পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত



পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম খণ্ড

boiRboi.net

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

"যে রাম যে কৃষ্ণ, ইদানীং সেই রামকৃষ্ণরূপে
ভক্তের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।"—**শ্রীরামকৃষ্ণ**

"নরলীলায় অবতারকে ঠিক মানুষের মত
আচরণ করতে হয়—তাই চিনতে পারা
কঠিন। মানুষ হয়েছেন তো ঠিক মানুষ।
সেই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, কখনো বা
ভয়—ঠিক মানুষের মত। পঞ্চভূতের ফাঁদে
ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।"—**শ্রীরামকৃষ্ণ**

boiRboi.net

www.boiRboi.net

॥ ১ ॥

তোকে কলকাতায় নিয়ে এলাম। দেখছিস?

মস্ত শহর কলকাতা। চোখের সামনে জলজল করছে। না দেখে উপায় কি?

এ কি আমাদের কামারপুকুরের মত নিঝঝুম? নিরিবিলি?

রামকুমার চিন্তিত মুখে বললেন, 'কলকাতায় এসে টোল খুললাম—'

তাও দেখতে পাচ্ছি বৈকি। তা ছাড়া ঝামাপুকুরে কারু-কারু বাড়িতে দাদা তো পুরোহিতগিরিও করছেন। সব পেরে উঠছেন না। সময় কই? টোলে টোল খেতে খেতেই দিন যায়।

'তাই তোকে নিয়ে এলাম এখানে।' বললেন রামকুমার, 'এবার একটু লেখাপড়া কর্।'

লেখাপড়া? গদাধর সরল-বিশাল চোখ তুলে তাকিয়ে রইল দাদার দিকে।

'হ্যাঁ, এবার বাড়ি গিয়ে দেখলাম লেখাপড়ায় তোর একেবারে মন নেই। পাড়ার ছোঁড়াদের সঙ্গে গাঁ-ময় ঘুরে বেড়াস, নয়তো যাত্রাদলে গিয়ে শিব সাজিস। ও সবে পেট ভরবে না—' রামকুমারের কণ্ঠস্বরে একটু ঝাঁজ ফুটল।

তবে কি করতে হবে?

মন দিয়ে লেখাপড়া করতে হবে। ষোলো-সতেরো বছর বয়স হলো তোর। ছিটে-ফোঁটা বিদ্যেও তোর পেটে নেই। আমার আয় দেখতে পাচ্ছিস তো? ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না—

তা আর অজানা নেই। কিন্তু শিখতে হবে কি?

'শাস্ত্র—ব্যাকরণ—' গম্ভীর হলেন রামকুমার: 'একটু মন লাগা। মা'র কাছছাড়া করে নিয়ে এসেছি তোকে। মা'র মুখ প্রসন্ন কর্।'

মা'র মুখ প্রসন্ন কর্। মা'র বিষণ্ণ মুখখানি মনে মনে ধ্যান করল গদাধর। সে কি শুধু চন্দ্রমণির মুখ?

সে মুখে অভয়প্রদা প্রসন্নতা। "সব্য হস্তে মুক্ত খড়্গ দক্ষিণে অভয়।"

'দাদা, চাল-কলা-বাঁধা বিদ্যে শিখে আমার কি হবে? তা দিয়ে আমি কি করব?'

তার মানে? বিরক্ত হলেন রামকুমার।

তার মানে অর্থকরী বিদ্যে আমি চাই না। ঘর-সাজানো বিদ্যে।

'তবে তুই কি চাস?'

'আমি চাই জ্ঞান।'

এ আবার কোন দিশি কথা? কোন দিশি জ্ঞান? এ জ্ঞানের অর্থ কি?

এ জ্ঞানের অর্থ নেতি। নেতি-নেতি করে-করে একেবারে শেষকালে যা বাকি থাকে তাই। সেই এক জানাই জ্ঞান, আর অনেক জানা অজ্ঞান—

বুঝতে পারলেন না রামকুমার। কি করেই বা বুঝবেন? সংসারের সুখভোগকে তুচ্ছ করে কেউ স্বপ্নবিলাসে মত্ত থাকতে পারে এ তাঁর কল্পনার অতীত। দরিদ্রের পক্ষে অভাবমোচনের চেষ্টার বাইরে আবার ব্যাকুলতা কী!

ছোট ভাইকে বকতে লাগলেন রামকুমার। কিন্তু গদাধর চুপ। অবিচল।

যখন সত্যিকারের জ্ঞান হয় তখন স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। সত্যিকারের জ্ঞান মানেই ব্রহ্মজ্ঞান। যেমন ধরো, একটি মেয়ের স্বামী এসেছে, সঙ্গে এসেছে তার সমবয়স্ক বন্ধুরা। সবাই বাইরের ঘরে বসে গুলতানি করছে। এদিকে ঐ মেয়েটি আর তার সমবয়সী সখীরা জানলার ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে। মেয়েটির স্বামীকে চেনে না সখীরা। একজনকে দেখিয়ে জিগগেস করছে, ঐটি তোর বর? মেয়েটি অল্প হেসে বলছে, না। ঐটি? উঁহু। ঐটি? তাও না। এমনি চলেছে নেতি-নেতি। শেষকালে ঠিক-ঠিক যখন স্বামীকে দেখিয়ে দিয়ে বললে, তবে ঐটিই তোর বর? তখন সে মেয়ে হাঁ-ও করে না, না-ও করে না, শুধু একটু ফিক করে হেসে চুপ করে থাকে। সখীরাও তখন বুঝতে পারে, কে বর। তেমনি যেখানেই ব্রহ্মজ্ঞান সেখানেই মৌন।

এ মৌনের ভুল মানে করলেন রামকুমার। ভাবলেন ছেলেটার মাথা বোধ হয় বিগড়েছে।

লেখাপড়া যখন শিখবে না তখন যা হয় একটু কিছু কাজ করুক। অন্তত দেব-সেবার কাজ। বাড়িতে রঘুবীর আছেন, সেবা-পূজার কাজ তো সে জানে। তাই সেদিকে মন দিক। কিছু দক্ষিণার সাশ্রয় হোক।

ঝামাপুকুরে দিগম্বর মিত্রের বাড়িতে গৃহদেবতার নিত্যপূজা। সেখানে গদাধরকে ঢুকিয়ে দিলেন রামকুমার।

গদাধর মহাখুশি। মনের মতন কাজ মিলেছে তার। যেন মনের মানুষ চলে এসেছে তার হাতের নাগালের মধ্যে।

যেমন দেখতে মনোহর তেমনি কণ্ঠস্বরে মধু ঢালা। ভজন গায় গদাধর। যে দেখে যে শোনে সেই তদ্‌গত হয়ে যায়। মনে হয় কোথাকার কবেকার কে আপন লোক যেন পথ ভুলে চলে এসেছে। অভিজাত বাড়ির মেয়েদের পর্যন্ত বিন্দু-মাত্র কুণ্ঠা নেই। সূর্যকে মুখ দেখাতে সংকোচ, কিন্তু এ যেন অন্ধকার ঘরের অন্তরঙ্গ

আলো। সকলের বস্ত্রাঞ্চলের নিধি। উদাসীন অথচ আনন্দময়। দেবতার সামনে যখন বসে সবাই চমকে ওঠে, দেবতাই এসে বসেছেন নাকি সামনে? কিন্তু এদিকে যার যখন দরকার ফুট-ফরমাস খেটে দিচ্ছে গদাধর। আড্ডা দিচ্ছে অন্দরে-বাইরে। ছেলে-ছোকরার দল পাকিয়ে হৈ-হল্লা করছে। লেখাপড়ার নামে ঠনঠন।

কি হবে ও সব অবিদ্যায়?

অমৃত-সাগরে যাবার পথ খুঁজছি। যেমন করে হোক সাগরে গিয়ে পৌঁছুতে পারলেই হলো। শুধু পৌঁছুলে চলবে না, ডুবতে হবে। কেউ তোমাকে ধাক্কা মেরে ফেলেই দিক বা নিজেই ঝাঁপ দিয়ে পড়। ডুবতে হবে। যা ডোবায় না ভাসিয়ে রাখে, তা দিয়ে আমি কি করব?

ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীও এ কথা বলেছিলেন। ধনধারিণী বসুন্ধরার যত সম্পদ হতে পারে সব এনে তাঁকে উপহার দিলেন যাজ্ঞবল্ক্য। মৈত্রেয়ী মমতাশূন্যের মত বললেন, 'যা দিয়ে আমি অমৃত হতে পারব না তা নিয়ে আমি কি করব? যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম?'

শুধু পুঁথি পড়লে কি চৈতন্য হবে? চৈতন্য কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে দেহের মধ্যে। তাকে জাগানো চাই। কি করে জাগাবে? যোগে ব'সে। যোগ কি? যোগ মানে যুক্ত হয়ে থাকা। দীপশিখা দেখেছ? হাওয়া নেই যেখানে, সেই নিষ্কম্প দীপশিখা? সেই স্থির স্থিতি? তারই নাম যোগ। ঊর্ধ্বের সঙ্গে সংস্পর্শ। তারই প্রথম আসন এই দিগম্বর মিত্রের বাড়িতে।

রামকুমার কি করেন? কার সাহায্যে সচ্ছল হবে তাঁর সংসার? কে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবে?

'তুমি যা করো—' রঘুবীরকে স্মরণ করলেন রামকুমার। শ্যামল-শান্ত রঘুবীর।

॥ ২ ॥

রঘুবীর আছেন দেরে গ্রামে মানিকরাম চাটুজ্জের বাড়িতে। যে গ্রামের জমিদার প্রতাপপ্রবল রামানন্দ রায়। দৌরাত্ম্যই যার একমাত্র মাহাত্ম্য।

ক্ষুদিরাম মানিকরামের বড় ছেলে। বাপের মৃত্যুর পর বিষয়-সম্পত্তি দেখেন আর রঘুবীরের সেবা করেন। প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা যান অল্প বয়সেই। দ্বিতীয় বার বিয়ে করেছেন চন্দ্রমণিকে। যখন চন্দ্রমণির বয়স আট আর তাঁর নিজের বয়স পঁচিশ। বিয়ের ছ' বছর পরে জন্ম হল রামকুমারের। আর তার পাঁচ বছর পরে প্রথম মেয়ে কাত্যায়নীর।

'আপনাকে রাজা ডেকেছেন—' ক্ষুদিরামের ঘরের দরজায় জমিদারের পেয়াদা।
কি আর্জি হুজুরের? চোখ তুলে চাইলেন ক্ষুদিরাম।
আর্জি নয়, হুকুম। রাজার তরফ থেকে একনম্বর মামলা রুজু আছে আদালতে। আপনাকে সাক্ষী দিতে হবে। আপনি একজন ধার্মিক লোক। আপনার জবানবন্দির দাম আছে।
ব্যাপারটা শুনলেন বিশদ করে। বুঝলেন, মামলাটি মিথ্যে, তঞ্চকী।
'মিথ্যে মামলায় সাক্ষী হতে পারব না।' একবাক্যে না করলেন ক্ষুদিরাম।
পেয়াদা তো অবাক। ভাবতেও পারে না, এ আদেশ প্রত্যাখ্যান করা যায়। এর পরিণাম কি হবে তা কি চাটুজ্জে মশায় জানেন না?
জানেন। কোপে পড়বেন জমিদারের। কিন্তু জমিদারের প্রশ্রয়ের চাইতে সত্যের আশ্রয়ে বেশি শান্তি।
অন্তরের মধ্যে একবার দেখলেন তাঁর রঘুবীরকে। সত্যে আর ন্যায়ে যিনি প্রতিষ্ঠিত সেই করুণাঘন রামচন্দ্রকে।
যা হবার তাই হল।
রামানন্দ রায় উলটে ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধেই মিথ্যে নালিশ করলেন। যার পক্ষে আমলা তার পক্ষেই মামলা। ডিক্রি পেয়ে গেলেন রামানন্দ। জারিতে ক্ষুদিরামের স্থাবর-অস্থাবর সব নিলেম হয়ে গেল। স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাত ধরে পথে এসে দাঁড়ালেন।
দেড়শো বিঘে মতন জমি ছিল। সব একটা রঙচঙে তামাশার মত শূন্যে মিলিয়ে গেল। কিছুই কি রইল না আর পৃথিবীতে?
আছেন, রঘুবীর আছেন। অভয় আশ্রয়ের স্নিগ্ধ আতপচ্ছদ মেলে ধরেছেন আকাশে। যার কেউ নেই কিছু নেই তারো স্থান আছে। অন্তরে স্থান আছে। অনন্তে স্থান আছে।
ক্ষুদিরাম দেখলেন হঠাৎ একজন বন্ধু এসে উপস্থিত।
'আমি কামারপুকুরের সুখলাল গোস্বামী। চিনতে পার?'
'তোমায় চিনি না? তুমি আমার কতকালের বন্ধু।'
তুমি চলো কামারপুকুর। আমার বাড়ির একটেরে তুমি থাকবে। তোমায় জমি দিচ্ছি বিঘেটাক। কাটা ঘুড়ির সুতো ধরো আবার।
কামারপুকুরে গোস্বামীদের লাখেরাজী স্বত্ব। আয়ও তেমনি নিষ্কর। নিষ্কণ্টক।
সপরিবারে ক্ষুদিরাম চলে এলেন কামারপুকুর। গোস্বামীদের বাড়ির একাংশে কয়েকখানি চালাঘরে বাস করতে লাগলেন। লক্ষ্মীজলায় ধানী জমি পেলেন এক

বিঘে দশ ছটাক। চিরকালের অর্পণ।

বর্তে গেলেন ক্ষুদিরাম। যিনি নেন তিনিই আবার ফিরিয়ে দেন। এক দোর দিয়ে যান হাজার দোর দিয়ে আসেন। নিত্যেও তিনি লীলায়ও তিনি।

মনে পড়ে, একদিন নিরুপায় কণ্ঠে বলেছিলেন চন্দ্রমণি : 'ঘরে আজ চাল নেই—' তবু বিচলিত হননি ক্ষুদিরাম। বলেছিলেন, 'তাতে কি? রঘুবীর যদি উপোস করেন আমরাও উপোস করব।'

সৌম্যোজ্জ্বল চোখে হাসলেন রঘুবীর। বা, উপোস করব কেন?

লক্ষ্মীজলার মাঠে ধানী জমি সোনার ধানে ঝলমল করে উঠল। ক্ষুন্নিবৃত্তির তৃপ্তিতে যেন প্রসন্ন হাসি হাসছেন দেবতা।

দুপুর বেলা। গ্রামান্তরে গিয়েছিলেন ক্ষুদিরাম। ফেরবার সময় গাছের তলায় বিশ্রাম করতে বসেছেন। হঠাৎ কেমন যেন তন্দ্রার ঘোর লাগল। এলিয়ে পড়লেন। স্বপ্ন দেখলেন শ্রীরামচন্দ্র বালকের বেশে দাঁড়িয়ে আছেন সামনে। চন্দ্রের মত রমণীয় বলেই তো রামচন্দ্র। নবদূর্বাদলের মতই শ্যামল-স্নেহল। কিন্তু মুখখানি ম্লান কেন?

'আমি বড় অযত্নে আছি। অনেক দিন কিছু খাইনি।' বললে বালক, 'তোমার বাড়িতে আমাকে নিয়ে চলো। বড় সাধ তোমার হাতের একটু সেবা পাই।'

অস্থির হয়ে উঠলেন ক্ষুদিরাম। বললেন, 'আমি অধম, আমার সাধ্য কি তোমার সেবা করি?'

'কোনো ভয় নেই। নিয়ে চল আমাকে। যার হৃদয়ে ভক্তি আছে তার আমি ত্রুটি ধরি না।'

ঘুম ভেঙে গেল ক্ষুদিরামের। চার পাশে তাকিয়ে দেখলেন কেউ নেই। কিন্তু স্বপ্নে যে ধানক্ষেত দেখেছিলেন ঐ তো সেই ধানক্ষেত। নিশ্চয়ই ঐখানে লুকিয়েছেন। এগোলেন ক্ষুদিরাম। দেখলেন এক টুকরো পাথরের উপর এক বিষধর সাপ ফণা মেলে আছে। ঠাহর করে দেখলেন সামান্য পাথর নয়, শালগ্রাম শিলা। মনে হল স্বপ্ন মিথ্যা নয়, ঐ শিলাই তাঁর রামচন্দ্র, নইলে সাপ সহসা অন্তর্হিত হবে কেন? কিন্তু সাপ তো একেবারে হাওয়া হয়ে যায়নি, পাথরের মুখে যে গর্ত তারই মধ্যে গিয়ে লুকিয়েছে। পাথর তুলে আনবার সময় হাতে যদি দংশন করে! ইতস্তত করতে লাগলেন ক্ষুদিরাম। কিন্তু যিনি রাম তিনি কি বিষহরণ নন? 'জয় রঘুবীর' বলে ত্বরিতভঙ্গিতে তুলে নিলেন শিলা। সাপ কোথায় তা কে জানে।

লক্ষণ থেকে বুঝলেন এ 'রঘুবীর' শিলা। তবে আর সন্দেহ কি, এই শিলাই

তাঁর জাগ্রত গৃহদেবতা। শুধু জাগ্রত নয়, স্বয়মাগত।

একদিন পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন মেদিনীপুর, কামারপুকুর থেকে কম-সে-কম চল্লিশ মাইল দূরে। অন্নুদয়ে বেরিয়েছেন, হেঁটেছেন প্রায় দশটা পর্যন্ত। হঠাৎ দেখলেন রাস্তার ধারে এক বেলগাছ। ফাল্গুনের রাশি-রাশি নতুন পাতায় সারা গাছ ঝলমল করছে। দেখে ক্ষুদিরামের মন ঐ কচি পাতার মতই নেচে উঠল। পাশের গাঁয়ে ঢুকে একটা ঝুড়ি আর গামছা কিনলেন তাড়াতাড়ি। সামনের পুকুরের জলে ধুয়ে নিলেন বেশ করে। পাতা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে ঝুড়ি বোঝাই করলেন। ভিজে গামছাখানি চাপিয়ে দিলেন উপরে। মেদিনীপুর পড়ে রইল, পাতা নিয়ে বিকেল তিনটের সময় বাড়ি পৌঁছুলেন।

চন্দ্রমণি তো অবাক।

'অনেক—অনেক বেলপাতা পেয়েছি আজ। নতুন বেলপাতা। আজ প্রাণভরে শিবপুজো করব।'

'মেদিনীপুর? মেদিনীপুর গেলে না?'

'বেলপাতা দেখে সব ভুল হয়ে গেল। আবার যাব না-হয় একদিন মেদিনীপুর। কিন্তু এমন বেলপাতা পাব কোথায়?'

এই ক্ষুদিরাম!

এবার চলেছেন—মেদিনীপুর নয়—সেতুবন্ধ-রামেশ্বর। চলেছেন তেমনি পায়ে হেঁটে। পদব্রজে না হলে তীর্থ কি! ক্লেশ না করলে ক্লেশমোচনের স্পর্শ পাব কি করে?

ফিরলেন পরের বছর। সঙ্গে নিয়ে এলেন বাণলিঙ্গ শিব। বসালেন রঘুবীরের পাশে। হরির পাশে হর। সীতাপতির পাশে উমাপতি।

প্রায় ষোলো বছর পরে ফের ছেলে হল চন্দ্রমণির। দ্বিতীয় ছেলে। ক্ষুদিরাম তার নাম রাখলেন রামেশ্বর।

রামকুমার তখন বেশ বড়ো হয়ে উঠেছে, পুজো-আচ্চা করছে যজমান-বাড়িতে। লক্ষ্মীপুজোর রাত। দিন থাকতে ভুরসুবো গিয়েছে, মাঝরাতেও ফেরবার নাম নেই। ছেলের জন্যে চন্দ্রমণি ঘর-বার করছেন। মন বড় উচাটন। এখনো ফিরছে না কেন রামকুমার?

ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। পথের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন চন্দ্রমণি। অনেকক্ষণ পর দেখলেন কে একজন যেন মাঠ পেরিয়ে ভুরসুবোর দিক থেকে আসছে। রামকুমারই বোধ হয়—দু' পা এগিয়ে গেলেন চন্দ্রমণি। কিন্তু ছেলে কোথায়, এ তো একজন মেয়ে!

আশ্চর্য রূপ সেই মেয়ের। এক গা গয়না। এই নির্জন মধ্যরাত্রে এখানে তার কি দরকার?

'কোত্থেকে আসছ মা তুমি?' চন্দ্রমণি গায়ে পড়ে জিগগেস করলেন।

'ভুরসুবো থেকে।'

'আমার ছেলে রামকুমারের কোনো খবর জানো?'

জিগগেস করেই লজ্জিত হলেন চন্দ্রমণি। অজানা ভদ্রঘরের মেয়ে, কোনো বিশেষ কারণেই না-হয় বাইরে বেরিয়েছে—তাঁর ছেলের খবর সে পাবে কোথায়? ছেলের জন্যে ব্যাকুল হয়েছেন বলেই বোধ হয় তাঁর আর বোধজ্ঞান নেই।

'যে বাড়িতে তোমার ছেলে পুজো করতে গিয়েছে আমি সেই বাড়ি থেকেই আসছি।' মেয়েটি বললে চোখ তুলে: 'ভয় নেই, এখুনি ফিরবে—'

কেমন যেন বিশ্বাস হল চন্দ্রমণির। বুকের ভার নেমে গেল।

জিগগেস করলেন, 'এত রাত্রে এত গয়নাগাঁটি পরে কোথায় যাচ্ছ তুমি মা?'

মেয়েটি হাসল। বললে 'অনেক দূর।'

'তোমার কানে ও কি গয়না?'

'ওর নাম কুণ্ডল—'

'মা, তোমার বয়স অল্প। এই অসময়ে এত গয়না-টয়না পরে তোমার একা-একা যাওয়া ঠিক হবে না।' চন্দ্রমণির কণ্ঠে আকুলতা ঝরে পড়ল: 'তুমি আমাদের ঘরে এস। রাতটা বিশ্রাম করে কাল ভোর হ'তে চলে যেও।'

'না মা, আমায় এখুনি যেতে হবে। আরেক সময় আসব তোমাদের বাড়িতে।' বলে মেয়েটি চলে গেল।

চলে গেল কিন্তু রাস্তা বা মাঠ দিয়ে নয়। ভারি আশ্চর্য তো! তাঁদের বাড়ির পাশেই নতুন জমিদার লাহাবাবুদের সার-সার ধানের মরাই। যেন সেদিক পানে চলে গেল। ওদিকে পথ কোথায়? বিদেশী মেয়ে পথ হারালো নাকি? চন্দ্রমণি বাইরে বেরিয়ে এলেন। এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগলেন চঞ্চল হয়ে। কোথায় গেল সে চঞ্চলা?

এ আমি তবে কাকে দেখলাম? কোজাগরী রাত্রিকে জিজ্ঞাসা করলেন চন্দ্রমণি। স্বামীকে গিয়ে তুললেন। বলো, এ আমি কাকে দেখলাম? সর্বাবয়বানবদ্যা নানালঙ্কারভূষিতা এ কে?

সব শুনলেন ক্ষুদিরাম। বললেন, 'শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীকে দেখেছ।'

এই চন্দ্রমণি!

পিতৃদেব আর মাতৃদেবী। দুই-ই দিব্যভাবের ভাবুক।

এমন বাপ-মা না হলে এমন ছেলে জন্মাবে কি করে ?

কাত্যায়নীর বড় অসুখ। আন্দুলে তার শ্বশুরবাড়িতে তাকে দেখতে গিয়েছেন ক্ষুদিরাম। মেয়ের হাবভাব কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হল। মনে হল ভূতাবেশ হয়েছে।

চিত্ত সমাহিত করে দেহে দিব্যযোনিকে আহ্বান করলেন ক্ষুদিরাম। প্রেতযোনিকে সম্বোধন করে বললেন, 'কেন আমার মেয়েকে অকারণে কষ্ট দিচ্ছ ? চলে যাও বলছি।'

কাত্যায়নীর জবানিতে বললে সেই প্রেতাত্মা : 'চলে যাব যদি আমার একটা কথা রাখো ?'

'কি কথা ?'

'যদি গয়া গিয়ে আমাকে পিণ্ড দিতে রাজী হও। আমার বড় কষ্ট—'

ক্ষুদিরাম তিলমাত্র দ্বিধা করলেন না। বললেন, 'দেব পিণ্ড। কিন্তু তাতেই কি তুমি উদ্ধার পাবে ?'

'পাব।'

'তার প্রমাণ কি ?'

'তার প্রমাণ আমি এখুনি দিয়ে যাচ্ছি। যাবার সময় সামনের ঐ নিমগাছের বড় ডালটা আমি ভেঙে দেব।'

মুহূর্তে নিমগাছের বড় ডালটা ভেঙে পড়ল।

আর কাত্যায়নীর অসুখও মিলিয়ে গেল বাতাসে।

ক্ষুদিরাম গয়া রওনা হলেন। সেটা শীতকাল, ১২৪১ সাল। পৌঁছুলেন চৈত্রের শুরুতে। মধুমাসেই পিণ্ডদান প্রশস্ত।

বিষ্ণুপদে পিণ্ড দিলেন ক্ষুদিরাম। রাতে বিচিত্র স্বপ্ন দেখলেন।

যেন তাঁর সামনে গদাধর এসে দাঁড়িয়েছেন। বলছেন, 'তোমার পুত্র হয়ে তোমার বাড়িতে গিয়ে জন্মাব। সেবা নেব তোমার হাতে।'

ক্ষুদিরাম কাঁদতে লাগলেন। বললেন, 'আমি গরিব, আমার সাধ্য কি তোমার সেবা করি ?'

'ভয় নেই।' বললেন গদাধর, 'যা জুটবে তাই খাওয়াবে আমাকে। আমি উপচার চাই না, ভক্তি চাই।'

এক মাস পরে বাড়ি ফিরলেন ক্ষুদিরাম। স্বপ্নের কথা পুষে রাখলেন মনে-মনে।

এদিকে চন্দ্রমণি কী দেখছেন ?

দেখছেন, রাতে তাঁর বিছানায় তাঁরই পাশে কে একজন শুয়ে আছে। স্বামী বিদেশে, অথচ এ কী অভাবনীয়! তা ছাড়া, কই, মানুষ তো এত সুন্দর হয় না! ধড়মড় করে উঠে বসলেন চন্দ্রমণি। প্রদীপ জ্বালালেন। কই, কেউ কোথাও নেই! দরজার খিল তেমনি অটুট আছে। কৌশলে খিল খুলে কেউ ঘরে ঢুকে তেমনি কৌশলে আবার পালিয়ে গেল নাকি? এত স্পষ্ট যে স্বপ্ন বলে বিশ্বাস হয় না। ভোর হতেই ধনী কামারনীকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'হ্যাঁ লো, কাল রাতে কেউ আমার ঘরে ঢুকেছিল বলতে পারিস?'

সব কথা শুনে ধনী হেসেই অস্থির। বললে, 'মর মাগী, লোকে শুনলে অপবাদ দেবে যে! বুড়ো বয়সে আর ঢলাসনি! স্বপ্ন দেখেছিস লো, স্বপ্ন দেখেছিস!' তাই মনে-মনে মেনে নিলেন চন্দ্রমণি। স্বপ্নই হবে হয়তো। কিন্তু আশ্চর্য, রাত কি কখনো দিনের মতো স্পষ্ট হয়?

আরেক দিন।

যুগীদের শিবমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন চন্দ্রমণি, দেখতে পেলেন মহাদেবের গা থেকে একটা আলো বেরিয়ে এসে ঘুরতে লাগল হাওয়ার মতো। ঘুরতে-ঘুরতে ছেয়ে ফেলল চন্দ্রমণিকে, তাঁর শরীরের মধ্যে ঢুকতে লাগল প্রবল স্রোতে। টলে পড়ে যাচ্ছিলেন, কাছেই ধনী ছিল, ধরে ফেললে। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ধনীকে সব বললেন চন্দ্রমণি। ধনী বললে, 'তোর বায়ুরোগ হয়েছে।'

গয়া থেকে ফিরে এসে শুনলেন সব ক্ষুদিরাম।

'আমার পেটে যেন কেউ এসেছে—এমনি মনে হচ্ছে সত্যি—', চন্দ্রমণি বললেন স্বামীকে।

'গদাধর আসছেন—'

এবারের গর্ভধারণে চন্দ্রমণির রূপ যেন আর বাঁধ মানছে না। যেন লাবণ্যবারিধি উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। সে-রূপ বুঝি সূর্যোদয়ের আগেকার আরক্তিম আকাশের রূপ।

'বুড়ো বয়সে গর্ভ হয়ে রূপ যেন ফেটে পড়ছে—,' বলাবলি করে পাড়ার মেয়েরা। কেউ বলে, 'পেটে ওর ব্রহ্মদত্যি ঢুকেছে—বাঁচলে হয় এবার।'

নানা রকম দিব্যদর্শন হচ্ছে চন্দ্রমণির। কখনো ত্রাস, কখনো উল্লাস, কখনো বা ঔদাসীন্য। কখনো বলেন, আমার এ গর্ভ পতিস্পর্শে ঘটেনি; কখনো বলেন, আমার মধ্যে পুরুষোত্তম এসেছেন। কখনো বা নিতান্ত অসহায়ের মত বলেন, 'আমাকে বুঝি গোসাঁইয়ে পেল।'

গোসাঁইয়ে পাওয়া মানে ভূতে পাওয়া। সুখলাল গোস্বামী মারা যাবার পর নানা রকম দৈব উৎপাত দেখা দিয়েছিল গ্রামের মধ্যে। লোকের বিশ্বাস হয়েছিল সুখলাল গোসাঁই মরে ভূত হয়েছে আর আছে তাদের বাড়ির সামনেকার বকুল গাছের মগডালে। সেই থেকে কাউকে কখনো ভাবে পেলে লোকে বলত, গোসাঁইয়ে পেয়েছে।

কিন্তু ক্ষুদিরাম তাঁর মন খাঁটি করে রেখেছেন, তাঁর ঘরে পুত্ররূপে নারায়ণ আসছেন।

ঘরের দরজা বন্ধ করে বাইরে দোরগোড়ায় শুয়ে আছেন চন্দ্রমণি, হঠাৎ শুনতে পেলেন কোথায় যেন নূপুর বাজছে। কান খাড়া করলেন, আওয়াজ তো তাঁর বন্ধ ঘরের মধ্যে। ঘর শূন্য দেখে বন্ধ করেছি দরজা, কেউ অগোচরে ঢুকে পড়ল নাকি? ঢুকে পড়ল তো নূপুর পেল কোথায়? ত্রস্ত হাতে বন্ধ দরজা খুলে ফেললেন চন্দ্রমণি। কেউ কোথাও নেই। যেমনি শূন্য ছিল তেমনি আছে। কি আশ্চর্য, চোখের মত কানও কি ভুল করবে?

স্বামীকে বললেন এই নূপুর-গুঞ্জনের কথা। ক্ষুদিরাম বললেন, 'গোকুলচন্দ্র আসছেন।'

একদিন মনে হল চন্দনের গাঢ় গন্ধ পাচ্ছেন চারদিকে। ঘরের মধ্যে যেন বিদ্যুতের খেলা দেখছেন। বুকের উপর উঠে কে এক শিশু গলা জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছে, আর পিছলে পড়ে যাচ্ছে গড়িয়ে, দু'বাহু দিয়ে চেপে ধরে রাখতে পারছেন না।

রঘুবীরের ভোগ রাঁধছেন চন্দ্রমণি, হঠাৎ যেন প্রসব-বেদনা টের পেলেন। বললেন, 'উপায়? এখন যদি হয়, ঠাকুরের সেবা হবে কি করে?'

'যিনি আসছেন তিনি রঘুবীরের সেবায় ব্যাঘাত ঘটাতে আসবেন না।' বললেন ক্ষুদিরাম, 'তুমি স্থির থাক। যাঁর পূজা তিনিই তার ব্যবস্থা করবেন।'

ঠাকুরের মধ্যাহ্ন-ভোগ আর শীতল শেষ হল নির্বিঘ্নে। রাতও প্রায় যায়-যায়। ধনী এসে শুয়েছে চন্দ্রমণির কাছে। বাড়িতে থাকবার মত দু'খানি চালাঘর, তা ছাড়া, রান্নাঘর, ঠাকুরঘর, আর ঢেঁকিঘর। ঢেঁকিঘরেই আঁতুড় পড়বে বলে ঠিক হয়েছে। ঘরে এক দিকে ধান ভানবার একটা ঢেঁকি আর ধান সিদ্ধ করবার একটা উনুন।

রাত ফুরুতে তখনো আধঘণ্টা বাকি, চন্দ্রমণির ব্যথা উঠল। ধনী তাঁকে নিয়ে এল ঢেঁকিসেলে, শুইয়ে দিলে মাটির উপর। দেখতে দেখতে প্রসব হয়ে গেল। যা অনুমান করা গিয়েছিল, পুত্র, নরবেশে পরমপুরুষই এসেছেন। প্রতিশ্রুত

প্রতিমূর্তি।

এসেছেন ? দেখেছিস তুই ?

হ্যাঁ লো, দেখেছি। তুই চুপ কর। ঠাণ্ডা হ। দেখবি, তুইও দেখবি। এখন তোকেই আগে দেখা দরকার।

ধনী সাহায্য করতে গেল প্রসূতিকে।

কিন্তু এ কী সর্বনাশ, ছেলে কই ? কই সেই নব-কলেবর ?

চকা-হরিণের মত ছট্‌ফট করে উঠল ধনী। কাঁপা হাতে বাতির সলতে বাড়িয়ে দিলে। ছেলে কই ? দেখা দিয়েই অন্তর্হিত হয়ে গেল নাকি ?

ওমা, দেখেছ ? পিছল মাটিতে হড়কে-হড়কে ধানসেদ্ধর উনুনের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে। উনুনে আগুন নেই এখন, কিন্তু ছাই আছে গাদি করা।

আলগোছে ধনী ছেলেকে টেনে নিলে কোলে। ছাই-মাখা ছেলে। ভাস্বর ভস্মভূষণ।

'ওমা, কত বড় ছেলে! প্রায় ছ'মাসের ছেলের মত!' ধনী নাড়ে-চাড়ে আর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। খালি গা, অথচ মনে হয় যেন কত মণি-রত্ন পরে আছে। দ্বিতীয়া তিথি কিন্তু মনে হয় যেন অদ্বিতীয় চাঁদ।

বাংলা ১২৪২ সালের ছয়ই ফাল্গুন ইংরিজি ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের সতেরোই ফেব্রুয়ারি। শুক্লপক্ষ, বুধবার। ব্রাহ্মমুহূর্ত।

ছেলে কোলে নিয়ে বসে একদিন রোদ পোয়াচ্ছেন চন্দ্রমণি। হঠাৎ মনে হল কোল জুড়ে যেন তাঁর পাথর পড়ে আছে। ভার যেন বইতে পারছেন না।

এ কী হলো বলো দেখি ?

কী আবার হবে! বিশ্বম্ভরের ভর হয়েছে ছেলের উপর।

অসহ্য। কোল থেকে ছেলে নামিয়ে নিয়ে কুলোর উপর শুইয়ে দিলেন চন্দ্রমণি। শিশুর ভারে কুলো চড়চড় করে উঠল। কুলো ভেঙে যাবে নাকি ? ব্যাকুল হাতে চন্দ্রমণি ছেলেকে আবার কোলে তুলতে গেলেন। ছেলে নিশ্চল—পাষাণ। দু'হাতে এমন শক্তি নেই যে টেনে তোলেন। যিনি গিরি ধরেছিলেন তিনিই যে শুয়ে আছেন কুলোর উপর তা কে জানে। চন্দ্রমণি কাঁদতে লাগলেন।

যে যেখানে ছিল ছুটে এল।

কি হলো ? হলো কি ?

'ছেলেকে কোলে তুলতে পারছি না—'

'কেন ?'

BanglaBook.org

'নিশ্চয়ই ওই নিমগাছের ব্রহ্মদত্যি ভর করেছে বাছার উপর—'

'কি যে বলিস তার ঠিক নেই। দাঁড়া, গা ঝেড়ে দিচ্ছি—', ধনী কামারনী কুলোর কাছে বসে মন্ত্র পড়তে লাগল।

নিমেষে শিশু হালকা হয়ে গেল। যেমন-কে তেমন। তেমনি নবীন ও নিরীহ।

আরো একদিন।

সংসারের কাজে গৃহান্তরে গিয়েছেন চন্দ্রমণি। মশারি ফেলা পাঁচ মাসের শিশু ঘুমুচ্ছে বিছানায়। ঘরে ফিরে এসে দেখেন ছেলে নেই। তার বদলে মশারি-প্রমাণ কে-এক দীর্ঘকায় মানুষ শুয়ে আছে। নবোদ্‌গত গাছের বদলে বিরাট বনস্পতি।

চেঁচিয়ে উঠলেন চন্দ্রমণি : 'ওগো দেখে যাও, বিছানায় ছেলে নেই—'

'কি বলছ ?' ত্রস্ত পায়ে ছুটে এলেন ক্ষুদিরাম।

'দেখ এসে, বিছানায় বাছার বদলে কে শুয়ে আছে !'

দু'জনেই তাকালেন মশারির দিকে। কই, তাঁদের সেই শিশুই তো শান্তিতে শুয়ে আছে। হাত-পা নেড়ে খেলা করছে আপন-মনে।

এ কী খেলা ! এই যে দেখলাম মহাকায় মানুষ। আবার এই দুধের ছেলে। সব শুনে গম্ভীর হলেন ক্ষুদিরাম। বললেন, 'কাউকে কিছু বোলো না।'

ছ'মাসে পা দিল শিশু। ছেলের মুখে-ভাতের যোগাড় করতে হয় এবার। বেশি জাঁকজমক করবার অবস্থা কই ? কোনো রকমে রঘুবীরের প্রসাদী ভাত মুখে দিয়েই নিয়মরক্ষা করতে হবে।

কিন্তু পাড়ার লোকেরা নাছোড়বান্দা। এমন রাজ্যেশ্বর ছেলে, ভোজ দাও। কারবারী ধর্মদাস লাহা ক্ষুদিরামের বন্ধু। এক পাড়ার বাসিন্দে। তাঁকে গিয়ে ধরলেন ক্ষুদিরাম। বললেন, 'বন্ধু, এখন উপায় ?'

ঈশ্বরই উপায়, আবার ঈশ্বরই উপেয়। যা তাঁর কৃপা, তাই তাঁর শক্তি।

'ভয় কি, লাগিয়ে দাও। রঘুবীর উদ্ধার করে দেবেন।' বললেন ধর্মদাস।

ধর্মদাসই ব্যবস্থা করলেন সব। তাঁর টাকার থলের মুখ খুলে দিলেন। পাড়ার লোককে তিনিই প্ররোচনা দিয়েছিলেন ক্ষুদিরামের থেকে নেমন্তন্ন আদায় করার জন্যে। আবার তিনিই সব জোটপাট করলেন। এ-পাড়া ও-পাড়া কাকে ছেড়ে কাকে বলবেন—গাঁ-কে গাঁ ঝোলো আনারই আসন পড়ল। জীবের মধ্যে যে শিব আছে, নিঃস্ব-নির্ধনের মধ্যে যে নারায়ণ, সেও তো আরাধনীয়। সেও তো সেব্য-পূজ্য।

কি নাম রাখবে শিশুর ?

এ আবার জিজ্ঞাসা কর কেন ? গয়াধামে গিয়ে গদাধর পেলাম। এ সেই গদাধর। গয়াবিষ্ণু।

ডাক-নাম ?

আদর করে গদাই বলে ডাকেন বাপ-মা। ডাকে ধনী কামারনী।

দিনে-দিনে বাড়ছে গদাধর। বড়-সড় হয়ে উঠছে। চন্দ্রমণি তাকে মাঝে-মাঝে ধুতি পরিয়ে দিচ্ছেন।

লাহাবাবুদের অতিথিশালায় সাধু-সন্ন্যাসীর নানান আনাগোনা। গদাধরের মন পড়ে আছে সেই সন্নেসীদের মাঝখানে। শুধু প্রসাদের লোভে নয়, হয়তো বা আর কিছুর আকর্ষণে। হয়তো বা কোনো জ্ঞাতিত্বের প্রতিশ্রুতিতে। আত্ম-ভোলা শিশুর মাঝে বাসা বেঁধেছেন শিশু-ভোলানাথ।

মা নতুন বস্ত্র পরিয়ে দিয়েছেন গদাধরকে।

কতক্ষণ পরেই এ তার কি পরিণতি! ফালা-ফালা করে ছিঁড়ে ফেলেছে গদাধর। এক ফালা নিয়ে দিব্যি ডোরকপনি করে পরেছে!

'ওমা, এ কি ? এ তুই কী হয়েছিস ?'

'অতিথি হয়েছি।'

'অতিথি ? সে আবার কী ?'

বুঝিয়ে দিল গদাধর। লাহাবাবুদের অতিথিশালায় যারা আসে, তাদেরকে অতিথি বলে না ?

তারা তো সব সন্ন্যাসী। সেই সন্ন্যাসীর বেশই তুই পছন্দ করলি ? মা'র মন হু হু করে উঠল। আস্ত কাপড় দিলাম, তা ছিঁড়ে তুই কৌপীন বানালি ?

গদাধর হাসল। অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর বুঝি এইটুকু একটু খণ্ড নিয়েই খুশি। ছোট-ছোট তিনখানি খোড়ো ঘর, তার মধ্যে একখানি আবার ঢেঁকিশাল। আশে-পাশে গাছপালা, ঝোপ-জঙ্গল। দেখলেই মনে হয়, গরিবের সামান্য কুটির। তবু কে জানে কেন, ছবিতে এমন একটি ভাব, চোখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করে না! মনে হয় কী যেন এখানে আছে! কত না-জানি শান্তি! কত না-জানি দয়া! কত না-জানি আশ্রয়!

পথ দিয়ে যেতে-যেতেও দাঁড়িয়ে যায় লোকেরা। ভাবে, কেন ভাবে কে বলবে, ঐখানে গেলে যেন তৃষ্ণার জল মিলবে, মিলবে যেন সমস্ত অসুখের আরোগ্য! ঐখানে আছে কে ? ও কার বাড়ি ? ও কি কোনো মুনি-ঋষির আশ্রম ?

॥ ৪ ॥

লাহাবাবুদের বাড়ির সামনে চালাও নাটমন্দিরে পাঠশালা। পাঁচ বছরের ছেলে তখন গদাধর, পাততাড়ি বগলে করে ঢুকল এসে সে পাঠশালায়।

সকালে-বিকেলে দু'বার করে পড়া হয়। সকালে দু'তিন ঘণ্টা পড়ে স্নানাহারের ছুটি, বিকেলে এসে আবার সন্ধ্যে পর্যন্ত। ইস্কুলে আর কিছুই ভালো লাগে না গদাধরের, শুধু আর কতগুলো ছেলে এসে যে জমেছে এইটেই মস্ত মজা। খুব করে খেলা করা যাবে। যেখানে যত বেশি প্রাণ সেখানেই তত বেশি লীলা। যদি ঐ শুভঙ্করীটা না থাকত! ও দেখলেই কেমন ধাঁধা লেগে যায় গদাধরের। কষ্টে-সৃষ্টে যোগ যদি বা হল, বিয়োগ আর কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারল না। কি করেই বা পারবে? যোগে আছে সর্বক্ষণ, তাই যোগ করায়ত্ত। কিন্তু বিয়োগ আবার কি! কোথাও লয়-ক্ষয় নেই, বিয়োগ-বিচ্ছেদ নেই। এখানে পূর্ণ থেকে পূর্ণ গেলেও থেকে যায় পূর্ণ।

পড়া বলতে বললেই মুস্কিল। তার চেয়ে স্তোত্র-প্রণাম দাও মুখস্থ বলে দিচ্ছে! বর্ণ-পরিচয় করে পড়তে যাওয়াটাই ঠিক, কিন্তু গদাধরের উলটো—তার পড়তে পড়তে বর্ণ-পরিচয়। অঙ্ক দিলেই আতঙ্ক। অঙ্ক ফেলে তালপাতায় ঠাকুরের নাম লেখা অনেক অনেক আরামের। যা রাম তাই নাম।

পাঠশালার ছুটির পর মধু ঘুগীর বাড়িতে গদাধর প্রহ্লাদ-চরিত পড়ছে। ভিড় জমেছে চার পাশে। এমন শিশুর মুখে এমন মনোহরণ পড়া কেউ আর শোনেনি কোনো দিন। কাছাকাছি আমগাছের ডালে বসে এক হনুমানও শুনছে সেই পড়া, সেই স্বরলহরী। হঠাৎ সে হনুমান এক লাফে নেমে এল গাছ থেকে, শিশুর কাছাকাছি এসে তার পা ধরে বসে পড়ল। গদাধর বিন্দুমাত্র ভয় পেল না, বরং হনুমানের মাথায় দিব্যি হাত ঠেকিয়ে আশীর্বাদ করলে।

হনুমান যেন চিনতে পেরেছে রামচন্দ্রকে। প্রণামের বিনিময়ে আশীর্বাদ নিয়ে এক লাফে আবার নিজের জায়গায় চলে গেল।

তেমনি গোচারণের মাঠে গিয়ে গদাধর ব্রজের রাখাল হয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে জুটছে সব সেথোরা। কেউ হচ্ছে সুবল কেউ শ্রীদাম—কেউ কেউ বা দাম-বসুদাম। আর যে গদাধর সেই তো বংশীধর। চরে-চরে কাছে আসে গোধন, আপন হাতে ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়ায়। কখনো বা লাফিয়ে লাফিয়ে দোল খায় গাছের ডালে। কখনো বা পাড়ে কাপড় ছেড়ে রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুকুরে। কোঁচড়ে করে মুড়ি খায়। খেতে খেতে নাচে। হাসে।

একদিন তেমনি বাঁড়ুয্যে-বাগানের মাঠে গরু চরাচ্ছে সকলে। হঠাৎ গদাধর বললে, 'আয় সবাই মিলে আজ মাথুর গান গাই। গাইবি?'

সবাই একবাক্যে রাজি।

গাছের তলায় যাত্রা আরম্ভ হয়ে গেল।

আজ কৃষ্ণ নেই। আজ রাধিকা। আজ কৃষ্ণকান্ত-বিরহিণী। কৃষ্ণ দেখেছিস এত দিন, আজ দেখ রাই-কমলিনীকে।

মাথুর-বিরহের গান ধরল গদাধর। সৃষ্টির মহামৌনের মাঝে যে শাশ্বত কান্না প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, আপন হৃদয় নিঙড়ে তা উৎসারিত করে দিল। কোথায়—কোথায় তুমি কৃষ্ণ, কোথায় হে তুমি পরমতম আকর্ষণীয়! কবে আমার এই ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ মিলবে গিয়ে তোমার নির্বিকল্প নির্বাণহীনতায়?

গাইতে গাইতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল গদাধর। বাহ্যচৈতন্য রইল না। সেথোরা অস্থির হয়ে পড়ল: 'ওরে গদাই, কি হল তোর? কেন এমন করছিস? চোখ চা।'

কেউ গায়ে ঠেলা দেয়, কেউ চোখে-মুখে জল ছিটোয়, কেউ বা কি করবে বুঝতে না পেরে কাঁদে।

কে একজন হঠাৎ কানের কাছে মুখ এনে বলে: 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ। হরেকৃষ্ণ—'

যে নামে অজ্ঞান সেই নামেই আবার জ্ঞান। যে নামে বৈরাগ্য সেই নামেই আবার প্রেম।

প্রাণকর কৃষ্ণনাম শুনে উঠে বসল গদাধর। কোথায় কৃষ্ণ? চার পাশে সব বালক-বন্ধুর দল। এই তো! তোরাই কৃষ্ণ, তোরাই কৃষ্ণ। সমস্ত সংসারই কৃষ্ণময়।

এই সব খেলা-ধুলোতেই গদাধরের কেরামতি। লেখাপড়ায় মন যেন থা পাতে না, আর অঙ্ক তো ডাঙোশ উঁচিয়ে আছে। তার চেয়ে গাঁয়ের কুমোরেরা যেমন মাটির তাল ছেনে মূর্তি গড়ছে, তাদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দাও, গদাধর পয়লা নম্বরের কারিগর। যদি বলো তো পট এঁকে দিতে পারে ওস্তাদ পটুয়ার মত। বেশ, ছবি-টবি চাও না, তবে গান শুনবে? কী গান গাইব? হরিনাম ছাড়া আবার গান আছে নাকি? ভক্তি ছাড়া আর কিছু আস্বাদন আছে?

পূজায় বসেছেন ক্ষুদিরাম। সামনে শান্ত-সৌম্য রঘুবীরের মূর্তি। পাশে নানান রকম উপকরণ—তার মধ্যে একগাছি ফুলের মালা। ঠাকুরকে স্নান করিয়ে রেখে চোখ বুজে তাঁর ধ্যান করছেন ক্ষুদিরাম। সেই স্নাত-অঙ্গের পুণ্যস্পর্শের স্বাদ কল্পনা করছেন, ধ্যানে ক্রমশই অতলায়িত হয়ে যাচ্ছেন। সাড়া নেই স্পন্দন নেই। সে এক সীমাহীন সমাধি।

গদাধরের বড় সাধ ঐ চিকণ-গাঁথন ফুলের মালাটি গলায় পরে। অমনি তুলে

নিয়ে গলায় দিয়ে পালিয়ে গেলে চলবে না। নয়নরোচন রঘুবীর সাজতে হবে। শিল্পামূর্তির পাশে বসে পড়ল গদাধর। চন্দনের বাটি থেকে চন্দন নিয়ে মাখলে সারা গায়ে। থালার থেকে মালা তুলে নিয়ে নিজের গলায় তুলিয়ে দিলে। বললে বাবাকে উদ্দেশ করে: 'চোখ মেল। রঘুবীরকে দেখ। দেখ কেমন সেজেছে আজ রঘুবীর—'

ধ্যান ভেঙে গেল ক্ষুদিরামের। চোখ মেলে দেখলেন, সামনে গদাধর বসে।

সেই দিন কি পুত্রবন্দনা করেছিলেন ক্ষুদিরাম? শিশুপুত্রের মাঝে কি লুকিয়ে আছে বালগোপাল?

রামশীলা দেবী ক্ষুদিরামের ছোট বোন। কামারপুকুরের কাছে ছিলিমপুরে তাঁর শ্বশুরবাড়ি। তিনি শীতলা দেবীর ভক্ত। মাঝে মাঝে তাঁর উপরে শীতলা দেবীর আবেশ হত। তখন তিনি একেবারে অন্য রকম হয়ে যেতেন। একদিন ভাইয়ের বাড়িতে এসেছেন রামশীলা। এসেই আবার অমনি শীতলা দেবীর আবেশ হয়েছে। সবাই ভয়ে তটস্থ, কী করে কি হবে কিছু বুঝতে পাচ্ছেন না। কিন্তু গদাধরের একরতি ভয় নেই। খুঁটে খুঁটে দেখছে পিসিমার ভাব, যাকে এঁরা বলছেন ভাবান্তর। চমৎকার অবস্থা তো—যেন অন্য কোথাও দেশ বেড়াতে যাওয়া। কে যেন দিব্যি ঘাড়ে ধরে তিন ভুবন ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। সবাই ত্রস্ত-ব্যস্ত, কিন্তু গদাধর প্রসন্নমুখে বলছে, 'পিসিমার ঘাড়ে যে আছে সে যদি আমার ঘাড়ে চাপে তো বেশ হয়—'

সেদিন কি সে-ই তবে প্রথম ঘাড়ে চাপল গদাধরের?

ছ'বছরের ছেলে ধানক্ষেতের সরু আল ধরে-ধরে চলেছে নিরুদ্দেশের মত। কোঁচড়ে মুড়ি, তাই তুলে তুলে চিবুচ্ছে থেকে থেকে। হঠাৎ কী মনে হল, আকাশের দিকে তাকাল একবার গদাধর। আকাশ তো আকাশই, শুধু তাকানোর মাঝেই তাৎপর্য। গদাধর দেখল এক বিশালকায় কালো মেঘ আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে, ছড়িয়ে পড়ছে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত। কি দিব্য মহিমা এই মেঘমণ্ডিত আকাশে। চোখ আর ফেরে না গদাধরের। হঠাৎ এক ঝাঁক সাদা বক সেই কালো মেঘের গা ঘেঁষে উড়ে গেল দূরান্তরে। গদাধরের সারা গায়ে শিহরণ লাগল। এই অপূর্ব, অনির্বাচ্য সৌন্দর্য্য কে পরিবেশন করল? কৃষ্ণিমার সঙ্গে এই শুভ্রতার যোগাযোগ? এই দিব্য কাব্য কার রচনা? হঠাৎ তার প্রতি গদাধরের প্রাণ-মন উড়ে চলল পাখা মেলে। দেহ-পিঞ্জর লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। চোখ মেলে চেয়ে দেখল বাড়িতে শুয়ে আছে। কে তাকে কখন কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে মাঠ থেকে কে জানে?

॥ ৫ ॥

গদাধরের মোটে সাত বছর বয়েস, ক্ষুদিরাম মারা গেলেন।

গিয়েছিলেন ভাগনে রামচাঁদের বাড়িতে, ছিলিমপুরে। মহাপূজার কাছাকাছি। কিন্তু মনে সুখ নেই। মনে সুখ নেই কেননা সঙ্গে গদাধর নেই।

ইচ্ছে ছিল সঙ্গে নিয়ে আসেন। কিন্তু ছেলেকে দূরে পাঠিয়ে চন্দ্রমণিই বা কি করে থাকবে? ও যে কটাক্ষে স্থিতি আবার কটাক্ষেই প্রলয়।

ছিলিমপুরে এসে দিনকয়েক পরেই অসুখে পড়লেন ক্ষুদিরাম। বাড়াবাড়ি অসুখ, তবু পুজোর আনন্দ ম্লান হতে দেবেন না। ষষ্ঠী গেল, সপ্তমী গেল, অষ্টমী গেল—নবমী বুঝি আর যায় না! কাতর চোখে তাকালেন একবার প্রতিমার আয়ত চোখের কোমল করুণার দিকে। নবমীও কেটে গেল। দশমী? দশমীর সন্ধ্যেয় প্রতিমা-বিসর্জনের পর রামচাঁদ দেখলেন ক্ষুদিরাম তখনো বেঁচে আছেন কিন্তু সময় বড় সংক্ষিপ্ত। চোখের দৃষ্টি যেন প্রতিমারই পথ ধরেছে। ডাকলেন: 'মামা!'

সাড়া নেই, শব্দ নেই। ক্ষুদিরাম নির্বাক।

সে কি? মৃত্যুকালে নাম করবেন না? জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে যাবে? নামবে বিস্মৃতির বিভ্রান্তি? এতদিনের অভ্যাস-যোগ আজ কোনো কাজে আসবে না? সমস্ত যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ হচ্ছে জপ-যজ্ঞ। তাই ঠাকুর বললেন, রাত-দিন জপ করবি। তা হলেই অভ্যাসবশে মৃত্যুকালে ঈশ্বর-চিন্তা আসবে। মৃত্যুকালে যা ভাববি তাই হবি। ভরত রাজা হরিণ-হরিণ করে শোকে প্রাণত্যাগ করেছিল। তাই তার হরিণ হয়ে জন্মাতে হল। মৃত্যুকালে যদি হরিনাম করতে পারিস তা হলেই সন্ধান পাবি ঈশ্বরের।

'মামা, রঘুবীরকে ভুলে গেলেন?' রামচাঁদের চোখ জলে ভরে এল: 'এত যার নাম করতেন সে আপনাকে আজ পরিত্যাগ করল?'

'কে? রামচাঁদ?' আচ্ছন্ন চোখ মেলে তাকালেন ক্ষুদিরাম: 'বিসর্জন হয়ে গেছে? আমাকে একবার তবে বসিয়ে দাও ধরাধরি করে।'

বসিয়ে দেওয়া হল। শুয়ে-শুয়ে নাম করব না, পূজার ভঙ্গিতে বসে নাম করব। সে নাম কি ভুলে যেতে পারি? সে আমার কণ্ঠের মধ্যে স্বর, মস্তিষ্কের মধ্যে স্মৃতি, রক্তের মধ্যে চেতনা। সে আমার নিশ্বাসবায়ু। আমার নিস্তার-নৌকা। জ্ঞানে গাঢ়, গম্ভীর সে স্বর—ক্ষুদিরাম রঘুবীরের নাম করলেন তিনবার। নাম

করার সঙ্গে-সঙ্গেই চলে গেলেন স্বধামে।

ভূতির খালের শ্মশানে ঘুরে বেড়াচ্ছে গদাধর। বাবা নেই, কোথায় গেলেন, মনটা কেমন উড়ু-উড়ু, ফাঁকা-ফাঁকা—কোনো কিছুতে মন বসে না। মা'র কাছাকাছিই মন ঘুরঘুর করে—এটা-ওটা আবদার করতে সাধ হয়। কিন্তু অভাবের জন্যে মা যদি সে-আবদার রাখতে না পারেন, তা হলে তো বাবার জন্যে শোক আরো উথলে উঠবে। সুতরাং চুপ করে রইল গদাধর। কোথায় গেলে অভাব থাকবে না সংসারে, শূন্যতার ভার উড়ে যাবে মেঘের মত, অন্তরের অন্ধকারে তারই ঠিকানা খুঁজতে লাগল।

এবারে পৈতে দিতে হয়। সাত পেরিয়ে আটে পড়েছে। দাদারা কোমর বেঁধেছেন।

পৈতে তো হল, কিন্তু ভিক্ষে দেবে কে? গদাধর গোঁ ধরল, ধনী কামারনী ছাড়া আর কারু হাতে ভিক্ষে নেব না।

সে কি কথা? ধনী ছোট জাতের মেয়ে, ব্রাহ্মণ-কন্যা নয়। সে কি ক'রে ভিক্ষে দেবে? কুল-প্রথা লঙ্ঘন হয়ে যাবে যে।

কিসের কুলাচার? কিসের জাত-বেজাত?—প্রাণ চাইছে ধনীকে মা বলব, যে ধনী কোলে করে আমাকে মুক্ত করেছে মা'র জঠর থেকে—সেই মা-নামের কাছে কোনো বিধি-নিষেধ মানব না। তোমরা তোমাদের বামুনাই নিয়ে থাকো, আমি না খেয়ে উপোস করে থাকব। এই দরজায় খিল দিলাম।

কত জনের কত কাকুতি-মিনতি, তবু দরজা খোলে না গদাধর। বালক অথচ বিপ্লবী গদাধর!

শেষকালে রামকুমার বললেন, 'বেশ, ধনী কামারনীই ভিক্ষে দেবে। খোল দরজা। কুলাচার নষ্ট হয় হোক, তবু তোকে উপোসী দেখতে পারব না।'

প্রসন্ন সূর্যের মত দরজা খুলে দিল গদাধর।

ধনী কামারনী ভিক্ষে দিল। কড়ে রাঁড়ি, নিঃসন্তান, কিন্তু মহা ভাগ্যবতী। ত্রিভুবনে যিনি ভিক্ষে দিয়ে বেড়ান তাঁকেই কি না সে ভিক্ষে দিলে!

আনুড়ে বিশালাক্ষী বা বিষলক্ষ্মীর থান। কামারপুকুর থেকে মাইল দুই দূরে আনুড়। মাঝখানে খোলা মাঠ। ধর্মদাস লাহার বিধবা মেয়ে প্রসন্ন পূজায় চলেছে। সঙ্গে গ্রামের আরো অনেক মেয়ে। হঠাৎ কোত্থেকে গদাধর এসে বললে, 'আমিও যাব।' তুই যাবি কি রে! এতটা মাঠভাঙা পথ হাঁটবি কি করে? কিন্তু গদাধরের মুখের দিকে চেয়ে মুখের কথা মুখের মধ্যেই আটকে রইল। মন্দ কি, যাক না সঙ্গে। ফেরবার সময় যদি ক্ষিধে পায়, সঙ্গে দেবীর প্রসাদ

থাকবে, দুধ থাকবে, তাই খাবে আর কি! তা ছাড়া, মিষ্টিগলায় খাসা গান গাইতে পারে ছেলেটা, বললে দু'চারটে গানই বা কোন না গাইবে! নে, চল, গান গাইতে হবে কিন্তু।

'সত্যি, গদাইয়ের গান শুনে অবধি আর কারু গান কানে লাগে না।' বললে প্রসন্ন। 'গদাই কান খারাপ করে দিয়েছে।'

ফাঁকা মাঠের মধ্যে গদাধর খোলা গলায় গান ধরলে। দেবী বিশালাক্ষীর মহিমা-কীর্তনের গান। গান গাইতে-গাইতে হঠাৎ থেমে গেল গদাধর! মেয়ের দল তাকিয়ে দেখল—এ কি ব্যাপার! গদাধরের দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছে, তার শরীর আড়ষ্ট অসাড়, দাঁড়িয়ে আছে নিস্পন্দের মত। কি, কি হল তোর? কে কার প্রশ্নের জবাব দেয়? গদাধরের জ্ঞান নেই। ওমা, এখন কি হবে? মেয়েদের দল ভয়ে বিশীর্ণ হয়ে গেল। রোদে নিশ্চয়ই ভিরমি গিয়েছে ছেলে, খুব করে জলধারানি দে। হাওয়া কর্, হাত বুলিয়ে দে সারা গায়ে।

কিন্তু গদাধরের সাড়া নেই, সঙ্কেত নেই।

'গদাধর—গদাই!' ব্যাকুল কণ্ঠে কত ডাক, কত কাতরতা! কি করে মা'র কোলে ফিরিয়ে দেব এই ছেলেকে!

হঠাৎ প্রসন্নর মনে ডাক দিয়ে উঠল—যে বিশালাক্ষীকে দেখতে চলেছি সে-ই আগবাড়িয়ে আসেনি তো পথ দেখাতে?

'ওলো, দেবীর ভর হয়নি তো?' প্রসন্ন অস্থির হয়ে উঠল: মিছিমিছি তবে গদাইকে ডেকে কি হবে? বিশালাক্ষীকে ডাক। যিনি এসেছেন আগবাড়িয়ে। আধার পেয়ে অধিষ্ঠিত হয়েছেন আনন্দে।'

সবাই দেবী-স্তব শুরু করলে। গদাধরের কর্ণমূলে রাখলে দেবী-নাম।

গদাধরের মুখে হাসি ফুটল। সংজ্ঞার লাবণ্য তরল হয়ে এল সর্বাঙ্গে। কেউ আর তাকে গদাই বলছে না, সবাই মা বলে ডাকছে। নৈবেদ্যের ডালি কি হবে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে? ওলো, গদাইকেই সবাই খেতে দে এখানে। সব তবে মাকেই খেতে দেওয়া হবে।

এই গদাধরের দ্বিতীয় ভাবাবেশ।

কালো মেঘের কোলে সিতপক্ষ বক-বলাকার যে রূপ, বিশালাক্ষীরও সেই রূপ। দুইয়ের একই উদ্ভাস, একই তাৎপর্য। একই দিব্য কাব্যের দু'টি শ্লোক।

কামারপুকুরের পাইনদের অবস্থা বেশ শাঁসালো। শিবরাত্রির সময় তাদের বাড়িতে যাত্রা হবে। পালা-ও শিবদুর্গা নিয়ে। ধুমুল পড়েছে, কিন্তু শিব যে সাজবে সে ছোঁড়ার দেখা নেই। অসুখ করেছে নাকি, আসতে পারবে না। আর যে কেউ

সাজবে তেমন লোক নেই। সুতরাং যাত্রা বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি? এদিকে যাত্রা বন্ধ হলে রাত্রি-জাগরণ কি করে হয়? সবাই ধরে পড়ল অধিকারীকে। অধিকারী বললে, আপনারা একজন শিব যোগাড় করুন, বাকিটা আমি চালিয়ে নিতে পারব।

একবাক্যে সবাই বলে উঠল—গদাধরকে শিব সাজালে কেমন হয়? চমৎকার হয়। বয়েস অল্প হোক, শিবের গান জানে সে অনেক। তাই দিয়ে সে চালিয়ে নিতে পারবে। তারপর শিবের পোশাকে তাকে যা মানাবে, আর দেখতে হবে না। কী যে ঠিক দাঁড়াবে বুঝতে পাচ্ছে না গদাধর। তবু সকলের ধরাধরিতে সে রাজী হয়ে গেল।

আসরে এসে দাঁড়াল সে শিবের মূর্তিতে। একেবারে সেই স্বভাবস্বচ্ছধবল সচ্চিদানন্দ শিব। মাথায় রুক্ষবর্ণ জটাভার, গায়ে বিভূতির আচ্ছাদন। এক হাতে শিঙা, অন্য হাতে ত্রিশূল। কণ্ঠে ও বাহুতে অনন্ত নাগ খেলা করছে ফণা তুলে, শেখরে খেলা করছে সুধা-ময়ূখ শশধর। পদপাতে ধৈর্য, অবস্থিতিতে শান্তি। চোখে সেই অনিমেষ দৃষ্টি যা তৃতীয় নয়নের দীপ্ততা। যেন মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব নেমে এসেছেন নরদেহে। সেই তপযোগগম্য শূলপাণি বিশ্বনাথ। যিনি প্রচণ্ড তাণ্ডব অথচ প্রাণপালক।

অভাবনীয় আনন্দের ঢেউ খেলে গেল চারদিকে। মেয়েরা যারা আসরে ছিল, হঠাৎ উলু দিয়ে উঠল। কেউ কেউ বা শাঁখ বাজালে। হরিধ্বনি করে উঠল পুরুষেরা। স্বয়ং অধিকারী শিবস্তুতি শুরু করলেন।

'মাইরি, কি সুন্দর মানিয়েছে গদাইকে!'

'শিবের পার্ট যে এত ভালো উতরোবে কেউ ভাবিনি।'

'ওকে বাগিয়ে নিয়ে আমাদের একটা দল করতে হবে দেখছি—'

এমনি বলাবলি করছিল পাড়া-বেপাড়ার ছোকরারা। কিন্তু ও কি, গদাধর কিছু বলছে না কেন, নড়ছে না কেন? শুধু চেহারা দেখিয়েই কি পার্ট হয়? বলতে-কইতে চলতে-ফিরতে হয় যে। ও কি? দেখছিস? গদাধর কাঁদছে। শিব আবার কাঁদল কখন?

কেউ কেউ ছুটে গেল গদাধরের কাছে। গদাধরের বাহ্যজ্ঞান নেই। গদাধর তৎস্বরূপ। জল দাও। হাওয়া করো। শিবের ভর হয়েছে, কানে শিবমন্ত্র দাও। 'ছোঁড়াটা রসভঙ্গ করলে মাইরি। এমন পালাটা শুনতে দিলে না।' আপসোস করলে কেউ কেউ।

যাত্রা ভেঙে গেল। কাঁধে করে গদাধরকে কারা বাড়ি পৌঁছে দিলে। গদাধর

তখনো দেহসংজ্ঞাহীন। তখনো শিবময়।

সারা রাত বাড়িতে কান্নাকাটি—গদাধরের জ্ঞান হচ্ছে না। কাকে বলে জ্ঞান, আর কাকেই বা অজ্ঞান! কে বা জাগ্রত, কে বা সুষুপ্ত!

সকালে চোখ মেলল গদাধর। আকাশে চোখ মেলল দিনমণি।

এই আমাদের গদাধর।. দু'টি আয়ত-উজ্জ্বল চোখ—যে চোখে শান্তি আর সরলতা—মাথাভরা এলোমেলো চুল—যে-চুলে আনন্দময় ঔদাসীন্য। মুখে অমিয়-মধুর হাসি, যে হাসিতে অহেতুকী করুণা। কণ্ঠস্বরে অমৃতনির্ঝর প্রসন্নতা, যে প্রসাদে অশেষ আশ্বাস। যে দেখে সে-ই তাকে ভালোবাসে। যে একবার চোখে রাখে সে-ই আর চোখ ফেরায় না। যদি ভালো কিছু আহার্য পায়, ইচ্ছে করে গদাধরকে খাওয়াই। ইচ্ছে করে তার একটু কথা শুনি। যেখানে সে গিয়েছে সেখানে গিয়ে বসি।

এদিকে লেখাপড়ায় এক ফোঁটা মন নেই গদাধরের। কিন্তু রামায়ণ-মহাভারত পড়তে দাও, মন মাতিয়ে পড়বে সে অনর্গল। ধ্রুব-প্রহ্লাদের কথা শুনতে চাও, সবাইকে সে ব্যাকুল করে ছাড়বে। মামুলী পাঠশালায় যেতে তার মন ওঠে না। তার চেয়ে মাঠে-মাঠে তাকে মুক্ত হাওয়ার মত ঘুরে বেড়াতে দাও, সে মহা খুশি। যা কিছু সুন্দর, তারই উপর তার মনের টান। মনে হয় কি করে এই সুন্দরকে নিজের সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ করা যায়! গদাধর তাই কাদা নিয়ে মূর্তি গড়ে, গলা ছেড়ে গান গায়, দু'হাত তুলে নাচে। শিল্পে, সঙ্গীতে আর নৃত্যে সে সে-এক অনির্বচনীয়কে উদ্ঘাটিত করতে চায়। আর যা সে কথা বলে তাই সাহিত্য, সাহিত্যের সারবিন্দু। 'আমাকে রসে-বশে রাখিস মা, আমাকে শুকনো সন্ন্যেসী করিস নে' এই প্রার্থনাই একদিন করেছিল গদাধর। আমাকে 'রস' দিস, কিন্তু সেই সঙ্গে 'বশে' রাখিস। আমাকে উচ্ছ্বাস দে, সঙ্গে সঙ্গে সংযমও দে। ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে রূপকেও বিকশিত কর্। আমি তোর কবি হব। তুই যদি মা আদি দেবী, আমিও তোর আদি কবি। কত আর মূর্তি গড়ব মা, আমি নিজেই এখন নিজেকেই মূর্তি বানাই!

॥ ৬ ॥

প্রায়ই আজকাল ভাবসমাধি হয় গদাধরের। হরিবাসরে, শিবের গাজনে, মনসা-ভাসানে কোথাও একটু দেব-দেবীর নাম-গান হলেই হয়। শুনতে শুনতে গদাধর একেবারে বিহ্বল-তন্ময়। সেই তন্ময়তা একটু গাঢ় হলেই ভাবসমাধি। চন্দ্রমণি আগে-আগে ভয় পেতেন, ছেলেকে বুঝি দানোতে পেয়েছে। এখন

দেখেন নিজের ভাবে যেমন ডুবে যায় তেমনি আবার নিজের ভাবে উঠে আসে। রোগের চিহ্ন নেই শরীরে। দর্পণের আভা যেন তার সারা গায়ে চমক দিচ্ছে। সেই দর্পণে যেন দেখা যাচ্ছে আরেক মূর্তি—আরেক দেহ। চিন্ময় মূর্তি, চিন্ময় দেহ।

কিন্তু দাদারা ধরে নিয়েছেন বায়ুরোগ হয়েছে। তাই তার উপর আর পড়া-শোনার তাড়া নেই, যেমন ইচ্ছে ঘুরে বেড়াও। তবু গদাধরের পাঠশালাতে একবার যাওয়া চাই। সংসার চলে না দেখে রামকুমার কলকাতায় গেলেন, সেখানে গিয়ে টোল খুললেন—গদাধরের তখন বারো-তেরো বছর বয়েস, তখনো সে পাঠশালায় যাচ্ছে। পড়তে নয়, ছোকরাদের সঙ্গে আড্ডা দিতে, দল বাঁধতে। যারা প'ড়ে জ্ঞানী-গুণী হবে তাদেরকে চিনে রাখতে। যতই কেন না আড্ডা দিক, রঘুবীরের পূজা ঠিক সেরে রাখে, মা'র ঘরকন্নার কাজে যোগান দেয়। রামেশ্বরের উপর সংসারের ভার, কিন্তু সেও রঘুবীরের উপর বরাত দিয়ে বসে আছে চুপ করে। মনে-মনে বিশ্বাস, গদাইয়ের যখন অত তুকতাক, তখন একটা কিছু হবেই। যিনি চিন্তামণি তিনিই যখন নিশ্চিন্ত, তখন চিন্তা করে লাভ কি!

বাড়িতে কাজ-ছুট বসে আছে গদাধর—গাঁয়ের মেয়েদের সঙ্গে তার বড় বনিবনা। দুপুরবেলা সবাই জোট বেঁধে চন্দ্রমণির কাছে আসে, আর গদাধরকে হরিনাম গাইতে ফরমাস করে। কিংবা কোনো দিন বায়না ধরে, ধর্মের কোনো উপাখ্যান বলো। এর চেয়ে আর মনোগত বিষয় কী আছে গদাধরের? গদাধর তখুনি তৈরি। 'মাগো, তুমিও বসে যাও—,' 'না রে, বাবা, আমার হাতের কাজ এখনো শেষ হয়নি।' 'সে কি কথা, আমরা আপনার কাজ সেরে দিচ্ছি!' সমাগত মেয়েরা চন্দ্রমণির হাতের কাজ চটপট সেরে দিলে। চন্দ্রমণি বসলেন স্থির হয়ে। গদাধর গান ধরলে, কোনো দিন বা পাঠ। গাঁয়ে যত ভাগবত পাঠ বা গান-কীর্তন হয়, সব শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে গদাধরের। তারপর যা কখনো সে শোনেনি সে সব কথাও তার মুখে এসে জোটে। মেয়েরা তন্ময় হয়ে শোনে। সময়ের হুঁশ থাকে না। বিকেলে যে আরেক কিস্তি কাজ আছে বাড়িতে তা ভুল হয়ে যায়। গদাধরের সঙ্গে-সঙ্গে তারাও নাম করে।

নাম কি কম? যা নাম তাই তো রাম। সত্যভামা যখন তুলায়ন্ত্রে সোনাদানা দিয়ে ঠাকুরকে ওজন করেছিলেন তখন হল না। কিন্তু রুক্মিণী যখন এক দিকে তুলসী আর কৃষ্ণনাম লিখে দিলেন তখন ঠিক ওজন হল। নামের এমনি গুণ। তবু নামের সঙ্গে অনুরাগ চাই। যে প্রিয় তাকে শুধু নাম ধরে ডাকলেই চলে না, তার সঙ্গে চাই একটু প্রেম। যদি নাম করতে করতে দিন-দিন অনুরাগ

বাড়ে, আর অনুরাগের সঙ্গে আনন্দ, তা হলে আর ভয় নেই। বিকার কাটবেই কাটবে। তার পরেই তিনি আকারিত হবেন।

ধর্মদাসের মেয়ে প্রসন্ন গদাধরকে ভাবে গোপাল। আর মেয়েদের মতন এমন হাব-ভাব করে গদাধর, আর-আর মেয়েরা তাকে বলে রাধারাণী।

সীতানাথ পাইনের প্রকাণ্ড সংসার। আট ছেলে সাত মেয়ে। তা ছাড়া জ্ঞাতি-গুষ্টিও অনেক। তার ঘরে রোজ দশটা শিলে বাটনা বাটা হয়। এত লোকের জায়গা কার আঙিনায় হবে? তাই গদাধরকে ডেকে নিত সীতানাথ। বলত, আমার বাড়িতে কীর্তন করবে এসো। সীতানাথের বাড়ির মেয়ে-বউরা ঘোরতর পর্দানশিন, সূর্যের সঙ্গে মুখ-দেখাদেখি হয় না। তারা কি করে তবে এই স্বরতরঙ্গ শোনে! কি করে দেখে সেই অনিন্দ্যসুন্দরকে! তারা চন্দ্রমণির সামনে পর্যন্ত বেরোয় না—অথচ গদাধরকে তাদের সংকোচ নেই। গদাধর যেন তাদের অন্তরের মানুষ। ইহকাল-পরকাল সকল কালের চেনা লোক।

কিন্তু দুর্গাদাস পাইনের এইটুকুতেও আপত্তি। দুর্গাদাস এই বেনে-পাড়ারই লোক, সীতানাথের প্রতিবেশী। এত বড় ছেলে কেন বাড়ির ভিতরে এসে মেয়েদের সঙ্গে বসে গান করবে, এতে তার প্রবল আপত্তি। হোক হরিনাম, হোক গদাধর হীরের টুকরো ছেলে, তবু সমাজ-সংসারে মেয়েদের সম্ভ্রমরক্ষার যে নিয়ম তা মানতে হবে বৈকি। আমার সংসারে মেয়েদের এমন বেচাল নেই—এমন উটকো লোক কেউ ঢুকতে পারে না আমার বাড়িতে। খুব বরফট্টাই করতে লাগল দুর্গাদাস। কই একটা কাকপক্ষী গিয়ে তার বাড়ির ভিতরের খবর জেনে আসুক তো, দেখে আসুক তো তার মেয়েদের মুখ! আটঘাট বাঁধতে জানা চাই, বুঝলে? হরিনামের পথে ধুলোট হতে দিতে নেই।

সন্ধ্যের দিকে বৈঠকখানায় বসে বন্ধুদের সামনে এমনি তম্বি করছেন দুর্গাদাস। এমনি সময়ে ঘরের দরজায় একটি মেয়ে এসে উপস্থিত। বেশভূষা দেখেই চিনতে পারলেন দুর্গাদাস। তাঁতিদের কারু মেয়ে হয়তো। পরনে হাতে-বোনা মোটা ময়লা শাড়ি, হাতে রূপোর ভারি পৈঁছা, কাঁখে চুবড়ি—তাতে কয়েক লাছি সুতো।

'কোত্থেকে আসছ?' দুর্গাদাস প্রশ্ন করলেন।

'হাট থেকে।' লজ্জায় জড়সড় হয়ে মুখে ঘোমটা টানল মেয়ে।

'কি হয়েছে? চাও কি?'

সংক্ষেপে মেয়েটি যা বললে তাতে বিশেষ বিচলিত হবার কিছু নেই। পাশের গাঁয়ে মেয়েটির বাড়ি, সঙ্গিনীদের সঙ্গে হাটে গিয়েছিল সুতো বেচতে। হাটের

পর বাড়ি ফেরার পথে মেয়েটি দেখলে সঙ্গিনীরা তাকে ফেলেই চলে গিয়েছে। এখন এই ভর-সন্ধ্যের সময় একা-একা বাড়ি ফিরতে তার ভয় করছে। যদি আজকের রাতের মত একটু আশ্রয় পায় তো বেঁচে যায়।

'বেশ তো, ভেতরে যাও, মেয়েদের গিয়ে বলো, থেকে যাবে'খন রাতটা। এ আর বেশি কথা কি!' দুর্গাদাস উদারতায় প্রসারিত হলেন।

শরণাগতা প্রণাম করল দুর্গাদাসকে। অন্তঃপুরে গিয়ে বললে সব মেয়েদের। আগন্তুকাকে ঘিরে ধরল সবাই। অল্প বয়স, মিষ্টি কথা, আতান্তরে পড়েছে, সবাই সহানুভূতিতে নরম হল। বললে, থাকবে বৈকি, একশোবার থাকবে, তার আগে হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খাও। কি যেন একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে মেয়েটির। যে তাকে দেখে তারই মনে মমতা লেগে থাকে। থাকবার জায়গা ঠিক হল এক ধারে, মুড়ি-মুড়কি দিয়ে দিব্যি জলযোগ করলে। তন্ন-তন্ন করে দেখে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়াতে লাগল মেয়েটি, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করলে, ভাব করলে, জেনে নিলে সুখ-দুঃখের ইতিহাস। যেন কি জাদু জানে, এক মুহূর্তে অন্তরের অঙ্গ হয়ে উঠল।

অন্ধকারে রামেশ্বর চলেছে হনহন করে।

এ কি, কোথায় চলেছেন এত রাতে?

সীতানাথের বাড়িতে।

সেখানে কি?

গদাইকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এত রাত হল, এখনো তার ফেরবার নাম নেই। মা ঘর-বার করছেন। কোথাও মুচ্ছো গেল কি না কে জানে!

ঐ সীতানাথের বাড়িতেই আছে ঠিক। সারা দিন-রাত ঐখানেই পাঠ-কীর্তন করে। ঐখানে গিয়েই হাঁক দিন।

না, সীতানাথের বাড়িতে যায়নি আজ গদাধর। রামেশ্বর চোখে অন্ধকার দেখল। রাত করে কোথায় এখন তাকে খুঁজবে ভেবে পেল না। পাইন-পাড়ার ঘরে-ঘরে অসহায়ের মত সে হাঁক দিয়ে ফিরতে লাগল—গদাই, গদাই,—গদাই আছিস্?

তাঁতি মেয়ে পা ছড়িয়ে বসে মেয়েদের সঙ্গে খোস-গল্প করছে, এমন সময় শুনতে পেল, কে উঁচু গলায় হাঁক পাড়ছে বাইরে থেকে। কার নাম ধরে ডাকছে? কান খাড়া করল তাঁতিনী। লাফিয়ে উঠল।

'যাচ্ছি গো দাদা—এই যে আমি এইখানে।' বলে সেই তাঁতিনী এক ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল।

বাড়ির মেয়েরা সব বললে গিয়ে দুর্গাদাসকে। দুর্গাদাস চুপ করে রইলেন। খানিক পরে বললেন, 'প্রভু আমার অহঙ্কার চূর্ণ করেছেন।'

তাই ঠাকুর বলেছেন উত্তরকালে: 'আপনাতে মেয়ের ভাব আরোপ করলে কামাদি-রিপু নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক মেয়েদের মতন ব্যবহার হয়ে দাঁড়ায়। তাই আমি অনেক দিন মেয়েদের মত কাপড়-গয়না পরে ওড়না গায়ে দিয়ে সখী-ভাবে ছিলুম। আবার ঐ ভাবেই আরতি করতুম। তা না হলে পরিবারকে আট মাস কাছে এনে রাখতে পারতুম? দু'জনেই মা'র সখী। আমি আপনাকে শুধু পুরুষ বলতে পারি কই! একদিন আমার ভাবাবস্থায় পরিবার জিগগেস করলে: আমি তোমার কে? আমি বললুম: আনন্দময়ী।'

॥ ৭ ॥

গ্রামে কিছুই হচ্ছে না গদাধরের। তাই তাকে কলকাতায় নিয়ে এলেন রামকুমার। কিন্তু গদাধরের মন গ্রামের মাঠে-ঘাটে ঘুরঘুর করে। কত চেনা মুখ, কত মন-কাড়া ভালোবাসা। এই ইট-কাঠের জটিলতার মধ্যে পাওয়া যাবে কি সেই সরল মমতা? সেই নিঃসঙ্গ থাকার শান্তি?

নির্জনে না হলে ভক্তিলাভ হবে কি করে? তাকে ভাববো কোথায়? চাল কাঁড়ছো, একলা বসে কাঁড়তে হয়। একেকবার চাল হাতে করে তুলে দেখতে হয়, সাফ হল কেমন। তা কাঁড়বার সময় যদি পাঁচবার ডাকে, ভালো কাঁড়া কেমন করে হবে?

কত জনাকেই মনে পড়ে! মনে পড়ে বৃন্দার মাকে। বৃন্দার মা জেতে বামুন, গদাইকে নিজ হাতে হামেসা রান্না করে খাওয়ায় কিন্তু খেতির মা জেতে ছুতোর, ইচ্ছে থাকলেও ঘরে ডেকে এনে খাওয়াতে পারে না। মনটা কেবল আঁটুবাঁটু করে। মনের কথা মুখে ফোটে না। ধনী কামারনীর বোন শঙ্করী কাছে-পিঠেই থাকে। তাকে একদিন জিগগেস করলে গদাধর: 'আচ্ছা বলতে পারো, খেতির মা আমাকে কি বলতে চাইছে, অথচ যেন বলতে পাচ্ছে না?' শঙ্করী তো থ! মনের কথাও জানতে পেরেছ তা হলে? বেশ তবে বলো, কি খাবে, আমি নিয়ে আসছি।

খাবো তো, এখানে এই পথের মাঝখানে খাব নাকি? তার ঘরে যাব, ঘরে গিয়ে মেঝের উপর আসন পেড়ে বসে খাব। যা সে নিজের হাতে রেঁধে দেবে—সমস্ত। তার মনের সাধ পূর্ণ করব ষোলো আনা।

তাই গেল ঠিক ছুতোর-বাড়ি। খেতির মা'র হাতের রান্না খেল সে তৃপ্তি

করে।

খেতির বাপ কিন্তু স্ত্রীর অনাচার সহ্য করতে পারল না। অনাচার বৈকি। ছোট জাতের মেয়ে, উচ্চবর্ণের জাত মেরে দিলি? দেবতা খেতে চাইবে বলে তুই তার অন্ন জোগাবি? রাগে দিশেহারা হয়ে গেল খেতির বাপ। পায়ের খড়ম তুলে শক্ত কয়েক ঘা বসিয়ে দিল স্ত্রীর পিঠের উপর।

খেতির মা টলল না একচুল। বললে, 'যতই কেন না মারো আর ধরো, আমার আর কিছুতেই দুঃখ নেই। ঠাকুরের প্রসাদ খেয়েছি আমি।'

আর মনে পড়ে চিনু শাঁখারিকে।

বয়েস হয়েছে, ছোট দোকান, কষ্টে দিন গুজরায়। কিন্তু গদাধর যখনই দোকানে এসে বসে, মনে হয় কোথাও যেন আর কষ্ট নেই। রাত যতই অন্ধকার হোক, গদাধর যেন চিরন্তন সুপ্রভাত। যাই একটু বাড়তি রোজগার হয় তাই দিয়ে মিষ্টি কিনে গদাধরকে খাওয়ায়। গদাধর খায় আর চিনু দেখে। ওদিকে খদ্দের এসেছে দোকানে, সেদিকে খেয়াল নেই। গদাধরকে যেন চিনতে পেরেছে চিনু। তার নাম যখন চিনু তখন সেই তো প্রথমে চিনতে পারবে।

একদিন হল কি, চিনু ফুল তুলে পরিপাটি করে মালা গাঁথলে। কোঁচড়ে করে লুকিয়ে মিষ্টি কিনে আনলে বাজার থেকে। গদাধরকে বললে, 'চলো।'

'কোথায়?'

'মাঠে। যেখানে কেউ কোথাও নেই। যেখানে কেবল তুমি আর আমি।'

চিনিবাস গদাধরকে নিয়ে মাঠের মধ্যে এসে দাঁড়াল। দৃষ্টির গোচরে নেই কোথাও জনমানুষ। উপরে আকাশ-ভরা শান্তির নীলিমা। মাল-মিষ্টি পাশে রেখে হাঁটু গেড়ে হাত জোড় করে বসে রইল চিনিবাস। সামনে গদাধর। কৃষ্ণ-কিশোর।

'এ কি চিনিবাসদা, এ কি করছ? তার চেয়ে মিষ্টির ঠোঙাটা হাতে দাও।'

'দিচ্ছি গো দিচ্ছি—'

আগে মালা দিলে গলায়। কৃষ্ণের গলায় অতসী ফুলের মালা। পরে হাতে করে খাওয়াতে লাগল গদাধরকে। ব্রজের ননীগোপালকে।

জলে চোখ ভেসে যাচ্ছে চিনিবাসের। মিষ্টিভরা হাত কখনো পড়ছে গিয়ে গদাধরের নাকে, কখনো চোখে, কখনো কপালে। গদাধর হাসছে আর খাচ্ছে।

খাওয়ানোর পর আবার স্তব করতে বসল চিনিবাস। বললে, 'বুড়ো হয়েছি, বাঁচব না বেশি দিন। মর্ত্যধামে তোমার কত লীলা-খেলা হবে, কিছুই দেখতে পাব না। তবু আজ যে তোমাকে একটু চিনতে দিলে দয়া করে, তাই আমার

পায়ের কড়ি হয়ে রইল।'

মত্ত অসুরের মত স্বাস্থ্য ছিল চিনিবাসের। দু'হাতে তুলে গদাধরকে কাঁধে চড়িয়ে বীরবিক্রমে নৃত্য করত। বলত, 'তুমি আমাকে দাদা বলো—চিনিবাস দাদা। আমি যদি তোমার দাদা হই, তবে আমি তো বলরাম।' বলে আবার নৃত্য।

তুমি সমুদ্র আর আমি সামান্য শঙ্খকার।

একবার মনে পড়ে, চিনু শাঁখারির পায়ে পড়েছিল গদাধর। শুধু চিনুর নয় আর আর সমবয়সীদেরও। কি খেয়াল হল, সবার পায়ে ধরে ধরে গদাধর মিনতি করতে লাগল, 'ওরে তোদের পায়ে পড়ি, একবার হরিবোল বল—'

সকলে তো অবাক। যত ছোটজাতের লোক, নুয়ে পড়ে সকলের পায়ে ধরা! আসল কথা বুঝেছিল চিনিবাস। বলেছিল, 'তোমার এখন প্রথম অনুরাগ, তাই সব সমান দেখছ। জাত-বেজাত স্তর-পঙ্‌ক্তি দেখছ না। প্রথম যখন ঝড় ওঠে তখন আম-গাছ, তেঁতুল-গাছ সব এক বোধ হয়। এটা আম, এটা তেঁতুল —চেনা যায় না।'

নবানুরাগের বর্ষা। নবানুরাগে মান-অপমান থাকে না। ছায়া-কায়া থাকে না। সব তুমি-ময়।

মরে যাবে চিনিবাস—এই তার দুঃখ। বয়সে সে জীর্ণ হয়ে এসেছে। মরে গেলে দেখতে পাবে না এই নিত্যলীলা।

রাবণ-বধের পর রাম-লক্ষ্মণ যখন লঙ্কার প্রাসাদে গিয়ে ঢুকলেন, দেখলেন রাবণের বুড়ী মা নিকষা পালিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্মণ বিদ্রূপ করে উঠল—যার ছেলে-নাতি-পুতি সব গেল, বংশে যার বাতি দেবার কেউ নেই, তার কিনা নিজের প্রাণের উপর এত টান! নিকষাকে রাম কাছে ডাকিয়ে আনলেন, জিগগেস করলেন, তুমি পালিয়ে যাচ্ছ কেন? তোমার কিসের ভয়? নিকষা বললে, আমার আর কিছু ভয় নেই, ভয় যদি মরে গিয়ে তোমার এত লীলা না আর দেখতে পাই। বেঁচে ছিলাম বলেই তো দেখলাম তোমাকে। তাই এখনো বাঁচবার সাধ যেতে চায় না।

কিন্তু কলকাতায় এসে গদাধরের কি চুপচাপ করে বসে থাকলে চলবে? কত সাধ করে তাকে নিয়ে এসেছেন রামকুমার। অক্ষয়কে জন্ম দিয়েই রামকুমারের স্ত্রী মারা গেল আঁতুড়ে—সেই থেকেই সংসারে অনটন। ছেলে গর্ভে আসতেই কেমন হয়ে গিয়েছিল বৌদি, কাঁধে অলক্ষ্মী চেপেছিল। সংসারে নিয়ম ছিল, যে-ছেলের এখনো পৈতে হয়নি সেই ছেলে কিংবা রুগী ছাড়া আর কেউ রঘু-

বীরের পুজোর আগে জলস্পর্শ করতে পারবে না। রামকুমারের স্ত্রী সেই নিয়ম অমান্য করতে লাগল। বাধার উত্তরে করতে লাগল অবাধ্যতা। রামকুমার বুঝলেন, স্ত্রীর মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে, আর সেই সঙ্গে বা অমঙ্গলের দিন।

হলও তাই। স্ত্রী চলে গেল। সংসারে এল কঠিন দুর্ভাগ্য।

গদাধরের পরে আরেকটি বোন ছিল, সর্বমঙ্গলা। গৌরহাটির রামসদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিলে, যখন আট পেরিয়ে ন'য়ে পড়েছে। আর রামসদয়ের বোনের সঙ্গে বিয়ে দিলে রামেশ্বরের। রামেশ্বর গৃহস্থালী দেখুক, তুই গদাধর কলকাতা চল। ওখানে টোল খুলেছি, একটা কিছু হিল্লে তোর হবেই। অন্তত শান্তি-স্বস্ত্যয়নটা তো শিখবি। কলকাতায় অনেক বড়লোকের বাসা, যদি মানুষ হতে পারিস, টাকার জন্যে ভাবতে হবে না। সংসার স্বচ্ছন্দ হবে।

টাকা? টাকা দিয়ে আমার কী হবে? আমি তো অবিদ্যার সংসার করতে আসিনি। আমি কি ঐশ্বর্যভোগ চাই, না দেহের সুখ চাই? না চাই 'লোকমান্য'?

আর তুমিই বা অত ভাবছ কেন? যে ঠিক ভক্ত, সে চেষ্টা না করলেও ঈশ্বর তার সব জুটিয়ে দেবেন। যে ঠিক রাজার বেটা সে মাসোয়ারা পায়। যে সদ্‌ব্রাহ্মণ, যার কোনো কামনা নেই, হাড়ীর বাড়ি থেকে হলেও তার সিধে আসে। যেমনি আসে তেমনি যায়। এই যদৃচ্ছা লাভই ভালো। সাঁকোর তলা দিয়েই জল বেরিয়ে যায় সহজে। সঞ্চয় করে কি হবে? কত কষ্ট করে মৌমাছি চাক তৈরি করে, কে আরেকজন এসে ভেঙে দিয়ে যায়। উপার্জন করাই কি জীবনের উদ্দেশ্য? নরজন্ম পেয়েছি, ঈশ্বরদর্শন করব না?

লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারি প্রায়ই আসত দক্ষিণেশ্বরে।

ঠাকুরের বিছানা ময়লা দেখে তার বড় ক্ষোভ। বললে, 'আমি তোমাকে দশ হাজার টাকা লিখে দিচ্ছি—তা দিয়ে তোমার সেবা হবে।'

যেই এ কথা শোনা, ঠাকুর অমনি বাহ্যজ্ঞানহীন হয়ে পড়লেন। কে যেন মাথায় লাঠি মারলে!

বাহ্যজ্ঞান পাবার পর বললেন বিমর্ষ কণ্ঠে: 'অমন কথা মুখে এনো না। অমন কথা যদি আর বলো, তোমার এখানে এসে তবে কাজ নেই!'

'কেন কি হল?'

'তুমি জানো না, আমার টাকা ছোঁবার জো নেই—কাছেও রাখবার জো নেই!'

লক্ষ্মীনারায়ণও ছাড়বার পাত্র নয়। সে বেদান্তবাদী। তর্কপটু।

'তা হলে এখনো আপনার ত্যাজ্য-গ্রাহ্য আছে?' লক্ষ্মীনারায়ণ হাসল: 'তবে তো জ্ঞান হয়নি আপনার।'

'না বাপু, অত দূর হয়নি এখনো।'

যারা-যারা কাছে বসেছিল হেসে উঠল।

তবু লক্ষ্মীনারায়ণ দমবে না। সে ধরল হৃদয়কে। হৃদয় মানে হৃদয়রামকে, ঠাকুর যাকে ডাকতেন হৃদে বলে। ক্ষুদিরামের বোন রামশীলার মেয়ে হেমাঙ্গিনী। তারই ছেলে হৃদয়।

হৃদয়কে দিয়ে লক্ষ্মীনারায়ণ গছাতে চাইল টাকা। বললে, 'আমি হৃদয়কে দিচ্ছি।'

'তা হলে আমাকেই বলতে হবে, একে দে, ওকে দে। না দিলে রাগ হবে মনে মনে, অভিমান হবে। টাকা কাছে থাকাই খারাপ। আরশির কাছে জিনিস রাখতে নেই। জিনিস থাকলেই প্রতিবিম্ব হবে। বুঝলে, ওসব হবে না এখানে —যে ঠিক রাজার বেটা সে মাসোয়ারা পায়।'

গদাধর কি রাজার বেটা নয়?

বাবাকে মনে পড়ে গদাধরের। স্নান করবার সময় জলে দাঁড়িয়ে "রক্তবর্ণং চতুর্মুখং" বলে ধ্যান করতেন, আর তাঁর চোখ জলে ভেসে যেত। খড়ম পায়ে দিয়ে যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন, গাঁয়ের দোকানীরা দাঁড়িয়ে পড়ত। বলত, ঐ তিনি আসছেন। যখন উনি স্নান করতেন তখন আর কেউ সাহস করে নাইতে যেত না। খোঁজ নিত—তিনি কি স্নান করে গেছেন? রঘুবীর-রঘুবীর বলতেন আর তাঁর বুক লাল হয়ে যেত।

সেই বাপের ছেলে গদাধর।

শুধু এইটুকুই তার পরিচয়? কে বলে! সে জগৎপিতার ছেলে।

সে পড়াশোনা জানে না। শাস্ত্র-সংহিতা সে কিছু ছোঁয়নি। সে হয়তো পুরো 'বাবা' বলে ডাকতে পারে না, উচ্চারণ জানে না সবটার, সে হয়তো আধো-আধো ভাষায় শুধু 'পা' বলে। বাপের টান কি শুধু 'বাবা' বলা ছেলের ওপর বেশি হবে, 'পা' বলা ছেলের চেয়ে? না বাবা বলবেন, এ আমার কচি ছেলে, বাবা ঠিক বলতে না পারলেও ডাকছে ঠিক আকুল হয়ে, অতএব একেই আগে কোলে নিই হাত বাড়িয়ে!

কিন্তু সেই যে বাবা স্বপ্ন দেখলেন গয়াধামে গিয়ে, রঘুবীর বলছেন তোমার ঘরে আমি ছেলে হয়ে জন্মাব, তার কি হবে? তবে, আসলে, তার কি কেউ পিতা নেই? সে তবে কে?

এই আত্মদর্শনই তো ঈশ্বরদর্শন।

BanglaBook.org

।৮।

রানী রাসমণি কাশী যাবেন। কৈবর্তের মেয়ে, কিন্তু আসলে অষ্ট সখীর এক সখী।

কলকাতার জানবাজারের জমিদার রাজচন্দ্র দাসের স্ত্রী। কিন্তু মন রয়েছে কালিকার পাদপদ্মে। চার কন্যার মা। আর, তৃতীয় কন্যা করুণাময়ীর স্বামী মথুরামোহন বিশ্বাস। আমাদের সেজবাবু।

বিয়ের অল্পকাল পরেই মারা যায় করুণাময়ী। রাসমণি চতুর্থ কন্যা জগদম্বার সঙ্গে মথুরামোহনের বিয়ে দেন। কিন্তু নাম তার সেই সেজবাবুই থেকে গেল। স্বামী রাজচন্দ্র তখন গত হয়েছেন। বাড়ির পাশেই গোরা সৈন্যদের ব্যারাক। একদিন মাতাল হয়ে একদল সৈন্য ঢুকে পড়ে বাড়ির মধ্যে। আত্মীয়-পুরুষেরা কেউ বাড়িতে নেই, রুখতে গিয়ে ঘায়েল হয়েছে দারোয়ানেরা। সৈন্যরা বাড়ি লুঠ করতে শুরু করেছে। এখন কি করেন রাসমণি? রাসমণি অস্ত্র ধরলেন। ছিলেন লক্ষ্মী, হয়ে দাঁড়ালেন রুদ্রচণ্ডী চামুণ্ডা।

রাজেন্দ্রাণী রাসমণি। রাজেন্দ্রাণী হয়েও অন্তরে ভিখারিণী। তেজস্বিনী হয়েও মমতার গঙ্গা-মৃত্তিকা। সংসারে কিছুই চান না, শুধু সেই মহাযোগেশ্বরী মহাডামরী সাট্টহাসা মহাকালীর রাঙা পা দু'খানি কামনা করেন। সেরেস্তায় যে শিলমোহর চলতি, তাতে তাঁর নাম লেখা—"কালীপদ-অভিলাষী শ্রীমতী রাসমণি দাসী।" ঐশ্বর্যের শয়নে শুয়েছেন, কিন্তু উপাধান হয়েছে বিশ্বেশ্বরীর উৎসঙ্গ। বারোশো পঞ্চান্ন সাল। রানী কাশী যাবেন মনস্থ করেছেন। দর্শন করবেন অন্নপূর্ণাকে, মহাভিক্ষুক বিশ্বনাথকে। অঢেল টাকা এজন্যে আলাদা করা আছে। অজস্র হাতেই তা ব্যয় করবেন। ঘাটে বাঁধা হয়েছে নৌকো, সারি-সারি প্রায় একশোখানি। থরে-থরে সম্ভার সাজানো হয়েছে। কত দাস-দাসী আত্মীয়-পরিজন। সবাই বিশ্রাম করছে নৌকোতে। শুধু একজন জেগে আছে। সে স্বয়ং কুবের। রানীর কোষাগারের দ্বারপাল।

রাত। নৌকোর বহর ছেড়ে দিয়েছে। রানী ঘুমিয়ে পড়েছেন। উত্তরে দক্ষিণেশ্বর গ্রাম পর্যন্ত এসেছেন, স্বপ্ন দেখলেন রাসমণি। দেখলেন দেবী ভবতারিণী নিজে এসে দাঁড়িয়েছেন। বলছেন, 'কাশী যাবার দরকার নেই। এই ভাগীরথীর পারেই আমাকে প্রতিষ্ঠা কর। আমাকে অন্নভোগ দে।'

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন রাসমণি। ওরে, নৌকো ফিরিয়ে নিয়ে চল্। আর কাশী যেতে হবে না। স্বয়ং কাশীশ্বরী এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে।

প্রথমে ভেবেছিলেন গঙ্গার পশ্চিম কূলে বালি-উত্তরপাড়ায় জমি নেবেন। কথায় আছে, গঙ্গার পশ্চিম কূল বারাণসী সমতুল। কিন্তু ও-অঞ্চলের জমিদারের বুদ্ধিসুদ্ধি আজগুবী। টাকার লোভে জমি দিতে তাঁদের আপত্তি নেই, কিন্তু সেই জমিতে পরের টাকায় যে ঘাট তৈরি হবে সে ঘাট দিয়ে তাঁরা গঙ্গায় নাইতে যাবেন না। না যাবেন তো না যাবেন—এমন কথা বলতে পারলেন না রাসমণি। তিনি পূর্ব কূলে উপস্থিত হলেন।

পূর্ব কূলে দক্ষিণেশ্বর। এক লপ্তে ষাট বিঘে জমি কিনলেন রাসমণি। জমির কতক অংশের মালিক ছিল হেস্টি নামে এক সাহেব, আর বাকি অংশে মুসলমানদের কবরখানা আর গাজী পীরের থান। জমির গড়ন খানিকটা কচ্ছপের পিঠের মত। তন্ত্রমতে অমন জমিই শক্তিসাধনার অনুকূল। তাই, সন্দেহ কি, ঐ পূর্ব কূল দেবীই নির্বাচিত করেছেন পূর্ব থেকে।

নয় লাখ টাকায় মন্দির আর মূর্তি তৈরি হল। নবরত্নবিশিষ্ট কালীমন্দির, উত্তরে রাধাগোবিন্দের মন্দির, পশ্চিমে দ্বাদশ শিবমন্দির আর দক্ষিণে নাটমণ্ডপ। মধ্যস্থলে প্রশস্ত চত্বর। উত্তরে-দক্ষিণে-পূবে আরো তিন সার দালান—সব মিলে অতিকায় দেবায়তন। সম্পূর্ণ হতে লেগেছিল প্রায় দশ বছর।

এই দশ বছর—উদ্যোগ থেকে উদ্‌যাপন পর্যন্ত—রাসমণি ব্রতধারিণী হয়ে ছিলেন, ছিলেন কঠোর নিয়মে-সংযমে। ত্রিসন্ধ্যা স্নান করেছেন, হবিষ্যান্ন খেয়েছেন, শুয়েছেন শুকনো মেঝের উপর। আর জপ করেছেন অবিশ্রান্ত। কিসের জন্যে এত অনুষ্ঠান? এই দেহ-মনকে যদি তাঁর উপযুক্ত বাহন করতে না পারি, তবে দেবী শুনবেন কেন আবাহন? হয় আসবেন না, নয় তো এসে ফিরে যাবেন।

তৈরি হল মন্দির। তৈরি হল দেবীমূর্তি। পণ্ডিতেরা পাঁজি দেখতে লাগলেন মন্দিরপ্রতিষ্ঠার শুভদিন কবে ঠিক করা যায়।

মূর্তি ছিল বাক্সের মধ্যে বন্দী হয়ে। দেখা গেল, মূর্তি ঘামছে।

রাত্রিযোগে স্বপ্ন দেখলেন রাসমণি। ক্লান্ত-কাতর কণ্ঠে ভবতারিণী বলছেন, 'আমাকে আর কত দিন কষ্ট দিবি এমনি বন্ধ করে রেখে। শিগ্‌গির আমাকে মুক্তি দে—'

রানি অধীর হয়ে উঠলেন। আর দেরি করা যায় না। আসন্ন যে কোনো শুভদিনেই প্রতিষ্ঠিত করতে হয় দেবীকে।

স্নানযাত্রার দিনই নিকটতম শুভদিন। কিন্তু এ দেবী শক্তিস্বরূপিণী—একে বিষ্ণু-পর্বাহে প্রতিষ্ঠিত করা যায় কি করে? হোক বিষ্ণু পর্বাহ, তবু আর অপেক্ষা করা যায় না—মা আকুল হয়ে উঠেছেন। যা শক্তি তাই মাধুরী—তাই "পরমা সি

মায়া"। যিনি কালী, তিনিই লক্ষ্মী, তিনিই লজ্জা। যিনি মুণ্ডমালিনী, তিনিই পদ্মালয়া। সর্বার্থসাধিকা।

বারোশো বাষট্টি সালের বারোই জ্যৈষ্ঠ স্নানযাত্রার দিনে মন্দির প্রতিষ্ঠা হল। দেবী ভবতারিণী। পাষাণময়ী অথচ করুণাদ্রবা। মৃত্যুবর্জিতা শিবসুন্দরী। ত্রিনয়নী, তেজোরূপোজ্জ্বলা। পুরাতনী, পরমার্থা। কাললোকবাসিনী কালী কপালিনী।

রূপার সহস্রদল পদ্ম, তার উপর দক্ষিণ শিয়রে শবীভূত শিব শুয়ে আছেন। তাঁরই হৃদয়ের উপর পা রেখে দাঁড়িয়েছেন ভবতারিণী। পরনে লাল বেনারসী, মাথায় মুকুট, গলায় সোনার মুণ্ডমালা। নানা অলঙ্কারে ঝলমল করছেন সর্বাঙ্গে। কটিতটে সারে-সারে খণ্ডিত নরকর। দেবী চতুর্ভুজা—দুই বাম করে নৃমুণ্ড আর অসি, আর দক্ষিণ দুই হাতে বর ও অভয়মুদ্রা।

দেবী দক্ষিণাস্যা।

এততেও যেন সম্পূর্ণ হল না। সোয়া দু'লাখ টাকায় দিনাজপুর জেলার শালবাড়ি পরগণা কিনলেন। মা'র সেবায় দান করলেন শালবাড়ি। তবুও হল না পুরো-পুরি। মা অন্নভোগ চেয়েছেন, তার ব্যবস্থা কি?

পণ্ডিতেরা বললেন, তার বিধি নেই।

মাকে চাট্টি খেতে দেব ভক্তি করে, তার বিধি নেই?

না, নেই। তুমি রানি হলে কি হবে, তুমি শূদ্রাণী। শূদ্রাণীর অধিকার নেই দেবতাকে ভোগ দেবার।

ব্যথায় চমকে উঠলেন রাসমণি। এ কিছুতেই হতে পারে না। বিধিতে আর ভক্তিতে এত প্রভেদ কি করে সম্ভব? নিচু ঘরে জন্মেছি বলে কি আমি মা'র সন্তান নই? মা কি নিচু অন্ন খান না?

না। প্রচলিত প্রথার ব্যতিক্রম করবেন রাসমণি। এ বিধি নয়, বিধি-বিড়ম্বনা। এ কিছুতেই মানতে পারব না। অভুক্ত থাকতে দেব না মাকে। তাঁর নিত্য ভোগের ব্যবস্থা করব।

সাবধান! অমন যদি কিছু করো, ব্রাহ্মণেরা মন্দিরে এসে প্রসাদ নেবে না। তোমার দেবালয় অধর্মাশ্রিত হবে।

তবে উপায়? রানি দিকে-দিকে লোক পাঠালেন। টোলে বা চতুষ্পাঠীতে, কোথাও কেউ কোনো ব্যবস্থা দিতে পারে কিনা। সবাই একবাক্যে বললে, কৈবর্তের মেয়ে দেবীকে অন্নভোগ দেবার অধিকারী নয়।

রানি আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

এতে কাঁদবার কি আছে? এত বড় একটা কীর্তি স্থাপন করলে, দেশে-দেশে তোমার নাম ছড়িয়ে পড়ল—এ কি কম কথা? কী হবে অন্নভোগ? অন্নপূর্ণার কি অন্নের অভাব আছে সংসারে?

তবু মেয়ের সংসারে মা এলে কি মেয়ে তাঁকে উপবাসী রাখে? আমি নামকাম চাই না। আমি চাই ভক্তি। আমি চাই সন্তোষ। মাকে অন্নভোগ দিতে না পেলে আমার সন্তোষ নেই।

আবার কাঁদতে বসলেন রাসমণি।

হঠাৎ রামকুমারের টোল থেকে নতুন বিধান এসে পৌঁছুল। প্রতিষ্ঠার আগে রানি যদি দক্ষিণেশ্বরের যাবতীয় সম্পত্তি কোনো ব্রাহ্মণকে দান করেন তবে অন্নভোগ চলতে পারে। সেক্ষেত্রে মন্দিরে ব্রাহ্মণদের প্রসাদ নিতে কোনো বাধা নেই।

অন্ধকারে রাসমণি দেখতে পেলেন মা'র আনন্দ চক্ষু। অভয় চক্ষু।

কিন্তু এ ব্যবস্থা পণ্ডিতদের মনঃপূত হল না। তবু, উপায় কি। স্বয়ং রামকুমার ভট্টাচার্য এ-পাঁতি দিয়েছেন, এ কে খণ্ডায়? সাধ্য নেই কেউ এ নিয়ে বিতণ্ডা করে।

রাসমণি ঠিক করলেন তাঁর গুরুর নামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন। কিন্তু পূজক-পুরোহিত কে হবে? গুরুবংশের কেউ পূজা-অর্চনা করে এ রানির অভিপ্রেত নয়। তারা সবাই অশাস্ত্রজ্ঞ, আচারসর্বস্ব। তাদেরকে ডাকতে তাই তাঁর মন উঠল না। তবে কাকে ডাকেন? যাকেই ডাকেন সে-ই মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। বলে পাঠায়, পুজো করা দূরস্থান, যে দেবতাকে শূদ্রাণী প্রতিষ্ঠিত করবে তার পায়ের গোড়ায় মাথা পর্যন্ত নোয়াব না। পারব না ব্রাত্য হতে।

এখন তবে কি করা যায়? এই মহা দুস্তরে পথ কোথায়?

শেষ পর্যন্ত রানি রামকুমারকেই লিখলেন উদ্ধার করতে। রামকুমার বললেন, 'পূজকের অভাবে মন্দির যখন প্রতিষ্ঠা হয় না, তখন, বেশ, আমিই পূজক হব।' মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন গদাধর এসেছে কালীবাড়িতে। বিরাট উৎসব। যাত্রা, কালীকীর্তন, ভাগবত, রামায়ণ পাঠ—কত কি হচ্ছে চারপাশে। কত দিক থেকে কত লোক এসেছে, সংখ্যায় লেখা-জোখা হয় না। সদাব্রত অন্নসত্র বসে গেছে। আহূত-অনাহূতের ভেদ নেই—শুধু দাও আর খাও, নাও আর ধরো। চলেছে চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়র ঢালাঢালি।

গদাধরের মনে হল ভগবতী যেন কৈলাস শূন্য করে চলে এসেছেন মন্দিরে। কিংবা গোটা রজতগিরিই যেন রানি রাসমণি তুলে এনে দক্ষিণেশ্বরে বসিয়ে

দিয়েছেন।

এত আয়োজন এত অজস্রতা, তবু গদাধর মন্দিরের অন্নভোগের অংশ নিল না। বাজার থেকে এক পয়সার মুড়ি-মুড়কি কিনে খেল, আর তাই খেয়ে কাটাল সমস্ত দিন। বেলা পড়লে হেঁটে চলে গেল ঝামাপুকুরে।

'কিছু খেলি নে কেন রে গদাই?' জিগগেস করেছিলেন রামকুমার।

'কৈবর্তের অন্ন খেতে পারি না দাদা।'

গদাধর এখন বড় হয়েছে, পণ্ডিত হয়েছে। ভাবলেন রামকুমার। নইলে ছেলে-বেলায় ধনী কামারনীর হাতে কি করে সে ভিক্ষে নিয়েছিল?

পরদিন সকালে উঠেও গদাধর দেখলে দাদা ফেরেননি। তার মানে কি? দাদা কি কায়েমী হয়ে থেকে যাবেন নাকি মন্দিরে? এ কি অভাবনীয়?

একের পর এক সাত-সাত দিন কেটে গেল, তবু দাদার দেখা নেই। আর অপেক্ষা করা যায় না, গদাধর চলল দক্ষিণেশ্বর।

'এ কি, বাড়ি যাবেন না?'

'না রে—ভাবছি জীবনের ক'টা দিন এখানেই কাটিয়ে দেব।'

গদাধর অবাক হয়ে রইল। বললে, 'তবে কি—'

'হ্যাঁ, মন্দিরের পূজার ভার নিয়েছি। টোল এবার তুলে দেব। তুইও চলে আয় আমার সঙ্গে।'

প্রবল আপত্তি তুলল গদাধর। তা কি করে হতে পারে? বাবা কোনো দিন শূদ্রযাজী হননি, তাঁর ছেলে হয়ে কোন্ যুক্তিতে তাঁর প্রথার প্রতিকূলতা করবেন? ও সব ছাড়ুন।

রামকুমার অনেক বোঝালেন। অনেক তর্ক ফাঁদলেন। গদাধর নির্বিচল। নিষ্ঠায় নিয়তস্থিত।

তা হলে ধর্মপত্র করা যাক। বললেন রামকুমার। যা ধর্মপত্র তাই দৈবাদেশ। একটা ঘটিতে কতগুলি কাগজের টুকরো। তাতে কোনোটায় 'হাঁ' বা কোনোটায় 'না' লেখা। অনপেক্ষ কোনো শিশুকে ডেকে আনো, সে যে কোনো একটা টুকরো তুলুক হাতে করে। সেই টুকরোতে যদি 'হাঁ' থাকে, তবে করো; আর যদি 'না' থাকে, তবে কোরো না। জানবে তাই তোমার দেবতার ইঙ্গিত।

ধর্মপত্রে হাঁ উঠল।

তার মানে রামকুমার করুক যেমন করছে পূজকের কাজ।

এখন গদাধরের কাজ কী? ঝামাপুকুরের টোল তো পটল তুলল, সে খায় কি,

থাকে কোথায় ?

রামকুমার বললেন, 'মন্দিরের প্রসাদ খাবি নে ?'

'না।'

'কেন গঙ্গাজলে রান্না, মাকে নিবেদন করা, খেতে দোষ কি ?'

'আমি স্বপাকে খাই।'

'বেশ তো, তবে সিধা নিয়ে যা না গঙ্গাপারে, নিজের হাতে রান্না করে খা গে। গঙ্গাকূলে সবই পবিত্র—এ তো মানতেই হবে।'

গঙ্গার নাম শুনে গদাধর গলে গেল। সকল-কলুষভঙ্গা গঙ্গা। "তব তট-নিকটে যস্য নিবাসঃ খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ।" সেই ভবভয়ভ্রাবিনী ভাগীরথী। তাকে গদাধর ফেরায় কি করে ?

তবে তাই। গদাধর থাকবে দক্ষিণেশ্বরে। গঙ্গাতীরে স্বপাকে রান্না করে খাবে। গঙ্গাজলের রান্না।

কেন, কেন এই নিষ্ঠার কাঠিন্য ?

ঠাকুর বললেন, 'পায়ে একটি কাঁটা ফুটলে আরেকটি কাঁটা যোগাড় করে পায়ের কাঁটাটি বের করতে হয়। তার পরই ফেলে দিতে হয় দু'টো কাঁটাই। তেমনি অজ্ঞান কাঁটা তোলবার জন্যে জ্ঞান কাঁটা যোগাড় করো। তার পর জ্ঞান-অজ্ঞান দু'টো কাঁটাই ফেলে দাও। তখন বিজ্ঞান অবস্থা। ত্রিগুণাতীত অবস্থা।' গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বললেন অর্জুনকে, নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।

নিষ্ঠা না থাকলে সত্যে পৌঁছুবে কি করে ? নিয়মে না থাকলে কি করে হবে নিয়মাতীত ? আগে শাসন চাই, শম-দম-সাধন চাই, তবে তো নির্বাণে পৌঁছুবে। আগে কঠিন হও, তবে তো সরল হবে। আগে ডুব দিতে শিখবে, তবেই তো খুঁজে পাবে গভীরতা।

চণ্ডাল মাংসের ভার নিয়ে চলেছে। শঙ্করাচার্য্যকে সে ছুঁয়ে দিলে। 'আমায় ছুঁলি ?' শঙ্করাচার্য চমকে উঠলেন। চণ্ডাল বললে, 'ঠাকুর, আমিও তোমায় ছুঁইনি, তুমিও আমাকে ছোঁওনি। শুধু আত্মা যে নির্লিপ্ত।'

এই হচ্ছে বিজ্ঞানীর ভাব। সে কখনো বালক, কখনো জড়, কখনো উন্মাদ, কখনো পিশাচ। সে তখন নিয়মাতীত। তার সর্বত্র ব্রহ্মময়। তার লজ্জা ঘৃণা ভয় ভাবনা নেই—কোনো গুণেরই আঁট নেই। সে কখনো বা জড়ের মত চুপ করে বসে থাকে। কখনো হাসে কখনো কাঁদে। এই বাবুর মত সাজে-গোজে, খানিক পরে আবার বগলের নিচে কাপড়ের পুঁটলি পাকিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ডোবার জল আর গঙ্গাজল সমান দেখে।

এই যে নিত্যসন্তুষ্ট অবস্থা—এতে আসতে হলে কত নিষ্ঠা-নিয়ম কত শাসন-বন্ধন দরকার তার কি ঠিক আছে ?

দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে এক পাগল এসে উপস্থিত। এক হাতে একটা কঞ্চি, অন্য হাতে একটা ভাঁড়, পায়ে ছেঁড়া জুতো। গঙ্গায় ডুব দিয়ে উঠে, কোঁচড়ে কি ছিল তাই খেল। তার পরে মন্দিরে গিয়ে স্তব করতে বসল। গমগমে শব্দে কে পে-কেঁপে উঠল মন্দির। ভাত জোটেনি, অতিথিশালার পাত কুড়িয়ে খেতে লাগল ভাত। পথের কুকুরের মত। এমন কি পথের কুকুরদের সরিয়ে-সরিয়ে কাড়াকাড়ি করে। হলধারী ছুটে এল মন্দির থেকে। লোকটার পিছু-পিছু ধাওয়া করলে। বললে, তুমি কে ?

পাগল বললে, 'চুপ। কাউকে বলিসনি। আমি পূর্ণজ্ঞানী।'

পূর্ণজ্ঞানী ?

'হ্যাঁ, তোকে বলে যাই। যেদিন এই ডোবার জল আর গঙ্গাজলে কোনো ভেদবুদ্ধি থাকবে না, তখনই বুঝবি পূর্ণজ্ঞান হয়েছে।' বলেই পাগল চলে গেল কোন দিকে।

ঠাকুর সব শুনলেন। ভয়ে জড়িয়ে ধরলেন হৃদয়কে। মাকে বললেন, 'মা, আমারো কি তবে এমনি হবে ?'

ভয় কি। মা'র মুখে সেই অভয়ঙ্কর প্রসন্নতা। চুম্বকের পাহাড়ের কাছ দিয়ে জাহাজ চলে গেলে জাহাজের আর কী থাকে ? তার কলকব্জা ইস্ক্রুপ-বলটু লোহা-লক্কড় সব আলাদা হয়ে খুলে যায়। তেমনি তোর যখন ঈশ্বরদর্শন হবে তখন তুই আর তুই থাকবি না। তুই তো কাঠ নস যে পোড়ালে ছাই থাকবি। তুই কপূর, পোড়ালে তোর কিছুই বাকি থাকবে না। শেষ বিচারের পর তোর সমাধি হয়ে যাবে। নুনের পুতুল হয়ে নামবি তুই লবণের সমুদ্রে।

তোর ভয় কি। তোর তো আমিই আছি। মৃন্ময় আধারে চিন্ময়ী মা।

॥ ৯ ॥

'এ ছেলেটি কে ?' খানিকটা তন্ময়ের মতই জিগগেস করলেন মথুরবাবু।

উদারদর্শন, নবীন ব্রহ্মচারী। কুমার-কোমল। এ কে ? একে কি আগে কোথাও দেখেছি ? কোথায় দেখব ? কত দিন আগে ?

কিছুতেই মনে করতে পারছেন না মথুরবাবু। তবে কি পূর্বজন্মে দেখেছি ? কিংবা জন্ম-মৃত্যুর পরপারে ?

'কে এই ছেলেটি ?'

না, স্বগতোক্তি নয়, প্রশ্ন করছেন রামকুমারকে।

'আমার ভাই।' স্নিগ্ধ-বিনয়ে বললেন রামকুমার।

কিন্তু মথুরামোহনের কে? কেউ যদি না-ই হবে তবে তার দিকে মন ছুটে চলেছে কেন?

'এখানে, এই মন্দিরে, কাজ করবে?'

'দেখব জিগগেস করে।'

বললেন বটে রামকুমার, কিন্তু জিগগেস করতে সাহস পেলেন না। তিনি জানেন তো তাঁর ভাইকে। দক্ষিণা নিয়ে ঠাকুর-পুজো করবার সে ছেলে নয়।

এমন সময় দক্ষিণেশ্বরে হৃদয়রাম এসে হাজির।

'এ কি, তুই এখানে কোত্থেকে?' অবাক হলেন রামকুমার।

'বর্ধমানে গিয়েছিলাম চাকরির সন্ধানে। চাকরির নামে লবডঙ্কা। শুনলাম মামারা এখন মস্ত হয়েছেন, রানি রাসমণির কালীমন্দিরে আছেন পূজারী হয়ে। ভাবলাম যদি তাঁদের ধরলে একটা হিল্লে হয়।'

ষোলো বছরের বলবান ছেলে। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে দৃঢ়কায়। সুপুরুষ। সদানন্দ।

'ওরে, হৃদে এসেছিস্?' আনন্দে ছুটে এল গদাধর। যদিও বছর চারেকের ছোট, সম্পর্কে ভাগনে, তবু একেবারে নিকটতম বন্ধু। ছেলেবেলার খেলুড়েদের একজন। সহজ স্নেহে জড়িয়ে ধরল বুকের মধ্যে। বললে, 'তুই কী মনে করে?' হৃদয় কিছু বলল না, চুপ করে রইল। কিন্তু অন্তরে বসে অন্তর-বাসিনী বললেন, 'তোরই জন্যে হৃদয়কে পাঠিয়ে দিলাম তোর কাছে। ও না হলে তোকে দেখবে-শুনবে কে? সামলাবে কে? সাধনায় বসে যখন সব ভুলে যাবি তখন তোর শরীর কে বাঁচিয়ে রাখবে? তুই যদি শিব,, ও তোর নন্দী। তুই যদি রাম, ও তোর লক্ষণ।'

গাছের যেমন ছায়া, গদাধরের তেমনি হৃদে।

দুটিতে কাছছাড়া নেই। সর্বক্ষণ সমভাব। শুধু খাবার সময় আলাদা। হৃদয় মন্দিরে প্রসাদ নেয়, গদাধর গঙ্গাতীরে রান্না করে।

সেজবাবুকে এড়িয়ে চলে গদাধর। কালী-ঘরে কোনো একটা চাকরিতে তাকে ঢুকিয়ে দেবেন তাঁর মনের কথা চোখের ভাষায় যেন ধরা পড়েছে। চাকরি-বাকরির মধ্যে আমি নেই, ধরা-বাঁধার মানুষ নই আমি। তার চেয়ে নিজের মনে শিব গড়ি, পুজো করি নিজের মনে। সেই আমার ভালো। আমার ধ্যানের আরাম।

এমনি মূর্তি গড়ছে গদাধর। মূর্তি গড়ে পুজোয় বসেছে এক দিন। পুজোয়

বসে আবিষ্ট হয়ে রয়েছে। সেই সুযোগে চুপিসাড়ে কখন কাছে এসে পড়েছেন সেজবাবু। তন্ময় হয়ে দেখছেন সেই শিবমূর্তি। তার গঠনলাবণ্য। শুধু ভাস্কর্য নয়, ভাস্কর্যের চেয়েও যা বড় জিনিস তাই যেন ফুটে উঠেছে সর্বাঙ্গে। তা ভক্তি। তা মনোমাধুরী। হাতের পেলবতায় গলে-গলে পড়ছে যেন অন্তরের অনুরাগ।

'এ মূর্তি কে করেছে?'

'গদাধর।' হৃদয় কাছাকাছিই ছিল, বললে।

এক মুহূর্ত কি ভাবলেন মথুরবাবু। বললেন, 'পুজো হয়ে গেলে আমাকে দেবে এই মূর্তি?'

আপত্তি কি! চক্ষের নিমেষে এমনি কত-শত মূর্তি গড়তে পারবে গদাধর। হৃদয় সম্মতি দিল।

মূর্তি হাতে পেয়ে আরো ব্যাকুল হলেন মথুরবাবু। যার চকিত কল্পনার এই রূপ, তার অতলতল ধ্যানের না-জানি কেমন চেহারা! ডেকে পাঠালেন রামকুমারকে। গদাধরকে রাজী করান, তাকে কাজ দেন মন্দিরে। অসম্ভব—মুখ গম্ভীর করলেন রামকুমার। গদাধরের চাকরিতে রুচি নেই।

জেদ চাপল মথুরবাবুর। যে করেই হোক গদাধরকে কালীর কোলের কাছে টেনে আনতেই হবে।

'বাবু আপনাকে ডাকছেন।'

গদাধর চেয়ে দেখল, সেজবাবুর চাকর।

আর পালাবার জো নেই। সেজবাবু একেবারে চোখের উপর দাঁড়িয়ে।

'ডাকছেন, যাও না!' হৃদয় তাড়া দিল: 'এত ভয় কিসের?'

'গেলেই বলবে, এখানে থাকো, চাকরি করো। ও আমি পারব না।'

'দোষ কি! করলেই বা চাকরি! লোক কত সৎ আর মহৎ। এমন লোকের আশ্রয়ে চাকরি করা তো সুখের কথা।'

'তুই কত বুঝিস! চাকরি নিলেই চিরকাল বাঁধা পড়ে যেতে হবে। আমার তা পোষাবে না। তাছাড়া—' গলা নামাল গদাধর: 'তাছাড়া কালীপুজোর ভার নেওয়া চারটিখানি কথা নয়। দেবীর গায়ের অত গয়নার কে ভার নেবে?'

'আমি নেব।'

'তুই নিবি? সত্যি বলছিস?'

'চাকরি খুঁজতে এসেছি আমি এখানে। আমার একটা কিছু জুটে গেলেই হল।'

BanglaBook.org

'তবে যাই, বলি গে সেজবাবুকে ।'

হাতে চাঁদ পেলেন মথুরবাবু। গদাধরকে বললেন, 'তুমি মাকে রোজ সাজাবে, মা'র "বেশকারী" হলে তুমি।' আর হৃদয়কে বললেন, 'তুমি হলে ওর সাগরে।'

এ সময় একটা কাণ্ড ঘটল।

ক্ষেত্রনাথ চাটুজ্জে রাধাগোবিন্দের পূজারী। রোজ সকালে রাধারাণী আর কৃষ্ণকে মন্দিরের সিংহাসনে এনে বসান আর বিকেল হলে নিয়ে যান শয়নঘরে। জন্মাষ্টমীর পরের দিন। দুপুরে ভোগরাগ অনেক হয়ে গিয়েছে, এখন বিরামপর্ব। কক্ষান্তরে রাধারাণীকে আগে শুইয়ে দিয়ে এসেছেন, এখন গোবিন্দকে নিয়ে চলেছেন ক্ষেত্রনাথ। হঠাৎ পড়ে গেলেন পা পিছলে। নিজে সামলেছেন কিন্তু বিগ্রহের একটি পা গিয়েছে ভেঙে।

তুমুল শোরগোল উঠল মন্দিরে। এ কি অঘটন! এ কি অশুভ সূচনা!

ক্ষেত্রনাথকে বরখাস্ত করে দেওয়া হল সরাসরি। কিন্তু তাতে কী হবে? বিগ্রহ তো তাতে অভঙ্গ হয়ে উঠবে না!

তা উঠবে না, কিন্তু এখন উপায় কী বলো? রানি রাসমণি অস্থির হয়ে উঠলেন। মথুরবাবুকে বললেন, সভা বসাও, ডাকাও পণ্ডিতদের, বিধি নাও।

বসল পণ্ডিতসভা। সব ন্যায়চুঞ্চু তর্কচূড়ামণির দল। অনেক শাস্ত্র ঘেঁটে আর সংস্কৃত আওড়ে তাঁরা পাঁতি দিলেন—ভাঙা বিগ্রহকে গঙ্গায় ফেলে দিতে হবে, আর তার জায়গায় বসাতে হবে নতুন দেবমূর্তি।

সঙ্গে-সঙ্গে নতুন দেবমূর্তির ফরমায়েস গেল।

কিন্তু রানির মনে সুখ নেই। অন্তরের অন্ধকারে কাঁদতে লাগলেন। বলতে লাগলেন গোবিন্দকে, তুমি কি আমার কাছে শুধু পাথর না তামা-পেতল যে তোমাকে জলে ফেলে দেব? তার চেয়ে তুমি আমাকে চোখের জলে ফেলে রাখো।

মথুর বুঝলেন রানির অস্থিরতা। বললেন, 'গদাধরকে গিয়ে জিগগেস করি।' মনে হল যেন কোথাও একটা সহজ সমাধান আছে। যিনি সরলের মধ্যে সরল তিনিই তরল করে দেবেন।

গদাধরকে বললেন সব মথুরবাবু। এখন তুমি কী বলো! তোমার মন কী বলে!

'যেমন পণ্ডিত তেমনি তাদের পাঁতি!' বলে উঠল গদাধর: 'রানির জামাইয়ের যদি আজ ঠ্যাং ভাঙত, তবে রানি কী করতেন? গঙ্গায় জামাইকে ফেলে দিতেন আর তার জায়গায় বসাতেন এনে নতুন জামাই?'

সবাই স্তব্ধ হয়ে রইল।

'কখনো না। জামাইকে রানি চিকিৎসা করাতেন। চিকিৎসা করিয়ে ভালো করে তুলতেন। এখানেও সে-ব্যবস্থা করলেই হয়।'

সবাই বাক্যহীন।

'হাঁ গো, ভাঙা পা জোড়া দেওয়ার কথা বলছি। ভাঙা পা জুড়ে দিলেই ঠাকুর আবার আস্ত-সুস্থ হয়ে উঠবেন। আবার চলবে তাঁর সেবা-পূজা।'

একেবারে সোজাসুজি অন্তরের কথা। মন যেমনটি চায় তেমনি। যা মন থেকে আসে, বিবেক থেকে আসে, তাই ঈশ্বর থেকে আসে। যেখানে সরল-স্বচ্ছ সেখানেই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব।

এমন যে সহজ মীমাংসা হতে পারে—শুনে পণ্ডিতেরা হতভম্ব হয়ে গেল। অনেক শাস্ত্র পেড়ে আপত্তি তুললে, কিন্তু মনের কাছে আবার শাস্ত্র কি! মনের জোরের কাছে কার জোর খাটবে!

রানির বুক ভরে গেল আনন্দে। দু'চোখে ধারা নেমে এল। কত সহজের মধ্যে তুমি আছ! কত সহজের মধ্যেই ধরা দিলে! মনে-মনে বললেন গোবিন্দকে। গদাধরকে বললেন, 'তুমিই তবে ভাঙা পা জুড়ে দাও। তুমি ওস্তাদ কারিগর, তুমিই বৈদ্যনাথ।'

ভাঙা পা জুড়ে দিল গদাধর। একেবারে নিখুঁত করে দিল। কারুর সাধ্যি নেই চোখে দেখে বার করে দেয় জোড়ার দাগ। কারুর সাধ্যি নেই বার করে দেয় এই জাদুকরের জারিজুরি।

ফরমায়েসি মূর্তি এসে পৌঁছুল। মথুরবাবু বললেন, 'দেখ তো, ও আগের মতন হল কিনা।'

চোখ মেলে নয়, চোখ বুজে দেখল গদাধর। দেখল অন্তরের মধ্যে ডুবে গিয়ে। না, তেমনটি হয়নি। তেমনটি আর হয় না।

দরকার নেই নতুন বিগ্রহে। পুরোনো বিগ্রহই ভালো। কত প্রীতি-ভক্তির কোমলতা তার গায়ে মাখা। কত অশ্রুতে তাকে স্নান করানো। কত প্রার্থনায় তার ঘুম ভাঙানো। তাকে কি আর বিদায় দেওয়া চলে? না কি বিদায় দিলেই তার দায় যাবে?

কিন্তু যাই বলো খুঁতে হয়ে রইল যে! অঙ্গহীন বিগ্রহের কি পূজা সিদ্ধ হয়?

খুব হয়। প্রিয়জন যদি খুঁতে হয়, তবে সেই খুঁতের জন্যেই সে প্রিয়তর।

বরানগরে কুটিঘাটার কাছে রতন রায়ের ঘাটে গদাধর বেড়াতে এসেছে। সেখানে ডাকসাইটে জমিদার জয়নারায়ণ বাঁড়ুয্যের সঙ্গে দেখা। কথায়-কথায় রানি

রাসমণির কালীবাড়ির কথা উঠল। রাধাগোবিন্দের কথা।

'হাঁ হে মশাই, ওখানকার গোবিন্দ কি ভাঙা?'

'তোমার বুদ্ধি কি গো!' গদাধর হেসে উঠল: 'যিনি অখণ্ডমণ্ডলাকার তিনি কি কখনো ভাঙা হন?'

জয়নারায়ণ চুপ।

ভাবাবস্থায় পড়ে গিয়ে ঠাকুরের দাঁত ভেঙে গিয়েছিল। সেবার পড়ে গিয়ে হাত ভেঙে গেল।

'হাত ভাঙলো কেন জানিস?' ভক্তদের সম্বোধন করে প্রশ্ন করলেন ঠাকুর।

কে কি বলবে! ঠাকুরের হাতে ভেঙে গিয়েছে এ একটা দৈব-বিপাক ছাড়া আর কি।

কিন্তু ঠাকুর বললেন, 'হাত ভাঙলো—সব অহঙ্কার নির্মূল করবার জন্যে। এখন আর এই খোলের ভিতরে আমি খুঁজে পাচ্ছি না। খুঁজতে গিয়ে দেখি তিনি রয়েছেন।'

রানি রাসমণি খুঁজতে গিয়ে দেখলেন, ভাঙা বিগ্রহের মধ্যেই গোবিন্দ রয়েছেন। জ্ঞানে যিনি সত্তায় যিনি প্রাপ্তিতে যিনি তিনিই গোবিন্দ।

॥ ১০ ॥

রাধাগোবিন্দের মন্দিরে গদাধর এবার পূজারী হল। আর হৃদয় হল কালীর সাজনদার।

কিন্তু এ কেমনতরো পূজা! সমস্ত বিশ্বসংসার থেকে চক্ষের পলকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যানবিলীন হয়ে বসে থাকা। মূর্তিকে প্রতীক না ভেবে প্রাণধারী বলে ব্যবহার করা। এমন পূজা দেখেননি কোনো দিন মথুরবাবু।

এমন তন্ময়, পূজা দেখবার জন্যে কারা ভিড় করেছে তাদের দিকে লক্ষ্য নেই। সে তো অল্প কথা, স্বয়ং মথুরবাবুকে পর্যন্ত দেখছে না।

দেখছে মন্ত্র বলবার সময় মন্ত্রের উজ্জ্বল বর্ণ কি করে তার দেহের সঙ্গে মিশে-মিশে যাচ্ছে। কি করে সর্পিণী কুণ্ডলিনী সুষুম্না দিয়ে সহস্রারে উঠছে ধীরে-ধীরে। শরীরের যে-যে অংশ ত্যাগ করে যাচ্ছে তাই অসাড় হয়ে যাচ্ছে, আর যে-যে অংশ ভেদ করে যাচ্ছে তাতে ফুটে উঠছে বিকচ পদ্ম। পূজার জায়গায় চারদিকে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে আর বহ্নিপ্রাকার তৈরি হয়ে যাচ্ছে সঙ্গে-সঙ্গে। তন্মনস্ক হয়ে মন্ত্র পড়ছে আর সমস্ত শরীর হয়ে উঠছে জ্বলিত-

তেজস্বান।

যে দেখছে সেও তন্ময় হয়ে যাচ্ছে।

ধ্যানের অবস্থা কি রকম জানো? মন হবে ঠিক তেলের ধারার মত। এক ঈশ্বর-চিন্তা ছাড়া আর কোনো চিন্তা নেই। পাখি মারবার জন্যে ব্যাধ তাগ করছে। সামনে দিয়ে বর চলে গেল মিছিল করে, কত গাড়ি-ঘোড়া কত বাজনা কত হট্টগোল। ব্যাধের হুঁস নেই। জানতেও পেল না বর গেল চতুর্দোলায়।

বুঝলে, স্পর্শবোধ পর্যন্ত থাকে না। গায়ের উপর দিয়ে সাপ হেঁটে যাবে, সাপও বুঝতে পারবে না কিসের উপর দিয়ে হেঁটে গেল। মনের বার-বাড়িতে কপাট দিয়ে বোসো। কপাটের বাইরে পড়ে থাকবে তোমার রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ আর স্পর্শ—তোমার পঞ্চেন্দ্রিয়ের পাঁচ উপচার। বন্ধ ঘরে তুমি আর তোমার মন। প্রতীক্ষা আর অন্ধকার। বিশ্বাস আর ব্যাকুলতা। বারুদ আর বহ্নিকণা।

প্রথম প্রথম সব ভোগের থালা আসবে ভারে-ভারে। পঞ্চেন্দ্রিয়ের পাঁচ প্রবঞ্চনা। বিচলিত হবি না, তলিয়ে যাবি, তলিয়ে যাবি। অন্ধকার থেকে চলে আসবি শুভ্রতায়। দেখবি আর ওরা আসবে না। আর কার কাছে আসবে?

'ধ্যান করতে-করতে প্রথম প্রথম আমার কি দর্শন হত জানিস?' বললেন এক দিন ঠাকুর, 'স্পষ্ট দেখলুম, সামনে টাকার কাঁড়ি, শাল-দোশালা, এক থালা সন্দেশ, দুটো মেয়ে আর তাদের ফাঁদী নথ। মনকে শুধোলুম, মন তুই কি চাস, কোনটা চাস্? মন বললে, কোনোটাই চাই না। ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া আমার আর কিছুই চাইবার নেই।'

রামকুমার খুশি। মন্দিরে এবার মন দিয়েছে গদাধর। কিন্তু যার জন্যে পুজো, সেই রোজগার হচ্ছে কই? ফিরছে কই সংসারের অবস্থা? চাকরি করতে বসে টাকার প্রতি টান না হলে চলবে কেন? টাকা ছাড়া উপায়ান্তর কি?

'আচ্ছা, এটা তোমার কী মনে হয় বলতে পারো?' ঠাকুর জিগগেস করলেন ডাক্তারকে—নাম ভগবান রুদ্র। 'টাকা ছুঁলেই হাত আমার এঁকে-বেঁকে যায়। নিশ্বাস পড়ে না।'

বলেন কি! ডাক্তার একটা টাকা বের করে ঠাকুরের হাতে রাখলেন। কি আশ্চর্য, দেখতে-দেখতে ঠাকুরের হাত বেঁকে গেল। রুদ্ধ হয়ে গেল নিশ্বাস। তা ছাড়া—চিন্তিত মনে ভাবছেন রামকুমার—ছেলেটার কেমন উদাস-উদাস ভাব। পঞ্চবটীর জঙ্গলে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকে একলা। কখনো বা সকাল-

সন্ধ্যেয় গঙ্গার পার ধরে দীর্ঘ পথ হেঁটে বেড়ায় আপন-মনে। কারুর সঙ্গে মেশে না, হাসে না, কি চায় কি ভাবে, কে জানে। বাড়িতে মা'র জন্যে মন কেমন করছে হয়তো।

একদিন ডেকে প্রশ্ন করলেন। 'মা'র জন্যে মন কেমন করছে রে গদাই? বাড়ি যাবি?'

'মা'র জন্যে?' কি বলবে ঠিক করতে পারল না গদাধর। বললে, 'না, বাড়ি যাব কেন?'

তবে অমনি ঘুরে বেড়াস কেন বনে-বাদাড়ে? কেন নির্জনে গিয়ে বসে থাকিস? কী হয়েছে?

নির্জন না হলে ভগবানচিন্তা হয় কই। সোনা গলিয়ে গয়না গড়াব, তা যদি গলাবার সময় পাঁচ বার ডাকে, তা হলে গয়না গড়াবো কি দিয়ে? ধ্যান করবো মনে মনে কোণে। ঈশ্বরচিন্তা যত লোকে টের না পায় ততই ভালো।

হয়তো এ মেজাজ চলে যাবে গদাধরের। এ একটা ক্ষণিক ঔদাস্য ছাড়া কিছু নয়। তেমনি ভাবলেন রামকুমার। কালীকে বললেন, মা, গদাধরকে সুমতি দাও।

শরীর ক্রমশ ভেঙে পড়ছে রামকুমারের। চলে যাবার আগে ছেলেটাকে মানুষ করে দিতে হয়। যাতে দাঁড়াতে পারে নিজের পায়ে। যাতে দু'পয়সা ঘরে এনে খাবার যোগাড় করতে পারে সংসারের। অন্তত তাঁর চাকরিটা সে ধরতে পারে সহজে।

তাই ভেবে গদাধরকে তিনি চণ্ডীপাঠ শেখাতে লাগলেন। শেখাতে লাগলেন কালীপুজোর বিধি-নিয়ম। বিস্তীর্ণ অনুশাসনের রীতি-নীতি।

কিন্তু শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা না নিয়ে পুজো করা যাবে না কালীকে। দীক্ষা নেব তো শক্তিসাধক কোথায়? আছে—বৈঠকখানার কেনারাম ভট্টাচার্য। দক্ষিণেশ্বরে আসে-যায়, রামকুমারের জানা-শোনা। একজন নামজাদা তান্ত্রিক। গদাধরের পছন্দ হল। বললে, এঁকেই তবে গুরু করি।

শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিল গদাধর। যেই তার কানে মন্ত্র পড়ল, চীৎকার করে উঠল গদাধর, ডুবে গেল গভীর সমাধিতে। গুরু তো হতবুদ্ধি। তাঁর নিজের মন্ত্রের এত শক্তি তা তাঁর নিজেরই অজানা।

'এক কাজ কর এখন থেকে।' বললেন রামকুমার: 'তুই কালীঘরে আয়, আমি রাধাগোবিন্দের ভার নিই।'

মথুরবাবুও পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।

'আমি শাস্ত্রের কি জানি? না জানি তন্ত্রমন্ত্র, না জানি আইনকানুন। কোথায় কি ত্রুটি করে ফেলব তার ঠিক নেই।'

'তোমাকে মানতে হবে না শাস্ত্র। দরকার নেই জেনে।' বললেন মথুরবাবু: 'তোমার ভক্তি আর আন্তরিকতাই শাস্ত্র হয়ে দাঁড়াবে। ভক্তিভরে যাই তুমি দেবে দেবীকে তাই তিনি গ্রহণ করবেন।'

বুকের ভিতরটা নড়ে উঠল গদাধরের। এক কথায় রাজী হয়ে গেল।

একটা বড় মানুষ জুটিয়ে দাও—মা'র কাছে প্রার্থনা করেছিলেন ঠাকুর। বড়লোক নয় শুধু, বড় মানুষ। মা মথুরবাবুকে জুটিয়ে দিলেন।

'মাকে বললুম, মা, এ দেহরক্ষা কেমন করে হবে? সাধুভক্ত নিয়েই বা কেমন করে থাকব? একটা বড় মানুষ জুটিয়ে দাও। মা সেজবাবুকে পাঠিয়ে দিলেন। চোদ্দ বছর ধরে সেবা করলে সেজবাবু।'

রামকুমার বললেন, এবার একটু বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। হৃদয় এল রামকুমারের জায়গায়। ছুটি পেল রামকুমার। বাড়ি যাবার আগে মুলাজোড় গিয়েছিল কি কাজে, সেখানেই চোখ বুজলে।

বাবার স্থলে দাদা—দাদার মৃত্যুতে বিহ্বল হয়ে পড়ল গদাধর। তখন তাকে ঈশ্বরতৃষ্ণা পেয়ে বসেছে। পেয়ে বসেছে মৃত্যুর রহস্য ছেদন করবার আকুলতা। তাই দাদার জন্যে শোক মিশে গেল ঈশ্বরাকাঙ্ক্ষার তীব্রতায়। যদি ঈশ্বর বুঝি তা হলে মৃত্যুকেও বুঝব। থাকেন যদি ঈশ্বর, তাহলে আর মৃত্যু নেই।

কচ নির্বিকল্প সমাধিতে রয়েছেন। সমাধি ভাঙবার পর একজন প্রশ্ন করলে, এখন কী দেখছ? কচ বললেন, তখন যা দেখেছি, এখনো তাই। দেখছি জগৎ যেন তাঁতে জ'রে রয়েছে। তিনিই পরিপূর্ণ, তিনিই সর্বময়। যা কিছু হয়েছে, তিনিই হয়েছেন। কিছু নেবার কিছু ফেলবার এমন কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। মা যেন আলো করে বসে আছেন।

মা'র পূজার ভার নিয়েছে গদাধর। ভার নিয়েই নিজেকে ঢেলে দিয়েছে, বিকিয়ে দিয়েছে। মা'র কোলে চড়ে বসেছে। নিজে মা'র হাত ধরেনি—বলছে, তুই আমার হাত ধরে নিয়ে চল। আমি যদি তোর হাত ধরি, পড়ে যেতে পারি হাত ফসকে। কিন্তু তুই যদি একবার আমার হাত ধরিস, আমার আর ভয় নেই।

ভগবানকে কে জানবে? জানবার চেষ্টাও করি না। আমি মা'কে জানি, তাই মা বলে ডাকি। যা ভালো বুঝবেন করবেন। বেড়াল-ছানার মত হেঁসেলে

রাখলে তিনিই রাখবেন, আবার বাবুদের বিছানায় এনে শোয়ালে তিনিই শোয়াবেন। আমি কেন বলতে যাব? ইচ্ছা হয় জানাবেন, না-হয় নাই জানাবেন। মা হয়ে বুঝবেন না তিনি সন্তানের ব্যাকুলতা?

ছোট ছেলে, মা'র ঐশ্বর্যের সে কী বোঝে? তার মা আছে এই তার পরম ঐশ্বর্য।

মা গো, তুই যেন তিন-ভুবন আলো করে বসেছিস।

মা'র মূর্তি রোজ ফুলে আর চন্দনে সাজায় গদাধর। মূর্তির গায়ে হাত লাগে আর চমকে-চমকে ওঠে। মনে হয় এ যেন নিশ্চল পাষাণ নয়, প্রাণময়ী জননী। পাথরে শৈত্য নেই, এ যেন প্রফুল্ল প্রাণতাপ। যেন এখুনি চোখের পলক নড়ে উঠবে, কথা কয়ে উঠবেন, হাত বাড়িয়ে টেনে নেবেন কোলের কাছে।

কই, অনুভবে-অনুমানে নয়, সত্যরূপে প্রত্যক্ষ হবি না কেন?

রাতে সবাই যখন ঘুমিয়েছে, তখন শয্যা ছেড়ে একা-একা বেরিয়ে পড়ে গদাধর। সকাল হলে ফেরে। দু'চোখ ফোলা, জবাফুলের মত লাল। যেন সমস্ত রাত নির্জনে বসে সে কেঁদেছে, দু'চোখের পাতা মুহূর্তের জন্যেও এক করেনি। কেমন উদ্‌ভ্রান্ত, উন্মাদের মত চেহারা।

'কোথায় যাও রোজ রাত্তিরে?' হৃদয় ধরে পড়ল একদিন।

'ঘুম আসে না। তাই ঠাণ্ডায় ঘুরে বেড়াই।' পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইল গদাধর।

'ঘুম আসে না মানে? না ঘুমুলে শরীর যে ভেঙে পড়বে একেবারে।'

শুধু-শুধু চোখে তাকিয়ে রইল গদাধর: 'ঘুম না এলে আমি করব কি!'

তখনকার মত চেপে গেল হৃদয়। নিশ্চয়ই কোনো রহস্য আছে। হৃদয় ঘুঘু ছেলে, ঠিক বার করে ফেলবে।

অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, ধাত্রী বা আমলকী আর অশোক এই পাঁচ বৃক্ষের সমাহারের নাম পঞ্চবটী। তখন পঞ্চবটীর চারপাশে ঘোর জঙ্গল, ঘোরালো অন্ধকার। দিনের বেলায়ও ওদিকে মাড়াতে গা ছমছম করে। একে গোরস্থান তাই অন্ধকারের জড়িপটিতে গাছপালার গোলকধাঁধা—রাত্রে সেখানে ভূত-প্রেতের মাতামাতি চলে। কারুর সাহস নেই ওদিকে পা বাড়ায়।

যেমন-কে-তেমন রাত নিবিড় হয়ে আসতেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে গদাধর। পিছু-পিছু হৃদয়ও বেরিয়ে পড়েছে সন্তর্পণে। দেখি কি করে। কোথায় যায়? কি সর্বনাশ! সেই সর্বগ্রাসী জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে গদাধর।

মা গো, মন্দির এখন বন্ধ, কিন্তু তোর এই আকাশ-ভুবন জোড়া চিরসুন্দরের মন্দিরে তো দরজা পড়ে না। আমি চুপি-চুপি তাই চলে এসেছি তোর কোলের কাছে। এই অন্ধকারে তোর হাতের স্পর্শ, এই স্তব্ধতায় তোর নিশ্বাস, এই প্রতীক্ষায় তোর পদধ্বনি। আমাকে দেখা দে।

বাইরে হৃদয় দাঁড়িয়ে রইল কাঠ হয়ে। হাঁকডাক দিলে শুনতে পাবে না গদাধর, হয়তো গ্রাহ্যও করবে না। তবে কি উপায়ে তাকে নিরস্ত করা যায়! টেনে আনা যায় ঐ জঙ্গল থেকে! শেষকালে সর্পাঘাতে মারা যাবে বুঝি।

একের পর এক ঢিল ছুঁড়তে লাগল হৃদয়। ভূতের আস্তানা, নিশ্চয় ভূতেই ঢেলা মারছে। যদি হুঁস হয়, যদি বা একটু ভয় পায়!

কা কস্য পরিবেদনা। একটি পাতারও চাঞ্চল্য নেই। যেমন নিরেট স্তব্ধতা তেমনি নীরন্ধ্র অন্ধকার। ভয় পেয়ে হৃদয়ই পিছু হঠল। ফিরে এস বিছানায়। ঘুমুতে পারল না।

পরদিন ফাঁকায় পেয়ে পাকড়াল গদাধরকে। বললে, 'রাত্রে জঙ্গলে ঢুকে কর কী?'

'ধান করি।'

'ধ্যান কর? কার?'

'আমার মা'র। মা'র মন্দির বন্ধ হয় না দিনে-রাত্রে।'

'কিন্তু জঙ্গলে কেন?'

'নির্জন না হলে ধ্যান করবার জোর আসে না মনের মধ্যে। ঐ আমলকী গাছের তলায় বসে ধ্যান করি। আমলকী গাছের তলায় বসে ধ্যান করলে কামনা সিদ্ধ হয়।'

'তোমার আবার কামনা কী?'

'একমাত্র কামনা—মাকে দেখব, মাকে পাব, মা'তে মিশে থাকব।'

কিন্তু এ সব কাজ ঠিক হচ্ছে না। মন্দিরের সেবা-পূজার পরিশ্রমেই তুমি যথেষ্ট কাহিল হয়ে পড়েছ। তার উপর আহারে তোমার রুচি নেই দেহের কোনো আরাম নেই। শেষকালে রাতের ঘুমটুকুও যদি বিসর্জন দাও, তুমি পাগল হয়ে যাবে। এ সব ছাড়ো।

মাকে তো তাই বলি—আমাকে পাগল করে দে। 'আমায় দে মা পাগল করে, আমার কাজ নেই জ্ঞানবিচারে।'

কিন্তু জায়গাটা তুমি ভালো বাছোনি। ওখানে ভূতের আড্ডা। রাতদিন দাপাদাপি করে। লোফালুফি করে ঢিল নিয়ে। টের পাও না?

গায়ের উপর দিয়ে সাপ হেঁটে গেলেও টের পাই না।

ঢিল ছুঁড়ে নিরস্ত করা গেল না গদাধরকে। একদিন শেষকালে সাহস সঞ্চয় করল হৃদয়। মামার ভাগ্নে সে—কিসের ভয়? গভীর রাত্রে অন্ধকারে ঢুকে পড়ল সে বনের মধ্যে। চলে এল আমলকী গাছের কাছাকাছি।

কিন্তু গাছের তলায় সে কী দেখছে? সর্বাঙ্গে শিউরে উঠল হৃদয়। মামা সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেছে নাকি?

দেখছে নিরবকাশ নগ্ন হয়ে ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছে গদাধর। নিবাত দীপশিখার মত নিষ্কম্প। গিরিশৃঙ্গের মত সমাহিত।

ধ্যান করবে তো করো, কিন্তু এ কী পাগলামি! শুধু পরনের ধুতিই ত্যাগ করেনি, পলায় পৈতে পর্যন্ত খুলে রেখেছে।

হৃদয়ের সহ্য হল না। এগিয়ে এসে ধমকে উঠল: 'এ কি হচ্ছে? পৈতে-কাপড় ফেলে দিয়ে উলঙ্গ হয়ে বসেছ যে?'

'এ, তুই! হৃদে? এ সব ফেলে দিয়েছি কেন জিজ্ঞেস করছিস? এরা হচ্ছে ছেলের মুখে চুষি-কাঠির মত। ছেলে চুষি নিয়ে যতক্ষণ চোষে মা আসে না। যখন চুষি ফেলে চিৎকার করে তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে ছুটে আসে। অহং-এর মায়ার রং-চং আমি মুছে ফেলে দিয়েছি, অন্তরের অরণ্যে বসে ডাকছি মাকে চেঁচিয়ে। মা, ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে ছুটে আয় আমাকে কোলে নিতে।'

উত্তর মনের মত হল না হৃদয়ের। যত খুশি ডাকো, কিন্তু দিগ্বসন হবার কী হয়েছে।

'তুই কী জানিস!' ঝলসে উঠল গদাধর: 'অষ্ট পাশে বদ্ধ হয়ে আছে মানুষ। ঘৃণা লজ্জা ভয় কুল শীল মান জাতি আর অভিমান—এই অষ্ট পাশ। মাকে ডাকতে হলে পাশমুক্ত হয়ে ডাকতে হয়। অহং-এর আঁশটি থাকলেও তিনি আসেন না। তাই ও-সব খুলে রেখেছি। ধ্যানের পর ফিরব যখন আবার অজ্ঞানের মেলায়, তখন আবার ও-সব পরে নেব।'

গোপীদের বস্ত্রহরণ হয়েছিল জানিস? তার মানে কি? তার মানে আর কিছুই নয়—গোপীদের সব পাশই গিয়েছিল, শুধু লজ্জা বাকি ছিল। তাই তিনি ও-পাশটাও ঘুচিয়ে দিলেন।

পরিধেয় আর পৈতে—এ দুটো উপাধি ছাড়া কিছু নয়। অভিমানের চিহ্ন। আমি বামুন, জাতে-জন্মে সকলের চেয়ে বড়, এই অহংকার। এই অহংকার বর্জন না করলে দীনতা আসে না। দীনতা না এলে সরলতা আসে না। আমার মা'র

আরেক নাম সরলতা।

আমি কি? আমি কি বস্ত্র না উপবীত? আমি কি হাড় না মাংস? রক্ত না নাড়ীভুড়ি? খোঁজো। খুঁজে কী পাচ্ছ দেখতে? দেখছ আমি নেই, শুধু তিনি আমার কিছুই উপাধি নেই, শুধু তাঁর ঐশ্বর্য।

রামচন্দ্রকে বললেন হনুমান, 'রাম, কখনো ভাবি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ। কখনো ভাবি তুমি সেব্য, আমি সেবক। কখনো ভাবি তুমি প্রভু, আমি দাস। কিন্তু রাম, যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন দেখি তুমিও যা আমিও তাই। তুমিই আমি, আমিই তুমি।'

যা সোঽহং তাই তত্ত্বমসি।

হৃদয় মামাকে বকতে এসেছিল, সব অন্য রকম হয়ে গেল। বললে, 'অহংকার যায় কই? এই যায় আবার এই আসে।'

তাই তো বলি, আমি যখন যাবে না, তখন থাক শালা দাস-আমি হয়ে। আমি ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের ভক্ত, আমি ঈশ্বরের ছেলে এ অহংকার ভালো। হাজার বিচার করো, আমি যায় না, চায় না যেতে। ভাবো একবার, চারদিকে অনন্ত জল, উপরে-নিচে সামনে-পেছনে ডাইনে-বাঁয়ে জলে জলময়। সেই জলের মধ্যে একটি কুম্ভ আছে। কুম্ভের বাইরে যেমন জল তেমনি ভিতরেও জল। জলে জল। তবু কুম্ভটি তো তখনো আছে। ঐটি হচ্ছে আমিরূপী কুম্ভ। যতক্ষণ কুম্ভ আছে ততক্ষণ আমি তুমি আছে। তুমি ঠাকুর আমি ভক্ত। তুমি প্রভু আমি দাস। তুমি আকাশ আমি পৃথিবী।

'কিন্তু কুম্ভ যখন থাকবে না? ভেঙে যাবে?'

গদাধর আবার ধ্যানস্থ হল।

তখন রাম আর হনুমান এক। তখন সে এক অন্য কথা। তখনকার কথা তখন।

॥ ১১ ॥

'মাগো, তুই কই? আমাকে কৃপা কর্। আমাকে দেখা দে। রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, আমায় তবে কেন দেখা দিবি নে? আমি কি দোষ করেছি জানিয়ে যা। এত কান্নায়ও কি সব দোষ ধুয়ে গেল না? আমি ধন জন ভোগ বিভব কিছুই চাই না, মা। শুধু তোকে চাই। তুই দয়া কর্। দেখা দে।'

চোখের জলে বুক ভেসে যায় গদাধরের। অশ্রুভরা গলাতেই ফের গান ধরে:

আদিভূতা সনাতনী শূন্যরূপা শশীভালী
ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যবে মুণ্ডমালা কোথা পেলি!

পরের দিন আবার কান্না : 'মাগো, আরেক দিন চলে গেল। বৃথাই গেল। তুই এলি না। এই তো সামান্য আয়ু, তার মধ্যে আরো একদিন নিয়ে নিলি, মা। আমার কান্না কি তুই শুনিস না? আমার কান্নায় কি জোর নেই? আমি কি পারছি না কাঁদতে?'

ছুয়ে পড়ে ঘাসের মধ্যে মুখ ঘষে গদাধর। বলে : 'মা, তুই কোথায়? তুই কি সত্যি আছিস? না সব মায়া, মিথ্যা, সব মনের ভুল? যদি তুই আছিস, তোর জন্যে যখন এত আলো এত অন্ধকার, তখন তোকে আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন? রামপ্রসাদ তো তোকে দেখেছে। তোকে তবে ছলনা বলি কি করে? তুই আয়। দেখা দে। চোখের সামনে দাঁড়া।' মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে গদাধর। চুল ছিঁড়ছে। মাটিতে মুখ ঘষছে। চোখের জলে কাদা করে ফেলেছে।

'আহা, ছোকরার মা মরেছে বুঝি।' পথ-চলতি লোক দাঁড়িয়ে পড়ে কৌতূহলে। 'কলে ম'ল? কবে? মাকে খুব ভালোবাসত, তাই না?'

চারপাশে ভিড়, তবু গদাধরের লজ্জা নেই, লৌকিকতা নেই। একবিন্দু বিরতি নেই কান্নার।

'এক-এক করে দিন চলে যাচ্ছে, মা। এক-পা এক-পা করে এগুচ্ছি মৃত্যুর দিকে। আর দেখি সহ্য হচ্ছে না। নরজন্ম যে ফুরিয়ে যাচ্ছে। শাস্ত্রে বলে, তুই-ই সত্য, তুই-ই একমাত্র অধিগম্য। শাস্ত্র কি সব গাঁজাখুরি? তুই কি ভাঁওতা? সমস্ত একটা জোচ্চুরি? সমস্ত জগতের কি কেউ জননী নেই? যদি থাকে তবে সে কি আমারো জননী নয়?'

গহনায় ছাঁকা করছে গদাধর। মনে হচ্ছে এক ঘরে আছে একতাল সোনা, অন্য ঘরে ঢুকেছে এক চোর। মাঝখানে শুধু একটা পাতলা যবনিকা। সোনা নেবার জন্যে চোর কি পাগল হয়ে ফিরবে না? চাইবে না সে পর্দাটা দুই হাতে ছিঁড়ে ফেলতে? টুকরো-টুকরো করে ফেলতে?

গুরু নেই, সাধু বা সিদ্ধপুরুষ কেউ নেই যে, রীতি-নীতি বা পদ্ধতি-প্রকরণ শেখায়। এমন কেউ স্বজন-বন্ধু নেই যে অভিজ্ঞতার কথা বলে। শাস্ত্রপুঁথি তো চিরকালের জন্যে শিকেয় তোলা। কোনোই সহায়-সম্বল নেই গদাধরের। শুধু আছে উজ্জ্বল বিশ্বাস আর উদ্দাম ব্যাকুলতা।

পুজোয় নিয়মমত আর বসতে পারে না গদাধর। কেমন যেন সে হয়ে গিয়েছে। মূর্তির সামনে নিশ্চল হয়ে বসে থাকে। কখনো কখনো, ঘুমের মধ্যে, শিশু যেমন কাঁদে তেমনি করে কেঁদে ওঠে। পুজো করতে-করতে হঠাৎ কখনো ফুল নিয়ে

নিজের মাথার উপর রাখে আর পূজা ভুলে ডুবে যায় সমাধিতে। ফুল নিয়ে দেবীকে সাজাচ্ছে তো সাজাচ্ছেই, শেষ আর হচ্ছে না। আরতি করছে তো করছেই, দীপ থেকে ঘণ্টায়, আবার ঘণ্টা থেকে দীপেই ফিরে আসছে। দেরি করছে, প্রতীক্ষা করছে। এই বুঝি মা জেগে উঠবেন!

'আমার কথা তুই কেন শুনছিস না মা? আমি তোর অযোগ্য ছেলে বলে কি তোর স্নেহেরও অযোগ্য? আমি বেদ-বেদান্ত কিছু জানি না বলে কি তোর স্নেহও জানব না?'

সবাই বিদ্রূপ করছে। বলছে, আহা মরি! কী পুজোই না হচ্ছে!

গদাধরের ভ্রূক্ষেপ নেই। লোকের মুখের দিকে সে চাইবে না। সে চেয়ে আছে মা'র মুখের দিকে। ঘুম নেই। খাবার গলছে না গলা দিয়ে। সমস্ত মুখ আর বুক লাল।

তবু, কোথায় মা! কোথায় জগদীশ্বরী!

যেমন করে ভেজা গামছা নিংড়োয় তেমনি করে কে বুকের মধ্যিখানটা নিংড়োচ্ছে গদাধরের। মনে ভয় ঢুকেছে, হয়তো ইহজীবনে মা'র দর্শনলাভ হবেই না। মা থাকতেও মাকে যদি না পাই কী হবে তবে বেঁচে থেকে? জীবনের আর তবে মূল্য কি?

হঠাৎ কালী-ঘরে যে খাঁড়া ঝুলছিল তার উপরে নজর পড়ল। গদাধর শিশুর মতন ছুটে গিয়ে পেড়ে আনল সেই খড়্গ। এই মুহূর্তেই জীবনের সে অবসান করে দেবে। আত্ম-রক্তপাতে জননীর নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ নেবে।

গলায় আঘাত করতে যাচ্ছে, অমনি সামনে মা এসে দাঁড়ালেন।

মা! তুই মা! তুই এলি এত দিনে?

মেঝের উপর মূর্ছিত হয়ে পড়ল গদাধর।

'দেখলুম—কী দেখলুম—যেন ঘর-বাড়ি ছাদ-দেয়াল জানলা-দরজা আড়াল-আবডাল সব এক নিমেষে কোথায় উড়ে গেল, মিশে গেল। কোথাও কিছু নেই। শুধু এক সীমাহীন উজ্জ্বল সমুদ্র। চৈতন্য-সমুদ্র। যেদিকে তাকাই, দেখি তার জ্বলন্ত ঢেউ আমাকেই গ্রাস করবার জন্যে ছুটে আসছে। চারদিক থেকে ছুটে আসছে। চোখের পলকে আমাকে আচ্ছাদন করে ফেলল, ভেঙে গুঁড়িয়ে মিশিয়ে দিল একাকার করে। কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে তলিয়ে গেলুম।'

কিন্তু ঐ কি তোমার মা? ঐ তোমার মাতৃরূপ? শুধু চৈতন্যময়ী জ্যোতি? তোমার মা হাসে না, কথা বলে না, খায় না, হাঁটে না?

কি জানি। ঢেউয়ে-ঢেউয়ে আমাকে ডুবিয়ে নিয়ে গেল অতলে। আমি আনন্দে 'মা' 'মা' বলে কেঁদে উঠলুম। মনে হল ও তো ঢেউ নয়, মা-ই আমাকে টেনে নিলেন কোলের মধ্যে।

জল আর বরফ, বরফ আর জল। যাই জল তাই বরফ, যাই বরফ তাই জল। নির্জনে গোপনে বসে কাঁদতে লাগল গদাধর: 'মাগো, তুই যে কেমন তাই আমাকে দেখিয়ে দে। তুই সাকার কি নিরাকার বুঝতে পারি না। তুই কালী না ব্রহ্ম তা তুই-ই জানিস। তুই যা হ, আমায় কৃপা কর্, দেখা দে।'

পরে আবার বলতে লাগল আকুল হয়ে: 'ভক্তের কাছে একবার ব্যক্তি হয়ে দেখা দে মা। একবার বরফ হয়ে ওঠ্। তারপর যখন জ্ঞানসূর্য উদয় হবে তখন না-হয় বরফ গলে আগেকার যেমন জল তেমনি জল হয়ে যাবি। আমি তোর মা-রূপটি ভালোবাসি। আমায় তুই মা হয়েই দেখা দে। আমি তোর সন্তান, আমার সন্তানভাব।'

একবার দেখে কি তৃপ্তি আছে গদাধরের? সে বহুবার, অনন্তবার দেখতে চায়। মায়ে পূর্ণ হয়ে থাকতে চায়, লীন হয়ে থাকতে চায়। যা পূর্ণ তাই লীন। চাই সেই অবিরাম যোগ। অবিচ্ছিন্ন আনন্দ।

লোক দাঁড়িয়ে থাকে চারদিকে, কত কি মন্তব্য করে, গদাধর কান পাতে না, চোখে দেখে না। মনে হয় সব পটে-আঁকা ছায়ামূর্তি। অবস্তু, অসত্য। মনে হয় সংসারে শুধু মা আর মা'র জন্যে এই কাতর কাকুতি ছাড়া আর কিছু নেই। তাই কে কি বলবে বা ভাববে কিছু আসে-যায় না গদাধরের। শুধু আসে-যায়, মা কবে আবার দেখা দেবেন, কবে থাকবেন চিরদ্যুতি হয়ে!

একমাত্র হৃদয়ের দুশ্চিন্তা। এ যে কঠিন রোগ হয়ে পড়ল মামার। কাজের বার হয়ে পড়ল ক্রমে ক্রমে। সাধন করতে বসে স্নায়ুবিকার হল। চিকিৎসা করতে হয়। ভূটকলাসের রাজার যে কবরেজ ছিল, নামজাদা বদ্যি, তাকে খবর পাঠালে। কবরেজ এসে নাড়ী টিপলে। ওষুধ দিলে। এ রোগের ওষুধ নেই। এ রোগের ওষুধ মাতৃদর্শন! মাতৃস্পর্শন!

হৃদয় ভাবলে, কামারপুকুরে খবর পাঠাই। মা'র ছেলে ফিরে যাক মা'র কাছে।

॥ ১২ ॥

শুধু একবার দেখা দিয়েই পালিয়ে গেলে চলবে না। চোখের সামনে দাঁড়াতে হবে স্থির হয়ে। শুধু একটু হাত বাড়িয়ে দিলি, বা দু'টি চোখ নাচালি, বা ছুটে পালিয়ে গেলি চুল এলিয়ে, তাতে হবে না। শান্ত হয়ে সর্বসম্পূর্ণ হয়ে দাঁড়াতে

হবে। উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে থাকতে হবে সঙ্গে-সঙ্গে। পায়ে-পায়ে, চোখে-চোখে, নিশ্বাসে-নিশ্বাসে। পৃথিবীকে ঘিরে যেমন বাতাসের প্রাণ-স্পর্শ, তেমনি আমাকে ঘিরে তোর অচঞ্চল অঞ্চল।

'মন রে, ঐ ছাখ।'

কি দেখব ?

ভৈরবকে ছাখ, মা'র নাটমন্দিরের ছাদের আলসেয় ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছে। অমনি নিশ্চল ষড়্ভাবশূন্য হয়ে বসবি, চোখ রাখবি মা'র পদ্মপদের উপরে। শরীরে ঝড় বয়ে যাবে, ভেঙে পড়বে সব ছাদ-দেয়াল। তুই নড়বি না। তুই নড়বি কেন ? যার নাড়ীর টান সে নড়ুক।

আমার কি হচ্ছে, কিছুই বুঝছি না। কিংবা কিছুই হচ্ছে না মাথামুণ্ডু। মন রে, মাকে তাই তুই বল কেঁদে কেঁদে। বল, আমাকে শিখিয়ে দে মা, কি করে তোকে দেখতে পাব। আমি একেবারে নিরেট, আমি না জানি তন্ত্রমন্ত্র, না জানি যাগ-যজ্ঞ, তুই না বলে দিলে কে বলে দেবে ? তুই-ই বল, তুই ছাড়া আমার কি আর কেউ আছে ?

মনকে এ কথা বলতে বলে দিয়ে চোখ বুজল গদাধর। ধ্যানে নিশ্চিহ্নচেতন হয়ে গেল। মনে হল কে যেন শরীরের হাড়ে হাড়ে জোড় খাইয়ে তালা মেরে দিচ্ছে। একটু যে নড়বে-চড়বে, বা আসন বদলাবে তার সাধ্য নেই। আবার যতক্ষণ না গ্রন্থিগুলি খুলে দিচ্ছে ততক্ষণ এমনি স্থাণু হয়ে বসে থাকো জড়পুত্তলির মত। মন রে, বসে থাক। ভালোই তো, থাক বসে। যে তোকে বসিয়ে রেখেছে, সে কতক্ষণ বসে থাকতে পারে দেখি।

কি দেখছিস ?

জ্যোতিবিন্দু দেখছি।

সর্ষেফুল দেখছিস। তার মানে কিছুই দেখছিস না।

না। এখন আর বিন্দু নেই। পুঞ্জ-পুঞ্জ হয়ে উঠেছে।

তার পর ?

গলানো রূপোর স্রোত চলেছে পৃথিবীতে। সব কিছু জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। উঠেছে ? তবে ধৈর্য ধর্। এবার দেখা দেবেন জ্যোতির্ময়ী। জগদ্ভাসিনী। ঘরে স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করছে গদাধর। সমাধি হয়েছে। সম্যক প্রকারে ধারণ করার ভাবই তো সমাধি। মা আগে আংশিক ছিলেন, কখনো প্রসারিত একখানি হাত, কখনো স্থির-স্থিত দু'টি পা, কখনো বা হাসির ঝিলিক দেওয়া একটি ক্ষণচকিত চাহনি—এখন মা সম্যকসম্পূর্ণ হয়ে উঠছেন। সমগ্র, সর্বাঙ্গসম্পন্ন।

অষ্টৈশ্বর্যে সৌষ্ঠবান্বিত।

ঝম্‌ঝম্‌ শব্দে পাঁয়জোর বাজিয়ে কে উঠছে রে মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে? গভীর রাতে নির্জন মন্দিরের চাতালে কে এমন ছুটোছুটি করছে? ক্ষিপ্রপায়ে বেরিয়ে এল গদাধর। দেখল, চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেল, মা মহামায়া মুক্তকেশে মন্দিরের দোতলার বারান্দার উপরে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রলয় ঘনঘটা ঘোররূপা প্রচণ্ডা। দিগ্‌বস্ত্রা নবনীল-ঘনশ্যামা। পুবে একবার কলকাতার দিকে তাকাচ্ছেন, আরেকবার তাকাচ্ছেন গঙ্গার দিকে পশ্চিমে। সর্ববর্ণময়ী, পরব্রহ্মস্বরূপিণী। মা আমার কালো কেন বলতে পারিস? যার আদিও নেই অন্তও নেই, তাকে তুই কোন রং দিয়ে বোঝাবি? যার কোনো রং-ই নেই, সে কালো ছাড়া আর কি?

মা আমার উলঙ্গিনী কেন? মা যে অদ্বিতীয়া। যেখানে দ্বিতীয় বলে কেউ নেই সেখানে আবরণের কথা ওঠে না! যে অন্তহীন তাকে তুই আবরণ দিয়ে ঢাকবি কি করে?

মন্দিরে ঢুকল গদাধর। মন্দিরে মূর্তি নেই, তার বদলে সশরীরে মা আছেন বসে। গদাধর তাঁর নাকের নিচে হাত রাখল, হাতে স্পষ্ট নিশ্বাসের স্পর্শ। মন্দিরে ভোগ সাজিয়ে রেখেছে, দেখল, গায়ের রঙে ঘর আলো করে মা খেতে বসেছেন। এক-এক দিন মন্ত্র বলবার পর্যন্ত ফুরসৎ দেন না, নৈবেদ্যের জন্যে হাত বাড়িয়ে বসেন।

'দাদা, আগে মন্ত্রটা বলি, তার পর খাস।' চেঁচিয়ে উঠল গদাধর।

হৃদয় ছুটে এল। দেখল, জবা-বেলপাতা নিবেদন করবার আগেই মামা নৈবেদ্যের থালা নিবেদন করছে মাকে। 'এ কি মামা, এ কি করছ?'

'কি করব! রাক্ষুসির যে তর সইছে না। খিদের জ্বালায় নোলা সকসক করছে।'

শুধু তাই নয়। নৈবেদ্যের থালা থেকে এক গ্রাস ভাত নিয়ে মামা সিংহাসনে উঠে মা'র মুখে ঠেকিয়ে বলছে, 'খা, খা, বেশ করে খা—'

হঠাৎ স্বর বদলে বলছে, 'কি, আমাকে খেতে হবে? আমি না খেলে খাবি নে? বেশ, খাচ্ছি—' বলে গ্রাসের খানিকটা নিজের মুখের মধ্যে পুরে দিলে। পরে উচ্ছিষ্টাংশ মা'র মুখে দিয়ে বললে, 'নে, এবার খা। আমি তো খেলাম—'

হৃদয় স্তম্ভিত। নিঃসন্দেহ, বদ্ধ পাগল হয়েছে মামা। ফুল-বেলপাতা মায়ের পায়ে না দিয়ে নিজের পায়ে রাখছে। মাকে পূজা না করে নিজেকে পূজা করছে। সর্বনাশ! সেজবাবু দেখতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না। এক ধমকে চাকরি

থেকে বরখাস্ত করে দেবেন। হৃদয়েরও অন্ন উঠবে সঙ্গে-সঙ্গে।

শুধু পাগল নয়; কাঁধে ভূত চেপেছে মামার। নইলে দেবতাকে নিয়ে এ কী শুরু করেছে ছেলে-খেলা! মা'র চিবুক ধরে আদর করছে, কথা কইছে, ঠাট্টা-তামাশা করছে। মা যেন সসম্ভ্রম দূরত্বের জিনিস নয়, একেবারে কোলে চড়ে বসবার জিনিস। যেন অনম্য প্রণম্য নয়, আদর-ভালোবাসার কাঙাল। যেন বিধির বাঁধনে দরকার নেই, যেন গুটি-গুটি পায়ে আর এগুতে হবে না, ভয়ে ভয়ে মাকে সিংহাসনে বসিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে লুটোতে হবে না আর চৌকাঠের বাইরে। সটান সিংহাসনে উঠে তার কোলে চড়ে বসতে হবে। সেই মা—যে ত্রিজগৎ-প্রসবিনী—সেই মা'র কোলে কোলের শিশু হয়ে চড়ে বসব। আমি উঠবন্দি রায়ত না হয়ে ক্ষেমংকরীর খাস তালুকের প্রজা হব। এই যে মা'র কোলে চেপে বসেছি—এ হচ্ছে "ক্ষেমার খাসে আছি বসে, আমার মহালে নাই শুখা-হাজা।" যিনি জগৎরঙ্গিণী তাঁর সঙ্গে ঘরের ভাষায় রঙ্গ-রহস্য করব। মা যে আমার সহজ মানুষ। সহজ না হলে সহজ মানুষকে চিনব কি করে?

গদাধরের মুখ-চোখ লাল। যেন মদ খেয়েছে আকণ্ঠ। টলে-টলে নাচছে আর গান গাইছে: 'সুরাপান করি নে রে, সুধা খাই রে কুতুহলে। আমার মন-মাতালে মেতেছে আজ, মদ-মাতালে মাতাল বলে॥' সরাসরি গান শোনাচ্ছে মাকে। মা'র হাত ধরে নেচে বেড়াচ্ছে:

"আর ভুলালে ভুলব না গো,
ভয়ে হেলব না গো দুলব না গো—
প্রসাদ বলে, দুধ খেয়েছি
ঘোলে মিশে ঘুলব না গো॥"

রাত্রে ঘুম নেই। ভাবের ঘোরে কার সঙ্গে কথা কয়। কখনো বা গান শোনায়। 'ঘুমুবে না মামা?'

দুই চোখে ধারা, গান ধরে গদাধর:

"ঘুম ছুটেছে, আর কি ঘুমাই,
যোগে যাগে জেগে আছি।
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে
ঘুমেরে ঘুম পাড়িয়েছি।
যে দেশে রজনী নাই,
সেই দেশের এক লোক পেয়েছি॥"

pathagar.net

কোনো দিন বা মন্দিরে মাকে শয়ন দিচ্ছে, হঠাৎ সেই শূন্যরূপাকে উদ্দেশ করে বলে উঠল গদাধর : 'আমাকে তোর কাছে শুতে বলছিস ? আচ্ছা, শুচ্ছি তোর বুকের কাছে।' মা'র সর্ব অঙ্গে বাৎসল্য, দুই চোখে স্নেহসিঞ্চিত লাবণী। হাত-পা গুটিয়ে ছোট্টটি হয়ে মা'র রূপোর খাটে শুয়ে পড়ল গদাধর। নীল-নিবিড় মেঘমণ্ডলের কোলে ক্ষীণ শশিকলা।

ভোগ নিবেদন করছে, কালীঘরে এক বেড়াল এসে উপস্থিত। ঘুরছে আর মিউ-মিউ করছে। ওমা, মা এসেছিস ? খাবি মা ? খা। ভোগের অন্ন বেড়ালকে খাওয়াতে বসল গদাধর।

গণেশ একবার মেরেছিল একটা বেড়ালকে। ভগবতী বললেন, তুই আমাকে মেরেছিস। আমার সর্ব অঙ্গে যন্ত্রণা। সে কি কথা! গণেশ তো হতবুদ্ধি। মাকে সে মারবে ? এই ছাখ, তোর মারের দাগ আমার গায়ে ফুটে রয়েছে। লজ্জায়, অনুশোচনায় মাটির সঙ্গে মিশে গেল গণেশ। যা মার্জারী তাই ভগবতী।

রাত্রিতে তো মন্দিরে আলো জ্বলে। মা যদি আসেন, ঘরের মধ্যে চলাফেরা করেন, তবে দেয়ালে তাঁর ছায়া পড়ে না কেন ? ভাবে হৃদয়। মাকে দেখার পুণ্য করিনি কিন্তু দেয়ালে তাঁর ছায়া দেখতে দোষ কি !

দিব্য অঙ্গের ছায়া থাকবে কি ? সে অচক্ষু হয়েও দেখে, অকর্ণ হয়েও শোনে। অস্পর্শ হয়েও কোলে নেয়।

বিশুদ্ধ পাগলামো। তাই বলে হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলে না এ কেলেঙ্কার। দেব-দেবী নিয়ে এই চপল ছেলেমানুষি। আগে নিজের পায়ে ঠেকিয়ে পরে মায়ের পায়ে ফুল দেওয়া। আগে নিজে খেয়ে মাকে এঁটো খাওয়ানো। খাটের উপর মা'র পাশেই শুয়ে পড়া। মা'র চিবুক ধরে ফষ্টি-নষ্টি করা। অসম্ভব এই অনার্যতা। একটা বিহিত করতে হয়। জানাতে হয় সেজবাবুকে।

কালীঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়ায় এসে সব মন্দিরের আমলারা। খাজাঞ্চি আর গোমস্তা, নায়েব আর আটপ্রহরী। কি-রকম যেন আবিষ্টের মতন চেয়ে থাকে। গদাধরের ধরন-ধারণ সব বিভূত তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আন্তরিকতায় ভরা। যা কিছু করছে যেন অকপটে করছে। বিশ্বাস বেশি বলেই যেন এত সাহস। আর ঐ যে উন্মনা ভাব ও যেন ঠিক উন্মাদের ভাব নয়।

সবাই শাসন-বারণ করতে এসেছিল। মুখস্ফুট করতে পেল না। দপ্তরে ফিরে পরামর্শে বসল—কি করা! আর কি করা! জানবাজারে খোদ মালিকের দরবারে দরখাস্ত দিতে হয়। যাই বলো, না হচ্ছে বিধিমত পূজা, না হচ্ছে ভোগরাগ।

অশাস্ত্রীয় অকাণ্ডের জন্যে শেষকালে না কোনো অঘটন ঘটে!

মথুরবাবু লিখে পাঠালেন, দাঁড়াও, আমি নিজে গিয়ে সব ব্যবস্থা করছি।

এবার তল্পি বাঁধো। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। অনাচারের দণ্ড নাও। কাউকে কিছু না বলে পুজোর মধ্যে মন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন মথুরবাবু। সটান ঢুকে পড়লেন কালীঘরে। ঢুকে যা দেখলেন, তা নরদেহে দেখবেন বলে কল্পনা করেননি। গদাধর তন্ময়মনোময় হয়ে পূজা করছে। কোনো দিকে লক্ষ্য নেই, লজ্জা নেই। যে মথুরবাবুর নিশ্বাসের আভাসে আর সবাই শশব্যস্ত, সে মন্দিরে এল বা চলে গেল, ভ্রূক্ষেপ করে না গদাধর। তার সমস্ত নিবেশ-নিক্ষেপ মা'র উপরে। কখনো কাঁদছে আকুল হয়ে, কখনো বা চেঁচিয়ে উঠছে আনন্দে। তন্ময় হয়ে গান গাইছে কখনো, কখনো বা ধ্যানে নিঃসংজ্ঞ হয়ে যাচ্ছে। মা'র সঙ্গে কথা কইছে নির্ভয়ে। অভিমান করছে, আবদারে ছেলের মত আখখুটেপনা করছে।

এ কি দেখছেন মথুরবাবু!

তাঁর দুই হাতে কি কোনো শাসনের উদ্যতি ছিল? হঠাৎ সেই দুই হাত তাঁর অঞ্জলিবদ্ধ হল কেন?

ঘুমঘোর ভাঙবে এবার মা'র। পাষাণী এবার প্রাণময়ী হয়ে উঠবে। আর ভাবনা নেই। মিলেছে ওস্তাদ বাজীকর। ঘুম-ভাঙানো বাঁশিওয়ালা।

যেমন এসেছিলেন তেমনি ফিরে গেলেন চুপি-চুপি। জানবাজার থেকে ফরমান পাঠালেন, গদাধরকে যেন বাধা দেওয়া না হয়। যেমন তার খুশি তেমনি ভাবেই পুজো করুক মাকে।

সীমা ছেড়ে চলে এসেছে সে অসীমায়। মাটির উপরকার বাঁধা-ধরা লাইন-ফেলা রাস্তা ছেড়ে সে চলে এসেছে আকাশের অনাবৃতিতে। ক্রিয়াকর্মের শাস্ত্র থেকে সর্বার্পণের অশাসনে। বৈধীভক্তি থেকে পরমপ্রেমরূপা ভক্তিতে। শুধু সন্তরণে নয়, নিমজ্জনে। ইন্দ্রিয়বিষয়ে অবিবেকীর যেমন আগ্রহ সেই "পরানুরক্তিরীশ্বরে"। সর্ববন্ধনবিমোচনে।

'মা-মা যে করো, মাকে দেখতে পাও তুমি?' নরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করল ঠাকুরকে। জিজ্ঞাসার মধ্যে যেন বা একটু অবিশ্বাসের রহস্য।

'দেখতে পাই কি রে! মা'র সঙ্গে বসে কথা কই খাই, মা'র পাশটিতে শুয়ে ঘুমুই—'

নরেন্দ্রের স্বরে তখনো প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ: 'ঈশ্বরকে দেখা যায় কখনো? কোথায় সে?' নিচে, উপরে, পিছনে, সামনে, দক্ষিণে, উত্তরে—স এবেদং সর্বমিতি।

ভিতরে বাইরে—বহিরন্তশ্চ ভূতানাম্। আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত তিনি। অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষু অবস্থিতং। দেখবি বৈকি, নিশ্চয়ই দেখবি। তোর এমন চক্ষু, তুই দেখবি নে?

প্রতাপ হাজরা দক্ষিণেশ্বরে আস্তানা গেড়েছে। সে হচ্ছে নগদ-বিদায়ের সাধু। তার মানে ধর্ম-কর্ম করে কিন্তু সব সময়েই প্রত্যাশা করে কিছু চাল-কলা। যদি কিছু পার্থিব উপকার না হয় তবে কি হবে এ-সব জপতপে? সব খাটনিরই মুনাফা আছে আর এর বেলাই শুধু লবডঙ্কা! যদি জপতপ করে কিছু সিদ্ধাই হয় তবে হয়তো সংসারের অবস্থাটা ফেরানো চলে। মনে-মনে এই কামনা নিয়েই বসেছে পূজার্চনায়।

'হাজরা শালার ভারি পাটোয়ারি বুদ্ধি!' ঠাকুর সাবধান করে দিতেন ভক্তদের, 'ওর কথা শুনিস নে তোরা কেউ।'

কিন্তু হাজরার কথা নরেনের মন্দ লাগে না। এই লাভ লোকসান খতিয়ে দেখার কথা। যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়ে স্পর্শসহ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছুনো। স্তবের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবেরও হিসেব নেওয়া। দেহ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সন্দেহ তো থাকবেই। হাজরার কথা তাই একেবারে ফেলনা নয়।

'যো কুছ হ্যায় সো তুহি হ্যায়—এ গানটা গা তো রে, নরেন।' ঠাকুর ফরমাশ করলেন।

নরেন গান ধরল। তাকে দিয়ে গান গাইয়ে ছাড়লেন ঠাকুর।

সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। যা কিছু তুই দেখছিস তোর চোখের সামনে, সব তিনি। গাছ পাখি মানুষ পশু, সব। আকাশ মাটি বাতাস আগুন জড় চেতন—সমস্ত। নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্। তিনি সর্বব্যাপী। সর্বাতীত। স্বয়ং-প্রকাশ। কে ঈশ্বর?

কে ঈশ্বর! অল্পতার শেষ সীমা পরমাণু আর বৃহতের শেষ সীমা আকাশ। তেমনি জ্ঞান-ক্রিয়াশক্তির অল্পতার পরাকাষ্ঠা ক্ষুদ্র জীব, আর তার আতিশয্যের পরাকাষ্ঠা ঈশ্বর।

সহজ করে বলুন।

সহজ করে বলব! ঈশ্বর কে তাই জানতে চেয়েছিস? সহজ করেই বলি। "তত্ত্বমসি"। অর্থাৎ তুই-ই সেই। হাসতে লাগলেন ঠাকুর।

তবু সংশয় যায় না নরেনের।

সংশয় থাকলেই মীমাংসা। নির্ণয় তো সংশয়সাপেক্ষ। সংশয় আছে বলেই সংসারবিচার। আত্মবিচার। থাক, থাক তুই সংশয়ে।

নরেন বারান্দায় এসে বসল হাজরার কাছে। তামাক সাজছে হাজরা। হুঁকোটা বাড়িয়ে দিল নরেনের হাতে। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে নরেন বললে, 'বলে কি অসম্ভব কথা! এ কখনো হতে পারে?'

'কি বলে?' হাজরা কটাক্ষ করল।

'বলে কিনা, ঘটি বাটি থালা গ্লাস সব কিছু ঈশ্বর। যা কিছু দেখছি চোখ মেলে তাই নাকি তাই। এমন কি আপনি আমি—আমরাও নাকি—'

হাসির রোল তুলল হাজরা। পাগল আর কাকে বলে! সে ব্যঙ্গের হাসিতে নরেনও যোগ দিলে।

ঘরের মধ্যে ঠাকুরের তখনো অর্ধবাহ্যদশা। সে সব্যঙ্গ হাসির শব্দ তাঁর কানে এল। তিনি নিমেষে বালকের মতন হয়ে গেলেন। পরনের কাপড়খানি বগলে নিয়ে বেরিয়ে এলেন বারান্দায়।

'কি বলছিস রে, নরেন?' হাসতে হাসতে কাছে এসে নরেনকে ছুঁয়ে দিলেন ঠাকুর। ছুঁয়েই সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

আর নরেন? নরেনের কি হল?

কি যে হল কে বলবে! চোখের সমুখ থেকে একটা পর্দা উঠে গেল। যেন চেতনান্তর হল। নিমস্থ দুই চোখ বুজে গিয়ে জেগে উঠল ললাটোর্ধ্ব তৃতীয় নয়ন। চেয়ে দেখল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই। ধূলিকণা থেকে আকাশ-বিকাশ সূর্য পর্যন্ত সব কিছু ঈশ্বর।

এ কি, চোখে ঘোর লাগল নাকি! চোখ বুজল নরেন। অন্ধকারেও সেই ঈশ্বর। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল নরেন।

বাড়িতে এসেও সেই ভাব। ইট কাঠ দরজা চৌকাঠ সব প্রাণময়। খেতে বসল, মনে হল থালা-বাটি, ভাত-ডাল সব কিছুর মধ্যে ঈশ্বর বসে আছেন। যিনি পরিবেশন করছেন আর যে খাচ্ছে দুই-ই তিনি। ভাতের থালার সামনে নিস্পন্দের মত বসে রইল নরেন। 'কি রে, বসে আছিস কেন? খা!' মা মনে করিয়ে দিলেন। খেতে শুরু করল নরেন। কিন্তু যে খাচ্ছে সে কে! যাকে খাচ্ছে তাই বা কি!

ভোর হল তবুও ঘোর গেল না। কলেজে চলেছে, রাস্তায় বেরিয়েও সেই বিচিত্র অনুভূতি। সর্বানন্দপ্রদাতা ঈশ্বর সমস্ত কিছুর মধ্যে জাগ্রত হয়ে আছেন। প্রায় গায়ের উপর গাড়ি এসে পড়ছে, তবু সরবার প্রবৃত্তি হয় না, মনে হয় গাড়িও যা সেও তাই, দুই-ই ঈশ্বরপূর্ণ। বিকেলে হেদোর ধারে বেড়াতে বেরিয়ে লোহার রেলিঙে মাথা ঠুকছে নরেন: বল্, তুই কে? তুই কি ঈশ্বর?

কোথাও কি রন্ধ্র নেই, অন্ত নেই? জাগরণে যে আছে সে কি স্বপ্নেও আছে? সুষুপ্তিতেও কি সেই? আর সব কিছুর অন্তরালেও কি সেই এক অখণ্ড-স্বরূপ?

সব সেই এক। সাপ চুপ করে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকলেও সাপ, আবার তির্যক-গতি হয়ে এঁকে-বেঁকে চললেও সাপ। নিত্যেও যিনি লীলায়ও তিনি। সব একাকার।

শুধু ঈশ্বর দেখছি এ হলেই চলবে না। তাঁকে ঘরে আনতে হবে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে হবে। রাজাকে তো অনেকেই দেখে পথে দাঁড়িয়ে। কিন্তু বাড়িতে এনে খাওয়াতে-দাওয়াতে পারে দু-একজন।

নরেন আকুল হয়ে উঠল। আমি কি পথে দাঁড়িয়ে রাজা দেখব? আমি কি তাঁকে টেনে আনতে পারব না ঘরের মধ্যে?

॥ ১৩ ॥

গদাধরের সমস্ত শরীরে ভীষণ জ্বালা। প্রায় ছ'মাস ধরে ভুগছে।

নানান ধরনের কবরেজি তৈল এনে দিলে হৃদয়। গায়ে-মাথায় মাখিয়ে দিলে। কিছুতেই কিছু হল না।

পঞ্চবটীতে বসে ধ্যান করছে গদাধর, হঠাৎ তার শরীর থেকে কে একজন বেরিয়ে এল। খুচখুচে কালো, চোখ দুটো লাল, ভয় পাওয়াবার মতন চেহারা। নেশা-খোরের মত টলে-টলে পড়ছে। আরো একজন বেরিয়ে এল পিছু-পিছু। পরনে গেরুয়া, হাতে ত্রিশূল, প্রশান্ত মূর্তি। সেই ঘোরদর্শন কদাকারকে সে আক্রমণ করলে, নিপাত করলে। পাপ-পুরুষ ভস্ম হয়ে গেল।

মথুরের কাছে রানি শুনলেন সব কাণ্ডকারখানা। ঠিক করলেন একদিন গদাধরকে দেখে আসবেন নিজের চোখে। তাই এসেছেন।

গঙ্গায় স্নান করে ঢুকেছেন মন্দিরে। মা'র মূর্তির কাছে বসেছেন শান্ত হয়ে। গদাধরের গান বড় ভালো লাগে। তাই বললেন, একটা গান ধরো।

গান ধরল গদাধর। রানি ধ্যানে চোখ বুজলেন।

হঠাৎ বলা-কওয়া নেই, গদাধর রানির গায়ে এক চড় বসিয়ে দিল। ধমকে উঠল, 'এখানেও ঐ চিন্তা?'

রানি হকচকিয়ে উঠলেন। এস্টেট নিয়ে একটা কঠিন মামলা চলছে, তারই কথা ভাবছিলেন ধ্যানে বসে। কিন্তু, তাই বলে সামান্য একজন মন্দিরের পুরোত তাঁর গায়ে হাত তুলবে নাকি?

pathagar.net

মন্দিরের খাজাঞ্চি-গোমস্তারা উৎসুক হয়ে উঠল। এবার নির্ঘাত বরখাস্ত হবেন বাছাধন।

কথাটা মথুরবাবুর কানে তুললে। বিরক্ত হলেন অত্যন্ত। একি অশোভন ব্যবহার! হৃদয় ছুটে এল মামার কাছে। ভীতকণ্ঠে বললে, 'এ তুমি কি করেছ!'

গদাধরের মুখে নির্মল প্রশান্তি। 'আমি তার কি জানি! মা বললেন, এখানে এসেও ও বিষয়সম্পত্তি ভাবছে, এক ঘা বসিয়ে দে পিঠের উপর। তাই বসিয়ে দিলাম। মা'র কথা অমান্য করি কি করে?'

মথুরবাবুকে ডেকে পাঠালেন রাসমণি। বললেন, 'ঠিকই করেছে গদাধর। ওর হাত দিয়ে মা আমাকে শাসন করেছেন।'

সত্যি?

'হ্যাঁ, আর সেই আঘাতে হৃদয় আলো করে দিয়েছেন।'

ভক্তি-ভাবের পাঁচটি প্রদীপ। শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর মধুর। পঞ্চ-ভাবেই সাধনা করছে গদাধর।

শান্ত হচ্ছে ঐকাত্মজ্ঞান। নির্গুণ সাধন। স্বস্থ, নির্লিপ্ত, ব্রহ্মনিষ্পন্ন হয়ে বসে থাকো। আরগুলো গুণাত্মক, রাগরঞ্জিত। দাস্য হচ্ছে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি হনুমানের ভাব। সখ্য হচ্ছে বাসুদেবের প্রতি অর্জুনের। বাৎসল্য হচ্ছে গোপালের প্রতি যশোদার। আর মধুর হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপিনীর।

যার যেমন ভাব সে তেমনি দেখে। তমোগুণী ভক্ত নিজে মাংস খায়, তাই ভাবে মা-ও পাঁঠা খাবে—তাই বলিদান দেয়। রজোগুণীর বিস্তারে-বিলাসে বিশ্বাস, তাই সে নানান ব্যঞ্জনে ভোগ সাজায়। সত্ত্বগুণীর জাঁক নেই জৌলুস নেই। তার পুজো লোকে জানতেও পারে না। ফুল নেই তো বেলপাতায় আর গঙ্গা-জলে পুজো করে। শীতল দেয় দু'টি মুড়কি কি বাতাসা দিয়ে।

আর আছে ত্রিগুণাতীত ভক্ত। যে শুধু নাম করে। ঈশ্বরের নাম করাই তাঁকে পুজো করা।

শান্ত হচ্ছে ঋষিদের ভাব। সানন্দভাবে পরিতুষ্ট। ভিক্ষান্নমাত্রে খুশি, ছেঁড়া কাঁথাই যেন লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য। শুধু মূল তরুতে আশ্রয়। শুধু আদি নিয়ে আছে, অন্ত-মধ্যের ধার ধারে না। "অহর্নিশং ব্রহ্মণি যে রমন্তঃ" —সেই যোগীর ভাব। আর দাস্য হচ্ছে বলবানের ভাব। রামের কাজ করছে হনুমান, শত সিংহের শক্তি তার শরীরে। কে অত বাছ-বিচার করে, গোটা গন্ধমাদনই নিয়ে এল। দ্বারকায় এসে হনুমান বললে, আমি সীতারাম দেখব। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, এখানে সীতাকে পাবে কোথায়? তা জানি না। তুমি যখন আছ তখন সীতাকেও

চাই। শ্রীকৃষ্ণ তখন রুক্মিণীকে বললেন, 'তুমি সীতা হয়ে বোস, তা না হলে হনুমানের কাছে রক্ষে নেই।' সীতার পাতালপ্রবেশের সময় এমন অবস্থা, রামকেই প্রায় মারতে যায়।

ধনমান দেহসুখ কিছুই চায় না, শুধু ঈশ্বরকে চায়। স্ফটিক স্তম্ভ থেকে ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে পালাচ্ছে, মন্দোদরী অনেক রকম ফল দেখিয়ে লোভ দেখাতে লাগল। ভাবলে ফলের লোভে যদি অস্ত্রটা ফেলে দেয়। কিন্তু হনুমান কি ভোলবার ছেলে? বললে, আমার শ্রীরামই কল্পতরু, আমার কি ফলের অভাব? লঙ্কাজয়ের পরে অযোধ্যায় ফিরেছেন রাম-সীতা। কত মিলন-উৎসব, কত আনন্দ-কোলাহল, পরিত্যক্তের মত এক কোণে পড়ে আছেন কৈকেয়ী। কই কই, আমার কৈকেয়ী-মা কই? হনুমান এসে তাঁকে সংবর্ধনা করলে। ভাগ্যিস তুমি রামকে পাঠিয়েছিলে। বনের মানুষ হয়ে তাই মনের মানুষকে পেলাম।

ঈশ্বরের আনন্দে মগ্ন হলে ভক্তের আর হিসেব থাকে না। একজন এসে হনুমানকে জিজ্ঞেস করলে, 'আজ কোন্ তিথি?' হনুমান বললে, 'কে তোমার বার-তিথির খোঁজ রাখে। রাম ছাড়া আর কিছু জানি না।'

আর সখ্যভাব কেমন জানো? এই—এসো ভাই এসো, কাছে এসে বোসো। অনেক দূর থেকে এলে বুঝি, বোসো, পাখার হাওয়া করি। হাত-মুখ ধোও, খাও পেট ভরে। গল্প করো।

বাৎসল্য ভাবে যশোদা ননী হাতে করে বেড়াতেন কখন গোপাল খেতে চাইবে। বলতেন, আমি না দেখলে গোপালকে দেখবে কে? তার অসুখ করবে। উদ্ধব বললে, 'মা, তোমার কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান, তিনি জগৎচিন্তামণি।' যশোদা বললেন, 'ওরে, তোদের চিন্তামণিকে চিনি না, আমার গোপাল কেমন আছে তাই বল।'

কার কি জানি না, আমার গোপাল।

আর মধুর ভাব শ্রীমতীর ভাব, গোপিনীর ভাব। মেঘ কি ময়ূরকণ্ঠ দেখছেন আর কৃষ্ণময় হয়ে যাচ্ছেন। চৈতন্যদেব মেড়গাঁ দিয়ে চলেছেন, শুনলেন এ গাঁয়ের মাটিতে খোল হয়। যেমনি শোনা অমনি ভাবাবেশ। এ ভাব মহাভাব।

কি নিষ্ঠা গোপিনীদের! মথুরায় দ্বারীকে অনেক কাকুতি-মিনতি করে তো সভায় ঢুকল। কিন্তু কৃষ্ণ কোথায়? দ্বারী নিয়ে গেল কৃষ্ণের কাছে। কৃষ্ণ পাগড়ি মাথায় দিয়ে বসে আছে। গোপিনীরা মুখ নামিয়ে রইল—এ আবার কে! এর সঙ্গে কথা কয়ে আমরা কি শেষে দ্বিচারিণী হব? চল ফিরে যাই।

আমাদের সেই পীতধড়া মোহনচূড়া-পরা কৃষ্ণ কোথায়? আমরা তাকে চাই।
দক্ষিণেশ্বরে প্রায়ই আসত এক পাগলি। কি নাম কোথায় থাকে কেউ জানে না। এসে ঠাকুরকে শুধু গান শোনাবে। বাধা দিলে বড় জ্বালাতন করে ভক্তরা তাই ত্রস্ত থাকে সব সময়। একদিন কাছে এসে কান্না শুরু করল। সে কি কান্না! ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, 'কাঁদছিস কেন?'
পাগলি বললে, 'মাথা ধরেছে।' এই অজুহাতে কাছটিতে বসে রইল।
আরেক দিন, ঠাকুর খেতে বসেছেন, কোত্থেকে হঠাৎ পাগলি এসে হাজির। বললে, 'দয়া করলেন না? মনে ঠেললেন কেন?'
ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর কি ভাব?'
পাগলি বললে, 'মধুর ভাব।'
'ওরে, আমার যে সন্তান ভাব। আমার যে সব মেয়েরা মা হয়।'
'তা আমি জানি না। সে খবরে আমার কাজ নেই।'
গিরিশ ঘোষ শুনছিলেন ঠাকুরের মুখে। বললেন, 'পাগলি ধন্য, কৃতার্থজন্ম। পাগলই হোক আর মারই থাক ভক্তদের হাতে, সর্বক্ষণ তো আপনাকেই চিন্তা করছে। আপনাকে চিন্তা করে—আমিই বা কি ছিলাম আর কি হলাম!'
গদাধরের এখন দাস্য ভাব। হনুমানের ভাব। রঘুবীরের সেবক মহাবীর।
অহং তো যাবে না সহজে। তাই বলি, থাক, দাস-আমি হয়ে থাক। তুমি প্রভু আমি দাস। তুমি সেব্য আমি সেবক। তুমি রাজাধিরাজ আমি অকিঞ্চন।
হনুমানের ধ্যানে ডুবে গিয়ে হনুমানের মতই হয়ে গেল গদাধর। পরনের কাপড়টা কোমরে বেঁধেছে আর পিছনের দিকে লেজ দিয়েছে ঝুলিয়ে। হাঁটে না, লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। বেশির ভাগ সময়ই গাছে উঠে বসে থাকে। খোসা না ছাড়িয়ে না কেটে আস্ত-আস্ত ফল খায়। আর আওয়াজ করে, রঘুবীর, রঘুবীর।
হনুমানের সাধনায় মেরুদণ্ডের প্রান্তভাগটা এক ইঞ্চি বেড়ে গিয়েছিল গদাধরের। সে ভাব চলে যাবার পর আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়।
পঞ্চবটীতে শূন্যমনে চুপচাপ বসে আছে গদাধর, হঠাৎ জায়গাটা আলো হয়ে গেল। চেয়ে দেখল এক অপূর্বসুন্দরী নারী সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে অপরূপ লাবণ্য, বেদনা করুণা ক্ষমা ও ধৃতির স্নিগ্ধতা। কে তুমি? উত্তর দিক হতে গদাধরের দিকে এগিয়ে আসছে দক্ষিণে। চোখে সেই প্রসন্ন দাক্ষিণ্য। কে তুমি?
সহসা কোত্থেকে এক হনুমান উপ করে লাফিয়ে পড়ল সেখানে।

চিনতে আর দেরি হল না। রামময়জীবিতা সীতা দেবী এসেছেন।

'মা' 'মা' বলে পায়ে লুটিয়ে পড়তে যাচ্ছে গদাধর, অমনি সেই মূর্তি তার দেহের মধ্যে ঢুকে পড়ল। গদাধর লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

পঞ্চবটীর কাছেই হাঁসপুকুর। সে পুকুর ঝালাতে গিয়ে বাড়তি মাটি ফেলা হয়েছে এই পঞ্চবটীর গর্ভে। ফলে আমলকী গাছটা আর রইল না। মারা পড়ল।

ওরে হৃদে, আমার বসবার জায়গার একটা বন্দোবস্ত কর।

গদাধর নিজেই অশ্বত্থের চারা লাগাল। হৃদয় নিয়ে এল বট অশোক বেল আর আমলকী। তুলসী আর অপরাজিতার চারা পুঁতে জায়গাটা ঘিরে দিলে। ক'দিনেই ঘন ঝোপ হয়ে উঠল। ভিতরে ধ্যানে বসলে কেউ দেখতে পায় না বাইরে থেকে।

ওরে হৃদে, ছাগলে-গরুতে ঝোপঝাড় সব খেয়ে ফেললে যে। নতুন লাগানো গাছেরও চারাতেও দাঁত বসিয়েছে। ওরে, কাঠ-বাঁশ দিয়ে শক্ত করে বেড়া লাগা —কাঠ-বাঁশ কই? হৃদয় ফাঁপরে পড়ল। দড়ি-পেরেক কই?

কোথা থেকে কি হয়ে গেল কেউ টের পেল না।

প্রবল জোয়ারের জলে গঙ্গার এ-পারে ঠিক মন্দিরের ঘাটের সামনে এক বোঝা কাঠ-বাঁশ আর দড়ি-পেরেক ভেসে এসেছে।

যে ঠিক রাজার বেটা সে মাসোয়ারা পায়।

জলে যদি মুখে রাম নাম বলতে বলতে হাত দিয়ে ফের কাপড় সামলাস, তাহলে জলে না। জানিস সে গল্পটা?

চারদিক অন্ধকার করে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। বুড়ী গয়লানির নদী পার হয়ে দুধ যোগাতে যেতে হয়। সেদিন দুর্যোগে পারাপারের নৌকো পেল না। রাম-নামের কথা মনে পড়ল। ভাবলে, রাম-নামে ভবসমুদ্র পার হয়, আর আমি এই ছোট্ট নদীটা পার হতে পারব না? নিশ্চয় পারব। রাম-নাম করতে করতে নদী পার হয়ে গেল বুড়ী। যে বাড়িতে দুধ দেয় সে এক পণ্ডিত। সে তো অবাক, এ দুর্যোগে বুড়ী নদী পার হল কি করে? কেন বাবাঠাকুর, রাম-রাম করে পার হয়ে এলুম। ওপারে কি কাজ ছিল পণ্ডিতের। বললে, বলিস কি রে? আমিও অমনি রাম-রাম করে পার হতে পারব? কেন পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে। দু'জন এল নদীর ধারে। বুড়ী রাম-রাম করে পার হতে লাগল। পণ্ডিতও রাম-রাম করে এগুতে লাগল, কিন্তু জলে নেমেই কাপড় গুটিয়ে নিলে। বুড়ী বললে, ঠাকুর, রাম-রামও করবে আবার কাপড়ও সামলাবে

—তা হবে না। পণ্ডিত পড়ে রইল পিছনে। দিব্যি পার হয়ে গেল বুড়ী।
যদি ধরবি তো এমনি আঁকড়ে ধরবি। বিশ্বাস চাই। সরল বিশ্বাস। অন্ধ বিশ্বাস।
হাজরা টিপ্পনী কাটল : অন্ধ বিশ্বাস?
নিশ্চয়ই। বিশ্বাসের তো সবটাই অন্ধ। বিশ্বাসের আবার চোখ কি! ছিদ্র কি! হয় বল, বিশ্বাস; নয় বল, জ্ঞান। জ্ঞান দুরূহ, বিশ্বাস সোজা। মা'র কাছে কেঁদে কেঁদে বল, মা, আমাকে ভক্তি দে, বিশ্বাস দে।

॥ ১৪ ॥

দিনে-দিনে পাগলামি বেড়েই চলেছে গদাধরের।
মথুরবাবু পর্যন্ত বিচলিত হলেন। নিশ্চয়ই কিছু স্নায়ুবিকার ঘটেছে।
কলকাতার সেরা কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনকে ডেকে আনালেন।
কা কস্য পরিবেদনা। গঙ্গাপ্রসাদ বিফল হল। তবু গঙ্গাপ্রসাদকে ধন্বন্তরি বলেই মানতেন ঠাকুর। ঈশ্বরের বিভূতি না থাকলে কি অত বড় চিকিৎসক হয়? যেখানেই গুণের বিকাশ, সেখানেই ঈশ্বরের বিভূতি। সেখানেই নত হবি।
'গঙ্গাপ্রসাদ বললে, আপনি রাতে জল খাবেন না। আমি ঐ কথা বেদবাক্য বলে ধরে রেখেছি। আমি জানি ও সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি।'
ধন্বন্তরিতে যখন কিছু হল না তখন নিজেই নিজেকে সামলে চলুন। আইন-কানুনের মধ্যে নিয়ে আসুন নিজেকে। ছাড়ুন এ সব খেয়ালিপনা।
'ঈশ্বর যে ঈশ্বর—সে পর্যন্ত তার নিজের আইন মেনে চলে।' বললেন মথুরবাবু। 'নিজের নিয়মকে লঙ্ঘন করার তাঁর ক্ষমতা নেই।'
গদাধর থমকে গেল। সে কি কথা? যে আইন তৈরি করেছে সে ইচ্ছে করলে ত রদ-বদল করতে পারে না? সে কি স্বাধীন নয়?
কি করে হবে? নিজে নিয়ম করে নিজেই আবার তা ভাঙলে নিজের কাছে কি জবাবদিহি দেবেন?
বা, সব তাঁর খেলা যে। ভাঙা-গড়ার খেলা। তাঁর কাছে আবার নিয়ম কি! তিনি সমস্ত নিয়মের বাইরে।
কিছুতেই মানলেন না মথুরবাবু। বললেন, 'লাল ফুলের গাছে লাল ফুলই হয়, শাদা ফুল হয় না। কই ফুটুক দেখি তো শাদা ফুল।'
ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হলে হতে পারে না এটুকু? অখিললোকনাথের হাত-পা কি নিয়মের নিগড়ে বাঁধা? তিনি কি খর্ব না পঙ্গু?

পরদিন সকালে মন্দিরের বাগানে লাল জবাফুলের গাছে এ কী দেখছে গদাধর! একই ডালে দু'টো ফেঁকড়িতে দু'টি ফুল রয়েছে ফুটে—একটি টুকটুকে লাল, আরেকটি ধবধবে শাদা।

উল্লাসে অধীর হয়ে গদাধর ডালটা ভেঙে ফেলল হাত বাড়িয়ে। চলল মথুরের কাছে। এই দেখ। ঈশ্বর কি অল্প না অক্ষম না আবদ্ধ? কৃপানিধি কি কখনো কৃপণ হতে পারেন?

মথুরবাবু হার স্বীকার করলেন। চেয়ে দেখলেন তাঁর চোখের সামনে তাঁর গুরু দাঁড়িয়ে। যিনি অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যান তিনিও গুরু। যিনি অন্ধকার দেশে আলোর সংবাদ নিয়ে আসেন তিনিও।

যদি তাপ বা আলো চাও, উদ্দীপিত আলোর আশ্রয় নিতেই হবে। যে আধারে জ্ঞান উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে সেই গুরু। গদাধর প্রজ্বলিত অগ্নি।

কিন্তু, যাই বলো, একটু পরীক্ষা করে দেখা যাক।

শরীর ভেঙে পড়ছে গদাধরের, এর কারণ হয়তো ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। নিবৃত্তির কাঠিন্য থেকে যদি ক্ষণিক মুক্তি পায় তাহলে হয়তো সে একটু স্বস্থ-সুস্থ হতে পারে। কিন্তু সরাসরি প্রস্তাব করতে গেলে মুখের উপর প্রত্যাখ্যান করে দেবে গদাধর। এ একেবারে দিবালোকের মত স্পষ্ট। তাই গোপনে ফাঁদ পেতে তাকে বাঁধতে চাইলেন মথুরবাবু।

শহর থেকে দু'টি পতিতা মেয়ে নিয়ে এসে দক্ষিণেশ্বরে গদাধরের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন চুপি চুপি।

গদাধর মূঢ়ের মতন তাকিয়ে রইল তাদের দিকে। সরল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল: 'মা, মা এসেছিস?' বলেই তাদের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল। জগদম্বা তখন পালাতে পারলে বাঁচে!

আরো একদিন চেষ্টা করলেন মথুরবাবু। গদাধরকে নিয়ে কলকাতায় বেড়াতে গেলেন। মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে থামলেন এক বাড়ির কাছে। দোরগোড়ায় অনেকগুলি সাজগোজ-করা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা ঘরে তাদের মাঝখানে গদাধরকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেলেন মথুরবাবু। পালিয়ে গেলেন মানে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন।

আর গদাধর?

"ত্রিয়াঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু—" সকল স্ত্রীলোকের মধ্যেই তিনি, জগজ্জননী। গদাধর মাতৃস্তব শুরু করল। শিশুর মত হয়ে গেল। লোপ পেল বাহ্যসংজ্ঞা। কোলাহল শুরু করল মেয়েগুলো। কান্নার কোলাহল। আত্ম-তিরস্কার। পায়ের

কাছে লুটিয়ে পড়ে কাতর কণ্ঠে বলতে লাগল : আমাদের ক্ষমা করো। আমরা অভাজন, অকিঞ্চন—

গদাধরের মুখে শুধু মাতৃনাম। মা-ই সব হয়েছেন। রাজেশ্বরী হয়েছেন আবার পণ্যাঙ্গনাও হয়েছেন।

গোলমাল শুনে উঁকি মারলেন মথুরবাবু। দেখলেন, শম-দম শৌচ-মৌনের সৌম্য প্রতিমূর্তি গদাধর। সেদিন তিনি যা একবার দেখেছিলেন, তাই। ধূমস্পর্শহীন প্রজ্বলিত বহ্নি।

মেয়ের দল মথুরবাবুর উপর ঝাঁজিয়ে উঠল : 'আপনি বাবাকে এখানে নিয়ে এসেছেন, এই আঁস্তাকুড়ের মাঝখানে? আপনার কি কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই?' লজ্জায় ম্লান হয়ে গেলেন মথুরবাবু। গুরুপ্রাপ্তির গরিমায় অন্তরে লাল হয়ে উঠলেন।

পানিহাটিতে ফি বছর মহোৎসব হয়। বাইশ বছর বয়েস, সেখানে গিয়েছে গদাধর। সেবার সেখানে বৈষ্ণবচরণ গোস্বামীর সঙ্গে তার প্রথম দেখা। বৈষ্ণব-চরণ যেমন পণ্ডিত তেমনি সাধক। ঠাকুরবাটিতে বসে আছে গদাধর, বৈষ্ণবচরণ তাঁকে দেখে লাফিয়ে উঠলেন। চিনে নিলেন এক নিমেষে। অলোকসুন্দর দিব্যপুরুষ।

পাঁচটা টাকা হঠাৎ দিতে চাইলেন গদাধরকে। কি করে আনন্দ জানাবেন যেন বুঝতে পারছেন না। বললেন, 'আম কিনে খাও।'

না, না, টাকা দিয়ে কি হবে? আম না খেলে কি হয়!

বৈষ্ণবচরণ ছাড়বার পাত্র নন। হৃদয়কে গছালেন। আম কেনালেন। বললেন, ভোগ হবে।

তারপর গদাধরকে মাঝখানে বসিয়ে কীর্তন শুরু করলেন। দেখতে-দেখতে সমাধি হয়ে গেল গদাধরের।

সমাধিভঙ্গের পর ভোগের দ্রব্য খেতে দেওয়া হল তাকে। আশ্চর্য, গলা দিয়ে কিছুই গলে না।

এক হাতে মাটি আরেক হাতে কটা টাকা নিয়ে গঙ্গাতীরে বসেছে গদাধর। মনে-মনে ওজন নেবার চেষ্টা করছে, কোনটা ভারি! কোনটার বেশি দাম! টাকা না মাটি, মাটি না টাকা! বিচার করতে-করতে উন্মেষ হল মনের মধ্যে, দুই-ই তুল্যমূল্য, দুই-ই সমান অসার। মাটি আর টাকা দুই-ই একসঙ্গে ছুঁড়ে ফেলল গঙ্গায়। নিঃশেষে নির্মুক্ত হয়ে গেল।

তাঁকে যদি একবার পাই তবে সব কিছুই পেয়ে যাব।

'সব কিছুই পেয়ে যাব।' বললেন ঠাকুর : 'টাকা মাটি, মাটিই টাকা—সোনা মাটি, মাটিই সোনা—এই বলে গঙ্গার জলে ফেলে দিলুম। তখন ভয় হল মা-লক্ষ্মী যদি রাগ করেন! লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য অবজ্ঞা করলুম। যদি খ্যাঁট বন্ধ করে দেন! অমনি বললুম, মা, খোদ তোমায় চাই, আর কিছু চাই না। তোমাকে পেলেই সব কিছু পেয়ে যাব।'

ভবনাথ চাটুজ্জে কাছেই বসে ছিল। হাসতে-হাসতে বললে, 'এ পাটোয়ারি।'

'হ্যাঁ, ঐটুকু পাটোয়ারি।' ঠাকুরও হাসলেন। 'ঈশ্বরানন্দ পেলে কোথায় বা বিদ্যানন্দ, কোথায় বা রমণানন্দ!' বললেন, 'ভক্তের তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে ভগবান দেখা দিলেন। বললেন, বর নাও। ভক্ত বললে, বর দিন যেন সোনার থালে বসে নাতির সঙ্গে ভাত খাই। পাটোয়ার ভক্ত—এক বরে অনেকগুলি মেরে দিলে। ঐশ্বর্য হল, ছেলে হল, নাতি হল—আয়ুও পেল মন্দ নয়।'

তাই তেমন জিনিস সন্ধান করো যা চরম যা চূড়ান্ত, যার আর পরতর নেই। নারাণ বড়-ঘরের ছেলে। অল্প বয়স, ছাত্র, কিন্তু ভগবানে অর্পিতচিত্ত। দক্ষিণেশ্বরে লুকিয়ে-লুকিয়ে আসে। দক্ষিণেশ্বরে আসে বলে অভিভাবকেরা মারে। তবু না এসে পারে না। ঠাকুরের কোলের কাছটিতে তার স্থান।

'মাস্টার', মহেন্দ্র গুপ্তকে জিজ্ঞেস করলেন ঠাকুর : 'একটি টাকা দেবে?'

'কাকে?'

'নারাণকে। দেবে? না কালীকে বলব?'

'আজ্ঞে বেশ তো, দেব।'

'ঈশ্বরে যাদের অনুরাগ আছে তাদের দেওয়া ভালো। তাহলে টাকার সদ্ব্যবহার হয়। সব সংসারে দিলে কি হবে?'

অধরচন্দ্র সেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট—মাইনে তিনশো টাকা। কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান হবার জন্যে দরখাস্ত করেছে—মাইনে হাজার টাকা। অনেক চেষ্টা-চরিত্র করছে যাতে চাকরিটি হয়। সই-সুপারিশ যোগাড় করেছে অনেক।

তবু যেন এগোয় না। প্রতাপ হাজরা এসে বললে ঠাকুরকে, 'অধরের কাজটি হবে, তুমি মাকে একটু বলো।'

অধরও বললে, 'একবারটি বলুন।'

ঠাকুর রাখলেন ওদের অনুরোধ। মাকে একটিবার, একটুখানি বললেন। বললেন, 'মা, অধর তোমার কাছে আনাগোনা করছে, যদি হয় তো হোক না।' বলেই সেই সঙ্গে সঙ্গেই আবার বললেন, 'কী হীনবুদ্ধি মা! জ্ঞান ভক্তি না চেয়ে

তোমার কাছে এই সব চাচ্ছে!'

টাকা গঙ্গায় ফেলে দিয়ে সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে গেল গদাধর। "সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন" হয়ে গেল। আরো কত অভিমান না জানি আছে! কাঙালীরা খেয়ে গেছে, মাথায় করে তাদের পাত ফেলে নিজে ঝাঁটা ধরে জায়গা পরিষ্কার করে দিলে। মেথরের কাজ করতে লাগল স্বচ্ছন্দে। শুধু তাই? কাঙালীদের উচ্ছিষ্টান্ন গ্রহণ করলে প্রসাদজ্ঞানে। শুধু তাই? জিভ দিয়ে চন্দন আর বিষ্ঠা স্পর্শ করলে। সর্বত্র ব্রহ্মস্বাদ।

ভাবাবেশে সর্বদা বিভোর গদাধর। পূজা-সেবার রীতিনীতি দূরস্থান, কালাকালই ঠিক থাকছে না। পূজা না করেই ভোগ দিয়ে দিলে। পূজার ফুল-চন্দন দিয়ে নিজেকেই সাজিয়ে রাখলে। বেলা বয়ে যাচ্ছে, হয়তো ধ্যানই ভাঙল না। ক্রমে ক্রমে কর্মত্যাগ হয়ে যাচ্ছে গদাধরের। আসন্নপ্রসবা গভিণীর মত।

একদিন ভাবাবেশে গদাধর বলে উঠল মথুরবাবুকে: 'আজ থেকে হৃদে পুজো করবে।'

মথুরবাবুর কাছে দৈবাদেশের মত শোনাল। হৃদয় বসল পূজার আসনে।

গদাধরের ছুটি। ছুটি মানে মা'র জন্যে ছুটোছুটি। মা'র জন্যে কান্না।

মাকে দেখতে যদি কখনো একটু দেরি হয় আথাল-পাথাল করে গদাধর। আছাড় খেয়ে পড়ে যায়। কোথায় পড়ল, আগুনে না জলে, তার জ্ঞান নেই। দম আটকে-আটকে আসে, কাটা ছাগলের মত ছট্‌ফট করে। সমস্ত গা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়, ভ্রূক্ষেপ করে না। মাটিতে মুখ ঘষতে ঘষতে কাঁদে আর চেঁচায়: মা, মাগো—

পথ-চলতি লোক বলে, 'আহা, শূলব্যথা উঠেছে বুঝি—'

॥ ১৫ ॥

এ আবার কে এল দক্ষিণেশ্বরে?

গদাধরের খুড়তুতো দাদা, রামতারক চাটুজ্জে। গদাধর নাম রেখেছিল হলধারী। হৃদয়ের মত চাকরির খোঁজে এসেছে। তবে হৃদয়ের মত সে মাঠো নয়। পণ্ডিতপ্রধান। ভাগবত আর গীতা, বেদান্ত আর অধ্যাত্ম রামায়ণ তার নখমুকুরে। মস্ত বড় বৈষ্ণব।

'একটা কাজকর্ম যদি কিছু দেন—' হলধারীর মধ্যে লুকোছাপা কিছু নেই, সরাসরি দাঁড়াল গিয়ে মথুরবাবুর দরবারে।

পরিচয় পেয়ে মোহিত হয়ে গেলেন মথুরবাবু। এ তো চাওয়ার মতই পাওয়া

হয়ে গেল দেখছি। ঈশ্বরের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে গদাধর। পুজো-আচ্চার আর ধার ধারে না আজকাল। কি যে করে আর কি যে করে না সে জানে আর তার মা-ই জানে। 'ভালোই হল।' মথুরবাবু সহজ মানুষের মত নিশ্বাস ফেললেন: 'তুমি কালীঘরের পুজোর ভার নাও।'

প্রথম পংক্তির বৈষ্ণব, শক্তিপূজার ভার নেবে! এক মুহূর্ত দ্বিধা করল হলধারী। আপত্তি কি! শক্তিও যা মধুরতাও তাই। "ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা, বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।" আবার শোনো: "শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গগৃহীতপরমায়ুধে, প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥" 'না' বলবার কিছু নেই।

কিন্তু আর যাই বলুন, গঙ্গাতীরে স্বপাকে রান্না করে খাব।

'কেন, গদাধর তো মা'র প্রসাদ খাচ্ছে আজকাল। তোমার আবার খুঁতখুঁতুনি কেন?' টিপ্পনী কাটলেন মথুরবাবু।

হলধারী হাসল। কার সঙ্গে কার তুলনা! মনে করুন, গোড়ায় গদাধরও গঙ্গা-তীরেই রান্না করে খেয়েছে। এখন সে উঠে এসেছে সাধনার উচ্চস্তরে। এখন সে ইচ্ছে করলে ঠাকুরবাড়ির প্রসাদ কেন, ছোটজাত কাঙালীরও উচ্ছিষ্ট খেতে পারে। তার সইবে, সে এখন সহিষ্ণুতার সমুদ্র। কিন্তু আমার সইবে না। যেটুকু বা নিষ্ঠা আছে তাও যাবে নষ্ট হয়ে।

তার শেষ যুক্তি সারলো খুশি হলেন মথুরবাবু।

কিন্তু, এ কী এক রকম ছল—এদিকে আবার বলি বন্ধ করবার বায়না ধরলে হলধারী। পঞ্চকালের প্রথা, বললেই কি আর বন্ধ করা যায়? ক্ষুণ্ণ হল হলধারী, পূজায় সেই আগাগোড়া আনন্দ যেন খুঁজে পেল না। খোলা হাওয়ায় না থাকলে মন খোলসা হয় কি করে?

একদিন, সন্ধ্যা করছে হলধারী, দেবী ভবতারিণী তার সামনে এসে দাঁড়ালেন, রুদ্ধ হয়েছেন মা, মা'র এখন উল্লাসিনী মূর্তি নয়, প্রচণ্ডিকা মূর্তি। বললেন, 'তোকে আমার আর পুজো করতে হবে না। এমনি আধাখেঁচড়া পুজো যদি করিস তো ছেলের মরা-মুখ দেখবি।'

হলধারী গ্রাহ্য করলে না। ভাবলে চোখে বুঝি ঘোর দেখেছে। হয়তো বা মাথার খেয়াল!

কিন্তু, আশ্চর্য, ক'দিন পরেই খবর এল, মারা গেছে হলধারীর ছেলে।

হলধারী গদাধরের শরণাপন্ন হল। গদাধর বললে, দেবীপূজা ছাড়ান দিন। যেমন করছিল আগে, তেমনই করুক, আপনি যান রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরে।

রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরে এসে হলধারী মধুর ভাবের পরিচর্যায় পরকীয়া নিয়ে

মেতে উঠল। বৈষ্ণব মতে এও এক রকম সাধনা বটে, কিন্তু অপকৃষ্ট, অধোগত সাধনা। ক'দিনেই নানান কথা রটতে লাগল হলধারীর নামে—শুরু হল নানা কানাকানি। কিন্তু কারুর সাধ্য নেই, মুখের উপর বলে কিছু পষ্টাপষ্টি। বিরুদ্ধতা করে। হলধারীকে সক্কলকার ভয়। তার মুখ বড় খারাপ। কথায় কথায় শাপ দেয়। আর সে-শাপ ভীষণ ফলে। বাক্‌সিদ্ধ হলধারী।

কিন্তু গদাধরের কানে এলে গদাধর বরদাস্ত করতে পারল না। দাদাই হোক আর যাই হোক, চলবে না এমন কদাচার। হলধারীকে কড়কে দিল গদাধর।

'কি ? তোর যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা !' হলধারী হুমকে উঠল, 'আমার ভাই হয়ে আমার চেয়ে বয়সে ছোট হয়ে তুই আমাকে শাসন করতে এসেছিস ? তোর মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে।'

আপনি চটছেন মিছিমিছি। আমি আপনার ভালোর জন্যেই বলছিলাম। পাঁচ-জনের কান-কথা থেকে রেহাই পান তারি জন্যে।

হলধারী গুম হয়ে রইল। কথা ফিরিয়ে নিলে না কিছুতেই। যা বলেছি তো বলেছি।

ক'দিন পরে, একদিন সন্ধ্যের পরে গদাধরের মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল সত্যি-সত্যি। কালো, ঘন রক্ত। কতক বেরিয়ে আসছে, কতক জমে থাকছে মুখের মধ্যে। কতক বা দাঁতের গোড়া থেকে ঝুলছে সুতোর মত।

এ কী হল ? রক্ত থামছে না যে ! ঝলকে-ঝলকে বেরুচ্ছে।

মুখের মধ্যে কাপড় গুঁজে দিল গদাধর। তবু রক্তের নিবৃত্তি নেই। এ কি হল ? মা, তুই এ কি করলি ?

সবাই ছুটে এল আশ-পাশ থেকে। দ্রুতপায়ে হলধারীও।

'দাদা, শাপ দিয়ে তুমি আমার এ কি করেছ দেখ।' ডুকরে উঠল গদাধর।

চোখে দেখে সহ্য করতে পারল না হলধারী। কাঁদতে লাগল। কথা ফিরিয়ে নেবার কথা ওঠে না আর। হাতের তীর আর হাতে নেই। কান্নার মধ্যেও একটু গর্ব মিশে আছে হলধারীর। অব্যর্থবাক্ সে।

চারদিকে হাহাকার পড়ে গেল। সমস্ত বলিদানের রক্ত বুঝি গদাধর দিলে।

'তুমি কি হঠযোগ করো ?'

গদাধর চোখ তুলে তাকাল। দক্ষিণেশ্বরে ক'দিন থেকে আছে যে প্রাচীন সাধু, সে।

'দেখি রক্তের রং ? দেখি মুখের কোনখানটা থেকে আসছে ? নিশ্চয়ই,' সাধু জোর দিয়ে বললে, 'নিশ্চয়ই তুমি হঠযোগ করো। তাই না ?'

'করি।'

তবে আর ভয় নেই। সাধনায় সুষুম্নাদ্বার খুলে গিয়েছে। দেহের রক্ত সব মাথায় গিয়ে উঠছিল। আপনা থেকে যে মুখের মধ্য দিয়ে পথ করে নিতে পেরেছে সেটা সৌভাগ্য বলতে হবে। জানো তো, হঠযোগে জড়সমাধি হয়ে যায়। রক্ত যদি সব মাথায় গিয়ে একবার জমতে পারত তাহলে তোমার সমাধি আর ভাঙত না। সবই মা'র ইচ্ছা।

'একশো বার। মা'র ইচ্ছাতেই তুমি আজ বেঁচে গেলে। তোমাকে দিয়ে মা'র কত না জানি কাজ আছে।'

হৃদয়কে কাছে ডেকে নিল হলধারী। বললে, 'আচ্ছা হৃদু, তুই বল এটা কি ঠিক হচ্ছে?'

কোনটা?

'এই যে কাপড় ফেলে পৈতে ফেলে সাধন করা?'

হলধারীকে হৃদয়ের বড় ভয়। বললে, 'কখনো না। ব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণত্ব বিসর্জন দিলে চলে কি করে?'

'বল্ সেই কথা।' উৎফুল্ল হল হলধারী: 'কত জন্মের পুণ্যে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম। সেই ব্রাহ্মণত্বকে উনি এক কথায় নস্যাৎ করে দেবেন?'

এক কথায় আর সবার মত হৃদয়ও নস্যাৎ করে দিল। বললে, 'পাগল! বদ্ধ পাগল!'

'তবু তোর কথাই যা হোক কিছু শোনে। তুই দৃষ্টি রাখবি, বাধা দিবি, যেন ও-সব অনাচার না করে। দরকার হয় তো বেঁধে রাখবি দড়ি দিয়ে।'

পাগল বলে কেটে পড়তে চাইল হৃদয়। কিন্তু, মুখে যাই বলুক, তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারে না হলধারী। অন্তত যখন পূজা দেখে গদাধরের। দেখে উৎসর্গের উন্মাদনা। ঈশ্বরের আবেশ না হলে কেউ কি এমন বিভোর হয়ে পূজা করতে পারে?

ছুটে যায় হৃদয়ের কাছে। 'ওরে হৃদু, পাগল নয়। অলৌকিক।'

তাই নাকি? হৃদয় বোকা সাজে।

'অলৌকিক না হলে এমন কখনো হতে পারে? কেউ পুজো করতে পারে এমন ভাবে? তুই বল দেখি সত্য করে, ওর মধ্যে তোর কিছু আশ্চর্যদর্শন হয়েছে?'

আমার কী দর্শন হবে! আমি দর্শনের-জানি কি।

'নইলে ওকে তুই রাত-দিন এমন চাকরের মতন সেবা করিস কেন?'

'তবু মনে হয় আরো কেন করতে পারি না।' তবু হৃদয়ের মুখে তৃপ্তির তন্ময়তা।

চিনতে পেরেছে হলধারী। আর তার ভুল হবে না।

'এবার আমি তোকে ঠিক চিনতে পেরেছি। নিশ্চয়ই তোর মাঝে দিব্যাবেশ হয়েছে। হিসেবে আর ভুল হবে না আমার।'

গদাধর হাসে। আবার কখন 'গোলেমালে চণ্ডীপাঠ' হবে তার ঠিক কি।

মন্দিরের কাজ সেরে পাঁজি-পুঁথি নিয়ে পড়তে বসে হলধারী। মাথা পরিষ্কার করবার জন্যে এক টিপ নস্যি নেয়। সেই এক টিপ নস্যিতেই খুলে যায় বুদ্ধি। ভাবে, এত শাস্ত্র-শাসন কিছু পড়েছে গদাধর? বোঝে কিছু?

ডাকো গদাধরকে।

'তুই এ সব কিছু জানিস? বুঝতে পারবি?'

'খুব।'

'কি করে পারবি? তুই তো আকাট মূর্খ—'

'আমি মূর্খ হলে কি হয়, আমার ভেতরে যিনি আছেন তিনি সর্বজ্ঞান। তিনিই সকল কথা বুঝিয়ে দেন আমাকে।'

'ইস, মস্ত বড় পণ্ডিত এসেছিস! সব যে তুই বুঝবি, তুই কি অবতার?'

হলধারী গরম হয়ে ওঠে।

'এই যে বলেছিলে, আর গোল হবে না হিসেবে—' মনে করিয়ে দেয় গদাধর।

'রাখ, তোর কথায় আমার গা জ্বলে। শাস্ত্র পড়িসনি যখন, আমার সঙ্গে কথা বলতে আসিস নে। কলিতে কল্কি ছাড়া আর অবতার নেই। যা, চলে যা। ঠিক চিনেছি তোকে। আর ভুল হবে না। তুই আস্ত আকাট—'

ছুটে গিয়ে হৃদয়কে ধরে এনেছে হলধারী। ঐ ছাখ। তুই বলিস পাগল হয়েছে, আমি বলি ব্রহ্মদৈত্যে পেয়েছে। তা না হলে এমন দশা হয়?

তাকিয়ে দেখল হৃদয়। দেখল বস্ত্র ত্যাগ করে গদাধর গাছের মগডালে বসে আছে স্তব্ধ হয়ে।

ছেলে মারা যাবার পর থেকে কালীকে হলধারী তমোময়ী বলে মনে করত। তমোময়ী মানে তমোগুণান্বিতা। যে তামসিক কর্মের ফলে মূঢ়তা তার যে অধিষ্ঠাত্রী। অবিবেক বা প্রমাদমোহের যে উৎপাদিকা। যে 'জঘন্যগুণবৃত্তস্থা'। একদিন মুখোমুখি বলেছে তাই গদাধরকে। 'তুই ও তামসী মূর্তির পুজো করিস কেন? ওতে কি কখনো আধ্যাত্মিক উন্নতি হতে পারে? বরং ও তোকে অধোগামী করবে। জানিস না, গীতায় কি বলেছে? অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ।'

ইষ্টনিন্দা শুনে বিমর্ষ হয়ে গেল গদাধর। কিন্তু বাধা কি হলধারীর সঙ্গে সে তর্ক করে? শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দেবারই বা তার বিদ্যে কোথায়? সে সোজাসুজি

মাকেই গিয়ে জিগগেস করতে পারে, মা, তুই কী! তোর রূপে যে এত অন্ধকারের ঐশ্বর্য সে কি অজ্ঞানের অন্ধকার?

মাকে সে তাই বললে সরল ভাবে। বল, তুই কী, তুই কে। তুই না বলে দিলে আমি বুঝব কি করে? আমি কি শাস্ত্র জানি না ব্যাকরণ জানি? যখন তুই আমাকে তা শেখালি না তখন নিজে থেকে আমাকে সব দেখিয়ে দে। নইলে হলধারীর সঙ্গে আমি লড়ব কি দিয়ে? ও শাস্তর-জানা পণ্ডিত, কত শত বচন ওর মুখস্থ। ওর সঙ্গে আমি পারব কেন? তুই যদি কিছু না বোঝাস, তবে বুঝব হলধারীর কথাই ঠিক। তুই তামসী, তুই—

মা দেখিয়ে দিলেন। বুঝিয়ে দিলেন।

বললেন, আমি ত্রিগুণাতীত, আবার সর্বগুণাশ্রয়ী। স্বরূপতঃ নির্গুণ, আবার মায়ারূপে সগুণ। নির্গুণ সগুণের অধিষ্ঠান। সগুণ নির্গুণের উদ্ঘাটন। সমুদ্রকে আশ্রয় করেই তরঙ্গের লীলা। তরঙ্গকে আশ্রয় করে সমুদ্রের উন্মোচন। আবার আমি আকাশ। সমস্ত গুণের অতীত। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-শূন্য।

'তবে রে—' দ্রুতবেগে ছুটল গদাধর। হলধারী পুজো করছিল, একেবারে তার ঘাড়ে চেপে বসল। 'তবে রে, তুই আমার মাকে তামসী বলিস? মা আমার সর্ববর্ণময়ী আবার ত্রিগুণাতীতা! এত শাস্ত্র পড়িস আর তুই এটুকু জানিস না?'

মুহ্যমানের মত তাকিয়ে রইল হলধারী। কোথা থেকে কি হয়ে গেল বুঝতে পেল না। মনে হল এ যেন গদাধর নয়, তার মাঝে সাক্ষাৎ জগদম্বার আবির্ভাব। ফুল-বেলপাতা হঠাৎ গদাধরের পায়ে অঞ্জলি দিয়ে বসল।

হৃদয় কাছেই ছিল। শুনিয়ে দিল টাস-টাস।

'কি গো মামা, বলতে না গদাধর পাগল হয়েছে? এখন? এখন যে নিজেই বড় পায়ে ফুল দিয়ে পুজো করছ?'

'কি জানি, আমিই বুঝি পাগল হয়ে গেলাম।' বিহ্বলের মত বললে হলধারী: 'তার মাঝে আমার স্পষ্ট ঈশ্বরদর্শন হল।'

কর্মত্যাগ হয়ে যাচ্ছে গদাধরের।

গঙ্গাজলে তর্পণ করতে গিয়ে দেখে আঙুলের ভিতর দিয়ে জল গলে পড়ে যাচ্ছে। ছুটে গেল হলধারীর কাছে। শুধালে, 'দাদা, এ কি হল?'

'একে গলিতহস্ত বলে।' বললে হলধারী: 'তোর ঈশ্বরদর্শন হয়েছে। ঈশ্বর-দর্শনের পর তর্পণ থাকে না।'

কোনো কর্মই থাকে না সমাধি হলে।

ঠাকুর বললেন শিবনাথ শাস্ত্রীকে: 'যতক্ষণ তুমি সভায় আসনি, ততক্ষণ

তোমাকে নিয়ে কত কথা কত গুণগুঞ্জন। যাই তুমি এসে পড়েছ অমনি সব কথা বন্ধ হয়ে গেছে। তখন তোমার দর্শনেই সুখ।'

যতক্ষণ হাওয়া না পাওয়া যায় ততক্ষণই পাখা চালানো। যখন হাওয়া আপনি আসে তখন আর পাখার দরকার কি। তখন তার স্পর্শনেই আনন্দ।

॥ ১৬ ॥

রাসমণির কালীমন্দিরে গদাধর আর পুজো করছে না—কামারপুকুরের চন্দ্রমণির কানে খবর পৌঁছুলো।

কেন করছে না রে পুজো? কী হয়েছে আমার গদাধরের?

মাথা খারাপ হয়েছে। হারিয়েছে সমস্ত মাত্রাজ্ঞান। এমন কাণ্ডকারখানা সব করছে যা সব সময় পাগল-ছাগলেও করে না। তোমার ছেলেকে বাড়ি আসতে বলো।

চন্দ্রমণি অস্থির হয়ে উঠলেন। চিঠির পর চিঠি লেখাতে লাগলেন রামেশ্বরকে দিয়ে। তুই আমার কাছে চলে আয়। ছেলেবেলায় তোর যে রকম অসুখ হত, তাই বোধ হয় আবার শুরু হয়েছে। এখানে গাঁয়ের জল-হাওয়ায় তোর শরীর ভালো হবে। ভালো হবে আমার যত্ন-আত্তিতে। ঘরের ছেলে তুই ঘরে ফিরে আয়। তোকে না দেখে-দেখে আমার দুই চোখ ক্ষয় হয়ে গেল।

কামারপুকুরে মা'র অঞ্চলের ছায়ায় ফিরে এল গদাধর।

কিন্তু এ কী হয়ে গেছে সে! কখনো জড়ের মত উদাসীন হয়ে বসে থাকে, কখনো আপন মনে হাসে, কখনো বা 'মা' 'মা' বলে কেঁদে আকুল। এই ব্যাকুল-করা মা-ডাকেই বেশি কাতর হন চন্দ্রমণি। কি ভাবে প্রতিকার করবেন বুঝতে পারেন না। প্রাণের সমস্ত স্নেহ আর আশীর্বাদ দুই করতলে ডেকে এনে ছেলের বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে দেন। একটু বা সুস্থির হয় গদাধর। হাসি-খুশি হয়ে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যে সকলের সঙ্গে আলাপ-গল্প করে।

কিন্তু কতক্ষণ সেই স্বভাবস্থিতি। কিছুক্ষণ পরেই আবার সেই ভাবাবেশ। সেই বহির্জ্ঞানশূন্যতা। আচরণে না আছে লজ্জা, না আছে ঘৃণা, না আছে ভয়লেশ। একেবারে নির্মুক্ত নিঃসীম। ঘর-সংসার বলে কিছু আছে, সে সম্বন্ধে চেতনা নেই। লোকলজ্জা বলে কিছু আছে, নেই সেই সংকীর্ণ সংস্কার।

ঠিক পাগল হয়নি। পাগল হলে মাকে, চন্দ্রমণিকে, এত ভালবাসে কি করে, পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গেই বা কেন এত ঠাট্টা-ইয়ার্কি। আসল কথা, উপদেবতা ভর করেছে। ওঝা ডাকাও।

পাঁচজনার পরামর্শে ওঝা ডাকালেন চন্দ্রমণি। ওঝা এসে অনেক ঝাড়ফুঁক করলে, মন্তর আওড়ালে। একটা পলতা পুড়িয়ে শুঁকতে দিলে গদাধরকে। বললে, ভূত যদি হয় এতেই পিঠ্‌টান দেবে। আর যদি না হয়—মনে মনে হাসল গদাধর।

ওতে কিছু হবে না। চণ্ড নামাতে হবে।

এল চণ্ডর ওঝা। মস্ত বড় গুণিন। তন্ত্রে-মন্ত্রে নিপুণ।

চণ্ড নামবে—গ্রাম্য লোকজন এসে ভিড় করেছে। এবারে অব্যর্থ ব্যাধি-শান্তি হবে গদাধরের। যথাবিধি পুজো হল, বলি দেওয়া হল চণ্ডকে। চণ্ড এসে অধিষ্ঠান হল শূন্যে। ওঝাকে উদ্দেশ করে বললে, 'ওকে ভূতে পায়নি, ওর কোনো আধি-ব্যাধি নেই—'

পরে সম্বোধন করলে গদাধরকে : 'কি হে সাধু, সাধুই যদি হবে, তবে অত সুপুরি খাও কেন?'

সময় নেই অসময় নেই, সুপুরি খেত গদাধর। কথা শুনে সে তো হতবাক। 'বেশি সুপুরি খেলে কাম বাড়ে। ও খাবে না।'

সুপুরি ত্যাগ করল গদাধর।

গ্রামের দুই ধারে দুই শ্মশান—ভুতির খাল আর বুধুই মোড়ল। দিন-রাতের বেশির ভাগ সময়ই শ্মশানবাস করে গদাধর। হাঁড়ি করে মেঠাই নিয়ে যায়, শিবা আর প্রমথদের ভোগ দেয়। যে হাঁড়ি শেয়ালের জন্যে, কোত্থেকে দলে দলে এসে খেয়ে যায় নিশ্চিন্তে। আর যে হাঁড়ি ভূত-প্রেতের জন্যে তা হঠাৎ শূন্যে উঠে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। আধার বা আধেয় কিছুরই পাত্তা পাওয়া যায় না। কোনো-কোনো দিন বা স্পষ্ট সাক্ষাৎ হয় পিশাচদের সঙ্গে। রঙ্গরহস্যও হয় কিছু-কিছু।

একদিন নিশীথ রাত্রেও গদাধরের বাড়ি ফেরার নাম নেই। মা'র কাছে ছোট ছেলে চিরকালই ছোট ছেলে—চন্দ্রমণি শ্মশানে পাঠিয়ে দিলেন রামেশ্বরকে। গদাধরকে গিয়ে ধরে নিয়ে আয়। ও কি মা'র ঘর শ্মশান করে শ্মশানেই বসতি করবে?

শ্মশানের প্রান্তে এসে নিঃসাড় অন্ধকারে ডাকতে লাগল : গদাই, গদাই, ওরে গদাই আছিস্?

'যাচ্ছি গো দাদা—' প্রতিধ্বনি করল গদাধর। চেঁচিয়ে বললে, 'এদিকপানে আর এগিয়ো না। আমার সঙ্গে তো এঁটে উঠছে না, তাই তোমার এরা অনিষ্ট করবে। তুমি ফিরে যাও।'

শ্মশানে বসতে পেয়ে অনেক শান্ত হয়েছে গদাধর। একটি বেলগাছ পুঁতেছে আর বুড়ো যে অশ্বত্থ গাছ ছিল ডাল-পালা ছড়িয়ে, তারই তলায় সে আসন নিলে। সেখানে ঘন ঘন কালীদর্শন হতে লাগল তার। দেখতে লাগল সে কর্ত্রী কারয়িত্রী সংসারৈকসারাকে। যে সাকারশক্তিস্বরূপা দিগন্তবসনা খড়্গামুণ্ডাভিরামা। আগম-নিগম-ফলময়ী, বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়িনী।

শান্ত হয়েছে বটে কিন্তু ঔদাসীন্য যায় না। যায় না সংসার-অস্পৃহা। বসনেই আঁট নেই, আর কোথায় তবে আঁট থাকবে? কি করে সংসারে একটু মন পড়বে? মনে কি করে আসবে একটু মোহ-মমতা?

বিয়ে দাও গদাধরের।

রামেশ্বরে আর চন্দ্রমণিতে লুকিয়ে লুকিয়ে পরামর্শ হচ্ছে। পাছে গদাধরের কানে গেলে সে সব ভণ্ডুল করে দেয়। কিন্তু তুমি দেয়ালের কান এড়াতে পারো, গদাধরের কান এড়াতে পারো না। ঠিক সে শুনে ফেললে।

শুনে তার কেমনতরো ভাব হলো না জানি।

'ওরে, আমার বিয়ে হবে!' উল্লাসে উথলে উঠল গদাধর। শিশুর মত উল্লাস। শিশুর মতই নৃত্যানন্দ। বাড়িতে কোনো উৎসব হলে বা প্রিয় আত্মীয়ের আসার সম্ভাবনা ঘটলে শিশু যেমন মাতামাতি করে তেমনি। যেন সব চেয়ে প্রিয়, সব চেয়ে প্রয়োজনীয় কে আসছে তার সংসারে। তার সমস্ত প্রার্থনার প্রতীক, প্রত্যক্ষ মাহেশ্বরী।

বিয়েতে মন আছে গদাধরের। নিশ্চিন্ত হলেন চন্দ্রমণি, নিশ্চিন্ত হলেন রামেশ্বর। ঘটক লাগালেন। ঘটক আর কেউ নয়, হৃদয়ের দাদা লক্ষ্মী মুখুজ্জে।

শিয়ড়ে, হৃদয়দের বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছে গদাধর। যাচ্ছে পাল্কিতে চড়ে। মুক্ত নীল আকাশ আর ঢেউ-খেলানো অঢেল ধান-ক্ষেত দেখতে দেখতে গদাধরের ভাবাবেশ হল। তার ভিতরে যে আদিকবি ধ্যানস্থ ছিলেন, তিনি যেন তার প্রজ্ঞানময় তৃতীয় চক্ষু উন্মীলন করলেন। গদাধর দেখল তার দেহ থেকে দু'টি কিশোর বয়সের ছেলে বেরিয়ে এসে মাঠময় ছুটোছুটি করে খেলা করছে। কখনো যাচ্ছে অনেক দূরে চলে, কখনো বা এসে পড়ছে পাল্কির কাছটিতে। নীরব ছায়ার মত ভাসছে না, দস্তুরমত হাসছে, কথা কইছে, গান গাইছে। কারা এই দু'টি ছেলে? কোন্ দেশের? তার শরীরের মধ্যে বাসা নিল কি করে?

অনেক দিন এ প্রশ্নের মীমাংসা হয়নি। বছর দেড় বাদে দক্ষিণেশ্বরে বামনিকে প্রশ্ন করেছিল গদাধর: 'ঐ দু'টি ছেলে কে বলতে পার? আমি ভুল দেখিনিতো

'না বাবা, ভুল দেখনি। এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব। তোমার মাঝে এবার চৈতন্য আর নিত্যানন্দ দুই-ই এসে বাসা নিয়েছেন। ঐ দু'টিতেই খেলছিল ছুটোছুটি করে।'

শিয়ড়ে হৃদয়ের বাড়িতে গান হচ্ছে। তাই শুনতে এসেছে গদাধর। ভিড় হয়েছে বিস্তর। পুরুষ মেয়ে—আর, সর্বত্রগামী অনুষঙ্গ, ছেলেপিলেও অনেক এসেছে। এক স্ত্রীলোকের কোলে তিন-চার বছর বয়সের এক খুকি। ড্যাবডেবে চোখে চেয়ে আছে সভার মধ্যে। স্ত্রীলোকটি তাকে রঙ্গ করে জিগগেস করছে: বিয়ে করবি? সম্মতিতে ঘাড় হেলাল মেয়ে। এত লোকের মধ্যে কা'কে বিয়ে করবি? কাকে তোর পছন্দ? হাত তুলে নিকটে-বসা গদাধরকে দেখিয়ে দিল স্বচ্ছন্দে।

ঐ যে স্ত্রীলোকটি মেয়ে কোলে নিয়ে বসে আছে, সে শিয়ড়ের হরিপ্রসাদ মজুমদারের কন্যা শ্যামাসুন্দরী। জয়রামবাটির রামচন্দ্র মুখুজ্জের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। এসেছে বাপের বাড়িতে বেড়াতে। কোলে প্রথম সন্তান সারদা। বাপের বাড়িতে শ্যামাসুন্দরীর তখন অসুখ। একদিন এল্লা-পুকুরের পাড়ে বাইরে গেছে—ঠাহর নেই—বসে পড়েছে এক বেলগাছের তলায়। কাছেই গাঁয়ের কুমোরদের পোয়ান, যেখানে পোড়ানো হয় হাঁড়িকুঁড়ি। সেখানে হঠাৎ ছোট ছোট পায়ে নূপুর বেজে উঠল রুনুঝুনু। দেখতে দেখতে ছোট একটি মেয়ে ছুটে এল নাচতে নাচতে। শ্যামাসুন্দরীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা জড়িয়ে ধরলে। মাথা ঘুরে পড়ে গেল শ্যামাসুন্দরী। মনে হল সেই মেয়ে তার পেটে ঢুকেছে।

তেমনি রামচন্দ্র একদিন দুপুরে ঘুমুচ্ছে, স্বপ্ন দেখল একটি ছোট্ট মেয়ে তার পিঠের উপর পড়ে দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরছে। হাতে-গায়ের গয়নায় মেয়ের রূপ যেন আরো খুলেছে। এই গরিবের ঘরে কে মা তুমি? এখানে কি করতে এলে? মেয়েটি বললে, 'এই এলুম তোমার কাছে।'

আটই পৌষ, বারোশো ষাট সাল, গদাধরের জন্মের প্রায় আঠারো বছর পর, জয়রামবাটিতে শ্যামাসুন্দরীর মেয়ে হল। নাম রাখলে সারদা।

ঠাকুর বললেন, 'ও সরস্বতী। ও সারদা। ও জ্ঞান দিতে এসেছে।'

ভক্তির পথও সত্যি, জ্ঞানের পথও সত্যি। ভক্তি মানে ঈশ্বরে পরানুরক্তি। "পুথানুশয়ী রাগঃ"। বিষয় যত সুখকর তত তীব্র তাতে অনুরাগ। আর যাতে অনুরাগ পরম বা নিরতিশয় তাই ঈশ্বর। অনুরাগের ধর্মই হচ্ছে স্মরণ-চিন্তন-অনুধ্যান। সুতরাং অনুরাগের বস্তুতে নিয়তচিত্ত হয়ে থাকাই ভক্তি। যোগ-

শাস্ত্রের ভাষায় তাই সমাধি। তাই ভক্তি আর যোগে কোনো ভেদ নাই। জ্ঞানও অভিন্ন। যখন পরমাত্মবোধ জেগে থাকবে তখনই জ্ঞান। যোগশাস্ত্রে তাকে বলে "অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতি"। অন্য বিষয় ত্যাগ করে পরমাকেই সর্বদা বোধগম্য রাখাই প্রকৃত জ্ঞানের লক্ষণ।

ভক্তিই বলো, যোগই বলো আর জ্ঞানই বলো, অভীষ্ট বস্তুতে অনন্যচিত্ততাই মুখ্যবৃত্তি।

কিন্তু যতই বিচার-আচার করো, মা'র কৃপা না হলে কিছুই হবার জো নেই। মানুষের কতটুকু শক্তি? কতটুকু সে চেষ্টা করতে পারে? কাম-কাঞ্চন ঠিক ঠিক মিথ্যে, জগৎ তিন কালেই ঠিক ঠিক অ-সৎ, মনে-জ্ঞানে এ ধারণা করা কি যে-সে কথা? মার দয়া না হলে কি হয়? কথায় বলে, এক-একটি জোয়ানের দানায় একেকটি ভাত হজম করিয়ে দেয়, কিন্তু যখন পেটের অসুখ হয় তখন একশোটি জোয়ানের দানাও একটি ভাত হজম করাতে পারে না। শুধু মাকে প্রসন্ন করো, মা'র কৃপার জন্যে বসে থাকো। "সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।"

জয়রাম মুখুজ্জের মেয়ে কালীর সঙ্গে সম্বন্ধ এনেছে ঘটক। কিন্তু জয়রাম বেঁকে বসল, ভাঙড় না হোক, ক্ষ্যাপা তো বটে—তাকে জামাই করব কি। তাছাড়া কোনো কোনো জায়গায় রামেশ্বরই নিজে এগোতে চাইল না। তখনকার দিনে কন্যা-পক্ষেরই পণ নেবার প্রথা। একেক জায়গায় এমন দর হাঁকল, যা রামেশ্বরের নাগালের বাইরে। তবে? এখন ইতিকর্তব্য কি?

খুব সোজা। চাষাদের শশার ক্ষেত দেখেছ?

বিরস ও বিষণ্ণ মুখে বসে আছেন চন্দ্রমণি। পাশে রামেশ্বর। দু'জনেই চমকে উঠলেন।

যে শশাটি ভালো ফলেছে তাতে চাষা একটি কুটো বেঁধে রাখে। কুটো বেঁধে চিহ্ন দিয়ে রাখে ভগবানকে ভোগ দেবে বলে। যাতে ভুলে বা গোলমালে না বিক্রি হয়ে যায়। তেমনি—

তেমনি কি? মা-দাদা উৎসুক হয়ে উঠলেন।

'তেমনি আমার বিবাহের পাত্রী জয়রামবাটি গাঁয়ের রাম মুখুজ্জের বাড়িতে কুটো-বাঁধা হয়ে আছে।' বললে গদাধর, 'মিছে তোমরা এখানে ওখানে খোঁজাখুঁজি করছ। এতে ভাবনারও কিছু নেই, হয়রানিরও কিছু নেই।'

জয়রামবাটিতে লোক পাঠালেন চন্দ্রমণি। কিন্তু খবর যা এল তা বিশেষ উৎসাহ-বর্ধক নয়। আর সব মিলেছে বটে কিন্তু পাত্রীর বয়স মোটে পাঁচ বছর।

হোক পাঁচ বছর! গুপ্তভাবেই আপ্তলীলা জগন্মাতার। হয়তো এই জনকনন্দিনী সীতা। এই কৃষ্ণ-উন্মাদিনী রাধিকা। শিবভাবভাবিনী ভগবতী। চন্দ্রমণি মত দিলেন।

কন্যা-পক্ষের পণ তিনশো টাকা। তা হোক, যোগাড় করলে রামেশ্বর। বিয়ের দিন ঠিক হল ১২৬৬ সালের বোশেখ মাসের শেষ বরাবর। গদাধর চব্বিশ বছরে পা দিয়েছে, সারদা ছ' বছরে।

জয়রামবাটিতে বিয়ে। জয়রামবাটি কামারপুকুর থেকে মাইল চারেকের পথ—পশ্চিমে। বরবেশে গদাধরকে না-জানি কেমন দেখাচ্ছে! শক্ত করে কসি-বাঁধা সুন্দর ধুতি পরনে, গায়ে কুর্তা, গলায় ফুলের মালা, কপালে চন্দনলেপ। প্রতিবেশিনীরা এসে সাজিয়ে দিয়েছে গদাধরকে কিন্তু মেজ বৌঠানের মনে দুঃখ, বাজনা নেই। অন্তত ঢোল আর কাঁসর না হলে বিয়ে কি!

দাঁড়াও, আমিই ঢোল বাজিয়ে দিচ্ছি।

দু'হাতে পাছা বাজিয়ে নাচতে লাগল গদাধর। মুখে বোল তুললে ঢোলের। রঙ্গ দেখে সকলে হেসে খুন। মেজ বৌঠানের মনেও আর খেদ নাই।

বিয়েতে চলেছে—এমন সময় ঢোলের বাজনা!

বাল্যভাব না ধরলে গদাধরকে বুঝতে পারবে না কেউ।

খালি পায়ে, খোলা গায়ে বরযাত্রী চলেছে সব। কোমরে চাদর, কাঁধে গামছা, হাতে লাঠি। যেন শিবের বিয়েতে চলেছে সব তাল-বেতাল, ভূত-প্রেতের দল। মধ্যে চলেছেন কন্দর্পদর্পনাশী ব্যোমকেশ।

সারদার সঙ্গে কেমন না-জানি শুভদৃষ্টি হল গদাধরের। অপর্ণার সঙ্গে মহাদেবের। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীমতীর।

রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তির মানে কি? পুরুষ আর প্রকৃতি অভেদ, তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। পুরুষ-প্রকৃতির যোগই যোগমায়া। বঙ্কিম ভাব ঐ যোগের জন্যে। এই যোগ দেখার জন্যেই শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি শ্রীমতীর দিকে, শ্রীমতীর দৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণের দিকে। শ্রীমতীর নাকে নীল পাথর, শ্রীকৃষ্ণ শ্যামবর্ণ বলে। শ্রীকৃষ্ণের নাকে মুক্তো যেহেতু শ্রীমতীর গৌর-বরণ মুক্তোর মত উজ্জ্বল। শ্রীমতীর বসন নীল বলে পীতাম্বর হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীমতীর পায়ে নূপুর বলে শ্রীকৃষ্ণের পায়েও নূপুর। তার মানে প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের অন্তরে বাহিরে মিল। যেমন ধরো আবার শিব-কালীর মূর্তি। শিবের উপর দাঁড়িয়ে আছেন কালী, শিব সব হয়ে পড়ে আছেন পদতলে। আর কালী তাকিয়ে আছেন শিবের দিকে। প্রকৃতি কর্ত্রী, পুরুষ অকর্তা। তাই শিব শব হয়ে আছেন। কিন্তু পুরুষের যোগেই

প্রকৃতির লীলা—সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের রাসোৎসব। শিব আর শক্তি ভিন্ন সংসারে আর কিছু নেই।

শিব আর শক্তির চারি চক্ষুর মিলন হল।

সাতাশ কাঠি জেলে এয়োরা বরকে প্রদক্ষিণ করছে, হঠাৎ জ্বালা-কাঠি লেগে গদাধরের হাতে-বাঁধা হলুদে-মাখানো মাঙ্গলিক সুতো পুড়ে গেল।

এটা কি হল ?

অবিদ্যা বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল। অবিদ্যা-মুক্ত শক্তিকে গ্রহণ করল গদাধর।

ঠাকুর বললেন, 'এই অবিদ্যাকে জয় করবার জন্যেই তো শক্তির পূজা-পদ্ধতি। তাকে প্রসন্ন করবার জন্যেই দাসী ভাবে, বীর ভাবে, সন্তান ভাবে আরাধনা। রমণ দ্বারা প্রসন্ন করার নাম বীর ভাব। সে বড় উৎকট সাধনা। আমার সন্তান ভাব। স্ত্রীলোকের স্তন আমি মাতৃস্তন মনে করি। মা'র দাসী ভাবে, সখী ভাবে ছিলাম দু'বছর। মেয়েরা এক-একটি শক্তির রূপ। বিয়ের সময় বাঙলা দেশে বরের হাতে জাঁতি থাকে, পশ্চিমে থাকে ছুরি। তার মানে, ঐ শক্তিরূপা কন্যার সাহায্যে বর মায়া-পাশ ছেদন করবে। এটিও বীর ভাব। কন্যা শক্তিরূপা। বিয়েতে বর-বোকাটি পিছনে বসে থাকে। কন্যা কিন্তু নিঃশঙ্ক।'

বাসর সাজাচ্ছে মেয়েরা। ওদিকে পাত পড়েছে নিমন্ত্রিতদের।

রঙ্গিনীরা ধরলে গদাধরকে, গান ধরো একখানা।

কত রসরঙ্গই যে করছে মেয়েরা, কত লীলা-চাপল্য। দেখতে দেখতে ভুবনরঙ্গিনীর কথা মনে পড়ে গেল গদাধরের। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, গান গাইবে বৈকি। মুক্ত উদার গলায় শ্যামাগুণগান শুরু করলে।

যারা খাচ্ছিল, খাওয়া ভুলে স্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগল। রঙ্গিনীরা রঙ্গ ভুলে পাষাণবৎ তাকিয়ে রইল মুখের দিকে। গদাধর তন্ময়, বিভোর, বাহ্যজ্ঞানহীন। লুটিয়ে পড়ে রঙ্গিনীদের প্রণাম করতে ব্যস্ত। মা, মাগো, সর্বত্র তুই, সর্বত্র তোর আনন্দের ছড়াছড়ি।

মধুর স্বরে নামোচ্চারণ করছেন ঠাকুর। আর বলছেন মাকে : 'ওমা, ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে বেহুঁশ করে রাখিস নে। ব্রহ্মজ্ঞান চাই না মা। আমি আনন্দ করব, বিলাস করব! শুঁটকে সাধু আমি হব না।'

॥ ১৭ ॥

ঘর আলো-করা বউ এসেছে সংসারে।

বরবধূকে দেখবার জন্যে কত লোক এসেছে আনন্দ করে। কত শান্তির দিন

আজ চন্দ্রমণির ! কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও একটা দুঃখের কাঁটা তাঁর মনের মধ্যে খচ-খচ করছে। বউয়ের গা থেকে গয়নাগুলো খুলে নিতে হবে।

বউকে গয়না গড়িয়ে দেবেন, এমন সঙ্গতি নেই চন্দ্রমণির। লাহা বাবুদের বাড়ি থেকে চেয়ে নিয়ে এসে বিয়ের দিন সাজানো হয়েছিল বউকে। ফিরিয়ে দেবার দিন আজ। লাহা বাবুদের কাছে মুখ থাকবে না নইলে। কিন্তু কোন মুখেই বা ঐ কচি গা থেকে গয়নাগুলো খুলে নেব ?

মা'র মনের ব্যথাটা বুঝতে পেরেছে গদাধর। বললে, তুমি কিচ্ছু ভেবো না। আমিই খুলে নিতে পারব।

ঘুমিয়ে পড়েছে সারদা। শৈশবশান্তিতে ঘুমিয়েছে।

ডান হাতখানি আলগোছে আলতো করে তুলে ধরছে গদাধর, সন্তর্পণে খুলে নিচ্ছে গয়না। তেমনি এক সময়ে আবার বাঁ হাত থেকে ক্রমে-ক্রমে একে-একে আর সবগুলিই। সারদা যেমন ঘুমে তেমনি ঘুমে।

টের পেল ঘুম থেকে জেগে উঠে। এ কি, তার গায়ের গয়না কি হল ? কে নিল ? কাঁদতে বসল সারদা।

চন্দ্রমণির বুক ফেটে যাচ্ছে। সারদাকে কোলে বসিয়ে আদর করতে লাগলেন। বললেন, 'গেলে গেছে। তুমি কেঁদো না, এর চেয়ে ঢের ভালো গয়না কত দেবে তোমাকে গদাই।'

সারদা শান্ত হল বটে, কিন্তু তার খুড়ো মেনে নিতে চাইলেন না ঘাড় পেতে। নতুন বালিকা-বধূকে একেবারে বৈরাগিনী সাজিয়ে দেওয়া। যা নয় তাই দিয়ে সাজিয়ে দেব সেই সাজ লুকিয়ে খুলে নিয়ে যাওয়া। এ প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কি। ঘোর বিরক্ত হলেন। সারদাকে নিয়ে সোজা ফিরে গেলেন জয়রাম-বাটিতে।

'কোথায় আর যাবে ?' পরিহাসচ্ছলে মাকে প্রবোধ দিল গদাধর। 'ও ফিরে না আসুক কিন্তু বিয়ে তো আর ফিরবে না।'

শ্রীমা যখন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন, ঠাকুর তাঁকে সোনার গয়না গড়িয়ে দিয়েছিলেন। উপর-হাতে তাবিজ আর নিচের হাতে বালা।

ওরে, বালা কিন্তু ডাইমন-কাটা হবে।

ঠাকুরের দেখি গয়নার নক্সার উপরেও নজর।

ওরে, পঞ্চবটীতে যখন সীতা দেবীকে দেখেছিলাম তখন তাঁর হাতে ডাইমন-কাটা বালা ছিল। সেই রকম বালা দেব ওকে।

বিষ্ণুঘরের যখন গয়না চুরি গেল, মথুরবাবু ঠাকুরকে খোঁটা দিলেন : 'ছি ঠাকুর,

তুমি তোমার গয়না রক্ষা করতে পারলে না!'

ঠাকুর বললেন, 'তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি। স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁর দাসী তাঁর কি ঐশ্বর্যের অভাব? তুমি কী ঐশ্বর্য তাঁকে দিতে পারো? ও গয়না তোমার পক্ষেই একটা ভারি জিনিস, মস্ত জিনিস, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে মাটির ড্যালা।' সেই কথাই আবার বলছিলেন কেশব সেনকে। 'তোমরা অত ঐশ্বর্য বর্ণনা কর কেন? হে ঈশ্বর, তুমি সূর্য করেছ, চন্দ্র করেছ, আকাশ করেছ—এ সব বলার কী দরকার? শুধু বাগান দেখেই তারিফ করে লাভ কি? বাগানের মালিক বাবুকে দেখবে না? বাগান বড়, না বাবু বড়? নরেন্দ্রকে যখন আমি দেখলাম, তখন আমি শুধু তাকেই দেখলাম—তার কোথায় বাড়ি, বাবার কি নাম, কি করে, তারা ক'টি ভাই ভুলেও একদিন জিজ্ঞেস করলাম না। আমার অত খবরে কাজ কি? আমি আম খেতে এসেছি, আম খেয়ে যাব। বাগানে ক'টা গাছ, ক'টা তার ডাল-পালা, কত তার পাতা—ও খোঁজে আমার কি হবে? মদ খাওয়া হলে শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে তার হিসেবে আমার কী দরকার? আমার এক বোতলেই কাজ হয়ে গেছে।'

তবে কি জানো? মানুষ নিজে ঐশ্বর্য ভালোবাসে বলে ভাবে ঈশ্বরও বুঝি তাই ভালোবাসেন। ভাবে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য প্রশংসা করলে তিনি খুশি হবেন। ঈশ্বরের কাছে ও-সব বাজিকরের বাজি। পঞ্চভূতের কুহক-কৌশল।

ঠাকুর যখন কলকাতায় আসতেন হৃদয় তাঁকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শহর দেখাত। এক দিন বললে, 'এই দেখ মামা, লাটসাহেবের বাড়ি। দেখেছ? কত বড় বড় থাম!'

ঠাকুর মাকে দেখলেন। মা-ই সব দেখিয়ে দিলেন ঠাকুরকে। দেখিয়ে দিলেন কতগুলি মাটির চাক থাক-থাক করে সাজানো।

শম্ভু মল্লিক মস্ত বড়লোক—মা-অন্ত প্রাণ! মথুরবাবুর মারা যাবার পর মা'র নির্দেশে তিনিই হলেন ঠাকুরের রসদদার। ঠাকুরকে বললেন, 'এখন এই আশীর্বাদ করো, যাতে আমার যা-কিছু ঐশ্বর্য সব তাঁর পাদপদ্মে দিয়ে মরতে পারি।'

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'এ তোমার পক্ষেই ঐশ্বর্য। তাঁকে তুমি কী দেবে? কী আছে তোমার দেবার? তাঁর কাছে এ সব ধুলো-মাটি।'

যদি কিছু দিতে চাও ভক্তি দাও, প্রাণঢালা ভক্তি। ঈশ্বর কি ঐশ্বর্যের বশ? তিনি ভক্তির বশ, তিনি ভাবের বশ। তিনি কি তোমার কাছে টাকা-কড়ি-ধন-দৌলত চান? তিনি চান ভাব, ভক্তি, ভালোবাসা।

গদাধর সেবার প্রায় বছর দুই ছিল কামারপুকুরে। শরীর ভালো করে না সারলে চন্দ্রমণি তাকে কিছুতেই আর যেতে দেবেন না কলকাতায়। এদিকে সারদা সাত বছরে পা দিল। এবার একবার গদাধরকে শ্বশুরবাড়ি যেতে হয়। 'জোড়ে' ফিরতে হয় বউ নিয়ে। তাই গেল গদাধর।

সাত বছরের মেয়ে সারদা—তাকে কে বলে দিলে কে জানে—ঘটি করে জল নিয়ে এল। নিয়ে এল পাখা। রূপের পুতলি সেই মেয়ে, মাথাভরা এক রাশ কালো চুল পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। জল ঢেলে পদাধরের পা ধুয়ে দিতে লাগল সারদা। জল-ভরা ছোট ছোট দু'টি হাত বুলিয়ে দিতে লাগল পায়ের উপর। শেষে হাঁটু মুড়ে নিচু হয়ে মাথার চুলে পা মুছে দিতে লাগল।

পা-ধোয়ানোর পর কাছে এসে দাঁড়াল সারদা। ছোট হাতে পাখা নেড়ে-নেড়ে হাওয়া দিতে লাগল গদাধরকে।

বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী বসেছেন বিষ্ণুর পদসেবায়। কিংবা, সারদা গদাধরের।

এই সেবাতেই নিয়তস্থিতা সারদা। বারো শো একাত্তর সালে দুর্ভিক্ষ লেগেছে গ্রামে-গ্রামান্তরে। সারদার তখন এগারো বছর বয়েস, আছে বাপের বাড়িতে। খিদের তাড়নায় কত লোকই যে আসছে কাতারে-কাতারে! রামচন্দ্র, সারদার বাবা, চালে-ডালে খিচুড়ি রাঁধিয়ে রাখছেন হাঁড়ি-হাঁড়ি। বলছেন, 'বাড়ি আর বাড়ির বাইরের সবাই খাবে এ খিচুড়ি। যে আসবে সে। শুধু আমার সারদার জন্যে দু'টি ভালো চালের ভাত করবে—'

তাকে তো শুধু খাওয়ানো নয়, তাকে একটু ভোগ দেওয়া!

একেক দিন এত লোক এসে পড়ে যে রাঁধা খিচুড়িতে কুলোয় না। আবার চড়ানো হয় তক্ষুণি। আর সেই গরম খিচুড়ি ঢেলে দেয় ক্ষুধার্তদের পাতায়। যেমন তপ্ত খিদে তেমনি তপ্ত খিচুড়ি। সারদা পাখা নিয়ে এসে দুই হাতে বাতাস করে। আহা, শিগ্‌গির করে জুড়োক, খিদের অন্ন কতক্ষণ মুখে না দিয়ে থাকা যায়!

এগারো বছরের বালিকা নয়, স্বয়ং বিশ্বমাতা। দুঃখার্ত জীবের ক্ষুধাহরণ করতে এসেছেন।

তার আগে, পাঁচ বছরের যখন মেয়ে, তখন থেকে সে সংসারের কাজে সাহায্য করছে। ক্ষেত থেকে তুলো তুলে এনে চরকায় পৈতে কাটছে। মুনিষদের মুড়ি-গুড় দিয়ে আসছে মাঠে। একবার পঙ্গপাল এসে সমস্ত ধান নষ্ট করে দিলে। মাটি থেকে ধান কুড়োবার পালা পড়ল। সারদার ছোট ছোট দু'টি মুঠিতে কি কম জায়গা? সেও লেগে গেল ধান কুড়োতে। আকণ্ঠ জলে নেমে গরুর জন্যে

দলঘাস কাটছে। একবার দলঘাস কাটবার সময় দেখলে, তারই সমবয়সী আরেকটি মেয়ের হাতে দা, সেও কাটছে দলঘাস। কে মেয়ে, কেন কাটছে, কে বলবে। কাটছে বটে কিন্তু নিচ্ছে না। একটি দল কেটে উপরে রেখে এসে সারদা দেখছে আরেকটি দল কেটে রেখেছে মেয়েটি, সারদাকে আর কাটতে হচ্ছে না।

এমনি আরো কত দেখেছে সারদা। তেরো বছর বয়সে যখন সে আবার কামার-পুকুরে যায় তখন হালদার-পুকুরে একা একা নাইতে যেতে তার ভয় হত। নতুন বউ, একলা ঘাটে যাবে কি! খিড়কির দরজা দিয়ে বেড়িয়ে এসে দেখে, আটটি মেয়েছেলে দাঁড়িয়ে। তারাও নাইতে চলেছে। আর তবে কিসের ভয়! রাস্তায় নামল সারদা, মেয়েছেলেদের চারজন তার আগে, চারজন তার পিছনে। তার সঙ্গে তারাও আগে-পিছে হয়ে স্নান করলে। তেমনি করে পৌছে দিয়ে গেল বাড়ি। এমনি শুধু একদিন নয়, নিত্যি।

কিন্তু কারা এরা, গ্রামের নতুন ছুটুলে বউ সারদা, তার সে কি জানে!

এবার, সাত বছর বয়সে, স্বামীর সঙ্গে 'জোড়ে' এসেছে সে কামারপুকুরে। কিন্তু মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হবার পরেই গদাধর জেদ ধরল, দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যাব।

চন্দ্রমণি আর পীড়াপীড়ি করতে পেলেন না। গদাধর এখন অনেক সুস্থ হয়েছে, শান্ত হয়েছে। তারপর বিয়ে করেছে সজ্ঞানে। চন্দ্রমণির এখন অনেক আশ্বাস, অনেক জোর। সারদাই তাঁর সেই বল-ভরসা।

কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে ফিরেই গদাধর আবার যে-কে-সে। কোথায় তার মা-ভাই, কোথায় তার স্ত্রী-সংসার! আবার, দেখতে দেখতে, বুক তার লাল হয়ে উঠল, শুরু হল দুঃসহ গাত্রদাহ! আর চোখের কোণ থেকে ঘুম গেল অদৃশ্য হয়ে। আবার দেখা দিল সেই অসাধ্য রোগ।

আবার শুরু হল মা'র জন্যে কান্না।

'তোকে ডাকার এই ফল হল, মা? শরীরে এই বিষম ব্যাধি দিলি? যায়-যাক এই শরীর, তবু তুই আমাকে ছাড়িসনি। তুই আমাকে দেখা দে, আমায় শুধু তুই এইটুকু কৃপা কর। আমার কেউ নেই, আমার কেউ নেই তুই ছাড়া—'

॥ ১৮ ॥

দেখুন দেখি আবার কি হল!

গঙ্গাপ্রসাদ সেনের কাছে গদাধরকে আবার নিয়ে এসেছেন মথুরবাবু।

ক্রমশই বুদ্ধির মুখে। এ কি উন্মাদ, না মূর্ছা রোগ? রাতে এক ফোঁটা ঘুম নেই, একটা বাঁশ কাঁধে করে মন্দিরের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। কুকুরকে খেতে দিয়ে তার ভুক্তাবশেষ মুখে পোরে। সর্বাঙ্গে জ্বালা, বুক-পিঠ লাল। আগের ওষুধে তো কিছু হল না। অন্য কিছু ব্যবস্থা করুন।

গঙ্গাপ্রসাদ ভাবতে বসলেন। পাশেই উপস্থিত ছিলেন আরেক জন কে কবিরাজ। কেউ বলেন, গঙ্গাপ্রসাদের ভাই দুর্গাপ্রসাদ, কেউ বলেন, পূর্ববঙ্গের এক নামী বৈদ্য। তিনি বললেন, এ রোগ ওষুধে মালিশে সারবার নয়। এ হচ্ছে দিব্যোন্মাদের অবস্থা। এ ব্যাধি যোগজ ব্যাধি—

দিব্যদ্রষ্টা আয়ুর্বেদী। ইনিই প্রথম বুঝতে পারলেন রোগের মূল কোথায়।

কিন্তু তাঁর কথা কে শোনে। বাইরের শাখা-পল্লব নিয়েই সকলের মাথাব্যথা। তেল-বড়ি, ভস্ম-চূর্ণ।

আস্তে আস্তে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় গদাধর। নিজের চোখ দেখে। স্থির, বদ্ধ, নিশ্চল চোখ। আঙুল দিয়ে চোখের পাতা দু'টো টানতে চেষ্টা করে, নড়াতে চেষ্টা করে। নড়ে না, পলক পড়ে না চোখের। কাচের চোখের মত নিস্পন্দ হয়ে আছে। চোখে খোঁচা মারে আঙুলের। তবু নিষ্পলক।

চন্দ্রমণির কানে খবর পৌছুল। নিরুপায় হয়ে বুড়ো শিবের মন্দিরে হত্যে দিয়ে পড়লেন। আমার গদাধরকে ভালো করে দাও। তার চোখে ঘুম দাও, তার গায়ের দাহ নিবারণ করো। যতক্ষণ পর্যন্ত না শুনছ আমার প্রার্থনা, জলস্পর্শ করব না আমি।

মুকুন্দপুরের শিবের কাছে যা। সেখানে গিয়ে হত্যে দে!

প্রত্যাদেশ পেলেন চন্দ্রমণি। ছুটলেন মুকুন্দপুরে। দু'-তিন দিন পড়ে রইলেন ধন্না দিয়ে, নিরম্বু নিরশনে। স্বপ্নে দেখা দিলেন মহাদেব। পরনে বাঘছাল, মাথায় জটাজূট, হাতে ত্রিশূল। শুদ্ধ-স্ফটিক-সঙ্কাশ চন্দ্রশেখর। বললেন, কিচ্ছু ভয় নেই, তোর ছেলে পাগল হয়নি। তার মাঝে ঈশ্বরের সঞ্চার হয়েছে, তাই তার ঐ বৈলক্ষণ্য। বাড়ি যা, মন ঠাণ্ডা করে থাক—

চন্দ্রমণি আশ্বস্ত হলেন। শিবের পুজো দিয়ে মন খাঁটি করে ঘরে ফিরলেন। ঘরে ফিরলেন তাঁর কুলদেবতা রঘুবীরের আশ্রয়ে। সেবা করতে লাগলেন প্রাণ ঢেলে। আমার গদাধরকে দেখো। রেখো তাকে বাঁচিয়ে।

কিন্তু গদাধরের মন ঠাণ্ডা হয় না। নিয়তজাগ্রত নিষ্পলক দুই চক্ষু দিয়ে দীর্ঘ ধারায় তার জল পড়ে। বলে, মা, মা গো, দুই চোখ আমার নিশ্চল করে দিয়েছিস চোখের সামনে চিরন্তনী হয়ে থাকবি বলে। যাতে এক নিমেষও

তোকে না হারাই। যাতে পলক ফেলতে না ফেলতে পালিয়ে না যাস ফাঁকি দিয়ে। কিন্তু তুই কই? এমনি করে আমাকে জাগিয়ে রেখে তুই শেষে ঘুমিয়ে পড়বি নিশ্চিন্ত হয়ে? এই তোর বিচার? তোর বিবেচনা? রোগের যন্ত্রণায় বিনিদ্র সন্তান ছট্‌ফট করলে তার মা কি ঘুমোয়? না, তার ঘুম আসে?

এমনি ছ'বছর চোখের পাতা একত্র করেনি গদাধর। ছ'বছর সে পলক ফেলেনি। ঘুমোয়নি এক বিন্দু। দিনে-রাত্রে, আলোতে-অন্ধকারে, নির্জনে-জনতায় সর্বক্ষণ দুই চোখ সে খুলে রেখেছে। একটি তীব্র দৃষ্টিতে আবিদ্ধ করে রেখেছে। স্থির-নিবদ্ধ তীব্র দৃষ্টি।

মা কি পারেন না এসে? ঐ দৃষ্টির আহ্বান, ঐ দৃষ্টির আকর্ষণ এড়াতে পারেন এমন তাঁর সাধ্য নেই। ঐ পাথুরে কান্নাই মমতার নির্ঝরিণীকে ডেকে আনে। বসেন এসে পাশটিতে। বলেন, ওরে আর কাঁদিস নে। আমি এসেছি। ডাকার মত ডাকলে আমি কি না এসে থাকতে পারি? এখন কি বলবি আমাকে বল। তাকা, কথা ক—

চাই এই একগুঁয়ে ব্যাকুলতা। অবাধ্য উন্মাদনা। যদি দেখা না দিবি তো রাত-দিন চোখ চেয়ে থাকব। দাঁতে কুটোটিও কাটব না। অনশনে দেহপাত করব। যদি বেশি দেরি করিস নিজের গলা কাটব। দেখি তুই টলিস কিনা। চাই এই একবগ্‌গা গোঁ।

'মাগ-ছেলের জন্যে লোকে এক ঘটি কাঁদে, টাকার জন্যে এক গামলা, কিন্তু ঈশ্বরের জন্যে কে কাঁদছে? ঈশ্বরের জন্যে কাঁদতে বাবুদের লজ্জা হয়!'

বললেন ঠাকুর: 'টাকার জন্যে খুব ছট্‌ফটানি। কিন্তু টাকায় হয় কি? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয়—এই পর্যন্ত। ভগবান লাভ হয় না। ভগবান লাভ হবে না তো মানুষ হয়ে জন্মালুম কেন?'

কিন্তু কি করে পাবো ঈশ্বরকে?

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্য ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। পড়ে-বুঝে-শুনে কিছুতেই পাবি না। যদি তিনি কৃপা করেন তবেই পাবি। তবে এই কৃপা উদ্রেক করবি কি করে? খুব খানিকটা ছুটোছুটি করে। ছেলে অনেক ছুটোছুটি করছে দেখে মা'র দয়া হয়। খেলায় এসে মা লুকিয়েছিলেন, এসে দেখা দেন। তাঁরই ইচ্ছে বেশ খানিকটা ছুটোছুটি হোক। তাঁর এ সংসার যে লীলার সংসার। তিনি যে ইচ্ছাময়ী।

চাই ব্যাকুলতা, চাই আনন্দসান্দ্রা ভক্তি, চাই অচল-অনল বিশ্বাস। তিন টান

হলেই তবে দেখা দেন ভগবান। বিষয়ের উপর বিষয়ীর টান, পতির উপর সতীর টান আর সন্তানের উপর মা'র টান। এই তিন টান যদি মেশাতে পারিস তবে ভগবান সটান এসে মিশে যাবেন।

মা'র আঁচল ধরে ছেলে পয়সা চাচ্ছে, ঘুড়ি কিনবে। মা পাড়াবেড়ানীদের সঙ্গে গল্পে মত্ত, লক্ষ্যও নেই ছেলের দিকে। ছেলেও তেমনি নাছোড়, নাকিসুরে শুরু করে কাকুতি-মিনতি। মা তখন ওজর-আপত্তি তোলে : না, উনি বারণ করে গেছেন। ঘুড়ি কিনে শেষে একটা কাণ্ড বাধাবি আর কি! বলে আবার ছেঁড়া গল্পের সুতো ধরে। ছেলেও তেমনি ধুরন্ধর। কাকুতি-মিনতিতে যখন কিছু হল না, তখন সে স্রেফ কান্না জোড়ে। গল্প করা মাথায় ওঠে। তখন পাড়া-বেড়ানীদের মা বলে, তোমরা একটু বোস ভাই, ছেলেটাকে আগে শান্ত করে আসি। বলে ঘরে ঢুকে বাক্স খুলে পয়সা ফেলে দেয়। বিরক্ত হয়েছে মা, কিন্তু ব্যাকুলতার কাছে হার মেনেছে।

অনুরক্ত না করতে পারিস বিরক্ত করে মা'র থেকে আদায় করে নে। যা বিরক্তি তাই তাঁর অনুরক্তি।

তার জন্যে এক অস্ত্র ব্যাকুলতা। তিনি যেকালে জন্ম দিয়েছেন আমাদের, সেকালে তাঁর ঘরে আমাদের হিস্যা আছে। বিষয়ের ভাগের জন্যে ব্যতিব্যস্ত করে তোল তাঁকে, আগেই দেখিস তোর হিস্যা ফেলে দেবেন। মা'র উপর জোর খাটবে না তো কার উপর খাটবে? আগে আমার হিস্যা ফেলে দাও তো দাও, নইলে গলায় ছুরি দেব।

নে বাবা, নে তোর হিস্যা, শান্ত হ।

ঈশ্বরকে কেমন করে পাওয়া যায়? এক শিষ্য জিগগেস করলে গুরুকে। গুরু বললে, এস দেখিয়ে দিই। বলে এক পুকুরের কাছে নিয়ে গেল। এই জলের মধ্যে ঢোকো। জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখল শিষ্যকে। কতক্ষণ পরে টেনে তুললে হাত ধরে। জিগগেস করলে, কেমন লাগছিল? শিষ্য হাঁফ নিয়ে বললে, প্রাণ আঁটুবাঁটু করছিল, যেন প্রাণ যায়। গুরু বলে, যখন ভগবানের জন্যে প্রাণ এমনি আঁটুবাঁটু করবে, তখন জানবে দর্শনের আর দেরি নেই।

তোমার ব্যাকুলতা, তাঁর কৃপা। কিন্তু ব্যাকুলতা হয় কি করে?

অনুরাগে। পরম প্রেমভাবে। সে প্রেমভাব কোত্থেকে আসবে? শুধু নামে। নামানন্দে।

'তবে কি জানো? ভোগান্ত না হলে ব্যাকুলতা হয় না। কাম-কাঞ্চনের ভোগ যেটুকু আছে সেটুকু তৃপ্তি না হলে জগতের মাকে মনে পড়ে না। ছেলে

যখন খেলায় মাতে তখন মাকে চায় না। খেলা সাঙ্গ হয়ে গেলে তখন বলে, 'মা যাবো।' হৃদের ছেলে পায়রা নিয়ে খেলা করত, পায়রাকে ডাকত, আয় তি-তি, তি-তি! যাই তৃপ্তি হল খেলা, অমনি কান্না ধরল, মা যাবো। কত ভোলাতে চেষ্টা করতুম, সে ভুলত না। খেলা-টেলা আর তার কিছুই ভালো লাগছে না, সন্ধ্যা হয়-হয় তার এখন মাকে চাই। তাকে কাঁদতে দেখে আমিও কাঁদতুম। এমনিই তো ঈশ্বরের জন্যে কান্না। ছেলে আমার কাছে যাবে না, কিন্তু যেই এক জন অচেনা লোক এসে বললে, চল তোকে তোর মা'র কাছে দিয়ে আসি, অমনি তার কোলে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল।'

আসলে যত দিন ভোগান্ত না হয় তত দিনই ভোগান্তি।

তার পর আবার উপাধি আছে না? এদিকে পিলে-রুগী, পরেছে কালোপেড়ে কাপড়, অমনি নিধুবাবুর টপ্পা ধরেছে। রোগা লোকও যদি বুট-জুতা পরে, অমনি শিস দিতে আরম্ভ করে, মুখ দিয়ে ফুটফাট ইংরিজি কথা বেরোয়। সামান্য একটু আধার হয়েছে, গেরুয়া পরেছে, অমনি অহংকারে ডগমগ। একটু ত্রুটি হলেই ক্রোধ, অভিমান।

টাকা একটা বিলক্ষণ উপাধি। টাকা হলেই মানুষ আরেক রকম হয়ে যায়, সে আর মানুষ থাকে না। সেই ব্রাহ্মণের কথা মনে আছে রে তোর হৃদে? এখানে আসা-যাওয়া করত, বাইরে বেশ বিনয়ী, বেশ সরল-কোমল। সেবার কোন্নগর যাচ্ছি, তুই সঙ্গে আছিস। নৌকো থেকে ঘাই নামছি, দেখি সেই ব্রাহ্মণ বসে আছে গঙ্গার ধারে। বোধ হয় হাওয়া খাচ্ছে। আমাকে দেখে বললে, কি ঠাকুর! বলি আছ কেমন? আমি থমকে গেলাম। তার কথার স্বর শুনেই তোকে বললুম, ওরে হৃদে, ওর নিঘ্‌ঘাৎ টাকা হয়েছে, নইলে গলা দিয়ে অমন স্বর বেরোয়? তুই হাসতে লাগলি।

কেশব সেনকেবল লেন ঠাকুর: 'যতক্ষণ উপাধি আছে, ততক্ষণ তিনি নেই। উপাধি যতই যাবে ততই তিনি কাছে হবেন। উঁচু ঢিপিতে বৃষ্টির জল জমে না, খাল জমিতে জমে। তাই যেখানে অহংকার, সেখানে জমে না তাঁর কৃপাবারি। তাই দীনহীনের ভাব ভালো, নিঃস্ব-নিষ্কিঞ্চনের ভাব।'

ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্যামা থাকতে পারে!

সেই শ্যামা এসেছেন গদাধরের কাছে। দুধের ছেলেকে কোলে নিয়ে বসেছেন। মা গো, কেন এত ছুটোছুটি করিয়ে বেড়াস? তুই যখন হাতের এত কাছে, কেন তোকে ছুঁতে দিস না?

বুড়িকে যদি আগে থাকতেই সকলে ছুঁয়ে ফেলে, তা হলে খেলা কেমন করে হয়?

খেলা চললেই তো বুড়ির আহ্লাদ। তার মায়াতেই বদ্ধ, তার দয়াতেই আবার মুক্ত। সব যে তার ইচ্ছা, তার খেলা। তার যে খুশি এমনি করেই খেলা হোক। একবার মায়ার খেলা, তারপর আবার দয়ার খেলা।

মা যখন আসেন না তখন গদাধরের শরীর থেকে আরেকজন কে বেরিয়ে আসে। অবিকল আরেকজন গদাধর। পবিত্র-পাবক সন্ন্যাসী মূর্তি। তার যে আত্মস্বরূপ সে। সে-ই তার সচ্চিদানন্দ গুরু।

যখন পূর্ণজ্ঞান হয় তখন কে বা গুরু কে বা শিষ্য! তখন নিজেই গুরু, নিজেই শিষ্য। বা, তখন গুরুও নেই শিষ্যও নেই। সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু-শিষ্যে দেখা নাই। তাই শুকদেব যখন ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য জনকরাজার কাছে গিয়েছিলেন, জনকরাজা বললেন, আগে দক্ষিণা দাও। শুকদেব বললেন, আগে জিনিস না পেলে কি করে দক্ষিণা হয়? জনকরাজা হাসতে লাগলেন। বললেন, ব্রহ্মজ্ঞান পেলে কি আর গুরু-শিষ্য বোধ থাকবে? তখন কে বা জনক, কে বা শুক, আর কী বা দক্ষিণা! তাই বলি, বাপু দক্ষিণাটি আগে দাও।

একদিন এক শিবমন্দিরে ঢুকে গদাধর 'মহিম্নঃ স্তোত্র' পড়ছে। পড়তে পড়তে সেই শ্লোকে এসেছে যেখানে বলেছে শিবমহিমার আর পারাপার নেই। হিমালয় যদি হয় কালির বড়ি, সমুদ্র হয় দোয়াত, কল্পতরুশাখা কলম, সমস্ত পৃথিবী কাগজ আর স্বয়ং সরস্বতী লেখিকা, তবু সেই কালির দোয়াতে সেই কলম ডুবিয়ে সেই বিস্তীর্ণ কাগজে অনন্ত কাল ধরে লিখে-লিখেও শিবমহিমার কথা সে লেখিকা শেষ করতে পারবেন না।

পড়তে পড়তে বিহ্বল হয়ে পড়ল গদাধর। দরদরধারে কাঁদতে লাগল। কথা আর পাঠ সব গুলিয়ে যেতে লাগল। চেঁচিয়ে উঠল আকুল হয়ে: মহাদেব গো, তোমার গুণের কথা কেমন করে বলব! শুধু নীরবে অশ্রু-বিসর্জন নয়, একেবারে কান্নার রোল তুলল গদাধর। মুক্তকণ্ঠের কান্না। আন্তরিকতার আর্তনাদ।

মন্দিরের আমলা-ফয়লারা ছুটে এল চারদিক থেকে। ওরে, ছোট ভট্টচাজ আবার পাগলামি শুরু করেছে। সেই পেটেন্ট পাগলামি। ভাবলুম বুঝি অন্য রকম কিছু হবে। না রে, আজ কিছু বাড়াবাড়ি দেখছি। এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কি, সেজবাবু আছেন আজ ঠাকুরবাড়িতে, পাগলাকে বেঁধে রাখ। নইলে বলা যায় না, শেষকালে হয়তো শিবের ঘাড়ে গিয়ে চেপে বসবে।

টেনে রাখ, হাত ধরে রাখ কেউ—

গোলমাল শুনে স্বয়ং মথুরবাবু এসে উপস্থিত। দৃশ্য দেখে মোহিত হয়ে গেলেন। শিব-ভাবে বিভোর হয়ে আছে গদাধর। উদাসীন আর উপশান্ত, আত্মবিভূতিতে বৈভবময়।

কিন্তু ওরা ওদিকে সবাই গোলমাল করছে কেন?

'বলছি কি, বিগ্রহের থেকে ওকে দূরে সরিয়ে রাখুক কেউ। কি অঘটন করে বসে তার ঠিক কি।'

'খবরদার।' গর্জে উঠলেন মথুরবাবু, 'কার ঘাড়ে দুটো মাথা ছোট ভটচাজের গায়ে হাত দেয়!'

জোঁকের মুখে নুন পড়ল। সবাই চুপ হয়ে গেল।

মুগ্ধ নেত্রে মথুরবাবু তাঁর গুরুকে দেখতে লাগলেন। দুস্তর ভব-সমুদ্রের নিপুণ কর্ণধারকে।

দেবতার চেয়েও গুরু গরীয়ান্। 'শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।'

কতক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে এল গদাধরের। চোখ চেয়ে দেখল এখানে-ওখানে ভিড় জমে আছে—মাঝখানে সেজবাবু।

বেসামাল হয়ে কিছু অঘটন করে ফেলেছে হয়তো। গদাধর শিশুর মত ভয় পেল। বললে সেই শিশুর মত সারল্যে: 'কিছু অন্যায় করে ফেলেছি নাকি?' গদাধরকে প্রণাম করলেন মথুরবাবু। বললেন, 'না বাবা, তুমি স্তবপাঠ করছিলে, তাই সকলে শুনছিলাম।'

আরেক দিন।

তার ঘরের উত্তরের বারান্দায় পায়চারি করছে গদাধর, কাছেই 'বাবুদের কুঠি' বা কাছারি ঘরে কাজ করছেন মথুরবাবু। গদাধরকে দিব্যি দেখতে পাওয়া যায় সেখান থেকে। কাজ করছেন আর একবার তাকাচ্ছেন ওদিকে। গদাধরের সেদিকে লক্ষ্যও নেই। একবার পশ্চিম থেকে পুবে, আরেকবার পুব থেকে পশ্চিমে টহল দিয়ে ফিরছে। কে তাকে দেখছে বা না-দেখছে তা কে দেখে।

হঠাৎ এ কী অভাবনীয় কাণ্ড! মথুরবাবু পাগলের মত হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। এসেই গদাধরের পা জড়িয়ে ধরে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। কাঁদতে লাগলেন অঝোরে।

গদাধর তো হতবুদ্ধি!

'এ কি, তুমি এ কী করছ? তুমি রানির জামাই, একটা গন্নিমান্নি লোক, তোমায় এমন করতে দেখলে লোকে বলবে কী? ওঠো, ঠাণ্ডা হও—'

আর কি সে কথা শোনেন মথুরবাবু! কান্না কি আর থামে!

বললেন, 'অপরূপ এক দর্শন হল আজ তোমার মধ্যে। পুব থেকে পশ্চিমে আসছ, স্পষ্ট দেখছি তুমি নও, মন্দিরের মা আসছেন। আবার যেই পিছন ফিরে পুবে যাচ্ছ, দেখছি, সাক্ষাৎ মহাদেব চলেছেন। ভাবলাম বুঝি চোখের ভুল। চোখ মুছে আবার তাকালাম। আবার সেই শিবকালী—আবার—যত বার দেখি তত বার—' কান্নায় গলে যেতে লাগলেন মথুরবাবু।

'কই বাপু, আমি তো কিছু টের পেলুম না। ও সব ধোঁকা—' উড়িয়ে দিতে চাইল গদাধর।

কিন্তু সে-কথা আর কানে নেন না মথুরবাবু। পা ছাড়েন না। তিনি পেয়ে গেছেন তাঁর জগৎগুরুকে। ভবভয়বৈদ্য সর্বকারণকারণকে।

ভড়কে গেল গদাধর। শেষে এ ব্যাপার কেউ দেখে ফেলে রানির কাছে গিয়ে লাগাক। রানি হয়তো ভাববেন, জামাইকে ছোট ভটচাজ গুণ করেছে!

অনেক করে ঠাণ্ডা করল মথুরবাবুকে। আমি কে, আমি কি—মা-ই-সব দেখিয়ে দিচ্ছেন তোমাকে। নইলে আমারটা তুমি এত করবে কেন, সর্বস্ব দিয়ে কেন ভালোবাসবে আমাকে?

গদাধরের শখ হল মাকে পাঁয়জোর পরাবে, মথুরবাবু অমনি গড়িয়ে দিলেন পাঁয়জোর। সখীভাবে সাধন করবার সময় স্ত্রীলোকের বেশ ধরবে গদাধর, মথুরবাবু বেনারসী শাড়ি, ওড়না আর এক সুট ডায়মণ্ডকাটা গয়না কিনে দিলেন। শুধু তাই নয়, পানিহাটির উৎসবে যাচ্ছে গদাধর, দারোয়ান নিয়ে গুপ্ত ভাবে সঙ্গে চলেছেন মথুরবাবু। ভিড়ে-ভাড়ে গদাধরের না কষ্ট হয় সেই তদারকে।

ভৃত্য, ভক্ত আর ভাণ্ডারী। মথুরবাবু এক আধারে ত্রিমূর্তি।

বললেন, 'আমার ঠিকুজির কথা ফলল এত দিনে।'

'কি আছে তোমার ঠিকুজিতে?'

'আমার ইষ্টের এত কৃপা থাকবে আমার উপর যে, সে শরীর ধারণ করে আমার সঙ্গে-সঙ্গে ফিরবে। তুমিই আমার সেই ইষ্ট, আমার অভিলষিত—আমার পরম প্রার্থনার চরম পুরস্কার।'

তুমি কৃপানিধি।

তুমি আগে মায়া, পরে দয়া। আগে মায়ারূপে এসে মনোহরণ কর, পরে দয়ারূপে এসে কর মায়ামোচন। মায়ার পারে এসে তোমার দয়ার জন্যে বসে আছি।

॥ ১৯ ॥

'পদ্ম সই দিলে না?' রানি রাসমণি কাতর চোখে তাকালেন চার দিকে: 'কেন এমন হল?'

শেষ শয্যায় শুয়েছেন রাসমণি। কিন্তু মনে শান্তি নেই।

এত বড় কীর্তি করে গেলেন জীবনে, তবু মৃত্যুতে নেই কেন শান্তি? দেবীসেবার জন্যে দু'লাখ ছাব্বিশ হাজার টাকায় তিন লাট জমিদারি কিনেছেন কিন্তু এখনো দেবোত্তর করেননি সম্পত্তি। চার মেয়ের মধ্যে দুজন শুধু এখন বেঁচে আছে। প্রথমা পদ্মমণি আর সব চেয়ে ছোট জগদম্বা। দেবতার নামে দানপত্র সম্পাদন করছেন রানি, সেই সঙ্গে মেয়েরাও একটা একরারনামা দস্তখৎ করে দিক, ঐ সম্পত্তিতে তাদের কোনো দাবি-দাওয়া নেই। জগদম্বা সই করে দিল একবাক্যে। কিন্তু কলম স্পর্শ করল না পদ্মমণি।

সেই ভেবে রানি বড় অসুখী। মা গো, তোর খেলা তুই জানিস। তোর মনে কি আছে যার জন্যে পদ্মমণির মনে এই নেওয়ালি!

আঠারো শো একষট্টি সালের আঠারোই ফেব্রুয়ারি দানপত্রে সই করলেন রাসমণি। আর তার পরের দিনই স্বস্থানে প্রস্থান করলেন।

মৃত্যুর কিছু দিন আগে থেকেই তাঁর কালীঘাটের বাড়িতে অপেক্ষা করছিলেন। সময় আসন্ন হয়ে এলে আদি গঙ্গার পারে তাঁকে নিয়ে আসা হল। অনেকগুলি আলো জ্বলছিল সামনে। হঠাৎ রাসমণি চেঁচিয়ে উঠলেন: 'সরিয়ে দে, নিবিয়ে দে ও সব রোশনাই। অন্ধকার করে দে। এখন আমার মা আসছেন, তাঁর অঙ্গের আলোয় দশ দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে।'

রাত্রি দ্বিতীয় যাম। রানি সহসা আকুল হয়ে উঠলেন: 'এসেছিস মা? নে, টেনে নে কোলের কাছে। কিন্তু শেষ কথাটা তোকে বলি—পদ্ম যে সই দিলে না!'

মা হাসলেন। তাতে তোর কি। হয়তো ঢের মামলা-মোকদ্দমা হবে তোর দৌহিত্রদের মধ্যে, হয়তো দেবোত্তর সম্পত্তি তছনছ হয়ে যাবে। তার জন্যে তোর ভাবনা কেন? যা থাকবার নয় তা যাক না। তুই থাকবি আর তোর গদাধর থাকবে।

'এ আমার কি স্বভাব হলো বলো দেখি!' গদাধর বললে গিয়ে হলধারীকে: 'জপ করতে বসে কেউ অন্যমনস্ক হয়েছে, আমি তাকে এক চড় মেরে বসি। সেই কালী-ঘরে রাসমণিকে এক চড় মেরেছিলাম, আজ আবার বরানগরের ঘাটে জয়

মুখুজ্জেকে দুই চড় মেরে বসেছি। ঠাট করে জপ করতে বসেছেন, কিন্তু মন রয়েছে অন্য দিকে।'

তুই উন্মাদ। বললে হলধারী।

তাই হবে। তাই হক কথা বেরিয়ে আসে মুখ থেকে। কাউকে মানি না। বড়লোককে কেয়ার করি না কানাকড়ি।

দক্ষিণেশ্বরে যদু মল্লিকের বাগানে যতীন্দ্র ঠাকুর বেড়াতে এসেছেন। ঠাকুরও গিয়েছেন সেখানে। যতীন্দ্র বললেন, 'আমরা সংসারী লোক, আমাদের কি আর মুক্তি আছে? স্বয়ং যুধিষ্ঠিরই নরকদর্শন করেছিলেন তো আমরা কোন ছার।' করেছিলেন তো করেছিলেন। কথা শুনে ঠাকুরের রাগ হল। বললেন, যুধিষ্ঠির বুঝতে শুধু ঐ নরকদর্শনটুকুই মনে করে রেখেছ? তার সত্য, ক্ষমা, ধৈর্য, বৈরাগ্য —তার কৃষ্ণভক্তি এ সমস্ত ভুলে যাবে? আরো কত কি বলতে যাচ্ছিলেন ঠাকুর, হৃদয়ের বড়লোককে বড় ভয়, তাড়াতাড়ি ঠাকুরের মুখ চেপে ধরল।

আর, যতীন্দ্র করলেন কি?

যতীন্দ্র বললেন, 'আমার একটু কাজ আছে।' বলে সরে পড়লেন।

আরেক দিন গিয়েছিলেন সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়ি। তাঁকে দেখেই বললেন, 'দেখ বাপু, তোমাকে কিন্তু রাজা-টাজা বলতে পারব না। তুমি যা নও তাই তোমাকে বলি কি করে?'

রজোগুণী লোক সৌরীন্দ্র, রাজা না বলাতে ষোল আনা খুশি হলেন না হয়তো। একা-একা কি আলাপ করবেন, যতীন্দ্রকে খবর পাঠালেন। যতীন্দ্র বলে পাঠালেন, 'আমার গলা-ব্যথা হয়েছে, যেতে পারব না।'

তুমি উন্মাদ। বললে কৃষ্ণকিশোর। এঁড়েদার কৃষ্ণকিশোর। সর্বশাস্ত্রে পারঙ্গম। উন্মাদ নও তো পৈতে-ধুতি উড়িয়ে দিলে কেন?

ঠাকুর বললেন, 'তোমার একবার উন্মাদ হয় তা হলে বোঝ।'

হলও তাই। কৃষ্ণকিশোরের উন্মাদ হল। একা এক ঘরে চুপ করে বসে থাকে আর কেবল ওঁ-ওঁ করে। সকলে বললে, মাথা খারাপ হয়েছে, কবরেজ ডাকো। কবরেজ এল নাটাগড় থেকে। কৃষ্ণকিশোর বললে, 'আমার রোগ আরাম করো আপত্তি নেই, কিন্তু দেখো যেন আমার ওঁকারটি আরাম করো না।'

নদীয়ায় ন্যায় পড়তে এসেছিল নারায়ণ শাস্ত্রী। বাড়ি রাজপুতানায়, গুরুগৃহে পঁচিশ বছর ব্রহ্মচর্য পালন করে এসেছে। জয়পুরের মহারাজা বড় চাকরিতে বাঁধতে চেয়েছিলেন তাঁকে, কিন্তু তিনি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। জ্ঞানের মতন আনন্দ নেই। শাস্ত্র-দর্শন সব তিনি মন্থন করে দেখবেন কোথায় সেই বিজ্ঞানানন্দ

ব্রহ্মের ঠিকানা। কিন্তু বই পড়ে মন ভরল না নারায়ণ শাস্ত্রীর। অস্তি—তিনি আছেন, শুধু এইটুকুই বলা যায়, তার বেশি আর উপলব্ধি হয় না। "অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।"

শুনলেন দক্ষিণেশ্বরে সেই উপলব্ধির অব্ধি বিরাজমান। ছুটলেন সেখানে। বুঝলেন আহারের চেয়ে আস্বাদ বড় জিনিস। ঠিকানা জানার চেয়ে একখানা চিঠি পাওয়ার বেশি দাম।

কিন্তু এসে দেখলেন কি? গদাধর বাঁশ ঘাড়ে করে বেড়াচ্ছে। কাঙালীরা খেয়ে গেলে তাদের পাতা চাটছে, মাথায় ঠেকাচ্ছে। কোথাকার কে নিচু জাতের স্ত্রীলোক, খাচ্ছে তার হাতের শাকান্ন। সবাই বলছে, উন্মাদ। কিন্তু নারায়ণ শাস্ত্রী দেখল, জ্ঞানোন্মাদ। পরে দেখল, শুধু জেনে উন্মাদ নয় পেয়ে উন্মাদ।

কিন্তু হলধারী এল মুখসাট মেরে: 'তুই এ-সব করছিস কি? কাঙালীদের এঁটো খাচ্ছিস তোর ছেলেমেয়ের বিয়ে হবে কেমন করে?'

কথা শুনে ক্ষেপে গেল গদাধর: 'তবে রে শালা, তুমি না গীতা-বেদান্ত পড়ো? তুমি না শেখাও জগৎ মিথ্যে ব্রহ্ম সত্য আর সর্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি? ভেবেছ আমি জগৎ মিথ্যে বলব আর ছেলেপুলের বাপ হব? তোর শাস্ত্রপাঠের মুখে আগুন!'

কি হবে শাস্ত্র পাঠে? ভাবল নারায়ণ শাস্ত্রী। বাজনার বোল মুখস্থ বলা সোজা, হাতে আনাই দুষ্কর।

রানির মারা যাবার পর সম্পত্তির এক্সিকিউটর হলেন মথুরবাবু। এক দিন গদাধরকে বললেন, 'তোমার নামে কিছু জমি-জায়গা লিখে দি, কি বলো?'

গদাধর রেগে টং। কি, আমাকে তোমার বিষয়ী করবার মতলব? আমিও কি কলাইয়ের ডালের খদ্দের?

ভগবানের আনন্দের কাছে আর কিছু আনন্দ আছে? ভগবানের স্বাদ পেলে সংসার আলুনি লাগে। শাল পেলে আর বনাত ভালো লাগে না।

এ আনন্দ কি বলে বোঝানো যায়? বিয়ের পর অনেক দিন বাদে মেয়ের কাছে তার স্বামী এসেছে। রাত্রিশেষে সখীরা ঘিরে ধরল মেয়েকে। হ্যাঁলো, কেমন আনন্দ করলি কাল? মেয়েটি বললে, কি করে বোঝাই বল। সে বলে বোঝানো যায় না। যখন তোদের স্বামী আসবে তখনই বুঝতে পারবি, তার আগে নয়।

তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে চাতকের। সাত সমুদ্র তেরো নদী খাল-বিল পুকুর-দিঘি সব জলে ভরপুর। অথচ সে জল খাবে না। ছাতি ফেটে যাচ্ছে, তবু না। স্বাতী নক্ষত্রের জলের জন্যে হাঁ করে আছে। 'বিনা স্বাতী কি জল সব ধুর।'

মিছরির পানা যে খেয়েছে সে কি আর চিটে গুড়ের পানা খাবে ?

'কিন্তু সংসারে থাকতে গেলে টাকাও তো চাই—' ত্রৈলোক্য সান্যাল বললেন, 'সঞ্চয়ও দরকার। পাঁচটা দান-ধ্যান—'

'রাখো। কত তোমাদের দান-ধ্যান! নিজের মেয়ের বিয়েতে হাজার-হাজার খরচ, আর পাশের বাড়িতে খেতে পাচ্ছে না। তাদের দু'টি চাল দিতে কষ্ট হয় —দিতে-থুতে অনেক হিসেব! খেতে পাচ্ছে না—তা আর কি হবে! ও শালারা মরুক আর বাঁচুক—আমি আর আমার বাড়ির সকলে ভালো থাকলেই হল। এদিকে মুখে বলে, সর্বজীবে দয়া!'

আগে ঈশ্বর লাভ করো, পরে সংসারে থাকো। ঈশ্বর লাভের পর যে সংসার সে বিদ্যার সংসার। তখন 'কলঙ্কসাগরে ভাসি, কলঙ্ক না লাগে গায়'।

এই দেখ না জয়গোপাল সেনকে। বিস্তর টাকা, কিন্তু আঙুল দিয়ে জল গলে না। 'গাড়ি করে আসে। গাড়িতে ভাঙা লণ্ঠন, ভাগাড়ের ফেরৎ ঘোড়া, হাসপাতাল ফেরৎ দারোয়ান। আর এখানের জন্যে নিয়ে এল দুটো পচা ডালিম!'

এই তো টাকার কেরামতি!

মথুরবাবুর সঙ্গে ঠাকুর কাশীতে তীর্থ করতে এসেছেন, উঠেছেন রাজাবাবুর বাড়িতে। সেখানেও সর্বক্ষণ বিষয়-আশয়ের কথাবার্তা। ঠাকুর কাঁদতে লাগলেন: 'মা, এ কোথায় আনলে? আমি যে রাসমণির মন্দিরেই খুব ভালো ছিলাম। সেখানে বিষয়ের কথা শুনতে হয়নি।'

ছাদের উপর ঠাকুর-ঘর, নারায়ণ পুজো হচ্ছে। বাড়ির গিন্নি-বান্নিরা চন্দন ঘষছে, নৈবেদ্য সাজাচ্ছে, করছে নানান রকম আয়োজন। কিন্তু মুখে একটিও ঈশ্বরের কথা নেই। কি রাঁধতে হবে, আজ বাজারে কিছু ভালো পেলে না, কাল অমুক রান্নাটি বেশ হয়েছিল—এই সব কথাবার্তা।

মথুরবাবু কথা ফিরিয়ে নিলেন। কত লোক তাঁকে আশ্রয় করে ফিরিয়ে নিল অবস্থা। আর এ এমন এক গুণী-গুরু যে তাঁরই অবস্থান্তর ঘটালেন।

'বাবা, তোমার জন্যে এই শাল এনেছি দেখ।'

হাজার টাকা দাম দিয়ে কিনে এনেছেন মথুরবাবু। গদাধরের গায়ে নিজেই পরিয়ে দিলেন আদর করে।

শাল গায়ে দিয়ে শিশুর মত সরল আনন্দে নেচে উঠল গদাধর। ডেকে দেখাতে লাগল সকলকে। ওরে শুনেছিস হাজার টাকা দাম!

পরক্ষণেই অন্য চিন্তা মনে এল। এই শালের মধ্যে আছে কি? কতগুলো ছাগলের লোম বই কিছু নয়। তারই এত চটকদারি! শীত ঠেকাতে সামান্য

একখানা কম্বলই তো যথেষ্ট। বলি, এই শালে ঈশ্বরস্পর্শ পাওয়া যাবে? বরং বিকার বাড়বে, মনে হবে আমি এক জন মস্ত এলেমবাজ। আর সকলের চেয়ে বড়, এক জন কেষ্ট-বিষ্টু। আর জানো না, বিকার হলে কি বলে? বলে, আমি পাঁচ সের চালের ভাত খাবো রে, আমি এক জালা জল খাবো। বদ্যি বলে, বেশ তো খাবি, নিশ্চয় খাবি। বলে বদ্যি নিজে তামাক খায়। বিকারের পর কি বলবে তারি জন্যে অপেক্ষা করে।

হঠাৎ গা থেকে শালখানি খুলে নিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল গদাধর। থুতু ফেলতে লাগল তার উপর, পা দিয়ে মাড়িয়ে ঘষতে লাগল ধুলোয়। তাতেও ক্ষান্তি নেই, আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলব এই জঞ্জাল।

কে এক জন ছুটে এসে উদ্ধার করে শালখানা। জানালে গিয়ে মথুরবাবুকে। মথুরবাবু বললেন, 'বেশ করেছে। ঠিক করেছে। যেমনটি চেয়েছিলাম তাই করেছে।'

এ চমৎকার পরিহাস ঈশ্বরের। গদাধরকে কয়েক দিনের জন্যে নিজের কাছে জানবাজারের বাড়িতে নিয়ে এসেছেন মথুরবাবু। সোনার থালায় করে ভাত খেতে দেন, রূপোর বাটিতে করে পঞ্চ ব্যঞ্জন। যে খাচ্ছে তার কিন্তু থালা-বাটির দিকে নজরও নেই, খাওয়া শেষ হলে চেয়েও দেখে না এঁটো বাসনের কি হল। মথুরবাবুরই যত গরজ। দেখ, ঠিকমত মাজা-ঘষা হল কি না, ভাঙা-ফুটো হল কি না, চোরে নিয়ে গেল না কি চুরি করে! তাঁরই যত হাঙ্গামা পোয়ানো। আর যে ভোজন করে গেল তার কাছে সব কিছুই একটা অসার ভোজবাজি।

চন্দ্র হালদার মথুরবাবুদের কুল-পুরোহিত। আছে বাবুদের আশ্রয়ে কিন্তু গদাধরের প্রাধান্য দেখে হিংসেয় ফেটে পড়ছে। কী কৌশলে যে বাবুকে হাত করল তাই বুঝে উঠতে পাচ্ছে না। কোথাকার কে বিদেশী, তার কিনা এত প্রতাপ! যাই বলো, আর আস্কারা দেওয়া চলে না। একটা হেস্তনেস্ত করতে হয়। বাইরের ঘরে একা বেহুঁস হয়ে বসে আছে গদাধর, চন্দ্র হালদার কাছে গিয়ে তার গায়ে ঠেলা মারতে লাগল: 'ও বামুন, বল্ না বাবুকে কি করে বশে আনলি?'

গদাধর নিঃসাড়।

'আহা, ঢং দেখ না! ঝিমুচ্ছে বসে-বসে। বল্ না সত্যি করে, কি করে বাগাল বাবুকে?'

গঙ্গাধর নিঃসংজ্ঞ।

"উঃ, খুব ফুটুনি হয়েছে!' বলেই গদাধরকে সে লাথি মারলে। একবার নয়, তিন-তিনবার।

গদাধর চোখও মেলল না। পৃথিবী সকলের চেয়ে বড়, সাগর তার চেয়ে বড়, আকাশ তারও চেয়ে বড়। কিন্তু ভগবান বিষ্ণু এক পায়ে স্বর্গ-মর্ত-পাতাল তিন ভুবন আবৃত করেছেন। সাধুর হৃদয়ের মধ্যে সেই বিষ্ণুপদ। আর সেই পদচ্ছায়ে অনন্ত সহ্যশক্তি!

সহ্য করে গেল গদাধর। মথুরবাবুকে বললে চন্দ্র হালদার আর আস্ত থাকত না।

ঠাকুর তাই বলতেন হৃদয়কে: 'তুই আমার কথা সহ্য করবি, আমি তোর কথা সহ্য করবো—তবে হবে। তা না হলে তখন খাজাঞ্চীকে ডাকো।'

যে সয় সেই রয়। যাকে রাখো সেই রাখে।

॥ ২০ ॥

বকুলতলার ঘাটে এসে নৌকো লাগল। সকাল বেলা। দক্ষিণেশ্বরের বাগানে গদাধর ফুল তুলছে। সহসা চোখ পড়ল ঘাটের দিকে। কে এল নৌকোয়?

আশ্চর্য, স্ত্রীলোক! কিন্তু এ কী তার অদ্ভুত বেশবাস! পরনে গেরুয়া, হাতে ত্রিশূল, ঘাড়ে-পিঠে অসম্বদ্ধ চুল—এ যে সন্ন্যাসিনী! এ এখানে এল কি করে? এখানে তার কি কাজ? কে তাকে পথ দেখাল?

তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরে এল গদাধর। ডাকলে হৃদয়কে। ওরে হৃদ্যা গিয়ে, ঘাটে এক ভৈরবী এসেছে। কি তার গায়ের রং, কি তার চোখের ছটা! কি তার ভঙ্গির তেজ! চাঁদনিতে রয়েছে। যা, তাকে গিয়ে ডেকে নিয়ে আয় এখানে।

হৃদয় তো অবাক। সে এখানে আসবে কেন? তুমি ডাকলে তার কি?

'তুই যা না। গিয়ে বল আমি এখানে আছি। তা হলেই সে আসবে।'

তাই গেল হৃদয়। গিয়ে দেখল, ঘাটের চাঁদনিতে ভৈরবী বসে আছে চুপচাপ। যেন বা তারই সংবাদের প্রতীক্ষায়। বললে, তার মামার কথা। মামা যেতে বলেছে তাকে।

হৃদয় তো অবাক। এক বাক্যে উঠে পড়ল ভৈরবী। বিনা প্রশ্নে অনুসরণ করলে।

চলে এল গদাধরের ঘরের দরজায়। গদাধরকে দেখেই আনন্দ আর বিস্ময়ে কেঁদে ফেলল। বললে উচ্ছ্বসিত হয়ে: 'বাবা, তুমি এখানে? শুধু এইটুকু

জেনেছি তুমি গঙ্গাতীরে আছ। সেই থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি তোমাকে। এত দিনে দেখা পেলাম।'

বছর চল্লিশ বয়েস হবে ভৈরবীর—অভিভূতের মত তার দিকে তাকিয়ে রইল গদাধর। বললে, 'আমাকে তুমি খুঁজে বেড়াচ্ছ, মা? কিন্তু আমার কথা তুমি জানলে কি করে?'

'মা মহামায়া জানিয়ে দিলেন। বললেন, এই তিন জনের সঙ্গে গিয়ে দেখা কর।'

'তিন জন?'

'হ্যাঁ, আর দু'জনের সঙ্গে পূর্ব-বাঙলায় দেখা হয়েছে। বাকি তোমাকেই এত দিন খুঁজছিলাম।'

গৃহহারা শিশু যেন মাকে ফিরে পেয়েছে এমনি আগ্রহে গদাধর আঁকড়ে ধরল ভৈরবীকে। কত দিনের কত সুখ-দুঃখের কথা বলতে বাকি। মা গো, সব বলি তোকে বসে-বসে। বাহ্যজ্ঞান থাকে না, অলৌকিক কত কি দেখি-শুনি, সমস্ত গা জ্বলে-পুড়ে যায়, চোখের পাতা এক করতে পারি না। সবাই বলে পাগল হয়ে গেছি। তাই কি সত্যি? রাত-দিন মাকে ডেকে-ডেকে শেষে পাগল হয়ে গেলাম? মাকে ডাকার এই পরিণাম?

'কে তোমাকে পাগল বলে?' ভৈরবীর কণ্ঠ থেকে অমৃত-আশ্বাস ঝরে পড়ল: 'একে বলে, মহাভাব। এ ভাব চেনে এখানে এমন কারু সাধ্যি নেই তাই যেমন সব পণ্ডিত তেমনি সব ভাষ্য।'

'মহাভাব!' গদাধরের দুই উন্নিদ্র চক্ষু জলজল করে উঠল।

হ্যাঁ, এই ভাব হয়েছিল রাধারানির, এই ভাব হয়েছিল শ্রীচৈতন্যের। ভক্তিশাস্ত্রে এ সব লেখা আছে। আমি পড়ে সব দেখিয়ে দেব তোমাকে। মিলিয়ে-মিলিয়ে দেখিয়ে দেব।'

ভৈরবী তার ঝুলি ঘাঁটতে লাগল। ঝুলিতে খান কয়েক পুঁথি আর দু'একখানা কাপড়। জীবনের পথবাহনে যা-কিছু সম্বল।

দেবীর কিছু প্রসাদ খাও মা। কিছু মাখন আর মিছরি ভৈরবীকে নিবেদন করল গদাধর। কিন্তু ছেলে না খেলে কি মা আগে খায় কখনো? গদাধর তাই মুখে দিল খানিকটা। তবেই ভৈরবী জলযোগ করলে।

কিন্তু কে মা তুমি সংসারত্যাগিনী? কেন তোমার এই সন্ন্যাসিসজ্জা?

কেউ কিছুই জানে না—আমিও না। শুধু এইটুকু জেনে রাখো, যশোর জেলায় আমার বাড়ি আর ব্রাহ্মণের ঘরে আমার জন্ম। যদি কিছু নাম দিতে চাও, বলো, যোগেশ্বরী। এই যোগে বসেই জানতে পেলাম তিন জনকে সাধনায় সাহায্য

করতে হবে। প্রথম দু'জনের নাম হচ্ছে চন্দ্র আর গিরিজা—দুয়ের বাড়িই বরিশালে। আর তৃতীয় জন তুমি। চন্দ্র আর গিরিজাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে এসেছি, এবার তোমার পালা।

ওরা কী শিখল ?

কয়েক দিনের মধ্যেই দেখতে পাবে। ওদের নিয়ে আসবে দক্ষিণেশ্বরে। তোমার সঙ্গে মিলিয়ে দেব। আমার তিন শিষ্য একত্র হবে।

মন্দির ঘুরে সব দর্শন করলে যোগেশ্বরী। গলায় ঝুলছে যে রঘুবীর শিলা, এখন তার ভোগের যোগাড় দেখতে হয়। সিধে এল ঠাকুরবাড়ি থেকে। তাই নিয়ে সে পঞ্চবটীতে রাঁধতে গেল।

মহাভাব! মহাভাব কাকে বলে ?

যেমন শ্রীমতীর হত। এক সখী ছুঁতে গেলে অন্য সখী বলত, ওরে এখন কৃষ্ণ-বিলাসের অঙ্গ, ছুঁসনি—এঁর দেহের মধ্যে এখন কৃষ্ণ বিলাস করছেন। মহাভাব ঈশ্বরের ভাব—দেহ-মনকে তোলপাড় করে দেয়। যেন একটা মস্ত হাতি নাড়া-কুচির কুঁড়েঘরে গিয়ে ঢুকছে। ঘর চুরমার। ঈশ্বরের বিরহ-আগুন প্রলয়ের আগুনের মত। সে কি সামান্য ? রূপ-সনাতন যে গাছের তলায় বসতেন, সে গাছের পাতা ঝলসা-পোড়া হয়ে যেত।

'এই অবস্থায় তিন দিন ঠায় অজ্ঞান হয়ে ছিলাম।' বললেন এক দিন ঠাকুর : 'অনড় হয়ে পড়েছিলাম এক জায়গায়। হুঁস হলে বামনি আমায় ধরে স্নান করাতে নিয়ে গেল। কিন্তু আমার গায়ে হাত ঠেকাবার কি জো আছে! গা মোটা চাদর দিয়ে ঢেকে দিলে। সেই চাদরের উপর দিয়ে ধরলে আমাকে। ধরে নিয়ে গেল গঙ্গায়। গায়ে যে সব মাটি লেগেছিল পুড়ে গিয়েছিল—'

শ্রীমা বলতেন, 'ঠাকুরের যখন মহাভাব হত, মনে হত বুকের ভিতর যেন সাতটা আগুনের তাওয়া জ্বলছে।' বলতে বলতে ভাবারূঢ় হতেন : 'আহা, সে কী গায়ের রং! সোনার ইষ্ট কবচের সঙ্গে গায়ের রং মিশে থাকত। যখন তেল মাখিয়ে দিতুম দেখতুম সব গা থেকে যেন জ্যোতি বেরুচ্ছে। যখনই কালী-বাড়িতে বার হতেন, সব লোক দাঁড়িয়ে পড়ত, বলত, ঐ তিনি যাচ্ছেন। বেশ মোটাসোটা ছিলেন। ছোট তেলধুতিটি পরে যখন থসথস করে গঙ্গায় নাইতে যেতেন, রূপের সে কি ঢেউই উঠত। বেড়ার ফাঁকে দাঁড়িয়ে চোখ ভরে দেখতুম। মথুরবাবু একখানা পিঁড়ে দিয়েছিলেন, বেশ বড় পিঁড়ে। যখন খেতে বসতেন তখন ভাতেও বসতে কুলোত না—ছাপিয়ে পড়তেন—'

'আমাকে তিনি কি বলতেন জানো?' বললেন এক দিন শ্রীমা: 'বলতেন, তাঁর দেহ দেখিয়ে বলতেন, আমার এই দেহটি গয়া থেকে এসেছে। তাই তাঁর মা দেহ রাখবার পর আমাকে তিনি বললেন, তুমি গিয়ে গয়ায় পিণ্ড দিয়ে এস। সে কি কথা? পুত্র বর্তমান থাকতে আমি পিণ্ড দেব কি! হবে গো হবে, তুমি দিলেই হবে। বললেন তিনি, আমার কি আর ওখানে যাবার জো আছে? গেলে কি আর ফিরবো? চমকে উঠলুম। কাজ নেই তবে গিয়ে। আমিই যাব। বুড়ো গোপালকে নিয়ে পরে আমিই গিয়েছিলুম গয়ায়।'

রান্না করে রঘুবীরের সামনে ভোগ্য-ব্যঞ্জন রেখে ধ্যানে বসেছে ভৈরবী। বাহ্য-জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেছে, গাল বেয়ে ঝরে পড়ছে আনন্দবৃষ্টি। ধ্যানে দেখছে, স্বয়ং রঘুবীর যেন খাচ্ছে সেই তার নিবেদনের অন্ন। আহা, থাক তৃপ্তি করে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে।

জ্ঞান হয়ে চোখ মেলে নিজেই আনন্দে আত্মহারা। যে খাচ্ছে এ ভাত সে গদাধর। অনাহূত কখন চলে এসেছে পঞ্চবটীতে। চলে এসেছে অদৃশ্য কোন প্রাণের টানে। অদৃশ্য কোন নিমন্ত্রণের সংবাদে।

ভৈরবীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই জ্ঞানভূমিতে নেমে এল গদাধর। অপ্রস্তুতের মত বললে, 'কখন কি যে গোলমাল হয়ে যায়, যত সব আজব কাণ্ড করে বসি।'

ভৈরবীর মুখে প্রশান্ত অভয়। বললে, 'বেশ করেছ, প্রাণ যেমনটি চেয়েছিল ঠিক তেমনটি করেছ। ধ্যানে যা দেখেছি তাই প্রত্যক্ষ করলাম চোখ মেলে। আমার আর বাইরের পুজোয় দরকার নাই, আমি পেয়ে গেছি আমার রঘুবীরকে।' বলে সে খেতে লাগল সেই উচ্ছিষ্টান্ন। তার দেবতার প্রসাদ।

খাওয়ার শেষে এল গঙ্গাতীরে। কী হবে আর শিলামূর্তিতে। পেয়ে গেছি প্রাণ-স্বরূপকে। এত দিন গলায় ঝুলিয়ে বয়ে বেড়াচ্ছিল যে শিলাখণ্ড, নিমেষে তা ফেলে দিলে গঙ্গায়।

মাকে বলত গদাধর: মা আমাকে দেখিয়ে দে, শিখিয়ে দে। তোর ছেলে হয়ে আমি কি আকাট হয়ে থাকব?

তাকে শেখাবার জন্যই মা পাঠিয়ে দিয়েছেন ভৈরবীকে, তাঁর জ্ঞানবতী যোগেশ্বরী মেয়েকে।

তন্ত্রশাস্ত্রে বিধিবেত্তা, বহুদর্শিনী ভৈরবী। পুত্রবৎ পড়াতে লাগল গদাধরকে। কাকে বলে দিব্য-দর্শন, কাকেই বা বলে দিব্যোন্মাদনা, বইয়ের লিখনের সঙ্গে লক্ষণ

মিলিয়ে দেখিয়ে দিতে লাগল। বহু জিজ্ঞাসার সমাধান হল গদাধরের, হল বহু সংশয়ছেদন। পঞ্চবটীতে বইতে লাগল দিব্যানন্দের ঢেউ। 'চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী।'

দিন সাতেক কেটে গেল অলৌকিক ঘনিষ্ঠতায়। কিন্তু বাইরের সংসার এ ঘনিষ্ঠতাকে কি চোখে দেখছে কে জানে। হয়তো বা ভৈরবীর নামে অন্যায় কিছু রটনা করে বসবে। তাই গদাধর ভৈরবীকে বললে, গাঁয়ের মধ্যে তুমি কোথাও একটু দূরে সরে থাকো না—

ঠিক বলেছ। তবে কোথায় কে জায়গা দেয় কে জানে। তবে যেখানেই থাকি রোজ আসব আমি গোপালকে ননী খাওয়াতে। গোপালকে না দেখে যে আমার সূর্য চন্দ্র উদয় হবে না।

খানিক দূরে উত্তরে দেবমণ্ডলের ঘাটে বামনি থাকবার আশ্রয় পেল। মণ্ডলরাই সাদরে জায়গা করে দিলে তার। চাঁদনিতে তক্তপোশ পেতে দিব্যি থাকো তোমার খুশি-মত।

গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে দু'দিনেই সকলের মন টেনে নিলে ভৈরবী। যেই কাছে আসে সেই মনে-মনে হাত জোড় করে। মুখে-মুখে মধুরতার রসদ যোগায়। এ বলে আমার থেকে সিধে নাও, ও বলে আমার বাড়িতে এসে থাকো। কারুর সাহস নেই দুর্নামের কাদা ছোঁড়ে।

গোপাল! গোপাল! ননী হাতে করে বসে-বসে কাঁদছে বামনি।

প্রায় দু'-মাইল দূর। সে কান্না কালীবাড়িতে গদাধরের কানে এসে লাগে। মা খাবার খেতে ডাকছে শুনে ছেলে যেমন ছোটে তেমনি হঠাৎ ছুট দেয় গদাধর। দু'-মাইল রাস্তা এক নিশ্বাসে পার হয়ে যায়। দম না নিয়েই বামনির হাতের থেকে ননী তুলে নিয়ে খেতে আরম্ভ করে।

কোন-কোন দিন পোশাক বদলায় ভৈরবী। গাঁয়ের মেয়েদের থেকে শাড়ি-গয়না চেয়ে নিয়ে সাজগোজ করে। ওদেরই সাহায্যে তৈরি করে নানা ভক্ষ্যভোগ্য। থালায় করে সাজিয়ে গান গাইতে-গাইতে চলে আসে কালীবাড়ি। নিজের হাতে খাওয়ায় গদাধরকে, তার গোপালকে।

বলে, নিত্যানন্দের খোলে এবার চৈতন্যের আবির্ভাব।

গদাধরের মনে হয় এ যেন সেই নন্দরাণী যশোদা। বাৎসল্যরসের সুরধুনী।

শুধু জননী নয়, জগৎগুরু। বলে, একে-একে চৌষট্টিখানা তন্ত্র শেখাব তোমাকে। মা'র আদেশ। মা'র আশীর্বাদ।

গদাধরের চোখ জলজল করে ওঠে।

ঠাকুরের ধর্মজীবনের প্রথম গুরু নারী। যে নারী মাতৃত্বময়ী মঙ্গলস্বরূপিণী।

॥ ২১ ॥

এ সব কী দেখছে ভৈরবী?

ভগবানের কথা বলতে গেলেই ভাববিভোর হয়ে যায়। কীর্তনে গলে পড়ে, ঢলে পড়ে। ধ্যানে বসলেই সমাধিস্থ। এ সব সেই চৈতন্যদেবের লক্ষণ। সেই জ্ঞান সেই ভক্তি সেই তীব্র বৈরাগ্য। চৈতন্যদেবের জিভে সার্বভৌম চিনি ঢেলে দিলে, চিনি ভিজলই না, ফরফর করে উড়ে গেল হাওয়ায়। তেমনি বহির্ময় সন্ন্যাস। প্রজ্বলন্ত অনাসক্তি। যাকে ছুঁচ্ছে তাকেই ঈশ্বরভাবিত করে দিচ্ছে। যাকে ধরছে তাকেই নাচিয়ে ছাড়ছে। এমন প্রিয় যে নিজের দেহ, তাই ভুল করে ফেলছে। শুধু ভুল কি, শরীরের বোধই নেই এক বিন্দু। চেতনার চিহ্ন নেই এক কণা। এ সবই চৈতন্যদেবের হয়েছিল। যাকে বলে প্রেমোন্মাদ। সাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন, সাগর বলে বোধ নেই। মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়লেন, শরীর সেই মাটির চেয়েও তুচ্ছ। বন দেখে ভাবলেন বৃন্দাবন, সমুদ্র দেখে যমুনা। যেমন গোপিনীদের হয়েছিল। রাসমণ্ডলের মধ্যে থেকে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হলেন, গোপিনীরা উন্মাদিনী হয়ে উঠল। গাছ দেখে বললে, তুমি নিশ্চয়ই কৃষ্ণকে দেখেছ নইলে অমন নিশ্চল, সমাধিস্থ হয়ে রয়েছ কেন? তৃণাচ্ছন্ন মাটিকে দেখে বললে, তুমি নিশ্চয়ই কৃষ্ণকে দেখেছ নইলে অমন রোমাঞ্চিত হয়ে রয়েছ কেন? আবার মঞ্জরিত মাধবীকে দেখে বললে, ও মাধবী, আমার মাধবকে এনে দে। সেই প্রেমোন্মাদ। প্রেমে হাসে প্রেমে কাঁদে প্রেমে নাচে প্রেমে গায়। সেই 'চিদানন্দ-সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী।'

চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবতে পড়েছে ভৈরবী, মহাপ্রভু আবার দেহ ধরবেন। দুঃখ ও অজ্ঞান থেকে জীবোদ্ধার করবার জন্যে অবতীর্ণ হবেন পৃথিবীতে। সন্দেহ নেই, ঠিক-ঠিক মিলে যাচ্ছে। তিনিই এসেছেন।

'মা গো, বুক-পিঠ জলে যাচ্ছে। কত চিকিৎসা করালাম, কিছুতেই কিছু হল না।' ভৈরবীকে বললে গদাধর। 'কি করি বলতে পারো? কিসে যাবে এই জ্বালা-পোড়া?'

সূর্যোদয়ে শুরু হয়, বেলা বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ে। দুঃসহতম হয় দুপুরে। মাথায় গামছা দিয়ে গদাধর তখন গঙ্গায় ডুবে থাকে। রোজ তিন-চার ঘণ্টা।

তবু জ্বালার উপশম হয় না। আরো বেশিক্ষণ ডুবে থাকতে সাহস হয় না, পাছে অন্য কোনো অসুখ হয়। মর্মরের মেঝে ভিজে গামছা দিয়ে মুছে-মুছে ঠাণ্ডা করে। তার পর তার উপর পড়ে থাকে। তবু নিবৃত্তি নেই।

'কিসে যাবে এই দেহের দাহ? কিছু বলতে পারো?'

'পারি।' প্রসন্নচোখে তাকাল ভৈরবী।

এমন কথা শুনতে পাবে গদাধর যেন ভাবতেও পারত না। বিস্ময়ে চমকে উঠল।

'কিসে? কী সেই প্রতিষেধ?'

ভেবেছিল, কি না-জানি কঠিন ক্লেশসাধনা করতে হবে। ভৈরবী নির্মল বয়ানে হাসল। বললে, 'প্রতিষেধ অত্যন্ত সোজা। শাস্ত্রেই তার উল্লেখ আছে।'

কি? কি? সবাই ঘিরে ধরল ভৈরবীকে।

শুধু চন্দনে গা চর্চিত করো। আর গলায় সুগন্ধি ফুলের মালা পরো একটি।

সবাই হেসে উড়িয়ে দিলে।

উড়িয়ে দিলেই তো আর উড়ে যায় না। এমন দাহ শ্রীরাধিকার হয়েছিল। আর যদি প্রত্যক্ষ ইতিহাস চাও, এমনি দাহ হয়েছিল শ্রীগৌরাঙ্গের। এ দাহ চর্মদাহ নয়, এ মর্মদাহ। এ ঈশ্বরবিরহের যন্ত্রণা।

মথুরবাবু বললেন, 'দেখা যাক না এর চিকিৎসাটা।'

সুবাসিত ফুলের মালা পরল গদাধর। সারা গায়ে চন্দন মাখল।

ভালো হয়ে গেল তিন দিনে। গদাধরের গায়ের জ্বালা শীতল হয়ে গেল। পরীক্ষায় সিদ্ধকাম হল ভৈরবী। ঐ দেহে কে বাস করছে—সন্দেহের আর অবকাশ রইল না সিদ্ধান্তে।

তার পর গদাধর যখন বললে সেই শিওড়ে যাবার সময়কার ভাবদর্শনের কথা, কেমন দু'টি ছেলে তার গা থেকে বেরিয়ে এসে ছুটোছুটি করে খেলা করছিল মাঠে-মাঠে, তখন ভৈরবীর সিদ্ধান্ত আরো পাকা হল। ভৈরবী ঘোষণা করলে, নিত্যানন্দের খোলে এবার চৈতন্যের আবির্ভাব।

তুমি সামান্য মানুষ নও। নও বা তুমি শুধু সম্পূর্ণ মানুষ। নও বা তুমি শুধু অতিমানুষ যে উপলব্ধির উচ্চতম চূড়ায় এসে উঠেছে। তুমি অবতার। তুমিই তিনি। অনন্ত ঈশ্বর তোমার মাঝে অন্তর্বান হয়েছে। তোমার মূর্তিতে প্রতিমূর্ত হয়েছেন। তোমার মা যা তুমিই তা। তোমার কায়ায় বাসা বেঁধেছেন মহামায়া। তুমি আবির্ভূত দেবতা। তুমি প্রতিভাত ব্রহ্ম। তারণ করতে তোমার অবতরণ।

এক দিন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করল ভৈরবী।

কিন্তু মথুরবাবু মানতে চান না। কি করে মানবেন? খবরের কাগজে লেখেনি যে। এক জন তার বন্ধুকে এসে বললে, কাল ওপাড়া দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি একটা বাড়ি হুড়মুড় করে পড়ে গেল। বন্ধু বললে, দাঁড়াও, আগে খবরের কাগজখানা দেখি। খবরের কাগজ খুলে দেখল বাড়ি পড়ার কথা কিছু লেখা নেই। কি বলছ হে, খবরের কাগজে তো কিছুই নেই। খবরের কাগজে যখন নেই তখন তোমার কথা বিশ্বাস করি কি করে? তুমি দেখবে চলো সেই ভাঙা বাড়ি। ভাঙা বাড়ি তো দেখব কিন্তু হুড়মুড় করে যে পড়েছে তার প্রমাণ কি?

ঈশ্বর মানুষ হয়ে লীলা করছেন এ তো ইন্দ্রিয়ের তত্ত্ব নয়, ভক্তির তত্ত্ব। অবতার তো জ্ঞানীর জন্যে নয়, ভক্তের জন্যে। নইলে চৌদ্দ পোয়ার মধ্যে অনন্ত এসেছেন এ কি সহজে বিশ্বাস করবার? নরলীলায় ভগবান যদি মানুষ হয়েছেন তো একেবারে ঠিক ঠিক মানুষ হয়েছেন। এতটুকু ভুলচুক নেই, নেই এতটুকু এদিক-ওদিক। একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় নিখুঁত মানুষ। সেই ক্ষুধা তৃষ্ণা রোগ শোক—কখনো বা ভয়, সব ঠিক মানুষের মত। কি করে তাকে চিনতে পারে অবতার বলে? রামচন্দ্র সীতার শোকে অস্থির হয়েছিলেন। লক্ষ্মণ যখন শক্তিশেলে পড়ল তখনও তাঁর কাতরতার অন্ত নেই। মানুষ হয়ে তেমনিই যদি তিনি হাসেন-কাঁদেন, খান-দান, রোগে-কষ্টে জর্জর হন, তবে তাঁকে তুমি চেন কি করে? মনে হবে এ তো মামুলী মানুষই, নারায়ণ কোথায়? বহুরূপী সাধু সেজে এসেছে, ত্যাগী সাধু। সাজ একেবারে নিখুঁত। সাজ দেখে বাবুরা খুব খুশি। যেই একটি টাকা দিতে চেয়েছে, উঁহু করে হাত গুটিয়ে চলে গেল। ত্যাগী সাধু টাকা নেয় কি করে? তার পরে সাজ খুলে যখন সে সহজ হয়ে এল, বললে, টাকা দাও। তেমনি ঈশ্বর যখন মানুষ সেজে আসেন, তখন হুবহু মানুষের মতই আচরণ করেন।

দেহটি আবরণ, ঘেরাটোপ, কিন্তু চেয়ে দেখ, লণ্ঠনের ভিতরে আলো জ্বলছে।

'কিন্তু তা কি করে হয়?' বললেন মথুরবাবু, 'শাস্ত্রে আছে বিষ্ণুর দশাবতার। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ আর কল্কি। এই দশের বাইরে আর অবতার নেই। অদ্ভুভাগবতে যে কল্কির কথা লেখে সে তো বাবা তুমি নও!'

'তার আমি কি জানি!' গদাধর সরলতার প্রতিমূর্তি। বললে, 'তবে বামনি বলছে—'

'কে বামনি?'

'তাকে তুমি এখনো দেখনি বুঝি ?' কথাটা সংক্ষেপে সারল গদাধর। বললে, 'সর্বশাস্ত্রে বিভূষী। ঝোলার মধ্যে এক রাশ পুঁথি। সে পুঁথি দেখে মিলিয়ে-মিলিয়ে বলে আমার দেহে আর মনে না কি অবতারের চিহ্ন। কী যে বলে তা কে জানে।'

বিশেষ আমল দিলেন না মথুরবাবু। বললেন, 'অবতারতত্ত্বের সে জানে কি! বেমক্কা একটা কিছু বললেই তো আর হল না। তবে, হ্যাঁ, কালাকালের যে মহিষী সেই কালীকে তুমি পেয়েছ বটে—'

এক থালা মিষ্টি নিয়ে এদিক পানে আসছে ভৈরবী। আসছে গদাধরকে খাওয়াতে। আনন্দময়ী নন্দরাণীর আবেশে। প্রেমময় মাতৃমূর্তিতে। কাছে এসেই মথুরবাবুকে দেখে আড়ষ্ট হয়ে গেল। খাবারের থালা হৃদয়ের হাতে ধরে দিলে।

'এই বুঝি তোমার সেই বামনি ?' কটাক্ষ করলেন মথুরবাবু।

'হ্যাঁ, এই সেই যোগেশ্বরী ভৈরবী।' বলেই ঠাকুর ভৈরবীকে সম্বোধন করলেন : 'ওগো, তুমি যা বলছিলে তা ইনি মানতে রাজি নন। বলেন, দশের বেশি অবতার নেই।'

'মিথ্যে কথা।' ভৈরবী হুঙ্কার করে উঠল : 'ভাগবতে বাইশ অবতারের উল্লেখ আছে। তার পরেও সম্ভবামি যুগে-যুগে—অসংখ্য বার ভগবানের অবতীর্ণ হবার কথা বলে গেছেন ব্যাসদেব। বৈষ্ণবশাস্ত্রে আছে মহাপ্রভু আবার দেহ ধরবেন। তা ছাড়া গদাধরের সঙ্গে গৌরাঙ্গদেবের কাঁটায়-কাঁটায় মিল—'

এ আরেক পাগলি জুটল দেখি দক্ষিণেশ্বরে! মনে-মনে হাসলেন মথুরবাবু। আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করলেন ভৈরবীকে। এত রাজ্যের রূপ নিয়ে দেশে-দেশে একা-একা ঘুরে বেড়ায়, যোগিনী না নাগিনী তা কে জানে। দেখ এক-বার যাচাই করে।

কালীমন্দিরের বারান্দায় তাকে পাকড়াও করলেন মথুরবাবু। বিদ্রূপের টান দিয়ে তাকে প্রশ্ন করলেন, 'বলি, বেড়ে ভৈরবী তো সেজেছ, কিন্তু তোমার ভৈরব কোথায় ?'

এক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল ভৈরবী। মন্দিরে কালীর পায়ের তলায় যে মহাকাল শুয়ে আছে তার দিকে স্পষ্ট আঙুল দেখাল। বললে, 'ঐ ভৈরব।'

মথুরবাবু ঠোঁট বেঁকালেন। 'ঐ ভৈরবটি তো অচল। বলি সচল ভৈরবটি কোথায় ?'

ফণিনীর মত মাথা তুলল ভৈরবী। দৃঢ়স্বরে বললে, 'ঐ অচলকে যদি সচল

করতে না পারি তবে মিছিমিছি ভৈরবী হয়েছি!'

মথুরবাবু ধাক্কা খেলেন। কিন্তু সন্দেহ যায় না।

গায়ের জ্বালা ঠাণ্ডা হয়েছে গদাধরের, কিন্তু এ আবার কি উপসর্গ শুরু হল।

'মা গো, নিদারুণ খিদে! এই খাচ্ছি আবার অমনি খিদে পাচ্ছে।' ভৈরবীর কাছে নালিশ জানাল গদাধর: 'রাত-দিন আর কোনো চিন্তা নেই, কেবল খাবার চিন্তা। এ আবার আমার কি হল?'

'কোনো ভাবনা নেই।' অভয় দিল ভৈরবী। বললে, 'সবই সেই একই কাহিনী। তোমার মাঝে যে ভাবস্বরূপ বিরাজ করছেন এ তাঁরই ভাব।'

'না মা, এ বুঝি আরেক রকম রোগ হল আমার—'

'দাঁড়াও, সারিয়ে দিই।'

মথুরবাবুকে বললে যত রাজ্যের বিচিত্র খাবার পাও সব এক ঘরে জড়ো করো। গদাধরকে বললে, ঐ খাবারের ঘরে খিল চাপিয়ে একা-একা বাস করো দিন-রাত। যত ইচ্ছে তত খাও, যখন যেমন খুশি। যখন যেমন খিদে। নাও আর খাও, ফেল আর ছড়াও।

অদ্ভুত ব্যবস্থা! কখনো এটা খাচ্ছে কখনো ওটা খাচ্ছে। যত খাচ্ছে ততই খিদে পাচ্ছে। যত খিদে পাচ্ছে ততই খাচ্ছে। কিন্তু তিন দিনের দিন, আশ্চর্য, আর সেই চণ্ডাল খিদে নেই। গদাধর আবার সেই স্বাভাবিক মানুষ। এ সব নির্ভুল অবতারলীলা। বামনি আবার ঘোষণা করল। গদাধর নরদেহে ভগবান।

মথুরবাবু তবুও নারাজ।

'তুমি সভা ডাকাও।' তেজোতপ্ত কণ্ঠে গর্জে উঠল ভৈরবী: 'আমি শাস্ত্রের উক্তি দিয়ে প্রমাণ করব। সাধ্য থাকে কেউ এসে আমাকে খণ্ডন করুক।'

কালীমন্দিরে সাড়া পড়ে গেল। এ বলে কি বামনি?

'ঠিকই বলছি। তোমরা যাকে এত দিন পাগল ভেবে এসেছ, সে স্বয়ং নরদেহী রামচন্দ্র।' ভৈরবী আবার হুঙ্কার ছাড়ল: 'এ শুধু আমার মুখের কথা নয়, এ শাস্ত্রের কথা। শাস্ত্র যদি মানো তবে আমার প্রমাণও মানবে।'

গদাধর বললে, 'বসাও না পণ্ডিত-সভা! মজাটা দেখা যাক না—'

কালীঘরের আমলারা মথুরবাবুর দিকে তাকাল। নিশ্চয়ই উপহাস করে উড়িয়ে দেবেন কথাটা। একটা মাথা-খারাপ বাউণ্ডুলে, সে না কি ঈশ্বর!

না, না, বসাক না সভা। মন্তব্য করলে কেউ-কেউ। সভা করলেই বুজরুকিটা বেরিয়ে পড়বে।

গদাধর নিজে যখন সভার কথা বলছে তখন মথুরবাবু আর আপত্তি করতে পারেন না।

মন্দ কি, নিজের সন্দেহেরও একটা শান্তি হবে।

কিন্তু ডাকাই কাকে ?

সে যুগে সব চেয়ে বড় পণ্ডিত আর সাধক হচ্ছে বৈষ্ণবচরণ আর গৌরীকান্ত তর্কভূষণ।

তাদের নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন মথুরবাবু।

আমি মূর্খ। তবু পণ্ডিতেরা আমার কাছেই আসবে! আমারই জন্যে! ভাবলে গদাধর। ভেবে অবাক হয়ে গেল। মা গো, এ তোর কি আশ্চর্য খেলা!

যে ধান মাপে তার পিছনে বসে আরেক জন কে রাশ ঢেলে দেয়। তুই তেমনি আমাকে রাশ ঠেলে দিস।

॥ ২২ ॥

সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে বৈষ্ণবচরণ চলে এল দক্ষিণেশ্বরে। বসল পণ্ডিত-সভা। ভৈরবী সওয়াল শুরু করল। অবতারের লক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলে আর গদাধরের মধ্যে সে কী পর্যবেক্ষণ করছে তারই বিবৃতি দিলে। প্রায় প্রতিটি লক্ষণ গদাধরের মধ্যে পরিস্ফুট। দেখুন সবাই মিলিয়ে। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বৈষ্ণবচরণকে সরাসরি সম্বোধন করলে ভৈরবী, গদাধর মর্তদেহী ভগবান। আপনি যদি তা না মানেন, বলুন, কেন, কি কারণে আপনি তা মানছেন না—

সাহসিকা জননীর মত আশ্রয়পক্ষপুট বিস্তার করে দাঁড়াল ভৈরবী। দেখি কে আমার গদাধরকে মন্দ বলে। কার সাধ্য ছোট করে গদাধরকে।

আর গদাধর ? সে সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। যাকে নিয়ে এত হট্টগোল, সে হাঁ-ও জানে না, না-ও জানে না। আত্মভোলা শিশুর মত সভার মাঝখানে বসে আছে। কখনো হাসছে কখনো ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে, কখনো বা বটুয়া থেকে মশলা তুলে মুখে ফেলছে। অবতার হলেই বা কি, না হলেই বা কি—তার কী যায়-আসে! সে যেমন আছে বেশ আছে।

বৈষ্ণবচরণ প্রশ্ন করতে লাগল গদাধরকে।

হ্যাঁ, জ্যোতি দেখি। নিদারুণ আনন্দ হয়। বুকের মধ্যে তুবড়ির মত গুরগুর করে মহাবায়ু ওঠে। নাভি থেকে যে শব্দ ওঠে শুনি সেই অনাহত শব্দ। শব্দ-

কল্লোল ধরে সমুদ্রে গিয়ে পৌছুই। সেই সমুদ্রই প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম। তাই পরম পদ। 'যত্র নাদো বিলীয়তে।' সেখানে আমিও নেই তুমিও নেই, একও নেই অনেকও নেই। সে জ্ঞান-অজ্ঞানের পার।

বিজ্ঞানী সাধু। যে দুধের কথা কেবল শুনেছে সে অজ্ঞান, যে দুধ দেখেছে তার জ্ঞান। আর যে দুধ খেয়েছে সে বিজ্ঞানী।

শুধু যে জ্ঞানী তার বসবার ভঙ্গিই অন্য রকম। সে গোঁফে চাড়া দিয়ে বসে। লোক দেখলে ডেকে শুধোয়, তোমার কিছু জানবার আছে? আছে তো বোসো, শোনো।

কিন্তু বিজ্ঞানী—যে সর্বদা ঈশ্বরকে দেখছে, ঈশ্বরের সঙ্গে কথা কইছে, তার ধরন-ধারণ অদ্ভুত। সে কখনো জড়, কখনো পিশাচ, কখনো বালক, কখনো উন্মাদ। বেশ আছে, হঠাৎ সমাধিস্থ হয়ে অসাড়-অস্পন্দ হয়ে গেল। তাই জড়। জগৎ ব্রহ্মময় দেখছে, তাই শুচি-অশুচি মেধ্য-অমেধ্য জ্ঞান নেই। এমন যে ভাত আর ডাল—তাও অনেক দিন রাখলে বিষ্ঠার মতন হয়ে যায়। তাই খাদ্যে আর ত্যাজ্যে সমান ব্রহ্মস্বাদ। তাই আবার পিশাচ। তার রকম-সকম সাধারণের শাদা চোখে স্বাভাবিক নয়। তাই সে পাগল। সে যে খাপ-খোলা তলোয়ার। তাই সে খাপ-ছাড়া। আবার পর মুহূর্তেই সে বালকের মত। কোনো পাপ নেই, লজ্জা-ঘৃণা নেই। ছলা-কলার ধার ধারে না। একেবারে সহজ অবস্থা। সহজ অবস্থাই সিদ্ধ অবস্থা।

আরো অনেক সব উত্তর দিল গদাধর। এটা হয় ওটা হয়, এটা দেখি ওটা দেখি—এই ধরণের উত্তর। নিজে কিছুই জানে না। যার খোঁজ তার খবর নেই! ভৈরবীর সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ সায় দিল বৈষ্ণবচরণ। শুধু তাই নয়, অন্যান্য অবতারে শাস্ত্রোক্ত যত লক্ষণ দেখা দিয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি—প্রায় সমস্তগুলিই—বিকশিত। যে পরমা ভক্তির ফল মহাভাব তা গদাধরে সবিশেষ দেদীপ্যমান। সন্দেহ নেই, গদাধর ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি।

স্বয়ং বৈষ্ণবচরণ বলছে। মথুরবাবু থ হয়ে রইলেন। আমলারা যারা ছিল তারা এ ওর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

ক'দিন পরে হাজির হল এসে গৌরীকান্ত তর্কভূষণ। বাড়ি বাঁকুড়া জেলার ইন্দেশে। বৈষ্ণবচরণ কর্তাভজা, গৌরীকান্ত তান্ত্রিক। মহা শক্তিশালী তান্ত্রিক। প্রতি দুর্গাপূজায় স্ত্রীকে ভগবতীজ্ঞানে আরাধনা করত। যজ্ঞ করার রীতি ছিল অলৌকিক। যজ্ঞের কাঠ মাটিতে সাজাত না, বাঁ হাতের তালুর উপর সাজাত। বাঁ হাত প্রসারিত, করতলের উপর কাঠ সাজিয়ে রাখছে—দু'চারখানা নয়—

সম্পূর্ণ এক মণ কাঠ—আর তাতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে ডান হাতে। যতক্ষণ অনুষ্ঠান না শেষ হচ্ছে ততক্ষণ হাতের উপর জ্বলছে সেই কাঠ। নিজের চোখে একদিন তা দেখেছিলেন ঠাকুর।

সেই গৌরীকান্ত এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। যেমন পণ্ডিত তেমনি তার্কিক। তার সঙ্গে সহজে কেউ এঁটে উঠতে পারে না। দাঁড়াতে পারে না মুখের সামনে। সবাই বলে এও তার তন্ত্রবল।

তর্কসভায় যখন সে ঢোকে তখন প্রাণপণ শক্তিতে একটা হুঙ্কার ছাড়ে। কোনো স্তোত্রের বিশেষ একটা অংশই আবৃত্তি করে হয়তো, কি কণ্ঠস্বরে গগন-বিদার বজ্রের কাঠিন্য। আওয়াজ শুনে ছাদ-দেওয়াল ফেটে পড়বে মনে হয়, ভয়ে হৃৎ-কম্পন স্তব্ধ হয়ে যায়। এই চীৎকারের উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, প্রতিপক্ষকে ভয় পাইয়ে দেওয়া। কেউ-কেউ বলে অমনি চীৎকার করেই না কি সে নিজের মধ্যে তার আশ্চর্য শক্তিকে উদ্দীপিত করে তোলে। সে যে একজন অসীম শক্তিধর ঐ চীৎকারই তার অভিজ্ঞান!

কালীমন্দিরের প্রাঙ্গণে ঢুকে যথারীতি হুঙ্কার ছাড়ল গৌরীকান্ত।

নিজের ঘরের নিরিবিলিতে বসেছিল গদাধর। চীৎকার শুনে চমকে উঠল। কোথাকার কোন পণ্ডিত এসেছে, কি তার শক্তি-সাধনা, কিছুরই সে খবর রাখে না। কিন্তু কি স্তোত্রাংশ বলেছে চীৎকার করে তা ঠিক ধরতে পেরেছে। তার অন্তরে যে বসে আছে সেই বলে দিলে গোপনে। বললে, তুইও ঐ ভাঙা লাইনটা আবৃত্তি কর। কিন্তু খবরদার, ও যতটা জোরে চেঁচিয়েছে, তার চেয়ে আরো জোরে চেঁচানো চাই।

তাই সই। গদাধর চীৎকার করে উঠল। প্রবলতর, পরুষতর কণ্ঠে। মনে হল যেন ডাকাত পড়েছে।

যে যেখানে ছিল হকচকিয়ে উঠল। লাঠি হাতে ছুটে এল দারোয়ানেরা। কি ব্যাপার? ডাকাত কোথায়?

ডাকাত-টাকাত কিছু নয়। গৌরী পণ্ডিতের সঙ্গে পাগলা-পুরোতের প্রতিযোগিতা হচ্ছে—কার গলার কত জোর! সবাই অবাক মানল। পাগলা পুরোতের গলা এত দরাজ! এমন সাংঘাতিক!

হার মানল গৌরীকান্ত। মুখ গম্ভীর করে ঢুকল এসে মন্দিরে। এক ডাকে এত নাজেহাল হবে স্বপ্নেও ভাবেনি। কে এ কালীর বরপুত্র!

তর্কে অজেয় ছিল গৌরী। দেখল তারো চেয়ে আশ্চর্যতর শক্তি আছে। তার যা শক্তি তা তাকে তর্কেই আবদ্ধ করে রেখেছে, তর্কাতীতকে দেখতে দেয়নি। সে

শুধু রৌদ্রই পেয়েছে, রুদ্রকে পায়নি। কিন্তু কে এ আলোকসম্ভব, যে একটি ধ্বনিতেই সমস্ত কোলাহল স্তব্ধ করে দেয়! একটি উক্তিতেই শান্ত করে দেয় সমস্ত জিজ্ঞাসা!

গদাধরের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করল গৌরীকান্ত।

এততেও মথুরবাবু তুষ্ট হলেন না। তিনি আরও পণ্ডিত ডাকালেন। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে শাস্ত্র মিলিয়ে বিচার হোক। মন্দিরের সামনে বিরাট নাটমন্দিরে বিচার-সভা। সে-সভায় ঢোকবার আগে গদাধর মন্দিরে ঢুকল কালী-প্রণাম করতে। কালী-প্রণাম করে বেরিয়ে আসছে, হঠাৎ বৈষ্ণবচরণ তার পায়ে পড়ল। অমনি ভাবসমাধি হল গদাধরের। বৈষ্ণবচরণের অন্তরে বইতে লাগল দিব্যানন্দের প্রবাহ। মুখে মুখে সে তক্ষুনি এক সংস্কৃত স্তোত্র রচনা করে ফেললে। সে স্তোত্রে শুধু গদাধরের স্তুতি।

'বৈষ্ণবচরণের সঙ্গে তর্ক করতে এসেছি আমি।' সমবেত পণ্ডিতদের উদ্দেশ করে বললে গৌরীকান্ত। 'আপনারা এসেছেন সে বাগ্‌যুদ্ধ দেখতে। সে যুদ্ধে কে জেতে তাই নির্ণয় করতে। কিন্তু সে যুদ্ধের আর দরকার নেই। বৈষ্ণবচরণ আজ বিষ্ণুচরণের স্পর্শ পেয়েছে—তাকে পরাস্ত করা মানুষের অসাধ্য। তা ছাড়া তর্ক করার আছে কি। শাস্ত্র মিলিয়ে দেখেছি আমরা দু'জনে, গদাধর ভগবানের মহাবতরণ।'

ওরা বলে কি! গদাধর বালকের মত অবাক মানল। কই আমি তো কিছু বুঝি না।

ঈশ্বরের স্বভাবই তো বালকের মত। ছোট ছেলে যেমন খেলাঘর করে, একবার গড়ে, একবার ভাঙে, ঈশ্বরও তেমনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। ছোট ছেলে যেমন কোনো গুণের বশ নয়, ঈশ্বরও তেমনি তিন গুণের অতীত।

তাই ছোট ছেলেদের সঙ্গে মেশো, তাদের সঙ্গে থাকো। তা হলেই তাদের স্বভাব আরোপ হবে। ওদের কথাই চিন্তা করো। তা হলেই সত্তা পাবে ওদের। তদাকারিতা হবে।

ঈশ্বর কেমনতরো? না, যেন কোনো ছেলে কোঁচড়ে রত্ন নিয়ে রাস্তায় বসে আছে। কত লোক যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। অনেকে চাচ্ছে তার কাছে রত্ন। কাপড়ে হাত চেপে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে বলছে, না, দেব না। আবার যে হয়তো চায়নি, চলে যাচ্ছে আপন মনে, তারই পিছু-পিছু ছুটে যেচে সেধে তাকে দিয়ে ফেলছে।

ভৈরবীর মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। তার কথা সবাই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে।

মথুরের বুক ফুলে উঠল দশ হাত। তিনি যাকে গুরু বলে শিরে ধরেছেন সে গুরুর গুরু, স্বয়ং সচ্চিদানন্দ—নিত্য সত্য জ্ঞানময় ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের অবতার।

অবতার বলে সবাই মেনে নিলেও গদাধর ক্ষান্ত হবার নয়। লোকের কথায় তার সান্ত্বনা কোথায়? সে চায়, নিজের অনুভব, নিজের উজ্জীবন। বোধ থেকে বোধির আস্বাদ। নতুন সাধনায় তাই সে আত্মনিয়োগ করলে। কঠিনতর তপস্যায়। বিধিগত যোগচর্চায়। তারই নাম তান্ত্রিক সাধনা। আর সে সাধনায় তার গুরু হল ভৈরবী যোগেশ্বরী।

এ পর্যন্ত গদাধর নিজের চেষ্টায় ঈশ্বরকে ধরতে চেয়েছে। নিজের চেষ্টায় মানে শুধু অন্তরের ব্যাকুলতায়। দেখা যাক পরের সাহায্যে কত দূর যেতে পারি। পরের সাহায্যে মানে গুরুর নির্দেশে।

সেই গুরু যোগেশ্বরী। একজন কি না স্ত্রীলোক।

কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করতে বলেছেন ঠাকুর। অথচ কি না এক নারী তাঁর গুরু!

তার মানে নারীর মধ্যে যে কামিনী যে তামসী তাকে ত্যাগ করবে। যে যোগিনী, যে মহিমাময়ী মাতৃস্বরূপিণী তাকেই গ্রহণ করবে। অভিনন্দন করবে।

"যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে,
মন, তুই ছাখ আর আমি দেখি
আর যেন কেউ নাহি দেখে।
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি
আয় মন বিরলে দেখি
রসনারে সঙ্গে রাখি
সে যেন মা বলে ডাকে॥"

জনক রাজার আরেক নাম বিদেহ, যেহেতু তিনি নির্লিপ্ত, তাঁর দেহে দেহবুদ্ধি নেই। সেই জনক রাজার সভায় একদিন এক ভৈরবী এসেছিল। স্ত্রীলোক দেখে জনক হেঁটমুখ হয়ে চোখ নিচু করে রইলেন। ভৈরবী বললে, 'তোমার এখনো স্ত্রীলোক দেখে ভয়! তোমার তবে এখনো পূর্ণজ্ঞান হয়নি। পূর্ণজ্ঞান হলে পাঁচ বছরের ছেলের স্বভাব হয়—তখন স্ত্রী-পুরুষ বলে ভেদ থাকে না।'

আমাদের গদাধর সেই পাঁচ বছরের ছেলে। স্ত্রীলোক মাত্রই তার মা'র প্রতিমা। তা ছাড়া কামিনীকাঞ্চনত্যাগ সন্ন্যাসীর পক্ষে, সংসারীর পক্ষে নয়। সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের পট পর্যন্ত দেখবে না। স্ত্রীলোক কেমনতরো জানো? যেমন

আচার-তেঁতুল। মনে করলে মুখে জল সরে। আচার-তেঁতুল সামনে আনতে নেই।

'কিন্তু এ কথা আপনাদের পক্ষে, সংসারীদের পক্ষে নয়।' বললেন ঠাকুর, 'আপনারা যদ্দূর পারো স্ত্রীলোকের সঙ্গে অনাসক্ত হয়ে থাকো। মাঝে-মাঝে নির্জনে গিয়ে ঈশ্বরচিন্তা করো। সেখানে ওরা যেন কেউ না থাকে। ঈশ্বরে বিশ্বাস-ভক্তি এলেই অনেকটা অনাসক্ত হতে পারবে। দু'-একটি ছেলেপুলে হলে স্ত্রী-পুরুষ দুই জনে ভাই-বোন হয়ে যাবে। ঈশ্বরকে সর্বদা প্রার্থনা করবে যাতে ইন্দ্রিয়সুখে মন না যায়, ছেলেপুলে আর না হয়।'

গিরিশ ঘোষ বললে, 'কামিনীকাঞ্চন ছাড়ে কই?'

'তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করো, বিবেকের জন্যে প্রার্থনা করো। ঈশ্বরই খাঁটি আর সব ভেজাল, অসার—এরই নাম বিবেক। জল-ছাঁকা দিয়ে জল ছেঁকে নিতে হয়। ময়লাটা এক দিকে পড়ে, ভালো জল এক দিকে পড়ে। বিবেকরূপ জল-ছাঁকা আরোপ করো। তোমরা তাঁকে জেনে সংসার করো। তাই হবে বিদ্যার সংসার।'

আর অবিদ্যার সংসারে দেখ না মেয়েমানুষের কী মোহিনী শক্তি! পুরুষগুলোকে বোকা অপদার্থ করে রেখে দিয়েছে। হারু এমন সুন্দর ছেলে, তাকে পেতনিতে পেয়েছে। ওরে, হারু কোথা গেল, ওরে হারু কোথা গেল? আর হারু কোথা গেল! সব্বাই গিয়ে দেখে হারু বটতলায় চুপ করে বসে আছে। সে রূপ নেই সে তেজ নেই সে আনন্দ নেই। বটগাছের পেতনি হারুকে পেয়েছে। পেতনি যদি বলে, যাও তো একবার, হারু অমনি উঠে দাঁড়ায়। আবার যদি বলে, বোসো তো, অমনি বসে পড়ে।

তবু ঠাকুর বিয়ে করলেন।

'আচ্ছা, আমার বিয়ে কেন হল বল্ দেখি? স্ত্রী আবার কিসের জন্যে হল? পরনের কাপড়ের ঠিক নেই—তার আবার স্ত্রী কেন?'

নিজেই আবার উত্তর দিলেন ঠাকুর: 'সংস্কারের জন্যে বিয়ে করতে হয়। ব্রাহ্মণশরীরের দশ রকম সংস্কার আছে—বিয়ে তার মধ্যে একটা। শুকদেবেরও বিয়ে হয়েছিল সংস্কারের জন্যে। ঐ দশ রকম সংস্কার হলেই তবে আচার্য হওয়া যায়। সব ঘর ঘুরে এলেই তবে ঘুঁটি চিকে ওঠে।'

বিয়ে করলেন অথচ সংসার ভোগ করলেন না। বিয়ে কত বড় আদর্শ হতে পারে তাই দেখালেন সংসারকে। স্বামী-স্ত্রী ভোগাসনে না বসে বসলেন যোগাসনে। যে কামিনী হতে পারত সে হয়ে দাঁড়াল জ্যোতিষ্মতী জগদ্ধাত্রী।

রতির পৃথিবীতে ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত করলেন মূর্তিমতী বিরতিকে—অতৃপ্তির জগতে সন্তোষময়ীকে। নারীর সব চেয়ে যে বৃহত্তম মহিমা তাই অর্পণ করলেন নারীকে।

'এখানকার যা কিছু করা সব তোদের জন্যে।' ঠাকুর বললেন ভক্তদের : 'ওরে, আমি ষোলো টাং করলে তবে তোরা যদি এক টাং করিস—'

ঠাকুরের জন্যে পূর্ণ নিবৃত্তি, সংসারী ভক্তদের জন্যে অন্তত একটু সংযম। ঠাকুরের জন্যে পূর্ণ নির্বাসনা, সংসারী ভক্তদের জন্যে অন্তত একটু অস্পৃহা।

'বাতাস করো তো মা, শরীর জ্বলে গেল।' অস্থির হয়ে বললেন একদিন শ্রীমা : 'গড় করি মা কলকাতাকে। কেউ বলে আমার এ দুঃখ, কেউ বলে আমার ও দুঃখ, আর সহ্য হয় না। কেউ বা কত কি করে আসছে, কারু বা পঁচিশটে ছেলেমেয়ে—দশটা মরে গেল বলে কাঁদছে। মানুষ তো নয়, সব পশু—পশু। সংযম নেই, কিছু নেই। ঠাকুর তাই বলতেন, ওরে এক সের দুধে চার সের জল, ফুঁকতে ফুঁকতে আমার চোখ জ্বলে গেল। কে কোথায় ত্যাগী ছেলেরা আছিস—আয় রে, কথা কয়ে বাঁচি। ঠিক কথাই বলতেন। জোরে বাতাস করো মা, লোকের দুঃখ আর দেখতে পারি না।'

॥ ২৩ ॥

মা গো, বামনি বলছে তন্ত্রমতে সাধন করতে। করব?

করবি বৈ কি, সম্পূর্ণ ভাবে করবি। ইঙ্গিত করলেন জগদম্বা। বললেন, তন্ত্র-সাধনা জীবনের সর্বাঙ্গীণ সাধনা। সত্তার নিম্নতম স্তর থেকে উচ্চতম স্তরের ক্রম-উন্মোচন। বোধ থেকে বিকাশে চলে আসা, ভোগ ছেড়ে যোগৈশ্বর্যে। জীবসত্তার উপর দাঁড়িয়ে ব্রহ্ম-ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা পাওয়া। চিত্ত থেকে চৈতন্যে উদ্‌বুদ্ধ হওয়া।

শক্তিই তন্ত্রের সর্বস্ব। তন্ত্রে কোথাও কিছু তুচ্ছ নেই হেয় নেই পরিত্যাজ্য নেই। সব কিছুর থেকেই ঈশ্বরী শক্তিকে আহরণ করা, আকর্ষণ করা। আত্মশক্তিকে অধ্যাত্মশক্তিতে নিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ শক্তিকে ছুটিয়ে এনে শিবত্বে পৌঁছে দেওয়া। সমস্ত গতিকে একটি পরম ধৃতির মধ্যে শান্ত করা।

মা গো, তোকে তো আমি দেখেছি, তবে আমার আবার সাধন কি?

দরকার আছে। লাউ-কুমড়োর দেখেছিস তো, আগে ফল হয় পরে ফুল ফোটে। তেমনি তোর আগে সিদ্ধি, পরে সাধন।

তুমি যদি আমাকে অবতারই বলো, বামনিকে গিয়ে ধরল গদাধর, তবে আমার

আবার সাধন কেন ?

দেখি না তোমার নরদেহে তা কী অপূর্ব ঐশ্বর্য নিয়ে আসে। দেহ যখন ধরেছ তখন নিয়েছ সকল বিকারের ভার। তাই দেহের পক্ষে যা সাধ্য সকল সাধন তোমাকে করতে হবে। এ জৈব দেহকে নিয়ে যেতে হবে শৈব স্থিতিতে। মৃন্ময় থেকে চিন্ময়ে। নইলে জীবোদ্ধার হবে কি করে ?

পার্বতী ভগবতী হয়েও শিবের জন্যে কঠোর সাধন করেছিলেন। পঞ্চমুণ্ডীর উপরে বসে পঞ্চতপা। শীতকালে জলে গা বুড়িয়ে থাকা। অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা সূর্যের দিকে।

তেমনি কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হলেও, অনেক সাধন করেছিলেন রাধাযন্ত্র নিয়ে।

'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখাও।' নরদেহ ধরেও কোথায় চলে আসা যায় কোন অলৌকিক তীর্থভূমিতে, তাই তুমি প্রমাণ করো। দেহী হয়েও দেহোত্তীর্ণ হবার আদর্শ তুলে ধরো। তুমি নইলে এই সব দুর্বল অবিশ্বাসী জীব কোথায় আশ্বাস পাবে ? কোথায় এসে ত্রাণ খুঁজবে ? রাগ-বেগ থেকে চলে আসবে বৈরাগ্য-আবেগে ?

তা ছাড়া, শাস্ত্রের মর্যাদা তো রাখতে হবে ষোলো আনা। সংস্কারপালনের জন্যে যেমন বিয়ে করেছ তেমনি শাস্ত্রপালনের জন্যে তোমাকে তন্ত্রসাধন করতে হবে। তন্ত্র সকল শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ।

'দেবীনাঞ্চ যথা দুর্গা বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা।
তথা সমস্তশাস্ত্রাণাং তন্ত্রশাস্ত্রমনুত্তমম্ ॥'

তন্ত্রে তিন রকম আচার—পশু, বীর আর দিব্য। পশ্বাচার সাধারণ জীবের জন্যে। এতে শুধু শম-দম যম-নিয়ম ধ্যান-পূজা যত সব আনুষ্ঠানিক রীতি-নীতি। কামনার থেকে দূরে সরে থাকার চেষ্টা—এতে করে হয়তো বা সেই কামনাকেই মূল্য দেওয়া। এ পথে যতটুকু সম্ভব, জীবভাবের সংস্কার চলে মাত্র, কিন্তু জীবভাবের লয় হয় না। অর্থাৎ জীবত্ব আরূঢ় হয় না শিবত্বে।

বীরাচার অন্য জাতের। কামনার মধ্যে বাস করে তাকে উপেক্ষা করা, উদাসীন থাকা। উল্লাসকে অনুভব করা কিন্তু তাতে আকৃষ্ট বা আবদ্ধ না হওয়া। মৌমাছি হয়ে পদ্মের উপর বসেও মধুপান না করা। ফল পেয়েও ফলত্যাগ করে যাওয়া। সমস্ত স্থূলাধারকে অধ্যাত্মশক্তির আয়ত্তাধীনে নিয়ে আসা। পশু শক্তি দ্বারা চলছে কিন্তু শক্তিকে চালাচ্ছে বীর। বীর শক্তিকে চালিয়ে নিয়ে এসে শিবভাবে প্রতিষ্ঠা দিচ্ছে। শক্তিকে রূপান্তরিত করছে শান্তিতে। স্থূলকে সূক্ষ্মে। বোধকে বিভূতিতে।

আর দিব্য? তিনি জ্ঞানস্বরূপ। তিনি ব্রহ্মমগ্ন। শক্তিতেও তিনি নেই, বিভূতিতেও তিনি নেই। তাঁর স্থিতিতেও ব্রহ্ম, প্রাপ্তিতেও ব্রহ্ম। তিনি প্রশান্ত ও প্রসারিত।

এখন কী করতে হবে?

সর্বপ্রথমে মুণ্ড সাধন করো। যে দেশে গঙ্গা নেই সে দেশ থেকে আগে মুণ্ডমাল। সংগ্রহ করি। স্থাপন করি মুণ্ডাসন।

বাগানের উত্তরসীমায় বেলগাছ। তার নিচে বেদি তৈরি হল। সেই বেদির নিচে তিনটি নরমুণ্ড পুঁতলে। বিকল্প আসন হল পঞ্চবটীতে। সে বেদির নিচে পঞ্চজীবের পঞ্চমুণ্ড। শেয়াল, সাপ, কুকুর, ষাঁড় আর মানুষ। বামনিই সব যোগাড় করেছে ঘুরে-ঘুরে। যেটার জন্যে যে আসন দরকার তাতেই বসে তন্ত্র-সাধন শুরু করলে গদাধর।

অনেক রকম পুজো, অনেক রকম জপ, অনেক রকম হোম-তর্পণ। উগ্র হতে উগ্রতর তপস্যা। একেকটা সাধন ধরে আর দু'তিন দিনের মধ্যেই নিরাপদে পার হয়ে যায়। শাস্ত্রে যে ফল নির্দিষ্ট আছে তাই প্রত্যক্ষ করে। দর্শনের পর দর্শন, অনুভূতির পর অনুভূতি।

এমনি করে গুনে গুনে চৌষট্টিখানা তন্ত্র শেখালে বামনি।

এতটুকু পদস্খলন হল না গদাধরের। কি করে হবে? মা যে তার হাত ধরে আছেন।

এক দিন রাত্রে বামনি কোত্থেকে এক স্ত্রীলোক ধরে আনল। পূর্ণযৌবনা সুন্দরী স্ত্রীলোক। তাকে বেদির উপর বসালে। গদাধরকে বললে, 'বাবা, একে দেবীবুদ্ধিতে পূজা করো।'

স্ত্রী-মাত্রেই মাতৃজ্ঞান গদাধরের। তার ভয় কি। সে তন্ময় হয়ে পূজা করতে লাগল।

পূজা সাঙ্গ হলে ভৈরবী বললে, 'বাবা, সাক্ষাৎ জগজ্জননী-জ্ঞানে এর কোলে বোস। কোলে বসে তদ্‌গত হয়ে জপ করো।'

শিউরে উঠল গদাধর। রমণী দিগম্বরী।

এ কি আদেশ করছিস মা? তোর দুর্বল সন্তান আমি, আমার কি এ দুঃসাহসের শক্তি আছে?

কে বলে তুই আমার দুর্বল সন্তান? তুই আমার সব চেয়ে জোরদার ছেলে। ওখানে ও বসে কে? ও তো আমি। তুই আমার কোলে বসবি নে? এ তো সহজ অবস্থা। এতে আবার দুঃসাহস কি!

"নিবিড় আঁধারে তোর চমকে অরূপরাশি। তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরি-গুহাবাসী।" সত্যিই তো, মা-ই তো বসে আছেন। অমনি সমস্ত দেহপ্রাণ অনন্ত দৈববলে বলীয়ান হয়ে উঠল। রমণীর কোলে বসেই সমাধিস্থ হল গদাধর। বামনি বললে, 'পরীক্ষায় পাশ হয়ে গেছে বাবা।'

আরেক দিন শবের খর্পরে মাছ রাঁধলে ভৈরবী। জগদম্বাকে তর্পণ করলে। গদাধরকে খেতে বললে মাছ। নির্ঘৃণ হয়ে খেল তাই গদাধর।

তার পরে সেদিন যা হল তা কল্পনায়ও ভয়াবহ। ভৈরবী কোত্থেকে গলিত নরমাংস যোগাড় করে আনলে। দেবী-তর্পণের শেষে গদাধরকে বললে, 'এ মাংস জিভে ঠেকাও।'

'অসম্ভব!' এ আমি পারব না।' ঝটকা মারল গদাধর।

'কেন, ঘেন্নার কি! কোনো কিছুকেই ঘেন্না করতে নেই। এই দেখ না, আমি খাচ্ছি।' বলেই এক টুকরো নরমাংস নিজের মুখে ফেলে চিবুতে লাগল বামনি।

'এইবার তুমি খাও।' গদাধরের মুখের সামনে ধরল আরেক টুকরো।

মা, তুই বলছিস? খাব?

দেহে-প্রাণে চণ্ডীর প্রচণ্ড উদ্দীপনা এসে গেল। 'মা' 'মা' বলতে বলতে ভাবাবিষ্ট হল গদাধর। অমনি বামনি তার মুখের মধ্যে মাংসের টুকরো পুরে দিলে।

ভয় নেই লজ্জা নেই ঘৃণা নেই গদাধরের। সে ত্রিপাশমুক্ত।

শেষ তন্ত্র এখনো বাকি। এবার শিব-শক্তির লীলা-বিলাস দেখতে হবে। এই বীরাচারের শেষ সাধন।

এক চুল বিচলিত হল না গদাধর। নির্বিকল্প সমাধিতে প্রশান্ত হয়ে রইল। সমস্ত স্ত্রীত্বেই সে মাতৃত্ব নিরীক্ষণ করছে। রমণী মাত্রেই মা। মাতৃভাবেই আদ্যাশক্তির অধিষ্ঠান।

মাতৃভাব নির্জলা একাদশী—ভোগের গন্ধ নেই এক বিন্দু। ফল-মূল খেয়েও একাদশী হয়। কোথাও বা লুচিছক্কা খেয়ে। সে সব বামাচার। বামাচারে ভোগের কথা আছে। ভোগ থাকলেই ভয়। সন্ন্যাসী যদি ভোগ রাখে, তা হলেই তার পতন। যেন থুতু ফেলে আবার সেই থুতু খাওয়া।

'আমার নির্জলা একাদশী। সব মেয়ে আমার মূর্তিমতী মহামায়া।' বললেন ঠাকুর। 'এই মাতৃভাবই সাধনের শেষ কথা। তুমি মা, আমি তোমার ছেলে—এর পরে আর কথা নেই, এর বাইরে আর সম্পর্ক নেই।'

'বাবা, তুমি আনন্দাসনে সিদ্ধ হয়ে দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে।' বললে ভৈরবী।

সাধনাসম্ভূত সে কী রূপ এল গদাধরের শরীরে। সে এক জ্যোতির্ময় দেহ। রোদে গিয়ে দাঁড়ালে ছায়া পড়ে না। সর্বাঙ্গে সুধাংশু-কান্তি। যেন ধবলগিরি শিরে শিব বসেছেন পদ্মাসনে।

'মা, আমার এই বাইরের রূপে কী হবে? আমাকে অন্তরের রূপ দে। যেন সকল সুরূপে-কুরূপে তোকেই কেবল দেখতে পারি।'

একদিন কালীঘরে পূজার আসনে বসে ধ্যান করছে গদাধর, কিন্তু কিছুতেই মা'র মূর্তি মনে আনতে পারছে না। হঠাৎ চেয়ে দেখে ঘটের পাশ থেকে উঁকি মারছে —ও কে? ও তো রমণী, পতিতা, দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে যে প্রায়ই স্নান করতে আসে! সে কি কথা? মা আজ পতিতার বেশে পূজা নিতে এলেন? 'ওমা, আজ তোর রমণী হতে ইচ্ছে হয়েছে? তা বেশ, যেমন তোর খুশী তাই হ। তেমনি হয়ে তুই পুজো নে।'

আরেক দিন থিয়েটার দেখে ফিরছেন ঠাকুর। গণমোহিনীরা সেজেগুজে, খোঁপা বেঁধে, টিপ পরে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাঁধা হুঁকোয় তামাক খাচ্ছে। 'ওমা, মা, তুই এখানে এভাবে রয়েছিস?' বলে ঠাকুর প্রণাম করলেন ওদের।

জননী, জায়া আর জনতোষিণী—সব সেই জগদম্বার অংশ।

তুমি মহাবিদ্যা। মহাবিদ্যাতে মহা বিদ্যাও আছে, আবার মহা অবিদ্যাও আছে। তেমনি বেদ-বেদান্তও তুই, খিস্তি-খেউড়ও তুই।

'মা, তুই তো পঞ্চাশৎ-বর্ণ-রূপিণী। তোর যে সব বর্ণ নিয়ে বেদ-বেদান্ত, সেই সবই তো ফের খিস্তি-খেউড়ে। তোর বেদ-বেদান্তের ক-খ আলাদা, আর খিস্তি-খেউড়ের ক-খ আলাদা—এ তো নয়! ভালো-মন্দে পাপে-পুণ্যে শুচি-অশুচিতে সর্বত্র তোর আনাগোনা।'

সর্বত্র সমবুদ্ধি। সকলের জন্যে স্থান, সকলের জন্যে মান, সকলের জন্যে আশ্বাস। পাপী আর তাপী, আর্ত আর পীড়িত, অবর আর অধম—কেউ তোমরা হেয় নও, অপাঙ্‌ক্তেয় নও। কেউ নও নিঃস্ব-নিরাশ্রয়। যে অবস্থায় আছ সে অবস্থায় চলে এস। সব অবস্থায়ই সন্তানের স্থান আছে মা'র কোলে। সে যদি আমাদের মা, তবে তার কাছে লজ্জাই বা কি, ভয়ই বা কি! আর, যদি দেরি একটু আমাদের হয়েই থাকে, তাই বলে কি মা'র কখনো দেরি হয়?

ভৈরবী বললে, 'একটু কারণ খাও।'

কারণ? জগৎকারণ ঈশ্বরের অমৃতই তো খেতে চলেছি। এ তুচ্ছ মদিরা তার কাছে কী!

'বাবা, বীরভাবে সাধনা করেই সিদ্ধি পেয়েছি আমি।' ভৈরবী মুগ্ধ বিস্ময়ে

তাকাল গদাধরের দিকে : 'কিন্তু তুমি দিব্যভাবের অধিকারী হয়েছ। তুমি আমার চেয়ে অনেক উঁচুতে।'

দিব্যভাব ? হাসল গদাধর।

তুমি জল না ছুঁয়ে মাছ ধরেছ। তোমার দেহবোধ নেই। তোমার সুষুম্নাদ্বার সম্পূর্ণ খুলে গিয়েছে। তুমি বালকস্বভাব হয়েছ। সর্ব বস্তুতে তোমার অদ্বৈত-বুদ্ধি এসেছে। গঙ্গার জল আর নর্দমার জল তোমার কাছে সমান। তুলসী আর সজনেতে কোনো ভেদ নেই। আমাকে এবার তোমার শিষ্যা করো। আমাকে বীর থেকে দিব্যে নিয়ে চলো। নিয়ে চলো রূপ থেকে অরূপে, ক্রিয়া থেকে সত্তায়, দীপ্তি থেকে তৃপ্তিতে—

তুমি যোগেশ্বরী। তুমি যোগমায়ার অংশ। তোমার আবার অপূর্ণ কি ?

জানি না। কিন্তু তোমার মাঝে এখন যে শান্তি যে বিশুদ্ধি যে স্বচ্ছতা দেখছি, তা আমার অনধিগম্য। তাই মনে হয় আমি অপূর্ণ, অশক্ত। তুমি অগ্নি থেকে চলে এসেছ জ্যোতিতে, ঝড় থেকে নীলিমায়, কেন্দ্র থেকে প্রসারে। আমি তোমার শিষ্যা হব। আমি চাই ঐ শান্তি, ঐ ব্যাপ্তি, ঐ নীরবতা। ঐ দিব্যচেতনা।

গদাধর হাসল। বললে, 'যে গুরু সেই আবার শিষ্য। যে মা সেই আবার সন্তান। যিনি ভগবান তিনিই আবার ভক্ত।'

ভৈরবী বসল এসে গদাধরের ছায়াতলে।

তার এখনো শেষ তপস্যা বাকি।

॥ ২৪ ॥

তন্ত্রে তোমার সিদ্ধি হল, এবার কিছু একটা ভোজবাজি দেখাও। হয় পাহাড় টলাও নয় তো মরা নদীতে জোয়ার আনো।

কিছুই করবে না, শুধু চুপচাপ বসে থাকবে, কি করে তবে বুঝব তুমি মস্ত বড় একটা সাধু হয়েছ !

'মা'র কাছে গিয়ে একটু ক্ষমতা-টমতা চাও না।' হৃদয় পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

ক্ষমতা দিয়ে কী হবে ? মাকে দেখতে পাচ্ছি, টেনে আনতে পারছি কাছে, এই কি যথেষ্ট ক্ষমতা নয় ?

এ পাঁচ জনে দেখতে পারছে কই ? যা দেখে পাঁচ জনের তাক লেগে যায় তেমন একটা কিছু করো।

তন্ত্রবলে অষ্টসিদ্ধির বিকাশ হয়েছে গদাধরে। তাই কি সে এবার প্রয়োগ করবে নাকি? থ বানিয়ে দেবে নাকি সবাইকে?

মা'র কাছে গেল তাই জিগগেস করতে। চক্ষের নিমিষে মা দেখিয়ে দিলেন ও-সব সিদ্ধাই ঘৃণ্য আবর্জনা। বিষ-কলুষ। ভগবানকে পাবার পথের দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায়। যদি একবার ঐ প্রলোভনে পা দাও তবে মাটি হয়ে যাবে সব তপস্যাফল। দেখতে-দেখতে দেউলে হয়ে যাবে।

কৃষ্ণ অর্জুনকে কী বলেছিলেন? বলেছিলেন, অষ্টসিদ্ধির মধ্যে যদি একটিও তোমার থাকে তা হলে তোমার শক্তি বাড়বে বটে, কিন্তু আমায় তুমি পাবে না। সিদ্ধাই থাকলে মায়া যায় না, আবার মায়া থেকেই অহঙ্কার। অহঙ্কার যদি থাকে তবে ভগবানের পথে এগুবে কি করে? ছুঁচের ভিতর সুতো যাওয়া, একটু রোঁ থাকলে হবে না—

আর কী হীনবুদ্ধির কথা! সিদ্ধাই চাই, না, মোকদ্দমা জিতিয়ে দেব, বিষয় পাইয়ে দেব, রোগ সারিয়ে দেব। আহা, এরি জন্যে সাধন?

যে বড়লোকের কাছে কিছু চেয়ে ফেলে, সে আর খাতির পায় না। তাকে আর এক গাড়িতে চড়তে দেয় না। আর যদি চড়তে দেয়ও, কাছে বসতে দেয় না, কথা কয় না মন খুলে।

যদি সিদ্ধাই-ই নিয়ে নিলাম তবে ভগবান বলবেন, আর কেন? খুব হয়েছে। ঐ নিয়েই ধুয়ে খা। ঐ নিয়েই মজে থাক। সেই সাবির কথা জানিস না? সবাই বলছে, সাবির এখন খুব সময়। একখানা ঘর ভাড়া নিয়েছে, দু'খানা বাসন হয়েছে, তক্তপোশ বিছানা মাদুর তাকিয়া হয়েছে, কত লোক আসছে-যাচ্ছে। তার সুখ আর ধরে না। তার মানে আগে সে গৃহস্থ বাড়ির দাসী ছিল এখন বাজারে হয়েছে। তার মানে, সামান্য জিনিসের জন্যে নিজের সর্বনাশ করেছে। যে শরীর-মন-আত্মা দিয়ে ভগবানকে লাভ করব সেই শরীর-মন-আত্মা তুচ্ছ টাকা-কড়ি তুচ্ছ লোকমান্য তুচ্ছ দেহ-সুখের জন্যে বিক্রি করে দেব?

'তবে কী চাইবে মা'র কাছে?' হৃদয় ঝটকা মারল।

'শুধু কৃপা চাইব। বলব, আমাকে ভক্তি দাও, শুদ্ধা ভক্তি, অহেতুকী ভক্তি।'

হ্যাঁ, প্রহ্লাদের যেমন ছিল। রাজ্য চায় না, ঐশ্বর্য চায় না, শুধু হরিকে চায়। কিছু চাও না অথচ ভালোবাসো এরই নাম ভক্তি। তুমি বড় লোকের বাড়ি রোজ যাও কিন্তু কিছুই চাও না, জিগগেস করলে বলো, আজ্ঞে, কিছু না, এমনি একটু শুধু আপনাকে দেখতে এসেছি, এরই নাম নিষ্কাম ভক্তি। যেমন নারদের

ছিল। ঘুরে-ঘুরে বেড়ায় আর বীণা বাজিয়ে হরিনাম গান করে।

গদাধর মন্দিরে গিয়ে মা'র পাদপদ্মে ফুল দিলে। বললে, 'মা, এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার ধর্ম, এই নাও তোমার অধর্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও—'

একটা নিলে আরেকটাও নিতে হবে। যদি মা জ্ঞান নেন তবে অজ্ঞানও নেবেন, পুণ্য নিলে পাপও। অনেক ছাড়া এক নেই। অন্ধকার ছাড়া আলো নেই। অহল্যার শাপ-মোচনের পর শ্রীরামচন্দ্র তাকে বললেন, বর চাও। অহল্যা বললেন, যদি বর দেবে তো বর দাও, যদি পশু হয়েও জন্মাই যেন তোমার পাদপদ্মে মন থাকে।

আমি সিদ্ধি চাই, সিদ্ধাই চাই না। আমার এ সিদ্ধি গায়ে মাখলে নেশা হয় না। এ সিদ্ধি খেতে হয়।

ভৈরবীর সেই দুই শিষ্য—চন্দ্র আর গিরিজা—এক দিন এসে উপস্থিত হল দক্ষিণেশ্বরে। দু'জনেই সিদ্ধাই নিয়ে ব্যস্ত। নানা রকম ক্ষমতার ভেল্‌কিবাজি নিয়ে।

এই হচ্ছে অহঙ্কার। এক রকম মায়া। এক টুকরো মেঘের মতন। সামান্য মেঘের জন্যে সূর্যকে দেখা যায় না। তেমনি এই অহং বুদ্ধির জন্যেই হয় না ঈশ্বরদর্শন।

অহঙ্কার ত্যাগ না করলে ঈশ্বরকে ধরা যায় না। ভার নেন না ঈশ্বর।

কাজকর্মের বাড়িতে যদি এক জন ভাঁড়ারি থাকে তবে কর্তা আর আসে না ভাঁড়ারে। যখন ভাঁড়ারি নিজে ইচ্ছে করে ভাঁড়ার ছেড়ে চলে যায় তখনই কর্তা ঘরে চাবি দেয় আর নিজে ভাঁড়ারের বন্দোবস্ত করে।

তাই, ক্ষমতা নিজের হাতে না নিয়ে ছেড়ে দাও সেই সর্বশক্তিমানের হাতে।

একবার বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী নারায়ণের পদসেবা করছেন, হঠাৎ নারায়ণ উঠে দাঁড়ালেন। লক্ষ্মী বললেন, 'ও কি, কোথায় যাও?' নারায়ণ বললেন, 'আমার একটি ভক্ত বড় বিপদে পড়েছে, তাকে রক্ষা করতে যাচ্ছি।' কিন্তু খানিক-দূর গিয়েই ফিরে এলেন নারায়ণ। 'এ কি, এত শিগগির ফিরে এলে যে?' শুধালেন লক্ষ্মী। নারায়ণ হেসে বললেন, 'ভক্তটি ভাবে বিহ্বল হয়ে পথ চলছিল। মাঠে কাপড় শুকোতে দিয়েছিল ধোপারা, ভক্তটি তাই মাড়িয়ে দিলে। তাই দেখে তাকে মারতে ধোপারা লাঠি নিয়ে তেড়ে এল। আমি তাকে-

বাঁচাতে গিয়েছিলাম।' 'কিন্তু ফিরে এলে কেন?' নারায়ণ বললেন, 'দেখলাম ভক্তটি নিজেই ধোপাদের মারবার জন্যে ইঁট তুলেছে। তাই আর আমি গেলাম না।'

নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে সমর্পণ করে দাও। নিজের জন্যে কিছু রেখো না। নিজেকে দেখিয়েও 'আমি' বলবে না, বলবে 'তুমি'।

চন্দ্রের 'গুটিকা-সিদ্ধি' হয়েছিল। একটি মন্ত্রপূত গুটিকা ছিল তার। সেটি ধারণ করলেই সে অদৃশ্য বা অশরীরী হয়ে যেতে পারত। আর অদৃশ্য হয়েই যেতে পারত যেখানে খুশি, সে জায়গা যতই দুর্গম বা দুষ্প্রবেশ্য হোক। ঐ শক্তি পেয়ে অহঙ্কারে ফুলে উঠেছিল চন্দ্র। ভাবলে, যখন যেখানে খুশি যেমন খুশি যাতায়াত করতে পারি, তখন ঐ দোতলায় সুন্দরী ঐ মেয়েটির ঘরে ঢুকলে কেমন হয়? সম্ভ্রান্ত বড়লোকের মেয়ে, আছে পর্দার ঘেরাটোপে। তা থাক, আমি তো অশরীরী হয়ে তার ঘরে ঢুকব। দরজা বন্ধ থাক, জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে ঢুকব, নয়তো বা কোনো দেয়ালের ছিদ্রপথে। সিদ্ধাইর তেজ দেখাতে গিয়ে চন্দ্র ক্রমে-ক্রমে সেই ধনীকন্যাতে আসক্ত হয়ে পড়ল। ফতুর হয়ে গেল নিঃশেষে। যার জন্যে এত চোটপাট সেই সিদ্ধাইও আর রইল না।

আর গিরিজা? এক দিন শম্ভু মল্লিকের বাগানে বেড়াতে গিয়েছেন ঠাকুর। সঙ্গে গিরিজা। কথা বলতে-বলতে কখন এক প্রহর রাত হয়ে গিয়েছে খেয়াল নেই। পথে এসে দেখেন বিষম অন্ধকার। ঈশ্বরের কথা বলতে বলতে এত তন্ময় হয়ে পড়েছিলেন একটা লণ্ঠন চেয়ে আনতে পর্যন্ত মনে ছিল না। এখন যান কি করে? এক পা হাঁটেন তো হোঁচট খান, দু' পা হাঁটেন তো দিক ভুল হয়ে যায়। কি হল বলো তো—এখন করি কি?

'দাঁড়াও, আমিই আলো দেখাই।'

সিদ্ধাই হয়েছে গিরিজার। সে পিঠের থেকে আলো বের করতে পারে।

কালীবাড়ির দিকে পিঠ করে দাঁড়াল গিরিজা। আলোর ছটা বেরুল একটা। সেই ছটায় কালীবাড়ির ফটক পর্যন্ত দেখা গেল স্পষ্ট। আলোয়-আলোয় চলে এলেন ঠাকুর।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। গিরিজার আর কিছু হল না। লণ্ঠনই হল, সূর্য হল না। ভবতারিণী ঠাকুরের শরীরে ওদের সিদ্ধাই সব টেনে নিলেন। ওরা মোহমুক্ত হল। মন থেকে অভিমান মুছে ফেলে দীনভাবে বসল আবার যোগাসনে।

ও সকলে আছে কি? ওসব তো বন্ধন। মনকে টেনে রাখে, এগোতে দেয় না। জানিস না সেই এক পয়সার সিদ্ধাইয়ের গল্প?

দু ভাই। বড় ভাই সন্নেসী হয়ে সংসার ত্যাগ করেছে। ছোট ভাই লেখা-পড়া শিখে সংসার-ধর্ম করছে। বারো বছর পর বাড়ি এসেছে সন্নেসী, ছোট ভাইর জমি-জমা চাষ-বাস কেমন কী হয়েছে তাই দেখতে। ছোট ভাই জিগগেস করলে, এত দিন যে সন্নেসী হয়ে ফিরলে তোমার কি হল? দেখবি? তবে আয় আমার সঙ্গে। ছোট ভাইকে সন্নেসী নদীর পাড়ে নিয়ে এল। এই ছাখ। বলে নদীর জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলে গেল পরপারে। খেয়ার মাঝিকে এক পয়সা দিয়ে নৌকোয় করে ছোট ভাইও নদী পেরোল। বড় ভাই বললে, 'দেখলি? কেমন হেঁটে পেরিয়ে এলুম নদী।' 'আর তুমিও তো দেখলে', বললে ছোট ভাই, 'আমিও কেমন এক পয়সা দিয়ে দিব্যি নদী পেরোলুম। বারো বছর কষ্ট করে তুমি যা পেয়েছ আমি তা পাই অনায়াসে, মোটে এক পয়সা খরচ করে। তা হলে তোমার ঐ সিদ্ধাইয়ের দাম এক পয়সা!'

আরেক যোগী যোগসাধনায় বাক্‌সিদ্ধি লাভ করেছে। কাউকে যদি বলে, মর্, অমনি মরে যায়। আর যদি বলে, বাঁচ্, অমনি বেঁচে ওঠে। এক দিন দেখে এক সাধু একমনে ঈশ্বরের নাম জপ করছে। ওহে, অনেকই তো হরি-হরি করলে, কিন্তু পেলে কিছু? কি আর পাব? শুধু তাঁকেই চাই, কিন্তু তাঁর কৃপা না হলে কিছুই হবার নয়। তাই করুণা ভিক্ষা করেই দিন যাচ্ছে। ওসব পণ্ডশ্রম ছাড়ো। যাতে কিছু একটা পাও তার চেষ্টা দেখ। আচ্ছা মশাই, আপনি কী পেয়েছেন শুনি? শুনবে আর কি। দেখ। কাছেই একটা হাতি বাঁধা ছিল, তাকে বললে, মর্। হাতি মরে গেল তক্ষুনি। ফের মরা হাতিকে লক্ষ্য করে বললে, বাঁচ্। অমনি গা-ঝাড়া দিয়ে হাতি উঠে দাঁড়াল। দেখলে? কি আর দেখলুম বলুন—হাতিটা একবার মলো, আবার বাঁচলো। তাতে আপনার কী এসে গেল? আপনি কি ঐ শক্তিতে নিজের জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে ত্রাণ পেলেন?

'শোন্, এই দিকে আয়।' ঠাকুর এক দিন চুপি-চুপি ডাকলেন নরেনকে। নিয়ে গেলেন পঞ্চবটীর নির্জনে।

বললেন, 'তোর সঙ্গে একটা কথা আছে।'

নরেন নিস্পন্দ, নির্বাক।

'শোন্, তোকে বলি। আমার মধ্যে অষ্টসিদ্ধি আবির্ভূত আছে। কিন্তু ও আমি কোনো দিন প্রয়োগ করিনি, করবও না। তোকে ও-সব দিয়ে দিতে চাই—'

'আমাকে?'

'হ্যাঁ, তুই ছাড়া আর কে আছে? তোকে অনেক কাজ করতে হবে, অনেক ধর্ম-প্রচার। তোরই ও-সব দরকার। তুই ছাড়া কারু সাধ্যও নেই এত শক্তি ধারণ করে। বল্, নিবি?'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল নরেন। বললে, 'ঐ সব শক্তি আমাকে ঈশ্বরলাভে সাহায্য করবে?'

কি ভাবলেন ঠাকুর। বললেন, 'না, তা করবে না।'

'তবে ও-সবে আমার দরকার নেই।' নরেনের ভঙ্গিতে ফুটে উঠল অনাসক্তির দৃঢ়তা: 'যা দিয়ে আমার ঈশ্বরলাভ হবে না, শুধু লোকমান্য হবে তা দিয়ে আমি কী করব?'

ঠাকুর হাসতে লাগলেন প্রসন্ন হয়ে।

এক দিন নরেন নিজেই গিয়ে উপস্থিত হল ঠাকুরের কাছে। তার ধ্যানের ফল কি হচ্ছে না-হচ্ছে তাই বুঝিয়ে বলতে। খেতে-শুতে-বসতে সব সময়েই ধ্যান করছে নরেন। কাজকর্মের সময়ে মনের কতকটা ভিতরে বসে ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে।

'এ আমার কী হল বলুন তো?'

'কী হল?' ঠাকুর প্রফুল্ল বয়ানে হাসলেন।

'ধ্যান করতে বসে আমি দূরের জিনিস দেখতে পাচ্ছি, শুনছি অনেক দূরের শব্দ। দেখছি কোন বাড়িতে বসে কে কি করছে, কে কি বলছে। উঠে-উঠে যাচ্ছি সে-সে বাড়িতে। গিয়ে দেখছি যা দেখেছি আর শুনেছি সব সত্যি। এ আবার কী নতুন খেলা!'

ঠাকুর বললেন, 'এ সব সিদ্ধাই। তোকে ভোলাতে এসেছে। ঈশ্বরলাভের পথে বাধা সৃষ্টি করতে এসেছে। তুই সিদ্ধাই নিবি কেন? তুই ভগবানকে নিবি। তুই ধ্যানসিদ্ধ হবি। দিন কতক ধ্যান তুই বন্ধ করে রাখ। তার পরে দেখবি ও-সব আর আসবে না। তুই পথ পাবি—নিত্য কালের এগিয়ে যাবার পথ!'

॥ ২৫ ॥

তুমি যেমন আমার মা তেমনি আবার তুমি আমার মেয়ে। তুমি যেমন 'পিতেব পুত্রস্য' তেমনি আবার তুমি সন্তান। তোমার রসের কি আর শেষ আছে? তুমি যেমন ভক্তিতে আছ প্রেমে আছ তেমনি আছ আবার বাৎসল্যে। শীতল স্নেহরসে।

BanglaBook.org

তুমি গুরুর চেয়েও গরীয়ান। তুমি বিশ্বচরাচরের পিতা। তুমি গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং। আবার তুমি বুকে-জড়ানো ছোট্ট অপোগণ্ড শিশু। অবোলা দুধের ছেলে।

'আমি একঘেয়ে কেন হব? আমি পাঁচ রকম করে মাছ খাই। কখনো ঝোলে কখনো ঝালে কখনো অম্বলে কখনো বা ভাজায়।'

আমার নিত্য-নতুন আস্বাদন। তিনি যে রসের অপার পারাবার। রসো বৈ সঃ। তাই রামকে সেবা করবার জন্যে হনুমান সাজি। আবার তাকে স্নেহ করবার জন্যে সাজি কৌশল্যা।

ভক্তের যেমন ভগবান চাই ভগবানেরও তেমনি ভক্ত ছাড়া চলে না। ভক্ত হন রস, ভগবান হন রসিক। সেই রস পান করেন। তেমনি ভগবান হন পদ্ম, ভক্ত হন অলি। ভক্ত পদ্মের মধু খান। ভগবান নিজের মাধুর্য আস্বাদন করবার জন্যেই দু'টি হয়েছেন। প্রভু আর দাস। মা আর ছেলে। প্রিয় আর প্রিয়া।

দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে অনেক সব সাধু-সন্নেসীর আনাগোনা বেড়েছে। পেট-বোরেগীর দল নয়, বেশ উঁচু-থাকের লোকজন। হয়তো গঙ্গাসাগরে চলেছে নয়তো পুরী—মাঝখানে ক'টা দিন দক্ষিণেশ্বরে ডেরা করে যাচ্ছে। স্বচক্ষে দেখে যাচ্ছে গদাধরকে। সর্বতীর্থসারকে।

গদাধর কোথাও নড়ে না। সে স্থির হয়ে বসে আপন মনে গান গায়ঃ

'আপনাতে আপনি থেকো
যেয়ো না মন কারু ঘরে।
যা চা'বি তাই বসে পাবি
খোঁজো নিজ অন্তঃপুরে॥'

এক দিন এক অদ্ভুত সাধু এসে হাজির। সঙ্গে জল খাবার একটা ঘটি আর এক-খানা পুঁথি। সেই পুঁথিই তার একমাত্র বিত্ত। রোজ ফুল দিয়ে তাকে পুজো করে, আর সময় নেই অসময় নেই থেকে থেকে তাকে পড়ে একমনে।

'কি আছে তোমার বইয়ে? দেখতে পারি?' গদাধর এক দিন তাকে চেপে ধরল।

দেখল সে বই। বইটির প্রত্যেক পৃষ্ঠায় লাল কালিতে বড় বড় অক্ষরে দু'টি মাত্র শব্দ লেখাঃ ওঁ রাম! আর কিছু নয়, আর কোনো কথা নয়। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা শুধু ঐ একই পুনরাবৃত্তি।

'কী হবে এক গাদা বই পড়ে? আর কথাই বা আর আছে কী?' বললে সেই বাবাজীঃ 'ঈশ্বরই সমস্ত বেদ-পুরাণের মূল, আর, তাঁতে আর তাঁর নামেতে

কোনোই তফাৎ নেই। তাঁর একটি নামেই সমস্ত শাস্ত্র ঘুমিয়ে আছে। কি হবে আর শাস্ত্র ঘেঁটে? ঐ একটি রাম-নামেই প্রাণারাম।'

এ সাধু বৈষ্ণবদের রামায়েৎ সম্প্রদায়ের লোক। তেমনি আমাদের জটাধারী। গদাধরের তন্ত্রসিদ্ধ হবার পর ১২৭৯ সালে চলে এসেছে ঘুরতে ঘুরতে। সঙ্গে অষ্ট-ধাতুর তৈরি বালক রামচন্দ্রের বিগ্রহ। আদরের নাম রামলালা।

আর কিছুই ধ্যানজ্ঞান নেই জটাধারীর। অষ্টপ্রহর তাকে নিয়েই মেতে আছে। যেখানে যাচ্ছে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে। এক মুহূর্ত কাছ-ছাড়া নেই। যা পায় ভিক্ষে করে তাই রেঁধে-বেড়ে খাওয়ায় রামলালাকে। শুধু নিয়ম রক্ষার নিবেদন নয়। জটাধারী দস্তুরমত দেখে, রামলালা খাচ্ছে, শুধু খাচ্ছে না চেয়ে নিচ্ছে, বায়না করছে। মনে-মনে স্বপ্ন দেখছে না জটাধারী, প্রসারিত চোখের উপরে দেখছে প্রত্যক্ষ। তার রামলালা মূর্তি নয়, মানুষ। বালগোপাল।

আর সারাক্ষণ বসে-বসে তাই দেখছে গদাধর।

কয়েক দিনেই, কি আশ্চর্য, তারই উপর রামলালার টান পড়ল। জটাধারীর কাছে যতক্ষণ বসে আছে ততক্ষণ রামলালা ঠিকই আছে, আপন মনে খেলাধুলো করছে। কিন্তু যেই গদাধর নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ায় অমনি রামলালা তার পিছু নেয়।

"কি রে, তুই আমার সঙ্গে চলেছিস কোথায়?' ধমকে ওঠে গদাধর: 'তোর নিজের লোকের কাছে, জটাধারীর কাছে, ফিরে যা।'

কথা কানেই তোলে না। নাচ শুরু করে রামলালা। কখনো আগে-আগে কখনো পিছে-পিছে নাচতে-নাচতে সঙ্গে চলে।

মাথার খেয়ালে ধাঁধা দেখছে না কি গদাধর? নইলে জটাধারীর পূজা-করা চিরকেলে ঠাকুর, সে জটাধারীকে ফেলে গদাধরের সঙ্গ নেবে কেন? প্রাণে-মনে কী নিবিড় নিষ্ঠায় জটাধারী তাকে সেবা করছে। সেই জটাধারীর চেয়ে গদাধর তার বেশি আপন হল?

কিন্তু রামলালা যদি ধাঁধা হয় তবে চোখের সামনে এই গাছ-পালা বাড়ি-ঘর লোক-জন সবই ধাঁধা।

এই দেখ! দু' হাত তুলে কোলে ওঠবার জন্যে আবদার করছে রামলালা।

উপায় নেই। সত্যি-সত্যি কোলে নিতে হয় গদাধরকে।

তার পর এক দিন হয়তো চুপচাপ কোলে বসে আছে, হঠাৎ খেয়াল ধরল, এক্ষুনি কোল থেকে নেমে যাবে। ছুটোছুটি করবে রোদ্দুরে, নয়তো ফুল তুলবে গিয়ে কাঁটা বনে, নয় তো গঙ্গায় নেমে হুটোপুটি করবে।

ছেলের সে কি দুরন্তপনা! কিছুতেই বারণ শুনবে না। ওরে যাসনি, রোদ্দুরে পায়ে ফোস্কা পড়বে, হাতে-পায়ে কাঁটা ফুটবে, সর্দি হবে ঠাণ্ডা লেগে। কে কার কথা শোনে! দূরে দাঁড়িয়ে ফিক-ফিক করে হাসে রামলালা, কখনো বা ঠোঁট ফুলিয়ে দিব্যি মুখ ভেঙচায়।

'তবে রে পাজি রোস, আজ তোকে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব।' দৌড়ে তার পিছু নেয় গদাধর।

জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে রামলালা। গদাধরও নাছোড়বান্দা। জল থেকে তাকে জোর করে টেনে নিয়ে আসে। এটা-সেটা দিয়ে তাকে ভোলাবার চেষ্টা করে বলে, ঘরের মধ্যে খেলা কর্, বাইরে কেন? তবুও যদি কথা সে না শোনে, দুষ্টুমি না থামায়, সটান চড়-চাপড় বসিয়ে দেয় গদাধর।

সুন্দর ঠোঁট দু'টি ফুলিয়ে জল-ভরা টলটলে চোখে চেয়ে থাকে রামলালা।

তখন আবার গদাধরের কষ্ট। তখন আবার বুকের মধ্যে মোচড় খাওয়া। তখন আবার তাকে কোলে নাও, আদর করো, মিষ্টি-মিষ্টি বুলি শোনাও।

ভাবের ঘোরে ছায়াবাজি দেখছে না গদাধর, দেখছে অবিকল রক্তে-মাংসে। তার নিজের ব্যবহারেও সেই অবিকল বাস্তবতা।

একদিন নাইতে যাচ্ছে গদাধর, রামলালা বায়না ধরল সেও যাবে। বেশ তো চল্, দোষ কি। কিন্তু সবাইর নাওয়া শেষ হয়, ওর হয় না। কিছুতেই উঠবে না জল থেকে। যত বলো, কানও পাতে না। শেষকালে চটে গিয়ে গদাধর তাকে জলের মধ্যে চুবিয়ে ধরল। বললে, নে, তোর যত খুশি জল ঘাঁট্। কিন্তু তা আর কতক্ষণ! গদাধর লক্ষ্য করল জলের মধ্যে রামলালা শিউরে উঠছে। তখন তাড়াতাড়ি হাতের চাপ ছেড়ে দিয়ে রামলালাকে বুকে তুলে নিয়ে পাড়ে উঠে এল গদাধর।

আরেক দিন কি আখখুটেপনা করছে রামলালা। তাকে ভোলাবার জন্যে গদাধর তাকে ক'টি খই খেতে দিল। দেখেনি, খইয়ের মধ্যে ধান ছিল আটকে। এখন দেখে, খই খেতে ধানের তুষ লেগে রামলালার নরম জিভ চিরে গেছে।

কষ্টে বুক ফেটে গেল গদাধরের। রামলালাকে কোলে নিয়ে সে ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগল। যে মুখে লাগবে বলে ননী-সর-ক্ষীরও মা কৌশল্যা অতি সন্তর্পণে তুলে দিতেন, সে-মুখে সে তুলে দিলে কি না ধানসুদ্ধ খই! তার এতটুকুও কাণ্ডজ্ঞান নেই?

গদাধর আকুল হয়ে কাঁদে। তার কোলে রামলালাকে কেউ দেখতে পায় না, কিন্তু সবাই দেখে তার এই কান্নার আন্তরিকতা। শোনে তার এই কান্নার কাতরিমা।

যে দেখে যে শোনে তারই চোখে জল আসে।

রান্না হয়ে গেছে, জটাধারী খুঁজছে রামলালাকে। ওরে খাবি আয়, কোথায় রাম-লালা! খুঁজতে-খুঁজতে এসে দেখে গদাধরের ঘরে গদাধরের সঙ্গে খেলা করছে। অভিমান হল জটাধারীর। বললে, 'বেশ ছেলে তুমি! আমি সব রেঁধে-বেড়ে রেখে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আর তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে এখানে বসে খেলা করছ!' সে-অভিমান বেদনায় গলে পড়লঃ 'জানি না? তোমার ধরনই ঐ রকম। দয়ামায়া বলে কিচ্ছু নেই। বাবা-মাকে ছেড়ে দিব্যি বনে গেলে, বাবা কেঁদে-কেঁদে মরে গেল তবু একবার তাকে দেখা দিলে না। এমনি তুমি পাষাণ!' বলে জোর করে ধরে নিয়ে গেল রামলালাকে।

কিন্তু গা-জুরি করে কত দিন তাকে ঠেকিয়ে রাখবে? ঘুরে-ঘুরেই আবার ফিরে আসে গদাধরের কাছে। দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে জটাধারীর আর যাওয়া হয় না—কি করে যায়? রামলালা যে ছাড়তে চায় না গদাধরকে। আর রামলালাকেই বা জটাধারী কি করে ছাড়ে?

প্রেমাস্পদের চেয়েও প্রেম বড়—শেষ পর্যন্ত বুঝল তাই জটাধারী। সজল চোখে এক দিন তাই দাঁড়াল এসে গদাধরের দোরগোড়ায়।

বললে, 'আমি আজ চলে যাব।'

'যাবে?' চমকে উঠল গদাধরঃ 'তোমার রামলালা?'

'সে এখান থেকে কিছুতেই যাবে না। তাকে তাই তোমার কাছে রেখে যাব।'

'রেখে যাবে?' খুশিতে উছলে উঠল গদাধর।

'হ্যাঁ, তাইতেই ওর আনন্দ। ও আজকে আমাকে আমার মনোমত মূর্তিতে দেখা দিয়েছে, বলেছে এখান থেকে ও নড়বে না এক পা। তাই একা-একা আমিই চলে যাচ্ছি। ও তোমার কাছে আছে, তোমার সঙ্গে খেলাধুলো করছে এই ভেবেই আমার সুখ। ও সুখে আছে এই ধ্যানই আমার শান্তি। ওর যাতে আনন্দ তাইতে আমারও আনন্দ। তাই তোমার কাছেই রইল আমার রামলালা।'

রামলালাকে দক্ষিণেশ্বরে রেখে রিক্ত হাতে চলে গেল জটাধারী।

সে এমন প্রেমের সন্ধান পেয়েছে, যে প্রেমে স্বার্থবোধ নেই, তাই বিচ্ছেদও নেই, বেদনাও নেই। যে প্রেমে পরম পূর্ণতা। যে প্রেম সকল ভাবের বড়—মহাভাব।

পূজার চেয়ে জপ বড়। জপের চেয়ে ধ্যান বড়। ধ্যানের চেয়ে ভাব বড়। ভাবের চেয়ে মহাভাব বড়। মহাভাবই প্রেম। আর প্রেমও যা ঈশ্বরও তাই।

একটি ধাতব মূর্তি এই রামলালা। তাই সবাই দেখত চর্মচোখে। সবারই কাছে সে শুষ্ক প্রতীক ; গদাধরের কাছে পূর্ণ প্রাণবান। এর আগে রঘুবীরকে সে প্রভুরূপেই আরাধনা করে এসেছে, জটাধারীই তাকে গোপালমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে দেখিয়ে দিল তার বালকমূর্তি। যিনি প্রভু যিনি আরাধনীয়, তিনিই আবার শিশু, আদরণীয়। সম্পর্ক শুধু একটা সেতু। সেই সেতু ধরে চলে আসতে হবে এপার থেকে ওপারে, প্রতীক থেকে প্রত্যক্ষে, মূর্তি থেকে ব্যাপ্তিতে, বিশ্বময়তায়। যে বাইরের দুর্লভ নিধি তাকে নিয়ে আসতে হবে অন্তরে, অন্তরের অন্দরমহলে—আর যে অন্তরের ধন তাকে দেখতে হবে বাইরে এনে, সর্ব জীবে, সমস্ত বিশ্বসৃষ্টিতে। সম্পর্ক থেকে চলে আসতে হবে বিরাট বন্ধনহীনতায়।

'মধুর ভাবসাধনের এই তো আসল তাৎপর্য।' বললে ভৈরবী।

"যো রাম দশরথকি বেটা, ওহি রাম ঘট-ঘটমে লেটা। ওহি রাম জগৎ পশেরা, ওহি রাম সবসে নেয়ারা॥"

রাম শুধু দশরথের ছেলে নয়, সে সমস্ত জীবদেহে প্রকাশিত। আবার অমনি প্রকাশিত হয়েও জগতের সব কিছুর থেকে সে পৃথক, মায়াহীন, নির্গুণ।

ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সর্বানুভূ। তিনি যেমন ঘটে তেমনি আকাশে। স্থানে কোথাও তাঁর বিচ্ছেদ নেই, কালে কোথাও তাঁর বিরাম নেই, পাত্রে কোথাও তাঁর বিভেদ নেই। তবু আবার তিনি স্থান-কাল-পাত্রের অতীত।

তাঁর অসীম ক্ষমতা, অনন্ত ঐশ্বর্য, অসামান্য প্রতাপ। কিন্তু আমাদের কাছে তাঁর সত্য পরিচয় কোথায়? তিনি সুন্দর, তিনি সরস, তিনি মধুর। তিনি আনন্দ-আকর।

॥ ২৬ ॥

বাৎসল্য রসের সাধনায় বসে গদাধরের অনুভব হল সে স্ত্রীলোক হয়ে গিয়েছে। সমস্ত স্ত্রীলোকে সে যা মা দেখছে সেই এখন সে-মা। মা কৌশল্যা। অন্তরে বিগলিত স্নেহ, অঙ্গে করুণার্দ্র কোমলতা।

স্নিগ্ধ থেকে চলে এল সে মধুরে। ধরল সে নারীর আরেক রূপ। সম্পর্কের আরেক সেতু। সাধনের আরেক সোপান। সে এখন প্রিয়া, প্রেমিকা, প্রেমোৎসুকা। সে এখন কৃষ্ণকামিনী গোপাঙ্গনা।

কে বলবে সে মেয়ে নয়! বেশ-বাস সব কিনে দিয়েছেন মথুরবাবু। শাড়ি-ঘাগরা ওড়না-কাঁচুলি থেকে শুরু করে মাথার পরচুলা পর্যন্ত। গায়ে এক সুট সোনার

গয়না, পায়ে রূপোর নূপুর। শুধু তাই? চললে-বলনে চেষ্টায়-কটাক্ষে ভঙ্গে-রঙ্গে সে একেবারে হুবহু মেয়ে। সে সখী, সে দাসী, সে সেবিকা।

দুর্গা পূজার সময় জানবাজারে এসেছে গদাধর। মথুরবাবুদের বাড়িতে। গদাধরের আনন্দের অন্ত নেই। সে মা'র দাসী সেজেছে। শুধু মনে-মনে নয়, বেশে-বাসে ইঙ্গিতে-ভঙ্গিতে। অন্তরের এক জন হয়ে মিশে গিয়েছে অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে।

কিন্তু সন্ধ্যায় যখন মা'র আরতি হবে তখন গদাধর কোথায়? মথুরবাবুর স্ত্রী, জগদম্বা, খুঁজতে এসে দেখেন গদাধর সমাধিস্থ হয়ে বসে আছে। সখীরূপে সমাধিস্থ। তাকে ঐ অবস্থায় ফেলে কি করে যান তিনি আরতি দেখতে? ভাবে বিহ্বল হয়ে কোথাও পড়ে-টড়ে যান কি না ঠিক নেই। কিছু কাল আগেই এ বাড়িতে অমনি টলে পড়ে গিয়েছিলেন। আর কোথাও নয়, একেবারে গুলের আগুনের মধ্যে। ক। করবেন তা হলে?

হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি এল জগদম্বার। জগদম্বা তার দামী-দামী গয়না-গাঁটি নিয়ে এলেন। একের পর এক পরিয়ে দিতে লাগলেন গদাধরকে। কানের কাছে মুখ এনে বলতে লাগলেন, 'মা'র এখন আরতি হবে। চলো, মাকে চামর করবে না?'

মা'র নামে ধ্যান ভাঙল গদাধরের। দ্রুত পায়ে চলল সে ঠাকুরদালানের দিকে। সেও পৌঁচেছে অমনি আরতি আরম্ভ হল। আর-আর মেয়েদের সঙ্গে সেও চামর দোলাতে লাগল।

দু' লাইনে ভাগ হয়ে সবিস্ময়ে আরতি দেখছে সব মেয়ে-পুরুষ। কিন্তু মথুরবাবুর বিস্ময়েরই আর শেষ নাই। তাঁর স্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে চামর করছে আরেক জন যে স্ত্রীলোক সে কে? কার স্ত্রী? এত আশ্চর্য সাজ, আশ্চর্য রূপ—সে কোন ঘরের ঘরণী? তাঁর স্ত্রীর বন্ধুদের মধ্যে এত সুন্দরী কেউ আছে না কি?

আরতির শেষে স্ত্রীকে জিগগেস করলেন মথুরবাবু, 'তোমার পাশে দাঁড়িয়ে তখন কে চামর করছিল? বাড়ি কোথায়? কার স্ত্রী?'

'ওমা, তুমি চিনতে পারোনি? উনি বাবা, আমাদের ঠাকুর গদাধর।'

মূক হয়ে গেলেন মথুরবাবু। আশ্চর্য, এত যে কাছের মানুষ, দিন-রাত এক-সঙ্গে থেকেও তাকে চেনা যায় না!

হৃদয়কে এক দিন অন্তঃপুরে নিয়ে গেলেন। মেয়েদের মধ্যে মেয়ে সেজে বসে আছে গদাধর। মথুরবাবু জিগগেস করলেন, 'বলো দেখি ওই মেয়েদের মধ্যে তোমার মামা কোনটি?'

অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকেও চিনতে পারল না হৃদয়।

ভৈরবী বললে, 'আমি চিনিয়ে দিতে পারি। যে রাধারানির মত দেখতে সেই আমাদের গদাধর। গদাধর যখন সকালে ফুল তুলত দক্ষিণেশ্বরে, কত দিন ওকে আমার রাধারানি বলে ভুল হয়েছে।'

গোপিনীদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কাত্যায়নী। গোপিনীরা তারই পুজো করে আর কৃষ্ণ-বর ভিক্ষে চায়। গদাধরও তাই ভবতারিণীর কাছে গিয়েই সর্বাগ্রে প্রার্থনা করল। মা গো, তোর শক্তিবলে সেই মধুরকে এনে দে। তুই শ্যামা, তুই-ই আমার শ্যাম হ।

কিন্তু সেই মধুরের যে সর্বস্বত্বাধিকারিণী, সেই মহাভাবভাবিনী রাধারানিকে তুষ্ট না করলে চলবে কেন? রাধারানির কৃপা না হলে হবে না কৃষ্ণদর্শন।

রাধারানির জন্যে ধ্যানে বসল গদাধর। নিত্য স্মরণ-মনন করতে লাগল সেই অকাম-প্রেমমূর্তির। আকুল আবেগে অবিরাম বলতে লাগল তাকে: আমাকে দেখা দাও। আমি তোমারই সখী, তোমারই সঙ্গিনী। আমাকে বঞ্চনা কোরো না। অদর্শনের বিরহ যে কি তা তো তুমি জানো—

রাধারানি দেখা দিল। নাগকেশরের মত গায়ের রং। সে এক গৌরগৌরবোজ্জ্বল মূর্তি। সে মূর্তি ধীরে-ধীরে এসে মিলিয়ে গেল গদাধরের শরীরে। গদাধর রাধারানি হয়ে গেল।

যা রাধা তাই ধারা। যা ধারা তাই রাধা।

কেঁদে আকুল হচ্ছে শ্রীমতী। ওলো, আমার কৃষ্ণকে এনে দে। না এনে দিবি তো আমাকে সেখানে নিয়ে চল। দিন গুণতে-গুণতে নখের ছন্দ ক্ষয় হয়ে গেল—আমার সেই কৃষ্ণচন্দ্রের উদয় হল কই? সেই কৃষ্ণ মেঘকে কবে দেখতে পাব? আর দেখবই বা কি দিয়ে? মোটে দু'টি মাত্র তো চোখ—তায় তাতে আবার নিমিখ, তাতে আবার বারিধারা। ওলো নিমিখে নিমিখ নাহি সয়। আমি দেখব কি করে?

সুচির-বিরহের নায়িকা। নিরুপাধি প্রেম, অথচ অনির্ণেয় বিরহ। এত যেখানে যন্ত্রণা, সেখানে তাকে ভুলে থাকলেই তো হয়! হায় হায়, তাকে ভুলব কি করে? যখন জল-আহরণে যাই, তখন যমুনা দেখি। যদি গৃহে থাকি, দূরে দেখি সেই গিরি-গোবর্ধন। যদি বনে যাই দেখি সেই কুঞ্জকুটির। শুনি সেই বেণুধ্বনি। তাকে ভুলব কি করে? তাকে বাইরে পাই না বলে অন্তরে অনুসন্ধান করি। সেইখানেই তাকে দেখি, শুনি, ছুঁই, আঘ্রাণ করি। সেই তো আমার মানস-সাক্ষাৎকার। আমার মানস-মহোৎসব। বল্ সই, যিনি অন্তরের অন্তরতম,

তাঁর সঙ্গে কি সর্বাংশে বিরহ হতে পারে ?

তবু, কেন, কেন এই বিরহ ? যাকে অন্তরে পাই তাকে বাইরে পাব না কেন ? যে নিরাধার সে কেন হবে না আধারভূত ? কেন দাঁড়াবে না এসে চোখের সামনে ?

ওলো, শুনেছিস, তাকে গভীর-নিবিড় করে পাব বলেই না কি এই বিরহ। বিরহই হচ্ছে প্রেমরূপা ভাবনা। প্রেমরূপা জীবিকা। মিলনে মন প্রিয়তমে অভিনিবিষ্ট হতে চায় না ; সে কেবল এক লীলা ছেড়ে আরেক লীলার সন্ধান করে, এক বিলাস ছেড়ে আরেক বিলাস। কিন্তু বিরহে সমস্ত সৃষ্টিই যে তদ্‌গত-সমাহিত। মিলনে সে সংক্ষিপ্ত, বিরহে পরিব্যাপ্ত। মিলনে আমি একা, বিরহে ত্রিভুবন আমার সহচর। তাই তো কৃষ্ণ বললেন গোপিনীদের, আমাকে কাছে পেয়ে যত স্বাদ তার চেয়ে বেশি স্বাদ আমাকে ধ্যান ক'রে। মধুধারার মতই এই ধ্যানধারা।

প্রেমের মত আছে কি ! এই বিশ্বসংসার ভগবানের অধীন, কিন্তু ভগবান প্রেমের অধীন। সর্বস্বাধীন ভগবান প্রেমের কামনায় ভক্তের দুয়ারে এসে হাত পাতেন। তিনি তো আপ্তকাম, তাঁর কি কিছু অভাব আছে ? তবে তিনি ভক্তের কাছে প্রেম ভিক্ষা চান কেন ? চান, এ তাঁর অভাব বলে নয়, এ তাঁর স্বভাব বলে।

প্রেমই পুরুষার্থ। বাইরে বিষজ্বালা, ভিতরে অমৃতময়। শীতও আছে আবার আচ্ছাদনও আছে। আচ্ছাদন আছে বলে শীত সুখকর, আবার শীত আছে বলে আচ্ছাদন আরামপ্রদ। তেমনি মিলনের আকাঙ্ক্ষায় বিরহ আনন্দময়, আবার বিরহের উৎকণ্ঠায় মিলনও আনন্দময়। তবু মিলনের চেয়ে বিরহ অধিকতর। মিলনে শুধু সঙ্গ, বিরহে যেমন স্মৃতি তেমনি আবার আশা। প্রথমে যদি বা দুঃখ, পরিপাকে আনন্দ। আর সেই আনন্দই পরাকাষ্ঠা।

গদাধর এখন সেই আনন্দময়ী বিরহিণী।

প্রেমের যে এই আনন্দ, এ কি ভক্তের নিজের আস্বাদের জন্যে ? না গো না, এ ভগবানের আস্বাদনের জন্যে। এ রস তত মিঠা যত এর জ্বালা বেশি। এতে যত আর্তি তত আপ্তি।

চার রকম প্রেম। এক দিক থেকে ভালোবাসা, তার নাম একাঙ্গী। তার মানে এক পক্ষ চায়, অন্য পক্ষ গ্রাহ্যও করে না। যেমন হাঁস আর জল। হাঁস জলকে ভালোবাসে, জল হাঁসকে চায় না। আরেক রকম প্রেম আছে, তার নাম সাধারণী, যেখানে শুধু নিজের সুখ চায়। তুমি সুখী হও বা না হও, বয়ে গেল।

এখানে নায়িকা শুধু আত্মসুখের জন্যে নায়ককে প্রিয়জ্ঞান করে। যেমন চন্দ্রাবলী। তৃতীয় হচ্ছে সমঞ্জসা। সমান-সমান। আমারও সুখ হোক তোমারও সুখ হোক। নায়কের সুখ চাই বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের সুখের দিকে সমান লক্ষ্য। সর্বশেষ, বা, সর্ব-উচ্চ প্রেমের নাম সমর্থা। আত্মসুখ চাই না, শুধু তোমার সুখ হোক। আমার যাই হোক না-হোক, তুমি সুখে থাকো। এই হচ্ছে শ্রীমতীর ভাব। শ্রীমতীর তাই সমর্থা রতি। শুধু কৃষ্ণ-সুখে সুখী। কৃষ্ণৈকনিষ্ঠা। কৃষ্ণময়ী বলেই তো সে শ্রীমতী। মূর্তিময়ী মাধুরী।

তোমাকে সব দেব। কুল আর শীল, ধৈর্য আর লজ্জা, দেহ আর আত্মা, ইহকাল আর পরকাল। কিছু চাই না বিনিময়ে। আমার প্রেম ধর্মাধর্মের অতীত। ধর্মের অতীত, কেননা তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ নেই। অধর্মেরও অতীত, কেননা আমি তোমারই স্বরূপশক্তি। তাই, "যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি"। আমি ছাড়া তুমি নেই। আবার তুমি ছাড়াও আমি নেই। আর সকল সম্বন্ধে একে-একে দুই, শুধু প্রেমেই দুইয়ে মিলে এক।

কে বলবে গদাধর রাধিকা নয়? রূপ যেন ফেটে পড়ছে। শুধু বেশবাসে বা হাবভাবে নয়, মহাভাবে। রাধিকার মতই সে জয়শ্রীমূর্তিধারিণী। তার দেহ যেন অমৃতবর্তিকা। কিন্তু যতই কেননা রূপ দেখছ, সব সেই কৃষ্ণের প্রতিচ্ছায়া। "তোমার গরবে গরবিণী আমি, রূপসী তোমার রূপে।"

মনই শরীরকে তৈরি করে। মনে যেমন ভাব মুখে তেমনি আভা। হনুমানের ভাবে থেকে ল্যাজের সূচনা হয়েছিল গদাধরের। এখন স্ত্রী-ভাবে থেকে তার রোমকূপ থেকে নিয়মিত সময়ে রক্তক্ষরণ হতে লাগল।

পদ্মলোচন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। বললেন, 'এ সব উপলব্ধি বেদ-পুরাণকে ছাড়িয়ে গেছে।'

সে কেন মেয়ে হয়ে জন্মাল না, প্রথম কৈশোরে মনে-মনে আক্ষেপ করেছে গদাধর। মেয়ে হলে গোপিনীদের মত দিব্যি ভজনা করতে পারত কৃষ্ণকে। এক দিন তাকে পেয়েও যেত শেষ পর্যন্ত। এই পুরুষদেহটাই তার সে সাধনার বাধা। যদি আরেক বার জন্ম নিতে হয়, সে ঠিক মেয়ে হয়ে জন্মাবে। ব্রাহ্মণের ঘরের সুন্দরী বালবিধবা হয়ে। কৃষ্ণ ছাড়া আর কাউকে পতি বলে জানবে না। ছোট্ট একটি কুঁড়ে ঘরে সে থাকবে আর থাকবে তার দূর-সম্পর্কের বুড়ো পিসি বা মাসি। ঘরের পাশে সামান্য একটু জমি, তাতে শাক-সব্জি ফলাবে। দিন গুজরাবে চরকা কেটে। গোয়ালে থাকবে একটি গরু, দুধ দুইবে নিজের হাতে। সেই দুধে ক্ষীর-সর করে গলা ছেড়ে কাঁদতে বসবে। ওরে আমার কৃষ্ণ,

খাবি আয়। তোকে নিজের হাতে খাওয়াব বলে এ সব করেছি আমি, বসে আছি কখন থেকে। এত সেবা এত কান্না—সে কি নিষ্ফল হতে পারে? কৃষ্ণ গোপ-বালকের বেশে এসে দেখা দেবে, তার হাতের থেকে খেয়ে যাবে চুপি-চুপি। এমনি এক-আধ দিন নয়, প্রত্যহ।

কিশোর কালের সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি বটে, কিন্তু এখন, সাধনার আরো উচ্চ ভূমিতে এসে গদাধরের শ্রীকৃষ্ণ দর্শন হল। আর ভগবানের ভাবই হচ্ছে এই মধুর ভাব। এই ঘনানন্দময় মধুর ভাবেই তাঁর মতি, রতি, অবস্থিতি। এই মধুর ভাবের সাধনায় শেষ শিখরে এসে গদাধর দেখলে, ঘাস থেকে আকাশ পর্যন্ত সমস্ত কৃষ্ণ। এমন কি, সে নিজেও বাসুদেব। যে রাধা সেই মাধব। কৃষ্ণই দুই অংশে সমান ভাবে বিভক্ত হয়েছেন—প্রিয় আর প্রিয়া, ভগবত্তা আর ভক্তি।

মাটির থেকে একটা ঘাসফুল ছিঁড়লেন ঠাকুর। বললেন ভক্তদের, 'তখন যে কৃষ্ণমূর্তি দেখতাম, এই রকম তার গায়ের রঙ।'

সামান্য ঘাসফুলেও তাঁর লাবণ্যলিখন।

ভাগবত পাঠ শুনছে গদাধর। হঠাৎ জ্যোতির্ময়মূর্তি শ্রীকৃষ্ণকে দেখল সামনে। দেখল তাঁর পা থেকে জ্যোতির একটা ছটা বেরিয়ে এসে প্রথমে ভাগবত স্পর্শ করলে, পরে এসে লাগল তার নিজের বুকে। এর তাৎপর্য কি? বুঝতে দেরি হল না। ভাগবত, ভক্ত আর ভগবান এক। একেই তিন, তিনেই এক।

॥ ২৭ ॥

ও কে স্নান করছে রে গঙ্গায়? কালী মন্দিরে পূর্বমুখ হয়ে ধ্যান করছে গদাধর, তার মনশ্চক্ষে এক সন্ন্যাসীর মূর্তি ভেসে উঠল। নাগা সন্ন্যাসী। কটিতে একটা কৌপীন পর্যন্ত নেই। মাথায় দীর্ঘ জটা, তেজঃপুঞ্জ কলেবর। গঙ্গায় নেমে স্নান করছে।

ধ্যানে এসে সে কী দেখল? গদাধর চলল ঘাটের দিকে।

ঠিকই দেখেছে। দীর্ঘকায় জটাজুটধারী উলঙ্গ এক সন্ন্যাসী তার সামনে এসে দাঁড়াল। দহনোত্তীর্ণ স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল।

'আরে, এই তো পাওয়া গেছে যোগ্য লোক।' গদাধরকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠল সন্ন্যাসী। বললে, 'সাধন-ভজন কিছু করবে?'

গদাধর তো অবাক। কিসের সাধন-ভজন?

'ভাবাতীত অরূপের সাধন। বেদান্তসাধন। যাকে বলে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ। করবে?'

'তার আমি কী জানি!'

'তুমি কী জানো মানে ? তবে কে জানে ?'

'আমার মা জানে।'

'কে তোমার মা ?'

মন্দিরের দিকে ইঙ্গিত করল গদাধর। বললে, 'ঐ পাষাণময়ীই আমার মা।'

বিদ্রূপের সূক্ষ্ম একটু হাসি খেলে গেল সন্ন্যাসীর মুখে। ও তো একটা মূর্তি, একটা পুত্তলিকা। ও আবার মা হয় কি করে ? ঈশ্বর এক, সত্য। দেবদেবী সব ভ্রম।

মুখের উপর কিছু বললে না স্পষ্ট করে। বললে, 'বেশ, যাও, তোমার মাকে জিগগেস করে এস। শোনো, বেশি যেন দেরি করে ফেলো না। বড় জোর তিন দিন এখানে থাকব। তিন দিনের বেশি থাকি না কোথাও এক দণ্ড। এরি মধ্যে দীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।'

গদাধর কতক্ষণ তাকিয়ে রইল সন্ন্যাসীর দিকে। বললে, 'আচ্ছা, আপনি কি তোতাপুরী ?'

'কি আশ্চর্য ! তুমি আমার নাম জানলে কি করে ?'

হ্যাঁ, আমি তোতাপুরী। পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় আমার মঠ ছিল। চল্লিশ বছর ধরে সাধনা করেছি। নর্মদাতীরে দুশ্চর তপশ্চর্যায় নির্বিকল্প সমাধি হয়েছে আমার। হয়েছে ব্রহ্মসাক্ষাৎ। ব্রহ্মজ্ঞ হবার পর তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছি। গঙ্গাসাগর আর শ্রীক্ষেত্র দর্শন করে আমি এসেছি দক্ষিণেশ্বরে। মাত্র তিন দিনের জন্যে। আমি শক্তি-ভক্তি মানি না। আমি আছি বিশুষ্ক জ্ঞানের কাণ্ডে। আমি বেদান্তবাদী। আমার নিরাকার ব্রহ্মসাধনা।

গদাধর চলে এল ভবতারিণীর দুয়ারে। বললে, 'মা, তোতাপুরী বলছে নিরাকার সাধনা করতে। করব ?'

'করবে বৈ কি।' আদেশ হল মা'র। 'তোমাকে শেখাবার জন্যেই সে এসেছে।'

কিন্তু বামনির বড় আপত্তি। সে বলে, ওই ন্যাংটার কাছে তুমি ঘেঁষো না। ও তোমার সমস্ত ভাব-টাব নষ্ট করে দিয়ে শুকনো দড়ি বানিয়ে ছাড়বে।

বানাক না। ভাবরাজ্যের চরম ভূমিতে এসেছি। এবার ভাবাতীত অদ্বৈত-ভূমিটা বেড়িয়ে আসি একবার।

মেয়েরা তত দিনই পুতুল খেলে, যত দিন তাদের বিয়ে না হয়। বিয়ে হয়ে যখন স্বামী পায় তখন পুতুলগুলি প্যাঁটরায় পুঁটলি বেঁধে তুলে রাখে। তেমনি ঈশ্বর লাভ হলে আর প্রতিমার দরকার হয় না।

সাকার-নিরাকার দুই-ই লাগে। কেউ সাকার থেকে নিরাকারে আসে। কেউ

নিরাকার থেকে সাকারে। রসুনচৌকিতে দুই-ই লাগে। পোঁও লাগে, সানাইও লাগে। পোঁ-এর শুধু এক সুর—সে যেন নিরাকার। আর সানাইয়ে বাজছে কত রাগ-রাগিণী। ঈশ্বরকে নানা ভাবে সম্ভোগ।

তা ছাড়া, মা'র আদেশ হয়েছে। গদাধর সটান চলে এল তোতার কাছে। বললে, 'হ্যাঁ, মা মত দিয়েছে। দীক্ষা নেব। আমাকে চেলা করুন আপনার।'

'গুরু মিলে লাখ তো চেলা মিলে এক।' উল্লসিত হয়ে উঠল তোতা। বললে, 'প্রথমে শিখা-সূত্র ত্যাগ করে যথাশাস্ত্র সন্ন্যাস নিতে হবে তোমাকে।'

'নেব। কিন্তু গোপনে।'

'গোপনে কেন?'

বছর খানেক হল আমার মা এখানে এসে রয়েছেন। এ মা আমার গর্ভধারিণী মা। সব সংস্কার বিসর্জন দিয়ে যদি পাকাপাকি ভাবে সন্ন্যাস নিই, আর মা যদি জানতে পারেন তবে বড় আঘাত পাবেন।'

এ হচ্ছে বারশো একাত্তর সালের কথা। বছর খানেক আগে থেকেই এখানে আছেন চন্দ্রমণি। যে সংসারে গদাধর নেই সে সংসার তাঁর কাছে অসার। তাই তিনি বাকি জীবন গদাধরের কাছেই কাটিয়ে দিতে চান গঙ্গাতীরে। আছেন নহবৎখানায়। গদাধরকে দেখতে পাচ্ছেন চোখের উপর—এর বেশি আর কিছু তাঁর চাইবার নেই।

মথুরবাবু এমনিতে খুব হাত-টান, অথচ গদাধরের বেলায়, কেন কে জানে, তাঁর উদারতার অন্ত নেই। সেই উদারতা চন্দ্রমণির দুয়ার পর্যন্ত এগিয়ে এল। একদিন মথুরবাবু বললেন, 'আচ্ছা ঠাকুমা, তুমি তো কোনো সেবা নিলে না আমার থেকে?'

'আমার অভাব কোথায়?' হাসলেন চন্দ্রমণি।

'তবু কিছু নাও না চেয়ে। যা তোমার খুশি।'

'কি চাইব? চাইবার আমার কি আছে! খাবার-পরবার এতটুকু কষ্টও তো তুমি রাখোনি।'

তবু মথুরবাবু পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। আমার বুঝি কিছু দিতে ইচ্ছে করে না তোমাকে? যা মন চায় একটা কিছু নাও না।

যার গদাধর আছে তার আবার চাইবার আছে কি? তবু মথুরবাবুর পীড়াপীড়িতে কিছু একটা না চেয়ে থাকতে পারলেন না। বললেন, 'যদি নেহাৎ দেবেই তবে আমাকে চার পয়সার দোক্তা কিনে দাও।'

এমন নির্লোভ মা না হলে এমন নিষ্কাম ছেলে হয়! সেই মা যদি টের পান ছেলে

সমস্ত সংসার-সম্পর্ক ঘুচিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাচ্ছে তবে সইবেন কি করে ?

তোতাপুরী বললে, 'বেশ, গোপনেই দীক্ষা দেব। কেউ জানতে পাবে না।'

সর্বাগ্রে নিজের প্রেত-পিণ্ড দাও। শ্রাদ্ধাদি করে সংযত হয়ে অবস্থান করো। পঞ্চবটীর সাধন-কুটিরে জড়ো করো সব উপচার। শুভ-মুহূর্তের উদয় হলে খবর দেব।

এল সেই ব্রাহ্ম মুহূর্ত। সপ্ত শিখা মেলে জ্বলে উঠল হোমাগ্নি।

সম্যক প্রকার ত্যাগের নাম সন্ন্যাস। এ সর্বস্বত্যাগ ঈশ্বরার্থে। কিন্তু কী তোমার আছে যে ত্যাগ করবে ? দেহ-মন-ইন্দ্রিয় কিছুই তোমার আপনার নয়। যার নিজের বলতে কিছু নেই, সে ত্যাগ করবে কী ?

তাই ত্যাগ করবার জন্যে অর্জন দরকার। আগে অর্জন কর—অর্জন কর আত্ম-বিভূতি। সকল জগৎকে আত্মবোধে প্রাণময় করে তোলো। এই বিশ্বরূপকে নিজের রূপ বলে অনুভব করো। সেই অনন্ত অনুভূতির মধ্যে নিজেকে বিসর্জন দাও। এই-ই ত্যাগ, এই-ই সন্ন্যাস। যার সেই ঐশ্বর্য নেই বিভূতি নেই, সে ত্যাগ করবে কী ? সে তো দীনহীন ভিক্ষুক।

কী যে প্রার্থনীয় তাই মানুষ জানে না, তাই ধন-জন কাম-যশ চেয়ে বসে। চাওয়া আর পাওয়া দুই-ই ভ্রান্তিবিলাস—কেন-না পেলেও অভাব মেটে না। কী পেলে যে তার শান্তি হয় তা সে জানে না বলেই ওসবের পিছু নেয়। শুধু খবর পায় না বলেই অলিতে-গলিতে ঘোরে। যদি একবার আনন্দময় ঈশ্বরসত্তার খবর পেত, প্রহ্লাদের মত যদি স্ফটিক-স্তম্ভেও হরি দেখত, তা হলে আর মণি ফেলে কাচ কুড়োত না। মধুর জ্ঞান নেই বলেই গুড় খোঁজে।

সর্বদেশে সর্বদিকে সর্বাবস্থায় নিয়ত মধু ক্ষরণ হচ্ছে এই উপলব্ধিই ঈশ্বরোপলব্ধি।

তোতাপুরী মন্ত্র পাঠ করতে লাগল।

দৃঢ়াসীন হয়ে বোসো। তদ্গত মনে শোনো। সমিদ্ধ হুতাশনে আহুতি দাও। প্রার্থনা করো।

হে যজ্ঞপতি, হে পরমাত্মন, আমার সমস্ত প্রাণবৃত্তি তোমাকে আহুতি দিচ্ছি, তুমি আমাতে প্রকাশিত হও। তুমি তো নিত্যকালের প্রকাশ, একবার আমার হয়ে প্রকাশ পেয়ে ওঠো। অখণ্ডৈকরস ব্রহ্মরস্তু আমাতে দীপ্যমান করো। বুঝতে দাও তুমিও যা আমিও তা। কোনো দ্বৈত নেই, সর্বত্র এক অখণ্ড চৈতন্য মাত্র বিদ্যমান। জীব আর ঈশ্বর একই অদ্বিতীয় পরম তত্ত্বের দুইটি পৃষ্ঠা। দাও আমাকে সেই একত্ববোধের চেতনা।

তার পর শুরু হল বিরজা হোম।

আমার দেহ যে পঞ্চভূতে তৈরি সে ভূতপঞ্চ শুদ্ধ হোক। শুদ্ধ হোক আমার কোষ-পঞ্চ, অন্নময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় আনন্দময় কোষ। শুদ্ধ হোক পঞ্চবায়ু—প্রাণ, অপান, সমান, উদান আর ব্যান। পঞ্চেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে যে পঞ্চবিষয়—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস আর গন্ধ, তাও শুদ্ধ হোক। শুদ্ধ হোক আমার দেহ আর মন, বাক্য আর কর্ম, শুদ্ধ হোক আমার নিরোধ-সমাধি। হে জ্বালামালী, হে সর্বদেবমুখ বৈশ্বানর, আমার মধ্যে জাগ্রত হও। হে সর্বার্থসাধক, আমার অভীষ্টলাভের পথে যত বাধা আছে সব বিনাশ করো। দাও আমাকে সেই সম্যক প্রজ্ঞা, যাতে গুরুদত্ত জ্ঞান নিরন্তর জাজ্বল্যমান থাকে। আমি স্ত্রী-পুত্র ধন-মান রূপ-যৌবন কিছুই চাই না। আমার সমস্ত পার্থিব বাসনা তোমাকে আহুতি দিয়ে নিঃশেষে ত্যাগ করছি। আমি নিজেই এখন সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম। যে ভাবে ঈশ্বর সমাহিত আমিও এখন সেই সর্বতো-নিরাবরণ সর্ব-প্রশান্ত পরমানন্দময় মহদাত্মভাবে নিমগ্ন। হে অর্চিষ্মান, আমি এখন শিখাহীন বিশুদ্ধ জ্যোতি। নিরবয়ব আভা।

নবজন্মে দীক্ষা হল গদাধরের।

রূপ থেকে চলে এল অরূপে। অল্প থেকে ভূমায়। পরিমিত থেকে নিরতিশয়ে।

আকার থেকে অকায়ে।

শিষ্যকে নতুন কৌপীন আর কাষায় দিল তোতাপুরী। বললে, এবার তোমাকে নতুন নাম দেব।

'আমার নামও বদলে যাবে?'

'শুধু নাম নয়, পদবীও বদলে যাবে। তুমি এখন সম্পূর্ণ নতুন। নতুন দেশে তুমি নতুন জন্মালে।'

গদাধর তাকিয়ে রইল আবিষ্টের মত।

'হ্যাঁ, এখন থেকে তোমার নাম রামকৃষ্ণ। সন্ন্যাসে যখন দীক্ষা নিলে, অর্থাৎ কি না, যখন শ্রী-তে অধিষ্ঠিত হলে, তুমি শ্রীরামকৃষ্ণ। আর পদবী? পদবী পরমহংস। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। পরমহংস কাকে বলে জানো তো?'

'জানি।' আবিষ্টের মতই বললে গদাধর। 'দুধে-জলে একসঙ্গে থাকলেও যিনি হাঁসের মত জলটি ছেড়ে দুধটি নিতে পারেন। বালিতে-চিনিতে একসঙ্গে থাকলেও যিনি পিঁপড়ের মত চিনিটুকু নিতে পারেন।'

ঠিক বলেছ। তিনিই পরমহংস। খোসাটি ছেড়ে সারটি নাও। খণ্ড ছেড়ে অখণ্ডকে। উপাধি ছেড়ে নিত্যবস্তুকে।

'জানিস, পরমহংস দুই রকম।' ঠাকুর এক দিন বললেন গিরিশ ঘোষকে: 'জ্ঞানী পরমহংস আর প্রেমী পরমহংস। যিনি জ্ঞানী পরমহংস, তিনি আপ্তসার—ভাবখানা, একলা আমার হলেই হল। কিন্তু যিনি প্রেমী পরমহংস, তাঁর একলার হলেই সুখ নেই—ঈশ্বরকে পেয়ে তার সংবাদ দিয়ে যেতে চান জনে-জনে। কেউ আম খেয়ে মুখটি পুঁছে ফেলে, কেউ বা আর পাঁচজনকেও দেয়। পাতকো খোঁড়বার সময় যে সব ঝুড়ি-কোদাল আনা হয়, খোঁড়া হয়ে গেলে কেউ সেগুলো ঐ পাতকোতেই ফেলে দেয়, কেউ বা তুলে রেখে দেয় যদি পাড়ার লোকের কারুর দরকারে লাগে। নারদ-শুকদেব ওঁরা পরের জন্য ঝুড়ি-কোদাল তুলে রেখেছিলেন।'

গিরিশ ঘোষ বললে, 'আপনিও তেমনি। আপনি তবে আমাকে আশীর্বাদ করুন।'

'আমি কে? আমি কেউ নয়। তুমি মাকে বলো, মাকে ডাকো, হয়ে যাবে।'

'হয়ে যাবে? কিন্তু আমি যে পাপী, ঘোরতর পাপী।'

ঠাকুর বিরক্ত হলেন। বললেন, 'ও কথা মুখেও এনো না। যে নিজেকে সব সময়ে কেবল পাপী-পাপী বলে সে পাপীই হয়ে যায়। বলো, আমি মা'র সন্তান। আমি মাকে ধরেছি—আমার আবার পাপ কী!'

'বলছি। কিন্তু আপনি আমার হয়ে একটু বলুন—'

'আমি বলব কি! আমি কে! আমি কেউ নয়। আমি খাই-দাই তাঁর নাম করি। তোমার যদি আন্তরিক হয়—'

'সেই তো কথা। ঐ আন্তরিকটুকুই তো নেই। ঐটুকু যদি দেন—'

'আমি কে! নারদ-শুকদেব ওঁরা হতেন, তাহ'লে না-হয়—'

'নারদ-শুকদেবকে পাব কোথায়! আমরা পাচ্ছি শ্রীরামকৃষ্ণকে।'

ঠাকুর হাসতে লাগলেন। বললেন, 'যো-সো করে একটা কিছু ধরলেই হয়। আসল হচ্ছে বিশ্বাস, আসল হচ্ছে শরণাগতি।'

॥ ২৮ ॥

এবার ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা হও। বললেন তোতাপুরী।

বললেন, নাম আর রূপের সীমার মধ্যে মায়া খণ্ডিত হয়ে আছে, সে সীমা লঙ্ঘন করে চলে এস নিজ লোকে, ব্রহ্মসাধর্মে। তোমার নিজের মধ্যে অবস্থিত যে

আত্মতত্ত্ব তাকে আবিষ্কার করো। তোমার সীমিত আমিকে ব্রহ্মানুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত করো। স্বসত্তাবোধের লোপ নয়, স্বসত্তাবোধের প্রতিষ্ঠা।

এই অদ্বৈতবাদ। এই আত্মবোধ জাগানোতেই অদ্বৈতবাদের সার্থকতা। আমি ক্ষুদ্র নই আমি নীচ নই, আমি মহান আমি ভূমা এই উদার উচ্চবোধই আত্মবোধ। আত্মবোধই আনন্দ। আর, আনন্দই সৎ।

আবার বললেন, বোঝো ভালো করে। জীব মাত্রই ঈশ্বরের আভাস। জীব প্রতিবিম্ব, ঈশ্বর বিম্বস্থানীয়। আসলে জীব আর ব্রহ্ম অভিন্ন। জীব ব্রহ্মের পরিণাম। আবার জীবের পরিণাম ব্রহ্ম। এই জ্ঞানেই আত্মস্বরূপের স্ফূর্তি। এই জ্ঞানই মোক্ষ।

এখন তুমি চার দিকে ঈশ্বরকে দেখছ, কিন্তু এ সাধনায় তুমি আর চার দিকে তাকাবে না, দিকবিদিকের ভাব ভুলে কেবল এক দিকে, একমাত্র ঈশ্বরের দিকেই তাকাবে। চার দিকে ফিরে-ফিরে চার দিকে ঈশ্বরকে দেখাও তো চঞ্চলতা। কিন্তু এ সাধনায় চিত্ত নিশ্চল হয়ে একাগ্র হয়ে কেবল সেই এক-কেই দেখবে। তখন আর তোমার পৃথকত্ব থাকবে না। ঈশ্বরের ভিতরেই তোমার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ হবে। ঈশ্বরে যে শাশ্বতী শান্তি তাই অবস্থিতি করবে তোমাতে।

কিন্তু আমাকে কী করতে হবে তাই বলো না। প্রশ্ন করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

তোমাকে বসতে হবে এখন নির্বিকল্প সমাধিতে। সেই গুণাতীত নির্বিশেষের তপস্যায়।

যার চেয়ে দূরবর্তী কিছু নেই, যার চেয়ে নেই কিছুই নিকটবর্তী; যার চেয়ে সূক্ষ্মতর কিছু নেই, যার চেয়ে নেই কিছুই মহত্তর, আকাশে বৃক্ষের মত যিনি স্তব্ধ ভাবে বিরাজমান, যিনি এক—দেশ, কাল ও বস্তু এই ত্রিবিধপরিচ্ছেদ-শূন্য—অদ্বিতীয়, সেই অসঙ্গ পুরুষের ধ্যান করো। বলো, আমার এই ক্ষীণ প্রাণস্পন্দন তোমার মহান প্রাণের সঙ্গে যোজনা করে দাও, এই ক্ষুদ্র প্রাণ তোমার বিরাট প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হোক। তোমার অন্তরের স্বভাবের সঙ্গে আমার অন্তরের পরিচয় করিয়ে দাও। তোমার নামে আমার কাজ নেই, তোমার রূপে আমার কাজ নেই, তোমার স্বভাবটি আমার স্বভাব হোক।

সমাধিতে বসল রামকৃষ্ণ।

শরীর আর ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের চরম স্থিরতার নামই সমাধি। যখন ধ্যাতা নিজেকে ভুলে গিয়ে কেবল ধ্যেয় বিষয়মানতা উপলব্ধি করে তখনই সে সমাহিত। কিন্তু রামকৃষ্ণ চিত্ত একবার স্থির করেছে কি, ধ্যানচক্ষে জগদম্বা এসে উদয়

হয়েছেন। কিছুতেই নামের বা রূপের গণ্ডি পেরিয়ে বেরিয়ে আসতে পারছেন না। যেই মনকে একাগ্র ভূমিতে নিয়ে আসছে অমনি মন রূপময় হয়ে উঠছে। আমি ভোক্তাও নই ভোজ্যও নই, আমি শুধু ভোজন, এই নির্বিতর্ক চেতনায় মন নিশ্চল হচ্ছে না।

'ও আমার হবে না।' চোখ মেলল রামকৃষ্ণ।

'কেঁও তোগা নেহি?' ধমকে উঠলেন তোতাপুরী। হতেই হবে। রূপের পদ্মসরোবর পেরিয়ে চলে আসতে হবে অরূপের মহাসমুদ্রে।

এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল তোতা। কুটিরের বাইরে এক টুকরো ভাঙা কাচ চোখে পড়ল। তাই কুড়িয়ে এনে রামকৃষ্ণের কপালের উপর, ঠিক ভুরু দু'টির মাঝখানে, টিপে ধরল সজোরে। বললে, 'মনকে ঠিক এই বিন্দুতে গুটিয়ে আনো।'

আবার সংকল্পহীন হবার সংকল্প নিয়ে ধ্যানে বসল রামকৃষ্ণ। আবার জগদম্বা আবির্ভূতা হলেন। কিন্তু এবার আর রামকৃষ্ণ অভিভূত হবে না। স্বস্থানে নিয়তাবস্থ থাকবে। যেই জ্ঞান নিরংশ, নিরবচ্ছিন্ন, সেই জ্ঞানে সমাসীন থাকবে। মূর্তি থেকে চলে আসবে সে ভাবে, আকার থেকে একাকারে। মূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল আস্তে-আস্তে—আর কোথাও কোনো বিকল্প বা বিশেষের লেশ রইল না। নিষ্কল-নির্মল, শান্ত ও সর্বাতীত এক রাজ্যে এসে রামকৃষ্ণ স্তব্ধ হয়ে গেল। এই অদ্বৈত-সাধনার সমাধি।

তোতা চুপচাপ বসে রইল পাশে। এক মনে দেখতে লাগল শিষ্যকে। বিন্দুমাত্র কম্পন নেই, নিশ্বাসও পড়ছে না বোধ হয়। এক জ্যোতির্ময় মৌনে আবৃত হয়ে আছে। আরূঢ় হয়ে আছে এক জ্যোতির্ময় উপলব্ধিতে।

দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে এল তোতাপুরী। পঞ্চবটীতে নিজ আসনে নিশ্চল হয়ে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। সাড়া পেলেই খুলে দেবে দরজা।

কিন্তু সাড়াও নেই শব্দও নেই। থাক, যতক্ষণ পারে, থাক ঐ ব্রহ্মস্বাদে তন্ময় হয়ে। কিন্তু কতক্ষণ থাকবে? দিন শেষ হল, রাতও প্রায় যায়-যায়। তোতাপুরী ভাবলে, এখন কী করি! 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং, ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু'—তাই হল না কি রামকৃষ্ণের? না, ভয় কিসের? ঐ দিব্য দীপাধার যার দেহ তার সম্বন্ধে ভুল হবে কী! তোতাপুরী আরো এক দিন—আরো এক রাত অপেক্ষা করল। তবু রামকৃষ্ণের ডাক এসে পৌঁছুলো না। দেহ কোনো প্রয়োজনেরই জানান দিল না। ব্যাপার কি, বেঁচে আছে তো? দরজা খুলে একবার দেখবে না কি অবস্থাটা? কিন্তু, কে জানে, কী অবস্থায় না-জানি দেখতে

হবে। যাক আরো এক দিন—হয়তো এরি মধ্যে ডাক এসে পড়বে। সেই দিনও এখন যেতে চলেছে। তবুও কুটির তেমনি নিঃসাড়, নিঃশ্বাসশূন্য। তোতাপুরী আর নিশ্চেষ্ট থাকতে পারল না। নিজের আসন ছেড়ে উঠে পড়ল। স্তব্ধীভূত রামকৃষ্ণ শিলীভূত হয়ে গেল না কি? এখনো বেঁচে আছে তো? না, কি—

জোর করে খুলে ফেলল দরজা। কোথায় রামকৃষ্ণ?

যেমন বসিয়ে গিয়েছিল তেমনি বসে আছে স্থির হয়ে। দেহে প্রাণের প্রকাশ পর্যন্ত নেই। নেই নিশ্বাসের আভাস-লেশ। অথচ শরীরে তপ্ত দীপ্তি, মুখে জ্যোতির্ময় প্রসন্নতা। নিরুদ্ধাবস্থায় প্রশান্ত হয়ে বসে আছে। বসে আছে নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার মত। বসে আছে আত্মজ্ঞানে আত্মদর্শনে বিভোর হয়ে। ব্রহ্মে লগ্ন, লিপ্ত, লীন হয়ে।

সংমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল তোতাপুরী। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে চাইল না। চল্লিশ বছর সাধনা করে সে যে সমাধিতে উত্তীর্ণ হয়েছে, রামকৃষ্ণের পক্ষে তা তিন দিনেই সম্ভব হল? নাকের নিচে হাত রাখল, রামকৃষ্ণের নিঃশ্বাস পড়ছে না। বুকের উপর হাত রাখল, হৃৎস্পন্দন হচ্ছে না। বারংবার স্পর্শেও বিকার জাগছে না চেতনার। যেন ঊর্ধ্ব-অধঃ-মধ্য সমস্ত আত্মবোধে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। আর এরই নামই তো নির্বিকল্প সমাধি।

"ঊর্ধ্বপূর্ণমধঃপূর্ণং মধ্যপূর্ণং যদাত্মকং,
সর্বপূর্ণং স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণম্।"

'ইয়ে ক্যা দৈবী মায়া!' বিস্ময়ে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল তোতাপুরী। দেবতার এ কী আশ্চর্য মায়া, শুধু একবারের চেষ্টায়, মাত্র তিন দিনের মধ্যেই, রামকৃষ্ণের নির্বিকল্প সমাধি হয়ে গেল!

এখন সমাধিভূমি থেকে নামিয়ে আনতে হয়। তোতাপুরী রামকৃষ্ণের কানে 'হরি ওম্' মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল। রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল পঞ্চবটী। রামকৃষ্ণ চোখ মেলল।

তিন দিন থাকবার কথা, একটানা এগারো মাস থেকে গেল তোতাপুরী। এমন আধার পেয়েছে, তাকে সহজে ছেড়ে যেতে মন উঠল না। ঠিক করল তাকে নির্বিকল্প ভূমিতে দৃঢ়াসনে বসিয়ে দিয়ে যাবে।

রামকৃষ্ণ তাকে ডাকত 'ল্যাংটা' বলে। তোতাপুরীর যেমন বালকত্ব উলঙ্গতায়, রামকৃষ্ণেরও তেমনি বালকত্ব ঐ সম্বোধনে।

সর্বক্ষণ ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকে তোতাপুরী। বর্ষা হোক বাদল হোক ধুনির

নির্বাণ নেই। খাওয়া বলো, শোওয়া বলো, সব এই ধুনির ধারটিতে। ধুনিকেই আরতি করে সকাল-সন্ধ্যা, ভিক্ষার অন্ন ধুনিকেই প্রথমে অর্ঘ্য দেয়। ধুনির পাশেই সমাধিতে বসে, ধুনির পাশেই ঘুমোয়। উলঙ্গ আকাশের নিচে এই উলঙ্গ অগ্নিই তার দেবতা।

সম্পত্তির মধ্যে একটি লোটা আর চিমটা আর একটি চর্মাসন। আর, সত্যি যখন ধ্যান করছে তখন লোকে ভুল করে ভাবুক যে সে লম্বা হয়ে ঘুমোচ্ছে, তার জন্যে গা মুড়ি দেবার চাদর।

লোটা আর চিমটা রোজ মাজা চাই তোতাপুরীর। তাই ব্রহ্মলাভ হবার পরও তার নিত্যি ধ্যানাভ্যাস চাই। চাই যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম।

রামকৃষ্ণ এক দিন বললে, 'ব্রহ্মলাভের পর আবার নিত্যি এই ধ্যানাভ্যাস কেন?'

ঝকঝকে করে মাজা লোটার দিকে ইঙ্গিত করল তোতাপুরী। বললে, 'নিত্যি মাজি বলেই ওর অমন উজ্জ্বল চেহারা। যদি না মেজে ফেলে রাখি তবে ময়লা ধরে যাবে। মনও সেই রকম। অভ্যাসযোগে নিত্যি তার মার্জনা চাই। মেজেঘষে না রাখলেই তা মলিন হয়ে যাবে।'

কথাটা মনের মত, সন্দেহ নেই। কিন্তু এরও পরে আরও কথা আছে। রামকৃষ্ণ তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল গুরুর দিকে। বললে, 'কিন্তু লোটা যদি সোনার হয়?'

ঠিকই তো, তা হলে আর মাজতে লাগবে কেন? নিকৃষ্ট ধাতুর পিতলের ঘটিই মাজতে হয় প্রত্যহ।

তোতাপুরী হাসল। বললে, 'কিন্তু সংসারে সোনার লোটা ঐ একটিই।'

দু'জনে ধুনির ধারে বসে আছে। অদ্বৈত ধ্যানে প্রায় অচেতন হয়ে। কে একটা লোক কলকেতে তামাক ধরাবার জন্যে আগুন খুঁজছিল। সে হঠাৎ ধুনির কাঠ টেনে আগুন নিতে বসল। তোমরা চোখ বুজে ধ্যান করছ তা করো, আমার একটু চোখ বুজে তামাক খেতে দোষ কি।

আরামে তামাক খাবার উপায় নেই। তোতাপুরীর সব চেয়ে পবিত্র জিনিস সেই ধুনিতে সে হাত দিয়েছে। এত বড় অনাচার সইতে পারবে না তোতা। মুহূর্তে টুটে গেল তার ধ্যান। পাবকের মতই সে ক্রোধে জ্বলে উঠল, গালিগালাজ করতে লাগল। তাতেও ক্ষান্তি নেই, মারতে গেল চিমটে তুলে।

'দূর শালা! দূর শালা!' অর্ধবাহ্যদশায় হেসে উঠল রামকৃষ্ণ।

লোকটাকে বলছে না—যেন তাকে বলছে, এমনি মনে হল তোতাপুরীর। আর

সেই লোকটা এখন কোথায় ? তাড়া খেয়ে সটকান দিয়েছে।
কিন্তু এতে এত হাসবার আছে কী ? অন্যায় দেখলে হাসি ?
হেসে একেবারে গড়াগড়ি দিচ্ছে রামকৃষ্ণ।
'এত হাসছ কেন ? লোকটার অন্যায়টা একবার দেখলে না ?'
'দেখলুম। সেই সঙ্গে তোমার ব্রহ্মজ্ঞানের দৌড়টাও দেখলুম। এই বলছিলে, ব্রহ্ম ছাড়া দ্বিতীয় সত্তাই নেই—জীব মাত্রই ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। তবে আবার সেই ব্রহ্মরূপী জীবকেই মারতে উঠেছ ? তাই হাসছি, মায়ার কী প্রভাব !'
তোতাপুরী গম্ভীর হয়ে গেল। ভেবে দেখল, কাম ত্যাগ করলেও ক্রোধ ত্যাগ হয়নি। তাই বললে, 'তুমি ঠিক বলেছ। ক্রোধ ত্যাগ হয়নি। আজ থেকে ত্যাগ করলুম ক্রোধ।
গুরু মিলে তো লাখ, চেলা মিলে এক—ঠিকই বলেছে তোতাপুরী। সকল গুরুর গুরু এই রামকৃষ্ণ।
একটা ফড়িঙের পাখায় কে একটা কাঠি ফুঁড়ে দিয়েছে। নিশ্চয়ই কোনো দুষ্টু ছেলের কাজ। রামকৃষ্ণের মন ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠল। পরক্ষণেই সে হাসির রোল তুললে। বললে, 'তুমিই তোমার দুর্দশা করেছ। তুমিই ফড়িং, তুমিই সেই দুষ্টু ছেলে।'
কালীবাড়ির বাগানে নতুন ঘাস উঠেছে। রামকৃষ্ণ অনুভব করলে ও যেন তার নিজের অঙ্গ। কে-একটা লোক হেঁটে যাচ্ছিল ওখান দিয়ে, যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল রামকৃষ্ণ : 'ওরে ঘাসনি, ঘাসনি, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, সইতে পারছি না—'
গঙ্গার ঘাটে ঝগড়া করছে মাঝিরা। ঝগড়া থেকে হাতাহাতি। এক জন আরেক জনের পিঠে সজোরে চড় মেরে বসল। রামকৃষ্ণ দাঁড়িয়েছিল ঘাটে, চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল হঠাৎ। ভয়ের কান্না নয়, যন্ত্রণার কান্না।
কালীঘর থেকে শুনতে পেল হৃদয়। কি হয়েছে ? ছুটে এল ঘাটের চাঁদনিতে। দেখল রামকৃষ্ণের পিঠ ফুলে লাল।
'এ কি, কে তোমাকে মেরেছে ? বলো, তাকে একবার আমি দেখে নিই।'
কিছুই বলে না, রামকৃষ্ণ শুধু কাঁদে। অনেক পরে শান্ত হয়ে বললে, 'এক মাঝি আরেক মাঝিকে মেরেছে, আমাকে নয়। কিন্তু সেও তো আমাকেই মারা। নইলে আমার লাগল কেন ? কাঁদলাম কেন এতক্ষণ ?'
এই অদ্বৈত ভাব। সে ভাবে তুমিও নেই আমিও নেই। একও নেই দুইও নেই। অর্থাৎ সীমাও নেই সংখ্যাও নেই। শুধু একটি বিমল বোধের ঘনতা।

এইটিই আত্মবোধ। নিরবধি গগন থেকে ক্ষুদ্র ধূলিকণা পর্যন্ত পরিব্যাপী আত্মময়তা। এই ভাবনাতীত ভাবসমুদ্র দূর থেকে দেখেই কেউ ফিরে আসে, কেউ ছোঁয় কি না-ছোঁয়, আর কেউ যদি তার জল খেতে পায় এক চুমুক তার যে কী হয় তা সে নিজেও জানে না।

নারদ দূর থেকে দেখেই ফিরেছিল। শুকদেব শুধু ছুঁয়েছিল। আর শিব তিন গণ্ডূষ জল খেয়েছিল সাহস করে। খেয়ে অবধি কি হয়েছে কে জানে। শব হয়ে পড়ে আছে।

সেই অদ্বৈত ভাবের ভূমিতে যদি এক মুহূর্তের জন্যেও কেউ পৌঁছুতে পারে তবেই তার নির্বিকল্প সমাধি।

এক-আধ দিন নয়, একটানা ছ'মাস রামকৃষ্ণ ছিল এই নির্বিকল্প অবস্থায়। খুব-বেশি একুশ দিন থাকলেই শরীর নশ্যাৎ হয়ে যায়—সেখানে ছয় মাস! কি দেখছে কি শুনছে কেউ জানে না। নুনের পুতুল যেন সমুদ্র মাপতে নেমেছে। যাই নামা অমনি গলে যাওয়া।

বিচার যেখানে এসে থেমে যায় তাই ব্রহ্ম। যাকে দেখে আর দেখবার নেই, যাকে জেনে আর জানবার নেই, যা হয়ে আর হবার নেই। কিন্তু কী তুমি দেখলে কী তুমি জানলে কী তুমি হলে বোঝাও তোমার সাধ্য কি। সংসারে আর সব জ্ঞেয় বস্তু এঁটো হয়ে গেছে। বেদই বলো আর পুরাণই বলো, কত পঠন-পাঠন কত বিচার-বিতর্ক হয়ে গেছে মুখে-মুখে। কত উচ্চারণ, কত বিশ্লেষণ। কিন্তু ব্রহ্ম? ব্রহ্মই একমাত্র অনুচ্চারিত। ব্রহ্মই একমাত্র অনুচ্ছিষ্ট। কখন কোন দিক দিয়ে দিন আসছে, কোন পথ দিয়ে চলে যাচ্ছে রাত, খেয়াল থাকছে না রামকৃষ্ণের। আগে-আগে সমাধিতে 'মা'-'মা' বলে কাঁদত, এখন বাক্য-মনের পরপারে চলে এসেছে। জাগরণও নয়, স্বপ্নও নয়, সুষুপ্তিও নয়—চলে এসেছে স্বরূপবোধের শুদ্ধতায়। নাকে-মুখে মাছি ঢুকছে, তবু সাড় আসছে না শরীরে। ধুলোয় ধুলোয় চুলে জট পাকিয়ে যাচ্ছে। অসাড়ে শৌচাদি হয়ে যাচ্ছে তবু চেতনা নেই। শূন্যও নয়, অশূন্যও নয়, সর্ব জগতে চিন্মাত্রবিস্তার।

আর সেই চেতনায় শিব শবীভূত।

শরীর ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল রামকৃষ্ণের। কিন্তু কোত্থেকে এক সাধু এসে হাজির তখন দক্ষিণেশ্বরে। হাতে একগাছা মোটা লাঠি, তাই দিয়ে থেকে-থেকে মারতে শুরু করল রামকৃষ্ণকে।

'কি, খাবি না কি? একশো বার খেতে হবে।' মারে আর শাসায় সেই সাধু। বলে, 'ওই দেহ অমনি করে নষ্ট করতে দেব না। ওই দেহে মা'র এখনো অনেক

কাজ আছে। বাকি আছে অনেক লোক-কল্যাণ। নে, ওঠ্, খা—' বলে আবার মার।

এমনি করে হুঁস আনবার চেষ্টা করছে। মারের চোটে যেই একটু হুঁস আসছে, অমনি খাবার গুঁজে দিচ্ছে মুখের মধ্যে। এমনি করে বাঁচিয়ে রাখছে।

এমনি করে এক-আধ দিন নয়, ছয় মাস।

তার পর এক দিন জগদম্বা দেখা দিলেন। বললেন, 'এবার নেমে আয়। এখন থেকে ভাবমুখে থাক। লোকশিক্ষার জন্যে ভাবৈশ্বর্য ধারণ কর।'

রামকৃষ্ণের রক্ত-আমাশা হল। সেই রোগে ভুগে-ভুগে ক্রমে-ক্রমে দেহে মন নামল।

'ছাদে কতক্ষণ লোক থাকতে পারে? তার পর আবার নেমে আসে। সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি—নি-তে কতক্ষণ থাকা যায়? আবার সা-তে নেমে আসে। সমাধিস্থ হয়ে যে ব্রহ্মকে দেখে, নেমে এসে সে আবার দেখে জীব-জগৎ সব তিনিই হয়েছেন। যিনি ব্রহ্ম তিনিই ভগবান। ব্রহ্ম গুণাতীত, ভগবান ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। এই জীব জগৎ মন বুদ্ধি ভক্তি জ্ঞান ত্যাগ বৈরাগ্য সব তাঁরই ঐশ্বর্য। ব্রহ্ম জ্ঞান-মুখে, ভগবান ভাব-মুখে। আমাদের ভাব-মুখের ভগবানটিই ভালো। তার ঘর-দুয়ার আছে, ধন-দৌলত আছে—তাই তার এত নাম-ডাক। আর ব্রহ্মটি দেউলে, বাউণ্ডুলে। যে বাবুর ঘর-দুয়ার নেই সে বাবু আবার কিসের বাবু!'

বাবুরাম ঘোষ, পরে যিনি স্বামী প্রেমানন্দ নামে প্রসিদ্ধ, এক রাতে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে এক ঘরে শুয়ে আছে। হঠাৎ কিসের শব্দে বাবুরামের ঘুম ভেঙে গেল। কান খাড়া রেখে শুনল কে যেন হাঁটছে ঘরের মধ্যে। আর কে? ঠাকুরই অস্থির হয়ে ঘরের মধ্যে পাইচারি করে বেড়াচ্ছেন। পরনের কাপড় বগলের নীচে গুটানো। পাইচারি করছেন আর বলছেন উত্তেজিত হয়ে: 'ও সব আমি চাই না। ও সব তুই ফিরিয়ে নিয়ে যা। ছিঃ, ও দিয়ে আমার কী হবে?'

তরুণ শিষ্য বাবুরাম বিস্ময়ে কাঠ হয়ে আছে।

আবার পাইচারি। আবার সেই সঘৃণ প্রত্যাখ্যান।

কতক্ষণ পরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল রামকৃষ্ণ। বাবুরাম জিগগেস করলে, 'তখন ও রকম করছিলেন কেন?'

'ও! তুই দেখে ফেলেছিস না কি? মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে যেতে দেখি, ঘরে মা এসেছেন। হাতে একটা থলে। বললেন, থলের মধ্যে যা-কিছু আছে, সব

তোর, তোর জন্যে এনেছি। নে, হাত পাত। কি এনেছিস? তাকিয়ে দেখি, থলের মধ্যে নাম-যশ, লোকমান্য। থলের থেকে মুখ বার করে রয়েছে। উঃ, সে কী বীভৎস দেখতে! চেঁচিয়ে উঠলাম, তুই ও-সব ফিরিয়ে নিয়ে যা, ফিরিয়ে নিয়ে যা। আমি ও-সব চাইনে। আমাকে লোভ দেখাসনে, তোর পায়ে পড়ি—'

'তার পর?'

'তার পর আর কি। মা একটু হাসলেন। চলে গেলেন থলে নিয়ে।'

॥ ২৯ ॥

'আরে, কেঁও রোটি ঠোকতে হো?'

হাততালি দিতে-দিতে হরিনাম করছে রামকৃষ্ণ। সকাল সন্ধ্যেয় যেমন চিরকালের অভ্যাস। হয় হরিবোল হরিবোল, নয় তো হরি গুরু, গুরু হরি। হয় আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, নয় তো মন কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ।

নির্বিকল্প সমাধি লাভ করে এ সব আবার কী ছেলেমানষি!

বিরক্ত হল তোতাপুরী। ঠাট্টা করে বললে, 'হাত চাপড়ে-চাপড়ে রুটি তৈরি করছ না কি?'

'দূর শালা! আমি ঈশ্বরের নাম করছি—শুনতে পাচ্ছ না?'

'ঈশ্বরের নাম করছ তো তালি দিচ্ছ কেন?'

কেন দিচ্ছে কে জানে। বেশি ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। ও-সব ভাবের ব্যাপার কিছুই বুঝবে না তোতাপুরী।

সে ব্রহ্ম নিয়েই মশগুল। তার সঙ্গিনী যে মায়া, যে ভাবরূপিণী শক্তি, তার সে খবর সে রাখে না। বিচার-বিতর্কে ঈশ্বরকে শুধু সন্ধানই করা যায়, তাকে যে ভালোবাসা যায়, তার জন্যে যে কেউ কাঁদতে পারে, নাচতে পারে—এ তার ধারণার অতীত। সে মনন-চিন্তন বোঝে, কীর্তন-ভজন বোঝে না। শম-দম বোঝে, বোঝে না বাৎসল্য-মাধুর্য। ভক্তি তার কাছে নিছক প্রলাপোচ্ছ্বাস। বুদ্ধির বিকিন্ন বিকার।

সে অভীঃ। তার ধুনির আগুনের মত সে মায়াশূন্য, নিষ্কলঙ্ক।

গভীর রাত্রে ধ্যানে বসবার উদ্যোগ করছে তোতাপুরী। মন্দিরচূড়ায় একটা পেঁচা ডাকছে। থমথম করছে চার পাশ।

হঠাৎ দীর্ঘাকার একটা লোক গাছ বেয়ে নিচে নেমে এল। দাঁড়াল এসে সামনে। এ কি, এ যে তারই মত উলঙ্গ।

'কে তুমি ?' জিগ্‌গেস করল তোতাপুরী।

'আমি ভূত—ভৈরব। গাছের উপর থাকি। এই দেবস্থান রক্ষা করি। কিন্তু তুমি কে ?'

বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না তোতা। বললে, 'তুমিও যা, আমিও তা।'

'আমি তো ভূত।'

'হলেই বা। তুমিও ব্রহ্মের প্রকাশ, আমিও ব্রহ্মের প্রকাশ। আমাতে-তোমাতে কোনো তফাৎ নেই। বোসো এসে পাশে। ধ্যান করো।'

নিমেষে মিলিয়ে গেল ভূত।

পরদিন তোতা বলল সব রামকৃষ্ণকে।

'জানি। অনেক বার দেখেছি তাকে।' রামকৃষ্ণ উদাসীনের মত বললে।

'বলো কি ? দেখেছ ? ভয় পাওনি ?'

'ভয় পাব কেন ? আমাকে কত সে ভবিষ্যৎ বলে দিয়েছে। সেবার কি হয়েছিল জানো না বুঝি—?'

বারুদ-ঘর করবার জন্যে কোম্পানি পঞ্চবটীর জমি নেবে ঠিক করেছিল। একটু নির্জনে বসে মাকে ডাকি, তাও উঠে যাবে ? কোম্পানির বিরুদ্ধে মথুর খুব লড়লে একচোট। মামলায় কে হারে কে জেতে তখন সেটা একটা সঙিন অবস্থা। এমন সময় একদিন রাত্রে দেখি ভৈরবটি পা ঝুলিয়ে বসে আছেন গাছে। 'কি খবর ?' ইশারায় বললে, ভয় নেই। মামলায় হেরে যাবে কোম্পানি।

হলও তাই। কোম্পানি ডিসমিস খেয়ে গেল।

তুমি জ্ঞানে নির্ভয়, আমি ভালোবাসায় নির্ভয়। তুমি ব্রহ্ম পেয়ে ব্রহ্ম নিয়েই থাকো। আমি ব্রহ্ম পেয়ে জীব নিয়ে থাকব। তোমার আগেও জ্ঞান পরেও জ্ঞান। আমার ভক্তি থেকে জ্ঞান। আবার জ্ঞান থেকে ভালোবাসা। আমার কখনো পূজা কখনো জপ কখনো ধ্যান কখনো শুধু নামগুণগান। কখনো বা দু' হাত তুলে নৃত্য। আমি শাক্তদেরও মানি, বৈষ্ণবদেরও মানি, আবার বেদান্তবাদীদেরও মানি। আজকালকার ব্রহ্মজ্ঞানীদেরও মানি। তুমি একরোখা, এক-ঘেয়ে। আমি বিচিত্র। আমি বহুল। আমার সর্বসময়য়।

ভক্তি-ভালোবাসা না মানলে কি হয়, তোতাপুরী যখন রামকৃষ্ণের গান শোনে, কেঁদে ফেলে।

ভক্তির বীজ আর যায় না। যতই জ্ঞান-চাপা দাও, আঁকুর থেকে ফুল-ফল হবেই। হাজার জ্ঞান বিচার করো, আবার ঘুরে-ফিরে 'মা'-'মা', আবার ঘুরে-ফিরে

হরিবোল হরিবোল !

তুমি অদ্বৈতজ্ঞান নিয়ে নিশ্চল হয়ে বসে থাকো। আমি অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে কাজ করি। আমার কত কাজ, কত কথা। আমি না বললে শুনবে কে ? আমি না করলে করবে কেন ? আর এই আমিটি আমি নয়, কেউ নয়। সকলই তিনি, সকলই তুমি।

তিনিটি জ্ঞান। আর তুমিটি ভালবাসা।

'অদ্বৈতভাব কেমন জানিস ? যেমন, ধরো, অনেক দিনের পুরোনো চাকর। মনিব তার উপর খুব খুশি। তাকে সকল কথায় বিশ্বাস করে, সব বিষয়ে পরামর্শ করে। একদিন করলে কি—তার হাত ধরে নিজের গদিতেই বসাতে গেল। কি কর, কি কর—চাকর তো সঙ্কোচে এতটুকু। আঃ, বোস না—মনিব তাকে জোর করে টেনে বসিয়ে দিল। বললে, তুইও যে, আমিও সে। অদ্বৈতভাব এই রকম।'

পদ্মলোচন প্রকাণ্ড বৈদান্তিক। দেশজোড়া প্রসিদ্ধি। বর্ধমান-রাজার সভাপণ্ডিত হয়ে আছে। রামকৃষ্ণ ধরল মথুরবাবুকে। বললে, আমাকে একবার বর্ধমান নিয়ে চলো। পণ্ডিতকে একবার দেখে আসি।

যেখানে পাণ্ডিত্য আর ভক্তি একসঙ্গে মিশেছে, সেখানে তো ভগবানের অধিষ্ঠান। সেই তো তীর্থক্ষেত্র। সেইখানেই তো হাতির দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।

যেতে হল না রামকৃষ্ণকে। পদ্মলোচনই চলে এল কামারহাটি। দক্ষিণেশ্বরের কাছে। শরীর সারাবার জন্যে রয়েছে গঙ্গাতীরে।

'একবার গিয়ে পণ্ডিতের খোঁজ নিয়ে আয় তো।' হৃদয়কে বললে রামকৃষ্ণ।

'সে আবার কে ?'

জানিস না বুঝি ? প্রকাণ্ড সাধক। ঈশ্বরপ্রেমিক। বিদ্যেবুদ্ধিতে প্রচণ্ড, আবার ভক্তিতে মেদুর। যেমন সদাচার ইষ্টনিষ্ঠা তেমনি আবার ঔদাসীন্য আর ঔদার্য। যেমন সরল তেমনি স্পষ্টবাদী। একবার রাজসভায় তর্ক উঠল, শিব বড় না বিষ্ণু বড় ? মীমাংসা হচ্ছে না, ডাকো পদ্মলোচনকে। পদ্মলোচন এসে বললে, তার আমি কি জানি। আমার চৌদ্দ পুরুষে কেউ শিবও দেখেনি বিষ্ণুও দেখেনি। বড়-ছোট বলব কি করে ? যার কাছে যে বড় তার কাছে সেই বড়।

'গিয়ে কি করতে হবে ?' জিগগেস করল হৃদয়।

'গিয়ে দেখে আয় তার মধ্যে অভিমান আছে কি না।'

হৃদয় দিয়ে দেখে এল পদ্মলোচনকে। বললে, 'সে তোমার জন্যে বসে আছে। আমাকে তোমার ভাগ্নে জেনে কত খাতির।'

তক্ষুনি চলল রামকৃষ্ণ। জীবন ফুরিয়ে যাচ্ছে, যা কিছু সৎসঙ্গ করবার করে নাও। দিন থাকতে-থাকতে দেখে নাও দিনমণিকে।

পদ্মলোচন দেখল তার দুয়ারে পদ্মপলাশলোচন এসেছে।

পরস্পরকে দেখে গলে গেল দু'জনে। শুরু হল কথার হোলিখেলা। রামকৃষ্ণ গান করলে। পদ্মলোচন কেঁদে আকুল।

'এত জ্ঞানী আর পণ্ডিত', বললেন একদিন ঠাকুর, 'তবু আমার মুখে রাম-প্রসাদের গান শুনে কান্না! জানিস, কথা কয়ে এমন সুখ আর পাইনি কোথাও।'

আর পদ্মলোচন বললে, 'ঝুড়ি-ঝুড়ি বই পড়ে যা জেনেছি ও এক পৃষ্ঠা না উলটিয়েও তার চেয়ে বেশি জেনেছে।'

বেদান্তবাদী হলে কি হয়, পদ্মলোচন তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধ। ইষ্টদেবীর শক্তিবলে তর্কে সে সর্বজয়ী। কিন্তু এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটু রহস্য ছিল। সব সময়েই তার কাছে থাকত একটি জলে-ভর্তি গাড়ু আর একখানি গামছা। তর্কে প্রবৃত্ত হবার আগে সেই জলে সে মুখ ধুয়ে নিত। ব্যস, একবার মুখ ধুয়ে নিতে পারলেই সে কেল্লা মেরে দিয়েছে। কেউ আর হারাতে পারবে না তাকে। তার প্রাধান্যই অক্ষুণ্ণ থাকবে।

একটা অত্যন্ত সাধারণ আচরণ। বাগদেবীকে জিহ্বাগ্রে আনার আগে এই একটু মুখ-ধোওয়া।

কিন্তু বিষয়টা কি, রামকৃষ্ণ বুঝতে পারল। জগদম্বা বলে দিলে।

সেদিন তর্কে প্রবৃত্ত হবার আগে পদ্মলোচন যথারীতি মুখ ধুতে উঠেছে। কিন্তু কোথায় গাড়ু-গামছা? বা, তার গাড়ু-গামছা কি হল? মুখ না ধুয়ে সে শাস্ত্রালোচনা শুরু করে কি করে? সে কি কথা? তার গাড়ু-গামছা কে নিল? এইখানেই তো ছিল—

আর কে নেবে! রামকৃষ্ণই লুকিয়েছে।

'কি, আরম্ভ করো মীমাংসা!' রামকৃষ্ণ হাসতে লাগল মৃদু-মৃদু।

'কি আশ্চর্য!' পদ্মলোচন তো হতবাক: 'তুমি জানলে কি করে? তবে তুমি কি অন্তর্যামী?'

পদ্মলোচনের দুই চোখ জলে প্লাবিত হয়ে গেল। করজোড়ে স্তব করতে লাগল রামকৃষ্ণকে। পরে বললে, 'আমি নিজে এক সভা বসাব। ডাকব সব পণ্ডিতদের।

বলব তুমি ঈশ্বরাবতার—দেখি কে কাটতে পারে আমার কথা।'

সে-সভা আর বসাতে পারেনি পদ্মলোচন। তার অসুখ ক্রমশই বৃদ্ধির মুখে। একদিন বললে, রামকৃষ্ণকে, 'ভক্তের সঙ্গ করব এ কামনা ত্যাগ কোরো, নইলে নানা রকমের লোক এসে তোমায় পতিত করবে।'

রামকৃষ্ণ হাসল। বললে, 'পতিত-অভাজনদের মধ্যেই তো এখন ঠাঁই নেব। আমাকে আবার পতিত করবে কে?'

দক্ষিণেশ্বরে মথুরবাবু বিরাট ব্রাহ্মণ-বিদায়ের আয়োজন করেছেন। এক হাজার মণ চাল বিলোনো হবে, সঙ্গে বহু বিচিত্র খাদ্যসম্ভার, সোনা-রূপোও যথেষ্ট। গাইয়েও নিমন্ত্রিত হয়েছে অনেক, যার গানে যত বেশি ভাব হবে রামকৃষ্ণের তাকে তত বেশি টাকা দেবেন—শয়ে-শয়ে টাকা, সঙ্গে শাল, ক্ষৌমবস্ত্র। মথুরবাবুর ইচ্ছে পণ্ডিত পদ্মলোচনকে নিমন্ত্রণ করে। কিন্তু সে যেমন গোঁড়া, হয়তো নেবে না নিমন্ত্রণ। রামকৃষ্ণকে বললে, 'তুমি একবার দেখ না বলে।'

'হ্যাঁ গা, তুমি যাবে না দক্ষিণেশ্বরে?' পদ্মলোচনকে জিগগেস করল রামকৃষ্ণ।

পরম নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণ। অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী। বললে, 'তোমার সঙ্গে হাড়ির বাড়িতে গিয়ে খেয়ে আসতে পারি। কৈবর্তের বাড়িতে সভায় যাব, এ আর কি বড় কথা!'

কিন্তু শরীরে শেষ পর্যন্ত কুলোল না। রামকৃষ্ণের থেকে বিদায় নিয়ে কাশী চলে গেল। আর ফিরল না।

সিঁথির বাগানে আরেক পণ্ডিত এসেছেন। নাম দয়ানন্দ সরস্বতী। আর্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা।

রামকৃষ্ণ গেল তার সঙ্গে দেখা করতে। যেখানে প্রসিদ্ধি সেখানেই ঈশ্বরের বিভূতি। আর যেখানেই ঈশ্বরের বিভূতি সেখানেই রামকৃষ্ণের স্বীকৃতি।

'কেমন দেখলেন সরস্বতীকে?'

'দেখলাম শক্তি হয়েছে—বুক লাল। কথা কইছে খুব, যাকে বলে বৈখরী অবস্থা। ব্যাকরণ লাগিয়ে শাস্ত্রবাক্যের ব্যাখ্যা করছে। নিজে একটা কিছু করব, একটা মত চালাব, এই অহঙ্কার ষোলো আনা।'

'আর জয়নারায়ণ পণ্ডিত?'

'আহা, তার কথা বোলো না। এত বড় বিদ্বান, এক বিন্দু অহঙ্কার নেই। নিজের মৃত্যুর কথা টের পেয়েছিল আগে থেকে। টের পেয়ে বললে, কাশী চললুম।'

আর এঁড়েদার কৃষ্ণকিশোর বিশ্বাসে একেবারে আগুন। কি? একবার তাঁর

নাম করেছি, আমার আবার পাপ? অসম্ভব।

'যে গরু বাচকোচ করে খায় সে ছিড়িক-ছিড়িক করে দুধ দেয়। আর যে গরু, শাক-পাতা খোসা-ভূষি যা দাও গব-গব করে খায়, সে হুড়হুড় করে দুধ দেয়।' কৃষ্ণকিশোরের ডাকাতে বিশ্বাস। তেষ্টা পেয়েছে, পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত। কুয়োর কাছে কে একজন দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে বললে একটু জল তুলে দিতে। সে বললে, আমি মুচি, ছোট জাত। হলেই বা। একবার শিব নাম নাও, অমনি শুচি হয়ে যাবে। একবার নাম নিলেই হবে? হ্যাঁ, বলছি কি, একবার নিলেই হবে। একবারই যথেষ্ট। লোকটা তাই একবার 'শিব' বললে। জল তুলে দিল কৃষ্ণকিশোরকে। কৃষ্ণকিশোর পরম তৃপ্তিতে জল খেল।

কৃষ্ণকিশোর বলে, তোমরা রাম নাম করো আমি বলি 'মরা' 'মরা'। রামের চেয়েও 'মরা' বেশি শক্তিশালী। মরাতেই রত্নাকরের উদ্ধার, মৃতের পুনর্জীবন। তোমাদের কী মন্ত্র জানি না, আমার এই মরা মন্ত্র।

বিষয়ীসঙ্গ সহ্য হত না, রামকৃষ্ণ প্রায়ই আসত কৃষ্ণকিশোরের কাছে। কৃষ্ণকিশোরের ঈশ্বর ছাড়া বাক্য নেই, ঈশ্বর ছাড়া স্তব্ধতাও নেই। কৃষ্ণকিশোর সচল তীর্থ, উদ্ঘাটিত শাস্ত্র।

হলধারীকে দেখতে পারত না দু'চোখে।

একবার রামকৃষ্ণ আর কৃষ্ণকিশোর এক সাধুদর্শনে চলেছে। তুমি যাবে? জিগগেস করল হলধারীকে। হলধারী বললে, 'পঞ্চভূতের একটা খাঁচাকে দেখে লাভ কি?'

খেপে উঠল কৃষ্ণকিশোর। 'যে লোক ঈশ্বরের নাম করে, ঈশ্বরের ধ্যান করে, ঈশ্বরের জন্যে সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে এসেছে, সে খাঁচা? সে জানে না যে ভক্তের হৃদয় চিন্ময়?'

কচু! তা হলে অজামিলকে আর দুশ্চর তপস্যা করতে হত না। একবার 'নারায়ণ' উচ্চারণ করেই তরে যেত।

কিন্তু কিছুতেই মানবে না কৃষ্ণকিশোর। তার ভক্তির তমঃ—মারো-কাটো-বাঁধো—জবরদস্ত ভক্তি। আবার কতবার বলবে? একবার বলেছি, এতেই হয়েছে। এতেই ছিনিয়ে নেব জোর করে। আমি কি ভিখিরি? আমি ডাকাত।

দক্ষিণেশ্বরে ফুল তুলতে আসত, হলধারীর সঙ্গে দেখা হলেই ফিরিয়ে নিত মুখ। অমন ক্ষুদ্র যার বিশ্বাস, যে ছিড়িক-ছিড়িক করে দুধ দেয়, তার সে মুখ দর্শন করবে না।

একদিন রামকৃষ্ণ গিয়ে দেখে, কৃষ্ণকিশোর কি ভাবছে বসে-বসে। কি হয়েছে? অনমনা কেন?

'ট্যাক্সওয়ালা এসেছিল। বললে, টাকা না দিলে ঘটি-বাটি বেচে লবে।'

'তাই ভাবছ?' রামকৃষ্ণ হেসে উঠল: 'লিক না ঘটি-বাটি। চাই কি, বেঁধে লয়েই যাক না। কিন্তু তোমাকে তো লয়ে যেতে পারবে না। তুমি তো 'খ' গো। তুমি তো আকাশবৎ।'

ঠিকই তো। আমাকে কে নেয়! আমাকে কে বাঁধে! কিন্তু তুমি যে এ-কথা বললে, তুমি কে?

তুমি 'অ'। "অক্ষরাণাং অকারোঽস্মি"। তুমি সেই অ-কার। তুমি প্রণবের আদ্য অক্ষর।

এ হেন কৃষ্ণকিশোরের পুত্রশোক হল। দু-দু- উপযুক্ত পুত্র মারা গেল পর-পর। কোন জ্ঞানেই কিছু কুলোল না। শোকে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেল।

তা অর্জুনই অধীর, এ তো কৃষ্ণকিশোর। যার জন্যে এত গীতা, যার জন্যে এত আত্মার বিশ্লেষণ সে-ই কি না অভিমন্যু-শোকে মূর্ছিত। সঙ্গে কৃষ্ণ, কৃষ্ণের এত সব শিক্ষা-দীক্ষা। কিছুতেই কিছু হল না। চোখের জলে সব ভেসে গেল। বশিষ্ঠ যে এত বড় জ্ঞানী, সেও পুত্রশোকে অস্থির। তখন লক্ষ্মণ বললে, এ কি আশ্চর্য! ইনিও এত শোকার্ত! রাম বললে, 'ভাই, যার জ্ঞান আছে তার অজ্ঞানও আছে। যার সুখবোধ আছে তার দুঃখবোধও আছে। তাই তোকে বলি, তুই দুইয়ের পার হ। সুখ-দুঃখের জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যা।'

রাবণ যখন বধ হল, লক্ষ্মণ দৌড়িয়ে গেল দেখতে। দেখে হাড় শতচ্ছিদ্র হয়ে গেছে। এমন জায়গা নেই যেখানে ছিদ্র নেই। রামকে বললে, রাম! তোমার বাণের কি মহিমা! রাবণের দেহে এমন জায়গা নেই যেখানে ছিদ্র না হয়েছে। রাম বললে, ও সব ছিদ্র বাণের জন্যে নয়। শোকে তার হাড় জর-জর করেছে। ও সব ছিদ্র শোকের চিহ্ন।

তেলির ছেলে গোবিন্দ, থাকে বরানগর। ছোকরা বয়স, প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে আসে। আর রামকৃষ্ণের কথামৃত শোনে।

একদিন বললে, 'গোপালকে আনব এখানে?'

'কে গোপাল?'

'আমার এক বন্ধু। আমারই সমবয়সী।'

'বেশ তো। নিয়ে আসিস একদিন।'

গোপাল এল গোবিন্দর সঙ্গে। রামকৃষ্ণের মুখে কথা শুনেই কেমন বেহুঁস হয়ে

boiRboi.net

নেশা। রামকৃষ্ণের যেমন সমাধি হয়, প্রায় তেমনি।

একদিন গোপাল এসে রামকৃষ্ণের পায়ের ধুলো নিলে। বললে, 'চলে যাচ্ছি।'

'সে কি? কোথায় যাচ্ছিস?' জিগগেস করল রামকৃষ্ণ।

'জানি না। এ সংসার আর ভালো লাগছে না তাই আর থাকছি না এখানে।'

কত দিন আর ছেলে দুটোর কোনো খবর নেই। এদিকে আর আসে না। কি হল কে জানে।

এক দিন গোবিন্দ এসে হাজির।

'আরে! কি খবর?'

'গোপাল মারা গেছে।'

মারা গেছে? রামকৃষ্ণ কাতর হয়ে পড়ল।

ক'দিন পরে খবর এল গোবিন্দও চলে গিয়েছে ওপারে।

ভাগ্যিস ওরা আমার কেউ নয়। ওরা আমার কে! রামকৃষ্ণ বলে আর চোখ মোছে।

॥ ৩০ ॥

তোতাপুরী জগদম্বাকে মানে না, কিন্তু তোতাপুরীর উপর জগদম্বার অপার করুণা। করুণাবলেই তার সাধনার পথ সহজ করে দিয়েছেন। দেখাননি তাকে তাঁর রঙ্গিণী মায়ার খেলা। অবিদ্যারূপিণী মোহিনী মায়ার ইন্দ্রজাল। দেখাননি তাকে তাঁর সর্বগ্রাসিনী করালী মূর্তি। প্রকটিতবদনা বিভীষিকা। বরং তাকে দিয়েছেন সুদৃঢ় স্বাস্থ্য, সরল মন আর বিশুদ্ধ সংস্কার। তাই নিজের পুরুষকারের প্রয়োগে সহজ পথে উঠে গিয়েছে শিখরে। আত্মজ্ঞানে, ঈশ্বরদর্শনে, নির্বিকল্প সমাধিভূমিতে। এখন মহামায়া ভাবলেন, ওকে এবার বোঝাই আসল অবস্থাটা কী!

লোহার মত শরীর, লোহা চিবিয়ে হজম করতে পারে তোতাপুরী—হঠাৎ তার রক্ত আমাশা হয়ে গেল।

সব সময় পেটে অসহ্য যন্ত্রণা। কি করে মন আর ধ্যানে বসে! ব্রহ্ম ছেড়ে মন এখন শুধু শরীরে লেগে থাকে। মনের সেই শান্তির মৌন চলে গিয়ে দেখা দেয় শারীরিক আর্তনাদ।

ব্রহ্ম এবার পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়েছেন। এবার মহামায়ার কৃপা না হলে আর রক্ষে নেই।

তোতাপুরী ভাবলে এবার পালাই বাঙলা দেশ থেকে। কিন্তু শরীর ভালো থাকছে

না এই ওজুহাতে পালিয়ে যাব? হাড়-মাসের খাঁচা এই শরীর, তাকে এত প্রাধান্য দেব? তার জন্যে ছেড়ে যাব এই ঈশ্বর-সঙ্গ? যেখানে যাব সেখানেই তো শরীর যাবে, শরীরের সঙ্গে-সঙ্গে রোগও যাবে। আর, রোগকে ভয়ই বা কিসের? শরীর যখন আছে তখন তো তা ভুগবেই, শেষও হয়ে যাবে এক দিন। সেই শরীরের প্রতি মমতা কেন? যাক না তা ধূলায় নস্যাৎ হয়ে। ক্ষয়হীন আত্মা রয়েছে অনির্বাণ। রোগ বা জরা বা মৃত্যু তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। সে প্রদীপ্ত চৈতন্য শরীর-বহির্ভূত।

নানা তর্ক করে মনকে স্তব্ধ করলে তোতাপুরী।

কিন্তু রোগ না শোনে ধর্মের কাহিনী। ক্রমেই তা শিখা বিস্তার করতে লাগল —যন্ত্রণার শিখা। ঠিক করল, আর থাকা চলবে না দক্ষিণেশ্বরে—রামকৃষ্ণের থেকে শেষ বিদায় নিতেই হবে। কিন্তু মুখ ফুটে রামকৃষ্ণকে তা বলে এমন তার সাধ্য নেই। কে যেন তার মুখের উপর হাত চাপা দিয়ে কথা কইতে বাধা দিচ্ছে। আজ থাক, কাল বলব—বারে-বারে এই ভাব এসে তাকে নিরস্ত করছে। আজ গেল, কালও সে পঞ্চবটীতে বসে রামকৃষ্ণের সঙ্গে বেদান্ত নিয়েই আলোচনা করলে, অসুখের কথা দন্তস্ফুট করতে পারল না।

কিন্তু বুঝতে পারল রামকৃষ্ণ। মথুরবাবুকে বলে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করালে। মনকে সমাধিস্থ করে যন্ত্রণা থেকে ত্রাণ খুঁজছে তোতাপুরী। আমি দেহ নই আমি আত্মা, আমি জীব নই আমি ব্রহ্ম এই দিব্যবোধে নিমগ্ন হয়ে থাকছে। শরণ নিচ্ছে যোগজ প্রজ্ঞার।

কিন্তু কত দিন?

এক দিন রাতে শুয়েছে, পেটে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হল। উঠে বসল তোতাপুরী। এ যন্ত্রণার কিসে নিবারণ হবে? মনকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পাঠাতে চাইল সেই অদ্বৈতভূমিতে। কিন্তু মন আর যেতে চায় না। একটু ওঠে আবার পেটের যন্ত্রণায় নেমে পড়ে। শরীরবোধের আর বিচ্যুতি ঘটে না। ভীষণ বিরক্ত হল তোতাপুরী। যে অপদার্থ শরীরটার জন্যে মনকে বশে আনতে পারছি না সে শরীর রেখে আর লাভ কী? তার জন্যে কেন এত নির্যাতন? সেটাকে বিসর্জন দিয়ে মুক্ত, শুদ্ধ, অসঙ্গ হয়ে যাই।

তোতাপুরী স্থির করল ভরা গঙ্গায় ডুবে মরবে।

গঙ্গার ঘাটে চলে এল তোতা। সিঁড়ি পেরিয়ে ধীরে-ধীরে জলে নামতে লাগল। ক্রমে-ক্রমে এগুতে লাগল গভীরের দিকে, মাঝ-নদীতে।

কিন্তু এ কি! গঙ্গা কি আজ শুকিয়ে গেছে? আদ্ধেক প্রায় হেঁটে চলে এল,

তবু এখনো কি না ডুব-জল পেল না? এ কি গঙ্গা, না, একটা শিশে খাল? প্রায় ও-পারের কাছাকাছি এসে পড়ল, এখন কি না ফের হাঁটু-জলে এসে ঠেকেছে। এ কি পরমাশ্চর্য! ডুবে মরবার জল পর্যন্ত আজ গঙ্গায় নেই।

'এ ক্যা দৈবী মায়া!' অসহায়ের মত চীৎকার করে উঠল তোতাপুরী।

হঠাৎ তার চোখের ঠুলি যেন খসে পড়ল। যে অব্যয়-অদ্বৈত ব্রহ্মকে সে ধ্যান করে এসেছে তাকে সে এখন দেখলে মায়ারূপিণী শক্তিরূপে। যা ব্রহ্ম তাই ব্রহ্ম-শক্তি। ব্রহ্ম নির্লিপ্ত, কিন্তু শক্তিতেই জীব-জগৎ। ব্রহ্ম নিত্য, শক্তি লীলা। যেমন সাপ আর তির্যক গতি। যেমন মণি আর বিভা।

সেই বিভাবতী জ্যোতির্ময়ীকে দেখল এখন তোতাপুরী। দেখল জগজ্জননী সমস্ত চরাচর আবৃত্ত করে রয়েছেন। যা কিছু দৃশ্য দর্শন ও দ্রষ্টা সব তিনি। শরীর-মন রোগ-স্বাস্থ্য জ্ঞান-অজ্ঞান জীবন-মৃত্যু—সব তাঁর রূপচ্ছটা। "এতৈব সা মহা-শক্তিস্ত্বয়া সর্বমিদং ততম্।"

মা'র এই বিশ্বব্যাপ্ত রূপ দেখে তোতা অভিভূত হয়ে গেল।

লুপ্ত হয়ে গেল ব্যাধিবোধ। নদী ভেঙে ফের সে ফিরে চলল দক্ষিণেশ্বরে।

পঞ্চবটীতে ধুনির ধারে বসল গিয়ে সে চুপচাপ। ধ্যান-চোখ বোজে আর দেখে সে জগদম্বাকে। চিৎসত্তাস্বরূপিণী পরমানন্দময়ীকে।

সকাল বেলা তোতাকে দেখে রামকৃষ্ণ তো অবাক। শরীরে রোগের আভাসলেশ নেই। সর্বত্র প্রহর্ষ-প্রকাশ।

'এ কি হল তোমার? কেমন আছ?'

'রোগ সেরে গেছে।'

'সেরে গেছে? কি করে?'

'কাল তোমার মাকে দেখেছি।' তোতার চোখ জলজল করে উঠল।

'আমার মাকে?'

'হ্যাঁ, আমারো মাকে। জগতের মাকে। সর্বত্র তাঁর আত্মলীলার স্ফূর্তি—চিদৈশ্বর্যের বিস্তার—'

'কেন, বলেছিলাম না?' রামকৃষ্ণ উল্লসিত হয়ে উঠল: 'তখন না বলেছিলে, আমার কথা সব ভ্রান্তি? তোমায় কী বলব, আমার মা যে ভ্রান্তিরূপেও সংস্থিতা—'

'দেখলাম যা ব্রহ্ম তাই শক্তি। যা অগ্নি তাই দাহিকা, যা প্রদীপ তাই প্রভা, যা বিন্দু তাই সিন্ধু। ক্রিয়াহীনে ব্রহ্মবাচ্য, ক্রিয়াযুক্তেই মহামায়া।'

'দেখলে তো, দেখলে তো ?' রামকৃষ্ণের খুশি আর ধরে না। 'আমার মাকে না দেখে কি তুমি যেতে পারো ? যোগে বসে এত দেখছ আর আমার মহাযোগিনী মাকে দেখবে না ?'

যা মন্ত্র তাই মূর্তি। এক বিন্দু বীর্য থেকে এই অপূর্বসুন্দর দেহ, এক ক্ষুদ্র বীজ থেকে বৃহৎ বনস্পতি, এক তুচ্ছ স্ফুলিঙ্গ থেকে বিস্তীর্ণ দাবানল। তেমনি ব্রহ্ম থেকে এই শক্তির আত্মলীলা।

'এবার তোমার মাকে বলে আমাকে ছুটি পাইয়ে দাও।'

'আমি কেন ? তোমার মা, তুমি বল না।' হাসতে লাগল রামকৃষ্ণ।

তোতা চলে এল ভবতারিণীর মন্দিরে। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল মাকে। প্রসন্ন মনে মা তাকে যাবার অনুমতি দিলেন। রামকৃষ্ণকে বিদায় জানিয়ে কালীবাড়ি ছেড়ে চলে গেল কোন দিকে।

কোন দিকে গেল কেউ জানে না।

॥ ৩১ ॥

তোতাপুরী গেল, এল গোবিন্দ রায়।

গোবিন্দ রায় জাতে ক্ষত্রিয়, কিন্তু আরবি-ফার্সিতে পণ্ডিত। ইসলামের এক-ভ্রাতৃত্বের আদর্শে মুগ্ধ হয়ে মুসলমান হয়েছে।

ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছে দক্ষিণেশ্বর। আস্তানা গেড়েছে কালীবাড়ির বাগানে। তখন এমনি উদার ব্যবস্থা। রানি রাসমণির পুণ্যের আকর্ষণে হিন্দু সন্নেসির মত মুসলমান ফকিররা এসেও জমায়েত হচ্ছে। যেখানে ভক্তির রাজ্য, ভাবের রাজ্য, সেখানে আবার জাত বিচার কি ! তা ছাড়া রানি যেখানে অন্নপূর্ণা।

গোবিন্দ রায় দরবেশ। সুফী-পন্থী। প্রেমভাবে মাতোয়ারা। ভাবের পশরা মাথায় নিয়ে ভবের হাটে কেনা-বেচা করে।

রামকৃষ্ণের চোখ পড়ল গোবিন্দর উপর। ভাবেশ্বরীই তাকে পথ দেখালেন।

'কি হে, এসেছ ?' ছুটে গেল রামকৃষ্ণ।

'তুমি ডাকলে যে ! না এসে কি পারি ?' গোবিন্দ রায় মহানন্দে হাসল।

চুম্বকের ডাকে লোহা চলে এসেছে।

যেখানেই অনুভূতির গভীরতা সেখানেই স্বচ্ছ সারল্য। যেখানে জ্ঞানের বিস্তৃতি সেখানেই প্রেমের সদানন্দ।

গোবিন্দ রায়ের বিতর্কহীন বিশ্বাস আর প্রশ্নহীন প্রেমে মুগ্ধ হয়ে গেল রামকৃষ্ণ।

দেখল, এও তো একটা পথ ঈশ্বরের কাছে পৌছুবার। এই পথেই তো মা কত লোককে টেনে নিয়ে চলেছেন, পৌছে দিচ্ছেন বিশ্বনিয়ন্তার পাদপদ্মে। এই পথটা একবার দেখে এলে কেমন হয়? পথ যখন আরেকটা আছে তখন সেটাই বা তার কাছে রুদ্ধ থাকবে কেন? সমস্ত রসের রসিক সে। সমস্ত পথের সে পর্যটক।

যত মত তত পথ। নদী নানা দিক দিয়ে আসে, কিন্তু পড়ে গিয়ে সেই সমুদ্রে। তেমনি ছাদে নানা উপায়ে ওঠা যায়। পাকা সিঁড়ি, কাঠের সিঁড়ি, বাঁকা সিঁড়ি, ঘোরানো সিঁড়ি। ইচ্ছে করলে শুধু একটা দড়ি দিয়েও উঠতে পারো। তবে যে ভাবেই ওঠো, একটা কিছু ধরে উঠতে হবে। দু' সিঁড়িতে পা দিলে পড়ে যাবে মুখ থুবড়ে। যখন যেটা ধরেছ সেটা ধরেই উঠে যাও। দেখ ঠিক উঠছ কি না।

ধর্ম তো আর ঈশ্বর নয়। ধর্ম হচ্ছে শুধু একটা কিছু ধরবার জন্যে। যেটা ধরে উঠতে পারবে উপরে, পর্বতচূড়ায়, যেখানে ঈশ্বর বিরাজ করছেন। যা তুমি ধরবে, তা বাপু, একটু শক্ত করে ধোরো। পা পিছলে পড়ে না যাও।

কালীঘাটে যাবার নানান রাস্তা। নানান বাহন। তোমার গাড়ি-ঘোড়া না জোটে, না জুটুক, তোমার খুব দূরের পাড়ি হয়, হোক যত দূর খুশি। তুমি পায়ে হেঁটেই চলে এস মন্দিরে। সোজা ভক্তি-বিশ্বাসের পথ দিয়ে।

রামকৃষ্ণ ধরল গিয়ে গোবিন্দ রায়কে। বললে, 'আমি মুসলমান হব।'

চিত্রার্পিতের মত তাকিয়ে রইল গোবিন্দ রায়। দেখলে সে কী মহাভাববিদ্যুতি রামকৃষ্ণের চোখে-মুখে খেলে যাচ্ছে। দেখল ভক্তি-ভালোবাসার বিশাল ঝঞ্ঝা-বাতে উড়ে গেছে সব বিধি-নিষেধ, সব সংস্কার-সংকীর্ণতা। অভিমানের জঞ্জালস্তূপ।

তবু নিজের কানকে যেন বিশ্বাস হল না গোবিন্দর। জিজ্ঞাসা করলে, 'কি হবে?'

'মুসলমান হব। ইসলামের পথও তো একটা পথ। এই পথে কত সাধকই তো বাঞ্ছিত ধামে গিয়ে পৌছুচ্ছেন। আমি সে পথটাই বা বাদ দেব কেন?'

'সত্যি বলছ মুসলমান হবে?'

'হ্যাঁ, তুমি আমাকে দীক্ষা দাও। আমার আর দেরি সইছে না—খিদের মুখেই আমার আস্বাদন চাই।'

গোবিন্দ রায় যথাবিধি দীক্ষা দিল রামকৃষ্ণকে।

রামকৃষ্ণ কাছা খুলে ফেলল। লুঙ্গির মতন করে পরল দু'গজি কাপড়। মুখে

আর 'মা' 'মা' নেই, শুধু 'আল্লা' 'আল্লা'। মন্দিরের ধারে-কাছেও যায় না। যে শ্যামা তার চক্ষুর চক্ষু ছিল তাকে দেখবার জন্যে আর এক বিন্দু ব্যাকুলতা নেই। বরং দেবদেবীর নাম শুনলে জ্বলে ওঠে। সেই একেশ্বর খোদাতাল্লার ভজনা করে।

থাকে মথুরবাবুর কুঠির এক পাশে। চোখের উপর এত বড় যে একটা মন্দির সেটা চোখে পড়ে না। শোনে না সকাল-সন্ধ্যায় ঘণ্টার আওয়াজ। পাঁচ বেলা নামাজ পড়ে তদ্গত মনে। নামাজের আগে পুকুরে ওজু করে নেয়।

এক দিন বললেন মথুরবাবুকে, 'মুসলমানের রান্না খাব।'

'সে কি কথা?'

'হ্যাঁ, খুব ঝাল-পেঁয়াজ-রশুন দেওয়া উগ্র রান্না। রান্নার গন্ধ বাতাসে টের পাওয়া যাবে।'

মথুরবাবু রাজি হন না। কিন্তু রামকৃষ্ণের দাবি দৃঢ়তর।

বেশ, মুসলমান বাবুর্চি দেখিয়ে দেবে, রাঁধবে হিন্দু বামুন। তাই সই। শিগগির-শিগগির চাপিয়ে দাও রান্না। খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে।

আমাশায় ভোগা রুগী, আঝাল ঝোল-ভাত যার পথ্য, তার জন্যে ঐ উগ্রচণ্ড রান্না। কিন্তু উপায় নেই। রামকৃষ্ণ যখন গোঁ ধরেছে তখন মানতেই হবে। মুসলমান বাবুর্চি বলে দিচ্ছে, আর তার কথামত রাঁধছে হিন্দু বামুন। কাছে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাই দেখছে রামকৃষ্ণ। বাতাসে ঘ্রাণ নিচ্ছে।

হঠাৎ ডাকিয়ে আনলেন মথুরবাবুকে। বললেন, 'এ ঠিক হচ্ছে না। বামুনকে বলো কাছা খুলে ফেলতে। ওতে আর ঐ বাবুর্চিতে কিছু তফাৎ নেই আমাকে ভাবতে দাও সেই কথা।'

মথুরবাবুর নির্দেশে বামুন কাছা খুলে ফেলল।

সানকিতে করে ভাত খেল রামকৃষ্ণ। জল খেল বদনাতে করে।

এ কি ভাব হল রামকৃষ্ণের—মথুরবাবু ভাবনায় পড়লেন। কিন্তু হৃদয় এল তেড়েফুঁড়ে, ভীষণ চোটপাটের সঙ্গে।

'এ সব কী হচ্ছে পাগলামি? নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে এ কী ব্যবহার? পৈতে ফেলে দিয়েছ বলে কাছাও ফেলে দেবে? কাছা ফেলে দিয়েছ বলে নামাজ পড়বে ওঠ-বোস করতে-করতে? পাগলামি ছাড়ো। যাও, মন্দিরে যাও। মন্দিরে গিয়ে মা'র কাছে বোসো। তাঁকে ভজনা করো।'

ধরে টেনে ঠেলে রামকৃষ্ণকে পাঠিয়ে দিল মন্দিরের দিকে। কতক্ষণ পরে হৃদয় মন্দিরে এসে দেখে রামকৃষ্ণের টিকিটিও কোথাও নেই। কোথায় গেল মামা?

ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল হৃদয়। মথুরবাবুর কুঠির বারান্দাতেও নেই, নেই বা গঙ্গার ধারে কাছে। বাগান-পঞ্চবটীও শূন্য। তবে কোথায় অদৃশ্য হল? খুঁজতে খুঁজতে চলে এল রাস্তায়। রাস্তা ছেড়ে সামনের মসজিদে।

দেখল মসজিদে নামাজ পড়ছে রামকৃষ্ণ।

দুষ্টুমি করার সময় ছোট ছেলে যেন ধরা পড়েছে অভিভাবকের কাছে। 'হৃদয় যেন রুদ্রচক্ষু গুরুজন আর রামকৃষ্ণ অবোধ অপোগণ্ড শিশু।

বললে, 'আমি কি করব বল্, আমার কোনো দোষ নেই। আমাকে কে যেন জোর করে এখানে টেনে এনেছে।'

সকাল বেলা। আজান দিয়েছে মসজিদ থেকে। রামকৃষ্ণ দে-ছুট।

'এ কি, তুমি কে?' প্রথম দিন জিগগেস করেছিল মুসলমানেরা।

ওদের থেকেই কে একজন বললে, 'ওকে চেন না? ও মন্দিরে থাকে, পুজো-টুজো করে—'

'করে না, করত। আমি এখন ইসলামের দীক্ষা নিয়েছি। আমার ভাইদের সঙ্গে একত্র উপাসনা করব।'

সকলে ভাবলে পাগল হবে বা। কিন্তু সাধ্য নেই তাকে কেউ তাড়িয়ে দেয়। নামাজের প্রত্যেকটি কৃত্য-করণ তার মুখস্থ। আর সব চেয়ে মর্মস্পর্শী হচ্ছে তার মুখস্থ ভাবটি। যে ভাবটি আসে শুধু সরলতা থেকে, ব্যাকুলতার সরলতা। তিন দিন ছিল এই ইসলামভাবে।

একদিন হঠাৎ এক জ্যোতির্ময় পুরুষ তার সামনে আবির্ভূত হল। মসজিদে যখন নামাজ পড়তে এসেছে। বৃদ্ধ ফকিরের বেশ, মাথার চুল সব শাদা, গোঁফ-দাড়িও তাই। গলায় কাঁচের মালা, হাতে লাঠি। বললে, 'তুমি এসেছ? বেশ—' বলে হাসল, হাত নেড়ে আশীর্বাদ করল। সেই পুরুষ-প্রবর বিরাট ব্রহ্মেরই প্রতিভাস।

পরে আরো এক দিন দেখেছিলেন তাকে ঠাকুর। বললেন, 'মা ভেদবুদ্ধি সব দূর করে দিলেন। বটতলায় বসে ধ্যান করছি, দেখালেন এক জন বুড়ো মুসলমান সানকি করে ভাত নিয়ে সামনে এল। সানকি থেকে ম্লেচ্ছদের খাইয়ে আমাকে দুটি দিয়ে গেল। মা দেখালেন এক বই দুই নেই—'

মা'র মন্দিরে বসে তোরা চোখ বুজে কেন ধ্যান করিস বল তো? সাক্ষাৎ মা চিন্ময়ী বিরাজ করছেন, আশ মিটিয়ে দেখে নে। ছাখ তাঁর আয়ত-শান্ত চোখ দুটি, ছাখ তাঁর পাদপদ্ম দু'খানি। যখন আপন মা'র কাছে যাস মাকে দেখতে, তখন কি চোখ বন্ধ করে মা'র কাছে বসিস, না, মালা ফেরাস বসে-বসে?

চেয়ে ছাখ দেখি—এ তোর আপনার মা নয় ?

'শিখেরা বলেছিল, ঈশ্বর দয়ালু। আমি বললাম, তিনি আমাদের মা-বাপ, তিনি আবার দয়ালু কি ! ছেলের জন্ম দিয়ে বাপ-মা লালনপালন করবে না, করবে কি বামুন-পাড়ার লোকেরা ?'

কালীমন্দিরের চাতালে বসে স্তব করছে রামকৃষ্ণ :

'ও মা, ও মা ওঁকাররূপিণী মা ! এরা কত কি বলে মা, কিছু বুঝতে পারিনি। কিছু জানি না, মা। শুধু শরণাগত ! শরণাগত ! কেবল এই কোরো মা তোমার শ্রীপাদপদ্মে যেন শ্রদ্ধা ভক্তি হয়। আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ কোরো না। শরণাগত ! শরণাগত !'

॥ ৩২ ॥

এই সেই যদু মল্লিক।

তুমি বড্ড হিসেবী লোক। অনেক হিসেব করে কাজ করো, তাই না ? সেই বামুনের গরু, খাবে কম, নাদবে বেশি, আর হুড়হুড় করে দুধ দেবে—

কি বললেন ?

তুমি বড় অন্যমনস্ক। ঈশ্বরচিন্তায় নয়, বিষয়চিন্তায়। কোন ব্যঞ্জনে নুন হয়েছে কোন ব্যঞ্জনে হয়নি এ তুমি বুঝতে পারো না। কেউ যদি বলে দেয়, এ ব্যঞ্জনে নুন হয়নি, তখন এঁ্যা-এঁ্যা করে বলো, হয়নি না কি ? তখন তোমার হুঁস হয়।

কেউ না বলে দিলে—

আপনি বলে দিন।

তুমি সেই রামজীবনপুরের শিলের মত—আধখানা গরম, আধখানা ঠাণ্ডা। ঈশ্বরেও মন আছে, আবার সংসারেও মন আছে—

ষোলো আনা গরম করে দিন।

অসম্ভব। কথা দিয়ে কথা রাখো না কেন ? বাড়িতে যে চণ্ডীর গান দেবে বলেছিলে, তা হল কই ? কত দিন কেটে গেল—

অনেক ঝঞ্ঝাট—নানান ঝামেলা।

তুমি পুরুষ-মানুষ তো বটে ? তবে কথা রাখবে না কেন ? পুরুষ-মানুষের এক কথা। কি, মানো ?

তা মানি বৈ কি।

তা যদি মানো, সেই মান সম্বন্ধে যদি হুঁস থাকে, তবে তো মানুষই হয়ে যেতে। মান-হুঁস—মানুষ। আর পুরুষ কাকে বলে ? পুরুষের সম্পদ কোথায় ?

BanglaBook.net

যদু মল্লিক তাকাতে লাগল এদিক-ওদিক।

কথায়। হাতির দাঁত, আর পুরুষের? পুরুষের বাত। এক কথার মালিক যে সেই পুরুষ।

এই সেই যদু মল্লিক।

এই যদু মল্লিকের বাগান-বাড়িতে এক দিন বেড়াতে এসেছে রামকৃষ্ণ। বৈঠক-খানায় বসে গল্প করছে যদুর সঙ্গে। হঠাৎ দেয়ালে-টাঙানো একখানা ছবির দিকে তার নজর পড়ল। বড় মধুর ভাবের ছবিখানি।

মা আর ছেলে। মা'র নধর বাহুর বেষ্টনীতে পবিত্র একটি শিশু, উষার আকাশে প্রথম উদয়ভানু। মা'র দুটি বড়-বড় বিভোর চোখে দ্রবীভূত স্নেহ, মুখে তৃপ্তিপূর্ণ হাসি। আর শিশুর মুখে সে যে কি নিষ্পাপ সারল্য তা রামকৃষ্ণ যেমন বুঝছে তেমন কি কেউ বুঝবে?

'ওরা কারা হে?'

এক মেমসাহেব আর তার ছেলে।

তাই হবে বা। অন্য দিকে চোখ ফেরাতে চাইল রামকৃষ্ণ।

কিন্তু চোখ ফেরায় এমন সাধ্য নেই। বলো না সত্যি করে। ওরা কে? ও তো দেখছি জ্যোতির্ময় দেবশিশু। আর ওর মা তো পুণ্যময়ী পবিত্রতা।

'মা মেরী আর তার ছেলে যীশুখৃষ্ট।'

একদৃষ্টে চেয়ে রইল রামকৃষ্ণ। দেখল যশোদা আর তার কোলে বালগোপাল। সোজা শম্ভু মল্লিকের কাছে গিয়ে হাজির হল। বললে, 'যীশুখৃষ্টের গল্প শোনাও আমাকে।'

এই সেই শম্ভু মল্লিক।

হাসপাতাল করা, ডিসপেনসারি করা, রাস্তা বানানো, কুয়ো কাটানো—এই সবে বড় ঝোঁক। এ সব কাজ অনাসক্ত হয়ে করতে পারো তো বুঝি। নইলে ও-সবের পিছনে তো শুধু নামের পিপাসা, ঢাকের বাদ্যি। কালীঘাটে এসে যদি শুধু দানই করতে থাকো তো কালীদর্শন হবে কখন? আগে যো-সো করে ধাক্কাধুক্কি খেয়েও কালীদর্শন করে নাও, তার পর দান যত করো আর না-করো। ঈশ্বর যদি তোমার কাছে এসে বলেন, কী বর চাও, তখন তুমি কী বলবে? বলবে, কতগুলি হাসপাতাল-ডিসপেনসারি করে দাও, না, স্থান দাও, আশ্রয় দাও, তোমার পাদপদ্মে?

গৌরবর্ণ পুরুষ, মাথায় তাজ। ভাবে তাকে দেখেছিল রামকৃষ্ণ। দেখেছিল সেবায়েৎ বলে। সেজোবাবুর পরে রসদদার এই শম্ভু মল্লিক।

বাগবাজার থেকে হেঁটে চলে আসে বাগানে। আসে সটান পায়ে হেঁটে। কেউ যদি বলে, অত রাস্তা, গাড়ি করে আস না কেন? যদি কোনো বিপদ হয়! শম্ভু মুখ লাল করে বলে, মা'র নাম করে বেরিয়েছি, আমার আবার বিপদ!

'আমি বই-টই কিছু পড়িনি, কিন্তু দেখ দেখি মা'র নাম করি বলে আমায় সবাই মানে।' শম্ভু মল্লিককে বলেছিল এক দিন রামকৃষ্ণ।

'আহা, তা আর জানি না?' সহাস্য সারল্যে বললে শম্ভু মল্লিক, 'ঢাল নাই তরোয়াল নাই, শান্তিরাম সিং।'

জানোই তো আমার বিদ্যেবুদ্ধি। তবে এবার একটু বাইবেল শোনাও দিকি। শম্ভু মল্লিক বাইবেল নিয়ে বসল। আবিষ্টের মত শুনতে লাগল রামকৃষ্ণ। ভূমাভিমুখী মন নামল অবগাহনে।

পরে এক দিন উন্মনার মত চলে এল যদু মল্লিকের বাগান-বাড়িতে। যদু মল্লিক বাড়ি নেই। বৈঠকখানা খুলে দিলে চাকররা। শিশুযুতা মাতৃচিত্রের কাছে বসল রামকৃষ্ণ।

'মা গো, তুই আমাকে এ কী দেখাচ্ছিস?'

রামকৃষ্ণ দেখল সেই ছবি যেন জীবনায়িত হয়ে উঠেছে। মা আর ছেলের দিব্য অঙ্গের জ্যোতিতে ভেসে যাচ্ছে দশ দিক। তার অন্তর-বাহির ধুয়ে যাচ্ছে সেই জ্যোতিস্নানে। এত দিনের দৃঢ়মূল সংস্কার উন্মূলিত হয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব-সংসারে আর কেউ বিরাজমান নয়—শুধু পীযূষপ্রেমময় যীশু। কৃষ্ণ নয়, খৃষ্ট। ঈশান নয়, ঈশা।

দেখল এ ঘর যেন গির্জা হয়ে গিয়েছে। নানা ধূপ দীপ মোমবাতি জেলে ব্যাকুলতার মূকমূর্তি হয়ে প্রার্থনা করছে পাদরিরা। সামনে ক্লেশভারক্লিষ্ট অথচ অক্লিষ্টকান্তি দেবতা।

কে তুমি পরম যোগী পরম প্রেমিক? কে তুমি 'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ?' সংসারদুঃখগহন থেকে জীবের উদ্ধারের জন্যে বুকের রক্ত ঢেলে দিলে। যাকে ত্রাণ করতে এলে তারই হাতে প্রাণ দিলে হাসিমুখে। এলে যে যন্ত্রণার নিবারণে সেই যন্ত্রণাই ক্ষমা হয়ে প্রেম হয়ে শান্তি হয়ে উদ্ভাসিত হল।

হাঁটতে-হাঁটতে চলে এল এক গির্জার সামনে। বড় রাস্তার পারে বড় গির্জা। সব বিদেশী-বিজাতীয়দের ভিড়। 'রাজার বেটা' না হোক, সব রাজার জাতের লোক। ভিতরে ঢুকতে সাহস পেল না রামকৃষ্ণ। কে জানে, হয়তো বা কালীঘরের খাজাঞ্চি বসে আছে।

'মা গো, খৃষ্টানরা গির্জেতে তোমাকে কি করে ডাকে একবার দেখিও। কিন্তু

ভিতরে গেলে লোকে কি বলবে? যদি কিছু হাঙ্গামা হয়? আবার কালী-ঘরে ঢুকতে না দেয়? তবে মা, গির্জের দোরগোড়া থেকেই দেখিও।'

গির্জার দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল রামকৃষ্ণ। চক্ষু মেলে তাকাল একবার ভিতরে। সর্বতশ্চক্ষু রামকৃষ্ণের চোখে এখন "পরম পশ্যন্তী দৃষ্টি"। দেখল সত্যি-সত্যিই এ কালী-ঘর। ভিতরে, বেদীতে, মা বসে আছেন। মা জগদম্বা। মা ভবতারিণী। সব্যে খড়্গমুণ্ডকরা, অসব্যে বরাভয়দাত্রী—সেই মা, যিনি করালী হয়েও কৈবল্য-দায়িনী। আনন্দধারায় দুই চোখ ভেসে গেল রামকৃষ্ণের।

সর্বত্রই এই মা'র ভজন। সর্বস্থানই মাতৃস্থান। কাজলের ঘরে বাস করলে গায়ে কালি লাগবেই, কিন্তু কোথাও আর কাজলের ঘর নেই—সর্বত্র কালী-ঘর।

যিনি যীশুখৃষ্ট তিনিই মোক্ষকরী শিবকরী মাহেশ্বরী।

তিন দিন থাকল এই খৃষ্টান ভাবে। চার দিনের দিন পঞ্চবটীতে বেড়াচ্ছে রামকৃষ্ণ, দেখল কে এক জন গৌরবর্ণ সুপুরুষ হঠাৎ তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বুঝতে দেরি হল না, বিদেশী, বিজাতি। কিন্তু সৌম্য আননে কী অপার সৌন্দর্য, সর্বাঙ্গে দেবদ্যুতি। কে তুমি? তুমিই কি সেই পুরুষোত্তম যীশু? তুমিই কি সেই তমালশ্যামল বনমালী?

সেই দেবদানব আলিঙ্গন করল রামকৃষ্ণকে। এক দেহে লীন হয়ে গেল দু'জনে। লীন হয়ে গেল ব্রহ্মাত্মবোধে।

'আচ্ছা তোরা তো সবাই বাইবেল পড়েছিস—' এক দিন ভক্তদের জিজ্ঞাসা করলেন ঠাকুর: 'সেইখানে যীশুর চেহারার কোনো বর্ণনা আছে?'

না, বাইবেলে তার উল্লেখ নেই।

'আচ্ছা, যীশু কেমন দেখতে ছিল বল তো?'

কে জানে! তবে ইহুদি ছিলেন যখন তখন রং গৌর চোখ টানা আর নাক টিকলো ছিল নিশ্চয়ই।

'কিন্তু আমি যখন দেখেছিলাম, দেখলাম নাক একটু চাপা। কেন দেখলাম কে জানে।'

ভাবে-দেখা মূর্তি কি বাস্তব মূর্তির অনুরূপ হয়? কিন্তু যীশুখৃষ্টের আকৃতির যে বর্ণনা পাওয়া গেছে তাতে তাঁর নাক চাপা বলেই লেখা আছে।

'মা গো, সবাই বলছে আমার ঘড়ি ঠিক চলছে। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ব্রহ্মজ্ঞানী সকলেই বলে আমার ধর্মই ঠিক। কিন্তু মা, কারুর ঘড়িই তো ঠিক চলছে না। তোমার ঘড়ির সঙ্গে কেউই তো মিলিয়ে নিচ্ছে না ঠিক-ঠিক। সবাই ঘড়ির কাঁটা দেখে, কেউই তোমাকে দেখে না।'

মিশ্র এসেছে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে। ধর্মে খৃষ্টান, বাড়ি পশ্চিমে। ভাই গিয়েছিল বিয়ে করতে, সেখানে বরের সভায় শামিয়ানা চাপা পড়ে মারা যায়। একা নয়, সঙ্গে আরো একটি ভাই—গিয়েছিল বরযাত্রী। সেই থেকেই মিশ্র সন্ন্যাসী। পরনে প্যান্ট কোট বটে, কিন্তু ভিতরে গেরুয়ার কৌপীন।

'ইনিই ঈশ্বর, ইনিই রাম, ইনিই কৃষ্ণ—' বলতে লাগল মিশ্র।

ঠাকুর হাসছেন। বলছেন, 'পুকুরে অনেকগুলি ঘাট। এক ঘাটে হিন্দুরা জল খাচ্ছে, বলছে জল। আরেক ঘাটে খৃষ্টানরা খাচ্ছে, বলছে ওয়াটার। মুসলমানেরা আরেক ঘাটে খাচ্ছে, বলছে পানি।' মিশ্রের দিকে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'কিছু দেখতে-টেকতে পাও?'

'শুধু আপনাকে দেখি। আপনি আর যীশু এক।'

ঠাকুরের বুঝি যীশুর ভাব হল। দাঁড়িয়ে পড়লেন। সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। ভাবাবেশে মিশ্রের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন। সেকহ্যাণ্ড করতে লাগলেন।

সবাইর সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাবে। তার পরে আবার নিরালায় ফিরে যাও নিজের ঘরে। সেখানে গিয়ে ফের শান্তিতে থাকো। রাখালেরা এক-এক বাড়ি থেকে গরু চরাতে নিয়ে যায়, কিন্তু মাঠে গিয়ে সব গরু মিলে-মিশে একাকার। আবার সন্ধ্যের সময় ফিরে যায় নিজের-নিজের ঘরে, আপনাতে আপনি থাকে।

গড়ের মাঠে বেড়াতে গিয়েছে রামকৃষ্ণ। বেলুন উঠবে, বেজায় ভিড়। জায়গা নিয়েছে এক পাশে। হঠাৎ নজরে পড়ল, একটি সাহেবের ছেলে গাছে হেলান দিয়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যাই দেখা, শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন হয়ে গেল। সমাধি হয়ে গেল রামকৃষ্ণের।

উলোর বামনদাস ঠিকই বলে। বলে, 'বাবাঃ, বাঘ যেমন মানুষ ধরে তেমনি ঈশ্বরী একে ধরে রয়েছেন।'

॥ ৩৩ ॥

মধুসূদন এসেছে দক্ষিণেশ্বরে—মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

এসেছে ব্যারিস্টার হিসাবে। মথুরবাবুর বড় ছেলে দ্বারিক ডেকে এনেছে। বারুদ-ঘরের সাহেবদের সঙ্গে যে মামলার ঘোগাড় হয়েছে সেই উপলক্ষ্যে।

দপ্তরখানার পাশে বড় ঘর। সেই ঘরে বসেছে মাইকেল। বললে, 'শ্রীরামকৃষ্ণকে একবার দেখব।'

খবর গেল রামকৃষ্ণের কাছে। রামকৃষ্ণ যেতে চায় না। অত বড় গণ্যমান্য লোক, দুর্দান্ত সাহেব, তার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে কি! হৃদয়কে বলে, 'তুই যা।'

হৃদয় গেলে হবে কেন? দ্বারিক বিশ্বাস আবার তাগিদ পাঠাল।

নারায়ণ শাস্ত্রী ছিল সামনে, রামকৃষ্ণ বললে, 'তুমিও সঙ্গে চল। ইংরিজি-টিংরিজি জানি না—কি বলতে কি বলব তার ঠিক নেই—'

দু'জনে এসে দাঁড়াল মাইকেলের মুখোমুখি। রামকৃষ্ণ ঠেলে দিল নারায়ণ শাস্ত্রীকে। বললে, 'তুমিই কথা কও।'

নারায়ণ শাস্ত্রী সংস্কৃতে আলাপ চালাল।

মাইকেল বললে, 'বাংলাতেই কথা বলুন—'

নারায়ণ শাস্ত্রী বললে, 'তুমি নিজের ধর্ম কেন ছাড়লে?'

মাইকেল পেট দেখাল। বললে, 'পেটের জন্যে।'

'পেটের জন্যে?' চটে উঠল নারায়ণ শাস্ত্রী: 'পেটের জন্যে তুমি ধর্ম ছাড়লে? তোমার বাপ-পিতেমোর ধর্ম? যে পেটের জন্যে ধর্ম ছাড়ে তার সঙ্গে কী কথা কইব!' ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলে।

'কিন্তু আপনি কিছু বলুন—' মাইকেল মিনতি করলে রামকৃষ্ণকে।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল রামকৃষ্ণ। বললে, 'আশ্চর্য, আমি কিছুই বলতে পারছি না। কে যেন আমার মুখ চেপে ধরেছে।'

রামকৃষ্ণের চাইতে মাইকেল বয়সে বারো বছর বড়। তা হলে কি হয়, করজোড় করল মাইকেল। বললে, 'আমাতে কেন আপনার কৃপা হবে না? আমি আপনার ভক্ত—'

'সে কথা নয়। আমি তো চাই কথা বলতে, কিন্তু বারে বারে কে যে আমার মুখ চেপে ধরছে, কথা কইতে দিচ্ছে না।'

মরমে মরে গেল মাইকেল। সে কি এত অভাজন? এত পরিত্যাজ্য?

বাজল বুঝি রামকৃষ্ণের। বললে, 'গান শোনো। গান শুনলে শান্তি পাবে।'

রামপ্রসাদী গান ধরল রামকৃষ্ণ। রক্তাক্ত ক্ষতে যেন প্রলেপ পড়ল। শান্তিতে চোখ বুজল মাইকেল।

কিন্তু নারায়ণ শাস্ত্রীর রাগ যাবার নয়। রামকৃষ্ণের ঘরের সামনেকার দেয়ালে কয়লা দিয়ে বড়-বড় অক্ষরে বাংলায় সে লিখলে: পেটের জন্যে ধর্ম ছাড়া মূঢ়তা।

মথুরকে বামনি বলত, প্রতাপরুদ্র। কত কি করলেন প্রাণ ঢেলে। আলাদা ভাঁড়ার করে দিলেন সাধুসেবার জন্যে। গাড়ি পালকি যাকে যা দিতে বলেছে

রামকৃষ্ণ, দিয়ে দিলেন। একবার সাধ হল ভালো জরির সাজ পরবে, আর রূপোর গুড়গুড়িতে তামাক খাবে। সব কিনে পাঠিয়ে দিলেন মথুরবাবু। জরির সাজ পরে গুড়গুড়ি বাগিয়ে নানারকম করে টানতে লাগল রামকৃষ্ণ—একবার এ পাশ থেকে, একবার ও পাশ থেকে, উঁচু থেকে নিচু থেকে। মনকে বোঝাল, মন, এরই নাম সাজ আর এরই নাম রূপোর গুড়গুড়িতে তামাক খাওয়া। অমনি খুলে ফেলল সাজ, ছুঁড়ে ফেলল গুড়গুড়ি।

'কামনা থাকতে, ভোগলালসা থাকতে মুক্তি নেই। আমি তারি জন্যে যা-যা মনে উঠত অমনি করে নিতাম। বড়বাজারের রং-করা সন্দেশ খেতে ইচ্ছে হল। খুব খেলুম। তার পর অসুখ। ধনেখালির খইচুর, কৃষ্ণনগরের সরভাজা—তাও খেতে সাধ হয়েছিল। ছাড়িনি একটাও—'

মথুরবাবু এসে বললেন, তাঁর স্ত্রী জগদম্বার মরণাপন্ন অসুখ। ডাক্তার-কবরেজরা জবাব দিয়ে দিয়েছেন। স্ত্রী তো চলেছেই, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই বিষয়-আশয়ও শেষ হয়ে যাবে।

পাগলের মতো হয়ে গিয়েছেন। তাঁকে ধরে পাশে বসাল রামকৃষ্ণ। কি হয়েছে? এত উতলা হবার আছে কী!

রামকৃষ্ণের পায়ের উপর পড়লেন। বললেন, 'আমার যা হবার তা তো হবেই। কিন্তু, বাবা, তোমার সেবা আর করতে পাব না।' ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন মথুরবাবু।

করুণায় মন বুঝি ভরে গেল রামকৃষ্ণের। বললে, 'যাও, বাড়ি যাও। তোমার স্ত্রী দিব্যি ভাল হয়ে উঠেছেন।'

ফুল্ল মনে বাড়ি ফিরলেন মথুরবাবু। দেখলেন, এ কি ইন্দ্রজাল, স্ত্রীর দেহে আর রোগ নেই।

'ইন্দ্রজাল নয়। ঐ রোগ এই দেহের মধ্যে টেনে এনেছি।' বললে রামকৃষ্ণ। ছয় মাস ভুগল এক নাগাড়ে।

বর্ষা আসতেই মথুরবাবু ভাবিত হলেন। গঙ্গার জল এখন লোনা হয়ে উঠবে। আর খাবার জল বলতে তো ঐ গঙ্গাজলই। নির্ঘাৎ তবে ফের পেটের অসুখ করবে রামকৃষ্ণের। এখানে থেকে তবে আর কাজ নেই। কয়েক দিন বরং দেশের বাড়িতে গিয়ে থেকে এস।

মন্দ কি। দেখে আসি একবার জন্মভূমি। আট বছর এই দেশ ছাড়া। দেখে আসি একবার সারদাকে।

'মা গো, তুমি যাবে কামারপুকুর?' চন্দ্রমণিকে শুধোল রামকৃষ্ণ।

'না বাবা, গঙ্গাতীর আর ছাড়ব না। এখানেই কাটিয়ে যাব বাকি জীবন। তুমি বামনিকে নিয়ে যাও।'

না-বলতেই প্রস্তুত বামনি।

আর কে যাবে সঙ্গে?

কেন, হৃদয়? দেশে-গাঁয়ে রটে গেছে, পাগল হয়ে গিয়েছে রামকৃষ্ণ। কাছা খুলে ফেলে আল্লা-আল্লা করছে। স্ত্রীবেশ ধরে গয়না-গাটি পরে ঢপ গাইছে। একবার চোখে আঙুল দিয়ে সবাইকে দেখিয়ে আসি।

মথুরবাবু আর তাঁর স্ত্রী দুজনে মিলে সব গোছগাছ করে দিচ্ছেন। যাতে দেশে গিয়ে রামকৃষ্ণের তৃণমাত্র না অসুবিধে হয়। কামারপুকুরের সংসার তো শিবের সংসার। জানতেন তা দুজনে—তাই "ঘর-বসত" সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছেন। মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবার সময় বাপ-মা যেমনটি করে দেয় সাজিয়ে-গুছিয়ে। প্রদীপের সলতেটি থেকে দাঁতের খড়কে কাঠিটি পর্যন্ত।

গ্রামে আনন্দ-বাজার বসে গেল। ওরে, শুনেছিস, রামকৃষ্ণ এসেছে। সঙ্গে কে এক ভৈরবী। হাতে মস্ত ত্রিশূল। চল দেখবি চল।

জয়রামবাটিতে সারদাকে খবর পাঠাল রামকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণী এসেছেন, তুমি এস। তুমি নইলে কে ওঁর সেবা করবে? সঙ্গে মা আসেননি, কিন্তু উনিই তোমার শ্বশ্রূমাতা।

সত্যিকারের এই প্রথম স্বামিসন্দর্শন সারদার। চৌদ্দ পেরিয়ে সে এখন পনেরোয় পা দিয়েছে। সে এখন স্বভাবসুন্দরাঙ্গা কিশোরী। শুভাননা। সর্বকল্যাণকারিণী। "কীর্তির্লক্ষ্মীধৃতির্মেধাপুষ্টিঃশ্রদ্ধাক্ষমামতিঃ"-র সমাহার।

স্বামীকে প্রথম দেখেছে ছ-সাত বছর বয়সে। ভালো করে কিছু মনে পড়ে না। পা ধুয়ে চুল দিয়ে মুছে দিয়েছিল—এই একটু মনে পড়ে ঝাপসা-ঝাপসা। বিয়ের সময় লোকে বলেছিল, পাগলা-জামাই হয়েছে। শিব গেল শ্বশুরবাড়ি, সবাই বলতে লাগল, 'ও মা উমা, তোর এই ছিল কপালে! শেষে একটা ভাঙড়ের হাতে পড়লি?' এখন তো শুনি আরো কত কি কথা! কে জানে এখন গিয়ে না-জানি কি রকম দেখব!

বাড়ির মধ্যে কোথায় গিয়ে লুকিয়েছে সারদা। কিন্তু হৃদয়ের চোখ এড়াবে এমন তার সাধ্য নেই। খুঁজে বার করে ফেলেছে সারদাকে। বলছে, 'এই দেখ তোমার জন্যে কত পদ্মফুল যোগাড় করে এনেছি।' সারদা তো লজ্জায় এতটুকু। 'দাঁড়াও, পদ্মফুল দিয়ে তোমার পাদপদ্মখানি পূজা করি।'

কিন্তু যাঁর পাদপদ্মের লোভে সারদা ছুটে এসেছে তিনি কোথায়?

দূর থেকে দেখল রামকৃষ্ণকে। কী রূপ, কী রঙ! সৌন্দর্য যেন স্থির হয়ে বসে নেই, আনন্দে লীলা করে বেড়াচ্ছে।

ঘরের বার হলেই মেয়ে-পুরুষ হাঁ করে দেখে রামকৃষ্ণকে। সঙ্গে হৃদয়, ভূতির খালের দিকে বেড়াতে চলেছে এক দিন। মেয়েরা জল ভরছে খাল থেকে। আর জল-ভরা! চার পাশ থেকে দেখছে সবাই একদৃষ্টে। বলাবলি করছে, ওরে, ঐ ঠাকুর—ঐ রামকৃষ্ণ। আঙুল তুলে দেখাচ্ছে পরস্পরকে।

'ও হৃদু, আমায় ঘোমটা দিয়ে দে, আমায় ঘোমটা দিয়ে দে—'

হৃদয় তো অবাক।

'ওরে, ওরা আমার বাইরের রূপ দেখছে! কী সর্বনাশ! শিগ্‌গির আমায় ঘোমটা দিয়ে দে। নইলে আমি এক্ষুনি ন্যাংটা হব।'

'না মামা, এখানে ন্যাংটা হয়ো না।' হৃদয় গম্ভীর হয়ে বললে, 'এখানে ন্যাংটা হলে লোকে কী বলবে!'

'নইলে যে পালাবে না মেয়েগুলো।'

'দাঁড়াও, আমি তোমার মুখ ঢেকে দিচ্ছি। কেউ আর তোমার রূপ দেখবে না।' খালি গায়ে চাদর ছিল রামকৃষ্ণের, তাই দিয়ে হৃদয় তাঁর মুখ ঢেকে দিলে।

রাত থাকতেই ওঠে রামকৃষ্ণ। উঠেই ফরমাস করে সারদাকে আর লক্ষ্মীর মাকে: আজকে এই-এই সব খাব। এই-এই সব রেঁধো। সব যোগাড় করে রাঁধত দুজনে। এক দিন পাঁচফোড়ন ছিল না, লক্ষ্মীর মা বললে, 'তা অমনিই হোক, নেই তার কি হবে?' শুনতে পেয়েছে রামকৃষ্ণ। বললে, 'সে কি গো, পাঁচ-ফোড়ন নেই, এক পয়সার আনিয়ে নাও না। যাতে যা লাগে তা বাদ দিলে হবে কেন? তোমাদের এই ফোড়নের গন্ধের বেন্নন খেতে দক্ষিণেশ্বরের মাছের মুড়ো আর পায়েসের বাটি ফেলে এলুম, আর তাই তোমরা বাদ দিতে চাও?' দুই জা' তখন লজ্জা রাখবার জায়গা পায় না।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার আরেক রকম সুর ধরে রামকৃষ্ণ। 'আঃ, আমার এ কি হল? সকাল থেকে উঠেই কি খাব! কি খাব! রাম রাম!'

এক দিন খেতে বসেছে দুজনে—রামকৃষ্ণ আর হৃদয়। রেঁধেছেও দুজনে—লক্ষ্মীর মা আর সারদা।

লক্ষ্মীর মা পাকা রাঁধুনি, তার রান্নায় তার বেশি। আর সারদা ছেলেমানুষ বউ, তার রান্না অখাদ্যি!

লক্ষ্মীর মা যেটা রেঁধেছে সেটা মুখে তুলে রামকৃষ্ণ বললে, 'ও হৃদু, এ যে রেঁধেছে

সে রামদাস বদ্যি।' আর সারদা যেটা রেঁধেছে সেটা মুখে ঠেকিয়ে বললে, 'আর এ যে রেঁধেছে সে ছিনাথ সেন।'

রামদাস ভালো চিকিৎসক আর শ্রীনাথ সেন হাতুড়ে।

রামকৃষ্ণ বুঝি একটু ঠেস দিলে সারদাকে!

হৃদয় বললে, 'তা হোক। তবে তোমার এ হাতুড়ে তুমি সব সময়ে পাবে—গা টিপতে, পা টিপতে পর্যন্ত। ডাকলেই হল। এক পায়ে খাড়া। আর রামদাস বদ্যি? তার অনেক টাকা ভিজিট, সব সময়ে পাবেও না তাকে। লোকে আগে হাতুড়েকেই ডাকে—সে তোমার সব সময়ের বান্ধব!'

'তা বটে, তা বটে।' হাসতে লাগল রামকৃষ্ণ। 'ও সব সময়ে আছে।'

'বৃষ্টি হয়ে গেছে সেদিন, ভূতির খালের দিক থেকে একা-একা ফিরছে রামকৃষ্ণ। পায়ে কি যেন একটা ঠেকল। চেয়ে দেখল মস্ত একটা মাগুর মাছ। পুকুর থেকে রাস্তায় কখন উঠে এসেছে। পায়ে করে ঠেলে-ঠেলে এনে মাছটাকে রামকৃষ্ণ পুকুরে ছেড়ে দিলে। বললে, 'পালা, পালা! হৃদে দেখতে পেলে তোকে আর আস্ত রাখবে না।'

পরে বললে হৃদয়কে, 'ওরে এই এত বড় একটা মাগুর মাছ—হলদে রং—রাস্তায় উঠে এসেছিল পুকুর থেকে—'

'কই? কী করলে?' চার দিকে তাকাতে লাগল হৃদয়।

'পুকুরে ছেড়ে দিলুম।'

'ও মামা, তুমি করলে কি গো! এত বড় মাছটা তুমি ছেড়ে দিলে! আঃ, আমলে কি রকম ঝোল হত—'

জয়রামবাটিতে এক দিন ভোর-রাতে একটা বাছুর খুব চেঁচাচ্ছে। গরু দুইছে এলময়, মা'র কাছে বাছুরটাকে ঘেঁষতে দেওয়া হচ্ছে না। দূরে বেঁধে রেখেছে খুঁটিতে। প্রবোধ মানছে না বাছুর, মা'র স্তনের জন্যে আর্তনাদ করছে।

'মাগো মা যাই,' ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে সারদা, করুণারূপিণী কিশোরী, বলছে, 'আমি এক্ষুনি তোকে ছেড়ে দেব, এক্ষুনি তোকে ছেড়ে দেব—'

দ্রুত পায়ে এসে বাছুরের বন্ধন মুক্ত করে দিলে সারদা।

॥ ৩৪ ॥

ও মামি, ও কী হচ্ছে?

সারদা হকচকিয়ে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে লক্ষ্মীও। বর্ণপরিচয় পড়ছিল দু'জনে। পিছন থেকে হুমকে উঠল হৃদয়: 'বই পড়া হচ্ছে?'

সারদার হাত থেকে কেড়ে নিল বই। বললে, 'মেয়েছেলের লেখাপড়া শিখতে নেই। শেষে কি নাটক নভেল পড়বে?'

লক্ষ্মীর বইও কাড়তে গেল, পারলে না। ঝিয়ারি মানুষ, তার সঙ্গে আঁটবে কে! সটান গেল সে পাঠশালায় পড়ে আসতে।

লুকিয়ে সারদাও আরেকখানা কিনে আনাল বর্ণপরিচয়। লক্ষ্মী শিখে এসে পড়াতে লাগল সারদাকে।

'কী হবে লিখে-পড়ে? পাঁজিতে লিখেছে বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজি টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না। এক ফোঁটাই পড়ু, তাও না।'

পড়ার চেয়ে শোনা ভালো। শোনার চেয়ে দেখা ভালো। গুরুমুখে বা সাধুমুখে শুনলে ধারণা বেশি হয়। আর শাস্ত্রের অসার ভাগ চিন্তা করতে হয় না। শোনার চেয়ে দেখা আরো ভালো। দেখলে আর সন্দেহ থাকে না। শাস্ত্রে অনেক কথাই তো আছে। কিন্তু ঈশ্বরদর্শন না হলে, তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি না হলে, চিত্তশুদ্ধি না হলে—সবই বৃথা।

তোতাপুরী বলে দিয়েছিল, স্ত্রীকে কাছে-কাছে রাখবি। স্ত্রী কাছে রেখেও যার ত্যাগ-বৈরাগ্য-বিবেক-বিজ্ঞান অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই আসল ব্রহ্মজ্ঞ।

সারদাকে কাছে ডেকে নিল রামকৃষ্ণ। শোনাতে লাগল ঈশ্বরের কথা।

'চাঁদা মামা সকল শিশুর মামা। তেমনি ঈশ্বর সকলের আপনার। তুমি ডাকো তো তোমাকেও তিনি দেখা দেবেন।' কাছে বসিয়ে স্নেহস্বরে বলছে রামকৃষ্ণ: 'বই-শাস্ত্র ঈশ্বরের কাছে পৌঁছুবার পথ বলে দেয়। পথ জানা হয়ে গেলে আর বই-শাস্ত্রের দরকার কি? তখন নিজে কাজ করতে হয়।'

কুটুম্ববাড়ি তত্ত্ব করতে হবে। কি-কি জিনিস কিনবে তারই ফর্দ-সমেত চিঠি এসেছে। কিন্তু চিঠি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক পরে পাওয়া গেল চিঠি। তখন আনন্দ আর ধরে না। দেখ, দেখ, কি লিখেছে চিঠিতে। কি পাঠাতে হবে। পাঁচ সের সন্দেশ আর একখানা কাপড়। ব্যস, হয়ে গেল। এখন আর চিঠির কি দরকার! উড়েই যাক বা পুড়েই যাক, কিছু আসে-যায় না। আসল খবর জানা হয়ে গিয়েছে। চিঠির ততক্ষণই দরকার, যতক্ষণ তত্ত্বের খবরটুকু জানা যায়নি। জানার পর শুধু পাবার চেষ্টা।

কৃপা হলেই পাবে। কিন্তু কৃপা পাবে কি করে? কৃ আর পা, দুয়ে মিলে কৃপা। করলেই পাবে। সুতরাং কাজ করো। কর্তব্য করো। 'শরীরং কেবলং কর্ম।'

'তুমি হবে আমার বিদ্যারূপিণী স্ত্রী।' সারদাকে বললে রামকৃষ্ণ।

বিদ্যারূপিণী স্ত্রী ভগবানের দিকে নিয়ে যায়। আর অবিদ্যারূপিণী স্ত্রী ঈশ্বরকে

ভুলিয়ে দেয়, সংসারে ডুবিয়ে রাখে। বিদ্যার সংসারে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ঈশ্বরের ভক্ত। ঈশ্বরই তাদের একমাত্র আপনার লোক, অনন্ত কালের আপনার। তারা পাণ্ডবদের মত। সুখ হোক দুঃখ হোক কখনো তাঁকে ভোলে না।

কিন্তু অবিদ্যাতে যদি অজ্ঞান, তবে ঈশ্বর অবিদ্যা করেছেন কেন?

তাঁর লীলা। মন্দটি না থাকলে ভালোটি বুঝবে কি করে? আবার খোসাটি আছে বলেই আম বাড়ে আর পাকে। আমটি তৈরি হলেই তবে খোসা ফেলে দিতে হয়। মায়ারূপ ছালটা আছে বলেই ক্রমে-ক্রমে ব্রহ্মস্বাদ।

কিন্তু বামনির মোটেই ইচ্ছা নয় সারদার সঙ্গে রামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠতা ঘটে। সে বলে এতে ব্রহ্মচর্যের হানি হবে।

সরলা সারদা ভয় পায়। ঠাকুর রামকৃষ্ণ হাসে।

একদিন রামকৃষ্ণকে গৌরাঙ্গ সাজাল বামনি। সাজাতেই ভাব হয়ে গেল রামকৃষ্ণের।

বামনি সারদাকে ডেকে আনল। বললে, 'কেমন হয়েছে?'

ভাবাবেশ দেখে ভয় পেয়ে গেল সারদা। কোনো রকমে একটা প্রণাম সেরে ছুটে পালাল।

বামনির এমন একটা ভাব, রামকৃষ্ণের যা কিছু দিব্যচেতনা সমস্ত তার জন্যে। অন্ধজনকে সেই যেন দৃষ্টিদান করেছে।

মহামায়ার কি লীলা, বামনির মধ্যে অহঙ্কার ঢুকে গেল। কি থেকে কী যে হয়ে গেল কেউ কিছু বুঝতে পারল না।

চিনু শাঁখারি তখনো বেঁচে আছে। বুড়ো অথর্ব। রামকৃষ্ণের কাছে এসেছে প্রসাদ নিতে। তার ভক্তি দেখে বামনি বেজায় খুশি। প্রসাদ পাবার পর এঁটো পরিষ্কার করতে যাচ্ছে চিনু, বামনি বললে, থাক, এ এঁটো আমি তুলব। চিনু তা মানতে রাজি নয়, কিন্তু বামনির রূঢ় নিষেধের কাছে তার আর হাত উঠল না। কিন্তু হৃদয় এল চোটপাট করে। এ কী অনাচার!

গাঁয়ের বামুনের মেয়ে যারা সেখানে ছিল তারাও বামনির বিরুদ্ধে। এখানে চলবে না এ সব অনাসৃষ্টি।

'চিনু ভক্ত লোক, তার এঁটো নেব, তাতে কি?' বামনিও ফণা বিস্তার করলে।

'শাঁখারির এঁটো নেবে, থাকবে কোথা?' হৃদয় এল মুখ খিঁচিয়ে: 'বলি, কে তোমাকে জায়গা দেবে? শোবে কোথা?'

বামনি গর্জন করে উঠল : 'শীতলার ঘরে মনসা শোবে।'

এই থেকে লেগে গেল বিষম ঝগড়া। যেখানে যেমন সেখানে তেমন—এই নীতি-বাক্যের ভুল হয়ে গেল বামনির। আর হৃদয়ও কাঠ-গোঁয়ার, দিশপাশের জ্ঞান নেই। মুখের ঝগড়া না মারামারিতে এসে পৌঁছয়। বামনি বুঝি আসে এই ত্রিশূল উঁচিয়ে।

কোথা থেকে কী হয়ে গেল, হৃদয় কি-একটা ছুঁড়ে মারল বামনিকে। জোরে ছুটে এসে লাগল ঠিক কানের কাছাকাছি। রক্ত পড়তে লাগল। কাঁদতে বসল বামনি। রামকৃষ্ণ কাতর হয়ে পড়ল। 'ওরে হৃদু, তুই কেন এমন করলি? ওরে, ও যে ভক্তিমতী যশোদা। এমন হলে যে লোক জড় হবে, কেলেঙ্কারি হবে—'

এখন উপায় কি। রামকৃষ্ণই ঠিক করল উপায়। বামনিকে ভাব দিয়ে দিলে। ভয় পাবার ভাব।

থেকে-থেকে উপরের দিকে তাকায় আর ভয় পায়। লাহাদের প্রসন্নময়ীকে সম্বোধন করে বলে, 'ওরে প্রসন্ন, আমার এ কী হল? আমি এখন কি করি, কোথা যাই! জগন্নাথ যাই না বৃন্দাবন যাই।'

এক দিন সত্যি-সত্যি কোথায় চলে গেল বামনি কেউ টের পেল না। ছ বৎসরের নিরন্তর-বাসের মায়া কেটে গেল এক মুহূর্তে।

চাতুর্মাস্যের সময় প্রায়ই এখন কামারপুকুরে আসে রামকৃষ্ণ। সেবার এসে অসুখে পড়েছে। পেটের অসুখ। পথ্যি সাবু-বার্লি।

রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে পাট চুকিয়ে শুতে গেছে মেয়েরা। ভাবে টলমল করতে-করতে দরজা খুলে বাইরে হঠাৎ বেরিয়ে এল রামকৃষ্ণ। লক্ষ্মীর মাকে উদ্দেশ করে বললে, 'সে কি গো, তোমরা যে সব শুতে গেলে! আমাকে খেতে দেবে না?'

সকলে তো হতবুদ্ধি। লক্ষ্মীর মা বললে, 'সে কি কথা? এই যে তুমি খেলে দুধ-বার্লি—'

'কই খেলুম! আমি তো এই দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি। কই খাওয়ালে!'

বুঝতে কারু বাকি রইল না, ভাবাবেশ হয়েছে রামকৃষ্ণের। কিন্তু উপায়? ঘরে তো কিছুই তেমন খাবার নেই। কি দেব এই পেট-রোগা মানুষকে?

'ঘরে তো তেমন কিছু নেই। শুধু মুড়ি আছে।' বললে লক্ষ্মীর মা। 'তা, খাবে মুড়ি? তাই দুটি খাও না। পেটের অসুখ করবে না তাতে।'

থালায় করে মুড়ি আনল। কিন্তু মুখ ফিরিয়ে রইল রামকৃষ্ণ। বললে, 'শুধু মুড়ি আমি খাব না।'

কিন্তু ঘরে আর কিছু নেই যে। তোমার এই পেটের অসুখে অন্য-কিছুই বা আর কি দেওয়া যায়? দোকান-পসার এখন বন্ধ। সাধ্য নেই সাবু-বার্লি কিনে এনে তোমাকে এখন জ্বাল দিয়ে দি।

ও আমি খাব না। অভিমানে মুখ ভার করে রইল রামকৃষ্ণ।

ভাইপো রামলালকে তখন বেরুতে হল বাজারে। ঝাঁপ ফেলে ঘুমিয়ে পড়েছে দোকানি, ডাকাডাকি করে তার ঘুম ভাঙালে। মিষ্টি কিনলে এক সের। বাড়িতে এসে মুড়ির থালার পাশে নামিয়ে রাখল মিষ্টির হাঁড়ি। রামকৃষ্ণের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে, আরো দুটি মুড়ি দাও।

থালায় আরো মুড়ি ঢেলে দিলে লক্ষ্মীর মা। আনন্দে খেতে লাগল রামকৃষ্ণ।

কী সর্বনাশ যে হবে কল্পনা করতেও ভয় পেল সকলে। মাসের অর্ধেক দিন সাবু-বার্লি খেয়ে যে কোনো-মতে বেঁচে আছে তার এই রাক্ষুসে খাওয়া! এত রাত্রে, পেটের এই অবস্থায়! ডাক্তার-বদ্যিতে আর কুলোবে না।

ভয়ে-ভয়ে রাত কাটাল সারদা। সঙ্গে-সঙ্গে লক্ষ্মীর মা।

কিন্তু পর দিন দিব্যি সুস্থ আছে রামকৃষ্ণ। দেহে কোনো রোগ-উদ্বেগ নেই। তার দেহে বসে ঐ খাওয়া কে খেয়েছে কে বলবে।

সেবারে এসে শ্বশুরবাড়ি গেছে। কি একটা ক্রিয়াকর্ম ছিল সেদিন, অনেক লোক-খাওয়ানো হয়েছে। রাতের খাওয়া চুকে গিয়েছে অনেকক্ষণ, শুতে গিয়েছে সবাই। হঠাৎ রামকৃষ্ণ বিছানা থেকে উঠে পড়ল। বললে, 'আমি খাইনি না কি? ভীষণ খিদে পেয়েছে যে। কিছু খেতে দাও—'

কি হবে! ঘরে যে এখন কিছুই নেই। মেয়েরা মাথায় হাত দিয়ে বসল।

খুঁজে-পেতে দেখা গেল হাঁড়িতে কতগুলো পান্তা ভাত শুধু পড়ে আছে। ওমা, তাও কি দেওয়া যায় জামাইকে!

তবু, ভয়ে-ভয়ে, তাই বলতে গেল সারদা। বললে, 'হাঁড়িতে পান্তা ভাত ছাড়া আর কিছুই নেই।'

'তাই নিয়ে এস।' হুঙ্কার ছাড়ল রামকৃষ্ণ।

তবু কুণ্ঠা যায় না সারদার। বললে, 'সঙ্গে তো আর কোনো তরকারি নেই।'

'আছে।' রামকৃষ্ণ আবার গর্জন করল। 'মাছ-চাটুই যে করেছিলে দেখ এক-আধটু পড়ে আছে কি না—'

সারদা ছুটে গেল রান্নাঘরে। দেখল বাটির এক কোণে ছোট্ট একটি মৌরলা মাছ পড়ে আছে। আর তার আশে-পাশে একটুখানি কাই। তাই রাখলে ভাতের পাশে।

উল্লাস আর ধরে না রামকৃষ্ণের। ছোট্ট ঐ একটি মাছের সহযোগে এক রেক চালের ভাত খেয়ে ফেলল।

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সারদা। এ কি আহার না আহুতি!

এ নিছক পাগলামি। মনে-মনে আপসোস করতে লাগল সারদার মা।

শুধু মনে-মনেই বা কেন? স্পষ্টাস্পষ্টিই দুঃখ করলে এক দিন। বললে, 'কী পাগল জামাইয়ের সঙ্গেই আমার সারদার বে দিলুম! আহা! ঘর-সংসারও করলে না, ছেলেপিলেও হল না, মা বলাও শুনলে না—'

শুনতে পেল রামকৃষ্ণ।

বললে, 'শাশুড়ি ঠাকরুন, সেজন্যে দুঃখ করবেন না। আপনার মেয়ের এত ছেলেমেয়ে হবে যে শেষে দেখবেন মা ডাকের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছে—'

'তা যা বলে গেছেন তাই ঠিক হয়েছে, মা।' শ্রীমা এক দিন তাই বললেন, স্ত্রী-ভক্তদের। 'আমার নরেন, বাবুরাম, রাখাল, শরৎ। আমার দুর্গাচরণ নাগ—' ভক্ত মেয়েরা ঘিরে বসল শ্রীমাকে।

'মঠে যেবার প্রথম দুর্গাপূজা করালে নরেন, আমাকে নিয়ে গেল। আমার হাত দিয়ে পঁচিশ টাকা দক্ষিণা দেওয়ালে। মোট চৌদ্দশ টাকা খরচ করেছিল নরেন। চারদিকে লোকারণ্য, ছেলেদের খাটা-খাটনির অন্ত নেই। হঠাৎ নরেন এসে আমাকে বললে, "মা, আমার জ্বর করে দাও।" ওমা, খানিক বাদে সত্যি-সত্যি তার হাড় কাঁপিয়ে জ্বর এসে গেল। সে কি কথা? এখন কি হবে। "সেধে জ্বর নিলুম, মা। ছেলেগুলো প্রাণপণে খাটছে বটে, তবু কখন কি ভুলচুক করে বসবে আর আমি রেগে উঠে কখন থাপ্পড় মেরে বসব ঠিক নেই। তাই ভাবলুম, কাজ কি, থাকি কিছুক্ষণ জ্বরে পড়ে!" কাজকর্ম চুকে আসতেই বললুম, "ও নরেন, এখন তা হলে ওঠো।" "হ্যাঁ মা, এই উঠলুম আর কি।" ঝটকা মেরে যেমন তেমনি উঠে বসল নরেন।'

॥ ৩৫ ॥

এক গলা ঘোমটা টেনে স্বামীর কাছে এসে দাঁড়ায় সারদা। যখন পাশে এসে বা বসে তখনো ঘোমটা খোলে না।

কি করে সলতেটি রাখতে হয় প্রদীপে—তা থেকে শুরু করে—কি করে চলতে হয় ট্রেনে-নৌকায় সব তাকে শেখায় রামকৃষ্ণ। গৃহস্থালির ছোটখাটো ব্যাপার, দৈনন্দিন খুঁটিনাটির কাঁটাখোঁচা। নেমন্তন্ন বাড়ির ভোজ থেকে শুরু করে শাক-

pathagar.net

পাতার কচুঘেঁচু। বাড়ির কে কেমন লোক, কার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে তার ফিরিস্তি। শুধু নিজের বাড়িতেই বা কেন? ধরো আর কারু বাড়িতে বেড়াতে গেলে, তখন সেখানেই বা কেমনধারা চলবে-ফিরবে, জেনে রাখো। আমি না-হয় টাকা ছুঁই না, কিন্তু তোমার হাতে তো টাকা আসবে, করতে হবে কত দেবতা-অতিথির সেবা, কত ভক্ত-বন্ধুর পরিচর্যা—সূক্ষ্ম করে হিসেব রাখবে মনে-মনে। গরমিল-গোঁজামিলের ধার ধারবে না।

শুধু তাই? তার পর ঈশ্বরসংবাদ আছে না? শুধু কি সংসারের রান্না-ভাঁড়ারের খবর নিয়ে ক্ষান্ত হবে, নেবে না সেই সমস্ত সাক্ষী ভগবানের সম্ভাষণ? কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায়, কিন্তু তার মন পড়ে আছে আড়ায়, যেখানে তার ডিম রয়েছে। বড়লোকের বাড়িতে ঝি কাজ করছে, কিন্তু তার মন পড়ে আছে নিজের দেশের বাড়িতে। মনিবের ছেলেদের বলে, আমার রাম, আমার হরি, কিন্তু মনে-মনে বেশ জানে, এরা আমার কেউ নয়। তেমনি সংসারে কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরে ফেলে রাখবে।

আর, ঈশ্বরও শুধু এই মনটিই দেখেন। একলব্য মাটির দ্রোণ সামনে রেখে বাণ-চালনা শিখেছিল। তার মনের একাগ্রতায়ই সে-মাটির মূর্তি গুরু হয়ে উঠেছে। কিন্তু মন বিষয়ে ফেলে রাখো, ভিজে-দেশলাই হয়ে উঠবে। যতই কেননা ঘষো, জ্বলবে না কিছুতেই।

পাড়াগাঁয়ে মাছ ধরবার জন্যে মাঠে ঘুনি পাতে দেখনি? ঘুনির ভেতরে চিক-চিক করে জল যায় দেখে ছোট-ছোট মাছগুলির ভারি ফুর্তি, খেলতে-খেলতে তারাও ঢুকে যায় ভিতরে। যে পথে ঢুকেছে সেই পথেই বেরিয়ে আসতে পারে অনায়াসে, কিন্তু জলের মিষ্টি শব্দ আর মাছের সঙ্গে খেলা তাদের ভুলিয়ে রাখে। আর বেরিয়ে আসবার চেষ্টাও করে না, সেইখানেই আটকে থাকে। পরে মারা পড়ে। তেমনি সংসারের বাইরের চাকচিক্য দেখে লোকে সাধ করে ঢোকে আর মায়া-মোহে জড়িয়ে পড়ে পথ খুঁজে পায় না। 'গতায়াতের পথ আছে রে তবু মীন পলাতে নারে।'

কিন্তু এমন মাছও আছে যে, ঘুনির কাছে গিয়ে ঐ দেখে লাফিয়ে অন্য দিকে বেরিয়ে যায়।

তাকাও এবার অন্য দিকে। আকাশের দিকে। 'যঃ সর্বতঃ সর্বং জগৎ প্রকাশয়তি স আকাশঃ।' যিনি সমস্ত দিক থেকে জগৎকে প্রকাশিত করছেন তিনিই আকাশ। যিনি সামর্থ্যবান তাঁরই নাম ঈশ্বর। সর্বদা ও সর্বত্র আছেন তাই তিনি ভব। সর্বসংহারক বলে শর্ব। রোদন করান বলে রুদ্র। পরমৈশ্বর্যবান বলে ঈশান।

কল্যাণকর্তা বলে শিব। পশু ও পাশের ঈশ্বর বলে পশুপতি। সমস্ত বিশ্বে পূর্ণ হয়ে আছেন বলে পুরুষ। সর্বব্যাপক ও সর্বনিয়ামক বলে অন্তর্যামী। ভজনের যোগ্য বলে ভগবান। আর তিনি উৎপত্তি ও প্রলয়ের পরেও অবশিষ্ট থাকেন বলে তাঁর আরেক নাম বা আদি-নাম "শেষ"।

তাঁকে প্রণিপাত করো। নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করে দাও।

কিন্তু, জানো তো, তিনি আমাদের কাছে কোনো দূরের জিনিস বা দুষ্প্রাপ্য জিনিস নন। তিনি আমাদের বাপ-মা। পালন করেন বলে তিনি আমাদের বাপ, আর সন্তানের সুখ আর উন্নতি কামনা করেন বলে মা।

স্ত্রী-সঙ্গে বসে এমনি সেই অসঙ্গের আলাপ।

ঘৃতকুম্ভসমা নারী আর জলদ্‌বহ্নিসমান পুরুষ—রাখবে না পাশাপাশি। কিন্তু নারী এখানে ঘৃত নয়, সম্মুখে জ্বলছে যে অগ্নিমান অগ্নি সে তারই দাহিকা। যে ভাস্বর সূর্য সে তারই দীধিতি। "দেবতা সা ন মানুষী।"

সেই কোপনি-ধারী সাধুর গল্প জানো না?

গুরু বলেছে সাধুকে, নির্জনে গিয়ে সাধনা করো। বনের কোণে কুঁড়ে বেঁধে সাধন-ভজনে মন দিয়েছে সাধু। কিন্তু কোত্থেকে এসে জুটল ইঁদুরের উৎপাত। ইঁদুর আর কিছুই করে না, স্নান করে ভিজে কৌপীন যখন শুকোতে দেয় সাধু, তখন এসে কেটে দেয়। ভিক্ষেয় বেরিয়ে সাধু জনে-জনে নালিশ করে। আপনাকে রোজ-রোজ কে কৌপীন দেবে? একটা বেড়াল পুষুন। উপদেশ দিলে কেউ-কেউ। ভালো কথা—সাধু তখনি এক বেড়ালের বাচ্চা যোগাড় করলে। বেড়ালের ভয়ে পালাল ইঁদুর। কিন্তু বেড়ালের জন্যে রোজ-রোজ দুধ ভিক্ষে করে আনা কঠিন হয়ে উঠল। বারো মাস কে আপনাকে দুধ দেবে? একটা গরু পুষুন। বেড়ালও খাবে নিজেও পরিতৃপ্ত হবেন। তাই সই। দুধালো গরু আনলে সাধু। এখন থেকে ঘরে-ঘরে খড়-বিচালি ভিক্ষে করতে লাগল। নিত্যি-নিত্যি কে আপনাকে খড় যোগাবে? আপনার কুটিরের কাছে পতিত জমি পড়ে আছে, তাই চষে খড় লাগান। মন্দ কি, হাল-বলদ নিয়ে এসে পতিত জমিতে লাঙল চালাল সাধু। এখন তবে গোলাবাড়ি করতে হয়, নইলে ফসল রাখবে কোথায়? সাধু তাই নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, এমন সময় গুরু এসে উপস্থিত। চার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গুরু প্রশ্ন করলেন, এ সব কী? সাধু অপ্রতিভ হয়ে গেল। বললে, 'এক কৌপীনকা ওয়াস্তে।'

এক কোপনির জন্যে এত কষ্ট! আর সংসারী লোকের স্ত্রী-পুত্র, চাকরি-বাকরি, ঘর-বাড়ি, জিনিস-পত্র, টাকা-পয়সা, লোক-লৌকিকতা—যন্ত্রণার কি অন্ত আছে?

তাই তো চৈতন্যদেব বলেছেন, 'শুন শুন নিত্যানন্দ ভাই, সংসারী জীবের কভু গতি নাই।'

তবে তাদের উপায় ? হাসল রামকৃষ্ণ। বললে, উপায় তুমি।

হ্যাঁ, তুমি। তুমিই সমস্ত জীবের জননী। তুমি সংসারসারভূতা সুরেশ্বরী।

কিন্তু এ সব কথায় সারদার ষোল আনা সুখ কই ? তাকে যে পাড়ার সকলে 'পাগলের বউ' বলে খেপায়। স্বামিনিন্দা সহ্য করতে পারে না কিশোরী। পাছে বাড়িতে থাকলে পাড়া-বেড়ানো মেয়েদের মুখে স্বামিনিন্দা শুনতে হয়, সারদা চুপি-চুপি ভানু পিসির বাড়িতে চলে আসে। তার দাওয়ায় আঁচল বিছিয়ে শুয়ে থাকে নিরিবিলি।

জয়রামবাটির ক্ষেত্র বিশ্বাসের মেয়ে এই ভানু পিসি। কুড়ি বছর বয়সে বিধবা হয়ে চলে আসে বাপের বাড়িতে। সেই থেকেই আছে একটানা। সারদার উপরে বড় টান। তার পর রামকৃষ্ণ যখন আসে শ্বশুরবাড়ি, তখন আর-আর মেয়েরা তাকে 'খ্যাপা জামাই' বলে খেপালেও সে কিছুই বলতে পারে না, মুগ্ধের মত চেয়ে থাকে স্তব্ধ হয়ে।

খ্যাপা যখন তখন মুখের আর আগল কি। এমন সব কথা বলে রামকৃষ্ণ, হাসতে-হাসতে মেয়েদের পেট ছিঁড়ে যায়, লজ্জায় পালাবার পথ পায় না।

'বেশ হল, আগড়া গুলো সব উড়ে গেল।' বললে রামকৃষ্ণ। 'এবার বোসো তবে তোমরা গোল হয়ে। কথা হবে।'

খ্যাপা বাতাস না এলে কি আর আতপের দিন স্নিগ্ধ হয় ?

এক দিন ভানু পিসিকে জিগগেস করলে রামকৃষ্ণ, 'তোমার নাম কি ?'

'মানদাসুন্দরী।'

সারদাকে নির্দেশ করল রামকৃষ্ণ। 'এ তোমার কি হয় ? কি বলে ডাকে ?'

'পিসি বলে।'

'তবে আজ থেকে তোমার নাম হল ভানু পিসি।' বলেই গান ধরল রামকৃষ্ণ : 'গরবিণী নাম ঘুচেছে।'

মুখুজ্জেদের পাগলা-জামাইয়ের কাছে ভানু পিসি যায়, এতে তার গৌর-দাদার বড় আপত্তি। কথা বলছে কথা বলছে, হঠাৎ এক সময় চেঁচিয়ে ওঠে রামকৃষ্ণ—'ঐ গৌরদাদা এল !' অমনি ভয়ে পুঁটলি পাকিয়ে যায় ভানু পিসি ; দেখে রামকৃষ্ণ হাসে আর বলে, 'লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়।'

'আপনার কাছে আসি বলে আমার অনেক সইতে হয়।' ম্লান মুখে বললে ভানুপিসি।

'বেশ তো, যখন গৌরদাদা শাসাতে আসবে তখন দু'হাত তুলে লাচবি আর

বলবি—ভজ মন গৌর নিতাই। গৌরদাদা ভাববে তুই পাগল হয়ে গিয়েছিস, আর তোকে কিছু বলবে না।'

জয়রামবাটি থেকে কামারপুকুরে ফিরছে রামকৃষ্ণ। হঠাৎ ভানুর সঙ্গে দেখা। বললে, 'আমাকে খিলি তৈরি করে খাওয়াতে পারিস?'

অমনি পান সাজতে ছুটল ভানু পিসি। পান নিয়ে ফিরে এসে দেখে, রামকৃষ্ণ অনেক দূর চলে গিয়েছে। ভানু পিসি পিছু-পিছু ছুটতে লাগল। কিন্তু মেয়ে-মানুষ কত দূর ছুটবে? তা ছাড়া রামকৃষ্ণ চলেছে জোর কদমে, যেমন তার অভ্যেস। পিছন থেকে নাম ধরে ডাকে এমনও সাহস নেই। তবু থামছে না ভানু পিসি, গোঁ-ভরে ছুটে চলেছে। দু-একখানা গ্রাম বুঝি পার হয়ে গেল, তবু নিবৃত্তি নেই। হঠাৎ, কেন কে জানে, রামকৃষ্ণ পিছন ফিরে দাঁড়াল। ভানু পিসিকে দেখে চক্ষুস্থির।

'এ কি, তুই এত দূর এসেছিস?'

'আপনি যে তখন পান খেতে চাইলেন, তাই নিয়ে এসেছি।' আনন্দে পরিপূর্ণ ভানু পিসি।

ততোধিক আনন্দ রামকৃষ্ণের। বললে, 'তোর হবে—তোর হবে।' বলে হাতে পান নিয়ে হাসিমুখে বললে, 'কী হবে বল দিকি?'

ভানু পিসি চোখ নামাল। তার সে কী জানে।

'তোর আজ ঠেঙানি হবে। মেয়েমানুষ হয়ে এত দূর এলি, এখন বাড়ি ফিরে গেলে গোবেড়েন খাবি। এক কাজ কর। কুমোরবাড়ি থেকে একটা হাঁড়ি হাতে করে নিয়ে বাড়ি যা। তাহলে সবাই ভাববে কুমোরবাড়ি গিয়েছিলি।'

সেই থেকে ভক্তদের পান খাইয়ে এসেছে ভানু পিসি। বলেছে, ঠাকুরের প্রসাদী পান। ঠাকুর বলে গেছেন, তুমি আমাকে পান খাওয়াবে নিত্যি। ভক্তসেবাই আমার ঠাকুরসেবা।

শ্যামাসুন্দরী, সারদার মা—সেও আস্তে-আস্তে ঘুরে দাঁড়াল। নির্জনে বসল গিয়ে ঠাকুরের আরাধনায়।

ভানু পিসি বিদ্রূপে ঝলসে উঠল: 'কি গো, তখন না বলতে, খ্যাপা জামাই! কি আকাটের হাতে মেয়ে দিলুম—সারদার কত কষ্ট! এখন কেন? এখন কেন সেই খ্যাপা জামাইয়ের পট পুজো করছ?'

শ্যামাসুন্দরীর বাক্য স্তব্ধ। চক্ষু নিষ্পলক। মেনকাও এক দিন বসেছিল শিবের আরাধনায়।

কামারপুকুর থেকে একবার শিওড়ে গিয়েছে রামকৃষ্ণ, হৃদের বাড়িতে। দিদি

হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে গিয়ে এক মহা ফ্যাসাদ! দিদি কতগুলো ফুল যোগাড় করেছে, বলছে তোমার পাদপদ্ম বন্দনা করব।

কোনো বারণ শোনে না। ভোলে না ছদ্মবেশে। বলে, গরিবের ঘরে কাঙালের ঠাকুর এসেছ, তোমাকে ছাড়ব না কিছুতেই। জলে পা ধুয়ে দিয়ে চুল দিয়ে মুছে দেব। একটা শুধু বর দাও যেন কাশীতে গিয়ে প্রাণ যায়।

তথাস্তু। সজ্ঞানে কাশীতেই প্রাণত্যাগ করল হেমাঙ্গিনী।

'কিন্তু আমার কেন ঘুম আসে না বলতে পারো?' মধ্যরাত্রের অন্ধকারে বায়ু-রোগগ্রস্ত ভানু পিসি কেঁদে ওঠে।

'ঘুম আসে না, ঘুমের ওষুধ তো আছে।' কে যেন বলে ওঠে অন্ধকারে।

'কি ওষুধ?'

'সেই যে ভজ-মন-গৌরনিতাই।'

মনে পড়ে যায় ভানু পিসির। অন্ধকারে উঠে পড়ে বিছানা ছেড়ে। দু'হাত তুলে নাচ শুরু করে আর বলে, ভজ মন গৌরনিতাই। বলে, 'ঠাকুর তুমি দেখ আর আমি নাচি।'

॥ ৩৬ ॥

তুমি দেখ আর আমি নাচি।

তুমি করাও আমি করি। কর্ম না করলে দর্শন হবে কি করে? পানা না ঠেললে জল দেখব কি করে?

তুমি আছ, শুধু এ জেনে কি বসে থাকলে চলবে? কাঠে আগুন আছে, শুধু এ তত্ত্বে কি ভাত রান্না হবে? পুকুরপাড়ে বসে থাকলেই কি মাছ পাব?

কর্ম করো। কর্মই ফল। খেলাই আসল, হার-জিৎ কিছু নয়। কর্মেই কৃপা। কর্মেই ভক্তি। কর্ম করতে-করতেই কর্মত্যাগ। এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে আরেক হাতে কাজ করছ, শেষকালে এক দিন দু'হাতেই ঈশ্বরকে আঁকড়ে ধরবে।

যদি একবার ভক্তি লাভ হয় তবে বিষয়কর্ম বিস্বাদ হয়ে যাবে। ওলা মিছরির পানা পেলে চিটে গুড়ের পানা কে খেতে চায়?

তাই তুমি দেখ আর আমি নাচি।

কামারপুকুরে থেকে স্বাস্থ্য ফিরেছে রামকৃষ্ণের। এবার ফিরতে হয় দক্ষিণেশ্বরে। চল রে হৃদু, মা'র কাছে যাই।

বর্ধমানের কাছাকাছি এসে এক মাঠের মধ্যে বসে পড়ল রামকৃষ্ণ।

BanglaBook.org

ওখানে কি ?

দেখছিস না, মাঠময় কেমন কাঁটাফুল ফুটে আছে। জানিস না ঐ কাঁটাফুল মহাদেবের পছন্দ। ঐ কাঁটাফুলে পুজো করলে শূলপাণি প্রসন্ন হন।

কিন্তু মাঠময় তো শুধু বিষ্ঠা দেখতে পাচ্ছি। হৃদয় ধমকে উঠল।

বিষ্ঠা-চন্দনে ভেদ নেই রামকৃষ্ণের। সেই মাঠের মধ্যেই বসে পড়ল শিবপূজায়।

এ ভালো হচ্ছে না মামা। কলকাতায় যাবার এই একখানা মাত্র আজ ট্রেন। সারারাত আজ আর ট্রেন নেই। যদি ঐ দুপুরের গাড়ি এখন ধরতে না পারি, তবে সারা দিন-রাত স্টেশনে পড়ে থাকতে হবে। কে শোনে কার কথা। রামকৃষ্ণ শিবধ্যানে সমাহিত হয়ে রইল।

শুচি-অশুচি জ্ঞান নেই—এ কেমনতরো উন্মাদ! ভীষণ বিরক্ত হল হৃদয়। এখন গাড়ি যদি ফসকে যায় উপায় কি হবে ?

হঠাৎ হৃদয়ের সেই সাধুর কথা মনে পড়ে গেল, সেই জ্ঞানোন্মাদ সাধু। উলঙ্গ, গায়ে-মাথায় ধুলো, বড়-বড় নখচুলদাড়ি, কাঁধে মড়ার কাঁথার মত একটা ছেঁড়া কাঁথা। কালীঘরের সামনে দাঁড়িয়ে গমগমে গলায় এমন স্তব পড়লে যে মন্দিরটা পর্যন্ত কাঁপতে লাগল থরথর করে। প্রসাদ পেতে কাঙালীরা যেখানে বসেছে পাত পেড়ে সেখানে গিয়ে বসলে! তাড়িয়ে দিলে কাঙালীরা, চেহারায়-পোশাকে সে কাঙালীদের চেয়েও অধম। তাড়িয়ে দিলে বটে কিন্তু উপবাসী রইল না। যেখানে উচ্ছিষ্ট পাতাগুলো ফেলেছে সেখান থেকে কুকুরদের সঙ্গে ভাগ করে এঁটো ভাত খেতে লাগল—

মামা বললে, ওরে হৃদু, এ যে-সে উন্মাদ নয়, এ জ্ঞানোন্মাদ।

তাই শুনে হৃদয় দেখতে ছুটল। বাগান পেরিয়ে চলে যাচ্ছে সাধু, হৃদয় তার পিছু নিলে। বললে, মহারাজ, ভগবানকে কেমন করে পাব কিছু বলে দিয়ে যান—

পাগলের দৃকপাতও নেই। হৃদয়ও নাছোড়বান্দা। সঙ্গে-সঙ্গে চলেছে, আর মুখে সেই এক বুলি। ভগবানকে কেমন করে পাব, কবে পাব, কোথায় পাব ?

হঠাৎ রুখে দাঁড়াল পাগল। পথের ধারে নর্দমা ছিল তারই জল দেখিয়ে বললে, 'এই নর্দমার জল আর ঐ গঙ্গার জল যখন এক বোধ হবে তখন পাবি।'

তখন ? এ কি একটা মনের মতন কথা হল ? নিশ্চয়ই আরো অনেক তর্ক-তত্ত্ব আছে। হৃদয় ফের পিছু নিল। বললে, 'মহারাজ, আমাকে আপনার চেলা করে সঙ্গে নিন।'

তবে রে ? মাটি থেকে একটা ইট তুলে নিল পাগল। হৃদয়কে মারতে তাড়া

করলে। হৃদয় ছুটে পালাল, দেখতেও পেল না কোন দিকে চলে গেল সেই জ্ঞানোন্মাদ।

মামারও এখন দেখি সেই অবস্থা। নইলে মাঠময় বিষ্ঠার মধ্যে বসে শিবপূজা। শুচি-অশুচি জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যেতে না পারলে ভগবানের স্পর্শ পাওয়া যাবে না। ঐ দ্বন্দ্ববোধের উর্ধ্বেই তো সেই ভূমা-ভূমি। 'শুচি-অশুচিরে লয়ে দিব্য-ঘরে কবে শুবি। তাদের দুই সতীনে পিরীত হলে তবে শ্যামা মা'রে পাবি।' পুজো শেষ করে ইষ্টিশানে পৌঁছে দেখে—যা ভেবেছিল হৃদয়—কলকাতার ট্রেন চলে গিয়েছে : দিনে-রাতে আর ট্রেন নেই।

'তখন বলেছিলাম না?' হৃদয় খিঁচিয়ে উঠল : 'এখন কি করবে কোথায় থাকবে, দেখ। চেনাশোনা আত্মীয়বন্ধু কেউ নেই এখানে যেখানে থাকা যায়, খাওয়া যায় দুটি পেট ভরে।'

রামকৃষ্ণ নিরুত্তর। আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্ট। স্থিতি-গতি উদ্ভতি-বিরতি সব সমান। ইষ্টিশানের অফিসে খোঁজ নিতে গেল হৃদয়। বাঁধাধরা ট্রেন আর নেই বটে তবে একটা সুবিধে হতে পারে। বললে স্টেশন মাস্টার। কাশী থেকে একটা স্পেশাল গাড়ি আসছে খানিক পরেই—উর্ধ্বতন এক কর্মচারীর স্পেশাল—দেখি তার মধ্যে কোনো এক ফাঁকে জায়গা করে দিতে পারি কিনা। গাড়ি কলকাতায়ই যাচ্ছে, ভয় নেই।

সাধারণ যাত্রীর অধিকার নেই সেই গাড়িতে কিন্তু স্টেশন-মাস্টারের মধ্যে কি ভাব চলে এল কে জানে, মামা-ভাগ্নেকে একটা নিরালা কামরায় চড়িয়ে দিলে নিজ্ঞাবনায়।

হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে হাসল একবার রামকৃষ্ণ।

দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এসে শুনল মথুরবাবু আর তাঁর স্ত্রী তীর্থে যাবেন বলে ধুয়ো তুলেছেন। তাঁদের সাধ রামকৃষ্ণও তাঁদের সঙ্গে যাক। যাবে?

মন্দ কি। যেখানে অনেক লোক একত্র হয়ে অনেক দিন ধরে ঈশ্বরের জন্যে ব্যাকুল হয়ে জমায়েত হচ্ছে সেখানে ঈশ্বর নিশ্চয় প্রকাশিত। এত সাধু ভক্ত যোগী সন্ন্যাসী যেখানে গিয়ে ঈশ্বরভাবে উদ্দীপ্ত হচ্ছে তার মাহাত্ম্য কে অস্বীকার করবে? মাটি খুঁড়লে সব জায়গায়ই জল পাওয়া যায় বটে, কিন্তু যেখানে পাতকো-ডোবা পুকুর-পুষ্করিণী আছে সেখানে জল সহজে মেলে, সেখানে আর খুঁড়তে হয় না মেহনৎ করে। যেখানে-সেখানেই রান্না করা যায় বটে কিন্তু রান্নাঘরে বেশি সুবিধে।

আমি গেলে আমার সঙ্গে যাবে কিন্তু হৃদয়রাম।

নিশ্চয়ই যাবে। স-শো লোক চলেছে একসঙ্গে—দস্তুরমত একটা বাহিনী বলতে পারো। থার্ড ক্লাস তিনখানি আর সেকেণ্ড ক্লাস একখানি গাড়ি রিজার্ভ হয়েছে। যে কোনো স্টেশনে ইচ্ছেমত কাটিয়ে নেওয়া যাবে। গাড়ির শেষ গন্তব্য কাশীধাম।

কা শীতলা গঙ্গা? কাশীতলা গঙ্গা। সেই কাশী।

মাঘ মাস, ১৮৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে তীর্থভ্রমণে বেরুল রামকৃষ্ণ। যাবার আগে ভবতারিণীকে প্রণাম করলে। বললে, 'মা গো, তোকে আরেক বেশে আরেক দেশে দেখে আসি। বেদে যার কথা তন্ত্রেও তার কথা পুরাণেও তারই কথা। সবই তুই। তোর শুধু ভোল ফিরিয়ে মন ভোলানো!'

হলধারী কবেই পূজকের পদ থেকে অবসর নিয়েছে, এখন অক্ষয় বসেছে মন্দিরে। যে খুশি তোর পুজো করুক, আমি এখন পরিত্যক্তকর্মা পরমাত্মা।

বৈদ্যনাথধামে নামল প্রথম তীর্থযাত্রীরা।

কিন্তু রামকৃষ্ণের চোখ পড়ল অনাথ-দরিদ্রের দিকে। কোন এক গ্রাম অতিক্রম করে যাচ্ছে, দেখল গ্রামবাসীদের পরনে কাপড় নেই, মাথায় তেল নেই এক ফোঁটা। চলতে-চলতে থেমে পড়ল রামকৃষ্ণ। বললে, কোন বৈদ্যনাথকে দেখতে চলেছি? কত দূরে?

বৈদ্যনাথকে তোরা চিনবি না। দেখে নে একবার এই অনাথের নাথকে।

'তুমি তো মা'র দেওয়ান।' রামকৃষ্ণ ধরলে মথুরকে, 'এদেরকে এক মাথা করে তেল আর একখানা করে কাপড় দাও। আর পেট ভরে খাইয়ে দাও এক দিন।'

মথুরবাবু গাঁইগুঁই করতে লাগলেন। 'বাবা, তীর্থে অনেক খরচ হবে। এতগুলি লোক খাওয়াতে-দাওয়াতে গেলে টাকায় টানাটানি পড়ে যাবে, সামলাতে পারবো না।'

করুণায় কোমল রামকৃষ্ণ প্রচণ্ড নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। বললে, 'দূর শালা, তোর কাশী আমি যাব না। তুই যা তোর দলবল নিয়ে। আমি এদের কাছেই থাকব, এদের ছেড়ে যাব না কিছুতেই।'

সেই অটল প্রতিজ্ঞার কাছে নত হলেন মথুরবাবু। কলকাতা থেকে কাপড় আনালেন, স্থানীয় বাজার থেকে তেল কেনালেন, পাঠালেন মহাপ্রসাদের ভোগ লাগিয়ে দিলেন একদিন।

গ্রামবাসীর আনন্দেই রামকৃষ্ণের আনন্দ। যদি তুমি দারিদ্র্যমোচন না করো, তবে তুমি কিসের বৈদ্যনাথ?

সাতদিন দেরি হয়ে গেল কাশী যেতে। তা হোক। তবু মা, তুই আমাকে

শুকনো সন্ন্যাসী করিস নে। আমাকে করুণা-কোমলতা দে। আমাকে রসে-বশে রাগ। আমি চিনি খাব, চিনি হব কেন? এক টুখানি অহং আমার রেখে দে। সোনার একটু কণা, আগুনের একটি ফিনকি। ওটুকু অহং না থাকলে বিলাস করব কি করে? তুমি-আমি আস্বাদন করব কি করে? কি করে ভক্তের রাজা হব?

দূর থেকে দেখা যাচ্ছে কাশী। 'কাশী সর্বপ্রকাশিকা।' 'যেষাং কাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ।'

নৌকো করে ঢুকতে হল কাশীতে। ভাবনেত্রে রামকৃষ্ণ দেখল কাশী স্বর্ণময়ী। ইটকাঠমাটিপাথর কিছুই নেই। আগোগোড়া সুবর্ণমণ্ডিত। তার মানে অক্ষয় নিত্যধাম এই কাশীধাম—জ্যোতির্ময় সব ভাব আর ভক্তি একে কনকান্বিত করে রেখেছে।

কিন্তু ক'দিন পরেই বললে হৃদয়কে, 'ওরে এখানেও যা সেখানেও তাই। সেখানকার আমগাছ তেঁতুলগাছ বাঁশঝাড়টি যেমন এখানকার সেগুলিও তেমনি। এখানে তবে আর কি দেখতে এলুম রে? সেখানেও যা এখানেও তাই।'

পরে ভক্তদের তাই বলতেন ঠাকুর, 'ওরে যার হেথায় আছে—তার সেথায় আছে। যার হেথায় নেই তার সেথায়ও নেই।'

"যদেতেঽ তদমুত্র যদমুত্র তদিহ।" যা এখানে তাই সেখানে, যা সেখানে তাই এখানে। "তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।"

কেদারঘাটের পাশে দুখানি বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন মথুরবাবু। কাশীতে এসেও তাঁর রাজসিকতার অন্ত নেই। মাথায় রূপোর ছাতা, সঙ্গে আসাবরদার—চলেছেন যেন কোন রাজারাজড়া। বাইরে ঐশ্বর্যের জেল্লা কিন্তু অন্তরে দীনবন্ধুর দাক্ষিণ্য।

রোজ পানসিতে চেপে বিশ্বনাথ দর্শনে যায় রামকৃষ্ণ। সেদিনও তেমনি যাচ্ছে। মণিকর্ণিকার পাশে শ্মশান। সেখান দিয়ে যাবার সময় দেখল চিতায় মড়া পোড়ানো হচ্ছে, ধোঁয়ায় দিক-পাশ আচ্ছন্ন। দেখেই উৎফুল্ল হয়ে নৌকোর বাইরে চলে এল রামকৃষ্ণ, দিব্যভাবে সমাধিস্থ হয়ে গেল। টলে পড়ে যাচ্ছিল বুঝি, ধরতে এল মাঝি-মাল্লারা। কাউকে ধরতে হল না। রামকৃষ্ণ নিজেই নিশ্চেষ্টতার মধ্যে স্থির হয়ে আছে। মুখে দিব্য দীপ্তির প্রসাদ।

কি দেখলাম জানিস? ধ্যান ভাঙবার পর বললে রামকৃষ্ণ। দেখলাম প্রকাণ্ড এক সিতগাত্র পুরুষ শ্মশানে প্রত্যেক শবের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে। প্রত্যেককে তুলে নিচ্ছে হাতে করে আর তার কানে তারকব্রহ্ম-মন্ত্র উচ্চারণ করছে। শবের

অন্য পাশে বসে আছে শক্তিময়ী মহাকালী—একে-একে জীবের সকল সংস্কার-বন্ধন খুলে দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, নির্বাণের দ্বার খুলে দিয়ে অখণ্ডের ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছে তাকে। যা বহু জন্মের যোগসাধনায় পাওয়া যায় তা শুধু কাশীতে মরে বিশ্বনাথের থেকে আদায় করে নিচ্ছে।

কাশীতে মৃত্যু মানেই নির্বাণপদবী।

কাশীতে এক দিন ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সঙ্গে দেখা। সেই ত্রৈলঙ্গ স্বামী! মাকে শ্মশানে পোড়াতে এসে যে আর ঘরে ফিরল না, সেই শ্মশানেই থেকে গেল।

কাশীতে একবার পদ্মাসনে গঙ্গার উপর বসে ছিল ত্রৈলঙ্গ স্বামী। নৌকো করে এক ম্যাজিস্ট্রেট যাচ্ছিল সেখান দিয়ে। দৃশ্য দেখে তার চোখ তো চড়ক গাছ। নৌকোয় তুলে নিল সাধুকে। কত আলাপ-বিলাপ শুরু করল, কিন্তু সাধু মৌনী।

কোমরে একটা তরোয়াল ঝুলছিল ম্যাজিস্ট্রেটের। ত্রৈলঙ্গ স্বামী তা দেখতে চাইলে। কেন চাইলে কে জানে। হঠাৎ সাধুর হাত ফসকে জলের মধ্যে পড়ে গেল তরোয়াল। এখন উপায়? ভীষণ চটে উঠল ম্যাজিস্ট্রেট। খুব বকতে লাগল সাধুকে। ঠিক করল পারে গিয়েই পুলিসে দেবে।

পারে এসে নৌকো লাগতেই জলের মধ্যে হাত ডোবাল সাধু। একখানি নয় তিন-তিনখানি তরোয়াল উঠে এল জলের থেকে। তোমার কোনটা? ম্যাজিস্ট্রেট তো অবাক। এইটে তোমার। যেখানা তার ঠিক তা বেছে দিয়ে দিলে ম্যাজিস্ট্রেটকে। বাকী দু'খানা ফেলে দিলে জলের মধ্যে।

আরেক বার উলঙ্গ হয়ে গঙ্গাতীরে বসে আছে ত্রৈলঙ্গ স্বামী। ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুমে পুলিস তাকে ধরে নিয়ে গেল। উলঙ্গ হয়ে থাকা অপরাধ। বারে-বারে আইন লঙ্ঘন করছে সাধু, একেবারে হাজতে ঢুকিয়ে দাও। কিন্তু কতক্ষণ পরে ম্যাজিস্ট্রেট দেখে গঙ্গাতীরে তেমনি উলঙ্গ হয়ে ত্রৈলঙ্গ স্বামী বসে আছে। এ কি, ঘুষ খেয়ে পুলিস তাকে ছেড়ে দিলে নাকি হাজত থেকে? ম্যাজিস্ট্রেট ছুটল অমনি হাজত দেখতে। এ কি! হাজতের মধ্যেই তো বসে আছে ত্রৈলঙ্গ স্বামী। অমনি আবার ছুটল গঙ্গাতীরে। গঙ্গাতীরেই তো ত্রৈলঙ্গ স্বামী বসে আছে উলঙ্গ হয়ে।

তাকে খালাস দিয়ে দিল। কারাগারের দেয়াল যাকে আবদ্ধ করতে পারে না, বসন তাকে কি করে আবৃত করবে?

সেই ত্রৈলঙ্গ স্বামী।

রামকৃষ্ণ দেখল সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ। সাক্ষাৎ শ্বেতশিখা। সমস্ত কাশীধাম উজ্জ্বল

করে আছে।

শরীরে কোনো হুঁস নেই। তপ্ত বালিতে পা রাখা যায় না, তারই উপর সুখে শুয়ে আছে। যদি বৃষ্টি পড়ে, তেমনি শুয়ে থাকবে নিশ্চিন্ত হয়ে।

এক দিন নিজ হাতে পায়েস রেঁধে খাইয়ে এল রামকৃষ্ণ। মৌনাবলম্বন করে রয়েছে, তাই কথা হল না। মুখের কথা না হোক, ইশারা-ইঙ্গিতে আলাপ করতে লাগল দুজনে। যেন এক দেশের মানুষ। একই ভাষাভাষী। যেন কত আগের চেনা। রামকৃষ্ণ প্রশ্ন করল ইশারায়: 'ঈশ্বর এক না অনেক?' ইশারায়ই উত্তর দিল ত্রৈলঙ্গ স্বামী: 'যদি সমাধিতে দেখ তবে এক, আর যদি জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখ তবে বহু। আমি তুমি জীব জগৎ সমস্ত।'

সুর এক। শুধু রাগরাগিণীর নানা নাম। সপ্তস্বর এক, তার বর্ণনা বিচিত্র। **'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।'**

'বুঝলি?' হৃদয়কে বললে রামকৃষ্ণ, 'একেই বলে ঠিক-ঠিক পরমহংস অবস্থা।'

॥ ৩৭ ॥

কাশীর থেকে প্রয়াগ। পুণ্য সঙ্গমে স্নান আর তিন রাত্রি বাস চাই প্রয়াগে। মথুরবাবুরা সেখানে মাথা মুড়োলেন। রামকৃষ্ণ বললে, আমার দরকার নেই। আমার শরীর কাশীক্ষেত্র। ত্রিভুবনজননী গঙ্গা আমার জ্ঞানগঙ্গা। ভক্তি-শ্রদ্ধা আমার গয়া। গুরুচরণধ্যানযোগ আমার প্রয়াগ। আর যিনি সকলজনমন-সাক্ষী তিনি আমার অন্তরাত্মা। "দেহে সর্ব মদীয়ে যতি বসতি পুনস্তীর্থমস্যং কিমস্তি।" আমার দেহেই যখন সকলে বাস করছে তখন আমার আবার তীর্থান্তর কী!

প্রয়াগ থেকে ফের সকলে ফিরল বারাণসী। 'বিরিঞ্চি-বিরচিতা বারাণসী'।

এক দিন চৌষট্টি-যোগিনী পাড়া দিয়ে যাচ্ছে রামকৃষ্ণ, সঙ্গে হৃদয়, কাকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

'ওরে হৃদু, ও আমাদের সেই বামনি না?'

সত্যিই তো সেই যোগেশ্বরী ভৈরবী। কী আশ্চর্য, এখানে কোথায় আছ?

আছি এ পাড়ায়, মোক্ষদার বাড়িতে। মোক্ষদা আমার মূর্তিমতী প্রণতি।

'তুমি আমাদের সঙ্গে বৃন্দাবনে চলো।'

'চলো।'

গঙ্গাতীরে এসে দাঁড়াল রামকৃষ্ণ। বললে, মা, তোকে ছেড়ে এখন যমুনায় চলেছি। সেই মুরারিকায়কালিমাময়ী সদাসিতা-যমুনা। মা গো, তুই দুর্গা, গঙ্গা,

গগনবাসিনী। তুই পাষাণভেদিনী খড়্গহস্তা। জন্মপ্রবাহহরণী পারায়ণপরায়ণা। আর যমুনা মধুবনচারিণী রাসেশ্বরী। অশেষনায়িকা কৃষ্ণকান্তা। দুজনেই মা, মহানন্দা মোক্ষদাত্রী। দুজনেই প্রাণদা প্রাণনীয়া।

নিধুবনের কাছে বাড়ি ভাড়া করলেন মথুর। কিন্তু চার দিকে চোখ চেয়ে এ সব কী দেখছে রামকৃষ্ণ! দেখছে না কাঁদছে। চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে! বলছে, 'কৃষ্ণ রে, সবই তো রয়েছে, কেবল তোকে দেখতে পাচ্ছি না।'

বাঁকাবিহারীর মূর্তি দেখে বিহ্বল হয়ে গেল। ছুটল আলিঙ্গন করতে। গোবর্ধন দেখে আবার ভাবাবেশ। ভাবাবেশে উঠল গিয়ে একবারে গিরিচূড়ায়। আর নামে না। তখন ব্রজবাসীদের পাঠিয়ে নামিয়ে আনলেন মথুরবাবু।

সন্ধ্যের দিকে যমুনাতীরে বেড়ায় আর কলিন্দনন্দিনীর গুণগান করে। যমুনার চড়ার উপর দিয়ে গরু নিয়ে বাড়ি ফিরছে রাখালেরা। দেখেই কৃষ্ণের উদ্দীপনা উপস্থিত। 'কৃষ্ণ কই কৃষ্ণ কই' বলতে-বলতে ছুটল তাদের পিছু-পিছু। ওরে তোরাই আমার সেই লীলামানুষবিগ্রহ নারায়ণ।

কালীয়দমনের ঘাটে এসে আবার ভাবাবেশ। স্নান করবে কিন্তু শরীরে বশ নেই। ছোট ছেলেটিকে যেমন করে নাওয়ায় তেমনি করে নাইয়ে দিলে হৃদয়। এইখানেই গঙ্গামায়ীর সঙ্গে দেখা।

ষাট বছর বয়স, নিধুবনের কাছে কুটির বেঁধে একলাটি থাকে গঙ্গামায়ী। ললিতা সখী হয়ে রাধিকার সেবাচর্যা করে। প্রেমরূপা যে ভক্তি করে তার সাধন-মোদন।

দুজন দুজনকে চিনে ফেলল। রামকৃষ্ণ বললে, তুমি ললিতা-সখী। গঙ্গামায়ী বললে, তুমি রাসেশ্বরী রাধিকা। তুমি আমার দুলালী, রাজদুলালী।

রামকৃষ্ণকে গঙ্গামায়ী দুলালী বলে ডাকে। কৃষ্ণপ্রাণাধিকা বিষ্ণুমায়া!

গঙ্গামায়ীকে পেয়ে সব ভুল হয়ে যায় রামকৃষ্ণের। কখন বা খাওয়া-দাওয়া, কখন বা বাড়ি ফিরে যাওয়া। কোথায় বাড়ি, কি বা আহার! ভোক্তাও নেই ভোজ্যও নেই চলেছে তবু ভোজনের আস্বাদ।

এক-এক দিন বাসা থেকে খাবার নিয়ে এসে খাইয়ে যায় হৃদয়। কোনো-কোনো দিন গঙ্গামায়ীই খাইয়ে দেয় রান্না করে।

থেকে-থেকে ভাব হয় গঙ্গামায়ীর। সে ভাব দেখবার জন্যে ভিড় জমে চার দিকে। এক দিন হল কি, ভাবাবেশে গঙ্গামায় হৃদয়ের কাঁধের উপর চড়ে বসল।

'এ তো বড় বিপদ হল দেখছি!' হৃদয় ঝটকা মারল, কড়া গলায় বললে রামকৃষ্ণকে, 'তুমি চলো এখান থেকে। একেবারে সটান দক্ষিণেশ্বর। বিন্দেবনে

আর কাজ নেই।'

কিন্তু রামকৃষ্ণ ঠিক করল আর ফিরবে না। গঙ্গামায়ীর আশ্রয়ে থেকে যাবে ব্রজ-ধামে। শ্রীমতী হয়ে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করবে।

মথুরবাবু ভাবনায় পড়লেন। ডাকতে বসলেন মহামায়াকে। মা গো, আমার দক্ষিণেশ্বর কি দক্ষিণাহীন হয়ে যাবে?

হৃদয় ধমকে উঠল, 'তোমার এত পেটের অসুখ, তোমাকে এখানে দেখবে কে?'

'কেন, আমি দেখব। আমি সেবা করব।' বললে গঙ্গামায়ী।

কিন্তু খাবে কি? শোবে কোথায়?

'সেদ্ধ চালের ভাত খাব। শোব এই গঙ্গামায়ীর ঘরেই। গঙ্গামায়ীর বিছানা ঘরের ওদিকে হবে, আমারটা এদিকে হবে। ভাবনা কি।'

'ওসব চলবে না চালাকি।' হৃদয় রামকৃষ্ণের হাত ধরে টানতে লাগল: 'ওঠো। চলো।'

আরেক হাত ধরে টানতে লাগল গঙ্গামায়ী। বললে, 'না, দেব না। কিছুতেই যেতে দেব না।'

দুজনের টানাটানিতে রামকৃষ্ণ নাজেহাল। এক দিকে রাধিকা অন্য দিকে কালী। এক দিকে মহাভাব অন্য দিকে মহামায়া।

সেই টানাটানিতে মা'র কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল রামকৃষ্ণের। মা'র কথা মানে চন্দ্রমণির কথা। মা সেই কালীবাড়ির নবতে বসে আছেন একলাটি। বসে আছেন রামকৃষ্ণের পথ চেয়ে।

মন স্থির করতে আর দেরি হল না রামকৃষ্ণের। বললে, 'না, আমার আর এখানে থাকা হবে না। আমাকে মা ডাকছেন।'

মা সকল তীর্থের ঊর্ধ্বে। মা স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী।

ওরে সংসারে বাপ-মা পরম গুরু, যথাসাধ্য ওঁদের সেবা করতে হয়। যে চরম দরিদ্র, যার শ্রাদ্ধ করবারও ক্ষমতা নেই সে অন্তত বনে গিয়ে তাঁদের কথা মনে করে কাঁদবে। কেবল ঈশ্বরের জন্যে বাপ-মা'র আদেশ লঙ্ঘন করা চলে—আর কিছুতে নয়। বাপের কথায় প্রহ্লাদ ছাড়েনি কৃষ্ণনাম। কৈকেয়ীর কথায় ভরত ছাড়েনি রামসেবা। মা বারণ করলেও ধ্রুব বনে গিয়েছিল তপস্যা করতে। রামের জন্যে রাবণের কথা শোনেনি বিভীষণ। ভগবানের জন্যে বলি তার গুরু শুক্রাচার্যকে অমান্য করেছে। আর কৃষ্ণকামিনী গোপিনীরা মানেনি তাদের পতির আধিপত্য।

মা কি কম জিনিস গা? শচী বললেন, কেশব ভারতীকে কাটব। চৈতন্যদেব

অনেক করে বোঝালেন। বললেন, 'মা, তুমি অনুমতি না দিলে আমি যাব না। তবে জানো তো, সংসারে আমি যদি থাকি, তবে আমার দেহ আর থাকবে না। তবে এটুকু বলে দিচ্ছি মা, যখনই মনে করবে, আমাকে দেখতে পাবে। আমি তোমার কাছে-কাছেই থাকব।' তবে শচীমাতা অনুমতি দিলেন।

আর, নারদের কথা জানো না? মা তাঁর যত দিন বেঁচে ছিল সে তপস্যায় যেতে পারেনি। সে নইলে মা'র সেবা করবে কে? মা'র দেহত্যাগ হল, তবে বেরুল হরিসাধনে।

'টানাটানিতে মা'র কথা মনে পড়ে গেল। অমনি বদলে গেল সমস্ত। ভাবলুম, মা বুড়ো হয়েছেন, মা'র চিন্তা থাকলে ঈশ্বর-ফিশ্বর সব ঘুরে যাবে। তার চেয়ে তাঁর কাছেই যাই। গিয়ে সেখানেই ঈশ্বরচিন্তা করি নিশ্চিন্ত হয়ে।'

হাজরার মা রামলালকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে দক্ষিণেশ্বরে, রামলালের খুড়ো-মশায় যেন হাজরাকে একবার পাঠিয়ে দেন তাঁর কাছে।

ঠাকুর বললেন হাজরাকে, 'বুড়ো মা, যাও, একবার দেখা দিয়ে এস।'

কিছুতেই গেল না হাজরা। তার মা কেঁদে-কেঁদে মরে গেল।

নরেন বললে, 'এবারে হাজরা দেশে যাবে।'

'এখন দেশে যাবে, ঢ্যামনা—শালা। দূর—দূর—'

আচ্ছা, নিজের মা'র রূপ কি ধ্যান করতে পারা যায়? এক দিন জিগগেস করল মণি মল্লিক।

'হ্যাঁ, মা গুরু। ব্রহ্মময়ীস্বরূপা। মাকেই ধ্যান করবি।'

মা ধরিত্রী জননী দয়ার্দ্রহৃদয়া নির্দোষা সর্বদুঃখহা। পরমা মায়া পরমা ক্ষমা পরমা শান্তি। মা'র মত এমন ধ্যানের মূর্তি আর কী আছে?

গিরিশ ঘোষ বসল এসে ঠাকুরের পদচ্ছায়ে। বললে, আমাকে ত্রাণ করুন। আমি ত্রাণ করবার কে?

মনে আছে কামারপুকুরের সেই মাগুর মাছটাকে আপনি পায়ে ঠেলে-ঠেলে জলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মাছটা নিরাশ্রয় হয়ে চলে এসেছিল মাটিতে। আপনি তাকে স্বধামে পাঠিয়ে দিলেন। তেমনি যদি পাপার্ত জীব আপনার পায়ে এসে পড়ে, আপনি তাকে ঠেলে-ঠেলে নিয়ে যাবেন না মোক্ষধামে?

আমি পাপ মানি না। পাপী বলে বিশ্বাস করি না কাউকে। আমার যেমন সাধুরূপী নারায়ণ তেমনি আবার ছলরূপী নারায়ণ, লুচ্চারূপী নারায়ণ—

মুগ্ধের মত তাকিয়ে রইল গিরিশ ঘোষ।

'গাড়ি করে যাচ্ছি, বারান্দার উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলাম দুই বেশ্যা।

দেখলাম সাক্ষাৎ ভগবতী—দেখে প্রণাম করলাম। শোন, বলি তোকে, কাঁদতে হবে। মল্লিকের মা জিগগেস করলে, ওদের কি কোনো মতেই উদ্ধার হবে না? নিজে আগে-আগে অনেক রকম করেছে কিনা! বললুম, হ্যাঁ, হবে—যদি আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে কাঁদে। শুধু হরিনাম করলে কি হবে, আন্তরিক কাঁদা চাই। তাই তোকে বলি, তুই কেঁদে-কেঁদে মাকে একবার ডাক মনের থেকে। যতই তোর পাপ হোক, যতই তুই ক্লেদে-আবর্জনায় ডুবে থাক, মাকে ডাকলে মা এসে তোকে মুক্ত করে দেবেনই—'

তেমনি গিরিশ গেল আবার শ্রীমা'র পদাশ্রয়ে। বললে, আমাকে ত্রাণ করুন। আমি ত্রাণ করবার কে?

মনে আছে জয়রামবাটিতে একটা বাছুরের কান্না শুনে আপনি তার বাঁধন খুলে দিয়েছিলেন। দিয়েছিলেন তাকে তার অমৃতলাভের অধিকার। তেমনি, মা, কত বাসনা-কামনার বন্ধনে বাঁধা পড়ে আছি। স্বহস্তে খুলে দিন শৃঙ্খল। বুঝতে দিন পরমার্থের আস্বাদ।

'ঠাকুর বলতেন বিচি খোলা বাদ দিলে সব বেলটা পাওয়া যায় না। তুমি তো সম্পূর্ণ বেল। তুমি তো ভৈরব। তোমার তবে আর ভয় কি।'

গিরিশ ঘোষ স্তব করতে বসল।

"জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়।"

॥ ৩৮ ॥

মথুরায় গেল রামকৃষ্ণ। দাঁড়াল ধ্রুব ঘাটে। স্পষ্ট দেখল সেই জন্মাষ্টমীর দৃশ্য। শিশু-কৃষ্ণকে বুকে করে যমুনা পার হয়ে যাচ্ছে বাসুদেব।

দিন পনেরো ছিল মোট বৃন্দাবনে। ছিল বৈষ্ণববেশে। গায়ে আলখাল্লা, পরনে ডোর-কোপনি। কপালে-গলায় বুকে-বাহুতে তিলক আঁকা। কাঁধে কাঁথার ঝুলি। কণ্ঠে তুলসী কাঠের মালা।

বামনিকে বললে, 'কোথায় মরবে? কাশী না বৃন্দাবন?'

'কাশী।'

তবে ফিরে চলো কাশীতে। স্বস্থানে গিয়ে অধিষ্ঠিত হও।

কাশীতে এসে রামকৃষ্ণ বললে, 'বীণ শুনব।'

মদনপুরায় মহেশ সরকার ওস্তাদ বীণকার। দেশ-বিদেশে প্রচণ্ড নাম-ডাক। হৃদয় খবর নিয়ে এল। চল্ তবে যাই ওস্তাদের বাড়িতে। বীণ শুনে আসি।

মথুরবাবু বললেন, 'ওখানে যাবে কেন? তাঁকে এখানে ডেকে আনি, ফরমাস-

মতো শোনো তোমার যতো ইচ্ছে—'

রাখো তোমার মিথ্যে মর্যাদার চটকদারি। এত বড় যে বাজিয়ে সে তো প্রকাণ্ড সাধক, তার খেয়াল রাখো? স্বয়ং বিশ্বযন্ত্রী ঈশ্বর তার স্পর্শে এসে ঝংকৃত হচ্ছেন। সে তো বিভূতি-ভূষিত। চল রে হৃদু, শুনে আসি। যাই-ই শোনা তাই দেখা। "যাহা শুনি কর্ণপুটে সকলি মা'র মন্ত্র বটে।"

দুজনে এসে হাজির হল মদনপুরায়। সটান মহেশ সরকারের বাড়িতে। মহেশ সরকার বাইরের ঘরেই বসেছিল। রামকৃষ্ণ বললে, 'বীণ শোনাও।' এ যেন স্বয়ং বীণাবাদিনীর আদেশ। মহেশ সরকার বীণ তুলে নিল। ঝংকার তুললে। সুর-সাগরে অমৃতের ঢেউ খেলে গেল। মুহূর্তে ভাবাবেশে বিহ্বল হয়ে পড়ল রামকৃষ্ণ। বললে, 'মা গো, আমায় বেহুঁস করে রাখিস নে, আমায় হুঁস দে! আমি ভালো করে বীণা শুনি।'

রামকৃষ্ণ সমাধি-ভূমি থেকে নেমে এল। নেমে এল অনুভূতির ভূমিতে। বাহ্য-জ্ঞানের শেষ প্রান্তে। ঠায় তিন ঘণ্টা বীণ শুনলে একটানা।

শুধু কি বীণা শুনলাম? শুনলাম এই সমস্ত বিশ্বসৃষ্টটাই একটা অপূর্ব সুর-ঝংকার। গ্রহে-নক্ষত্রে, বৃক্ষে-তৃণে, নীহারিকা থেকে ধূলিকণায়, প্রত্যেকটি পলায়মান মুহূর্তকণায় বাজছে এই গীতছন্দ। ছুটেছে ভুবনপ্লাবনী সুর-শৈবলিনী। যা শোনা তাই আবার দেখা।

রামকৃষ্ণ দেখল সেই সুরশব্দ যেন একটা উজ্জ্বল চৈতন্যের মত প্রতিভাত। যেন সূর্য উঠেছে রাত্রির আকাশে। ইন্দ্রিয়ের জগতে চৈতন্যের আবির্ভাব। হৃদাকাশে চিদাদিত্য।

বীণার সঙ্গে-সঙ্গে রামকৃষ্ণ গলা মিলিয়ে গান ধরল।

মথুরবাবু বললেন, 'এবার গয়া যাব। তুমি যাবে?'

সর্বনাশ! গয়ায় গেলে এ দেহ কি আর থাকবে? জানো না আমার বাবার সেই স্বপ্নের কথা?

তাই গয়ায় আর নামলেন না মথুরবাবু। জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি সবাইকে নিয়ে ফিরে এলেন দক্ষিণেশ্বর।

আবার সেই অনন্ত আনন্দ-তীর্থ।

রামপ্রসাদ গেয়েছে, এ সংসার ধোঁকার টাটি। রামকৃষ্ণ গাইলে, 'এ সংসার মজার কুটি। ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি।'

বৃন্দাবনের রাধাকুণ্ড আর শ্যামকুণ্ড থেকে ধুলো নিয়ে এসেছে রামকৃষ্ণ। কিছুটা পঞ্চবটীর চার দিকে ছড়িয়ে দিল আর কতক পুঁতলে তার সাধন-কুটিরের মধ্যে।

এই সেই কুটির যেখানে বসে হয়েছিল তার নির্বিকল্পসমাধি। হয়েছিল ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার।

'ব্রহ্ম কেমন বল না?'

ঘি খেয়েছিস তো? বল তো কেমন ঘি? কেমন ঘি, না, যেমন ঘি! তেমনি ব্রহ্মের উপমা ব্রহ্ম। তাকে বোঝাব কি দিয়ে?

সেই পণ্ডিতের গল্প জানো না? এক রাজাকে রোজ ভাগবত শোনাত। আর পড়ার শেষে রোজই রাজাকে জিগ্‌গেস করত, রাজা, বুঝেছ? আর রাজাও রোজ বলত, আগে তুমি বোঝো। পণ্ডিত বাড়ি গিয়ে ভাবত, রাজা অমন ধারা রোজ বলে কেন? ভাবতে-ভাবতে জ্ঞান হয়ে গেল—শাস্ত্র-পাণ্ডিত্য সব মিথ্যে, আসল হচ্ছে হরি-পাদপদ্ম। বিবাগী হয়ে চলে গেল সংসার ছেড়ে। রোজ কত বক্তৃতা ঝাড়ত, আজ যাবার আগে বলে গেল দুটি কথা: 'এবার বুঝেছি।'

তাই বলি, কলকলানি ছাড়ো। যতক্ষণ ঘি কাঁচা থাকে ততক্ষণই কলকল করে। পাকা ঘিয়ে আর শব্দ নেই। খালি গাড়ুতে জল ভরতে গেলেই ভকভকানি ওঠে। কিন্তু ভরে গেলে আর শব্দ হয় না। বিচারবুদ্ধি কতক্ষণ? যতক্ষণ মা তাঁর আনন্দের খবর পাওয়া যায়। মধুপানের আনন্দ পেলে মৌমাছি আর ভনভন করে না।

'আমি কাঁদতাম আর বলতাম, মা, বিচারবুদ্ধিতে বজ্রাঘাত হোক।'

শশধর পণ্ডিত জ্ঞানমার্গের পন্থী। বললে, 'সে কি? আপনারো তবে ছিল বিচারবুদ্ধি?'

'তা, একটু-আধটু ছিল বৈ কি।'

উৎফুল্ল হয়ে উঠল শশধর। বললে, 'তবে বলে দিন আমাদেরো যাবে। আপনার কেমন করে গেল?'

ঠাকুর বললেন, 'অমনি এক রকম করে গেল।'

আমি দু হাত ছেড়ে দিয়েছি। আমি বগলে হাত দিয়ে টিপি না।

সেই এক বেয়ান এসেছিল আরেক বেয়ানের সঙ্গে দেখা করতে। ঘরের বেয়ান তখন নানা রঙের সুতো কাটছে, বাইরের বেয়ানকে দেখে ভারি খুশি। কত দিন পরে এলে, যাই তোমার জন্যে কিছু জলখাবার আনি গে। যেই জলখাবার আনতে গেছে সেই ফাঁকে বাইরের বেয়ান এক তাড়া রঙিন সুতো বগলের তলায় লুকিয়ে ফেললে। জলখাবার নিয়ে এসে ঘরের বেয়ান বুঝতে পারলে বাইরের বেয়ানের কাণ্ডখানা। তখন সে এক ফন্দি ঠাওরালে। বললে, কত দিন পরে এলে, এস আজ দুজনে একটু আনন্দ করি। কি আনন্দ? এস

দুই বেয়ানে নৃত্য করি। ভালো কথা। দুই বেয়ানে নাচতে লাগল। ঘরের বেয়ান দেখল বাইরের বেয়ান হাত না তুলেই নৃত্য করছে। হাত না তুলে নাচ কি একটা নাচ? ঘরের বেয়ান তখন বললে, এমন আনন্দের দিনে এস আজ হাত তুলে নাচি। ভালো কথা। কিন্তু বাইরের বেয়ান এক হাতে বগল টিপে আরেক হাত তুলে নাচতে লাগল। ও আবার কেমন নৃত্য? এস, দু হাত তুলে নাচি। এই দেখ—ঘরের বেয়ান দু হাত তুললে। বাইরের বেয়ান যে-কে-সে। তেমনি বগল টিপে এক হাত তুলেই সে নাচতে লাগল। বললে, যে যেমন জানে বেয়ান—

আমি কিছুই জানি না। আমি তাই দু হাত ছেড়ে দিয়েছি। আমার সরল শরণাগতি।

তীর্থ থেকে ফিরে এসে রামকৃষ্ণের শুধু সেই তীর্থভ্রমণের কথা। তা ছাড়া আবার কি। মাতাল মদ খাওয়ার পর কেবল আনন্দেরই কথা কয়।

কী পেলেন তীর্থ করে?

কী পেলাম? জ্ঞান পেলাম। যতক্ষণ বোধ যে ঈশ্বর সেথা ততক্ষণ অজ্ঞান। যখন হেথা হেথা, তখনই জ্ঞান। যা মন চায় তারই পিছে ধায়। কিন্তু ছুটতে হবে কেন? যা মন চায় তাই মনের মাঝখানে। যা হাত চায় ধরতে তাই হাতের কাছাকাছি।

তামাক খাবে, তাই গেছে প্রতিবেশীর বাড়ি টিকে ধরাতে। ঢের রাত হয়েছে, প্রতিবেশী ঘুমে অচেতন। অনেক ধাক্কাধুক্কি, অনেক হাঁক-ডাক। ঘুম ভেঙে গেল প্রতিবেশীর। দরজা খুলে অবাক হয়ে গেল—এ কি, এত রাতে কি মনে ক'রে। আর কি মনে ক'রে! তামাক খাব কিন্তু টিকে ধরাবার দেশলাই নেই। তারি জন্যে এত কষ্ট, এত হৈ-হল্লা! তোমার হাতে যে লণ্ঠন রয়েছে—সে আছে কি করতে?

হৃদাকাশে চিদাদিত্য। চলেছি আমরা তবে আর কোন দেশে কোন সূর্যের সন্ধানে?

কথাটা এই, বুড়ি ছুঁয়ে যা ইচ্ছে কর। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে তার পর লীলা আস্বাদন করে বেড়াও। সাধু শহরে এসে হেথা-হোথা ঘোরাঘুরি করে নানা রকম আমোদ করে বেড়াচ্ছে। পথে আরেক মুসাফির সাধুর সঙ্গে দেখা। মুসাফির বললে, এত যে চার দিকে রঙ দেখে বেড়াচ্ছ, তা তোমার পোঁটলাপুঁটলি কোথায় রাখলে? কেন—আগে বাসা ঠিক করলাম, তালা-চাবি কিনলাম, পরে পোঁটলাপুঁটলি ঘরের মধ্যে চাবি দিয়ে বন্ধ করলাম। বন্ধ করে রেখে তবে

আমোদ করতে বেরিয়েছ।

জানো, শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলুম। সেখানে খুব সংকীর্তন হল। বহু লোকের আসর বসল। মাকে বললুম, মা এ সব কি সত্য? সত্য যদি হয় তবে দেশের জমিদার কেন আসবে না? এসে গেল জমিদার। সেধে গায়ে পড়ে আদর করে কথা কইলে।

ওরে হৃদু, একটি সুন্দরী ধরে নিয়ে আয়।

হৃদয় তো অবাক।

ওরে নিয়ে আয়। আমি পুজো করব।

বুঝি মামীর কথা মনে পড়ল হৃদয়ের। সেই তার পদ্মদল দিয়ে পাদপদ্ম পুজো করার কথা। কিন্তু কোথায় মামী!

চৌদ্দ বছরের একটি সুন্দরী সধবা কন্যা যোগাড় করল হৃদয়। কোন বাড়ির বউ বা মেয়ে।

কিন্তু রামকৃষ্ণ দেখল সাক্ষাৎ ভগবতী। পূজা করলে। প্রণাম করলে। ওরে তোরা কেউ প্রণামীর টাকা এনে দে মাকে।

তাতেও তৃপ্তি নেই রামকৃষ্ণের। যখন যে কুমারী মেয়ে কাছে পায় তাকে ধরে এনে পুজো করে। হোক সে যত অকুলীন যত অপরিচ্ছন্ন।

শুদ্ধাত্মা কুমারীতেই ভগবতীর বেশি প্রকাশ।

রামলীলা দেখতে গেল রামকৃষ্ণ। যারা রাম-লক্ষ্মণ সেজেছিল, হনুমান-বিভীষণ সেজেছিল সবাইকে পুজো করতে বসল। মনে হল আসলে-নকলে ভেদ নেই। নারায়ণই এ সব মানুষের রূপ ধরে রয়েছেন।

বৈষ্ণবচরণও তাই বলত। বলত, নরলীলায় বিশ্বাস হলেই তবে পূর্ণ জ্ঞান হবে।

বকুলতলার ঘাটের কাছে এক দিন দেখল নীলাম্বরী পরে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের মেয়ে না পথের মেয়ে নজর করে দেখতেও চাইল না। মুহূর্তে দীপাধার উদ্দীপন এসে গেল। দেখল সীতা লঙ্কা থেকে উদ্ধার পেয়ে রামের কাছে যাচ্ছে।

'এমন ভাবও দেখিনি, এমন রোগও দেখিনি।' বলে হৃদয়রাম।

'ভাবলে কি হয়, কেবল জমি-জমি করে। এত যার সেবা-পূজা করছে তার সঙ্গ-স্পর্শেও যেন কিছু সুফল হচ্ছে না। রামকৃষ্ণ তার হাতের জিনিস, রামকৃষ্ণের পায়ে কাউকে হাত ঠেকাতে দিতে পর্যন্ত সে নারাজ, তবু হাতে পেয়েও আঙুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে রামকৃষ্ণ। হৃদয় টাকা খুঁজছে, জমি খুঁজছে, গরু

খুঁজছে।

এক দিন ধরল গিয়ে শম্ভু মল্লিককে। বললে, 'আমায় কিছু টাকা দাও।'

শম্ভু মল্লিকের ইংরিজি মত। বললে, 'তোমায় কেন টাকা দিতে যাব? তোমার তো দিব্যি শরীর আছে, তুমি তো খেটে খেতে পারো।'

'দিব্যি শরীর?'

'যা হোক কিছু রোজগার তো করছ। তোমায় দেব কেন? যারা খুব গরিব, কিংবা কানা-খোঁড়া তাদের দিলে কাজ হয়।'

'থাক মশাই, ঢের হয়েছে।' হৃদয় ঝলসে উঠল: 'আমার টাকায় কাজ নেই। ঈশ্বর করুন আমায় যেন কানা-খোঁড়া হতদরিদ্দির না হতে হয়। আপনারো দিয়ে কাজ নেই, আমারো নিয়ে কাজ নেই। খুরে দণ্ডবৎ মশাই।'

রামকৃষ্ণকে গিয়ে ধরল। কি এমন ভাবের ঢেউ দিয়েছ! তোমার মা'র কাছে গিয়ে কিছু সিদ্ধাই চাইতে পার না? যাতে করে কিছু খাঁটি দ্রব্য লাভ হয় তার দিকে দৃষ্টি দিতে পার না? তোমার এ ভাব দিয়ে কি অভাব মিটবে?

আবার? ধমকে উঠল রামকৃষ্ণ। তোর পাল্লায় পড়ে সিদ্ধাই চাইতে গিয়ে আমি যা দেখেছিলাম তা আমি ভুলিনি। জানিস তো, 'মাগনেসে ছোটা হো যাতা।' এমনি যিনি ভগবান তিনি যখন ভিক্ষে করতে বেরিয়েছিলেন, তাঁকে বামন রূপ ধরতে হয়েছিল। কেন মিছিমিছি চাইতে গিয়ে ছোট হবি?

রাখো ওসব তত্ত্ব কথা। তত্ত্ব কথায় পেট ভরে না। হৃদয় একটা এঁড়ে বাছুর কিনলে। ঘাস খাওয়াবার জন্যে নিত্যি সেটাকে বাগানে বেঁধে রাখে। কত যত্ন-আত্তি করে। সোহাগ করে গলায়-পিঠে হাত বুলোয়।

'রোজ ওটাকে ওখানে বেঁধে রাখিস কেন রে?' জিগ্‌গেস করল রামকৃষ্ণ।

'ওটাকে দেশে পাঠিয়ে দেব।'

'কেন, সেখানে কী?'

'বড় হলে সেখানে ও লাঙল টানবে।'

কোথায় কামারপুকুর, শিওড়, আর কোথায় কলকাতা। বাছুরটা সেখানে যাবে ঐ পথ ভেঙে! সেখানে গিয়ে বড় হবে! বড় হয়ে লাঙল টানবে।

মূর্ছিত হয়ে পড়ল রামকৃষ্ণ।

এরই নাম মায়া, এরই নাম সংসার।

চালের আড়তে বড়-বড় ঠেকের মধ্যে চাল থাকে। যাতে ইঁদুর ঐ চালের সন্ধান না পায়, আড়তদার একটা কুলোতে করে খই-মুড়কি রেখে দেয়। ঐ খই-মুড়কি খেতে মিষ্টি, ইঁদুরগুলো তাই সমস্ত রাত কড়র-মড়র করে খায়। চালের সন্ধান

আর পায় না।

ওরে, মায়াকে চিনতে চেষ্টা কর। মায়াকে যদি চিনতে পারিস, মায়া আপনি লজ্জায় পালাবে। হরিদাস বাঘের ছাল পরে একটা ছেলেকে ভয় দেখাচ্ছিল। ছেলেটা বললে, আমি চিনেছি, তুই আমাদের হরে। হরিদাস হাসতে-হাসতে চলে গেল।

হরিদাসকে চিনবে না হৃদয়। তার বাঘের ছালেই সে মাতোয়ারা।

॥ ৩৯ ॥

আমার তো মামাই আছে। আমার আবার ভাবনা কী! আমার আবার কিসের সাধন-ভজন!

হৃদয় ডঙ্কা মেরে বেড়ায় আর বিষয়-আশয়ের ফিকির খোঁজে। কোথায় একখানা জমি, কোথায় একটা গরু, কোথায় কটা টাকা! পরিবারের জন্যে একখানা গয়না, নিজের জন্যে একখানা শাল।

সাধক-ভক্তদের কাছ থেকে শোনে যখন রামকৃষ্ণের অলৌকিকত্বের কথা, তখন বলে, ভালোই তো, আমার মেহনৎ কমল। ঐ যে কথায় বলে না, মামার হলেই ভাগ্নের হল। আমারো হয়েছে তাই। ওর হওয়াতেই আমার ষোলো আনা হয়ে আছে। মহাদেব যখন পার হবেন তখন নন্দী-ভৃঙ্গীকেও নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে।

তার পরে পরিচর্যা কম করছি? আমি না হলে ওর সাধুগিরি বেরিয়ে যেত! আমি আছি বলেই ওর এত জেল্লা-জমক। আমাকে কি আর ও ফেলতে পারে?

আমি তাই খাই-দাই আর তুড়ি মারি। আর যদি পারি তো এই ফাঁকে কিছু গুছিয়ে নিই চাল-কলা।

এমনি সময় তার স্ত্রী মরল।

মুহূর্তে মন কেমন উলটো-মুখো হয়ে গেল। সংসার যেন উড়ে গেল তাশের ঘরের মত। টাকার তোড়া মনে হল ধুলোর ঝোড়ার মত।

সেও খুলে ফেলল পরনের কাপড়, ছুঁড়ে ফেলল গলার পৈতে। উগ্র ভঙ্গি করে বসল ধ্যানাসনে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। শেষে এক দিন ধরল গিয়ে রামকৃষ্ণকে। বললে, 'তোমার যেমন ভাব-টাব হত, তেমনি আমার করে দাও। আমাকে ডুবিয়ে দেও অতলে। দেখাও তোমার মহামায়াকে—'

রামকৃষ্ণ বললে, 'তোর ও সবে দরকার নেই।'

'আলবৎ আছে।' গর্জে উঠল হৃদয়। বললে, 'তুমিই ফল পাবে আর কেউ পাবে না? মা কি তোমার একলার?'

'ওরে, শুধু আমাকে সেবা করলেই তোর ফল হবে।'

'ঢের সেবা করেছি এত দিন। কিছু হয়নি। আমার এখন ভাব চাই। আমাকে ভাব দাও।'

'কী বলিস পাগলের মত!' রামকৃষ্ণ তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল। 'আমরা যদি দুজনেই ভাবে বিভোর হয়ে থাকি, তখন কে কাকে দেখবে?'

'তা আমি জানি না।' হৃদয় ছাড়বার পাত্র নয়। তাকে তখন বৈরাগ্য পেয়ে বসেছে। বললে, 'আমাকে তুমি বলে দিয়ে যাও, কি করে কি হবে—'

'আমার ইচ্ছায় কিছুই হবার নয়। সব মা'র ইচ্ছে। মাকে গিয়ে ধর, মা'র যদি ইচ্ছে হয়, তোরও হবে। যদি ইচ্ছে করেন নিঃস্বকেও তিনি বিশ্বজয়ী করতে পারেন।'

বেশ, তবে মাকেই ধরব। এই ধরলাম। এই বসলাম দৃঢ়াসনে।

আস্তে-আস্তে দর্শন হতে লাগল হৃদয়ের। পূজায় বা ধ্যানে বসে শুরু হল অর্ধ-বাহ্যদশা। কখনো বা নিবিড় ভাবাবেশ।

মথুরবাবু প্রমাদ গণলেন। জিগ্‌গেস করলেন রামকৃষ্ণকে, 'হৃদয়ের আবার এ সব কী হচ্ছে? ঢং না কি?'

'না। খুব ব্যাকুল হয়ে মাকে ধরেছিল, মা-ই এই ভাব এনে দিয়েছেন।'

'সর্বনাশ! তা হ'লে কী হবে হৃদয়ের?'

'কিছু ভয় নেই। মা-ই সব দেখিয়ে-বুঝিয়ে দু দিনে তাকে ঠাণ্ডা করে দেবেন।'

মথুরবাবু বুঝলেন, এ সবই রামকৃষ্ণের খেলা। বললেন, 'বাবা, তুমিই ওকে ভাব দিয়েছ, তুমিই আবার ওকে ঠাণ্ডা করে দাও। আমরা তোমার দুই ভৃত্য, নন্দী আর ভৃঙ্গী, আমরা তোমার কাছে-কাছে থাকব, তোমার সেবা-চর্চা করব। আমাদের আবার এ ছাড়া ভাব কি, এ ছাড়া কাজ কি। আমাদের আবার কিসের অদ্বৈত অবস্থা!'

পঞ্চবটীর দিকে চলেছে রামকৃষ্ণ। হয় তো দরকার হতে পারে, হৃদয় গাড়ু-গামছা নিয়ে চলল পিছু-পিছু। যেতে-যেতে অপূর্ব দর্শন হল তার। অলোক-অবলোকিত দর্শন। দেখল রামকৃষ্ণ দেহধারী মানুষ নয়, একটি চলমান জ্যোতি-বর্তিকা। দিব্যকলেবরে অরুণরক্তিমরুচি। সেই আলোতে পঞ্চবটী প্লাবিত, উদ্ভাসিত হয়ে গেছে। রামকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় দুখানি পা যেন মাটি স্পর্শ করছে না, শূন্যের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছে। যেন শূন্য সরোবরে রক্ত পদ্ম

চলেছে ফুটতে-ফুটতে।

হৃদয় চোখ মুছল। সব ঠিক আছে। শুধু রামকৃষ্ণই আর দেহে নেই, শিখাময় হয়ে গিয়েছে।

তাকালো সে নিজের দিকে। এ কি! তারও দেখি দিব্যসত্তা, সেও দেখি নিরঙ্গ-উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে যেন ঐ সম্মুখবর্তী দিব্য-অঙ্গেরই অংশস্বরূপ। দেবতার পশ্চাতে দেবানুচর। দেবতার সেবা-সঙ্গ করবার জন্যে দেববেশে তার এই পৃথকস্থিতি।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল হৃদয়, 'ও রামকৃষ্ণ! শুনছ? আমরা মানুষ নই, আমরা দেবতা।'

একবার চেঁচিয়ে ক্ষান্তি নেই হৃদয়ের। দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে আবার সে চেঁচিয়ে উঠল অবোধের মত: 'ও রামকৃষ্ণ! দাঁড়াও! দেখছ আমরা কে! আমরা তবে কেন এখানে পড়ে আছি?'

'ওরে থাম, থাম—চেঁচাস নে—' রামকৃষ্ণ মিনতি করল।

'কেন থামতে যাব? তুমিও যা আমিও তাই। আমরা দু জনেই অবতার।'

'ওরে থাম, লোকজন সব এখুনি ছুটে আসবে।'

'আসুক না লোকজন।' হৃদয় তবু থামবে না কিছুতেই। সমানে চেঁচাতে লাগল। 'এ দেশে থেকে আর আমাদের লাভ কি? চলো অন্য দেশে যাই। দেশে দেশে গিয়ে জীবোদ্ধার করি।'

কিছুতেই স্তব্ধ হবে না হৃদয়।

রামকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি ছুটে এল হৃদয়ের কাছে। তার বুকে হাত ঠেকিয়ে দিলে। বললে, 'দে মা, শালাকে জড় করে দে।'

দিব্যদর্শন ছুটে গেল মুহূর্তে। আনন্দের সাগর এক শ্বাসে শুকিয়ে গেল। সেই শরীরী শিখা নিবে গিয়ে মূর্ত হল রক্ত-মাংসের দেহ।

'মামা, এ কী করলে?' কেঁদে ফেলল হৃদয়। 'আমাকে জড় বানিয়ে দিলে?'

'তোকে শুধু একটু স্তব্ধ করে দিলাম।'

'আমি আর দেখতে পাব না সেই দৃশ্য?' নিঃস্বের মত তাকিয়ে রইল হৃদয়।

'তুই যে বড্ড গোল করিস। একটু কি দর্শন পেয়েই একেবারে দিশেহারা হয়ে গেলি। দেশসুদ্ধ লোক ডেকে হাট বাধাবার যোগাড়।'

দরকার নেই রামকৃষ্ণে। আমি একাই পারব। রামকৃষ্ণ যদি পেরে থাকে, আমিই বা কম কিসে। ধ্যান-জপের মাত্রা বাড়িয়ে দিল হৃদয়। গভীর রাত্রে উঠে-উঠে যেতে লাগল পঞ্চবটী।

ঠিক করল রামকৃষ্ণ যেখানে বসে জপধ্যান করত সেখানেই আসন করতে হবে। হয় তো সেই জায়গাটিই পয়মন্ত। হয় তো মাটির কোনো গুণ আছে। দেখি না কি ফল হয়!

যেই সেই জায়গাটিতে বসেছে আসন করে, অমনি চীৎকার করে উঠল: 'মামা গো, পুড়ে মলাম, পুড়ে মলাম। শিগগির বাঁচাও।'

সে আর্তনাদ শুনতে পেল রামকৃষ্ণ। ত্রস্ত পায়ে ছুটে এল ঘর ছেড়ে। মুখে এক করুণ জিজ্ঞাসা: 'কি রে, কি হয়েছে?'

'এইখানে ধ্যান করতে বসা মাত্র কে যেন এক মালসা আগুন গায়ে ঢেলে দিলে।' যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল হৃদয়। 'সারা গা জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে।'

'তুই কেন এ সব করিস বল তো? তোকে বলেছি না আমার সেবা করলেই তোর সব হবে। কেন তবে এ সব ঝামেলা করছিস? নে, ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি তোকে—' রামকৃষ্ণ তার গায়ে স্নেহকরুণ হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

সেই স্পর্শে শান্তি হয়ে গেল হৃদয়ের। গঙ্গাস্নানের মত এল যেন শীতল নির্মলতা। বুঝলে সেবা ছাড়া আর তার পথ নেই। শুশ্রূষা ছাড়া নেই তার আর কোনো জিজ্ঞাসা।

বেশ আছি। যেখানে আছি, সেইখানেই আমার রামের অযোধ্যা। 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলে হাততালি দিয়ে সকাল-সন্ধ্যায় আমার শুধু হরিমাম। তা হলেই সব পাপ-তাপ চলে যাবে। পাপ-হরণ করেন বলেই তো তিনি হরি। দেহবৃক্ষে পাপ হচ্ছে পাখি আর নামকীর্তন হচ্ছে হাততালি। যেমন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে হাততালি দিলে পাখি উড়ে যায়, তেমনি হাততালি দিয়ে হরিনাম করলে দেহ থেকে পালিয়ে যায় অবিদ্যা।

যা আমার হবার নয় তার পিছনে ছুটি কেন? আমার শুধু ডাকের আশায় দাঁড়িয়ে থাকা। "হুজুরেতে আরজি দিয়ে মা দাঁড়িয়ে আছি করপুটে।"

এই সব ভাবে বটে কিন্তু মনের আনাচে কোথায় একটু অহং থেকে যায়। কার্নিশের ফাঁকে কোথায় লুকিয়ে থাকে অশ্বত্থের বীজ, তা থেকে ফোঁকড়ি বেরোয়।

হৃদয় বলল, 'বাড়িতে এবার দুর্গোৎসব করব। মা আমার পুজো নেন কি না দেখতে হবে।' মথুরবাবুকে বললে, 'কিছু টাকা দিন।'

'তা দিচ্ছি।' মথুরবাবু রাজি হলেন একবাক্যে। বললেন, 'কিন্তু বাবাকে নিয়ে যেতে পাবে না।'

'সে কি কথা! আমার বাড়িতে প্রথম পুজো, মামা থাকবে না?'

"নাই বা থাকলাম। তুই তার জন্যে ক্ষুণ্ণ হোস নে হৃদু।' সান্ত্বনা দিল রামকৃষ্ণ। বললে, 'আমি রোজ সূক্ষ্ম দেহে তোর পুজো দেখতে যাব। আর তোকে বলছি, আর-কেউ দেখতে পাবে না আমাকে, কিন্তু তুই পাবি।'

আরো শোন, বলে দিই, কাকে দিয়ে প্রতিমা গড়াবি, কে হবে তন্ত্রধারক। নিজের ভাবে নিজেই পুজো করবি। আর শোন, একেবারে উপোস করে থাকিস না, দুধ গঙ্গাজল আর মিছরির সরবৎ খাবি। বুঝলি?'

হলও তাই। রোজ পুজো-সাঙ্গের পর রাতে আরতি করবার সময় হৃদয় দেখতে পেত রামকৃষ্ণ এসে দাঁড়িয়েছে প্রতিমার পাশে।

আশ্চর্য, প্রতিমা প্রতিমাই থাকে। কিন্তু করুণাঘন রামকৃষ্ণ দাঁড়ায় এসে ভক্তের আঙিনায়।

চল তবে সেই করুণা-নিলয়ের কাছে। সেখানে গিয়ে তারই সেবারাধনায় মন দিই। হৃদয়ও তাই ফিরে গেল দক্ষিণেশ্বরে। শুধু মাঝখান থেকে আরেকবার বিয়ে করে নিলে।

॥ ৪০ ॥

সতেরো বছরের সুরূপ ছেলে এই অক্ষয়। মা-বাপ-মরা ছেলে। বসেছে বিষ্ণু-মন্দিরের পূজারি হয়ে। ধ্যানে নিস্পন্দ হয়ে বসে থাকে দু-তিন ঘণ্টা। নিজের হাতে রান্না করে খায়। সারাদিন গীতা পড়ে।

শুধু ভাই-পো বলে নয়, ভক্তির জোর দেখে তাকে বড় ভালোবাসে রামকৃষ্ণ।

সেই অক্ষয়ের বিয়ে হল। বিয়ের পরেই অসুখে পড়ল। ডাক্তার বললে, সামান্য জ্বর, সেরে যাবে।

কিন্তু হৃদয়কে ডেকে নিয়ে বললে রামকৃষ্ণ, 'হৃদু, লক্ষণ বড় খারাপ। ছোঁড়া বাঁচবে না।'

"ছি মামা! তোমার মুখ দিয়ে এ কথা বেরুলো কেন?'

"তার আমি কি জানি! মা যেমন বলান তেমনি বলি। নইলে, বল্, আমার কি ইচ্ছা অক্ষয় চলে যায়?'

হৃদয় উঠে-পড়ে লাগল কি করে ভালো করা যায় অক্ষয়কে। বড় ডাক্তার আছে কাউকে বাদ দিলে না। কিন্তু যার ডাক পড়েছে ডাক্তার তার কী করবে।

মাস খানেক ভুগে এমন জায়গায় এসে ঠেকল যখন সলতে আর উস্কে দেওয়া যায় না। এল সেই অন্তিম মুহূর্ত। রামকৃষ্ণ পাশে বসে অক্ষয়কে সম্বোধন করে বললে গাঢ়স্বরে, 'অক্ষয়, বলো, গঙ্গা, নারায়ণ, ওঁ রাম।' ঐ মন্ত্র তিন-

তিন বার আবৃত্তি করল অক্ষয়। তার পর ধীরে-ধীরে লীন হয়ে গেল।

মাটিতে আছাড় খেয়ে কাঁদতে লাগল হৃদয়। রামকৃষ্ণ চলে গিয়েছে ভাবভূমিতে। হৃদয় যত কাঁদে, তত হাসে রামকৃষ্ণ। নাচে, গান গায়। অমৃততীর্থে এসে উত্তীর্ণ হয়েছে অক্ষয়। ক্ষয়হীন আনন্দধামে। এ দেখে যদি আনন্দ না হয় তবে কী দেখে হবে!

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বেশ স্পষ্ট দেখল চোখের উপর। দেখল কি করে মানুষ মরে, কি করে আত্মা বেরিয়ে আসে দেহ থেকে, কোথায় যায় সে আত্মা। দেখল খাপের ভিতর থেকে ঝকঝকে তরোয়াল এল বেরিয়ে। তরোয়ালের কিছু হল না, শুধু খাপটা পড়ে রইল। সেই উজ্জ্বল নির্ভীক তরোয়াল এই মায়া-মিথ্যার তমসা ভেদ করে চলে গেল লোকাতীত আলোকতীর্থে।

কিন্তু সেই ভাবলোক ছেড়ে নেমে আসতে হল ফের স্থূল মাটিতে। পর দিন কালীবাড়ির উঠোনের সামনের বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে আছে রামকৃষ্ণ, দেখল, অক্ষয়ের নর-দেহ পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে ফিরে আসছে শ্মশানযাত্রীরা। যেমনি দেখা অমনি বুকফাটা কান্না পেল রামকৃষ্ণের। গামছা যেমন নিঙড়োয়, মনে হল বুকের ভিতরটা তেমনি কে নিঙড়োচ্ছে। সমস্ত দুঃখ অবুঝ অশ্রুর উচ্ছ্বাসে উথলে উঠল। সে জলতরঙ্গ কে রোধ করে!

'মা, এখানে পরনের কাপড়ের সঙ্গেই সম্বন্ধ নেই, তা ভাইপোর সঙ্গে তো কতই ছিল। এখানেই যখন এ রকম হচ্ছে তখন গৃহীদের শোকে কী না নয়! তাই দেখাচ্ছিস বটে।'

কখনো আমি-আমার বলে না রামকৃষ্ণ। সব 'এখানে', 'এখানকার'।

'আমি গেলে ঘুচিবে জঞ্জাল।'

'কৃষ্ণকিশোরের ভবনাথের মত দুই ছেলে। দুটো-আড়াইটে পাশ। মারা গেল অতো বড়ো জ্ঞানী। প্রথম-প্রথম সামলাতে পারলে না! আমায় ভাগ্যিস ঈশ্বর দেননি!' ঠাকুর বললেন আত্মগতের মত।

কে এক জন ভক্ত বললে, 'ঈশ্বরে খুব ভক্তি হয় তো বেশ হয়। শোক-টোক থাকে না।'

'উঁহু। শোক ঠেলে দেয় ভক্তিকে।'

বিধবা ব্রাহ্মণী—তার একমাত্র মেয়ে, নাম চণ্ডী। খুব বড় ঘরে বিয়ে দিয়েছে মেয়ের। জামাই প্রকাণ্ড জমিদার, খেতাব পেয়েছে রাজা বলে। থাকে কলকাতায়, জাঁক-জমকের সংসার। মেয়েটি যখন বাপের বাড়ি আসে, সামনে-পিছে সেপাই-শান্ত্রী নিয়ে আসে। মায়ের বুক দশ হাত হয়। কিন্তু পলতের বাতি নিবে গেল

এক ফুঁয়ে। কি একটা সামান্য অসুখে অল্প কদিন ভুগে মেয়েটি চোখ বুজল। বিধবা থাকে সেই বাগবাজার। কি করে এই অসাধ্য শোক শান্ত করবে তারই জন্যে বাগবাজার থেকে থেকে-থেকে ছুটে আসে পাগলের মত। যদি ঠাকুর কিছু উপায় বলে দেন! যদি সেই শীতল শান্তমূর্তি দেখে বুক জুড়োয়।

ব্রাহ্মণীর দিকে তাকালেন একবার ঠাকুর। বললেন, 'সেদিন একজন মজার লোক এসেছিল। খানিকক্ষণ বসে থেকে বললে, যাই এখন একবার ছেলের চাঁদমুখটি দেখি গে। আমি আর থাকতে পারলাম না। বললাম, তবে রে শালা! ওঠ এখান থেকে। ঈশ্বরের চাঁদমুখের চেয়ে ছেলের চাঁদমুখ?'

বাগবাজারে নন্দ বোসের বাড়ি বেড়াতে এসেছেন ঠাকুর। কথা আছে নন্দ বোসের বাড়ি থেকে যাবেন ব্রাহ্মণীর বাড়ি।

সেই ঠাকুর আর আসেন না। ব্রাহ্মণী কেবল ঘর-বার করছে। বোধ হয় আর এলেন না। অভাগিনীর অঙ্গনে কি ভগবানের পদার্পণের স্থান আছে?

শেষকালে উচাটন হয়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। গেল সটান নন্দ বোসের বাড়ির দিকে। খবর নিতে, চলে গেলেন না কি দক্ষিণেশ্বরে? না কি নন্দ বোসের আনন্দ-ভবন পেয়ে ভুলে গেলেন দুঃখিনীর শোকম্লান ঘরের কোণটি?

ব্রাহ্মণীও গেছে, আর অমনি ঠাকুর এসে পড়লেন ভক্তদের নিয়ে।

বাড়িতে ব্রাহ্মণীর ছোট বোন, সেও বিধবা। বললে, 'দিদি এই গেলেন নন্দ বোসের বাড়ি খবর নিতে। এই এলেন বলে।'

ছাদের উপর সবাইকে নিয়ে বসেছেন ঠাকুর। ছেলে বুড়ো পুরুষ মেয়ে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রাণে-প্রাণে বয়ে চলেছে ভক্তির স্রোতস্বতী। এত লোক, তবু মনে হচ্ছে, এক জন কে নেই।

'ঐ দিদি আসছেন।' ছোট বোন উছলে উঠল।

ছাদে উঠে ঠাকুরকে দেখে ব্রাহ্মণী কি বলবে কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারছে না। অস্থিরের মত এদিক-ওদিক করছে। বলছে, 'আমি নিশিদিশি কাঁদি, কিন্তু, ওগো, আমি যে এখন আহ্লাদে আর বাঁচি না। তোমরা সব বল গো আমি কেমন করে বাঁচি। ওগো, আমার চণ্ডী যখন এসেছিল—সঙ্গের সেপাই-শান্ত্রী পাহারা দিচ্ছিল বাড়ির দরজায়, তখনো যে আমার এত আহ্লাদ হয়নি গো। আমার এ কি হোল, চণ্ডীর শোক আর আমার এখন একটুও নেই গো! মনে করেছিলাম তিনি যেকালে এলেন না, যা আয়োজন করেছি সব গঙ্গার জলে ফেলে দেব। আর ওঁর সঙ্গে আলাপ করব না, যেখানে আসবেন একবার অন্তর থেকে দেখে আসব। তাই, সকলকে বলি, আয় রে আমার সুখ দেখে যা,

'আমার ভাগ্যি দেখে যা। দেখে যা আমার ঘরে আজ কে এসেছে! ওগো, আমি মরে যাব, আমার এত সুখ সইবে না, তোমরা সবাই মিলে আশীর্বাদ করো আমাকে, নইলে মরে যাব সত্যি-সত্যি—'

অক্ষয়ের মৃত্যুর পর থেকে রামকৃষ্ণ কেমন বিষণ্ণ। মথুরবাবু বললেন, চলো একবার আমার জমিদারিটা ঘুরে আসবে।

তাই চলো। ওরে হৃদু, জমিদারি দেখবি চল।

চুণীর খালে নৌকোয় করে বেড়াচ্ছে তিন জন। রানাঘাটের কাছাকাছি কলাই-ঘাটায় এসে রামকৃষ্ণের চোখ পড়ল দারিদ্র্যদলিত জনগণের উপর। রামকৃষ্ণ বললে, 'এই তোমার জমিদারির চেহারা? এই হাল তোমার মহলের?'

কেন, কী হল?

দেখ দেখি ঐ লোকগুলোর দিকে। পরনে ট্যানা, পেটে-পিঠে এক হয়ে রয়েছে। শোনো, সবাইকে একখানা করে কাপড় দাও, আর খাইয়ে দাও এক বেলা।

যেমন চিরদিনের অভ্যেস, তা-না-না-না করতে লাগলেন মথুরবাবু।

তবে তোমার জমিদারি জাহান্নমে যাক। চল রে হৃদু, আর জমিদারি দেখে না। ফিরে চল দক্ষিণেশ্বর।

মথুরবাবুকে আবার তাঁর থলের মুখ ফাঁদালো করতে হল। গ্রামের লোকদের অন্নবস্ত্র বিতরণ করলেন।

সাতক্ষীরার কাছে সোনাবেড়ে গ্রামে মথুরবাবুর পৈত্রিক ভিটে। তারই কাছাকাছি তালামাগরো গ্রাম। সে-গ্রামে তাঁর গুরুঘর। গুরুবংশে সরিকি অংশ নিয়ে ঝগড়া বেধেছে। আপোসনিষ্পত্তি করবার জন্যে তলব পড়েছে মথুরবাবুর।

এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা। রামকৃষ্ণ আর হৃদয় চলেছে পাল্কিতে। আর মথুরবাবু হাতির হাওদায়।

সহসা শিশুর মত হয়ে গেল রামকৃষ্ণ। বললে, 'আমি হাতি চড়ব।'

মথুরবাবু বাহন বদলালেন। রামকৃষ্ণ আর হৃদয়কে হাতিতে চাপিয়ে নিজে এলেন পাল্কিতে। হাতিতে চড়ে রামকৃষ্ণের আনন্দ তখন দেখে কে!

সর্বভূতে নারায়ণের গল্প জানিস তো? গুরু শিখিয়ে দিয়েছে শিষ্যকে, শিষ্যকে আর পায় কে। পথ দিয়ে হাতি চলেছে, উপর থেকে মাহুত বললে, সরে যাও। শিষ্যের তখন সর্বভূতে নারায়ণ—সে ভাবলে, সরব কেন? আমিও নারায়ণ, হাতিও নারায়ণ, আমাদের মধ্যে বিরোধ নেই। সরাসরি হাতির সামনে এসে দাঁড়াল, সরল না এক চুল। হাতি তাকে শুঁড়ে করে ধরে দূরে ছুঁড়ে ফেললে। ঘা-ব্যথা সারবার পর গুরুর কাছে এসে নালিশ করলে। গুরু বললে—ভালো

কথা, তুমিও নারায়ণ হাতিও নারায়ণ, আর মাহুতটি নারায়ণ নয়? মাহুত নারায়ণের কথা শুনবে না?

দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এল দলবল। কলুটোলায় কালী দত্তর বাড়ি বৈষ্ণবদের প্রকাণ্ড হরিসভা বসে। সেখানে এক দিন নেমন্তন্ন হল রামকৃষ্ণের। আর, যেখানেই রামকৃষ্ণ, সেখানেই তরুচ্ছায়ার মত হৃদয়রাম।

ভাগবত পাঠ হচ্ছে। তন্ময় হয়ে শুনছে সবাই ভাগবত। রামকৃষ্ণও বসে পড়ল একধারে।

সামনে মহাপ্রভুর আসন। তার মানে বেদীতে যে আসন বিছানো তা হচ্ছে শ্রীচৈতন্যের আসন। বৈষ্ণবদের পূজা-পাঠের সময় থাকে এমনি আসন বিছানো। কল্পনা করা হয় সেখানে গৌরাঙ্গ দেব এসে বসেছেন, শুনছেন হরিকথা। ভক্তের মধ্যেই ভগবানের অধিষ্ঠান এই ভাবটিরই প্রতীক ঐ আসনখানি।

রামকৃষ্ণকে পেয়ে ভক্তির স্রোত আরো উত্তরঙ্গ হয়ে উঠল। হরিকথায় এল আরো অতলতরো অনুরক্তি।

কোথা থেকে কি হয়ে গেল কেউ টের পেল না, রামকৃষ্ণ হঠাৎ সেই চৈতন্যাসনের উপর গিয়ে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়েই সমাধিস্থ। একখানি হাত ঊর্ধ্বে তোলা আর তার আঙুলে সেই বাক্যাতীত ভাবলোকের নির্দেশ। সর্বাঙ্গ নির্বায়ু-নিশ্চল দীপশিখার মত স্থির, মুখে প্রেমপূর্ণ প্রসাদ-শান্তি। চৈতন্যদেবের সমস্ত চিহ্ন অঙ্গে-ভঙ্গে দেদীপ্যমান।

শ্রোতা-বক্তা সকলেই স্তম্ভিত হয়ে রইল। ভালো-মন্দ কোনো কথাই কারু মুখ দিয়ে বেরুল না। ভয়ে-বিস্ময়ে কাঠ হয়ে রইল সবাই। এ কি অঘটন! জনতার উগ্র দৃষ্টি শান্ত হয়ে এল ক্রমে-ক্রমে। বিমূঢ় দৃষ্টিতে এল কোমল মুগ্ধতা।

যেই নাম শুনে সমাধি সেই নাম শুনেই আবার বহির্জ্ঞান। সুতরাং কীর্তন লাগাও। কীর্তন শুনিয়ে প্রভুর ধ্যান ভাঙাও।

বৈষ্ণবের দল কীর্তন শুরু করল। নাম-ঝংকারে জ্ঞান এল রামকৃষ্ণের। দু হাত তুলে শুরু করল নাচতে। মাধুর্যে উচ্ছল আবার উদ্দামতায় উত্তাল সেই যে নৃত্য সে-নৃত্য নটশ্রেষ্ঠ মহাদেবের। সবাই নামসৌরভে বিভোর হয়ে উঠল, নয়নরঞ্জনকে দেখে হয়ে রইল নিষ্পলক।

চৈতন্যদেবের আসন অধিকার করা রামকৃষ্ণের পক্ষে ন্যায় হয়েছে কি অন্যায় হয়েছে এ প্রশ্নের বাষ্পটুকুও কারু মনে রইল না।

কিন্তু ভাবের গিরিচূড়ায় কতক্ষণ থাকবে। নেমে আসতে হল দৈনন্দিন জীবনের সমতলতায়। তখন তর্ক উঠল এই আসন-অধিকারের ঔচিত্য নিয়ে। এক দল

বললে, ঘোরতর অন্যায় হয়েছে। শুধু অন্যায় নয়, আস্পধা। আরেক দল বললে, প্রাণ যেমন চায় ঠিক তেমনটি হয়েছে। শুধু ন্যায্য নয়, বাঞ্ছনীয়। মীমাংসা হল না। সমস্ত বৈষ্ণব সমাজে বিষম আলোড়ন উঠল। এ যে ধর্মের কলঙ্কীকরণ। এর প্রতিকার কি ?

সবাই গেল তখন কালনায়, ভগবানদাস বাবাজীর কাছে। ঘটনা শুনে ভগবানদাস তো রেগে কাঁই।

'ভণ্ড, ধূর্ত কোথাকার।' রামকৃষ্ণের উদ্দেশে তপ্ত-অঙ্গার গালাগাল ছুঁড়তে লাগল বাবাজী। পারে তো নখে-দাঁতে ছিঁড়ে ফেলে। বললে, 'আর কোনো দিন ঢুকতে দিও না ওকে হরিসভায়।'

এ কি অঘটন !

আর যে অঘটনের ঘটয়িতা রামকৃষ্ণ, সে সাতেও নেই পাঁচেও নেই। সে কিছু জানতেও পেল না।

সে এখন বসে আছে তৃণাসনে। সমস্ত তৃণাসনই তার চৈতন্যাসন।

॥ ৪১ ॥

'আশ্রমে কে এল বল দেখি।' ভগবানদাস বাবাজী তাকাতে লাগলেন চার দিকে। কে আবার আসবে !

'না, একজন কে মহাপুরুষ এসেছেন আশ্রমে। নিশ্বাসে তাঁর সুগন্ধ টের পাচ্ছি। তোরা সব একটু ত্যাখ দেখি এগিয়ে।'

কত লোকই তো আসছে-যাচ্ছে আশ্রমে। কালনার সিদ্ধবাবাজীর নাম ভারত-প্রসিদ্ধ। এমন কৃষ্ণভক্ত থাকতে আবার কার গায়ের গন্ধে বাতাস আমোদ হবে। কত ঢঙের মানুষই আসে আজকাল। কে একজন দেখ না এসেছে একেবারে কাপড়ে মুড়িসুড়ি দিয়ে। মুখ-হাত-গা কিছুই দেখবার উপায় নেই। পুরুষ-মানুষের আবার এ কোন ছিরি ! কোনো অসুখ-বিসুখ নাকি ?

'না, এটা ওঁর ভয়-লজ্জার ভাব।' সঙ্গের লোকটি বললে। 'ওঁর বালকস্বভাব কিনা। অচেনা নতুন জায়গায় এলে এমনি ওঁর ভাব হয়।'

'তোমার কে হন ?' জিগ্‌গেস করলেন বাবাজী।

'আমার মামা। সারাক্ষণ ঈশ্বরভাবেই আছেন। আপনার এ আশ্রম ঈশ্বরভাবের আশ্রম—আপনার নামটিও ভগবান। দেখতে এসেছেন আপনাকে।'

বোসো এক পাশে। কত ভাবের লোকই আসে আজকাল। কী-না-কী একটু ভাব হল, অমনি ঈশ্বরভাব ! মোগল-পাঠান হদ্দ হল ফারসি পড়ে তাঁতী !

'কিন্তু কে এল বল তো আশ্রমে! এমন দিব্যসৌরভ টের পাচ্ছি কেন?' বাবাজী উন্মনা হয়ে উঠলেন।

কোথায় কে! তেমন আবার কে আসবে আচমকা!

বাবাজীকে প্রণাম করে এক পাশে বসল দুজনে। হৃদয় আর রামকৃষ্ণ। বসল একান্ত দীনভাবে। বিনম্র-বিনত হয়ে।

দিব্য গন্ধের উৎস কোথায় বুঝতে পারলেন না বাবাজী।

যাক, উপস্থিত প্রসঙ্গেই নেমে আসা যাক। হ্যাঁ, যা নিয়ে কথা চলছিল এতক্ষণ। সেই বৈষ্ণব সাধুটির কথা। যে গর্হিত কাণ্ড সে করে বসেছে তার সম্বন্ধে এখন কি করা উচিত। কোন শাস্তিটি বিধেয়?

'আমি বলি কি', ভগবানদাসের কণ্ঠে শাসক-রোষ গর্জে উঠল: 'আমি বলি কি, ওর গলার কণ্ঠি কেড়ে নিয়ে ওকে দল থেকে বার করে দাও।'

বাবাজীর যা অভিমত, তাই প্রত্যাদেশ।

মালা ফেরাচ্ছেন বাবাজী।

'আপনি আর অকারণ মালা রেখেছেন কেন?' জিগগেস করলে হৃদয়: 'আপনার সিদ্ধিলাভ তো কবেই হয়ে গেছে।'

এ-প্রশ্ন কি হৃদয় করল, না, আর কেউ করাল তাকে দিয়ে?

'নিজের জন্যে কি আর করি? লোকশিক্ষা তো দিতে হবে আমাকে।'

'লোকশিক্ষা?'

'তা ছাড়া আবার কি। তারি জন্যেই তো আছি। আমাকে দেখে আর সবাই যদি অমনি মালা-তিলক ছেড়ে দেয় তবে দল-কে-দল গোল্লায় যাবে।'

ওরে, এ যে সোঽহং বলছে। কী সর্বনাশ! ওরে, দা লাগা! দা বসা! সোঽহং-এর আগে দা জুড়ে দে। বল দাসোঽহং। দেহবুদ্ধিতে দাসোঽহং ছাড়া পথ নেই। বল আমি দাস, আমি ভক্ত, আমি বালক। জ্ঞান হলে আবার অহং কি! সূর্য যদি ঠিক মাথার উপর থাকে তবে আর ছায়া কোথায়? কিন্তু অন্য সময়? সূর্য যখন এদিকে-ওদিকে? যখন চলছে দেহের ছায়াবাজি? যখন আর জ্ঞান নেই? তখন? তখন ভক্তি, তখন প্রেম, তখন সেবা। সেবা-প্রেম না নিয়ে মানুষ কি নিয়ে থাকবে? কী করে তবে তার দিন কাটে?

যার অটল আছে তার আবার টলও আছে। এই আছিস স্থির হয়ে অমনি আবার তুই কাজ করছিস। তোর স্থিরতা কতটুকু? তোর চাঞ্চল্যই বেশি। সূর্য মাথার ওপর কতক্ষণ? বেশিক্ষণই সে ডাইনে-বাঁয়ে। তাই জ্ঞান নিয়ে কতক্ষণ বসে থাকবি? ভক্তিতে ছুটে চল। ভক্তিতে গলে যা। ওরে যা জ্ঞান

তাই ভক্তি। জ্ঞান বলে, এ জল; ভক্তি বলে, জানি না কে—এ শুধু শীতলতা। একে ছুঁতে ঠাণ্ডা, খেতে ঠাণ্ডা।

জ্ঞান বস্তু, ভক্তি স্বাদ। কিন্তু যেখানে একা-একা নয়, জীব-জগৎ নিয়ে থাকবি সেখানে স্বাদ দিয়ে যা জনে-জনে। স্বাদ নিয়ে যা ক্ষণে-ক্ষণে।

তাই বলে এই অহঙ্কার! এত প্রতপ্ততা! নিমেষে কি হয়ে গেল কে বলবে। মুখের কাপড় খসে পড়ল রামকৃষ্ণের। রাগের ঝঙ্কার দিয়ে উঠে দাঁড়াল আগুনের মত। বললে, 'তুমি লোকশিক্ষা দেবে? তুমি লোক তাড়াবে? তুমি ধরবে-ছাড়বে? কে তুমি? যাঁর এই জগৎসংসার তিনি যদি না শেখান, তিনি যদি না তাড়ান, তিনি যদি না ধরেন-ছাড়েন, তোমার সাধ্য কি! কেন, কিসের এত অহঙ্কার?'

কটিতট থেকে খসে পড়ল বস্ত্রখণ্ড। মুখে দিব্য জ্যোতি, দেহে দিব্য তেজ, কণ্ঠে দিব্য বাণী। সমাধিস্থ রামকৃষ্ণ।

চোখ মেলে তাকালেন একবার বাবাজী। নিশ্বাস নিলেন বুক ভরে। বুঝলেন সেই দিব্য গন্ধের উৎস কোথায়।

এ সংসারে কেউ কোনো দিন তাঁর মুখের উপর কথা বলেনি। সাহস পায়নি প্রতিবাদ করতে। তিনি যা বলেছেন তাই সবাই মেনে নিয়েছে হেঁটমুণ্ডে। কিন্তু কে এ উদ্যতদণ্ড মহাশাসন? অথচ এর প্রতি সেই স্বাভাবিক ক্রোধ হচ্ছে না কেন? কেন জাগছে না প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি? আমি কি বদলে গেলাম নিমেষে? কিন্তু এ কে?

এ সেই বিশ্বভুবনের তমোহর। তোমার অভিমানের তমোনাশ করতে এসেছেন। এসেছেন তোমার অন্তশ্চক্ষু ফুটিয়ে দিতে। বুঝিয়ে দিতে তুমি কে, তুমি কতটুকু! তোমাকে ঠাণ্ডা করে দিতে।

ভাবমোহিত হয়ে গেলেন ভগবান। বললেন, কণ্ঠে বিনয়নম্র মধুরতা: 'আমার এমনি নাম ভগবান বটে কিন্তু আজ থেকে আমার আসল নাম ভাগ্যবান। ভাগ্যবান বলেই আমি আপনাকে পেয়েছি, আমাকে দেখা দিয়েছেন—'

সত্যিই দেখা দিয়েছেন! বাবাজী দেখলেন, মহাপ্রভুর মহাভাবের যে লীলাবর্ণন আছে তাই ওঁর দিব্য অঙ্গে প্রকাশিত।

বন্দনার আনন্দস্রোত বইতে লাগল আশ্রমে।

কে এ? কে এ বন্ধনমুক্ত বিভাবসু? অহঙ্কারের সংহত তুষারকে গলিয়ে দিলেন ভক্তির স্রোতস্বিনীতে!

উনিই সেই দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস। কলুটোলার হরিসভায় উনিই সেদিন

ভাবাবেশে দাঁড়িয়েছিলেন চৈতন্যাসনে।

করজোড়ে ক্ষমা চাইলেন বাবাজী। বহু কটু-কাটব্য করেছি সেদিন। বুঝতে পারিনি। যিনি সমস্ত জীবের চৈতন্য এনে দিয়েছেন চৈতন্যাসনে তো তাঁরই একমাত্র অধিকার।

মথুরবাবু আর হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে কালনায় বেড়াতে এসেছিল রামকৃষ্ণ। এসেছিল নৌকো করে। কেন এসেছিল কেউ জানেনি। মথুরবাবু গেলেন বাসা দেখতে, রামকৃষ্ণ বললে, চল রে হৃদু, শহরটা একবার ঘুরে আসি। কত দূর এসেই পথের লোককে ডেকে জিগগেস করলে, 'আচ্ছা মশাই, ভগবানদাস বাবাজীর আশ্রমটি কোন দিকে?'

সেই আশ্রমে এসে এই কাণ্ড।

তোতাপুরীকে ক্রোধ জয় করতে শিখিয়ে দিয়েছিল, ভগবানদাস বাবাজীকে শিখিয়ে দিল অহঙ্কার জয় করতে, প্রতিহিংসা জয় করতে।

মথুরবাবুকে বললে, 'এইখানে একটি মচ্ছব লাগিয়ে দাও।'

মথুরবাবু বললেন, 'তথাস্তু।'

সেখান থেকে চলো এবার নবদ্বীপ। চলো একবার দেখে আসি নিমাইয়ের জন্মভূমি।

কেউ বলে নিমগাছের নিচে জন্মেছিল বলে নিমাই। কেউ বলে যমের মুখে তেতো লাগবে বলে নিমাই। কেউ বলে আট-আটটি কন্যা মরে যাবার পর নবম গর্ভে জন্মেছিল বলে নিমাই।

কিন্তু এমন কাঁদুনে ছেলে, কিছুতেই শান্ত হতে চায় না। পাড়ার স্ত্রীলোকদের কত জনের কত রকম চেষ্টা, কিছুতেই নিবৃত্তি নেই। অগত্যা অনুপায় হয়ে হরি-নাম শুরু করে দেয় সবাই। ব্যস, শিশুর মুখের খিলখিল হাসি।

পরম সঙ্কেত পেয়ে গেল সকলে। শিশু কাঁদলেই হরিনাম করতে হবে। আর শিশুও এমনি দুঁদে, তার কেবল থেকে থেকে কান্না।

কিন্তু নেড়া-নেড়ীদের এ সব কী কাণ্ড বলো দেখি? সত্যিই কি চৈতন্য অবতার? না নেড়া-নেড়ীরাই টেনে-বুনে বানিয়েছে একটা? চলো নিজে গিয়ে দেখে আসি।

হ্যাঁ, নিজে সেখানে গেলেই ঠিকঠাক বোঝা যাবে। চৈতন্য যদি অবতার হয়ই তবে সেখানে কিছু-না-কিছু প্রকাশ থাকবেই, আর ইশারা ঠিক মিলে যাবে চট করে।

রামকৃষ্ণ এল নবদ্বীপে। বড় গোসাঁইয়ের বাড়ি, ছোট গোসাঁইয়ের বাড়ি দেখতে লাগল ঘুরে-ঘুরে। হেথা-হোথা হেন-তেন কত ঠাকুর-দেবতার থান। কোথাও

কিছু দেখতে পেল না। সর্বত্রই শুকনো হাঁড়ি ঠনঠন করছে। কোথাও দেবভাব নেই। সব জায়গাতেই এক-এক কাঠের মুরদ হাত তুলে খাড়া হয়ে আছে শুধু। দূর! এখানে তবে এলুম কী করতে! চল্ ফিরে চল্ নৌকোয়।

তাই সই। ফিরে চলো।

কিন্তু নৌকোয় যেই উঠেছে রামকৃষ্ণ, অমনি বদলে গেল দৃশ্যপট। অলৌকিক দর্শন হল তার। ঐ এলো, ঐ এলো—বলতে বলতে চকিতে সমাধিস্থ হয়ে গেল। জলে পড়ে যাচ্ছিল, হৃদয় ধরে ফেললে।

কী দেখলে অকস্মাৎ?

'দেখলুম দুটি সুন্দর ছেলে—আহা, এমন রূপ কখনো দেখিনি, তপ্ত কাঞ্চনের মত রং, কিশোর বয়স, মাথায় একটা করে জ্যোতির মণ্ডল, হাত তুলে আমার দিকে চেয়ে হাসতে-হাসতে আকাশপথ দিয়ে ছুটে আসছে। এসেই একেবারে এই খোলটার মধ্যে ঢুকে গেল, আর আমার কিছু হুঁস রইল না। ওরে, ওরাই হচ্ছে নিমাই-নিতাই। নিমাই যে অবতার, তাতে কি কোনো সন্দেহ আছে?'

কিন্তু এ ভাব নবদ্বীপে না এসে এই গঙ্গাবক্ষে এল কেন?

মথুরবাবু বললেন, 'যে নবদ্বীপে মহাপ্রভুর জন্ম তা গঙ্গায় ভেঙে গেছে। এই যে বালুর চড়া দেখতে পাচ্ছ এই ছিল আসল নবদ্বীপ। তাই হালের শহরে না হয়ে এই বালুর চড়ার কাছে এসে তোমার ভাব হল।'

তুমি ভাবাম্বুনিধি। তুমি সর্বগুণেশ্বর।

আমি কেউ নই। আমি আবার কে!

॥ ৪২ ॥

কর্মযোগে অঙ্গারও হীরক হয়।

মথুরবাবুও ভক্তিতে-বিশ্বাসে অত্যুজ্জ্বল হয়ে উঠলেন।

সকাতরে বললেন রামকৃষ্ণকে, 'বাবা, আমাকে ভাবসমাধি দাও।'

হাসল রামকৃষ্ণ। বললে, 'দিব্যি তো আছিস। সুখে থাকতে ভূতে কিল খাবি কেন?'

'না, ও সব শুনছি না আমি—'

'না শুনলে চলবে কেন? তোর এদিক-ওদিক দুদিক চলছে। ভাব হলে যে অথৈ জলে পড়বি। সংসার থেকে মন যে তখন উঠে যাবে। তখন তোর বিষয়-আশয় কে দেখবে-শুনবে? বারো ভূতে যে লুটে খাবে সর্বস্ব।'

মথুরবাবু তবুও নাছোড়বান্দা।

'ওরে কালে হবে, কালে হবে। একটা বিচি পুঁততে-পুঁততেই কি গাছ হয়? আর গাছ হয়েই কি ফল পাওয়া যায়?'

ভক্ত, ভৃত্য আর ভাণ্ডারী এই মথুরবাবু। কখনো প্রভুজ্ঞানে ইষ্টপূজা, কখনো বা সন্তানভাবে স্নেহশ্রাবণ। কখনো অভিভাবক জ্ঞানে সতর্ক সম্মান, কখনো বা মিত্র-বুদ্ধিতে সমতা-মমতা। আর যিনি বিশ্বজনক, যিনি আত্মীয়ের চেয়েও আত্মীয়, সর্বত্র যাঁর ক্ষমা, দয়া, বিশ্বাস আর আশীর্বাদ, তাঁকেই মাঝখানে রেখে দুই পাশে শুয়েছেন দুই জনে। মথুরবাবু আর জগদম্বা। একই ধৈর্যের শয্যায়।

রামকৃষ্ণ ভাব দিতে রাজি হল না বলে মরমে মরে রইলেন মথুরবাবু। মাকে বললেন, মা, আমাকে বঞ্চনা করে তোর লাভ কি।

কি খেলা দেখাবার জন্যে মথুরবাবুকে মা নিয়ে এসেছিল রামকৃষ্ণের কাছে তা কি মথুরবাবু জানেন? বারে-বারে রামকৃষ্ণকে যাচাই করে দেখবার জন্যে। সাধে কি আর মথুরবাবু লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে? দেখলেন যতই আগুন আনেন ততই সোনা টকটকে রং ধরে। একলা ঘরে সুন্দরী মেয়েমানুষ এনে দিলেন, রামকৃষ্ণ দুর্গাস্তব শুরু করলে। শাল-দোশালা চাপিয়ে দিলেন গায়ে, তার গায়ে থুতু ছিটোতে লাগল। রূপোর সাজ আর গড়গড়া দিলেন কিনে, বললে গামছা পরে ভাবা হুঁকো খেতে দোষ হল কি! বিষয় দিতে চাইলেন, এই মারে তো সেই মারে! তাঁর নিজের সংসারের উপরে দিলেন তাকে অপ্রতিহত প্রভুত্বের অধিকার, এক নজর তাকিয়েও দেখল না। কামারপুকুরের সংসারের জন্যে কত অর্থব্যয় করলেন, এতটুকু কাতরতা-কৃতজ্ঞতা নেই!

এ কে তুমি বৈরাগ্যবারিনিধি! আমি অনেক দুষ্কার্য করেছি, জমিদারি বজায় রাখতে খুনখারাপি করতেও কসুর করিনি, এবার দাও আমাকে নৈষ্কর্ম্যের নিষ্কৃতি। আমাকে ভাব দাও।

তদ্‌ভাবে তদ্‌ভাবঃ, তদ্‌ভাবে তদ্‌ভাবঃ।

'ওরে ঠিক-ঠিক যে ভক্ত সে কি তাঁকে দেখতে চায়? সে শুধু তাঁর সেবা করে।' প্রবোধ দিল রামকৃষ্ণ। 'তাঁর সেবাতেই তার পরমানন্দ। তার বেশি আর সে কিছু চায় না।'

তবু মন ওঠে না মথুরবাবুর।

'তা কি জানি বাপু! মাকে তবে গিয়ে বলি। দেখি তাঁর কি ইচ্ছে!'

এর দিন কয়েক পরেই হঠাৎ একদিন মথুরবাবুর ভাবসমাধি উপস্থিত। তিন দিন ধরে ঠায় জড় অবস্থা।

ডেকে পাঠালেন রামকৃষ্ণকে। দেখে যাও কোথায় এসে উঠেছি শেষ পর্যন্ত।

রামকৃষ্ণ দেখল, আশ্চর্য, এ কী হয়ে গিয়েছে মথুর! যেন আরেক দেশের মানুষ। চেনা যায় না চট করে। দু' চোখ লাল, কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে। মুখে শুধু ঈশ্বরের কথা। শুধু অধ্যাত্মরতি।

কিন্তু রামকৃষ্ণকে দেখেই দু' পা জড়িয়ে ধরলেন মথুরবাবু। আকুল কণ্ঠে বললেন. 'বাবা, ঘাট হয়েছে। তোমার ভাব তুমি ফিরিয়ে নাও।'

'কেন, কি হল?'

'সব তছনছ হয়ে গেল। তিন দিন ধরে এই অবস্থা, বিষয়কর্মে মন দিতে পারছি না, চেষ্টা করলেও মন উঠে উঠে যাচ্ছে। তিন দিনই বারো ভূত ছেড়ে তেত্রিশ ভূত এসে লেগেছে—'

'কেন, তখন যে খুব ভাব চেয়েছিলে শখ করে? এখন ফেরৎ দিলে চলবে কেন?'

'এদিকে সব যে যায়!'

'কেন, আনন্দ নেই?'

'আছে, কিন্তু সে আনন্দ, যিনি নিত্যানন্দ, তোমারই সাজে। আমাদের ও সবে কাজ নেই। আমাদের পদসেবা। পর-জ্ঞানে পরা-সেবা।'

হাসতে লাগল রামকৃষ্ণ। বললে, 'তাই তো বলেছিলাম আগে।'

'তখন কি অতশত বুঝেছি? তখন কি জানতাম যে ভাবের গোঁয়ে চব্বিশ ঘণ্টাই ফিরতে হবে? ইচ্ছে করলেও আর কিছুতেই মন দিতে পারব না?'

তখন আর রামকৃষ্ণ কি করে! মথুরবাবুর বুকে স্নেহের হাত বুলিয়ে দিলে। ধাতস্থ হলেন মথুরবাবু।

ওরে, কী হবে ও সব ভাব-টাবে। শুধু তাঁর নাম কর, তাঁর দয়ায় বিশ্বাস কর। ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর তাঁর কাছে। কী চাইবি? শুধু আশ্রয়, শুধু শান্তি, শুধু প্রসন্নতা। ওরে, ধেয়ান ধর, প্রেম লাগা।

সাধন-ভজন কেবল ডানা বেদনা করবার জন্যে। আকাশে উড়তে উড়তে ডানায় ব্যথা হলেই পাখি কোথাও কোনো উঁচু জায়গায় এসে বসে। সেই উঁচু জায়গাটিই তিনি। আর তাঁরই জন্যে সাধন।

চিঁড়ে কোটো, মন রেখো ঢেঁকির মুষলের দিকে। তুলসীদাস পড়েছিস? তুলসী, য়্যাসা ধেয়ান ধর, য়্যাসা বিয়ানকা গাই। মু মে তৃণ চান্য টুটে চেং রাখয়ে বাছাই। প্রসূতি গাভী মুখে ঘাস খেলেও যেমন তার মন পড়ে থাকে বাছুরের উপর, তেমনি সংসারকর্মে লেগে থাকলেও মন ফেলে রাখ ঈশ্বরে।

মথুরবাবুর অসুখ, ফোড়ার যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। হৃদয়কে দিয়ে বলে পাঠালেন, বাবা যেন একবারটি আসেন।

রামকৃষ্ণ বললে, 'আমি গিয়ে কি করব! আমি কি তার ফোড়া ভালো করতে পারব?' গেল না রামকৃষ্ণ।

মথুরবাবু আবার লোক পাঠালেন। বাতাসে পাঠালেন তাঁর যন্ত্রণার কাতরতা। অগত্যা যেতে হল রামকৃষ্ণকে।

অনেক কষ্টে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে উঠে বসলেন মথুরবাবু। বললেন, 'বাবা এসেছ? আমাকে একটু পায়ের ধুলো দাও।'

'তুমি কি ভেবেছ আমার পায়ের ধুলোয় তোমার ফোড়া ভালো হবে?'

সারা অন্তরে ছি-ছি করে উঠলেন মথুরবাবু। বললেন, 'বাবা, আমি কি এমনি? আমি কি আমার ফোড়ার জন্যে তোমার পায়ের ধুলো চাই?' দুই চোখ দিয়ে অশ্রুধারা নেমে এল। 'আমার ফোড়ার জন্যে তো ডাক্তার আছে। আমি তোমার শ্রীচরণের ধুলো চাই এই ভবসাগর পার হবার জন্যে।'

শুনতে শুনতে ভাবাবেশ হল রামকৃষ্ণের। স্বচ্ছ ভক্তির স্পর্শে উথলে উঠল ভাবতরঙ্গ।

সেই সুযোগে মথুরবাবু রামকৃষ্ণের যুগ্মপদে মাথা ঠেকালেন। দেহের চিকিৎসার জন্যে আয়ুর্বেদী আছে, তুমি ভবরোগবৈদ্য।

তুমি অতীন্দ্রিয় রাজ্যের স্বরাট-বিরাট সম্রাট হয়ে আবার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের অধিপতি। তুমি স্নেহে মাতা, পালনে পিতা, জীবনের খেলার সাথী।

একেক সময় একটা গোঁ আসে মথুরবাবুর।

যেমন সেইবার এসেছিল। বিজয়াদশমীর দিন বলে বসলেন, প্রতিমা বিসর্জন দেব না, নিত্যপূজা করব।

কারু কথায়ই কান পাতেন না। স্ত্রীর কথা পর্যন্ত উড়িয়ে দিলেন। বিপদ বুঝে রামকৃষ্ণকে ডেকে পাঠালেন জগদম্বা। স্বামীর নিশ্চয় মাথা বিগড়েছে। নইলে এমনতরো চেহারা হয় আকস্মিক?

মুখ-চোখ লাল, কেমন একটা উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এদিক-ওদিক। না, কিছুতেই ফেলে দিতে পারব না মাকে। মাকে ছাড়া বাঁচতে পারব না।

রামকৃষ্ণের অনুরোধ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করে দিলেন।

'মাকে ছেড়ে বাঁচতে পারব না। যতক্ষণ আমার প্রাণ আছে ততক্ষণ কেউ নিয়ে যেতে পারবে না মাকে।'

রামকৃষ্ণ তখন তাঁর বুকে হাত বুলুতে লাগলেন। বললেন, 'মাকে ছেড়ে তোমাকে থাকতে হবে এ কথা কে বললে? আর বিসর্জন দিলেই বা মা যাবেন কোথায়?

pathagar.net

ছেলেকে ছেড়ে মা কি থাকতে পারেন কখনো? তিন দিন বাইরের দালানে বসে পুজো নিয়েছেন, আজ থেকে একেবারে ভিতরের দালানে বসে পুজো নেবেন। হ্যাঁ, ভিতরের দালান। তোমার অন্তর মহল। আরো নিকট হবেন তিনি। বসবেন এসে তোমার অন্তরের অন্দরে।'

ব্যস, হাতের ছোঁয়ায় নরম হয়ে গেলেন মথুরবাবু। সত্যদৃষ্টির সৌম্য শান্তি নেমে এল দু চোখে।

'কথা কইতে-কইতে অমন করে ছুঁয়ে দি কেন জানিস?' ভক্তদের বললেন এক দিন ঠাকুর। 'যে শক্তিতে ওদের ওই গোঁ-টা থাকে, সেইটের জোর কমে গিয়ে ঠিক-ঠিক সত্য বুঝতে পারবে বলে।'

১২৭৮ সালের আষাঢ় মাসের শেষ দিকে মথুরবাবু জ্বরে পড়লেন। দেখতে-দেখতেই বিকারে দাঁড়িয়ে গেল জ্বর।

রামকৃষ্ণ গিয়েছে দেখা করতে।

মথুরবাবু বললেন, 'আচ্ছা বাবা, সেই যে তুমি বলেছিলে তোমার অনেক ভক্ত আসবে, কই, তারা তো আজো এল না?'

'কি জানি বাপু, কত দিনে আসবে সব। মা যত কিছু দেখিয়েছেন সব ফলেছে, শুধু এইটেই বুঝি ফলল না!' রামকৃষ্ণের মুখে পড়ল ঈষৎ বিষাদ-ছায়া।

জানো না সেই ভূতের সঙ্গী খোজা। ভূত একা-একা ঘোরে, সঙ্গী-সাথী জুটছে না একটাও। শনি-মঙ্গলবারে কেউ যদি অপঘাতে মরে, তাকে ধরে আনবার জন্যে দৌড়ে যায়। ভাবে যেহেতু শনি-মঙ্গলবারে মরেছে ভূত হবে নির্ঘাৎ। সঙ্গী পাওয়া যাবে এত দিনে। কিন্তু যেই সামনে ছুটে যায়, দেখে, হয় লোকটা শেষ পর্যন্ত মরেনি, নয়তো বার গুনতে ভুল হয়েছে। ভূতের আর সঙ্গী মেলে না।

আমারো হয়েছে সেই দশা। আমার কথা নেবে কে? আমি তাই সঙ্গী খুঁজছি —খুঁজছি আমার ভাবের লোক। খুব ভক্ত দেখলে মনে হয় এই বুঝি আমার ভাব নিতে পারবে। কিন্তু, না, কত দিন হতেই সে আরেক রকম হয়ে যায়। তরোয়াল দিয়ে সে দাড়ি চাঁছে।

'মনের কথা কইব কি সই, কইতে মানা। দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না।'

কথায় কেমন যেন একটা করুণ বেদনা। মথুরবাবু বললেন, 'তারা আসুক আর না আসুক, আমি আছি। আমি একাই একশো ভক্তের সমান। তাই মা হয়তো আমাকে দেখিয়েই তোমাকে বলেছিলেন অনেক ভক্ত আসবে—'

'কে জানে বাপু, মা-ই জানেন।'

কিন্তু রামকৃষ্ণ বুঝতে পারল মা-ই এবার নিজে এসেছেন মথুরকে নিয়ে যেতে।

যা, মা'র কাছেই যা। দেখ গে সেই দেবীলোক।

নিজে আর এল না রামকৃষ্ণ। খোঁজ নিতে রোজ পাঠায় হৃদয়কে।

কাশীতে রামকৃষ্ণের অনুরোধে মথুরবাবু কল্পতরু সেজেছিলেন। যে যা চাইল তাই দান করলেন অকাতরে!

রামকৃষ্ণকে বললেন, 'তুমি কিছু চাও।'

চন্দ্রমণি এক আনার দোক্তা চেয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ বললে, 'আমাকে একটি কমণ্ডলু দাও।'

সেই কমণ্ডলু করে আমাকে একটু এখন গঙ্গাজল দেবে না? কৃপণ মথুরকে মুক্তহস্ত করে দিয়ে, হে কৃপানিধি, তুমি আজ নিজে কৃপণ হয়ে গেলে?

কোনো দরকার নেই। স্বয়ং গঙ্গা আসছেন তোকে নিয়ে যেতে। আসছেন সেই বেদময়ী শব্দময়ী গঙ্গা। তৃপ্তিকর্ত্রী ভবতারিণী। তাঁর এগিয়ে আসার শব্দ শুনতে পাচ্ছিস না?

পয়লা শ্রাবণ, আজ মথুরবাবুর শেষ দিন। আজো রামকৃষ্ণ গেল না জানবাজারে। তোর ভক্তিব্রত উদ্‌যাপন হয়েছে, মা তোকে কোলে তুলে নিতে নিজে এসেছেন। কালীঘাটে নিয়ে গেল মথুরবাবুকে। ঘনিয়ে এসেছে জীবনের অন্তিমা।

রামকৃষ্ণ তখন দক্ষিণেশ্বরে সমাধিস্থ। তার সূক্ষ্ম দেহ জ্যোতির পথ ধরে চলে এল মথুরের শয্যাপার্শ্বে। চোখের পাতা শেষ বারের মত বোজবার আগে মথুরবাবু দেখলেন রামকৃষ্ণকে।

বিকেল পাঁচটার সময় ধ্যান ভাঙল। হৃদয়কে ডেকে বললে, 'ওরে, মথুর রথে উঠল। খুব বেগে উড়ে গেল সেই রথ। চলে গেল দেবীলোকে।'

অনেক রাতে খবর এল দক্ষিণেশ্বরে, বিকেল পাঁচটার সময় মথুরবাবু লোকান্তরিত হয়েছেন।

'আমাকে দেখে সে কী বলত জানিস?' ঠাকুর এক দিন বললেন ভক্তদের। 'বলত, বাবা, তোমার ভেতরে আর কিছু নেই—শুধু সেই ঈশ্বর আছেন। দেহটা একটা খোল, বাইরে কুমড়োর আকার, কিন্তু ভেতরের শাঁস-বিচি কিছু নেই। তোমায় দেখলাম, যেন কেউ ঘোমটা দিয়ে চলে যাচ্ছে।'

তবু তুমি মনে করো না, সেজবাবু, তুমি একটা বড় মানুষ আমায় মানছ বলে আমি কৃতার্থ হয়ে গেছি। মানুষ কী করবে! ঈশ্বরই তাকে মানাবেন। ঈশ্বরীয় শক্তির কাছে মানুষ খড়-কুটো।

কী জ্বলন্ত বিশ্বাসই ছিল! কী উর্জা ভক্তি! কর্ম করতে গেলে আগে একটি বিশ্বাস চাই। একটি আনন্দময় বিশ্বাস। মাটির নিচে মোহরের ঘড়া আছে এই

আনন্দময় বিশ্বাস থাকলেই তো মাটি খুঁড়ব। খুঁড়তে খুঁড়তে যদি ঠং করে একটা শব্দ হয়, বুকের ভিতরটাও আনন্দে টং করে ওঠে। তার পর যদি ঘড়ার কানা দেখা যায়, তা হলে তীব্রতর আনন্দ। খোঁড়ার বেগ তখন আরো বাড়ে। সাধু গাঁজা সাজছে, তার সাজতে-সাজতে আনন্দ। টানবার আগে থেকেই আনন্দ। হনুমানের রাম নামে বিশ্বাস। বিশ্বাসের গুণে সে সাগর লঙ্ঘন করলে। আর স্বয়ং রামচন্দ্র, তাঁকে সাগর বাঁধতে হল!

'আচ্ছা, মশাই, মৃত্যুর পর মথুরের কী হল?' এক দিন কে এক জন জিগগেস করল ঠাকুরকে।

'তাঁর নিশ্চয়ই আর জন্মাতে হবে না।'

'কে বললে? সে নিশ্চয়ই কোথাও একটা রাজাটাজা হয়ে জন্মেছে। তার মধ্যে যে ভোগবাসনা ছিল!'

যোগভ্রষ্ট হলে ভাগ্যবানের ঘরে জন্ম হয়—তার পরে আবার ঈশ্বরের জন্যে সাধনা করে। পূর্বজন্মে ঈশ্বর চিন্তা করতে-করতে হঠাৎ হয় তো ভোগ করবার লালসা হয়েছে। তাকেই বলে যোগভ্রষ্ট। কামনা থাকতে, লালসা থাকতে মুক্তি নেই।

'ওরে, বাস্‌নায় আগুন দে।' এই কথা শুনেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন লালাবাবু। সাত লাখ টাকার আয়ের সম্পত্তি ছেড়ে চলে গেলেন বৃন্দাবনে।

ধর্মের সূক্ষ্ম গতি। ছুঁচে সুতো পরাচ্ছ, সুতোর মধ্যে একটু আঁশ থাকলে ছুঁচের ভিতর আর ঢোকে না। কামনা থাকলে আর ভগবান নেই।

কী চাইবি ভগবানের কাছে? ভক্তি-মুক্তি, জ্ঞান-বৈরাগ্য—ও সব কিছু নয়। শ্রীমা বললেন, 'চাইবি শুধু নির্বাসনা।'

॥ ৪৩ ॥

'তোমরা সব কোথায় চলেছ?'

'কলকাতায় গঙ্গাস্নানে যাচ্ছি।'

'কলকাতায়?'

'হ্যাঁ, ফাল্গুনী পূর্ণিমায় প্রকাণ্ড যোগ সেখানে। ঐ দিন জন্মেছেন গৌরাঙ্গদেব।'

'আমাকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবে?'

'ও মা, স্নানে যাবি তুই?' আত্মীয়া বয়স্কা মহিলারা কৌতূহলী হয়ে উঠল।

'না, একবারটি দক্ষিণেশ্বরে যাব। তাঁকে দেখতে বড় মন কেমন করছে।'

'তোর বাবাকে গিয়ে বল। তোর বাবা না বললে যাবি কি করে?'

লজ্জায় মরে গেল সারদা। একটু বা ভয়-ভয় করতে লাগল। যদি বাবার কানে

ওঠে! ছি ছি, বাবার কানে গেলে তিনি কি ভাববেন।

সেই কত দিন আগে দেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে। চার বছর আগে। গেল পৌষে সারদার আঠারো বছর পূর্ণ হয়েছে। ভরন্ত বয়সের চটুল চাপল্য নেই, স্বভাবটি প্রশান্ত গম্ভীর। হৃদয়ের মধ্যে সব সময়ে আনন্দের একটি পূর্ণঘট বসানো। উল্লাসটি উচ্ছলিত নয়, উল্লাসটি নিয়তনিশ্চল।

সত্যি-সত্যি বাবার কানে উঠল কথাটা। সারদা দক্ষিণেশ্বরে যেতে চায়। মিলতে চায় তার স্বামীর সঙ্গে। তার পুরুষের সঙ্গে।

লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করল। মনে-মনে বললে, তোমার কাছে যেতে চাই, তুমিই আমাকে রক্ষা করো।

রামচন্দ্র ডেকে পাঠালেন সারদাকে। বললেন, 'বেশ তো। যাবে। আমিই তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। গোছগাছ করে নাও চট করে।'

হৃদয়স্থ আনন্দঘটের দিকে সারদা তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। কৃতজ্ঞকরুণ চোখে প্রতীক্ষার প্রশান্তি।

কোথায় জয়রামবাটি আর কোথায় কলকাতা! পায়ে-হাঁটা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। সাত রাজ্যে ইঞ্জিনের বাঁশি শোনেনি কেউ। এদিকে বিষ্ণুপুর, ওদিকে তারকেশ্বর—সব ঝাঁঝাঁ করছে। ঘাটালের যে নদী সেখানেও ইষ্টিমার আসেনি। সর্বদিকে একটা স্থান আর সময়ের বিস্তীর্ণ হাহাকার। কোথা দিয়ে কোথায় যাব, কত দিনে কোন দিকে গিয়ে পৌছুব—সমস্ত একটা ধূসর অস্পষ্টতা। কিছুই ধরা-ছোঁয়ার নেই, সব যেন ঐ দিগন্তের কাছাকাছি।

তবু চলো। চলা ছাড়া অন্যপায়ের আর উপায় কি। শুধু এগিয়ে চলো। যেমন পদে-পদে বিপদ, তেমনি পায়ে-পায়ে উপায়।

সারদা শুধু স্বামীদর্শনে যাচ্ছে না, সে যাচ্ছে তীর্থদর্শনে। হিমালয় ডিঙিয়ে মানস সরোবরে।

কোনো দিন পথে বেরোয়নি সারদা। হাঁটেনি কোনোদিন দূরের পাড়িতে। তবু ভয় পাবে না সে। থাকবে না পেছিয়ে পড়ে। যিনি তীর্থপতি তিনিই তীর্থ-পথিককে টেনে নেবেন।

কোথাও-কোথাও রাস্তার খেই হারিয়ে গেছে। ধান কাটা হয়ে গিয়েছে মাঠে, কোথাও বা সেই শুকনো মাঠ ভাঙো। ঢেলা মাড়িয়ে-মাড়িয়ে চলো। গাছের ছায়া পাও তো, জিরিয়ে নাও একটু। তালপুকুর মিলেছে কোথাও, জল খেয়ে নাও পেট ভরে। সূর্যদেব গো, তোমার রশ্মিজাল একটু স্তিমিত করো।

কমলকোমল পা ফেলে-ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে সারদা। মুখখানি রোদে আমলে গেছে,

আর যেন পারছে না চলতে। পা ভেঙে পড়ছে পথশ্রমে। শরীর ঝিমিয়ে পড়ছে।
'চলতে কষ্ট হচ্ছে রে সারু?' জিগগেস করেন রামচন্দ্র।
'না, বাবা।' মুখে হাসি আনে সারদা, পা দুটোকে টানে জোর করে।
'তবে অমন পিছিয়ে পড়ছিস কেন?'
'এই একটু দেখতে দেখতে চলেছি সব—'
মেয়ের মুখের দিকে তাকান রামচন্দ্র। ঝামরে গেছে মুখ-চোখ। যেন টলে-টলে পড়ছে। দু-তিন দিনেই এই, এখনো আছে আরো কত দিনের দীর্ঘ শ্রম। উপায় কি, এমনি করেই চটি থেকে চটিতে বিশ্রাম নিতে-নিতে এগুতে হবে। বিশ্রামটা না-হয় আরো একটু বড় করা যায়, কিন্তু পথ তো আর ছোট করা যাবে না।
হু-হু করে জ্বর এসে গেল সারদার। মেয়ে পথের মধ্যেই এলিয়ে পড়ল। চোখে আঁধার দেখলেন রামচন্দ্র। মেয়েকে নিয়ে এখন করি কি।
আর সব সহযাত্রীরা থামতে চাইল না। তোমার মেয়ের জন্যে আমাদের গঙ্গাস্নান মারা যাক আর কি। আমরা চললুম এগিয়ে। তুমি তোমার মেয়েকে নিয়ে সামনের চটিতে গিয়ে ওঠো।
তা ছাড়া আর পথ নেই। রুগী মেয়ে হাঁটবে কি করে? পালকি কই এ অঞ্চলে? অগত্যা রামচন্দ্র সারদাকে নিয়ে সামনের এক চটিতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।
দুঃখের আর অবধি নেই সারদার। নিজে তো অসুখে পড়লুমই, বাবাকেও বিপদে ফেললুম। তোমাকে দেখবার দিনটিও পিছিয়ে গেল।
গ্রাম্য বধূ, লজ্জা-সরমের কত ছিরি-ছাঁদ। এখন জ্বরে বেহুঁস হয়ে বিদেশের চটিতে সব জলাঞ্জলি গিয়েছে। লজ্জানিবারণ হরি, তাঁর স্নেহদৃষ্টির ছায়ায়ই তার আচ্ছাদন।
সারদা দেখল, কে একটি মেয়ে তার পাশে এসে বসল।
গায়ের রংটি কালো, কিন্তু কালো অমন অপরূপ হয়, কালোর যে অমন আলো থাকে, স্বপ্নেও কোনো দিন দেখেনি সারদা। মেয়েটি পাশে বসে ঠাণ্ডা স্নেহে সারদার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। নরম হাতের ছোঁয়ায় মুছে দিতে লাগল তপ্ত গায়ের দাহ। দুটি টানা-টানা বিশাল চোখের মমতাটিও কত ঠাণ্ডা!
সারদা জিগগেস করলে, 'তুমি কোথা থেকে আসছ গা?'
'দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি।'
'বলো কি? দক্ষিণেশ্বর থেকে? আমিও ভেবেছিলুম দক্ষিণেশ্বরে যাব। সেই আশা করেই বেরিয়েছিলুম বাড়ি থেকে। তায় রাস্তায় এই জ্বর। আচ্ছা, তুমি দক্ষিণেশ্বরে তাঁকে দেখেছ? ঠাকুরকে?'

'দেখেছি বই কি।'

'বড় সাধ ছিল, তাঁকে দেখব, তাঁর সেবা করব। আমার ভাগ্যে সে আশা আর মিটল না। জ্বর এসে আমার সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে দিলে।'

মেয়েটি ব্যস্ত হয়ে বললে, 'না, না, তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে বই কি। তুমি ভালো হবে, সেখানে গিয়ে দেখবে তাঁকে। তোমার জন্যেই তো তাঁকে আটকে রেখেছি সেখানে।'

'বটে? ভালো হয়ে সেখানে গিয়ে তাঁকে দেখব?' সারদা তাকাল একবার সেই মমতাময়ীর দিকে। 'তুমি আমাদের কে হও গা?'

'আমি তোমার বোন হই।'

'সত্যি? তাই বুঝি তুমি এসেছ আমার অসুখ শুনে? বাঃ, বেশ!' বলতে-বলতে ঘুমিয়ে পড়ল সারদা।

সকালে ঘুম ভেঙে দেখল বোন কোথায় চলে গেছে। বোনের সঙ্গে-সঙ্গে জ্বরও অন্তর্হিত।

আবার শুরু হল পথ হাঁটা। কত দূর এসে, কি আশ্চর্য, একটা পালকি মিলে গেল। বোনটিই হয় তো পাশের কোনো গাঁ থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে পালকি।

আবার জ্বর এল দুপুরের দিকে।

'কেমন আছিস রে সারু?'

'বেশ, ভালো আছি বাবা।' পালকি পেয়েছে, আবার রোগ-বালাই কী সারদার! চলেছি তো এখন সর্বরোগপাবনের কাছে।

পথের শেষ হল এক সময়। রাত নটার সময় দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে নৌকো লাগল। রামকৃষ্ণের কাছে খবর পৌঁছুল। রামকৃষ্ণ ডেকে পাঠাল হৃদয়কে। বললে, 'ও হৃদু, বারবেলা নেই তো? প্রথম বার আসছে।'

এ কথা হয়ে গেছে আগেই। সারদা গঙ্গার উপরেই নৌকোতে বারবেলা কাটিয়ে এসেছে।

আর সকলে এদিক-সেদিক গেল—নহবতের ঘরে চন্দ্রমণি আছেন, সেখানে কেউ-কেউ। সারদা সটান চলে এল রামকৃষ্ণের ঘরে। মুখে সেই সলজ্জ ঘোমটা।

'তুমি এসেছ?' উৎফুল্ল হয়ে উঠল রামকৃষ্ণ। 'বেশ করেছ।' বলেই ব্যস্ত হয়ে উঠল: 'ওরে, ওকে একখানা মাদুর পেতে দে। কত দূর থেকে আসছে। তার পরে আবার অসুখ করে এসেছে।' বলেই নিজের মনে খেদ করতে লাগল: 'এখন কি আর আমার সেজবাবু আছে যে, তোমাকে যত্ন করবে? আমার ডান হাত ভেঙে গেছে। তোমাকে আমি এখন কোথায় রাখি? আমার সেজবাবু

হলে তোমাকে অট্টালিকায় রাখতেন। এলে তো এত দেরি করে এলে। আমার সেজবাবুকে দেখতে পেলে না।'

মাদুর বিছিয়ে দিল হৃদয়। জড়সড় হয়ে বসল তাতে সারদা।

চোখ-কানের বিবাদ ভঞ্জন করল। কত কি শুনেছিল দেশে থাকতে। পাগল হয়ে গিয়েছেন, পরনে কাপড় নেই, মুখে শুধু অসম্বন্ধ প্রলাপ। তাঁর সম্বন্ধে এই বিবরণটাই তো পাগলের বিবরণ। একেবারে পরমানন্দ মহাপুরুষের মত বিরাজ করছেন। আশ্চর্য, সারদাকে তিনি ভোলেননি, ঠিক মনে করে রেখেছেন। শুধু মনে করে রাখেননি নয়, তার প্রতি করুণায় অজস্র হয়ে আছেন।

ঘর ছেড়ে উঠে যেতে ইচ্ছে করে না সারদার। তবু বললে, 'আমি মা'র কাছে নবতের ঘরেই যাই।'

'না, না, ওখানে ডাক্তার দেখাতে অসুবিধে হবে।' রামকৃষ্ণ ব্যস্ত হয়ে উঠল। 'তুমি এ ঘরেই থাকো। আমি নইলে ওষুধ-পথ্য দেবে কে?'

চন্দ্রমণি আগে কুঠিঘরের একটি কোঠায় থাকতেন, অক্ষয়ও থাকত তাঁর সঙ্গে। সেই ঘরেই অক্ষয় মারা যায়। অক্ষয় মারা গেলে চন্দ্রমণি ছেড়ে দিলেন সেই কুঠিঘর। বললেন, 'আর আমি ওখানে থাকব না। আমি নিচে এই নবতের ঘরেই থাকব। গঙ্গা পানে মুখ করে রইব। কুঠিতে আর আমার দরকার নেই।'

তখন রাতের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গিয়েছে। দু-তিন ধামা মুড়ি নিয়ে এল হৃদয়। যেমন অসময়ে এসেছ তেমনি মুড়ি চিবোও বসে-বসে।

রাত্রে সেই ঘরেই শুলো সারদা। শুলো ভিন্ন শয্যায়, সঙ্গে আরেকটি মেয়ে নিয়ে। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে ভাবল সারদা, এ কি ঘুম, না, জাগরণ!

পর দিনেই ডাক্তার আনালো রামকৃষ্ণ। তিনচার দিন সারদাকে রাখল তার খবরদারিতে। নিজের হাতে খাওয়াতে লাগল পথ্য। ঘড়ি ধরে ওষুধ। নিজের সেবা-যত্নে ভালো করে তুলল। বললে, 'এবার তুমি যেতে পারো মা'র কাছে।'

নবতে চলে এল সারদা। লাগল শাশুড়ীর সেবায়। যতটুকু উনি নেন ততটুকু রামকৃষ্ণের সেবায়।

সেবার মত আনন্দ আর কী আছে। সেবা ছাড়া আর কী আছে জীবনের কবিতা!

রামচন্দ্র দেখে বড় শান্তি পেলেন। ফিরে গেলেন স্বস্থানে।

কিন্তু সারদাকে নবতে পাঠিয়েই রামকৃষ্ণের মনে হল, কেন, কেন ওকে দূরে সরিয়ে রাখব। ওকে কি আমার ভয়, না, ঘৃণা? ও কি আমার তাচ্ছিল্যের, না, অনুকম্পার? প্রতিমায় ঈশ্বর পূজা হয় আর জীয়ন্ত মানুষে হবে না? আমি

কি ফুটো কলসী যে জল রাখলে জল সব বেরিয়ে যাবে? আমি কি বালির বাঁধ যে আষাঢ়ের বন্যাকে রোধ করতে পারব না?

মনে পড়ল তোতাপুরীর কথা। তোতাপুরী বলেছিল, 'তুমি যে কাম জয় করেছ তার প্রমাণ কি? স্ত্রীকে দেশের বাড়িতে রেখে এখানে বনবাসে থেকে কামজয়ের কথা বলা সোজা। স্ত্রীকে কাছে রেখে বলতে পারো তবে বুঝি।'

এবার তো সেই পরীক্ষার সুযোগ এসেছে। জোর করে নিজের বীরত্ব জাহির করবার জন্যে তো তিনি করছেন না, তাঁর কাছে সুযোগ এসেছে বলেই তিনি পরীক্ষা করছেন। সমস্তই মহামায়ার ইঙ্গিত।

রামকৃষ্ণ বলে পাঠালো, 'সারদা আমার ঘরে এসে শোবে।'

সারদার ভয় করতে লাগল। এ আবার কী হল রামকৃষ্ণের! কিন্তু 'না' বলবার উপায় নেই। শাশুড়ী বললেন, 'যাও যখন ও বলছে।'

ঘরের মধ্যে একান্তে ডেকে এনে রামকৃষ্ণ জিগগেস করলে সারদাকে, 'তুমি কি আমাকে সংসার পথে টেনে নিতে এসেছ?'

ঘোমটা-ঢাকা মুখে হেঁট হয়ে দাঁড়াল সারদা। বললে, 'না। তোমাকে সংসার পথে কেন টানতে যাব? তোমাকে ইষ্ট পথেই সাহায্য করতে এসেছি।'

তবে বোস পাশটিতে, শোনো।

খই ভাজবার সময় যে খইটি খোলার উপর থেকে ঠিকরে বাইরে পড়ে তাতে কোনো দাগ লাগে না, কিন্তু গরম বালির খোলায় থাকলে কোনো না কোনো জায়গায় কালো দাগ লাগবেই। যা ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন বলে বোধ হবে তা মাই হোক আর স্ত্রীই হোক, তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করতে হবে। ঈশ্বরের মতন কিছু নেই। রাবণ সীতার জন্যে মায়ার নানা রূপ ধারণ করেছে, তবু সীতা টলে না। এক জন বললে, 'একবার রামরূপ ধরে যাও না কেন?'

রাবণ বললে, 'রামরূপ একবার হৃদয়ে ধরলে ব্রহ্মপদই তুচ্ছ হয়, পরস্ত্রী তো কোন ছার! তা রামরূপ কি ধরবো!'

'কিন্তু আমি তোমার কে?' গভীর-সরল অন্তরে জিগগেস করলে সারদা।

'তুমি আমার বিদ্যা। তুমি সারদা, সরস্বতী। তুমি রূপ নিয়ে আসোনি, বিদ্যা নিয়ে এসেছ। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয় তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছ। এসেছ বিদ্যার আলো জ্বালিয়ে। তুমি জ্ঞানদাত্রী।'

অত-শত কি বোঝে সারদা? বুঝে কাজ নেই কানাকড়ি। তার চেয়ে সেবা করি। জ্ঞান বুঝি না, বুঝি ভক্তি, বুঝি সেবা। রামকৃষ্ণের পা টিপতে বসল সারদা।

পা টেপবার পর সারদাকে রামকৃষ্ণ প্রণাম করল।

ও কি! ছি! সর্বাঙ্গে কুণ্ঠিত হল সারদা। বললে, 'আমি তোমার দাসী।'

'তুমি আমার আনন্দময়ী। যে মা মন্দিরে আছেন তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন। তিনিই সম্প্রতি আছেন নবতে আর তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। তুমি কি শুধু এই ঘরের মধ্যে আছ? তুমি আছ আমার বিশ্বব্যাপিনী হয়ে।'

॥ ৪৪ ॥

'মন রে, চেয়ে ছাখ। দেখছিস?'

বড় তক্তপোশটিতে বসে আছে রামকৃষ্ণ। একসঙ্গে লাগানো ছোট খাটটিতে শুয়ে আছে সারদা। শুয়ে আছে লজ্জায় জড়সড় হয়ে। আগাগোড়া গা ঢেকে। শুধু পদতল দুটি অনাবৃত। পদ্মদলের মত পদতল। তাতে পদ্মরাগের আভা।

ঘরে দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। দরজায় খিল দেওয়া।

থমথম করছে নিশুতি মধ্যরাত। এটা বসন্ত কাল না? "ঋতূণাং কুসুমাকরঃ"—সেই মধু-ঋতু না এখন? দক্ষিণেশ্বরের বাগানে গন্ধাদ-গন্ধ ফুল ফুটেছে অনেক। গঙ্গার উপরে বাতাস মন্থর হয়ে এসেছে।

'ছাখ চোখ ভরে। দেখছিস?'

ঘরের কোণে প্রদীপ জ্বলছে না একটা? জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েনি? দেখতে পাচ্ছিস না তোর অনুভূতির অন্তর্গূঢ় অন্ধকারে!

'পাচ্ছি।'

'কী দেখছিস?'

'একটি অমল ও অনুপম সৌন্দর্য। একটি অনাঘ্রাত কুসুম। একটি সর্বতোমুখী শ্রী।'

'চোখে কাব্যের অঞ্জন লাগিয়ে দেখতে হবে না। চেয়ে ছাখ চর্মচক্ষে। কী দেখছিস?'

'একটি উদ্ভিন্নযৌবনা নারী। লাবণ্য-ঊর্মিলা স্রোতস্বতী।'

'শুধু তাই?'

'স্বাস্থ্য সারল্য আর পবিত্রতার সমাবেশ। অস্পৃষ্ট, অনুপভুক্ত। বিরজ-বিশুদ্ধ বিশদ-বিশোক।'

'কে হয় বল দেখি তোর?'

'স্ত্রী হয়। যার সম্বন্ধে কোনো নিষেধ নেই, নিবারণ নেই। বরং যার পক্ষে শাস্ত্র, যার পক্ষে সংসারসৃষ্টি।'

boiRboi.net

'সেই স্ত্রী আজ তোর নিভৃত শয্যায় এসে শুয়েছে। যে বেষ্টন করে দীপ্তি পায় সে-ই স্ত্রী। যাতে নতুন করে নিজেকে জন্মগ্রহণ করানো যায় সে-ই জায়া। চেয়ে ছাখ। সদ্য-প্রাণকরা স্ত্রী। এ সম্পূর্ণ তোর। তোর আয়ত্তের মধ্যে।'

'দেখছি। অনিন্দ্যকান্তি। অপরূপ-সুন্দর।'

'হ্যাঁ, একেই বলে স্ত্রী-শরীর।' রামকৃষ্ণ মনের কাছে আরো উন্মুক্ত হল। বললে, 'লোকে বলে এর চেয়ে ভোগ্য এর চেয়ে উপাদেয় কিছু আর নেই পৃথিবীতে। কি, গ্রহণ করবি?'

'কিন্তু—' উন্মনা মন বিমনা হয়ে রইল।

'হ্যাঁ, তবে ঐ দেহেই যদি আবদ্ধ হয়ে থাকিস তবে আর সচ্চিদানন্দঘন ঈশ্বরকে পাবি না। ছাখ বিবেচনা করে। নারী চাস না নারায়ণী চাস?'

মন খুঁতখুঁত করে। তৃষ্ণার কুয়াশা সঞ্চিত হতে-না-হতেই জেগে ওঠে বৈরাগ্যের ত্বিষাম্পতি। বললে, 'কিন্তু কাম ভোগ করে কি কামের নিবৃত্তি হবে?'

'তা হবে না। সেই জানিস না যযাতি কী বলেছিল? পুত্রের যৌবন চেয়ে নিয়েও তার কামের উপশম হল না। ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। যতই আহুতি ততই আকৃতি।'

'আর ঈশ্বরানন্দ?'

'ঈশ্বরানন্দ! এখানেও যত পান তত পিপাসা। তফাৎ এই, ওখানে ক্ষয়, গ্লানি, ক্লান্তি, খেদ, আর এখানে নিরংশ, নিরন্তর, নিরতিশয় আনন্দ। সেই যা বলেছিস বিরজ-বিশোক, বিশদ-বিশুদ্ধ—'

'আমি ঈশ্বরানন্দ চাই।' মন মুখ ফেরাল।

'দেখিস, ভাবের ঘরে চুরি করিস নে। পেটেমুখে এক হ। মুখে বাহাদুরি মারবি আর পেটে খিদে থাকবে তা হতে পারবে না। যদি চাস সোজাসুজি টেনে নে স্বচ্ছন্দে। তোর হাতের নাগালের মধ্যেই তো আছে। আছে তোর অধিকারের গণ্ডিতে। লুকোচুরির দরকার নেই।'

মন উসখুস করে উঠল। সারদার অঙ্গ স্পর্শ করবার জন্যে হাত বাড়াল রামকৃষ্ণ। সেই উদ্যতিতেই মন বেঁকে বসল। ধীরে-ধীরে কোথায় ডুব দিল অতলে। লীন হয়ে গেল আত্মস্বরূপে। দেহমনোহীন অনাদ্যন্ত সচ্চিদানন্দে।

যে হৃদয়োৎসবরূপা সমানমনোরমা, সে কি এতই অল্প, এতই লঘু, এতই সহজ-লভ্য? তাকে আমি কী মূল্য দিলাম, তার পরীক্ষা হবে কিসে? তাকে আমি কোথায় এনে প্রতিষ্ঠিত করলাম—তাতে। তার মূল্যেই আমি মূল্যবান। তার সম্বন্ধেই আমি মহনীয়।

ধড়মড় করে উঠে বসল সারদা। কে যেন তাকে তুলে দিলে জোর করে।
এ কি! তিনি এখনো শোননি? বিছানার উপরে ঠায় বসে আছেন? বসে আছেন নিশ্চল, নিঃসংজ্ঞ হয়ে। রাত এখন কটা হল না-জানি। কতক্ষণ এমনি বসে থাকবেন! ভোর হতে বাকি কত?
এমন ভাবারূঢ় কূটস্থ মূর্তি আর দেখেনি সারদা। তার ভয় করতে লাগল। জ্যোতিঃপুঞ্জময় দিব্যমূর্তি স্পর্শ করতে তার সাহস হয় না। কিন্তু কি করে এই ভাব ভাঙাবে রামকৃষ্ণের? কি করে নিয়ে আসবে তাকে তার স্বচ্ছস্বাভাবিকতায়? এমনি বসে থেকে-থেকেই চলে যাবেন নাকি শেষকালে?
ব্যস্ত হয়ে ঘরের বার হল সারদা। ঝি কালীর মাকে কাছেই পাওয়া গেল। আকুল হয়ে বললে, 'শিগগির ভাগ্নেকে ডেকে আনো। উনি যেন কেমন হয়ে গিয়েছেন।'
কালীর মা গিয়ে ডাকাডাকি করে তুললে হৃদয়কে।
কেমন আর হবেন! ভাবের ঘরে বাস করেন, ভাবের ঘোরে ভব হয়ে গিয়েছেন। নিজে ভবানী হয়ে এত ভাবিনী হবার কি দরকার!
হৃদয় গিয়ে রামকৃষ্ণকে নাম শোনাতে বসল।
যে নামে টান, সেই নামে জ্ঞানে। আবার সেই নামেই পরিত্রাণ।

'আমার প্রাণ-পিঞ্জরের পাখি, গাও না রে,
ব্রহ্মকল্পতরুশাখে বসে রে পাখি, বিভুগুণগান গাও দেখি,
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সুপক্ক ফল খাও না রে॥'

কাশীপুরের মহিমাচরণ চক্রবর্তী ঠাকুরের ভক্ত। কিন্তু পাণ্ডিত্যাভিমানই সব পণ্ড করেছে। ভক্তির চেয়ে শাস্ত্রের প্রতি বেশি পক্ষপাত। খুব পড়াশোনা করেছে এমনি একটা ভাব দেখাতে সদা-ব্যস্ত। ইংরিজি আর সংস্কৃত বুকনি সর্বদা তার মুখে ফুটছে। শব্দাড়ম্বরের প্রতি তার মুগ্ধ দৃষ্টি। সে এক ইস্কুল করেছে, তার নাম প্রাচ্য-আর্য-শিক্ষা-কাণ্ড-পরিষৎ। তার ছেলের নাম রেখেছে মৃগাঙ্কমৌলি পতিতুণ্ডি। হরিণের নাম রেখেছে কপিঞ্জল। আর তার গুরুর নাম আগমাচার্য ডমরুবল্লভ।
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে আসতে ঠাকুর বলে উঠলেন: 'এ কি! এখানে জাহাজ এসে উপস্থিত! এখানে ছোটখাটো ডিঙি-টিঙি আসতে পারে। এ যে একেবারে জাহাজ!'
এ শুধু তার পণ্ডিতম্মন্যতার প্রতি কটাক্ষ। সকলে হেসে উঠলেও মহিমাচরণ হয়তো খুশিই হল। সে নৌকো নয়, সে জাহাজ!

এ জাহাজকে সহজ করে দিতে চাইলেন ঠাকুর। বললেন, নাম করো। নাম করলে অহঙ্কার দূরে যাবে। পাণ্ডিত্যের বাইরে সুধাভাণ্ডটিকে দেখতে পাবে তখন।

গেরুয়া আর রুদ্রাক্ষ পরে একেক দিন চলে আসে মহিমাচরণ। বাঘের ছাল পেতে বসে পঞ্চবটীতে। রুদ্রাক্ষের মালা ফিরিয়ে জপ করে। কখনো একটা তানপুরা নিয়ে গান গায়। যেন কত বড় একজন তন্ময় সাধক।

বাড়ি যাবার আগে বাঘের ছালটি ঠাকুরের ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখে।

'এ কেন রাখে জানিস? দেখলেই লোকে জিগগেস করবে এ বাঘের ছাল আবার কার! তখন আমি বলব, মহিমাচরণের, আর তাতেই ওর মান বাড়বে!'

কেবল নিজের নাম, নিজের মান। ওরে, তাঁর নাম কর। তাঁর মান রাখ। তাঁর নামেই বন্ধনমোচন হবে। বটের বীজ দেখেছিস? লাল শাকের বীজের চেয়েও ছোট। তা, ভগবানের নামের বীজ কতটুকু? হয় একটি অক্ষর নয় দুটি অক্ষর। তা থেকেই কালে ভাব, ভক্তি, প্রেম—কত কি!

সেই নামের মন্ত্রই দিলেন মহিমাচরণকে। সহজ হবার সহজ নিয়ম। মুক্ত হবার সরল সূত্র।

'শুধু এগিয়ে পড়ো। আরো এগোও। পাবে চন্দন কাঠ, কিন্তু ওখানে থামলে চলবে না, আরো এগোও। পাবে রূপোর খনি, থামলে চলবে না, আরো এগোও। তার পরে, সোনার খনি, পাবে হীরে-মানিকের খনি—তবু থামা নেই। এগিয়ে পড়ো। এহ বাহ্য, আগে কহ আর—'

মহিমাচরণ কাতর স্বরে বললে, 'আজ্ঞে, টেনে রাখে যে। এগুতে দেয় না।'

'কেন, লাগাম কাটো। ঘোড়া ছুটিয়ে দাও।'

'কি ভাবে কাটব?'

'শুধু তাঁর নামের গুণে কাটো। কালীর নামে যে কালপাশ কাটে।'

আর কিছু নয়, শুধু তাঁর নাম করো। একটু স্থির হয়ে বসে তাঁকে স্মরণ করো, আহ্বান করো।

যে নাম-দাতা সেই আবার নাম-শ্রোতা। হৃদয় নাম শোনাতে লাগল। ভাবভূমি থেকে সারা রাত আর নামল না রামকৃষ্ণ। নামধ্বনিতে সমাধি ভাঙল শেষকালে। প্রভাতের সীমানায় এসে।

সারদাকে কাছে ডেকে নিল রামকৃষ্ণ।

'একা-একা ঘরে আমাকে অমনি কাঠ হয়ে বসে থাকতে দেখে তোমার খুব ভয় করছিল, না?'

তা আর বিচিত্র কি! কোথায় শান্তিতে একটু ঘুমুবে, তা নয়, তোমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আসলে ভয় নয়, আসলে আনন্দ!

'শোনো, আরো অনেক রকম হয়তো ভাব হবে রাত্রে। ভয় পাবে না। কোন ভাবে কোন মন্ত্র শুনিয়ে আমার বাহ্যজ্ঞান আনতে হবে তোমাতে সব শিখিয়ে দিচ্ছি।' সারদা যেন ভরসা পেল।

কিন্তু, জানো, ভাব ছাড়া লাভ নেই। 'সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে? হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে।' আমি লোহা, তিনি চুম্বক। তিনিই আমাকে ধরেছেন। মর্ত্যশয়ন থেকে নিয়ে যাচ্ছেন সেই অনন্তশয়নে। যেখানে অনন্তনাগের উপরে বিষ্ণু শয়ান।

॥ ৪৫ ॥

শুধু প্রথম রাত্রি নয়, প্রতি রাত্রি।

ঘোমটাতে মুখখানি ঢেকে সর্বাঙ্গে কুণ্ঠিত হয়ে নিঃশব্দে শুয়ে থাকে সারদা। শুয়ে থাকে তরলিত সরলতায়। সমর্পিত প্রশান্তিতে। স্পৃহা নেই প্রতিবাদ নেই, প্রতীক্ষা করে আছে ধৈর্যের মত, তিতিক্ষার মত। তপস্যার মত।

নিদ্রাহীন নিশীথ ঝাঁ ঝাঁ করছে। শোনা যাচ্ছে গঙ্গার কলস্বর।

হাত বাড়িয়ে ধরলেই হয়। টেনে নিলেই হয় আলিঙ্গনে। বৃন্ত থেকে কুসুম-চয়নে এতটুকু কণ্টক নেই। স্নানাবতরণে নেই এতটুকু পদস্খলন।

কিন্তু আমি তো জৈব প্রয়োজনে নয়, আমি দৈব প্রয়োজনে। আমি ষোলো আনা করলে মানুষে যদি এক পয়সা করে।

তাই বলে গোঁ ধরে কিছু করে না। করে না কোনো অন্ধ একরোকামি। সদসৎ বিবেচনা ক'রে করে। সারাক্ষণ মনের সঙ্গে চলে কঠিন বোঝাপড়া। চলে জটিল বাদানুবাদ, সূক্ষ্ম বিচারমীমাংসা। মনকে সম্পূর্ণ ছুটি দেয়, নিষ্ঠুর হাতে তার টুঁটি টিপে ধরে না! বল না কি বলবি, যা না কোথায় যাবি, নে না যা তুই চাস। কিন্তু তার আগে আমার পাশে বোস একটু শান্ত হয়ে। আমার সঙ্গে দুটো কথা ক। গোয়ারের মতন অমন গোঁজ হয়ে থাকিস নে। স্ফূর্তি করে তুই কর আমার সঙ্গে। মামলায় যদি তুই জিতিস আমাকে তুই বেঁধে নিয়ে যাস জেলখানায়। জানি, তুই কি বলবি। কিন্তু কত দিন ধরে করতে পারবি এই দেহস্তব, তাই শুধু আমাকে বল। লতাপাতাঘেরা শান্তশীতল মাটির কুটিরে যে যেতে চাস তার মাধুর্য কি আমি জানি না? কিন্তু তার চেয়ে—তাকিয়ে ছাখ দেখি এই রাত্রির আকাশের দিকে, এই অবিচ্ছিন্ন অন্ধকারের দিকে,—এই মহামৌনের মধ্যে ঈশ্বরের

মন্দিরটি কি বেশি রমণীয়, বেশি মোহনীয় নয়? আর কী তুই চাস এই শ্মশান-নাট্যের রঙ্গশালায়? যুবতীর চর্ম-মাংস-রক্ত-বাষ্প? যোগবাশিষ্ঠ পড়িসনি? রামচন্দ্র কী বলছেন? বলছেন যুবতীর চর্ম-মাংস-রক্ত-বাষ্প যদি আলাদা-আলাদা করে রেখে সৌন্দর্য দেখতে পাও, তবে দেখ তাই একদৃষ্টে। নইলে মিছে আর কেন মুগ্ধ হওয়া?

জোয়ারের জলের মতন এই যৌবন। অল্পোচ্ছ্বসিত, অচিরস্থায়ী। কিন্তু ভুবন-ব্যাপী এই ঈশ্বরসিন্ধু। এ চিরকাল সমানস্রোত, অচ্ছিন্নপ্রবাহ। বল, স্নানের জন্যে কোন ঘাটে তুই অবতরণ করবি?

তোর উপরে আমি জোর খাটাতে চাই না। তুই জাগ্রত, বুদ্ধিমান, কুশাগ্রতীক্ষ্ণ। তুই নিজেই হিসেব করে ছাখ। ক্ষয়দ্বারে যাবি, না, যাবি অক্ষয় মন্দিরে?

বুদ্ধদেবের সংসারত্যাগের আগে কতগুলি সুন্দরী যুবতী এসেছিল তাঁকে প্রলুব্ধ করতে, প্রতিনিবৃত্ত করতে। দীর্ঘ রাত প্রমোদোৎসবে মাতামাতি করে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে এতক্ষণে। তাদের দিকে তাকালেন বুদ্ধদেব। নিদ্রার বিকৃতিতে কী কুৎসিত দেখাচ্ছে মেয়েগুলোকে। বুদ্ধদেব দেখলেন এ তো শ্মশান, এখানে আবার প্রমোদলীলা কোথায়!

মন, তাই বলি, তুই কি এক বেলার কাঙালীভোজনে যাবি, না, যাবি চিরন্তন অমৃতের নিমন্ত্রণে?

ভিক্ষু মহাতিস্স পর্বতচূড়ায় বসে তপস্যা করেন। পাহাড় থেকে নেমে সেদিন চলেছেন অনুরাধাপুর গ্রামের দিকে। সেই গ্রামের এক সুন্দরী যুবতী স্বামীত্যাগ করে সেদিন পথে বেরিয়েছে। সহসা দেখা হল সেই সৌম্যদর্শন ভিক্ষুর সঙ্গে। যুবতী বিলোল কটাক্ষ করে মদির অধরে হেসে উঠল। ভিক্ষু তাকালেন তার দিকে। দেখলেন বিকশিত মল্লিকার মত সুন্দর দন্তপঙ্‌ক্তি। কিন্তু মনে হল যেন কঙ্কালের হাসি। এক অস্থিসার কঙ্কাল তাঁর দিকে চেয়ে বিকটবদনে হাসছে।

কিছুক্ষণ পরে সেই যুবতীর স্বামীর সঙ্গে দেখা। স্বামী জিগগেস করলে, 'এই পথে কোনো নারীকে আপনি দেখেছেন?'

'নারী?' ভিক্ষু উদাসীনের মত বললেন, 'নারী না, পুরুষ বলতে পারব না। দেখলাম একটা কঙ্কাল হেঁটে যাচ্ছে।'

মন, বল, নারীকে কঙ্কালে নিয়ে যাবি, না, তাকে মনোময়ী প্রতিমা করে বসাবি হৃদয়ের পদ্মাসনে?

যুবতীর মাথার খুলিটি একবার কল্পনা কর। সেই তো তোর মহামোহের ফাঁদ।

কিন্তু সেই যে মুখারবিন্দ সে এখন কোথায়? কোথায় সেই অধরমধু? কোথায় সেই আয়ত কুটিল কটাক্ষ? কোথায় সেই দন্তরুচিকৌমুদী? কোথায় বা সেই মঞ্জুগুঞ্জ আলাপন? কোথায় বা সেই মদনধনুর মত ভঙ্গুর ভ্রূবিলাস? এই ক্ষরোটির বাটিতে তুই আর কী মদিরা পান করবি?

মন, শোন, একটু অমৃত-মদ খাবি? পাত্র খুঁজছিস? খুরি-খুলি লাগবে না। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই সেই অমৃতের ভাণ্ড।

রামকৃষ্ণ আবার সমাধিতে বিলীন হল।

নিশুব্ধতারও বুঝি ডাক আছে। সেই মৌনের ডাকে জেগে উঠল সারদা।

দেখল যেন কর্পূরগৌর মহাদেব বসে আছেন। পর্বতের মধ্যে মহামেরু. সরোবরের মধ্যে মহাসাগর।

তুমি সর্বধাত্রী ধরিত্রী। আমি ঋত, সত্য, ধৈর্য, শ্রেয়, শৌচ, সন্তোষ। তুমি দয়া ক্ষমা নীতি কান্তি লজ্জা সহিষ্ণুতা। আমি বিগত-বিষয়-রসরাগ। তুমি সর্বরাগস্বরূপিণী।

তুমি দিব্যাম্বরা. আর আমি দিগম্বর।

ঠিক-ঠিক নামটি মনে আছে সারদার। এই ভাবে কোন মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাই সে নিষ্ঠার সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে উচ্চারণ করতে লাগল। সেই উচ্চারণে মিশল এসে তার ধৈর্যের মাধুর্য, তার সম্মতির স্নিগ্ধতা।

তুমি স্মৃতি তুমি মেধা তুমি বাক্য।

আমি উপলব্ধি আর তুমি উচ্চারণ।

সমাধি ভাঙল রামকৃষ্ণের। ঘোমটা সরিয়ে পরিপূর্ণ চোখে দেখছিল বুঝি সারদা। রামকৃষ্ণের ধ্যান ভাঙতেই ত্রস্ত হাতে মুখের উপর আবার ঘোলটা টেনে দিলে। রামকৃষ্ণ বললে, 'এবার তুমি একটু শোও। রাত পোহাতে এখনো খানিক দেরি আছে।'

কিন্তু এমনি করেই কি কাটবে রাতের পর রাত?

কে একজন স্ত্রীলোক ধরে বসল সারদাকে। 'তুমি কি ন্যাকা না বোকা?'

'কেন, কী হয়েছে?' সারদা অবাক হয়ে রইল।

'তুই কি ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানিস না?' স্ত্রীলোকটি বিদ্রূপ করে উঠল: 'গাঁয়ের মেয়ে বলে কি তুই এমনি আহাম্মক হবি? গাঁয়ের মেয়ে কি আর বিয়ে করে না? স্বামী নিয়ে ঘরসংসার করে না? তাদের ছেলেপুলে হয় না?'

'তা, আমি কী করলাম!'

'তুমি হাঁদী, তুমি আবার কী করবে ? বলি, তোর স্বামীকে কি তুই ভেসে যেতে দিবি ? সংসারে তার মন নেই, সে মন তুই জাগিয়ে দিবি নে ? ভোগের দিকে তাকে টেনে আনবি নে ? তোর কপাল তুই চিবিয়ে খাবি ? ধর্মপত্নী হয়ে এমন অধর্ম ঘটাবি তুই ?'

বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল সারদা। অধর্ম ! তার ঠাকুর তাকে দিয়ে অধর্মের অভিনয় করিয়ে নিচ্ছেন ?

'তা ছাড়া আবার কি ? তোকে বিয়ে করেছে অথচ তোকে তোর সংসারধর্ম করতে দিচ্ছে না, এ তো ঘোরতর অধর্ম ! তুই স্ত্রী হয়েছিস, তুই এবার মা হবি নে ? তুই তোর পাওনা-গণ্ডা ছাড়বি কেন ? স্বামীর কাছ থেকে আদায় করে নিবি ষোলো আনা। বলবি গিয়ে সোজাসুজি—আমি সন্তান চাই। আমি মা হব।'

সরলতার প্রতিমূর্তি সারদা।

রামকৃষ্ণকে সেই রাত্রে বললে তাই সে স্পষ্ট করে। ঘোমটা-ঢাকা মুখের মধ্য থেকে কেমন অদ্ভুত শোনাল কথাগুলি।

'সবাই বলছে, আমার একটাও ছেলেপুলে হবেনি ? বিয়ে হয়েছে আমার, তা নইলে সংসারধর্ম বজায় থাকবে কিসে ?'

কথা শুনে চমকে উঠল রামকৃষ্ণ। সারদার মুখে এ কী কথা !

সারদা উপবাচিকা হয়ে পা টিপতে লাগল রামকৃষ্ণের। ছোট খাটটিতে তার শোবার কথা, বড় তক্তপোশটিতে এসে বসল।

মহামায়ার চাতুরী বুঝতে পেরেছে রামকৃষ্ণ। সে হাসল মনে-মনে। মন্দিরের ভবতারিণীকে উদ্দেশ করে বললে, 'তোর চালাকি ধরতে পেরেছি। তুই এত দিন নিজের মূর্তিতে এখানে ছিলি, আজ তোর কী খেয়াল হল, স্ত্রীর মূর্তি ধরে এলি আমার কাছে। তুই যদি তাই আসতে পারিস আয় আমার কাছে। তুই আসতে পারলে আমার ভয় কী !'

সারদা আড়ষ্ট হয়ে রইল। চকিতে কেমন যেন হয়ে গেল আরেক রকম।

রামকৃষ্ণ বললে, 'তুমি মা হতে চাও ? তা মোটে একটি ছেলে খুঁজছ কি গো ? দেশ-দেশান্তর থেকে তোমার কত ছেলে আসবে, সব মাতৃমন্ত্রে মাতোয়ারা। তুমি যে তখন মা-ডাকে তিষ্ঠোতে পারবে না।'

সারদার মুখে আর কথা নেই। দেহে আর দেহবোধ নেই।

ঠিকই হয়েছে। মহামায়া ঠিক ভারটিই এনে দিয়েছেন তোমার মধ্যে। তুমি জীবের জননী হবে। যে বিশ্বজনের জননী হবে তার মধ্যে এই সন্তানকামনাটি

না এলে চলবে কেন? তোমার তো এ শুধু দেহসুখের ছলনা নয়, তোমার এ শুধু মাতৃত্বভাতি। ঈশ্বরের এই সংসারে, এই পরমানন্দের মন্দিরে, তুমি লীলালাবণ্যকল্যাণী শ্রীমতী মাতা।

সারদা সরে গেল নিজের খাটে। আত্মানন্দে ঘুমিয়ে পড়ল।

রাতের পর রাত চলতে লাগল এই রতিহীন বিরতির পরীক্ষা। এই বিরতি দিয়ে ঈশ্বরের আরতি।

একেই বলে সহজ-অটুট অবস্থা। সহজ, কেননা স্বস্থানে নিয়তস্থিত; আর অটুট, কেননা ব্রহ্মচর্য থেকে বিচ্যুতি নেই এই এক বিন্দু।

এ হচ্ছে সেই অবস্থা—'রমণীর সঙ্গে থাকে না করে রমণ'।

ঈশ্বর দর্শন হলে রমণ-সুখের কোটি গুণ আনন্দ হয়। গৌরীচরণ বলত, মহাভাব হলে শরীরের রোমকূপ পর্যন্ত মহাযোনি হয়ে যায়। একেকটি রোমকূপে আত্মার সহিত মহারমণ হয়।

পতঞ্জলি বলেছে, ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠাতেই বীর্য লাভ। যার বীর্য আছে তারই ভক্তি আছে। যার বীর্য আছে তারই আছে বজ্রবন্ধন। তারই আছে অনন্যচিত্ততা। রামকৃষ্ণ উত্তীর্ণ হল সেই বীর্যের পরীক্ষায়। সেই স্থৈর্যের পরীক্ষায়।

"রাঁধুনী হইবি ব্যঞ্জন রাঁধিবি হাঁড়ি না ছুঁইবি তায়,
সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি সাপ না গিলিবে তায়।
অমিয় সাগরে সিনান করিবি কেশ না ভিজিবে তায়॥"

উত্তীর্ণ হলেন সেই নির্বিকল্পের সাধনায়।

তুমি বীর্যবতী বিদ্যা। তুমি বলবতী মেধা। তুমি ধারণাবতী স্মৃতি।

সারদাকে ডেকে তুলল রামকৃষ্ণ। বললে, 'তোমাকে আবার সেই কথা জিগগেস করছি, সারদা! তুমি কি আমাকে সংসারপথে টেনে নিতে চাও?'

'না।' সারদা বললে, 'তোমাকে তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে চাই।'

'বেশ।' তৃপ্তির প্রসাদে বুক ভরে গেল রামকৃষ্ণের। বললে, 'এবার তবে ঘুমোও নিশ্চিন্ত হয়ে।'

কতক্ষণ পরে আবার ডেকে তুলল সারদাকে। বললে, 'সত্যি করে বলো তো, তোমার কী মনে হয়, আমি কি তোমাকে ত্যাগ করেছি?'

'বা, তা কেন মনে হবে? আমাকে তুমি গ্রহণ করেছ।' শান্ত সমর্পণে ঘুমুল সারদা। এ অর্পণ কে বলে? এ অর্চনা।

রামকৃষ্ণ বললে, তুমি বাণী। তুমি কল্পনা। তুমি আমার নামস্বাদময়ী ভিক্ষা। যোগেন-মা বড়লোকের ঘরের বউ, কিন্তু সংসারের জ্বালায় বড় জ্বলছে। তাপ-

হরণের খবর পেয়ে সটান চলে এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। রামকৃষ্ণ তাকে স্থান দিলে। বললে, সারদার কাছে যাও। শান্তির স্পর্শটি ওর কাছে।

দুদিনেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল যোগেন-মা। যেখানে একনিষ্ঠ সেখানেই ঘনিষ্ঠ! তার কাছে সারদা আক্ষেপ করল, 'ওঁর কেমন ভাব হয় দেখলে!'

'দেখলুম।'

'আমার ইচ্ছে হয় আমারো এমনি ভাব হোক। তুমি ওঁকে গিয়ে একটু বলবে?'

'কি বলব?' যোগেন-মা তো অবাক।

'যাতে আমাকে একটু ভাব-টাব দেন। আমার নিজের বলতে বড় লজ্জা করে।'

একা তক্তপোশে বসে আছে রামকৃষ্ণ, যোগেন-মা প্রণাম করে দাঁড়াল এক পাশে। সারদা কি বলেছে বললে সরলের মত।

রামকৃষ্ণ কথা বলল না। গম্ভীর হয়ে রইল।

নহবতে ফিরে এল যোগেন-মা। দেখল সারদা পূজায় বসেছে। সন্তর্পণে দরজাটা একটু ফাঁক করল। দেখল আপন মনে হাসছে সারদা। কতক্ষণ পরেই আবার দরবিগলিতধারে কান্না! কতক্ষণ পরে একেবারে সমাধিস্থা।

'তবে না তোমার নাকি ভাব হয় না?' সমাধিশেষে সানন্দ কণ্ঠে প্রশ্ন করল যোগেন-মা।

সলজ্জ মুখে হাসল একটু সারদা। বললে, 'কি জানি যোগেন, কেমনতর হয়ে গেল। একটা মহানন্দের মধ্যে গিয়ে পড়লুম। তাঁর ভাবের ঢেউ এসে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তিনি আমার চর্মস্পর্শ করেননি বটে, কিন্তু তিনি যে আমার মর্মস্পর্শ করেছেন।'

তুমিই নিতে পারবে আমার ভাব। তুমিই ভবভয়শমনী সর্বসিদ্ধিপ্রদাত্রী।

॥ ৪৬ ॥

আর আমাকে ছলনা করিস নে মা। আমি তো কামজয় করেছি, কিন্তু ওর মধ্যে কামভাব আনিস নে।

আকুল হয়ে প্রার্থনা করে রামকৃষ্ণ। ও যদি কামময়ীকামিনী হয়ে ওঠে তা হলে, কে জানে আমার এই তেজ-বীর্য ধুয়ে যাবে কি না। কে জানে, সংযমের বাঁধ ভেঙে জাগবে কি না দেহবুদ্ধি।

তাই মা, আমি তোর দুয়ার ধরে পড়ে আছি, আমাকে কৃপা কর। সারদাকে তুই সারভূতা করে দে। আমি যদি মা প্রেম, সারদা পবিত্রতা!

সংসাররঙ্গমঞ্চে এ কী অদ্ভুত প্রার্থনা! নবীনযৌবনা স্ত্রীকে সামনে রেখে এক জন

সমর্থ-সুস্থ বীর্যবান যুবকের অসাধারণ আরাধনা! আমার স্ত্রীকে কামমোহিনী করিস নে, কালমোহিনী করে দে।

আমি আর কিছু চিনি না। আমি শুধু তোকে চিনি। 'আমার মা আছেন আর আমি আছি।' আমাকে কে টলায়? 'ঝড়ে গাছ নড়ে যত, তরু বদ্ধমূল তত।' মা কৃপা করলেন। ধরা দিলেন সেই ঘরে এসে। ধরা দিলেন সারদার মধ্যে। লবকুশ হনুমানকে খুব কষে বাঁধলে দড়ি দিয়ে। ছোট্টটি হয়ে হনুমান বাঁধন নিলে সর্বাঙ্গে। দেখে লবকুশের মহাখুশি। মহাবীর ধরা পড়েছে।

তখন হনুমান বললে :

'ওরে কুশীলব করিস কি গৌরব
ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে?'

কৃপা করে মা-ই ধরা দিয়েছেন। করালেনও তিনি, পাওয়ালেনও তিনি। তিনিই সারদার মধ্যে দেখালেন জগদীশ্বরীকে।

আট মাস এক শয্যায় রাত কাটাল দুজনে। সে এক বিচিত্র সাধনা। শবসাধনার চেয়ে ভীষণতরো কঠিনতরো সাধনা—এই সজীব সাধনা। আগুন যত জ্বলে ঘি তত জমাট হয়। সূর্য যত জ্বলে তত সংহত হয় তুষার। চন্দ্র যত পূর্ণ হয় তত শান্ত হয় সমুদ্র। এ এক অভিনব সাধনা। শবসাধনা নয়, নব সাধনা।

'আমার অন্তরে আনন্দময়ী সদা করিতেছেন কেলি,
আমি যে ভাবে সে ভাবে থাকি নামটি কভু নাহি ভুলি।
আবার দু আঁখি মুদিলে দেখি অন্তরেতে মুণ্ডমালী॥'

সাধন-শেষে রামকৃষ্ণ ঠিক করল সমারোহে একবার কালীপুজো করব। জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যা—১২৮০ সাল—ফলহারিণী কালীপুজোর দিন। সেই দিনটিই প্রশস্ত।

কিন্তু কালীপুজো মন্দিরে হবে না। কালীর যে 'গুপ্ত ভাবে আপ্তলীলা।' তাই তার পুজোও হবে গুপ্ত ভাবে। রামকৃষ্ণের নিজের ঘরে।

পুজো হবে স্ত্রীর। ষোড়শীরূপিণী সারদার।

'মা বিরাজে ঘরে ঘরে
জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে?'

মন্দিরে জাঁকজমক করে মামুলী পুজো হচ্ছে। সে পুজোর পূজারী হৃদয়। তাই নিয়ে সে শশব্যস্ত। রামকৃষ্ণ বললে, 'এ দিকে একটু দৃষ্টি রাখিস।'

ঠিক আছে। সব যোগাড়যন্ত্র করে দিয়েছে হৃদয়। দীনু বলে একটি ছেলে, জ্ঞাতিসম্পর্কে ভাই-পো হয়, রাধাগোবিন্দের মন্দিরে পুজো করে, ফুল-বেলপাতা

যোগাড় করে আনলে। জিগগেস করলে, এ কেমনতরো পূজা?

রামকৃষ্ণ বললে, 'এ রহস্যপূজা।'

রাত নটা। কালীবাড়িতে নানা গান-বাজনা হচ্ছে, সর্বত্র হৈ-রৈ। রামকৃষ্ণের ঘর বন্ধ। রামকৃষ্ণ অনুপস্থিত।

তার খোঁজ আর কে নেয়!

সারদাকে বলা ছিল আগের থেকে। যেমন-কে-তেমন সাধারণ বেশে মুখে ঘোমটা টেনে রাত নটার সময় ঠিক এসে ভেজানো দরজায় ঘা দিলে। রামকৃষ্ণ তাকে এনে বসাল পিঁড়ির উপর।

পিঁড়ির উপরে আলপনা-আঁকা। সামনে-পাশে পূজার সমস্ত উপকরণ সাজানো। রামকৃষ্ণ বললে, 'বোসো। পশ্চিমমুখো হয়ে বোসো।' বলতে-বলতেই বন্ধ করে দিল দরজা।

রামকৃষ্ণের তক্তপোশের উত্তর পাশে গঙ্গাজলের যে জালা ছিল তার দিকে মুখ করে বসল সারদা। রামকৃষ্ণ বসল পুবমুখো হয়ে। যেখানে পশ্চিম দিকের দরজা তার কাছে।

প্রথমে সারদার পায়ে আলতা পরিয়ে দিল রামকৃষ্ণ। কপালে-মাথায় সিঁদুর মাখিয়ে দিল।

স্পর্শনেই সারদার অর্ধবাহ্যদশা হয়ে গেল।

তার পর পরনের শাড়ি ছাড়িয়ে নিয়ে পরিয়ে দিল নববস্ত্র। থালায় করে মিষ্টি দিল খেতে। বললে, খাও। খাবার পরে পান দিল মুখে।

যোড়শোপচারে পূজা হচ্ছে 'ষোড়শীর'। পূজার উপকরণগুলি সংশোধিত হল। মন্ত্রপূত জল ছিল সামনের কলসে, যথাবিধানে অভিষিক্ত করল সারদাকে। ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ—প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল রামকৃষ্ণ:

'হে কালিকা, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী জননী, হে ত্রিপুরসুন্দরী, সিদ্ধিদার উন্মুক্ত করো। এর দেহমন পবিত্র করে এতে আবির্ভূত হও, এতে বিরাজিত থাকো। জগৎসংসারের সর্বকল্যাণকরণ সম্পূর্ণ করো।'

হে কপালিনী, আমাকে ভার্যা দাও মনোরমা। শুধু মনোরমা নয়, মনোবৃত্তি-অনুসারিণী। আমি যদি ভাবাতীত হই, ও-ও হোক তদ্ভাবভাবিত। আমাদের দৈহিক বিবাহ নয়, আত্মিক বিবাহ। আমাদের আত্মানন্দ।

পূজার চরম উপচার প্রণাম। জপ ধ্যান প্রার্থনা উপাসনা—সমস্ত কিছুই এই শেষ প্রণামটির জন্যে। এ প্রণিপাতটিই শেষ অর্ঘ্য। রামকৃষ্ণ বিল্বপত্রে নাম লিখল। আগে-আগে যত সাধন-ভজন করেছে তার সব বেশবাস তোলা ছিল সযত্নে—

তাই নামিয়ে একসঙ্গে করলে। রুদ্রাক্ষের মালা, কবচ, যা কিছু সাজ-সরঞ্জাম ছিল, তাও বাদ দিলে না। সকল আবরণ-আভরণ, সকল সাধনসিদ্ধির ধন একত্র করে সারদার পায়ে অঞ্জলি দিলে। বললে, 'যত জপ-তপ সাধন-ভজন যত আচার-বিচার, যত কর্মকাণ্ডের মালা—সব তোমার দুটি পায়ে অর্পণ করলাম। এ পূজাতেই আমার সমস্ত পূজার ইতি হল।'

বলে সারদাকে প্রণাম করল রামকৃষ্ণ।

সারদা দেখছে সব চোখ মেলে। কিন্তু সাড় নেই, মুখে কথা ফুটছে না।

মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ী করেছিল এক দিন। আজ আবার অপ্রমেয়াকে প্রতিমায় নিয়ে এল।

সারদা শঙ্খকঙ্কণধারিণী লোকমাতা।

'হে সর্বমঙ্গলস্বরূপা সর্বার্থসাধিকা, হে শরণদায়িনি ত্রিনয়নী, সনাতনী নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম।'

আত্মনিবেদন করে রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হয়ে গেল।

রাত্রি প্রায় তিন প্রহর, ধ্যান ভাঙল রামকৃষ্ণের। সারদা তখনো নিশ্চল হয়ে বসে আছে পিঁড়িতে। তদ্গত তন্ময় হয়ে।

রামকৃষ্ণ বললে, 'পূজা শেষ হয়েছে। এবার যেতে পারো নবতে।'

সারদা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল পিঁড়ি ছেড়ে। উঠেই নবতের দিকে ছুট দিলে। একটা প্রণাম করে আসা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারল না। ছি, ছি, নিশ্চয়ই ঠিক ছিল। মনে-মনে তাই এখন প্রণাম করলে রামকৃষ্ণকে। পূজ্য-পূজকে ভেদ নেই সেই ভাবাতীতের রাজ্যে।

লক্ষ্মী বললে, 'তোমার এত লজ্জা, তুমি কাপড় পরাতে দিলে কি গো!'

'কি জানি, আমি তখন যেন কি রকম হয়ে গিয়েছিলুম!'

'তার পর উনি তোমাকে মিষ্টি খাওয়ালেন, পায়ে ফুল দিলেন, হাত দিলেন, তুমি ঠায় বসে রইলে?'

'কি জানি বাপু, বসে রইলুম। সব দেখছি বটে, কিন্তু কথা বলতে পারছি না, নড়তে-চড়তে পারছি না।'

'আর কেউ টের পেল না?'

'কি করে পাবে! দরজা বন্ধ যে।'

'তুমি মহাশক্তি। মহাশক্তি না হলে এ পূজা গ্রহণ করে এমন শক্তি কার?'

সেই থেকেই ভাব হয় সারদার।

নবতের ঘরটিতে শুয়ে আছে সারদা, তারই বিছানার এক পাশে যোগেন-মা

BanglaBook.net

ঘুমুচ্ছে। রাত্রে কোথাও হঠাৎ বাঁশি বেজে উঠল।
বাঁশির স্বরে ভাব হল সারদার। যেন সে বেণুবিনোদিনী রাধিকা হয়ে গেছে। থেকে-থেকে হাসতে লাগল আপন-মনে। দেখতে লাগল বুঝি বা সেই বংশী-বটবিহারীকে।
বিছানার এক কোণে তাড়াতাড়ি সরে বসল যোগেন-মা। বসেই রইল যতক্ষণ না ভাব ভাঙে। ভক্তিমতী হলে কি হয়, সংসারের মধ্যে তো আছে, যোগেন-মা ভাবল যদি তার ছোঁয়া লেগে সারদার ভাব কেটে যায়।
সেই ভাবের চরম হল নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে। ছাদে বসে ধ্যান করছিলেন শ্রীমা, পাশে গোপাল-মা, যোগেন-মা বসে। ধ্যানের পর আর সমাধি ভাঙে না শ্রীমা'র। অনেক নাম শোনাবার পর হুঁস যদি বা হল, শ্রীমা উদ্‌ভ্রান্তের মত বলতে লাগলেন, 'ও যোগেন, আমার হাত কই, আমার পা কই? আমি কি করে ঢুকবো এই শরীরের মধ্যে?'
স্ত্রী-ভক্তেরা শ্রীমা'র হাত-পা টিপে দিতে লাগল—এই যে পা, এই যে হাত। তবু, দেহটা যে কোথায় পড়ে রয়েছে, চট করে খুঁজে পাচ্ছেন না।
সারদা চলে গেল নবতে। রামকৃষ্ণ বললে, এবার শান্তিতে ঘুমোও গা মেলে। আমার কাছে থাকতে, আর সারা রাত বসে থাকতে জেগে, কখন কী ভাব হয় আমার আর কখন কী নাম-মন্ত্র বলে আমাকে সচেতন করো! এতে কী কারু সুখ থাকে না শরীর থাকে? তুমি মা'র কাছে নবতে গিয়ে ঘুমোও।
তাই যাব। তুমি যেমন নাচাও তেমনি নাচি। যাব বিরহের মন্দিরে, সেখানেই বিশ্বনাথের আরতি করব। আমার বসন নিয়েছ, তুমি নাও আমার সমস্ত বাসনা।
বিদুরের স্ত্রী স্নান করছে, ঘরের বাইরে কৃষ্ণের ডাক শোনা গেল: বিদুর! বিদুর! কৃষ্ণকণ্ঠের স্বর শুনে বিহ্বল-ব্যাকুল হয়ে বিদুর-পত্নী ছুটে এল গৃহদ্বারে। কিন্তু, কি লজ্জা, ব্যাকুলতায় বসনখানিই ফেলে এসেছে ভুল করে। তখন আর পিছু সরবার পথ নেই, কৃষ্ণের কাছে সে সম্পূর্ণ উন্মোচিতা। কৃষ্ণ তক্ষুনি তার নিজের উত্তরীয় বিদুর-পত্নীর গায়ে ছুঁড়ে দিল। ত্রস্ত হাতে তাই দিয়ে কোনো রকমে গা ঢাকবার চেষ্টা করলে, কিন্তু কৃষ্ণের চেয়ে লজ্জা তার বেশি নয়। কৃষ্ণকে ঘরে নিয়ে এল। কিন্তু কী যে খেতে দেবে ভেবে পেল না। দেখল বাড়িতে শুধু পাকা কলা ছাড়া কিছু নেই। তাই একটা ছিঁড়ে খেতে দিল কৃষ্ণকে। কিন্তু ভাবে-ভক্তিতে এমনি বিবশ হয়ে গিয়েছে যে, কলা না দিয়ে খোসা দিয়ে ফেলেছে। আর তাই কৃষ্ণ খাচ্ছে তৃপ্তি করে। ভক্তের কলা আর খোসা দুই-ই সমান ভগবানের কাছে। আমারও তেমনি ভক্তি, তেমনি প্রীতি, তেমনি ব্যাকুলতা। হয়তো তোমাকে

খোসা দিয়ে ফেলেছি, কিন্তু তুমি সর্বস্বাদগ্রাহী, তুমি দেখ তা ভাবের রসে স্বাদু কিনা।

প্রভু, তুমি যদি নাও, তবেই আমি পূর্ণ হব। তুমি যদি খাও তবেই আমার খিদে মিটবে।

গোলাপ-মা'র ভালো নাম অন্নপূর্ণা। মাঝবয়সী বিধবা। একটি মাত্র মেয়ে মারা যাবার পর দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরের পায়ের কাছে কেঁদে পড়ল।

ঠাকুরের ভাব হল। বললেন, 'তুমি তো মহা ভাগ্যবতী।' গোলাপ-মা থমকে রইল।

'সংসারে যাদের কেউ নেই কিছু নেই ঈশ্বর তো তাদেরই সহায়।'

অশরণের আশ্রয়স্থল তুমি। গোলাপ-মা বসে পড়ল পদচ্ছায়ে।

ঠাকুরের তখন অসুখ, গোলাপ-মা বললে, কলকাতায় তার এক জানাশোনা ডাক্তার আছে, সে নির্ঘাৎ সারিয়ে দিতে পারবে। ছোট ছেলের মত লাফিয়ে উঠলেন ঠাকুর, বললেন, কালই চলো। পর দিন ভোরেই রওনা হলেন নৌকো করে, সঙ্গে গোলাপ-মা, লাটু আর কালী। সারা দুপুর কেটে গেল এই ডাক্তারির ধান্দায়। ফেরবার পথে বেজায় খিদে পেল সবাইকার। সেই কোন সকালে বেরিয়েছে সকলে। এখন দুপুর প্রায় গড়িয়ে গেছে। ঠাকুর জিগগেস করলেন, কারু কাছে পয়সা আছে কি না। কেবল গোলাপ-মা'র কাছে আছে। তাও, চারটি মোটে পয়সা!

তাই সই। ঠাকুর কালীকে বললেন, বরানগরের বাজার থেকে মিষ্টি কিনে নিয়ে আয়।

ঠোঙায় করে তাই নিয়ে এল কালী। কিন্তু, কি আশ্চর্য, কাউকে কিছু না দিয়ে সমস্ত মিষ্টিটা ঠাকুর একাই খেয়ে ফেললেন। তার পরে গঙ্গার জল খেলেন অঞ্জলি ভরে। বললেন, 'আঃ, খিদে মিটল।'

অবাক কাণ্ড। আর তিন জনেরও খিদে মিটে গেল সেই সঙ্গে। কিছু নিল না, খেল না, অথচ কারু খিদে নেই এক ফোঁটা। সেই বন্য ক্ষুধা মুহূর্তে তৃপ্ত হল কি করে?

তুমি কি সেই মহাভারতের কৃষ্ণ? তুমি তৃষ্ণাহর। তুমি তৃপ্তিকর।

নবতের সরু বারান্দায় চিকের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে সারদা। অতৃপ্ত চোখে চেয়ে থাকে যদি কখনো কোনো ফাঁকে দেখা যায় সেই তৃপ্তিকরকে।

রামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি দেখে সারদাকে ঠাট্টা করে হৃদয়। বলে, 'সবাই তো মামাকে বাবা বলছে। তুমিও তবে বাবা বলে ডাকো না।'

এতটুকু রুষ্ট বা অপ্রতিভ হল না সারদা। নিবিড় ভক্তির সঙ্গে গভীর প্রীতি মিশিয়ে বললে, 'উনি বাবা কী বলছ! উনি বাবা মা বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন, সমস্ত। যেখানে, যে সম্পর্কে যতটুকু আনন্দ আছে, সমস্তই উনি। উনি আনন্দময়।'

সেই গান্ধারীর কথা মনে করো :

'ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব॥'

তুমি আমাকে দূরে সরিয়ে রেখেছ, কিন্তু জেনো, আমি তোমার দুয়ারেই পড়ে আছি।

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥

boiRboi.net

boiRbot.net

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

দ্বিতীয় খণ্ড

boiRboi.net

"তুমি সংসারে থেকে ঈশ্বরের প্রতি মন রেখেছ, এ কি কম কথা? যে সংসারত্যাগী সে তো ঈশ্বরকে ডাকবেই। তাতে আর বাহাদুরি কি! সংসারে থেকে যে ডাকে সেই ধন্য। সে বিশমণ পাথর সরিয়ে তবে দেখে।"—**শ্রীরামকৃষ্ণ**

"যস্য বীর্যেণ কৃতিনো বয়ং চ ভুবনানি চ।
রামকৃষ্ণং সদা বন্দে শর্ব্বং স্বতন্ত্রমীশ্বরম্॥
যাঁর শক্তিতে আমরা ও সমুদয় জগৎ কৃতার্থ সেই শিবস্বরূপ স্বাধীন ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণকে আমি সদা বন্দনা করি।"—**স্বামী বিবেকানন্দ**

"শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতবর্ষের সমগ্র অতীত ধর্ম-চিন্তার সাকার বিগ্রহস্বরূপ। যে তাঁকে নমস্কার করবে সে সেই মুহূর্তে সোনা হয়ে যাবে।"—**স্বামী বিবেকানন্দ**

boiRboi.net

সমস্ত সাধনার ইতি করে দিলে রামকৃষ্ণ।

আর পাখা চালিয়ে কী হবে? দক্ষিণ থেকে চলে এসেছে মলয় হাওয়া। আর কী হবে দাঁড় টেনে? বাঁক কাটিয়ে অনুকূল বায়ুতে পাল তুলে দে নৌকোর।

সাধনের প্রথম অবস্থাতেই খাটুনি। তার পরে পেনসন। প্রথমে সিঁড়ি ভাঙা পরে পাহাড়ের চূড়ায় পরেশনাথের মন্দির।

সিদ্ধি-সিদ্ধি বললে কি হয়? সিদ্ধি গায়ে মাখলেও নেশা হয় না। খেতে হয় একটু। দুধে মাখন আছে বললেই কি মাখন হবে? দুধকে দই পেতে মন্থন করো নির্জনে।

'হরিসে লাগি রহ রে ভাই। তেরা বনত বনত বনি যাই।'

'হরিতে লেগে থাকো। লেগে থাকতে-থাকতেই হরি হয়ে যাবে। বলতে-বলতেই হরি ব'নে যাবে।

রামকৃষ্ণ হরি হয়ে গেছে যে আছে সে-ই হয়েছে। এই হওয়া অর্থ থাকাটিকেই প্রকাশিত করা। এর পর আবার সাধন কি?

বাউল বৈষ্ণবেরা বলে, সাঁই। 'সাঁইয়ের পর আর কিছু নাই।'

রামকৃষ্ণেরও আর কিছু নেই। রামকৃষ্ণের পরেও আর কিছু নেই।

বৈষ্ণব বাউলরা একেই বলে সহজ অবস্থা। সহজ অবস্থার দুটি লক্ষণ। প্রথম, কৃষ্ণগন্ধ গায়ে নেই। তার মানে ঈশ্বরের ভাব অন্তরে ওতপ্রোত, বাইরে কোনো চিহ্ন নেই, মুখে হরিনাম পর্যন্ত বলছে না। আর দ্বিতীয়, পদ্মের উপরে অলি বসবে অথচ মধু খাবে না। তার মানে, জিতেন্দ্রিয়, কাম-কাঞ্চনে স্পৃহা নেই। রামকৃষ্ণের এখন সেই সহজ অবস্থা।

অনেক পিত্ত জমলে কষা লাগে, তখন চার দিকে হলদে দেখায়। অনেক ভক্তি জমলে মধু লাগে, তখন চার দিক হরি দেখায়। শ্রীমতী যখন শ্যামকে ভাবলে, সমস্ত শ্যামময় দেখলে। আর নিজেকেও শ্যাম বোধ হল। রামকৃষ্ণ সমস্ত বিশ্ব ঈশ্বরময় দেখল, দেখল সেও ঈশ্বর। পারার হ্রদে শিশে অনেক দিন থাকলে শিশেও পারা হয়ে যায়। রামকৃষ্ণ ভগবানের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে থেকে ভগবান হয়ে গেল। কুমুরে পোকা ভাবতে-ভাবতে আরশুলা নিশ্চল হয়ে যায়, নড়ে না, শেষে তাকে আস্তে-আস্তে কুমুরে পোকাই হতে হয়। রামকৃষ্ণ ব্রহ্ম ভাবতে-ভাবতে ব্রহ্ম হয়ে গেল। যে নিরাকার ছিল সে হয়ে দাঁড়াল নিরাকার।

তার আবার সাধন ভজন কি! হরি আবার কবে হরিনাম করে!

যার খোলা নেমেছে তার আবার জ্বাল কিসের?

কিন্তু খোলা নামবে কখন? এক জন বাউল এসেছে রামকৃষ্ণের কাছে। রামকৃষ্ণ তাকে শুধোল: 'তোমার খোলা নেমেছে?'

বাউল তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে।

'বলি রসের কাজ সব শেষ হয়ে গেছে? যত জাল দেবে তত "রেফাইন" হবে রস। প্রথম আকের রস, পরে গুড়, পরে দোলো, পরে চিনি—তার পর মিছরি—কিন্তু, সিগগেস কবি, খোলা নামবে কখন? অর্থাৎ সাধন করে শেষ হবে?'

বাউল শুনতে লাগল মন্ত্রমুগ্ধের মত।

'যখন ইন্দ্রিয় জয় হবে। তার আগে নয়। যেমন জোঁকের উপর নুন দিলে জোঁক আপনি খুলে পড়ে যায় তেমনি শিথিল হয়ে যাবে ইন্দ্রিয়। তার আগে নয়।'

জাল নিভিয়ে খোলা নামিয়ে বসে আছে রামকৃষ্ণ। সে এখন আকাশের মৌন। সমুদ্রের শান্তি। ধরিত্রীর সমর্পণ।

ওঁকার লক্ষ্য, আত্মা শর আর ব্রহ্ম লক্ষ্য। নির্ভুল চোখে লক্ষ্য ভেদ করতে হবে, তার পর তীরের মুখ লক্ষ্যের সঙ্গে তন্ময় হতে হবে। ব্রহ্ম শরলক্ষ্যমুচ্যতে।

'কিন্তু জানিস, তাঁকে যখন লাভ হয়, তখন আর ওঁ উচ্চারণ করবারও যো নেই। সমাধি থেকে অনেক নিচে নেমে না এলে ওঁ বলতে পারি না।'

শাস্ত্রে যেমন বলা আছে তেমনি দর্শন হয় রামকৃষ্ণের। কখনো দেখে জগৎময় আগুনের স্ফুলিঙ্গ। কখনো দেখে চার দিকে যেন পারার হ্রদ ঝকঝক করছে। কখনো বা গলিত রূপোর স্রোত। কখনো বা গ্রহতারায় রংমশালের ফুলঝুরি। নীলিমাভ্রমের ঊর্ধ্বে কখনো বা অন্তহীন অন্তরীক্ষের শুভ্রতা।

রামকৃষ্ণ এখন একটি অখণ্ড প্রাপ্তি, একটি অখণ্ড প্রত্যুত্তর।

একটি আকাশবিস্তীর্ণ প্রশান্ত শুদ্ধতা।

কিন্তু ব্রহ্ম নিয়ে আমি কতক্ষণ থাকব? ছাদে উঠে আবার সিঁড়িতে নামা। কখনো লীলায় কখনো নিত্যে—যেন ঢেঁকির পাটে ওঠা-নামা করছি। এক দিক নিচু হয় তো আরেক দিক লাফিয়ে ওঠে। যেদিকে তাকাই সেদিকে তিনি। অন্তর্মুখে সমাধিস্থ হয়ে আছি তখনো তিনি, বহির্মুখে জীবজগৎ নিয়ে আছি তখনো তিনি। যখন আরশির এ পিঠ দেখছি তখনো তিনি, আবার যখন উলটো পিঠ দেখছি তখনো তিনি।

শিব হয়ে আছি, তিনি। জীব হয়ে আছি, তিনি।

তুষের দ্বারা আবৃত থাকলেই ধান্য, তুষ থেকে মুক্ত হলেই তণ্ডুল। জীবে-শিবে ভেদ নেই। ভেদ হচ্ছে ভ্রান্তির ফল। কোরকে যেমন পুষ্পভাব, প্রস্ফুটিত পুষ্পেও

তেমনি কোরকত্ব। ঈশ্বরে যেমন জীবভাব, জীবে তেমনি ঈশ্বরভাব।

কিন্তু যাই বলো বাপু, নির্বিকার ব্রহ্ম হয়ে বসে থাকতে পারব না। বালকের মতন থেকেছি, থেকেছি উন্মাদের মত। কখনো জড় হয়েছি, কখনো পিশাচ। তারপর আবার নিত্য থেকে চলে এসেছি লীলায়। রামলালাকে কোলে নিয়ে বেড়িয়েছি, নাইয়েছি-খাইয়েছি। হনুমান সেজে গাছে উঠে বসেছি, আস্ত-আস্ত ফল খেয়েছি। তারপর শ্রীমতী হয়ে কৃষ্ণময় হয়ে গেলাম। আবার লীলা ছেড়ে নিত্যে মন উঠে গেল। ত্যাজ্য-গ্রাহ্য রইল না। সজনে তুলসী সব এক হয়ে গেল। যত ঈশ্বরীয় পট বা ছবি ছিল সব খুলে ফেললাম। হয়ে গেলাম সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ আদি পুরুষ। সেই আদি যার আর অন্ত নেই।

সব রকম সাধনই করেছি। তামসিক, রাজসিক আর সাত্ত্বিক। জয় মা কালী, দেখা দিবিনে? দেখা যদি না দিবি তো গলায় ছুরি দেব। এই হল তামসিক সাধন।

রাজসিক সাধনে নানারকম ক্রিয়াকলাপ, অনুষ্ঠানের সমারোহ। এত তীর্থ করতে হবে, এত পুরশ্চরণ, এত পঞ্চতপা! আর সাত্ত্বিক সাধনা শান্তশীলের সাধনা। ফলাকাঙ্ক্ষা নেই, শুধু নামটি নিয়ে নির্নিমেষ হয়ে পড়ে থাকো। নাম দিয়ে-দিয়ে কাম ধুয়ে ফেল।

আর কাম ঘুচলেই মনস্কাম।

আমারই মতন রূপ কে একজন প্রবেশ করলে আমার মধ্যে। দেহের ঘটপদ্ম ফুটে উঠল তার আবির্ভাবে। নিম্নমুখ ছিল, ঊর্ধ্বমুখ হয়ে উঠল।

আমি জীবের জন্যে এসেছি জীবের মধ্যেই থাকব থাকব "ডাইলিউট" হয়ে। আমার আপন জন কত আসবে আমার কাছে, কত আহ্লাদের দিন আছে, কত ভাবের আস্বাদের দিন।

গাঁজাখোরকে দেখলে গাঁজাখোরই আহ্লাদ করে। গায়ে পড়ে কোলাকুলি করে। অন্য লোক দেখলে মুখ লুকোয়। গরু আপন জনকে দেখলে গা চাটে, অন্য লোক দেখলে ঢুঁ মারে।

আমার আপন জন সব যখন আসবে তখন আমাকে আপন ভাষায় কথা বলতে হবে। ব্রহ্ম হয়ে বোবা হয়ে থাকলে আমার চলবে কেন?

পাকা ঘি'র কোন শব্দ থাকে না। কিন্তু যখন আবার পাকা ঘিয়ে কাঁচা লুচি পড়ে, তখন একবার কলকল করে ওঠে। কাঁচা লুচিকে পাকা করে আবার সে চুপ হয়ে যায়।

এই ঘিয়ে পড়বে অনেক কাঁচা লুচি। তাই একটু কলকল না করে উপায় নেই।

মৌমাছি যতক্ষণ ফুলে না বসে ভনভন করে। ফুলে বসে মধু খেতে আরম্ভ করলে চুপ হয়ে যায়। মধু খেয়ে যখন মাতাল হয় তখন আবার আনন্দে গুনগুন করে।

তাই আমাকে গুনগুন করতে দিস। গান গাইতে দিস প্রাণ ভরে।

'ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী
পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়?
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে
কভু সন্ধি নাহি পায়।'

পুকুরে কলসীতে জল ভরবার সময় একবার ভক-ভক করে। পূর্ণ হয়ে গেলে আর শব্দ হয় না। কিন্তু আরেক কলসীতে যদি ঢালাঢালি হয় তখন আবার শব্দ ওঠে।

শুদ্ধতায় ব্রহ্ম, আবার শব্দেও ব্রহ্ম। আমাকে এখন একটু শব্দ করতে দে। আমার আপন লোকরা সব আসবে, তাদের সঙ্গে আমি নৃত্য করব না?

আগেকার লোক বলত, কালাপানিতে জাহাজ গেলে ফেরে না। ওরে, ভয় নেই, আমার রিটার্ন টিকিট কাটা আছে। আমি বারে-বারে ফিরে-ফিরে আসি।

'হা'-র পর একবার ডুব দিয়ে ফের ফিরে আসি 'নি'-তে। জানিস না সেই কিন্তুনের কাণ্ড? কিন্তুনে প্রথমে গান ধরে 'নিতাই আমার মাতা হাতি! নিতাই আমার মাতা হাতি!' তারপর ভাব যখন জমে, তখন শুধু বলে, 'হাতি! হাতি!' তার পর কেবল, 'হাতি!' শেষকালে 'হা'। বলতে-বলতে সমাধি, একদম চুপচাপ।

কিন্তু আমি 'হা'র পর আবার 'নি'-তে ফিরে আসি। শোনবার জন্যে তোরা যে সব বয়েছিস উৎকর্ণ হয়ে। তোদের তৃষিত কর্ণে আমাকে যে নাম দিতে হবে। আমার কি ফাঁকি দিলে চলবে? শ্যামপুকুরে পৌঁছেছি বলে কি আমি তেলিপাড়ার খবর রাখব না?

শোন, দুটি ভাব নিয়ে থাকবি। এক দাসভাব, আরেক সন্তানভাব। অহং তো আর যায় না, হাজার বিচার করো, ঘুরে-ফিরে ফের এসে উঁকি মারে। আজ অশ্বত্থ গাছ কেটে দাও, কাল আবার ফেঁকড়ি বেরুবে। উপায় কি? উপায় হচ্ছে, আমি ভক্ত, আমি দাস, আমি বালক এই ভাবটি আরোপ করা। মিষ্টি খেলে অম্বল হয় কিন্তু মিছরির মিষ্টিতে হয় না। অকামো বিষ্ণুকামো বা। বিষ্ণুকামনা কামনা নয়।

আর শেষ ভাব, মুখ্য ভাব—সন্তানভাব। পূজায় আদ্যাশক্তিকে প্রসন্ন করতে না পারলে কিছুই হবে না। সেই ব্রহ্মময়ীর প্রতিমাই তো স্ত্রীজাতি। মাতৃভাবই তাই শুদ্ধ ভাব। সে ভাবেই তাদের প্রাণময় অভিষেক। আর কোনো ভাবে নয়।

আমি মাতৃভাবেই ষোড়শী পূজা করেছিলাম। দেখলাম, স্তন মাতৃস্তন, যোনি মাতৃযোনি।

শ্রীমাকে জিগগেস করল এক জন ভক্ত : 'মা, আপনি ঠাকুরকে কি ভাবে দেখেন?'

শ্রীমা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকলেন। পরে গম্ভীর মুখে বললেন, 'সন্তানের মত দেখি।'

ওরে এইটিই মহাভাব।

সারাৎসার বস্তু হয়েও ঈশ্বর ভাবরূপ ধরে রয়েছেন। আমাকেও থাকতে দে ভাবমুখে।

'এবার ভালো ভাব পেয়েছি।
ভবের কাছে পেয়ে ভাব
ভবীকে ভালো ভুলায়েছি।'

॥ ৪৮ ॥

জ্যৈষ্ঠ মাসে ষোড়শী পূজা হল, আশ্বিন কি কার্তিকেই সারদা ফিরে গেল কামার-পুকুর। শাশুড়ী বললেন ফিরে যেতে। ভাবের সংসার তো দেখলে, এবার একটু অভাবের সংসারটা দেখে এস।

রামেশ্বর বুঝতে পারছে তার দিন আর বেশী নেই। বাড়ির সামনে একটা আমগাছ কাটছে, রামেশ্বর বললে, ভালোই হল আমার কাজে লাগবে।

পাঁচ-সাত দিন পরে, অগ্রহায়ণ মাসে, চোখ বুজল রামেশ্বর।

গাঁয়ের গোপাল কাছাকাছিই থাকে। রাত্রে হঠাৎ তার বাড়ির দরজায় একটা শব্দ হল।

'কে?'

'আমি রামেশ্বর।'

'এত রাত্রে?'

'গঙ্গাস্নানে যাচ্ছি। বাড়িতে রঘুবীর রইল, তার সেবায় যাতে গোল না হয় দেখো।'

দরজা খুলতে এগিয়ে গেল গোপাল।

boiRboi.net

'দোর খুলে কী হবে? আমার শরীর নেই, আমাকে দেখতে পাবে না।'
খবর এসে পৌছুল দক্ষিণেশ্বরে। রামকৃষ্ণের ভাবনা ধরল এ দুঃসংবাদ মাকে কি করে শোনাই! এ শোক মা সামলাতে পারবেন না।
সর্বপ্রথমে জগদম্বাকে শোনাই।
মন্দিরে গেল রামকৃষ্ণ। বললে, অবস্থা যা করেছিস এবার ব্যবস্থা করে দে। পুত্রশোক দিয়েছিস এবার তা সহ্য করবার মতো শক্তি দে, সান্ত্বনা দে। এক হাতে নিবি আরেক হাতে দিবি নে, তা হতে পারবে না।
নবতে গিয়ে চন্দ্রমণিকে বললে রামকৃষ্ণ।
ভেবেছিল চন্দ্রমণি শোকে বিহ্বল হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়বে। কিন্তু চন্দ্রমণি বিশেষ বিচলিত হলেন না। চোখের কোণের জলটুকু মুছে নিয়ে বললেন, 'সংসার অনিত্য। মৃত্যু নিশ্চিত। তাই শোক করা অনর্থক।' রামকৃষ্ণের দিকে তাকালেন উৎসুক হয়ে। বললেন, 'সে কি, তুই কাঁদছিস কেন? এত সব বুঝিয়ে নিজেই শেষে অবুঝ হোস?'
না, কোথায় চোখের জল? সর্বত্র আনন্দভাতি।
জগন্মাতাকে উদ্দেশ করে বারে-বারে প্রণাম করতে লাগল রামকৃষ্ণ। যেমন দহনে আছিস তেমনি আছিস সহনে। যেমন আছিস ভাবনে তেমনি আছিস পাবনে।
মথুরবাবু গেছেন, এসেছেন শম্ভু মল্লিক। সিঁদুরেপটির শম্ভু মল্লিক। সদাগরী আপিসে মুচ্ছুদ্দির কাজ করে, অঢেল পয়সা। গোড়ায়-গোড়ায় খুব রাজসিক ভাব, ইস্কুল করব, হাসপাতাল করব, রাস্তা-পুষ্করণী করব। শেষকালে বিগলিত সমর্পণ: 'আশীর্বাদ করো যাতে এই ঐশ্বর্য তাঁর পাদপদ্মে দিয়ে মরতে পারি।'
দক্ষিণেশ্বরের কাছেই বাগানবাড়ি, কি ভাবে এক দিন এসে পড়ল পথ ভুলে। ব্রাহ্মধর্মে মতি, ভাবখানা আধা-সাহেবি, কিন্তু রামকৃষ্ণের কাছটিতে এসে আর যেতে চায় না। যে কালে হাসপাতালে এসে নাম লিখিয়েছ, রোগের যতক্ষণ কসুর থাকবে ছাড়বে না ডাক্তার সাহেব। আর ছাড়ান-ছোড়ান নেই। তুমি নাম লেখালে কেন?
রামকৃষ্ণের দ্বিতীয় রসদদার। বলে, 'আর কিছু বুঝি না, তুমি আমার গুরু। আমার গুরুজী।'
'কে কার গুরু!' রামকৃষ্ণ হাসে। করজোড় করে বলে, 'তুমি আমার গুরু।' শম্ভুর স্ত্রী আবার আরেক কাঠি উপরে। প্রতি মঙ্গলবার সারদাকে তার বাড়ি নিয়ে আসে। ষোড়শোপচারে পূজা করে তার পা দুখানি। মঙ্গলাচরণে মঙ্গল চরণ।

জলন্ত বিশ্বাস। অন্ধকার জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ চলে শম্ভু। বলে, তাঁর নাম করে বেরিয়েছি, আমার আবার বিপদ কিসের! ক্রমে-ক্রমে পার্থিব বিষয়ে ঔদাসীন্য। রামকৃষ্ণকে বলে, তুমি ন্যাংটা, তোমারই অখণ্ড আরাম। আমরা এ গ্রন্থি খুলি তো ও গ্রন্থিতে পাক দিই।

'তোমরা যে অনেক গ্রন্থ পড়েছ। গ্রন্থই তো গ্রন্থি। আমি গ্রন্থের গ-ও জানি না। আমি খাই-দাই আর বগল-বাজাই। ন্যাংটার নেই বাটপাড়ে ভয়।'

তোমার মত সরলই যে হতে পারি না। সরল ভাবে ডাকলে কি তিনি না শুনে পারেন? শম্ভুর এখন সেই সরল অশ্রু। বলে, সরল হওয়ার সাধনাই তো সব চেয়ে কঠিন সাধন। সামান্য গা খালি করতে পারি না তো মন খালি করব। জমিকে নিষ্কণ্টক করি কি করে? জমি পাট করতে পারলেই তো বীজ পড়বে, আঁকুর বেরুবে। এ সব জমি যে কাঁকুরে জমি।

রামকৃষ্ণের মুখে শুধু একটি হাসির সারল্য।

তুমি আমার যেমন দেখতে সরল তেমনি তোমাকে বুঝতে সরল।

রামকৃষ্ণের তখন খুব পেটের অসুখ, শম্ভুবাবু পরামর্শ দিলেন, একটু আফিং খাও। রামকৃষ্ণ গিয়েছে তার বাগানবাড়িতে, বাগানবাড়ির সামনেই শম্ভুবাবুর ডিসপেনসারি। বললেন, রাসমণির বাগানে ফেরবার সময় আমার থেকে নিয়ে যেও আফিংটুকু।

কথায়-কথায় ভুলে গিয়েছে আফিঙের কথা। পথে এসে রামকৃষ্ণের মনে পড়ল, ঐ যাঃ, আফিংটুকুই নিয়ে আসা হয়নি। অমনি ফিরে গেল শম্ভুর বাগানবাড়িতে। শম্ভু তখন অন্দরে চলে গিয়েছে, যাক, ডাকাডাকি করে আর কাজ নেই। ডিসপেনসারির কম্পাউণ্ডারের থেকে চেয়ে নিলেই হবে! কম্পাউণ্ডার তক্ষুনি কাগজে মুড়ে দিয়ে দিল এক দলা। ফেরবার পথে রামকৃষ্ণ দেখল তার আর পা চলছে না, কে যেন তার পা টেনে ধরে রয়েছে। রাস্তায় না উঠে পা এগিয়ে যাচ্ছে ড্রেনের দিকে। এ কি, এ কোন পথে চলেছি? পথ কই গৃহে ফেরবার? পথ সব মুছে গেল নাকি? অথচ পিছন ফিরে শম্ভুবাবুর বাড়ির দিকে তাকিয়ে পথ তো দেখতে পারছি দিব্যি। তবে এ কী পথভ্রম!

রামকৃষ্ণ ফের শম্ভুবাবুর বাড়ির ফটকের কাছে ফিরে এল। এইবার ঠিক হদিস হবে পথের। সামনে গিয়ে ডাইনে। পথঘাট তো মুখস্থ। তবে কেন বেচালে পা পড়বে? আফিঙের পুঁটলি ট্যাকে গুঁজে রামকৃষ্ণ আবার রওনা হল। আস্তে-আস্তে এক পা দু পা করে, মুখস্থের জের টেনে-টেনে। কিন্তু যথাপূর্বং তথাপরং। আবার দিকভ্রম, আবার পথলুপ্তি। আবার কে পা ধরে টানতে

লাগল পিছন দিকে। কি, কোথায় কী ভুল হল আমার!

হঠাৎ মনে পড়ে গেল রামকৃষ্ণের। শম্ভু বলেছিল, আমার থেকে নিয়ে যেও, তাকে না বলে আমি তার কম্পাউণ্ডারের থেকে চেয়ে নিয়ে গেছি। তাই মা আমাকে যেতে দিচ্ছেন না। ঘুরিয়ে মারছেন। আমার যে সত্যচ্যুতি হয়েছে। এ ভাবে নেওয়া তো চুরি করার সামিল।

অমনি ফিরে গেল রামকৃষ্ণ। ডিসপেনসারিতে গিয়ে দেখে সেই কম্পাউণ্ডারও নেই। দরজা বন্ধ নাকি? কে জানে। জানলা একটা খোলা আছে। সেই জানলা দিয়ে আফিঙের পুঁটলিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ভিতরে। বললে, 'ওগো, এই তোমাদের আফিং রইল।'

বলে কের মন্দিরের দিকে পা বাড়াল রামকৃষ্ণ। সমস্ত পথ এখন নড়গড়। আর কেউ টানছে না পা ধরে, ঠেলছে না এদিক-ওদিক। চোখের দৃষ্টি ফর্সা হয়ে গিয়েছে।

আমার মা আছে আর আমি আছি। আমি তো মা'র হাত ধরিনি, মা-ই আমার হাত ধরেছেন। নিজে না ধরে তাঁকে দিয়েই ধরিয়েছি আমাকে। তাই পা এতটুকু পড়তে দেন না বেচালে।

আমি তোমাকে ছেড়ে থাকি, কিন্তু মা, তুমি আমাকে ছেড়ে থেকো না। 'মুঝে তুম মৎ ছোড়ো।'

ওরে শোন, বাঁদরের বাচ্চা হবি না, বেড়ালের বাচ্চা হবি। বাঁদরের বাচ্চা তার মাকে ধরে, মা যখন এক গাছ থেকে আরেক গাছে লাফায়, কখনো ছিটকে পড়ে যায় বাচ্চা। আর বেড়ালের বাচ্চাকে তার মা ঘাড়ে কামড়ে ধরে, বেড়ালের বাচ্চার আর ভয় নেই। মা-ই তাকে আঁকড়ে ধরে নিয়ে যাবে যেখানে খুশি। কভু আখার ধারে, কভু বা ছাইয়ের গাদায়, কভু বা বাবুদের বিছানায়। তুমি কোথায়, তোমাকে ধরতে পারছি না। এই হাত বাড়িয়ে দিলাম, তুমি আমাকে ধরো।

মাঠের মাঝে আলপথ, এক গাঁ থেকে আরেক গাঁ। বাপ তার দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে সেই আলপথ দিয়ে, গ্রামান্তরে। ছোট ছেলেটিকে বাপ কোলে করে নিয়ে যাচ্ছে। বড়টি সেয়ানা, সে নিজেই বাপের হাত ধরে চলেছে। সরু পথ, পড়ে যাবার ভয়, তাই দু ছেলেই বাপের আশ্রয় নিয়েছে। যাচ্ছে-যাচ্ছে, হঠাৎ একটা শঙ্খচিল উড়ে যেতে দেখল, একেবারে ঠিক মাথার উপর দিয়ে। দেখেই দু ছেলের মহা আহ্লাদ। দুজনেই আপনা ভুলে হাততালি দিয়ে উঠল। ছোট ছেলেটা জানে, বাপ আমাকে ধরে আছে, আমার ভয় কি, আমি আনন্দে

হাততালি দিই। কিন্তু বড় ছেলেটি যেই বাপের হাত ছেড়ে হাততালি দিতে গেল, অমনি পড়ে গেল নিচে, ঘা খেয়ে কেঁদে উঠল।

মাকে অমনি কোলে নিতে বল। মা'র কোলে বসে হাত ছেড়ে দে।

সারদার বাবা রামচন্দ্র রামনবমী তিথতে মারা গেলেন। সারদার মন ভেঙে পড়ল। ভাবল আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যাই।

বৈশাখ মাস, ১২৮১ সাল, সারদা আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এল।

কিন্তু থাকে কোথায় ?

আর কোথায় ! সেই সংকীর্ণ নবত ঘরে। চন্দ্রমণির সঙ্গে।

একরত্তি ঘর। একটুখানি দরজা। ঢুকতে-বেরুতে মাথা ঠুকে যায়। একজনে থাকবার মতও তাতে জায়গা হয় না তা দুজনে, শাশুড়ী-বৌয়ে। ঐটুকু ঘরের মধ্যেই হাঁড়ি-কুঁড়ি, পোঁটলা-পুঁটলি। যত হাবজা-গোবজা। শিকেয় ঝুলছে যত কড়া-ডেগচি। রামকৃষ্ণের জন্যে জিয়ানো মাছ পর্যন্ত। এখানে থাকতে বৌ'র যে বেজায় কষ্ট হবে।

কথাটা শম্ভু মল্লিকের কানে উঠল। মথুর হলে হয়তো অট্টালিকায় রাখতেন, শম্ভু মল্লিক মন্দিরের কাছে সারদার জন্যে একখানা চালাঘর তুলে দিলেন। তার জন্যে জমি নিতে হল মৌরসী স্বত্বে। আড়াই শো টাকা সেলামী দিলেন শম্ভু।

জমি তো হল কিন্তু কাঠ কই ?

কাঠ যোগাল কাপ্তেন। বিশ্বনাথ উপাধ্যায়। বিশ্বনাথ নেপালরাজের কর্মচারী। কলকাতায় ও মফস্বলে নেপালের শাল কাঠের সে যোগানদার। বেলুড়ে তার কাঠের গদি। বললে, 'যত লাগে পাঠিয়ে দেব শালের চকোর।'

জড়াইয়ে বামুনের ঘরের ছেলে। বাপ ভারতীয় ফৌজের সুবাদার। এরা লড়াইও করে, আবার পুজোও করে। যুদ্ধক্ষেত্রে শিব নিয়ে যায়। এক হাতে শিব অন্য হাতে তরবার।

বেদ-বেদান্ত গীতা-ভাগবত সব কণ্ঠস্থ। তারপর ভক্তি কত ! যখন পুজো করে কর্পূরের আরতি করে। পুজো করতে-করতে স্তব করে আসনে বসে। সে আরেক মানুষ। পুজো করার সময় চোখের ভাব ঠিক যেন বোলতা কামড়েছে।

কী ভক্তি ! নিজের মা'র কাছে নিচে বসে। মা যে আসনে বসে তার চেয়ে নিচু আসন। কিংবা যে আসনে সে বসবে তার চেয়ে উঁচু আসনে মাকে বসাবে।

কী ভক্তি ! রামকৃষ্ণ বরানগরের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, ছুটে এসে মাথার উপরে ছাতা ধরে। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে নানা তরকারি রেঁধে খাওয়ায়। যেখানে খাওয়ায় সেখানেই আঁচাবার ব্যবস্থা করে, উঠতে দেয় না। বাতাস করে, পা টিপে দেয়।

ওদের বাড়িতে গিয়ে পাইখানায় বেহুঁস হয়ে পড়েছে রামকৃষ্ণ—এত আচারী, তবু পাইখানায় গিয়ে ঠিকমত বসিয়ে দিয়ে এল। যদি কখনো সমাধি হয় রামকৃষ্ণের, কাপ্তেন মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। সে এককালে হঠযোগ করত। তাই গুণ আছে তার হাতে।

শালের চকোর পাঠিয়ে দিল বিশ্বনাথ। একখানা আবার গঙ্গার জোয়ারে ভেসে গেল একদিন। হৃদয় দুঃখ করে বললে সারদাকে, 'তোমার যেমন অদেষ্ট, একটা শালকাঠও ঠিকমত জোটে না।'

সারদা শুধু একটু হাসল উদাসীনের মত।

গেছে-গেছে ও শালকাঠ। বিশ্বনাথ আবার নতুন পাঠিয়ে দিলে। ঘর উঠল, সারদার। চালাঘর।

শালকাঠ নিয়ে বিশ্বনাথেরও বিপদ কম নয়। গঙ্গার জোয়ারে অনেকগুলি কাঠ তার ভেসে গেছে। রাজসরকারের দারুণ ক্ষতি। এখন কী কৈফিয়ৎ দেয়া যাবে এর জন্যে, কে বলবে? কাঠের হিসেব পাঠালে না এবার বিশ্বনাথ। ঠিক করলে পরের বছরের লাভে এ লোকসানের পূরণ করবে। কিন্তু হঠাৎ কাটমুণ্ডু থেকে তার তলব এল। বিকৃত কি রিপোর্ট গেছে রাজধানীতে, বিশ্বনাথের চাকরি নিয়ে টানাটানি। সংসারী লোক, ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। নেপালে যাবার আগে এল সে দক্ষিণেশ্বরে। সেই সরল সত্যশরণের কাছে।

বললে, 'এখন উপায় বলুন।'

'উপায় খুব সোজা।' বললে রামকৃষ্ণ। 'এর চেয়ে সোজা আর হতে পারে না।'

'কি?'

'সত্য কথা বলবে। কাঠ তো আর তুমি নাওনি, গঙ্গায় নিয়েছে। তাই বলবে গিয়ে দরবারে। তোমার কিচ্ছু হবে না। মা তোমাকে, তোমার সত্যকে রক্ষা করবেন। সত্যের মত সহজ আর কিছু নেই।'

বুকের ভার নেমে গেল বিশ্বনাথের। সোজা সত্য কথা বলব এ সব চেয়ে বড় আশ্বাস। অতলস্পর্শ শান্তি।

হলও তাই। সত্য কথা বলায় তার দোষক্ষালন তো হলই, তার প্রমোশন হল। কাপ্তেন ছিল কর্ণেল হল। ফিরে এল কলকাতায় নেপালের রাষ্ট্রদূত হয়ে।

বাঙালীদের নিন্দা করে বিশ্বনাথ। নিন্দা করে ইংরিজি-পড়ুয়াদের। ঠাকুরের পায়ের কাছে বসে বলে, 'এমন মানিককে ওরা চিনল না।'

সংসারে থাকতে গেলে সত্য কথার খুব আঁট চাই। আর এই সত্যেই ভগবান। সত্য কথাই কলির তপস্যা। কায়মনোবাক্যে বারো বছর সত্য পালন করলে মানুষ সত্য-সঙ্কল্প হয়ে যায়।

'আমি মাকে সব দিয়েছিলুম। জ্ঞান-অজ্ঞান, ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ, শুচি-অশুচি, সব। কিন্তু সত্য মাকে দিতে পারলুম না। বলতে পারলুম না, এই নে তোর সত্য, এই নে তোর অসত্য। ঐ সত্য যদি ত্যাগ করি তবে মাকে যে সর্বস্ব অর্পণ করলুম সেই সত্য রাখি কিসে? সত্য ভগবানকেও দেয়া যায় না। সত্যই তো ভগবান। তা আবার দেব কাকে?'

সেই শালকাঠের ঘরে বাস করতে লাগল সারদা। একটি মেয়ে রইল তার তত্ত্ব করতে। সেই ঘরেই রাঁধে সারদা—রামকৃষ্ণের সেই ছিনাথ হাতুড়ে। থালা-বাটি সাজিয়ে নিয়ে যায় মন্দিরে কাছে বসিয়ে রামকৃষ্ণকে খাইয়ে আসে। মাথা থেকে ঘোমটাটি সরে না হাওয়ায়।

দিনে-দুপুরে রামকৃষ্ণ মাঝে-মাঝে যায় সেই চালাঘরে। খোঁজ-খবর নিয়ে আসে। ঘোমটার ভিতর থেকে কথা কয় সারদা।

একদিন হল কি, বিকেলের দিকে গিয়েছে রামকৃষ্ণ। আর যেমনি যাওয়া অমনি মুষলধারে বর্ষণ। সে বর্ষণ আর থামে না। মন্দিরে এখন ফিরে যাই কি করে? না, যাব না মন্দিরে। তোমার চালাঘরটিতে থাকব আজ। কি খাওয়াবে আজ বলো?

ঝোল-ভাত তোমার পথ্য, ঝোল-ভাতই খাবে। সারদা রেঁধে দিল ঝোল-ভাত।

খেতে-খেতে রামকৃষ্ণ বললে, 'এ কেমনতরো হল? কালীঘরের বামুনরা যেমন রাত্রে বাড়ি আসে এ যেন আমি তেমনি এসেছি।'

চালাঘরেই রাত কাটাল রামকৃষ্ণ। চালাঘর নয়, কালীঘর।

॥ ৪৯ ॥

চালাঘরে থেকে সারদার কঠিন আমাশা হল।

শম্ভুবাবু প্রসাদ ডাক্তারকে নিয়ে এলেন খাওয়ালেন অনেক ওষুধপত্র। কিন্তু রোগের কিছুতেই আরাম হয় না। সবাই বলে, দেশে ফিরে যাক। সেখানকার খোলা হাওয়া আর মিঠে জল ছাড়া সারবে না অসুখ।

জয়রামবাটিতে ফিরে গেল সারদা। আশ্বিন মাস, ১২৮২ সাল। শ্যামাসুন্দরী তাকে টেনে নিলেন বুকের মধ্যে।

অসুখ বেড়েই চলল। কোথায় মুক্ত হাওয়া, কোথায় মিষ্টি জল! সারদা মিশে গেল বিছানার সঙ্গে। শ্যামাসুন্দরী চোখে আঁধার দেখলেন। দেশের হাতুড়ে-রোজাদের ডাকেন এমনও বুঝি তাঁর সংস্থান নেই। আছেন শুধু দয়াময়।

সারদার দেহ বুঝি আর থাকে না। খবর পৌঁছুল রামকৃষ্ণের কাছে।

'তাই তো রে হৃদু, সারদা কেবল আসবে আর যাবে।' শান্ত স্বরে বললে রামকৃষ্ণ, 'মনুষ্যজন্মের কিছুই তার করা হবে না।'

বিছানার থেকে আস্তে-আস্তে উঠে বসল সারদা। কাছেই গ্রাম্যদেবী সিংহবাহিনীর মন্দির। ঠিক করল সিংহবাহিনীর মাড়ে গিয়ে হত্যা দেবে। হয় রোগ নাও, নয় আমাকে নাও।

গ্রাম্যদেবীর কোনো নাম-ডাক নেই। কিন্তু আমার ডাকেই তার নাম হবে। মা-ভাইয়েরা যেন জানতে না পারে। চুপি-চুপি যেতে হবে মন্দিরে। কিন্তু যেতে পারব তো একা-একা? নিজের পায়ে ভর করে?

কে যেন তাকে হাত ধরে নিয়ে গেল ধীরে-ধীরে। মা-ভাইয়েরা জানতেও পেল না। সিংহবাহিনীর মাড়ে হত্যে দিয়ে পড়ল সারদা।

খানিকক্ষণ পড়ে থাকবার পরেই সিংহবাহিনী নেমে এল সিংহাসন থেকে। বললে, 'তুমি কেন পড়ে আছ গো?' বলে হাত ধরে তাকে তুলে দিল। 'ওলতলার মাটি একটু খাও গে, আধি-ব্যাধি সেরে যাবে।'

মাটি খেয়ে অসুখ সেরে গেল সারদার। জীর্ণ দেহ সবল হয়ে উঠল।

গ্রামে-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ল সিংহবাহিনীর মাহাত্ম্য। দূর-দূরান্তর থেকে আসতে লাগল আর্ত-আতুর। কেউ আমরা আগে জানিনি, আগে বুঝিনি, খোঁজ করিনি আমাদের গ্রাম্যদেবীকে। সাপের বিষ পর্যন্ত নাশ হয় ঐ মাটির ছোঁয়ায়। চল-চল যাই সিংহবাহিনীর দুয়ারে।

লোকমাতা লোকের কল্যাণের জন্যে ঘুমন্ত দেবীকে জাগিয়ে দিলেন। যেমন জগতের প্রভু ভুবনের কল্যাণের জন্য জাগিয়ে দিয়েছিলেন ভবতারিণীকে।

এ দিকে শম্ভু মল্লিকের অবস্থা সঙিন হয়ে উঠেছে। ঘোর বিকার। সর্বাধিকারী এসে দেখে বললে, 'ওষুধের গরম।'

দেখতে গেল রামকৃষ্ণ। শম্ভুর বিকারাচ্ছন্ন মুখে ভেসে উঠল তৃপ্তির প্রশান্তি। 'শম্ভুর প্রদীপে আর তেল নেই।'

অসুখের গোড়ার দিকে শম্ভু বলেছিল একদিন হৃদয়কে: 'হৃদু, পোঁটলা বেঁধে বসে আছি। কাণ্ডারী এলে তার হাতে তুলে দেব পোঁটলা। বলব ফেলে দাও ভবনদীতে। ভরে হালকা করো।'

ঐশ্বর্য ছিল, আসক্তি ছিল না। সংসারে টাকার দরকার বটে, কিন্তু ওগুলোর জন্যে ভাববে কে বসে-বসে? যখন আসে আসবে যখন যাবার যাবে। যদৃচ্ছা লাভ। ঈশ্বরের যারা ভক্ত ঈশ্বরের যারা শরণাগত, তারা কিছু ভাবে না, তাদের যদৃচ্ছা লাভ। যত্র আয় তত্র ব্যয়। এক দিক থেকে আসে আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। বৈরাগ্য মানে তো শুধু সংসারে বিরাগ নয়, বৈরাগ্য মানে ঈশ্বরে অনুরাগ। যার ঈশ্বরে অনুরাগ আছে তার অন্য অঙ্গরাগে দরকার নেই।

জানিস যারা ভক্ত, তারা হচ্ছে ঈশ্বরের আত্মীয়, ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের রক্ত-মাংসের সম্বন্ধ। ঈশ্বরই তাদের টেনে নেন। দুর্যোধনেরা যখন গন্ধর্বের কাছে বন্দী হল যুধিষ্ঠিরই তাদের উদ্ধার করলেন। বললেন, আত্মীয়দের ঐ অবস্থা হলে আমাদেরই কলঙ্ক।

ভক্তের আবার ভয় কি! অভাবের ভয়, না, আঘাতের ভয়? না, মরণের ভয়? ওরে ভক্তের নাশ নেই। 'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'।

শম্ভু চলে গেল। এখন কে হবে রক্ষাদার?

ঝি কালীর মা সেবা করে চন্দ্রমণিকে। নব্বুয়ের উপর বয়স হয়েছে চন্দ্রমণির। বুদ্ধির জড়তা এসে গিয়েছে। হৃদয়কে দেখতে পারেন না দু চক্ষে। কি করে তাঁর ধারণা হয়েছে অক্ষয়কে ও-ই মেরে ফেলেছে। এখন বলছেন রামকৃষ্ণ আর সারদাকে সে মেরে ফেলবে। মাঝে-মাঝে রামকৃষ্ণকে বলেন গলা নামিয়ে, 'হৃদয়ের কথা কখ্খনো শুনবি না। ও শত্তুর।'

রাসমণির বাগানের কাছেই আলমবাজারের পাটের কল। দুপুরের কলে সিটি বাজে। সেই সিটিকে চন্দ্রমণি বৈকুণ্ঠের শঙ্খধ্বনি বলেন। ঐ সিটি না শোনা পর্যন্ত খেতে বসেন না। কেউ অনুরোধ করলে বলেন, 'এখন কী খাব গো? লক্ষ্মীনারায়ণের ভোগ হয়নি, বৈকুণ্ঠে শঙ্খ বাজেনি, এখন কি খাওয়া যায়?' যেদিন কলের ছুটি থাকে সেদিন আর বাঁশি বাজে না। সেদিন চন্দ্রমণিকে খাওয়ানো শক্ত হয়ে ওঠে। বৈকুণ্ঠের শঙ্খ নেই আমারও খাওয়া নেই। রামকৃষ্ণ তখন নানারকম কৌশল করে। ছোট মেয়েকে যেমন করে ভোলায় তেমনি করে পাশে বসিয়ে খাওয়ায় মাকে।

রোজ ভোরে উঠে মাকে দর্শন করা চাই রামকৃষ্ণের। কিছুক্ষণের জন্যে তাঁর কাছে থেকে তাঁকে সেবা করা চাই স্বহস্তে। আর কত দিন মা'র পাদপদ্ম স্পর্শ করা যাবে মা-ই জানেন।

হৃদয় দেশে যাবার জন্যে তোড়জোড় করছে। বাঁধছে বোঁচকা-বুঁচকি। হাটের থেকে নানা দ্রব্য কিনে এনেছে। না গেলেই নয়। শুনতে পেয়েছে দেশে কি-

এক বেধেছে মোকদ্দমা।
রামকৃষ্ণের কাছে গেল অনুমতি চাইতে।
'মামা, যাব ?'
'না।' রামকৃষ্ণ বারণ করল।
'কেন বারণ করছ ?'
রামকৃষ্ণ কারণ বললে না। হৃদয় যত জিদ করে, রামকৃষ্ণ তত শুদ্ধ হয়।
শেষকালে হৃদয় গেল খাজাঞ্চির কাছে। মামা না বললে কি হয় খাজাঞ্চি যদি ছুটি দেয়, তবেই হল। খাজাঞ্চি ছুটি মঞ্জুর করল। আর হৃদয়কে পায় কে ?
সন্ধের সময় রামকৃষ্ণ নবতে এল। এল মা'র কাছটিতে।
শুরু করল যত সব পুরোনো কথা, গাঁ-ঘরের কথা, পাড়া-পড়শীর কথা। পুরোনো কথার মত এমন আর কী ভালো লাগে মায়েদের। ছেলেদের ছেলেবেলার কথায় এলে মায়েদের আর থামায় কে! রাত বাড়ছে, তবু কথায় মত্ত মায়ে-পোয়ে।
মন্দির থেকে হৃদয় ডাকাডাকি শুরু করল। কি গো মামা, খাবে না ? খেতে এস। মাকে ছেড়ে তবু উঠে যেতে মন ওঠে না রামকৃষ্ণের। মা'র কাছটিই যেন কাশীধাম। হৃদয়ের চীৎকার তীব্রতর হল।
'আমারটা রেখে তোরা দুজনে খা গে।' বললে রামকৃষ্ণ।
তারা দুজনে মানে হৃদয় আর রামলাল। রামেশ্বরের মৃত্যুর পর রামলাল এসে পূজারী হয়েছে দক্ষিণেশ্বরে।
আমি আরো একটু বসি মা'র কোল ঘেঁষে। আরো একটু কথা শুনি।
রাত প্রায় দুপুর, মাকে ঘুম পাড়িয়ে রামকৃষ্ণ ফিরে এল নিজের ঘরে। খেয়েদেয়ে শুলো নিজের বিছানায়।
কিন্তু হৃদয়ের চোখে ঘুম নেই। কেবল এ পাশ ও পাশ করছে। রাত যত বাড়ছে তত বাড়ছে হৃদয়ের ছট্‌ফটানি। কে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে তাকে বেঁধে ধরেছে বিছানায়, ছাড়া পাবার জন্যে হাত-পা ছুঁড়ছে ক্ষণে-ক্ষণে।
রামকৃষ্ণের পাশের বিছানা হৃদয়ের। রামকৃষ্ণ দেখেও দেখছে না।
এক ঝটকায় উঠে পড়ল হৃদয়। ঘরের কোণে গাঁঠরি বাঁধা, কাল ভোরেই সে রওনা হবে ঠিকঠাক। সহসা সে ক্ষিপ্র হাতে গাঁঠরির বাঁধনগুলি খুলে ফেলতে লাগল। আর বাঁধনও কি একটা দুটো। যেমন যত রাজ্যের জিনিস পেয়েছে পুরেছে, তেমনি এঁটেছে দড়িদড়ার ঘোরপ্যাচ। টেনে খিঁচে ছিঁড়ে খুলতে লাগল দড়ির জট।

রামকৃষ্ণ জিগগেস করল, 'কি হল ?'

'কী হল ! বিছানায় শুতে পাচ্ছি না। যতক্ষণ এ বাঁধনগুলো না যাচ্ছে ততক্ষণ আমার শান্তি নেই। গাঁঠরির মতই দড়ি দিয়ে কে আমাকে বেঁধেছে নাগপাশে—'

'বাড়ি যাবি না ?'

'আর গেছি ! মনে একটা ইচ্ছে হলেই যদি কেউ বাগড়া দেয়, তাহলে বাঁচি কি করে ?' বন্ধন মুক্ত হয়ে হৃদয় ফের ফিরে এল বিছানায়। বললে, 'কিন্তু কেন যে বাড়ি যেতে দিলে না বুঝতে পারলুম না।'

'পারবি। ভোর হোক।'

নিজে আগে ভোরে উঠে কালীর মাকে জাগিয়ে দেন চন্দ্রমণি। সেদিন কালীর মা-ই আগে উঠল। বেলা এক-গা হতে চলল তবু চন্দ্রমণির সাড়া নেই। ডাকা-ডাকি করতে লাগল কালীর মা। তবু দরজা খোলেন না।

দরজায় কান পেতে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল কালীর মা। শুনতে পেল গলার একটা ঘড়-ঘড় শব্দ। ছুটে গেল হৃদয়কে খবর দিতে।

বার থেকে কী কৌশলে হৃদয় খুলে ফেলল হুড়কো। দেখল চন্দ্রমণির শেষ অবস্থা। ওষুধ আর গঙ্গাজল দিতে লাগল ফোঁটা-ফোঁটা করে।

তিন দিন কাটল এমনি অবস্থায়। হৃদয় অসুরের মত যুঝতে লাগল যমের সঙ্গে। রামকৃষ্ণ বললে, এবার অন্তর্জলি করা হোক। চন্দ্রমণিকে নিয়ে চলল গঙ্গায়। যাবার আগে ফুল চন্দন আর তুলসী দিয়ে মা'র পায়ে অঞ্জলি দিলে রামকৃষ্ণ। পুত্রকে শিয়রে রেখে মা চোখ বুজলেন।

রামলাল ফুল নিয়ে এল, হৃদয় নিয়ে এল শ্বেত চন্দন। মা'র পা দুখানি গঙ্গাজলে ধুয়ে তাতে রামকৃষ্ণ ঘন করে চন্দন মাখিয়ে দিল। এ জল চোখের জল আর এ চন্দন ভক্তর চন্দন, ভালোবাসার চন্দন।

'যে দেহ থেকে আমার দেহের প্রকাশ সেই দেহ আজ মিশে গেল পঞ্চভূতে।'

এঁড়েদার শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল চন্দ্রমণিকে। রামলাল মুখাগ্নি করলে, সৎকার করলে। রামকৃষ্ণ যে সন্ন্যাসী।

রামলালই শ্রাদ্ধ করল বৃষোৎসর্গ।

রামকৃষ্ণ অশৌচ পর্যন্ত পালন করেনি। প্রেতপিণ্ড দেওয়া তো দূরের কথা। পুত্রোচিত কোন কার্যই করলাম না মা'র জন্যে। মনের ভিতরটা খচখচ করছে রামকৃষ্ণের। অন্তত একটু তর্পণ করি মাকে।

গঙ্গায় নামল রামকৃষ্ণ। পিছনে অগণন লোক। রামকৃষ্ণের মাতৃতর্পণ দেখবে।

জলের অঞ্জলি নেবার জন্যে গঙ্গায় হাত ডোবাল রামকৃষ্ণ। কিন্তু যেই অঞ্জলিবদ্ধ হাত উপরে তুললে অমনি হাতের আঙুলগুলি অসাড়, শিথিল হয়ে গেল। এঁকে বেঁকে ফাঁক হয়ে গেল। সব জল পড়ে গেল ফঁক দিয়ে। যতক্ষণ জলের মধ্যে থাকে হাত ঠিক বদ্ধাঞ্জলি থাকে, যেই জল নিয়ে উপরে ওঠে আঙুলগুলি অমনি কাঠির মতন শক্ত হয়ে প্রসারিত হয়ে পড়ে। এক বিন্দু জল বন্দী হয় না। বার বার চেষ্টা করেও পারছে না কিছুতেই।

ডুকরে কেঁদে উঠল রামকৃষ্ণ। 'মা গো, তোমার জন্যে কি কিছুই করতে পারব না?'

কোনো দোষ স্পর্শেনি তোমাকে। তুমি গলিত-হস্ত। বললে এসে পণ্ডিতেরা। তুমি অধ্যাত্মসাধনার চূড়ায় এসে উঠেছ।

তুমিই 'শ্রদ্ধায়াগ্নি সমিধ্যতে'। তুমি 'শ্রদ্ধয়া হূয়তে হ বঃ'।

॥ ৫০ ॥

মথুরবাবু তখন বেঁচে, রামকৃষ্ণ তাঁকে এক দিন ধরে বসল: 'দেবেন ঠাকুরের বাড়ি যাব।'

মথুরবাবু অভিমানী লোক, আগু-পিছু করতে লাগলেন। আমরা কেন সেধে তার বাড়ি যাই? সে নিজে আসতে পারে না?

'ওগো, দেবেন্দ্র যে ঈশ্বরের নাম করে।'

নাম তো তুমিও করো। সে আসতে পারে না তোমার এখানে?

আমি নাম করলে কি হয়, আমার নিজের কি কোনো নাম আছে? তাঁর নাম দিয়ে নিজের নামটাকে মুছে ফেলেছি। তাঁর নামেই নিজের নামের নাশ হয়েছে। দেবেন্দ্রের কত বিদ্যে, কত ঐশ্বর্য। সে তো কলির জনক। সে এ দিক-ও দিক দু দিক রেখে দুধের বাটি খায়। সে ভোগেও আছে যোগেও আছে। রাজত্বও করছে দাসত্বও করছে। সে একটা মহাতীর্থ। তাকে এখানে আসতে না দিয়ে আমার ওখানে যাওয়াই তো আমার লাভ। আমি অমন একটা তীর্থ করব না?

যেখানে ঈশ্বরের নাম সেখানেই আমি আছি। তাঁকে যে ডাকে সে যে আমাকেও ডাকে!

দেবেন্দ্র আর মথুর একসঙ্গে পড়তেন হিন্দু কলেজে। সেই সুবাদে যাওয়া সহজ হয়ে গেল। সঙ্গে নিয়ে গেলেন রামকৃষ্ণকে।

দেবেন্দ্রনাথের তখন দেশজোড়া নাম। খৃষ্টানি থেকে দেশকে উদ্ধার করার জন্যে

তিনি ব্রাহ্মধর্ম আর ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করলেন। রাজা রামমোহন এসে বোঝালেন বেদান্ত-প্রতিপাদিত ধর্মই সত্যধর্ম আর তাই প্রচার করবার জন্যে স্থাপন করলেন ব্রহ্মসভা। দেবেন্দ্রনাথের সাধনায় সেই ধর্মই হয়ে দাঁড়াল ব্রাহ্মধর্ম, আর সেই সভাই হয়ে দাঁড়াল ব্রাহ্মসমাজ।

বিদেশের গুরুর কাছে গোটা দেশ যখন ধর্মে দীক্ষা নিতে যাচ্ছিল তখন রাজা রামমোহন দেখালেন তাকে তার আপন সত্যসম্পদ। সেই দেখানোর কাজে দেবেন্দ্রনাথ একটি দিব্য শিখা। ব্রহ্মকে তিনি শুধু অনুষ্ঠানে রাখেননি নিয়ে এসেছেন জীবনের অধিষ্ঠানে। তিনি প্রত্যগাত্মা। তিনি ঈশ্বরদর্শী।

দিব্যি ভুঁড়ি হয়েছে মথুরবাবুর, তবু তাঁকে চিনতে পারলেন দেবেন্দ্রনাথ। বিনয় বচনে জিগগেস করলেন, 'সঙ্গে ইনি কে?'

কথার সুরে একটি প্রসন্ন বিস্ময়। চোখের সম্মুখে হঠাৎ যেন দেখতে পেয়েছেন সুন্দরের মহামহিম প্রকাশ। একটি বিভান্বিত বিভূতি।

'এই এক জন আত্মভোলা মানুষ। ঈশ্বর-ঈশ্বর করে পাগল।' মথুরবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন।

যেন শুধু এইটুকুই পরিচয় নয়। পাগল নয়, পারমহংস; অনন্তগুণগম্ভীর। মানুষ নয়, লীলামানুষবিগ্রহ। তাকিয়ে রইলেন দেবেন্দ্রনাথ।

'সংসারে থেকে তুমি ঈশ্বরে মন রেখেছ, তাই তোমাকে দেখতে এসেছি।' বললে রামকৃষ্ণ। 'তুমি জনক রাজার মত দুখানা তরোয়াল ঘোরাও, একখানা জ্ঞানের একখানা কর্মের। তুমি পাকা খেলোয়াড়!'

স্মিতশান্ত নেত্রে হাসলেন দেবেন্দ্রনাথ।

'কিন্তু এ দেখায় চলবে না। দেখি তোমার গা দেখি।'

সহজ-সুন্দর মানুষটির এ অনুরোধ যেন গুহাহিত প্রত্যগাত্মার আদেশ। এ আবরণমুক্ত হওয়া মানেই ভারমুক্ত হওয়া, মালিন্যমুক্ত হওয়া। আবরণ খুলে ফেলতে পারলেই রইল না আর অহঙ্কার, রইল না আর অসন্তোষ।

গায়ের জামা খুলে ফেললেন দেবেন্দ্রনাথ। রামকৃষ্ণ দেখল সেই 'প্রলম্ববাহুঃ পৃথুতুঙ্গবক্ষঃ'কে। দেখল তাঁর গৌরবর্ণের উপর কে সিঁদুর ছড়িয়ে দিয়েছে। বুঝল ঈশ্বর স্পর্শ করেছে দেবেন্দ্রনাথকে! তাঁর মর্ত তনু ভাগবতী তনু হয়ে উঠেছে।

দেখে খুশি আর ধরে না রামকৃষ্ণের। তুমি তো তবে আমার দেশের লোক, আমার স্বজন-বান্ধব। রামকৃষ্ণ চেপে ধরল দেবেন্দ্রনাথকে। 'তবে আমাকে কিছু ঈশ্বরীয় কথা শোনাও।'

বেদ থেকে কিছু-কিছু শোনালেন দেবেন্দ্রনাথ। এই বিশ্বজগৎ প্রকাণ্ড একটা ঝাড়-লণ্ঠনের মতো। প্রত্যেকটি জীব ঝাড়-লণ্ঠনের বাতি এক-একটি। শুধু নিজেরা জ্বলছে না, সমস্ত কিছুকে উজ্জ্বল করে রেখেছে।

কী আশ্চর্য! আমি যে অমনি দেখেছিলুম এক দিন পঞ্চবটীতে। তোমার সঙ্গে আমার যে তা হলে মিল গো! কিন্তু বিষয়টার ব্যাখ্যা কি?

'ঝাড়-লণ্ঠন না হলে কে জানত কে দেখত এই জগৎসংসারকে?' দেবেন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। 'ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন শুধু নিজেদের দেখাতে নয়, ঈশ্বরকে দেখাতে। শুধু নিজেদের গৌরব প্রচার করতে নয়, ঈশ্বরের গৌরবের প্রচার করতে। মানুষ ছাড়া ঈশ্বরকে বোঝেই বা কে, বোঝায়ই বা কাকে। ঝাড়ের আলো না থাকলে সব-কিছু অন্ধকার, স্বয়ং ঝাড় পর্যন্ত দেখা যায় না।'

বড় সুন্দর করে বললে তো। একই বহুধা হয়েছেন। গণনাহীন অনৈক্য দিয়ে দেখাচ্ছেন সেই এককে। সেই সমগ্রকে। সেই অখণ্ডকে। তিনি যে অখণ্ডৈকরস।

'আমি'-র মধ্যে কিছু নেই। আমার মধ্যেই সমস্ত রয়েছে।

আলাপ করে উল্লাস হল দেবেন্দ্রনাথের। বললেন, 'আমাদের উৎসবে কিন্তু আসতে হবে।'

'সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।' উদাসীন রামকৃষ্ণ।

'না, আপনি আসবেন।'

'কিন্তু দেখছ তো আমার অবস্থা। আমার কাপড়-চোপড়ের আঁট নেই। কখন কি ভাবে তিনি রাখবেন তিনিই জানেন।'

'না, আসতে হবে!' দেবেন্দ্রনাথ পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। 'শুধু একটা ধুতি আর উড়ুনি পরে আসবেন। আপনাকে এলোমেলো দেখে কেউ যদি কিছু বলে আমার কষ্ট হবে।'

'না বাপু, আমি তা পারব না। বাবু হতে পারব না আমি।'

দেবেন্দ্রনাথ শুধু অর্ধবস্ত্র উন্মোচন করেছিলেন, কিন্তু রামকৃষ্ণ মুক্তসমস্তসঙ্গ। রামকৃষ্ণ সর্ববিকারবর্জিত। নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব। তার কাপড় থাকলেই বা কি, না-থাকলেই বা কি। নগ্ন বলেই তো সে পূর্ণ। চরম বলেই তো সে পরম। কিন্তু শালীনতায় বাধল দেবেন্দ্রনাথের। পর দিন মথুরবাবুকে চিঠি লিখে পাঠালেন। একেবারে খালিগায়ে এলে ভালো দেখাবে না। গায়ে অন্তত একখানা উড়ুনি—

ওরে, ওরা এখনো বস্ত্রকে দেখে, সত্যকে দেখে না। আমাকে দেখে না, আমার কাপড় দেখে। ওরে, এ যে হরির শরীর। হরির শরীরের জন্যে ক'হাত কাপড়

কিনবি, কোন বাজারে? হরিই জগৎ, জগৎই হরি—এর বাইরে আর শরীর কই? হরিরেব জগৎ, জগদেব হরিঃ, হরিতো জগতো ন হি ভিন্ন তনুঃ।

'দেবেন্দ্র এখনো ভোগে আছে। তাই সে ভাগেও আছে।'

আমার ভোগও নেই, তাই ভাগও নেই। আমার ইয়ত্তাও নেই, পরিচ্ছেদও নেই। আমি সর্বোপাধিশূন্য।

'কিন্তু গৃহস্থেরা কি একেবারে ডুবে যেতে পারে না?' জিগগেস করল কেশব সেন।

'তোমরা ডুবে যাবে কি গো? তোমরা একবার ডুব দেবে আবার উঠবে।' হাসল রামকৃষ্ণ।

তোমরা ঈশ্বরকোটি নও, তোমরা পানকৌটি।

'কিন্তু, কেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর?'

মহর্ষি বলতে পারো, কিন্তু আসলে রাজর্ষি। রাজর্ষি জনক। সংসারে থেকেও থাকতেন অরণ্যে। অরণ্যের নির্জনতায়।

'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর? দেবেন্দ্র? দেবেন্দ্র?' দেবেন্দ্রনাথের উদ্দেশে প্রণাম করল রামকৃষ্ণ। বললে, 'তবে কি জানো, পর্যাপ্তকাম হতে হয়। এক জনের বাড়িতে দুর্গাপূজার সময় উদয়াস্ত পাঁঠাবলি হত। এখন আর বলির সে ধুমধাম নেই। এক জন জিগগেস করলে, মশাই আপনার বাড়িতে আর বলির সে ধুমধাম কই? বাবু বললে, আরে, এখন যে দাঁত পড়ে গিয়েছে।' থেমে আবার বললে রামকৃষ্ণ, 'দেবেন্দ্রনাথ খুব মানুষ। হাতে তেল মেখে নিয়ে কাঁঠাল ভাঙছে। হাতে তেল মেখে নিয়ে কাঁঠাল ভাঙলে হাতে আর আঠা লাগে না।'

ওরে একবার পরশমানিককে ছুঁয়ে সোনা হ। তার পর হাজার বছর ধরে মাটিতে পোঁতা থাক, যে-সোনা সে-সোনাই থেকে যাবি।

মথুরবাবুকে আবার ডাকল রামকৃষ্ণ। বললে, চলো এবার আরেক তীর্থে।

সে আবার কোথায়?

দীননাথ মুখুজ্জের বাড়ি। বাগবাজারের পোলের কাছে থাকে। লোকটি বড় ভালো।

ভালো লোক হলেই তার বাড়িতে যেতে হবে? মথুরবাবু রাগ দিয়ে উঠলেন।

শুধু ভালো নয়, ভক্ত। সব সময়ে তাঁতে আছে, মন-প্রাণ সব তাঁতে গত হয়েছে।

এমন লোককে আমি দেখতে যাব না? ভক্তকে দেখা তো তাঁকেই দেখা।

দুনিয়ার গলিতে-গলিতে কত এমন ভক্ত আছে। তাই বলে সবাইকার বাড়ি-বাড়ি ধাওয়া করতে হবে না কি?

আমাকে সে সব গলি-গলির ঠিকানা এনে দাও। আমি জনে-জনে গিয়ে প্রণাম

করে আসব। ভক্ত হচ্ছেন ভগবানের বৈঠকখানা। সেখানেই তিনি বিশেষরূপে প্রকাশিত। বিশেষরূপে তরঙ্গায়িত, তরলীকৃত। বৈঠকখানাতেই তো বাবু আছেন খুশমেজাজে, দিলদরিয়া হয়ে। মজা গুড়াবার মজলিশ চালাচ্ছেন চব্বিশ ঘণ্টা। আমাকে সেই আখড়ার আড্ডাধারী করে দাও।

ভক্ত ছাড়া তীর্থ নেই মহীতলে। ষোলো টাকার পয়সা এক কাঁড়ি, কিন্তু ষোলোটি টাকা যখন একত্র করো তখন আর কাঁড়ি দেখায় না। ষোলো টাকার বদলে যদি একটি মোহর করো তখন আরো কত ছোট হয়ে গেল। আবার সেটির বদলে যদি এক কণা হীরে করো, তা হলে লোকে টেরই পায় না।

ভক্ত ছোট্টটি হয়ে আছে। শুধু ঈশ্বরের নামটি ধরে বসে আছে। তীর্থভ্রমণ, গলার মালা ভেক-আচার কিছু নেয় না, শুধু ভক্তি নিয়ে পড়ে থাকে। ভার নেয় না সার নেয়। জীবনে শুধু একখানি দলিল লিখে চুকিয়ে দেয় লেখা-পড়া। সে দলিল উইল বা দানপত্র নয়, নয় কোনো বন্ধক-তমশুক, শুধু একখানি আমমোক্তারি! ভক্ত ঈশ্বরকে আমমোক্তার দিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে বসে থাকে। সে আমমোক্তারি বিশ্বাসের খাতায় রেজেস্টারি করা। রদ-রহিত নেই কোনো কালে।

তাঁর নাম আর তিনি তো অভেদ। যা রাম তাই নাম। তেমনি যা ভগবান তাই ভক্ত।

মথুরবাবু গাড়ি নিয়ে এলেন। তীর্থদর্শনে বেরুল রামকৃষ্ণ।

সেদিন দীননাথের বাড়িতে দীননাথের এক ছেলের পৈতে হচ্ছে। বাড়িটি ছোট, কিন্তু হৈ-চৈ প্রচণ্ড। তার উপর কে এক জন বড়লোক এসেছে ল্যাণ্ডো করে, তাকে নিয়ে দীননাথের ঘরগুষ্টি ভীষণ ব্যস্ত। এমন সময় এদের দেখে ওদের অপ্রস্তুত অবস্থা। কোথায় বসায় এই অনাহূতকে? নিমন্ত্রণ না করলেও যে চলে আসে পথ চিনে, প্রার্থনার অপেক্ষা না করে? কোথায় বসাই? ঘরে যে অনেক জিনিস, অনেক আসবাব, সেখানে জায়গা কোথায়?

পাশের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন মথুরবাবু, ওপাশ থেকে কে ঝাঁজিয়ে উঠল: 'ও-ঘরে হবে না, ও-ঘরে সব মেয়েরা আছেন।'

মহা অপ্রস্তুত। জায়গা হল না রামকৃষ্ণের। তাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন মথুরবাবু।

'কেমন? দেখলে?' চটে গিয়েছেন মথুরবাবু।

রামকৃষ্ণ হাসতে লাগল। বললে, 'কেন, দীননাথকেই দেখলাম। তিনি দীননাথ, তিনি কি আমাকে ফাঁকি দিতে পারেন!'

'আর বোলো না। বসতে জায়গা দিল ঘরে?'

'ঘরে জায়গা না দিক, হৃদয়ে দিয়েছে।'

'তোমার কথা আর শুনব না। তোমার সঙ্গে যাব না আর কোথাও।' তবু রাগ যায় না মথুরবাবুর। 'তোমাকে যারা স্থান না দেয়—'

'আমাকে স্থান না দিলে স্থান কোথায় আর সংসারে?' দীননাথের মতই হাসতে লাগল রামকৃষ্ণ।

তুমি, মথুরবাবু, তুমি আর নেই। তবে আমাকে এখন বেলঘরের বাগানে কেশব সেনের কাছে কে নিয়ে যাবে?

আমি আছি—এগিয়ে এল কাপ্তেন। সঙ্গে সর্বত্রগ হৃদয়।

কিন্তু গাড়ি?

গাড়ি আমি দেব। কাপ্তেন বললে।

কাপ্তেনের সঙ্গে তার গাড়িতে চড়ে চলল রামকৃষ্ণ। চলল মাইল দুই দূরে বেলঘরে জয়গোপাল সেনের বাগানবাড়িতে। সেইখানেই কেশব এসেছে। ভক্তদল নিয়ে মেতেছে সাধন-ভজনে। চলো হরিকথা শুনে আসি। মা হাতছানি দিয়ে ডাকছেন সেখানে।

রামকৃষ্ণের পরনে শুধু লালপেড়ে একটি ধুতি। কোঁচার খুঁটটি বাঁ-কাঁধের উপর ফেলা। কালো বার্নিস-করা চটি পায়ে।

চলেছে জ্ঞানীগুণীদের মজলিশে। যেখানে হরিগুণগান, সেখানে গুণই বা কি, আর জ্ঞানই বা কি।

॥ ৫১ ॥

দেবেন্দ্রনাথের ডান হাত কেশব সেন।

চমৎকার চেহারা। সৌম্য, প্রশান্ত, ওজঃপূর্ণ। মুখশ্রীতে ঈশ্বরবিশ্বাসের লাবণ্য মাখানো। কণ্ঠস্বরে যেমন ভক্তির মধুরতা তেমনি প্রতিজ্ঞার তেজ। দার্ঢ্য আর দীপ্তির সমাহার। বাগ্‌বজ্রে বংশীধ্বনি।

চমৎকার বক্তৃতা দেয় কেশব। যেমন ইংরিজি তেমনি বাংলা। প্রথম-প্রথম ইংরিজি, শেষ দিকে কেবল বাংলা। সে বক্তৃতার কী বর্ণচ্ছটা। কী বিন্যাস-চাতুর্য। যে শোনে সেই তন্ময় হয়। সত্য পথের ধ্রুব জ্যোতিটি চোখের সামনে জ্বলতে দেখে।

দেশ তখন ভেসে যাচ্ছে। ভেসে যাচ্ছে মদে, খৃষ্টানিতে, ইংরিজিয়ানায়। উচ্ছন্নে যাবার জন্যে পাগল হয়ে ছুটোছুটি করছে চার দিকে। ছুটতে বা পারছে কই,

নর্দমায় টলে পড়ছে।

কাঁচা নর্দমার পাঁকের মধ্যে সার-সার শুয়ে আছে মাতালেরা। ধাঙড়দের ঝোড়াগুলোকে মাথার বালিশ করেছে। যেন একেক জন কত বড় বাহাদুর। পাহারাওয়ালা এলে বলছে, 'এ বাবা, নর্দমায়, মিউনিসিপ্যালিটিতে আছি, পুলিশ জুরিসডিকশানের বাইরে। টিকিটিও ধরতে পাবে না।'

"সধবার একাদশী"র নিমচাঁদ বলে, সেকালে ভূতে পেত, একালে আমাদের মদে পেয়েছে। ব্রাণ্ডির নাম বোতলচারুহাসিনী। আমি তাকে ছাড়তে পারি কিন্তু সে আমাকে ছাড়ে কই? যদি 'রাইম' করতে চাও তো মদ খাও।

সে যুগে মদ না খাওয়া মানে শিক্ষিত বলে কল্‌কে না পাওয়া। যে-কলেজ থেকে বেরিয়েছে পাশ করে তার নাম ডোবানো। স্বনামধন্য রামগোপাল ঘোষের ভাগ্নে গ্রাজুয়েট হয়েছে কিন্তু মদ খায় না। ঘোষ মশায় দুঃখ করে তাকে বলছেন, 'তুই মদ খেতে শিখলি না, তোকে আমি সমাজে বার করি কি করে?'

প্যারীচরণ সরকার "সুরাপাননিবারণী সভা" স্থাপন করলেন। মদিরার স্রোত তবু বন্ধ হয় না। নিমে দত্ত বলছে, ও সভা যদি ত্বরায় না নিপাত হয় আমি নিপাত হব। বড়মানুষের ছেলে-ব্যাটারা এক-একটি করে সভ্য হবে আর আমি ধেনো খেয়ে মরব এ হতে দেব না। এক ব্যাটা বড়মানুষের ছেলে মদ ধরলে ষাদশটি মাতাল প্রতিপালন হয়—

গিরিশ ঘোষ মদ খায়। তা নইলে না কি তার নেশা হয় না।

ঠাকুর বলেন, 'খা না—কত খাবি? কত দিন খাবি? শেষে যখন তোকে সে-নেশা ভগবৎ-নেশায় পেয়ে বসবে তখন মদ কোথায় পড়ে থাকবে টেরও পাবি না।'

সে-নেশা মদের চেয়েও দুর্মদ। সে-নেশাই সর্বনাশের নেশা।

তা ছাড়া, আরেক লক্ষণ, শিক্ষিত সমাজ সদলবলে সাহেবিয়ানার মোসাহেবি শুরু করে দিয়েছে। গায়ে বিলিতি খেলাত, মুখে বিলিতি বুকনি। যা কিছু ইংরেজি, যেমন কিছু সাহেবি তাই ওঠ-বোস মক্স করো। ইংরেজের পায়ে দেশ বিকিয়ে দিয়েছ, ভাব-ভাষাও বিলিয়ে দাও।

নিমে দত্ত বলছে, আই রীড ইংলিশ, রাইট ইংলিশ, টক ইংলিশ, স্পীচিফাই ইন ইংলিশ, থিঙ্ক্ ইন ইংলিশ, ড্রীম ইন ইংলিশ।

সেইখানে ঠাকুর এলেন খাঁটি দিশি বাংলার জয়ধ্বজা উড়িয়ে। বললেন, 'চার দিকে বড় গোলমাল। কিন্তু গোলমালেও মাল আছে। গোল ছেড়ে মালটি নেবে।'

ঠাকুর যেমন আপনি অকপট তেমনি ভাষাও অকপট।

বললেন, 'তিনটে "স" হয়েছে কেন বলতে পারিস? শ, ষ, স—এই তিন "স" কেন? এই তিন "স"-র মানে হচ্ছে স, স, স। মানে সহ্য কর্, সহ্য কর্, সহ্য কর্। যে কোনো কাজে হাত দিস্, বসিস যে কোনো সাধনায়, সহ্য করতে হবে। সহ্য না করলে সিদ্ধি নেই। এই সওয়ার বা সহ্য করার উপরে জোর দেবার জন্যেই তিনটে "স" হয়েছে।' বলেই একটি ছন্দ গাঁথলেন: 'যে সয় সে রয়, যে না সয় সে নাশ হয়।'

আগে লোকে বলত, উপমা কালিদাসস্য, এখন দেখছে, উপমা রামকৃষ্ণস্য!

তার পর পোশাকটি দেখ।

এক দিকে চাঁদনির সাহেব আরেক দিকে বাগবাজারের বাবু।

বাবুর বর্ণনা দিচ্ছে নিমচাঁদ। ভোলাচাঁদকে দেখে বলছে, 'তুমি যে বাবু সেজে বাহার দিয়ে এসেছ। মাথার মাঝখানে সিঁতে, গায়ে নিমুর হাফচাপকান, গলায় বিলাতী ঢাকাই চাদর, বিদ্যাসাগরপেড়ে ধুতি পরা, গরমি কালে হোল্ মোজা পায়, তাতে আবার ফুল-কাটা গার্টার, জুতোয় ফিতের বদলে রূপার বগলস, হাতে হাড়ের হ্যাণ্ডেল বেতের ছড়ি, আঙুলে দুটি আংটি—'

ভোলাচাঁদ ইংরেজিতে বলছে, 'ফাদার ইনলা গিভ সার—ইউ মাই ফাদার ইনলা লার—'

আর রামকৃষ্ণের পরনে লালপেড়ে ধুতি, গায়ে বড় জোর একটি মার্কিনের জামা, পায়ে কালোবার্নিশ-করা চটি, বড় জোর কখনো কচিৎ হাফ মোজা।

মাস্টারকে বললেন, 'গোটা দু-এক মার্কিনের জামা দিও। সকলের জামা তো পরি না! কালেমকে বলব মনে করেছিলাম, তা তুমিই দিও।'

মাস্টার বসে ছিল, উঠে দাঁড়াল। কৃতার্থের মত বললে, 'যে আজ্ঞে।'

কিন্তু ঠাকুর যখন ভদ্রলোক ছেড়ে ভাবলোকে আসেন তখন তিনি একেবারে দিগম্বর। তখন তিনি মঙ্গলায়তন হরি। তখন তিনি সকলেশ্বর। তাঁর ললাটফলকে কস্তুরীতিলক, বক্ষস্থলে কৌস্তুভ, নাসাগ্রে নবমৌক্তিক, করতলে বেণু, সর্বাঙ্গে হরিচন্দন। তিনি অহেতুক দয়ানিধি।

তখনকার দিনের লোকেরা প্রণাম করে না। প্রণাম করাকে কুসংস্কার বলে। প্রণাম না করে বলে, গুড মর্ণিং। বলবার সময় তর্জনীটা একবার একটু কপালে ঠেকায়। ঘাড়টা মোটা করে রাখে, কারু কাছে মাথা নোয়ায় না। মাথা নোয়ালেই যেন মানটি খোয়া যাবে।

ওরে, মাথা নত কর। যেখানে যেটুকু গুণ দেখছিস সেখানেই তো ঈশ্বরকে

দেখছিস। ঈশ্বর যে গুণগুরু। গুণাতীত হয়েও তিনি যে গুণবর্ধক। সে গুণের কাছে মাথা নোয়া। ঈশ্বরকে স্বীকার করলেই তো নিজেকে মান দিলি। যার এই মান সম্বন্ধে হুঁস আছে সেই তো মানুষ। যে বোঝে সে অমৃতের সন্তান নয়, অমৃতের সন্তান, সেই তো যথার্থ মানী।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দির মানে প্রণাম শেখার পাঠশালা।

বাগবাজারে বোসপাড়া গলির মোড়ে বসে আছে গিরিশ ঘোষ, ঠাকুর গাড়ি করে যাচ্ছেন সেখান দিয়ে। গিরিশকে দেখেই ঠাকুর প্রথমে প্রণাম করলেন। প্রণাম ফিরিয়ে দিল গিরিশ। ঠাকুর আবার প্রণাম করলেন তক্ষুনি। যতবার গিরিশ প্রণাম ফেরায় ততবার ঠাকুর আগ বাড়িয়ে নতুন আরেকটা প্রণাম করে বসেন। কাঁহাতক চালানো যায় এই প্রণামের প্রতিযোগিতা? ক্ষান্ত হল গিরিশ ঘোষ। কিন্তু প্রণামে ঠাকুরের নিবৃত্তি নেই। গিরিশের থামবার পরেও আরেক বার প্রণাম করলেন ঠাকুর।

গিরিশ ঘোষ বললে, 'দক্ষিণেশ্বরের পাগলা বামুনটার সঙ্গে প্রণামে আর টক্কর দেওয়া চলে না। ওর ঘাড় ব্যথা হয় না কিছুতে।'

ঠাকুর জগন্মাতাকে প্রণাম করছেন আর বলছেন, 'ভাগবতভক্ত, ভগবান, জ্ঞানীর চরণে প্রণাম, ভক্তের চরণে প্রণাম, সাকারবাদীর চরণে প্রণাম, নিরাকারবাদীর চরণে প্রণাম। সর্বতীর্থময় হরি। সর্বভূতে, সর্বজীবে প্রণাম।'

গিরিশ ঘোষ বলে, 'রাম অবতারে ধনুর্বাণ নিয়ে জগৎজয় হয়েছিল, কৃষ্ণ অবতারে জগৎজয় হয়েছিল বংশীধ্বনিতে, আর রামকৃষ্ণ অবতারে জগৎজয় হবে প্রণামমন্ত্রে।' নাম করো আর প্রণাম করো। প্রকৃষ্টরূপে নামই তো প্রণাম।

আরেক হাওয়া চলছিল সে যুগে—খৃষ্টানির হাওয়া। যেহেতু ইরেজের ধর্ম, সেহেতু আর কথা নেই, মেতে যাও। হিন্দুধর্ম মানে পুতুল পুজো, স্রেফ ছেলেখেলা। শিক্ষার আলোতে এসে ও সব কুসংস্কার মানতে কেউ রাজী নয়।

গীতা-উপনিষদের কেউ নাম শোনেনি। চণ্ডী? সে আবার কি মাথামুণ্ডু? চৈতন্যদেবের বাড়ি কোথায় তা কে জানে? ভাগবত? ও তো 'কথকের কথা'। সে যুগে কথকের কথা মানে আষাঢ়ের গল্প। যদি কেউ কিছু আজগুবী কথা বলে, ভদ্রলোকেরা অমনি বলে বসে—এ কথকের কথা। ভদ্রলোকেরা শোনে না কথকতা। তার চেয়ে গাঁজায় দম দেওয়া ভালো।

তবে তোমরা পড় কি?

পাদরিরা বাড়ি-বাড়ি বাইবেল দিয়ে গেছে, তাই পড়ি এক-আধটু। ইংরেজিতে লেখা, বেশ বোঝা যায় সহজে।

দেশের কতকগুলো মাথাল লোক খৃষ্টান হয়ে গেল। দেখাদেখি আরো অনেকে। যেন একটা হুজুগ পড়ে গেল। গা ভাসিয়ে দিল গড্ডলিকায়।

বাঙালী পাদরির দল বেরুল গলির মোড়ে, হেদোর ধারে, কেষ্ট বন্দ্যোর গির্জের কোণে। কালাপাহাড় মুসলমান হয়েছিল, এরা হল শাদাপাহাড়। এদের ধর্মের মধ্যে কর্ম শুধু হিন্দু দেবদেবীকে গাল পাড়া। সব চেয়ে ঝাল বেশি কালী আর কৃষ্ণের উপর। কালী ন্যাংটা আর কৃষ্ণ ননীচোর।

শ্রোতার দল মেতে ওঠে। এক কথায় বাপ-পিতামোর ধর্মকে নাকচ করে দেয়। হিন্দুধর্ম একটা কুসংস্কার। ছত্রিশ রকম জাত মানে। স্ত্রীলোক আর বাসনকোসনে তফাৎ রাখে না। পালকিতে বসিয়ে পালকি-সুদ্ধ জলে ডুবিয়ে গঙ্গাস্নান করায় মেয়েদের। যিনি অনন্ত তাকে কি না নিয়ে এসেছে ঘটে-পটে, মাটির ডেলায়। আর দেবতাও একটি-দুটি নয়, তেত্রিশ কোটি।

অত হিসেব সামলাতে পারব না। পাদরির কথাই ঠিক। ঈশ্বর এক আর নিরাকার। আর ঈশ্বরের অবতার যীশুখৃষ্টই একমাত্র সমুদ্ধর্তা।

গির্জের খাতায় নাম লেখাতে লাগল দলে-দলে। যেহেতু খৃষ্টান হলাম সেহেতু সাহেব হয়ে গেলাম। তাই নিয়ে এসো মদ, নিয়ে এসো নিষিদ্ধ মাংস।

একেই বলেছে, 'জাত মাল্লে পাদরি এসে, প্যাট মাল্লে নীল বাঁদরে।'

এখন এর উপায় কি? সব যে যায়!

রামমোহন নিয়ে এলেন বেদান্তের বাণী, দেবেন ঠাকুর তাকে সংহত করলেন ব্রাহ্মধর্মে। আর কেশব লেগে গেল প্রচারণায়। বক্তৃতা দিয়ে ফিরতে লাগল। শুধু বক্তৃতা নয়, বার করল একাধিক পত্রিকা।

উন্মার্গগামীরা একটু থমকে দাঁড়াল।

খৃষ্টধর্ম আর হিন্দুধর্মের মধ্যে একটা আপস ঘটালো কেশব সেন। মূর্তি দূর করে দাও, নিয়ে থাকো ভক্তির ভাবটি। যীশুবিহীন যীশুর ধর্ম গ্রহণ করো। তুলে দাও জাতিভেদ আর যদি দেশের মুক্তি আত্মার মুক্তি চাও, মুক্তি দাও স্ত্রী-জাতিকে।

বেশ ভাব। ইংরেজের ধর্ম খৃষ্টানিও আছে, বাপ-পিতেমোর ধর্ম হিঁদুয়ানিও আছে। চলো ব্রাহ্মসমাজে গিয়েই নাম লেখাই।

কেনারাম ডেপুটিকে জিগগেস করছে নিমচাঁদ: 'তুমি তো ব্রাহ্ম হয়েছ, হিন্দু-শাস্ত্রের তেত্রিশ কোটি দেবতার সব ত্যাগ করেছ, না, দুটি-একটি রেখেছ, সাত দোহাই তোমার, যথার্থ করে বলো—'

কেনারাম বললে, 'আমি কেতাব না দেখে উত্তর দিতে পারি না। আপনি

ভারি শক্ত প্রশ্ন করেছেন—'

'দূর ব্যাটা ঘটিরাম', নিমচাঁদ ঝাঁজিয়ে উঠল : 'তুমি ব্রাহ্মধর্ম যত বুঝেছ তা এক আঁচড়ে জানা গিয়েছে। যখন ব্রাহ্মধর্মের শর্ত হচ্ছে একমেবাদ্বিতীয়ম, তখন তেত্রিশ কোটি দেবতার সব ত্যাগ করিচিস কি না, বলতে কতক্ষণ লাগে ?'

কেনারাম চিন্তিত মুখে বললে, 'একটি-আধটি ঠাকুর হলে খপ করে বলা যায়, তেত্রিশ কোটির কথা ঝাঁ করে বলা যায় না—জানি কি, যদি দুটো-একটা রাখবার মত হয় !'

ব্রাহ্মধর্ম বুঝুক আর না বুঝুক, লোক তো আগে ফিরুক পাদরিদের খপ্পর থেকে। হুজুগটা তো বন্ধ হোক।

কেশবের বাগ্মিতায় আর ধর্মসাধনায় বিশ্বাস ফিরে এল উদ্‌ভ্রান্তদের। ঝাড়াই-বাছাই করে যদি দেশের মাঠেই পাই তবে কেন আর যাই বিদেশের মাটিতে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে নাম লিখলেই তো শুধু চলবে না, নিতে হবে নীতি আর পবিত্রতার পাঠ, সত্যনিষ্ঠা আর পরোপকারের ব্রত। 'ব্যাণ্ড অফ হোপ' নামে এক দল খুলল কেশব। মদ-তামাক খাব না। ছোঁব না নিষিদ্ধ মাংস।

নিমচাঁদকে শাসালো রামধন : 'তুমি বসো, আমি তোমার শ্রাদ্ধের আয়োজন করে আসছি।'

নিমে বললে, 'ব্রাহ্মমতে কোরো বাবা। অনেক বৃষ পার করেছি, এখন আর বৃষ উৎসর্গ ভালো লাগবে না।'

এর পর আবার আরেক দল উঠল যারা ঠাকুর-দেবতাও মানে না নিরাকার ব্রহ্মও বোঝে না। তারা নাস্তিক, সংশয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন। কোনটা যে ধরবে ঠিক করতে পারছে না। হাল-ছাড়া নৌকোর মতো দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আরেক দল উঠল, যারা প্রত্যক্ষবাদী। ধর্ম-টর্ম ধার ধারে না, ইন্দ্রিয়ের বাইরে জানে না আর কোনো অনুভূতির অস্তিত্ব।

চার দিকে বিশৃঙ্খলা, অশান্তি, একটা ঝোড়ো হাওয়ার এলোমেলো ধুলো।

এমন সময় ঠাকুর এলেন। সনাতন ধর্মের শাশ্বত জ্যোতির স্নিগ্ধতা নিয়ে, বিশ্ব-বিস্তীর্ণ উদার উন্মুক্তি নিয়ে। হিন্দুধর্মের উজ্জ্বলন্ত প্রতীক হয়ে, নির্গলিত ভাস্ত হয়ে। নিয়ে এলেন শান্তি, সাম্য, সামঞ্জস্য। নিয়ে এলেন সঙ্গতি, সংহতি, সমন্বয়। খণ্ডের ঘরে ক্ষুদ্রের ঘরে রইলেন না, এলেন একেবারে ভুবনজোড়া আসন মেলে।

নিয়ে এলেন সত্য, শৌচ, দয়া, শান্তি, ত্যাগ, সন্তোষ আর আর্জব। শম দম তপ সাম্য তিতিক্ষা শ্রুত আর উপরতি। নিয়ে এলেন প্রেম। প্রেমের অমোঘ মহিমা।

ভগবান ভূতভাবন হিন্দুধর্মের মহাঙ্কিত পতাকা নিয়ে অবতীর্ণ হলেন দক্ষিণেশ্বরে। যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত—হৃতপ্রভ সূর্য উদ্দীপিত হল। ঠাকুর মৃতদেহে নিশ্বাস সঞ্চার করলেন। ক্রমে-ক্রমে সঞ্চার করলেন আশ্বাস। তার পর সকলে বিশ্বাসের বটপত্রে ভেসে-ভেসে চলল। ভেসে চলল সেই অমৃতের সমুদ্রে।

দক্ষিণেশ্বরের দুর্গম অরণ্যে সরল একটি ফুল ফুটেছে। কিন্তু লোকে তার গন্ধটির খবর পায় কি করে? ফুল তো ফুটলেই চলে না, চাই গন্ধবহ সমীরণ। যে বলবে, দেখ, কেমন ফুল ফুটেছে; আর, শোনো, আমার সঙ্গ ধরো, দেখবে চলো, কোথায় ফুটেছে এ ফুল! আমি নিয়ে এসেছি সেই কাননের ঠিকানা।

কেশব সেনই সেই গন্ধবহ সমীরণ।

॥ ৫২ ॥

কেশব সেনকে রামকৃষ্ণ প্রথমে দেখে আদি সমাজে, সে অনেক আগে। মসজিদ ঘুরে, গির্জে ঘুরে গিয়েছিল এক দিন ব্রাহ্মসভায়। গিয়ে দেখে বেদীর উপর চার পাশে অনেক লোক, মাঝখানে কেশব। ধ্যান করছে চোখ বুজে।

'জোড়াসাঁকোর দেবেন্দ্রের সমাজে গিয়ে দেখলাম, তাকের উপর ক'জন বসেছে, কেশব মাঝখানে। দেখলাম যেন কাঠবৎ। সেজবাবুকে বললাম, যত জন ধ্যান করছে তার মধ্যে ঐ কেশব ছোকরারই ফাতনা ডুবেছে। ও কি যে-সে ছেলে? লেখাপড়া নেই, বাপের ধার মেনে নিলে এক কথায়। অন্য ছেলে হলে মানত?'

কিন্তু চোখ বুজেই বা ধ্যান করতে হবে কেন? চোখ চেয়েও ধ্যান হয়। কথা কইছে তবু ধ্যান। যেমন ধরো দাঁতের ব্যথা। সব কাজ করছে কিন্তু মন রয়েছে দরদের দিকে। চোখ চেয়ে আছে, কথা কইছে, কাজ করছে, কিন্তু মন রয়েছে ভগবানে বিদ্ধ হয়ে। তিনিও আমাকে চান, আমিও তাঁকে চাই, তবু ধরতে পারছি না, মিলতে পারছি না—এ কি কম যন্ত্রণা?

এবার শুধু দূর থেকে দেখা নয়, কাছে এসে বসা, আলাপ করা, অন্তরের অঙ্গ হয়ে যাওয়া। তার আগে কেশবকে এক দিন স্বপ্নে দেখেছিল রামকৃষ্ণ। মা-ই দেখিয়েছিলেন। কেশব যেন পেখম-মেলা ময়ূর, ময়ূরের মাথায় মুক্তো। মা-ই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। পেখম হচ্ছে কেশবের শিষ্যমণ্ডল আর মুক্তোটি হচ্ছে তার রাজসিকতার দীপ্তি।

সকাল বেলার দিকে কেশব তার শিষ্যবৃন্দ নিয়ে পুকুরে বাঁধাঘাটে বসে আছে,

হৃদয় আস্তে-আস্তে কাছে এল। বললে, 'আমার মামা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

কে আপনার মামা?

ঐ দক্ষিণেশ্বরে থাকেন। হরিকথা শুনতে বড় ভালবাসেন। সারা দিনরাত ডুবে আছেন এই হরিকথায়। যেখানে হরিনাম পান হরিভক্ত পান সেখানেই গিয়ে উপস্থিত হন। হরিগুণগান শুনে তাঁর ভাবসমাধি হয়। আপনি এখানে হরি-নাম করতে এসেছেন জেনে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

'কোথায় তিনি?'

'গাড়িতে বসে আছেন।'

'নিয়ে আসুন নামিয়ে।' কেশব ব্যস্ত হয়ে উঠল।

হৃদয় গিয়ে নামিয়ে নিয়ে এল রামকৃষ্ণকে। সবাই রামকৃষ্ণকে দেখবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে। দেখে হতাশ হবার ভাব করল। ও! এই? এ তো এক জন সাধারণ লোক। আজেবাজে পাঁচ জনেরই এক জন।

রামকৃষ্ণ বুঝতে পেরেছেন কোন জন কেশব। বুকের ভিতরে তারে-তারে সুর বেজে উঠল। কেশবের কাছে আসবার আগে নারায়ণ শাস্ত্রীকে পাঠিয়েছিল একবার রামকৃষ্ণ। বলেছিল, তুমি একবার যাও, গিয়ে দেখে এস তো কেমন লোক। নারায়ণ দেখে এসে বলেছিল লোকটা জপে সিদ্ধ!

রামকৃষ্ণ কেশবের কাছটিতে চলে এল। বললে, 'বাবু, তোমাদের কাছে ঈশ্বরের কথা শুনতে এসেছি। তোমরা না কি দেখেছ ঈশ্বরকে? সে কেমনতরো দর্শন আমাকে একটু বলবে?'

কেশব তন্ময়ের মত তাকিয়ে রইল রামকৃষ্ণের দিকে। এ সে কী দেখছে? কাকে দেখছে? বললে, 'আপনি বলুন—'

আমি বলব? গলা ছেড়ে গান ধরল রামকৃষ্ণ।

'কে জানে কালী কেমন,
ষড়দর্শনে না পায় দরশন,
মূলাধারে সহস্রারে
সদাযোগী করে মনন।
ঘটে ঘটে বিরাজ করেন
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড
প্রকাণ্ড তা জানো কেমন,

BanglaBook.net

মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম,
অন্য কেবা জানে তেমন।
প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে
সন্তরণে সিন্ধু তরণ ॥'

গাইতে-গাইতে রামকৃষ্ণের সমাধি হয়ে গেল। উপস্থিত সকলে ভাবলে এ বুঝি একটা ঢং, মস্তিষ্কের বিকার। কিংবা হয়তো লোকটার যুগি আছে।
রামকৃষ্ণের কানে হৃদয় প্রণব-মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল। হরি ওঁ! হরি ওঁ! ধীরে-ধীরে রামকৃষ্ণের মুখ প্রসন্ন পবিত্র হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যে আস্বাদন করে এসেছে, অবগাহন করে এসেছে এ তার মুখ। এ মুখ উপলব্ধির, সমাপত্তির। জ্ঞানানন্দ, বোধানন্দ আর মিলনানন্দের সংমিশ্রণ।
এ মুখের বিভা দেখে অভিভূত হয়ে গেল সকলে।
অন্ধেরা হাতি দেখে এল ছুঁয়ে-ছুঁয়ে। এক জনের হাত পড়েছিল পায়ে, সে বললে, হাতি ঠিক থামের মতো। আরেক জনের হাত পড়েছিল পেটে, সে বললে, জলের জালার মতো। দূর, কুলোর মতো—কানে হাত রেখেছিল যে তৃতীয় জন সে বললে।

'ভাবলে ভাবের উদয় হয়।
যেমনি ভাব তেমনি লাভ মূল সে প্রত্যয়।'

গাছে এক গিরগিটি থাকে। এক জন তাকে দেখে এসে বললে, একটা সুন্দর লাল রঙের জানোয়ার দেখলাম। আরেক জন বললে, ভুল দেখেছিস, লাল নয় নীল। তোরা তো খুব জানিস! আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি আজ সকালে, বিলকুল হলদে। বললে তৃতীয় জন। কাকে যে তোরা কি রঙ বলিস কিছু ঠিক নেই। বিদ্রূপ করে হেসে উঠল চতুর্থ জন। শ্রেফ সবুজ, একেবারে কচু পাতার রঙ। মহাবিরোধ উপস্থিত। সবাই মিলে চলল গাছের নিচে। গিয়ে দেখে এক জন লোক বসে আছে সেখানে। তাকে সবাই ধরল। আপনি তো এখানকার বাসিন্দে, বলুন জানোয়ারটার কী রঙ? যে যেমন দেখ তেমনি। তোমাদের সকলের কথাই ঠিক, ও কখনো লাল কখনো নীল কখনো হলদে কখনো সবুজ। ওটা বহুরূপী। আবার কখনো-কখনো দেখা যাবে ওটার একদম রঙ নেই। ওটা বর্ণহীন, নির্গুণ।

সবাই তন্ময় হয়ে শুনতে লাগল রামকৃষ্ণকে।

ভক্ত যে রূপটি ভালোবাসে ভগবান সেই রূপটি ধরে দেখা দেন। এক জনের এক গামলা রঙ ছিল। অনেকে আসত তার কাছে কাপড় রঙ করবার জন্যে। যে যে-রঙ চায় তার কাপড় সেই রঙে ছুপিয়ে দিত। এক জন দেখাছল এই আশ্চর্য ব্যাপার। তাকে রঙওয়ালা জিগগেস করলে, তোমার কী রঙ চাই? সে বললে, 'ভাই যে রঙে রঙেছ আমায় সেই রঙ দাও।'

কী গভীর কথা কেমন সরস করে বলছে রামকৃষ্ণ। স্নানাহারের বেলা হয়ে গেল তবু কারু ওঠবার নাম নেই।

নিরাকার জ্ঞানের সাধন, সাকার ভক্তির। ভক্তির কাছে নিরাকার এনো না, কিছু দেখতে না পেলে ধরতে না পেলে তার ভক্তির হানি হবে। সাকার থেকে চলে আসবে সে নিরাকারে। আগে হয়তো দশভুজা নিলে—সে মূর্তিতে বেশি ঐশ্বর্য। তার পর চতুর্ভুজ। তার পর দ্বিভুজ। তার পর গোপাল—বালগোপাল। ঐশ্বর্যের বালাই নেই, কেবল একটি কচি ছেলের মূর্তি। তার পরে আরো ছোট হয়ে গেল—একটি শিবলিঙ্গ বা শালগ্রাম। তার পর? আর দরকার নেই রূপে। প্রতীক তখন প্রত্যক্ষের বাইরে। তখন মহাব্যোমে একটি অখণ্ড জ্যোতি। সেই জ্যোতি দর্শন করেই লয়।

কিন্তু তার পর? ধ্যান যখন ভাঙবে? জ্ঞানের পর কোথায় এসে দাঁড়াবে? দাঁড়াবে এসে প্রেমে। তখন আবার সাকারে চলে আসবে। তখন দেখবে সমস্ত জীব ঈশ্বরের প্রতিভাস। জীবের আকারে ব্রহ্ম বিচরণ করছেন। তখন ব্রহ্মোপাসনা মানে জীবোপাসনা। আর জীবে যা প্রেম ঈশ্বরে তাই ভক্তি। আর ভক্তির প্রগাঢ় পরিপক্ক অবস্থাই প্রেম।

উপাসনার ঘণ্টা বাজল। এখন উঠতে হয় এই আড্ডা ছেড়ে।

কে ওঠে! কোথায় আবার উপাসনা! ভগবানের কাছটিতে বসাই তো উপাসনা। এ কি আমরা ভগবানের কাছটিতে বসে নেই?

বেদান্তের বিচারে ব্রহ্ম নির্গুণ। তাঁর কী স্বরূপ কেউ বলতে পারে না। কিন্তু যতক্ষণ তুমি সত্য ততক্ষণ জগৎও সত্য। ঈশ্বরের নানা রূপও সত্য। ঈশ্বরকে ব্যক্তিবোধও সত্য।

দুই-ই সত্য। নিরাকারও সত্য, সাকারও সত্য। কবীর বলত, নিরাকার আমার বাপ, সাকার আমার মা। তুমি কাকে ছেড়ে কাকে রাখবে?

নানা রকম পূজা তিনিই আয়োজন করেছেন, অধিকারী ভেদে। যার যেমন পেটে সয় তেমনিই তো পরিবেশন করবেন। বাড়িতে যদি বড় মাছ আসে, মা

নানা রকম মাছের তরকারি রাঁধেন—যার যেটি মুখে রোচে। কারু জন্যে মাছের টক, কারু জন্যে মাছের চচ্চড়ি, কারু জন্যে মাছ ভাজা। যেটি যার ভালো লাগে, যেটি যার পেটে সয়। সর্বত্রই সেই মৎস্যস্বাদ।

আমাদের হলধারী দিনে সাকারে আর রাতে নিরাকারে থাকত। তা যে ভাবেই থাকো, ঠিক-ঠিক বিশ্বাস হলেই হল। বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস। গুরু বলে দিয়েছে, রামই সব হয়েছেন—'ওহি রাম ঘট ঘটমে লেটা।' কুকুর এসে রুটি খেয়ে যাচ্ছে। ভক্ত বলছে, 'রাম! দাঁড়াও, দাঁড়াও, রুটিতে ঘি মেখে দিই।' গুরুবাক্যে এমনি বিশ্বাস!

কিন্তু যাই বলো, সাকারই বলো নিরাকারই বলো, তিনি রয়েছেন এই খোলের মধ্যেই। হরিণের নাভিতে কস্তুরী হয়, তখন তার গন্ধে হরিণগুলো দিকে-দিকে ছুটে বেড়ায়, জানে না কোত্থেকে গন্ধ আসছে। তেমনি ভগবান এই মানুষের দেহের মধ্যেই রয়েছেন, মানুষ তাকে জানতে না পেরে ঘুরে-ঘুরে মরছে।

এ কি, আজ কি আর কোনো কাজ হবে না না কি? সবাই এমনি বসে থাকবে সারাক্ষণ? মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে আছে। মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে আছে। চার দিকে শুধু আনন্দের ঢেউ।

'এ যেন গরুর পালে গরু এসেছে। ঝাঁকের কই মিশেছে ঝাঁকে এসে। তাই এত লহর পড়েছে চার দিকে।'

কেশব ভক্তিতে অভিভূত হয়ে পড়েছে। এমনটি তো সে কই ভাবেনি। এ যে একেবারে 'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ'। ভূমার অখণ্ড অভ্যুদয়। প্রণামের রসে আপ্লুত হল কেশব। নিজেকে বালকের মতন মনে হল। চিনির পাহাড়ের কাছে ক্ষুদ্র এক পিপীলিকা।

নিশ্চয়ই ঈশ্বর দেখেছে, পেয়েছে, হয়েছে। নইলে এমন সব কথা কয়! কথায়-কথায় এমন একটি ভাব আনে! এমন সব সহজ করে দেয় সহজে।

তর্কের জায়গা নেই, প্রশ্ন সব ঘুমিয়ে পড়েছে। সন্দেহ মাথা তুলতে পারছে না। চোখের সামনে বসে আছে যেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সর্বশেষ উপলব্ধি।

উঠল রামকৃষ্ণ। যাবার আগে কেশবকে বললে, 'তোমার ল্যাজ খসেছে।'

কেশব তো অবাক।

ব্যাঙাচির যদ্দিন ল্যাজ থাকে তদ্দিন জলেই থাকে, ডাঙায় উঠতে পারে না। কিন্তু ল্যাজ যখন খসে পড়ে তখন জলেও থাকতে পারে, ডাঙায়ও উঠতে পারে। তেমনি মানুষের যদ্দিন অবিদ্যার ল্যাজ থাকে তদ্দিন সে সংসার-জলেই থাকতে পারে, ব্রহ্মস্থলে উঠতে পারে না। ল্যাজ খসে পড়লেই সংসার ও সারাৎসার

দুই জায়গায়ই সে থাকতে পারে। তুমি তেমনি সংসারেও আছ সচ্চিদানন্দেও আছ।

সংসারে থেকে যে তাঁকে ডাকে সে বীরভক্ত। যে সংসার ছেড়ে এসেছে সে তো ডাকবেই—ডাকবার জন্যই এসেছে, তাতে তার বাহাদুরি কি। সংসারে থেকে যে ডাকে, সে বিশ মণ পাথর ঠেলে দেখতে চায়, সেই ধন্য, সেই বাহাদুর, সেই বীরপুরুষ।

রামকৃষ্ণ চলে গেলে এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। এই সহজ সুন্দরটি কে? কে এই সদয়হৃদয়? কে এই মায়ামানুষবেশী?

চলো যাই সভা করে সবাইকে বলি গে। অখিল মধুরের যিনি অধিপতি তিনি এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে।

তুমি কি তাঁকে চোখে দেখেছ? সবাই ঘিরে ধরে কেশবকে।

চোখে দেখেছি। দুই চোখে তাঁকে কুলোয় না। চল তোরাও দেখবি চল।

॥ ৫৩ ॥

দক্ষিণেশ্বরে চর পাঠিয়ে দিল কেশব। লক্ষ্য করবে রামকৃষ্ণকে। চোখে-চোখে রাখবে। রাত-দিন পাহারা দেবে। ঠিক-ঠিক খাঁটি কিনা, না, আছে কিছু বুজরুকি।

হ্যাঁ, ভালো কথা, বাজিয়ে নাও, যাচাই করে নাও। পরের মুখের ঝাল খাবে কেন? কেন মেনে নেবে শোনা কথা? নিজে এসো, বসো, দেখ পরখ করে। তন্ন-তন্ন করে দেখ।

কিন্তু পরীক্ষার পর প্রমাণে যদি পরিতৃপ্ত হও, তখন কী হবে? কোন দিকে যাত্রা করবে?

তিন জন ব্রাহ্ম-ভক্ত এল দক্ষিণেশ্বরে। তাদের মধ্যে এক জন প্রসন্ন। পালা করে রাত-দিন দেখবে রামকৃষ্ণকে আর কেশব সেনকে রিপোর্ট দেবে। পোশাকী আর আটপৌরে এমন কিছু ভেদ আছে নাকি রামকৃষ্ণের। সে মনে-মুখে এক কি না। সে কি সত্যিই জিতাসন, জিতশ্বাস, জিতেন্দ্রিয়? সে কি সত্যিই পরিমুক্তসঙ্গ?

রামকৃষ্ণের ঘরের মধ্যে চলে এল সটান। বললে, 'রাত্রে আমরা ও-ঘরে শোব।'

বেশ তো, শোও না। ঢালাও নিমন্ত্রণ রামকৃষ্ণের।

কিন্তু তুমি তো চুপ করে শুয়ে থাক। তা না, কেবল 'দয়াময়', 'দয়াময়' করতে

লাগল। নিরাকার কিনা, তাই ঈশ্বরের দয়া ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। তাঁর ঐশ্বর্যই তো দয়া। সূর্যের ঐশ্বর্যের যেমন আলো। সূর্যকে যদি 'আলোময়' 'আলোময়' বলা যায়, কিছুই বলা হয় না। নতুন কিছু বল। ডাকার মতন করে ডাক। যে-ডাকে শুধু দয়া দেখাতে আসবে না, ভালোবাসায় গলে জল হয়ে যাবে।

ব্রাহ্ম ভক্তরা কেশবের স্তুতি আরম্ভ করল। বলল, 'কেশববাবুকে ধরো, তা হলেই তোমার ভালো হবে।'

'কিন্তু আমি যে সাকার মানি।'

আমি যে মা বলে ডাকি। মাকে যদি নিরাকার করি তবে অমন কোলটুকু পাব কি করে? কি করে দেখব তবে সেই সুখপ্রসন্ন বদনের স্নেহময় সুষমা?

মা কি আমার সামান্য? মা আমার অনন্তরূপিণী। মা আমার কালাভ্র-শ্যামপাঙ্গী, বিগলিতচিকুরা, খড়্গমুণ্ডাভিরামা। মহামেঘপ্রভা, শ্মশানালয়-বাসিনী। বলতে চাও, এমন রূপটি আমি দেখব না নয়ন ভরে? দেখব না তো, আমার নয়ন হল কেন?

শোনো, কমলাকান্ত কি বলছে। দেখে, শুনতে-শুনতে দেখো কিনা চোখের সামনে।

সমর আলো করে কার কামিনী!
সজল জলদ জিনিয়া কায়
দশনে প্রকাশে দামিনী॥
এলায়ে চাঁচর চিকুর পাশ
সুরাসুর মাঝে না করে ত্রাস,
অট্টহাসে দানব নাশে
রণপ্রকাশে রঙ্গিণী॥
কিবা শোভা করে ভ্রমজ বিন্দু
ঘন তনু ঘেরি কুমুদবন্ধু
অমিয় সিন্ধু হেরিয়ে ইন্দু
মলিন, এ কোন মোহিনী॥
এ কি অসম্ভব ভব-পরাভব
পদতলে শব সদৃশ নীরব
কমলাকান্ত কর অনুভব।
কে বটে ও গজগামিনী॥

এই রণরামা নীরদবরণীকে দেখব না আমি? আহা, দেখ, দেখ, শোণিত-সায়রে যেন নীল নলিনী ভাসছে!

তবুও ব্রাহ্ম-ভক্তরা কেবল 'দয়াময়' 'দয়াময়' করে। ঘুমুতে দেবে না রামকৃষ্ণকে।

তখন রামকৃষ্ণের ভাবাবস্থা হল। সেই অবস্থায় আরূঢ় থেকে বললে সেই ভক্তদের: 'এ ঘর থেকে চলে যাও বলছি।'

যেন বজ্রঘোষের আদেশ। ভক্তরা তখন পালিয়ে যেতে পথ পায় না। ঘর ছেড়ে তখন বারান্দায় গিয়ে শুলো।

কাপ্তেনও এমনি পরীক্ষা করে নিয়েছিল। যেদিন দিনের বেলায় প্রথম দেখলে রামকৃষ্ণকে, ঠিক করলে রাতের বেলাও দেখে যেতে হবে। দেখে যেতে হবে রাতেও এ সূর্য সমপ্রভই থাকে কিনা। কোণটিতে চুপি-চুপি রইল চোখ মেলে। দেখল এ সূর্যের উদয়াচলই আছে, অস্তাচল নেই।

আমাকে শক্ত হাতে বাজিয়ে নিবি, যেমন করে খাদের উপরে মহাজনে টাকা বাজায়। বেপারী যেমন তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নেয় মালের টুটা-ফুটা। ভক্ত হয়েছিস বলে বোকা হবি কেন? বুঝে-সুঝে দেখে-শুনে নিবি। সন্দেহই যদি রাখবি তবে সন্ধান জানবি কি করে?

নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে এসেছে। ঠাকুরের ঘরটিতে গিয়ে দেখে, ঠাকুর নেই। কোথায় তিনি? কলকাতায় গিয়েছেন। ফিরবেন কখন? এই এলেন বলে।

তা হোক, এই সোনার সময়। দেখা যাক কেমন তাঁর সোনার উপর বিতৃষ্ণা!

ঘর ফাঁকা হতেই পকেট থেকে একটা টাকা বের করলে নরেন। ঠাকুরের বিছানার নিচে আলগোছে লুকিয়ে রাখলে। সে-তল্লাটেই আর রইল না তার পর। সিধে চলে গেল পঞ্চবটী। কেউ যেন ঘুণাক্ষরে না টের পায়!

কতক্ষণ পরেই ফিরেএলেন ঠাকুর। দেখতে পেয়েই নরেন এগিয়ে এল তাড়াতাড়ি। এবার বোঝা যাবে কাঞ্চনত্যাগের মহিমা। ঘরের মধ্যে আগে ভাগে ঢুকে ঠিক কোণটি বেছে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

যেমন নিত্য বসেন তেমনি বিছানায় এসে বসলেন ঠাকুর। কিন্তু গা ঠেকিয়েছেন কি না ঠেকিয়েছেন চীৎকার করে উঠলেন। যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের উপরে বসেছেন এমনি দগ্ধকর যন্ত্রণা। কী হল? ব্যস্ত হয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল সকলে। বিষাক্ত কিছু দংশন করল নাকি? কই, বিছানায় কিছু দেখা যাচ্ছে না তো!

ঠাকুর সরে দাঁড়ালেন খাটের থেকে। কাছাকাছি যারা ছিল সবল হাতে ঝাড়তে লাগল বিছানা। টং টং করে হঠাৎ একটা আওয়াজ হল মেঝের উপর। ওটা কি! ওটা এক টা টাকা দেখছি না? বিছানায় এল কি করে?

নরেন তাড়াতাড়ি চলে গেল ঘর ছেড়ে।

বুঝেছি, বুঝেছি। আনন্দে ঠাকুর বিহ্বল হয়ে উঠলেন। তুই আমাকে পরীক্ষা করছিস।

বেশ তো, নিবিই তো পরীক্ষা করে। কত পরীক্ষা করেছেন মথুরবাবু। কাঁকা ঘরে মেয়েমানুষ ঢুকিয়ে দিয়েছেন, বলেছেন জমিদারির খানিকটা তোমাকে লিখে দি। তোদের যার যেমন মন চায় যাচাই করে নে। যা চাই তা পাব কিনা—এ জিজ্ঞাসায় যখন এসেছিস তখন যাচাই করা ছাড়বি কেন?

তোদের সকলের সন্দেহ নিরসন করে নে। চলে আয় সত্যের স্থিরতায়। সিদ্ধান্তের শান্তিতে।

পরিণত বয়স জমিদার নবীন রায়চৌধুরীর ছেলে যোগীন। বিয়ে করেছে, তবু রোজ রাতে বাড়ি যায় না, প্রায়ই ঠাকুরের কাছটিতে পড়ে থাকে। যখন আর-আর ভক্তরা কাছে-ভিতে কেউ নেই, তখন ফাঁকতালে ঠাকুরের কোনো কাজে লেগে যেতে পারে কিনা, তারই আশায় জেগে থাকে।

সেদিন সন্ধ্যে হতে-না-হতেই ভক্তেরা বিদায় নিয়েছে। যোগীন বসে আছে একলাটি।

'কি রে, বাড়ি যাবি না?'

'কেউ আজ নেই আপনার কাছে। ভাবছি, আমিই তবে থেকে যাই রাতখানা।'

ঠাকুর খুশি হলেন। রাত দশটা পর্যন্ত আলাপ করলেন একটানা। আলাপের বিষয়ও সেই এক টানের বিষয়। অটনে-অনটনে সেই এক ঈশ্বরের টান।

রাত দশটায় জলযোগ করলেন ঠাকুর। যোগীনও খেয়ে নিল কালীঘরে। ঠাকুর শুয়ে পড়লেন তাঁর বড় খাটটিতে। সেই ঘরের মেঝেতে বিছানা পাতল যোগীন। মাঝ রাত। ঠাকুরের একটিবার বাইরে যাবার দরকার হল। তিনি তাকালেন যোগীনের দিকে। অঘোরে ঘুমুচ্ছে ছেলেটা। কেমন মায়া হল ঠাকুরের, ডেকে ঘুম ভাঙালেন না। নিজেই দোর খুলে বেরিয়ে গেলেন। একা-একা চলে গেলেন ঝাউতলা।

খানিক পরেই ঘুম ভেঙে গেল যোগীনের। এ কি, ঘরের দরজা খোলা কেন? ঠাকুর কোথায়? বিছানা শূন্য। এত রাতে কোথায় গেলেন তিনি একা-একা? গাড়ু-গামছা তো সব ঠিক-ঠিক জায়গাই আছে। আর তাই যদি যাবেন, তবে

তাকে দাঁড়িয়ে দিতে নিয়ে গেলেন না কেন সঙ্গে করে? তবে বোধ হয় চাঁদের আলোয় একটু বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। গঙ্গায় ঝিরঝিরে হাওয়া দিয়েছে।

কই, গঙ্গার কাছাকাছি কোথাও তিনি নেই তো! যোগীন বাইরে এসে উৎসুক চোখে দেখতে লাগল চার দিক। কোথাও সাড়াও নেই শব্দও নেই। হঠাৎ বুকের মধ্যে ধাক্কা খেল যোগীন। ঠাকুর লুকিয়ে তাঁর স্ত্রীর কাছে নহবৎখানায় যাননি তো? ভয় করতে লাগল যোগীনের। দিনের বেলা তিনি যা বলেন রাতের বেলা তিনি তা পালন করেন না? ডুবে-ডুবে জল খান?

না, এর একটা হেস্ত নেস্ত দেখে যেতে হবে। নহবৎখানার কাছাকাছি এগিয়ে গেল যোগীন। নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইল দরজার দিকে। ব্যাপারটা অন্যায় হচ্ছে তবু নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি নেই।

দরজা খুলে ঠাকুর বেরিয়ে এলেই দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে সোজা বাড়ি চলে যাবে যোগীন। পথ ভুলেও আসবে না এ তল্লাটে।

সমস্ত আকাশ-বাতাস যেন নিশ্বাস রুদ্ধ করে আছে। একটি গাছের পাতাও নড়ছে না। উৎসুক এক প্রতীক্ষা মুহূর্তের মালায় স্তব্ধতার মন্ত্র জপ করে চলেছে। যিনি অচ্যুত তিনি যেন এখুনি বিচ্যুত হয়ে পড়বেন!

চট-চট—চটি জুতোর আওয়াজ শোনা গেল। কে যেন আসছে পঞ্চবটীর ওদিক থেকে। কান খাড়া করল যোগীন। এ তো সেই পরিচিত পদশব্দ। সর্বাঙ্গে শিউরে উঠে তাকাল চন্দ্রালোকে। সত্যিই তো, ঠাকুরই তো আসছেন।

কে কাকে ধরে ফেলে! যোগীনের ইচ্ছে হল মাটির সঙ্গে মিশে যাই। যে মাটিতে তিনি পা রেখেছেন সেই পদস্পর্শনের মাটিতে।

'কি রে এখানে দাঁড়িয়ে আছিস যে?' কাছে এসে প্রশান্ত বয়ানে জিগগেস করলেন ঠাকুর।

অধোমুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল যোগীন।

অন্তরদর্শী বুঝেছেন এক পলকে। তবু অপরাধ নেবার নাম নেই। তবু আশ্বাসের স্নেহছত্র মেলে ধরলেন স্বচ্ছন্দে। বললেন, 'বেশ, বেশ, এই তো চাই। সাধুকে সহজে বিশ্বাস করবি নে। সাধুকে দিনে দেখবি, রাতে দেখবি, ছবে বিশ্বাস করবি। নে, চল, ঠিক করেছিস, এখন ঘরে আয়।'

ঠাকুরের পিছু-পিছু ঘরে ঢুকল যোগীন।

সারা রাত আর ঘুম এলো না যোগীনের। মনে-মনে বারংবার ক্ষমা চাইতে লাগলো সেই ক্ষমাময়ের কাছে।

ভগবানকে ছোট করেছেন বলে ব্যাসদেব যেমন ক্ষমা চেয়েছিলেন। বলেছিলেন,

হে জগদীশ্বর, তুমি রূপবর্জিত, অথচ আমি ধ্যানে তোমার রূপকল্পনা করেছি। তুমি অখিলগুরু, বাক্যের অতীত, অথচ আমি স্তবস্তুতি করে তোমার অনির্বচনীয়তা নষ্ট করেছি। তুমি সর্বব্যাপী, অথচ আমি তীর্থভ্রমণ করে তোমার সেই সর্বব্যাপিত্ব খণ্ডন করেছি। আমি ঘোরতর অপরাধী। আমার এই বিকল্পতা-দোষত্রয় মার্জনা করো।

তেমনি করেই আকুল অনিদ্রায় ক্ষমা চাইতে লাগলো যোগীন। তুমি সংশয়-পরিলেশশূন্য। অথচ আমি আমার আবিল মনের কুটিল সন্দেহের ছায়া ফেললাম তোমার উপর। প্রভু, আমাকে ক্ষমা করো। তোমার পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতে আমাদের অনচ্ছন্ন দৃষ্টি সংশোধন করে দাও।

'কাকে সাধু বলে মশাই?' এক প্রতিবেশী এসে জিগগেস করলে রামকৃষ্ণকে।

'যার মন-প্রাণ-অন্তরাত্মা ঈশ্বরে নত হয়েছে তিনিই সাধু। যিনি কামকাঞ্চন-ত্যাগী। যিনি স্ত্রীলোককে মাতৃবৎ দেখেন, পুজো করেন। সর্বদা ঈশ্বর চিন্তা করেন, ঈশ্বরীয় কথা বই কথা কন না। আর সর্বভূতে ঈশ্বর আছে জেনে আপামর সকলের সেবা করেন।'

সাধুর আশা নেই, আসক্তি নেই। সে সতত সন্তুষ্ট। সে বহির্নিশ্চেষ্ট। তার আরম্ভ-উদ্যোগ নেই। তার সর্বত্র সমবুদ্ধি। তার ফলেও যা অফলেও তাই। তার কাছে নিন্দা স্তুতি এক কথা। শত্রু-মিত্র এক জন। তার গতি চঞ্চল কিন্তু মতিটি স্থির। তার বেষ-লেশ নেই। সে প্রসন্নোদ মূর্তি। হেতু নেই অথচ ভক্তি। অকারণে অবারণ ভক্তি। প্রহ্লাদকে যখন কৃষ্ণ বর দিতে চাইলেন, প্রহ্লাদ কী বললে? বললে, 'যদি বর দেবেনই তবে এই বর দিন, আমায় যারা কষ্ট দিয়েছে, তাদের যেন অপরাধ না হয়। তারা যেন কষ্ট না পায়।' যে সাধু সে প্রহ্লাদের মতই সর্বভূতে হিতকামী।

তেমনি এক জন সাধু বসেছে দক্ষিণেশ্বরে। অক্ষতপুণ্যলেশ। অপঙ্কতোয় অচ্ছোদ সরোবর। তাঁর নাম রামকৃষ্ণ পরমহংস। অভয়প্রদ আশ্রয়কেতন। তাঁকে দেখতে চলো দলে-দলে।

ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিতে লাগল কেশব সেন। সাধারণ ব্রহ্মমন্দির থেকে, এমন কি ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসে স্বশাস্ত্ররূপ স্বরূপানন্দ রামকৃষ্ণ। একেবারে বালকস্বভাব। ঘরের কাছে এই অনন্ত ধনের খবর না নিয়ে যাবে তোমরা বিদেশের বিপণিতে?

শুধু রসনা নয়, তেজস্বিনী লেখনী চালালে কেশব। সুলভ সমাচার, সানডে মিরর আর থিইস্টিক কোয়ার্টার্লি রিভিয়ুতে লিখতে লাগল।

ওরে আর কেউ নয়, কেশব সেন বলছে, কেশব সেন লিখছে। যেমন তপ্ত ভাষা তেমনি দীপ্ত লেখা। এ কি ফেলা চলে? দেখছিস, বলতে-বলতে কেশবের গৌর আনন কেমন আরক্ত হয়ে উঠছে। একেই বুঝি বলে প্রত্যয়প্রতিভা। কি রে, কি বলছিস, যাবি একবার দক্ষিণেশ্বর? স্বচক্ষে দেখে আসবি?

আর, ওদিকে রামকৃষ্ণ ডাকছে আকুল কণ্ঠে: ওরে, তোরা কোথায়? তোদের ছাড়া আমি যে থাকতে পারছি না। আকাঠের মাঝে কোথায় তোরা সব চন্দন তরু? ধীরতার মাঝে বেগ, জড়তার মাঝে বল, ভীরুতার মাঝে বীর্য—কোথায় তোরা সব সৈনিক সন্ন্যাসী। চলে আয়। বন-জঙ্গল ভেদ করে নদীনালা সাঁতরে তীরবেগে বায়ুবেগে মনোবেগে চলে আয়। আমি তোদের জন্যে কত কথা কত ভাব কত ভালোবাসা নিয়ে বসে আছি। কত গান কত সুর কত নৃত্য। কত স্বাদ কত রুচি। চলে আয়, চলে আয়।

॥ ৫৪ ॥

কয়াপাটের হাটতলা। সারদাকে নিয়ে এসেছেন শ্যামাসুন্দরী। এসেছেন পিলে দাগাতে।

শিবমন্দিরের অঙ্গনে বহু লোকের ভিড়। জ্বরে-জ্বরে সবাই সারা হয়ে গেল। পিলে-দাগানো লোকটিকে ঘিরে সবাইর কাতর ঔৎসুক্য। কার কখন ডাক পড়ে। সবাই পিলে দাগাবে।

খানিকটা আগুন, লোহার শিক আর একটা কি পাতা। এই শুধু সরঞ্জাম। এতেই পিলে পালাবে দেশ ছেড়ে। আর মাথা তুলতে পাবে না।

বেলা বেড়ে যাচ্ছে। আবার ফিরতে হবে বাড়ি। কত রাজ্যের পথ। শ্যামাসুন্দরী অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন।

'মেয়েকে নিয়ে অনেকক্ষণ বসে আছি বাবা। যদি একটু এদিক পানে হাত দাও। মেয়ে আমার জ্বরে-জ্বরে ঝুর-ঝুর হল।'

'এই যে যাচ্ছি, মা। দেখছ তো গাহেকের ভিড়—'

'তোমার জন্যে একখানা নতুন কাপড় এনেছি। চান করে পরো। একটু জল খাও, তা-ও এনেছি তোমার জন্যে।'

লোকটি বুঝি এতক্ষণে সজাগ হল।

'কিন্তু নতুন পাতায় নতুন আগুন নাও। মেয়ে আমার গঙ্গাজলের মতন শুচি।'

তাই হল। পিলে দেগে দিল সারদার।

পিলে আরাম হল বটে, কিন্তু সংসারের দারিদ্র্য আর যায় না। শ্যামাসুন্দরী

বাড়ুয্যেদের ধান ভানেন। যোলো কুড়িতে এক আড়া। এক আড়া ধান ভেনে চার কুড়ি ধান পায়। মায়ের সঙ্গে সারদাও হাত লাগায়।

গাঁয়ে কালীপুজো হবে। বাড়ি-বাড়ি ঘুরে পুজোর চাল যোগাড় হচ্ছে। তাঁদের বাড়ির বরাদ্দ চাল যোগাড় করে রেখেছেন শ্যামাসুন্দরী। কিন্তু গাঁয়ের মোড়ল নব মুখুজ্জে নিলে না সে চাল। কি নিয়ে আড়াআড়ি হয়েছে কে জানে, শ্যামাসুন্দরীর পুজোর চাল ফিরিয়ে দিলে। শ্যামাসুন্দরী সমস্ত রাত কাঁদলেন। বললেন, 'কালীর জন্যে চাল করেছি, নিলে না, ফিরিয়ে দিলে? এখন এ চাল আমার কে খায়? কাকে দিই?'

কাঁদতে-কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে মাটির উপর শুয়ে পড়েছেন। রাত হয়েছে। হঠাৎ চোখ চেয়ে দেখেন দোরগোড়ায় কে এক জন সুন্দরী স্ত্রী বসে আছে চুপচাপ। বসে আছে পায়ের উপর পা দিয়ে। মুখ-হাত-পা সব লাল। প্রথম সূর্য উঠলে যেমন হয়, তেমনি অরুণ-বর্ণের ঝলস দিয়েছে চার দিকে।

স্ত্রীলোকটি কাছে এসে গা চাপড়ে-চাপড়ে ওঠালেন শ্যামাসুন্দরীকে।

'তুমি কাঁদছ কেন? তোমার কালীর চাল আমি খাব।'

শ্যামাসুন্দরী তো অবাক। মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে শুধোলেন: 'তুমি কে?'

'ঐ যে গো—এর পরেই যার পুজো হয়। সেই আমি।'

পরদিন সারদাকে জিগগেস করলেন শ্যামাসুন্দরী: 'গায়ের রঙ লাল, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে—ও কোন ঠাকুর রে সারদা?'

'জগদ্ধাত্রী।'

'আমি জগদ্ধাত্রীর পুজো করব।'

কিন্তু ওটুকু চালে হবে না। আরো চাল লাগবে। বিশ্বাসদের থেকে দু আড়া ধান আনালেন শ্যামাসুন্দরী। ধান আনালেন তো বৃষ্টিও নামল অঝোরে। এক দিনও ফাঁক নেই, সুজ্জি গিয়েছে বনবাসে। চাটাই বিছিয়ে ধান মেলে বসে আছি কবে থেকে। শ্যামাসুন্দরী হতাশার সুর ধরলেন: 'কি করে তবে আর তোমার পুজো হবে মা? ধানই শুকুতে পাল্লুম নি, তবে চাল করব কি করে?' চার দিকে বৃষ্টি, শ্যামাসুন্দরীর ধানের চাটাইয়ে রোদ। জগদ্ধাত্রীর আশীর্বাদ। কাঠের আগুনে সেঁকে মূর্তি শুকিয়ে রঙ দেওয়া হল। পুজোর পর প্রতিমা বিসর্জনের সময় শ্যামাসুন্দরী মূর্তির কানে বলে দিলেন, 'মা জগাই, আবার আর বছর এসো। আমি বছর-ভোর তোমার নব যোগাড় করে রাখব।'

জগদ্ধাত্রীর পুজো করেই শ্রী ফিরল সংসারের।

মেয়েকে শ্যামাসুন্দরী বললেন, 'তুমি কিছু দিও, আমার জগাইয়ের পুজো হবে।'

সারদা থমকে গেল। বললে, 'আমি আবার কি দেব! ও সব ল্যাঠা আমি পারব নি। একবার পুজো তো হল, আবার কেন?'

রাত্রে স্বপ্ন দেখল সারদা। তিন জন কে-কে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। বলছে, 'আমরা কি তবে যাব?'

'কে তোমরা?'

'আমি জগদ্ধাত্রী—আর এরা জয়া-বিজয়া।'

'না মা, তোমাদের যেতে বলিনি, কোথা যাবে তোমরা? তোমরা থাকো, যেও না।' গলায় আঁচল দিয়ে জগদ্ধাত্রীর পায়ে গড় করল সারদা।

সারদা আর কি দেবে! শ্রম দেবে, সেবা দেবে। অন্তরের নিষ্ঠা দেবে।

জগদ্ধাত্রীর পুজোর সময় সারদা গিয়ে তাই বাসন মেজে দেয়।

'সেই থেকে বরাবর জগদ্ধাত্রীর পুজোতে জয়রামবাটি যাই—বাসন মাজতে হয় কিনা।' বললেন শ্রীমা, 'শেষকালে যোগীন সব কাঠের বাসন করে দিলে। বললে, মা, তোমাকে আর যেতে হবে না বাসন মাজতে।'

প্রতিমা বিসর্জনের সময় জগদ্ধাত্রীর কানের গয়না একটি খুলে রাখলে।

'সেইটিই মনে করে মা আবার আসবেন পরের বছর।' বললেন শ্রীমা।

মা আমাদের রাজরাজেশ্বরী।

তাঁর ফিরে আসতে আভরণের আকর্ষণ লাগে না। তিনি যে দীন-দরিদ্রের মা। শুধু একটি কাতর 'মা' ডাক শুনলেই তিনি চলে আসেন। ডাকও লাগে না, অন্তরে আকুলতা থাকলেই হল। প্রার্থনার চেয়েও বড় হচ্ছে আকুলতা। মুখরের চেয়েও মৌন। মুখে বললেই শুনবেন, আর মনে বললে শুনবেন না, মা কি আমাদের বধির?

মা আমাদের অমৃতভাষিণী অন্নপূর্ণা। 'অচক্ষু সর্বত্র চান অকর্ণ শুনিতে পান!' কোনো ভয় নেই। মা সর্বতন্ত্রেশ্বরী শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরী।

॥ ৫৫ ॥

তৃতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে যাচ্ছে সারদা। যাচ্ছে পদব্রজে।

সঙ্গে ভূষণ মণ্ডলের মা ও আরো ক'জন বর্ষীয়সী মহিলা। আর যাচ্ছে লক্ষ্মী, আর তার ভাই শিবরাম।

কামারপুকুর থেকে আরামবাগ—আট মাইলের ধাক্কা। আরামবাগ পেরিয়েই তেলোভেলোর মাঠ। সে মাঠ পেরিয়ে তারকেশ্বর। তার পরে আবার আরেক মাঠ—কৈকলার মাঠ। কৈকলার মাঠ পেরিয়ে বৈদ্যবাটি। বৈদ্যবাটি থেকে গঙ্গা

পেরিয়ে দক্ষিণেশ্বর।

তেলোভেলো আর কৈকলা এই দু মাঠে ডাকাতের আস্তানা। আর ঐ মাঠ ছাড়াও পথ নেই। পথচারীদের উপর কখন যে হামলা হবে তা ডাকাতে-কালীই বলতে পারেন। তেলো আর ভেলো, পাশাপাশি দুই গ্রাম, মাঝখানের মাঠে এক ভীমদর্শনা করালবদনা কালীমূর্তি। ঐ ডাকাতে-কালী। দস্যুদের আরাধনীয়া। ধান্যদা ধনদায়িনী। ডাক-নাম তেলোভেলোর ডাকাতে-কালী। ভূতপ্রমথসেবিকা ঘোরচণ্ডী। রণরামা।

শুধু লুণ্ঠন নয়, চক্ষের পলকে খুন করে ফেলা, লাশ লোপাট করে দেওয়া। যাকে বলে গায়েবী খুন। ডাকাতের সে লাঠি বজ্রের চেয়েও নৃশংস। টাকা কড়ি যা আছে খুলে দিচ্ছি ঝুলি ঝেড়ে—এটুকু প্রস্তুত হবারও সময় দেয় না। আগে লাঠি, শেষে লুঠ। কাড়ো আর মারো নয়, মারো আর কাড়ো। এর থেকে একমাত্র উপায় হচ্ছে দল পাকিয়ে পথ হাঁটা। দল দেখে ডাকাতেরা যদি ভয় পায়। দল থাকলে পথচারীদের অন্তত সাহস বাড়ে।

সন্ধ্যের বেশ আগেই পৌঁচেছ আরামবাগ। চলতে চলতে সারদার পা দুখানি ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। রাতটা আরামবাগে কোথাও বিশ্রাম করলে হয়। কিন্তু সঙ্গীরা নারাজ। তারা বলে, আঁধার লাগবার আগেই বেলাবেলি তেলোভেলোর মাঠ পেরিয়ে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। এখনো দিব্যি দিন আছে, সহজেই পেরিয়ে যেতে পারব। মিছিমিছি এক রাত নষ্ট করি কেন?

পথক্লান্তির কথা কাউকেও বললে না সারদা। তোমরা যখন চলেছ, আমিও চলি তোমাদের পিছে-পিছে।

কেবলই পিছিয়ে পড়ছে থেকে-থেকে। পা টেনে-টেনে তবু চলে এসেছে চার মাইল। কিন্তু তার সঙ্গীরা কোথায়?

সঙ্গীরা থেমে পড়ছে বারে-বারে। থেমে পড়ছে যাতে পা চালিয়ে এসে সারদা তাদের সঙ্গ ধরতে পারে। কিছুতেই তাড়াতাড়ি চলতে পারছে না মেয়েটা। 'কাঁহাতক তোমার জন্যে এমনি করে দাঁড়াই বলো তো!' বিরক্তি জানায় সঙ্গীরা: 'বেলা ঢলে পড়ল, এখন একটু তাড়াতাড়ি পা চালাও।'

সাধ্যমত পদক্ষেপ দ্রুত করে সারদা। কিন্তু তার সাধ্য কি, সঙ্গীদের সঙ্গে তাল রাখে। আবার সে পিছিয়ে পড়েছে। বিশ-পঁচিশ হাত নয়, প্রায় সিকি মাইল। 'এমনি করে চললে কি করে চলবে?' আবার ধমকে ওঠে সঙ্গীরা: 'তোমার জন্যে কি সবাই শেষকালে ডাকাতের হাতে মারা পড়ব? পশ্চিমের আকাশ-খানা একবার দেখেছ?

সন্ধ্যার শেষ লালিমাটুকুও মিলিয়ে যায় বুঝি।

সত্যিই তো! তার একলার অক্ষমতার জন্যে সবাই কেন বিপন্ন হবে? ওদের কি দোষ! ওদের দেহে যখন শক্তি আছে তখন ওরা যাবেই তো আগ বাড়িয়ে। নিজের সুবিধের জন্যে ওদের সে অসুবিধে ঘটাবে কেন?

'তোমরা আমার জন্যে আর দাঁড়িয়ো না—চলে যাও সোজাসুজি।' সঙ্গশূন্যতার ভয়ে এতটুকু কাতর নয় সারদা। নেই এতটুকু অসহায়তার সুর। বললে, একেবারে তারকেশ্বরের চটিতে গিয়ে উঠো। আমি সেখানে গিয়েই ধরব তোমাদের। আমার শরীর আর বইছে না—আমি যাচ্ছি আস্তে-আস্তে।'

'যত শিগগির পারিস বেরিয়ে আয় তাড়াতাড়ি। চার দিক আঁধার হয়ে এল। মাঠের বড় দুর্নাম—'

পিছনে ফিরে তাকিয়েও দেখল না। সারদাকে ফেলেই দ্রুতবেগে এগিয়ে গেল সঙ্গীরা। মিলিয়ে গেল চোখের বাইরে। জনমনুষ্যহীন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সারদা একা।

শরীরে আর দিচ্ছে না, তবু কষ্টে পা টেনে-টেনে চলেছে। অন্ধকারে পথ ঘাটের ইশারা পাচ্ছে না। কোথায় যেতে কোথায় চলে আসছে কে জানে।

'কে যায়!' কে-একজন বাঘের গলায় হুমকে উঠল।

প্রকাণ্ড একটা কালো লোক চোখের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। দৈত্যের মতন চেহারা। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, হাতে রূপোর বালা, কাঁধে মস্ত লাঠি।

'কে যায়।'

'তোমার মেয়ে গো—সারদা।'

নির্জন মাঠের মধ্যে, সন্ধ্যার অন্ধকারে, আমার মেয়ে! লোকটার কানে কেমন যেন অদ্ভুত শোনাল। এত বছর ধরে ডাকাতি করছি, কই, এমন কথা তো কখনো শুনিনি! সারদার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল ডাকাত। স্থির প্রতিমার মতই দাঁড়িয়ে রইল সারদা। প্রতিমার মতই স্থির নেত্রে।

'কে তুমি? এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

'বাবা, দক্ষিণেশ্বরে যাচ্ছিলাম। চলতে পাচ্ছিলাম না, তাই আমার সঙ্গীরা আমাকে ফেলে গিয়েছে। অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলেছি।'

'দক্ষিণেশ্বরে যাচ্ছ কেন?'

'দক্ষিণেশ্বরে যে তোমার জামাই থাকে। রানি রাসমণির কালীবাড়ি আছে না? সেই কালীবাড়িতে তিনি থাকেন। তাঁর কাছেই আমি যাচ্ছি।'

কেমন যেন মধুমন্ন লাগল কণ্ঠস্বর। বাগদি ডাকাতের বুকের ভিতরটা আনচান

করে উঠল। শুধু ডাকাতের নয়, সেই কণ্ঠস্বরের আমেজ এসে লাগল যেন আরো এক জনের কানে। কাছেই কোথায় ছিল, ছুটে এল সে ব্যাকুল পায়ে। সারদা তো অবাক, এ যে দেখি স্ত্রীলোক। দেখেই বুঝল, বাগদি-ডাকাতের স্ত্রী। তার হাত দুখানা চেপে ধরল সারদা। যেন অকূলে কূল পেল।

"তুমি কে গা?' ডাকাত পত্নীর চোখে স্নেহকরুণ জিজ্ঞাসা।

'তোমার মেয়ে সারদা। চিনতে পাচ্ছ না? যাচ্ছিলুম দক্ষিণেশ্বরে, তোমার জামাইয়ের কাছে। সঙ্গীরা পিছে ফেলে আগে-আগে পালিয়ে গিয়েছে। ফাঁকা নির্জন মাঠে অন্ধকারের মধ্যে কী বিপদেই পড়েছিলুম, মা। তোমাদের পেয়ে ধড়ে প্রাণ এল। তোমাদের না পেলে কী সর্বনাশ যে হত কে জানে।'

প্রাণ জুড়িয়ে গেল। কঠিন পাথর ফেটে বেরুল সুধা-ধারা। দয়াহীন মরুভূমির আকাশে নম্র মেঘের মাধুর্য।

'মেয়ে আমার নেতিয়ে পড়েছে যে গো। কিছু ওকে খেতে দাও আগে।' ডাকাত-বউ বললে ডাকাতকে।

'না, আমি এগোই। তারকেশ্বরে গিয়ে ধরব আমার সঙ্গীদের।'

অসম্ভব, পথের মাঝেই পড়বে টাল খেয়ে। বাপ হয়ে মেয়েকে কেউ পাঠাতে পারে না এ বিপদের মুখে। এ ঘোর অন্ধকারে, জনশূন্য মাঠের মধ্য দিয়ে। তার শরীরের এই অবসন্ন অবস্থায়। তার চেয়ে চলো, কাছে-পিঠে যে দোকান আছে, সেখানে তোমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করি। রাত ফুরুলে খোঁজা যাবে ফের পথের নিশানা। তোমার সঙ্গীদের উদ্দেশ।

তেলোভেলোয় ছোট একটি মুদি-দোকান। সেখানেই নিয়ে গেল সারদাকে। নিজের হাতে শয্যা রচনা করল ডাকাত-বউ। ডাকাত নিজে গিয়ে মুড়ি মুড়কি কিনে আনল। বাপের দেওয়া খাবার তৃপ্তি করে খেল সারদা। মায়ের করা বিছানায় শুলে আরাম করে। ছোট মেয়েকে মা যেমন করে ঘুম পাড়ায় তেমনি করে ডাকাত-বউ ঘুম পাড়াল সারদাকে। আর সারা রাত লাঠি-হাতে দুয়োর আগলে দাঁড়িয়ে রইল ডাকাত-বাবা।

কোথায় সব কিছু লুটপাট করে, চাই কি গুম খুন করে ফেলবে—তা নয়, নিদ্রাহীন দীর্ঘ রাত্রি দুয়ারে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে।

উপায় কি! এ যে তার মেয়ে। যে মেয়ে সেই আবার মা!

ভোরে ঘুম ভাঙতেই মেয়েকে নিয়ে এগোল তারকেশ্বরের পথে। খেতে কড়াই-শুঁটি ফলেছে। তাই ছিঁড়ে-ছিঁড়ে ডাকাত-বউ দিতে লাগল সারদাকে। বললে, 'তোর খিদে পেয়েছে, খা।' মুখ ধোয়া হয়নি, তবু ছোট মেয়ের মত তাই খেতে

লাগল সারদা। স্বাদে অপূর্ব মাতৃস্নেহ।

চার দণ্ড বেলা হয়েছে, পৌঁছুল তারবেশ্বর।

'আমার মেয়ে কাল সারা রাত কিছু খায়নি। যাও, শিগগির-শিগগির বাবাকে পুজো দিয়ে বাজার করে নিয়ে এসো। মাছ-তরকারি দিয়ে মেয়েকে ভালো করে খাওয়াতে হবে।' ডাকাত-বউ তাগিদ দিল স্বামীকে।

বাগদি-ডাকাত বাজার করতে ছুটল। তার মেয়ে শ্বশুর-ঘরে যাচ্ছে। যাবার আগে বাপের বাড়িতে আজ তার শেষ খাওয়া।

সঙ্গীদের সন্ধান পেল সারদা। 'মা, তুই বেঁচে আছিস? আসতে পেরেছিস পথ চিনে? কোথায় ছিলি তুই সারা রাত?'

বাবা-মা'র কাছে ছিলাম। ছিলাম নির্ভয়ের আশ্রমে, নিশ্চিন্তের ক্রোড়নীড়ে। বাৎসল্যরসের সরসীতে।

খাওয়া-দাওয়ার পর বিদায়ের পালা এল। যাত্রীদল এবার বৈদ্যবাটির পথ ধরবে। বাগদি বাপ-মা কাঁদতে লাগল অঝোরে। মেয়ে সারদাও নিজেকে সামলাতে পারল না। সেও কান্নায় ভেঙে পড়ল। এক রাতের পরিচয়ে এক জন্মের সম্পর্ক। কণ্ঠের একটি মাতৃ-সম্বোধনেই অনন্ত জীবনের বন্ধন।

এমন মেয়ের বিচ্ছেদ সয়ে কি করে বাঁচবে তারা? কাঁদতে-কাঁদতে অনেক দূর পর্যন্ত এগোল বাগদি-বাগদিনী। বাগদিনী কড়াইশুঁটি ছিঁড়ে মেয়ের আঁচলে বেঁধে দিল যত্ন করে। বললে, 'মা সারু, রাতে যখন মুড়ি খাবি, তখন এগুলো দিয়ে খাস।' বলতে-বলতে নিজের আঁচলে চোখ চেপে ধরল।

বাগদি বললে, 'যদি পায়ের বোঝা স্ত্রী না সঙ্গে থাকত, সোজা তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসতাম। দেখে আসতাম জামাইকে।'

'কিন্তু বলো দক্ষিণেশ্বরে তুমি যাবে।' সারদা পীড়াপীড়ি করতে লাগল। রাজী করলে ডাকাত-বাবাকে। মাঝে মাঝে গিয়ে মেয়েকে না দেখে এসে কি সে থাকতে পারবে? মা কি মেয়েকে পাঠিয়ে দেবে না তার নিজের হাতে গড়া মোয়া-নাড়ু? পথ ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। ডান দিকের রাস্তায় বাবা আর মা চলে গেল, সারদা আর তার সঙ্গীরা চলল বাঁ দিকে। যত দূর দেখা যায় বাবা আর মা ফিরে-ফিরে তাকায় আর কাঁদে। সারদাও থেকে-থেকে তাকায় পিছন ফিরে আর আঁচলে চোখ মোছে।

ডাকাতের ছদ্মবেশে কে এরা বাগদি-বাগদিনী?

জানিস আমরা কী দেখলুম? গাঁয়ে ফিরে এসে বলতে লাগল বাগদি-দম্পতি! দেখলুম, স্বয়ং কালী এসে দাঁড়িয়েছেন। যে কালীর পুজো করি সেই কালী।

'বলো কি গো? দেখলে? ঠিক তাই দেখলে!'
সত্যি-সত্যিই দেখলুম। কিন্তু বেশিক্ষণ দেখি এমন সাধ্য কি! আমরা যে পাপী। আমরা পাপী বলে যে রূপ গোপন করে ফেললে। সারাক্ষণ দেখতে দিলে না। চকিতে যখন একবার দেখেছ তখন পলকেই পাপ চলে গিয়েছে। চকিতের দেখাই অনন্ত কালের দেখা। যা চকিত তাই চিরকালিক।

॥ ৫৬ ॥

কেশবের ডাকে ইয়ং-বেঙ্গলে সাড়া পড়ে গেল। পল্লব-প্রফুল্ল বসন্তের শিহরণ জাগল অরণ্যে। কিন্তু যার ডাকে এই অবস্থা, তার নিজের অবস্থা কি!
জয়গোপাল সেনের বাগানে রামকৃষ্ণ লালপেড়ে কাপড় পরে গিয়েছিল।
কেশব বললে, 'আজ বড় যে রঙ! লালপাড়ের বাহার!'
রামকৃষ্ণ বললে, 'কেশবের মন ভোলাতে হবে, তাই বাহার দিয়ে এসেছি।'
রঙ লাগল কেশবের মনে। রসে ডুবে ভাসতে লাগল ভাবের জোয়ারে। হয়ে দাঁড়াল সে রামকৃষ্ণের মনের মানুষ।

'মনের মানুষ হয় যে জনা
ও তার নয়নেতে যায় গো চেনা।
সে দু-এক জনা।
ভাবে ভাবে রসে ডোবে
ও তার উজান পথে আনাগোনা।'

কিন্তু গোড়ার দিকে রাজসিকতার ভাবটা একটু সজাগ ছিল কেশবের। কেশবের কলুটোলার বাড়িতে গিয়েছে রামকৃষ্ণ, সঙ্গে হৃদয়। টেবিলের কাছে চেয়ারে বসে কি সব লিখছে কেশব। যে ঘরে বসে লিখছে সেই ঘরে এনেই বসাল রামকৃষ্ণকে। কিন্তু কেশবের চেয়ার ছেড়ে ওঠবার নাম নেই। এ কমনে লিখেই চলেছে। অনেক পরে লেখা শেষ করে চেয়ার ছেড়ে নেমে বসল। নেমে বসল বটে, কিন্তু রামকৃষ্ণকে একটা নমস্কার পর্যন্ত করলে না।
নমস্কার না করাটাই বুঝি সে যুগের জ্ঞানী-গুণীদের শালীনতা।
কিন্তু কেশব যখন এসেছে দক্ষিণেশ্বরে, রামকৃষ্ণ তাকে আনত হয়ে প্রণাম করলে। একবার নয়, যতবার এসেছে ততবার। যখন যে দলবল নিয়ে এসেছে, সবাইকে। তখন তারা আর করে কি। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে শিখলে।
কঠিনকে নম্র করে দিলে রামকৃষ্ণ। অভিজাতকে নিরভিমান। রামকৃষ্ণের সমস্ত

সাধনাই এই সহজের সাধনা। নিকটের সাধনা। নিকটে পাবার সহজ সাধনা। বললে, 'যাঁকে তোমরা ব্রহ্ম বলো তাঁকেই আমি মা বলি। মা বড় মধুর নাম।' আমি ঈশ্বর বুঝি না। আমি আমার মাকে বুঝি, মাকে ডাকি। আর কে আছে না আছে কে জানে, আমি আছি আর আমার মা আছে। ঈশ্বরের ঐশ্বর্যের আমি তত্ত্ব করি আমার সাধ্য কি, আমার মা আছে এই আমার পরম ঐশ্বর্য।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে বেদীতে বসে উপাসনা করছে। কিন্তু ঈশ্বরকে ডাকছে 'মা' 'মা' বলে।

'তুমি তাঁকে "মা" "মা" বলে প্রার্থনা করছিলে। এ খুব ভালো। এ খুব ভালো।' বিজয়কৃষ্ণকে বললে রামকৃষ্ণ। 'কথায় বলে বাপের চেয়ে মায়ের টান বেশি। মায়ের উপর জোর চলে, বাপের উপর চলে না। ত্রৈলোক্যের মায়ের জমিদারি থেকে গাড়ি-গাড়ি ধন আসছিল, সঙ্গে কত লাল-পাগড়িওয়ালা লাঠি-হাতে দারোয়ান। ত্রৈলোক্য রাস্তায় লোকজন নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, জোর করে সব ধন কেড়ে নিলে। মায়ের ধনের উপর খুব জোর চলে। বলে নাকি ছেলের নামে মা'র তেমন নালিশ চলে না।'

'জানাইব কেমন ছেলে
মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে,
যখন গুরুদত্ত দস্তাবেজ
গুজরাইব মিছিলকালে।
মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা,
ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে।
আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায়
শান্ত করে লবে কোলে॥'

মা কতক্ষণ মামলা চালাবে? কতক্ষণ মুখ ভার করে থাকবে? কখন নিজেই এক সময় বাহু মেলে টেনে নেবে কোলের মধ্যে।

আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরকে আমরা পিতা বলে কল্পনা করেছি। পিতা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা, লালনকর্তা, রক্ষণকর্তা। পিতার মধ্যে যে ভাবটি প্রকাশিত তা প্রতাপের ভাব, প্রভুত্বের ভাব। তিনি শুধু আমাদের পালন করেন না, চালনা করেন, পোষণ করেন না শাসন করেন। তিনি জগৎসংসারের সর্বময় বিধাতা। একচ্ছত্র একাধিপতি।

বেদে বলেছে, পিতা নোঽসি। তুমি আমাদের পিতা হয়ে আছ। বলেছে,

পিতা নো বোধি। তুমি যে আমাদের পিতা এই বোধের আলোকে আমাদের দু-চোখ উদ্ভাসিত হোক। এই জানা আর অনুভব করার মধ্যে পিতার সর্ব-সাম্রাজ্যময় বিরাটত্বকেই কল্পনা করা হয়েছে। যখনই বলেছে, শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ, তখন আমরা যাঁর পুত্র সেই আদিত্যবর্ণ পুরুষকে দিব্যধামবাসী একনায়ক সম্রাট বলেই মেনে নিয়েছি। সমস্ত অন্ধকারের পরপারে সেই পিতা ভাস্বর ভাস্কর।

এ ভাবটির মধ্যে যতই মহিমা থাক, কিছুটা যেন ভয় আছে। সম্ভ্রম তো আছেই, হয়তো বা রয়েছে একটু নিষ্ঠুরতা। পিতা আমাদের যতই প্রিয় হোন, তাঁর সঙ্গে কোথায় যেন রয়েছে একটু ব্যবধান। কোথায় যেন একটু আড়াল বাঁচিয়ে চলছি। যেন তাঁর চোখে চোখ রেখে মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি না, একটু পাশ কাটিয়ে পালিয়ে বেড়াই। যদি বা কখনো কাছে আসি, সম্ভ্রমসূচক দূরত্ব বজায় রাখি। কখনো যদি অপরাধ করি, তবে তো আর কথাই নেই; ভয় পাই, শাসনে যেন উদ্যতবজ্র হয়ে আছেন।

কিন্তু মা—মা আমাদের কাঙালিনী। আমরা কাঙাল বলে মা-ও কাঙালিনী সেজেছেন। মা'র সঙ্গে আমাদের তন্তুমাত্র ব্যবধানেই, নেই লেশমাত্র অন্তরাল। আমরা মা'র অঙ্গের অঙ্গ বলে তাঁর সঙ্গে আমাদের অন্তহীন অন্তরঙ্গতা। যতই অকিঞ্চন হই, আমরা মা'র অঞ্চলের নিধি। যতই ধুলো-মাটি মাখি, মা'র অঞ্চলে আমাদের জন্যে অবারিত মার্জনা। যদি অপরাধ করি, মা-ও নিজেকে অপরাধী মনে করেন। সন্তানের দুঃখে তাঁর দুঃখ।

কোনো কুণ্ঠা নেই, লজ্জা নেই, শুধু ক্ষমা শুধু স্নেহ। শুধু পুষ্টি দেন না তুষ্টি দেন, শুধু পিপাসা মেটান না, নিয়ে আসেন পরিতৃপ্তির আস্বাদ। মা আমাদের মূর্তিমতী সরলতা, মা আমাদের অভয়ময়ী। পুত্র যত বৃদ্ধই হোক, মা'র কাছে সে শিশু, অর্বাচীন আপোগণ্ড শিশু। আর মা যত বৃদ্ধই হোক, ছেলের কাছে সে সনাতনী মা। পিতার জন্যে আমাদের শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম, আনুগত্য, কিন্তু মা'র জন্যে আমাদের ভালোবাসা, অবিরল অফুরন্ত ভালোবাসা। পিতার থেকে আমরা দূরে দূরে থাকি, কিন্তু মা আমাদের একেবারে কোলের মধ্যে টেনে নেন। আর্ত হই বঞ্চিত হই পীড়িত হই পাপলিপ্ত হই, অকূলে মা'র কোল আছেই। পিতা আমাদের রাজ-চক্রবর্তী, মা আমাদের বিশ্বকল্যাণী।

দুর্গাচরণ নাগ ঠাকুরের নিদারুণ ভক্ত। অসুখের সময় আমলকী খাবার ইচ্ছে হয়েছিল ঠাকুরের। এমন সময় আমলকী কি কোথাও পাওয়া যায়? জিগ্‌গেস করলেন ঠাকুর। তখন শ্রাবণ মাস, আমলকীর পক্ষে অকাল। কিন্তু ঠাকুরের

যখন ইচ্ছে হয়েছে, নিশ্চয়ই কোথাও পাওয়া যাবে আমলকী। দুর্গাচরণ বেরিয়ে পড়ল আমলকী খুঁজতে। বনে-বাগানে ঘুরে ঘুরে তিন দিন পরে ঠিক আমলকা নিয়ে এল। সেই দুর্গাচরণকে শ্রীশ্রীমা একখানি কাপড় দিয়েছেন। সেই কাপড় না পরে মাথায় বেঁধে রাখে দুর্গাচরণ। আর আনন্দে ধ্বনি করে: 'বাপের চেয়ে মা দয়াল! বাপের চেয়ে মা দয়াল!'

শ্রীশ্রীমা'র তখন অসুখ। খুব যন্ত্রণা পাচ্ছেন। এক ভক্ত বললে, 'মা, আপনি এত কষ্ট পাচ্ছেন, কষ্টট আমায় দিন না!'

মা চমকে উঠলেন। 'বল কি!' ছেলে! মা কখনো ছেলেকে কষ্ট দিতে পারে? ছেলের কষ্ট হলে যে মা'র আরো বেশি কষ্ট।'

বিভূতি বলে একটি ছেলে আসত শ্রীমা'র কাছে। এলেই পেট ভরে খেয়ে যেত। এক দিন তার খাওয়া দেখে তার মা বললে, 'বিভূতি তো এখানে বেশ খায়। বাড়িতে মাত্র এত ক'টি খায়!'

অমনি শ্রীমা বললেন, 'আমার ছেলেকে তুমি খুঁড়ো না। আমি ভিখারীর রমণী, আমার ছেলেদিকে আমি যা খেতে দি, ছেলেরা আমার তাই আদর করে খায়।' চন্দ্র দত্ত উদ্বোধন-অফিসের কর্মচারী। এক দিন শ্রীমাকে বললে, 'মা, আপনাকে কত দূর দেশ থেকে কত লোক দর্শন করতে আসে। আপনি তো ঘরের ঠাকুরমার মত পান সাজেন, সুপুরি কাটেন, কখনো বা ঘর ঝাঁট দেন। আপনাকে দেখে আমি তো কিছুই বুঝতে পারি না।'

মা বললেন, 'চন্দ্র, তুমি বেশ আছ। আমাকে তোমার বোঝবার দরকার নেই।' স্বভাবে সহজ, করুণায় কোমল, স্নেহে সীমাহীন—এই আমাদের মাতৃপ্রতিমা। মাকে আমাদের বোঝবার দরকার নেই, ডাকবার দরকার। ডাক শুনে মা যখন ছুটে এসে কোলে তুলে নেবেন তখন সেই স্পর্শেই বুঝতে পারব, মা এসেছে রে, মা এসেছে।

যিনি অবাঙমানসগোচর, অগম্য অপার, সমস্ত রুদ্ধ অন্ধকারের ওপারে যাঁর বাসা, তাঁকে নিকটতম, নিবিড়তম করে পাবার সাধনায় রামকৃষ্ণ নতুন মন্ত্র আবিষ্কার করলেন। ওঁ-এর মত এ মন্ত্রও একাক্ষর মন্ত্র। এ মন্ত্রের কথা হচ্ছে—'মা'। এ মন্ত্রের আকর্ষণে যা অত্যন্ত দূর তা নিমেষে কাছে চলে এল, যা অত্যন্ত দুরূহ তা হয়ে দাঁড়াল জলের মত সোজা। যা ছিল পর্বতশৃঙ্গে তাই বিগলিতধারে নেমে এল নির্ঝরিণী হয়ে। যা ঐশ্বর্যশালিনী শক্তি, তাই দেখা দিল দয়ারূপে, ক্ষমারূপে, অমিয়ময়ী প্রশান্তিরূপে।

একেই বলে এক চালে মাৎ। এক বাণে জগজ্জয়। এক অক্ষরে পরা সিদ্ধি।

রামকৃষ্ণের সবই সহজ। তত্ত্ব সহজ, পদ্ধতিও সহজ। মানুষটি যেমন সহজ, মন্ত্রটিও তেমনি। একেই বলে তরঙ্গহীন স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপসমুদ্র। কিংবা, সহজ করে বলে, সহজানন্দ।

বিজয়কৃষ্ণকে বলে রামকৃষ্ণ, কারণের বোতল এক জন এনেছিল, আমি ছুঁতে গিয়ে আর পারলুম না।'

বিজয় বললে, 'আহা!'

'সহজানন্দ হলে অমনি নেশা হয়ে যায়। মদ খেতে হয় না। মা'র চরণামৃত দেখেই আমার নেশা হয়ে যায়। ঠিক যেমন পাঁচ বোতল মদ খেলে হয়।'

কেশবকেও তেমনি সহজ করে দিল রামকৃষ্ণ। কেশব 'মা' ধরল। ঈশ্বরকে ডাকতে লাগল 'মা' বলে। ঈশ্বরকে 'মা' বলে ডাকে আর কেশবের দুই নয়নে ধারা নামে।

॥ ৫৭ ॥

এ মাতৃসাধনার গোড়াপত্তন রামপ্রসাদে। তার পর তাতে সৌধ তুলল কমলাকান্ত। গরানহাটায় দুর্গাচরণ মিত্তিরের বাড়িতে রামপ্রসাদ মুহুরির কাজ করে আর হিসেবের খাতায় দুর্গানাম কালীনাম লেখে। সমস্ত হিসেব বেহিসেব হয়ে যায়। পদে-পদে ত্রুটির কাঁটা খোঁচা মারে।

নালিশ গেল মনিবের কাছে। মনিব খাতা তলব করলেন। দেখলেন আষ্টেপৃষ্ঠে অঙ্কের আঁচড় নেই, কেবল দুর্গানাম কালীনাম। কেবল মাতৃসঙ্গীত।

কি না-জানি আছে এই গানে! মনিব পড়তে লাগলেন। লোকটার আস্পর্ধা বটে। সামান্য মুহুরি হয়ে তবিলদারি চাইছে!

'আমায় দাও মা তবিলদারি,
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী।
আমি বিনা মাহিনার চাকর,
কেবল চরণ-ধূলার অধিকারী॥'

মনিব ছুটি দিয়ে দিলেন রামপ্রসাদকে, বললেন, 'তুমি বাড়ি যাও। এখানে যেমনি ত্রিশ টাকা মাইনে পেতে তেমনি পাবে তুমি বাড়ি বসে। তুমি মা'র নামের গান গাও!'

ছাড়া পেয়ে গেল রামপ্রসাদ। কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ডেকে পাঠালেন, রাজসভায় চাকরি দেবেন। আবার চাকরি! চরণ-ধূলার জন্যে এই তো দিব্যি চাকর আছি বিনি-মাইনেয়। হলই বা না রাজসভা, মা'র শোভার কাছে আবার রাজসভা

কি! মহারাজের অযাচিত দান প্রত্যাখ্যান করলে। এবার না কোপে পড়ে মহারাজার। মহারাজার কি মতি হল, রামপ্রসাদের বৈরাগ্য দেখে একশো বিঘে নিষ্কর জমি দান করে বসলেন।

'মন তুই কাঙালী কিসে।' রামপ্রসাদ গান ধরল: 'অনিত্য ধনের আশে, ভ্রমিতেছে দেশে-দেশে। ও তোর ঘরে চিন্তামণি নিধি, দেখিস রে তুই বসে-বসে।' মাকে নিয়ে সাধনায় বসল রামপ্রসাদ। কারু সাধনা জ্ঞানে, রামপ্রসাদের গানে। আর-সব সাধকেরা জ্ঞানানন্দ, রামপ্রসাদ গানানন্দ।

মাকে নিয়ে তার নানান খেলা, নানান লুকোচুরি। কত নালিশ-আপত্তি, কত অভিমান-অভিযোগ! কখনো ঝগড়া, কখনো মামলা-মোকদ্দমা, কখনো বা রফা-নিষ্পত্তি। কখনো রাগ, কখনো কান্না, কখনো অহঙ্কার, কখনো স্রেফ গায়ের জোর। সাধ্য নেই মা আর বসে থাকেন লুকিয়ে। কালী বটে, কিন্তু কালা তো নন। ডাকের মত ডাক হলে শুনতে পান ঠিকঠাক। কান্না শুনে না আসেন, আসবেন ধমক খেয়ে। ভালো-মানুষের মত না আসেন, আসবেন ভয়ে-ভয়ে।

'এবার কালী তোমায় খাব
গণ্ড যোগে জনমিলে,
সে হয় যে মা-খেকো ছেলে,
এবার তুমি খাও কি আমি খাই
দুটার একটা করে যাব।
হাতে কালী মুখে কালী
সর্বাঙ্গে কালী মাখিব,
যখন আসবে শমন বাঁধবে কষে
সেই কালী তার মুখে দিব॥'

মাকে লজ্জা দিতেও ছাড়ছে না রামপ্রসাদ। বিদ্রূপ করছে। অনুযোগ করছে।

'কে বলে তোরে দয়াময়ী।
কারো দুগ্ধেতে বাতাসা
আর আমার এমনি দশা
শাকে অন্ন মেলে কই॥
কারো দিলে ধন-জন মা,
হস্তী অশ্ব রথচয়।
ওগো তারা কি তোর বাপের ঠাকুর
আমি কি তোর কেহ নই॥'

BanglaBook.net

কিংবা—

'বড়াই করো কিসে গো মা
বড়াই করো কিসে।
আপনি ক্ষ্যাপা পতি ক্ষ্যাপা
থাকো ক্ষ্যাপা সহবাসে।
তোমার আদি মূল সকলি জানি
দাতা তুমি কোন পুরুষে॥
মাগী-মিন্সে ঝগড়া করে
রইতে নার আপন বাসে॥
মা গো তোমার ভাতার ভিক্ষা করে
ফেরে কেন দেশে দেশে॥'

আবার বলছে—

'মা হওয়া কি মুখের কথা।
কেবল প্রসব করে হয় না মাতা।
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা॥
দশ মাস দশ দিন যাতনা পেয়েছেন মাতা
এখন ক্ষুধার বেলায় শুধালে না
এল পুত্র গেল কোথা॥'

শেষকালে অভিমানে ভেঙে পড়ছে রামপ্রসাদ—

'ছিলেম গৃহবাসী, বানালে সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখো এলোকেশী।
দ্বারে দ্বারে যাব ভিক্ষা মাগি খাব
মা মলে কি তার সন্তান বাঁচে না॥'

বাস্তুর পাশে ডোবা, ডোবার পাশে বাগান। সেই বাগানে রামপ্রসাদকে দেখা দিলেন অন্নদা। দেখা না দিয়ে আর উপায় কি। এত ভাবে ডাকলে কি করে আর সরে থাকা যায়? শেষকালে কন্যা হয়ে ঘরের বেড়া বাঁধতে বসলেন। এই মাতৃসাধনা চরম হল রামকৃষ্ণে।

'মা, তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, কমলাকান্তকে দেখা দিয়েছিস, আমায় কেন দেখা দিবি নে?'

এ আকুলতা শুধু মাকে লক্ষ্য করেই জানানো যায়। এ দাবি এ আবদার মা ছাড়া আর কে পূরণ করবে?

দেখা দিবি নে ? এই গলায় তবে ছুরি দেব।

কোন মা ঘুমিয়ে থাকবে ?

আবার বলছে, 'মা, আমি নরেন্দ্র ভবনাথ রাখাল কিছুই চাই না। কেবল তোমায় চাই। আমি মানুষ নিয়ে কি করব ?'

'মা, পূজা উঠিয়েছ, সব বাসনা যেন যায় না। মা, পরমহংস তো বালক—বালকের মা চাই না ? তাই তো তুমি মা, আর আমি তোমার ছেলে। মা'র ছেলে মাকে ছেড়ে কেমন করে থাকে ?'

সাধ্য কি, এমন ছেলেকে মা কোলে না নেয় !

রাত্রে একলা রাস্তায় কেঁদে-কেঁদে বেড়ায় রামকৃষ্ণ। আর বলে, 'মা, বিচার-বুদ্ধিতে বজ্রাঘাত দাও।'

বিচার-বিতর্ক ভেসে গেল। রইল শুধু ভক্তি আর ভালোবাসা। মাকে ভালোবাসতে পারলে আর ভাবনা নেই। আর, ভালোই যদি বাসবি, মা'র মতন আর কে আছে ভালোবাসার ?

কার্তিক-গণেশকে বললেন ভগবতী, যে আগে ব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণ করে আসতে পারবে তাকে গলার এই রত্নহার দেব। কার্তিক তখুনি ময়ূরে চড়ে বেরিয়ে পড়ল। গণেশ শুধু মাকে একবার প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করলে। মা'র মধ্যেই তো ব্রহ্মাণ্ড। প্রসন্ন হয়ে গণেশকেই হার দিলেন ভগবতী। অনেক পরে ঘুরে এসে কার্তিকের তো চক্ষুস্থির। দাদা দিব্যি হার পরে বসে আছেন।

'মা, আমি বলবো তবে তুমি করবে—এ কথাই নয়। আচ্ছা মা, যদি না-বলতাম, আমি খাবো, তা হলে কি যেমন খিদে তেমন খিদে থাকত না ? তোমাকে বললেই তুমি শুনবে, আর ভিতরটা শুধু ব্যাকুল হলে তুমি শুনবে না—এ কখনো হতে পারে ? তুমি যা আছ তাই আছ—তবে বলি কেন, প্রার্থনা করি কেন ? ও ! যেমন করাও তেমনি করি।'

এই সরলতা এই ব্যাকুলতা এই আন্তরিকতার কাছে মা কি ধরা না দিয়ে পারেন ?

মা-তে ওতপ্রোত হয়ে আছে রামকৃষ্ণ। মা ছাড়া আর কিছু নেই জীবজগতে। মা-ই আমাদের একমাত্র মাধুরী। যিনি মানসী তিনিই আবার মানুষী।

তাই যতক্ষণ গর্ভধারিণী মা আছেন ততদিন তাঁতেই জগজ্জননী আরোপ করতে হবে।

'আমি মাকে ফুলচন্দন দিয়ে পূজা করতাম।' বললে রামকৃষ্ণ, 'সেই জগতের মা-ই মা হয়ে এসেছেন !'

কিন্তু যখন মা থাকবে না, কিংবা পূজা থাকবে না, তখন? তখন অন্য কথা। তখন মা'র মনোমূর্তি। তখন বিশ্বব্যাপিনী জগন্মাতা।

'মা, পূজা গেল, জপ গেল, দেখো মা যেন জড় কোরো না। সেব্য-সেবকভাবে রেখো। মা, যেন কথা কইতে পারি, যেন তোমার নাম করতে পারি—আর তোমার নামগুণ কীর্তন করব, গান করব মা। আর শরীরে একটু বল দাও, যেন আপনি একটু চলতে পারি। যেখানে তোমার কথা হচ্ছে, যেখানে তোমার ভক্তরা আছে, সেই সব জায়গায় যেতে পারি।'

শুধু গান নয়, নৃত্য করছে রামকৃষ্ণ। আমাদের নিত্যানন্দ ঠাকুর এখন নৃত্যানন্দ। মাকে কখনো আদর করছে, শাসন করছে কখনো। কখনো বিলাপ করছে, কখনো বা মুখ ভার করে থাকছে। কখনো মিনতি করছে, কখনো বা জোর ফলাচ্ছে। কখনো বা রঙ্গরসের তরঙ্গ তুলছে।

'কে মা এলি গো গিরে দাদার বেটি।
দোনো ছোকরা বি সাৎ
দোনো ছুকরি বি সাৎ
আর এক বেটা জুলপি-কাটা
বাঘটা কামড়ে নেছে টুঁটি॥
একবার নেমে দাঁড়া শ্যামা।
ভাঙল বুড়োর পাঁজর-কটি।
শিব মলে অনাথ হবে
কার্তিক গণেশ ছেলে দুটি॥'

গালে হাত দিয়ে অবাকের ভাব করে নাচছে রামকৃষ্ণ।

'আই মা কি লাজের কথা
মিনসের উপরে মাগী।
বেটির পদতলে পড়ে ভোলা
অপরূপ এক যোগী॥
নয়নে না দেখ চেয়ে
শিব আছেন শব হয়ে
আবার কে দেখেছে এমন মেয়ে
কুল-লজ্জা-ভয়-ত্যাগী॥'

আবার অন্য রকম তাল ধরেছে:

'কোন হিসেবে হরহৃদে

boiRboi.net

দাঁড়িয়েছ মা পদ দিয়ে।
সাধ করে জিভ বাড়ায়েছ
যেন কত ন্যাকা মেয়ে॥
বল মা তোরে শুধাই তারা
এমনি কি তোর কাজের ধারা
তোর মা কি তোর বাপের বুকে
দাঁড়িয়েছিল অমনি করে?'

'রসো বৈ সঃ যে তিনি। নানা ভাবে তাঁর রস আস্বাদ করতে হবে, তবে তো হবে।' বললেন রামকৃষ্ণ। 'নইলে কেশবদের মত খালি দয়াময়, প্রভু বললে কি রস হয়?'

রামকৃষ্ণে যেমন সর্বধর্মসমন্বয় তেমনি সর্বরসসমাশ্রয়।

মা-ও রামকৃষ্ণকে দেখা দিলেন নানান ভাবে। নানান রস-বেশে।

এক দিন মুসলমানের মেয়ে হয়ে চলে এলেন। ছ-সাত বছরের মেয়ে। মাথায় তিলক কিন্তু দিগম্বরী। রামকৃষ্ণের সঙ্গে বেড়াতে লাগল আর ফিচকেমি করতে লাগল। একবার চোখ নাচাল, অমনি নীল আকাশে গ্রহ-তারা সব দুলে উঠল একসঙ্গে।

কালো পেড়ে কাপড় পরনে শ্রীগৌরাঙ্গ হয়ে এক দিন দেখা দিলেন হৃদয়ের বাড়িতে।

তার পর, হলধারী যখন যন্ত্রণা দিচ্ছে আর বলছে রূপ-টুপ কিছু নেই, তখন এক দিন মা'র কাছে গিয়ে নালিশ করলে রামকৃষ্ণ। মা রতির মা'র বেশে দেখা দিলেন। বললেন, তুই ভাবেই থাক।

'এক-একবার ও-কথা ভুলে যাই বলে কষ্ট হয়। ভাবে না থেকে দাঁত ভেঙে গেল। তাই দৈববাণী যতক্ষণ না শুনছি বা প্রত্যক্ষ যতক্ষণ না হচ্ছে ভাবেই ডুবে থাকব, থাকব ভক্তি নিয়ে।'

সেই সহজ কথাই কেশবকে শেখাতে বসল।

'দুধ কেমন? না, ধোবো-ধোবো। দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাবা যায় না। আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না। তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। যিনি নিত্য তিনিই ব্রহ্ম, যিনি লীলা তিনিই কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী।'

কালীতত্ত্ব জানবার জন্যে ধরে বসল কেশব। কালী অত কালো কেন?

'কালী কি কালো? দূরে, তাই কালো, জানতে পারলে কালো নয়।' বললে

রামকৃষ্ণ। 'আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। কাছে গিয়ে দেখ, কোনো রঙ নেই। সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে দেখ, কোনো রঙ নেই।' ভাবে বিহ্বল হয়ে গান ধরল রামকৃষ্ণ।

'মা কি আমার কালো রে? কালরূপ দিগম্বরী, হৃৎপদ্ম করে আলো রে।'

মা'র একান্ত কাছটিতে সরে এসেছে রামকৃষ্ণ। কাছে এসে আলোয় আলোময় দেখছে। সরে আসতে-আসতে নিজেই মা-তে মিশে মা হয়ে গিয়েছে। 'শ্যামা পুরুষ না প্রকৃতি? এক জন ভক্ত পুজো করছিল। এক জন দর্শন করতে এসে দেখে মূর্তির গলায় পৈতে। তুমি মা'র গলায় পৈতে পরিয়েছ? দর্শক আপত্তি করলে। ভক্ত বললে, ভাই, তুমিই চিনেছ। আমি এখনো চিনতে পারিনি, তিনি পুরুষ কি প্রকৃতি। তাই পৈতে পরিয়েছি।'

তাকেই তো বলে যোগমায়া, অর্থাৎ পুরুষপ্রকৃতির যোগ। পুরুষ নিষ্ক্রিয় তাই শিব শব হয়ে আছেন। আর, পুরুষের যোগে প্রকৃতি সমস্ত কাজ করছে, হনন-পালন করছে। এক ছাড়া আর নেই। যা পুরুষ তাই প্রকৃতি। যা বিদ্যুৎ তাই বৈদ্যুত শক্তি। রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তিরও মানে ঐ। ঐ যোগের জন্যেই তো বঙ্কিম ভাব।

মনোমোহন মিত্তিরের বোনকে বিয়ে করেছে রাখাল। রাখালের বয়েস তখন আঠারো। বিয়ের পর ভগ্নিপতিকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে এসেছে মনোমোহন।

এ কে? রাখালকে দেখে রামকৃষ্ণ তো অবাক।

ভাবমুখে থেকে মাকে এক দিন বলেছিল রামকৃষ্ণ, 'মা গো, বিষয়ী-সংসারী লোকের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে জিভ জ্বলে গেল।'

মা বললেন, 'ভয় নেই। শুদ্ধসত্ত্ব ত্যাগী ভক্তেরা আসছে একে একে।'

'এক জনকে সঙ্গী করে দাও আমার মত। আমার তো সন্তান হবে না, কিন্তু মা, ইচ্ছা করে, একটি শুদ্ধভক্ত ছেলে আমার সঙ্গে থাকে। সেইরূপ একটি ছেলে আমায় দাও।'

এর কিছু দিন পরে ভাবচক্ষে রামকৃষ্ণ দেখতে পেল, বটতলায় একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। কেন, ও ওখানে কেন? এ কি কাণ্ড?

হৃদয়কে বললে সেই দর্শনের কথা। হৃদয় আনন্দ করে উঠল। বললে, 'মামা, নিশ্চয়ই তোমার ছেলে হবে। তাই দেখেছ।'

'সে কি রে?' চমকে উঠল রামকৃষ্ণ। 'সে কি রে? আমার যে মাতৃযোনি। আমার ছেলে হবে কেমন করে?'

রামকৃষ্ণ এক দিন বসে আছে নিরালায়, হঠাৎ মা এসে তার কোলের মধ্যে একটি

ছেলে ফেলে দিয়ে গেলেন। বললেন, 'ছেলে চেয়েছিলে না? এই তোমার ছেলে।'

সে কি? আমার আবার ছেলে কি?

মা বুঝিয়ে দিলেন, শরীরের পুত্র নয়, মানসপুত্র।

রাখালের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল রামকৃষ্ণ। এ যে সেই ছেলে!

'তোমার নামটি কি?' তৃষিত কর্ণে জিগগেস করলে রামকৃষ্ণ।

'শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষ।'

সমস্ত হৃদয় দুলে উঠল। সমস্ত সৃষ্টি ভরে গেল বাঁশির সুরে। নীল যমুনার জলে। 'সেই নাম! রাখাল, ব্রজের রাখাল!' ভাবে ডুবে গেল রামকৃষ্ণ। আর কোনো কথা নেই। আর শুধু একটি মাত্র স্নেহস্বর: 'এখানে আবার এক দিন এস। আবার এক দিন।'

আর রাখাল কী দেখল? এ কে? দিব্যদীপ্তি অঙ্গে নিয়ে এ কে বসে আছে তার চোখের সামনে? রাখাল দেখল মা বসে আছে। মা, তার মা। জীব-জগতের মা।

তার পর আরো ক'দিন পর কলেজের ছুটির শেষে এক দিন একা-একা চলে এসেছে রাখাল।

'তোর এখানে আসতে এত দেরি হল কেন?' আকুল হয়ে ডাকল রামকৃষ্ণ: 'আয় আয়, তুই আমার রাখাল, তুই আমার গোপাল, তুই আমার কৃষ্ণ।'

রাখালের মনে হল সে যেন তিন-চার বছরের ছেলে। আর তার সামনে বিশ্রামশান্ত কোল পেতে তার মা বসে আছেন। মা কালী, মহাকালী। শ্যামশ্রীতে স্নেহশ্রী।

রামকৃষ্ণের কোলের মধ্যে গিয়ে বসে পড়ল রাখাল। রামকৃষ্ণ সস্নেহে হাত বুলুতে লাগল সর্বাঙ্গে। আর রাখাল নিঃসঙ্কোচে রামকৃষ্ণের স্তনপান করতে লাগল। রামকৃষ্ণই মা। রামকৃষ্ণই মাতৃসাধনার চরম।

তাই তো মা বলে ডাকি। মা বলে যখন ডাকি তখন তোমাকেই ডাকি। আমরা কি কালী চিনি না দুর্গা চিনি? আমরা শুধু তোমাকে চিনি। আমরা মা বলে ডাকলে আর কেউ সাড়া না দিক, তুমি দেবে। তোমার ডাক, তুমিই তো ভালো চেন। তুমিই তো সংসারের কানে দিয়ে গেছ এই ডাক। এই সংক্ষিপ্ত একাক্ষর মন্ত্র। তাই তোমার সাধ্য কি, তুমি থাকো নিশ্চল হয়ে।

তার পর এক দিন নিজের ডাকে যদি নিজে সাড়া দাও, প্রভু, তবে আর আমাদের কালীই বা কি, ব্রহ্মই বা কি।

বিজয়কৃষ্ণকে লিখে পাঠাল কেশব সেন : বন্ধু, একবার রামকৃষ্ণ পরমহংসকে দেখবে এস।

বন্ধু? তা ছাড়া আবার কি। হোক দলাদলি, হোক রেষারেষি, হোক বাদ-বিতণ্ডা, তারা সতীর্থ। তারা এক তীর্থের যাত্রী। যারা সমানতীর্থসেবী তারাই সতীর্থ। তারা এক গুরুর ছাত্র। এক পাঠশালার পড়ুয়া। তাদের দুজনের একই ঈশ্বর-সন্ধান।

তখন তাদের ঝগড়া চরমে উঠেছে। তবু লিখে পাঠাল কেশব : বন্ধু, এমনটি তুমি আর দেখনি।

শান্তিপুরে প্রভু অদ্বৈতাচার্যের বংশে বিজয়কৃষ্ণের জন্ম। বাপের নাম আনন্দ-কিশোর গোস্বামী। নিত্যপূজার শালগ্রাম শিলা গলায় বেঁধে এক দিন হঠাৎ পুরীর দিকে যাত্রা করলেন আনন্দকিশোর। বাসনা জগন্নাথ দর্শন। যাত্রা করলেন পায়ে হেঁটে নয়, বুকে হেঁটে। গণ্ডি কেটে-কেটে। পুরী পৌঁছুতে এক বছর লাগল। মাটির ঘষায় বুকে-পায়ে ঘা হয়ে গেছে তবু হটছেন না আনন্দ-কিশোর। ঘায়ের উপর ন্যাকড়া জড়িয়ে নিয়েছেন।

ভক্তের যদি ন্যাকড়াও না জোটে, তবু ভক্ত ন্যাকড়ার আগুন।

জগন্নাথ স্বপ্ন দিলেন। 'তুই বাড়ি যা, আমি পুত্র হয়ে তোর ঘরে আসব।'

পুত্র? দু-দুবার বিয়ে করেছিলেন আনন্দকিশোর, দুই স্ত্রীই গত হয়েছেন নিঃসন্তান অবস্থায়। প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স হল, এখন আর তবে পুত্র কি! কিন্তু স্বপ্ন-বাক্য কি নিষ্ফল হবে?

তৃতীয় বার বিয়ে করলেন আনন্দকিশোর। বিয়ে করলেন নদীয়া জেলার গৌরী জোদ্দারের মেয়ে স্বর্ণময়ীকে।

সেদিন ঝুলন-পূর্ণিমার রাত। পূর্ণিমার চন্দ্র, কিন্তু সবাই বলে কৃষ্ণচন্দ্র।

কিন্তু গৌরীপ্রসাদের ঘরে সেদিন বিপদ উপস্থিত। পরের দুঃখে মন কাঁদে, কোন এক দেনদারের জামিন হয়েছিলেন গৌরীপ্রসাদ। সেই দেনদার হঠাৎ ফেরার হয়েছে। তাই জামিনদারের বিরুদ্ধে জোকী পরোয়ানা বেরিয়েছে আদালত থেকে। অস্থাবর ধরবার পরোয়ানা, আদালতের পেয়াদা চড়াও হয়েছে বাড়িতে।

সে সব দিনে আদালতের পেয়াদা মানে কৃতান্তের অনুচর। বাড়ির মেয়েরা পেয়াদা দেখে যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। স্বর্ণময়ী পালাল বাড়ির পিছনে

পিটুলি গাছের নিচে ঘন কচুবনের মধ্যে।

স্বর্ণময়ী আসন্নপ্রসবা।

লোকের হাঙ্গামা চুকে গেল, বাড়ির মেয়েরা সব একে-একে ফিরল বাড়িতে। কিন্তু স্বর্ণময়ী কোথায়? স্বর্ণময়ী কোথায় গেল?

খুঁজতে-খুঁজতে পেল তাকে কচুবনে। এ কি! তার কোলে প্রসন্নহাস হিরণ্ময়বপু শিশু।

বিপদ কোথায়! বিপদের দিনে বিপদভঞ্জন। বিপন্নপালক।

এই শিশুই বিজয়কৃষ্ণ।

নিম গাছের নিচে জন্মেছিলেন শ্রীচৈতন্য। পিটুলি গাছের নিচে জন্মালেন বিজয়-কৃষ্ণ।

আর আমাদের প্রভু রামকৃষ্ণ জন্মালেন ঢেঁকিশালে। জন্মেই উনুনের ছাই মেখে বিভূতিভূষণ হলেন।

রামকৃষ্ণের রঘুবীর, বিজয়কৃষ্ণের শ্যামসুন্দর।

ভোর বেলা, মন্দিরের দরজা বন্ধ। পূজারী এসে দরজা খুলবে।

শিশু বিজয়কৃষ্ণ সেই দরজা ঠেলছে প্রাণপণে। কাঠের রঙিন বল্ নিয়ে সে খেলছিল, সে-বল্ সে খুঁজে পাচ্ছে না। খুঁজে পাচ্ছিস্ না তো এখানে কি!

'ওই শ্যামসুন্দরই আমার বল্ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। ও-ও যে খেলছিল আমার সঙ্গে।'

কে শোনে কার কথা! দরজা যখন খুলতে পারছে না গায়ের জোরে, তখন কাকুতি-মিনতি করছে। দাও না আমার বল্! কেন বসে আছ দোর এঁটে? বাইরে বেরিয়ে এস না।

দাঁড়াও। কতক্ষণ বন্ধ হয়ে থাকবে? শিশু বিজয়কৃষ্ণ এক লাঠি নিয়ে এসেছে। পূজারী এসে দরজা খুললেই দেখে নেব তোমাকে। কে তখন তোমাকে বাঁচায় দেখব।

দরজা খোলা হলেও মন্দিরে তাকে ঢুকতে দেওয়া হল না। তার যে এখনো পৈতে হয়নি।

সারা দিন উপোস করে রইল বিজয়। মা এসে কত সাধ্যসাধনা করলেন, নরম হল না এতটুকু। শ্যামসুন্দরের উপর প্রতিশোধ না নিয়ে অন্নজল গ্রহণ করবে না সে।

মা ঘরে ভাত রেখে শুয়ে পড়লেন। খিদের কাছেও যে হার মানে না সে কেমন-তরো ছেলে!

মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে গেল স্বর্ণময়ীর। বিজয় যেন কথা কইছে কার সঙ্গে।

'যাক, ঘাট মানলে। তাই ছেড়ে দিলাম। নইলে দেখাতাম একবার মজা।'

গলার সুর বদলাল বিজয়।

'আমি না হয় তোমার উপর রাগ করে খাইনি। কিন্তু তাই বলে তুমি কেন খেলে না?'

স্বর্ণময়ী তো বাক্যহীন।

'বেশ, বেশ, দুজনে একসঙ্গে খাই এস।'

ঢাকা তুলে ভাত খেতে লাগল বিজয়। তার সঙ্গে আরো এক জন কে খাচ্ছে। শিকারপুরের পাঠশালায় ভর্তি হয়েছে বিজয়। ভীষণ কলেরা লেগেছে শান্তিপুরে। চক্ষের পলকে বহু লোক নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তার মধ্যে অনেকগুলো বিজয়ের সহপাঠী।

বিজয়ের বেদনার চেয়ে বিস্ময় বেশি। যে মাদুরে তারা বসত সে মাদুর আছে, যে বই তারা পড়ত সেই বই আছে, যে জিনিস নিয়ে খেলাধুলো করত সেই জিনিসগুলো আছে। অথচ তারা নেই। এ কখনো হতে পারে? ঐটুকু শিশু মহা সমস্যায় পড়ে গেল। যা একবার থাকে তা কি আবার না-থাকে? যা একবার হয় তা কি আবার না হয়?

চিন্তায় হাবুডুবু খাচ্ছে শিশু। কে তাকে মীমাংসা করে দেবে? কে তার সেই গুরুমশাই?

একদিন ভারি মন নিয়ে চলেছে পাঠশালার। হঠাৎ তার সেই মৃত সহপাঠীরা দর্শন দিলে তাকে, দিনের আলোয়, পথের মধ্যে। বলে উঠল সমস্বরে: 'বিজয়, আমরা আছি। আমরা আছি।'

আমরা আছি? আমরা যদি আছি, তবে নিশ্চয়ই তিনিও আছেন।

পাঠশালায় চলে এল একছুটে। পাঠশালার গুরু ভগবান সরকার, তাঁকে বললে সব বিজয়। ভূতের গল্প বলে হেসে উড়িয়ে দিলেন গুরুমশাই। বিজয় জেদ ধরল, আপনি একবার চলুন আমার সঙ্গে। সেই ঝোপের পাশে, পথের উপর।

নেই-আঁকড়ার পাল্লায় পড়েছেন গুরুমশাই। শেষে তিনি শক্ত হয়ে বললেন, 'ঠিক বলছিস? তাদের কথা তুই শোনাতে পারবি?'

'নিশ্চয়ই পারব।'

সেই চেনা জায়গায় নিয়ে এল গুরুমশাইকে। কিন্তু কোথায় সেই ছেলের দল? কোথায় তাদের সেই কচি গলার কলস্বর?

ওরে তোরা কোথায়? তোরা কথা ক। আমরা শুধু আমাদের কথা কইছি।

BanglaBook.org

তোরা তোদের কথা ক। তোদের কথাই তাঁর কথা।

চার দিকে শুধু মৌনময় মূখরতা। এ কি গুরুমশাইদের কানে ঢোকে? তারা ইন্দ্রিয়ের প্রমাণ চায়। বলে, দেখাতে পারো? শোনাতে পারো?

'যত সব ফাজলামো—' ভগবান সরকার মারতে উঠলেন বিজয়কে।

হঠাৎ একসঙ্গে কতগুলি ছেলে কলধ্বনি করে উঠল: 'গুরুমশাই, মারবেন না বিজয়কে।'

উদ্যত হাত অসাড় হয়ে গেল। ব্যাকুল চোখে চার দিকে তাকাতে লাগলেন ভগবান সরকার।

'এই যে আমরা। এইখানে, এইখানে। সবখানে—'

বিজয়কে বুকে জড়িয়ে ধরলেন ভগবান সরকার। কে কার গুরু? যে দেখায় আর শোনায় সেই তো আচার্য।

সেই তো দ্রষ্টা, স্রষ্টা, শ্রোতা, ভ্রাতা, রসয়িতা।

পুরন্দর পূজারী মরে ব্রহ্মদৈত্য হয়েছে। থাকে গাছের উপর। আগে শ্যাম-সুন্দরের পূজারী ছিল। পূজো করত আর জিনিস সরাত। ভোগ-নৈবেদ্য শুধু নয়, আরো কিছু মোটা জিনিস। তারই পাপে এই গতি।

কিন্তু বিজয়ের উপর ভারি টান। তার সর্বত্র অপদে গতায়াত, তাই আপদে-বিপদে সব সময়ে সে বিজয়কে রক্ষা করে। থাকে তার সঙ্গে-সঙ্গে। কখনো দেখা দেয় কখনো বা দেয় না।

যাত্রা শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে বিজয়। আসর ভেঙে গিয়েছে। যে যার মনে কখন ফিরে গিয়েছে বাড়ি-ঘর। ফরাসের একধারে বিজয় শুধু একা ঘুমিয়ে। ঘুম ভেঙে চোখ চেয়ে তো তার চক্ষুস্থির। রাত ঝাঁ-ঝাঁ করছে, সঙ্গী-সাথী নেই কেউ ধারে-কাছে, এখন সে বাড়ি ফেরে কি করে?

খড়মের শব্দ শোনা গেল চটপট। হাতে লণ্ঠন আর লাঠি, কে এক জন কাছে এসে দাঁড়াল। বললে, 'চল্, পৌঁছে দিয়ে আসি।'

এমনি আরো কয়েকবার সে পৌঁছে দিয়ে এসেছে। বিপদে বা বিপথে পড়লেই লাঠি হাতে পুরন্দর এসে দেখা দেয়।

'ঐ লোকটা কে রে?' এক দিন জিগগেস করলেন স্বর্ণময়ী।

'কোন লোক?'

'যে তোকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যায়?'

'বা, আমি তো জানি তুমিই পাঠিয়ে দাও ওকে। আমাকে ডেকে নিয়ে আসবার জন্যে বুঝি লোক রেখেছ। তবে—'

pathagar.net

'শোন, ওর সঙ্গ করবি নে। ও ব্রহ্মদত্যি।'

হোক ব্রহ্মদৈত্য। দৈত্য থেকেই ক্রমে এক দিন ব্রহ্মে গিয়ে পৌছুব।

বিজয় না চাইলে কি হবে, পুরন্দর তাকে ছাড়ে না। বলে, আমি যতদিন আছি, ততদিন তোকে আগলে যাব।

'কিন্তু মা বলেছে, গয়ায় যদি তোমার পিণ্ড দিই ?'

ব্যস্, তা হলেই বন্ধন মুক্তি। তাহলেই ঊর্ধ্বযাত্রা। ক্রমোন্নয়ন।

'কিন্তু, দেখো, তোমরা যেন গয়ায় মরে ভূত হয়ো না।' হেসে উঠল পুরন্দর।

সেদিন গান শুনে বাড়ি ফিরতে বেজায় দেরি হয়ে গিয়েছে।

পুরন্দর বললে, 'এই পোড়ো বাড়ির আঙিনার ভেতর দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে। গাছে বাঁদর আছে, ডালপালায় ঝুপঝাপ করলে ভয় পেয়ো না।'

অমনি গাছের উপর থেকে কে একজন বলে উঠল ব্যঙ্গ করে : 'বেশ বলেছ যা হোক। গাছে যখন আছি তখন বাঁদর ছাড়া আর কি। কিন্তু ছেলেটার কাছে আসল কথাটা ফাঁস করে দেব না কি ?'

তার মানে ছেলেটাকে ভয় দেখাবে। পুরন্দর তেড়ে এল। বললে, 'ঐ যে বলেছে মরলেও স্বভাব যায় না তাদের হয়েছে তাই।'

ঝগড়া বাধে দেখে বৃক্ষস্থ আরেক জন মধ্যস্থতা করতে এল। গম্ভীর গলায় বললে, 'পরলোক দেখ! পরলোক দেখ!'

শুধু পরলোক নয়, পরম লোককে দেখব। যা প্রেত ও প্রস্থিত তাই এক দিন মহাস্থিতের কাছে পৌছে দেবে। সেই তো আদি বাড়ি। সেখানেই তো আসল উপনয়ন।

ন বছর বয়সে উপনয়ন হল বিজয়ের। টোলে গিয়ে ঢুকল। এক বছরে মুগ্ধবোধ মুখস্থ করে ফেললে। তার পর নিয়ে পড়ল সাংখ্য আর বেদান্তদর্শন।

কিন্তু যতই পড়ো আর লড়ো, তার মুখে শুধু এক বুলি। সে বুলির নাম 'হরিবোল'। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী হরি-ভোলা সংসারে বাস করে না, বাস করে হরি-বোলা সংসারে।

দক্ষিণেশ্বরে যখন আসে তখনই মুখে ধ্বনি করে : 'হে শ্রীহরি—'

এই শ্রীহরি ডাকটিই পর-পর তিন বার তিন রকম সুরে সে উচ্চারণ করে। এমন করুণ এমন আর্দ্র সেই স্বর যে তপ্ত চিত্ত শীতল হয়, তৃষিত চিত্ত তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। মনে হয় সর্বতীর্থময় হরি যেন বাস করছেন এই দক্ষিণেশ্বর তীর্থে।

নামাগ্নিতে দগ্ধীভূত হয়ে যাচ্ছে—বিজয়কৃষ্ণকে চিনতে পারল রামকৃষ্ণ।

বিধৌত হয়ে যাচ্ছে পরমপাবনী ভক্তিতে। এসেছে সেই ক্ষমা, বৈরাগ্য আর

মানশূন্যতা। সেই আশাবন্ধসমুৎকণ্ঠা, ভগবানকে পাবার জন্যে বেগবতী আশা আর না পাওয়ার জন্যে ঐকান্তিকী কাতরতা। সেই নামগানে সদারুচি। আসক্তিস্তৎগুণাখ্যানে, প্রীতিস্তৎবসতিস্থলে। বিজয়ের সর্বাঙ্গে সেই ভাবকদম্ব পরিস্ফুট।

ঠাকুরের তখন হাত ভেঙে গেছে, খুব কষ্ট পাচ্ছেন।

একজন ব্রাহ্ম ভক্ত বললে, 'আপনি তো জীবন্মুক্ত, এই কষ্টটুকু ভুলতে পাচ্ছেন না?'

ঠাকুর বললেন, 'তোদের সঙ্গে কথা বলে ভুলব? তোদের বিজয়কে আন। তাকে দেখলে আমি আপনাকে ভুলে যাই।'

॥ ৫৯ ॥

কলকাতায় এসে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হল বিজয়কৃষ্ণ। রামচন্দ্র ভাদুড়ীর মেয়ে যোগমায়াকে বিয়ে করলে। বিজয়ের বয়স আঠারো আর যোগমায়ার ছয়।

বিজয়ের দুই বন্ধু রামময় আর কৃষ্ণময় খৃষ্টান হয়ে গেল।

বিরক্তিতে বিভ্রান্ত হল না বিজয়, বেদনায় ভাবতে বসল। হিন্দুধর্মের অনুষ্ঠানে তুলসী-বিল্বপত্রের সঙ্গে অনেক আগাছা এসে ভিড়েছে। তাই লোকে আস্থা হারাচ্ছে। রাস্তা হারাচ্ছে। উন্মার্গগামী হচ্ছে।

এখন উপায় কি।

রংপুরে শিষ্যবাড়ি গিয়েছিল, শিষ্য মন্ত্র আওড়ে পা-পূজো করলে। বললে, তুমি জ্ঞানবর্তিকা জেলে অজ্ঞানের চক্ষুরুন্মীলন করেছ, তোমাকে প্রণাম।

ছাই করেছি। কিছু করিনি। আমার নিজের চোখ কে খুলে দেয় তার ঠিক নেই, আমি গেছি পরের চোখ খুলতে। একেই বলে গয়ায় মরে ভূত হওয়া। করব না আর কপটাচরণ।

যজমানগিরি ছেড়ে দিয়ে স্বাধীন ভাবে খেটে খাব কলকাতায়। পড়ব মেডিকেল কলেজে।

রংপুর থেকে বগুড়ায় এল বিজয়কৃষ্ণ। বগুড়ায় তিন জন ব্রাহ্মভক্তের সঙ্গে দেখা হল। এরা তো চমৎকার। যেমন শুনেছিলাম তেমন তো নয়। মদও খায় না, স্বেচ্ছাচারও করে না। শুধু ঈশ্বরের কথা হয়। সেই তো 'অমৃতস্য পরং সেতু'। বাক্যে তাঁর প্রকাশ হয় না অথচ বাক্যই তাঁর প্রকাশ।

কলকাতায় এসে ব্রাহ্মসমাজে হাজির হল এক দিন। সেদিন দেবেন ঠাকুর বক্তৃতা দিচ্ছেন। বক্তৃতার বিষয়—'পাপীর দুর্দশা ও ঈশ্বরের করুণা'। বক্তৃতা

শুনে বিজয় অভিভূত, দ্রবীভূত হয়ে গেল। নিজেকে হঠাৎ মনে করল নিরাশ্রয় বলে। নির্জন, নিঃসহায় বলে। প্রার্থনা করতে বসল। 'এইমাত্র শুনলাম তুমি অনাথের নাথ, তুমি দীন জনের বন্ধু। তবে আমাকে তুমি নাও, আমাকে তুমি রাখো। তোমাকে যে পায়নি তার মত আর দীন কে! তুমি আমার, এই নিকট অনুভূতি যার নেই সেই তো অনাথ। আমি আর কোথাও যাব না, আর কোথাও ঘু ব না, এই তোমার দুয়ার ধরে পড়ে রইলাম—'

তাঁর দরজায় তিনি যে আমাকে পড়ে থাকতে দেবেন এই তো তাঁর অনেক দয়া। ভিখারীকে দোরগোড়ার স্থানটুকুই বা কে দেয়!

শুধু শরণাগতিতেই শান্তি। সর্বসাধনস্তম্ভরূপা শরণাগতি।

'শান্তিরেব শান্তিঃ, সা মে শান্তিরেধি।' যা আপনাতেই শান্তি সেই শান্তিই আমার হোক।

ঠাকুর বললেন, 'কাঠ পোড়া শেষ হলে আর শব্দ থাকে না—উত্তাপও থাকে না। সব ঠাণ্ডা। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।'

মেডিকেল কলেজের বাংলা বিভাগে পড়ছে বিজয়কৃষ্ণ। সাহেব অধ্যক্ষের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষ বেধেছে। বিজয় সেই ছাত্রদলের পাণ্ডা।

ব্যাপার কি?

এক ছাত্রকে ওষুধচুরির অপবাদ দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছেন অধ্যক্ষ। শুধু তাই নয়, জাত তুলে বাঙালীদের গাল দিয়েছেন। আর যায় কোথা! বিজয়ের নেতৃত্বে ছাত্রেরা সব কলেজ ছেড়ে দিলে।

এই নিয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা বিজয়কৃষ্ণের।

বিজয়কে দেখে বিদ্যাসাগরের আনন্দ ধরে না। দুই তেজস্বী চক্ষু সত্যের আলোতে জ্বলছে। দৃপ্ত ব্যক্তিত্বে অবক্র নির্ভীকতা। শুধু তাই নয়, সঙ্গে তীব্র ঈশ্বরানুরাগ।

বিজয় বললে, 'আপনার বোধোদয়ে সবই তো লিখেছেন, কিন্তু সত্যিকার বোধোদয় হয় যাঁকে আশ্রয় করে, তাঁর কথাই কিছু নেই।'

কোনো উত্তর খুঁজে পেল না বিদ্যাসাগর। বিদ্যার সে সাগর বটে কিন্তু তার নামের প্রথমেই যে ঈশ্বর তার দিকেই বুঝি তার চোখ পড়েনি।

বোধোদয়ের পরের সংস্করণে 'ঈশ্বর' এল। নতুন পাঠ। কিন্তু নব-নবায়মান রস। পৈতে ফেলে দিয়ে ব্রাহ্ম হল বিজয়কৃষ্ণ। প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে লাগল। শুধু বক্তৃতা নয়, প্রচারণা। চাই ব্রহ্মবিদ্যা, পরা বিদ্যা। জড় ধর্ম থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানকে লাভ করার সারমর্মই হচ্ছে ব্রাহ্মধর্ম।

এই সময় কেশব সেনের সঙ্গে আলাপ হল বিজয়ের। আলাপের সঙ্গে-সঙ্গেই গভীর বন্ধুতা। একে অন্যের দর্পণ হয়ে দাঁড়াল। এ দর্পণে পরস্পরের মুখ দেখে না, পরাবরের মুখে দেখে।

মেডিকেল-কলেজের শেষ পরীক্ষা কাছে, বিজয় বললে, পরীক্ষা দেব না, ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করব। দেশে-দেশে দিকে-দিকে ঈশ্বরের নাম গেয়ে বেড়াব এই ব্যাকুল-তাই আমার জীবনের আকর্ষণ। জীবিকার চেয়ে জীবন বড়। জীবনের চেয়ে জীবনবল্লভ।

কিন্তু প্রচার মুখের কথা নয়। কেশব বললে, দস্তুরমতো পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে হবে।

'তাই করব।' পড়াশোনা করে পাশ করলে সহজেই। ধর্মের বৈজয়ন্তী নিয়ে বিজয় বেরুল দিগ্বিজয়ে।

'এ যে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।' আপত্তি করল বন্ধুরা। 'পেট চলবে কি করে?'

'যিনি মরুভূমিতে ঘাস বাঁচিয়ে রাখেন, তিনিই রাখবেন।'

মহর্ষি বললেন, 'নির্দিষ্ট কিছু বৃত্তি দেওয়া যাক তোমাকে।'

প্রবৃত্তির বৃত্তি করতে আসিনি। ঈশ্বরই আমার উত্তম, ঈশ্বরই আমার উদ্দেশ্য। তাঁর উপরে যদি সত্যি আমার নির্ভর থাকে তা হলেই আমি অভীঃ।

সংসারে তার জায়গা হয়নি, তাই বলে সংসারকে ত্যাগ করেনি বিজয়কৃষ্ণ। শান্তিপুর তাকে তাড়িয়েছে কিন্তু বিজয় চলেছে আসল শান্তিপুরে।

তার গতি দুর্গবিঘাতিনী, তার বাণী অপরাঙ্মুখী।

কলকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য হল বিজয়।

বুধবার, উপাসনার দিন। প্রলয়ঙ্কর ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। পথঘাট ডুবে গেছে, গাছ পড়েছে অনেক, গাড়ি-ঘোড়া জনমানবের চিহ্ন নেই। জলস্রোতে মৃতদেহ ভাসছে। ঘোর অন্ধকার। কার সাধ্য রাস্তায় বেরোয় এই দুঃসময়ে?

বিজয়ের সাধ্য। প্রথমে হাঁটুজল থেকে গলাজল। তার পরে সাঁতার। পথনদী পার হয়ে শেষ পর্যন্ত পৌঁছুল মন্দিরে। কিন্তু হা হতোহস্মি, এক জনও আসেনি, ব্যাকুলতার ঝড়ে ভক্তির নদী সাঁতরে। বিশ্বাসের ভেলায় ভেসে। অশ্রুজলের বর্ষণে।

মন্দিরের চাকরকে পাঠাল আচার্যের কাছে। আচার্য মানে দেবেন ঠাকুরের কাছে। তিনি লিখে পাঠালেন: প্রকৃতির আজ করালমূর্তি, আজ এর মধ্যেই পরমেশ্বরের লীলা দর্শন করো।

একাই উপাসনায় বসল বিজয়। বিজয় একাই একশো।

কতক্ষণ পরে কেশব এল পালকিতে করে। বসে পড়ল উপাসনায়। নীরন্ধ্র অন্ধকারে দুটি নিষ্কম্প দীপদ্যুতি—কেশব আর বিজয়। স্বস্থ, শান্ত, স্পন্দনবিরহিত। ব্রহ্মনিষ্পন্ন।

বিজয়ের দিন কাটছে অর্ধাশনে, কখনো অনশনে। চাঁদার খাতায় চার আনা আট আনা ভিক্ষে করে। কখনো বা দেড় পয়সার মুড়ি খেয়ে। বাড়ির প্রাঙ্গনে কাঁটা-নটে শাক ফলেছে অজস্র, তাই দিয়ে ভাত মেখে। তাও না জোটে তেঁতুলগোলা দিয়ে। তবু ঈশ্বরস্খলন নেই, নেই স্বভাবচ্যুতি।

কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি—এই কাম্যকর্মত্রয় বিজয়ের। 'অন্নচিন্তা চমৎকারা'—এ যেন বিজয়ের পক্ষে খাটে না। সে জানে তৃষ্ণাসূত্র ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত জীবের সমস্তই দুঃখ, তৃষ্ণাচ্ছেদ থেকে যে কৈবল্য তাই একমাত্র আনন্দ। বিজয় আছে সেই বৃহদানন্দে, জগদানন্দে। যদি সে পৌত্তলিকতা বর্জন করে থাকে তবে সে সুখ-শান্তি অর্থ-আরাম যশ-মান—সমস্ত উপাধিই বর্জন করবে। উপাধিরই বিকার, উপাধিরই মৃত্যু, আত্মা স্থির, নির্বিচল।

আত্মা প্রকাশক, জড় প্রকাশ্য। কেবল উপাধির যোগেই ভাবি আত্মাই বুঝি কর্তা, আত্মাই বুঝি ভোক্তা। অবিদ্যার বশেই নিজেকে দেহবান মনে করি। মন মায়া, আভাস মাত্র। আমাদের আসল অধিষ্ঠান চৈতন্যে। ঈশ্বর মায়ার অতীত। ঈশ্বর চৈতন্যস্বরূপ।

বিজয় সেই চৈতন্যের দ্যোতনা।

কেশব আর বিজয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারছে না পাদ্রিরা। খৃষ্টধর্মে আর আকৃষ্ট হচ্ছে না বাঙালী, ব্রাহ্মধর্মেই পাচ্ছে তাদের পিপাসার পানীয়।

এখন কি করা! পাদ্রিরা ঠিক করল তর্কসভায় ব্রাহ্ম-প্রচারকদের আহ্বান করা যাক। তাদের তর্কে পরাস্ত করতে পারলেই বিদ্বৎসমাজ কৃতনিশ্চয় হবে যে খৃষ্ট-ধর্মই শ্রেষ্ঠধর্ম।

তখন কেশব বিজয় আর প্রতাপ এলাহাবাদে। উপাসনার পরে মন্দিরে এক দিন এসেছে এক পাদ্রি। মহাজ্ঞানী আর তর্কবীর বলে প্রখ্যাত। খোদ বিলেত থেকে এসেছে খৃষ্টান মিশনের প্রতিনিধি হয়ে। আগে পাদ্রি, পরে বেনে, শেষকালে সৈন্য। এই ইংরাজী কূটনীতি। আগে মিষ্টি বুলি, পরে টাকার টুং-টুং, শেষকালে অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা। সাদরে অভ্যর্থনা করল কেশব।

'তোমরা খৃষ্টধর্ম প্রচারে বাধা দিচ্ছ। সে বিষয়ে খোঁজ করতে এসেছি আমি। ধর্ম সম্বন্ধে আমি বিচার করতে চাই তোমাদের সঙ্গে। কি তোমাদের বক্তব্য, কি

বা তার ভাব—'

চার দিকে তাকাল পাদ্রি। কার সঙ্গে কথা কইব? কে তোমাদের মধ্যে উপযুক্ত?

যাকে ইচ্ছে তাকেই বেছে নাও। কিন্তু তোমাকে কে বাছল, তাই ভেবে পাচ্ছি না।

'ঐ যে এক জন বসে আছে স্থির হয়ে, উপাসনা শেষ হয়ে যাবার পরেও যে নড়ছে না, ওর নাম কি?'

'বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।'

'ওর সঙ্গেই আমি কথা কইব। ওকে বলো না, চেয়ারে এসে বসবে, ও ভাবে পা মুড়ে বসবার আমার অভ্যেস নেই।'

বিজয়ের ধ্যান ভাঙল। জানল সাহেবের অভিপ্রায়।

বললে, 'সাহেব, পাণ্ডিত্য তো অগাধ সঞ্চয় করেছ। আমার পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর আগে দাও। প্রশ্ন থেকেই বুঝে নাও ভারতবর্ষের জিজ্ঞাসার গভীরতা। ধর্ম কি? তার উৎপত্তি কোথায়? আত্মা কাকে বলে আর তার স্বরূপ কি? সত্য কি জিনিস? কাকে মায়া বলে? পাপ কি, কেন?'

পাদ্রি সাহেব এ পাশ ও পাশ তাকাতে লাগল, বললে, 'এ সব প্রশ্ন তো কই শুনিনি কোথাও। এ আবার কি কথা। আমরা তো শুধু বাইবেল জানি, বাইবেলই পড়েছি—'

'সাহেব, এ দেশের নাম ভারতবর্ষ।' কেশব বললে, 'এ দেশ থেকেই ধর্ম আর সভ্যতা গ্রীস হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে তোমাদের ইউরোপে। এ দেশকে জানো, বোঝো, তবে এসো এ দেশকে ধর্মে দীক্ষা দিতে। প্রশ্নের উত্তর তুমি যদি নিজে দিতে না পার, তোমার দেশে ফিরে যাও, সেখান থেকে উত্তর নিয়ে এস।'

সৃষ্টির প্রথম প্রশ্নের ভারতবর্ষই শেষ উত্তর।

ভারতবর্ষ বৃক্ষ, আর সব ছায়া। একে সেবা কর, উচ্ছিন্ন কোরো না। আমাদের সেবা মঙ্গলরূপিণী। 'সেবিতব্যঃ মহাবৃক্ষঃ'।

যখন তিনি দূরে তাঁকে আরাধনা করি আর যখন তিনি কাছে তখন তাঁকে সুখে সেবা করি। তিনি সুখসেব্য দুরারাধ্য। তিনি গুহ্যগভীরগহন হয়েও সহজ-সুন্দর। তুমি, সাহেব, বুঝবে না এ তত্ত্ব। আগে শ্রদ্ধা দিয়ে বুদ্ধিকে বিশুদ্ধ করো। পরে দেখ ভারতবর্ষকে।

আর বাক্যস্ফূর্ত না করে চম্পট দিলে পাদ্রি সাহেব।

শুষ্ক জ্ঞানে মন ভরে না বিজয়ের। মন ভক্তি চায় প্রীতি চায়। প্রীতিই একমাত্র

মাধুর্যবিষয়িনী। আর ভাগবতী প্রীতিই ভক্তি। ভক্তিতেই সমস্ত জ্ঞানের অবসান। ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচার করতে-করতে বিজয় বৃন্দাবনে এসেছে। উপাসনার মধ্যে হঠাৎ কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার বর্ণনা শুরু করে দিলে। ব্রাহ্মরা যারা শুনছিল তারা চঞ্চল হয়ে উঠল। এ কি পথস্খলন!

'কে জানে! স্পষ্ট চোখের উপর দেখলাম কৃষ্ণ গোঠে গরু নিয়ে যাচ্ছে।'

শুধু তাই নয়, উপাসনায় বসে মাঝে-মাঝে 'মা' 'মা' করে ওঠে।

এ কী হচ্ছে! ক্ষুণ্ণ হয় ব্রাহ্মরা। এ কী ভগবতী না জগদ্ধাত্রীর আবাহন? কিন্তু সেই অধীর আর্তি স্পর্শ করে সবাইকে। এ তো বৈধী ভক্তি নয়, এ রাগানুগা ভক্তি। শাস্ত্রের শাসনে ঐশ্বর্যবানে যে ভক্তি তা বৈধী ভক্তি আর মাধুর্যময়ী স্বভাবরুচির ভক্তিই রাগানুগা ভক্তি। বৈধী ভক্তি পিতা, রাগানুগা ভক্তিই মা। 'জয় জয় বিজয়ের জয়!' কেশব চিঠি লিখছে বিজয়কে: 'ঈশ্বরকে একমাত্র নেতা-জ্ঞানে উচ্চকণ্ঠে তাঁর নাম কীর্তন কর। বৈরাগী হয়ে পদানত কর সংসারকে। উৎসাহের উত্তাপ দিয়ে জাগাও প্রসুপ্তকে, এক প্রীতির বন্ধনে সবাইকে বেঁধে ফেল। যারা নিজেদের দরিদ্র বলে বোধ করছে, তাদের ভগবৎ-বিত্তে সম্রাটের চেয়েও ধনবান কর। দেশে-বিদেশে আমাদের রাজ্য বিস্তৃত হোক।'

বাইরে প্রচার হচ্ছে আর এদিকে ঘরের মধ্যে চেঁচামেচি। বিধবা-বিয়ে, অসবর্ণ বিয়ে, ব্রাহ্মমতে শ্রাদ্ধ—এই সব নিয়ে। তুমুল হট্টগোল। কেশবকে সবাই খৃষ্টান বলতে শুরু করে দিয়েছে। শুধু তাই নয় দিচ্ছে তাকে আরো অপকৃষ্ট অপবাদ। বইছে শুধু ঈর্ষার বিষবায়ু।

বিজয়ের মন বিমুখ হয়ে উঠল। আছি শ্রীপাদপদ্মবিষয়িনী ভক্তি নিয়ে, এ সব আবার কি সংস্কারের উৎপাত! যেন অধিষ্ঠানের চেয়ে অনুষ্ঠান বড়! বিজয় চলে এল কালনায়, ভগবান দাস বাবাজীর আশ্রমে।

জল খেতে চাইল বিজয়। বললে, আমি ব্রহ্মজ্ঞানী, আমাকে কিন্তু আলাদা পাত্রে জল দেবে। বাবাজী বললে, 'যার জ্ঞান তারই তো ভক্তি। ভক্তি বাদ দিয়ে কি জ্ঞান সম্ভব? আমার পিপাসাও আজ চরিতার্থ করব। আমার কমণ্ডলুতেই জল খান।'

বাবাজীর পাত্রেই জল খেল বিজয়।

এক ঢোঁকে বাকি জল খেয়ে নিলেন বাবাজী। কমণ্ডলু মাথায় ঠেকালেন।

'এ কি করলেন? ইনি যে ব্রাহ্ম।' কে এক জন চেঁচিয়ে উঠল: 'এঁর যে পৈতে নেই।'

'আমার অদ্বৈতেরও ছিল না। ব্রাহ্মসমাজে গেছেন, কিন্তু সেখানেও আমার

গোঁসাইই আচার্য।'

'আহা, আচার্যের কি বাহার! গায়ে জামা, পায়ে জুতো, আহা ফিটফাট ফুলবাবুটি!' ব্যঙ্গ করে উঠল সেই অভক্ত।

'প্রভুকে আমার পরিপাটি করে সাজাও।' ভগবান দাস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন: 'আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার প্রভুর ললাটে তিলক, শিরে জটাজুট ও গলায় তুলসীর মালা। সর্বাঙ্গে বৈষ্ণব চিহ্ন।'

ব্রহ্মমন্দিরে কীর্তন ঢোকাল বিজয়।

'কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ,
নেত্রের ভূষণ আমার সে রূপ দর্শন,
বদনের ভূষণ আমার সে রূপ কথন,
হস্তের ভূষণ আমার সে পদ সেবন,
(ভূষণের কি আর বাকি আছে)
আমি কৃষ্ণচন্দ্রহার পরেছি গলে।'

কেশবকে কীর্তনে দীক্ষিত করলেন ঠাকুর। কেশব গলায় খোল ঝোলালো। মাঝখানে ঠাকুরকে রেখে সকলে নাচছে। কেশবও শুরু করলে নাচতে।

কেশব যেমন আসে তেমনি ঠাকুরও যান কেশবের বাড়িতে।

নিমাই সন্ন্যাস দেখতে কেশবের বাড়িতে গিয়েছেন ঠাকুর। কেশবের এক খোশামুদে শিষ্য কেশবকে বললে, 'কলির চৈতন্য হচ্ছেন আপনি।'

কেশব ঠাকুরের দিকে তাকাল। হাসতে-হাসতে বললে, 'তাহলে ইনি কি হলেন?'

ঠাকুর বললেন, 'আমি তোমার দাসের দাস। রেণুর রেণু।'

কেশবকে বড় ভালোবাসে রামকৃষ্ণ। তার সঙ্গে তার অন্তরের মাখামাখি। কিন্তু কাপ্তেন খড়্গহস্ত। সে বলে, কেশব ভ্রষ্টাচার, সাহেবের সঙ্গে খায়, ভিন্ন জাতে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। 'আমার সে সবে দরকার কি? কেশব হরিনাম করে, দেখতে যাই, শুনতে যাই। আমি কুলটি খাই, কাঁটায় আমার কি কাজ?' কাপ্তেন ছাড়ে না তবু। 'কেশব সেনের ওখানে যাও কেন তুমি?' 'আমি তো টাকার জন্যে যাই না। আমি হরিনাম শুনতে যাই। আর তুমি লাট সাহেবের বাড়িতে যাও কেমন করে? তারা তো ম্লেচ্ছ—'

তবে নিবৃত্ত হল কাপ্তেন।

কেশবকে লক্ষ্য করে রঙ্গরসের গান গায় রামকৃষ্ণ:

'জানি ওহে জানি বঁধু
তুমি কেমন রসিক সুজন,
বলি, আর কেন কর প্রাণ জ্বালাতন।
নেচে ঘুরে ঘুরে
অভিমানে মুখ ফিরায়ে
বঁধু, আর কেন কর প্রাণ জ্বালাতন॥
রমণীর মন ভুলাতে
নিতি হয় আসতে-যেতে
কেন এলে নিশি প্রভাতে
ওহে, মদনমোহন বংশীবদন॥'

বিজয়কে কবে গান শোনাবে রামকৃষ্ণ? কবে তাকে নাচতে শেখাবে? কবে দেখবে তার গৈরিকবাস সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী মূর্তি?

আর, বিজয়কৃষ্ণ কবে এসে রামকৃষ্ণের পদতলে পড়বে? বক্ষে ধারণ করবে সেই পাদপদ্ম?

আর, সেই তো পরং পদং, পরা কাষ্ঠা।

॥ ৬০ ॥

ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করছে বিজয়, আবার সেই সঙ্গে চিকিৎসাও করছে। চার দিকে এত রুগী, চুপ করে বসে থাকলে চলে কি করে? যেটুকু জ্ঞান ভাণ্ডারে আছে তা পরিবেশন না করে শান্তি কই?

দর্শনী ঠিক করল আট আনা। কিন্তু শুধু রোগ তো নয়, রোগের সঙ্গে নিষ্ঠুরতম রোগ—দারিদ্র্য। তাই গরীব রুগীদের ওষুধ আর পথ্য যোগাতে গিয়ে দর্শনী অদৃশ্য হয়ে গেল। দর্শনী নেই বটে কিন্তু হতে লাগল অপূর্ব দর্শন।

রাত্রে প্রায়ই স্বপ্ন দেখে বিজয়। দেশনেতা সুরেন বাঁড়ুয্যের বাপ দুর্গাচরণ বাঁড়ুয্যে নামজাদা ডাক্তার। তিনি গত হয়েছেন বটে, কিন্তু স্বপ্নে প্রায়ই দেখা দেন বিজয়কে। কঠিন সব রোগের ব্যবস্থাপত্র দিয়ে যান। বিজয় তাই বিছানায় কাগজ ও পেন্সিল নিয়ে ঘুমোয়। স্বপ্নে-পাওয়া প্রেসক্রপশান ভোরে উঠেই টুকে রাখে। সে অন্ধকারে ঢিল-ছোঁড়া ওষুধ নয়, সে একেবারে বিশল্যকরণী।

ডাক্তার হিসেবে বিজয়ের তাই জয়-জয়কার।

শুধু ডাক্তার হিসেবে?

শান্তিপুরের ওপারে গুপ্তিপাড়া। সেখানকার এক রুগী এসেছে বিজয়ের হাতে।

সকালে একবার দেখে এসেছে, এখন আবার বিকেলে গিয়ে খোঁজ নেওয়া দরকার। শুধু খোঁজ নেওয়া নয়, নতুন আরেক দফা ওষুধ দিতে হবে। কিন্তু যায় কি করে? বর্ষাকাল, নিদারুণ ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়েছে। খেয়া বন্ধ, পাটনী রাজী নয় নৌকো ছাড়তে। তবে, উপায়? উপায় জগৎপিতা। কাপড়ের পাগড়ি করে ওষুধের শিশি মাথায় বাঁধল বিজয়, বর্ষার ভরা নদী পার হয়ে গেল সাঁতরে।

রুগী চোখ চেয়ে দেখল, দুয়ারে ধন্বন্তরী দাঁড়িয়ে।

সেই দুর্গাচরণই শেষে আরেক দিন স্বপ্ন দেখালেন। বললেন, 'তুমি কি শুধু দেহের চিকিৎসা করেই দিন কাটাবে? অন্তরের চিকিৎসা করবে না? তুমি শুধু আয়ুর্বেদী নও, তুমি ভবরোগবৈদ্য।'

ডাক্তারি ছেড়ে দিল বিজয়। থাকে বন্ধু ব্রজসুন্দর মিত্রের বাড়িতে। তাকে উদ্দেশ করে চিঠি লিখল তক্ষুনি: 'ভাই, আমার ভিখিরির ঘরে জন্ম, তাই আবার ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে তুলে নিলাম। ব্যবসা করা আমার পোষাল না। তাই তোমার আশ্রম ছেড়ে চললাম আবার নিরুদ্দেশে। ঈশ্বরের পায়ে নিজেকে বহু দিন বেচে দিয়েছি, তাই তিনি আর আমাকে ত্যাগ করতে পারবেন না। ব্রাহ্ম-ধর্মের জয় হোক। আমার শোণিত পোষণ করুক ব্রাহ্মধর্মকে। ব্রাহ্মধর্মই আচরণীয়। প্রচরণীয়।'

শান্তিপুরে নির্জনে এসে বাস করছে বিজয়। শুধু স্থানের নির্জনে নয়, গুহাশয়ী মনের নির্জনে। হঠাৎ এক দিন সেখানে দেখা দিল শ্যামসুন্দর। বিজয় তাকে ত্যাগ করেছে বটে, কিন্তু শ্যামসুন্দর যে ত্যাগীকেও ত্যাগ করে না। ছাড়তে শিখিয়েও যে ধরে থাকে। পথহারা করিয়েও যে পথ দেখায়!

'তোকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে এলাম, নিয়ে এলাম মন্দির থেকে মুক্ত প্রাঙ্গণে—' বললে শ্যামসুন্দর: 'আবার তুই এসে সেই ঘরে ঢুকেছিস? ঢুকেছিস সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে? বেরিয়ে আয়, বেরিয়ে আয় আগল ভেঙে—'

কে শোনে কার কথা! বিজয় ভাবলে ছলনা। নিরংশ জ্ঞানের জগতে ভাবের কুজ্ঝটিকা। আরেক দিন গভীর রাত্রে ব্রহ্মনাম সাধন করছে বিজয়, মনে হল রুদ্ধ দরজায় কে ঘা মারছে বাইরে থেকে। ভাবতন্দ্রা ঘুচে গেল বিজয়ের। প্রশ্ন করলে: 'কে?' কোনো উত্তর নেই। শুধু দ্রুত করশব্দ। মনে হল এক জন নয়, বহু লোকের সমাগম হয়েছে বাইরে।

খুলে দিল দরজা। এক দল জ্যোতির্ময় পুরুষ ঘরে ঢুকল একসঙ্গে। জ্যোতির প্লাবনে ভরে গেল গৃহাঙ্গণ।

তাদের মধ্য থেকে এক জন এল এগিয়ে। বললে, 'আমি অদ্বৈত আচার্য। আর

চেয়ে দেখ, ইনি মহাপ্রভু, ইনি নিত্যানন্দ, ইনি শ্রীবাস—'

প্রিয়তন্ময়তায় বিহ্বল হয়ে রইল বিজয়।

'তোমার ব্রাহ্মসমাজের কাজ শেষ হয়েছে।' বললে অদ্বৈত আচার্য: 'এবার মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হও। স্নান করে এসো চট করে। মহাপ্রভু দীক্ষা দেবেন তোমাকে। নাম দেবেন।'

কুয়োর ধারে চলে এল বিজয়। নিশীথ রাত্রে স্নান করলে। মহাপ্রভু তাকে দীক্ষা দিয়ে সদলবলে অন্তর্হিত হলেন।

পরদিন সকালে কুয়োতলায় ভিজে কাপড় দেখে যোগমায়া তো অবাক। স্বামীর দিকে জিজ্ঞাসু চোখ তুলতেই বললে সব বিজয়। শুধু স্ত্রীকেই নয়, কেশব সেনকেও বললে চুপিচুপি।

কেশব বললে, 'কাউকে বোলো না আর এ-কথা। কেউ বিশ্বাস করবে না। তোমাকে পাগল বলবে।'

নিজেরই পাগল বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে স্বপ্নজাল। ব্রাহ্মধর্মে তার ভক্তি অচলা কি না তাই পরীক্ষা করবার ভৌতিক ষড়যন্ত্র। কতকগুলি প্রেতলোকবাসী আত্মা এসেছিল হয়তো, তাকে একটু দেখে গেল বাজিয়ে। দেখে গেল মন টলে কি না। খাঁটি কি না সে তার ব্রহ্মৈক্যবাদে।

বিজয় আছে বজ্রবন্ধনে। তার ব্রাহ্মী স্থিতি নিশ্চল স্থিতি। সে টলবার পাত্র নয়। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে কাশীতে এসেছে বিজয়। এসে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সঙ্গে দেখা। শুধু দেখা নয়, সাহচর্য। সঙ্গে-সঙ্গে থাকে আর দেখে তার কাণ্ড-কারখানা। নৈকট্যের তাপ নেয়। নেয় যোগামৃতরসের স্বাদ।

তখনো স্বামীজী অজগরবৃত্তি নেননি, কিন্তু মৌনাবলম্বন করে রয়েছেন। সারা দিন ধরে ঘুরছে-ফিরছে দুজনে, খাওয়া নেই। এক সময় হঠাৎ ইশারায় জিগগেস করলেন স্বামীজী, কিছু খাবে? বিজয় হ্যাঁ করল। অমনি স্বামীজী ইশারা করলেন আরেক জনকে, বিজয়ের জন্যে কিছু খাবার নিয়ে এস। খাবার এসে গেল তক্ষুনি, কিন্তু পাঁচ-সাতজনের খাবার। বিজয় বললে, এত আমি খেতে পারব না। আপনি কিছু খাবেন?

খাব। স্বামীজী হাঁ করলেন। ইশারায় বললেন, মুখের মধ্যে ফেলে দাও।

আস্তে-আস্তে সমস্ত খাবারই নিঃশেষ হবার যোগাড়। শ্বাস আর রুদ্ধ হয় না কিছুতেই।

বিজয় দেখলে, সমূহ বিপদ। তার ভাগ্যে আর থাকে না বুঝি এক মুঠ। তাড়াতাড়ি সে তার ভাগটা সরিয়ে রাখল চালাকি করে। ঠিক চোখে পড়েছে স্বামীজীর।

স্বামীজী হাসলেন, লিখে দিলেন মাটিতে—বাচ্চা সাঁচ্চা হ্যায়।

এক দিন এক কালীমন্দিরে নিয়ে গেলেন বিজয়কে। প্রস্রাব করে কালীর গায়ে ছিটিয়ে দিতে লাগলেন। বিজয় তো হতভম্ব। জিগগেস করলে, এ কি?

মাটিতে লিখে দিলেন ত্রৈলঙ্গ স্বামী: 'গঙ্গোদকং।'

'কিন্তু গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেবার মানে?'

'পূজা—পূজা করছি।'

'এ পূজার দক্ষিণা কি?'

'দক্ষিণা? দক্ষিণা যমালয়।'

অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে যমালয়।

মন্দিরের পুরোত-পূজারীদের কাছে ব্যাপারটা প্রকাশ করে দিল বিজয়। তারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। বললে, 'তা তো ঠিকই। এঁর প্রস্রাব তো গঙ্গোদকই। ইনি যে সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ।'

এক দিন ত্রৈলঙ্গ স্বামী মৌনভঙ্গ করলেন। দশাশ্বমেধ ঘাটে এসে বললেন, 'আস্নান করো।'

নিজের হাতে ধরে স্নান করালেন বিজয়কে। বললেন, 'তোকে দীক্ষা দেব।'

বিজয় পরিহাস করে উঠল: 'আর রাজ্যে লোক নেই, আপনার কাছ থেকে দীক্ষা! আপনার গঙ্গোদকের যে নমুনা তাতে ভক্তি উড়ে গেছে।' পরে গম্ভীর হয়ে বললে, 'আমি ব্রহ্মজ্ঞানী। গুরুবাদ মানি না। মাপ করুন, পারব না দীক্ষা নিতে।'

'বাচ্চা সাঁচ্চা হ্যায়'—এবার মুখর হয়ে ঘোষণা করলেন স্বামীজী। পরে বললেন, 'শোন্, তোর গুরু আমি নই—সে আসবে ঠিক সময়ে। আমি শুধু তোর শরীর শুদ্ধ করে দেব। আমার উপরে তাই ভগবানের আদেশ।'

কানে মন্ত্র দিল বিজয়ের। বিজয় ভাবল একাকিনী গঙ্গা দিয়ে বুঝি হবে না। গঙ্গাকে এসে মিশতে হবে যমুনার সঙ্গে। জ্ঞানকে এসে মিলতে হবে ভক্তির নির্মল মুক্তিতে। জ্ঞান আত্মানন্দ, ভক্তি বিশ্বানন্দ। ভগবৎ-তত্ত্বের প্রকাশকারিণী শক্তির নামই ভক্তি। ভক্তই ভগবৎ-অস্তিত্বের প্রমাণ। ভক্তিই বিশ্বাত্মতা।

দেহ-গেহে ভক্তিই প্রীতি-প্রদীপ। ভক্তি ছাড়া সবই অন্ধকার।

লাহোরে এসেছে বিজয়, প্রচারের কাজে। হঠাৎ খবর পেল, তার মা, স্বর্ণময়ী পাগল হয়ে গেছেন। পাগল হয়ে কোন দিকে যে চলে গেছেন কেউ জানে না। তক্ষুনি বাড়ি ফিরল বিজয়। কিন্তু কোথায় মা! কে একজন কাঠুরে বললে, 'বাঘের গায়ে শিয়র দিয়ে ঘুমোচ্ছেন।'

বনগাঁয়ের কাছাকাছি দুর্ভেদ্য বন। মা'র খোঁজে সেইখানেই ঢুকল বিজয়। এমন স্থান নেই যা বিজয়ের কাছে অজেয়।

ঠিকই বলেছে কাঠুরে। বাঘের গায়ে মাথা রেখে মা ঘুমোচ্ছেন। মা'র বসন নেই, বাঘের নেই হিংসে। মা'র চোখ বোজা, কিন্তু বাঘ চেয়ে আছে মা'র দিকে। বশ্যতার তৃপ্তিতে।

লোকজন জড়ো করল বিজয়। বাঘকে তাড়িয়ে মাকে সরিয়ে আনতে হয়! কিন্তু কে এগোয়—কী নিয়ে এগোয়!

গোলমালে তন্দ্রা ভেঙে গেছে স্বর্ণময়ীর।

বাঘকে জিগগেস করছেন, 'বাঘ, তুই কার?'

দুই চোখে ভয়ঙ্কর স্থৈর্য নিয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে বাঘ।

'বল্ সত্যি করে, তুই আমার? আমার যদি হোস, আমাকে তবে তোর পিঠে কর দিকিনি?'

নিশ্চল হয়ে বসে রইল বাঘ। একটা শুধু হাই তুলল।

'বুঝেছি, তুই আমার নোস। কি করেই বা আমার হবি? আমি যে উলঙ্গ কালী। আমি তো দশভূজা নই। দশভূজা দুর্গা যদি হতাম, তুই তবে আমায় পিঠে চড়াতিস।'

বাঘ তেমনি প্রশান্তদৃষ্টি।

'দাঁড়া, তোর জন্যে কিছু খাবার নিয়ে আসি।' বলেই স্বর্ণময়ী বেরুলেন বন থেকে। ছুটলেন নক্ষত্রগতিতে। চক্ষের পলকে বিজয় তাঁর পায়ে পড়ল।

'কে তুই?' থমকে দাঁড়ালেন স্বর্ণময়ী।

'আমি আপনার দাস।'

'দাস হওয়া কি মুখের কথা? কিন্তু দেখি তোর মুখখানি! কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।'

'আপনি চিনবেন না? বিশ্বভুবনের সমস্ত আপনি চেনেন, আর আমাকে চিনবেন না?'

'কে কাকে চেনে? কিন্তু তোকে কোথায় এর আগে দেখেছি বল তো? দেখেছি তো, আবার দেখিনি কেন? কোথায় ছিলি? সেখান থেকে আবার এলি কি করে এখানে?'

মাকে স্নান করাল বিজয়। পরিয়ে দিল নতুন কাপড়। বাড়িতে এনে তুলসীতলায় আসন পাতলে। সে-আসনে মাকে বসিয়ে বললে, 'মা, আহ্নিক করো।'

'আহ্নিক কাকে বলে?' স্বর্ণময়ী যেন আকাশ থেকে পড়লেন!

'সে কি কথা? আহ্নিক তোমার মনে নেই? আমি বলে দেব,'

মৃদু-মৃদু হাসলেন স্বর্ণময়ী। 'বল্ তো—শুনি।'

কোন বাল্যকালে মন্ত্র দিয়েছিলেন মা, তাই মা'র কানে উচ্চারণ করলে বিজয়। শোনামাত্রই স্বর্ণময়ীর চোখ অশ্রুতে আচ্ছন্ন হয়ে এল। ভক্তির অশ্রু, আনন্দের অশ্রু! বিজয় এখনো তা হলে ভোলেনি। মুক্তির পথে বেরুলেও এখনো তার মাকে মনে আছে! আর, ভক্তিই তো মুক্তির মা।

চিদ্‌বিলাসের সূচনাই ভক্তি সমাপ্তিই প্রেম। সেই ভক্তির আভাস কি এখনো জাগবে না বিজয়ে?

প্রতিমায় কি শুধু শিলা? মন্ত্রে কি শুধু অক্ষরযোজনা? শুদ্ধ চেতনার চেয়ে আবেগানুরাগ কি বড় নয়? শুষ্ক একটা বিদ্যমানতার বোধে বুক ভরে কই? সেই বোধের বস্তুতে নিয়তচিত্ত থাকবার জন্যে চাই আতীব্র অনুরাগ। সুখকর অনুসরণ। সেই ঈশ্বরপ্রীতি-প্রার্থনাই ভক্তি। ভক্তিই জাগতিক ক্ষুধানাশক।

না, বিজয় আছে নির্বিশেষ জ্ঞানের স্বরাজ্যে। ঈশ্বরের অগাধবোধে।

তাই তার অসহ্য মনে হল যখন শুনল কেশব সেনকে ব্রাহ্মরা কেউ কেউ অবতার বলে খাড়া করতে চাইছে। ঈশ্বরজ্ঞানে কেশবের পায়ের ধুলো নিচ্ছে; শুধু তাই নয়—জল দিয়ে পা ধুয়ে দিচ্ছে নিজের হাতে। এ কী পৌত্তলিক তামসিকতা! খেপে গেল বিজয়। সরাসরি গিয়ে পাকড়াও করল কেশবকে।

'এ সব কি হচ্ছে? তুমি আর-সবাইর পুজো নিচ্ছ?'

'তার আমি কি জানি!' কেশব পাশ কাটাতে চাইল কথাটার। বললে, 'লোকে কি করে না করে তাতে আমার কি যায়-আসে! অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার আমার অধিকার কোথায়?'

উত্তর মোটেই মনঃপুত হল না বিজয়ের। লোকে তোমাকে নিয়ে যদৃচ্ছা নাচবে, আর তুমি বলবে কি না স্বাধীনতা! বিজয় লেখনীতে কশাঘাত শুরু করলে। সংবাদপত্রের কালো কালি লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। কেশবের দলের লোকেরা বিজয়কে নাস্তিক বলে গাল দিলে। কেউ-কেউ বা মারের ভয় দেখালে। বিজয়ের দল নেই। কোনো বন্ধনে সে বন্দীভূত নয়।

হতশ্রী কোলাহল শুরু হয়ে গেল চার দিকে। কেশবের নিজেরই কেমন খারাপ লাগতে লাগল। আতিশয্যের মাঝে আর দেখতে পেল না ঐশ্বর্য। সর্বত্র অভ্যাসের শুষ্কতা।

কে এক ভক্ত পায়ে ধরে কাঁদছে।

'এখানে কি?' ধমকে উঠল কেশব। 'আমার কাছে কাঁদলে কি হবে? ঈশ্বরের

BanglaInternet

কাছে গিয়ে কাঁদুন।'

'আপনিই তো সেই ঈশ্বরের অবতার।'

'মিথ্যে কথা। আমি এক জন সামান্য মানুষ।'

সামান্য মানুষ? ভক্তের দল চটে গেল। কেশবকে গাল পাড়তে শুরু করলে। বললে, ভণ্ড, মিথ্যেবাদী।

বিজয়ের সঙ্গে হাত মেলাল কেশব। আমরা কেউ কারু নিজের জয় চাই না। শুধু ঈশ্বরের জয় হোক। জয় হোক ব্রাহ্মধর্মের।

কিন্তু সে বারের ঝগড়া বুঝি আর মেটে না।

কেশবের আন্দোলনে ব্রাহ্মবিবাহ আইন পাশ হয়েছে। সে আইনে অন্যূন বয়স ধার্য হয়েছে, ছেলের পক্ষে আঠারো আর মেয়ের পক্ষে চৌদ্দ। বেদী থেকে ঘোষণা করল কেশব, এ বিধি কেবল রাজবিধি নয়, এ ঈশ্বরের বিধি।

কিন্তু ঘটল বিধি-বিড়ম্বনা। কুচবিহারের রাজার সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছে কেশব। কিন্তু মেয়ের বয়স চৌদ্দ হয়নি এখনো। তাতে কি! রাজার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবে। আইন লঙ্ঘন হয় হোক, কেশব মানবে না সে আইন। আবার ঘোষণা করল কেশব, এ বিয়ের ঈশ্বরের আদেশ। ঈশ্বরের আদেশের কাছে আবার আইন কি!

এ হচ্ছে সংকীর্ণ সুবিধাবাদীর ব্যবস্থা। বিজয় খেপে গেল। ফুলের চেয়ে সে মৃদু হোক, সে আবার বজ্রের চেয়েও কঠোর। ক্ষমায় সে পৃথিবীর সমান হোক কিন্তু তেজে সে কালানল।

তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল। শুধু লেখনীতে নয়, বক্তৃতায়। অন্যায় ও অসত্যের প্রতিবাদ না করা পাপ। আর নিজের যা স্খলন বা বিচ্যুতি তা ঈশ্বরের উপর আরোপ করা ঘোরতর দুষ্কৃতি।

তুমুল লড়াই শুরু হল। এ যদি মারে ঢিল ও ছোড়ে কাদা। শেষ পর্যন্ত বিজয়ের স্ত্রী যোগমায়াকে ভয় দেখিয়ে চিঠি। বিজয়কে ক্ষান্ত করুন, নইলে বিপদ অনিবার্য।

চিঠি পড়ে হাসল বিজয়। বললে, 'কেশব কি আমার সৃষ্টিকর্তা না পালনকর্তা যে ও আমাকে বিপদে ফেলবে? আসুক বিপদ, তবু সত্যের অপমান আমি সইতে পারব না।'

মেয়ের বিয়ে শেষ পর্যন্ত হিন্দুমতেই দিতে হল কেশবকে। আহত ভুজঙ্গের মত সে ফুঁসতে লাগল। 'নববিধান' নাম দিয়ে সে নতুন ব্রাহ্মসমাজ চালু করলে। বিজয়ের দলে শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু আর দুর্গামোহন

দাশ। তারা স্থাপন করলে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'।

অসাধারণ ঝগড়া। আকাশ রইল আকাশের মনে, ঘট নিয়ে মারামারি।

কিন্তু কেশব যখন একবার রামকৃষ্ণের দেখা পেল তখন আর আবার ঝগড়া কি! কিসের বিবাদ-বচসা, কিসের মতভেদ! মনের মালিন্য মুছে গেল এক মুহূর্তে, বইতে লাগল প্রসন্নতার মুক্ত বায়ু। চোখের সামনে জ্বলছে মূর্তিমান ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নি। এ আগুনের কাছে আবার শত্রু-মিত্র কি, মান-অপমান কি, নিন্দা-স্তুতি কি! শুধু নির্গলিত আনন্দ। অমৃতায়িত নির্মলতা।

এ আর কেউ নয়—জাজ্বল্যদর্শন রামকৃষ্ণ। সর্বকামদ কল্পতরু। অহেতুক দয়ানিধি। এর খবর কি কেউ না দিয়ে থাকতে পারে? বিজয় গুরুর সন্ধানে বনে বনে ঘুরছে। সে একবার দেখে যাক রামকৃষ্ণকে।

তাই কেশব লিখে পাঠাল: বন্ধু, একবারটি দেখবে এস। এমনটি তুমি আর দেখনি। বিজয় ছুটে এল খবর পেয়ে। এসে কী দেখল?

কি দেখল কে জানে! রামকৃষ্ণের দুই পা বুকের মধ্যে চেপে ধরল। স্পর্শাতীতের জগতের স্পর্শমণিকে খুঁজে পেয়েছে।

দেখল, সমস্ত জিজ্ঞাসার উত্তর বসে আছে। সমস্ত প্রশ্নের সমাধান। সমস্ত তর্কের নিষ্পত্তি। সমস্ত জটিলতার মীমাংসা। সমস্ত যাত্রার উত্তরণ।

নরপূজার বিরুদ্ধে এক দিন প্রতিবাদ করেছিল বিজয়। কিন্তু, এখন এ সব কী হচ্ছে?

নর কোথায়? এ যে নরাকারে নিরাকার!

পরমেশ্বর ইচ্ছাবশে মায়াময় রূপ ধরে অবতীর্ণ হয়েছেন সংসারে।

অতীন্দ্রিয় রাজ্যের সম্রাট হয়েও আছেন হৃদয়েশ্বর হয়ে। খেলার সাথী হয়ে, বিশ্রম্ভের সখা হয়ে। স্নেহে মাতা পালনে পিতা হয়ে। দশদিগন্তব্যাপী প্রেমের মহাসমুদ্র হয়ে।

বিজয়ের কণ্ঠে শুধু সেই শ্রবণলোভন আকূতি, 'হে শ্রীহরি—'

॥ ৬১ ॥

শুধু বিজয়কে নয়, আরো অনেককেই কেশব ডেকে নিয়ে গেল একে-একে। কেশব শুধু নিমিত্ত। যিনি অন্তরে বসে ডাক দেবার তিনিই ডাক দিলেন। এগারো নম্বর মধু রায় লেনে থাকে রামচন্দ্র দত্ত—সে গেল সকলের আগে। ক্যাম্বেল মেডিকেল ইস্কুল থেকে ডাক্তারি পাশ করে বেরিয়েছে—ঘোরতর নাস্তিক। নাস্তিক হলেও রামকৃষ্ণের প্রতি অশ্রদ্ধাবান নয়। যখন কেশব বললে,

যীশুখৃষ্টের মত রামকৃষ্ণেরও 'ট্রান্স' হয়, তখন রাম দত্ত ভাবল, মিরগি রোগ নিশ্চয়ই।

'না হে, হাত-পা খেঁচাখেঁচি করে না। ধীর-স্থির শান্ত হয়ে থাকে। আপনা-আপনি ভালো হয়। ডাক্তার লাগে না কখনো।'

কি জানি বা! এমনতরো কই পড়িনি বইয়ে।

প্রগতিবাদী ছেলে-ছোকরারা ব্যঙ্গ করে পরমহংসকে। বলে, গ্রেট গুরু।

পানিহাটিতে বৈষ্ণবদের উৎসব হচ্ছে। যাকে বলে হরিনামের হাটবাজার। ভক্তদের নিয়ে ঠাকুর যাচ্ছেন সে উৎসবে। ভক্তদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ দুইই আছে। চার-চারটে পানসি ভাড়া করা হয়েছে।

শ্রীমা যাবেন কি না—একজন স্ত্রী-ভক্ত এসে জিগগেস করলে ঠাকুরকে।

'তোমরা তো সবাই যাচ্ছ—', বললেন ঠাকুর, 'ওর যদি ইচ্ছা হয় তো চলুক—' ইচ্ছা হয় তো চলুক –নিশ্চয়ই মন খুলে মত দিচ্ছেন না। প্রচ্ছন্ন সুরটি ঠিক ধরতে পেরেছেন শ্রীমা। যদি মন খুলে সম্মতি দিতেন, তা হলে প্রফুল্ল স্বরে বলে উঠতেন, হ্যাঁ, যাবে বৈ কি। তার বদলে, ইচ্ছা হয় তো চলুক। একটু যেন কুণ্ঠার কুয়াশা আছে কোথাও।

শ্রীমা গেলেন না। বললেন, 'অত ভিড়ে আমি যাব না। তোমরা যাও।'

উৎসবশেষে ঠাকুর ফিরেছেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর বলছেন, 'সাধে কি আর ও যায়নি? ও মহাবুদ্ধিমতী। ওর নাম সারদা।'

স্ত্রী-ভক্তরা ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে রইল উৎসুক হয়ে।

'ওখানে আমার ভাবসমাধি হচ্ছিল, তাই দেখে কেউ-কেউ রঙ্গ করছিল আমাকে নিয়ে।' ঠাকুর বললেন ক্ষমাময় স্নিগ্ধ হাস্যে: 'ওকে সঙ্গে দেখলে নিশ্চয়ই বলত ঠাট্টা করে—হংস-হংসী এসেছে!'

তুমি যদি মানসসরোবর, আমরা মানসযাত্রী হংস। আমাদের সমস্ত প্রাণ তোমার দিকে উড়ে চলুক পাখা মেলে। দৈনিক জীবনযাত্রার মধ্যে আমাদের সমাপ্তি নেই, আমরা তাই যাত্রা করেছি তোমার দিকে। পরিপূর্ণের দিকে। অপর্যাপ্তের দিকে।

কলকাতা মেডিকেল কলেজের সহকারী রসায়ন-পরীক্ষক হয়েছে রাম দত্ত। কুরচি গাছের ছাল থেকে রক্তামাশায়ের ওষুধ বের করেছে। বিজ্ঞানের আওতায় এসে নাস্তিকতার নেশায় পেয়েছে। ঈশ্বর আছেন তার প্রমাণ কি? তাঁকে কি দেখা যায়?

ব্রাহ্মসমাজে ঘোরে রাম দত্ত। তারা তো ঈশ্বরকে নিরাকার বলেই কাজ

সেরেছে। দেখবার আর দায় রাখেনি।

পর-পর এক মেয়ে আর দুই ভাগ্নী মারা গেল কলেরায়। বিজ্ঞানে কুলোল না। ডাক্তারি ডাক্তারকে উপহাস করলে। অস্থির হয়ে পড়ল রাম দত্ত। দগ্ধ মনে শান্তির ওষুধ দেবে এখন কোন ডাক্তার?

হঠাৎ এক দিন দক্ষিণেশ্বরের দিকে রওনা হল। সঙ্গে দুই মিত্তির—মনোমোহন আর গোপালচন্দ্র। দেখি রামকৃষ্ণ কি বলে!

গিয়ে দেখে, দরজা বন্ধ। ভিতরে নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু কি বলে তাকে ডাকে। দ্বিধা করতে লাগল রাম দত্ত। রামকৃষ্ণ মনের কথা টের পেয়েছে। অমনি খুলে দিল দরজা। 'নারায়ণ' বলে নমস্কার করলে।

আমাদের মনের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে নারায়ণ। জেনে-শুনেও খুলি না দরজা। অর্গল এঁটে মনের অন্ধকারে বসে কাঁদি।

'বোসো।'

বসল তিন জন। রাম দত্তের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল রামকৃষ্ণ। বললে, 'হ্যাঁ গা, তুমি না কি ডাক্তার। আমার হাতটা একবার দেখ না।'

রাম দত্ত তো অবাক। কি করে জানলে?

এক মুহূর্তে ফুটে উঠল অন্তরঙ্গতার আবহাওয়া। একে যেন সব কিছু বলা যায়, এ একেবারে ঘরের মানুষ। জিগগেস করল রামচন্দ্র: 'ঈশ্বর কি আছেন?'

'দিনের বেলায় তো একটি তারাও দেখা যায় না। তাই বলে কি বলবে তারা নেই?' বললে রামকৃষ্ণ। 'দুধে মাখন আছে কিন্তু দুধ দেখলে কি তা ঠাহর হয়? যদি মাখন দেখতে চাও, দুধকে আগে দধি করো। তার পর সূর্যোদয়ের আগে মন্থন করো সে দধিকে। তখন দেখতে পাবে মাখন।'

'কিন্তু কি করে তাঁকে দেখা যায়?'

'বড় পুষ্করিণীতে মাছ ধরতে চাইলে কি করো? আগে খোঁজ নাও। যারা সে পুকুরে মাছ ধরেছে তাদের থেকে খোঁজ নাও। কি মাছ আছে, কি টোপ খায়, কি চার লাগে। শেষে সেই পরামর্শানুসারে কাজ করো। ধরো সেই মনোনীত মাছ।' একটু থামল রামকৃষ্ণ। বললে, 'কিন্তু ছিপ ফেলামাত্রই কি মাছ ধরা পড়ে? স্থির হয়ে অপেক্ষা করতে হয়। তবেই আস্তে আস্তে "ঘাই" আর "ফুট" দেখা যায়। তখন বিশ্বাস হয়, পুকুরে মাছ আছে—আর বসে থাকতে-থাকতে আমিও একদিন ধরে ফেলব।'

ঈশ্বর সম্বন্ধেও তাই। গুরুর কাছে তত্ত্ব করো। ভক্তি-চার ফেল। মনকে ছিপ করো। প্রাণকে কাঁটা। নামকে টোপ। তার পরে টোপ ফেল সরোবরে।

ঈশ্বরের ভাব-রূপ 'ফুট' আর 'ঘাই' জানান দেবে। বসে থাকো তন্নিষ্ঠ হয়ে। টোপ গিলবে মাছ। খেলিয়ে-খেলিয়ে ডাঙায়, মানে সংসারে তুলে নিয়ে আসবে। সাক্ষাৎকার হবে।

তার পর ?

তার পর আর কি। সেই মাছ তখন ঝালে খাও ঝোলে খাও ভাজায় খাও অম্বলে খাও।

শান্তি পেল রাম দত্ত। শোকে অস্থির হয়ে কাজকর্ম ছেড়ে দিয়েছিল, আবার ধীর-স্থির হয়ে কাজ করতে লাগল। ঈশ্বর যদি আছেন তবে সুরাহা এক দিন একটা হবেই। সমস্ত কাটাকুটি ও যোগ-বিয়োগের পর হিসেব এক দিন মিলবেই। মন খাঁটি করে রইল।

কুলগুরুর কাছে দীক্ষা না নিয়ে রামকৃষ্ণের থেকে দীক্ষা নিল রাম দত্ত। রাম দত্ত বৈষ্ণব, দীক্ষাদাতা শাক্ত। পাড়ায় চি চি পড়ে গেল। 'রাম ডাক্তারের গুরু জুটেছে হে। ঐ যে দক্ষিণেশ্বরে থাকে—কৈবর্তদের পূজুরী। কেলেঙ্কারি করলে মাইরি—'

সবাই চটল। চটল কিন্তু পিছিয়ে গেল। পিছন থেকে চিপটেন কাটতে লাগল। এগিয়ে এল পাড়ার সুরেশ মিত্তির, আসল নাম সুরেন মিত্তির। দুর্ধর্ষ শাক্ত। কেশব সেন যখন বিডন স্কোয়ারে ব্রাহ্মধর্মের বক্তৃতা দেয়, তখন তার খোলের চামড়া কেটে দিয়েছিল ছুরি দিয়ে।

'ওহে রাম, তোমার গুরুর কাছে একবার নিয়ে চল।' বললে সুরেশ। 'কেমন হংস একবার দেখে আসি।'

রাম দত্ত হাসল। বললে, 'চল।'

'কিন্তু এক কথা। তোমার হংস যদি মনে শান্তি দিতে না পারে তবে তার কান মলে দিয়ে আসব।'

সে যুগে 'কান মলে দেব' কথাটার বড় বেশি চল। অন্যের কানটা যেন হাতের কাছেই আছে এমনি একটি আত্মদৃপ্ত উদ্ধত ভাব সকলের।

সিমলে স্ট্রীটে থাকে। সদাগরি অফিসের মুৎসুদ্দি। বুদ্ধিতে পাটোয়ার। আর মদে টুপতুজঙ্গ। গেল রাম দত্তের সঙ্গে। দেখল ভক্ত-পরিবৃত হয়ে ভাবে বিভোর হয়ে বসে আছে রামকৃষ্ণ। রাম দত্ত প্রণাম করল। এক পাশে সুরেশ বসল নির্লিপ্ত হয়ে। ভাবখানা এই, কান মলে যে দিইনি এই যথেষ্ট।

বাঁদরের বাচ্চা না বেড়ালের বাচ্চা—এই গল্পটাই তখন বলছিল রামকৃষ্ণ।

'বাঁদরের বাচ্চা জোর করে মা'র কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, মা ব্যাজার হয়ে ফেলে

দেয়, পড়ে গিয়ে কিচমিচ করে। কিন্তু মা-অন্ত প্রাণ বেড়ালছানা মা-ও মা-ও, কি না মা-মা বলে ডাকে। মা যেখানে রাখে সেখানেই সুখে থাকে। ছাইয়ের গাদায়ই হোক বা গদিবিছানায়ই হোক। একেই বলে নির্ভরের ভাব—'

অমৃতময় কথা। সুরেশের সমস্ত জিজ্ঞাসার নিরসন হয়ে গেল। ভক্তিভরে প্রণাম করল রামকৃষ্ণকে।

রামকৃষ্ণ বললে, 'কালী ভজনা কর যখন, মা'র উপর নির্ভর রাখ ষোলো আনা। তবে মাঝে-মাঝে এসো এখানকে, ভগবৎ-ভাবের উদ্দীপনা হবে।'

'ভাই, কান মলতে গিয়েছিলাম, কান মলা খেয়ে এলাম।' রাম দত্তর কানে কানে বললে সুরেশ।

নরেন্দ্রনাথেরও সেই কথা।

নরেন্দ্রনাথ আরো দুর্ধর্ষ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে উপাসনায় ধ্রুপদ গায়। হার্বার্ট স্পেনসার, স্টুয়ার্টমিল পড়ে। গলার জোরে গায়ের জোরে তর্ক করে। পাদরিদেরও ছাড়ে না। তেড়েফুঁড়ে কথা কয়। কথার দাপটে ভূত ভাগায়।

তাকে এক দিন ধরলে রাম দত্ত। 'বিলে, শোন—'

নরেন দাঁড়াল।

'দক্ষিণেশ্বরে এক পরমহংস আছেন দেখতে যাবি?'

'সেটা তো মুখখু—', এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিল নরেন। বললে, 'কী তাঁর আছে যে শুনতে যাব? মিল স্পেনসার লকি-হ্যামিলটন এত পড়লুম, কোনো কিনারা হল না। ঐ একটা কৈবর্তের বামুন, কালীর পূজুরী—ও কি জানে?'

'একবার গিয়ে কথা বলেই দেখ না—'

কি ভাবল নরেন। বললে, 'বেশ, যদি রসগোল্লা খাওয়াতে পারে তো ভালো, নইলে কান মলে দেব বলছি।'

স্যার কৈলাস বসুও চেয়েছিলেন ঠাকুরের কান মলতে।

রাম দত্তকে বললেন, 'তুমি বলছ, তাই যাচ্ছি একবার তোমার পরমহংসকে দেখতে। যদি ভালো লোক হয় তো ভালো, নইলে তার কান মলে দেব বলে রাখছি।'

ঠাকুর তখন কাশীপুরের বাগানে, অসুস্থ। উপরে আছেন। নিচে বসে অপেক্ষা করছে কৈলাস। নিচের ঘরের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছে এই ভাবে: 'আরে, গিয়ে দেখলুম নরেনটা বি-এ পাশ করে একেবারে বকে গেছে। নিচেকার হল ঘরের কতগুলো ছোঁড়া নিয়ে এলোমেলো ভাবে বসে আছে আর রামের বাড়ির সেই চাকর ছোঁড়া লাটু—সেটাও বসে আছে ওদের সঙ্গে। আরে ছ্যা!'

উপর থেকে কে এক জন চলে এল নিচে। বললে, 'ঠাকুর পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, যে বাবুটি আমার কান মলে দেবেন বলেছেন তাঁকে ওপরে নিয়ে এস। তাই নিতে এসেছি। তিনি কে, কোনটি?'

কৈলাস তো স্তম্ভিত! সিমলেতে ঘরের মধ্যে বসে রামের সঙ্গে কি কথা কয়েছি কাশীপুরের বাগানে সে-কথা এল কি করে এখুনি? স্খলিত পায়ে উঠে গেল কৈলাস। অচ্যুত-পায়ে প্রণাম করলে। মানলে গুরু বলে, দিগদর্শক বলে। কিন্তু গিরিশ ঘোষ আরেক কাঠি সরেস। তার থিয়েটারে গিয়েছেন ঠাকুর, মাতাল হয়ে তাঁকে বাপান্ত গালাগাল করলে গিরিশ। নেপথ্যে নয়, মুখের উপর। দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এসে তাই বলছেন ঠাকুর: 'শুনেছ গা! গিরিশ ঘোষ দেড়খানা লুচি খাইয়ে আমায় যা না তাই বলে গালাগাল দিয়েছে।'

'ওটা পাষণ্ড। ওর কাছে আপনি যান কেন?'

যাই কেন! যাই বলে এই ব্যবহার! রাম দত্তের কাছে নালিশ করলেন ঠাকুর। কেন, বেশ তো করেছে। ঠিকই করেছে। গিরিশকে সমর্থন করল রাম দত্ত।

'শোন, শোন, রাম কি বলে শোন। সে আমার মাতৃপিতৃ উচ্চারণ করল, আর রাম বলে কি না—'

'ঠিকই বলি। কালীয়কে শ্রীকৃষ্ণ তাড়া করলেন, কি জন্যে তুমি বিষ উদ্গীরণ কর? কালীয় কী বললে? বললে, ঠাকুর, তুমি আমাকে বিষ দিয়েছ, সুধা উদ্গীরণ করব কি করে? গিরিশ ঘোষকে আপনি যা দিয়েছেন তাই দিয়ে সে আপনার পূজা করছে।'

হাসলেন ঠাকুর। বললেন, 'যাই হোক, আর কি তার বাড়িতে যাওয়া ভালো হবে?'

'কখনোই না।' অনেকে বলে উঠল একসঙ্গে।

'রাম, গাড়ি আনতে বলো।' উঠে পড়লেন ঠাকুর। 'চলো তার বাড়ি যাই।' সকলে তো লুপ্তবাক।

তুমিও চলো, রাম। তুইও চল, নরেন। পতিতপাবন চললেন জীরোদ্ধারে।

॥ ৬২ ॥

হে ঈশ্বর, তুমি তো জানো আমরা কত দুর্বল, কত অক্ষম, কত ক্ষণভঙ্গুর। মুখোমুখি তোমার সামনে গিয়ে যে দাঁড়াতে পারি এমন আমাদের সাধ্য নেই। কি করে সইব তোমার সেই আলো, কি করে বইব তোমার সেই ভালোবাসা! আমরা ক্ষুদ্র, আমরা ক্ষীণ, আমরা অল্পপ্রাণ। তা জানো বলেই তো আমাদের

জন্যে তোমার এত কৃপা, এত অনুকম্পা। তাই তো তোমার ও আমাদের মাঝখানে তুমি অন্তরাল রচনা করেছ। তোমার চিরন্তন উপস্থিতির উলঙ্গ উজ্জ্বলতা সইতে পারব না বলেই এই অন্তরাল। এই অন্তরালটিই তোমার মায়া। এই অন্তরালের নামই সংসার।

ছোট-ছোট বেড়া তুলে দিয়েছ আমাদের চার পাশে। ধনের বেড়া মানের বেড়া অহঙ্কারের বেড়া। তুচ্ছ আশা-আকাঙ্ক্ষার শুকনো খড়কুটো দিয়ে চাল ছেয়ে দিয়েছ মাথার উপরে। আশে-পাশে ছোট-ছোট সুখ-দুঃখের ঘুলঘুলি বসিয়েছ। মৃত্তিকার মেঝেটি শীতল করে লেপে দিয়েছ স্নেহ-প্রেমের সিঞ্চনে। এমনি করে অপরিসর ঘরের মধ্যে আমাদের ঢুকিয়ে দিয়ে তুমি দূরে সরে দাঁড়িয়েছ। সরে না দাঁড়িয়েই বা করবে কি! তোমার কি দোষ! আমরাই যে অশক্ত, অসমর্থ। তোমার আলোর ছটায় আমাদের দু চোখ যে ধাঁধিয়ে যাবে, তোমার ভালোবাসার ভারে ভেঙে পড়বে যে আমাদের বুক। তাই তুমি কৃপা করে তোমার ও আমাদের মাঝখানে মায়ার যবনিকা ফেলে রেখেছ। রেখেছ এই রমণীয় ব্যবধান। এই মনোহর দূরত্ব।

সংকীর্ণ পর্বতপথরেখা ধরে চলেছে রামসীতা, অনুগামী লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে। সর্বাগ্রে রাম, রামের পিছনে সীতা, সীতার পিছনে লক্ষ্মণ। এই তাদের বনাভিযানের চিরন্তন চিত্র। রাম আর লক্ষ্মণের মাঝখানে অপরিহরণীয়া সীতা। লক্ষ্মণ ভাবছে, এত দিন চলেছি একসঙ্গে, রামকে দাদা ছাড়া আর কিছু বলে দেখতে পেলাম না কোনো দিন। হনুমান তাঁকে নারায়ণ বলে সেবা করছে, বিভীষণও পূজা করছে বিষ্ণুজ্ঞানে, কিন্তু আমার কাছে তিনি শুধু আমার সেই শাদাসিধে দাদা, দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। আমি তো কই তাঁকে কেষ্টবিষ্টু বলে দেখতে পাচ্ছি না। কি করে পারবে? কি করে রামকে দেখবে তাঁর স্বভাব-মূর্তিতে? লক্ষ্মণ আর রামের মধ্যখানে যে মায়ারূপিণী সীতা দাঁড়িয়ে। মায়াই যে দেখতে দিচ্ছে না মায়াধীশকে। সীতা যতক্ষণ না সরে দাঁড়াচ্ছেন ততক্ষণ শ্রীরামদর্শন হচ্ছে না লক্ষ্মণের। ততক্ষণ রাম শুধু দশরথের ছেলে, শুদ্ধ-ব্রহ্ম-পরাৎপর রাম নয়।

তেমনি, ঈশ্বর, এই মায়াময় সংসার সৃষ্টি করে তুমি আমাদের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করেছ। তোমাকে ভুলে থাকবার খেলায় অষ্টপ্রহর মেতে আছি আমরা। কিন্তু তুমি তোমার নিজের খেলায় মেতে থেকেও আমাদের ভোলনি। যবনিকা সরিয়ে মাঝে-মাঝে উঁকিঝুঁকি মারছ। আভাসে তোমার গায়ের বাতাস আমাদের গায়ে লাগছে। আমরা চমকে-চমকে উঠছি, বুঝতে

পারছি না, ধরতে পারছি না। এমন একেকটা আনন্দ দিয়েছ, তোমাকে দেখবার জন্য ব্যগ্র হয়ে বাইরে ছুটে এসেছি। এমন একেকটা দুঃখ দিয়েছ, ঘরের নিঃসঙ্গ অন্ধকারে কেঁদেছি তোমাকে বুকে নিয়ে। তবু, কই, তোমাকে দেখতে পাচ্ছি কই! রুদ্ধদৃষ্টি বধির যবনিকা দুর্ভেদ্য বাধা মেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে চোখের সামনে। এই যবনিকা উত্তোলন করো। উন্মোচিত করো এই নিষ্ঠুর অবগুণ্ঠন। তোমাকে দেখতে দাও। দেখতে দাও তোমার সম্পূর্ণ মুখচ্ছবি। তোমার নীরবতার মুখ, গভীরতার মুখ, অতলতার মুখ। পদ্ম যেমন সূর্যকে দেখে, তেমনি করে দেখতে দাও তোমাকে। তুমি অপাবৃত হও, উদ্ঘাটিত হও, দূর করে দাও এই আচ্ছাদনের কুহেলি।

সারদা হঠাৎ মুখের ঘোমটা খুলে দাঁড়াল রামকৃষ্ণের সামনে। আর রামকৃষ্ণ কর-জোড়ে স্তব করতে লাগল।

মুখের ঘোমটা ঠিক সারদা নিজে সরায়নি, সরিয়েছে আরেক জন। সেই কথাটাই বলি।

এমনিতে সব সময় মুখের উপর ঘোমটা টানা সারদার। যখন রামকৃষ্ণের কাছে এসে দাঁড়ায়, তখন জড়পুত্তলী ছাড়া তাকে আর কি বলবে! যা-ও দু-একটা কথা কয়, তা-ও ঘোমটার ভিতর দিয়ে। কথার সঙ্গে-সঙ্গে মুখের ভাবটি কেমন হয় তা কে জানে!

রামকৃষ্ণের তখন খুব অসুখ, সারদা থাকে দূরে, শম্ভুবাবুর সেই চালাঘরে। রামকৃষ্ণের সেবার তাই অসুবিধে হচ্ছে। কাশী থেকে কে একজন মেয়ে এসেছে, সেই সেবা করছে রামকৃষ্ণের। সেই মেয়ের কি নাম, কোথায় বাড়ি, কবে এল কবে যাবে কেউ কিছু খবর রাখে না।

এক দিন রাত্রে সেই কাশীর মেয়ে চালাঘর থেকে সারদাকে ধরে নিয়ে এল। ধরে নিয়ে এল সটান রামকৃষ্ণের ঘরের মধ্যে। রামকৃষ্ণ যেখানে বসে ছিল সেইখানে তার চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সারদা। মুখে তার সেই দীর্ঘ ও দুর্ভেদ্য ঘোমটা।

কাশীর মেয়ে সহসা সবল হাতে সারদার সেই মুখের ঘোমটা খুলে ফেলল এক টানে।

রামকৃষ্ণকে দেখাল সেই মুখ।

রামকৃষ্ণ কী দেখল রামকৃষ্ণই জানে।

করজোড়ে তৎক্ষণাৎ স্তব শুরু করল। কোথায় অসুখ, কোথায় সেবা, সমস্ত রাত ভগবৎ-কথা ছাড়া আর কথা নেই। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সারদা। পটার্পিতের

boiRboi.net

মত। কখন যে রাত পুইয়ে ভোর হয়ে গেল ধীরে-ধীরে, কেউ টের পেল না। এবারে কলকাতায় এসে সোজাসুজি দক্ষিণেশ্বরে উঠল না সারদা। সঙ্গে প্রসন্নময়ী ছিল, উঠল প্রথমে তার বাসায়। পরদিন সকালে দক্ষিণেশ্বরে হাজির। সারদার মা শ্যামাসুন্দরী সেবার সঙ্গে এসেছে, সারদা তাই একটু তটস্থ। মনে আশা, মাকে কেউ একটু সমাদর করুক। মিষ্টি করে কথা বলুক দুটো।

বরং ঠিক তার উলটোটা ঘটল। হৃদয় এল তেরিয়া হয়ে। শ্যামাসুন্দরীকে লক্ষ্য করে বললে, 'এখানে কি! এখানে তোমরা কি করতে এসেছ?'

শ্যামাসুন্দরী তো হতবাক। সারদা অপ্রস্তুত। এমন কাণ্ড কে কবে দেখেছে! দরজায় পা দিতে-না-দিতেই গলাধাক্কা!

আর কাউকে কথা বলতে দিল না। নিজেই গজরাতে লাগল হৃদয়: 'তোমাদের এখানে আসবার কি দরকার! বলা নেই কওয়া নেই সটান এখানে এসে হাজির! এখানে মজাটা কিসের জানতে পাই?'

শ্যামাসুন্দরী শিওড়ের মেয়ে, হৃদয় তাই তাকে গ্রাহ্যই করলে না। উলটে অপমান করলে। সবাই ভাবলে রামকৃষ্ণ এর একটা প্রতিকার করবে। কিন্তু হাঁ-না কিছুই বললে না রামকৃষ্ণ। বলতে গেলে গালমন্দ করে হৃদয় তাকে নাস্তানাবুদ করবে। হৃদয়ের মুখ তো নয় যেন বিষের হাঁড়ি। হৃদয়কে রামকৃষ্ণের বড় ভয়।

শেষকালে শ্যামাসুন্দরী বললে, 'চল দেশে ফিরে যাই। এখানে কার কাছে মেয়ে রেখে যাব?'

অন্তরে মরে গেল সারদা। মা'র মনের ব্যথাটি গুমরাতে লাগল মনের মধ্যে। 'তাই যাও মেয়ে নিয়ে। ওরে রামলাল, পারের নৌকো এনে দে।'

রামলাল নৌকো নিয়ে এল। সেই দিনই মাকে নিয়ে ফিরে গেল সারদা। আর কোনো দিন আসব না এমন কোনো প্রতিজ্ঞা করল না রাগ করে। বরং মা-কালীকে উদ্দেশ করে মনে-মনে বললে, 'মা, আবার যদি কোনো দিন আনাও তো আসব।'

হৃদয়কে নিয়ে রামকৃষ্ণের বড় যন্ত্রণা। বড় হাঁকডাক করে, কথায়-কথায় হৈ-হুজ্জুত। এত শাসন-জুলুম ভালো লাগে না রামকৃষ্ণের। অথচ উচ্চ-বাচ্য করার যো নেই। কিছু বলতে গেলেই আবার তেড়ে আসবে। দাঁতে খড়কে দিয়ে বসে থাকে রামকৃষ্ণ।

শুধু কি তাড়না? ফোড়ন দিতেও ষোলো আনা ওস্তাদ।

কাউকে হয়তো উপদেশ দিচ্ছে রামকৃষ্ণ, অমনি হৃদয় চিপটেন ঝাড়ল : 'তোমার বুলিগুলি সব এক সময়ে বলে ফেল না! ফি বার একই বুলি বলার মানে কি?'

সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল রামকৃষ্ণের। ঝাঁজিয়ে উঠল তক্ষুনি : 'তা তোর কি রে শালা? আমার বুলি, আমি লক্ষ বার ঐ এক কথা বলব—তাতে তোর কি?'

গালাগাল তো দেয়ই, আবার থেকে-থেকে টাকা-টাকা করে। জমি-জায়গার ফিকির খোঁজে। হাটে যায় গরু কিনতে। এক দিন রামকৃষ্ণকে এসে বললে, একখানি শাল কিনে দাও দেখি।

রামকৃষ্ণ তো অবাক। আমি কোথা শাল পাব?

'না দেবে তো নালিশ করব বলে রাখছি।' হৃদয় চোখ রাঙালো।

কর্‌ না। শেষকালে শালের বদলে শূল এসে না জোটে।

শুধু চাওয়া আর চাওয়া! শুধু হৈচৈ। আশুতোষের ঘরে কেউ নয়, সবাই অসন্তোষের ঘরে। বাজ পড়লে ঘরের মোটা জিনিস তত নড়ে না, শার্সিই খটখট করে।

রামকৃষ্ণ ঠিক করল কাশীবাসী হব। আর সহ্য হয় না জ্বালাতন।

কিন্তু কাশী যে যাবে, কাপড় না-হয় নেবে, কোনো রকমে রাখবে না-হয় পরনে, কিন্তু টাকা নেবে কেমন করে? হাতে মাটি দেবার জন্যে মাটি নিতে পারে না রামকৃষ্ণ। বটুয়া করে পান আনবার যো নেই। কাশী যাবার টিকিট রাখবে কিসের মধ্যে?

আর কাশী যাওয়া হল না।

কিন্তু একটা ব্যবস্থা তো দরকার।

ব্যবস্থা আবার কি! হৃদয় না হলে দেখবে-শুনবে কে, সেবা করবে কে? বর্ষার দিনে পেট-খারাপের সময় মাছের ঝোল আর শুকতোর যোগাড় দেখবে কে? তুমি তোমার কাজ করো না। হৃদয়কে থাকতে দাও না তার মোড়লির মণ্ডলে। তুমি এত বড় জগৎ-সংসারের মোড়লি করছ, হৃদয়ের এই সেবার প্রভুত্বে কেন বাদ সাধছ? হৃদয় আর কাউকে তোমার পা ছুঁতে দেয় না, শুধু ঐ পা দুখানি নিজের নিভৃত বুকে ধরে রেখেছে বলে।

তবু জীব-নিয়তির বন্ধন তার গলায়। সে টাকা চায়, জমি চায়, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার চায়। তোমার ও তার মাঝখানে চায় সে একটি সহন-শোভন যবনিকা। জীবননাটকের বিচিত্রিত পটপৃষ্ঠা। তুমি যদি না তোলো, কার সাধ্য তা সরায়! তুমি যদি না খোলো, কার সাধ্য তা নড়ায়!

॥ ৬৩ ॥

অর্ধেক রাতে উঠে রামকৃষ্ণ কুটনো কুটতে লেগেছে। তা-ও দিগম্বর হয়ে। এমন কথা শুনেছে কেউ? হৃদয় খেপবে না তো কি!

শুধু তাই নয়, কাল সকালের চাল-ডাল মশলা সব যোগাড় করে রাখছে রামকৃষ্ণ। 'তুমি তো বেশ লোক।' খুট-খুট শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গিয়েছে হৃদয়ের। 'চোখে ঘুম নেই বুঝি? মাঝরাতে উঠে এই কাণ্ড?'

হৃদয়ের কথা রামকৃষ্ণ তো ভারি গ্রাহ্য করে! নিজের মনে কাজ করে চলেছে। 'কেন? ও সব কি সকালে হয় না?'

'তুই তার কি বুঝবি? ঘুম ভেঙে গেল, ভাবলুম বসে-বসে কি আর করি, কালকের রান্নার যোগাড় দেখি গে যাই।' সরল সহাস মুখে বললে রামকৃষ্ণ।

'কিন্তু ও তোমার কি কাজের ছিরি! ঠিক একটা লোকের মত অল্প-স্বল্প করে যোগাড় করছ। ঐটুকু তরকারিতে তোমার পেট ভরবে?' হৃদয় ঝামটা মেরে উঠল: 'আচ্ছা কিপ্পন যা হোক।'

'তা তো বলবিই। তোদের কি! খুব খানিকটা বেশি-বেশি করে অপচয় করতে পারলেই হল! আমার পেটের আটকোল যখন জানিস না তখন চুপ করে থাক—'

'রাখো, তোমার মত গুনে-গুনে একশোটা ভাতের দানা রাখতে পারব না পাতে।'

'শোন্, এই ভাতের জন্যই কুলীন বামুনের ছেলে হয়ে এখানে চাকরি করতে এসেছিস। নইলে কোথায় শিওড় আর কোথা দক্ষিণেশ্বর! যদি দেশে তোর ধামের জমি বা টাকা-পয়সা সচ্ছল থাকতো তা হলে কি আসতিস এখানে? শোন্, লক্ষ্মীছাড়া হতে নেই, মিতব্যয়ী হবি।'

একজনকে একটা দাঁতন-কাঠি আনতে বলল রামকৃষ্ণ। সোজা দু-তিনটে ডাল ভেঙে আনলে সে।

'শালা, তোকে একটা আনতে বললুম, তুই এতগুলি আনলি কেন?'

লোকটা ভেবেছিল রামকৃষ্ণ বুঝি খুশি হবে অনেকগুলি দাঁতন পেয়ে। উলটে ধমক খাবে ভাবতে পারেনি।

দু দিন পরে আবার সেই লোককেই বললে রামকৃষ্ণ: 'ওরে একটা দাঁতন দে না—'

সে আবার ছুট দিল বাগানের দিকে।

'ওরে, কোথা যাচ্ছিস?'

'আজ্ঞে গাছ থেকে ভেঙে আনতে যাচ্ছি।'

BoiRboi.net

'কেন, সেদিন যে অতগুলি আনলি—নেই ?'

'আছে।'

'তবে আবার ডাল ভাঙতে ছুটছিস যে ?' রামকৃষ্ণ শাসনের সুরে বললে, 'ও গাছ কি তুই সৃজন করেছিস যে মনে করলেই টপ করে কিছু ডাল ভেঙে আনবি ! যার সৃজন সেই জানে। বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে, বুঝে-সুজে কাজ কর্। জিনিসের অপচয় করবি কেন ?'

ঠিক-ঠিক উপদেশ মত চলতে চেষ্টা করে রামলাল। রাত্রে যত বার বিড়ি খায়, পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে ধরিয়ে নেয় লণ্ঠন থেকে। ফালতু একটিও বাক্সের কাঠি খরচ করে না।

'যত সব হাড়-কিপ্পন—', হৃদয়কে বাগানো যায় না কিছুতেই।

খিটিমিটি বেধেই আছে রামকৃষ্ণের সঙ্গে। সামান্য বচসা নয় দস্তুরমতো লম্বাই-চওড়াই ঝগড়া। রামলাল বলে, সে সব ঝগড়া দেখবার মত।

একেক সময় ভীষণ রেগে যায় রামকৃষ্ণ। হৃদয়কে যা-তা গালাগাল দিয়ে বসে। এমন সব কথা বলে যা মুখে আনা যায় না।

হৃদয় তখন চুপ করে থাকে। যখন অসহ্য হয়, বলে, 'আঃ, কি কর মামা! ও সব কথা কি বলতে আছে ? আমি যে তোমার ভাগনা।'

আমার গালাগাল দেওয়া নিয়ে কথা। কথার অর্থ দিয়ে আমার কি হবে ? আমার পূজা করা নিয়ে কথা। তোমার স্তোত্রমন্ত্র দিয়ে কী হবে ?

আমার ভালোবাসা দেওয়া নিয়ে কথা। আমি রূপ-গুণ রত্ন-বস্ত্র দিয়ে কী করব ?

একেক সময় গালাগালেও মেটে না। হাতের সামনে যা পায়, ঝাঁটা-জুতো, সপাসপ লাগিয়ে দেয় হৃদয়ের পিঠে। হৃদয় নীরবে সহ্য করে।

মনে হয় এই বুঝি দুজনে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার দুজনে ভালোবাসা, আবার ঠাট্টা-ইয়ার্কি। আবার হৃদয়ের প্রাণ-ঢালা সেবা। পর্যন্ত-হীন পরিচর্যা। তখন আবার হৃদয় হুকুম করছে রামকৃষ্ণকে। আর রামকৃষ্ণ তাই শুনছে চুপ করে। হৃদয়ের যখন প্রভুত্বের পালা তখন আবার সেই মাত্রা-জ্ঞানহীন কোলাহল। রামকৃষ্ণের যন্ত্রণার একশেষ।

রামকৃষ্ণ ভাবল এ দেহ আর রাখব না। গঙ্গায় ঝাঁপ দেবার জন্যে পোস্তার উপর গিয়ে দাঁড়াল।

দেহত্যাগ করতে হবে না রামকৃষ্ণকে। মা অন্য রকম ব্যবস্থা করে দিলেন। হৃদয়ের কি খেয়াল হল, কুমারী-পূজা করবে। কিন্তু কুমারী কোথায় ? মথুর-বাবুর নাতনী—ত্রৈলোক্য বিশ্বাসের মেয়েকে পাকড়াও করলে হৃদয়। পায়ে

ফুলচন্দন দিয়ে পুজো করলে।

খবর শুনে নিদারুণ চটে গেল ত্রৈলোক্য। কে জানে কি অকল্যাণ হবে না-জানি মেয়ের। যত সব মূর্খ অঘটন।

মন্দিরের কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিলে হৃদয়কে। হ্যাঁ, এই মুহূর্তে চলে যাও মন্দির ছেড়ে। আর কোনো দিন ঢুকতে পাবে না এর ত্রিসীমানায়।

দারোয়ান এসে বললে, 'আপনাকে এখান থেকে যেতে হবে।'

'আমাকে?' রামকৃষ্ণ চমকে উঠল: 'সে কি রে? আমাকে নয়, হৃদুকে।'

'না, বাবুর হুকুম', দায়োয়ান বললে শাসনভঙ্গীর কণ্ঠে: 'তাকে আর আপনাকে দুজনকেই যেতে হবে।'

ব্যস, আর বিন্দুমাত্র বাক্যব্যয় নেই, ক্ষণমাত্র দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই, রামকৃষ্ণ চটি পরে বেরিয়ে গেল।

হাঁ-হাঁ করতে-করতে ছুটে এল ত্রৈলোক্য। ছুটে এসে হাতে-পায়ে ধরল রামকৃষ্ণের। 'ও কি? আপনি যাচ্ছেন কেন? আপনাকে তো আমি যেতে বলিনি।'

'তাই নাকি?' কিছু আর না বলে ফিরে এল রামকৃষ্ণ।

ত্যাগেও ঝাঁজ নেই রামকৃষ্ণের। নির্লিপ্ত, নিরভিমান। যেতে বলো চলে যাচ্ছি। থাকতে বলো থাকছি এককোণে। আমার কোনো ইতরবিশেষ নেই। আমার যেতেও যেমন আসতেও তেমন।

'ওরে হৃদু, তোকে একাই চলে যেতে বলেছে।'

হৃদয় চলে গেল হেঁট মুখে। রামকৃষ্ণ দেখল, মা-ই তাকে সরিয়ে দিলেন।

এবার আবার হাজরাকে নিয়ে মুশকিল হয়েছে। ব্রহ্ম আর শক্তি যে অভেদ এ সে কিছুতেই মানতে চায় না।

তখন রামকৃষ্ণ মাকে ডাকতে বসল। বললে, 'মা, হাজরা এখানকার মত উলটে দেবার চেষ্টা করছে। হয় ওকে বুঝিয়ে দে, নয় ওকে সরিয়ে দে এখান থেকে।'

'হাজরার কথায় আপনার এত লাগল?' জিগগেস করল ভবনাথ।

'এখন আর লোকের সঙ্গে হাঁক-ডাক করতে পারি না। হাজরার সঙ্গে যে ঝগড়া করব এ রকম অবস্থা আর আমার নয়—'

মা প্রার্থনা শুনলেন।

পর দিন হাজরা এসে বললে, 'হ্যাঁ, মানি। বিভু সকল জায়গায় বর্তমান।'

জীবের স্বভাবই সংশয়। হ্যাঁ বললেও, ঢোক গিলে বলে, কিন্তু—। বিশ্বাস হতে হবে প্রহ্লাদের মত। স্বতঃসিদ্ধ। স্বতঃস্ফূর্ত। 'ক' দেখেই প্রহ্লাদের কান্না।

'ক' দেখেই দেখেছে কৃষ্ণকে।

বালকের বিশ্বাস চাই।

এক দিন ঘাসবনে কি কামড়েছে ঠাকুরকে। ভয় হল, যদি সাপ হয়! তবে কি করা! ঠাকুর শুনেছিলেন, আবার যদি সাপ কামড়ায়, তা হলে বিষ ঠিক তুলে নেয়। তখন সাপের গর্ত খুঁজতে লাগলেন ঠাকুর, যাতে আবার কামড়ায় দয়া করে। কিন্তু গর্ত ঠিক ঠাহর হচ্ছে না। একজন জিগগেস করলে, কি করছেন? সব বললেন তাকে ঠাকুর। লোকটি বললে, যেখানটায় আগে কামড়েছে ঠিক সেই জায়গায় কামড়ানো চাই। তখন উঠে পড়লেন ঠাকুর।

আরেক দিন রামলালের কাছে শুনেছিলেন, শরতের হিম ভালো। নজির হিসেবে কি একটা শ্লোকও আওড়েছিল রামলাল। কলকাতা থেকে গাড়ি করে ফিরছেন ঠাকুর, গলা বাড়িয়ে রইলেন বাইরে, যাতে সব হিমটুকু লাগে।

তাই লাগল। তার পর অসুখ।

'গঙ্গাপ্রসাদ আমাকে বললে আপনি রাত্রে জল খাবেন না। আমি ঐ কথা বেদবাক্য বলে ধরে রেখেছি। আমি জানি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি।'

'বিশ্বাসের কত জোর! সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ যে রাম তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু লাগল। কিন্তু শুধু রাম নামে বিশ্বাস করে লাফ দিয়ে সমুদ্র ডিঙোল হনুমান। তার সেতু সাগল না।

তোমার-আমার বিরহের অন্তরালে আর কত সেতু বাঁধব? যে সমুদ্রে আমি সে সমুদ্রে তুমিও। আমি যাচ্ছি ও-পার, তুমি আসছ এ-পার। মাঝসমুদ্রে দেখা হয়ে যাবে দুজনের। আমাদের হাতেহাতে সেতুবন্ধ।

কিন্তু হৃদয় কি সত্যিই চলে গেল? রামকৃষ্ণের সঙ্গছাড়া হল?

শ্রীমা বললেন, 'তা ভালো জিনিস কি চিরদিন কেউ ভোগ করতে পায়?'

'কিন্তু ঠাকুরকে অনেক কষ্টও দিত। গাল-মন্দ করত।'

'যে অত সেবা-পালন করেছে সে একটু মন্দ বলবে না? যে যত্ন করে সে অমন বলে থাকে।' শ্রীমা'র কণ্ঠস্বরে মমতার ফল্গু।

রামকৃষ্ণেরও সেই অন্তঃশীলা করুণা। বললে, 'অমন সেবা বাপ-মাও করতে পারে না।'

কিন্তু এখন তোমাকে কে দেবে সেবা-স্নেহ?

'দেবার সেই ঈশ্বর।' বললে রামকৃষ্ণ: 'শাশুড়ী বললে, আহা, বৌমা, সকলেরই সেবা করবার লোক আছে, তোমার কেউ পা টিপে দিত বেশ হত। বউ বললে, ওগো, আমার পা হরি টিপবেন। আমার কারুকে দরকার নেই। সে ভক্তি-

ভাবেই ঐ কথা বললে—'

তার মানে, আমি যখন ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে আছি তিনিই সব ভারবহনের ব্যবস্থা করবেন। এ চাই, ও চাই, বলে তো বহু বাহানা করি, কিন্তু কী বা কতটুকু আমার সত্যিকার চাইবার মত, তা কি আমি জানি? মা জানেন, মা-ই ঠিক করে দেবেন। হয়তো শয্যা পেলাম, নিদ্রা পেলাম না; বিষয় পেলাম, মামলা বাধল; প্রেয়সী পেলাম কিন্তু প্রেম হল অস্তমিত। কী পেলে আমার চলে, কিসে বা কতটুকুতে আমার শান্তি ও সমতা, তা বুঝি আমার সাধ্য কি? আমি লোভান্ধ, অল্পদৃষ্টি, স্বার্থপর। তাই তিনি বঞ্চনা দিয়ে বাঁচান, আঘাত দিয়ে চেনান, বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নিয়ে আসেন নতুন পরিচ্ছেদে। রাজার বেটা যদি ঠিক মাসোয়ারা পায়, হরির বেটা ঠিক হরিসেবা পাবে।

যিনি ক্লেশ হরণ করেন পাপ হরণ করেন মনোহরণ করেন তিনিই হরি।

ত্রৈলোক্য নতুন এক হিন্দুস্থানী চাকর রেখে দিল। হৃদয়ের বদলে সে-ই সেবা করবে রামকৃষ্ণের।

কিন্তু শুদ্ধ সাত্ত্বিক লোক ছাড়া আর কারু ছোঁয়া সহ্য করতে পারে না রামকৃষ্ণ।

তাই কি করে চলে ও-সব হেটো চাকরে?

দু দিন পরে রাম দত্ত এসেছে দক্ষিণেশ্বরে।

'তোমার সঙ্গে এই ছেলেটি কে হে?' উৎসুক হয়ে জিগগেস করল রামকৃষ্ণ।

'লাটু। আমার বাড়ির চাকর।'

'ওকে এখানে আমার কাছে রেখে দাও। ও বড় শুদ্ধসত্ত্ব ছেলে।'

এই লাটু মহারাজ। এই স্বামী অদ্ভুতানন্দ।

ঠাকুরের সন্ন্যাসী-শিষ্যদের মধ্যে প্রথমাগত। প্রথম-পরশ-ধন্য

॥ ৬৪ ॥

আদি নাম রাখতুরাম। ছাপরা জেলার কোন এক গণ্ডগ্রামে জন্ম। খুব ছেলে-বেলাতেই বাপ-মা মরে গিয়েছে। আছে খুড়োর সংসারে। খুড়োর ছেলেপিলে নেই। রাখতুরামকে সহজেই সে টেনে নিল বুকের কাছে।

কিন্তু রাখতুরামের জন্যে নিভৃত পক্ষীনীড় নয়। ঝড়ের আকাশে তার নিমন্ত্রণ। কোন এক সমুদ্রগামী জাহাজের মাস্তুলে এসে সে বসবে।

রাখতুরাম রাখালি করে। গোঠে-মাঠে ঘুরে বেড়ায়। প্রকৃতির পাঠশালায় পড়ে। খোলা মাঠ তার বই, আকাশ আর মেঘ তার শ্লেট-পেন্সিল, বৃষ্টি তার ধারাপাত। ঘরের পশু আর বনের পাখি তার সহপাঠী।

আর গুরু? কে জানে! থেকে-থেকে গান করে রাখতুরাম: 'মনুয়া রে, সীতারাম ভজন কর লিজিয়ে।'

মহাজনের খপ্পরে পড়েছে চাচাজী। ঋণের দায়ে নিলেম হয়ে গেল জমি-জমা। রাখতুরামকে নিয়ে চাচাজী পথে বসল।

ভাগ্যের সন্ধানে কলকাতায় এল দুজনে। কিন্তু ইটের পর ইট, ওখানে শুধু মানুষ-কীটের বাসা। কোথাও স্নেহ নেই, কোমলতা নেই। অতিথিকে ওখানে ভিক্ষুক মনে করে, ভিক্ষুককে মনে করে চোর।

দেশের লোক কাউকে পাওয়া যায় কিনা, এখানে-ওখানে খুঁজতে লাগল চাচাজী। পাওয়া গেল ফুলচাঁদকে। ফুলচাঁদ মেডিকেল কলেজে রাম দত্তের আরদালি।

'আমার কাছে রেখে যা। দেখি বাবুকে বলেকয়ে রাজী করাতে পারি কিনা।'

'সব কাজ করবে। খুব বাধ্য ছেলে রাখতুরাম।' খুড়ো মিনতি করল।

দেখেই কেমন পছন্দ হয়ে গেল রাম দত্তের। বেশ উজ্জ্বল চোখ দুটো ছেলেটার। মুখে একটা অকাপট্যের ভাব। শরীরে কাঠিন্যের লাবণ্য।

কাজ আর কি। বাজার করা, মেয়েদের বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, মায়েদের ফরমাস খাটা আর অফিসে রাম দত্তের টিফিন নিয়ে আসা। কি, পারবি তো?

'কিন্তু এক কথা। তোর অত বড় নাম আমি বলতে পারব না। ছোট করে বলব, লালটু। কি, রাজী?'

লালটু থেকে লাটু। ঠাকুর ডাকেন লেটো বলে।

কুস্তি করে লাটু। আশ্চর্য, তাতে পাড়ার গৃহস্থদের আপত্তি। চাকর আবার কুস্তি করবে কি! কুস্তিগীর চাকর হলে তো সর্বনাশ।

রাম দত্তের কাছে নালিশ করে কেউ কেউ। এতে নালিশ করবার কী আছে। শেষ কালে বললে রাম দত্ত: 'কুস্তি করা তো ভালো। কুস্তি করলে কাম কমে যায়, আপনা-আপনি বীর্য রক্ষা হয়। নিজেরা যেমন দুর্বল, চাকরও তেমনি দুর্বল খোঁজো।'

কিন্তু তবু নিবৃত্ত হয় না পড়শীরা। একজন এসে বললে, 'বাজারের পয়সা চুরি করে লাটু।'

'হ্যাঁ রে ছোঁড়া', হাঁক দিল রাম দত্ত: 'ক পয়সা আজ চুরি করেছিস বাজার থেকে?'

রুখে দাঁড়াল লাটু। প্রতিবাদের ভঙ্গিতে ফুটে উঠল পালোয়ানের ভাব। জ্বলে উঠল প্রস্ফুট দুই চোখ। আধা হিন্দির তোতলামি মিশিয়ে বললে, 'জানবেন

বাবু! হামি নোকর আছে, চোর না আছে!'

এই তো কথার মত কথা! জীবলোকে যত দীপ্তি আছে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে সত্যদীপ্তি।

রামকৃষ্ণের থেকে দীক্ষা নিয়ে রাম দত্ত তখন ঈশ্বরমদে মাতোয়ারা। সে মদের ছিটে-ফোঁটা পড়ছে এসে সংসারে। যিনি সর্বমন্ত্রপ্রণেতা তাঁরই বাণীবিন্দুর বর্ষণ। রামের উদ্দীপনায় বাড়ির সবাই কমবেশি উৎসাহিত হচ্ছে, কিন্তু একেকটা কথা লাটুর মনে নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে। কথার মানে সে ভালো বোঝে না কিন্তু একটি ইশারা মনের মধ্যে কেবল কেঁদে-কেঁদে বেড়ায়। একটা ভ্রমর যেন গুনগুনিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। তার মনের মধ্যে যে ফুলটি ফুটিফুটি করছে তার মধু খেতে।

'ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে, তা দেখেন না।' কথাটা বাজল একটা আশ্বাসের মত। পথহারা প্রান্তরে আলো-জ্বালা আশ্রমের মত।

'নির্জনে বসে কাঁদতে হয় তাঁর জন্যে। তবে তো তাঁর দয়া হবে।'

দুপুর বেলায় গায়ে কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে আছে লাটু। মাঝে-মাঝে বাঁ হাত দিয়ে চোখ মুছছে। পাশ ফিরছে খানিক বাদে। আবার চোখ মুছছে ডান হাত দিয়ে।

'কাকার জন্যে মন কেমন করছে রে লাটু?' রামবাবুর স্ত্রী জিগগেস করলেন কাছে এসে।

তাঁর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল লাটু। কার জন্যে কাঁদছি তা কি আমি জানি? কেউ কি তা জানে?

এক রোববার রাম দত্ত চলেছে দক্ষিণেশ্বরে, লাটু এসে তার সঙ্গ নিল। বললে, 'হামাকে নিয়ে চলুন।'

'সে কি, তুই কোথা যাবি?'

'যার কথা আপুনি বলেন, সেই পরমহংসকে হামি দেখবে।'

কেমন মায়া হল রাম দত্তের। সঙ্গে করে নিয়ে গেল লাটুকে।

গোলমাল বেঁটেখেটে জোয়ান চেহারার চাকর। চাকর বলে ঘরে ঢুকতে সাহস নেই। রামকৃষ্ণের ঘরের সামনে পশ্চিমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু হাত-জোড়।

রাম দত্ত ঘরে ঢুকে রামকৃষ্ণকে দেখতে পেল না। বাইরে থেকে রামকৃষ্ণ তখন আসছে নিজের ঘরের দিকে। রাধিকার কীর্তন গাইতে-গাইতে। 'তখন আমি

দুয়ারে দাঁড়ায়ে—।' নিজের মনে আখর দিচ্ছে রামকৃষ্ণ। 'কথা কইতে পেলুম না। আমার বঁধুর সনে কথা হল না। দাদা বলাই ছিল সাথে তাই কথা হল না।'

বারান্দায় লাটুর সঙ্গে দেখা। তুই কে রে? তুই কোত্থেকে এলি? তোকে এখানে কে আনল?

রামকৃষ্ণকে দেখেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে রাম দত্ত।

'এ ছেলেটাকে বুঝি তুমি সঙ্গে করে এনেছ? একে কোথা পেলে? এর যে সাধুর লক্ষণ।'

রাম দত্তের দেখাদেখি লাটুও প্রণাম করলে রামকৃষ্ণকে। বুঝলে চোখের সামনে এই সেই নয়নাতীত।

কিন্তু ঘরে ঢুকেও বসছে না সবাইর মত। হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে ঈষন্নত হয়ে। যেন রামের কাছে হনুমান।

'বোস না রে বোস।' হুকুম করল রামকৃষ্ণ। তখন লাটু এক পাশে বসল জড়সড় হয়ে।

'যারা নিত্যসিদ্ধ তারা যেন পাথর-চাপা ফোয়ারা। জন্মে-জন্মে তাদের জ্ঞান-চৈতন্য হয়েই আছে। এখানে-সেখানে ওসকাতে-ওসকাতে যেই চাপটা সরিয়ে দিল মিস্ত্রি, অমনি ফোয়ারার মুখ থেকে ফরফর করে জল বেরুতে লাগল—' বলেই রামকৃষ্ণ হঠাৎ ছুঁয়ে দিল লাটুকে।

লাটুর গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল, ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল ঘন-ঘন, আর দেখতে-দেখতে দু চোখ ফেটে উথলে উঠল কান্না।

সকলে অবাক। এক ঘণ্টার বেশি হয়ে গেল, তবু কান্না থামে না লাটুর।

'ছেলেটা কি এমনি সারাক্ষণই কাঁদবে না কি?' ব্যস্ত হল রাম দত্ত।

রামকৃষ্ণ আবার স্পর্শ করল লাটুকে। কান্না থেমে গেল তৎক্ষণাৎ।

যে হাতে কাঁদাও সেই হাতেই আবার মুছে দাও কান্না। খেলার আরম্ভে যেমনি তুমি, খেলার ভাঙার বেলায়ও তুমি।

বাড়ি ফিরে এসে কেমন আনমনা হয়ে রইল লাটু। কাজে-কর্মে উৎসাহ নেই, মন যেন দেশান্তরী হয়েছে। দেহযন্ত্রটা ঠিক-ঠিক চলছে বটে, কিন্তু যন্ত্রের মধ্যে থেকেও যে যন্ত্র নয়, সেই মনটিরই এখন যন্ত্রণা।

পরের রবিবার দক্ষিণেশ্বরে কিছু ফল-মিষ্টি পাঠাবার কথা উঠল। কিন্তু কে নিয়ে যায় বয়ে। রাম দত্তের কোথায় কি কাজ পড়েছে, সে যেতে পারবে না।

মন-মরা হয়ে বসে ছিল লাটু। ঝটকা মেরে লাফিয়ে উঠল। জোয়ার-আসা গাঙের

মত খুশির ঢেউয়ে উলসে উঠল সর্বাঙ্গ। বললে, 'হামি যাবে। হামাকে দিন, হামি সব উখানকে লিয়ে যাবে। ঠিক পছন লিবে আমাকে।'

তাই গেল লাটু। দীর্ঘ পথ একটা বাঁশির সুরের মত বাজতে লাগল। এত দিন গোষ্ঠে ফিরেছে লাটু, আজ চলল গোকুলে।

দূর থেকে দেখা যাচ্ছে রামকৃষ্ণকে। বাগানে দাঁড়িয়ে আছে। বেলা প্রায় এগারোটা। দেখেই দৌড় মারল লাটু। এক ছুটে হাজির হল পায়ের কাছে। লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করলে। 'কি রে, এসেছিস? আজ এখানে থাক।'

'শুধু আজ নয়, বরাবরই ইখানকে থাকবে। হামি আর নোকরি করবে না। আপুনার কাজ করবে।'

রামকৃষ্ণ হাসল। বললে, 'তুই এখানে থাকবি আর আমার রামের সংসার দেখবে কে? রামের সংসার যে আমারই সংসার।'

এই বলে রামকৃষ্ণ তাকে বুঝিয়ে দিল কি করে চাকরি করতে হয় মনিবের বাড়িতে। কি করে কর্ম করতে হয় সংসারে। মনিবের বাড়িতে থাকবি আর মন পড়ে থাকবে দেশের বাড়িতে। মনিবের ছেলেদের 'আমার রাম' 'আমার হরি' বলবি, কিন্তু মনে-মনে ঠিক জানবি ওরা তোর কেউ নয়।

কিন্তু এখন কোন ধরনের প্রসাদ নিবি তুই?

কালীবাড়ির আমিষ প্রসাদ নিতে কুণ্ঠা ছিল লাটুর। রামকৃষ্ণ তা বুঝতে পেরেছে। বললে, 'ওরে, মা-কালীর আমিষ ভোগ হয় আর বিষ্ণু মন্দিরে হয় নিরামিষ। সব গঙ্গাজলে রান্না। প্রসাদে কোনো দোষ নেই।'

'আমি অত-শত কি জানি!' লাটু শুধু জানে কোথায় তার আসল প্রসাদ। 'আপুনি যা পাবেন হামনে তাই খাওয়া করবে। হামি তো আপুনার প্রসাদ পাবে—বাকি আর কুছু পাবে না।'

রামলালের দিকে তাকিয়ে বললে রামকৃষ্ণ, 'শালা কেমন চালাক দেখেছিস। আমি যা পাব শালা তাতেই ভাগ বসাতে চায়।'

'বাচ্চা সাচ্চা হ্যায়।'

সারা বেলা কাটিয়ে দিল লাটু। বুঝিয়ে-সুজিয়ে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিল রামকৃষ্ণ। যাবার সময় বলে দিল, 'দেখিস বাপু, এখানে আসবার জন্যে যেন মনিবের কাজে ফাঁকি দিসনি। রাম তোর আশ্রয়দাতা, তার যদি কাজ না করবি তা হলে নেমকহারামি হবে। খবরদার, নেমকহারাম হবি না। যখন সময় হবে তখন আমিই তোকে এখানে ডেকে নেব।'

॥ ৬৫ ॥

রামকৃষ্ণকে এখন একবার দেশে যেতে হয়। এই প্রথম তার হৃদয়-ছাড়া দেশে যাওয়া।

মাকে বলে হৃদয়কে নিজেই সরিয়ে দিয়েছে রামকৃষ্ণ। কায়মনে এত সেবা করে অথচ টাকার মায়া কাটাতে পারে না, থেকে-থেকে কোত্থেকে সব বড়লোক এনে হাজির করে। বলে, এটা চাও, ওটা নাও, এদিক-ওদিক সুবিধে দেখ। লছমীনারায়ণ মাড়োয়ারীকে ওই ধরে এনেছিল কিনা ঠিক কি। যখন বললে, টাকাটা হৃদয়বাবুর কাছে রেখে যাই, হৃদয়বাবুর স্ফূর্তি তখন দেখে কে।

এক কথায় নিরস্ত করে দিলে রামকৃষ্ণ। টাকা কাছে রাখাই মানে অহঙ্কারকে জীইয়ে রাখা।

মাড়োয়ারী তখন আরেক কৌশল করলে। বললে, তোমার স্ত্রীর নামে লিখে দি।

হৃদয় বললে, 'সেই ভালো।'

রামকৃষ্ণ ভাবল, মন্দ কি, জিগগেস করা যাক সারদাকে।

নিভৃতে ডাকিয়ে আনল। বললে, 'দশ-দশ হাজার টাকা! তোমাকে দিতে চাচ্ছে লছমীনারায়ণ। নাও না? নেবে?'

সার কথা বুঝতে পেরেছে সারদা। বললে, 'তা কেমন করে নিই? আমি নিলে যে তোমার নেওয়াই হয়ে গেল। আমি আর তুমি কি আলাদা? তুমি যা নিতে পারো না তা আমিও নিতে পারি না।' চলে গেল সারদা।

হৃদয়ের মুখ ম্লান হল বটে কিন্তু হাঁপ ছাড়ল রামকৃষ্ণ।

টাকার যে এত অহঙ্কার কর, তোমার ক' হাঁড়ি আছে জিগগেস করি? তোমার যদি আছে হাঁড়ি, ওর আছে জালা। তোমার যদি আছে জালা, ওর আছে মটকি। আধিক্যেরও আতিশয্য আছে। সন্ধের পর যখন জোনাকি ওঠে তখন সে ভাবে জগৎকে খুব আলো দিচ্ছি। কিন্তু যেই আকাশে তারা উঠল, তার অভিমান চলে গেল। তারারা ভাবতে লাগল, আমরাই আলো দিচ্ছি জগৎকে। কিছু পরে যেই চাঁদ উঠল, লজ্জায় মলিন হয়ে গেল তারারা। চাঁদ ভাবল জগৎ আমার আলোতেই হাসছে। দেখতে-দেখতে অরুণোদয় হল, সূর্য উঠলেন। তখন কোথায় বা চাঁদ, কোথায় বা কি।

গোড়ায়-গোড়ায় রামলালও এক-আধটু হাত বাড়াত। ঠাকুরের অসুখের সময় মহেন্দ্র কবরেজ দেখতে এসেছে সেবার। যাবার সময় পাঁচটি টাকা দিয়ে গেল

রামলালের হাতে।

ডাক্তার কই ভিজিট নেবে, সে-ই কিনা উলটে টাকা দেয় রুগীকে।

বিছানায় ছট্‌ফট করছেন ঠাকুর। সারাক্ষণ কত হাওয়া করল লাটু, তবু কমছে না যন্ত্রণা। বুকের মধ্যে যেন বিল্লি আঁচড়াচ্ছে। শেষে বললেন, 'যা তো, রাম-নেলোকে ডেকে নিয়ে আয় তো, সে শালা নিশ্চয় কিছু করেছে, নইলে চোখ বুজছে না কেন?'

রামলাল কাছে আসতেই ঠাকুর চেঁচিয়ে উঠলেন: 'যা শালা যা, এখানকার জন্যে যার ঠেঙে টাকা নিয়েছিস তাকে শিগগির ফিরিয়ে দিয়ে আয়।'

রাত তখন প্রায় দুটো। লাটুকে সঙ্গে নিয়ে রামলাল গেল সেই কবরেজের বাড়ি। কবরেজকে ঘুম থেকে তুলে তার টাকা তাকে ফেরত দিলে।

ঠাকুর ঠাণ্ডা হয়ে দুচোখ একত্র করলেন।

'ওরে রামলাল', ঠাকুর বলেছিলেন এক দিন স্নেহস্বরে: 'যদি জানতুম জগৎটা সত্যি, তবে তোদের কামারপুকুরটাই সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়ে যেতুম। জানি যে, ও সব কিছু নয়, একমাত্র ভগবানই সত্যি।'

ওরে, সে যে আনন্দং নন্দনাতীতং। প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়োনাস্মাৎ সর্বস্মাৎ। তার মত ভালোবাসার জিনিস আর কিছু নেই।

শ্রীমতী বললে, 'সখি, চতুর্দিক কৃষ্ণময় দেখছি।'

তা তো দেখবেই। তুমি যে অনুরাগ-অঞ্জন চোখে দিয়েছ।

সখীরা বললে, 'রাধে, ঐ দেখ কৃষ্ণ এসেছে। তোমার সর্বস্ব ধন হ'রে নিতে এসেছে—'

ওরে, নিক হরণ করে। ওই তো আমার সর্বস্ব।

কেশব সেন যখন আসে দক্ষিণেশ্বরে, হাতে করে কিছু নিয়ে আসে। হয় ফল নয় মিষ্টি। রামকৃষ্ণের পায়ের কাছে বসে কথা কয়। একেক দিন বা বক্তৃতা দেয়। সেদিন বড় ঘাটে গঙ্গার দিকে মুখ করে বক্তৃতা দিলে কেশব।

হৃদয়ের যেমন মুরুব্বিয়ানা করা অভ্যেস, গম্ভীর মুখে বললে, 'আহা, কী বক্তৃতা! মুখ দিয়ে যেন মল্লিকে ফুল বেরুচ্ছে!'

কিন্তু বক্তৃতার মধ্যেই উঠে গেল রামকৃষ্ণ। যারা জমায়েত হয়েছিল বলাবলি করতে লাগল, লোকটা মুখ্যু কিনা, মাথায় কিছু ঢোকে না, তাই কেটে পড়ল। কিন্তু কেশবের মনে ডাক দিল, কোনো ত্রুটি হয়েছে নিশ্চয়ই। তাড়াতাড়ি কাছে এসে জিগগেস করলে রামকৃষ্ণকে, 'কিছু কি অন্যায় করে ফেলেছি?'

'নিশ্চয়ই। তুমি বললে, ভগবান, তুমি আকাশ দিয়েছ বাতাস দিয়েছ—কত কি

দিয়েছ। তারি জন্যে যেন তোমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। ও সব তো ভগবানের বিভূতি। বিভূতি নিয়ে কথা কইবার দরকার কি? এ কি তুমি বলে শেষ করতে পারবে? তা ছাড়া, এ সব বিভূতি যদি তিনি নাই দিতেন, তা হলেও কি তিনি ভগবান হতেন না?' একটু থামল রামকৃষ্ণ। বললে, 'বড়লোক হলেই কি তাঁকে বাপ বলবে? যদি তিনি গরিব হতেন, নিঃস্ব ও নির্ধন হতেন, তা হলে কি তাঁকে বাপ বলবে না?'

কেশব চুপ করে রইল।

হৃদয়কে জিগগেস করি, এখন এ কোন ফুল বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে?

সকলে বলাবলি করতে লাগল, 'সত্যি বড়লোক হলেই কি বাপ হবে? গরিব হলে সে আর বাপ নয়?'

এরই নাম ভালোবাসা। ভগবান আমাকে কিছু দিন বা না-দিন, আমার দিকে তাকান বা না-তাকান, তবু আমি তাঁকে ভালোবাসি। আমি তাকিয়ে আছি তাঁর দিকে।

দক্ষিণেশ্বরের পাগলা বামুন কেশব সেনের মাথা ভেঙে দিয়েছে। এই নিয়ে শুরু হল হৈ-চৈ। বলে কিনা, বড়লোক না হলে বাপ কি আর বাপ হবে না? সন্তান কি গরিব বাপকে ডাকবে না বাবা বলে?

তার পরে যখনই কেশবকে বক্তৃতা দেবার জন্যে অনুরোধ করেছে রামকৃষ্ণ, কেশব সলজ্জ হাস্যে বলেছে, 'কামারের দোকানে আমি আর ছুঁচ বেচতে আসব না। আপনিই বলুন, আমরা শুনি।'

হৃদয়ের মাতব্বরী করার দিন ফুরিয়ে গেল। দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে চলে যাবার সময়ও নরম হল না। বললে, 'মামা, তুমি এদের ছাড়ো। দু-চারটে বড়মানুষ ধরো, দেখবে কত বাগানবাড়ি তোমার হবে।'

ত্রৈলোক্য তাড়া দিচ্ছে বেরিয়ে যাবার জন্যে।

'তুমিও আমার সঙ্গে চলো, মামা।' হৃদয় এক মুহূর্ত তাকাল পিছন ফিরে। বললে, 'তোমায় যদি পেতুম, দেখতে কত বড় কালীবাড়ি জাঁকিয়ে তুলতুম। ইট চুন সুরকির মন্দির নয়, একেবারে সোনার মন্দির।'

চলে গেল হৃদয়। রামকৃষ্ণ নিঃসঙ্গ। একা-একা গেল কামারপুকুর।

বালক লাটু একা-একা চলে এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। কিন্তু এসে দেখছে, সমস্ত ফাঁকা, রামকৃষ্ণ নেই, তার ঘর বন্ধ। তখন কি করে লাটু, গঙ্গার ঘাটে বসে অঝোরে কাঁদতে বসল। ডাকতে লাগল আকুল হয়ে, তুমি কোথায়? একবার দাঁড়াও আমার চোখের সামনে।

আর কত কাঁদবি? এবার বাড়ি যা। আজই তাঁর ফেরবার দিন নয়।

ফেরবার দিন নয় মানে? তিনি কি কুথা গেছেন নাকি? তিনি ইখানকেই আছেন।

এখানেই আছেন কি রে? তিনি দেশে গেছেন।

আপুনি জানেন না। ইখানকেই আছেন। হামি তার সাথে দেখা না কোরে যাবে না।

তবে থাক বসে। কতক্ষণে দেখা পাস ছাখ।

মন্দিরে সন্ধ্যারতি হচ্ছে। ওদিকে লক্ষ্য নেই লাটুর। গঙ্গার পরপারে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে।

কে একজন বুঝি তাকে প্রসাদ দিতে এল। এসে দেখল লাটু যেন প্রাণ ঢেলে কাকে প্রণাম করছে। সামনে লোকজন কেউ নেই, তবু প্রাণ-ঢালা প্রণাম।

অনেকক্ষণ পর মাথা তুলল লাটু। অপরিচিত লোক সামনে দেখে থ হয়ে গেল। বললে, 'সে কি! পরমহংসমশায় কুথায় গেলেন? এই যে ছিলেন এতক্ষণ ইখানকে।'

রাম দত্তকে জিগগেস করলে রামকৃষ্ণ: 'কি মধু পেয়ে ছোঁড়াটা এখানে পড়ে থাকতে চায় বলো তো! আমি তো কিছু বুঝি না।'

রাম দত্তও বোঝে না। তার স্ত্রীও বোঝে না।

রাম দত্তের স্ত্রী বলে, 'ওখানে তোকে খাওয়াবে কে? কাপড়চোপড় দেবে কে?' কি রকম অবুঝের মতন তাকায় লাটু। খাওয়া? কাপড়চোপড়? দক্ষিণেশ্বরের সংসারে এও আবার একটা জিজ্ঞাসা নাকি? জোটে জুটবে না জোটে না জুটবে। সে যে দক্ষিণ-ঈশ্বর।

তবু বিনা মাইনেয় নোকরি করতে হবে কষ্ট সয়ে! এরই বা অর্থ কি?

কালবোশেখীর দুর্যোগ, তবু নরেন চলেছে দক্ষিণেশ্বরে। বাবা বললেন, যদি একান্তই যাবি, ঘোড়ার গাড়িতে যা। কেন মিছিমিছি পয়সা নষ্ট! শেয়ারের নৌকোতেই চলে যাবে দক্ষিণেশ্বর। নৌকো যদি ডোবে তো ডুববে!

একেই বলে ডানপিটের মরণ গাছের আগায়। কোনো সুবুদ্ধির সে ধার ধারে না।

'এসেছিস?' ডাক দিয়ে উঠল রামকৃষ্ণ।

পর মুহূর্তেই গম্ভীর হবার ভান করে বললে, 'কেন আসিস বল তো? আমার কথা যখন শুনিস না তখন আসিস কি করতে?'

'তুমি আবার শোনাবে কি! তুমি কি কিছু জানো? নিজে কি কিছু পেয়েছ যে তাই পরকে দেবে?' নরেনের কণ্ঠে স্পষ্ট অস্বীকার। রূঢ় প্রত্যাখ্যান।

'বেশ তো, জানি না কিছু, পাইনি কানাকড়ি।' রামকৃষ্ণ স্নেহকরুণ চোখে তাকাল নরেনের দিকে : 'তবু, যার থেকে কিছুই শেখবার নেই, যাকে তুই নিস না, মানিস না, তার কাছে এই ঝড়দাপটে তুই আসিস কেন?'

'আসি কেন!' হাসল নরেন : 'তোমাকে ভালোবাসি বলে দেখতে আসি।'

রামকৃষ্ণ জড়িয়ে ধরল নরেনকে। বললে, 'সকলেই স্বার্থের জন্যে আসে। নরেন আসে আমাকে শুধু ভালোবাসে বলে।'

একেই বলে ভালোবাসা!

॥ ৬৬ ॥

স্বরবর্ণ হয়ে গিয়েছে। এখন লাটুকে ব্যঞ্জনবর্ণ শেখাচ্ছে রামকৃষ্ণ।

সামনেই বর্ণপরিচয় খোলা।

রামকৃষ্ণ বললে, 'বল্, "ক"—'

লাটু উচ্চারণ করলে, ' "কা"—'

'ওরে "কা" নয়, "ক"। বল্ "ক"—'

আবার লাটু বললে, ' "কা"—'

কিছুতেই পশ্চিমী জিভ সজুত করতে পারছে না। রামকৃষ্ণ যত বলছে "ক", লাটু তত বলছে "কা"।

ঝলসে উঠল রামকৃষ্ণ : 'শালা, "ক"কেই যদি "কা" বলবি তবে "ক"-এ আকারকে কি বলবি? যা শালা, তোর আর পড়ে কাজ নেই।'

ছুটি মিলে গেল লাটুর। তাকে আর পাশের পড়া পড়তে হল না।

ঠাকুর বলেন, 'পাশ করা, না, পাশ পরা!'

লেখা-পড়া না শিখিস, নেশা-করাটা শিখে নে।

কিসের নেশা?

মদ-ভাঙের নেশা নয়। এ একেবারে রাজা নেশা। ব্রহ্ম-নেশা।

বই পড়ে কি জানবি? যতক্ষণ না হাটে পৌছুনো যায়, দূর হতে শুধু হো-হো শব্দ। হাটে পৌছুলে আরেক রকম। তখন দেখতে পাবি, শুনতে পাবি স্পষ্ট। দেখতে পাবি দোকানিকে। শুনতে পাবি, আলু নাও, পয়সা দাও!

বড়বাবুর সঙ্গেই আলাপের দরকার। তাঁর কখানা বাড়ি, কটা বাগান, কত কোম্পানির কাগজ, এ আগে থেকে জানতে এত ব্যস্ত কেন? কেন এ-দোর ও-দোর ঘোরাঘুরি করা? চাকরদের কাছে গেলে দাঁড়াতেই দেয় না, তারা বলবে কোম্পানির কাগজের খবর! কিন্তু যো-সো করে বড়বাবুর সঙ্গে একবার

আলাপ করু, তা ধাক্কা খেয়েই হোক বা বেড়া ডিঙিয়েই হোক—তখন একে-একে সব জানতে পাবি। কত বাড়ি কত বাগান কত কোম্পানির কাগজ তিনিই সব বলে দেবেন। বাবুর সঙ্গে আলাপ হলে চাকর-দারোয়ানরা সব সেলাম করবে।

'এখন বড়বাবুর সঙ্গে আলাপ হয় কিসে?' একজন কে জিগগেস করলে।

'তাই তো বলি, কর্ম চাই।' বললে রামকৃষ্ণ: 'ঈশ্বর আছেন বলে বসে থাকলে চলবে? যো-সো করে তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছুতে হবে।'

'কি করে পৌঁছুই?'

'নির্জনে তাঁকে ডাকো, প্রার্থনা করো। দেখা দাও বলে কাঁদো ব্যাকুল হয়ে। কামিনীকাঞ্চনের জন্যে তো পাগল হয়ে বেড়াতে পারো, একবার তার জন্যে একটু পাগল হও দেখি। লোকে বলুক, অমুকে ঈশ্বরের জন্যে পাগল হয়েছে।'

একটু নির্জনে যা। নির্জন না হলে মন স্থির হবে না। নির্জনে বসে একটু ধ্যান কর। বাড়ির থেকে আধ পো অন্তরে ধ্যানের জায়গা কর। নির্জনে গোপনে তাঁর নাম করতে-করতে তাঁর কৃপা হয়। তার পরেই দর্শন।

'দর্শন?' চমকে উঠল কেউ-কেউ।

'হ্যাঁ, দর্শন। যেমন ধরো, জলের ভিতর ডোবানো বাহাদুরী কাঠ আছে—তীরে শিকল দিয়ে বাঁধা। সেই শিকলের এক-এক পাপ্ ধরে-ধরে গেলে, শেষে বাহাদুরী কাঠকে স্পর্শ করা যায়।'

কেন সংসার কি দোষ করল? আমরা জনক রাজার মত নির্লিপ্ত ভাবে সংসার করব।

'মুখে বললেই জনক রাজা হওয়া যায় না। জনক রাজা হেঁটমুণ্ড হয়ে ঊর্ধ্বপদ করে কত তপস্যা করেছিলেন। তোমাদের হেঁটমুণ্ড বা ঊর্ধ্বপদ হতে হবে না, কিন্তু সাধন চাই। নির্জনে বাস চাই। দই নির্জনে পাততে হয়। ঠেলাঠেলি নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না।'

সবাইর মুখভাব একটু কঠিন হয়ে উঠল। কোমলকে পাবার জন্যে সাধনা চাই কঠিন। বন্ধুর পথটি বন্ধুর হয়ে রয়েছে!

'এ তো ভালো বালাই হল!' রামকৃষ্ণ কথায় একটু বিদ্রূপের টান দিল: 'ঈশ্বরকে তুমি দেখিয়ে দাও আর উনি চুপ করে বসে থাকবেন। দুধকে দই পেতে মন্থন করলে তো মাখন হবে! তুমি মাখন তৈরি করে ওঁর মুখের কাছে তুলে ধরো! ভালো বালাই—তুমিই মাছ ধরে হাতে দাও।'

ওরে, রাজাকে দেখতে চাস? রাজা আছেন সাত দেউড়ির পারে। প্রথম

দেউড়ি পার না হতে-হতেই বলে, রাজা কই ? যেমন আছে, এক-একটা দেউড়ি তো পার হতে হবে। যেতে হবে তো এগিয়ে।

রাম দত্তকে বলে লাটুকে রেখে দিয়েছে রামকৃষ্ণ। এমন শুদ্ধসত্ত্ব ছেলে আর দুটি হতে নেই।

গাড়ু ছুঁতে পারে না রামকৃষ্ণ। শৌচে যখন যায় গাড়ু নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে লাটু। জপে বসেছে লাটু, হঠাৎ জপ ছুটে গেল। কে যেন ছুটিয়ে দিলে।

'ওরে, তুই যার ধ্যান করছিস, সে এক গাড়ু জলও পায় না।' সামনে দাঁড়িয়ে রামকৃষ্ণ। বলছে, 'এ রকম ধ্যানে কী ফল হবে রে ?'

গাড়ু হাতে সঙ্গে-সঙ্গে চলল লাটু।

'যার সেবা করবি তার কখন কি দরকার হুঁশ রাখবি। তবে তো সেবার ফল পাবি।'

শোন, কাজের মাঝেই তাকে ধরবি। কিন্তু সব সময়ে জানবি তুই যন্ত্র তিনি যন্ত্রী। তুই চক্র, তিনি চক্রী। তুই গাড়ি তিনি ইঞ্জিনিয়র।

পাতাটি নড়ছে সেও জানবি ঈশ্বরের ইচ্ছে। সেই তাঁতি কি বলেছিল জানিস না ? তাঁতি বললে, রামের ইচ্ছেতেই কাপড়ের দাম এক টাকা ছ আনা, রামের ইচ্ছেতেই ডাকাতি। রামের ইচ্ছেতেই ধরা পড়ল ডাকাত, রামের ইচ্ছেতেই আমাকে ধরে নিয়ে গেল, আবার রামের ইচ্ছেতেই ছেড়ে দিলে।

ওরে ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল। খোলেরই মাঝ, মাঝেরই খোল।

এক দিন লাটুকে জিগগেস করলে রামকৃষ্ণ : 'ওরে লেটো, বলতে পারিস ভগবান ঘুমোয় কি না ?'

প্রশ্ন শুনে লাটুর তো চক্ষুস্থির ! বললে, 'হামনে জানে না।'

'ওরে, জীবজগতে সকলেই ঘুমের অধীন, কিন্তু ভগবানের ঘুমোবার যো নেই। তিনি ঘুমুলে সব অন্ধকার ! সারা রাত সারা দিন জেগে তিনি জীব-জন্তুর সেবা করছেন। তিনি জেগে আছেন বলেই জীবজন্তু নির্ভয়ে ঘুমুতে পারছে।'

শুধু কি তাই ? ঘুমে বা জাগরণে কে কখন কেঁদে ওঠে, তিনি না জেগে থাকলে তা শুনবে কে ? আমরা অন্ধকারে ঘুমুই, আর তিনি সারা রাত আলো জ্বালিয়ে বসে থাকেন শিয়রে।

অধর সেন দক্ষিণেশ্বরে এসে প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়ে।

এক দিন ঠাকুরকে এসে শুধোলে, 'তোমার কি-কি সিদ্ধাই হয়েছে বলো তো ?'

'যারা ডিপটি হয়ে সবাইকে ভয় দেখিয়ে থাকে,' ঠাকুর বললেন হাসতে-হাসতে, 'মায়ের ইচ্ছেয় সে সব ডিপটিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখি।'

তারই জন্যে কি অধর দক্ষিণেশ্বরে এসে ঘুমোয় ?

এ কেমন হীনবুদ্ধি ! ভাগ্যবলে দক্ষিণেশ্বরে এসেছিস, 'বিল্‌ডিং' না দেখে বরং গঙ্গা ছাখ, মাকে ছাখ, ঠাকুরকে ছাখ—তা নয়, গা ঢেলে লম্বা ঘুম ! সবাই নিন্দে করতে লাগল অধরের। নিতান্তই পাশবদ্ধ জীব, ত্রিনাথের এলাকায় এসেও ত্রাণ নেই।

কিন্তু ক্লান্তিহরণের কণ্ঠে অপূর্ব করুণা। স্নেহশান্ত স্বরে বললেন ঠাকুর, 'তোরা কি বুঝবি রে ? এ মায়ের ক্ষেত্র, শান্তি-ক্ষেত্র। ওরা এখানে এসে বিষয়-কথা না বলে ঘুমুচ্ছে, সে অনেক ভালো। তবু একটু শান্তি পাচ্ছে !'

কৃষ্ণধন নামে এক রসিক ব্রাহ্মণ আসে দক্ষিণেশ্বরে। সারাক্ষণ কেবল ফষ্টি-নষ্টি করে।

'কি সামান্য ঐহিক বিষয় নিয়ে তুমি রাত-দিন ফষ্টি-নষ্টি করে সময় কাটাচ্ছ ? ঐটি ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দাও। শোনো, যে নুনের হিসেব করতে পারে, সে মিছরিরও হিসেব করতে পারে।'

কৃষ্ণধন সহাস্যে বললে, 'আপনি টেনে নিন।'

'আমি কি করব ! তোমার চেষ্টার উপর সব নির্ভর করছে। এ মন্ত্র নয়, এ মন তোর !'

'কি করতে হবে বলুন—'

'সামান্য রসিকতা ছেড়ে ঈশ্বরের পথে এগিয়ে পড়ো। ঈশ্বরই সব চেয়ে বড় রসিক, তাঁর তত্ত্বটিই হচ্ছে সব চেয়ে বড় রসিকতা। সেই রসিকতার সন্ধান করো। শুধু এগিয়ে পড়ো—'

'এ পথের আর শেষ নেই—'

'কিন্তু চলতে-চলতে যেখানেই শান্তি, সেখানে "তিষ্ঠ"। সেখানে বিশ্রাম করে নাও।'

আহা, অধর সেন এখানে এসে শান্তিতে একটু বিশ্রাম করছে ! ওকে জাগাস নে। ওকে ঘুমুতে দে একটু ঠাণ্ডা হয়ে !

কিন্তু যে সেবা করতে এসেছে তারই সেবায় লাগল নাকি রামকৃষ্ণ ?

লাটুকে শিবমন্দিরে ধ্যান করতে পাঠিয়েছে রামকৃষ্ণ। ঢুকেছে সেই দুপুর বেলা, বিকেল হয়ে এল, লাটুর এখনো বেরুবার নাম নেই। কি করছে দেখে আয় তো রে ! রামলালকে খোঁজ নিতে পাঠাল। রামলাল এসে বললে, এক গা ঘেমে আছে। নিথর পাথর ! একখানা পাখা নিয়ে আয়। পাখা নিয়ে চলল রামকৃষ্ণ। আর শোন্, এক গ্লাশ জল চাই ঠাণ্ডা। জল নিয়ে গিয়ে রামলাল দেখে, রামকৃষ্ণ লাটুকে হাওয়া করছে। আর পাখার হাওয়ায় লাটুর শরীর কাঁপছে, তুলো

যেমন কাঁপে তেমনি।

'ওরে বেলা যে আর নেই। সন্ধে-টন্ধে কখন সাজাবি?' রামকৃষ্ণের আওয়াজে লাটুর ধ্যান ভাঙল। চোখ চেয়ে দেখল যাকে ধরবার জন্যে মহাশূন্যে পাখা মেলেছিল তিনিই পাখা হাতে করে পাশটিতে বসে আছেন। সস্নেহে বাতাস করছেন মা'র মত।

ব্যস্ত হয়ে উঠতে চাইল আসন ছেড়ে। রামকৃষ্ণ বললে, 'আগে একটু সুস্থ হ, তার পরে উঠিস। দেখছিস না, গরমে কেমন ঘেমে গেছিস।'

'আপুনি এ কী করছেন! এতে হামার অকল্যাণ হবে।'

হাসল রামকৃষ্ণ। বললে, 'তোর কে সেবা করছে? তোর মধ্যে যে শিব এসেছিলেন তাঁর সেবা করছিলুম। গরমে যে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। নে, এখন এই এক গেলাশ জল খা দিকিনি—'

জড়ভরত রাজার পালকি বইছে। রাজা পালকি হতে নেমে এসে বললে, 'তুমি কে গো?'

জড়ভরত বললে, 'আমি নেতি।'

'সে আবার কি?'

'আমি শুদ্ধ আত্মা।'

যেমন বাতাস। ভালো-মন্দ সব গন্ধই বাতাস নিয়ে আসে কিন্তু বাতাস নির্লিপ্ত। যেমন প্রদীপ। প্রদীপের সামনে বসে কেউ ভাগবত পড়ে, কেউ বা দলিল জাল করে। প্রদীপ নির্লিপ্ত। যেমন সূর্য। শিষ্টকেও আলো দিচ্ছে, দুষ্টকেও আলো দিচ্ছে। ধোঁয়া যতই কালো হোক দেয়ালকে ময়লা করতে পারে, আকাশকে নয়। চামড়া-ঢাকা অখণ্ড খোলের মধ্যে খোঁজো সেই প্রাণস্বরূপে। হাড়মাসের খাঁচার মধ্যে ধরো সেই পলাতক পাখি।

॥ ৬৭ ॥

রাম দত্তের বাড়ি, মধু রায়ের গলিতে, রামকৃষ্ণ এসেছে।

কলকাতাকে বড় ভয়, বড় সম্ভ্রম রামকৃষ্ণের। সব জ্ঞানী-গুণীর বাসা এখানে। রাজা-রাজড়া সুখী-ভোগীদের আস্তানা। পাড়াগাঁয়ের আলাভোলা ছেলে আমি, এখানে কি কলকে পাব? আমাদের কি কেউ খাতির-যত্ন করবে?

ঠাকুরের তখন হাত ভেঙেছে, দেবেন্দ্র মজুমদার দেখতে এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। পরনে লাল-পাড় কাপড়, ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাত গলার সঙ্গে ঝোলানো, ঠাকুর বসে আছেন তক্তপোশে। দেবেন্দ্রকে জিগগেস করলেন, 'কোত্থেকে আসা হচ্ছে?'

'কলকাতা থেকে।'

কলকাতার নাম শুনে যেন শিউরে উঠলেন ঠাকুর। নিশ্চয়ই তবে একজন গন্যি-মান্যি লোক।

'কী দেখতে এসেছ? এমনি?' বলে ঠাকুর হাতের পর হাত রেখে ত্রিভঙ্গবঙ্কিম কৃষ্ণের ভঙ্গি করলেন।

'না, শুধু আপনাকে দেখতে এসেছি।' কণ্ঠস্বরে যেন ভক্তির সুরটি পাওয়া গেল। ঠাকুরের গলায় কান্না ফুটে উঠল: 'আর আমায় কী দেখবে বলো! পড়ে গিয়ে আমার হাত ভেঙে গিয়েছে। দেখ দেখি সত্যি ভেঙেছে কিনা। বড় যন্ত্রণা। কি করি?'

হাতখানি বাড়িয়ে দেবার ইঙ্গিত করলেন। দেবেন্দ্র স্পর্শ করল সেই হাত। একটু বা টিপে-টিপে দেখল। জিগগেস করল, 'কি করে ভাঙল?'

কাঁদ-কাঁদ মুখে ঠাকুর বললেন, 'কি একটা অবস্থা হয়, তাইতে পড়ে গিয়ে ভেঙে গিয়েছে। ওষুধ দিলে আবার বাড়ে। অধর সেন ওষুধ দিয়েছিল, বেশি করে ফুলে উঠল। তাই আর কিছু দিইনি। হাঁ গা, সারবে তো?'

যিনি সকলের ব্যথা সারান তাঁরই কণ্ঠে ব্যথার জিজ্ঞাসা।

'আজ্ঞে সেরে যাবে বৈ কি। নিশ্চয় সারবে।' দেবেন্দ্র জোরের সঙ্গে বললে।

আহ্লাদে শিশুর মতন হয়ে গেলেন ঠাকুর। আর সকলকে উদ্দেশ করে বলতে লাগলেন: 'ওগো, ইনি বলছেন আমার হাত সেরে যাবে। আর ভয় নেই। ইনি যেমন-তেমন লোক নন। ইনি কলকাতা থেকে এসেছেন!'

কলকাতা সম্বন্ধে এত তাঁর ভয়-ভক্তি। সেই কলকাতায় তিনি এসেছেন বিদ্বৎ সমাজে! বসেছেন তাদের বৈঠকখানায়! শেষে চাতরে না হাঁড়ি ভাঙে!

মা গো, পাশে এসে বোস্। রাশ ঠেলে দে।

রামকৃষ্ণের চোখের দিকে চেয়ে মা হাসেন মিটি-মিটি।

রাম দত্তের হাঁপানি, তাই নিয়ে সে ছুটোছুটি করছে। এসেছে সুরেশ মিত্তির, ভাবে বিভোর হয়ে টলছে মাতালের মত। গায়ে জামা নেই গলায় পৈতে, এক পাশে এসে বসেছে দেবেন মজুমদার। গ্যাস জ্বলছে ঘরে। তাতে আর কতটুকু আলো হবে! রামকৃষ্ণের গায়ের আলোয় মধু রায়ের গলি ভেসে যাচ্ছে। আকাশের সুধাকর এসেছেন নগরের ধূলির নিকেতনে।

'ওরে, রাম দত্তের বাড়িতে দক্ষিণেশ্বরের সেই সাধু এসেছে। চল দেখবি চল। রাস্তায় কর্পোরেশনের বাতি নেই, সাধুই নাকি সব অলি-গলি আলো করে বসেছে! একটি সহজসুন্দর মানুষ। ঘরছাড়া হয়েও যেন ঘরের লোক। গালে একটু

একটু ঝুপচানো দাড়ি, চোখের পাতা অনবরত মিটমিট করছে—
ওরে, ভালো করে চেয়ে ছাখ, কমলবিশদনেত্র ক্লেশনাশন কেশব বসে আছেন।
সর্ববান্ধবস্বরূপ দীনবন্ধু।
কলকাতায় এসেছে, তাই গায়ে জামা পরে এসেছে। জামার আস্তিন কনুই আর কব্জির মাঝখানে। রঙিন একটি বটুয়া সামনে। তারই থেকে একটু মশলা নিয়ে মুখে দিচ্ছে মাঝে-মাঝে। কতক্ষণ আর থাকা যায় কাঠের ভদ্রলোক সেজে? গায়ের জামা খুলে ফেলল রামকৃষ্ণ। এমনি যে আভা ছিল তার শতগুণ বিভা বেরুচ্ছে গা থেকে। সুধাকরের বদলে নেমে এসেছে প্রভাতের দিবাকর। নখজ্যোতিতেই যেন শরদিন্দুর দীপ্তি গায়ের আলো বহু দূর ছড়িয়ে পড়েছে। একটি স্থিরস্ফুট বিদ্যুৎ যেন চিরজীবী হয়ে আছে আকাশে।
বহু লোক এসে জমায়েৎ হয়েছে। ঘর ছাপিয়ে ভিড় করেছে রোয়াকে, রোয়াক ছেড়ে রাস্তায়। অথচ সবাই স্তব্ধ, অভিভূত। বিস্ময়বিভোর।
এ কে বল দেখি? দরিদ্রের মধ্যে রাজরাজেশ্বর! মর্তধামে ত্রিলোকপালক! যিনি শ্মশানে ভূতনাথ তিনিই আবার গৃহে জগদ্‌গুরু।
কথা ক' না! প্রশ্ন কর্! যার যা জিগগেস করবার আছে জেনে নে।
কেউই প্রশ্ন করে না। প্রশ্ন করবার কথা মনেও হয় না কারুর। শুধু এই মনে হয়, অশেষ প্রশ্নের শেষ উত্তরটি যেন জীবন্ত হয়ে জলন্ত হয়ে বসে আছে। গভীর উপলব্ধির সহজ একটি উচ্চারণ। বসে আছে বাকপতি, বিবুধেশ্বর। বাক্য দিয়ে শুধু হরিনামের মালা গাঁথা। তাই যা বাক্য তাই কাব্য।
নিজের মনেই বলে যাচ্ছে রামকৃষ্ণ। বলছে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ। সতৃষ্ণকর্ণে তাই শুনছে সকলে। কোনো তর্ক-বিচার করছে না। যা বলছে তাই যেন চরাচরের চরম কথা। এর পরে আর বিষয় নেই, বর্ণনা নেই। পারাপার নেই। যা শুনছে তাই নিঃসন্দেহে মানছে সকলে। কি যে শুনছে মনে ধরে রাখতে পারছে না, তবু মন বলছে এ অত্যন্ত খাঁটি কথা, এ কথার আর ওর নেই।
কথা বলতে-বলতে মাঝে-মাঝে থামছে রামকৃষ্ণ। তখনই সবাই শ্রবণতৃষ্ণায় অস্থির হয়ে উঠছে। রামকৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকছে নিষ্পাণের মত। কথা কও, তুমি সর্বমন্ত্রপ্রণেতা, তোমার কথায় নিশ্চল নিস্তব্ধতায় প্রাণসঞ্চার করো।
অথচ কী সরল কথা! পণ্ডিতগিরি ফলানো নেই এতটুকু। এতটুকু বক্তৃতা মারা নেই। লঘুতা-প্রগল্‌ভতা নেই। সহজের সংবাদটি সহজ করে পরিবেশন করছেন।

'আগে শাদাসিধে জ্বর হত, সামান্য পাচনেই দেরে যেত। এখন যেমন ম্যালেরিয়া জ্বর, তেমনি ওষুধও ডি-গুপ্ত! আগে লোকে যোগ-যাগ তপস্যা করত, এখন কলির জীব, দুর্বল, অন্নগত প্রাণ—এক হরিনামই তার সম্বল। হরিনামেই সে পেরিয়ে যাবে ভবনদী। নামও করো, সঙ্গে-সঙ্গে প্রার্থনা করো, দুদিনের জিনিসের উপর থেকে ভালোবাসা যেন কমে যায়। দুদিনের জিনিস মানে টাকা, মান, যশ, দেহসুখ। টাকার জন্যে যেমন ঘাম বার করো, হরিনাম করে নেচে গেয়ে ঘাম বার করতে পারো তো বুঝি।'

তার পর গান ধরে রামকৃষ্ণ।

'নামেরই ভরসা কেবল শ্যামা গো তোমার।
কাজ কি আমার কোশাকুশি দেঁতোর হাসি লোকাচার!
নামেতে কালপাশ কাটে, জটে তা দিয়েছে রটে;
আমি তো সেই জটের মুটে, হয়েছি আর হব কার॥'

এ তো গান নয়, শিবের জটা ছেড়ে গঙ্গার মর্তাবতরণ।

'জানতে, অজানতে বা ভ্রান্তে যে কোনো ভাবেই হোক না কেন, তাঁর নাম করলেই ফল হবে।' আবার কথা শুরু করলে রামকৃষ্ণ: 'কেউ তেল মেখে নাইতে যায়, তারও যেমন স্নান হয়, যদি কাউকে জলে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয় তারও তেমনি স্নান হয়। আর কেউ ঘরে শুয়ে আছে, তার গায়ে জল ঢেলে দিলে তারও স্নানের কাজ হয়ে যায়। নিতাই তাই কোনো রকমে হরিনাম করিয়ে নিতেন। চৈতন্যদেব বলেছিলেন, ঈশ্বরের নামের ভারি মাহাত্ম্য। তক্ষুনি-তক্ষুনি ফল না পেলেও এক সময়ে না এক সময়ে পাবেই। বাড়ির কার্নিশে যদি বীজ পড়ে, অনেক দিন পরে বাড়ি পড়ে গেলেও সেই বীজ মাটিতে পড়ে গাছ হয়ে তার ফল হবে।'

রাত হয়ে গেল কিন্তু বাড়ি ফেরবার কারু নাম নেই। খিদে পেয়েছে তেষ্টা পেয়েছে এ অত্যন্ত তুচ্ছ চিন্তা। এখন শুধু নয়নের তৃষ্ণা। জীবনের রাত অনেক হয়ে গেল বটে কিন্তু গৃহ বলতে এঁরই পদাশ্রয়। রামকৃষ্ণকে ছেড়ে কোথায় আবার আমাদের ঘর-বাড়ি?

হঠাৎ রামকৃষ্ণের সমাধি উপস্থিত হল।

পাড়া-বেপাড়ার ভিড় করা শহুরে লোকেরা দেখুক তা চর্মচক্ষে।

রামকৃষ্ণের ডান হাতের মাঝের তিনটি আঙুল বেঁকে গেল, শক্ত ও সিধে হয়ে গেল হাত দুখানি। মোটেই দেহবিকারের লক্ষণ নয়, বিদেহবিহারের লক্ষণ। রামকৃষ্ণ এখন দিব্য ভাবের দীপ্র মূর্তি। তাঁর সঙ্গে ভাবনবনীর অমিয় লাবণ্য। এ কি

কর্পূরকুন্দেন্দুধবল শিব না রাজীবলোচন দূর্বাদলশ্যাম রাম !

দেবেন্দ্র মজুমদারের মনের মধ্যে গুরুস্তোত্রের শ্লোক গুঞ্জন করে ফিরতে লাগল :

'মন-বারণ-শাসন-অঙ্কুশ হে,
নরত্রাণ তরে হরি চাক্ষুষ হে।
গুণগানপরায়ণ দেবগণে,
গুরুদেব দয়া করো দীন জনে ॥'

রামকৃষ্ণের ভাবের হাওয়া লেগে সবাইর মন মাটি ছেড়ে উড়তে লাগল আকাশে। ঘোর-ঘোর নেশা আর কাটতে চায় না। মন যেন আর থা পায় না মাটিতে। ভাবের বাতাসেই কেবল উড়তে চায়। উড়তে-উড়তেই যেন ধরতে পারবে কাউকে। সেই চিরকালের অধরাকে।

দেবেন্দ্র তখন পৌঁছে গেছে শেষ শ্লোকে :

'জয় সদ্‌গুরু ঈশ্বরপ্রাপক হে,
ভবরোগবিকারবিনাশক হে।
মন যেন রহে তব শ্রীচরণে,
গুরুদেব দয়া করো দীন জনে ॥'

॥ ৬৮ ॥

দক্ষিণেশ্বরে যিনি আছেন তাঁর আরেক নাম দক্ষিণ-ঈশ্বর।

রুদ্র, যত্তে দক্ষিণমুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

উত্তরে-দক্ষিণে পুবে-পশ্চিমে ডাক পাঠাচ্ছে রামকৃষ্ণ। কখনো নহবৎখানা থেকে, কখনো বা কুঠির ছাদের উপর উঠে। আরতির সময় ঘড়ি-ঘণ্টা বাজছে আর ডাকছে রামকৃষ্ণ : ওরে তোরা কে কোথা আছিস চলে আয়। তোদের ছাড়া দিন আর কাটে না রে—

প্রথমে এল লাটু। দ্বিতীয় এল রাখাল।

রামকৃষ্ণ দেখল গোপাল এসেছে। পায়ে নূপুর বাজছে ঝুম-ঝুম। 'আয়, আয়—' হাত বাড়িয়ে দিল রামকৃষ্ণ। আর রাখাল দেখল স্নেহ-শান্তির সুধাসত্র বিছিয়ে মা বসে আছেন। ঝাঁপিয়ে পড়ল কোলের মধ্যে।

কখনো তার গায়ে হাত বুলোয় রামকৃষ্ণ, কখনো বা স্তন্য পান করায়। গদগদ-ভাষে কখনো বা ডাকে, গোপাল, গোপাল ; কখনো বা যদি দেখতে না পায়, গলা ছেড়ে কান্না ধরে, আমার ব্রজের রাখাল কোথায় গেলি ?

যখন আসে ক্ষীর-ননী খাওয়ায়, কত খেলা দেয়, কখনো বা কাঁধে করে নাচে।

কিনা—তবু যেন আনন্দের প্রতিমূর্তি।

'বাবা, ক্যা ভোজন হুয়া?' এক সাধুকে জিগগেস করলে একজন।

'আজ মালিক নেহি মিলায়ে।' বললে সেই সাধু, আজ রামজীকি ইচ্ছাই হ্যায় ভোজন মিলনে নেহি হ্যায়। আজ আনন্দই হ্যায়—'

সর্বাবস্থায় সদানন্দ। এই আনন্দের হাট থেকে আমার তোলা বন্ধ করে দিও না। কেমন যেন হয়ে গেল আনন্দমোহন। ছেলেকে পারল না ফিরিয়ে নিতে। শুধু রামকৃষ্ণকে বললে, 'মাঝে-মাঝে এক-আধবার পাঠিয়ে দেবেন দয়া করে।'

তাই সেই অনুরোধই এখন করছে রামকৃষ্ণ। ওরে, অনেক দিন হয়ে গেল, এখন একবার বাড়ি গিয়ে বাপকে দেখা দিয়ে আয়। যদি একেবারে না যাস, কেলেঙ্কারি হবে, তোকে চিরদিনের মত আটকে রাখবে, আর তোকে আসতে দেবে না।

তুইয়ে-তাইয়ে পাঠিয়ে দেয় বাড়িতে।

দুদিন যেতে না যেতেই ফের ফিরে আসে। বাপের চোখের উপর দিয়েই ফিরে আসে। আনন্দমোহনের কেমন ধারণা হয়েছে এ সাধুকে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। এর আস্তানায় অনেক গণ্যমান্য লোক যাতায়াত করছে। ওর এখন বিস্তর নামডাক। এর কৃপাতেই মামলাতে সুফল হয়েছিল। বলা যায় না, লেগে থাকলে কোন না আবার সুবিধে হবে!

রাখালের খোঁজে নিজেও দু-এক দিন চলে আসে আনন্দমোহন।

রামকৃষ্ণ খুব খাতির-যত্ন করে। আগে-আগে শুধু ছেলের প্রশংসা করত এখন বাপেরও প্রশংসা করে। বলে, 'যেমন ওল তেমনি মুখীটি তো হবে। গাছটি রসালো বলেই তো ফলটি মিঠে।'

'এমনি করেই রাখালের বাবার মন খুশি রাখতেন।' বললেন একদিন শ্রীমা: 'রাখালের বাবা এলেই যত্ন করে এটি-ওটি দেখাতেন, খাওয়াতেন, কত কথা যে বলতেন তার শেষ নেই। মনে ভয়, পাছে রাখালটিকে ওখানে না রাখে, নিয়ে যায়। রাখালের সৎ-মা ছিল। সে যখন দক্ষিণেশ্বরে আসত, ঠাকুর রাখালকে বলতেন, ওরে ওঁকে ভালো করে সব ছাখা, শোনা, যত্ন কর্—তবেই তো জানবে ছেলে আমাকে ভালবাসে।'

একবার রামলালকে ধরেছিল, এখন ধরল বালগোপালকে। আগে ছিল অষ্টধাতুর বিগ্রহ এখন সপ্তধাতুর মানুষ। আগে ছিল মনোমূর্তি, এখন মানস-পুত্র।

'ভারি খিদে পেয়েছে।' রাখাল বললে এসে রামকৃষ্ণকে। যেমন আবদারে ছেলে মাকে এসে বলে। খিদে পেয়েছে! কি সর্বনাশ, এখন তোকে খেতে দিই কি!

ঘরে খাবার নেই, দোকানও বা কই এখানে কাছে-ভিতে! এখন করি কি, যাই কোথায়! আমার রাখালের যে খিদে পেয়েছে! উতলা হয়ে গঙ্গার ধারে চলে এল রামকৃষ্ণ। গলা ছেড়ে কান্নার সুরে ডাকতে লাগল: 'ও গৌরদাসী, এস আমার রাখালের খিদে পেয়েছে।'

বৃন্দাবনের সন্ন্যাসিনী এই গৌরদাসী। বলরাম বসুর কাছে শুনেছে রামকৃষ্ণের কথা। সটান চলে এসেছে দক্ষিণেশ্বর। এসে দেখল রামকৃষ্ণ কোথায়, এ যে সেই গৌরহরি। সেই থেকে আছে তার পদচ্ছায়ে।

আচ্ছা, গৌরদাসী কি মেয়ে? রামকৃষ্ণ বলে, মেয়ে যদি সন্ন্যাসী হয় সে কখনো মেয়ে নয়, সে পুরুষ। গৌরদাসীও তাই পুরুষ। অদম্য কর্মশক্তি। অভঙ্গব্রতে অসাধ্যসাধিকা।

রামকৃষ্ণ বলে, 'আমি জল ঢালছি, তুই কাদা মাখ।'

আমি ভাব দি, তুই তাকে আকার দে। আমার রূপকে তুই রীতিতে নিয়ে যা। আমার বস্তুকে নিয়ে যা আস্বাদে।

শ্রীমা যেবার রামেশ্বর থেকে ফিরলেন, তাঁকে জিগগেস করলে মেয়েরা, 'কি দেখে এলেন বলুন—'

'আমাকে তারা লেকচার দিতে বললে।' শ্রীমা একটু হাসলেন। 'বললাম আমি লেকচার দিতে জানি না। যদি গৌরদাসী আসত তবে দিত।' একটু থেমে আবার বললেন, 'যে বড় হয় সে একটিই হয়। তার সঙ্গে অন্যের তুলনা হয় না। সে আমাদের গৌরদাসী।'

সেই গৌরদাসীকে লক্ষ্য করে কাঁদছে রামকৃষ্ণ। ওরে আয়, অসাধ্যসাধন করে দিয়ে যা। ঘরে এক দানা খাবার নেই। আমার রাখালকে কিছু খাবার দিয়ে যা শিগগির। তুই না হলে এ অসম্ভবকে কে সম্ভব করবে?

চাঁদনি ঘাটে নৌকো লাগল। কে তোরা কোত্থেকে আসছিস? পথে আমার গৌরদাসীকে দেখেছিস কেউ? নৌকোর মধ্যেই তো গৌরদাসী। সঙ্গে বলরাম বোস। আরো কয়েকজন ভক্ত। সবাই এসে পড়েছে এক ডাকে। একে-একে নামতে লাগল। গৌরদাসীও নামল। গৌরদাসীর হাতে খাবারের পুঁটলি। 'ওরে রাখাল, আয়, ছুটে আয়, খাবার খাবি আয়। তোর জন্যে খাবার নিয়ে এসেছে গৌরদাসী।' ব্যাকুল হয়ে ডাকতে লাগল রামকৃষ্ণ।

রাখাল কাছে এসে মুখ ভার করে রইল। বললে, 'খাব না।'

'সে কি রে? এই না বলছিলি খিদে পেয়েছে!'

'বলেছিলাম তো বলেছিলাম! তাই বলে চার দিকে ঢাক পেটাতে হবে নাকি?'

'আহাহা, তাতে কি হয়েছে।' রাখালের পিঠে হাত বুলুতে লাগল রামকৃষ্ণ : 'তোর খিদে পেয়েছে, তোর খাবার চাই, এ কথা বললে দোষ কি! খিদে পাবার মধ্যে লজ্জা কিসের! আর, খিদে যখন পেয়েছে, তখন খেতে তো হবেই। এতে আবার রাগের কথা কি! নে, এখন খা।' রাখালকে খাইয়ে দিতে লাগল রামকৃষ্ণ। বড় করে হ্যাঁ কর্। ভাল করে খা।

'কি অবস্থাই গেছে। মুখ করতুম আকাশ-পাতাল-জোড়া আর মা বলতুম। যেন মাকে পাকড়ে আনছি। যেন জাল ফেলে মাছ হড়-হড় করে টেনে আনা।'

সেই গানে আছে না—

'খাব খাব বলি মা গো, উদরস্থ না করিব,
এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পূজিব।
যদি বল কালী খেলে কালের হাতে ঠেকা যাব,
আমার ভয় কি তাতে, কালী বলে কালেরে কলা দেখাব॥'

॥ ৬৯ ॥

কামারপুকুরের লক্ষ্মণ পানকে দিয়ে রামকৃষ্ণ খবর পাঠাল সারদাকে।

'এখানে আমার কষ্ট হচ্ছে। রামলাল মা-কালীর পূজারী হয়ে বামুনের দলে মিশেছে, এখন আমাকে আর তত খোঁজ করে না। তুমি অবশ্য আসবে। ডুলি করে হোক, পালকি করে হোক, দশ টাকা লাগুক, বিশ টাকা লাগুক, আমি দেব।' সারদার মন কেঁদে উঠল। ভাবল যদি পারি তো পাখি হয়ে উড়ে যাই। লক্ষ্মণ পান আরো বললে। বললে, ঠাকুর ভাব-টাব হয়ে পড়ে থাকেন, সেদিকে রামলালের খোঁজ নেই। তার মনের ভাবখানা হচ্ছে, কালীঘরের থাকিয়ে পূজারী হয়েছি, আর আমাকে পায় কে। এদিকে মা-কালীর প্রসাদ শুকনো হয়ে রয়েছে, দেখেও দেখছে না।

যেমন চালাও তেমনি চলি। যদি দূরে রাখো, দূরে থাকি; যদি কাছে ডাকো, ডাক শোনবার জন্যে কান খাড়া করে থাকি তোমার কাছে-কাছে।

ছোট তক্তপোশে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে আছেন ঠাকুর। মেঝেতে ভক্ত-দল। হেসে-হেসে ঠাকুর বলছেন ভক্তদের, 'হাজার বিচার করো, আর যাই কেননা বলো, তবু তাঁর অন্‌ভারে আমরা আছি।'

মাস্টার মশাই বলেন, 'সেই দিন থেকে অন্‌ভার কথাটি শিখলাম—'

'তিনি তো আর আমাদের হাতে পড়েননি, আমরাই তাঁর হাতে পড়েছি।' বললেন ঠাকুর।

তেমনি আমি পড়েছি তোমার হাতে। আমি আমার বাঁশি শূন্য করে রেখেছি, তুমি যেমনি বাজাও তেমনি বাজব।

সারদা চলে এল দক্ষিণেশ্বর। ঢুকল নবতে।

ছোট্ট এই একটুখানি ঘর। ঢোকবার দরজাটিও ছোট। ঢুকতে প্রায়ই মাথা ঠুকে যায় সারদার। এক দিন তো কেটেই গেল রীতিমত। ক্রমশ অভ্যেস হয়ে এল। দরজার সামনে আপনা হতেই নুয়ে পড়ে মাথা। হে প্রবেশপথের দারুদেবতা, ভক্তিমতীর প্রণাম নাও।

সামনে একটু বারান্দা, দরমার বেড়া দেওয়া। ঐ তো ঘর, তার মধ্যেই সমস্ত সংসার। রাজ্যের জিনিসপত্র। রাঁধবার সাজ-সরঞ্জাম, হাঁড়ি-কুড়ি, বাসন-কোশন। জলের জালা, রামকৃষ্ণের জন্যে হাঁড়িতে মাছ জিয়োনো। শিকেতে ভক্তদের জন্যে খাবার-দাবার।

আবার লক্ষ্মী এসেছে সঙ্গে। সেও থাকে এই নবতের ঘরে। রাত্রে মাথার উপর মাছের হাঁড়ি কলকল করে, লক্ষ্মীর ঘুম আসে না।

শুধুই কি লক্ষ্মী? কলকাতা থেকে স্ত্রী-ভক্ত যদি কেউ আসে সেই ঘরেই রাত কাটিয়ে যায়। গৌরদাসীর তো কথাই নেই। তার আবার সেই ঘরেই ভাব হয়। থেকে-থেকে 'নিত্য কোথা' 'নিত্যগোপাল কোথায়' বলে নৃত্য করতে থাকে।

'কে জানে তোমার নিত্য কোথায়?' সারদার কণ্ঠস্বরে হয়তো ঈষৎ ঝাঁজ ফোটে: 'দেখ গে, গঙ্গার ধারে-টারে ভাব হয়ে রয়েছে হয়তো।'

কলকাতা থেকে স্ত্রী-ভক্তরা যারা দেখতে আসে, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বলে, 'আহা, কি ঘরেই আমাদের সীতালক্ষ্মী আছেন গো! যেন বনবাস গো!'

সত্যিই সীতা-লক্ষ্মী। পরনে কস্তা পেড়ে শাড়ি, সিঁথে-ভরা সিঁদুর। কালো ভরাট মাথার চুল প্রায় পা পর্যন্ত পড়েছে। গলায় সোনার কণ্ঠীহার। কানে মাকড়ি। হাতে চুড়ি, যে চুড়ি রামকৃষ্ণের মধুর ভাবের সময় গড়িয়ে দিয়েছিলেন মথুরবাবু। তার উপরে আবার নাকে নথ। নিজের নাকের কাছে আঙুল ঘুরিয়ে গোল চিহ্ন দেখিয়ে সারদাকে রামকৃষ্ণ বোঝায় ইশারায়।

নবতকে বলে খাঁচা। লক্ষ্মী আর সারদাকে শুকসারী। কালীঘরের প্রসাদ এলে রামলালকে বলে, 'ওরে খাঁচায় শুকসারী আছে, 'ফলমূল ছোলাটোলা কিছু দিয়ে আয়।'

বাইরের লোক যারা শোনে, ভাবে, খাঁচায় বুঝি সত্যি-সত্যি পাখি আছে রামকৃষ্ণের।

রাত্রে তো বেশি ঘুম নেই, অন্ধকার থাকতে-থাকতেই উঠে পড়ে রামকৃষ্ণ।

বেড়াতে-বেড়াতে নবতের দিকে চলে আসে। হাঁক পাড়ে: 'ও লক্ষ্মী, ওঠরে ওঠ। তোর খুড়িকে তোল রে। আর কত ঘুমুবি? রাত পোহাতে চলল। মা'র নাম কর।'

শীতের রাত। এক-এক দিন বিছানা ছাড়তে মন ওঠে না। লেপের ভিতরে কুঁকড়ি-সুকড়ি হয়ে সারদা আস্তে-আস্তে লক্ষ্মীকে বলে, 'চুপ কর, সাড়া দিসনি। নিজের চোখে তো ঘুম নেই! এখনো সময় হয়নি ওঠবার। কাক-কোকিল ডাকেনি এখনো—'

সাড়া না পেয়ে সরে যাবার লোক নয় রামকৃষ্ণ। দরজার ফাঁক দিয়ে জল ছিটোয় বিছানায়।

নইলে এমনিতে রাত চারটের সময় উঠে সারদা স্নান করে নেয় গঙ্গায়। বিকেলে নবতের সিঁড়িতে যেটুকু রোদ পড়ে তাইতে চুল শুকোয়। যোগেনের চুল-বাঁধাটি ভারি পছন্দ। যোগেন এলেই বলে বেঁধে দিতে।

যোগেনকে বলতে হয় না। সে নিজের থেকে বসে সেই চুলের কাঁড়ি নিয়ে। পাঁচ আঙুলে চুলের গোছা সামলাতে পারে না।

মা যে আমার আলুলায়িতকুন্তলা। থাকেন ক্ষুদ্র নবতে, কিন্তু আসলে ভুবনেশ্বরী। সর্বানন্দকরী, প্রসন্নাস্যা। ক্ষিতীশমুকুটলক্ষ্মী।

'কার ধ্যান করছিস রে লেটো?'

যার ধ্যান করছে সে তো চোখের সামনে। লাটু আসন ছেড়ে উঠে পড়ল। 'শোন, ঐ নবত-ঘরে সাক্ষাৎ ভগবতী আছেন, তাঁর রুটি বেলে দে গে।'

বিবেকানন্দের ভাষায়, জ্যান্ত দুর্গা। আমেরিকা থেকে শিবানন্দকে চিঠি লিখছেন স্বামীজী: 'দাদা, বিশ্বাস বড় ধন। দাদা, জ্যান্ত দুর্গা পূজা দেখাব, তবে আমার নাম। তুমি জমি কিনে জ্যান্ত দুর্গামাকে যেদিন বসিয়ে দেবে সেই দিন আমি একবার হাঁপ ছাড়ব। তার আগে আর আমি দেশে ফিরছি না।'

ফল-মিষ্টি দেদার বিলোচ্ছে সারদা। লোকদের বিলিয়ে দিতে পারলে আর তার কথা নেই। তার এই সদাব্রত দেখে রামকৃষ্ণ ঈষৎ বিরক্ত হল বোধ হয়। বললে, 'অত খরচ করলে কি চলবে?'

একটু বুঝি অভিমান হল সারদার। তার সমুখ থেকে চলে যাবার ভঙ্গিটিতে বুঝি সেই ভাবই ফুটে উঠেছে।

ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠল রামকৃষ্ণ। রামলালকে ডেকে পাঠাল।

'ওরে তোর খুড়িকে গিয়ে শান্ত কর।'

'কি হয়েছে?'

'বোধ হয় রেগে গেছে।' একটু থামল রামকৃষ্ণ। বললে, 'ও রাগলে আমার সব নষ্ট হয়ে যাবে।'

রামকৃষ্ণ অগ্নি, সারদা দাহিকা। রামকৃষ্ণ জল, সারদা শীতলতা। রামকৃষ্ণ ব্রহ্ম, সারদা কালী।

রাখালের বালিকা-বউকে নিয়ে এসেছে মনোমোহনের মা। মনোমোহনের মা মানে রাখালের শাশুড়ী। রাখালের শ্বশুরবাড়ি রামকৃষ্ণের ভক্ত-পরিবার। কিন্তু তাই বলে রাখালের বউকে নিয়ে আসার মানে কি? রামকৃষ্ণের বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল। রাখালকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার অভিসন্ধি নয় তো?

না, ব্যস্ত কি, রাখালই ফিরে-ফিরে যাবে সংসারে। তার ভোগের এখনো একটু বাকি আছে।

কিন্তু স্ত্রীর সংস্পর্শে রাখালের ঈশ্বরভক্তির হানি হবে না তো?

আয় তো মা, আয় তো এদিকে, তোকে একবারটি দেখি।

বিশ্বেশ্বরী এগিয়ে এল রামকৃষ্ণের কাছে। রামকৃষ্ণ তাকে দেখতে লাগল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। সুলক্ষণা, সুভূষণা মেয়ে।

সর্বঅঙ্গে দেবীশক্তি। ভয় নেই এতটুকু, স্বামীর ইষ্টপথে বিঘ্ন হবে না।

বললে, 'নবতে যাও, তোমার শাশুড়ীকে প্রণাম করে এস।'

সারদাকে নবতে বলে পাঠাল রামকৃষ্ণ: 'টাকা দিয়ে যেন পুত্রবধূর মুখ দেখো।'

সিঁতিতে বেণী পালের বাগানে রাখালকে সঙ্গে করে বেড়াতে গিয়েছে রামকৃষ্ণ। কথা আছে, রাতটা থাকবে সেখানে।

সন্ধ্যের পর বাগানে একা-একা বেড়াচ্ছে রামকৃষ্ণ। সেখানে কতগুলো ভূতের সঙ্গে দেখা।

'তুমি এখানে এসেছ কেন?' ভূতগুলো কাতরাতে লাগল: 'তোমার হাওয়া আমাদের সহ্য হচ্ছে না। আমরা জ্বলে গেলুম, জ্বলে গেলুম। তুমি চলে যাও এখান থেকে।'

খাওয়া-দাওয়ার পরেই গাড়ি আনতে বললে রামকৃষ্ণ।

সে কি কথা, আপনি না রাত্রে এখানে থাকবেন বলেছিলেন?

তা থাকা হল না। শুধু জীবিতের নয়, মৃতেরও আতি আছে।

'কিন্তু এত রাতে গাড়ি পাব কোথায়?'

'তা পাবে, দেখ গে।'

গাড়ি পাওয়া গেল সহজেই। সেই রাতেই ফিরে এল দক্ষিণেশ্বর।

জাগ-প্রদীপটির মতই জেগে আছে সারদা। গাড়ির শব্দ পেয়ে চমকে উঠল।

boiRboi.net

কান পেতে শুনল রাখালের সঙ্গে কি কথা বলছে রামকৃষ্ণ। ওমা, কি হবে, যদি না খেয়ে এসে থাকেন, কি খেতে দেব এত রাতে? অন্য দিন কিছু না কিছু ঘরে থাকে, অন্তত একটু সুজি। কখন কি খেয়ালে খেতে চেয়ে বসেন ঠিক কি। কিন্তু আজ কী হবে? যদি বলেন, খিদে পেয়েছে?

রাত একটা, মন্দিরের ফটক বন্ধ হয়ে গেছে কখন। কি করে কে জানে ফটক খুলিয়ে নিল রামকৃষ্ণ। হাততালি দিয়ে ঠাকুর-দেবতার নাম করতে-করতে এগুতে লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে তালি দিয়ে-দিয়ে রাখালও নাম করছে।

ঝি যদুর মাকে তোলাল সারদা। ও যদুর মা, কি হবে, উনি যে ফিরে এলেন! যদি বলেন, খাইনি কিছু, খেতে দাও?

মনের আকুলতাটি বুঝতে পেরেছে মনোহারী। নিজের ঘর থেকেই ডেকে বললে, 'তোমরা ভেবো না গো, আমরা খেয়ে এসেছি।'

পরদিন সকালে রাখালকে বললে সেই ভূতের গল্প।

'ও বাবা, ভাগ্যিস তখন বলোনি সেই রাত্তির বেলা, তাহলে আমার দাঁত-কপাটি লেগে যেত। শুনে এখনি বুক কাঁপছে—'

স্ত্রী-ভক্তদের কাছে সেই গল্পটাই সেদিন বলছেন শ্রীমা, আর রাখালের ভয়ের কথা ভেবে হাসছেন মৃদু-মৃদু। 'ভূতগুলো তো বড় বোকা।' বললে একজন স্ত্রী-ভক্ত।

'ঠাকুরের কাছে কোথায় মুক্তি চাইবে, তা নয়, চলে যেতে বললে।'

'ঠাকুরের যখন একবার দর্শন পেলে তখন মুক্তির আর বাকি রইল কি মা!' শ্রীমা'র চোখ দুটি প্রসন্নতায় ভরে উঠল: 'জানো না বুঝি আমার নরেনের কাণ্ড? সেবার মাদ্রাজে গিয়ে ভূতের পিণ্ড দিলে। পিণ্ড দিয়ে মুক্ত করে দিলে প্রেতাত্মাদের।'

কলকাতার রাস্তায় লাটুর সঙ্গে নরেনের দেখা।

'তোদের ওখানকার খবর কি?' জিগ্যেস করলে নরেন।

'কাল উখানে কত উৎসব হল, আপুনি যান নাই কেন? হামার সঙ্গে আজ উখানে চলুন।'

'আমার বয়ে গেছে! সামনে একজামিন। এখন এক পাগলা বামুনের সঙ্গে বসে আড্ডা দেবার আমার সময় নেই।'

'পাগলা বামুন!' হতবুদ্ধির মত তাকিয়ে রইল লাটু। 'পাগলা বামুন আপুনি কাকে বলছেন?'

'আর কাকে! কোমরে কাপড় থাকে না, হাত-পা তেউরে যায়, নাম শুনলেই ধেই-ধেই করে নাচে, মান-ইজ্জত নেই, যেখানে-সেখানে খালি গায়ে যাওয়া-আসা করে! তার পর আবার ভেলকি দেখানো আছে—'

'ভেলকি !'

তা ছাড়া আবার কি! সেই গান আছে না? নিতাই কি ভেলকি জানে, নিতাই কি যাদু জানে! শুকনো কাঠে ফল ধরালো, ফুল ফোটালো পাষাণে!

হ্যাঁ রে, রাখাল ওখানে যায়?'

'যায় বই কি। শুধু যায় না, কখুনো দু-তিন রাত্তির থেকেও যায়। ঠাকুর তাকে ছেলে বলেন। মাকে বললেন, এই নাও গো তোমার ছেলে এসেছে।'

'রাখালকে তাঁর ছেলে বললেন?'

'সাচ বলছি, তাই শুনেছি।'

রাখাল যদি ঠাকুরের ছেলে, নরেন শ্রীমা'র।

'মা, এই একশো আট বিল্বপত্র ঠাকুরকে আহুতি দিয়ে এলুম, যাতে মঠের জমি হয়। তা কর্ম কখনো বিফলে যাবে না। ও হবেই এক দিন।' নরেনের কণ্ঠে ব্রজের ঘোষণা।

তার পর মঠের জমি কেনা হলে চতুঃসীমা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখাল শ্রীমাকে। বললে, 'মা, তুমি তোমার আপন জায়গায় আপন মনে হাঁপ ছেড়ে বেড়াও।'

একদিন খুব ব্যস্ত-ত্রস্ত হয়ে এসেছে নরেন। বললে, 'মা আমার আজকাল সব উড়ে যাচ্ছে। সবই দেখছি উড়ে যায়।'

শ্রীমা হাসলেন। বললেন, 'দেখো, আমাকে কিন্তু উড়িয়ে দিও না।'

নরেন বললে, 'মা, তোমাকে উড়িয়ে দিলে থাকি কোথায়? যে জ্ঞানে গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দেয় সে তো অজ্ঞান। গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দিলে জ্ঞান দাঁড়ায় কোথায়?'

কৃষ্ণ নাম বিষ্ণু নাম দু-অক্ষর হলেও কঠিন। বানানেও কঠিন, উচ্চারণেও কঠিন। শিব বলতে তিনটে 'স'-এর মধ্যে একটাকে বাছতে হয়। তার চেয়ে হরি আর রাম সোজা। বর্ণপরিচয়ের সময় যখন জল-খল অজ-আম শিখেছিলি সে সময়েই শেখা যেত হরি নাম। তেমনি সরল, শিশুবোধ্য। কিন্তু তা-ও দু-অক্ষর। তোকে একাক্ষর মন্ত্র দিচ্ছি। সব চেয়ে কম, সব চেয়ে ছোট, সব চেয়ে সোজা—সেই একাক্ষর। ওঁ নয়, হ্রীং-ক্লীং নয়। একেবারে জলের মত তরল, শিশিরের মত ঠাণ্ডা। সেই শব্দটি শিখেছিস সকলের আগে, ভূঁয়ে পড়ে মাটি পাবার সঙ্গে-সঙ্গেই। কান্নার স্বর, আনন্দের স্বর, আর্তির স্বর, আকুলতার স্বর। সেই একাক্ষর মন্ত্রটির নাম হচ্ছে মা। মা আমার জগৎ জুড়ে। আর আমিও তো জগৎ ছাড়া নই। তাহলেই তো মা আমাকে ধরে আছেন, ঘিরে আছেন। তাহলে আর আমার ভয় কি।

মা-ই আমার অভয় মন্ত্র।

॥ ৭০ ॥

সুরেশ মিত্তির 'কারণ' করে জপ করে। তার পর ছাদের পাঁচিলের পাশে বসে নিচু গলায় শ্যামার গান গায়। আস্তে-আস্তে গলা চড়তে থাকে। ক্রমে-ক্রমে সে-গলা কান্নায় গলে পড়ে।

আর সে কী কান্না! আর্তনাদের মত কানে লাগে। আশে-পাশের বাড়িগুলি সচকিত হয়ে ওঠে।

'সুরেশ মিত্তির মদ খায়।' এক দিন রাম দত্ত এসে নালিশ করল রামকৃষ্ণের কাছে। 'ওকে বারণ করুন।'

'তাতে তোর কি?' রামকৃষ্ণ ঝলসে উঠল: 'ওর ধাত আলাদা, ও নিজের পথে যাবে। তাতে তোর কী মাথাব্যথা?'

'কারণ' করে কোনো দিন যদি আনন্দে পায় সুরেশকে, তখন আর কথা নেই, সর্বক্ষণ তার মুখে শুধু রামকৃষ্ণের কথা।

'তুই কত্তামো করিস নে।' রাম দত্তকে বললে এক দিন সুরেশ। 'চল্ প্রভুর কাছে যাই। তিনি যেমন আদেশ করেন তেমনি করব।'

নবতখানার পাশে বকুলতলায় দাঁড়িয়ে আছে রামকৃষ্ণ। প্রণাম করে দাঁড়াল দুজনে। মনোবাসী টের পেয়েছে মনের কথা। বললে, 'ও সুরেন্দর, মদ খাবি তো খা না। কিন্তু দেখিস পা যেন না টলে, মা'র পাদপদ্ম হতে মন যেন না টলে।'

এখানেও আশ্বাস, এখানেও প্রশ্রয়! মন যদি মুক্ত থাকে, পায়ের বন্ধনে কি এসে যাবে!

জানিস না সেই দুই বন্ধুর গল্প? দুই বন্ধু—এক জন গেল বেশ্যালয়ে, আরেক জন গেল ভাগবৎ শুনতে। প্রথম জন ভাবছে, ধিক আমাকে! বন্ধু হরিকথা শুনছে, আর আমি এ কোথায় পড়ে আছি! দ্বিতীয় জন ভাবছে, ধিক আমাকে! বন্ধু কেমন ফুর্তি করছে, আর আমি শালা কী বেকুব! দুজনেই মলো। প্রথম জনকে বিষ্ণুদূতে নিয়ে গেল—বৈকুণ্ঠে। দ্বিতীয় জনকে নিয়ে গেল যমদূতে—নরকে। শুধু মন নিয়ে কথা। মনেতেই বদ্ধ মনেতেই মুক্ত। মনেতেই শুদ্ধ মনেতেই অশুদ্ধ। মন ধোপাঘরের কাপড়। লালে ছোপাও লাল। নীলে ছোপাও নীল। গেরুয়ায় ছোপাও গেরুয়া। যে রঙে ছোপাও সেই রঙে ছুপবে।

'ওরে মদে বিষও আছে মধুও আছে।' সুরেশ মিত্তিরকে বললে রামকৃষ্ণ। 'মদ খাস কেন? ঐ মধুর জন্যেই তো? কিন্তু ঐ বিষ তুই ধারণ করতে পারবি?

না, তুই চাস তাই ধারণ করতে?'

সুরেশ মিত্তির চুপ।

'শোন, মদ খাবার আগে ঐ বিষটুকু তুই মাকে নিবেদন করে দে। বল, মা তুমি এর বিষটুকু খাও আর সুধাটুকু আমাকে দাও।'

তাই ভালো। ঝামেলা গেল! মা-ই বিষ খাক। আমার সুধাপানের কথা, সুধাই খাব পুরোপুরি।

খাবার আগে মদের গ্লাশ মাকে নিবেদন করে দেয় সুরেশ। বলে, বিষটুকু টেনে নে মা, সুধাটুকু আমার জন্যে রেখে যা। বলে গান ধরে মুক্তকণ্ঠে:

জয় কালী জয় কালী বলো,
লোকে বলে বলবে পাগল হলো:
ভালো মন্দ দুটা কথা
ভালোটা না করাই ভালো।

কিন্তু সন্তান হয়ে মাকে কত দিন সে বিষ দিতে পারবে হাতে ধরে? সুরেশের মনে খটকা লাগল। ঠাকুর তাকে ধোঁকায় ফেলেছেন। নিজে মধুটুকু খেয়ে মাকে কি ছেলে বিষ দিতে পারে? কতটুকু পারে? কত দিন পারে? মদের গ্লাশ নামিয়ে রাখলে সুরেশ।

অচলানন্দ এসে রামকৃষ্ণকে বলে, একটু কারণ খাও।

সে সব কী দিনই গেছে! যে দলের সাধকই হও না কেন আমাকে দেখাও তোমার ঈশ্বরসাধন। তোমার রীত-নীত। তোমার আকার-প্রকার। আমি শুধু দেখব আর আনন্দ করব। কত রকম ভোগ্য, কত রকম ভজনা!

মথুরবাবুকে বললে, 'সব সাজপাট যোগাড় করে দাও।'

ভাণ্ডারী মথুর কাণ্ডারী হল। বললে, 'সব যোগাড় করে দিচ্ছি। কার কি লাগবে বলো। তোমার যাকে যা খুশি তাই দিয়ে দাও স্বচ্ছন্দে।'

সাধুদের জন্যে শুধু চাল ডাল ঘি আটা নয়—যোগাড় হল কম্বল-আসন-লোটা-কমণ্ডলু—যার যা নেশার সরঞ্জাম। সিদ্ধি গাঁজা কারণ চরস। আদা পেঁয়াজ মুড়ি কড়াই-ভাজা।

তান্ত্রিক অচলানন্দের দারুণ জেদ। বলে, কারণ খেতেই হবে তোমাকে।

রামকৃষ্ণকে চক্রে নিয়ে বসে। কখনো বা চক্রেশ্বর সাজায়। বলে, 'খাও না একটু কারণ।' রামকৃষ্ণ বলে, 'ওগো, আমার নাম করলেই নেশা হয়ে যায়।'

আমার নেশা জিভে মেশা। বাইরের কোনো পৃথক বস্তুর দরকার হয় না। যেমনি একটু নাম করব অমনি সমস্ত সত্তা পীযূষে স্নান করে উঠবে। আমার

হচ্ছে নাম-সুধার নেশা।

অচলানন্দ ছেড়ে দিল। শেষকালে শুধু বললে, 'চক্রে বসলে কারণ গ্রহণ করতে হয়—নইলে সাধনার অঙ্গহানি ঘটে।'

রামকৃষ্ণ তখন কারণ নিয়ে কপালে ফোঁটা কাটে বা ঘ্রাণ নেয়। বড় জোর আঙুলে করে ছিটে দেয় মুখের উপর। পাত্রে-পাত্রে ঢেলে সবাইকে পরিবেশন করে।

একেক দিন ভীষণ তর্জন করে অচলানন্দ। বলে, 'স্ত্রীলোক নিয়ে বীরভাবে সাধন তুমি কেন মানবে না? শিবের কলম মানবে না? তন্ত্র লিখে গেছেন শিব, তাতে সব ভাবের সাধন আছে। বীরভাবের সাধনও বাদ পড়েনি—'

'কে জানে বাপু' রামকৃষ্ণের মুখে সরল সমর্থন: 'আমার শুধু সন্তানভাব।'

মধু রায়ের গলিতে গাড়ি ঢোকে না, দাঁড়ায় পুবের বা পশ্চিমের বড় রাস্তায়। সভা-শেষে হেঁটে চলেছে রামকৃষ্ণ—গলিটুকু পেরিয়েই গাড়িতে গিয়ে উঠবে। কিন্তু ঈশ্বরানন্দে এমনি মাতোয়ারা হয়ে আছে, মেপেমেপে পা ফেলতে পারছে না। টলমল করছে, এখানকার পা ওখানে গিয়ে পড়ছে—

রাখাল বুঝি এখন সঙ্গে নেই। তার কাজই হচ্ছে ঈশ্বরবিভোর রামকৃষ্ণকে ধরে-ধরে ঠিকমতো পথ দেখানো। এইখানে সিঁড়ি, এইখানে উঁচু, এইখানে গর্ত, এমনি বলে-বলে নিজের জায়গায় টেনে নিয়ে যাওয়া: যখন রাখাল না থাকে তখন বাবুরাম আছে।

ভক্তরা দুদিক থেকে ধরে রামকৃষ্ণকে নিয়ে যাচ্ছে গাড়ির দিকে। আস্তে-আস্তে নিয়ে যাচ্ছে। রামকৃষ্ণ টলছে, হেলছে-দুলছে, পা রাখতে পারছে না স্থির হয়ে। গলির মোড়ে দাঁড়িয়েছিল কারা। বলে উঠল, 'কী দারুণ টেনেছে হে!' 'বাবাঃ একেই বলে পাঁড় মাতাল! একেবারে বেহুঁস।'

লোকে তাই দেখে চর্মচক্ষে। একেই বলে দর্শনেন্দ্রিয়ের প্রমাণ! দড়িকে সাপ দেখে, ছায়াকে ভূত! আবার তেমনি ঈশ্বরসময়কে বলে কি না সুরাপানে জ্ঞানশূন্য।

ওরে সুরাপান করি না আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে। আমার মন-মাতালে মাতাল করে মদ-মাতালে মাতাল বলে।

আহাহা, চেয়ে ছাখ ঈশ্বর যেন ঊর্ণনাভ। মাকড়সা কি করে? নিজের শরীর থেকেই লুতাতন্তু সৃষ্টি করে নিজের আনন্দে জাল বোনে। আবার সেই জালের আশ্রয়েই নিজের আনন্দে বাস করে। তেমনি আমাদের ঈশ্বর। সমস্ত জগতের উপাদান তিনি, তিনিই আবার সমস্ত জগতের উপলক্ষ্য। আবার এই জগতের

মধ্যেই তাঁর বাসা। এই জগৎই আবার তাঁর লীলাগৃহ।

রামকৃষ্ণ গেছে কালীঘরে ভবতারিণীকে দর্শন করতে। সারদা তার ঘরখানি ঝাঁটপাট দিয়ে রাখছে। পেতে রাখছে বিছানা। তার পর পান সাজতে বসেছে এক কোণে।

ঘরের কাজ চট্‌পট সেরে চুপিচুপি বেরিয়ে যাবে সারদা, দরজার মুখে রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা।

কিন্তু এ তাঁর কী চেহারা! যেন পুরোদস্তুর মাতাল! চোখ দুটো লাল, এখানকার পা ওখানে পড়ছে, কথা এড়িয়ে গেছে, কী সব যেন বলছেন জড়িয়ে-জড়িয়ে।

ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে কিনা এক মুহূর্ত ভাবল সারদা।

এক মুহূর্ত।

মাতালের মত সারদার গা ঠেলে দিল রামকৃষ্ণ। বললে, 'ওগো, আমি কি মদ খেয়েছি?'

সারদা আনন্দের লহর দিয়ে উঠল। বললে, 'না, না, মদ খাবে কেন?'

'তবে কেন এমনি টলছি? তবে কেন কথা কইতে পাচ্ছি না? আমি কি মাতাল?'

সারদা একবার দেখল বুঝি পরিপূর্ণ চোখে। বললে, 'না, না, তুমি মদ কেন খাবে? তুমি মা-কালীর ভাবামৃত খেয়েছ।'

॥ ৭১ ॥

'তোদের বংশের কেউ সন্নেসী হয়েছে?' নতুন কোনো ছাত্র ইস্কুলে ভর্তি হতে এলেই নরেনের এই প্রথম জিজ্ঞাসা: 'ধন-মান স্ত্রী-পুত্র ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে বিবাগী হয়ে?'

মেট্রোপলিটান ইস্কুলের সব চেয়ে নিচু ক্লাশের ছাত্র। মাত্র সাত বছর বয়স। নতুন ছাত্র অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। রাজারাজড়ার খবর নয়, কে কবে কোথায় ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে পথে বেরিয়েছে, এ নিয়ে এত জাঁক। সন্নেসী হওয়া মানে যেন কত বড় এক দিকপাল হওয়া।

জান্তা ছেলেরা কেউ-কেউ টিপ্পনি কাটে। তোর বাবা তো মস্ত এটর্নি, আছিস সবাই রাজার হালে, সুখের পায়রা সেজে। তোদের বংশে আবার সন্নেসী!

'ছাই জানিস।' গর্জে ওঠে নরেন: 'আমার ঠাকুরদা দুর্গাচরণ দত্ত সন্নেসী হয়েছিলেন—'

মাত্র পঁচিশ বছর বয়স, স্ত্রী ও তিন বছরের শিশুপুত্র বিশ্বনাথকে ত্যাগ করে দুর্গাচরণ চলে গেলেন প্রব্রজ্যা নিয়ে।

বিশ্বনাথ তখন আট বছরের, তাকে নিয়ে তার মা কাশী চললেন। উদ্দেশ্য বিশ্বনাথ-দর্শন। নৌকোয় যেতে দেড় মাস লাগল। যিনি স্বামী হয়ে ত্যাগ করেছেন ও পুত্র হয়ে পূর্ণ করেছেন তাঁকে একবার দেখে আসবেন স্বচক্ষে।

বৃষ্টি হয়ে বিশ্বনাথের মন্দিরের সমুখটা পিছল হয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পড়ে গেলেন। 'মাগি গির গিয়া—' বলে এক সাধু ছুটে এসে তাঁকে তুলে ধরল। কে এ সন্নেসী? সিঁড়িতে সযত্নে শুইয়ে দিতে যাবে চোখে চোখে চকিত সংস্পর্শ হয়ে গেল! এ যে দুর্গাচরণ!

'মায়া হ্যায়, এ মায়া হ্যায়—' বলে উঠল সন্নেসী। দ্রুত পায়ে অন্তর্ধান করলে। সেই সন্নেসীরই নাতি নরেন্দ্রনাথ।

বলে, 'এই, দেখি, তোর হাত দেখি।'

যেন কতই পণ্ডিত, এমনি ভাবে সহপাঠীদের হাত দেখে। বলে, 'ছাই, কিচ্ছু নেই। তোর কিচ্ছু হবে না—সন্নেসী হওয়া নেই তোর অদৃষ্টে।'

সন্ন্যাসী হওয়া মানে নরপতি হওয়া। আর, নরপতির আর এক নামই নরেন্দ্র। 'এই ছাখ, আমার হাতে কত বড় চিহ্ন। আমি নিঘ্‌ঘাত সন্নেসী হব।'

এ যেন প্রায় বিলেত যাওয়ার মত। আর সব ছেলেরা আবিষ্টের মতন চেয়ে থাকে।

সন্নেসী হবার কি মজা, তাই তখন সবাইকে গল্প করে। তোরা কিছুই জানিস নে, বড়-বড় সাধুরা সব হিমালয়ে থাকে, গভীর জঙ্গলের মধ্যে। কৈলাস পাহাড়ের উপর রোজ মহাদেবের সঙ্গে তাদের দেখা হয়। যদি সন্নেসী হতে চাস, তবে প্রথমে যেতে হবে সেই জঙ্গলে, সাধুদের পায়ে মাথা খুঁড়তে হবে। যদি তাঁদের দয়া হয়, যদি তাঁদের পরীক্ষায় পাশ করতে পারিস, তবেই চেলা বনতে পারবি, পরতে পারবি গেরুয়া।

কিসের পরীক্ষা? কেমনতরো পরীক্ষা?

পরীক্ষা খুব কঠিন। প্রত্যেককে একখানা করে বাঁশ দেবে। আর, সেই একখানা বাঁশের উপর শুয়ে ঘুমুতে হবে সারা রাত। পড়ে গেলেই ফেল। যদি না পড়ে রাত কাটাতে পারিস তবেই সন্নেসী। তারপরেই একদিন কৈলাসে শিবদর্শন। মা ভুবনেশ্বরী প্রত্যহ শিবপূজা করেন। চার-চারটি মেয়ে, দুটি আবার গত হয়েছে, একটিও ছেলে নেই। বীরেশ্বর শিব কি তাঁর মনের ইচ্ছাটি পূর্ণ করবেন না? ইচ্ছা হয়ে যিনি মনের মধ্যে ছিলেন। তিনিই আবির্ভূত হলেন। অপূর্ব স্বপ্ন

দেখলেন ভুবনেশ্বরী। যেন যোগীশ্বর শিব যোগনিদ্রা ছেড়ে পুত্ররূপে তাঁর দুয়ারে দাঁড়িয়ে।

বারো শো উনসত্তর সালের পৌষসংক্রান্তির দিন বিশ্বনাথের ছেলে হল। মা নাম রাখলেন বীরেশ্বর: সেই থেকে দাঁড়াল 'বিলে'।

এ তো হল ডাক-নাম। ভালো নামের তলব পড়ল অন্নপ্রাশনের সময়।

নাম দাও নরেন্দ্র। নরের মধ্যে যে ইন্দ্র, তার নাম আবার কী হবে? এ হচ্ছে নরেশ্বর, নরোত্তম। এ হচ্ছে নরসিংহ।

দুর্দান্ত ছেলে। অষ্টপ্রহর তার সঙ্গে-সঙ্গে ঘোরবার জন্যে দু-দুটো ঝি রেখে দিয়েছে বিশ্বনাথ। যদি একবার রাগ হয় জিনিসপত্র সব ভেঙে-চুরে ছারখার করে দেবে। তাকে শান্ত করা তখন এক বিষম সমস্যা। কিন্তু অভিনব এক উপায় বের করেছেন ভুবনেশ্বরী! 'শিব' বলে মাথায় একটু জল ছিটিয়ে দিলেই নিশ্চিন্ত। ক্ষুদমন্তরে ঠাণ্ডা।

এক টুকরো গেরুয়া কাপড় কৌপীনের মত করে পরেছে নরেন।

'এ কি?' চমকে উঠলেন ভুবনেশ্বরী।

'আমি শিব হয়েছি।'

চোখ বুজে ধ্যান করলেই মাথায় জটা গজায়, আর সেই জটা বটের শেকড়ের মত মাটির ভেতরে গিয়ে সেঁধোয়। এমনি চমৎকার একটা কাহিনী কে বলেছে নরেনকে। তাই সে শিরদাঁড়া টান করে চোখ বুজে বসে খানিকক্ষণ আর থেকে-থেকে চোখ মেলে দেখে, জটা কত দূর নামল পিঠ বেয়ে।

'মা, এত ধ্যান করছি, জটা হচ্ছে কই?'

মা বললেন, 'জটা হয়ে কাজ নেই।'

বাবা জিগগেস করেন, 'বড় হয়ে কি হবি রে বিলে?'

নির্বিতর্ক উত্তর নরেনের: 'কোচোয়ান হব।'

চাবুক মেরে ঘোড়া ছুটিয়ে গাড়ি চালাব। চেতনার চাবুক। কর্ম আর ধর্ম দুই ঘোড়া। আর, জাড্য আর তামসিকতার গাড়ি।

'ত্যাগী না হলে তেজ হবে না।' ব্রহ্মানন্দকে লিখছে বিবেকানন্দ: 'আমরা অনন্তবলশালী আত্মা—দেখ দিকি কি বল বেরোয়। কিসের দীনা-হীনা? আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা। কিসের রোগ, কিসের ভয়, কিসের অভাব? দীনা-হীনা ভাবকে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় করো দিকি।...বীর্যমসি বীর্যং, বলমসি বলম্, ওজোঽসি ওজঃ, সহোঽসি সহো, ময়ি ধেহী। তুমি বীর্যস্বরূপ, আমাকে বীর্যবান করো। তুমি বলস্বরূপ, আমাকে বলবান করো: তুমি ওজঃস্বরূপ,

আমাকে ওজস্বী করো। তুমি সহ্যশক্তি, আমাকে সহনশীল করো। রোজ ঠাকুর পুজোর সময় যে আসন প্রতিষ্ঠা—আত্মানং অচ্ছিদ্রং ভাবয়েৎ—আত্মাকে অচ্ছিদ্র ভাবনা করবে—ওর মানে কি? ওর মানে, আমার ভেতরেই সব আছে—আমার ইচ্ছা হলেই সমস্ত প্রকাশিত হবে।'

ইচ্ছাটিকে চাবুক করে মারো তোমার গতিহীন জড়ত্বের স্থূল পিণ্ডে। বেগবান ঘোড়া ছুটিয়ে দাও। রজোগুণের ঘোড়া।

আস্তাবলের সহিসের সঙ্গে ভাব করল নরেন। কিন্তু বিয়ে করে সহিসের বড় কষ্ট। বিয়ের মত ঝকমারি আর কিছু নেই। সারা জীবন সে ঝকমারির মাশুল যোগাতেই প্রাণান্ত। বালক নরেনের কানে মন্ত্র দিলে সহিস। আর, নরেনের কাছে সহিসই সর্বজ্ঞ।

মনের মধ্যে ধাক্কা খেল আচম্‌কা। এ বলে কী! যে রামসীতাকে নরেন এত ভক্তি করে তারা যে বিয়ে করেছে! রামসীতার ভালোবাসার কত গল্প শুনেছে সে মা'র কাছে! তবে সহিস যখন বলছে, বিয়ে খারাপ, তখন রামসীতাকে কি করে আর ভক্তি করা যায়? রামসীতার দুঃখে কাঁদতে লাগল নরেন। মা কাছে আসতে তাঁর বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে আরো ফুঁপিয়ে উঠল। মা বললেন, 'তাতে কি! তুই শিবপুজো কর।'

বুকটা হালকা হয়ে গেল। ছাদের ঘরে উঠে রামসীতার মূর্তি সে তুলে নিয়ে এল। ছুঁড়ে ফেলে দিল রাস্তায়। রামসীতার আসনে বসাল শিবমূর্তি।

শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশ চন্দ্রশেখর। আদিমধ্যান্তশূন্য শ্বেতশিখা।

নরেন নিজে কী!

'ও হচ্ছে পাতালফোঁড়া শিব। ও বসানো শিব নয়।' বললেন ঠাকুর: 'কারু পদ্ম দশদল, কারু ষোড়শদল, কারু বা শতদল। কিন্তু পদ্ম মধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল।' আর নরেন্দ্র কী বলছে?

'দাদা, না হয় রামকৃষ্ণ পরমহংস একটা মিছে বস্তুই ছিল, না হয় তাঁর আশ্রিত হওয়া একটা বড় ভুল কর্মই হয়েছে, কিন্তু এখন উপায় কি? একটা জন্ম নয় বাজেই গেল, মরদের বাত কি ফেরে? দশ স্বামী কি হয়? তোমরা যে যার দলে যাও, আমার কোনো আপত্তি নেই, কিছুমাত্রও নেই, তবে এ দুনিয়া ঘুরে দেখেছি যে, তাঁর ঘর ছাড়া আর সকল ঘরেই "ভাবের ঘরে চুরি"। তাঁর জনের উপর আমার একান্ত ভালোবাসা, একান্ত বিশ্বাস। কি করব? একঘেয়ে বলো বলবে, কিন্তু ঐটি আমার আসল কথা। যে তাঁকে আত্মসমর্পণ করেছে, তার

পায়ে কাঁটা বিঁধলে আমার হাড়ে লাগে।…তাঁর দোহাই ছাড়া কার দোহাই দেব? আসছে জন্মে না হয় বড় গুরু দেখা যাবে, এ জন্ম এ শরীর সেই মূর্খ বামুন কিনে নিয়েছে।'

জাত কাকে বলে—বালক নরেন বড় ফাঁপরে পড়ছে। জাত না মানলে কী হয়? ছাদ-দেয়াল কি ভেঙে পড়ে? জাত যে যায়, কি করে যায়, কোন পথে? ও কি টাকা-কড়ি যে চুরি যায়? না, জামা-কাপড় ছিঁড়ে যায়? একবার দেখলে হয় পরীক্ষা করে।

নানারকম মক্কেল আসে বিশ্বনাথের বৈঠকখানায়। জাত মেনে আলাদা-আলাদা হুঁকো। বৈঠকের উপর সার-সার বসানো। এটা শুদ্দুর এটা বামুন এটা মুসলমান। মুসলমানের হুঁকোতেই আগে টান দিল নরেন।

'ও কি হচ্ছে রে?' বাবা কখন হঠাৎ এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে।

'দেখছি কোনখান দিয়ে জাত যায়? যাকে ছোট করে রেখেছি তাকে ছুঁলে কী হয়?'

কী হয়? সে হাতে হাত দিয়ে পাশে এসে দাঁড়ায়। জাতটা নিমেষে বড় হয়ে ওঠে। দেশ দুশো কদম এগিয়ে যায়।

'বলি, শশীবাবুকে মালাবারে যেতে বোলো।' রাখালকে চিঠি লিখছে নরেন, 'সেখানকার রাজা সমস্ত প্রজার জমি ছিনিয়ে নিয়ে ব্রাহ্মণগণের চরণার্পণ করেছেন, গ্রামে-গ্রামে বড়-বড় মঠ, চর্বচোষ্য খানা, আবার নগদ।…ভোগের সময় ব্রাহ্মণেতর জাতের স্পর্শে দোষ নেই—ভোগ সাঙ্গ হলেই শ্লান।…পয়সা নেবে, সর্বনাশ করবে, আবার বলে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না। আর কাজ তো ভারি—আলুতে-বেগুনে যদি ঠোকাঠুকি হয়, তা হলে কতক্ষণে ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাবে! …মহা দঁক সামনে—সাবধান, ঐ দঁকে সকলে পড়ে মারা যাবে—ঐ দঁক হচ্ছে যে হিঁদুর ধর্ম বেদে নাই, পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই, মুক্তিতে নাই—ধর্ম ঢুকেছেন ভাতের হাঁড়িতে। হিন্দুর ধর্ম বিচারমার্গেও নয়, জ্ঞানমার্গেও নয়, ছুঁৎমার্গে। আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না। এই ঘোর বামাচার ছুঁৎমার্গে পড়ে প্রাণ খুইও না। "আত্মবৎ সর্বভূতেষু" কি পুঁথিতে থাকবে নাকি? যারা এক টুকরা রুটি গরিবের মুখে দিতে পারে না তারা আবার মুক্তি কি দিবে!'

'নরেন্দ্র সভায় থাকলে আমার বল।' বললেন তাই ঠাকুর: 'ও বড় ফুটোওলা বাঁশ। খুব আধার—অনেক জিনিস ধরে।'

তৃণগুল্মের দেশে মাঝে-মাঝে বিস্ময়কর বনস্পতির দেখা মেলে। নরেন্দ্রনাথ বনস্পতির দেশে দেবতাত্মা নগাধিরাজ।

আর সেই যে হিমালয় তার ঊর্ধ্বে বিরাজিত যে মানস-সরোবর—নিবাত-নিষ্কম্প নীলকান্ত প্রশান্ত অমৃত-হ্রদ, তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ।

॥ ৭২ ॥

ছ'টি সৈন্য সঙ্গে নিয়ে পথ চলে নরেন। তারা হচ্ছে—কি আর কে, কবে আর কোথায়, কেন আর কেমন করে? সব সঙ্গিন-ওঁচানো সান্ত্রী।

কেউ একটা কিছু বলবে আর তখুনি ঘাড় কাৎ করে মেনে নেবে এমনটি কখনো হবার নয়। যদি থাকে তো দেখাও। বেশ তো, কোথায়? চলো আমার সঙ্গে। কেন ঈশ্বরকে ডাকবো? কেন মানবো তোমাকে? তুমি কে? ঈশ্বরই বা কি? যদি উঠবোই উপরে, কেমন করে উঠবো?

শিব চাঁপাফুল ভালোবাসে। তাই নরেনও ভালোবাসে চাঁপাফুল।

পাড়ার কোন এক ছেলের বাড়িতে চাঁপা গাছ আছে, যখন-তখন তার ডালে বসে দোল খায় নরেন। গাছ তো ভাঙবেই, ডানপিটে ছেলেটাও জখম হবে।

'ও গাছটায় উঠো না।' বাড়ির বুড়ো মালিক ভারিক্কি গলায় বারণ করলে।

'কি হয় উঠলে?'

প্রশ্ন শুনে মালিক চমকে উঠল। ভাবলে শান্ত কথায় হবে না, ভয় দেখাতে হবে। বললে, 'ও গাছে ব্রহ্মদত্যি থাকে।'

'কি রকম দেখতে ব্রহ্মদত্যি?'

'ওরে বাবাঃ, ভয়ঙ্কর দেখতে। নিশুতি রাতে শাদা চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়ায়।'

'ঘুরে বেড়াক না।' নরেনের মুখে নিটোল নির্লিপ্তি: 'তাতে আমার কি!'

'তোমার কি মানে? যারা ঐ গাছে চড়ে তাদের সে ঘাড় মটকে দেয়।'

রাত করে চুপি-চুপি চলে এসেছে নরেন। বড় ইচ্ছে শাদা চাদর-পরা ব্রহ্ম-দৈত্যর সঙ্গে দেখা হয়। সহপাঠী ছেলে বাধা দিতে এল নরেনকে। বললে, 'না ভাই, অমন কাজ করিস নে। নিঘ্‌ঘাত তবে তোর ঘাড় মটকাবে।'

নরেন হেসে উঠল উচ্চরোলে। 'লোকে একটা কিছু বললেই বিশ্বাস করতে হবে? পরীক্ষা করে দেখব না নিজে?' বলেই সে গাছের ডালে চড়ে বসল। নিজেই যাচাই করে দেখব। যাচাই করে দেখব বুদ্ধির কষ্টিপাথরে যুক্তির সোনা ঘষে-ঘষে। বইয়ে লেখা আছে বলেই সত্য, ভালোমানুষের মত তা মানতে পারব না। নিজে পরীক্ষা করব। সত্য কি এতই সোজা? বিলেত আছে, এ বললেই হবে? যেতে হবে বিলেতে। পরের মুখে ঝাল খেতে পারব না।

ঝালের প্রমাণ চাই।

'ঈশ্বর মানুষ হয়ে আসেন এ বললেই হবে?' নরেন্দ্র গর্জে উঠল: 'প্রমাণ চাই।'

গিরিশ ঘোষ বললে, 'বিশ্বাসই প্রমাণ। এই জিনিসটা যে এখানে আছে তার প্রমাণ কি? বিশ্বাসই প্রমাণ।'

'আমি ট্রুথ চাই—প্রুফ চাই।' নরেন্দ্র আবার হুঙ্কার ছাড়ল। 'শাস্ত্রই বা বিশ্বাস করি কেমন করে? একেক জন একেক বলছে। যার যা মনে এসেছে তাই—'

ঠাকুর বললেন, 'গীতা সব শাস্ত্রের সার। সন্ন্যেসীর কাছে আর কিছু থাক না থাক, ছোট একখানি গীতা অন্তত থাকবে।'

একজন ভক্ত গদ্‌গদ হয়ে উঠল: 'আহা, গীতা—শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'

'শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, না ইয়ে বলেছেন—' ঝাঁজিয়ে উঠল নরেন।

'হাতি যখন দেখিনি, তখন সে ছুঁচের ভেতর দিয়ে যেতে পারে কিনা কেমন করে জানব?' বললে ভবনাথ। 'ঈশ্বরকে যখন জানি না তখন তিনি মানুষ হয়ে অবতার হতে পারেন কিনা কেমন করে বুঝব বিচার করে?'

নরেন বললে, 'আমি বিচার চাই। ঈশ্বর আছেন, বেশ; কিন্তু তিনি কোথাও ঝুলছেন এ আমি মানতে পারব না।'

'সবই সম্ভব।' বিস্ময়-সুস্মিত মুখে বললেন ঠাকুর, 'তিনি ভেলকি লাগিয়ে দেন। বাজিকর গলার ভেতর ছুরি চালায়, আবার বার করে। ইট-পাটকেল খেয়ে ফেলে।' তবু বাজিকরই সত্য। আর সব ভেলকি।

বাজিকর আর তার বাজি। ভগবান আর তাঁর ঐশ্বর্য। বাবু আর তার বাগান। বাজি দেখে লোকে অবাক, কিন্তু বাজি ক্ষণিকের, এই আছে এই নেই—বাজিকরই সত্য। ঐশ্বর্য দুদিনের, ভগবানই সত্য। বাগান দেখেই ফিরে যেও না, বাগানের মালিক-বাবুর সন্ধান করো।

নরেনের বয়স তখন এগারো, গঙ্গার ঘাটে ইংরেজের মানোয়ারী জাহাজ এসেছে। চল, দেখে আসি।

কিন্তু ঘাটের বড় সাহেবের দস্তখতী ছাড় চাই। ওরে বাবা, গিয়ে কাজ নেই। কে দাঁড়াবে ওই লালমুখো জাঁদরেলের কাছে? কথা কইবে কে? ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে চল্।

সামনের সিঁড়িতে প্রত্যক্ষ বাধা। পিছনের দিকে লোহার আরেকটা সরু সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়েই সটান উঠে গেল নরেন। একবার উঠি তো উপরে, তারপরে ঠিক ধরে ফেলব সাহেবকে। যা ভেবে ছল নরেন। পর্দা-ফেলা ঘরে সাহেব বসে আছে। পর্দা সরিয়ে সটান ঢুকলো নরেন। সাহেব তো অবাক। অবাক যখন

হয়েছে তখন অবাক থেকেই আলগোছে সই করে দাও একটা।

পাশ নিয়ে সামনের সিঁড়ি দিয়েই বুক ফুলিয়ে নেমে এল নরেন। প্রহরী তো অবাক। জিগগেস করলে, 'তুম ক্যায়সে উপরমে গিয়া?'

নরেন শুধু বললে, 'হাম জাতু জানতা।'

বাবার সঙ্গে রায়পুর যাচ্ছে নরেন—নাগপুর পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে, সেখান থেকে গরুর গাড়ি। গরুর গাড়ির রাস্তা প্রায় পনেরো দিন। তাই চলেছে নরেন। চলেছে বিন্ধ্যাচলের গা ঘেঁষে। ঘন অরণ্যের পথ বেয়ে। একখানা গরুর গাড়িতে নরেন একা। অন্য গাড়িতে তার মা আর ছোট ভাইয়েরা।

চার দিকে বিরাটের রূপ। যে দিকে তাকাও সেই দিকেই বিরাট আসন পেতে বসেছেন। বসেছেন পর্বতশৃঙ্গে, বসেছেন গহন অরণ্যানীতে। তা ছাড়া সেই মহা-শিল্পীর সূক্ষ্ম কারুকাজও ছড়িয়ে রয়েছে এখানে-সেখানে। পত্রে-পুষ্পে, কঠিনের গায়ে কোমলের আলিম্পনে। হঠাৎ একটা মৌচাক নরেনের চোখে পড়ল। পাহাড়ের চূড়া থেকে শুরু করে প্রায় মাটি পর্যন্ত দীর্ঘ এক ফাটল জুড়ে বিরাট মৌচাক। কত তিল-তিল পরিশ্রম, কত বিন্দু-বিন্দু মধু—আদি-অন্তের ইয়ত্তা করা যায় না। অনন্তের ভাবে তলিয়ে গেল নরেন।

তাকাও তেমনি একবার ঐ অন্তরীক্ষে। রাত্রির তারকাময় আকাশে। সমুদ্র-তটের বালুকণার মত জ্যোতির কণিকা। একেকটা কণিকা দেদীপ্যমান সূর্যের চেয়ে বড়। এমনি কত যে স্ফুলিঙ্গ, বিজ্ঞানের কোনো ল্যাবরেট্যারিতেই গণনা করা যায়নি। তার মধ্যে এক কণা ধূলির মতো এই পৃথিবী। এ সবের মানে কি! তাও কি সবাই স্থির হয়ে আছে? ছুটেছে দুর্দান্ত বেগে। সে যে কত বড় মহাশূন্য কে তার সীমাসীমান্ত খুঁজে পায়! কেন এই জ্যোতিরিঙ্গন? কেন এই সর্বতশ্চক্ষু আকাশ? রাত্রির পৃষ্ঠায় কিসের ইঙ্গিতটি সে লিখে রেখেছে স্পষ্টাক্ষরে? কেন? কার জন্যে?

সেই মৌচাক দেখে প্রথম ধ্যানাবিষ্ট হল নরেন।

এনট্রান্স পাশ করে ঢুকল এসে কলেজে। নড়ে-ভোলা ছেলে নয়, দুঃসাহসী, জাঁহাবাজ ছেলে। এদিকে আবার স্ফূর্তিবাজ, রঙ্গপ্রিয়। অপরিমিত জীবনের উজ্জ্বল উচ্ছ্বাস। সব মিলে আবার নির্মলতা আর পবিত্রতার দীপ্ত বিগ্রহ।

শুধু তাই? গান গায় নরেন। মৃদঙ্গ বাজায়। নৃত্য হচ্ছে বীরোচিত কলা। নাচে তাই স্বচ্ছন্দে। স্বভাবসৌন্দর্যে। তাণ্ডবপ্রিয় শিব যেন মেতেছেন উদ্ধত নৃত্যে। ফার্স্ট আর্টস পাশ করে বি-এ পড়তে লাগল নরেন। কিন্তু পড়ার উদ্দেশ্য কি? শুধু পরীক্ষা পাশ করা? না, জ্ঞানার্জন? কিন্তু জ্ঞানই বা বলে কাকে?

'আহাম্মক, তোমরা বই হাতে করে সমুদ্রের ধারে পাইচারি করছ। ইউরোপীয় মস্তিষ্ক-প্রসূত কোনো তত্ত্বের এক কণামাত্র—তাও খাঁটি জিনিস নয়—সেই চিন্তার বদহজম খানিকটা ক্রমাগত আওড়াচ্ছ, আর তোমাদের প্রাণমন সেই তিরিশ টাকার কেরানীগিরির দিকে পড়ে রয়েছে। না হয় খুব জোর একটা দুষ্ট উকিল হবার মতলব করছ। এই ভারতীয়গণের সর্বোচ্চ দুরাকাঙ্ক্ষা। আবার প্রত্যেক ছাত্রের আশে-পাশে একপাল ছেলে—তাঁর বংশধরগণ—বাবা খাবার দাও, খাবার দাও করে উচ্চ চীৎকার তুলেছে। বলি, সমুদ্রে কি জলের অভাব হয়েছে যে তোমাদের বই গাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা প্রভৃতি সমেত তোমাদের ডুবিয়ে ফেলতে পারে না?'

বি-এ-তে দর্শন ছিল নরেনের। এক দিকে হার্বার্ট স্পেনসার, কাণ্ট আর মিল, অন্য দিকে ভারতবর্ষ—হিন্দুদর্শন। তত্ত্ব আর তর্ক, যুক্তি আর কল্পনা। কি হবে দর্শনে? দর্শন পড়ে কী দর্শন করব? সত্য-দর্শন চাই।

সত্যমেব জয়তে নানৃতং, সত্যেনৈব পন্থা বিততো দেবযানঃ।

'যৌবন ও সৌন্দর্য নশ্বর, জীবন ও ধনসম্পত্তি নশ্বর, নাম-যশ নশ্বর, এমন কি পর্বতও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ধূলিকণায় পরিণত হয়, বন্ধুত্ব ও প্রেমও অচিরস্থায়ী, একমাত্র সত্যই চিরস্থায়ী। হে সত্যরূপী ঈশ্বর, তুমিই আমার একমাত্র নিয়ন্তা হও।...এই মুহূর্ত হইতে আমি ইহামুত্রফলভোগবিরাগী হইলাম—ইহলোক এবং পরলোকের যাবতীয় আর ভোগনিচয়কে পরিত্যাগ করিলাম। হে সত্য, একমাত্র তুমিই আমার পথপ্রদর্শক হও। আমার ধনের কামনা নাই, নাম-যশের কামনা নাই, ভোগের কামনা নাই। ভগিনি, এ সকল আমার নিকট খড় কুটা—'

শুধু গুণ-বিচার করে চলেছি। শুধু বর্ণনা আর অনুমান। শুধু কীর্তন আর কল্পনা। আগে দেখি, পরে গুণ-বিচার করব। আগে দর্শনধারী পিছে গুণ-বিচারি।

দেবেন ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হল নরেন। বললে, 'আপনি ঈশ্বর দেখেছেন?' চোখ বুজে ধ্যান করছিলেন মহর্ষি। এক উত্তেজিত উন্মাদ কণ্ঠে তাঁর ধ্যান ভাঙল। চেয়ে দেখলেন, নরেন। যে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করছে, নাম লিখেয়েছে খাতায়, যোগ-ধ্যানের ক্লাশে ভর্তি হয়েছে ক'দিন।

'দেখেছেন আপনি ঈশ্বর?'

তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইলেন মহর্ষি। নরেনের স্থিরনিবদ্ধ বিস্ফারিত দুই চক্ষু যেন ভাগ্যতী দীপ্তিতে জ্বলছে। হাঁ-না উত্তর দিতে পারলেন না মহর্ষি। শুধু

বললেন, 'তোমার চোখ দুটি কী উজ্জ্বল! যেন যোগীচক্ষু।'

তা দিয়ে আমার কী হবে! যে অন্ধকারে আমি তাঁকে খুঁজছি সেখানে কী করবে চর্মচক্ষু? আলোয় আলোকময় করে কি তিনি দেখা দেবেন যে চোখ মেলেই তাঁকে দেখব? দেখব তাঁকে পাতায়-ফুলে ঘাসে-শিশিরে আকাশে-তারায়, প্রতিটি মানুষের মুখে!

কেশব সেনকে প্রকাশিত করেছেন মহর্ষি, উদ্ভাসিত করেছেন। যে ছিল মৃৎপ্রদীপ তাকে করেছেন ভাস্বতী শিখা। মহাকবি প্রকৃতিকে মানবায়িত করে, মহর্ষি মানুষকে ঈশ্বরায়িত করেছেন। কেশব যাঁর কীর্তি, তিনিও দেখেননি ঈশ্বরকে?

বড় হতাশ হল নরেন। মনের আকাশে যে ঝড় উঠেছে তাতে মুছে যাচ্ছে আকাশের শাশ্বতী স্থিতি। তবে কি তিনি নেই? তবে কি তিনি দর্শনের অগোচর?

কেন এসেছিল সে দর্শনের সংস্পর্শে? ধর্মের অনুসন্ধানে? সে কি এই মেঘ-জালের মধ্য থেকে পথ পাবে না? সে কি জ্যোতির তনয় নয়?

'বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি—অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি।' পাবে না কি সে সেই তপ্ত তাড়িত স্পর্শ? এমন কি কেউ নেই যিনি তাকে বলবেন সরল সত্যের সহজ স্ফূর্তিতে: 'তাঁকে দেখেছি বই কি। তোকে যেমন দেখছি চোখের উপর, তেমনি। স্পষ্ট, স্থূল, সাবয়ব।'

'দেখেছ?' চমকে উঠবে নরেন, কিন্তু এমন প্রাণময় সারল্যের সঙ্গে তিনি বলবেন যে নরেন তাঁকে বিশ্বাস করবে। সে অগ্নিময় আন্তরিকতার কাছে তার সংশয়ের ফণা সে নত করবে।

'শুধু দেখেছি? তার সঙ্গে খেয়েছি, কথা কয়েছি, শুয়েছি একসঙ্গে।'

'বলো কি, দেখাতে পারো আমাকে?' লাফিয়ে উঠবে নরেন।

'আমাকে দেখাতে হবে না। তুই নিজেই দেখতে পারবি।' বলবেন সেই সর্বানুভূ।

'তোর এমন চক্ষু তুই দেখবি নে?'

কোথায়, কোথায় তিনি?

॥ ৭৩ ॥

ওরে অন্তরে আয়, ঘুচে যাবে সব অন্তরায়।

রাম দত্তের বাড়িতে রামকৃষ্ণের বসবার জন্যে একখানা বিলিতি গালচে হয়েছে। হয়েছে তাকিয়া। ডান হাতের কাছে কাঁচের গেলাশে জল। এড়ানী পাখা দিয়ে বাতাস করছে কেউ।

কোঁচার কাপড় ফেটি করে কোমরে বাঁধা। জামাটি কখনো গায়ে আছে, কখনো বা কতক্ষণ পরেই খুলে ফেলছে। কখনো বা কোঁচাটি খুলে লম্বা চাদরের মত করে কাঁধের উপর ফেলা।

রাম দত্ত আর মনোমোহন প্রথম আরম্ভ করল কীর্তন। খোল-করতাল নেই। মাঝে-মাঝে শুধু রামকৃষ্ণ হাততালি দেয়। সেই হাততালিই যেন সূর্য-চন্দ্রের করতাল।

'মন একবার হরি বল হরি বল,
জলে হরি থলে হরি, অনলে-অনিলে হরি—'

ভাবাবেশে কখনো দাঁড়িয়ে পড়ে রামকৃষ্ণ। নৃত্য করে। সে নয়নৃত্য নয়, অমর-নৃত্য। স্পন্দনের সঙ্গে স্থৈর্য। যাকে বলে 'সাম্যস্পন্দন'। কতক্ষণ পরে একেবারে সমাধি। শরীর থেকে শক্তি বেরুচ্ছে, সূর্যের যেমন বিভা। সমস্ত ঘর-দালান ভেসে যাচ্ছে। জানলা দিয়ে বেরিয়ে ঢেউ খেলছে গলিতে।

একবার বিজয় গোস্বামীকে বলেছিল নাগ-মশাই: 'এখানে এসে চোখ বুজে বসেছ কেন? দেখতে এসেছ, চোখ খুলে দেখ প্রাণ ভরে। এখানে জপধ্যানও বন্ধন। শুধু উন্মীলনই মুক্তি।'

চোখ খুলল বিজয়।

'ঈশ্বরকে লাভ করতে হলে, তাঁকে দর্শন করতে হলে, শুধু ভক্তি হলেই হয়?' জিজ্ঞেস করল বিজয়।

'হ্যাঁ, পাকা-ভক্তি, প্রেমা-ভক্তি, রাগ-ভক্তি।' বললেন ঠাকুর, 'সোজা কথা, ভালোবাসা। যেমন ছেলের মা'র উপর ভালোবাসা। যতক্ষণ না এই ভালোবাসা জন্মায় ততক্ষণ ফটোগ্রাফের কাঁচে কালি মাখানো হয় না। ফটো-গ্রাফের কাঁচে কালি মাখানো থাকলেই যা ছবি পড়ে তা রয়ে যায়। কিন্তু শুধু-কাঁচের উপর হাজার ছবি পড়ুক, একটাও থাকে না—একটু সরে গেলেই যেমন কাঁচ তেমনি কাঁচ।'

'ভালোবাসা এলে কী হয়?'

'ভালোবাসা এলে স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজনের উপর সে মায়ার টান থাকে না, দয়া থাকে। সংসারকে বিদেশ বোধ হয়, শুধু একটা কর্মভূমি, রঙ্গভূমি ছাড়া কিছু নয়। দেশলায়ের কাঠি যদি ভিজে থাকে, হাজার ঘষো, কোনো রকমেই জ্বলবে না—কেবল এক রাশ কাঠিই লোকসান হবে। বিষয়াসক্ত মনই ভিজে দেশলাই—'

তাই শ্রীমতী যখন বললেন, জগৎ-সংসার আমি কৃষ্ণময় দেখছি, তখন সখীরা বললে, তুমি এ কী প্রলাপ বকছ! কই আমরা তো তাকে দেখতে পাচ্ছি না। শ্রীমতী বললেন, সখি, নয়নে অনুরাগ-অঞ্জন মাখো, তাকে দেখতে পাবে।

অনুরাগের ঐশ্বর্য কি কি ?

অনুরাগের ঐশ্বর্য বিবেক, বৈরাগ্য, জীবে দয়া, সাধু সেবা, সাধু সঙ্গ, ঈশ্বরের নাম-গুণকীর্তন, সত্য কথা—এই সব।

এই সব লক্ষণ দেখলে ঠিক বলতে পারা যায়, ঈশ্বরদর্শনের আর দেরি নেই। বাবু কোনো খানসামার বাড়ি যাবেন এরূপ যদি ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে সেই খানসামার বাড়ির অবস্থা দেখেই ঠিক ঠিক বুঝতে পারা যায়। প্রথমে বন-জঙ্গল কাটা হয়, ঝুলঝাড়া হয়, ঝাঁটপাট দেওয়া হয়। বাবু নিজেই সতরঞ্চি গুড়গুড়ি এই সব পাঁচ রকম জিনিস পাঠিয়ে দেন। এই সব আসতে দেখলেই লোকের বুঝতে বাকি থাকে না, বাবু এই এসে পড়লেন বলে।'

কিন্তু হাজার চেষ্টা করো, তাঁর কৃপা না হলে কিছু হবার নয়। তিনি কৃপা না করলে তাঁকে দেখা তোমার সাধ্য কি।

'সার্জন সাহেব রাত্রে আঁধারে লণ্ঠন হাতে করে বেড়ায়—তার মুখ কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু ঐ আলোতে সে সকলের মুখ দেখে, আর-সকলেও পরস্পরের মুখ দেখে। যদি কেউ সার্জনকে দেখতে চায়, তাহলে তাকে প্রার্থনা করতে হয়। বলতে হয়, সাহেব, কৃপা করে একবার আলোটি নিজের মুখের উপর ফেরাও, তোমাকে একবার দেখি।'

একটা মাতাল এসেছে রাম দত্তের বাড়িতে। নাম বিহারী ঘোষ।

'রাম দাদা, বলতে কি, চাটের পয়সা জোটে না, শুধু মদ খেয়ে বেড়াই—'

'আজ সন্ধ্যের সময় আসিস। তোকে লুচি আলুবদমের চাট খাওয়াবো।'

সেই সন্ধ্যের সময় এসেছে বিহারী। দেখলে বৈঠকখানায় ভিড়, কাকে ঘিরে উত্তেজিত স্তব্ধতা।

ও সব বুঝি না। আমাকে আমার লুচি আলুবদমের চাট কখন দেবে ? বকতে লাগল বিহারী।

কে একজন বললে, 'যা, পরমহংসদেবকে প্রণাম কর্ গিয়ে—'

মাতালের কি খেয়াল হল ঘরে ঢুকে প্রণাম করলে।

সেই হল তার চরম চাট খাওয়া।

এখন শুধু অঝোরে কাঁদে আর বলে, 'ভাই, শুধু তাঁর কথা বলো। আর কিছু ভালো লাগে না। মাতাল ছিলুম, লুচি আলুবদমের চাট খেতে চেয়েছিলুম, কিন্তু তিনি কী করে দিলেন ? তাঁকে ছাড়া আর কিছু মনে আসে না। হায়, এমন অমূল্য রতন হাতে পেয়ে তখন কিছু বুঝিনি—লুচি আলুবদমের চাটকেই জীবনের সার ভেবেছিলুম—'

সে সব দিনের নিমন্ত্রণে তরকারিতে নুন দেওয়া হত না। আলুনি তরকারির পাশে আলাদা করে নুন থাকত পাতে। রামকৃষ্ণকে নিয়ে সকলে যখন পঙ্‌ক্তি ভোজনে বসছে, তখন চলবে নুন-দেওয়া তরকারি। রাম দত্তের বাড়িতেই প্রথম নিয়মভঙ্গ হল। একসঙ্গেই আহার চলল সকল শ্রেণীর। রামকৃষ্ণ এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিলেন জাতাজাতি। বললেন, 'ভক্তির মধ্যে আবার জাত কি? সব একাকার।'

বন্যার জল যখন এসে পড়েছে তখন কে আর আল-পথ খুঁজে বেড়ায়?

মেয়েরাও আসছে দলে-দলে। এ এক অভিনব ব্যাপার। মুক্ত অঙ্গনে জ্যোতির্ময়কে দেখবার পিপাসায় বেরিয়ে আসছে পর্দার ঘেরাটোপ থেকে। আরো আশ্চর্য, কেবা পুরুষ কেবা স্ত্রী—কারুরই কোনো দেহজ্ঞান নেই। সবাই একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকছে মুখের দিকে। রামকৃষ্ণের সঙ্গে-সঙ্গে আর সবাইও যেন বিদেহ হয়ে গিয়েছে।

হাঁটু দুটি উঁচু করে আসনখানির উপর বসে আহার করে রামকৃষ্ণ। স্ত্রী-পুরুষ কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখে।

'আগে কাপড় ঠিক থাকত না, বেভুল বে-এক্তিয়ার হয়ে থাকতাম। এখন সে ভাবটা প্রায় গেছে—' বলতে-বলতেই কখন দিগ্‌বসন হয়ে গেল রামকৃষ্ণ। বিরক্ত হয়ে বললে, 'আরে ছ্যাঃ, আমার ওটা আর গেল না—'

কিন্তু যারা দাঁড়িয়ে আছে সামনে, সবাইর অতীন্দ্রিয় ভাব। মেয়েরা পর্যন্ত নিঃসঙ্কোচ। একটি ছোট শিশু যদি উলঙ্গ হয়ে যায় তবে মা কি কুণ্ঠিত হন?

'আমি মাঝে-মাঝে কাপড় ফেলে আনন্দময় হয়ে বেড়াতাম।' বললেন ঠাকুর। শম্ভু এক দিন বলছে, 'ওহে তুমি তাই ন্যাংটো হয়ে বেড়াও—বেশ আরাম! আমি এক দিন দেখলাম।'

কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল সুরেশ মিত্তির। বললে, 'আফিস থেকে এসে জামা চাপকান খোলবার সময় বলি—মা, তুমি কত বাঁধাই বেঁধেছ!'

'অষ্ট পাশ আর তিন গুণ দিয়ে বেঁধেছে।'

রামকৃষ্ণ শিশু।

'মাইরি, কোন শালা ভাঁড়ায়—' বালকের মতই শপথ করে মাঝে-মাঝে।

'বিষয়ী লোকদের সঙ্গে কথা বলতে কষ্ট বোধ হত বলে হৃদেকে দিয়ে পাড়ার ছোট-ছোট ছেলেদের ধরে আনতুম। খাবার-খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে খেলা করতুম তাদের সঙ্গে। বেশ খেলছে, যাই একবার বললে, মা যাব, শালার ছেলেকে আর কে ধরে রাখে! তখন আবার হৃদেকে দিয়ে তার মা'র কাছে পাঠিয়ে দিই। মানুষের যদি এমনি টান হয় ভগবানের উপর, তাহলে কেউ

আর তাকে রুখতে পারে না।'

কটির বসনখানি কখন বগলের নিচে চলে এসেছে। যুবক ভক্তদের লক্ষ্য করে বলছেন ঠাকুর, 'তোরা সব ইয়ং বেঙ্গল আসা অবধি আমি এত সভ্য হয়েছি যে সব সময়েই কাপড় পরে থাকি।'

'এই আপনার কাপড় পরা?'

'মাইরি আমি সভ্য হয়েছি—'

তখন তাঁর গা ছুঁয়ে দেখানো হল তিনি সত্যিই দিগবসন।

করুণ স্বরে বললেন ঠাকুর, 'মনে তো করি সভ্য হব কিন্তু মহামায়া যে অঙ্গে বসন রাখতে দেন না। সে কি আমার অপরাধ?'

প্রলয়পয়োধিতে বটপত্রের উপর শিশু নারায়ণ শুয়েছেন। তেমনি শুয়েছে রামকৃষ্ণ। দু পায়ের দু বুড়ো আঙুল মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে শিশুর মত আনন্দ করছে। বালক-ভাবের চরম।

আবার কখনো শ্রীমতীর ভাব ধরে। অল্প পথ হেঁটেই ক্লান্তিতে ঢলে পড়ে। রাখালের কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে-আস্তে যেতে-যেতে গান ধরে রামকৃষ্ণ। 'আর চলিতে নারি, চরণ বেদন যে হল সখি। সে মথুরা কত দূর!'

সে মথুরা কত দূর! কোথায় সে প্রেমের অমরাবতী!

সুবল একটা বাছুর বুকে নিয়ে জটিলার কাছে উপস্থিত। বললে, 'মা একটু জল খাব।'

গোষ্ঠ-মিলন গান হচ্ছে। গাইছে নরোত্তম কীর্তনে।

জটিলা বললে—গানের সুরে—'সুবল রে, তোর সবই গুণ।'

অমনি রামকৃষ্ণ আখর দিল: 'তবে কালার সঙ্গে বেড়াস, ওই যা দোষ—'

'পাকশালায় যাও, বধূর কাছে জল পান করবে।' বললে জটিলা।

'সুবল তাই তো চায়—', আখর দিল রামকৃষ্ণ।

রান্নাঘরে সুবল গিয়ে দেখে উনুনের ধোঁয়ার ছলে শ্রীমতী কৃষ্ণ বিরহে কাঁদছে। সুবলকে দেখে চকিতে ব্যাপারটা বুঝতে পারল শ্রীমতী। সমরূপী সুবলের সঙ্গে তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্তন করল। বললে, গানের সুরে—'সুবল, সবই হলো, আমি যে নারী, কিরূপে বক্ষ ঢাকি বলো।'

রামকৃষ্ণ আখর দিচ্ছে, 'চিন্তা নাই, উপায় করে এসেছি—বাছুরাকে বুকে এনেছি—ঐ দেখ দ্বারে বেঁধে রেখেছি—এরে বুকে করে তুমি চলে যাও—'

ওরে, তোরা আর কিছু না নিস, কৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর এই টানটুকু নে—

সুরেশ মিত্তির এসে বললে, 'এক দিন আমার ওখানে চলুন।'

'তোর ওখানে যে যাব, গাইবার লোক আছে?' জিগগেস করলে রামকৃষ্ণ।
'কত! গাইয়ের আবার ভাবনা!' কথাটা উড়িয়ে দিল সুরেশ।

৭৪ ॥

এ কে?

পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, নাগ-যজ্ঞ-উপবীতী। সর্বাঙ্গে বিভূতি, নাগালঙ্কার। ধূম্র, পীত, শ্বেত, রক্ত আর অরুণ—পঞ্চ বর্ণের পঞ্চ মুখ। ত্রিনয়ন, জটাজূটধারী। শিরে গঙ্গা, ললাটে চন্দ্রকলা। বাম করে কপাল, পাবক, পাশ, পিনাক আর পরশু। দক্ষিণ করে শূল, বজ্র, অঙ্কুশ, শর আর বরমুদ্রা। লোচন আনন্দসন্দোহে উল্লসিত। কান্তি হিমকুন্দেন্দুসদৃশ। কোটিচন্দ্রসমপ্রভ। বৃষাসনে বিরাজিত। এ কে? এ তো সেই শিব-শান্ত উমাকান্তকে দেখছি।

সিমলে স্ট্রীটে সুরেশ মিত্তিরের বাড়িতে এসেছে রামকৃষ্ণ।

বেলফুলের গোড়ে মালা এনেছে সুরেশ। নিচের দিকে তোড়ার মত করা ফুলের থোপনা, মাঝে-মাঝে রঙিন ফুল আর জরির তবক। রামকৃষ্ণের গলায় মালাটি পরিয়ে দিয়ে পায়ের কাছে প্রণাম করল সুরেশ। কিন্তু সহসা রামকৃষ্ণের এ কী হল? মালা গলা থেকে খুলে দূরে ফেলে দিল রামকৃষ্ণ।

নিমেষে ম্লান হয়ে গেল সুরেশ। কী না-জানি সে সেবাপরাধ করে বসেছে। কিন্তু জলের গ্লাশে শশীর যখন পা ঠেকে গিয়েছিল তখন তো এত বিমুখ হয়নি রামকৃষ্ণ। সে-জল খেয়েছিল শান্ত মুখে।

সমাধি ভাঙবার পর এক ঢোঁক জল খায় রামকৃষ্ণ। যন্ত্রচালিতের মত হাত বাড়িয়ে দেয়, আর তক্ষুনি জল-ভরা গ্লাশটি এগিয়ে দেয় শশী। শশী মানে শশিভূষণ ভটচাজ, উত্তরকালের রামকৃষ্ণানন্দ। সে দিন রাম দত্তের বাড়িতে কি হল, তাড়াতাড়িতে জলের গ্লাশে পা ঠেকে গেল শশীর। জল বদলাবার আর সময় নেই, রামকৃষ্ণ হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

সেই জলের গ্লাশই এগিয়ে ধরল শশী। রামকৃষ্ণ তাই খেল নিশ্চিন্ত হয়ে।

শশীর অপরাধ তো জানিত অপরাধ। সুরেশ তো বুঝতেই পাচ্ছে না কোনখানে তার বিচ্যুতি হয়েছে। শশীর যদি ক্ষমা হয়, তবে তার কেন হবে না?

এই জলের গ্লাশে পা ঠেকে যাওয়া নিয়ে চিরকাল আক্ষেপ করেছে শশী। কিন্তু ঠাকুর তো জানতেন তার অন্তরের স্বচ্ছতা। তাই তো তাকে ক্ষমা করলেন অনায়াসে। সুরেশের মন কি তেমনি পরিষ্কার নয়?

জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরে কাঠ-ফাটা রোদ্দুরে শশী এসে হাজির। মুখ-চোখ লাল, এক

হাঁটু ধুলো। ঘাম ঝরছে গা বেয়ে। 'এ কি করেছিস তুই?' ঠাকুর ক্ষিপ্র হাতে তাকে পাখা করতে লাগলেন। 'এই রোদ্দুরে কেউ আসে?' শশী নিবৃত্ত করতে চায় ঠাকুরকে, ঠাকুর কোনো-কিছুই শুনতে রাজী নন। বোস একটু চুপ করে, আগে খানিক ঠাণ্ডা হ। গায়ের ঘাম মরেছে এতক্ষণে। বল এইবার কি বলবি। বলবার কিছু নেই। এই দেখুন বরানগরের বাজার থেকে আপনার জন্যে কিছু বরফ কিনে এনেছি। চাদরের খুঁট খুলে এক টুকরো বরফ বের করল শশী। ঠাকুরের আনন্দ তখন দেখে কে। বললেন, 'দেখ, দেখ। এই গরমে মানুষ গলে যায়, কিন্তু শশীর বরফ গলেনি। কি করে গলবে? শশীর ভক্তিহিমে বরফ জমাট হয়ে রয়েছে।'

ভক্তি-হিমে জল জমে যখন বরফ হয় তখনই ঈশ্বর সাকার। যখন জ্ঞান-সূর্যে গলে যায় বরফ, তখন আবার যে-জল সে-ই জল, তখন আবার তিনি নিরাকার। ভক্তের জন্যে তাঁর রূপ, জ্ঞানীর জন্যে অরূপ। কিন্তু দুয়ের জন্যেই সমান অপরূপ।

তবে কি সুরেশের ভক্তি নেই?

ভক্তমাল থেকে একটি গল্প বলল রামকৃষ্ণ। যে ভক্ত সে কী মনোভাব নিয়ে দান করবে। তার মধ্যে অভিমানের এতটুকু আঁশ থাকবে না। অহংকার ত্যাগ করলেই তবে ঈশ্বর তার নেন। মালা যে দিলি মালার মধ্যে যে তোর একটু অহংকারের জ্বালা আছে। মালার মধ্যে যে অনেক চেকনাই। অনেক কেরামতি। তারই জন্যে তোর মনের মধ্যে একটু অহংকারের জ্বর।

অহংকার হচ্ছে উঁচু ঢিপি। সেখানে কি জল জমে! জল জমে নিচু জমিতে, খাল জমিতে। সেই ঢিপিকে খাল করে দাও। তবেই জমবে ভক্তির জল।

সুরেশ কাঁদতে লাগল।

লাটু ছিল উপস্থিত। সে তাজ্জব বনে গেল। ঠাকুরের রসদদারদের মধ্যে একজন এই সুরেশ মিত্তির, তবু তার দান তিনি গ্রহণ করলেন না। আর, চেয়ে দেখ, তারই জন্যে কাঁদছে সুরেশ মিত্তির।

না কাঁদলে হবে কেন? কান্না দিয়ে পথের ধুলো ধুয়ে দিলেই তো তিনি আসবেন। ভক্তি-প্রদীপের তেলটিই তো অশ্রুজল।

এই যে বিশ্ব এ হচ্ছে বিস্তীর্ণ ব্যথার পত্রপট। ভক্তকে পাচ্ছেন না বলে ভগবানের কান্না। তাঁর অসীম শক্তির শুকনো রঙগুলি তিনি প্রেমের অশ্রুতে গুলে-গুলে এই বিচিত্র বর্ণবেদনার ছবি এঁকেছেন। মনের মধ্যে যদি সেই কান্না না থাকে তবে এ চিঠির মর্মোদ্ধার করব কি করে? এই চিঠির মধ্যেই তো আনন্দের সংবাদ।

কীর্তনে নিয়ে এসেছে সুরেশ। নিজে গান গেয়ে রামকৃষ্ণ তাকে উচ্চভাবে উদ্দীপ্ত করে তুলল। অর্ধবাহ্যদশায় এসে হঠাৎ সেই ত্যক্ত মালা গলায় পরে উঠে দাঁড়াল। গান ধরল গলা ছেড়ে :

'আর কী সাজাবি আমায়—
জগৎ-চন্দ্র-হার আমি পরেছি গলায়—'

ফের আখর দিতে লাগল : 'আমি জগৎ-চন্দ্র-হার পরেছি। অশ্রুজলে সিক্ত-করা জগৎ-চন্দ্র-হার পরেছি। প্রেমরসের ভাবন দেওয়া জগৎ-চন্দ্র-হার পরেছি—'

চোখের কান্না মুছে ফেলে চেয়ে ছাখ আমাকে। আমি দূরে আছি যে বলে, সেই নিজে দূরে রয়েছে। আমাকে দেখতে আবার নতুন কী আয়োজন হবে! দেখব বলে তাকালেই দেখতে পাবি চোখের উপর। 'ত্বমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং।' ইট কাঠ মাটি পাথর সব আমি। আকাশ বাতাস আগুন জল পাখি পতঙ্গ। একটা গাছ দেখছিস সামনে? ঐ বৃক্ষরূপে তো আমিই দাঁড়িয়ে। সমস্ত কান্নার পারে আমিই তো আনন্দ-তীর।

কিন্তু সে দিন সুরেশের বাড়িতে গাইয়ের যোগাড় নেই।

রামকৃষ্ণ শুধালো : 'ভজন গাইতে পারে এমন কেউ নেই তোমাদের পাড়ায়?'

আছে বৈ কি। সুরেশ ব্যস্ত হয়ে খুঁজতে বেরুল। গৌর মুখুজ্জে লেনের বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে নরেন।

নরেন তখন গানের স্রোতে ভাসছে। ভগবান আছে কি নেই জানি না, কিন্তু দেহ-ভরা প্রাণ আছে, কণ্ঠ-ভরা গান আছে। আর, এই প্রাণ আর গান এ যেন আর কারো দানোচ্ছাসে। তাই নরেন গায়, 'অচল ঘন গহন গুণ গাও তাঁহারি।' কখনো বা :

'মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ,
তোমারি রচিত ছন্দ মহান বিশ্বের গীত॥
মর্তের মৃত্তিকা হয়ে ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লয়ে
আমিও দুয়ারে তব হয়েছি হে উপনীত।'

'ওরে বিলে, বাড়ি আছিস?' দরজায় সুরেশ মিত্তির দাঁড়িয়ে। ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে কাছে এল নরেন। 'চল আমার বাড়ি চল। গান গাইবি।'

একবার গানের নাম শুনলেই হল, নরেন উচ্ছলিত। ক'দিন বাদে একজামিন, দুপুর বেলা হয়তো পড়ছে নরেন, বন্ধু এসে বললে, রাত্তিরে পড়িস, এখন দুটো গান গা। তবে বাঁয়াটা নে—বলেই বই-টই ঠেলে ফেলে নরেন তানপুরা নিয়ে বসল। ইস্কুল-কলেজে টেবিল চাপড়ে বাজিয়েছে বলেই কি আর এখন বাঁয়া

বাজাতে পারবে—গান শুনতে চেয়ে বন্ধু পড়ল মুশকিলে। মোটেই শক্ত নয়, এমনি করে শুধু ঠেকা দিয়ে যা—বাজনার বোল বলে দিল নরেন। ঠেকার অভাবে ঠেকবে না, নরেন তানে-লয়ে তন্ময় হয়ে গান ধরল উদার গলায়। কখন দুপুর গড়িয়ে গেল আস্তে-আস্তে, কিছু খেয়াল নেই—একটার পর একটা গান গেয়ে চলেছে অনবরত। সন্ধ্যায় আলো দিয়ে গেল চাকর, তবু আসর ভাঙছে না। রাত দশটায় এল খাবার তাড়া, তখনই বুঝি প্রথম হুঁস হল। দিব্য ভূমি থেকে নেমে এল স্থূল ভূমিতে।

গানই হচ্ছে একমাত্র জ্ঞান যে জ্ঞানের ওপারে একজন আছেন। জ্ঞানের ওপারে যিনি আছেন তাঁকে একমাত্র গান দিয়েই স্পর্শ করা।

অন্তরের কান্নাটিও একটি গান। আকুলতাটিও একটি সুর।

গানের নাম শুনেই কোমর বাঁধল নরেন। চলল সুরেশ মিত্তিরের বাড়িতে।

রামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেন্দ্রের প্রথম দর্শন হল—সূর্যের সঙ্গে সমুদ্রের।

এ কে! চমকে উঠল রামকৃষ্ণ। এ যে তার সেই স্বপ্নে-দেখা সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষি! সে এক অপূর্ব দর্শন হয়েছিল রামকৃষ্ণের।

সমাধি অবস্থায় জ্যোতির্ময় পথ ধরে ঊর্ধ্বে নভোমণ্ডলে উঠে যাচ্ছে রামকৃষ্ণ। পার হল পৃথিবী, পার হল জ্যোতিষ্কলোক। ক্রমে-ক্রমে চলে এল সূক্ষ্মতর ভাবলোকে। যতই উপরে উঠছে, পথের দুপাশে দেখতে লাগল দেব-দেবীরা বসে আছেন। সেখানেও ঊর্ধ্বগতি ক্ষান্ত হল না। উঠে এল ভাবরাজ্যের চরম চূড়ায়। সেখানে দেখল একটি জ্যোতির রেখা দিয়ে দুটি বিশাল রাজ্যকে আলাদা করা হয়েছে। খণ্ড আর অখণ্ডের রাজ্য, দ্বৈত আর অদ্বৈতের দেশ। রামকৃষ্ণ অখণ্ডের রাজ্যে এসে ঢুকল। সেখানে আর দেব-দেবী নেই—দিব্য দেহের অধিকারী হয়েও এখানে আসবার অধিকার নেই তাদের। অনেক নিচে ভাবলোক তাদের বাসা। সেই অখণ্ডলোকে সাতটি ঋষি বসে আছে ধ্যানলীন হয়ে। প্রজ্ঞ, প্রবীণ ঋষি। আশ্চর্য হল রামকৃষ্ণ। যেখানে দেব-দেবী আসতে পারে না সেখানে এই ঋষিরা এল কি করে? বুঝল জ্ঞানে প্রেমে পুণ্যে পবিত্রতায় এরা দেবদেবীকেও হার মানিয়েছে। এদের মহত্ত্বচিন্তায় অভিভূত হল রামকৃষ্ণ। সহসা দেখতে পেল সেই অখণ্ডলোকের পরিব্যাপ্ত জ্যোতিপুঞ্জের কিয়দংশ ঘনীভূত হয়ে একটি দেবশিশুর আকার নিলে। একটি অমলকান্তি দেবশিশু। দেবশিশুটি তার মৃদুল-কোমল বাহু দুটি দিয়ে একজন ঋষির গলা জড়িয়ে ধরল, তার ধ্যান ভাঙাবার জন্যে ডাকতে লাগল কলভাষে। ধ্যান ভাঙল ঋষির, আনন্দময় অনিমেষ চোখে দেখতে লাগল শিশুকে। এ যেন তার

কত কালের প্রিয়ধন, তার হৃদয়রতন। কি যেন বলবে বলে এসেছে! প্রসন্ন-প্রভাত চোখ দুটি তুলে শিশু বললে ঋষিকে, 'আমি চললুম তুমি এস।' কোথায় চললে? পৃথিবীতে। তুমিও এস আমার পিছু-পিছু। স্নেহস্নাত চোখে চেয়ে থাকতে-থাকতে ঋষি আবার ধ্যানস্থ হল। রামকৃষ্ণ দেখল, ঋষির সেই দেহ থেকে একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে জ্যোতির্বিকারূপে নেমে গেল পৃথিবীতে।

নরেন্দ্রকে দেখেই চমকে উঠল রামকৃষ্ণ। এ যে সেই ঋষি!

তবে ঐ শিশুটি কে? শিশুটি স্বয়ং রামকৃষ্ণ।

বিবেকানন্দ ঋষি, রামকৃষ্ণ শিশু। তার মানে কি? বিবেকানন্দ পরিপূর্ণ জ্ঞান, রামকৃষ্ণ পরিপূর্ণ প্রেম। বিবেকানন্দ সংহত তেজ, রামকৃষ্ণ বিগলিত সারল্য। বিবেকানন্দ তাই হিমালয়, রামকৃষ্ণ মানস-সরোবর।

॥ ৭৫ ॥

একটি ভজন গাইল নরেন। উন্মনা হয়ে গেল রামকৃষ্ণ। কাদের বাড়ির ছেলে? কোথায় থাকে? কোথা থেকে এসেছে? কি করে পথ চিনল এ গলির? আরো একখানা গান হল।

এগিয়ে এল রামকৃষ্ণ। কাছে এসে নরেনের অঙ্গলক্ষণ দেখতে লাগল। বলল, কথার সুরে মিনতি মাখিয়ে বলল, 'একবারটি দক্ষিণেশ্বরে এসো আমার কাছে। কেমন, আসবে?'

উন্মনা হয়েই ফিরল দক্ষিণেশ্বরে। তার নিঃসঙ্গতার অন্ধকারে।

কে যেন নেই। কে যেন আসবে বলে আসেনি। দেখা দিয়েই চক্ষের পলকে পালিয়ে গেছে।

প্রতিক্ষণ উচাটন। প্রতিক্ষণ তার পায়ের শব্দ শুনছে উৎকর্ণ হয়ে। সে যে আসে আসে আসে। পৃথিবীর সমস্ত সুরে-ছন্দে তার আগমনী বাজছে। কিন্তু সে আসছে কই? দেখা দিচ্ছে কই চোখের সামনে! কোথায় সেই চারু-হারী-রুচির-মনোহর? রুচ্য রম্য কান্ত কাম্য? তাকে না দেখে কেমন করে থাকব? অন্ধকারে তার গন্ধ টের পাচ্ছি, কিন্তু সে কি অন্ধকারে আমার কান্না শুনতে পাচ্ছে না? বিশ্ববীণায় সে এত সুর বুনছে, সেখানে কি বাজছে না এই গীতহারা নীরবতা?

'ওরে, তুই কে জানি না। কী হবে জেনে? তবু তুই একবার আয়। তোকে না দেখে যে থাকতে পারছি না। তোকে ছাড়া সব অন্ধকার। একেবারে একা।' নির্জনে গিয়ে ডাক ছেড়ে কাঁদে রামকৃষ্ণ। যেমন ভিজে গামছা নিংড়োয় তেমনি

করে বুকের ভিতরটা কে জোর করে নিষ্পীড়ন করছে। চোখে ঘুম নেই, মুখে রুচি নেই, সব সময়ে কেবল ইতি-উতি তাকায়, ঘন-ঘন নিশ্বাস ফেলে, কিন্তু সে আসে না।

সে শুধু আসে আসে আসে।

শেষকালে মা'র কাছে কেঁদে পড়ে রামকৃষ্ণ। মা, একবারটি তাকে এনে দে। ওকে না পেলে কেমন করে থাকব! কার সঙ্গে কইব আমার প্রাণের কথা? আমি রাজ্য চাই না, স্বর্গ চাই না, মোক্ষ চাই না, তুই শুধু ওকে এখানে নিয়ে আয়। আমি ওর কনককাঞ্চনছবি আর একবার দেখি।

রাত্রে শুয়ে আছে রামকৃষ্ণ, কে যেন তাকে তার গা ঠেলে তুলে দিল। বললে, 'আমি এসেছি।' রামকৃষ্ণ চেয়ে দেখল, নরেন।

ধড়মড় করে উঠে বসল। এসেছিস? এত রাত্রে, মধ্যরাত্রে? তাতে কি? তাই তো আমি আসি, যখন চরাচর সান্দ্র-স্তব্ধ, সুষুপ্তিগত। কিন্তু কই, কই তুই? কেউ নেই।

এই তুই সাকার, আবার তুই নিরাকার। এই তুই সমুপস্থিত গান, আবার তুই পলায়মান সুর! আর কত তোর পথ চেয়ে বসে থাকব? আমার ঘর নেই আমি পথই সার করেছি। তুই এসে আমাকে পথের খবর দিয়ে যা। কোন পথে মিলবে সেই পথপতিকে?

বয়ে গেছে নরেনের আসতে! তার এফ-এ পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে, বাবা তার জন্যে এখন পাত্রী খুঁজছেন। তার খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, সে চলেছে দক্ষিণেশ্বর! ধাপ-ধাড়া গোবিন্দপুর এর চেয়ে অনেক ভালো জায়গা।

কিন্তু বাবা শুধু পাত্রীই দেখছেন না, দেখছেন তার টাকার ওজনটা। মেয়েটি শামলা, তাই তার দশ হাজার টাকা জরিমানা। তা ছাড়া ছেলে দেখুন। ছেলে আমার সোনা-বাঁধানো হাতির দাঁত।

কিন্তু নরেন ঘাড়ে এক ঝাঁকরানি দিয়ে সব নস্যাৎ করে দিলে।

মেয়ে কালো বলে নয়, নয় বা বাবা পণ নিচ্ছেন বলে। সে বিয়ে করবে না কেননা সে ঈশ্বরসন্ধানে হবে দুর্গমের যাত্রী, দুরারোহ ও দুরবগাহের। সে-পথ ক্ষুরধারের মত নিশিত-দুস্তর।

বিশ্বনাথের সংসারেই প্রতিপালিত রাম দত্ত, তাকে তাই ধরলেন বিশ্বনাথ। বললেন, 'বিলের ঘাড়ে একটু ঘি ডলো, কি এক গোঁ ধরেছে, বলছে বিয়ে করবে না—'

রাম দত্ত লাগল ঘটকালিতে। কিন্তু নরেন তো ঘট নয় যে কালি মাখাবে, নরেন

আকাশ তাতে লাগে না কিছু কামনার কালিমা।

'যদি সত্যি ধর্ম লাভ করতেই চাও তবে মিছে ব্রাহ্মসমাজে না ঘুরে দক্ষিণেশ্বরে যাও। মূর্তিমান ধর্মকে দেখে এসো।'

যেতে হয়তো যাব, তুমি বলবার কে! এমনিই ভাব নরেনের। তুমি বলবে বললেই যাব? তুমি কি আমার অভিভাবক? তুমি কি আমার বিবেক? আমার খুশি আমি যাব না।

নতুন গাড়ি হয়েছে সুরেশের। দুশো টাকা মাইনে হয়েছে রাম দত্তের। হাসি পায়, সব নাকি ঠাকুরের কৃপায়। এতই যখন কৃপা, নরেন ভাবল মনে-মনে, জগৎ-সংসারের সমস্ত দুঃখ-দারিদ্র্য এক দিনে দূর করে দিক না। তবে বুঝি কেমন ঠাকুর!

নতুন গাড়ি কিনে রামকৃষ্ণকে একদিন চড়াল সুরেশ।

সুরেশের বাড়ি এলে রামকৃষ্ণকে ঘিরে আজকাল ছেলে-ছোকরারা ভিড় করে। 'ছোট ছেলেগুলোকে আপনি বকাচ্ছেন—' সুরেশেরই বাড়িতে থাকে এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী, সে একদিন হঠাৎ রামকৃষ্ণকে আক্রমণ করলে।

'তুমি কী করো?' শান্ত বয়ানে প্রশ্ন করল রামকৃষ্ণ।

'আমি আপনার মতো ছেলে বকাই না, আমি জগতের হিত করি।'

'যিনি এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন পালন করছেন তিনি কিছু বোঝেন না আর তুমি সামান্য মানুষ, তুমি জগতের হিত করছ? ঈশ্বরের চেয়ে তুমি বেশি বুদ্ধিমান?' চুপ করে গেল সরকারী চাকুরে।

সেই সরকারী চাকুরের পিছনে লেগে গেল পাড়ার ছেলেরা। কি হে, জগতের হিত করছ নাকি? কতটা হিত আজ করলে জগতের?

কৃষ্ণদাস পালকে জিগগেস করলে রামকৃষ্ণ; 'মানুষের কি কর্তব্য?'

কৃষ্ণদাস বললে, 'জগতের উপকার করব।'

'হ্যাঁ গা, তুমি কে?' বললে রামকৃষ্ণ, 'আর, কী উপকার করবে? আর, জগৎ কতটুকু গা, যে তুমি উপকার করবে?'

ঈশ্বরকে ভালোবাসাই জীবনের উদ্দেশ্য। ঈশ্বরে ভাব-ভক্তি মানেই ঈশ্বরে ভালোবাসা। নিষ্কাম কর্ম করতে-করতেই ঈশ্বরে ভক্তি-ভালোবাসা আসে। আর এই ভক্তি-ভালোবাসা থেকেই ঈশ্বরলাভ। এই ঈশ্বরলাভই মানুষের কর্তব্য। জগতের উপকার মানুষ করে না, তিনিই করেছেন। যিনি চন্দ্র-সূর্য করেছেন, যিনি মা-বাপের বুকে স্নেহ দিয়েছেন, মহতের চিত্তে দয়া দিয়েছেন, ভক্তের প্রাণে ভক্তি দিয়েছেন—তিনিই। বাপ-মা'র মধ্যে যে স্নেহ দেখ সে

তাঁরই স্নেহ। দয়ালুর মধ্যে যে দয়া দেখ সে তাঁরই দয়া। তুমি কাজ করো আর না করো, তিনি কোনো না কোনো সূত্রে তাঁর কাজ করবেনই করবেন। তাঁর কাজ আটকে থাকবে না।

জগতের দুঃখ দূর করবে তোমার স্পর্ধা কি? জগৎ কি এতটুকু? বর্ষাকালে গঙ্গায় কাঁকড়া হয় দেখেছ? তেমনি অসংখ্য জগৎ আছে—অফুরন্ত। যিনি জগতের পতি তিনিই সকলের খবর নিচ্ছেন। তোমার মিথ্যে মাথা ঘামাতে হবে না। তোমার কাজ হচ্ছে তাঁকে আগে জানা। তাঁর জন্যে ব্যাকুল হওয়া। শরণাগত হওয়া। ঈশ্বরদর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য!

এমন নরদেহ ধারণ করেছ একবার ঈশ্বরদর্শন করবে না? এত কিছু দেখলে, এত কিছু ধরলে, দেখবে-না-ধরবে-না শুধু ঈশ্বরকে? জীবনে এত রোমাঞ্চ খুঁজছ, নেবে না একবার ঈশ্বর-শিহরণ?

গঙ্গার দিকে পশ্চিমের দরজায় কার ছায়া পড়ল।

কে? চঞ্চল হয়ে উঠল রামকৃষ্ণ। এ কার ছায়া? কার আভাতি?

আর কার! চোখের সামনে নরেন। সপ্ত ঋষির একজন।

সুরেশ মিত্তিরের গাড়িতে করে এসেছে। সঙ্গে সুরেশ, আরো ক'জন সমবয়সী ছোকরা। কিন্তু সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র এই নরেন্দ্রনাথ। সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন-বিযুক্ত। শরীরের দিকে লক্ষ্য নেই, বেশেবাসে উদাসীন, গায়ে ময়লা একখানা চাদর, বাইরের কোনো কিছুতে কৌতূহল নেই, সমস্ত কিছুর সঙ্গে অবন্ধন, সমস্ত কিছুই যেন তার শিথিল। শুধু ধ্যানের আবেশে চোখের তারা উপর দিকে উঠে আছে। ঘুমুলেও হয়তো সম্পূর্ণ বোজে না তার চোখ। চোখ সুমুখ ঠেলা। দেখলেই মনে হয় ভিতরে কিছু আছে।

বিষয়ীর আবাস কলকাতায় এত বড় সত্ত্বগুণী আধার এল কোত্থেকে? সত্ত্বগুণই তো সিঁড়ির শেষ ধাপ। তার পরেই ছাদ।

এসেছিস? আয়—

মনের ব্যাকুলতা চেপে রাখল রামকৃষ্ণ। মেঝেতে মাদুর পাতা, বসতে বলল নরেনকে। যেখানে জলের জ্বালা, তার কাছেই বসল নরেন। তার সহচর বন্ধুরাও বসল আশে-পাশে। কিন্তু তারা সব ডোবা-পুষ্করিণী। ডোবা-পুষ্করিণীর মধ্যে নরেন বড় দীঘি— যেন ঠিক হালদার পুকুর।

চুম্বকের টানে লোহা আসে, না লোহার টানে চুম্বক ছোটে—কে করবে এ রহস্যের সমাধান? প্রিয়তন্ময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রামকৃষ্ণ। বলে, 'একটা গান ধর।'

গান তো নয়, মানস-যাত্রী হংস। নরেনের সমস্ত শরীর যেন সুরে-বাঁধা। সমস্ত প্রাণ-মন ঢেলে ধ্যানারূঢ় হয়ে সে গান ধরলে :

'মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে॥'

'আহা, কি গান' ভাবে উঠে গিয়েছিল রামকৃষ্ণ, নেমে এসে বললে, 'আরেকখানা গা।'

'যাবে কি হে দিন বিফলে চলিয়ে'—সুধা-ঢালা কণ্ঠে গান ধরল নরেন : 'আছি নাথ, দিবানিশি আশা পথ নিরখিয়ে।'

পাখির ওড়াই যেমন বিশ্রাম, নরেনের গানই যেন ধ্যান। ও স্বতঃসিদ্ধ। নিত্য-সিদ্ধ। নিত্যসিদ্ধ হচ্ছে মৌমাছি। শুধু ফুলের উপর বসে মধু পান করে। তার মানে হরিরস পান করে, বিষয়-রসের দিকে যায় না।

মা, তোর কী কৃপা! তুই এত দিন পরে নিয়ে এসেছিস আমার মন-ঠাণ্ডা-করা আপন জন!

কালীঘরের খাজাঞ্চি ভোলানাথ মুখুজ্জেকে জিগগেস করেছিল রামকৃষ্ণ : 'নরেন্দ্র বলে একটি কায়েতের ছেলে, তার জন্যে আমার মন এমন হচ্ছে কেন? সে আমার কে!'

ভোলানাথ বললে, 'এর মানে ভারতে আছে। সমাধিস্থ লোকের মন যখন নিচে আসে, তখন সত্বগুণী লোকের সঙ্গে বিলাস করে। সত্বগুণী লোক দেখলে তবে তার মন ঠাণ্ডা হয়।'

আমি বিলাস করব। আমি শুঁটকে সাধু হব না।

॥ ৭৬ ॥

গান শেষ হওয়া মাত্র নরেনের হাত ধরল রামকৃষ্ণ। হাত ধরে টেনে আনল উত্তরের বারান্দায়। বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলে ঘরের দরজা।

শীতকাল। উত্তুরে হাওয়া আটকাবার জন্যে থামের ফাঁকগুলো ঝাঁপ দিয়ে ঘেরা। নিশ্চিন্ত, নিরিবিলি জায়গা। ঘরের দরজা বন্ধ করে দেবার পর কার সাধ্য নেই এখানে উঁকি মারে।

নিরিবিলিতে কিছু উপদেশ দেবে বোধ হয় রামকৃষ্ণ, নরেন তাই কৌতূহলী হয়ে রইল। কিন্তু এ কি, রামকৃষ্ণের মুখে কোনো কথা নেই। রামকৃষ্ণ কাঁদছে। আকুল হয়ে কাঁদছে। যেন কত দিনের গভীর পরিচয়, বলছে তেমনি স্নেহস্বরে,

'এত দিন কোথায় ছিলি ?'

নিঃশব্দ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইল নরেন।

'তোর কি মায়া দয়া নেই ? এত দিন পরে আসতে হয় ! কত ক্ষণ থেকে দিন, দিন থেকে মাস, মাস থেকে বছর আমি তোর জন্যে বসে আছি—তোর তা খেয়াল নেই। তোর মনে পড়ল না আমাকে ?' নরেনের হাত ধরে বিলাপের মত করে বলছে, কিন্তু আসলে এ আনন্দ-প্রলাপ। এ দুঃখ প্রীতিকণ্টকিত দুঃখ। এ অশ্রু স্নেহার্দ্রগাঢ় সুধাধারা।

এ বাণী নবনীসমানা অমিয় বাণী।

'বিষয়ী লোকের কথা শুনে-শুনে আমার কান পুড়ে গেল। প্রাণের কথা আর কাউকে বলা হল না। বলতে না পেয়ে এই ছাখ আমার পেট ফুলে রয়েছে। এইবার তুই এসেছিস, এবার বাহির দুয়ারে কপাট লেগে ভিতর দুয়ার খুলে যাবে। হরিকথারতিতে কেটে যাবে দিন-রাত। তুই এসেছিস, তার মানে ভক্তের হৃদয়ে ভগবান বিশ্রাম করতে এসেছে। ভক্তের হৃদয়েই তো ভগবানের বিশ্রাম।'

নরেন চিত্রলিখিতের মত দাঁড়িয়ে রইল। নিস্পন্দ, নিঃসাড়।

'মাকে সেদিন অনেক করে বললাম। কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী শুদ্ধ ভক্ত না পেলে কেমন করে থাকব পৃথিবীতে ? কার সঙ্গে কথা কইব ? কাঁদতে-কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর কী হল জানিস না বুঝি ?'

নরেন তাকিয়ে রইল উৎসুক হয়ে।

'মাঝ রাতে তুই এলি আমার ঘরে। আমায় তুললি গা ঠেলে। বললি, আমি এসেছি।'

'কই আমি তো কিছু জানি না।' নরেনের মুখে হাসির একটি রেখা ফুটল। বললে, 'আমি তো আমার কলকাতার বাড়িতে তখন তোফা ঘুম মারছি।'

'তুমি জানো না বৈ কি। তুমি যদি না জানো, তবে আর কে জানে !' রামকৃষ্ণ সহসা হাত জোড় করল। দেববন্দনার ভঙ্গিতে বলতে লাগল, 'কিন্তু আমি জানি প্রভু, তুমি সেই পুরাণ পুরুষ, তুমি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, তুমি নররূপী নারায়ণ। তুমি আমার জন্য রূপধারণ করে এসেছ। শুধু আমার জন্য নয়, সমস্ত জীবের জন্য এসেছ। এসেছ সমস্ত ভুবনের দৈন্যদুঃখদুরিত দূর করতে—প্রণতজনের ক্লেশ-হরণ করতে—'

কে এ উন্মাদ ! নইলে আমি সামান্য বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে, আমাকে এ সব কথা বলছে ! কে এ বচনরচনপটু ! এ সব কি আমি প্রহেলিকা শুনছি ? আমি

আছি তো আমার মধ্যে? নরেন স্থান-কাল একবার যাচাই করে নিল। সব ঠিক আছে। শুধু পাত্রই অপ্রকৃতিস্থ। লোকে যে বলে দক্ষিণেশ্বরে এক পাগলা বামুন আছে, ঠিকই বলে।

পাগল নয় তো কি! পাগল না হলে কি মানুষের মধ্যে ঈশ্বর দেখে! যাকে দেখা যায় না শোনা যায় না তার জন্যে অশ্রুবর্ষণ করে কেউ? এমন কাণ্ডজ্ঞান-শূন্যের মত কথা বলে?

কিন্তু পাগল বলে এক কথায় উড়িয়ে দেবার মত সায় পায় না মনের মধ্যে। পাগল কি এমন হিরণ্ময় হয়? হয় কি এমন পুলকোদ্ভিন্নদর্বাঙ্গ? বচনে কি এত মধু থাকে? কথা কি হয় শ্রবণমঙ্গল? এমন লোকাতিহর হাসি কি তার মুখে থাকে? কণ্ঠে ও চাহনিতে, স্পর্শে ও কাতরতায় থাকে কি এমন মেদুর-মেঘের মমতা, অমৃতবর্ষণ স্নেহ?

কে জানে! কী হবে বিচার-বিতর্ক করে? এ যেন এক তর্কাতীত, তত্ত্বাতীত অনুভূতি। শুধু দেখা যাক। শুধু শোনা যাক। নিরুদ্ধ নিশ্বাসে থাকি শুধু নিশ্চল হয়ে।

'তুই একটু বোস। তোর জন্যে খাবার নিয়ে আসি।' দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকল রামকৃষ্ণ।

চকিতে ফিরে এল খাবারের থালা নিয়ে। প্রায় পাগলের ব্যাকুলতায়। যদি এই ফাঁকে পালিয়ে যায় ননীচোর! যদি অন্ধকারে অন্তর্ধান করে!

না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে নরেন। বর্তমান-ভবিষ্যৎ কিছুই নির্ণয় করতে পারছে না। শুধু ভাবছে, আমি কি সার্ধ-ত্রিহস্ত পরিমিত মাংসপিণ্ডময় সামান্য একটা দেহ? না কি আমি বিরাট, আমি মহান, আমি অনন্তবলশালী পরমাত্মা?

থালায় কতগুলি সন্দেশ, মাখন আর মিছরি। হাতে করে নরেনের মুখের কাছে খাবার তুলে ধরল রামকৃষ্ণ। বললে, 'খা, হাঁ কর।'

'সে কি, আমার বন্ধুরা যে রয়েছে সঙ্গে!' মুখ সরিয়ে নিতে চাইল নরেন।

'দিন, আমার হাতে দিন, ওদের সঙ্গে ভাগ করে খাই।'

কে শোনে কার কথা!

'হবে'খন, ওরা খাবে'খন পরে—আগে তুমি খাও।' জোর করে মুখে পুরে দিতে লাগল রামকৃষ্ণ।

কৌশল্যা হয়ে রামকে খাইয়েছি, যশোদা হয়ে ননীগোপালকে। খা, এই নে আমার হৃদয়বেদ্য নৈবেদ্য। তুই জানিস না তুই কে? তুই সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্তী নারায়ণ।

জোর করে সবগুলি খাবার খাইয়ে দিলে।

'বল, আবার আসবি! দেরি করবি না একেবারে! ঠিক তো?' রামকৃষ্ণ মিনতি জানাল। বললে, স্বর নামিয়ে বললে, 'কিন্তু দেখিস, একা একা আসবি।'

পাগল? কিন্তু এমন দরদী-মরমী হয় কি করে? কথা কি করে হয় এমন অমিয়জড়িত?

'আসব।'

'আর শোন, একটু বেশি-বেশি আসবি। প্রথম আলাপের পর বরং একটু ঘন-ঘনই আসে। কেমন, আসবি তো?'

'চেষ্টা করব।'

ঘরের মধ্যে ফের চলে এল দুজনে। একদৃষ্টে নরেন দেখতে লাগল রামকৃষ্ণকে। পাগল কি এমন সদালাপ করে, পাগলের কি ভাবসমাধি হয়? পাগল কি ঈশ্বরের জন্যে পাগল হয়?

'লোকে স্ত্রী-পুত্রের জন্যে ঘটি-ঘটি চোখের জল ফেলে,' বলতে লাগল রামকৃষ্ণ, 'কিন্তু ঈশ্বরের জন্যে কাঁদে কে? কাশী যাওয়া কী দরকার যদি ব্যাকুলতা না থাকে! ব্যাকুলতা থাকলে এইখানেই কাশী। এত তীর্থ, এত জপ, হয় না কেন? যেন আঠারো মাসে বৎসর। হয় না তার কারণ ব্যাকুলতা নেই। যাত্রার গোড়ায় অনেক খচমচ-খচমচ করে, তখন শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যায় না। তারপর নারদ ঋষি যখন ব্যাকুল হয়ে বৃন্দাবনে এসে বীণা বাজাতে-বাজাতে ডাকে আর বলে, প্রাণ হে, গোবিন্দ মম জীবন! তখন কৃষ্ণ আর থাকতে পারেন না। রাখালদের সঙ্গে সামনে আসেন আর বলেন, ধবলী রও! ধবলী রও!'

'দেখা যায় ঈশ্বরকে?' কে একজন জিগগেস করলে।

'তিনি আছেন, আর তাঁকে দেখা যাবে না? যেকালে তিনি আছেন সেকালে দ্রষ্টব্য হয়েই আছেন।'

'আছেন?'

'জগৎ দেখলেই বোঝা যায় তিনি আছেন। কিন্তু তাঁর বিষয়ে শোনা এক তাঁকে দেখা আর-এক। কিন্তু দেখার উপরেও বড় কথা আছে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করা। কেউ দুধের কথা শুনেছে, কেউ দেখেছে, কেউ খেয়েছে। দেখলেই আনন্দ, খেলেই বল-পুষ্টি।'

সমস্ত যেন প্রত্যক্ষ করেছে এমনি প্রজ্বলন্ত অনুভূতি। পাগল বলতে চাও বলো কিন্তু তার উর্জস্বান ত্যাগ দেখ। ঈশ্বরের জন্যে সর্বস্বত্যাগ। দেখ তার আয়সী-কঠিন পবিত্রতা। তার অমল-ধবল আনন্দ। তার অতল-গভীর শান্তি। এ

যদি পাগল হয় তবে পাগলের আরেক নাম সচ্চিদানন্দ।

নরেনের মনে হল পরম তীর্থে বসে আছি। যার দ্বারা মানুষ দুঃখ থেকে পার হয় তার নাম তীর্থ। জল ত্রাণ করে না, উলটে ডুবিয়ে মারে। নৌকোই তীর্থ, সেই উত্তীর্ণ করে দেয় নদ-নদী। রামকৃষ্ণ সেই ভবসাগরতারণি। সকল তীর্থের সার।

এবার উঠতে হয় নরেনের।

প্রণাম করল। প্রেমস্মিতস্নিগ্ধহাস্যে তাকিয়ে রইল রামকৃষ্ণ।

'কোথায় আর যাবি, কত দূর? তোকে এই তীর্থপ্রদ পাদসরোজপীঠে আসতেই হবে বারে-বারে। তোকে নির্বিতর্ক হতে হবে, নিঃসংশয় হতে হবে। অবগাহন করতে হবে এই করুণাঘন অগাধ সমুদ্রে। বেরুতে হবে জগজ্জয়ের মশাল নিয়ে। আজ যা।

'আর কোন মিঞার কাছে যাইব না।' গাজীপুর থেকে লিখছে বিবেকানন্দ: 'এখন সিদ্ধান্ত এই যে—রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব সিদ্ধি আর সে অপূর্ব অহেতুকী দয়া, সে ইন্টেন্স সিম্‌প্যাথি বদ্ধজীবনের জন্য—এ জগতে আর নাই···তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি কখনো আমার প্রার্থনা গরমঞ্জুর করেন নাই—আমার লক্ষ অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন—এত ভালোবাসা আমার পিতা-মাতায় কখনো বাসে নাই। ইহা কবিত্ব নহে, অতিরঞ্জিত নহে, ইহা কঠোর সত্য এবং তাঁহার শিষ্যমাত্রেই জানে। বিপদে, প্রলোভনে ভগবান রক্ষা করো, বলিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছ—কেহই উত্তর দেয় নাই—কিন্তু এই অদ্ভুত মহাপুরুষ বা অবতার বা যাই হউন, নিজে অন্তর্যামিত্বগুণে আমার সকল বেদনা জানিয়া নিজে ডাকিয়া জোর করিয়া সকল অপহৃত করিয়াছেন। যদি আত্মা অবিনাশী হয়—যদি এখনো তিনি থাকেন, আমি বারংবার প্রার্থনা করি, হে অপারদয়ানিধে, হে মমৈকশরণদাতা রামকৃষ্ণ ভগবান, কৃপা করিয়া আমার এই নরশ্রেষ্ঠ বন্ধুবরের সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো। আপনার সকল মঙ্গল, এ জগতে কেবল যাঁহাকে অহেতুক দয়াসিন্ধু দেখিয়াছি, তিনিই করুন।'

আজ যা। আবার আসিস। দেখিস দেরি করিস নে যেন।

'মনের কথা কইবো কি সই কইতে মানা
দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না।
মনের মানুষ হয় যে জনা
নয়নে তারে যায় গো চেনা
সে দু-এক জনা।

BanglaBook.org

সে যে রঙ্গে ভাসে প্রেমে ডোবে
করছে রসের বেচাকেনা ॥
মনের মানুষ মিলবে কোথা
বগলে তার ছেঁড়া কাঁথা,
ও সে কয় না কথা।
মনের মানুষ উজান পথে করে আনাগোনা ॥'

কেশব সেনকে বললে রামকৃষ্ণ : 'জগদম্বা তোমাকে একটা শক্তি, মানে বক্তৃতা-শক্তি দিয়েছেন বলে তুমি জগৎমান্য হয়েছ, কিন্তু মা দেখাচ্ছেন নরেন্দ্রের ভিতরে আঠারোটা শক্তি আছে। নরেন্দ্র খানদানী চাষা, বারো বছর অনাবৃষ্টি হলেও চাষ ছাড়ে না।'

নরেন্দ্র খাপখোলা তরোয়াল।

মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙাচক্ষু বড় রুই—আর সব পোনা, কাঠিবাটা। অন্যেরা কলসী-ঘটি, নরেন্দ্র জালা।

'ওর মদ্দের ভাব—পুরুষভাব ; আর আমার মেদি ভাব—প্রকৃতিভাব।'

ওরে আয়, দেখা দে। সেই যে আসবি বলে গেলি, আর এলি না। আমি যে তোর জন্যে পথ চেয়ে বসে আছি। তুই এলে আমি বিহ্বল হই, বিবশ হয়ে পড়ি ; জানি, সব জানি, তবু তুই আয়।

॥ ৭৭ ॥

বাড়ি ফিরে এল নরেন। ফিরে এল তার নিভৃত অন্ধকারে।

চক্ষু মেলে কী দেখে এল সে দক্ষিণেশ্বরে! বৈরস্য ও নৈরাশ্যের মরুভূমিতে এ কে সজলতা ও সরসতার অভিষেক! দৈন্য মালিন্যের মাঝে এ কে প্রসাদ-পবিত্র আনন্দ! ধূলি ও গ্লানির রাজ্যে নির্মলশ্যামল নিমুক্তি! নিত্য অভাবের দেশে অমৃতপুঞ্জিত পরিপূর্ণতা! স্বপ্ন দেখে এল নাকি নরেন? নাকি রঙ্গমঞ্চের অভিনয়?

যাই বলো, পাগল ছাড়া কিছু নয়। পাগল না হলে বলে কিনা ঈশ্বরকে দেখা যায় স্বচক্ষে? কি করে দেখবে? যে নির্বিকার নিরাধার গুণাতীত লোকাতীত, যে অবাঙমনসোগোচর, সে কখনো ধরা দেয় চোখের সমুখে? তুমি দাঁড়াও, আমি দেখি—বললেই সে কি আকারিত হয়? যে অকায়, তার আবার আকার কি! যে অসঙ্গ তার আবার সীমা কোথায়! যে অরূপ সে তো দিগদেশ-কালশূন্য।

নরেন পড়েছে, যা আত্মা তাই ঈশ্বর। আত্মা অজ, তার জন্ম নেই। অমর, তার মৃত্যুও নেই। নিরবয়ব বলেই অজ। নির্বিকার বলেই অবিনাশী। এ হেন যে আত্মা সে আবার মূর্তি ধরবে কি? মূর্তি ধরলে কোন মূর্তি ধরবে? যে ব্যাপী তার পরিচ্ছেদ কোথায়, পৃথকত্ব কোথায়?

কিন্তু এমনভাবে বললেন, উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সেই স্থির-স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দুই চক্ষের আলোয় কোথাও যেন একটুকু ছায়া থাকে না সন্দেহের। দেখা যায় ঈশ্বরকে—এ যেন চোখের সামনে এই দেয়াল দেখার মত। ভোরে উঠে সূর্য দেখার মত। রাত্রে উঠে অন্ধকার দেখার মত। কথার মধ্যে এতটুকু গায়ের জোর নেই, এ যেন সরল জল-ভাত। এ যেন বিশ্বাসের পাষাণে আন্তরিকতার শিলালিপি। সত্যের কষ্টিপাথরে সারল্যের স্বর্ণাক্ষর।

কিন্তু কি হলে, কি করলে দেখা দেবেন ঈশ্বর? খুব করে বিনতি-মিনতি করব—স্তুতি-চাটুক্তি করব? তা হলেই কি ঈশ্বর কান পাতবেন? মিথ্যে কথা। আমাকে যদি কেউ খোশামোদ করে, আমি তো বেজায় চটে যাই। যা আমার কাছে বিরক্তিকর, তাই ঈশ্বরের কাছে সুখকর হবে? আর, নিজেকে যে অত্যন্ত ছোট বলে ভাবব সেটাও তো মিথ্যে ভাবা হবে। আমিও তো দীনের দীন হীনের হীন নই—আমার চেয়েও তুচ্ছ আমার চেয়েও অধম লোক আছে অনেক সংসারে। তাই মিথ্যে কথায় বাজে কথায় ঈশ্বর মুগ্ধ হবেন এ ক্ষুদ্রতা যেন আমার না হয়। তা ছাড়া আমার চেয়ে অনেক যিনি বেশি বোঝেন, তিনি আমারই আদেশ অনুরোধের অপেক্ষা করছেন, এ বুদ্ধি স্পর্ধার নামান্তর। তিনি কি করবেন, না-করবেন তা আমার বলা না-বলায় ঠিক হবে না। তাই যতই কেননা 'দেখা দাও' 'দেখা দাও' বলে দেয়ালে মাথা ঠুকি, মাথাই ভাঙবে, দেয়াল নড়বে না একচুল।

ঈশ্বর কি একটা বস্তু? একটা দ্যুতি? একটা দ্যোতনা? তাঁকে কি করে দেখা যাবে?

তাঁকে দেখা যায় না। তিনি কি শিলা, না দারু, না ভূমি! তিনি কি কাঠ-খড়, না তাম্র-পিত্তল?

আর তাঁকে দেখেই বা আমার কী লাভ! তাঁকে দেখলেই কি আমার তাপ-ত্রয় ঘুচে যাবে? তাই যদি হত, তবে এত যাঁর করুণা আর ঐশ্বর্য, তিনি দর্শন দিয়ে সমস্ত জীব-জগৎকে একযোগে মুক্ত করে দিতেন। লোকের শোক-ক্রন্দন দৈন্য-অনুনয়ের জন্যে বসে থাকতেন না।

কে বলে তিনি প্রত্যক্ষীভূত নন? 'বল দেখি রে তরুলতা, আমার জগজ্জীবন

আছেন কোথা ?'—এ কান্নার প্রয়োজন কি! তিনি তো হাতের কাছেই আছেন, এই আমার চোখের কাছে। তাঁকে আবার দেখব কি, পাব কি! তাঁকে তো প্রতিক্ষণেই দেখছি, প্রতিক্ষণেই তো ডুবে রয়েছি, মিশে রয়েছি তাঁতে। যিনি সর্বত্রস্থ, তাঁর আবার দূর-নিকট কি—যিনি সর্বব্যাপী, তিনি তো অন্তরে বাহিরে সমান বর্তমান। তিনি তো আমার মধ্যেও আছেন। চমকে উঠলে নাকেন। মনে পড়ল দক্ষিণেশ্বরের সেই স্তববাণী : 'তুমিই সেই পুরাণ পুরুষ, তুমিই সেই নররূপী নারায়ণ—'

আমিই সেই ?

'চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং ?' আমিই কি সেই ওঙ্কারগম্য সঙ্গহীন শিব ? মনোবাগতীত প্রকাশস্বরূপ ? নিরাকার, অত্যুজ্জ্বল, মৃত্যুহীন ?

কে বলে ? উন্মাদ ! যে বলে সে উন্মাদ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যদি সে উন্মাদ তবে সে এত ভালোবাসে কেন ? চেনে না শোনে না নিজেকে লুকিয়ে রাখে সরিয়ে রাখে, অথচ আলো-বাতাসের মত আপ্রাণ ভালোবাসে, সে কি উন্মাদ ?

দূর ছাই, ভাবব না তার কথা। কিন্তু না ভেবে থাকো তোমার সাধ্য কি! থেকে-থেকেই সে লোক কেবল উঁকিঝুঁকি মারে। বলে, যদি তুমি আছ তা হলে আমিও আছি।

যদি আমি আছি তা হলে তুমিও আছ। এই 'তুমি'টির কি কোন মানস মূর্তি নেই ? নেই কোন মানুষ মূর্তি ? থেকে-থেকেই ঠাকুরের মোহন মূর্তি দেখা দেয় চোখের সামনে। দয়াঘন আনন্দকন্দ জগদ্বন্ধু।

দূর ছাই, যাই আরেকবার দক্ষিণেশ্বর। তাঁকে আরেকবার দেখে আসি।

এ কি শুধু অলস কৌতূহল, না আর কোন অনিবার্য আকর্ষণ ? যদি আকর্ষণই হয় তবে এর পেছনে যুক্তি কি ? চুম্বক লোহাকে টানে, সূর্যে-চন্দ্রে জোয়ার ভাটা খেলে ? এর মধ্যে সঙ্গত ব্যাখ্যা কোথায় ? আর যারই উদ্দেশ্য-উপলক্ষ থাক, ভালোবাসা অহেতুক। তিনি যে ভালোবাসেন। তাঁর ভালোবাসায় যে হিসেব নেই, জিজ্ঞাসা নেই।

সূর্যের আলোতেই যেমন সূর্যকে দেখি তেমনি তাঁর করুণাতেই তাঁকে দেখব।

মাসখানেক পরে আবার একদিন হাজির হল দক্ষিণেশ্বরে। পথ যেন আর শেষ হতে চায় না। কে জানত এত দূরের রাস্তা আর এত কষ্টকর! সেদিন সুরেশ মিত্তিরের গাড়িতে করে এসেছিল বলে বুঝতে পারেনি। যাই, ফিরে যাই। বৃথা এই সন্ধান-ক্লান্তি। পথশ্রমের হয়তো শেষ আছে কিন্তু পণ্ডশ্রমের শেষ কই।

কিন্তু, যাই বলো, নেই আর ফিরে যাওয়া। চুম্বকের টানের কাছে লোহা নিরুপায়, সূর্য-চন্দ্রের কাছে নদী ইচ্ছাশূন্য। এ গতি নিরঙ্কুশ। এ গতি কৃষ্ণাকর্ষী। দক্ষিণেশ্বর কোন দিকে যাব বলতে পারেন?

আরো উত্তরে যাবে। সেখানেই আছেন সেই লোকোত্তর। উত্তর দেবেন স্বদক্ষিণ বলে।

সেদিনের মতই ছোট তক্তপোশটিতে বসে আছে রামকৃষ্ণ। যেন কার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে। ঘরে লোক-জন নেই। যেন কথা কইবার লোক নেই সংসারে। উদাস, নিরলম্বের মত চেয়ে আছে শূন্য চোখে। যেন উৎকর্ণ হয়ে শুনছে কার পদধ্বনি।

তুই এসেছিস? নরেনকে দেখে আহ্লাদে ফেটে পড়ল রামকৃষ্ণ। আয়, আয় বোস আমার পাশটিতে। মুখখানি শুকিয়ে গেছে দেখছি। কিছু খাবি?

একটু দূরে কুণ্ঠিত হয়ে বসল নরেন। রামকৃষ্ণ সরে আসতে লাগল। তোর কুণ্ঠা, কিন্তু আমার অজস্রতা। তুই দূরে বসিস আর আমি সরে-সরে আসি। চুম্বকই শুধু লোহাকে টানে না, লোহাও ডাকে চুম্বককে।

পাগল না-জানি অদ্ভুত কি করে বসে তারই ভয়ে সঙ্কুচিত হল নরেন। ঠিক তাই, রামকৃষ্ণ তার ডান পা নরেনের গায়ের উপর তুলে দিলে। মুহূর্তে কী যে হয়ে গেল বোঝা গেল না। মনে হল দেয়াল-দালান সব যেন মহাবেগে উড়ে চলেছে, বিরাট আকাশের ব্যাপ্তির মধ্যে মিশে যাচ্ছে এই ক্ষুদ্র আমিত্বের অস্তিত্ব। আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে পড়ল নরেন। আমিত্বের নাশই তো মৃত্যু। সেই মৃত্যুই বুঝি এখন উপস্থিত।

চেঁচিয়ে উঠল নরেন: 'ওগো, তুমি আমার এ কী করলে? আমার যে মা-বাপ আছেন।'

খল-খল করে হেসে উঠল রামকৃষ্ণ। তাই আছে নাকি? যখন তোর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল, জিজ্ঞাসাও করিনি, তোর বাপের নাম কি? তোর বাপের কখানি বাড়ি? আয়-আদায় কত?

আমার মদ খাওয়া নিয়ে কথা। যেখানে আমার এক বোতলেই কাজ হয়ে যায়, সেখানে শুঁড়ির দোকানে কত মদ আছে সে হিসেবে আমার দরকার কী! নরেনের আর্তস্বর কী রকম যেন লাগল বুকের মধ্যে। তার বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল রামকৃষ্ণ। স্নেহস্নাত করুণকোমল হাত।

'তবে থাক, এখন থাক, একেবারে কাজ নেই। কালে হবে। আস্তে-আস্তে হবে।'

অমনি নিমেষে আবার সব স্বাভাবিক হয়ে গেল। সেই ঘর সেই দেয়াল—সেই

সব এখানে-ওখানে। তবে এটা কী হয়ে গেল চকিতের মধ্যে? ভোজবাজি? এই কি মন্ত্র-তন্ত্র-ইন্দ্রজাল?

না কি এই জীবনেই জন্মান্তর ঘটে গেল নরেনের?

কিছু না, কিছু না। হিপ্‌নটিজম জানে লোকটা, তারই প্রভাবে সহসা সম্মোহিত করে ফেলেছে।

তাই বা মেনে নিতে মন সায় দিচ্ছে কই? আমি এমন একজন দৃঢ়কায় লোক, এত আমার মনের জোর, আমিই এত সহজে অভিভূত হয়ে পড়ব? যাকে পাগল বলে ঠাউরেছি, হব তারই হাতের পুতুল? কে জানে কি শক্তি ধরে লোকটা, দরকার নেই তার কাছে এসে, ভেলকি লাগিয়ে কি অঘটন ঘটায় তার ঠিক কি!

অমনি পরমুহূর্তেই মন আবার রুখে দাঁড়াল। পালিয়ে যাবার কোনো মানে হয় না। লোকটা যদি পাগলই হয় তবে প্রমাণ করতে হবে সেই পাগলামি। কঠিন-কঠোর পাথরকে যে এক নিমেষে একতাল কাদা বানাতে পারে, এক কথায় তাকে পাগল বললেই তার ব্যাখ্যা হয় না। শিশুর অধিক সারল্য, মা'র অধিক ভালোবাসা আর ফুলের অধিক শুচিতা—এদের সমাহারে পাগলামির জন্ম হয় এ কথনো শুনিনি। না, বিচার-বিশ্লেষণ করে একটা শান্ত সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছুতেই হবে। দাঁড়াতে হবে এ প্রশ্নের মুখোমুখি, করতে হবে এ রহস্যের উন্মোচন। প্রহেলিকা বলে পালিয়ে যাব না। কুহেলিকা বলে আচ্ছন্ন হতে দেব না নিজেকে। আয়ত্তাতীতকে আনতে হবে ইয়ত্তার মধ্যে। সংশয় থেকে আসতে হবে সংকল্পে। হয় এস্‌পার নয় ওস্‌পার। হয় প্রত্যাখ্যান নয় সমর্পণ।

তাই ঠাকুর যখন একদিন বললেন, 'নরেন্দ্র, তুই কি বলিস! সংসারী লোকেরা কত কি বলে! কিন্তু ছাখ, হাতি যখন চলে যায়, পেছনে কত জানোয়ার কত রকম চিৎকার করে, কিন্তু হাতি ফিরেও চায় না। তোকে যদি কেউ নিন্দা করে, তখন তুই কী মনে করবি?'

নরেন্দ্র বললে, 'আমি মনে করব কুকুর ঘেউ-ঘেউ করছে।'

না, পালিয়ে যাব না। যে যাই বলুক, একটা হয়-নয় করে যাব। এই পরম অদ্ভুতের স্বরূপ বুঝব ঠিক-ঠিক। হটে যাব না, ছেড়ে দেব না, শানের উপর আছড়ে-আছড়ে টাকা বাজিয়ে নেব। দেখব এতে কতটা খাদ, কতটা ভেজাল, কতটা মেকি।

সব আবার সহজ হয়ে গেল। দুজনে যেন সৌভাগ্যের দিনের আত্মীয়, নিঃসঙ্গ-বাসের বন্ধু।

কত অন্তরঙ্গ কথা, কত রঙ্গ-রস, কত হাস্য-পরিহাস। তার পর আবার কাছে বসে খাওয়ানো। গায়ে হাত বুলিয়ে দেওয়া। ছেড়ে দিতে মন-কেমন করা। আসন্ন সন্ধ্যা তো নয়, ঘনায়মান বিষণ্ণতা। ও আবার চলে যাবে। ওর আবার বাড়ি আছে, বাপ-মা আছে—

রামকৃষ্ণের চোখ ছলছল করে এল।

আর সব কিছুরই হয়তো সমাধান মেলে, মেলে না শুধু ভালোবাসার। সূর্যের আলোর হয়তো ব্যাখ্যা হয় কিন্তু চন্দ্রের কেন এত ভুবনপ্লাবন জ্যোৎস্না?

এবারে তবে উঠি?

'কিন্তু আবার শিগগির আসবি বল—যেমন নতুন পতি ঘন ঘন আসে তেমনিই আসবি বেশি বেশি। ওরে তোকে যখন দেখি, তখন আমি সব ভুলে যাই।' আসব।

প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিল রামকৃষ্ণ।

হাজরা বললে, 'তুমি ছোকরাদের কথা এত ভাবো কেন? যদি নরেন-রাখাল নিয়েই ব্যস্ত থাকো তবে ঈশ্বরকে ডাকবে কখন?'

বলরাম বোসের বাড়ি যাচ্ছে রামকৃষ্ণ, মহা ভাবনায় ধরলো। সত্যি কথা তো, ভুল বলেনি। ওর পাটোয়ারি বুদ্ধি, ওর চুল-চেরা হিসেব। সত্যিই তো, যখন থেকে রাখাল-নরেন এসেছে তখন থেকে ওদের কথাই তো বুক জুড়ে রয়েছে। মায়ের কথা ভুলে আছি।

মাকে তাই বললে রামকৃষ্ণ, মা, এ কেমনতরো হল? তোমাকে ছেড়ে এখন যে কেবল ছোকরাদেরই চিন্তা করছি। হাজরা মুখের উপর কথা শুনিয়ে দিলে। মা বুঝিয়ে দিলেন। বুঝিয়ে দিলেন তিনিই মানুষ হয়েছেন। শুদ্ধ আধারে তাঁরই বিশদ বিকাশ। ঘোল ছেড়ে মাখন পেয়ে তখন বোধ হয় ঘোলেরই মাখন মাখনেরই ঘোল।

সমাধি-দর্শনেরই পর হাজরার উপর রাগ হল। শালা আমার মন খারাপ করে দিয়েছিল।

তার পর আবার ভাবলে, হাজরার দোষ কি! সে জানবে কেমন করে? তাঁকে দেখবার পর সবতাতেই তাঁকে দেখা যায়। মানুষে তাঁর বেশি প্রকাশ। তার মধ্যে যারা আবার শুদ্ধসত্ত্ব তাদের মধ্যে তিনি আরো উচ্চারিত। সমাধিস্থ ব্যক্তি যখন নেমে আসে তখন কিসে সে মন দাঁড় করাবে? তাই তো সত্ত্বগুণী ভক্তের দরকার। ভক্তির এই নজির পেয়ে তবে বাঁচল রামকৃষ্ণ।

ভাবসমুদ্র উথলালেই ডাঙায় একবাঁশ জল। নদী দিয়ে সমুদ্রে আসতে হলে

এঁকে-বেঁকে আসতে হয়। বন্যা এলে আর ঘুরে যেতে হয় না। তখন নদীতে-সমুদ্রে একাকার। তখন ডাঙার উপর দিয়েই দোজা চলে যাবে নৌকো।

ভগবানের লীলা যে আধারে বেশি প্রকাশ সেখানেই তাঁর বিশেষ শক্তি। জমিদার সব জায়গায় থাকেন, কিন্তু অমুক বৈঠকখানায়ই তাঁর বিশেষ গতিবিধি। তেমনি ভক্তই ভগবানের বৈঠকখানা। ভক্তের হৃদয়েই তাঁর বিশেষ শক্তির উদ্ভাসন। যেখানে কার্য বেশি সেখানেই বিশেষ শক্তির রূপচ্ছটা।

'বুঝলে হে,' কেশব সেনকে বলছে রামকৃষ্ণ: 'যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। যখন নিষ্ক্রিয় তখন ব্রহ্ম, পুরুষ। যখন কর্মময়ী তখন শক্তি, প্রকৃতি। আনন্দময় আর আনন্দময়ী।'

একটু থেমে আবার বললে, 'যার পুরুষ-জ্ঞান আছে তার মেয়ে-জ্ঞানও আছে। যার বাপ-জ্ঞান আছে তার মা-জ্ঞানও আছে।'

কেশব একটু হাসল।

'যার সুখ-জ্ঞান আছে তার দুঃখ-জ্ঞানও আছে। যদি রাত বুঝি তবে দিনও বুঝেছি। যদি বলি আলো তবে আবার বলব অন্ধকার। তুমি এটা বুঝেছ?'

'হ্যাঁ বুঝেছি।'

'মা মানে কি? মা মানে জগতের মা। যিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন, পালন করছেন তিনি। যিনি সর্বদা রক্ষা করছেন তাঁর ছেলেদের। আর যে যা চায়, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, সব দিচ্ছেন দু হাতে। ঠিক যে ছেলে সে মা ছাড়া থাকতে পারে না। তার মা-ই সব জানে। ছেলে খায়-দায় বেড়ায়—অতশত জানে না। কি, বুঝেছ?'

কেশব ঘাড় নাড়ল। আজ্ঞে হ্যাঁ, বুঝেছি।

॥ ৭৮ ॥

ব্রাহ্ম ভক্তদের সঙ্গে স্টীমারে করে বেড়াতে গিয়েছে রামকৃষ্ণ।

ব্রহ্মরূপ সমুদ্রে যখন বান ডাকে তখন তার অনাশ্রয় আত্মাকে তা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সমুদ্র হচ্ছে নিরাকার ঈশ্বর আর তার লহরী হচ্ছে সাকার।

ভাবমগ্ন হয়ে বসে আছে রামকৃষ্ণ, একজন একটি দুরবীন নিয়ে তার কাছে এল। বললে, 'এর ভিতর দিয়ে একবার দেখুন।'

এর ভিতর দিয়ে তাকালে কী এমন আর দেখা যাবে, যিনি অণু হতে অণীয়ান, তাঁকে বিশালতম করে দেখছি। যিনি দর্বিষ্ঠ তাঁকে দেখছি অন্তিকতম করে। ব্রহ্মকে দেখতে দুরবীন লাগে না। তাঁর তো দূরের বীণা নয়, তাঁর হচ্ছে অন্তরের বীণা।

সেদিন আবার এক স্টীমার এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। স্টীমারে রেভারেণ্ড কুক আর মিস পিগট। ব্রাহ্মভক্তরা নিয়ে এসেছে তাদের। ধর্ম বিষয়ে বড় একজন বক্তা এই কুক সাহেব—রামকৃষ্ণকে দেখতে বড় সাধ। রামকৃষ্ণকে দেখতে মানে মূর্তিমান ভারতবর্ষকে দেখতে। ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মকে দেখতে।

খবর পেয়ে রামকৃষ্ণ নিজেই এল নদীর ঘাটে।

সকলের পীড়াপীড়িতে উঠে গেল স্টীমারে। উঠে গেল গভীর ভাবাবেশের মধ্যে। পশ্চিমের জ্ঞান বিমুগ্ধ হয়ে দেখল এই ভারতীয় ভক্তি। ভক্তির পায়ের কাছে জ্ঞান মাথা নোয়াল। উপলব্ধির কাছে স্তব্ধ হল বক্তৃতা।

তোমাদের কেবল লেকচার দেওয়া আর বুঝিয়ে দেওয়া। তোমাকে কে বোঝায় তার ঠিক নেই! তুমি বোঝাবার কে হে? যাঁর জগৎ তিনি বোঝাবেন। তিনি এত উপায় করেছেন, আর এ উপায় করবেন না? বেশ করছি, আমি মাটির প্রতিমা পূজা করছি। এতে যদি কিছু ভুল হয়ে থাকে, তা তিনি কি জানেন না যে তাতে তাঁকেই ডাকা হচ্ছে?

নিশ্চয়ই হচ্ছে। যে মাকে লক্ষ্য করে গান বা প্রার্থনা করছে রামকৃষ্ণ সে মা যেন চোখের সামনে জলজীয়ন্ত দাঁড়িয়ে। কথা বা গানের ভাষাও প্রাণতৃপ্ত। কে বলে সে শুধু মৃৎমূর্তি, কে বা বলে সে শুধু শূন্যরূপা? সে মা সর্বসাম্রাজ্যদায়িনী মহামায়া। অতিবিস্তীর্ণকান্তি কাননকুন্তলা পৃথিবী।

আপনি শুতে জায়গা পায় না, শঙ্করাকে ডাকে। নিজে জানি না, পরকে বোঝাই। এ কি অঙ্ক না ইতিহাস না সাহিত্য যে পরকে বোঝাব? এ যে ঈশ্বরতত্ত্ব। নুনের পুতুল হয়ে যে-ই গেছে সমুদ্র মাপতে সে-ই গলে গেছে। যে গলে যায় সে আবার ফিরে এসে বলবে কি!

আবার জাহাজ এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। ঘরে বসে বিজয় গোস্বামী আর হরলালের সঙ্গে কথা কইছে রামকৃষ্ণ। জাহাজে কেশব এসেছে—ব্রাহ্মভক্তরা এসে বললে। চলুন একটু বেড়িয়ে আসবেন আমাদের সঙ্গে।

এক কথায় রাজী। কেশব যখন আছে তখন আবার কথা কি! বিজয়কে নিয়ে নৌকোয় উঠল রামকৃষ্ণ। নৌকোয় উঠেই সমাধিস্থ।

নৌকো থেকে জাহাজে তোলাই মুশকিল। কেশব ব্যস্তসমস্ত হয়ে সব তদারক করছে। অনেক কষ্টে বাহ্যজ্ঞান আনতে পারলেও ঠিক-ঠিক পা ফেলতে পারছে না রামকৃষ্ণ। ভক্তের গায়ের উপর ভর দিয়ে আসছে।

ক্যাবিনে আনা হল। বসানো হল চেয়ারে। কেশব লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করলে। সঙ্গে-সঙ্গে অন্যান্য ভক্তরা। যে যেখানে পেল বসে পড়ল মেঝেতে। বিস্তর ভিড়

চারদিকে। যারা ঢুকতে পায়নি তারা শুধু এখানে-ওখানে উঁকি-ঝুঁকি মারছে। স্পর্শন না পাই শুধু একটু দর্শন হোক। যদি দর্শনও না জোটে পাই যেন তার একটু অমৃতবর্ষণ।

ঘরের জানালাটা খুলে দিল কেশব। বিজয়কে দেখেই সে অপ্রস্তুত হয়ে গেল। যে একদিন অত্যাগসহন বন্ধু ছিল সে-ই আজ বিরুদ্ধ-বৈরী। অথচ ছায়াসন্ধানে দুজনেই এক তরুমূলে সমাগত। একই নদীর ঘাটে এসে অঞ্জলিতে করে একই পিপাসার বারি তুলে নিয়েছে।

সমাধি ভেঙেছে রামকৃষ্ণের। তবু এখনো ঘোর রয়েছে ষোল আনা। মাকে বলছে, 'মা, আমাকে এখানে তুই আনলি কেন? বেড়ার ভিতর থেকে কি পারব এদের রক্ষা করতে?'

এদের যে সব কাম-কাঞ্চনে হাত-পা বাঁধা। বেড়ার মধ্যে সব বেড়ি পরে বসে আছে। ওদের কি পারব আমি মুক্ত করতে?

গাজীপুরের নীলমাধববাবু আছেন। গাজীপুরের সেই সাধু পওহারী বাবার কথা উঠল। পওহারী মানে পও-আহারী, অর্থাৎ কিনা বায়ুভুক্ সন্ন্যাসী।

মাটিতে বিরাট এক গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে ধ্যান করে পওহারী। উপরে ছোট একটি আশ্রম, সেখানে প্রেমাস্পদ প্রভু রামচন্দ্রের পূজা আর নিজের হাতে বিরাট ভোগ রান্না করে দরিদ্রের মধ্যে পরিবেশন। এই তার সাধন-ভজন।

নিজের খাবার বেলায় এক মুঠো তেতো নিমপাতা, নয়তো গোটা কয় কাঁচা লঙ্কা। তার পর গর্তের মধ্যে এক-এক সময় এত দীর্ঘকাল সমাধিস্থ হয়ে থাকে, লোকে ভেবে পায় না সাধু খায় কি? সাপের মত নিশ্চয়ই শুধু বাতাস খেয়ে থাকে। সেই থেকে তার নাম হয়েছে পওহারী।

এরই আশ্রমে একদিন চোর এসেছিল। পোঁটলা বেঁধে জিনিসপত্র নিয়ে গিয়েছিল চুরি করে। পওহারী বাবা দেখতে পেয়ে তার পিছু নিল। ভয় পেয়ে পোঁটলা ফেলে চম্পট দিল চোর। তবু পওহারী বাবা তার পিছু ছাড়ে না। জিনিস পেয়ে গিয়েছে তবু ছাড়ান-ছোড়ান নেই। চোর কি করে পারবে সাধুর সঙ্গে, জোরে ছুটে চোরকে ধরে ফেললে পওহারী। কোথায় চোর কাকুতি-মিনতি করবে, পওহারী বাবাই স্তুতি-মিনতি করতে লাগল। চোরের পদপ্রান্তে পোঁটলা নামিয়ে রেখে করজোড়ে ক্ষমা চাইল। বললে, অনেক ব্যাঘাত ঘটিয়েছি প্রভু, তাই নিশ্চিন্ত মনে পোঁটলাটি তোমার নেওয়া হল না। আমাকে ক্ষমা করো। নাও এই সামান্য উপহার। এ পোঁটলা আমার নয়, এ তোমার।

,সেই পওহারী বাবা,' বললে একজন ব্রাহ্মভক্ত, 'নিজের ঘরে আপনার ছবি টাঙিয়ে রেখেছে।'

নিজের দিকে আঙুল দেখালো রামকৃষ্ণ। বললে, 'এই খোলটার।'

বালিশ আর তার খোল—তার মানে দেহী আর দেহ। বাইরেটা দেহ, অন্তরে দেহী, তার মানে অন্তর্যামী। দেহের ছবি নিয়ে কি হবে? ছাপ নাও সেই অন্তরঙ্গের।

তিনি এক, তাঁর নাম আলাদা, রূপ আলাদা। একই ব্রাহ্মণ যখন পূজা করে তখন তার নাম পূজুরি, যখন রান্না করে তখন রাঁধুনে। একই লোক যখন মা'র কাছে তখন ছেলে, যখন স্ত্রীর কাছে তখন স্বামী, যখন ছেলের কাছে তখন বাপ। একই জল, কেউ বলে জল, কেউ বলে পানি, কেউ বলে ওয়াটার। একই ভাব, নানান নামের টুকরোয় ফেটে পড়ে। একই শুভ্রতা রূপ নিয়েছে সাতরঙা রামধনু।

'কালীর কথা বলুন।' জিগগেস করল কেশব। 'কালী কালো কেন?'

'দূরে আছে বলে কালো দেখায়। জানতে পারলে আর কালো নয়। তখন আলো। আকাশ দূর থেকেই নীল, যদি কাছে যাও দেখবে রঙ নেই—সাদা। সমুদ্রের জলও তাই—দূর থেকেই নীল, কাছে গেলে সাদা।'

'তিনি যদি লীলাময়ী ইচ্ছাময়ী, তবে তিনি তো ইচ্ছে করলেই আমাদের সকলকে মুক্ত করে দিতে পারেন—তাই দেন না কেন?'

'তাও তাঁরই ইচ্ছে। তাঁর ইচ্ছে তিনি এই সংসারের ছকে জীব-জন্তুর ঘুঁটি চেলে-চেলে খেলা করেন। বুড়িকে আগে থাকতেই ছুঁয়ে ফেললে ছুটোছুটি হয় না। ছুটোছুটি না হলে খেলে সুখ কই? খেলা চললেই বুড়ির আহ্লাদ।'

তবে কি আমরা বুড়ির আহ্লাদের জন্যে কেবল ছুটোছুটি করব?

করলেই বা। মন্দ কি। খেলা চলছে এই তো বেশ। যে ছেলে ছুটোছুটি করে খেলছে আর যে ছেলে বসে আছে মা'র কোলে চেপে, এদের মধ্যে কোন্ ছেলেকে মা'র বেশি পছন্দ?

'সব ত্যাগ না করলে কি পাওয়া যাবে না ঈশ্বরকে?' জিগগেস করলে এক ব্রাহ্মভক্ত।

'তা যাবে না। কিন্তু ত্যাগ তো মনে। মন নিয়েই কথা। সংসার করছ করো কিন্তু মন রাখো ঈশ্বরের হাতের মুঠোয়।'

'সেই তো কঠিন।'

'মোটেই কঠিন নয়। এক পাশে পরিবার, এক পাশে সন্তান নিয়ে শোওনি?

দুজনকে আদর করোনি দু ভাবে? দুই জন দুই ভাব, কিন্তু মন এক। মন নিয়েই সব। যদি সাপে কামড়ায়, আর যদি জোর করে বলো, বিষ নেই, বিষ ছেড়ে যায়। যদি বলো আমি মান-হুঁষ মানুষ, যদি বলো আমি ঈশ্বরের সন্তান, কে আমাকে বাঁধে, দেখবে তুমি নির্বন্ধন, তুমি নির্মুক্ত, তুমি মহাবীর।' রামকৃষ্ণ তাকাল কেশবের দিকে। বললে, 'তোমাদের ব্রাহ্মসমাজেও কেবল পাপ আর পাপী। খৃষ্টানদেরও তাই। যে রাত-দিন কেবল পাপী-পাপী করে সে পাপীই হয়ে যায়। যে কেবল বলে আমি বদ্ধ আর বদ্ধ, সে বধ্যই হয়ে থাকে। বলো আমি রাজরাজেশ্বরের ছেলে, আকাশজোড়া আমার মুক্তি, আকাশজোড়া আমার নির্মলতা, আমাকে ছোঁয় কে, আমাকে কে আটকায়!'

ভাঁটা পড়ে এসেছে। এবার ফেরা যাক। অমৃত কথা শুনতে শুনতে কত দূর চলে এসেছে জল ঠেলে কারু খেয়াল নেই।

কোঁচড়ে করে মুড়িনারকেল খাচ্ছে সবাই। হঠাৎ বিজয়ের দিকে নজর পড়ল রামকৃষ্ণের। কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। তার পাশে আরেক চেয়ারে কেশব বসে। সেও তেমনি জড়সড়। মিটে গেছে ঝগড়া তবু যেন মিশ খাচ্ছে না।

রামকৃষ্ণ তাকাল একবার বিজয়ের দিকে, তারপর কেশবের দিকে। বললে, 'তোমাদের ঝগড়াবিবাদ যেন সেই শিব-রামের যুদ্ধ। জানো তো, রামের গুরু-শিব। দুজনে যুদ্ধও হলো, আবার সন্ধিও হলো। কিন্তু শিবের চেলা ভূতপ্রেত আর রামের চেলা বানর—ওদের ঝগড়া-কিচিমিচি আর মেটে না।'

সবাই হেসে উঠল।

'মায়ে-ঝিয়ে আলাদা মঙ্গলবার করে, এও প্রায় তেমনি। মা'র মঙ্গল আর মেয়ের মঙ্গল এ দুটো যেন আলাদা। এর মঙ্গলেই যে ওর মঙ্গল এ খেয়াল কারুর হয় না। তোমাদের ওর একটি সমাজ আছে, এখন আবার এর একটি দরকার।'

আবার হাসির রোল।

'তবে এ সব চাই। যদি বলো ভগবান নিজে লীলা করছেন, সেখানে জটিলে-কুটিলের কী দরকার! জটিলে-কুটিলে না থাকলে যে লীলা পোষ্টাই হয় না।' বুড়ি-ছোঁয়ার খেলাটিও তাই জটিল-কুটিল। যদি গোলকধাঁধার পথ না হত তবে জমত না খেলা, রগড় হত না। বলতেই বলে, দুশো মজা, পাঁচশো রগড়।

জাহাজ এসে থামল কয়লাঘাটে। গাড়ি আনা হল। কেশবের ভাইপো নন্দলালের সঙ্গে গাড়িতে উঠল রামকৃষ্ণ।

উঠেই মুখ বাড়িয়ে ব্যাকুল স্বরে ডেকে উঠল, কই, কই, তিনি কই?

কাকে রামকৃষ্ণ খুঁজছে বুঝতে কারু দেরি হল না। তাঁকে ডেকে আনল। হাসি-হাসি মুখে কেশব এসে দাঁড়াল সামনে। ভূমিষ্ঠ হয়ে রামকৃষ্ণের পায়ের ধুলো নিল।

ইংরেজটোলার মধ্য দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। ঝকমক করছে রাস্তা, ঝকঝক করছে বাড়ি-ঘর। গ্যাসের আলো জ্বলছে অন্দরে-বাইরে। আকাশে আবার পূর্ণিমার প্লাবন। পিয়ানো বাজিয়ে গান করছে মেম-সাহেবেরা। সর্বত্র যেন আনন্দভাতি। সব দেখে-শুনে রামকৃষ্ণও হাসতে হাসতে চলেছে। হঠাৎ এক সময় বলে উঠল, আমি জল খাব। তেষ্টা পেয়েছে আমার।

এখন কী হবে! রাস্তার মাঝখানে এখন কী করা যায়!

নন্দলাল নামল গাড়ি থেকে। সামনেই ইণ্ডিয়া ক্লাব। সেখান থেকে কাচের গ্লাসে করে জল নিয়ে এল।

সানন্দে সেই জল খেল রামকৃষ্ণ।

নবাগত শিশু যেমন কলকাতা দেখে তেমনি ভাবে মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগল গাড়ি-ঘোড়া, দোকানদানি, দেখতে লাগল শহরের ইট-পাথরের উপর জ্যোৎস্নার অকার্পণ্য।

নন্দলাল নেমে গেল কলুটোলায়। গাড়ি এসে থামল সুরেশ মিত্তিরের বাড়ির সামনে।

সুরেশ বাড়ি নেই। এখন গাড়িভাড়া কে দেবে?

'ভাড়াটা মেয়েদের কাছ থেকে চেয়ে নে না—'

দোতলার ঘরে ঠাকুরকে এনে বসাল সকলে। ফরমাশ দিয়ে নতুন একখানা ছবি আঁকিয়েছে সুরেশ—ঠাকুর কেশবকে সকল ধর্ম সকল সম্প্রদায়ের সমন্বয় দেখাচ্ছেন। সেই ছবি দেওয়ালে টাঙানো। মেঝেতে ফরাস পাতা, তার উপর তাকিয়া। রামকৃষ্ণ বসল সেখানে, বসেই বললে, ওরে তোরা নরেনকে কেউ ডেকে আন।

চাষারা হাটে গরু কিনতে যায়। গরু বাছবার চিহ্ন কি? ল্যাজের নিচে হাত দিয়ে দেখে। ল্যাজে হাত দিলে যে-গরু শুয়ে পড়ে সে-গরু কেনে না। ল্যাজে হাত দিলে যে-গরু তিড়িং-মিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে সেই গরু পছন্দ করে। নরেন আমার সেই গুরুর জাত—ভিতরে জলন্ত তেজ। সে চিঁড়ের ফলার নয়, সে ভ্যাদ-ভ্যাদ করে না।

আহা এখানে এক রকম, ওখানে আরেক রকম। দুরন্ত ছেলে বাবার কাছে যখন বসে, যেন জুজুর ভয়ে চুপ করে বসে, আবার যখন চাঁদনিতে এসে খেলে

তখন তার আরেক মূর্তি। এরা নিত্যসিদ্ধের থাক, সংসারে বদ্ধ হয় না কখনো। একটু বয়স হলেই চৈতন্য হয়, আর ভগবানের দিকে চলে যায়। ওরে কই, এখনো তো এল না নরেন্দর।

নরেন এসেছে, নরেন এসেছে, রব উঠল চারদিকে। রামকৃষ্ণের আনন্দের আগুন দ্বিগুণ হয়ে উঠল।

'আজ কেমন জাহাজে করে বেড়াতে গিয়েছিলাম—' বলতে লাগল নরেনকে, 'সঙ্গে বিজয় ছিল কেশব ছিল, এরা সব ছিল। এদের জিগগেস কর্, কত আনন্দ হল আজ। কেমন বিজয়-কেশবকে মায়ে-ঝিয়ে মঙ্গলবার শোনালুম, বললুম সেই জটিলে-কুটিলের কথা।'

নরেন শুনতে লাগল অতৃপ্য কর্ণে।

ওরে আমার আনন্দের ভাগ তোকে কিছু না দিলে আমি যে একা-একা বইতে পারি না।

॥ ৭৯ ॥

বেড়াতে গিয়ে রাখাল একটি পয়সা কুড়িয়ে পেয়েছে। ভাবলে বাজে লোক যদি পায় নির্ঘাত মেরে দেবে। তার চেয়ে কানা-খোঁড়া ভিক্ষুককে দিয়ে দিলে সদ্ব্যয় হবে পয়সাটার।

ঠাকুরের কাছে কথাটা গোপন করলে না। শিশু যেমন তার মাকে সব কথা খুলে বলে, রামকৃষ্ণের কাছে রাখালের সেই রকম অনাবৃতি।

'একটা পয়সা কুড়িয়ে পেয়েছি। পথে ভিক্ষুক কাউকে দিয়ে দেব।'

ভেবেছিল ঠাকুর বোধ হয় খুশি হবেন, কিন্তু তিনি জ্বলে উঠলেন। তোর দানের জন্যে বিশ্ব ভুবন বসে আছে! পয়সা তো আপনা থেকে তোর মুঠোর মধ্যে চলে আসেনি! তুই কুড়োতে গেলি কেন?

'বা, আমি যে যাচ্ছিলুম ও-পথে। পথের মধ্যে পড়ে রয়েছে।'

'যে মাছ খায় না সে মাছের বাজারেই বা যাবে কেন? তোর যখন নিজের দরকার নেই, তখন কেন তুই ও-পয়সা ছুঁতে গেলি?'

দে ফেলে দে পয়সা।

সেদিন স্নানের আগে ঠাকুরকে তেল মাখাচ্ছে রাখাল। কি খেয়াল হল রাখাল একটা প্রার্থনা করে বসল। প্রার্থনা আর কিছুই নয়, ভাবসমাধি চাই। রাখাল যত চায় রামকৃষ্ণ তত কঠিন হয়।

রাখালও নাছোড়বান্দা। দিতেই হবে আমাকে সেই ঈশ্বরিক অনুভূতির উচ্চতর অবস্থা।

রামকৃষ্ণ তখন কি করে, একটা নিদারুণ কথা বলে রাখালকে আঘাত করে বসল। সেই মর্মান্তিক আঘাতের যন্ত্রণা সইতে পারল না রাখাল। তেলের বাটি হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হন-হন করে ছুটে চলল। থাকবে না আর সে দক্ষিণেশ্বরে। ফিরে যাবে কলকাতা।

কত দূর আর যাবে! ফটক পার হতে না হতেই পা দুটো তার অবশ হয়ে পড়ল। সাধ্য নেই দাঁড়িয়ে থাকে। বসে পড়ল সেইখানে।

একেবারে নিরুপায়! এখন কি করি কোথায় যাই, যেন জলে পড়ল রাখাল। নিরুপায়েরই উপায় আছে। জলেরই আছে আবার তীরাশ্রয়। ফটকের কাছে রামলাল। 'ঠাকুর পাঠিয়ে দিলেন নিয়ে যেতে।'

ক্ষমায় একেবারে মাতা বসুন্ধরার মত। দীনপাবনী করুণার মুক্তধারা।

রামলালের পিছু-পিছু রাখাল চলে এল গুটি-সুটি। অধোবদন হয়ে দাঁড়াল ঠাকুরের সামনে।

'কি রে, পারলি? পারলি গণ্ডি ছাড়িয়ে যেতে?'

সন্ধ্যে বেলায় সেই রাখাল আবার বসেছে ঠাকুরের সামনে।

'রাখাল-নরেনও আছে, আবার আছে হাজরা। হাজরা হচ্ছে শুকনো কাঠ। জপ করে, আবার ওরই ভেতর দালালির চেষ্টা করে। সবাই বলে, ও এখানে থাকে কেন? তার মানে আছে। জটিলে-কুটিলে না থাকলে লীলা পোষ্টাই হয় না।'

তার পর হঠাৎ রাখালের দিকে চোখ ফেরাল রামকৃষ্ণ। বললে, 'সকালে তখন তুই রাগ করেছিলি? তাই না? তোকে রাগালুম কেন? তার মানে আছে। ওষুধ ঠিক পড়বে বলে। পিলে মুখ তুললে পরই মনসার পাতা-টাতা দিতে হয়। বুঝলি?'

তার পর আবার ঈশ্বরীয় রূপের কথা বলছেন মাস্টারের দিকে চেয়ে। বলছেন, ঈশ্বরীয় রূপ মানতে হয়। জগদ্ধাত্রী রূপের মানে জানো? যিনি জগৎকে ধারণ করে আছেন। তিনি না ধরলে জগৎ পড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। মন-করীকে যে বশ করতে পারে তারই হৃদয়ে জগদ্ধাত্রীর উদয়।'

রাখাল বললে, 'মন মত্ত-করী।'

'সিংহবাহিনীর সিংহ তাই হাতিকে জব্দ করে রয়েছে।'

আবার আরেক দিন অভিমান হল রাখালের। আবার ছেড়ে গেল দক্ষিণেশ্বর। আবার ফিরে এল ঠাকুরের পদমূলে।

'তুই রাগ করে দক্ষিণেশ্বর থেকে চলে গেলি, আমি মা'র কাছে গিয়ে কাঁদতে লাগলুম। মা গো, এরা তোর অবোধ সন্তান, এদের অপরাধ নিসনি। তাই আবার ফিরে এলি। না এসে আর যাবি কোথায় ?'

অধর সেনকে এক দিন বললেন ঠাকুর, 'এরা শ্রাবণ মাসের জল নয়। শ্রাবণ মাসের জল হুড়-হুড় করে আসে আবার হুড়-হুড় করে বেরিয়ে যায়। এরা থাকিয়ে জল। মাটি ফুঁড়ে এদের আবির্ভাব।'

ঠাকুরের পা টিপছে রাখাল, আর একজন ভাগবতের পণ্ডিত ভাগবতের কথা বলছে কাছে বসে।

কথায় আর স্পর্শে রাখালের সেই প্রথম ভাব। থেকে-থেকে শিউরে উঠতে-উঠতে একেবারে নিশ্চল স্থির।

ভাব তো নয়, ভাব-বিলাসিতা! এই হল নরেনের ধারণা। এ সব ভাব হচ্ছে স্নায়ুদৌর্বল্যের ফল, মানসিক মৃগী রোগ।

ব্রাহ্মসমাজের খাতায় নাম লিখিয়েছে দুই জনে—নরেন আর রাখাল—ব্রাহ্মসমাজের সংকল্প নিয়েছে। অথচ—

এক দিন দক্ষিণেশ্বরে এসে নরেন দেখতে পেল ঠাকুরের পিছু-পিছু রাখালও চলেছে মন্দিরে। বিগ্রহের সামনে ঠাকুর ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করছেন, পিছু-পিছু রাখালও প্রণাম করছে।

দেখে তো পায়ের রক্ত মাথায় উঠল নরেনের। রাখালের এ কী বিশ্বাসভঙ্গ! কথা দিয়ে এসে সেই কথার প্রত্যবায়!

ধরল রাখালকে। অন্তরালে ডেকে নিয়ে গেল। তীব্র ভর্ৎসনার সুরে বললে, 'এ তোমার কী কাণ্ড ?'

'কেন, কী হয়েছে ?'

'কী হয়েছে মানে ? এটা মিথ্যাচার নয় ?'

'কোনটা ?'

'এই যে মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীকে প্রণাম করা ?'

রাখাল চোখ নামাল। কথা কইল না।

'তুমি ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীকার-পত্রে সই করে দিয়ে আসোনি ? বলে আসোনি, নিরাকার ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু ভজনা করবে না ? মানবে না দেবদেবী ?'

তবু চুপ করে রইল রাখাল। কি করে মনের কথা বোঝাবে নরেনকে ? ঠাকুরের ছোঁয়ায় সংস্কারের পুরোনো গ্রন্থি সব খুলে গিয়েছে যে। ব্রহ্মের যে ইতি নেই, তাঁর যে লেখাজোখা হয় না। তিনি যদি নিরাকার হয়ে থাকতে পারেন, সাকার

হয়েই বা থাকতে পারবেন না কেন? তিনি যদি সর্বব্যাপক সর্বাবরক হন তবে তিনি শিলা-মৃত্তিকাই বা আশ্রয় করতে পারবেন না কেন? গোঁড়ামির অন্ধকূপ থেকে ঠাকুর তাকে নিয়ে এসেছেন আকাশের নিত্যনির্মল উদারতায়।

কিন্তু কিছুই বলতে পারল না। এত যার তেজ ও দীপ্তি তার সঙ্গে রাখাল পারবে না তর্ক করে।

তাই বলে নরেন ছাড়বার পাত্র নয়। সে গিয়ে ধরল ঠাকুরকে।

'রাখাল এই মিথ্যাচার করবে? গড় হয়ে প্রণাম করবে দেবদেবী?'

'করলেই বা। ভগবান সব জায়গায় আছেন, শুধু মূর্তিতেই থাকবেন না?'

'কিন্তু ও যে সই করে দিয়ে এসেছে।'

'তাই বলে ও মত বদলাতে পারবে না? চিন্তার জগতে থাকবে না ওর স্বাধীনতা?'

চিরস্বাধীন নরেন্দ্রনাথ থমকে গেল। কথা খুঁজে পেল না।

'রাখালের এখন সাকারে বিশ্বাস হয়েছে। তা কি করবে বলো? যার যেমন ধাত। যার যেমন পেটে সয়। তোর নিরাকারের ঘর, রাখালের সাকারের। সকলেই কি আর গোড়া থেকে নিরাকারে মন দিতে পারে? সাকার-নিরাকার যে কোনো একটাতে বিশ্বাস থাকলেই হলো।'

নরেন ফিরে যাচ্ছিল ঠাকুর ডাকলেন। বললেন, 'রাখালকে আর কিছু বলিসনি। সে তোকে দেখলেই ভয়ে জড়সড় হয়।'

সেই রাখালের অসুখ করেছে। সবাইকে উদ্বেগ জানাচ্ছেন ঠাকুর। বলছেন, 'এই দেখ আমার রাখালের অসুখ। সোডা খেলে কি ভালো হয় গা?'

শেষকালে যেন দৈববাণীর মতো বলে উঠলেন, 'যা, রাখাল, তুই জগন্নাথের প্রসাদ খা গে, যা।'

দেখতে পেলেন নারায়ণ বালকের রূপ ধরে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঠাকুরের প্রেমানুরঞ্জিত চোখ—গোপালকে দেখে যশোমতীর যেমন স্নেহগদগদ দৃষ্টি। ধীরে-ধীরে সমাধিতে ডুবে গেলেন রামকৃষ্ণ। যে মা এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন সন্তানের জন্যে, সে মা এখন কোথায়? সাকার ছেড়ে ডুব দিয়েছেন নিরাকারের জলধিতে।

নন্দনবাগানে ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে নিমন্ত্রণ হয়েছে ঠাকুরের। ভক্তদের নিয়ে এসেছেন, সঙ্গে রাখাল। কিন্তু তাঁদের দিকে গৃহস্বামীদের লক্ষ্য নেই। উপাসনা শেষ হলে খাবার ডাক পড়ল। কিন্তু এদিক পানে কেউ তাকিয়েও দেখছে না। শুধু বড়লোক আর আত্মীয়-কুটুমদের নিয়ে শশব্যস্ত।

'কই রে কেউ ডাকে না যে রে!' ঠাকুর বললেন ভক্তদের।

ভক্তরা আর কি করবে। এদিক-ওদিক তাকায়, কারুরই চোখের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না। কে না কে এসেছে হেজিপেজি এমনি মনোভাব।

ঠাকুরের কথা শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল রাখাল। বললে, 'মশায়, চলে আসুন।'

রাখালকে বড় বিঁধছে এ অপমান। অন্যায় ঔদাসীন্য অপমান ছাড়া আর কি। কিন্তু চলে আসুন বললেই তো আর চলে যাওয়া যায় না।

'আরে রোস', রাখালকে নিরস্ত করলেন ঠাকুর। 'গাড়িভাড়া তিন টাকা ছ আনা কে দেবে? রোক করলেই হয় না। পয়সা নেই আবার ফাঁকা রোক। আর এত রাত্রে খাই কোথা?'

একসঙ্গে পাতা পড়েছে সকলের। অনেক পরে যখন ডাক পড়ল এ-দলের তখন গিয়ে দেখল, জায়গা নেই, সমস্ত আসন ভরে গিয়েছে। তখন এক পাশে নোংরামতন একটা জায়গায় ভক্ত সমেত ঠাকুরকে বসানো হল এক ধারে। নুন-টাকনা দিয়ে দিব্যি লুচি খেলেন ঠাকুর।

ভক্তরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ঠাকুরের দিকে। বিন্দুমাত্র অভিমান নেই। নেই এতটুকু দোষদর্শন। কারুণ্য আর সৌশীল্যের প্রতিমূর্তি। উদারতা আর ক্ষমার সমাহার। লোককল্যাণকামনায় সর্বংসহ।

পরের দোষ আর দেখব না। গর্বে আর পর্বত ভাবব না নিজেকে।

॥ ৮০ ॥

এদিকে, এর আগে, বিজয়ের কি হয়েছিল একটু খোঁজ নিই।

কেশবের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে। কেশব করেছে 'নববিধান', বিজয় করেছে 'সাধারণ'। জয় হয়েও বিজয়ের শান্তি নেই। শুধু প্রচারে-বিচারে উপদেশে-উপাসনায় ঊষর মরু সজল হয় না। চাই শ্রাবণ-সিঞ্চন। তৃষ্ণা মেটে না শুধু জ্ঞানের খরতাপে। চাই ভক্তির বারিধারা।

শুধু নিরাকারে শান্ত হয় না হাহাকার।

মেছুয়াবাজার স্ট্রীট ধরে এক দিন হেঁটে যাচ্ছে বিজয়কৃষ্ণ, হঠাৎ এক হিন্দুস্থানী সাধুর সঙ্গে দেখা। সাধু-সন্ন্যেসীর দিকে তাকিয়েও দেখেনি কোনো দিন, অথচ এর দিকে চোখ না ফেলে পারল না। যেমনি চোখ পড়ল অমনি থমকে দাঁড়াল। শুধু তাই নয়, যা ধারণার অতীত, পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে বসল সাধুকে। কি লজ্জা, কেউ দেখতে পায়নি তো।

ব্রাহ্মসমাজে বেদীতে বসে উপাসনা করছে বিজয়, চোখ চেয়ে দেখল এক কোণে সেই সাধু বসে। উপাসনার শেষে বেরিয়ে আসছে মন্দির থেকে, হঠাৎ পিছন দিক থেকে এসে বিজয়ের হাত ধরল সেই সাধু। বললে, 'চলো!'

কোথায়?

কোথাও নয়। এই রাস্তায়। অচেনা ভিড়ের নিরিবিলিতে।

কাঁকায় চলে এসে হঠাৎ জিগগেস করলে সাধু, 'তোম গুরু কিয়া?'

বিজয় দৃঢ়স্বরে বললে, 'আমি গুরুবাদ মানি না।'

শিবনাথ শাস্ত্রীও বলেছিল সেই কথা। গুরু লাগবে কিসে? আত্মবলে ঈশ্বর লাভ করব। আমি কি কিছু কম?

ঠাকুর একবার তাকালেন গঙ্গার দিকে। দেখলেন হাতের কাছেই সুস্পষ্ট উদাহরণ। চলন্ত স্টীমারের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা গাধাবোট। স্টীমারের সঙ্গে-সঙ্গে গাধাবোটও দিব্যি জল কেটে এগিয়ে আসছে পারের দিকে।

ঐ দেখ ঐ গাধাবোট। ওর সাধ্য ছিল আত্মবলে এত তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসতে? হয়তো এক বেলা লেগে যেত। ভাগ্যক্রমে স্টীমারের সঙ্গে বাঁধা পড়েছিল বলেই এত বেগে বেরিয়ে আসতে পারছে। গাধাবোটের পক্ষে পার পেতে হলে শুধু আত্মবলে চলে না, গুরুবল লাগে।

জীবমাত্রই গাধাবোট। শুধু লগি ঠেলে-ঠেলে কত আর তুমি এগোবে—কত দিনে। স্টীমার ধরো। ধরো গুরু। ধরো পারাপারের কর্ণধার। ঠিক তোমাকে পার করে দেবে।

'গু' মানে অন্ধকার আর 'রু' মানে আলোর দ্যোতক। অন্ধকার থেকে যিনি আলোকে নিয়ে যান তিনিই গুরু। অন্ধকারে যিনি আলোর সংবাদ দেন তিনিও।

এত বড় যে বিদ্যা-বিশারদ হয়েছ, বলি, বর্ণপরিচয় শিখতে গুরু লাগেনি?

কিন্তু মুখ গম্ভীর করে বিজয় বললে, 'মানি না আমি গুরুবাদ।'

মৃদু-মৃদু হাসল সেই সন্ন্যাসী। বললে, 'এই সি ওয়াস্তে সব বিগড় গিয়া—'

বিজয়ের বুকের মধ্যে কে ধাক্কা দিলে। মুখ ঘুরিয়ে বললে, 'তুমি শুনেছ আমার উপাসনা? ও কিছু নয়?'

'ও সব তো বেদকা বাণী হ্যায়। ওসি মে ক্যা হোগা?'

যেন সহসা কে টলিয়ে দিল বিজয়কে। পথের মধ্যে বসিয়ে দিল। মনে হল গুরু নেই বলে সব পণ্ড হয়ে যাচ্ছে। পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল চেষ্টা। গুরু চাই। অগ্নিমন্থন কাঠ প্রস্তুত। শুধু একটু ঘর্ষণ দরকার।

আপনি আমার গুরু হোন। ব্যাকুলতায় সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল বিজয়ের।

আমাকে দিন সে চতন্যের স্ফুলিঙ্গ। যজ্ঞের কাঠ একবার জ্বলে উঠুক।'

'নেহি। তোমারা গুরু দোসরা হ্যায়—'

ঠাকুর বললেন, 'তবে এবার এক বাঘিনীর গল্প শোনো—'

ছাগলের পালে এক বাঘিনী পড়েছিল। দূর থেকে তাক করে এক শিকারী তাকে মেরে ফেললে। তখন সেটার প্রসব হয়ে ছানা হয়ে গেল। ছানাটি ছাগলের সঙ্গে মানুষ হতে লাগল। ছাগলেরা ঘাস খায়, বাঘের ছানাও ঘাস খায়। ছাগলদের মত বাঘের ছানাও ভ্যা-ভ্যা করে। আবার কোনো জানোয়ার এলে ছাগলের মতই ছুটে পালায়। এক দিন সেই ছাগলের পালে আর একটা বাঘ এসে পড়ল। ঘাসখেকো বাঘটাকে দেখে তো সে অবাক! দৌড়ে তখন ধরল সে ঘাসখেকোকে। সেটা প্রাণপণে ভ্যা-ভ্যা করতে লাগল। সেটাকে টেনে হিঁচড়ে জলের কাছে নিয়ে এল সেই বাঘ। বললে, ত্যাখ, জলের মধ্যে তোর মুখ ত্যাখ—আমার যেমন হাঁড়ির মতন মুখ, তোরও তেমনি। আর এই নে খানিকটা মাংস, চিবিয়ে ত্যাখ। বলে তার মুখের মধ্যে খানিকটা মাংস জোর করে পুরে দিলে। আর যায় কোথা! প্রথমে তো মুখেই তুলবে না, শেষে রক্তের স্বাদ পেয়ে খেতে লাগল। তখন বাঘ বললে, 'এখন বুঝেছিস? ত্যাখ চেয়ে, আমিও যা তুইও তা। এখন আয়, আমার সঙ্গে বনে চলে আয়।' বাঘ হল সেই গুরু। চৈতন্য এনে দিলে। জলে মুখ দেখালে—তার মানে, চিনিয়ে দিলে স্বরূপ। বনে ডেকে নিয়ে গেল। নিয়ে গেল স্বধামে। ঈশ্বর-নিকেতনে।

গুরুর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল বিজয়। তিনি যদি নিজের থেকে না আসেন তাঁকে খুঁজে বের করতে হবে। ভারতবর্ষের আঁতিপাঁতি চষে দেখব। মাটি খুঁড়ে হোক, পাহাড় ফেড়ে হোক, উদ্ধার করতে হবে সেই লুক্কায়িতকে।

কোথায় আমার সেই জল-দর্পণ! যার মধ্যে তাকিয়ে আমি আমার স্বরূপকে চিনব!

বিন্ধ্যাচল পাহাড়ে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছে বিজয়। শুনেছিল কোথাকার কে এক সাধু আছে এই জঙ্গলে। রাত্রির অন্ধকার নেমে এল, জনপ্রাণীর দেখা নেই। শুধু লতাগুল্মের জটিলতা। খুঁজতে খুঁজতে পেল এক ভাঙা বাড়ি—ঠিক করল এখানেই রাত কাটাবে। তাই সই, পরিত্যক্ত ভাঙা বাড়িতেই ডেরা বাঁধলে। কিসের ডেরা—মাঝ রাতে এক দল ডাকাত এসে হাজির। এটা সাধু-সন্ন্যেসীর ডেরা নয়, এটা ডাকাতের আস্তানা। কেটে পড়ো। সন্ন্যেসীর পোশাক থাকলেই বা কি, বিজয়কে ওরা তাড়িয়ে দিলে।

দূরে এক গাছতলায় গিয়ে বসল বিজয়। এ দিকে ভাঙা বাড়ির মধ্যে বসে লুট-করা মালের বখরা করতে লাগল ডাকাতেরা। বখরার পর যখন ঘুমুতে যাবে তখন বিজয়ের কথা ফের মনে পড়ল তাদের। সাধুটা গেল কোথায়? ও তো নির্ঘাত পুলিশে খবর দেবে। ওকে ধরো। সাবড়ে দাও এক কোপে।

ডাকাতদের যে সর্দার সে আপত্তি করলে। বললে, নিরীহ সন্ন্যেসীমানুষ, ওর থেকে আমাদের কোনো ক্ষতি হবে এ আমার বিশ্বাস হয় না। ওকে মেরে কাজ নেই।

রাখো তোমার সরফরাজি। ওকে না কেটে ফেললে পুলিশের হাতে ও সাবুদ হবে।

দুটো তরোয়াল নিয়ে দুটো ডাকাত এগিয়ে গেল সেই গাছতলার দিকে। কিন্তু এ কী সর্বনাশ! বিজয়ের সামনে অল্প কয়েক হাত দূরে প্রকাণ্ড একটা বাঘ বসে। যেন পাহারা দিচ্ছে বিজয়কে। সেই পুরুষব্যাঘ্রকে।

এ দিক থেকে মারা যাবে না দেখছি। যেতে হবে পিছন দিকে। সে দিক থেকেই বসাতে হবে কোপ। সে দিকে গিয়ে দেখে, সে দিকেও আরেক বাঘ। বিশাল জিভ মেলে থাবা চাটছে বসে-বসে। কে মারে সেই ব্যাঘ্রমূর্তিকে!

ডাকাত দুটো তরোয়াল নামিয়ে হেঁটমুখে সরে পড়ল।

এবার এসেছে তিব্বতে। শুনেছিল দুর্গম অরণ্যের মধ্যে কোন এক গোফার ধারে এক বাঙালী মহাপুরুষ আছেন। অহোরাত্রই নাকি সমাধিস্থ। সেই থেকে শোনা সেই থেকেই তাঁর ঠিকানা খুঁজে ফিরছে। ঠিকানা মানে বরফ আর পাথর, জল আর জঙ্গল। তবু বের করা চাই সেই মহাপুরুষকে। খাদ্য নেই, ঘুম নেই, না থাক, চাই শুধু সেই পরমান্ন, শুধু সেই অসঙ্গ-সঙ্গ। কোথায় সে! পথ চলতে-চলতে তিন দিনের দিন অজ্ঞান হয়ে পড়ল বিজয়।

ঘোর অরণ্য। প্রাণস্পন্দনহীন। কে তার খবর রাখে!

কিন্তু যাকে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে তিনি খোঁজ রাখেন।

নগ্নদেহ কে এক সন্ন্যাসী সহসা তার সামনে এসে দাঁড়াল। স্পর্শ করতেই জেগে উঠল বিজয়। তার শিথিল হাতে কটি ছোট-ছোট বীজ গুঁজে দিলে সন্ন্যাসী। বললে, 'বাচ্চা, এহি দানা লেও, ভুখ-পিয়াস ছুট যায়েগা।'

সত্যিই তাই। দু-এক দানা মুখে দিতেই ক্ষুধাতৃষ্ণা মিটে গেল বিজয়ের। মিটে গেল পথশ্রান্তি।

কিন্তু শুধু দেহের ক্ষুধাতৃষ্ণা মিটিয়েই নিবৃত্তি কোথায়? শুধু এ হলেই মন কেন বলে না সব পাওয়া হয়ে গেল? কোথায় মানুষের সেই 'সবপেয়েছি'-র দেশ?

ক্লান্তি গেলেও ক্ষান্তি আসে না কেন? আবার কেন সন্ধানের ইন্ধন জলে?
সেই সন্ন্যাসী কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। হল না বুঝি গুরুপ্রাপ্তি। অন্ধকার থেকে আলোতে আগমন।

ঘুরতে-ঘুরতে গয়ায় এসেছে বিজয়। এখানে এসে শুনতে পেল আকাশগঙ্গা পাহাড়ে রঘুবর দাস এক মস্ত সাধু। আর কথা নেই, অমনি ছুটল সেই আশ্রমে। বাবাজীর পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল বিজয়: 'বাবাজী, কি করে উদ্ধার হব? কে আমার হাত ধরবে?'

এমন সাধু আর দেখেনি রঘুবর। যেমন উত্তাল ভক্তি তেমনি উদ্দাম ব্যাকুলতা। আশীর্বাদের ভঙ্গিতে বললে, 'দয়াল রামজী তোমাকে আলবৎ কৃপা করেগা। দৈন্য ছোড়ো।'

যতক্ষণ তার দেখা না পাই ততক্ষণ কি করে ছাড়ি এই দীন বেশ?

সেখান থেকে আরেক সাধুর সন্ধানে চলল ব্রহ্মযোনির পাহাড়ে। বিজয়কে দেখে সেই সাধু তো আনন্দে আত্মহারা। বাহু বাড়িয়ে আলিঙ্গন করল বুকের মধ্যে। শুধু বললে, 'আনন্দে রহো। আনন্দে রহো।'

যাই বলো, রঘুবর দাসের আশ্রমটিই বিজয়ের মনে ধরেছে। এই আশ্রমটিই যেন এক দিন সে দেখেছিল স্বপ্নে। এই পাহাড়, এই মন্দির, মন্দিরে এই মহাবীরের মূর্তি। কেন দেখেছিল কে জানে, কিন্তু জায়গাটি ভারি প্রাণজুড়ানো। সঙ্কেতে-সঙ্গীতে ভরা।

একদিন রঘুবরের সঙ্গে বসে গল্প করছে বিজয়, এক রাখাল ছেলে এসে খবর দিলে, পাহাড়ের উপরে কে একজন মস্ত লোক এসেছেন। স্বপ্নে মহাবীর যেন এই পর্বতশীর্ষের দিকেই ইশারা করেছিল। তাড়াতাড়ি ছুটে গেল দুজনে। দেখল এক অপূর্বকান্তি তেজস্বান মহাপুরুষ। মাথা ঘিরে জ্যোতির্গোলক। কিন্তু তাদের তিনি কাছে ঘেঁষতে দিলেন না। ইশারায় বললেন চলে যেতে।

কি আর করা! ম্লান মুখে ফিরে গেল বিজয়। কিন্তু মন রইল সেই পর্বতের নির্জনতায়।

কিছু গাঁজা কিনল বিজয়। ভাবল গাঁজা পেলে সাধু নিশ্চয় তাকে ফিরিয়ে দেবেন না। দুটো অন্তত কথা কইবেন। একা-একা চলে এল সে গুটি-গুটি। গাঁজা দিতে হল না, কথা কইলেন সাধু। জিগগেস করলেন, 'কি করো?'

ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করি।

'ব্রাহ্মধরম? ও হাম জানতা হ্যায়। কলকাতা মে ব্রাহ্মসমাজ হ্যায়। রাজা রামমোহন একঠো বড় আদমি থা। আগাড়ি ওহি ব্রাহ্মধরম স্থাপন কিয়া।

ওলোগ বেলায়েত গিয়া—'

বিজয় তো অবাক। পশ্চিমী সাধু, বাঙলা দেশের এত খবর জানে কি করে ? 'দেবেনবাবু কেশববাবু সব কোইকো হাম পছান্তা—'

যত কথা বলেন সাধু ততই যেন বেহুঁস হয়ে আসে বিজয়। তার আর নড়বার-চড়বার ক্ষমতা নেই। জিভও পর্যন্ত অসাড় হয়ে গেছে। জ্ঞানহারা অবস্থায় নীরবে কাঁদতে লাগল।

মহামানব তাকে টেনে নিলেন কোলের মধ্যে। দেহে শক্তি সঞ্চার করলেন। শুধু তাই নয়, কানে দীক্ষামন্ত্র দিয়ে দিলেন। লাফ দিয়ে উঠে বসল বিজয়। পায়ে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করল। কৃপাসিন্ধুর এ কী কৃপাবিন্দু! একে-একে সাধন-প্রণালী শিখিয়ে দিলেন সাধু। শুধু সাধু নয়, বলো গুরুদেব। বলো আকাশগঙ্গার পরমহংস।

কঠোর সাধনে লেগে গেল বিজয়। শুকনো কাঠে আগুনই শুধু জ্বলছে, কিন্তু কোথায় সে হিরণ্যগর্ভ ?

গুরুদেব হঠাৎ এক দিন আবার দেখা দিলেন। বললেন, 'কাশী যাও। হরিহরানন্দ সরস্বতীর কাছে গিয়ে সন্ন্যাস নাও।'

তক্ষুনি কাশী ছুটল। বের করল সেই সরস্বতীকে। বললে, পৈতে ত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্মে ঢুকেছি। এখন প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে আমাকে সন্ন্যাস দিন।

তোমার এই উচ্চাবস্থায় প্রায়শ্চিত্তের দরকার নেই। তবে তোমাকে আবার যথারীতি উপবীত গ্রহণ করতে হবে। তার পরে তিন দিন পরে বিরজাহোমে শিখাসূত্রের আহুতি দিয়ে সন্ন্যাসী হবে তুমি।

তথাস্তু। আমি সন্ন্যাসী হব। সর্বপ্রকার কাম্যকর্ম ত্যাগ করে সম্যকরূপে ভগবানে যে আত্মসমর্পণ করে সেই সন্ন্যাসী। পুরো দস্তুর সন্ন্যাসী হয়েই বিজয় ফিরে এল দক্ষিণেশ্বরে। দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসের কাছে। বললে, 'হে শ্রীহরি—' যদিও এখানেই বিজয়ের সাধনার ইতি নয়—এখানে এক মহাস্বীকৃতি।

॥ ৮১ ॥

বরানগরে বেড়াতে এসেছে মহেন্দ্র গুপ্ত। আটাশ বছর বয়েস, শ্যামবাজার মেট্রোপলিটান ইস্কুলের হেডমাস্টার। বেড়াতে এসেছে বন্ধু সিদ্ধেশ্বর মজুমদারের বাড়ি।

এণ্ট্রান্সে দ্বিতীয়, এফ-এ-তে পঞ্চম, বি-এ-তে তৃতীয় হয়ে বেরিয়েছে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে। আইন পড়বার শখ, সংসারের প্রয়োজনে চাকুরিতে

ঢুকেছে। প্রথমে কেরানীগিরি, ইদানীং মাস্টারি। গোড়ার দিকে যশোর নড়ালে, এখন কলকাতায়। সিটি স্কুল, এরিয়ান স্কুল, মডেল স্কুল শেষ করে এখন এসেছেন বিদ্যাসাগরের ইস্কুলে। সে ইস্কুলের শ্যামবাজার ব্রাঞ্চে।

'গঙ্গার ধারে চমৎকার একটি বাগান আছে, যাবে বেড়াতে?' জিগগেস করলে সিদ্ধেশ্বর।

প্রসন্ন বাঁড়ুয্যের বাগান দেখে ফিরছিল দুজনে। মাস্টার বললে, 'কার বাগান?'

'রাসমণির বাগান। সেখানে একজন পরমহংস আছেন। যাবে?'

'সে তো শুনেছি উন্মাদ।'

'না হে, এখন আর তার সে অবস্থা নেই। সে এখন শান্ত সদানন্দ বালক। দেখলে চোখ জুড়োয়।'

হাঁটতে-হাঁটতে চলে এল দুজনে। একেবারে ঠাকুরের ঘরে।

এই প্রথম দর্শন! এ কে! এ কি মানুষ, না, শুভ্র স্বচ্ছ অক্ষুণ্ণানন্দ আকাশ! একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তার দিকে। মনে হল সমস্ত জীবনের সুখ-দুঃখ-মন্থন-ধন যেন বসে আছে সামনে।

কিন্তু এ কোথায় এলাম? কাঁসর-ঘণ্টা খোলকরতাল বেজে উঠেছে এক সঙ্গে। দেবালয়ে আরতি হচ্ছে বুঝি?

চলো আগে দেখে আসি মন্দির। দ্বাদশ শিবমন্দির। রাধাকান্তের মন্দির। আর এই ত্রিভুবনজননী কারুণ্যপূর্ণেক্ষণা ভবতারিণী।

মন্দির দেখে আবার ফিরল তারা ঠাকুরের ঘরে। ঘরের দরজা ভেজানো। পাশেই বৃন্দে-ঝি দাঁড়িয়ে। জল খাবারের জন্যে লুচি বরাদ্দ থাকে—এই সেই বৃন্দে-ঝি। মাঝে-মাঝে অসময়ে কোনো ভক্ত এলে যদি তার বরাদ্দ লুচি খরচ হয়ে যায়, সে বকে অনর্থ করে। বলে, ওমা, কেমন সব ভদ্দরলোকের ছেলে গো, আমারটি সব খেয়ে বসে আছে। সামান্য মিষ্টিটাও পাই না?

পাছে এই সব কথা ছেলেদের কানে যায়, ঠাকুরের দারুণ ভয়। এক দিন তেমনি খরচ হয়ে গেছে লুচি, ঠাকুর প্রমাদ গুনছেন। নবতে চলে এসেছেন শ্রীমা'র কাছে। বলছেন, 'ওগো, বৃন্দের খাবারটি তো খরচ হয়ে গেল। এখন চটপট রুটিলুচি যা-হয় কিছু করে রাখো, নইলে এক্ষুনি এসে বকাবকি করবে। দুর্জনকে পরিহার করে চলতে হয়—'

বৃন্দাকে দেখেই তো শ্রীমা'র মুখ চুন। বললেন, 'বোসো, তোমার খাবারটা তৈরি করে দি।'

থাক। বুঝেছি। ঢের হয়েছে। গরিবের উপরেই যত অত্যাচার।

'বেশিক্ষণ লাগবে না। এক্ষুনি তৈয়ার করে দিচ্ছি।'

'আর তৈয়েরে কাজ নেই বাছা—এমনি দাও।'

শ্রীমা তখন সিধে সাজিয়ে দিলেন। ঘি ময়দা আলু পটল—কত কি।

সেই বৃন্দে-ঝি দরজায়। একটু বোধ হয় ঘাবড়ে গেল মাস্টার। বললে, 'হ্যাঁ গা, সাধুটি কি ভিতরে আছেন?'

'ভিতরে থাকবে না তো যাবে কোথায়?'

'কত দিন আছেন বলো তো এখানে?'

'আমি কত দিন আছি তার হিসেব কে রাখে ঠিক নেই—অন্তের হিসেব রাখতে যাব!'

মাস্টার দ্বিধা করল, তবু জিগগেস না করে পারল না। 'আচ্ছা, ইনি কি খুব বইটই পড়েন?'

'ওসব তোমরা পড়ো।' বৃন্দে-ঝি ঝামটা মেরে উঠল: 'সব বই ওঁর মুখে-মুখে।' বই পড়ে না সে আবার কি রকম জ্ঞানী!

গ্রন্থ নয় হে, গ্রন্থি—গাঁট। শুধু পাণ্ডিত্যে মানুষ ভোলাতে পারবে, তাঁকে পারবে না। হাজার বই পড়ো, হাজার শ্লোক আওড়াও, ব্যাকুল হয়ে তাঁতে ডুব না দিলে তাঁকে ছুঁতেও পারবে না। পণ্ডিত খুব লম্বা-লম্বা কথা বলে, কিন্তু নজর কেবল পার্থিব সুখে। যেমন শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে, কিন্তু নজর রয়েছে গো-ভাগাড়ে। শুধু-পণ্ডিতগুলো দরকোচাপড়া। না এ দিক না ও দিক। তাই সংক্ষেপে করো। পিঁপড়ের মতো বালিটুকু ত্যাগ করে চিনিটুকু নাও। শব্দার্থ না খুঁজে মর্মার্থ খোঁজো। সাধুমুখে গুরুমুখে জেনে নাও সেই মর্মস্থলের সংবাদ। এক জানার নাম জ্ঞান, অনেক জানার নাম অজ্ঞান।

এক দৃষ্টে শুধু পাখির চোখ দেখ। লক্ষ্যভেদের সময় অর্জুনকে দ্রোণাচার্য কী জিগগেস করলেন? জিগগেস করলেন 'আমাদের সবাইকে দেখতে পাচ্ছ? এই সব রাজা-রাজড়া, গাছ, গাছের ডাল-পালা, তার উপরে পাখি—দেখতে পাচ্ছ সব?'

অর্জুন বললে, 'শুধু পাখির চোখ দেখতে পাচ্ছি।'

যে শুধু পাখির চোখ দেখে, সেই লক্ষ্যভেদ করে।

'বন্ধ ঘরে ইনি বুঝি এখন সন্ধে করছেন—' বৃন্দে ঝিকে জিগগেস করল মাস্টার।

'তোমার বুদ্ধি কি গো! ঘরে ধুনো দিয়েছি। যাও না, ঘরে গিয়ে বোসো না।'

ঘরে ঢুকে প্রণাম করে বসল দু-জনে। মামুলী দুচারটে প্রশ্ন করলেন ঠাকুর। কথায় ফাঁকে-ফাঁকে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন। সেই তন্ময়তার মধ্যে শিথিল

ঔদাসীন্য নেই, বরং রয়েছে আতীব্র একাগ্রতা। একেই বুঝি ভাব বলে
সিদ্ধেশ্বর বললে, 'সন্ধের পর এমনি ওঁর ভাবান্তর হয়।'
তবে আরেক দিন সকাল বেলা আসব। দেখব প্রভাত-আলোয়।
শীতের সকাল। নাপিত এসেছে, ঠাকুর কামাতে যাচ্ছেন। গায়ে র‍্যাপার, ধারগুলো শালু দিয়ে মোড়া, পায়ে চটিজুতো।
'তুমি এসেছ? আচ্ছা বোসো আমার কাছে।'
দক্ষিণের বারান্দায় কামাতে বসলেন। কামাচ্ছেন আর কথা কইছেন।
হঠাৎ বলে উঠলেন কাতর ভাবে। হ্যাঁগা, কেশব কেমন আছে বলতে পারো? তার বড্ড অসুখ।'
'আমিও শুনেছি বটে।'
'তার অসুখ হলেই আমার প্রাণটা বড় ব্যাকুল হয়। রাত্রি শেষ প্রহরে উঠে আমি কাঁদি। বলি, মা, কেশবের যদি কিছু হয়, তবে কার সঙ্গে কথা কবো।'
মাস্টারের বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। বললে, 'এখন বোধ হয় ভালো আছেন।'
'কেশবের জন্যে মা'র কাছে ডাব চিনি মেনেছি। কলকাতায় গেলে দিয়ে আসব সিদ্ধেশ্বরীকে।' বলে তাকালেন মাস্টারের দিকে। শুধোলেন, তোমার কি বিয়ে হয়েছে?'
'আজ্ঞে হ্যাঁ, হয়েছে।'
যন্ত্রণায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন ঠাকুর। 'ওরে রামলাল! ঘাঃ, বিয়ে করে ফেলেছে।'
মাথা হেঁট করে বসে রইল মাস্টার। বিয়ে করা কি এতই দোষ?
আবার জিগগেস করলেন ঠাকুর, 'ছেলে হয়েছে?'
বুকের মধ্যেটা ঢিপ-ঢিপ করছে মাস্টারের। ভয়ে ভয়ে বললে, 'আজ্ঞে, হয়েছে একটি।'
'ঘাঃ, ছেলেও হয়ে গেছে।' আবার কাতরোক্তি করে উঠলেন। পরে বললেন স্নেহস্বরে, 'তোমার মধ্যে যে ভালো লক্ষণ ছিল। আমি কপাল চোখ এ সব দেখে বুঝতে পারি—'
জানো, মানুষের মন হচ্ছে সরষের পুঁটলি। সরষের পুঁটলি ছড়িয়ে পড়লে কুড়ানো ভার হয়ে ওঠে। তেমনি কামিনী-কাঞ্চনে মন ছড়িয়ে পড়লে ছড়ানো মন কুড়ানো দায়।
অনেকের কাছে স্ত্রী একেবারে শিরোমণি। বলে, আমাকে কত ভালোবাসে, কত সেবা-যত্ন করে, তাকে ছেড়ে যাই কেমন করে? শিষ্যকে গুরু তাই এক

ফন্দি শিখিয়ে দিল। একটা ওষুধের বড়ি দিয়ে বললে, এইটে খেলেই মড়ার মত হয়ে যাবি, তোর জ্ঞান থাকবে না। কিন্তু সব বেশ পাবি দেখতে-শুনতে। তার পর আমি এলে তোর চৈতন্য হবে। যেমন কথা তেমন কাজ। শিষ্যের বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। ওগো দিদি গো আমার কি হল গো, তুমি আমাদের কী করে গেলে গো—বলে আছড়ে-আছড়ে কাঁদতে লাগল স্ত্রী। লোকজন সব জড়ো হল। খাট এনে তাকে ঘর থেকে বার করবার যোগাড় করলে। কিন্তু বড়ির গুণে লাশ এঁকে-বেঁকে আড়ষ্ট হয়ে যাওয়াতে দরজা দিয়ে তা বেরুচ্ছে না সিধেসিধি। তখন একজন একখানা কাটারি নিয়ে এল। দরজার চৌকাঠ কাটতে আরম্ভ করলে। দুম-দুম শব্দ শুনে স্ত্রী ছুটে এল অস্থির হয়ে। ওগো, কী হয়েছে গো! কী করছ গো! ইনি বেরুচ্ছেন না তাই দরজা কাটছি। অমন কম্ম করো না গো! স্ত্রী চেঁচাতে লাগল। আমি এখন রাঁড়-বেওয়া হলুম, আমার আর দেখবার-শোনবার কেউ নেই। কটি নাবালক ছেলেকে মানুষ করতে হবে। এ দুয়ার গেলে তো আর হবে না। ওগো, ওঁর যা হবার তা তো হয়ে গেছে, ওঁর হাত-পা কেটে বার করো। ততক্ষণে গুরু এসে গিয়েছে। লাফিয়ে উঠল শিষ্য। হাঁক পাড়লে, তবে রে শালী, আমার হাত-পা কাটবে? এই বলে গুরুর সঙ্গে বেরিয়ে গেল বাড়ি ছেড়ে।

জানো না বুঝি, অনেক স্ত্রী আবার ঢঙ করে শোক করে। কাঁদতে হবে বলে গয়না নৎ খুলে বাক্সের ভেতরে রেখে আসে। তার পর আছড়ে পড়ে কাঁদে—

'ওগো দিদি গো, আমার কী হলো গো—'

এই স্ত্রী! এই সংসার!

'আচ্ছা তোমার পরিবার কেমন? বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি?'

মাস্টার ভরসা পেয়ে বললে, 'আজ্ঞে ভালো, কিন্তু অজ্ঞান।'

যেন লেখাপড়া শিখলেই জ্ঞান!

ঠাকুর একটু বিরক্ত হলেন। বললেন, 'আর তুমি এক মস্ত জ্ঞানী!'

অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেল মাস্টারের।

শোনো, বারে-বারে শোনো, এক জানার নাম জ্ঞান, অনেক জানার নাম অজ্ঞান। চৈতন্যদেব দক্ষিণ দেশে ভ্রমণের সময় দেখলেন একজন গীতা পাঠ করছে, আর একজন একটু দূরে বসে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে। চৈতন্যদেব তাকে জিগগেস করলেন, তুমি এ সব কিছু বুঝতে পারছ? সে বললে, ঠাকুর, আমি শ্লোক কিছুই বুঝতে পারছি না, আমি অর্জুনের রথ দেখতে পাচ্ছি আর তার সামনে ঠাকুর আর অর্জুন কথা কইছেন।

জানতেও বই লাগে না, চিনতেও বই লাগে না। অক্ষরজ্ঞান ছাড়াও সম্ভব সে অক্ষর-জ্ঞান।

কলকাতা যাবার পথে বিষ্ণুপুর ইষ্টিশানে গাড়ির অপেক্ষা করছেন শ্রীমা। হঠাৎ এক হিন্দুস্থানী কুলি তাঁকে দেখতে পেয়ে ছুটে এল। কাঁদতে-কাঁদতে লুটিয়ে পড়ল পায়ের কাছে। বললে, 'তু মেরী জানকী, তুঝে ম্যায় নে কিতনে দিনোঁসে খোঁজা থা। ইতনে রোজ তু কাঁহা থী?'

তুই আমার মা জানকী। তোকে কত দিন ধরে খুঁজছি। তুই এত দিন কোথায় ছিলি?

মা তাকে শান্ত করলেন। বললেন, একটি ফুল নিয়ে আয়। ফুল নিয়ে কি করতে হবে বলে দিতে হল না কুলিকে। মা'র পাদপদ্মে নিবেদন করলে। মা তাকে দিয়ে দিলেন ইষ্টমন্ত্র।

কেশবেরও বড় সাধ রামকৃষ্ণের পা দুখানি ফুল দিয়ে পুজো করে। কিন্তু পাড়ার লোক, দলের লোক কি ভাববে এই ভেবে সাহস পায় না।

সেদিন রামকৃষ্ণের সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা হচ্ছিল কেশবের।

কেশব বললে, আরো বলুন।

রামকৃষ্ণ হেসে বললেন, 'আর বললে দলটল থাকবে না।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কেশব। বললে, 'তবে আর থাক মশাই।'

এই দল-দল করতেই দলা পাকিয়ে গেল। তুমি দল-দল করছ আর এদিকে তোমার দল থেকে লোক ভেঙে-ভেঙে যাচ্ছে।

'আর বলেন কেন মশাই। তিন বচ্ছর এ দলে থেকে আবার ও দলে চলে গেল। যাবার সময় আমার গালাগাল দিয়ে গেল—'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'তুমি লক্ষণ দেখ না কেন? যাকে-তাকে চেলা করলে কি হয়?'

যতক্ষণ মোড়লি করছ ততক্ষণ মা আসে না। মা ভাবে ছেলে আমার মোড়ল হয়ে বেশ আছে। আছে তো থাক।

যে ভাবছে, আমি দলপতি, দল করেছি, লোকশিক্ষা দিচ্ছি, সে কাঁচা আমি। ঘি কাঁচা থাকলেই কলকলানি করে। মধু যতক্ষণ না পায় ততক্ষণই ভনভনানি করে মাছি। তুমি এখন ও সব ছাড়ো। পাকা ঘি, পাকা আমি হও। সালিশি মোড়লি তো অনেক করলে, এখন তাঁর পাদপদ্মে বেশি করে মন দাও। বলে, কার দল কে করে। দল ভাঙে তো তোমার কি। বলে, লঙ্কায় রাবণ মলো, বেহুলা কেঁদে আকুল হলো।

তুমি দলে নও, তুমি শতদলে।

কিন্তু কিছুতেই পুরোপুরি হয় না কেশবের। সিদ্ধি মুখে নিয়ে শুধু কুলকুচোই করলে, পেটে ঢোকালে না। পেটে না ঢোকালে কি নেশা হবে?

অহেতুকী ভক্তি না হলে কি মিলবে ভগবানকে?

কেশব উপাসনা করছে। বলছে, হে ঈশ্বর, তোমার ভক্তিনদীতে যেন ডুবে যাই।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'ওগো, তুমি ভক্তিতে ডুবে যাবে কি করে? ডুবে গেলে চিকের ভেতর যারা আছে তাদের হবে কি! বেশি দূর এগোতে চেয়ো না—বেশি এগোতে গেলে সংসার-টংসার ফক্কা হয়ে যাবে। তবে এক কর্ম কোরো। মাঝে-মাঝে ডুব দিয়ো, আর এক-একবার আড়ায় উঠো।'

রামকৃষ্ণকে বাড়িতে নিয়ে এসেছে কেশব। অনেক ফুল নিয়ে এসেছে। অনেক ফুল দিয়ে পূজা করবে রামকৃষ্ণকে। প্রাণ ঢেলে পূজা করবে।

তাই করলে কেশব। কিন্তু—

কিন্তু পূজা করবার আগে ঘরের দরজা বন্ধ করলে। বন্ধ করলে, পাছে তার পাড়ার লোক, তার দলের লোক টের পায়।

মনে-মনে হাসলেন রামকৃষ্ণ। বললেন, 'ও যেমন দরজা বন্ধ করে পূজা করলে, তেমনি ওর দরজাও বন্ধ থাকবে।'

কিন্তু বিজয়? মুক্ত অঙ্গনে সকলের চোখের সামনে ঠাকুরের পাদমূলে লুটিয়ে পড়ল। ঠাকুরের পা দুখানি ধরলে নিজের বুকের মধ্যে। রক্তমাখা প্রাণপুষ্প অর্ঘ্য দিলে ঠাকুরকে।

মহিমচক্রবর্তী জিগগেস করলে, 'বহু তীর্থ করে এলেন, দেখে এলেন অনেক দেশ, এখন এখানে কী দেখলেন বলুন।'

'কি বলবো।' অশ্রুভরভর বিজয়ের কণ্ঠস্বর: 'দেখছি, যেখানে এখন বসে আছি, এখানেই সব। কেবল মিছে ঘোরা। কোনো-কোনো জায়গায় এরই এক আনা, দু আনা, বড় জোর চার আনা—এই পর্যন্ত। এখানেই পূর্ণ ষোলো আনা দেখছি।'

'দেখ বিজয়ের কি অবস্থা হয়েছে। লক্ষণ সব বদলে গেছে। যেন সব আউটে গেছে। আমি পরমহংসের ঘাড় ও কপাল দেখে চিনতে পারি। বলতে পারি পরমহংস কিনা।'

নিজের কথা শুনবে না বিজয়। পরের কথা, একের কথা, প্রত্যক্ষের কথা শুনবে। বললে, 'এখানেই ষোলো আনা।'

কেদার বললে, 'অন্য জায়গায় খেতে পাই না—এখানে এসে পেটভরা পেলুম।'

মহিমা বললে, 'পেটভরা কি! উপচে পড়ছে।'

হাত জোড় করল বিজয়। বললে, 'বুঝেছি আপনি কে! আর বলতে হবে না।' ভাবারূঢ় অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'যদি তা হয়ে থাকে তো তাই।'

॥ ৮২ ॥

রঙ্গন আর জুঁই ফুল দিয়ে মালা গেঁথেছে সারদা। সাত-লহর গোড়ে মালা। বিকেল বেলা গেঁথে পাথরের বাটিতে জল দিয়ে রাখতেই কুঁড়িগুলি ফুটে উঠেছে। মন্দিরে পাঠিয়ে দিল। জগদম্বার গলার গয়না খুলে রেখে পরানো হল ফুলের মালা।

রামকৃষ্ণ দেখতে এসেছে ভবতারিণীকে। আহা এ কি রূপ! একদিকে নিকষের মতো কালো আকাশ, তার গায়ে সূর্যোদয়ের ছিটে-লাগা শাদা সমুদ্রের ঢেউ। ভাবে একেবারে বিভোর রামকৃষ্ণ।

সেই যে ছ-বছর বয়সে প্রথম দেখেছিল সরু আল-পথ দিয়ে মাঠে যেতে-যেতে। কাজল কালো আকাশের কোলে সিতপক্ষ বকের বলাকা।

'আহা, কালো রঙে কী সুন্দরই মানিয়েছে!'

যেন জীবন-মৃত্যুর কোলাকুলি। মাঝখানে ঈশ্বরানুরাগের রক্তিমা।

'কে গেঁথেছে রে এমন মালা?' চারদিকে তাকালো রামকৃষ্ণ।

'আর কে!' পাশে ছিল বৃন্দে-ঝি, টিপ্পনি কাটল।

রামকৃষ্ণের বুঝতে আর বাকি নেই, কে। সে ছাড়া আর কার এমন শুভ্রতা, কার এমন চিকণ-গাঁথন। ভক্তির সুগন্ধে গদগদ হয়ে আছে সারল্যের হাসিটি।

'আহা, তাকে একবার ডেকে নিয়ে এস।' স্নেহের আনন্দে উছলে উঠল রামকৃষ্ণ। 'মালা পরে মায়ের কি রূপ খুলেছে একবার দেখে যাক।'

বৃন্দে-ঝি ডাকতে গেল সারদাকে।

লজ্জায় জড়িপটি খেয়ে গেল। মন্দিরে কেউ আর নেই তো এ সময়?

নেই। তা ছাড়া ঠাকুর যখন ডেকেছেন—

কিন্তু মন্দিরের কাছে আসতেই দেখল সুরেন মিত্তির, বলরাম বোস, আরো কে কে, আসছে এদিকে। হয়েছে! এখন তবে কোথায় যাই। কোথায় লুকোই। বৃন্দের আঁচল টেনে ধরে তাড়াতাড়ি নিজেকে ঢাকা দিল সারদা। কোনো রকমে একটা আড়াল রচনা করে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেল।

আশ্চর্য, ঠিক নজর রেখেছে রামকৃষ্ণ। বলে উঠল, 'ওগো ওদিক দিয়ে উঠো না। সেদিন এক মেছুনি উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে মরেছে। সামনের

দিক দিয়েই এস।'

বলরামবাবুরা সরে দাঁড়ালো। সারদা উঠে দাঁড়ালো। ভাবে-প্রেমে গান ধরল রামকৃষ্ণ।

সেবার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে সত্যি-সত্যিই কিন্তু পড়ে গিয়েছিলেন শ্রীমা। দুধের বাটি নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন—বাটিতে আড়াই সের দুধ। ঠাকুরের তখন অসুখ, আছেন কাশীপুরের বাড়িতে। হঠাৎ কি হল, মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন শ্রীমা। দুধ তো গেলই, পায়ের গোড়ালির হাড় সরে গেল। নরেন আর বাবুরাম কাছে পিঠে কোথাও ছিল, ছুটে এসে ধরলে মাকে।

ঠাকুর শুনতে পেলেন। ডাকিয়ে আনলেন বাবুরামকে। বললেন, 'তাই তো—এখন তবে আমার খাওয়ার কি উপায় হবে?'

ঠাকুর তখন মণ্ড খান। সে-মণ্ড তৈরি করে দেন শ্রীমা। রোজ উপরের ঘরে গিয়ে খাইয়ে আসেন ঠাকুরকে।

'এখন তবে কে আমার মণ্ড রাঁধবে? কে খাইয়ে দেবে?'

শ্রীমা'র পা বিষম ফুলে উঠেছে, নিদারুণ যন্ত্রণা। ওঠা-চলা সম্ভবের বাইরে। গোলাপ-মা রেঁধে দিচ্ছে মণ্ড। নরেন খাইয়ে দিচ্ছে নিজের হাতে।

একদিন বাবুরামকে নিজের কাছটিতে ডেকে আনলেন ঠাকুর। নিজের নাকের কাছে হাত ঘুরিয়ে ঠারে-ঠোরে বললেন, 'ওকে একবারটি এখানে নিয়ে আসতে পারিস?' বাবুরাম তো অবাক। পা ফেলতে পারেন না মাটিতে, সিঁড়ি বেয়ে আসবেন কি করে উপরে?

ঠাকুর পরিহাস করে বললেন, 'একটা ঝুড়ির মধ্যে ওকে বসিয়ে দিবি মাথায় করে তুলে নিয়ে আসবি।'

নরেন আর বাবুরাম উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল।

ব্যথাটা একটু কম পড়তেই উঠে দাঁড়ালেন শ্রীমা। নরেন-বাবুরামকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আমাকে তোমরা ধরে-ধরে নিয়ে যাও উপরে। হ্যাঁ, খুব পারব আমি। ওঁকে নিজের হাতে খাইয়ে আসি।'

বাবুরাম আর নরেন মাকে নিয়ে চলল ধরে-ধরে।

কিন্তু সেবার যখন ঠাকুরের হাত ভেঙেছিল তখন কী হয়েছিল?

জগন্নাথকে মধুর ভাবে আলিঙ্গন করতে গিয়েই ঠাকুর পড়ে গেলেন। ভেঙে গেল বাঁ-হাত। এর দু-একদিন আগেই সারদামণি ফিরেছে দেশ থেকে। দক্ষিণেশ্বরে ফিরতে না ফিরতেই এই অঘটন।

'কবে রওনা হয়েছিলে?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'বেস্পতিবার।'

'বেলা তখন কত?'

হিসেব করে দেখা গেল, বারবেলা।

আর কথা নেই। ঠাকুর বললেন দৃঢ়স্বরে, 'বিষুৎবারের বারবেলায় রওনা হয়ে এসেছ বলেই আমার হাত ভেঙেছে। যাও, যাত্রা বদলে এস।'

আর কথাটি নেই। সারদা ফিরে চলল দেশে। যাত্রা বদলে আসতে।

তুমি যেমন বলো তেমনি চলি। তোমার যাতে আরাম তাতেই আমার আনন্দ। বৃক্ষ হয়ে যদি বসতে বলো, বসি। আকাশ হয়ে যদি বলো ওড়ো, উড়ে বেড়াই। বৃক্ষ আর আকাশ, দুইই আমার আশ্রয়।

মথুরবাবুর দেওয়া পিঁড়িতে রামকৃষ্ণ বসে আর সারদা তার গায়ে তেল মাখিয়ে দেয়। সারদা তন্ময় হয়ে দেখে, গা থেকে যেন জ্যোতি বেরুচ্ছে। আর কী রঙ! যেন হরিতালের মত! বাহুতে সোনার ইষ্টকবচ, তার সঙ্গে গায়ের রঙ যেন মিশে গেছে।

ঠাকুর তখন দেহ রেখেছেন, ঠাকুরের ইষ্টকবচ তখন শ্রীমা'র হাতে। ট্রেনে বৃন্দাবন যাচ্ছেন শ্রীমা, দেখতে পেলেন জানলার বাইরে ঠাকুর দাঁড়িয়ে। শুধু দাঁড়িয়ে নয়, জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিয়েছেন ভিতরে। বলছেন, 'কবচটি যে সঙ্গে-সঙ্গে রেখেছ, দেখো যেন না হারায়।'

মা'র যে হাতখানিতে কবচ ছিল তা বোধ হয় জানলার উপরে অনাবৃত ছিল। দেখতে পেয়ে ঠাকুর তাই সাবধান করে দিলেন।

আগে একবার সত্যিই গিয়েছিল হারিয়ে। সেই কবচ পুজো করতেন শ্রীমা। একবার ঠাকুরের এক তিথিপূজার দিন ফুল-বেলপাতার সঙ্গে তাকেও ফেলে দিয়েছিলেন গঙ্গায়। কারুর খেয়াল ছিল না। কিন্তু যাঁর কবচ তাঁর খেয়াল আছে। ভাঁটার জল যখন কমে গেল, তখন গঙ্গার পারে খেলতে গেল হৃষি, বলরামের ছেলে। দিব্যি পেয়ে গেল ইষ্টকবচ।

যা হারাবার নয় তা কে হরণ করে। নিশীথ রাত্রে নিজের হাতে যদি ঘরের আলো নিবিয়েও ফেলি, বাইরে চেয়ে দেখি ধ্রুবতারার জ্যোতিটি তুমি ঠিক জেলে রেখেছ!

পরনে ছোট তেল-ধুতি, খস-খস করে গঙ্গায় নাইতে যায় রামকৃষ্ণ। কাচের উপর রোদ লেগে যেমন ঠিকরে পড়ে তেমনি তার গা থেকে একটা আভা ছিটকে পড়ছে চারদিকে। যে দেখে তারই আর পলক পড়ে না।

রামকৃষ্ণের জন্যে রাঁধে সারদা। যদিও পরিহাস করে বলে, শ্রীনাথ হাতুড়ে,

তবু সারদার রান্নাটিতেই রামকৃষ্ণের অন্তরের রুচি। সজনে খাড়া বা পলতা শাক যেটি যখন রাঁধে সারদা, সেটিই একান্ত মনের মতন হয়ে ওঠে। স্বাদ আর পুষ্টির স্বাভাবিক মিতালি। রাত্রে দু-একখানি লুচি আর একটু সুজির পায়েস। কাশীপুরে তুলোর মতন নরম করে মাংসও রেঁধে দিয়েছেন শ্রীমা।

'আমি যখন ঠাকুরের জন্যে রাঁধতুম কাশীপুরে, কাঁচা জলে মাংস দিতুম। কখানা তেজপাতা আর অল্প খানিকটা মশলা। তুলোর মতন সেদ্ধ হলে নামিয়ে নিতুম।' থালার উপর টিপে-টিপে ভাত বেড়ে দেয় সারদা। যাতে একটু কম দেখায়। বেশি ভাত দেখলে আঁত ক ওঠে রামকৃষ্ণ। তাই সরুটি করে দেয় টিপে-টিপে। দুধের বেলায়ও তাই। আধ সের করে রোজ-বাঁধা। কখনো-সখনো একটু বেশী দিয়ে যায় গয়লা। সেটাকে ফুটিয়ে ঘন করে রাখে। সর করে। সর ভালোবাসে রামকৃষ্ণ। এমনি করে ভুলিয়ে-ভুলিয়ে খাওয়ায় সেই সদানন্দ শিশুকে। কিন্তু কিছুতেই লোভ নেই সেই শিশুর। একদিন একটা সন্দেশ মুখে পুরে দিতে গিয়েছিল সারদা, রামকৃষ্ণ বললে, 'ওতে আর কি আছে? সন্দেশও য মাটিও তা।'

শুধু নারকেলের নাড়ু আর জিলিপির উপর একটু পক্ষপাত।

'ঠাকুর নারকেলের নাড়ু ভালোবাসতেন।' এক স্ত্রী-ভক্তকে বললেন এক দিন শ্রীমা: 'দেশে গিয়ে তাই করে তাঁকে ভোগ দেবে।'

আর জিলিপি?

কেশব সেনের বাড়িতে খেতে বসেছেন ঠাকুর। খাওয়া হয়ে গিয়েছে—হাত তুলে বসেছেন পাত থেকে। আর খাবেন না, শত সাধাসাধি করলেও না। এমন সময় জিলিপি এসে উপস্থিত। আর যায় কোথা! ঠাকুর তুলে নিলেন জিলিপি। এ হচ্ছে বড়লাটের গাড়ি। ঠাকুর প্রসন্ন চোখে হাসলেন। বড়লাটের গাড়ি দেখলে রাস্তা যেমন ফাঁকা হয়ে যায় তেমনি জিলিপি দেখে ভরা পেট হালকা হয়ে যাচ্ছে। জিলিপির সঙ্গে কার কথা! জিলিপি হচ্ছে অমৃতের লিপি! সেই শিশুকালের অকৃত্রিম সুস্বাদের সংবাদ। সেই কামারপুকুরের সত্য-ময়রার দোকান।

খাবার জায়গা হয়েছে রামকৃষ্ণের। নহবত থেকে থালা হাতে নিয়ে আসছে সারদা। ভক্তরা সব এখন সরে যাও। সিঁড়ি থেকে বারান্দায় পা দিয়েছে, কোত্থেকে এক মেয়ে-ভক্ত হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল। 'দাও মা আমাকে দাও।' বলে প্রায় জোর করেই সারদার হাত থেকে টেনে নিল থালা। রামকৃষ্ণের আসনের কাছে ধরে দিয়ে সরে গেল। সারদা বসল এক পাশে। রোজ এমনিই

এসে বসে। রামকৃষ্ণের খাওয়া দেখে। খেয়ে যে স্বাদ রামকৃষ্ণ পায় তারও চেয়ে সারদা অধিকতর পায় না-খেয়ে।

'তুমি এ কি করলে?' আসনে বসেই বললে রামকৃষ্ণ, 'আমার খাবার নিজে না নিয়ে ওর হাতে দিলে কেন? তুমি কি ওকে জানো না?'

একটা কলঙ্ক ছিল মেয়েটির। সারদা বললে, 'জানি।'

'জানো তো, দিলে কেন? এখন আমি খাই কি করে?'

মেয়েটির হাতের সেই আকুলতাটি বুঝি মনে পড়ল সারদার। বললে, 'আজকে খাও।'

'তবে বলো, আর কোনো দিন আর কারু হাতে দেবে না আমার খাবার?'

সারদা জোড় হাত করল। বললে, 'ওটি আমি পারব না। যে কেউ চাইলেই আমি ছেড়ে দেব ভাতের থালা।'

করুণাময়ীর এ আরেক অমৃত-পরিবেশন। আমার ভালবাসার সঙ্গে আর যদি কেউ তার ভক্তির স্বাদটি মিশিয়ে দিতে চায় তা আমি বারণ করি কি করে?

'তবে চেষ্টা করব খুব।' সারদা বললে গাঢ়স্বরে, 'যাতে আমিই বরাবর নিজের হাতে নিয়ে আসতে পারি।' খুশি মনে খেতে লাগল রামকৃষ্ণ।

কাশীপুরে ঠাকুরের জন্যে শামুকের ঝোল ব্যবস্থা হল। ঠাকুরের ইচ্ছে শ্রীমাই তা রান্না করুন। শ্রীমা বললেন, 'ও আমি পারব না।'

'কেন কি হল?'

'ওগুলো জীয়ন্ত প্রাণী, চলে বেড়ায়। ওদের মাথা আমি ইট দিয়ে ছেঁচতে পারব না।'

'সে কি! আমি খাব, আমার জন্যে করবে!'

তখন, কি আর করা, রোক করে করতে লাগলেন শ্রীমা।

'মা, ঠাকুরকে অন্ন ভোগ দেব কি?' জিগগেস করলেন এক স্ত্রী-ভক্ত।

'হ্যাঁ, দেবে বৈ কি। তিনি শুকতো খেতে ভালোবাসেন। গাঁদাল, ডুমুর, কাঁচকলা—'

'মাছ ভোগ দেব কি?' কুণ্ঠা-ভরা জিজ্ঞাসা মেয়েটির।

'হ্যাঁ, তাও দেবে। তিনি সেদ্ধ চালের ভাত খেতেন, মাছও খেতেন। অন্তত শনি-মঙ্গলবারে মাছ ভোগ দেবে। আর যেমন করে হোক তিন তরকারি ছাড়া ভোগ দেবে না—'

তারপরে পান সাজে সারদা। রামকৃষ্ণের মশলা এলাচ লাগে না। শাদাসিধে সাজা পানেই অন্তরঙ্গ স্বাদ। পান সাজছে নহবতে বসে। কতগুলো বেশ ভালো

করে এলাচ-মশলা দিয়ে, কতগুলো শুধু সুপরি-চুন দিয়েই। যোগেন বলে ছিল পাশে। জিগগেস করলে, 'কই এগুলোতে মশলা-এলাচ দিলে না? ওগুলো বা কার, এগুলোই বা কার?'

সারদা বললে, 'যেগুলো ভালো, এলাচ-দেওয়া সেগুলো ভক্তদের। ওদের আপনার করে নিতে হবে, তাই একটু আদর-যত্নের ছিটেফোঁটা ওগুলোতে। আর এলাচ-মশলা ছাড়া এগুলো—এগুলো ওঁর জন্যে। উনি তো আপনার আছেনই।'

তোমাকে ভালো ভাষায় ভোলাব না, তোমাকে ভালোবাসায় ভোলাব। তোমার জন্যে আমার কোনো সাজ-সজ্জা নেই, আমার এই সারল্যটুকুই আমার একমাত্র ভূষণ। আমার তো ঘোষণা নয়, আমার আহ্বান। অকপট না হলে তোমার কপাটপাটন হবে না যে।

আহারান্তে রামকৃষ্ণ ছোট খাটটিতে এসে বসে। তামাক খায়। সারদা এসে পা টেপে। শেষকালে, সারদার চলে যাবার আগে সারদাকে আবার প্রণাম করে রামকৃষ্ণ।

সন্ন্যাসী-স্বামীর একটি পরিত্যক্তা স্ত্রী এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। একটু সাজগোজ করতে চায় বলে তার উপর তার শাশুড়ীর বড় কড়া শাসন। শ্রীমা তাই বলছেন দুঃখ করে: 'আহা ছেলেমানুষ বৌ, তার একটু পরতে-খেতে ইচ্ছে হয় না? একটু আলতা পরেছে তা আর কি হয়েছে? আহা, ওরা তো স্বামীকে চোখেই দেখতে পায় না—স্বামী সন্ন্যাস নিয়েছে। আমি তো তবু চোখে দেখেছি, সেবা-যত্ন করেছি, রেঁধে খাওয়াতে পেরেছি, যখন বলেছেন যেতে পেরেছি কাছে, যখন বলেননি, দু'মাস পর্যন্ত নামিইনি নবত থেকে। দূর থেকে দেখে পেন্নাম করেছি—'

সাজতে সারদাও ভালোবাসে।

'কেন বাসবে না? ওরে, ওর নাম সারদা, ও সরস্বতী। তাই তো ভালোবাসে সাজতে।' বললে রামকৃষ্ণ। নিজে টাকা-কড়ি ছুঁতে পারে না, তাই ডাকলো হৃদয়কে। 'ছাখ তো, তোর সিন্দুকে কত টাকা আছে। ওকে ভালো করে দু ছড়া তাবিজ গড়িয়ে দে।' সিন্দুক থেকে তিনশো টাকা বেরুলো। তাই দিয়ে তাবিজ হল সারদার।

রামকৃষ্ণের মাইনে নিয়ে হিসেবে কি গোল করেছিল খাজাঞ্চি। কম দিয়েছিল। তাই নিয়ে এক দিন বললে সারদা, 'খাজাঞ্চিকে গিয়ে বলো না—'

রামকৃষ্ণ বললে, 'ছি-ছি, হিসেব করব!'

হিসেব পচে যায়।

এদিকে সর্বস্ব ত্যাগী, অথচ সারদার জন্যে ভাবনা। এক দিন তাকে জিগগেস করলে রামকৃষ্ণ, 'তোমার ক'টাকা হলে হাতখরচ চলে?'

মুখ নামালো সারদা। বললে, 'পাঁচ-ছ টাকা হলেই চলে।'

তারপর, হঠাৎ আরেক অদ্ভুত জিজ্ঞাসা: 'বিকেলে কখানা রুটি খাও?'

এবার লজ্জায় আর বাঁচে না সারদা। কি করে বলি! এ কি একটা বলবার মত কথা! কিন্তু রামকৃষ্ণ ছাড়ে না। জিগগেস করে বারে-বারে। মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে সারদা বললে, 'এই পাঁচ-ছখানা খাই।'

তারপর আরো একটু অন্তরঙ্গ হয় রামকৃষ্ণ। বলে, 'বুনো পাখি খাঁচায় রাতদিন থাকলে বেতে যায়। মাঝে-মাঝে পাড়ায় বেড়াতে যাবে।'

এক দিন ক'টা পাট এনে দিলে সারদাকে। বললে, 'এগুলি দিয়ে আমাকে শিকে পাকিয়ে দাও। আমি সন্দেশ রাখব লুচি রাখব ছেলেদের জন্যে।'

সারদা শিকে পাকিয়ে দিল। কেঁসোগুলো দিয়ে থান ফেলে বালিশ করলে।

কোনো জিনিস অপচয় হতে দেয় না সারদা। যত সামান্য জিনিস হোক, যত্ন করে রেখে দেয়, কাজে লাগায়। বলে সেই অপূর্ব কথা: 'যাকে রাখো সেই রাখে।' পটপটে মাদুর পেতে কেঁসোর বালিশে মাথা রেখে সারদা শোয়। দিব্যি ঘুম আসে।

পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, সারদার জন্যে বড় ভাবনা রামকৃষ্ণের। কোথায় না জানি শৌচে যাবে, নিন্দে করবে লোকে, তখন ভারি লজ্জা পাবে বেচারী! কিন্তু আশ্চর্য, কখন যে কি করে, কাকপক্ষীও টের পায় না।

'বাইরে যেতে আমিও কখনো দেখলুম না।' বলে ফেলল রামকৃষ্ণ।

কথাটা সারদার কানে যেতেই মুখ শুকিয়ে গেল। ওমা, এখন কী হবে! ঠাকুর যা মনে-মনে চান তাইই মা ওঁকে দেখিয়ে দেন। এখন তো তবে এক দিন তাঁর চোখে ঠিক ধরা পড়ে যাব! এখন উপায়? আকুল হয়ে ভবতারিণীকে ডাকতে লাগল সারদা। 'হে মা, আমার লজ্জা রক্ষা করো।'

এমন মা, বিপন্না মেয়ের দায় মোচন করলে। দুই পাখা দিয়ে ঢেকে রাখল মেয়েকে। কত বছর ধরে আছে সারদা, এক দিনও কারু সামনে পড়ল না।

রাত তিনটের সময় উঠে জপে বসে। জপে বসে আর কোনো হুঁস থাকে না। সেদিন জ্যোৎস্না রাত, নবতে সিঁড়ির পাশে বসে জপ করছে সারদা। চারদিকে রুদ্ধশ্বাস স্তব্ধতা। ধ্যান খুব জমে গিয়েছে। ঠাকুর কখন বটতলায় গেছেন টেরও পায়নি। অন্য দিন জুতোর শব্দে টের পায়, আজ তাও নয়। লালপেড়ে শাড়ির

আঁচল খসে বাতাসে উড়ে-উড়ে পড়ছে, খেয়াল নেই। তন্ময়তার প্রতিমূর্তি। যখন ধ্যান ভাঙল তাকালো চাঁদের দিকে। হাত জোড় করলে। বললে, 'তোমার ঐ জ্যোৎস্নার মত আমার অন্তর নির্মল করে দাও।'

॥ ৮৩ ॥

'আজ নরেন এখানে খাবে।' ঠাকুর বললেন এসে নবতে। 'বেশ ভালো করে রাঁধো।'

মুগের ডাল আর রুটি করল সারদা। তাই খেল নরেন এক পেট। খাবার পর ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'ওরে কেমন খেলি?'

'বেশ খেলুম। যেন রুগীর পথ্য।'

ঠাকুর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। নবতের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বললেন, 'ওকে ওসব কি রেঁধে দিয়েছ? ওর জন্যে ছোলার ডাল আর মোটা-মোটা রুটি করে দেবে।'

তাই আবার করে দিল সারদা। তাই আবার খেল নরেন।

'নরেনের হচ্ছে ব্যাটাছেলের ভাব। নিরাকারের ঘর। পুরুষের সত্তা! ও হচ্ছে পুরুষ-পায়রা। পুরুষ-পায়রার ঠোঁট ধরলে ঠোঁট টেনে ছিনিয়ে নেয়।'

কিন্তু মেয়ে-ভাব প্রকৃতি-ভাব কার? বাবুরামের। ওর হচ্ছে প্রেমের ঘর।

কিন্তু নরেন আর আসে না কেন? কেন দেখা দিয়ে আবার লুকিয়ে থাকে?

নরেন আসেনি কিন্তু সেদিন বাবুরাম এসে উপস্থিত।

যখন পাঁচ বছর বয়েস তখন যদি কেউ বলত, 'তোর এমন বাবুর মত চেহারা, তোকে একটি টুকটুকে সুন্দরী বউ এনে দেব, অমনি কচি-কচি দুটি হাত নেড়ে অসম্মতি জানাত, 'ও কথা বোলো না—ম'রে যাব ম'রে যাব।' সেই বাবুরাম। বড় বোন কৃষ্ণভাবিনী। শ্যামবাজারের বলরাম বোসের স্ত্রী। ঠাকুরের রসদদার বলরাম বোস।

'যখন আসবে এখানকার জন্যে কিছু নিয়ে এস। শুধু হাতে আসতে নেই।' এ কথা এক দিন বলেছিলেন বলরামকে। আর যায় কোথা! প্রতি মাসে ডালা পাঠায় বলরাম।

কেশবও যখন আসে হাতে করে কিছু নিয়ে আসে। অন্তত একটি ফুল।

শ্যামবাজারের যদু পণ্ডিতের 'বঙ্গ বিদ্যালয়ে' ভর্তি হয়েছে বাবুরাম। থাকে খুড়োর বাড়িতে। পাঠশালার সহপাঠী কালীপ্রসাদ। স্বামী অভেদানন্দ।

সেইখান থেকে চলে এসেছে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে। মাস্টারমশায়ের ইস্কুলে। ঠিক অঙ্কুরটি উড়ে এসে পড়েছে ঠিক মাঠটিতে।

গঙ্গাপারে সাধুসন্নেসী খুঁজে বেড়ায় বাবুরাম। কতই দেখে, কিন্তু মনের মতনটিকে দেখে না। যাকে দেখে আর জিগগেস করতে হয় না, এ কে—সেই জিজ্ঞাসাতীতকে।

ঘুণাক্ষরেও জানে না তেমন একজনকে দেখেছে তার ভগ্নীপতি। দেখেছে তার মা। এমন কি তার দাদা তুলসীরাম।

'কোথায় অমন সাধু খুঁজে বেড়াচ্ছিস?' এক দিন তাকে বললে তুলসীরাম। 'যদি সত্যিকার সাধু দেখতে চাস তবে দক্ষিণেশ্বরে যা! দেখে আয় রামকৃষ্ণদেবকে।' রামকৃষ্ণের কথা শুনেছে বাবুরাম। পড়েছে খবরের কাগজে। জোড়াসাঁকোর এক হরিসভায় এক দিন বুঝি তাঁকে দেখেওছিল দূর থেকে। কিন্তু তাঁর কাছে যাই কেমন করে? কে নিয়ে যায়!

শুধু একবার মনে করো, যাবে, তিনিই ব্যবস্থা করে দেবেন। ছেলে যদি বাপের কাছে যেতে চায়, বাপ টাকা পাঠিয়ে দেয়, লোক পাঠিয়ে দেয়। তোমার কাছে যাব—একবার শুধু একটু খবর পাঠিয়ে দাও তাঁকে। আর দেখতে হবে না। তিনি পাঠিয়ে দেবেন যান-বাহন লোক-লস্কর টাকা পয়সা।

রাখালকে চিনত, তাকে বললে খুলে মনের কথা।

'আমি তো যাই প্রায়ই দক্ষিণেশ্বর।'

'আমাকে নিয়ে যাবে?' রাখালের হাত চেপে ধরল বাবুরাম।

কিন্তু যাবে কি করে? পায়ে হেঁটে না নৌকোয়? যাবে তো ফিরবে কি করে? যদি ফিরতে না পাও, থাবে কি? শোবে কোথায়? কোনো প্রশ্ন নিয়েই আর মাথা ঘামায় না বাবুরাম। ঠিকানা জানা হয়ে গেছে। ঠাকুর পাঠিয়ে দিয়েছেন দিশারী।

শনিবার ইস্কুল ছুটি হলে দুই বন্ধু চলে এল হাটখোলার ঘাটে। রামদয়াল চক্রবর্তীও এসেছে দেখছি। হোরমিলার কোম্পানিতে চাকরি করে রামদয়াল, থাকে বলরামের বাড়িতে। সেও দক্ষিণেশ্বরের যাত্রী।

পৌঁছুতে সেই সন্ধ্যে। ঠাকুর ঘরে নেই।

রাখাল কখন চলে গেছে মন্দিরের দিকে। বাবুরামকে বসে থাকতে বলে গেছে, তাই বসে আছে বাবুরাম। বসে আছে প্রার্থনার মত। প্রসাদের জন্যে যে প্রতীক্ষা তাই প্রার্থনা।

কতক্ষণ পরে রাখালের কাঁধে হাত রেখে ভাবাবিষ্ট ঠাকুর ঘরে ঢুকছেন। টলছেন মাতালের মত। হতবাকের মত তাকিয়ে রইল বাবুরাম। চোখের সামনে এ কে নয়নভুলানো!

ছোট খাটটিতে বসলেন ঠাকুর। রামদয়াল পরিচয় করিয়ে দিল।

'বলরামের আত্মীয়? তা হলে তো আমাদেরও আত্মীয়।' হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ডাকলেন বাবুরামকে। 'এসো তো, আলোয় এসো তো একটিবার, তোমার মুখখানি দেখি।'

ঘরের কোণে মিটমিটে একটি দীপ জ্বলছে। সেইখানে বাবুরামকে টেনে আনলেন ঠাকুর। বাবুরামের ভক্তিনম্র কিশোর মুখখানি দেখলেন একদৃষ্টে। বললেন, 'বাঃ, বেশ ছেলেটি তো!' পরে তার হাতখানি টেনে নিলেন তাঁর হাতের মধ্যে। ওজন নিলেন। বললেন, 'বেশ।'

বাবুরামকে দেখলাম—দেবীমূর্তি। গলায় হার। সখী সঙ্গে। ওর দেহ শুদ্ধ—ওর হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ। একটা কিছু করলেই ওর হয়ে যাবে।

পরে এক দিন বলেছিলেন ঠাকুর, 'দেহরক্ষার বড় অসুবিধে হচ্ছে। বাবুরাম এসে থাকলে ভালো হয়। নেটো তো চড়েই রয়েছে। ক্রমে লীন হবার যো। আর রাখাল? রাখালের এমন স্বভাব হয়ে দাঁড়াচ্ছে, আমাকেই তাকে জল দিতে হয়। আমার সেবা বড় সে আর করতে পারে না। তবে টানাটানি করে আসতে বলি না, বাড়িতে হাঙ্গামা হতে পারে। আমি যখন বলি চলে আয় না, তখন বেশ বলে, আপনি করে নিন না। রাখালকে দেখে কাঁদে, বলে, বেশ আছে।'

তাই এক দিন যখন মাকে নিয়ে বাবুরাম গিয়েছে দক্ষিণেশ্বর, ঠাকুর বললেন মাতঙ্গিনী দেবীকে, 'তোমার এই ছেলেটি আমাকে দেবে?'

মাতঙ্গিনী দেবী নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন। বললেন, 'এ তো আমার পরম সৌভাগ্য।'

বাবুরামের দেহ-লক্ষণ পরীক্ষা করে ঠাকুর আবার বসলেন ছোট খাটে। হঠাৎ রামদয়ালকে লক্ষ্য করে বললেন স্নেহাকুল কণ্ঠে, 'ওগো নরেনের খবর জানো? সে কেমন আছে?'

'ভালো আছে।' বললে রামদয়াল।

'এখানে অনেক দিন আসে না। তাকে দেখতে বড় ইচ্ছে করছে। কেন আসে না—এক দিন আসতে বোলো।'

কানু ছাড়া গীত নেই, ঈশ্বর ছাড়া কথা নেই। কথায়-কথায় রাত দশটা বেজে গেল। অমৃতময়ী কথা।

নারদকে রাম বললেন, তুমি আমার কাছে কিছু বর নাও। নারদ বললেন, রাম, আমার আর কি বাকি আছে? কি বর নেব? তবে যদি একান্তই দেবে, এই বর দাও যেন তোমার পাদপদ্মে শ্রদ্ধাভক্তি থাকে, আর যেন তোমার ভুবন-

মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। রাম বললেন, নারদ, আর কিছু বর নাও। নারদ আবার বললেন, রাম আর কিছু চাই না, যেন তোমার পাদপদ্মে শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকে এই করো।

যেখানে ভক্তি সেখানেই ভগবান।

লক্ষণ রামকে জিগগেস করলেন, রাম, তুমি কত ভাবে কত রূপে থাকো, কিরূপে তোমায় চিনতে পারব? রাম বললেন, ভাই, একটা কথা জেনে রাখো। যেখানে উর্জিতা ভক্তি, সেখানে নিশ্চয়ই আমি আছি। উর্জিতা ভক্তিতে হাসে কাঁদে নাচে গায়। যদি কারু এরূপ ভক্তি হয় নিশ্চয় জেনো সেখানে ভগবানের আবির্ভাব।

ঠাকুরের তো সেই অবস্থা। প্রেমে হাসে কাঁদে নাচে গায়। তবে কি এইখানেই ঈশ্বরসাক্ষাৎ? বাবুরামকে ঠাকুর যখন আত্মীয় বললেন তখন তার মানে কি বাবুরাম ঠাকুরের ভক্ত? অন্তরঙ্গদের একজন?

রাত দশটা বেজে গেছে। ঠাকুর বললেন, এবার খেয়ে নাও সকলে।

রামদয়াল আর বাবুরাম বারান্দায় শুলো। রাখাল ঠাকুরের সঙ্গে এক ঘরে। শয়ন যেন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম এই শুধু মনে হতে লাগল বাবুরামের। যেন বা মাতৃ-অঙ্কে মাথা রেখে শিশুর মতো ঘুমিয়ে আছে। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে নিগূঢ় শান্তি। যেন কোন গভীরের দেশে এসে সহজ বিশ্রাম পেয়েছে আজ।

'ওগো ঘুমুলে?'

অতন্দ্র মধ্যরাত্রিই হঠাৎ করুণ স্বরে কেঁদে উঠল নাকি?

বাবুরাম চোখ চাইল, দেখল ঠাকুর। বালকের মত পরনের কাপড়খানি বগলের নিচে ধরা। রামদয়ালের শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে ডাকছেন।

দুজনে ঘুম ফেলে উঠে বসল। বললে, 'আজ্ঞে না, ঘুমুইনি।'

'ওগো আমার ঘুম আসছে না। নরেনের জন্যে আমার প্রাণের ভেতরটা মোচড় দিচ্ছে! যেন জোরে কে গামছা নিংড়োচ্ছে বুকের মধ্যে। তাকে একবার নিয়ে আসতে পারো?'

'আজ্ঞে, ভোর হোক। ভোর হলেই তাকে আমি সংবাদ দেবো। বললে রামদয়াল।

'তাই কোরো। শুধু একবারটি একটু চোখের দেখা। তাকে মাঝে-মাঝে না দেখলে থাকতে পারি না।'

এই বুঝি ভগবানের কান্না। বাবুরাম দেখতে লাগল, শুনতে লাগল। ভক্তই শুধু ভগবানের জন্যে কাঁদে না, ভগবানও বিনিদ্র রাত্রি জেগে ভক্তের জন্যে অশ্রু-

বর্ষণ করে। ভক্ত না থাকলে ভগবানও অনর্থক। যিনি কবি তাঁর একটি রসিক পাঠক চাই। এই রসিকটি না থাকলে সমস্ত রসসমুদ্রই শুষ্ক। সমস্ত কবিতাই মাটি।

শুধু ভগবান নন ভক্তও কঠোর হতে জানে। আর সেই ভক্তকে দ্রবীভূত করবার জন্যে ভগবানের এই বিগলিত কান্না।

বাবুরাম ভাবতে লাগল, কী নিষ্ঠুর না-জানি এই নরেন্দ্রনাথ।

শুধু কি এক দিন না এক রাত্রি? ভালোবাসার কি দিন-রাত্রি আছে? কান্নার কি ক্ষান্তি আছে কোনো কালে? এক দিন শেষে মা'র মন্দিরে গিয়ে ধরা দিলেন। মা গো, তাকে এনে দে। তাকে না দেখে যে থাকতে পাচ্ছি না।

ঠাকুরের কান্নার রোল ঘরের মধ্যে বসে শুনতে পাচ্ছে ভক্তেরা। পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। একটা পরের ছেলের জন্যে এমন করে কাঁদতে পারে কেউ? মা গো, এক কালে তোর জন্যে কেঁদেছিলাম, এখন নরেনের জন্যে কাঁদছি। তুই দেখা দিলি আর নরেন দেখা দেবে না? আমার এই কান্নার ডাকটি তার কানে পৌঁছে দে মা। তুই পাষাণ হয়ে শুনতে পেলি আর ও রক্ত-মাংসের মানুষ হয়ে শুনতে পাবে না?

আবার ভক্তদের মধ্যে এসে বসেন ঠাকুর। বলেন, 'এত কাঁদলাম কিন্তু নরেন্দ্র তো এলো না! সে এত বোঝে আর আমার প্রাণের টানটাই বোঝে না!'

আবার ঘরের বাইরে গিয়ে কান পাতেন। ঐ বুঝি শোনা যাচ্ছে তার পায়ের শব্দ। তার দরাজ গলার কলস্বর।

কোথাও কিছু নেই। তখন নিজেকেই নিজে উপহাস করেন ঠাকুর। 'বুড়ো মিনসে, পরের একটা ছেলের জন্যে এমনি কাঁদছি, লোকে দেখলে কী বলবে বলো দেখি? তোমরা আপনার লোক, তোমাদের কাছে না-হয় লজ্জা নেই, কিন্তু অন্যে কী বলবে? অন্যে কী বলবে ভেবেও তো সামলাতে পাচ্ছি না!'

সেবার ঠাকুরের জন্মোৎসব করছে ভক্তরা। নতুন সাজে সাজিয়েছে ঠাকুরকে। চন্দন-চর্চিত পুষ্পমালা দুলিয়ে দিয়েছে গলায়। আনন্দের হাটবাজার বসে গিয়েছে চারদিকে। রাম দত্ত প্রসাদ বিলোচ্ছে। গোষ্ঠমিলন গান শুরু হবে এবার। কিন্তু ঠাকুর মাঝে মাঝে একটা বিষণ্ণতার রেখা টানছেন। 'তাই তো, নরেন্দ্র এখনো এলো না।'

নরোত্তম কীর্তন গাইছে। যার কীর্তন তিনি মাঝে-মাঝে আখর দিচ্ছেন। মাঝে-মাঝে আবার তা কান্নার আখর। 'কই, নরেন্দ্র কই?'

নরেন্দ্র ছাড়া সমস্ত ব্যঞ্জন আলুনি। সমস্ত ব্যঞ্জনা বিস্বাদ।

উন্মনা ভাবে কখন একটু তন্ময় হয়ে ছিলেন ঠাকুর, নরেন হঠাৎ এসে তাঁকে প্রণাম করলে। ঠাকুর লাফিয়ে উঠলেন। তাঁর আনন্দ তখন আর দেখে কে! একেবারে নরেনের কাঁধে চেপে বসলেন, বসেই গভীর ভাবাবেশ।

আর নরেন? প্রেমময়ের স্পর্শে বেদান্তবাদীর কাঠিন্য গলে যেতে লাগল। দুটি পরিপূর্ণ চোখ আচ্ছন্ন হয়ে এল অশ্রুতে।

চারদিকে আনন্দের ঢেউ বইতে লাগল। বইতে লাগল সেবার স্রোতস্বিনী। ঠাকুর খাচ্ছেন, প্রসাদ-লোভে ভক্তরা তাঁকে বেষ্টন করে আছে। হঠাৎ দু'চার গ্রাস খেয়েই ঠাকুর বলে উঠলেন, 'নরেনের গান শুনব। গান শুনতে-শুনতে খাব। তাঁর গুণগান শোনবার জন্যে মহামায়া নরেনকে অখণ্ডের ঘর থেকে নিয়ে এসেছেন। ওর গান শুনলে আমার ভিতরে কী হয় জানিস? আমার ভিতরে যিনি, তিনি কোঁস করে ওঠেন।'

নরেন গান ধরল:

'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী॥
অভয় চরণ তলে প্রেমের বিজলী খেলে
চিন্ময় মুখমণ্ডলে শোভে অট্ট অট্ট হাসি॥'

গান শুনেই ঠাকুর সমাধিস্থ। অন্নরস ছেড়ে চলে গেছেন অন্য রসে। আনন্দরসে। কিন্তু ঠাকুরের পরিহাসরসও অফুরন্ত।

বেলা দুটোর সময় ভক্তরা বসেছে পঙক্তিভোজনে। চিঁড়ে দই আর চিনি পরিবেশন হচ্ছে। 'রামের কি ছোট নজর!' বললেন ঠাকুর, 'আমার জন্মোৎসবে কিনা চিঁড়ের ব্যবস্থা করল! এই শীতের দিনে চিঁড়ে-দই! তার বদলে—'

ঠাকুর গান ধরলেন: 'মোণ্ডা খাজা খুরমা গজা মোদক-বিপণি-শোভনম্।'

ভক্তবৃন্দ উল্লাসের হিল্লোল তুলল।

গান জমাবার জন্যে 'আরে আরে' বলে ঠাকুর আখর দিচ্ছেন, এমন সময়ে এক ভক্ত 'হরি হরি' বলে উঠল। সব রস মাটি। ঠাকুর হেসে উঠলেন। 'শালা এমন বেরসিক, রসগোল্লা-রসগোল্লা না বলে হরি-হরি বললে।'

এমন সময় ফের দই নিয়ে এল। এই দেখে ঠাকুর হাত তুলে গাইতে লাগলেন:

'দে দই দে দই পাতে, ওরে ব্যাটা হাঁড়ি হাতে
ওরা কি তোর বাবা খুড়ি, ওদের পাতে হাঁড়ি-হাঁড়ি—'

একটা হুল্লোড় পড়ে গেল।

আর তারই মধ্যে সেই অরসিক ভক্ত 'রসগোল্লা' বলে 'জয়' দিলে।

যদু মল্লিকের বাগানে গিয়ে আবার কাঁদে রামকৃষ্ণ।

ভোলানাথ, মোটা বামুন, হাত জোড় করে বলে, 'মশায়, ওর সামান্য পড়াশুনো, ওর জন্যে আপনি কেন এত অধীর হন?'

সামান্য পড়াশুনো? নরেনের জুড়ি আর একটাও ছেলে আছে? ঝলসে ওঠে রামকৃষ্ণ। 'যেমন গাইতে-বাজাতে, তেমনি বলতে-কইতে, তেমনি আবার লেখাপড়ায়। রাত-ভোর ধ্যান করে, ধ্যান করতে-করতে সকাল হয়ে যায়, হুঁস থাকে না। সে কি যে-সে? তার ভেতর এতটুকু মেকি নেই—বাজিয়ে দেখ গিয়ে, টং টং করছে। আর সব ছেলেদের দেখি—দেড়টা-দুটো পাশ করেছে হয়তো, ব্যস, ঐ পর্যন্তই। চোখ-কান টিপে কোনো রকমে পাশ করতেই যেন সব শক্তি বেরিয়ে গেছে। আমার নরেনের সে রকম নয়, সে হেসে-খেলে পাশ করে যায়। ব্রাহ্মসমাজে ভজন গায় সে—আর-আরদের মতন নয়, সে সত্যিকারের ব্রহ্মজ্ঞানী। বুঝলে, ধ্যান করতে বসে সে জ্যোতি দেখে। সাধে কি আর নরেনকে এত ভালোবাসি?'

কিন্তু যাকে এত ভালবাসেন সে তাঁকে মানতে রাজী নয়। সে তাঁকে কাঁদায়। এক দিন সরাসরি বললে মুখের উপর, 'তুমি ঈশ্বরের রূপ-টুপ যা দেখ তা তোমার মনের ভুল।' আহতের মত অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন রামকৃষ্ণ। বললেন, 'বলিস কি রে! কথা কয় যে!'

'কথা কয় না কচু!' কথাটা হেসে উড়িয়ে দিল নরেন্দ্র। 'সব আপনার মাথার খেয়াল!'

বলে কি ছোঁড়া! মাথার খেয়াল!

'বলিস কি রে! মা স্পষ্ট চোখের সামনে দাঁড়ান, হাঁটেন-চলেন, কথা কন—'

'বাজে কথা! মাটির প্রতিমা নড়বে-চড়বে কি! কথা কইবে কি!'

'বাঃ, নিজের চোখ-কানকে অবিশ্বাস করব?'

'মাথার গরমে ছায়া দেখেন আপনি, হয় তো বা অপচ্ছায়া!' নরেন নিষ্ঠুরের মত বললে, 'হাওয়ায় হয়তো বা কি শব্দ হয়, ভাবেন ছায়া বুঝি কথা কইছে।'

'তুই বললেই হল?' নরেনকে উড়িয়ে দিতে চাইলেন রামকৃষ্ণ।

'আপনি বললেই বা হবে কেন?' প্রত্যাখ্যানে দৃঢ় নরেন্দ্রনাথ: 'পশ্চিমের বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, অনেক জায়গায় চোখ-কান এমনি করে প্রতারণা করে।

আপনিও যে প্রতারিত হচ্ছেন না তার প্রমাণ কি? কে বলবে সমস্তই আপনার চোখ-কানের ভুল নয়?'

'সমস্তই আমার চোখ-কানের ভুল?' অসহায়ের মত তাকিয়ে রইলেন রামকৃষ্ণ। 'নিশ্চয়। নইলে যা সত্যি অদৃশ্য তাকে দেখা যাবে কি করে? যা অচল সে কি করে নড়ে-চড়ে?'

এর মধ্যে আবার হাজরা আছে টিপ্পনি ঝাড়তে।

বলছে, 'ঈশ্বর অনন্ত, তাঁর ঐশ্বর্য অনন্ত—সব বুঝি। তাই বলে তিনি কি আর সন্দেশ-কলা খাবেন? না, গান শুনবেন? ও সব ধোঁকা, ধাপ্পাবাজি।'

'তা ছাড়া আবার কি।' তার কথায় দাগা বুলালো নরেন।

বড় মন-মরা হয়ে গেলেন রামকৃষ্ণ। নরেন তো মিথ্যে বলবার ছেলে নয়! তবে এত দিন তিনি যা সব দেখে এসেছেন, বিশ্বাস করে এসেছেন, সব ভুয়ো! সব কাল্পনিক? ভবতারিণীর কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লেন রামকৃষ্ণ।

'মা, এ কী হল? এ সব কি মিছে? নরেন্দ্র এমন কথা বললে! তুই শুধু পাথরের মূর্তি? তুই অচল, অনড়? তুই বোবা, বধির?'

মা কথা কয়ে উঠলেন। বললেন, 'ওর কথা শুনিস কেন? কিছু দিন পরে ও-ই নিজে দেখতে পাবে ঈশ্বরীয় রূপ, সব কথা সত্য বলে মানবে। কিছু ভাবিসনে। যদি মিথ্যে হবে, সব কথা তবে অবিকল মিলল কি করে?'

শুধু তাই নয়, দেখিয়ে দিলেন ভবতারিণী। দেখিয়ে দিলেন, সর্বত্র চৈতন্য, অখণ্ড চৈতন্য—চৈতন্যময় রূপ।

তেড়ে ছুটে গেলেন রামকৃষ্ণ। পাকড়াও করলেন নরেনকে। বললেন, 'শালা, তুই আমায় অবিশ্বাস করে দিয়েছিলি! চলে যা, তুই আর এখানে আসিস নে।'

যার জন্যে এত কান্না, তাকেই কিনা বাড়ির বার করে দেওয়া।

মুখের কথায় নরেন নড়ে না, কেননা সে জানে অন্তরের কথাটি। তাই সে আস্তে-আস্তে 'বারান্দায় সরে গিয়ে বসে তামাক সাজতে। নীরবে হুঁকোটা বাড়িয়ে দেয় হাজরার দিকে। হাজরাও চুপ।

সেই যে সেদিন চলে গেল নরেন, রামকৃষ্ণের ভয় হল, আর বুঝি সে আসবে না রাগ করে। কিন্তু, না, আবার এসেছে আরেক দিন। সেদিন আনন্দ কত রামকৃষ্ণের! মনে-মনে বলছেন, ও যে আমার আপনার লোক, তাই ওকে বকলেও ও আসবে। যে আপনার লোক তাকে বকলেও সে রাগে না।

তাই তো ঈশ্বর মুখের কথায় ধার ধারেন না। অন্তরের বচনহীন ভাষাটি শোনবার জন্যে নিরন্তর কান পেতে থাকেন।

,নরেন্দ্রের কথা আর লই না।'
সেদিন আবার আরেক তর্ক।
রামকৃষ্ণ বললেন, চাতক আকাশের জল ছাড়া আর কিছু খায় না।
নরেন তা মানতে রাজী নয়। বললে, 'বাজে কথা। এমনি জলও চাতক খায়।'
মহা ভাবনা ধরল রামকৃষ্ণের। আবার ছুটলেন ভবতারিণীর মন্দিরে। মা, এ সব কি মিথ্যে হয়ে গেল? যা এত দিন সব দেখেছি-জেনেছি সব গাঁজাখুরি?
সেদিন কি মনে করে নরেন্দ্র এসে হাজির।
ঘরের ভিতর কতগুলো কী পাখী উড়ছে ফরফর করে। নরেন্দ্র বলে উঠল, 'ঐ, ঐ—'
কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলেন রামকৃষ্ণ, 'কি?'
'ঐ চাতক! ঐ চাতক!' উল্লাস করে উঠল নরেন।
কতগুলো চামচিকে।
হেসে উঠলেন রামকৃষ্ণ। বললেন, 'সেই থেকে নরেন্দ্রের কথা আর লই না।'
কিন্তু সব সময়ে ভয়, নরেন্দ্র এই বুঝি আর কারু হয়ে গেল। আমার বুঝি হল না! তাই তার সঙ্গে কথা কইতেও ভয়, না কইতেও ভয়।
স্নেহকরুণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন রামকৃষ্ণ। ভাববিহ্বল হয়ে গান ধরেন:

'কথা বলতে ডরাই না-বললেও ডরাই।
মনে সন্দ হয় পাছে তোমাধনে হারাই-হারাই॥'

গান শুনে অশ্রু-ভরোভরো চোখে তাকিয়ে থাকে নরেন। ভাবে ভালোবাসায় পাহাড় বুঝি দ্রবময়ী নির্ঝরিণী হয়ে যাবে।
কিন্তু ঐ বুঝি আবার হারিয়ে গেল। কত দিন আবার দেখা নেই নরেনের। কাঁহাতক আর বসে থাকবেন পথ চেয়ে! সেদিন নিজেই রওনা হলেন কলকাতার দিকে। কিন্তু, হঠাৎ খেয়াল হল, আজ তো রবিবার, যদি তার বাড়িতে গিয়ে দেখা না পাই! যদি কোথাও কারু সঙ্গে আড্ডা দিতে বেরিয়ে গিয়ে থাকে! কোথায় আর যাবে! আজ যখন রবিবার, নিশ্চয়ই ব্রাহ্মসমাজে ভজন গাইবার ডাক পড়েছে সন্ধের সময়। সেখানে গেলেই নির্ঘাত তাকে দেখতে পাব। আমার তো আর কিছুই বাসনা নেই, শুধু তাকে একটু দেখব কাছে থেকে।
যেমন ভাবা তেমন কাজ। সরাসরি সমাজে গিয়ে উপস্থিত হলেন রামকৃষ্ণ। মুহূর্তে একটা প্রলয়-কাণ্ড ঘটে গেল। বেদিতে বসে আচার্য ভাষণ দিচ্ছেন,

জনতার সেদিকে লক্ষ্য নেই। সেই 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' সহসা যেন মূর্তি ধরে আবির্ভূত হয়েছেন সভাস্থলে, এমনি মনে হল জনতার। তাঁকে একবারটি একটু চোখের দেখা দেখবার জন্যে চারদিকে রব পড়ে গেল। শুরু হয়ে গেল বাঁধভাঙা বিশৃঙ্খলা। বেঞ্চির উপর উঠে দাঁড়াল একদল, অন্য দল ঘিরে ধরতে চাইল রামকৃষ্ণকে।

স্তম্ভিতের মত বসে রইল আচার্য। মাথায় একবার এল না ঠাকুরকে যোগ্য সমাদরে সম্বর্ধনা করে নিই। বসাই এনে বেদির উপরে।

আচার্যের কথা ছেড়ে দি, সমাজের কর্তৃপক্ষের কেউই একটা সাধারণ শিষ্টাচার পর্যন্ত দেখালো না। মনে-মনে রামকৃষ্ণের উপর তারা চটা ছিল। তাদের সমাজের দু-দুটো মাথা—কেশব আর বিজয়কে রামকৃষ্ণ বশ করেছে। টেনে নিয়েছে নিজের মতে।

কিন্তু তাই বলে তিনি এমনি ভাবে অপমানিত হবেন? বেদির উপর বসে ছিল নরেন্দ্রনাথ, নিচে লাফিয়ে পড়ল। এগিয়ে গেল ঠাকুরের দিকে।

তাকে দেখতে পেয়ে ভাবে মাতোয়ারা হলেন রামকৃষ্ণ। তার দিকে ধাবমান হতে-না-হতেই সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন।

তখন আবার সমাধি-অবস্থায় রামকৃষ্ণকে দেখবার জন্যে জনতা আলোড়িত হয়ে উঠল। এমন সময় কারা ঘরের গ্যাস দিল নিবিয়ে। ঘনান্ধকারে ভরে গেল চারদিক। তুমুল গোলমাল। দিক্‌ভ্রান্ত ঘারভ্রান্ত জনতা। এদিক-ওদিক ছুটতে লাগল বিপর্যস্তের মত।

এমন রামকৃষ্ণকে কি করে রক্ষা করবে নরেন্দ্র! কি করে অন্ধকার থেকে নিয়ে আসবে বাইরে। নরেন একাই একশো। একাই আবৃত করে রাখবে। বলিষ্ঠবাহু পুত্র যেমন পিতাকে বেষ্টন করে রাখে। কারু সাধ্য নেই রামকৃষ্ণের ছায়া মাড়ায়।

রামকৃষ্ণের সমাধি ভাঙল। চার পাশে তাকালেন অন্ধকারে। কই, তুই আছিস? আয়, আমাকে ধর। তোকে দেখতে চলে এসেছি কতদূর!

হাত ধরে রামকৃষ্ণকে বাইরে নিয়ে এল নরেন। পিছনের দরজা দিয়ে। অন্ধকার ঠেলে-ঠেলে। একটা গাড়ি ডাকালো। চলো দক্ষিণেশ্বরে।

পথে ঠাকুরকে বকতে লাগলো নরেন। 'কেন আপনি এসেছিলেন এখানে?'

তুই জানিস না কেন এসেছিলাম? সুখস্মিতমুখে তাকিয়ে রইলেন ঠাকুর।

'সেজন্যে এখানে আপনি আসবেন, এই ব্রাহ্মসমাজে? এখানে ওরা আপনাকে সম্মান দেখাল, না, অভ্যর্থনা করল? ঘর অন্ধকার করে পালিয়ে গেল সকলে।

আমার জন্যে আপনি কেন এ অপমান নিতে এলেন? আপনার অপমানে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে—'

অপমান! ঠাকুরের মুখপদ্মের প্রসন্নাভা এতটুকু ম্লান হল না।

'অপমান ছাড়া আবার কি। ওরা আপনাকে বোঝে না, বোঝবার ওদের সাধ্যও নেই—ওদের এখানে আসবার আপনার কী দরকার! আমাকে ভালোবাসেন বলে আপনার সমস্ত কাণ্ডজ্ঞান খোয়াতে হবে?'

যা খুশি তাই বল। তোর কথায় কে কান দেয়। তোর কথা আর লই না। তোর দেখা পেয়েছি, তুই আমাকে গাড়ি করে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে দিতে যাচ্ছিস এই ঢের। নইলে কে কোথায় কী অনাদর বা উপেক্ষা করল তাতে আমার বয়ে গেল।

'ভালোবাসেন বাস্থন, কিন্তু নিজের দিকে খেয়াল রাখেন না কেন?'

ওরে ভালোবাসায় কি নিজের দিকে খেয়াল থাকে? ভালোবাসা যে আত্মনাশী।

'কিন্তু এই ভালোবাসার পরিণতি কি? শেষে ভরত রাজার মতন আপনার না দশা হয়! ভরত রাজা হরিণ ভাবতে-ভাবতে হরিণ হয়ে জন্মেছিল, আপনারো না শেষ পর্যন্ত—'

ঠাকুরের মুখে হঠাৎ চিন্তার ঘোর লাগল। বললেন, 'তুই একেকটা এমন কথা বলিস যে বিষম ভাবনা ধরে যায়।'

'আমি ঠিকই বলি।'

'তাই তো রে, তাহলে কী হবে! আমি যে তোকে না দেখে থাকতে পারি না। আমার তবে উপায় বলে দে।'

তবু ভালোবাসায় মাত্রা টানতে পারবেন না ঠাকুর। মন্দা পড়তে দেবেন না জোয়ারে। শেষকালে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে মা'র দুয়ারে এসে হাজির হলেন। নরেনকে কেন এত ভালোবাসি? কেন ওকে দেখবার জন্যে চোখ দুটো ক্ষয় হয়ে যায়? ও আমার কে? হাসতে-হাসতে ফিরে এলেন মন্দির থেকে। বললেন, 'যা শালা, তোর কথা আর লই না। মা সব বলে দিলেন, বুঝিয়ে দিলেন—'

'কী বলে দিলেন?'

'বলে দিলেন তুই ওকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে জানিস, তাই অত ভালোবাসিস। যেদিন ওর মধ্যে নারায়ণকে দেখতে পাবিনে সেদিন ওর মুখদর্শন তোর অসহ্য হবে।' প্রসন্ন আস্য প্রেমে তরল হয়ে এল। 'আমার ভরত রাজার মত দশা হবে বলতে চাস? নারায়ণ ভেবে নারায়ণকে ভালোবেসে যে পাড়ি জমাতে পারে তার আর পারাপারের ভয় কি!' সেই ভালোবাসার কাছে নরেন দাঁড়িয়ে রইল

অসহায়ের মত। আত্মবিস্মৃতের মত।

'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন কিনা জানি না, বুদ্ধ চৈতন্য প্রভৃতি একঘেয়ে, শিবানন্দকে বিবেকানন্দ চিঠি লিখছেন আমেরিকা থেকে : 'রামকৃষ্ণ পরমহংস দি লেটেস্ট এ্যাণ্ড দি মোস্ট পারফেক্ট—জ্ঞান প্রেম বৈরাগ্য লোকহিতচিকীর্ষা উদারতায় জমাট—কারু সঙ্গে কি তাঁর তুলনা হয়? তাঁকে যে বুঝতে পারে না তাঁর জন্ম বৃথা। আমি তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের দাস, এই আমার পরম ভাগ্য, তাঁর একটা কথা বেদবেদান্ত অপেক্ষা অনেক বড়। তস্য দাস-দাস-দাসহহং। তবে একঘেয়ে গোঁড়ামি দ্বারা তাঁর ভাবের ব্যাঘাত হয়—এই জন্য চটি। বরং তাঁর নাম ডুবে যাক—তাঁর উপদেশ ফলবান হোক। তিনি কি নামের দাস?...'

॥ ৮৫ ॥

জুড়িগাড়ি করে কারা আসছে দক্ষিণেশ্বরে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল রাখাল। সহজেই চিনতে পারল। কলকাতার এক নামজাদা বড়লোক।

রামকৃষ্ণেরও চোখ পড়েছে। যেমনি দেখা অমনি জড়দড় হয়ে পালিয়ে গেলেন ঘরের মধ্যে। অচেনা আগন্তুক দেখে শিশু যেমন ভয়ে পালায়।

এ কি হল? রাখালও পিছু-পিছু ঘরে ঢুকল।

'যা যা, শিগগির যা। ওরা এখানে আসতে চাইলে বলিস এখন দেখা হবে না।'

এমনতরো তো কোনো দিন হয় না। অর্থী তো কোনো দিন ফিরে যায় না ব্যর্থ হয়ে।

অবাক মানল রাখাল। বাইরে এসে জিগগেস করলে অভ্যাগতদের : 'কি চাই?'

'এখানে একজন সাধু আছেন না? তাঁকে চাই।'

'কি দরকার?'

'আমার আত্মীয়ের থাক-যাক অসুখ। কিছুতেই সুরাহা হচ্ছে না। উনি দয়া করে যদি কোন ওষুধ-টোষুধ দেন—'

এতক্ষণে বুঝল রাখাল। কিন্তু অন্তরের ভাবটি কি করে বোঝেন ঠিক অন্তর্যামী তা কে বলবে!

'উনি ওষুধ দেন না। আপনারা ভুল শুনেছেন—'

এক দিন আরেক জন বড়লোক এসেছিল। আমায় বলে, মশায়, এই মোকদ্দমাটি কিসে জিত হয় আপনার করে দিতে হবে। আপনার নাম শুনে এসেছি। আমি বললুম, বাপু, সে আমি নই—তোমার ভুল হয়েছে।

বলছেন রামকৃষ্ণ : 'যার ঠিক-ঠিক ঈশ্বরে ভক্তি হয়েছে, সে শরীর, টাকা—এ

সব গ্রাহ্য করে না। সে ভাবে, দেহসুখের জন্যে কি লোকমান্যের জন্যে কি টাকার জন্যে আবার জপ-তপ কি! জপ-তপ ঈশ্বরের জন্যে।'

বলে, দুদিক রাখব! দু'আনা মদ খেয়ে মানুষ দু'দিক রাখতে চায়। কিন্তু খুব মদ খেলে রাখা যায় দু'দিক?

তেমনি ঈশ্বরের আনন্দ পেলে আর কিছুই ভালো লাগে না। কামকাঞ্চনের কথা যেন বুকে বাজে। শাল পেলে আর বনাত ভালো লাগে না। রামকৃষ্ণ কীর্তনের সুরে গান গেয়ে উঠলেন। 'আন লোকের আন কথা ভালো তো লাগে না—' তখন ঈশ্বরের জন্যই মাতোয়ারা। আর সব আলুনি, পানসে।

ত্রৈলোক্য বললে, 'সংসারে থাকতে গেলে টাকাও তো চাই, সঞ্চয়ও চাই। পাঁচটা দানধ্যান—'

'আগে টাকা সঞ্চয় করে নিয়ে তবে ঈশ্বর?' রামকৃষ্ণ ঝলসে উঠলেন: 'আর দানধ্যানই বা কত! নিজের মেয়ের বিয়েতে হাজার-হাজার টাকা খরচ, আর পাশের বাড়িতে খেতে পাচ্ছে না। তাদের দুটি চাল দিতে কষ্ট হয়। দিতে-থুতে হিসেব কত! ও শালারা মরুক আর বাঁচুক—আমি আর আমার বাড়ির সকলে ভালো থাকলেই হল। মুখে বলে সর্বজীবে দয়া!'

জীবে দয়া! জীবে দয়া! দূর শালা! কীটানুকীট—তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? তোর স্পর্ধা কিসের? তুই কিসের এত আত্মম্ভরী?

সেদিন ঠাকুর তাই ধমকে উঠেছিলেন নরেন্দ্রকে। বল, জীবে দয়া নয়, জীবে শ্রদ্ধা, জীবে প্রেম, জীবে সেবা। শিবজ্ঞানে জীবের বন্দনা।

দয়ার মধ্যে একটু উঁচু-নিচুর ভাব আছে। আমি দয়ালু, আমি উপরে দাঁড়িয়ে; তুমি দয়ার ভিখারী, তুমি নিম্নাসীন। এ অসাম্য সহ্য হল না রামকৃষ্ণের। তিনি সর্বত্র নরান্বিত নারায়ণ দেখলেন। দেখলেন আশ্চর্য সৌষাম্য। সব এক, সব সমান, সব বিভক্ত হয়েও অবিচ্ছিন্ন। প্রত্যেককে দাঁড় করিয়ে দিলেন একটি শ্যামল সমভূমিতে—যার পোশাকী নামটি ভূমা, আর চলতি নামটি ভালোবাসা।

এই রামকৃষ্ণের সাম্যবাদ। সকলে আমরা অমৃতস্য পুত্রাঃ, আনন্দময়ীর ছেলে, রামপ্রসাদের ভাষায়, ব্রহ্মময়ীর বেটা। এক রাপের সমাংশভাক বংশধর। অধিকারের স্তরভেদ নেই, আমাদের মধ্যে শুধু প্রেমের সমানস্রোত।

বনের বেদান্তকে ঘরে নিয়ে এলেন রামকৃষ্ণ। একেই বললেন, 'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে কাজ করা।' একেই বললেন, নিরাকার থেকে আবার সাকারে চলে আসা। এবার সত্যিকারের সাকার। মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে স্বীকার করা, আবিষ্কার

করা, অভ্যর্থনা করা।

নরেনের তৃতীয় নয়ন আবার উদ্দীপ্ত হল। দেখল সর্বত্র অভেদ। পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলে একই পরমপ্রকাশের খণ্ড মূর্তি। প্রত্যহের তুচ্ছতার মধ্যে সে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তাকে মুক্ত করে যুক্ত করে দিতে হবে সে সর্বভাসকের সঙ্গে। দিতে হবে তাকে তার সুমহান অধিকারের সংবাদ। তার অন্তরের নিভৃত গুহা থেকে জাগাতে হবে সে প্রসুপ্ত কেশরী। তার অনুভবের মধ্যে আনতে হবে তার অস্তিত্বের পরমার্থের আস্বাদ।

শুধু নিজে দেখলে চলবে না, দেখাতে হবে। শুধু নিজে চিনলে চলবে না, চেনাতে হবে। আমি যদি একা জেগে উঠে দেখি আর-সবাই তখনো ঘুমিয়ে রয়েছে, তখন আমার আকাশ-ভরা প্রভাত-আলোর আনন্দ কই?

ছিন্ন কথার খেই ধরল ত্রৈলোক্য। বললে, 'সংসারে তো ভালো লোকও আছে। চৈতন্যদেবের ভক্ত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, তিনি তো সংসারে ছিলেন—'

'তার গলা পর্যন্ত মদ খাওয়া ছিল।' বললেন রামকৃষ্ণ, 'যদি আর একটু খেত, সংসার করতে পারত না।'

'তা হলে সংসারে কি ধর্ম হবে না?'

'তবে। যদি ভগবানকে লাভ করে থাকতে পারো। তখন কলঙ্ক-সাগরে ভাসো, কলঙ্ক না লাগে গায়। তখন পাঁকাল মাছের মতো থাকো। ঈশ্বরলাভের পর যে সংসার সে বিদ্যার সংসার। তাতে কামিনীকাঞ্চন নেই, শুধু ভক্ত আর ভগবান। এই আমার দিকেই দেখ না। আমারও মাগ আছে, ঘরে-ঘরে ঘটি-বাটিও আছে—হরে প্যালাদের খাইয়েও দিই, আবার যখন হাবীর মা এরা আসে এদের জন্যেও ভাবি।'

চৈতন্যলাভের পর সংসারে গিয়ে থাকো। যদি অনেক পরিশ্রমের পর কেউ সোনা পায়, তা বাক্সের মধ্যেই রাখো বা মাটির নিচেই রাখো, সোনার কিছুই হয় না। কাঁচা মনকে সংসারে রাখতে গেলেই মন মলিন হয়ে যায়। দুধে-জলে একসঙ্গে রাখলেই ঘায় সব একাকার হয়ে। দুধকে মন্থন করে মাখন তুলে জলের উপর রাখলে আর গোল থাকে না, ভাসে।

কাগজে তেল লাগলে তাতে আর লেখা চলে না। তবে যদি বেশ করে খড়ি দিয়ে ঘষে নিস, লেখা ফুটবে। তেমনি কামকাঞ্চনের দাগ-ধরা জীবনে সাধন করতে হলে ত্যাগের খড়ি ঘর্ষণ করো।

শশধর পণ্ডিতকে দেখতে যাবেন রামকৃষ্ণ। অত বড় পণ্ডিত, অথচ এক বিন্দু ভয় নেই কাছে ঘেঁষতে। আমার কি! আমার তো বাজনার বোল মুখস্থ বলা

নয়, হাতে বাজানো। ওরা শুধু জল তোলপাড় করে, আর আমি অতলতলে ডুব দিই।

ওরে নরেন, তুই সঙ্গে চল। মন্দ কি, পণ্ডিতদের সঙ্গে দর্শনচর্চা করে আসবি। কিন্তু, দেখা হলে শশধর পণ্ডিত কী বললে? বললে, 'দর্শনচর্চা করে হৃদয় শুকিয়ে গিয়েছে। দয়া করে আমায় এক বিন্দু ভক্তি দিন—'

জ্ঞানের খররৌদ্রে দগ্ধ হয়ে গেলাম, দাও এবার একটু ভক্তির বিষাদ-মেঘ, ভালোবাসার অশ্রুবিন্দু। তোমার জন্যে শুধু সেজে-গুজে সুখ নেই, তোমার জন্যে কেঁদে আনন্দ। আমি তোমার রাজরানি হতে চাই না, আমি তোমার কাঙালিনী হব।

রামকৃষ্ণ শশধরের বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন। তৃষ্ণা মিটল শশধরের। দীপ্ত চোখ অশ্রুতে ছলছল করে উঠল।

রামকৃষ্ণেরও পিপাসা পেল হঠাৎ। বললেন, জল খাব।

গৃহস্থ যদি নিজের থেকে কিছু না-ও দেয়, তবু সাধু-সন্ন্যেসী চেয়ে নিয়ে কিছু খেয়ে আসবে। আর কিছু না হোক, অন্তত এক গ্লাশ জল। নইলে অকল্যাণ হয় গৃহস্থের।

আর সকলের হোক বা না হোক, রামকৃষ্ণের ভুল হয় না।

তিলক-কণ্ঠীধারী এক ভক্ত শুদ্ধ ভাবে জল নিয়ে এল। কিন্তু মুখের কাছে গ্লাশ তুলে ধরতেই, এ কী হল হঠাৎ? রামকৃষ্ণ গ্লাশ নামিয়ে রাখলেন। তাঁর কণ্ঠনালী আড়ষ্ট, বিশুষ্ক হয়ে গিয়েছে। এক ফোঁটা জল গলবে না ভিতরে।

গ্লাশের জলে কুটোকাটা পড়েছে বোধ হয়। তাই বোধ হয় আপত্তি করলেন খেতে। গ্লাশের জল ফেলে দিল নরেন। আরেক গ্লাশ জল এনে দিল আরেক জন। এবার সে জল স্বচ্ছন্দে পান করলেন রামকৃষ্ণ। সন্দেহ নেই, আগের গ্লাশে ময়লা ছিল বলেই সেটা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

কিন্তু নরেনের মন মানতে চাইল না কিছুতেই। নিশ্চয়ই গভীর আর কোনো রহস্য আছে। ঠাকুরকে একাই পাঠিয়ে দিলে গাড়িতে করে। বললে, আমার বিশেষ কাজ আছে। পরে যাব।

বিশেষ কাজ নয় তো কি! সব দিক থেকে যাচিয়ে-বাজিয়ে নিতে হবে ঠাকুরকে। সব কিছুর জানতে হবে হাট-হদ্দ। কেন উনি ঐ ভক্তের হাতের জল খেলেন না? তিলক-কণ্ঠীধারীকে প্রশ্ন করা যায় না সরাসরি। তার ছোট ভাইকে পাকড়াও করলে। ভাগ্যক্রমে তার সঙ্গে আগে থেকে আলাপ ছিল নরেনের। জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপার কি হে তোমার দাদাটির? বলি, স্বভাবচরিত্র কেমন?

মাথা চুলকোলো ছোট ভাই। বললে, দাদার কথা কি করে বলি ছোট হয়ে? নিমেষে বুঝে নিল নরেন। কিন্তু ঠাকুর বুঝলেন কি করে? তিনি কি অন্তর্যামী অন্তরজ্ঞ?

আবার গেরুয়া কেন? একটা কি পরলেই হল? রামকৃষ্ণ রসিকতা করলেন, 'একজন বলেছিল চণ্ডী ছেড়ে হলুম ঢাকী। আগে চণ্ডীর গান গাইতো, এখন ঢাক বাজায়।'

সংসারের জ্বালায় জ্বলে গেরুয়া পরেছে—সে বৈরাগ্য বেশি দিন টেঁকে না। হয়তো কাজ নেই, গেরুয়া পরে কাশী চলে গেল। তিন মাস পরে ঘরে চিঠি এল, আমার একটি কাজ হয়েছে, কিছু দিন পরেই বাড়ি ফিরব, ভেবো না আমার জন্যে। আমার সব আছে, কোনো অভাব নেই, কিন্তু কিছুই ভালো লাগে না। ভগবানের জন্যে একা-একা কাঁদে। সে বৈরাগ্যই আসল বৈরাগ্য।

মন যদি ভেকের মত না হয়, ক্রমে সর্বনাশ হয়। তার চেয়ে শাদা কাপড় ভালো। মনে আসক্তি, আর বাইরে গেরুয়া! কী ভয়ঙ্কর!

ভগবতী ঝি এসে দূর থেকে প্রণাম করল ঠাকুরকে। অনেক দিনের ঝি। বাবুদের বাড়িতে কাজ করে। ঠাকুরের জানাশোনা।

প্রথম বয়সে স্বভাব ভালো ছিল না। কিন্তু তাই বলে ঠাকুর তাঁর করুণার সুগন্ধ বারির ধারাটি শুকিয়ে ফেলেননি। দিচ্ছেন তাকে তাঁর অমিয় বচনের আশীর্বাদ। বললেন, 'কি রে, এখন তো ঢের বয়স হয়েছে। টাকা যা রোজগার করলি, সাধু-বৈষ্ণবদের খাওয়াচ্ছিস তো?'

'তা আর কি করে বলব!' অল্প একটু হাসল ভগবতী।

'কাশী-বৃন্দাবন—এ সব হয়েছে?'

'তা আর কি করে বলব?' কুণ্ঠিত হবার ভান করল ভগবতী: 'একটা ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছি। তাতে পাথরে আমার নাম লেখা আছে।'

'বলিস কি রে?'

'হ্যাঁ, নাম লেখা আছে শ্রীমতী ভগবতী দাসী।'

আনন্দে হাসলেন রামকৃষ্ণ। বললেন, 'বেশ, বেশ।'

কি মনে ভাবল ভগবতী, হঠাৎ ঠাকুরের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে।

যেন একটা বিছে কামড়েছে, যন্ত্রণায় এমনি অস্থির হয়ে পড়লেন ঠাকুর। ছোট খাটটিতে বসে ছিলেন, ঝটকা মেরে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মুখে শুধু, 'গোবিন্দ', 'গোবিন্দ'। কী যেন একটা অঘটন ঘটে গেল মুহূর্তে। অসহন আর্তির দৃশ্য। শিশুঅঙ্গে কে যেন তপ্ত অঙ্গার ছুঁড়ে মেরেছে।

ঘরের যে কোণে গঙ্গাজলের জালা, সেদিকে হাঁপাতে-হাঁপাতে ছুটলেন ঠাকুর। পায়ের যেখানে ভগবতী ছুঁয়েছিল সেখানে ঢালতে লাগলেন গঙ্গাজল।

জীবন্মৃতার মত বসে আছে ভগবতী। সাড় নেই স্পন্দ নেই, দহনের পর দেহের ভস্মরেখা। জীবনে অনেক সে পাপ করেছে, কিন্তু এ পাপের বোধ হয় তুলনা নেই।

যত তোমার পাপ করবার ক্ষমতা, তার চেয়ে ভগবানের বেশি ক্ষমতা ক্ষমা করবার। পতিতপাবন করুণাসিন্ধু তাই আবার অমৃতবচন বিতরণ করলেন। বললেন, 'বেশ তো গোড়ায় দূর থেকে প্রণাম করেছিলি। কেন মিছিমিছি পা ছুঁতে যাস?'

যাক গে। তাই বলে মন-খারাপ করিস নে। গা-হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে এতক্ষণে। শোন, একটু গান শোন। গান শুনলে তুইও ঠাণ্ডা হবি।

ঠাকুর গান ধরলেন।

দুর্গাপূজার দিন মাঠে বহু লোক সেবার প্রণাম করছে শ্রীমাকে। প্রণামের পর বারে-বারে গঙ্গাজলে পা ধুচ্ছেন শ্রীমা। যোগেন-মা বললেন, 'মা, ও কি হচ্ছে? সর্দি করে বসবে যে।'

'যোগেন, কি বলব! এক-একজন প্রণাম করে যেন পা জুড়ায়, আবার এক-একজন প্রণাম করে যেন গায়ে আগুন ঢেলে দেয়। গঙ্গাজলে না ধুলে বাঁচিনে।' তোমার পা ছোঁবার সুযোগ দাওনি। তাই দূর থেকেই তোমাকে প্রণাম করছি। তাতেও যদি পাপস্পর্শের জ্বালা লাগে, গঙ্গাজল কোথায় পাব মা, আমার অশ্রুজলে ধুয়ে নিয়ো পাদপদ্ম।

ভবতারিণীর মন্দিরে গিয়ে ভাবাবস্থায় কথা বলছেন ঠাকুর, 'করছিস কি? এত লোকের ভিড় কি আনতে হয়? নাইবার-খাবার সময় নেই। গলা তো ভাঙা ঢাক। এত করে বাজালে কোন দিন ফুটো হয়ে যাবে যে। তখন কী করবি?' তবু ভিড়ের কমতি নেই। ভক্তের দল যেমন আসছে তেমনি আসছে আবার ভণ্ডের দল।

'অমন সব আদাড়ে লোকদের এখানে আনিস কেন?' এক দিন সরাসরি জগদম্বার সঙ্গে ঝগড়া করছেন রামকৃষ্ণ। 'আমি অতশত পারব না। এক সের দুধে পাঁচ সের জল—জ্বাল ঠেলতে-ঠেলতে ধোঁয়ায় চোখ জলে গেল। তোর ইচ্ছে হয় তুই দিগে যা। আমি অত জ্বাল ঠেলতে পারব না। অমন সব লোকদের আর আনিসনি।'

সাধুর মধ্যেও ভণ্ডের ছড়াছড়ি।

'যে সাধু ওষুধ দেয়, ঝাড়ফুঁক করে, টাকা নেয়, বিভূতি-তিলকের আড়ম্বর করে, খড়ম পায়ে দিয়ে যেন লাইনবোট মেরে নিজেকে জাহির করে বেড়ায়, তার থেকে কিছু নিবিনে।'

শুধু ভক্তি খুঁজে বেড়াবি। অহেতুক ভক্তি। নারদীয় ভক্তি। ভক্তির আমি-র অহঙ্কার নেই। এ আমি আমির মধ্যেই নয়। যেমন হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয়। অন্য শাকে অসুখ করে, হিঞ্চে শাকে পিত্ত যায়। মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়। অন্য মিষ্টিতে অপকার, মিছরি খেলে অম্বল নাশ হয়। ভক্তি অজ্ঞান করে না, বরং ঈশ্বর লাভ করিয়ে দেয়।

আমার শক্তি নেই, আসক্তিও নেই। শুধু ভক্তি নিয়ে বসে আছি এক কোণে। মধুস্নিগ্ধ পদ্ম যদি ফোটে, শুনতে পাব সে ভৃঙ্গের গুঞ্জরণ।

॥ ৮৬ ॥

আচ্ছা, রসিক মেথর কি কোনোদিন পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছিল ঠাকুরকে? যদি বা করেছিল, গায়ে কি জ্বালা ধরেছিল ঠাকুরের? যেমন হয়েছিল ভগবতীর বেলায়? ময়লা পরিষ্কার করে বলে রসিকও কি ময়লা?

কে বলে! মেথররূপী নারায়ণ। ঝাড়ু অস্পৃশ্য বটে, কিন্তু ঝাড়ুদার অস্পৃশ্য নয়। পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছিল কিনা জানা নেই, কিন্তু ঠাকুর একদিন সটান রসিকের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত। শরীরে না হোক, মনে-মনে।

বলছেন ঈশান মুখুজ্জেকে, 'ধ্যান করছিলাম। ধ্যান করতে-করতে মন চলে গেল রসকের বাড়ি। রসকে ম্যাথর। মনকে বললুম, থাক শালা, ঐখানেই থাক। মা দেখিয়ে দিলেন, ওর বাড়ির লোকজন সব বেড়াচ্ছে, খোল মাত্র, ভিতরে সেই এক কুলকুণ্ডলিনী, এক ষটচক্র।'

রতির মাকে চেনো তো? লালাবাবুর রানি কাত্যায়নীর মোসাহেব, গোঁড়া বৈষ্ণবী। খুব আসা-যাওয়া করে দক্ষিণেশ্বরে। ভক্তি দেখে কে। কিন্তু যেই রামকৃষ্ণকে দেখল মা-কালীর প্রসাদ খেতে, অমনি পালালো।

কী আশ্চর্য, সেই রতির মা'র বেশেই মা-কালী দেখা দিলেন একদিন। যা শক্তি তাই বৈষ্ণবী। বললেন, তুই ভাব নিয়েই থাক।

কিন্তু আমার ভাব কি জানো? চোখ চাইলেই কি তিনি, আর নেই? আমি নিত্য-লীলা দুইই লই। সব মতই সেই এককে নিয়ে। এক থেকে নিয়ে নয়। তাই আমি শাক্তেও আছি, বৈষ্ণবেও আছি, বেদেও আছি, বেদান্তেও আছি। রাম শিবকে পুজো করেছিলেন, শিব রামকে। কৃষ্ণ স্তব করেছিলেন কালীকে, আবার কৃষ্ণই কালীরূপ ধরেছিলেন। আমি সব ঘটে আছি, সব সংঘটে। শুধু

অকপট হলেই হল। আকারে যে অনাকারেও সে। কিম্বা বলো, সাকার-নিরাকার আমার বাপ-মা। বাপ নির্গুণ মা গুণান্বিতা। কাকে নিন্দা করে কাকে বন্দনা করবে, দুই পাল্লায় সমান ভারি।

'নির্গুণ মেরা বাপ সগুণ মাহ্‌তারি,
কারে নিন্দো কারে বন্দো, দোনো পাল্লা ভারি।'

'যে সমন্বয় করেছে সেইই লোক।' বললেন রামকৃষ্ণ।

যত মত তত পথ। কিন্তু পথটাই পৌছুনো নয়। মতেই না হয় মতিভ্রম। যদি ভুল-পথেও যাও, ঘুর-পথেও যাও, অন্তরে যদি অসরল না থাকে, তবে সে-পথও একদিন সোজা-পথ হয়ে যাবে। হবে ঠিক জগন্নাথদর্শন।

যাত্রার লগ্নে লক্ষ্যটি যদি ঠিক থাকে, পথ যাই হোক, একদিন ঠিক হাত ধরবেন অন্ধকারে। ক্লান্ত হলে কোলে নেবেন। তাঁর হাতে শুধু হিত, পায়ে শুধু ছায়া। ঈশ্বর ক্ষীরের পুতুল। হাত ভেঙে খেলেও মিষ্টি, পা ভেঙে খেলেও মিষ্টি।

এ একমাত্র আসল, যার আসল ভেঙে খেলেও সুদ বাড়ে।

কলকাতায়, পাথুরেঘাটায় যদু মল্লিকের বাড়ি যাচ্ছেন ঠাকুর। কিন্তু গাড়ির যোগাড় হয় কোত্থেকে?

বরানগরের বেণী সা ভাড়ায় গাড়ি খাটায়। কথা আছে, ঠাকুর বলে পাঠালেই দক্ষিণেশ্বরে গাড়ি আসবে। আর, কলকাতা থেকে ফিরতে যত রাতই হোক না, গাড়োয়ান গোলমাল করতে পাবে না। যত বেশি টাইম তত বেশি ভাড়া। আগে রসদদার ছিল মথুর, পরে পেনেটির মণি সেন, শেষে শম্ভু মল্লিক, এখন সিঁদুরে-পটির জয়গোপাল। তবে যার বাড়িতে যাওয়া, সেই দিয়ে দেয় গাড়ি-ভাড়া।

কিন্তু যদু মল্লিক যা কৃপণ। বরাদ্দ দু'টাকা চার আনার বেশি গাড়িভাড়া দেবে না। কিন্তু বেণী সা'র সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়েছে ফিরতে যত রাতই হোক, তিন টাকা চার আনা দিলেই গাড়োয়ান আর গোলমাল করবে না। নইলে, দেরি হতে দেখলেই গাড়োয়ান কেবল চলো, চলো, করে দিক করে। কিন্তু গেলেই কি তক্ষুনি-তক্ষুনি ফেরা যায়? যদুর মা এসেছে, সে কত ভালোবাসে, তার সঙ্গে দুটো কথা না কয়েই বা আসি কি করে? কিন্তু এখন বাড়তি টাকা একটা কে দেয়!

একদিন যদুকে বললেন সরাসরি: 'হ্যাঁ হে, এত টাকা করেছ, এখনো টাকার লোভ গেল না?'

'দেখ ছোট ভটচাজ,' বললে যদু মল্লিক, 'ও লোভ যাবার নয়। তুমি যেমন ভগবানের লোভ ছাড়তে পারো না, তেমনি বিষয়ী লোকও ছাড়তে পারে না টাকার লোভ। আর কেনই বা ছাড়বে? তুমি ভগবানের প্রেমের জন্যে পাগল, আমি তাঁর ঐশ্বর্যের জন্যে পাগল! আচ্ছা, বলো দিকিনি টাকা কি তাঁর ঐশ্বর্য নয়?'

ঠাকুরের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, 'যদি এটা ঠিক বুঝে থাকো টাকাটা তোমার নিজের ঐশ্বর্য নয়, ভগবানের ঐশ্বর্য, তাহলে আর তোমার ভাবনা কি গো! কিন্তু এ কথা তুমি সরল ভাবে বলছ, না, চালাকি করে বলছ?'

'সে কথা তুমিই জানো। তোমার কাছ থেকে কি মনের কথা লুকানো যায়?' কিন্তু যাই বলো, ও সব মোসাহেবগুলোকে রেখেছ কেন?

'ভদ্দরলোকের ছেলে, ভিক্ষে করতে পারে না, কিছু পাবার আশায় এখানে পড়ে থাকে। ওদের বঞ্চিত করলে ওরা যায় কোথায়?'

'কিন্তু ওদের সঙ্গে মিশলে ক্ষতি হতে পারে।'

'দেখ ছোট ভটচাজ, বিষয়-আশয় রাখতে গেলে অমন লোকের দরকার আছে।' আবার বিষয়-আশয়! চঞ্চল হয়ে উঠলেন ঠাকুর। 'সবই তো ইহকালের জন্যে সংগ্রহ করছ, ও পারের জন্যে কি যোগাড়যন্ত্র করলে?'

'ও পারের কাণ্ডারী তো তুমি। শেষের দিনে তুমি আমায় পার করবে সেই আশায়ই তো শেষ পর্যন্ত বসে থাকব। আমার উদ্ধার না করলে তোমার পতিতপাবন নামে কালি পড়বে।'

চলো যদু মল্লিকের বাড়ি।

তার মা ঠাকুরকে কাছে বসে খাওয়ান আর কাঁদেন। তাঁর বাৎসল্য-রস।

গাড়িতে উঠলেন ঠাকুর। সঙ্গে লাটু, হাতে ঠাকুরের বটুয়া আর গামছা। আর হয়তো অতুলকৃষ্ণ, গিরিশ ঘোষের ভাই। কৌতূহলী হয়ে এটা-ওটা দেখছেন ঠাকুর আর শিশুর মত জিগগেস করছেন লাটুকে।

বরানগরের বাজার ছাড়িয়ে চলেছেন এখন মতিঝিলের পাশ দিয়ে। ডাইনে একটা মদের দোকান, ডাক্তারখানা, চালের আড়ত, ঘোড়ার আস্তাবল। তার দক্ষিণে সর্বমঙ্গলা আর চিত্তেশ্বরীর মন্দির।

মদের দোকানে মদ খাচ্ছে মাতালেরা আর খুব হল্লা করছে। কেউ-কেউ বা গান ধরেছে স্ফূর্তিতে। কেউ-কেউ বা বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে নাচছে স্খলিত পায়ে। সব চেয়ে মজার, দোকানের যে মালিক, সে নির্লিপ্ত হয়ে দুয়ার ধরে

দাঁড়িয়ে আছে বাইরে চেয়ে। দোকানের চাকর তদারক করছে বেচাকেনা। এ সব মালিকের যেন আঁট নেই। কপালে মস্ত এক সিঁদুরের ফোঁটা কেটে দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়।

যার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে সে বুঝি ঘরের সমুখ দিয়ে চলে যায়। আনমনে চলে যাবে। হয়তো একবার ভুলেও ভ্রূক্ষেপ করবে না।

মদ-বেচা শুঁড়ি, তার আবার আবদার! কিন্তু ঠাকুর তো মদ দেখেন না, ঠাকুর মন দেখেন। জীবিকা দেখেন না, জীবন দেখেন। দোকানের মদের ভাণ্ড আমার পূর্ণ থাকতে পারে কিন্তু অন্তরে করুণার কুম্ভটি আমার শূন্য।

ঠাকুরকে দেখতে পেয়েই হাত তুলে প্রণাম করল দোকানি। ঠাকুরের চোখ পড়ল দোকানের দিকে। তরল-অনল-উচ্ছল মাতালদের দিকে। তাদের বিহ্বল মাতামাতির দিকে। এ কি! ঠাকুরও যে মুহূর্তে বিভোর হয়ে গেলেন নেশায়। তাঁর গা-হাত-পা টলতে লাগল, এড়িয়ে গেল কথা! এ কি! ঠাকুরও মদ খেয়েছেন নাকি? কখন খেলেন?

মদ দেখে কারণের কথা মনে পড়েছে ঠাকুরের—জগৎকারণের কথা। কারণানন্দ দেখে মনে পড়েছে সচ্চিদানন্দকে। ঠাকুরও মদ খেয়েছেন, কিন্তু এ মদের নাম হরিরসমদিরা। এ মদের নাম সুরা নয় সুধা। এ মদ মদের চেয়েও দুর্মদ।

শুধু তাই নয়, চলতি গাড়ির পা-দানিতে এক পা রেখে মাতালের মত নাচতে শুরু করলেন ঠাকুর। হাত নেড়ে-নেড়ে বলতে লাগলেন চেঁচিয়ে: 'বা, বেশ হচ্ছে, খুব হচ্ছে, বা বা বা!'

এ কি, পড়ে যাবেন যে! চলতি গাড়ি থেকে রাস্তায় ছিটকে পড়লে কি আর রক্ষে আছে? ত্রস্তব্যস্ত হয়ে অতুল ধরতে গেল ঠাকুরকে, হাত বাড়িয়ে টানতে গেল ভিতরে! লাটু বাধা দিয়ে বললে, 'পড়ে যাবেন না, ভয় নেই। নিজে হতেই সামলাবেন—'

আড়ষ্ট হয়ে রইল অতুল। বুক ঢিপ-ঢিপ করতে লাগল। নিজে হতেই সামলাবেন! কে জানে। পড়ে গেলেই তো সর্বনাশ! আর নয়, পাগলা ঠাকুরের সঙ্গে আর কখনো যাব না এক গাড়িতে। দিব্যি সহজ মানুষের মত কথাবার্তা বলছিলেন, হঠাৎ কোথাকার কতগুলো মাতাল দেখে মত্ত হয়ে গেলেন। এ কখনো শুনিনি।

শুনিনি তো ঠিক, কিন্তু দেখছি স্বচক্ষে। কারণীভূতকে দেখে কারণশরীরে অকারণ আনন্দ!

গাড়ি ছাড়িয়ে গেল শুঁড়িখানা। ঠাকুর স্থির হয়ে বসলেন এসে ভিতরে।

স্বাভাবিক সহজ সুরে বললেন, 'ঐ সর্বমঙ্গলা। বড় জাগ্রত। প্রণাম করো।' নিজেই প্রণাম করলেন সর্বাগ্রে।

মদ খেয়ে টং হয়েছে গিরিশ। এমন মাতাল, বেশ্যাও তখন দরজা খুলে দিতে নারাজ। হঠাৎ কি হল, দক্ষিণেশ্বরের কথা মনে পড়ে গেল আচমকা। একটা ঘোড়ার গাড়ি ডাকিয়ে নিয়ে উঠে বসল। চলো দক্ষিণেশ্বর। সেখানে এমন একজন আছেন যিনি দরজা কখনো বন্ধ করেন না।

রাত নিশুতি। মন্দিরের ফটক কখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে এতক্ষণে।

তা হোক, তবু কোথাও যদি জায়গা থাকে সে দক্ষিণেশ্বরে। কলকাতার উত্তরে, কিন্তু আসলে দক্ষিণ।

যা ভেবেছিল। ফটক বন্ধ। চার পাশ অন্ধকার। নিস্পন্দ।

কিন্তু যিনি ঘুমোন না, আর্ত জনের অন্ধ জনের কান্না শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে আছেন, তাঁকে ডাকতে দোষ কি!

'ঠাকুর! ঠাকুর!' চীৎকার করে ডাকতে লাগল গিরিশ।

কে, গিরিশ না? সেই নোটো নেচো গিরিশ। নির্জন নিঃসহায় অন্ধকারে আমাকে ডাকছে কাতর প্রাণে! আমি কি থাকতে পারি স্থির হয়ে?

বাইরে বেরিয়ে এলেন ঠাকুর। ফটক খোলালেন। মাতাল গিরিশের হাত ধরলেন আনন্দে। মদ খেয়েছিস তো কি, আমিও মদ খেয়েছি। সুরাপান করি না রে, সুরা খাই রে কুতুহলে। আমার মন মাতালে মাতাল করে, মদ-মাতালে মাতাল বলে। বলে গিরিশের হাত ধরে হরিনাম করতে-করতে নাচতে লাগলেন ঠাকুর।

স্বভাব আর ছাড়তে পারে না গিরিশ। সে দিন আবার মাতাল হয়ে এসেছে গাড়িতে করে।

কি করেই বা ছাড়বে? গল্প করলেন ঠাকুর: 'বর্ধমানে দেখেছিলাম। একটা দামড়া গাই-গরুর কাছে যাচ্ছে। জিগগেস করলুম, এ কী হল? তখন গাড়োয়ান বললে, মশায়, এ বেশি বয়সে দামড়া হয়েছিল। তাই আগেকার সংস্কার যায়নি। একটা বাটিতে যদি রশুন গোলা হয়, রশুনের গন্ধ কি যায়? বাবুই গাছে কি আম হয়?'

ঠাকুরও তেমনি তাঁর স্বভাব ছাড়তে পারেন কই? তাঁর অযাচিত করুণার স্বভাব।

ওরে গিরিশ এসেছে। নিজেই এগিয়ে গিয়ে আদর করে ধরে নিয়ে এলেন।

মাতাল বলে প্রত্যাখ্যান করলেন না।

লাটুকে বললেন, 'যা তো, ছাখ তো গাড়িতে কিছু আছে কিনা।'

লাটু গিয়ে দেখে মদের বোতল পড়ে আছে। আর গ্লাশ আছে কাঁচের। ঠাকুরের হুকুম, নিয়ে চলল গ্লাশ-বোতল। ভক্তরা যারা দেখল হেসে উঠল।

ঠাকুর বললেন, 'রেখে দে তোর কাছে। এখানে খোঁয়ারি এলে তখন কোথায় পাব?'

মদের মধ্য দিয়েই ওর মুক্তি আসবে। শেষকালে আর মদ থাকবে না, থাকবে মাদকতা। ক্রোধ থাকবে না থাকবে তেজ। কাম থাকবে না থাকবে প্রেম। লোভ থাকবে না থাকবে ব্যাকুলতার হাওয়া।

গিরিশের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন ঠাকুর। রাঙা চোখ শাদা করে দিলেন।

গিরিশ বললে, 'আমার আস্ত বোতলের নেশাটাই মাটি করে দিলে।'

'যদি পাপ থেকে পরিত্রাণ পাবই জানতুম', গিরিশ আপসোস করেছিল, 'তবে আরো কিছু পাপ করে নিতাম শখ মিটিয়ে।'

সে বার লছমনঝোলায় শরৎ-মহারাজ আর হরি-মহারাজ খুব ভাঙ খেয়েছে। নেশা করে শুধু ঠাকুরের কথাই কইতে লাগল। কইতে-কইতে চোখ শাদা হয়ে গেল, মেশার লেশমাত্র রইল না।

বাকি রাতটুকু তোমার কথাই কইতে দাও। এই ব্যাধির রাত, বিকারের রাত কেটে যাক। তোমার কথায় জাগুক একবার সেই আরোগ্যের সুপ্রভাত।

॥ ৮৭ ॥

'আমাকে বিদ্যাসাগরের কাছে নিয়ে যাবে?' মাস্টারমশাইকে জিগগেস করলেন ঠাকুর। 'আমার দেখতে বড় সাধ হয়।'

বিদ্যাসাগরের ইস্কুলে মাস্টারি করেন, একদিন কথাটা পাড়লেন গিয়ে মাস্টার মশাই। বিদ্যাসাগর জিগগেস করলেন, 'কেমনতরো পরমহংস হে? গেরুয়া কাপড় পরে থাকেন নাকি?'

'না, পাড়পেড়ে কাপড় পরেন। গায়ে জামা, পায়ে বার্নিশ-করা চটিজুতো। রাসমণির কালীবাড়ীতে থাকেন একটি ঘরে, তক্তপোশের উপর সামান্য বিছানা, তাতে শোন, মশারি খাটান। দেখতে অত্যন্ত শাসাসিধে, কিন্তু এমন আশ্চর্য লোক আর দেখা যায় না। ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু জানেন না সংসারে।'

বটে? খুশি হয়ে উঠলেন বিদ্যাসাগর। বললেন, 'শনিবার চারটের সময় নিয়ে

এস।'

গাড়ি করে যাচ্ছেন রামকৃষ্ণ। সঙ্গে মাস্টার, ভবনাথ আর হাজরা।

আহা, ভবনাথ কেমন সরল! বিয়ে করে এসে আমায় বলছে, আমার স্ত্রীর উপর এত স্নেহ হচ্ছে কেন? তা, স্ত্রীর উপর ভালোবাসা হবে না? এটিই জগৎ-মাতার ভুবনমোহিনী মায়া।

এই স্ত্রী নিয়ে মানুষ কী না দুঃখভোগ করছে। তবু মনে করে এমন আত্মীয় আর কেউ নেই। কুড়ি টাকা মাইনে—তিনটে ছেলে হয়েছে—তাদের ভালো করে খাওয়াবার শক্তি নেই, বাড়ির ছাদ দিয়ে জল পড়ছে, পয়সা নেই মেরামতি করার—ছেলের নতুন বই কিনে দিতে পারে না, ছেলের পৈতে দিতে পারে না—এর কাছে আট আনা ওর কাছে চার আনা ভিক্ষে করে—

বিদ্যারূপিণী স্ত্রীই যথার্থ সহধর্মিণী। এক হাতে সংসারের কাজ করে, আরেক হাতে স্বামীর হাত ধরে নিয়ে চলে ঈশ্বরের পথে।

আর হাজরা?

অনেক জপতপ করে, মন পড়ে আছে বাড়িতে, স্ত্রী-ছেলে জমি-জমার উপর। তাই ভিতরে-ভিতরে দালালিও করে। টাকাওয়ালা লোক দেখলে কাছে ডাকে, লম্বা-লম্বা কথা শোনায়, বলে, রাখাল-টাখাল যা সব দেখছ, জপতপ করতে পারে না, হো-হো করে ঘুরে বেড়ায়।

'যদি কেউ পর্বতের গুহায় বাস করে, গায়ে ছাই মাখে, উপবাস করে, নানা কঠোর সাধনা করে, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে বিষয়ে মন, কামকাঞ্চনে মন, সে লোককে বলি ধিক। আর যার কামকাঞ্চনে মন নেই, খায় দায় বেড়ায়, তাকে বলি ধন্য।'

পোল পার হয়ে শ্যামবাজার হয়ে আমহার্স্ট স্ট্রীটে পড়েছে গাড়ি। এই বাদুড়-বাগানের কাছে এসে গেলাম। মুহূর্তে ভাবাবেশ হল রামকৃষ্ণের।

এই রামমোহন রায়ের বাগান-বাড়ি।

রামকৃষ্ণ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এখন ও সব আর ভালো লাগছে না।'

এখন শুধু বিদ্যাসাগর। বিদ্যা—যা থেকে ভক্তি, দয়া, প্রেম, জ্ঞান—যা শুধু ঈশ্বরের পথে নিয়ে যায়। সেই বিদ্যার সমুদ্র।

দোতলা, ইংরেজ-পছন্দ বাড়ি। চারদিকে দেয়াল, পশ্চিম ধারে ফটক। পাঁচিল থেকে নিচের ঘর পর্যন্ত ফুলের কেয়ারি। বিদ্যাসাগর উপরে থাকেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই উত্তরে একটা কামরা, তার পুবে হল-ঘর। হল-ঘরের পুব প্রান্তে টেবিল-চেয়ার। সেইখানে পশ্চিমমুখো হয়ে বসে কাজ করেন বিদ্যাসাগর। হলঘরের দক্ষিণে বিদ্যাসাগরের লাইব্রেরি। সে আরেক বিরাট শব্দসমুদ্র। পাশেই

নিরীহ শোবার ঘর।

'মা গো, পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা করতে চলেছি। আমার মুখ রাখিস মা।'

গাড়ি থেকে নামলেন রামকৃষ্ণ। গায়ে একটি লংক্লথের জামা, পরনে লালপেড়ে ধুতি, আঁচলটি কাঁধের উপর ফেলা। পায়ে বার্ণিশ-করা চটি জুতো। উঠোন পেরিয়ে যেতে-যেতে জিগগেস করলেন মাস্টারকে, 'জামার বোতাম খোলা রয়েছে, এতে কিছু দোষ হবে না?'

'আপনার কিছুতে দোষ হবে না।' বললে মাস্টার। 'আপনার বোতাম দেবার দরকার নেই।'

নিশ্চিন্ত হলেন ঠাকুর। বালককে বোঝালে যেমন নিশ্চিন্ত হয়, তেমনি।

হল-ঘরে না বসে উত্তরের কামরায় বসেছেন বিদ্যাসাগর। বয়স আন্দাজ বাষট্টি। রামকৃষ্ণের থেকে ষোল-সতেরো বছরের বড়। খর্বাকৃতি, মাথাটি প্রকাণ্ড, চার পাশ উড়িয়াদের মতো কামানো। পরনে শাদা থান কাপড়, গায়ে হাত-কাটা ফ্লানেলের জামা, গলার পৈতে দেখা যাচ্ছে, পায়ে ঠনঠনের চটি জুতো। বাঁধানো দাঁতগুলো ঝকঝক করছে।

রামকৃষ্ণ ঘরে ঢুকতেই বিদ্যাসাগর উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন। যে টেবিল সামনে রেখে দক্ষিণাস্য হয়ে বসে ছিলেন বিদ্যাসাগর, তার পুব পাশে এসে দাঁড়ালেন রামকৃষ্ণ। বাঁ হাতখানি টেবিলের উপর। যেন সংলগ্ন হয়ে আছেন বিদ্যাসাগরে। একদৃষ্টে তাঁকে দেখছেন আর হাসছেন ভাবাবেশে। ভাবাবেশ সংবরণ করবার জন্য মাঝে-মাঝে বলছেন রামকৃষ্ণ, 'জল খাব। 'জল খাব।'

দেখতে-দেখতে ভিড় হয়ে গেল ঘরের মধ্যে। পিছনে একটা পিঠ-তোলা বেঞ্চি ছিল, তাতে বসলেন রামকৃষ্ণ। সেখানে একটি ছেলে বসে। বিদ্যাসাগরের কাছে ভিক্ষে করতে এসেছে, পড়াশোনার খরচ চলে না। তার থেকে সরে বসলেন ঠাকুর। বললেন, 'মা, এ ছেলের বড় সংসারাসক্তি। তোমার অবিদ্যার সংসার। এ অবিদ্যার ছেলে।'

আর এ ছেলেটি? সামনে-বসা আরেকটি ছেলেকে নির্দেশ করলেন বিদ্যাসাগর। 'এ ছেলেটি সৎ। যেন অন্তঃসার ফল্গু নদী। উপরে বালি, কিন্তু একটু খুঁড়লেই জল দেখতে পাবে ভিতরে।'

জল এসে গেল ভিতর থেকে। বিদ্যাসাগর মাস্টারকে জিগগেস করলেন, 'কিছু খাবার দিলে ইনি খাবেন কি?'

'আজ্ঞে আনুন না।' বললে মাস্টার।

বিদ্যাসাগর ব্যস্ত হয়ে ছুটে গেলেন বাড়ির মধ্যে। একথালা মিষ্টি নিয়ে এলেন।

বললেন, 'এগুলি বর্ধমান থেকে এসেছে।'

মিষ্টিমুখ করলেন রামকৃষ্ণ। ভবনাথ আর হাজরাও কিছু অংশ পেল। মাস্টারের বেলায় বিদ্যাসাগর বললেন, ও তো ঘরের ছেলে। ওর জন্যে আটকাবে না।

মিষ্টিমুখের পর বিদ্যাসাগরের দিকে চেয়ে মিষ্টি হেসে বললেন রামকৃষ্ণ, 'আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল বিল হ্রদ নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখলুম!'

বিদ্যাসাগর হেসে জবাব দিলেন, 'তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান।'

'না গো! নোনা জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর। তুমি যে ক্ষীরসমুদ্র।'

এক ঘর লোক। কেউ বসে কেউ দাঁড়িয়ে। কথার রসগ্রহণ করে হাসছে সবাই। কিন্তু বিদ্যাসাগর চুপ।

'তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম।' বলছেন রামকৃষ্ণ, 'সত্ত্বগুণ হয় দয়া থেকে। শুকদেবাদি লোকশিক্ষার জন্যে দয়া রেখেছিলেন। তোমার বিদ্যাদান অন্নদান —সেও ঐ দয়া থেকে। নিষ্কাম হয়ে করতে পারলে ঐতেই ভগবান-লাভ। কেউ করে নামের জন্যে, পুণ্যের জন্যে, তাদের কর্ম নিষ্কাম নয়। আর তোমার হচ্ছে দয়ার থেকে, দয়ার জন্যে। তাই তুমি তো সিদ্ধ গো!'

'আমি সিদ্ধ?' চমকে উঠলেন বিদ্যাসাগর। আমি আবার ভগবানের জন্যে সাধন করলুম কবে?'

রামকৃষ্ণ হাসলেন। বললেন, 'আলু-পটল সিদ্ধ হলে কী হয়? নরম হয়। তুমিও তো তেমনি নরম হয়ে গেছ। পরের দুঃখে তোমার হৃদয় দ্রবীভূত হয়েছে। তোমার এত দয়া, তুমি নও তো আর কে সিদ্ধ?'

শিবনাথের কোলে একটি সাত-আট বছরের মেয়ে। শিবনাথ তখন আছে বন্ধু যোগেনের সঙ্গে। যোগেন দ্বিতীয়পক্ষে একটি বিধবা মেয়েকে বিয়ে করে সমাজপরিত্যক্ত হয়ে বাস করছে নিরালায়। একটা হিন্দু চাকর পর্যন্ত জোটেনি। থাকবার মধ্যে আছে সতীর্থ বন্ধু শিবনাথ আর মহাপ্রাণ অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরই পুরোত যোগাড় করে দিয়েছেন বিয়ের, নিমন্ত্রিতদের খাওয়াবার খরচ দিয়েছেন, নববধূকে দিয়েছেন মূল্যবান উপহার।

যোগেনের বাড়িতে প্রায়ই আসেন বিদ্যাসাগর। মজার-মজার গল্প বলে হাসিয়ে যান সবাইকে। বিষাদভাব লাঘব করেন। কঠোর ব্রতোদ্‌যাপনের প্রতিজ্ঞাতে ধীর যোগান। সে দিন এসে দেখেন, শিবনাথের কোলে সুশ্রী একটি মেয়ে।

'কে এই মেয়ে?'

'নাপিতদের মেয়ে। আমাদের পাড়াতেই থাকে। দাদা বলে আমাকে।'

'বা, বেশ মেয়েটিতো?' একটু আদর করতে হাত বাড়ালেন বিদ্যাসাগর।

'কিন্তু জানেন কি?' কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ হয়ে এল শিবনাথের : 'ও বিধবা।'

বিধবা? যেন বাজ পড়ল ঘরের মধ্যে। স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইলেন বিদ্যাসাগর। যন্ত্রণায় মুদ্রিত করলেন দু'চোখ। শিবনাথ দেখতে পেল, বড় বড় জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে গাল বেয়ে।

হঠাৎ দু'বাহু বাড়িয়ে অবোলা শিশুটাকে টেনে নিলেন বুকের মধ্যে।

শিবনাথ বললে, ওকে ফের বিয়ে দেবার জন্যে ওর মাকে বোঝাচ্ছি ক'দিন থেকে।

'কিছু ভাবতে হবে না। ওকে আগে বেথুন ইস্কুলে ভর্তি করে দাও। খরচ-পত্র যা লাগে সব আমি দেব। তারপর একদিন পালকি ভাড়া করে ওকে আর ওর মাকে পাঠিয়ে দিও আমার বাড়িতে, আমার মা'র কাছে।'

বিদ্যাসাগর কি সিদ্ধ নয়?

শিবনাথ যখন ব্রাহ্ম হয়, তখন তার বাবা কেঁদেছিলেন। বলেছিলেন বিদ্যাসাগরকে, 'মানুষ যেমন যমকে ছেলে দেয়, তেমনি আমি কেশবকে ছেলে দিয়েছি।'

শুনে স্থির থাকতে পারেননি বিদ্যাসাগর। বাপের দুঃখে কেঁদেছিলেন আকুল হয়ে।

শিবনাথকে বাড়ির থেকে বের করে দিয়েছে বাপ। ত্যাজ্যপুত্তর করেছে। স্ত্রী আর ছোট্ট একটি মেয়ে নিয়ে আলাদা বাসা করে আছে কায়ক্লেশে। স্কলারশিপের টাকা ক'টিই ভরসা।

পথে-ঘাটে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা হয় মাঝে-মাঝে। মুখ ফিরিয়ে নেন না বিদ্যাসাগর। বরং মুখ বাড়িয়ে গলা নামিয়ে জিগগেস করেন আলগোছে, 'হ্যাঁ রে, কেমন করে চলে?'

শুধু বাপের কষ্টেই কাঁদেন না, ছেলের কষ্টেও কাঁদেন। প্রায়ই খোঁজ নিতে আসেন। এটা-ওটা পরামর্শ দেন। শিবনাথ যদি কখনো অর্থ সাহায্য চেয়ে বসে, বোধ হয় তারই জন্য নীরবে অপেক্ষা করেন।

কত ছেলেবেলা থেকে ভালোবাসেন শিবনাথকে। যখনই তাদের বাড়ি যান, দু'আঙুলের চিমটেতে শিবনাথের ভুঁড়ির মাংস টেনে ধরেন। ওটাই তাঁর আদরের চেহারা। সে আদরের ভয়ে পালিয়ে বেড়ায় শিবনাথ। কিন্তু বিদ্যাসাগর ঠিক তাকে ধরে আনেন। তার ভুঁড়িতে চিমটি না কাটতে পেলে বিদ্যাসাগরের শান্তি নেই।

তখন তো বাপ ছেলে একসঙ্গে ছিল। এখন ছেলে একা, বাপ একা। দুয়ের দুঃখেই কাঁদেন বিদ্যাসাগর। একবার এ বাড়ি যান, আরেক বার ও বাড়ি। কাঁদবার আগে পর্যন্ত বিচার। একবার কান্না এসে গেলে বিচার ধুয়ে যায়।

বিদ্যাসাগরের কাছে কত লোক এসে গাল পাড়ে শিবনাথকে। ব্রাহ্মসমাজে ঢুকেছে বলেই সবাইর রাগ। কিন্তু বিদ্যাসাগর বলেন, 'যাই ও করুক, ফেলতে পারব না ওকে। যাই বলো, ওকে বুকে রাখলে আমার বুক ব্যথা করে না।'

সেই শিবনাথের ঘরে আরেক জন বন্ধু এসেছে। বন্ধুটিও শিবনাথের মত সমাজদ্রোহী, বিধবা বিয়ে করেছে, আর শিবনাথের মতই পিতৃ-পরিত্যক্ত। খুব ধনীর ছেলে, এখন একেবারে দুরাবস্থার চরম। তার উপর রোগ হয়েছে মারাত্মক। বিধবা-বিয়ে ঘটাতে হাত ছিল শিবনাথের, তাই এখন ত্যাগ করতে পারল না বন্ধুকে। সপুত্রকলত্র আশ্রয় দিল। ডাক্তর ডাকল। কিন্তু কিছুই সুরাহা হল না। তখন বন্ধু বললে, বাবাকে একটা খবর দাও। তিনি ক্ষমা না করলে আর সারব না আমি। তার বাবার সঙ্গে পরিচয় নেই শিবনাথের। কি করে তাঁকে ধরে! নিজে গেলে হয়ত উলটো ফল হবে। বন্ধুর অন্তিম কামনা পূর্ণ হবে না।

তখন অগতির গতি বিদ্যাসাগরকে গিয়ে ধরল শিবনাথ। বিদ্যাসাগর তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। 'জানো ও ছোকরার চরিত্র? ওর সব অতীত কীর্তি?' সব জানে শিবনাথ। মুখ বুজে হেঁট হয়ে রইল। বুঝল, বৃথা, আশালতা দগ্ধ হয়ে গেল সূর্যতেজে।

'ওকে সাহায্য করবে না আর কিছু! উলটে ওকে চাবকে দেওয়া উচিত।'

সেই বিরাট আননের উপর ক্রোধের রুদ্ররঙ্গ দেখতে লাগল শিবনাথ। নিরুপায়ের মত প্রণাম করল বিদ্যাসাগরকে। চলে যাবার আগে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'একজন মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ ইচ্ছাটি পূর্ণ করতে পারলাম না।'

মহামানুষটি নড়ে উঠলেন। ধমক দিলেন শিবনাথকে। 'বোস্। আমি তোকে চলে যেতে বলেছি? হ্যাঁ, সেই কাল সকালের আগে তো কিছু হবে না? যা, কাল সকালে নিয়ে যাব তার বাপকে। আর শোন, দাঁড়া এই ক'টা টাকা নিয়ে যা।' শিবনাথের হাতে ক'টা টাকা গুঁজে দিলেন বিদ্যাসাগর: 'তুই একা কদ্দিন চালাবি? এই নে। দেখিস ওর স্ত্রী আর সন্তান যেন কষ্টে না পড়ে।' বলো, সিদ্ধ কি নয় বিদ্যাসাগর? যে মাতৃভক্ত সে কি সাধক নয়? মা বলেছেন ভাইয়ের বিয়েতে হাজির হতে, যেমন করেই হোক, দামোদর সাঁতরেই চলে গেলেন। তার পর মা যখন চলে গেলেন, বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে গেলেন নির্জনে।

আর কিছুর জন্যে নয়, মা'র জন্যে কাঁদতে বুক ভরে। পরের জন্যে যে কাঁদে সে তো পরমের জন্যেই কাঁদে। পরই তো পরম। পরেশও যে, পরমেশও সেই। ব্রহ্মই তো পরব্রহ্ম। ব্রহ্মের জন্যে যে কাঁদে সেই তো সিদ্ধ। বিদ্যাসাগর বললেন রামকৃষ্ণকে, 'কিন্তু জানেন তো, কলাই সেদ্ধ হলে শক্ত হয়ে যায়।'

'তুমি তেমনি নও গো। তুমি দরকচা-পড়া পণ্ডিত নও। শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে, কিন্তু তার নজর ভাগাড়ের দিকে। যারা শুধু পণ্ডিত, শুনতেই পণ্ডিত, এদিকে কামকাঞ্চনে আসক্তি, তারা শকুনির মতই পচা মড়া খুঁজছে। তুমি সে রকম নও। বিদ্যার ঐশ্বর্য—দয়া ভক্তি বৈরাগ্য খুঁজছ। তুমি সিদ্ধ নয় তো কে সিদ্ধ?'

এক জ্ঞানময় পুরুষ দেখেছেন এক আনন্দময় পুরুষকে।

॥ ৮৮ ॥

'ছেলেরা মেলায় যাবার বায়না ধরেছে,' হেনরিয়েটা কাঁদো-কাঁদো মুখে বললে ঘরে ঢুকে, 'কিন্তু হাতে মোটে আমার তিন ফ্রাঙ্ক—'

তখনকার হিসাবে দেড় টাকার কাছাকাছি।

মধুসূদন তাকান একবার শূন্য চোখে। বললে, 'শুধু আজকের দিনটা অপেক্ষা করো।'

'কত দিন-তাই তো গেল এমনি অপেক্ষা করে-করে। তুমি কি মনে করো তোমার দেশের লোক কেউ তোমাকে সাহায্য করবে?'

সে আশা ছেড়েছে মধুসূদন। সাহায্য দূরের কথা, পাওনা টাকাই পাঠাচ্ছে না সরিকেরা। এদিক-সেদিক করে চার হাজার টাকা পাওনা। একটি কপর্দকেরও দেখা নেই।

সরিক তো নয় কালসাপ। তাদের কথা ভাবছে না মধুসূদন। দেশে কত-কত মানী গুণী। কত-কত টাকার আণ্ডিল। তাদের কথাও ভাবছে না। হেন লোক নেই যার সঙ্গে চেনাশোনা নেই মধুসূদনের। এক-এক করে মনে করতে লাগল মুখগুলো। একটা মুখও এমন নয় যে মন উন্মুখ হয়। বিত্তবান তো অনেক আছে, কিন্তু চিত্তবান কোথায়!

না, একজন বোধ হয় আছে।

একজন নয়, দুজন। একজন ঈশ্বর, আরেকজন ঠিক সেই ঈশ্বরের নিচেই।

তারই জন্যে অপেক্ষা করতে বলেছে স্ত্রীকে।

এমনিতে অস্থিরমতি মধুসূদন, মুহূর্তের বশে কাজ করতে গিয়ে অনেক ভুল সে

করেছে জীবনে, অনেক নির্বুদ্ধিতা, কিন্তু এবার পরিত্রাতা খুঁজতে গিয়ে ভুল করেনি এতটুকু। এত দিনে একটি স্থিরবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। অন্তত এই একবার।

'শুধু আজকের দিনটা—'

'কি আছে আজকে?'

'আজকে ডাক আসবার দিন। আজ ঠিক চিঠি আসবে। একটা শুভসংবাদ এসে যাবে কিছু।'

'যদি না আসে?'

'যদি না আসে!' চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি করতে লাগল মধুসূদন: 'তাহলে আমি সটান জেলখানায়, আর তোমরা, তুমি আর ছেলেমেয়েরা, কোনো একটা অনাথ-আশ্রমে।'

জামার হাতায় চোখ মুছল হেনরিয়েটা।

'কিন্তু, কান্নাটা শেষ পর্যন্ত স্থায়ী নাও হতে পারে। কেননা টাকার জন্যে যাকে এবার লিখেছি—'

'কে সে?'

সমস্ত বাঙলাদেশে সে শুধু একজনই আর্য ঋষির মত জ্ঞানী, ইংরেজের মত কর্মোৎসাহী আর বাঙালী মায়ের মত কোমলহৃদয়। এখানেও যদি না হয়! না, না, হতেই হবে, নিজে বিপন্ন হয়েও আসবে বিপদ্ধারে। আমি নদী-নালার কাছে যাইনি, গিয়েছি সমুদ্রের কাছে।'

দরজার কড়া নড়ে উঠল।

ঐ এলো বুঝি সেই সমুদ্রের মুক্ত হাওয়া! বাধাহীন স্বাধীনতার শুভ্রতা।

আদালতের বেলিফ। দরজা একটু ফাঁক করে উঁকি মেরে দেখল হেনরিয়েটা ক্ষিপ্র হস্তে ফের বন্ধ করে দিল। ক্রোক করবার মত আর নেই কোন মালা-মাল। এবার হাতে-হাতে গ্রেপ্তার করতে এসেছে। আবার নড়ে উঠল কড়া।

'কে?'

'চিঠি।'

উল্লাসে লাফিয়ে উঠল মধুসূদন। 'বলিনি, চিঠি আসবে দেশ থেকে?' ত্বরিত হাতে খুলে ফেলল দরজা। 'কোথাকার চিঠি?'

তোমাকে বলিনি। সাগরের মত প্রাণ! বাঙালী মায়ের মত হৃদয়! আশ্চর্য, এমন আকাঙ্ক্ষাও ফলে মানুষের জীবনে! এই দেখ, পনেরো শো টাকার ড্রাফট পাঠিয়েছেন বিদ্যাসাগর।

শুধু কি সেই একবার? আরো বহুবার টাকা পাঠালেন। জড়িয়ে পড়লেন ঋণ—

জালে। শেষ পর্যন্ত ব্যারিস্টারি পাশ করিয়ে ছাড়লেন।

সেই মাইকেল দেশে ফিরছে এত দিনে। বিদ্যাসাগর তার জন্যে পছন্দসই বাড়ি ভাড়া করে রেখেছেন। বিলেত-ফেরতের মত উপযুক্ত করে সাজিয়ে দিয়েছেন জিনিসে-আসবাবে? কিন্তু সে বাড়িতে উঠল না মাইকেল। গেল স্পেন্স হোটেলে।

অবজ্ঞা দেখে অভিমান করলেন না বিদ্যাসাগর। নিজে থেকে আনতে গেলেন ডেকে।

এক কথায় ফিরিয়ে দিল মাইকেল। ঐ নেটিভ পাড়ায় ঐ নোংরা পরিবেশের মধ্যে সে থাকবে! বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে আসা ব্যর্থ করে দেবে এমন করে!

বিষণ্ণ মনে ফিরে এলেন বিদ্যাসাগর। শূন্য সাজানো বাড়ির দিকে তাকালেন শূন্য চোখে।

তবু কি সেই বাঙালী মায়ের হৃদয় শুষ্ক হয় কখনো? কত বাধা-বিপদ ফিরতে লাগল পদে-পদে—এমন কি, হাইকোর্টেই ঢুকতে পাচ্ছে না মাইকেল। চির-যোদ্ধা বিদ্যাসাগরের ডাক পড়ল। গাঁয়ের নামে যাঁর নাম—আর কে আছে অমন বীরসিংহ? হটিয়ে দিলেন সব বাধা-নিষেধ, ঢুকিয়ে দিলেন হাইকোর্টে।

কর্মে চুপ, শুধু মুখেই কৃতজ্ঞতা। শুধু চলচিত্তের চলচ্চিত্র। স্থিরদ্যুতি নক্ষত্র নয়, পার্থিব স্খলিত উল্কাপিণ্ড।

টাকার কথাটা একেবারে মনে করিয়ে দিলেন বিদ্যাসাগর। টাকা? কত চাই? দশ-কুড়ি হাজার টাকা এই এসে পড়ছে হাতের মুঠোয়। মধুসূদনের জন্য কত ধার করেছে বিদ্যাসাগরের?

মুখে শুধু বড় বড় কথা। যত বহ্বাস্ফোট। হাতে টাকা এলে আর ধার শোধ নয়, নির্বিরোধ খেজাঞ্চিখানা। ছন্দে যেমন অবন্ধন ব্যয়ে তেমনি উড়নচণ্ডি।

শুধু বিদ্যাসাগরেরই ঋণ বাড়ে। তাঁর সংস্কৃত প্রেসের দুই-তৃতীয়াংশ বিক্রি হয়ে যায়। তবু কি বাঙালী মায়ের হৃদয় নিষ্ঠুর হয়, নীরস হয়?

বলো, এ কোন সাধনায় সিদ্ধ বিদ্যাসাগর? রামকৃষ্ণ কি আর ভুল বললেন? এই মধুসূদনই রামকৃষ্ণের কাছে ক'টি কথা চেয়েছিল। শান্তির কথা, আশ্বাসের কথা। মা-কালী রামকৃষ্ণের মুখ চেপে ধরেছিলেন, ধর্মত্যাগীর সঙ্গে বলতে দেননি কথা।

কিন্তু কথার চেয়ে গান বড়। ধর্মের চেয়ে বড় ঈশ্বরকরুণা।

সেই করুণায় বিগলিত হল রামকৃষ্ণ। করুণার ধারা নেমে এল সুরাস্রোতে।

কথা বলতে দিচ্ছেন না, কিন্তু গান তো কথা নয়, গান গাইতে দোষ কি। আর এ গান তো অন্যের রচনা, রামপ্রসাদের রচনা। রামকৃষ্ণ গান ধরল। আর, মধুসূদনের কৃতজ্ঞতা নেমে এল অশ্রুবর্ষণে।

আমি অমিত্রাক্ষর লিখি, কিন্তু হে অক্ষর, তুমি তো অমিত্র নও।

'তুমি মিথ্যেবাদী, তুমি প্রবঞ্চক।' গর্জন করে উঠলেন বিদ্যাসাগর: 'ভদ্রলোকের ছেলে বলে এসে আমার সঙ্গে এই চাতুরীটা করলে?'

সামান্য একজন পুলিশ সাব ইন্‌স্পেকটর। ভয়ে-দুঃখে দাঁড়িয়ে আছে বিমূঢ় হয়ে। কী যে অপরাধ করেছে বুঝতে পারছে না।

অপরাধের মধ্যে টাকা ধার নিয়েছিল বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে। বিপদে না পড়ে কি আর কেউ কর্জ করে! আর, সে কী নিদারুণ বিপদ! ছ মাসের জেলের হুকুম হয়েছে, চাকরিরও দফা রফা। এখন হাইকোর্টে মোশন করতে হবে। মনোমোহন ঘোষকে ব্যারিস্টার দেবার ইচ্ছে, কিন্তু তার সাতশো টাকা ফি। বাড়িতে লেখা হয়েছে, এখনো এসে পৌছয়নি টাকা।

সুতরাং মুরুব্বি ধরে চলো বিদ্যাসাগর। অনুপায়ের উপায়, অশরণের আশ্রয়।

'কি করতে হবে তাই বলো না।'

মনোমোহন ঘোষকে আপনি শুধু একটা চিঠি লিখে দিন যেন বিনা ফি তে কাজটি করে দেয়। হ্যাঁ, আজকেই দিন মামলার। হপ্তা খানেকের মধ্যেই টাকা এসে যাবে বাড়ি থেকে, তখন দিয়ে দেব ঘোষ-সাহেবকে—নির্ঘাত দিয়ে দেব।

'বাড়ি কোথায়?'

নাটোর। পুলিশে চাকরি করে, বিরুদ্ধ দল মিথ্যেমিথ্যি ফাঁসিয়ে দিয়েছে। জেলটা রদ করাতে না পারলে একটা পরিবার ছারখারে যাবে। শুধু যদি একটা সুপারিশ লিখে দেন—

চুপচাপ কতক্ষণ ভাবলেন বিদ্যাসাগর। বললেন, 'এ কর্ম আমার দ্বারা হবে না। এক পা জেলে এক পা বাইরে এমন লোকের টাকা বাকি রেখে কাজ করতে বলা অবিচার করা। মামলায় যদি হার হয়? জেলের হুকুম যদি বহাল থাকে? না বাপু, অসম্ভব, এমনটি পারব না কিছুতেই।'

তবে আমি যাই কোথা? শুনেছি যার কেউ নেই তার বিদ্যেসাগর আছে। যার বিদ্যেসাগরও নেই সে যাবে কোন দুয়ারে?

কাগজ-কলম টেনে নিলেন বিদ্যাসাগর। খসখস করে লিখতে লাগলেন, মাই ডিয়ার ঘোষ—

হঠাৎ থেমে পড়ে বললেন, 'অসম্ভব। এ কর্ম হবে না আমার দ্বারা। অন্যায়

boiRboi.net

অনুরোধ করি কি করে ?'

দারোগা কেঁদে ফেলল। বললে 'তা হলে আমি জেলেই যাব ?'

একটা তীর যেন এসে বিদ্ধ করল বিদ্যাসাগরকে। চোখের কোণ ভিজে উঠল। জানা ছিল, তবু ব্যাঙ্কের খাতা খুলে আরেকবার দেখলেন এক পয়সাও মজুত নেই। তবু আশ্চর্য, একটা চেক কাটলেন। সাত শো টাকার চেক। বললেন, 'এই চেক নিয়ে গিয়ে ঘোষকে দাও। আর বলো, কাল সাড়ে এগারোটার আগে যেন ব্যাঙ্কে না পাঠায়। যে করে হোক আজকের দিনের মধ্যে সাত শো টাকা ব্যাঙ্কে জমা করে দেব।'

হাইকোর্টে খালাস পেয়েছে দারোগা। ধার শোধ করতে টাকা নিয়ে এসেছে। এক আধলা কম নয়, পুরো সাত শো টাকা। সাত দিনের মধ্যে ধার শোধ দেবার কথা ছিল, চার দিনের দিনই পৌঁছে দিয়েছে টাকা। সহাস্য মুখে প্রণাম করে উঠেছে। কিন্তু হঠাৎ এ কী বিস্ফোরণ! তুমি মিথ্যাবাদী, তুমি প্রবঞ্চক, তুমি অভদ্র—

'তা ছাড়া আবার কী ?' বিদ্যাসাগর তেমনি গজরাতে লাগলেন : 'তুমি না বলেছিলে, তুমি পুলিশে কাজ করো ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—'

'মিথ্যে কথা। একশো বার মিথ্যে।'

'সে কি কথা ? আপনি খোঁজ নিন, খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন। সামান্য চাকরি, মিথ্যে বলতে যাব কেন ?'

'মিথ্যে ছাড়া আর কী বলব!' একটু যেন প্রশমিত হয়েছেন বিদ্যাসাগর। কণ্ঠস্বরে নিজলা ক্রোধের পরিবর্তে এসেছে যেন একটু অভিমানের ঝাঁজ : 'এত দিনে কত লোক "দেব" বলে টাকা নিয়ে আর দিল না। অপারগের কথা ছেড়ে দিই, কত সম্পন্ন বড়লোকও টাকা ধার নিয়ে মেরে দিলে। বন্ধুবান্ধবের তো কথাই নেই। যে দেশে নিলে আর দিতে চায় না, সে দেশের লোক হয়ে, শুধু তাই নয়, পুলিশের দারোগা হয়ে, পুরোপুরি ফিরিয়ে দেবে, এ বিশ্বাস করি কি করে ? তা ছাড়া সাত দিনের কড়ার করে চতুর্থ দিনে ফেরত দেবে এ কল্পনার অতীত। তবে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলব না তো কি! তোমার খালাস পাওয়া উচিত হয়নি। সাত দিনের কড়ারে টাকা নিয়ে চার দিনের দিন যে শোধ দেয় সে পুলিশের দারোগাগিরি করে জেলে যাবে না তো কে যাবে!'

কাউকে চিঠি লিখতে বসেই প্রথমে লেখেন : 'শ্রীহরিঃ শরণম্'। বাজে বা বেফাঁস কথা লেখবার লোক নন বিদ্যাসাগর। কিন্তু সংসারে 'বাস্তবচক্ষে যদি

কারু শরণ নিয়ে থাকেন, তবে সে বাপ-মা। পাকপাড়া রাজবাড়ির হুডসন সাহেবকে দিয়ে দুখানা ছবি করিয়ে নিয়েছেন—তাদের সামনে দিনারম্ভের প্রথম প্রণামটি না রেখে জলস্পর্শ করেন না বিদ্যাসাগর। ওই তাঁর হর-গৌরী। তাঁর রাম-সীতা। তাঁর লক্ষ্মী-নারায়ণ।

'পাকপাড়া রাজবাড়িতে ভালো এক সাহেব পোটো এসেছে, মা,' ভগবতী দেবীকে বললেন বিদ্যাসাগর, 'ইচ্ছে করছে তোমার একখানা ছবি আঁকিয়ে নি।'

'দূর, আমার ছবি কী হবে! ছি-ছি!' ভগবতী দেবী মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

'ছবি তো তোমার জন্যে নয়, ছবি আমার জন্যে। যখন যেখানে থাকি, সকাল-সন্ধে থাকবে আমার চোখের সামনে। প্রাণটা যখন কেমন করে উঠবে তখন একবার দেখব চোখ ভরে।'

রামকৃষ্ণের সেই কথা। যাকে দেখতে এসেছিস, চোখ মেলে চোখ ভরে ছাখ মা'র মুখখানি। ঈশ্বরের মুখের আভাস যদি কোথাও থাকে তবে এই মা'র মুখে।

'না বাপু, সাহেবের সামনে বসে ছবি আঁকাতে পারবো না।' ভগবতী দেবী আবার পাশ কাটাতে চাইলেন।

'না, মা, সে খুব ভালো লোক, আমাকে খুব ভালোবাসে, তার সামনে বসতে দোষ নেই।'

একটু বোধ হয় নরম হলেন ভগবতী। বললেন, 'তা সে এখানে আসবে তো?'

'না মা, তোমাকে পাকপাড়ার রাজবাড়িতে গিয়ে বসতে হবে। সেখানে সে আড্ডা করেছে। সে আড্ডা ভেঙে এখানে আনতে গেলে ছবি হয়তো ভালো হবে না—'

পুত্রের মুখের দিকে তাকালেন ভগবতী। বললেন, 'তোর যা ইচ্ছে তাই কর। নিন্দে হলে লোকে তো আর আমাকে নিন্দে করবে না, তোরই নিন্দে করবে। বলবে, বিদ্যাসাগর মাকে পাকপাড়া ছবি তুলতে নিয়ে গেছে।'

লোকের নিন্দাকে বিদ্যাসাগর যেন কত ভয় করে! আমি মাতৃবন্দনা করব তায় লোকনিন্দা!

সেই মা'র মৃত্যুতে দশ দিক শূন্য হয়ে গেল বিদ্যাসাগরের। বালকের মত কাঁদতে লাগলেন অঝোরে। মৃত্যুর সময় কাছে থাকতে পাননি, সেবা করতে পাননি, দুটো কথা শুনতে পাননি, এ দুঃখ রাখবার জায়গা নেই। নির্জনে চলে গেলেন, ফিরতে লাগলেন দীনহীনের মত। পায়ে জুতো নেই, মাথায় ছাতা নেই, বেশ-বাসে পরিচ্ছন্নতা নেই। থাকেন একাহারে, স্বপাকে নিরামিষ খেয়ে। নিতান্ত অসুস্থ হয়ে না পড়লে সাহায্য নেন না দিনময়ীর। কঠিন

মেঝের উপর শুয়ে ঘুমোন। আর নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তদ্গত চিত্তে মা'র গুণাবলীর ধ্যান করেন।

এমনি এক বছর। একটানা এক বছর।

কত বছর তার পর চলে গেছে। এক দিন কি কথায়-কথায় এক বন্ধু হঠাৎ তাঁর মা'র গুণের কথা উল্লেখ করলেন। যেই শোনা, কাতর কান্নায় ফেটে পড়লেন বিদ্যাসাগর।

বন্ধু তো অপ্রস্তুত। বিদ্যাসাগর অত্যন্ত পীড়িত, দেখা করতে এসেছিলেন, কথাচ্ছলে উঠে পড়েছিল ভগবতী দেবীর প্রসঙ্গ। কিন্তু ফল এমন হবে অনুমান করিতে পারেননি। এ যে একেবারে শোকসমুদ্র!

'এত কষ্ট দেব জানলে ও-কথা পাড়তুম না।'

'কষ্ট? তুমি আমাকে কষ্ট দিলে কোথায়? তুমি তো আমার বন্ধুর মত কাজ করলে। তোমার জন্যে আমার মায়ের কথা মনে পড়ল, মায়ের নামে দু ফোঁটা চোখের জল ফেললাম। এত দুর্দশা, সব সময়ে বাপ-মাকে স্মরণ করতে পারি কই?'

এই বিদ্যাসাগর। সাগরের তুলনা সাগর। 'সাগরং সাগরোপমং'।

এই মাতৃসাধক কি সিদ্ধ নয়? নয় কি তপঃপরায়ণ ঋষি?

রামকৃষ্ণ কী করতেন? যত দিন চন্দ্রমণি জীবিত ছিলেন, রোজ সকালে গিয়ে প্রণাম করে আসতেন। বৃন্দাবন থেকে যাবেন ভেবেছিলেন, মায়ের কথা মনে পড়তেই বৃন্দাবন ভেসে গেল। তার পর মা যখন গত হলেন তখন রামকৃষ্ণের সে কী কান্না! রামকৃষ্ণের মন্ত্রই তো মা! মুখেই হোক আর মনেই হোক মাকে যে ডাকে সে তো ভগবতীকেই ডাকে। বিদ্যাসাগরের মা-ও তাই ভগবতী!

॥ ৮৯ ॥

'ব্রহ্ম যে কি মুখে বলা যায় না।' বিদ্যাসাগরকে বলছেন রামকৃষ্ণ: 'সব শাস্ত্র-দর্শন এঁটো হয়ে গেছে। তার মানে মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে। কিন্তু একটা জিনিস কেবল এঁটো হয়নি। সে ব্রহ্ম। সে অনুচ্ছিষ্ট।'

আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন বিদ্যাসাগর। 'বা, এটি তো বেশ কথা। এ কথা তো কোথাও শুনিনি। একটি নতুন কথা শিখলাম আজ।'

ব্রহ্ম অনুচ্ছিষ্ট।

একেবারে মুখের মধ্যে এনে ছেড়ে দিয়েছেন। ঘনিষ্ঠ আস্বাদের মধ্যে। রসনার রসাশ্রয়ে। কিন্তু সাধ্য নেই দন্তস্ফুট করো। মুখ খুলেছ কি উড়ে পালিয়েছে!

বাক্যের ব্যর্থ অলঙ্কারে ভাবস্বরূপের বন্দনা চললেও বর্ণনা চলে না। ভূষণ দিয়ে কি কি রূপের উদ্ঘাটন হয়?

'কিন্তু যারা ব্রজজ্ঞানী?'

'তারা নুনের পুতুল। নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়েছিল। কত গভীর জল তারা খবর দেবে। খবর দেওয়া আর হল না। যাই নামা অমনি গলে যাওয়া। কে কার খবর দেবে?'

মানুষ তো খুব বাহাদুর, তাই মনে করে আমরা তাঁকে জেনে ফেলেছি। সেই যে পিঁপড়ের গল্প। একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিল। এক দানা খেয়ে পেট ভরে গেল। আরেক দানা মুখে করে বাসার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যাবার সময় ভাবছে এবার এক সময় এসে গোটা পাহাড়টা নিয়ে যাব।

ব্রহ্ম তো নির্লিপ্ত, কিন্তু ভগবানটি কে?

যিনিই ব্রহ্ম তিনিই ভগবান। একজনেরই দু'রকমের পোশাক। বাড়িতে থাকার মত শাদাসিধে চেহারার একজন, আরেকজন বাইরে বেরুবার মত একটু ফিটফাট সাজগোজ। একজন গুণাতীত, আরেকজন গুণময়। একজন ষড়্ভাবশূন্য, আরেকজন ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ।

আপনার কাকে বেশি পছন্দ, ব্রহ্মকে না ভগবানকে?

ব্রহ্ম যেন গতসর্বস্ব দেউলে। যেন নিষ্কিঞ্চন পথের ভিখিরি। চাল নেই চুলো নেই, যেন গাছতলায় আশ্রয়। যে বাবুর ঘর নেই দ্বার নেই, বিনি পয়সায় যে বিকিয়ে গেল, সে বাবু আর কিসের বাবু? ভগবান ষড়ৈশ্বর্যে প্রকাশমান। কত তাঁর প্রতাপ কত তাঁর প্রভুত্ব। তাঁর যদি ঐশ্বর্য না থাকত তা হলে কে মানত তাঁকে? আমার কিন্তু বাপু ব্রহ্মের চেয়ে ভগবানকে বেশি ভালো লাগে। ভগবান হচ্ছে রাজা, কিন্তু ব্রহ্ম হচ্ছে জমিহীন জমিদার।

'ঈশ্বর যদি সর্বভূতেই আছেন, তবে একজনকে বেশি শক্তি আরেকজনকে কম শক্তি দিয়েছেন এর মানে কি?'

যেমন আধার তেমনি শক্তির আয়তন। শক্তি আধারের নয়, শক্তি তাঁর। তিনিই বিকাশিত হয়েছেন। যেমন দীপ তেমনি আলো। যেমন মাঠ তেমনি ফসল। যেমন কলসী তেমনি সরা।

সব তিনি। তোমাকে যখন কেউ মানে তখন জানবে তাঁকেই মানে। তোমাকে যে মানে তাতে তোমার শিং বেরিয়েছে ছুটো?

শুধু পাণ্ডিত্যে কিছু নেই। তাঁকে জানাবার জন্যেই বই পড়া, জনে-জনে জানাবার জন্যে নয়। পাণ্ডিত্য হচ্ছে চাবের বাড়ি। পাড়া-পড়শীর ঘুম না ভাঙিয়ে ক্ষান্তি

নেই। সারা গায়ে গয়না পরে একা-একা নিজের ঘরের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কে কবে শান্তি পায়! বাইরের লোককে দেখাবার জন্যে রাস্তায় ছোটে। নামের পেছনে পদবীর পুচ্ছ নাড়ে। নিজের কথাটি পরের কথার উদ্ধৃতির স্তূপে চাপা দেয়। শুধু কোটেশন আর ফুটনোট। জানতে তো জেনেছি কিছুই নয়, তবু কতটা পড়েছি তার ফর্দ নাও। আমার বাক্যের বহরে যদি একটু অবাক হও। যেমন ঐশ্বর্য দেখিয়ে সূক্ষ্মভাবে চাই তোমাকে একটু ঈর্ষালু করতে। শুধু নিজেকে দেখানো। শুধু প্রাচীরপত্রে নিজের নামজারি।

যদি কাউকে জাহির করতে হয়, তাঁকে জাহির করো। যদি কাউকে সাব্যস্ত করতে হয় তাঁকে সাব্যস্ত করো।

'আমি ও আমার, এই দুটি অজ্ঞান। আমার বাড়ি, আমার টাকা, আমার বিদ্যা, আমার ঐশ্বর্য, এই যে ভাব এ হয় অজ্ঞান থেকে।' বললেন রামকৃষ্ণ: 'আর হে ঈশ্বর, তুমিই সব কর্তা, আর এ সব তোমার জিনিস—বাড়ি-ঘর, ধন-দৌলত, পুত্র-পরিবার, বন্ধু বান্ধব—আমার বলতে কেউ কিছু নয়, সব তোমার এইটিই জ্ঞানভাব।'

লোক বুঝেও বুঝে না। ঘা খায়, আবার উঠে বসে অহঙ্কারের বেড়া মেরামত করে। সূর্য যে অস্তে চলেছে সেদিকে খেয়াল নেই। সারা দিন চলে শুধু এই মেরামতি টুকটাক। আত্মরতির ক্ষুদ্র-সংস্কার দিন যায় দৈন্য আর যায় না। তার পর মৃত্যুর পর আবার খবরের কাগজে হেডলাইন দিতে ছোটে। হোমরা-চোমরা কে কে এসেছিল শ্রাদ্ধ খেতে তার ফিরিস্তি ঝাড়ে। চাকরি থেকে পেনসন নিয়ে বাড়ি করে দরজার উপরে ছাড়া-চাকরির নেম-প্লেট ঝোলায়।

সন্ন্যাসী শুয়ে আছে লোহার কাঁটার উপর। সংসারী শুয়ে আছে অহঙ্কারের কণ্টকে।

বড় মানুষের বাগানের সরকার, বাগান যদি কেউ দেখতে আসে, খুব আড়ম্বর করে বলে, এ বাগানটির আমাদের, এ পুকুরটি আমাদের। কিন্তু কোনো দোষ দেখে বাবু যদি তাকে ছাড়িয়ে দেন, তখন তাঁর আম কাঠের সিন্দুকটাও নিয়ে যাবার তার যোগ্যতা থাকে না। বাবুর দারোয়ানকে দিয়ে সিন্দুকটা পাঠিয়ে দেয়। হেসে উঠলেন বিদ্যাসাগর।

বদলি হবার সময় আদালতের ফার্নিচার ফেরত দাও। মায় দোয়াতদানটি পর্যন্ত ভগবান দুই কথায় হাসেন, বললেন আবার রামকৃষ্ণ। এক হাসেন, কবরেজ যখন রুগীর মাকে বলে, মা, ভয় কি? আমি তোমার ছেলেকে ভালো করে দেব। এই বলে হাসেন, আমি মারছি, আর এ কিনা বলে, বাঁচাবে! আর

হাসেন, দু' ভাই যখন দড়ি ফেলে যায়গা ভাগ করে, আর বলে, এ দিক আমার, ও দিক তোমার। এই বলে হাসেন, আমার জগৎ ব্রহ্মাণ্ড, আর ওরা বলছে, এ জায়গা আমার!

'আচ্ছা, তোমার কী ভাব?' ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে জিগগেস করলেন বিদ্যাসাগরকে। মৃদু-মৃদু হাসছেন বিদ্যাসাগর। বললেন, 'সে এক দিন আপনাকে গিয়ে বলব আমি চুপি-চুপি।'

আমার পরোপকারের ভাব। পর মানে ভগবানে, উপ মানে সমীপস্থ, আর কার মানে কার্য। আমি এমন কার্য করব যাতে মুহূর্তে ভগবানের সমীপস্থ হয়ে যাব। ভগবানকে কি করে আনন্দিত করব? এত যাঁর আছে তাঁকে আর আমি কী দিয়ে খুশি করতে পারি? তাঁকে খুশি করতে পারি শুধু পরের অশ্রু মুছিয়ে। আপনি বলছেন ভগবান হাসছেন। আমি তো দেখি অহর্নিশি কাঁদছেন তিনি। কাঁদছেন ঘরে-ঘরে, পথে-পথে। শৃঙ্খলে নিপীড়িত হয়ে কান্নার ভাষা হারিয়ে, শাসনের কারাগারের দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে।

তিনিই সব এ ভাবটুকু থাকলেই হল। তাঁর জন্যেই সব করছি, নিজের নাম-যশের জন্যে নয়, গীতায় একেই বলেছে নিষ্কাম কর্ম। গীতায় এমনিতেও যা, ওলটালেও তাই। এমনিতেই গীতা, ওলটালেও তাগী। তাগী মানে ত্যাগী। ত্যজ ধাতুর উপর বিহিত প্রত্যয়ে তাগী-ও সিদ্ধ। মরা-মরা বলতে-বলতে যেমন রাম হয়েছিল তেমনি গীতা-গীতা বলতে-বলতে ত্যাগী হয়ে যাও। নিজের সমস্ত জ্ঞান-কর্ম বিদ্যাবুদ্ধি তাঁর হাতে, একটা বৃহত্তম সত্তার উপলব্ধিতে, উৎসর্জন করো। এর জন্যে চাই বিশ্বাস। সংশয়ের ঝড়ের রাতে প্রত্যয়ের দীপবর্তি। এর হদিস পণ্ডিতের বিচারে নেই, আছে একটি নির্মল সরল বালকের বিশ্বাসে। ষড়দর্শনেও তাঁর দর্শন হয় না, দর্শন হয় শুধু বালকের পবিত্রতায়। সেই যে কথায় বলে না, স্বয়ং রামের সাগর বাঁধতে হল আর হনুমান রামনামের বিশ্বাসের জোরে ডিঙিয়ে গেল এক লাফে।

'যদি তাঁতে বিশ্বাস থাকে,' বললেন রামকৃষ্ণ, 'তা হলে পাপই করুক আর মহা-পাতকই করুক, কিছুতেই ভয় নেই।'

শক্তিতে হয় না, ভক্তিতে হয়। একের পর এক গান ধরলেন রামকৃষ্ণ। সুরে-সুরে সুধার হ্রদ নেমে এল মর্তধামে।

তত্ত্ব অতি সোজা। শুধু একটি ভালোবাসার তত্ত্ব। যাতে ঐ ভালোবাসাটি আসে তার জন্যেই তাঁকে মা বলা। মা বড় ভালোবাসার জিনিস।

বিদ্যাসাগরের চোখ ছলছল করে উঠল। এ কি আর বিদ্যাসাগরকে বোঝাতে

হবে ?

পূজা হোম যাগযজ্ঞ, ও-সব কিছুই নয়। আসল হচ্ছে ভালোবাসা। যদি একবার ভালোবাসা আসে তবে কী হবে ও-সব অনুষ্ঠানে ? যদি ভালোবাসা হবে কী হবে আর বেশভূষায় ? চোখে যদি জল আসে কাজলের রেখা আর থাকে না। 'তুমি যে সব কর্ম করছ এ সব সৎকর্ম।' বললেন রামকৃষ্ণ, 'যদি আমি কর্তা এই অহঙ্কার ত্যাগ করে নিষ্কামভাবে করতে পারো তা হলেই হল। নিষ্কাম কর্ম করতে-করতে ঈশ্বরে ভালোবাসা আসবে।'

একেক জনের একেক রকম পথ! কারু জ্ঞানে, কারু ভক্তিতে, কারু বা শুধু নিষ্কাম কর্মে। নিষ্কাম কর্মই নিয়ে যাবে মনস্কামের চরম তীর্থে।

'আমি বলছি, নিষ্কাম কর্মই হচ্ছে ঈশ্বরপ্রেম। আর ভালোবাসা হলেই দর্শন। আর সব দর্শনে চোখাচোখি হয় না, ভালোবাসাতেই মুখচন্দ্রিকা। হ্যাঁ গো, দেখা যায় ঈশ্বরকে। তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়। এই যেমন তোমাকে দেখছি চোখের উপর চোখ রেখে। এই যেমন কথা কচ্ছি তোমার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে।' রাত হচ্ছে, এবার উঠবেন রামকৃষ্ণ।

'যা সব বলছি তোমাকে তুমি সব জানো।' হাসলেন রামকৃষ্ণ : 'তবে খবর নেই। বরুণের ভাণ্ডারে কত-কি রত্ন আছে, বরুণ রাজার খবর নেই।'

'তা আপনি বলতে পারেন।' হাসলেন বিদ্যাসাগর।

'অন্তরে সোনা আছে, কিন্তু একটু মাটি চাপা পড়ে আছে। যদি একবার সন্ধান পাও, তখন অন্য কর্ম কমে যাবে। শুধু খনন করবে সেই গহন অন্তর। ঐ দেখ না, গৃহস্থের বউর কত কর্ম, অন্তঃস্বত্ত্বা হলেই কর্ম কমে আসে। শেষ ছেলে হলে ছেলেটিকেই নিয়ে থাকে, ওটিকে নিয়েই নাড়াচাড়া করে। সংসারের কাজ আর শাশুড়ি করতে দেয় না।'

তাই শুধু এগোও। কর্মারণ্যে কুঠার হাতে করে কাঠ কাটতে বেরিয়েছ, কিন্তু শুধু চন্দন গাছ দেখেই থেমে যেও না। ঐ কুঠারে যে রূপোর খনি সোনার খনিও খুঁড়তে হবে। তবে থামছ কেন ? এগোও, এগিয়ে যাও। মণি-মাণিক্যের ভাণ্ডার রয়েছে সামনে। অন্তরেই সেই আকর, অন্তরেই সেই রত্নাগার। থেমো না, আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পোড়ো না—

এমনি অন্ধ বন্ধ করো না পাখা! অনেক তোমার সম্ভাবনা। অনেক তোমার প্রতিশ্রুতি। তোমার মাত্রাহীন যাত্রা। তোমার সংক্রান্তিহীন দিনপঞ্জী। প্রতিদিনই তোমার জন্মদিন।

'সব জানো, তবে খবর নেই।'

'তা কখনো হয় ?'

'হ্যাঁ গো, অনেক বাবু জানে না চাকর-বাকরের নাম কি।' উঠলেন রামকৃষ্ণ। 'একবার যেয়ো বাগান দেখতে। রাসমণির বাগান। ভারি চমৎকার জায়গা।'

'যাবো বৈ কি। আপনি এলেন আর আমি যাব না ?'

'আরে আমার কাছে যাবে কি ? ছি-ছি ! বাগান দেখতে যাবে।'

'সে কি কথা !' একটু ক্ষুণ্ণ হলেন কি বিদ্যাসাগর ? বললেন, 'ও কথা বলছেন কেন ?'

'আরে, আমরা হচ্ছি জেলেডিঙি। খাল-বিলেও যেতে পারি, আবার বড় নদীতেও যেতে পারি। কিন্তু তুমি হচ্ছ জাহাজ, কি জানি যদি যেতে গিয়ে চড়ায় হঠাৎ ঠেকে যায়—'

সকলে হেসে উঠল।

রামকৃষ্ণ টিপ্পনি কাটলেন : 'তবে এ সময় যেতে পারে জাহাজ।'

ঈঙ্গিত বুঝে নিলেন বিদ্যাসাগর। বললেন, 'হ্যাঁ, এটি বর্ষাকাল বটে।'

নবানুরাগের বর্ষা। নবানুরাগের সময় মান-অপমান থাকে না, বিদ্যা-অবিদ্যা থাকে না, শুধু জলে জলময়। তখন প্রেমের নদী, প্রেমের হাওয়া, প্রেমের ময়ূরপঙ্খী। প্রেমের অঞ্জনে তখন বিশ্বময় নিরঞ্জন।

দাঁড়িয়ে মূল মন্ত্র জপ করছেন রামকৃষ্ণ। ভাবারূঢ় হয়েছেন। হয়তো বিদ্যাসাগরের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্যে প্রার্থনা করছেন মা'র কাছে।

ভক্তসঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন ধীরে-ধীরে। নিজের হাতে মধ্যে একটি ভক্তের হাত ধরা। আগে-আগে বাতি-হাতে চলেছেন বিদ্যাসাগর।

শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষ। ষষ্ঠীর চাঁদ দেখা দেয়নি এখনো। বাগানে অন্ধকার। তার মধ্য দিয়ে বাতির একটি ক্ষীণ রেখা চলেছে ফটকের দিকে। সেই ক্ষীণ রেখার পিছনেই জ্যোতিষ্মান দিনকর। জগৎজোড়া অন্ধকারের মধ্যে দেখা যাচ্ছে কি সেই আশায় ক্ষীণ-দ্যুতি ? সেই আভাসের পিছনে নব ভাস্করের আবির্ভাব ?

ফটকের সামনে কে একজন গৌরবর্ণ সুপুরুষ দাঁড়িয়ে। বয়েস চল্লিশের কাছা-কাছি। মাথায় পাগড়ি, দাড়িগোঁফ একমুখ। শিখ নাকি ? অথচ পরনে ধুতি, পায়ে জুতো-মোজা। বাঙালী তো, গায়ে চাদর নেই কেন ?

রামকৃষ্ণকে দেখামাত্রই পাগড়িসুদ্ধ মাথা পায়ে লুটিয়ে দিল।

'এ কি ? তুমি ? বলরাম ? এত রাত্রে ?'

'অনেকক্ষণ এসেছি। দাঁড়িয়ে ছিলাম এখানে।'

'সে কি ? ভেতরে যাওনি কেন ?'

'সবাই আপনার কথা শুনছেন, এর মধ্যে আমি গিয়ে কেন তালভঙ্গ করি ?'

ঘরের মধ্যেই থাকি আর দরজার বাইরে থাকি, আমি আছি আমার ভাবের ঘরের দরজা খুলে।

ঠাকুর গাড়িতে উঠলেন।

মাস্টারের কানে-কানে বললেন বিদ্যাসাগর, 'গাড়িভাড়া দেব ?'

'আজ্ঞে না, ও হয়ে গেছে।'

বিদ্যাসাগর প্রণাম করলেন ঠাকুরকে। প্রত্যেকে, একে-একে।

গাড়ি চলল দক্ষিণেশ্বর। কিন্তু গাড়ির মধ্যে যিনি বসে তিনি চলেছেন কোথায় ? তিনি চলেছেন জীবের ঘরে-ঘরে। কায়ে মনে আর বাক্যে একটি শুধু বাণী নিয়ে। সে বাণী ভালোবাসার বাণী। শুধু ভালোবাসা। ঈশ্বরকে ভালোবাসা। ঈশ্বরকে ভালোবাসলেই আর সকলকে ভালোবাসবে। এ জীবন পেয়েছ শুধু সেই ভালোবাসায় আলো জ্বালাতে। গাঁথতে শুধু সেই একটি ভালোবাসার বরমালা।

॥ ৯০ ॥

তুমি তোমার সিংহাসন ছেড়ে নেমে এলে। নেমে এলে আমার পর্ণকুটিরের ভগ্ন-দুয়ারে। আমার দুয়ারের চৌকাঠে ঠেকে যাবে বলে ফেলে এলে তোমার রাজমুকুট। আমি দীনদুঃখী বলে পরে এলে রিক্ততার সাজ। আমি ছোট বলে তুমিও ছোট হলে। আমি কি তোমাকে ছোট করেছি ? তুমি নিজেই ছোট হয়েছ আমার জন্যে। আমি দুর্বল বলেই সুলভ হয়েছ। ভঙ্গুর বলেই হয়েছ সুকোমল। নইলে তোমাকে ধরি কি করে ? রাখি কি করে বুকের নিবিড়ে ? কিন্তু, ছোট হয়ে শুনতে চাও তুমি বড় কথা। আমার ছোট মুখের বড় কথা। সে-কথাটির নাম ভালোবাসি। তোমাকে ভালোবাসতে পারলেই বিশ্বসংসার ভরে উঠবে, ঘুচে যাবে সব ঘর-গড়া ব্যবধান। এইটিই বড় কথা। এইটিই শোনবার জন্যে ছোট হয়ে কাছে এসেছ। ছোট হয়েছ বড় করবার জন্যে। রিক্ত সেজেছ মুক্তির পথ দেখাতে।

তুমি ভিখারি শিব। ভস্মমাখা। হাড়ের মালা গলায় দোলানো। তুমি নিষ্কিঞ্চন বলেই তো প্রবঞ্চিতের বন্ধু। সরল বলেই তো ডাক দিয়েছ সহজ হতে।

কিন্তু এ কেমনতরো শিব ? কেমনতরো সাধু ? থেকে-থেকে কেবল হাত পাতে। কেবল খেতে চায়।

দু পয়সার দেদো সন্দেশ কিনে দক্ষিণেশ্বরে এসেছে অঘোরমণি। থাকে কামার-হাটিতে, দত্তদের ঠাকুরবাড়ির দক্ষিণের কোঠায়। রাধাকৃষ্ণের মন্দির। নিজের হাতে ভোগ রাঁধে অঘোরমণি। কলাপাতায় করে গোপালের জন্যে ভোগ সাজায়। গঙ্গাজলের ছোট গ্লাশ পাশে রেখে পিঁড়ি পাতে সামনে। এস, বসো, খাও—আহ্বান করে গোপালকে।

দুপয়সার দেদো সন্দেশের জন্যেই হাত বাড়ায় রামকৃষ্ণ। বলে, 'কই, কি এনেছ আমার জন্যে? দাও। ওকি, ঢাকছ কেন আঁচলে?'

ছি-ছি, অমন রোখো সন্দেশও কেউ চায় হাত বাড়িয়ে! লজ্জায় পিছিয়ে গেল অঘোরমণি। কত ভালো জিনিস এনে খাওয়াচ্ছে ভক্তেরা, কত তবক-দেওয়া, কত-বা রাংতা-জড়ানো। অঘোরমণির যেমন অদৃষ্ট, দুপয়সার দেদো সন্দেশের বেশি জোটেনি। তা, লুকিয়ে এনেছি আঁচলের তলায়, একেবারে আসামাত্রই খেতে চাওয়ার কী হয়েচে? একটু রয়ে-সয়ে ধীরে-সুস্থে চাইলেই তো হয়।

'দাও না গো! এনেছ তো লুকোচ্ছ কেন?'

কুণ্ঠীত ভঙ্গিতে সন্দেশগুলো বের করে দিল অঘোরমণি। তুচ্ছ জিনিস নিয়ে এসেছি তোমার জন্যে, কিন্তু তুমি কি আমার নৈবেদ্যের দৈন্য ধরবে? দেখবে না কি আমার নিবেদনের ভাবটি? তুমি কি ভাবে নও? তুমি কি উপকরণে?

স্বচ্ছন্দে মুখে পুরল সেই দেদো সন্দেশ। সানন্দে খেতে লাগল রামকৃষ্ণ। বললে, 'তুমি গরিব মানুষ,পয়সা খরচ করে বাজার থেকে সন্দেশ আনো কেন?'

ন বছরে বিয়ে হয়েছিল, তেরো বছরে বিধবা হয়েছে। অল্প কিছু ধানজমি পেয়েছিল শ্বশুরঘর থেকে, বিক্রি করে তারই সামান্য আয়ে দিন চালায়। দিন কি আর চলে? দিন না চলে তো মনও চলে না। মন অচল হয়ে পড়ে থাকে বিগ্রহের পদমূলে।

গোপালমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে অঘোরমণি। সমস্ত সৃষ্টির যে সম্রাট তাকে সে সন্তান-রূপে কাছে টেনে এনেছে। দিন কাটাচ্ছে শুধু মন্দিরের তদারকে। ফুল তুলছে, মালা গাঁথছে, চন্দন বাটছে, বাসন মাজছে, ঝাঁটপাট দিচ্ছে। তারপর কোনোরকমে নিজের স্নানাহার সেরে বাকি সময় শুধু জপযজ্ঞ। শুধু মানসনামগুঞ্জন।

এমনি এক-আধ দিন নয়, একটানা তিরিশ বছর।

'নারকোলের নাড়ু করবে নিজের হাতে, তাই আনবে দুটো-একটা।' কিন্তু এতেও বিশেষ আগ্রহ নেই রামকৃষ্ণের। বললে, 'যা নিজের জন্যে রাঁধো, তারই থেকে কিছু নিয়ে এলে তো ভালো হয়। কী রেঁধেছিলে আজ? লাউশাকের

চচ্চড়ি, না, আলু-বেগুন-বড়ি দিয়ে সজনেখাড়ার ঘ্যাঁট? তাই নিয়ে এসো না দু-একদিন। তোমার হাতের রান্না খেতে বড় সাধ যায়।'

কেবল খাওয়া আর খাওয়া। এ ছাড়া সাধুর কি আর কোনো কথা নেই? দক্ষিণেশ্বরের গিন্নী খুব ভালো সাধুরই খোঁজ দিয়েছে যা হোক। গোপাল-গোবিন্দের কথা নেই, শুধু এ-খাই না ও-খাই। দূর ছাই, আর আসব না। আমি অনাথ কাঙাল লোক, কোথায় পাব অত ভোজনের পারিপাট্য। নিজের পেট চলে না, এখন আবার অতিথি খাওয়াই! তাও, যে অতিথি দুয়ারে এসে দাঁড়ায় না, দূর থেকে বসে হুকুম দেয়। দরকার নেই অমন আদিখ্যেতায়। কিন্তু কি হল অঘোরমণির, কদিন যেতে না যেতেই চচ্চড়ি রেঁধে হাজির হল দক্ষিণেশ্বরে।

'দাও, দাও, কী এনেছ বাটিতে করে? লাউশাক না সজনেখাড়া?' হাত বাড়িয়ে বাটিটা টেনে নিল রামকৃষ্ণ। কোনোরকম ভূমিকা না করে খেতে লাগল রসিয়ে-রসিয়ে। বললে, 'আহা, কী রান্না! সুধা! সুধা!'

অঘোরমণির চোখে জল এল। কী এমন রেঁধেছি, সাধু একেবারে স্বাদে-গন্ধে গদগদ হয়ে উঠেছে। কী করুণা এই সাধুর! দরিদ্র বলে উপেক্ষা করল না, সাধারণ ব্যঞ্জনে কী অসাধারণ ব্যঞ্জনা পেল না জানি। এমন একটি মশলা এসে মিশেছে যা বাজারে কেনা যায় না, সেটি হৃদয়-রসের পাঁচফোড়ন। ভক্তি-প্রীতির সম্বরা।

যতই খায় ততই শুধু খাই-খাই। এটা আনো ওটা আনো। এটা রাঁধো ওটা রাঁধো। আর কোনো প্রসঙ্গ নেই, শুধু ভোজনবিলাস! শুধু নোলার শকশকানি। অনেক সাধু দেখেছি জীবনে কিন্তু এমন পেটুক সাধু দেখিনি!

এ তুমি আমাকে কোথায় এনে ফেললে! গোপালের কাছে মনে-মনে কাঁদে অঘোরমণি। এমন সাধুর কাছে আনলে যার খাওয়া ছাড়া আর কথা নেই! ধর্মকর্মের ধার ধারে না, যেন খাওয়াই পরমার্থ। এত আমি খাওয়াই কি করে? আমার ভাঁড়ার কি অফুরন্ত?

রাত তিনটের সময় জপে বসেছে অঘোরমণি। জপ সেরে প্রাণায়াম শুরু করেছে, কে একজন তার পাশে এসে বসল। গা ছমছমিয়ে উঠল অন্ধকারে। কে, কে তুমি? চমকে চোখ চেয়ে দেখল—একি, এ যে সেই দক্ষিণেশ্বরের সাধু। ডান হাত মুঠ করে ধরা, যেমনটি দেখেছে দক্ষিণেশ্বরে, আর মুখে সেই মধুর মৃদুল হাসি। এত রাতে এল কি করে এখানে? অন্ধকারে পথ চিনে-চিনে?

আশ্চর্য একটা সাহস হল অঘোরমণির। নিজের বাঁ হাত বাড়িয়ে ধরল রামকৃষ্ণের বাঁ হাত। মুহূর্তে ঘটে গেল অভাবনীয়। পাশে বসে আর সেই প্রৌঢ়

রামকৃষ্ণ নেই, তার বদলে একটি দশ মাসের শিশু। নধর নবনীতকোমল। স্নেহদ্রব নবজলধর। একি, এ যে সত্যিকারের গোপাল! হামা দিয়ে একেবারে বুকের কাছে চলে এল দেখছি। হাত তুলে মুখের দিকে তাকিয়ে বলছে, 'মা গো, ননী দে।'

এ কি কাণ্ড! অঘোরমণি আকুলকণ্ঠে কেঁদে উঠল: 'বাবা, আমি কাঙালিনী চিরদুখিনী। ননী কোথায় পাব? আমি খুদ খাই পাতা কুড়ুই।'

সে কথা শুনে নিবৃত্ত হবার ছেলে নয় গোপাল। অঘোরমণির আঁচল টানে, হাত থেকে মালা কেড়ে নেয়। বলে, 'ও-সব আমি শুনি না। মা হয়েছিস কেন তবে? খেতে দিবি কি না বল—'

শিকে থেকে নারকেল-নাড়ু বের করে অঘোরমণি। ছোট হাতখানি ভরে নাড়ু দেয়। বলে, 'বাবা গোপাল, তোমাকে এ বাসি জিনিস দিতে বুক ফেটে যাচ্ছে—'

তার আগে যে খিদেয় আমার পেট চুপসে যাচ্ছে। বাসি নাড়ু, বাসি নাড়ুই নই। সন্তানবিরহে যে মা উপবাসী, তার সঞ্চিত স্নেহ কি কখনো বাসি হয়?

মুখ ভরে খেতে লাগল গোপাল। উপভোগের আনন্দে চোখের পাতা নাচতে লাগল। কিন্তু খেয়েই কি সে শান্ত হবে? না কি সে শান্ত হবার মত ছেলে? ঘরময় ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল। কখনো বা অঘোরমণির কোলে, কখনো বা কাঁধে চেপে বসতে লাগল। জপ-তপ ঘুচে গেল অঘোরমণির।

সকাল হলেই ছুটল দক্ষিণেশ্বরের দিকে। ছুটল প্রায় পাগলিনীর মত। আগোছাল চুল, অসামাল বেশবাস। বুকের উপর দুবাহুর মধ্যে কখন উঠে এসেছেন গোপাল। তার রাঙা পা দুখানি টুকটুক করছে বুকের উপর।

গোপাল! গোপাল! বলতে-বলতে রামকৃষ্ণের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল অঘোরমণি। কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, রামকৃষ্ণের পাশ ঘেঁষে বসে পড়ল। আর, এরই জন্য যেন অপেক্ষা করছিল রামকৃষ্ণ। ভাবাবেশে অঘোরমণির কোলে চড়ে বসল।

যে দেখল সেই অবাক। বাষট্টি বছরের বুড়ীর কোলে আটচল্লিশ বছরের পোঢ় সন্তান। যে ঠাকুর স্ত্রীজাতির ছোঁয়া সহ্য করতে পারেন না তাঁর এ কেমনতরো ব্যবহার! কেমনতরো তা কে বোঝে! একবার মা হয়ে কোলে নিয়েছিল ছেলেকে, রাখালকে, এবার ছেলে হয়ে কোলে বসলো মা'র।

ক্ষীর-সর খাইয়ে দিতে লাগল অঘোরমণি। খাইয়ে দিচ্ছ তো কাঁদছ কেন? অন্তরের স্নেহধারা নয়নের অশ্রুধারা হয়ে বেরুচ্ছে। আমি নন্দরাণী—তুমি

নন্দদুলাল। তুমি গোপাল আর আমি গোপালের মা—

ভাব সংবরণ করে সরে বসল রামকৃষ্ণ। কিন্তু গোপালের মা'র আর ভাব থামে না। ছেলে সরে বসে, কিন্তু মা'র স্নেহভাবের কি ইতি আছে? সে ভালোবাসায় কি ভাঁটা পড়ে? সেখানে শুধু জোয়ারের জল। শুধু ঢেউয়ের পর ঢেউ। তাই ঘরময় নাচতে লাগল অঘোরমণি। আর গাইতে লাগল, 'ব্রহ্মা নাচে বিষ্ণু নাচে আর নাচে শিব।'

'দেখ দেখ, আনন্দে ভরে গেছে। গোপাললোকে চলে গেছে গোপালের মা।' বললে রামকৃষ্ণ।

'এই যে গোপাল আমার কোলে, এই যে আবার তোমার ভেতর—', নৃত্যের আর বিরাম নেই অঘোরমণির: 'আয়রে গোপাল বেরিয়ে আয়, আয়রে আমার কঠিন কোলে—'

এবার ছেলের হাতে কিছু খাও গোপালের মা। ছেলের ভালোবাসার কিছু স্বাদ নাও। নিজের হাতে খাইয়ে দিল রামকৃষ্ণ। বুকে হাত বুলিয়ে ভাবভূমি থেকে নিয়ে এল বাস্তবভূমিতে।

'বড় দুঃখে দিন কেটেছে বাবা। কোথায় ছিলি তুই এতদিন? টেকো ঘুরিয়ে সুতো কেটে দিন কেটেছে। আজ বুঝি তোর দুখিনী মায়ের কথা মনে পড়লো? তাই এত আদর করছিস্ মাকে? বল্, যখন একবার তোকে কোলে পেলাম, আর তুই যাবি না কোল ছেড়ে—'

রামকৃষ্ণ এখন নিজেই রামলালা।

অনেক বলে-কয়ে সন্ধের দিকে পাঠিয়ে দিল অঘোরমণিকে। নিজের বাড়ি কামারহাটিতে। কিন্তু যখনই পথে নেমেছে, গোপাল কখন ছুটে এসে দিব্যি কোলে চড়ে বসল। তা বসেছিস বোস, বুকে করে নিয়ে যাচ্ছি বাড়ি। কিন্তু বাড়ি এসে এ তুই কী রঙ্গ শুরু করে দিলি? এ কি, আমাকে আজ তুই জপ করতে দিবিনে দুষ্টু ছেলে? বেশ, তাই, করব না জপ, মালার থলে গঙ্গাজলে ফেলে দেব। কিন্তু এখন তুই কী চাস বল তো? এই তো দেখছিস আমার বিছানার ছিরি, শুকনো তক্তপোশের উপর ছেঁড়া মাদুর পাতা। নরম বিছানা-বালিশ আমি পাব কোথায়? শুবি তো শো এই শুকনো কাঠে। শুয়েছে বটে কিন্তু গোপালের স্বস্তি নেই। খুঁতমুত করতে লেগেছে। দুধের শিশুকে কি তার মা এমন কঠিন বিছানায় শুতে দেয়? বালিশ নেই তোশক নেই, এ কী নিষ্ঠুরতা!

'বাবা, আজ এরকমই শোও, কাল কলকাতায় গিয়ে নরম বিছানা করিয়ে দেব।'

বাঁ বাহুর বালিশে গোপালের মাথা রেখে ঘুম পাড়াল গোপালের মা। মাতৃঅঙ্গের স্নেহস্পর্শ পেয়েছে, আর চাই কি গোপালের! অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল।

অঘোরমণিকে দেখিয়ে রামকৃষ্ণ বললে, 'এ খোলটা কেবল হরিতে ভরা। হরিময় শরীর।' মাথা থেকে পা পর্যন্ত হাত বুলিয়ে দিলে। শিশু যেমন মাকে আদর করে তেমনি। পায়ে হাত দিয়েছে বলেও চমকাল না গোপালের মা। ছেলে যদি পায়ে হাত দেয়, মা কি চমকায়, না প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ করে?

সেদিন বাড়ি ফেরবার সময় মাকে অনেকগুলি মিছরি দিলে রামকৃষ্ণ। ভক্তরা যত এনেছিল উপহার, সমস্ত। গোপালের মা বললে, 'এত মিছরি দিয়ে কী হবে?'

তার চিবুক ধরে সোহাগ করে বললে রামকৃষ্ণ, 'ওগো, আগে ছিলে গুড়, পরে হলে চিনি, এখন হয়েছ মিছরি। এখন মিছরি খাও আর আনন্দ করো।'

সন্তান কোলে নিয়ে মেয়েরা যেমন কোমর বেঁকিয়ে হাঁটে, তেমনি করে চলে গোপালের মা! 'না বিইয়ে কানায়ের মা।' সর্বজীবে গোপাল দেখে। ক্ষুধার্ত ভগবান মাতৃহৃদয়ের কাছে স্নেহের নবনী ভিক্ষা করে ফিরছেন।

আত্মীয়ের মধ্যে একটি শুধু বেড়াল। বেড়ালের মধ্যে ঠাকুর দেখেছেন কালী, অঘোরমণি দেখছে গোপাল। সেবার ঠাকুর তখন অপ্রকট হয়েছেন, বোসপাড়া লেনের বাড়িতে সিসটার নিবেদিতার ঘাড়ে বেড়ালটি ঘুমিয়ে আছে। নিবেদিতাও নির্বিকার। এ কি দুর্দৈব, কে একজন স্ত্রী-ভক্ত তাড়িয়ে দিল বেড়ালটাকে।

'আহাহা, কি করলি মা, কি করলি? গোপাল যে চলে গেল, চলে গেল—'

কিন্তু কোথায় সে যাবে? সে যে বস্ত্রাঞ্চলের নিধি। সকাল হতেই চলেছে সে বাগানে মা'র সঙ্গে কাঠ কুড়োতে। পিঠে পড়ে মা'র রান্না দেখতে। পুকুরে নেমে ঝাঁপাই ঝুড়তে।

দিন যায়। অঘোরমণি বুড়ো হয়, কিন্তু গোপাল আর বড় হয় না। চিরকাল মা'র বুকের আঁচল ধরে টানে আর কাঁদে, 'মা খেতে দে, খিদে পেয়েছে—'

কোথায় তুমি খেতে দেবে, তা নয়, তুমিই খেতে চাও! ভ্রমর হয়ে ফিরছ গুঞ্জন করে, গুনগুন করে বলছ, কোথায় ফুলটি ফুটেছে, কে আমাকে একটু মধু দেবে!

॥ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥

boiRboi.net

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

তৃতীয় খণ্ড

boiRboi.net

"অগ্নিতত্ত্ব কাঠে বেশি। ঈশ্বরতত্ত্ব যদি খোঁজো মানুষে খুঁজবে। মানুষলীলা কেন? এর ভিতর তাঁর কথা শুনতে পাওয়া যায়। এর ভিতর তাঁর বিলাস, এর ভিতর তিনি রসাস্বাদন করেন। মানুষের ভিতর নারায়ণ। দেহটি আবরণ, যেন লণ্ঠনের ভিতর আলো জ্বলছে। অথবা শার্সির ভিতর বহুমূল্য জিনিস দেখছি। যেন বলছে, আমি মানুষের ভিতর রইচি, তুমি মানুষ নিয়ে আনন্দ কর। প্রতিমাতে তাঁর আবির্ভাব হয় আর মানুষে হবে না? মানুষের ভিতর যখন ঈশ্বরদর্শন হবে তখনই পূর্ণ জ্ঞান হবে। তিনিই এক এক রূপে বেড়াচ্ছেন। কখনও সাধুরূপে কখনও ছলরূপে—কোথাও বা খল-রূপে।"—শ্রীরামকৃষ্ণ

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি ভূরিদা জনাঃ॥"

"তোমার কথা অমৃততুল্য। সন্তপ্তজনের জীবন-দান করে, কবিকুলদ্বারা উচ্চারিত হয়ে সমস্ত পাপ বিনাশ করে, শুনতেই এ মধু-মঙ্গল। দিকে দিকে ব্যাপ্ত হয়ে বিধান করে সকলশ্রী। যাঁরা পৃথিবীতে এ কীর্তন করেন তাঁরাই বহুদাতা।"—শ্রীমদ্ভাগবত

boiRboi.net

॥ ৯১ ॥

নরেন্দ্রনাথের পিতা বিশ্বনাথ দত্ত হঠাৎ মারা গেলেন।

বরানগরে ভবনাথ চাটুজ্জের বাড়িতে নেমন্তন্ন ছিল নরেনের। বিকেল থেকেই আড্ডা জমিয়েছে সেখানে। সঙ্গে বন্ধু সাতকড়ি লাহিড়ী আর দাশরথি সান্যাল। রাত দুটো, চার বন্ধু ঘুমিয়েছে একসঙ্গে, খবর এসে পৌঁছুল, বাবা আর নেই। হার্ট ফেল করে মারা গিয়েছেন।

আরামশয্যা থেকে উন্মুলিত হল নরেন। প্রথমটা সম্মূঢ় হয়ে গেল। জীবনের প্রথম প্রতিবেশী মৃত্যুকে দেখলে। যে অপেক্ষা করে না, কিছুমাত্র কৈফিয়ত শোনে না, সবলে কেশ আকর্ষণ করে টেনে নিয়ে যায়।

ছুটল ঘরের দিকে। ভবনাথ বললে, 'দাঁড়াও, আমিও যাচ্ছি।'

'জন্মান্তরে তুই নরেনের জীবনসঙ্গিনী ছিলি বোধ হয়।' ভবনাথকে নিয়ে রহস্য করেন ঠাকুর।

এমনি ভাব নরেনের সঙ্গে। গাছের সঙ্গে যেমন ছায়া। একটি পাতা যেন ফুলের বৃন্তে।

'ভবনাথ, বাবুরাম—এদের প্রকৃতি ভাব।' বলেন ঠাকুর : 'আর হরিশ তো মেয়ের কাপড় পরে শোয়। বাবুরাম বলেছে ঐ ভাবটা ভালো লাগে। ভবনাথেরও তাই।' যে যে-ভাবে আছে, যার যে-ভাব ভালো লাগে। স্ব-ভাবটিই আসল ভাব। আমার অঙ্কে মাথা, আমি সাহিত্য দিয়ে কি করবো। আমার চিত্রে অভিরুচি, আমি চাই না মসীজীবী হতে। স্বভাব কখনো বর্জনীয় নয়। স্বভাবে নিধনও শ্রেয়। শুধু একটু বাঁক ঘুরিয়ে দেওয়া। কামকে প্রেম করা। ক্রোধকে তেজ করা। লোভকে ব্যাকুলতায় নিয়ে যাওয়া। অবন্ধন স্রোত থেকে বন্দরে নৌকো ভেড়ানো। শুধু একজনকে বা একটাকে ধরো। যাকে ভালো লাগে, যাকে ভালোবাসি, যাকে ভাবলে অন্তর-বাহির আলোকিত হয়ে ওঠে। ভাবো তো ডুবে গিয়ে ভাবো। ধরো তো পাকা করে ধরো। নড়নচড়ন নেই, ছাড়ানছোড়ান নেই। 'ভাব কি জানো?' বললেন ঠাকুর, 'তাঁর সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতানো। সেইটে সর্বক্ষণ মনে রাখা। যেমন তাঁর দাস আমি, তাঁর সন্তান আমি, তাঁর অংশ আমি। প্রথম অবস্থায় তুমি-টুমি, ভাব বাড়লে তুই-মুই। যেমন ধরো, নষ্ট মেয়ে।

পরপুরুষকে প্রথম-প্রথম ভালোবাসতে শিখছে, তখন কত লুকোলুকি, কত ভয়, কত লজ্জা। তারপর যেই ভাব বেড়ে উঠল, তখন আর কিছু নেই—একেবারে তার হাত ধরে সকলের সামনে কুলের বাইরে এসে দাঁড়াল। তখন যদি সে পুরুষ আদর-যত্ন না করে, ছেড়ে যেতে চায়, তো তার গলায় কাপড় দিয়ে টেনে ধরে বলে, তোর জন্যে পথে দাঁড়ালুম, এখন তুই খেতে দিবি কিনা বল্। তেমনি যে ভগবানের জন্যে সব ছেড়েছে, তাঁকে আপনার করে নিয়েছে, সে তাঁর উপর জোর করে বলে, তোর জন্যে সব ছাড়লুম, এখন দেখা দিবি কিনা বল্।'

কালীবাড়ির নবতে বাজনা শোনা যাচ্ছে।

ঠাকুর বলছেন কেশব সেনকে, 'দেখলে কেমন সুন্দর বাজনা! একজন পোঁ করছে, আরেকজন নানা সুরের লহরী তুলে কত রাগরাগিণীর আলাপ করছে। আমারও ঐ ভাব। আমার সাত ফোকর থাকতে শুধু কেন পোঁ করব—কেন শুধু সোঽহং সোঽহং করব! আমি সাত ফোকরে নানা রাগরাগিণী বাজাব। কেন শুধু ব্রহ্ম-ব্রহ্ম করব! শান্ত দাস্য বাৎসল্য সখ্য মাধুর্য—সব ভাবে ডাকব। আনন্দ করব বিলাস করব।'

হায়, রন্ধ্ররন্ধ্র বাঁশি হয়ে পড়ে আছি। নানা অহঙ্কারে আর মোহে ফোকরগুলি বন্ধ হয়ে আছে। তাই আর বাজছে না একটুও। ছিদ্র যদি না শূন্য হয়, বাজবে কি করে? দরজা যদি না মুক্ত হয় আসবে কি করে সে অতিথি-পথিক? তাই, 'শূন্য করিয়া রাখ তোর বাঁশি, বাজাবার যিনি বাজাবেন আসি।' পূর্ণ করা সোজা, শূন্য করাই তপস্যা।

ভবনাথ যে দক্ষিণেশ্বরে আসে তার বাড়ির লোক পছন্দ করে না। তার চেয়ে ব্রাহ্ম-সমাজে যে নাম লিখিয়েছে সে অনেক ভালো। কিন্তু প্রাণ জানে তার টানের কথা।

'তুই এত দেরিতে-দেরিতে আসিস কেন?'

'আজ্ঞে, পনেরো দিন অন্তর দেখা করি।', ভবনাথ হাসল। 'সেদিন আপনি নিজে রাস্তায় দেখা দিলেন, তাই আর আসিনি।'

'সে কি রে?' ঠাকুর ফোড়ন দিলেন: 'শুধু দর্শনে কি হয়? স্পর্শন, আলাপ, এ সবও চাই।'

তোমাকে দেখব অথচ তোমাকে ধরতে পারব না এ সইব কি করে? তুমি আমার মুখোমুখি বসবে অথচ কথা কইবে না এ যে আমার মরণাধিক যন্ত্রণা। শুধু চোখের উপর চোখ রাখলেই চলবে না, আমার হাতের উপর তোমার হাত রাখো। আর আমার বুকের মধ্যে তোমার পা দুখানি।

কি করে তোমার কৃপা আকর্ষণ করব তাই ভাবি। কায়দা-কানুন কিছুই জানি না, শুধু কর্ম দিয়েছ দুহাত ভরে, তাই করে যাচ্ছি উদয়াস্ত। ক্লান্ত করছি নিজেকে, যদি তোমার দক্ষিণ সমীরের আনন্দটি অহেতুক এসে স্পর্শ করে। যদি তুমি এক-খানি হাত সন্তর্পণে তুলে ধরো। তখন এক হাতে তোমাকে ধরব আরেক হাতে কাজ করব। কখন আবার আরেকখানি হাতও তুলে নেবে। তখন দুহাতে ধরব তোমাকে।

আর কোনো সাধন-ভজন জানি না আমরা। কর্ম আর ক্লান্তি—এই আমাদের সাধন-ভজন।

'ভবনাথ নরেন্দ্রের জুড়ি—দুজনে যেন স্ত্রী-পুরুষ।' বললেন ঠাকুর, 'তাই ভব-নাথকে নরেন্দ্রের কাছে বাসা করতে বললুম। ওরা দুজনেই অরূপের ঘর।'

হরি-নামের মাহাত্ম্যের কথা হচ্ছিল সেদিন। ঠাকুর বললেন, 'যিনি পাপ হরণ করেন তিনিই হরি। হরি ত্রিতাপ হরণ করেন।'

ভবনাথ বললে, 'হরিনামে আমার গা যেন খালি হয়।'

সব অহঙ্কারের পোশাক যেন খুলে দিতে পারি গা থেকে। যেন মা'র কোলে নগ্ন শিশু হয়ে খেলা করতে পারি। অহঙ্কার করছি, কিন্তু এ অহংটি কার? ঠাকুর বললেন, 'মান করাতে একজন সখী বলেছিল, শ্রীমতির অহঙ্কার হয়েছে। বৃন্দে বললে, এ অহং কার? এ তাঁরই অহং। কৃষ্ণগরবে গরবিনী।'

চৈতন্যদেব অবতার হয়ে যেকালে হরিনাম প্রচার করেছিলেন সেকালে এ অবশ্য ভালো—এই বলেও অন্তত লেগে যাক সকলে। যদি চৈতন্যমন্ত্রেও চৈতন্য হয়। রসিকতা করলেন ঠাকুর: 'চাষারা নিমন্ত্রণ খাচ্ছে। তাদের জিগগেস করা হল, তোমরা আমড়ার অম্বল খাবে? তারা বললে, যদি বাবুরা খেয়ে থাকেন তা হলে আমাদের দেবেন। তাঁরা যেকালে খেয়ে গেছেন সেকালে ভালোই হয়েছে।'

'কিন্তু যাই বলো,' বললেন ঠাকুর, 'আমি নরেন্দ্রকে আত্মার স্বরূপ বলে জ্ঞান করি। আর আমি ওর অনুগত।'

অনুগত তো, কী সুরাহা হল নরেন্দ্রের! বাবার মৃত্যুতে জগৎ-সংসার নিবে গেল এক ফুঁয়ে। সৌভাগ্যের ঝাড়-লণ্ঠনটা মৃত্যুর পাথরের উপর ছিঁড়ে পড়ে চুরমার হয়ে গেল। সংসার সরতে-সরতে থমকে দাঁড়াল পাতালের গুহামুখে। ছোট-ছোট ভাই আর মা, পাঁচ-সাতটি আর্ত মুখ তাকিয়ে রয়েছে নরেনের দিকে। বাবা এটর্নি ছিলেন, রেখে যাননি সংস্থান। দুরন্ত আত্মীয় পালন করে-করে নিঃস্ব হয়ে গেছেন। রেখে গেছেন ঋণ। আয়ের ঘরে শস্যহীন মাঠ, ব্যয়ের ঘরে লবণাক্ত বন্যা। সেবার বি-এ দিয়েছে নরেন। কত রঙিন ভাবনার ফোঁড়-সেলাই করে

বিচিত্র করে রেখেছিল জীবনের নক্সা। সব ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। আর সব আচ্ছাদনের আগে গ্রাসাচ্ছাদন। উদরপূরণ না হলে উদার অম্বর অর্থহীন। কিন্তু উদরপূরণের ব্যবস্থা কি! সঞ্চিত টাকা নেই, জমিদারি নেই, কৃপালু আত্মীয়-রক্ষক কেউ নেই আশে-পাশে। চারদিকে শুধু একটা নিস্তৃণ মরুবিস্তার। থাকবার মধ্যে আছে এই নগ্ন পদ আর দৃপ্ত বাহু।

'আর কেউ নেই?' কে যেন জিগগেস করল কানে-কানে।

তুমি আছ? করুণানিধান হয়ে আছ? কে জানে! আছো তো, এত দুঃখ কেন, দারিদ্র্য কেন, কেন এত অপ্রতিকার অবিচার?

পায়ে জুতো নেই, গায়ে একটা আস্ত জামা নেই, চাকরির জন্যে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল। এ আফিস ও আফিস, এ দরজা থেকে ও দরজা। সর্বত্র এক উত্তর। এক নিরুত্তর নিশ্ছিদ্র প্রত্যাখ্যান। হবে না, জায়গা নেই, পথ দেখ। পাথুরে দেয়ালে মাথা ঠুকতে লাগল, ঠেলতে লাগল লৌহদুয়ার। নিশ্চল নিষেধ রয়েছে দাঁড়িয়ে—দুর্ধর্ষ ঔদাসীন্য। এতটুকু টলে না, এতটুকু পথ ছাড়ে না। মধ্যাহ্নের রৌদ্রে কেউ আনে না এতটুকু ছায়া-স্নেহ। রাশি-রাশি নৈরাশ্যের বালুকায় শুধু বৈফল্যের অনাবৃষ্টি।

বন্ধুরা মুখ ঘুরিয়ে নেয়, সুখীরা সহানুভূতি করতে আসে, আর অপরিচিত জনস্রোত ফিরেও তাকায় না। সর্বত্রই একটা নীতিহীন অসামঞ্জস্য। একটা পাগলের খামখেয়াল।

তবে কি তিনি নেই? এই সমস্ত কি একটা দায়িত্বহীন দানবের রচনা?

আর কার কাছে প্রার্থনা করবে? নিজের কাছেই প্রার্থনা করে নরেন। আশ্রয় নেয় আত্মশক্তির তরুতলে। দৃঢ়হস্তে সরিয়ে দেব এ দুর্দিনের যবনিকা। উচ্ছেদ করব এ দুঃখ-দুর্যোগের আবর্জনা। ওঁ সহোঽসি সহং ময়ি ধেহি। ওঁ মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি। তুমি সহনশক্তির ঘনীভূত মূর্তি, আমাকে সহিষ্ণুতা দাও। তুমি অন্যায়ের প্রতি ক্রোধস্বরূপ দণ্ডদাতা, আমাকে অন্যায়ের প্রতি ক্রোধ ও অন্যায়ের প্রতিরোধের শক্তি দাও।

শুধু একটা গাড়োয়ানই বুঝি ডেকে জিগগেস করে। খালি গাড়ি নিয়ে চলেছে রাস্তা দিয়ে। চেনা গাড়োয়ান। বাবা থাকতে কত দিন চড়েছে এ গাড়ি, ভাড়ার উপরে বকশিশ দিয়েছে গাড়োয়ানকে—

'বাবু, আসুন না! কোথায় যাবেন?' ঝুঁকে পড়ে জিগগেস করল গাড়োয়ান।

'পয়সা নেই।'

'তাতে কি! আসুন না! আমি নিয়ে যাব।'

রাজী হয় না নরেন। পায়ের নিচে প্রস্তররুক্ষ পথ পেয়েছি, মাথার উপরে নগ্ন নিষ্ঠুর আকাশ—আমি একাই যেতে পারব দিগন্ত পর্যন্ত।

ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষল গাড়োয়ান। চাবুকের শব্দটা নরেনের বুকে লাগল একটা তীক্ষ্ণ চমকের মতো।

আমি কোচোয়ান হব। একদিন বলেছিল সে বাবাকে। এ মহাজড়বুদ্ধির দেশটাকে নিয়ে যাব রাজসিক কর্মৈশ্বর্যে। সত্ত্বগুণের ধুয়ো ধরে দেশ নেমে যাচ্ছে তমোময় মহাসমুদ্রে। জন্মালস বৈরাগীর লেপ মুড়ি দিয়ে অক্ষম জড়পিণ্ড শুয়ে আছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। পরাবিদ্যার ছলনায় ঢাকতে চাচ্ছে নিজের মূর্খতা। ভণ্ডের দল তপস্যার ভান করে অবিবেক আর অবিচারকে মানছে ধর্ম বলে। নিজের আলস্য আর অসামর্থ্যের দিকে লক্ষ্য নেই, অহোরাত্র অন্যের দোষদর্শন। এ তামসী রাত্রির অবসান ঘটাবো, চতুর্দিকে হানব শুধু চেতনার চাবুক, বেগবীর্যহীন তামসিকতার ঘোড়াকে উজ্জীবিত করব দিবস্পতি ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবায়।

হায়, সঙ্কল্পও বুঝি কল্পনা! নইলে তুচ্ছ একটা চাকরিও জোটাতে পাচ্ছি না এত দিন ধরে! পেট ভরিয়ে খাওয়াতে পাচ্ছি না ভাইগুলোকে। মায়ের মুখের বিষাদ ও ক্লান্তির করুণ রেখাটি অটুট হয়ে রয়েছে।

'এ কি, স্নান করে উঠেই চললি কোথায়?' মা দাঁড়ালেন এসে পথের সামনে: 'খাবি নে?'

চোখ নামাল নরেন। বললে, 'বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্ন আছে।'

মনে-মনে একটু কি আরাম পেলেন ভুবনেশ্বরী? বাড়িতে আজ পর্যাপ্ত আহার নেই সকলের, হাত শূন্য। এমন অদিনে বাইরে কোথাও নিমন্ত্রণ আছে—সেটা শুধু আস্বাদনীয় নয় আরাধনীয়। পথ ছেড়ে দিলেন ভুবনেশ্বরী। শুকনো মুখে বেরিয়ে গেল নরেন। মনে খটকা লাগল। নরেন কি ছলনা করল? তবে কি সে অনশনে থাকবে?

খালি পায়ে রোদে ঘুরে-ঘুরে পায়ের নিচে ফোস্কা পড়েছে। গড়ের মাঠের মনুমেণ্টের নিচে বসেছে বিশ্রাম করতে। হঠাৎ এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। সুখে-শান্তিতে আছে খেয়ে-পরে। সুখে-শান্তিতে আছে বলেই হয়তো ঈশ্বরভক্ত। জানত সব নরেনের কথা। তার ভাগ্যহীন দুঃসময়ের কথা। তার চেষ্টা ও অসাফল্যের কাহিনী। সান্ত্বনা দেবার জন্যে বসল তার পাশটিতে। গান ধরল:

'বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্মনিশ্বাস পবনে—'

'নে, নে, রাখ তোর ব্রহ্মনিশ্বাস।' ক্ষোভে অভিমানে ঝাঁজিয়ে উঠল নরেন: 'যারা খেয়ে-পরে সুখে-সৌভাগ্যে আছে তাদেরই ভালো লাগে ব্রহ্মনিশ্বাস। ইজিচেয়ারে

শুয়ে টানাপাখার হাওয়া খাচ্ছে আর ভাবছে, ব্রহ্মনিশ্বাস খাচ্ছি! আর ক্ষুধার তাড়নায় যার মা-ভাইয়েরা কষ্ট পাচ্ছে, দোরে-দোরে ঘুরে একটা যে চাকরি জোটাতে পাচ্ছে না, তার কাছে আর ব্রহ্মনিশ্বাস নেই, বজ্রনিশ্বাস!'

বন্ধুকে অকারণে আঘাত দিল হয়তো। তা আর কি করবে! পেটে ভাত নেই, বলে কিনা আফিঙের মৌতাত চড়াও। কর্ম জোটে না একটা, বলে কিনা ধর্ম করো।

ঠনঠনের ঈশান মুখুজ্জের বাড়িতে এসেছেন ঠাকুর। সকাল বেলা। মাস্টারমশাই এসে খবর দিলে নরেনকে। বললে, তোমাকে যেতে বলেছেন।

গিয়ে কি হবে! চাকরি জুটিয়ে দেবেন একটা? উপবাসী মা-ভাইয়ের মুখে অন্ন তুলে দেবেন? তবু গেল নরেন। প্রণাম করে ঠাকুরের পাশটিতে এসে বসল।

ঠাকুরের কেমন চিন্তিত ভাব। সব খবর রেখেছেন আদ্যোপান্ত। নরেনের বাড়ির কষ্টে তাই তিনিও বিমর্ষ। হঠাৎ নরেনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'ঈশানকে তোর কথা বলেছি। অনেকের সঙ্গে তার আলাপ আছে। একটা কিছু যোগাড় হয়ে যাবে হয়তো।'

কাষ্ঠ হাসি হাসল নরেন। এমনি কত লোকই কত আশ্বাস দিয়েছে এতদিন। শুধু কৃপাঘন ব্রহ্মনিশ্বাসটিই টের পাওয়া যায়নি।

উপরের ঘরে চলে এসেছেন ঠাকুর। বলছেন মাস্টারকে, 'সংসারে কিছুই নেই। ঈশানের সংসার ভালো তাই—তা না হলে ছেলেরা যদি রাঁড়খোর গাঁজাখোর মাতাল অবাধ্য এই সব হত, কষ্টের একশেষ হত। সকলেরই ঈশ্বরের দিকে মন—বিদ্যার সংসার! এরূপ প্রায় দেখা যায় না। এরূপ দু-চার বাড়ি দেখলাম। নইলে, কেবল ঝগড়া কোঁদল হিংসা—তারপর রোগ শোক দারিদ্র্য। দেখে বললাম, মা, এইবেলা মোড় ফিরিয়ে দাও।' একটু থামলেন ঠাকুর। বললেন, 'এই দেখ না, নরেন্দ্র কি মুশকিলেই পড়েছে! বাপ মারা গেছে, বাড়িতে যেতে পাচ্ছে না, কাজকর্মের এত চেষ্টা করছে, জুটছে না একটাও। এখন কি করে বেড়াচ্ছে ছাখো।' হঠাৎ জনান্তিকে বললেন, 'তুমি আগে অত যেতে, এখন তত যাও না কেন? পরিবারের সঙ্গে বেশি ভাব হয়েছে বুঝি?'

নিচে হঠাৎ গান শোনা গেল। কে গায় রে? কার কণ্ঠস্বর?

এ কি আর চিনতে ভুল হয়? নরেনের গলা। নরেন গান করছে। কী গান করছে? 'বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্মনিশ্বাস পবনে'? না কি 'ওহে ধ্রুবতারা মম হৃদে জ্বলন্ত বিশ্বাস হে'!

কে জানে কী গান! ঠাকুর তাকে গান গাইয়ে ছাড়লেন।

॥ ৯২ ॥

ঈশ্বর কি শুধু কোমলকান্ত পদাবলী? শুধু কি কলিতললিত বংশীস্বর? বিলাস-আলস্যে সুখে-সমৃদ্ধিতে থাকলেই কি বলব তিনি আছেন? তাঁর আবির্ভাব কি শুধু আরামরম্যতায়? কণ্টক-শয়নে তিনি নেই? নেই কি কোপকর্কশ বজ্রবহ্নিতে? তাঁর আশীর্বাদ কি শুধু ধনমান সাফল্য-স্বাচ্ছন্দ্য? এই আঘাত আর অভাব, সংগ্রাম আর ব্যর্থতা—এ কি নয় তাঁর অনুকম্পা? সুখের পেলবতাটুকুই তাঁর স্পর্শ, দুঃখের কাঠিন্যটুকুই আর তাঁর স্পর্শ নয়?

হায়, সুখ হচ্ছে চকিতে একটু ছোঁয়া, দুঃখই হচ্ছে নিবিড় আলিঙ্গন।

যা দেন সব নেব নতশিরে। খরশর হোক, হোক বা পুষ্পবৃষ্টি। জল যেখান থেকেই আসুক, কুম্ভ থেকেই হোক বা কূপ থেকেই হোক, হোক তা খাল-বিলের বা বর্ষা-বাদলের, নেব সব অঞ্জলি ভরে। ঈশ্বর সুখকর নন দুঃখকরও নন, ঈশ্বর কল্যাণকর। নন শুধু শীত-নিবারিণী কন্থা, তিনি আবার হিমরাত্রির অনাবরণ।

তাই ঘুম থেকে উঠে ঈশ্বরের নাম করে নরেন।

পাশের ঘর থেকেই একদিন শুনতে পেলেন ভুবনেশ্বরী। ঝাঁজিয়ে উঠলেন, 'চুপ কর্। ছেলেবেলা থেকেই তো কত ভগবান-ভগবান করলি—ভগবান তো সব করলেন!'

বুকের মধ্যে ধাক্কা খেল নরেন। সর্বংসহা যে মা তিনিও অস্থির হয়েছেন। ভগবান তাঁর কান্নাও কানে নেননি। তবে তাঁকে করুণাময় বলি কি করে? যিনি কল্যাণ করেন তিনি একটু করুণা করতে পারেন না?

পর-দুঃখে কাতর হয়ে তাই বলেছিলেন বিদ্যাসাগর: 'ভগবান যদি দয়াময়ই হবেন তবে দুর্ভিক্ষে লাখ-লাখ লোক দুটি অন্নের জন্যে কেঁদে-কেঁদে মরে কেন?'

ঠিকই বলেছিলেন। যার ব্যবস্থা করবার ক্ষমতা আছে সে যদি এত কান্নায়ও বিচলিত না হয়, তবে কী বলব? হয় বলব তিনি নেই বা তাঁর ব্যবস্থা করবার ক্ষমতা নেই, কিম্বা বলব তিনি নিশ্চেষ্ট নিষ্ঠুর অনাত্মীয়। কেউ নন তিনি আমাদের।

এই প্রশ্ন নিয়েই একদিন সটান গিয়েছিল ঠাকুরের কাছে।

'বলুন ঈশ্বর কিসে দয়াময়? দয়াময় তো, এত দুঃখ কেন দিনে-রাত্রে? যারা নিষ্পাপ-নির্দোষ তাদের কেন এত যন্ত্রণা?'

আয়ত-স্নিগ্ধ চোখে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, বোস পাশটিতে। একটু স্তব্ধ হয়ে তাকা একবার রাতের আকাশের দিকে।

কোথায় রাতের আকাশ! রাতের আকাশের মত রহস্যগভীর যে দুটি চোখ তার দিকে তাকিয়ে রইল নরেন।

হ্যাঁ রে, কী দেখছিস? গুঁড়ো-গুড়ো কাঁচের টুকরোর মত কত তারা ছড়িয়ে রয়েছে আকাশে গুনতে পারিস? কেউ পারে? একথালা সুপারি, গুনতে নারে বেপারী। তেমনি গুনতে পারিস গঙ্গাপারের ক্যাঁকড়া? চেয়ে ছাখ ভালো করে। শর্বরীর নীলাম্বরীতে কুচি-কুচি চুমকি। একটা দুটো নয়, লক্ষ-লক্ষ, হয়তো কোটি-কোটি। তার মধ্যে তোর এই পৃথিবী। হাওয়ায় উড়ে আসা ছোট্ট একটা বালুকণা। সেই পৃথিবীই বা কি কম বড়! হাঁটতে শুরু করলে পথ আর ফুরোয় না একজন্মে। অন্তরীক্ষের প্রেক্ষিতে তোর এ বিশাল পৃথিবীই বা কি। তুচ্ছ একটা কীটাণু। তার মধ্যে আবার তুই! তোর মস্তিষ্ক! তোর হৃৎস্পন্দন!

নরেন মাথা নোয়াল।

হ্যাঁ, নত কর মাথা। কার বিচার করবি তুই, কোন আইনে? সেই বিচারদৃষ্টি কতদূর প্রসারিত করবি? তারপর শেষে আকাশে এসে ঠেকবে না? এই কালো রাত্রির আকাশ? তখন কী বলবি রে নরেন? এতগুলো তারা কেন? কোন ভূতের বাপের পিণ্ডি দিতে? সূর্য-চন্দ্র বুঝি, কিন্তু তারা দিয়ে কি মানুষ ধুয়ে খাবে? কী উত্তর দিবি? যদি বলি ওরা সব চিন্তামণির নাচ-দুয়ারের মণি-মাণিক্য, পারবি মেনে নিতে? বলি, বিচার কতদূর যাবে? শেষে সকল পথ পায়ে হেঁটে দুয়ারে এসে আছড়ে পড়বি! বিচার থা পাবে না।

না পাক, নোয়াব না মাথা। ঈশ্বরের কাছেও না। নিজের পায়ে দাঁড়াব। লড়ব নয় মরব। আকাশটাকে ছিনিয়ে আনব দুহাতে।

পূজার ঘর থেকে বেরিয়ে ছেলের সামনে পড়ে গিয়েছেন ভুবনেশ্বরী। যেন ধরা পড়ে গিয়েছেন। যেন জল খাচ্ছিলেন ডুবে-ডুবে। মুখে ঠাট্টা, অন্তরে কান্না। মুখে রাগ, অন্তরে অনুরাগ!

তাড়াতাড়ি সরে যাচ্ছিলেন ভুবনেশ্বরী। আর কিছুর জন্যে নয়, যে চেলি পরে আহ্নিক করছিলেন সেটা শতছিন্ন হয়ে গিয়েছে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল কথাটা: 'আমাকে একখানা চেলি বা গরদের কাপড় কিনে দিতে পারিস? এটা পরে আর পারা যায় না।'

মাথা হেঁট করল নরেন। কোথায় পাবে সে চেলি-গরদ? সে বেকার, উদয়াস্ত ভূতের বেগার খাটছে। কোথায় পাবে সে পট্টবস্ত্রের পয়সা? লজ্জা মা পাবে কেন, লজ্জা পেল ছেলে। মা'র সমুখ থেকে চলে গেল ম্লানমুখে।

সেইদিনই বিকানির থেকে এক মাড়োয়ারি এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। সঙ্গে মিছরির থালা তার উপরে একখানা গরদের কাপড়। দেখে ঠাকুরের বড় খুশি-খুশি ভাব। ডুমো-ডুমো মিছরি দিয়ে ভর্তি-করা গরদ-ঢাকা থালা নামিয়ে প্রণাম করল মাড়োয়ারি।

দু দিন পরে নরেন এসে হাজির। যাকে মানে না সেই আবার টানে। যারে নিন্দে তারেই বন্দে।

'শোন, কাছে আয়—' নরেনকে ডাকলেন ঠাকুর।

নরেন কাছে এল। দাঁড়িয়ে রইল, বসল না।

'শোন, এই মিছরির থালা আর গরদখানা তুই নিয়ে যা—'

উচ্চশব্দে হেসে উঠল নরেন! পরবার নেংটি নেই দরবারে যেতে চায়! মিছরি দিয়ে আমি কী করব? আমি কি ছোট ছেলে যে মিষ্টি দিয়ে ভোলাবেন? আর গরদ—

'গরদখানা তোর মাকে নিয়ে দে গে। তার আহ্নিক করবার চেলি ছিঁড়ে গিয়েছে। সে এ গরদ পরে আহ্নিক করবে।'

বুকের মধ্যে ধ্বক করে উঠল নরেনের। তা আপনি কি করে জানলেন? আপনাকে বললে কে?

'ওরে আমি জানতে পাই। উৎসটি ঠিক থাকলে ধ্বনিটি ঠিক আমার কানে লাগে। দ্রৌপদী বস্ত্রহরণের সময় এক হাতে নিজের কাপড় ধরে আরেক হাত তুলে ডাকছিল কৃষ্ণকে। প্রথম-প্রথম শত কান্নায়ও কৃষ্ণ সাড়া দেয়নি। কিন্তু দ্রৌপদী যখন দু হাত তুলে দিলে, ছেড়ে দিলে, তখনই বস্ত্রভার কাঁধে নিয়ে দাঁড়ালেন শ্রীকৃষ্ণ। যোগক্ষেম বহন করে নিয়ে এলেন। তেমনি যে দু হাত ছেড়ে দিয়ে ডাকে, তাকে তুলে নেন ভগবান। তার ডাকটি ঠিক।

'শোন, নিয়ে যা গরদখানা। তোর নিজের জন্যে বলছি না, তোর মা'র জন্যে।'

'মা'র জন্যে আপনার কাছে ভিক্ষে করতে যাব কেন?'

'ভিক্ষে?'

'তা ছাড়া আবার কি! মা আমার কাছে চেয়েছেন। আমাকে বলেছেন কিনে দিতে। যখন উপার্জন করতে পারব তখন কিনে দেব। আপনার কাছ থেকে ভিক্ষে করে নেব কেন?'

নরেনের তেজ দেখে প্রসন্নবয়ানে হাসতে লাগলেন ঠাকুর। বললেন, 'এ না হলে নরেন! আমরা হলুম নর আর তুই যে নরের ইন্দ্র।'

কিছুতেই নিল না নরেন। গরদের কাপড় মা'র কত দরকার, আকস্মিক ভাবে পেয়ে গেলে কত খুশি হতেন—তা জেনেও টলল না একচুল। মা আমার কাছে চেয়েছেন, আমি রোজগার করে তা কিনে দেব। কিন্তু হাত পেতে ভিক্ষে নিতে যাব কেন? না, কিছুতেই ভিক্ষে করব না। স্বয়ং ভগবানের কাছেও নয়।

নরেন চলে গেলে ডাকলেন রামলালকে। বললেন, তোকে একটা কাজ করতে হবে রামনেলো!

কি কাজ?

'কাল শিগ্‌গির করে খেয়ে নিয়ে চলে যাবি কলকাতায়। সেই শিমলেয় লরেনের বাড়িতে। বাইরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে যখন বুঝবি লরেন বাড়িতে নেই, সটান চলে যাবি তার মা'র কাছে। ঠিক তার মা'র হাতে এই গরদখানা আর এই মিছরির থালা পৌঁছে দিয়ে আসবি। বুঝলি? বলবি, আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। কি, পারবি তো?'

পারব।

'দেখিস বাইরে থেকে যেন ডাকাডাকি করিসনে।' নরেনকে যেন কত ভয় ঠাকুরের। 'দেখিস অন্যের হাতে গিয়ে যেন পড়ে না। লরেন টের পেলে দরজা বন্ধ করে দেবে।'

কিন্তু ঠাকুর যখন নিজে নরেনকে খুঁজতে আসেন, বাড়ির ভিতর ঢোকেন না। বাইরে থেকে বলেন, 'লরেন কোথায়, লরেনকে ডেকে দাও।' কিন্তু রামলালের জন্যে অন্য ব্যবস্থা। তাকে তাগ বুঝে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে হবে। ঢুকতে হবে নরেনের দৃষ্টি এড়িয়ে।

চাদরের তলায় থালা আর কাপড় লুকিয়ে গ্যাসপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে আছে রামলাল। গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীটের তিন নম্বর বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে। দুপুরের রোদ উঠে এসেছে মাথার উপর। চারদিক ঝাঁ-ঝাঁ করছে। কখন না-জানি নরেন বেরোয় বাড়ি থেকে। তার দৈনন্দিন চক্রাবর্তে।

কি হল? নরেন আজ আর বেরুবে না নাকি?

না, ঐ বেরুচ্ছে। খুলেছে সদর দরজা। মলিন চাদরখানা গায়ে ফেলে চলেছে পথ দিয়ে। অমনি ঐ ফাঁকে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে রামলাল। একেবারে ভুবনেশ্বরীর দরবারে।

'আপনাকে এই মিছরির থালা আর গরদের কাপড় পাঠিয়ে দিলেন ঠাকুর।'

গরদের কাপড়! পাঠিয়ে দিলেন লোক দিয়ে! হাসলেন ভুবনেশ্বরী। কি করে জানলেন তিনি? তিনি কি দূরের ভাষা শুনতে পান? শুনতে পান মনের মৌন? বললেন, 'এইখানে কি কথা হল বিলের সঙ্গে, তাই দক্ষিণেশ্বরে অমনি টেলিগ্রাম হয়ে গেল?'

কেন হবে না? তিনি খুব কানখড়কে। সব শুনতে পান। যত ডেকেছ যত কেঁদেছ সব শুনেছেন। শুধু কথাটিই শোনেন না, বলতে না পারার ব্যথাটিও শোনেন। এক মুসলমান নমাজের সময় হো আল্লা হো আল্লা বলে খুব চেঁচিয়ে ডাকছিল। একজন তার চীৎকার শুনে বললে, তুই অত চেঁচাচ্ছিস কেন? তিনি যে পিঁপড়ের পায়ে নূপুর শুনতে পান। শুনতে পান তোর অস্ফুটতম দীর্ঘনিশ্বাস।

নরেন বাড়ি ফিরে এসে দেখল মা গরদের কাপড় পরে বসে আছেন পূজার ঘরে। এ কে ওস্তাদ বীণকার! সব সুরের রাগিণীই যেন জানেন খেলতে। কখনো আঘাতে কখনো আনন্দে, কখনো কড়িতে কখনো কোমলে। শুধু তার বাঁধা সুর বাঁধার মুখেই যন্ত্রণা। এই বুঝি ছিঁড়ে গেল তার, শুরু হল বেসুরের আর্তনাদ। বিচ্ছিন্ন তারের ঝঙ্কারকে কবে নিয়ে যেতে পারব একটি সঙ্গীতের সমগ্রতায়? পৃথক-পৃথক জিজ্ঞাসাকে গ্রথিত করতে পারব একটি মহাবিশ্বাসের মূলসূত্রে? যত দিন তা না পারি তত দিন হাজরার কাছে গিয়ে বসি।

দক্ষিণেশ্বরে বসে জপ করে হাজরা। তারই মধ্যে আবার দালালির চেষ্টা করে। বাড়িতে ক'হাজার টাকা দেনা আছে তা শোধবার ফিকির খোঁজে। জপ করে তার বেজায় অহঙ্কার। রাঁধুনে বামুনদের কথায় বলে, ওদের সঙ্গে কি আমরা কথা কই? শোনো কথা! রাঁধুনে বামুনরা যেন আর মানুষ নয়!

শ্রীরামপুর থেকে একটি গোসাঁই এসেছে সেদিন। ইচ্ছে দু-এক রাত্তির থেকে যায় দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর তাকে যত্ন করে থাকতে বললেন। কিন্তু হাজরা ঝামটা মেরে উঠল। বললে, 'এ ঘরে নয়, ওকে খাজাঞ্চির ঘরে পাঠিয়ে দাও।'

মানেটা বুঝতে পেরেছেন ঠাকুর। মানেটা আর কিছুই নয়, এখানে থাকলে পাছে হাজরার দুধ-মিষ্টিতে ভাগ বসায়। যদি তার বরাদ্দে কিছু টান পড়ে। এত হিসেবী এত স্বার্থপর! ঠাকুর ঝলসে উঠলেন, 'তবে রে শালা! গোসাঁই বলে আমি ওর কাছে সাষ্টাঙ্গ হই, আর সংসারে কামিনীকাঞ্চন নিয়ে নানা কাণ্ড করে—এখন একটু জপ-তপ করে তোর এত অহঙ্কার হয়েছে! লজ্জা করে না?'

লজ্জা করবে কি! জটিল-কুটিল না হলে লীলারস জমবে কি করে?

কিন্তু নরেন বলে, 'হাজরা খুব ভালো লোক।'

'তুমও একদিন বলবে, আমি বলে রাখছি।' হাজরা লক্ষ্য করে ঠাকুরকে: 'এখন

আমাকে তোমার ভালো লাগছে না, কিন্তু দেখো, পরে আমাকে তোমার খুঁজতে হবে।'

আমি হচ্ছি সংশয়। আমি হচ্ছি স্বার্থপরতা। আমি হচ্ছি ব্যবসাবুদ্ধি। সংশয় ছাড়া প্রত্যয়ের দাম কোথায়? স্বার্থপরতা না থাকলে কোথায় থাকবে আত্মত্যাগের মহিমা? ব্যবসাবুদ্ধিতে শেষ পর্যন্ত কুলোবে না বলেই তো শরণাগতির শান্তিজল। থেকে-থেকে রসিকতা করে। সত্ত্বগুণের রঙ শাদা, রজোগুণের লাল, তমোগুণের কালো। সত্ত্বগুণ ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়, রজ তম ঈশ্বর থেকে তফাত করে। হাজরাকে জিগগেস করলেন ঠাকুর: 'বলো তো, কার কত সত্ত্বগুণ হয়েছে?'

'নরেনের ষোলো আনা।' নির্লিপ্ত মুখে বললো হাজরা। 'আমার এক টাকা দুই আনা।'

'বলো কি? আর আমার?'

'তোমার এখনো লালচে মারছে—তোমার বারো আনা।'

বাইরের বারান্দায় হাজরার কাছে গিয়ে বসেছে নরেন। হাজরাও অভাবী লোক, জীবিকার্জনের জন্যে সংগ্রাম করে, আবার সেই সঙ্গে নিবিষ্ট নিষ্ঠায় জপধ্যান করে, তারই জন্যে বোধ হয় পক্ষপাত। কিন্তু বেশিক্ষণ ঠাকুরকে না দেখেও থাকা যায় না। বারান্দা ছেড়ে ঘরের মধ্যে এসে বসল নরেন।

'তুই বুঝি হাজরার কাছে বসেছিলি?' বললেন ঠাকুর, 'আহা, তুই বিদেশিনী, সে বিরহিণী। হাজরারও দেড় হাজার টাকার দরকার।'

সবাই হেসে উঠল।

'হাসলে কি হবে? আমি তাকে বলি, তুমি শুধু বিচার করো তাই তুমি শুষ্ক। সে বলে, আমি সৌরসুধা পান করি, তাই শুষ্ক। যদি শুদ্ধা ভক্তির কথা বলি, যদি বলি শুদ্ধ ভক্ত টাকাকড়ি কিছু চায় না, সে বিরক্ত হয়, বলে, কৃপাবন্যা এলে নদী তো উপচে যাবেই খাল ডোবাও পূর্ণ হবে। শুদ্ধা ভক্তিও হয়, আবার ষড়ৈশ্বর্যও হয়, টাকাকড়িও হয়। কি হয় না হয় কে বলবে?'

কৃপাবৃষ্টি অজস্র ধারায় ঝরে পড়ছে দিবানিশি। সেই বৃষ্টির জল ধরি তেমন পাত্রই এখনো হতে পারছি না। কিন্তু আমি যদি তোমার কৃপাপাত্র না হই, তবে আর কোথায় পাবে তোমার কৃপার পাত্র?

নরেন অন্য কথা পাড়ল। বললে, 'গিরিশ ঘোষের সঙ্গে আলাপ হল। আপনার কথা হচ্ছিল—'

'কি কথা?' একটু বোধ হয় কৌতূহলী হলেন ঠাকুর।

'এই আপনি কিচ্ছু লেখাপড়া জানেন না—আমরা সব পণ্ডিত, এই সব কথা।'

'তা তো ঠিকই বলছিলি। আমি শুধু সার কথা জেনে নিয়েছি। বেদান্তের সার, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা; আর গীতার সার ত্যাগী। আর বই পড়ে কি হবে? জানবার পর এখন শুধু সাধন-ভজন। সর্ষে পিষে তেল, মেদিপাতা বেটে রঙ আর কাঠ ঘষে আগুন বের করো।'

আর এক দিন তর্কের মুখে বলেছিল নরেন: 'তুমি দর্শনশাস্ত্রের কী জানো? তুমি তো একটা মুখ্খু।'

সেবার ঠাকুর করেছিলেন রসিকতা। বলেছিলেন, 'নরেন আমাকে যত মুখ্খু বলে আমি তত মুখ্খু নই।' বাঁ হাতের চেটোতে ডান হাতের আঙুল দিয়ে লিখে দেখিয়ে দিয়েছিলেন: 'আমি অক্ষর জানি।'

ঠাকুরের ইচ্ছে নরেন একখানা গান গায়। মাস্টারকে বললেন তানপুরাটা পেড়ে দিতে।

নরেন বাঁধতে লাগল তানপুরা।

বাঁধা আর শেষই হয় না। বিনোদ বললে, 'বাঁধা আজ হবে, গান আরেক দিন হবে।'

আর সকলের সঙ্গে ঠাকুরও হেসে উঠলেন। বললেন, 'ইচ্ছে করছে তানপুরাটা ভেঙে ফেলি। কি টং-টং শুরু হয়েছে—তারপর আবার তানা নানা নেরে সুম হবে।'

'যাত্রার গোড়ায় অমনি বিরক্ত হয়।' ফোড়ন দিলে ভবনাথ।

নরেন ঝলসে উঠল: 'সে না বুঝলেই হয়।'

সদানন্দ ঠাকুর প্রসন্ন স্নেহে বলে উঠলেন, 'ঐ! আমাদের সব উড়িয়ে দিলে।'

॥ ৯৩ ॥

দারিদ্র্যের রন্ধ্র দিয়ে উঁকি দিতে চাইল অবিদ্যা। নানা ভাবে কি পরীক্ষা করে নেবে না? তুমি কি স্ফটিক দিয়ে তৈরি, না ইস্পাত দিয়ে। পরীক্ষায় না ফেলে কি করে বুঝব তুমি দুর্বাসনারজ্জু নারীকে প্রত্যাহার করতে পেরেছ?

একটি সুন্দরী মেয়ের নজর ছিল নরেনের উপর। শুধু সুন্দরী নয়, ধনিনী। ভাবলে, তার এই দুর্যোগের সুযোগে টোপ ফেলি। গোপনে প্রস্তাব করে পাঠাল, সভূমিভুষণা আমাকে গ্রহণ করো। শুধু দারিদ্র্যমোচন হবে না, নিঃসঙ্গতার অবসান হবে। রুক্ষবেশ ছেড়ে ধরো এবার রাজবেশ।

ধ্যান ভেঙে মুনিরা তপস্যার ফল বিসর্জন দিয়েছে নারীর পায়ে। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ ও-সব মুনি-ঋষির চেয়ে দৃঢ়ব্রত।

প্রথমটা অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে নিল নরেন। মেয়েটা তবু ফেরে না। শেষে কাঁদতে শুরু করল। ভাবলে নারীর বল, চোখের জল। ছলনাজাল গুটিয়ে বিস্তার করলে শোকজাল। যদি এবার একটু বিগলিত হয় সেই পাষাণপিণ্ড।

কিন্তু পাষাণের চেয়েও কঠোর নরেন্দ্রনাথ। ধ্রুব, নিবিচল। তার শুধু এক প্রার্থনা: 'ব্রতপতে, ব্রতং চরিষ্যামি, সত্যং উপৈমি অনৃতাৎ।' হে ব্রতপতি, যে দীক্ষা দিয়েছ তাই আমাকে রক্ষা করুক। মিথ্যা থেকে দূরে থেকে যেন সত্যেই শরণাগত থাকি। আর কাউকে চিনি না তুমিই শক্তি দাও। সাহস দাও।

সেই রজনীরঞ্জিনী দুঃখশৃঙ্খলা নারী চলে গেল দুয়ার থেকে।

কিন্তু এবার যে এল প্রলুব্ধ করতে, সে বারবধূ। সে জলন্ত দুষ্কৃতাগ্নিশিখা। গুরুকে এসেছিল পরখ করতে, শিষ্যকে একবার দেখবে না বাজিয়ে?

আগে বীর্যলাভ, পরে ব্রহ্মলাভ। আগে বীর্যানন্দ, পরে ব্রহ্মানন্দ।

বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে বাগানবাড়িতে গিয়েছে নরেন। কি অমন দারিদ্র্যদুঃখে ম্লান হয়ে আছিস। চল ফুর্তি করবি চল। 'ন পুণ্যং সুখতঃ পরং।' সুখের চেয়ে আর পুণ্য নেই। দু চোঁক খেলেই দেখবি সমস্ত জগৎসংসার একটা রঙিন ফানুস হয়ে উড়ে চলেছে।

রাজী হয়নি প্রথমে। সে কি কথা, তুই না গেলে গান গাইবে কে? ফুর্তির মুখে হরিনাম—যেন মুড়ির সঙ্গে ফুটকড়াই। যেমন ভোজন তেমন দক্ষিণা। চল চল, মনমরা হয়ে বসে থাকিস নে মুখ গুঁজে।

গান গাইবে এই শুধু জানে নরেন। কিন্তু এ কাকে পাঠিয়ে দিয়েছে বন্ধুরা? মাংসপাঞ্চালীকায়া শৃঙ্গারবেশাঢ্যা রমণী। নববিহঙ্গের বন্ধনরাগুরা।

বুঝল এও এক মহামায়ার খেলা। বিচলিত হল না। বিমোহিত হল না। শুধু জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম কি?'

স্ফুরৎসকিতচক্ষে তাকাল একবার মোহিনী। উত্তর দিল না।

'তোমার বাবার নাম কি? বাড়ি কোথায়? কেন পা বাড়ালে এ পথে?'

আবার কটাক্ষগর্ভ নেত্রপাত। আবার স্তব্ধতা।

'নিজের কথা একবার ভাবো? ভবিষ্যতের কথা? কি হবে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? নিত্য ভিক্ষায় তনুরক্ষাই সাধনা। কিন্তু যখন ভিক্ষে আর মিলবে না?'

অপাঙ্গবীক্ষণ নেই আর মোহিনীর। চোখের দৃষ্টি এবার স্থির হয়েছে, শান্ত হয়েছে। ভরে উঠেছে তাতে হতাশার কুয়াশা, লজ্জায় আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে!

'যখন থাকবে না এই শরীর? কি সম্বল নিয়ে যাবে তুমি ওপারে?'

এবার বুঝি দিগদর্শন হল মেয়েটির। দেখল চারদিকে শুধু ধু-ধু করছে মরুভূমি।

কোথাও এতটুকু পিপাসার জল নেই, নেই অনুতাপের অশ্রুলেখা।

দ্রুতপায়ে চলে গেল। বললে গিয়ে বন্ধুদের, 'অমন লোকের কাছে পাঠাতে আছে আমাকে?'

ঠাকুর নরেনকে বলেন, শুকদেব।

তাই শুনে বিশ্বনাথ দত্ত ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'ব্যাসদেবের ব্যাটা শুকদেব।'

কায়েতে এক দিন পথ হারিয়ে ফেলেছেন বিবেকানন্দ। সঙ্গীদের সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা বলতে-বলতে। সঙ্গী সঙ্গীক ফাদার লয়সন, শিকাগোর মিস ম্যাকলিয়ড আর সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা এম্মা ক্যালভি। পথ হারিয়ে চলে এসেছেন একটা নোংরা গলির মধ্যে।

দুদিকে সার-সার ঘর, দরজা-জানলা খোলা। সেই সব জানলা আর দরজার সামনে অর্ধনগ্ন নারীর দল বসে আছে দেহের বেসাতি সাজিয়ে। কিছু লক্ষ্য করেননি স্বামীজী, ঈশ্বরোন্মাদনার আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে আছেন। চারদিকে শুধু ঈশ্বরপ্রতিভাস।

কিন্তু তাঁর লক্ষ্য না ফিরিয়ে ছাড়বে না মেয়েগুলো। কে একটা মুখরা মেয়ে তাঁকে ডাকতে লাগল হেসে হেসে। দেহে যৌবনের এমন দিব্যশোভা নিয়ে কোথায় তুমি চলে যাচ্ছ, উদাসীন!

সঙ্গীরা ব্যস্ত হয়ে উঠল। কি করে অবিলম্বে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবে স্বামীজীকে তার জন্যে তাড়া দিতে লাগল। কিন্তু সহসা বিবেকানন্দ দল ছেড়ে সেই পণ্যাঙ্গনাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'কি করেছ! নিজেদের দেবীত্বকে ঢেকেছ এ কোন সৌন্দর্যসজ্জায়! আত্মস্বরূপকে দেখ, দেখ সেই দেবীবৈভব! এ করেছ কি!' বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন। রূপাজীবাদের সামনে দাঁড়িয়ে যেমন কেঁদেছিলেন যীশুখৃষ্ট।

মেয়েগুলির মুখে আর কথা নেই। একজন এগিয়ে এসে স্বামীজীর গৈরিক বাসের এক প্রান্ত স্পর্শ করল, সেই প্রান্তভাগ চুম্বন করে ভাঙা-ভাঙা স্পেনী ভাষায় বলতে লাগল, 'হোমব্রি ডে ডিওস, হোমব্রি ডে ডিওস—দেব-মানব, দেব-মানব।' আরেকজন চোখ ঢাকল দুহাতে। স্বামীজীর সেই চক্ষুস্থটা যেন সে সইতে পারছে না। তার পাপলিপ্ত আত্মা যেন সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে।

চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল বকে গিয়েছে নরেন্দ্রনাথ, নাস্তিক হয়ে গিয়েছে। মদ আর তার অনুষঙ্গ কিছুতেই তার অরুচি নেই। কেউ যদি এ প্রশ্ন নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ায়, কি উত্তর পেলে সে সুখী হবে বুঝতে পেরে নরেন বলে, 'বেশ বলেছি। যদি কেউ বুঝে থাকে ও-সব ক্ষণিক সুখভোগেই সাংসারিক দুঃখ-কষ্ট

ভুলে থাকা যায়, তবে তাকে তা বুঝতে দিতে আপত্তি কি? যাও, সরে পড়ো, যত পারো নিন্দা করো মনের সুখে। নিন্দা করে আনন্দিত হও।'

কথা কানে হাঁটে। দেয়ালে শোনে। বাতাসে লেখা হয়ে যায়।

দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের কানে উঠল। তাও আবার কানে এল নরেনের। তবে আর কি, ঠাকুরও এবার বিশ্বাস করুন তাঁর নরেন মন্দিরের দ্বার ছেড়ে চলে এসেছে নরকের দরজায়! তাঁর সেই বৃহদ্‌ব্রতধর ব্রহ্মতেজা নরেন!

ভবনাথ তো একেবারে কেঁদে পড়ল ঠাকুরের পায়ে।

'নরেনের এমন হবে এ কথা স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবিনি।'

ঠাকুর পা ছাড়িয়ে নিলেন। বললেন, 'দূর শালারা, চুপ কর। আমার মা'র কথার চেয়ে তোদের কথা বড় হবে? আমার মা বলে দিয়েছেন, সে কখনো ও রকম হতে পারে না, তার জীবনে যোষিৎসঙ্গ হবে না কোনোদিন। তার জন্যে ভাবতে হবে না তোদের। ফের যদি ও কথা বলিস তোদের মুখ-দর্শন করব না।'

কথা শুনে আনন্দে বুক ভরে গেল নরেনের। সত্যদর্শী অন্তর্যামী ঠিক দেখতে পেয়েছেন তার অন্তরের মানচিত্র। তিনিই তাকে রক্ষা করবেন আমরণ।

কেউ যদি কখনো বলে, সে কি মশাই, এ তো নরেনও বলে, তখন ঝলসে ওঠেন ঠাকুর: 'এ তো লরেন বলে! লরেন বলতে পারে, তা বলে তুই বলতে যাসনি। তুই আর লরেন এক না।'

'আপনি নরেনকে এত ভালবাসেন কেন? নিজের ছোট হুঁকোয় করে নরেনকে তামাক খেতে দিলেন, হুঁকোটা যে এঁটো হয়ে গেল!' আরেকজন কে নালিশ করলে ঠাকুরের কাছে: 'ও যে হোটেলে খায়। ওর এঁটো কি খেতে আছে?'

'ওরে শালা তোর কি রে? নরেন হোটেলে খাক বা নাই খাক, তাতে তোর কি? তুই শালা যদি হবিষ্যিও খাস আর নরেন যদি হোটেলে খায়, তা হলেও তুই নরেন হতে পারবি নে।'

কেবল নরেন আর নরেন! নরেন যে আপনাকে গাল দেয় তার হিসেব রাখেন?

'নরেন আমাকে গাল দেয়, কিন্তু আমার ভিতর যে শক্তি আছে তাকে সে মানে, তাকে সে গাল দেয় না।'

সে আশ্চর্য শক্তিই বরাবর রক্ষা করে এসেছে নরেনকে। সে শক্তিই তো ত্রৈলোক্য-কর্ষিণী বংশীধ্বনি। নিরন্তর বেজে চলেছে বাতাসপ্রবাহে। শোণিতপ্রবাহে। আমেরিকাতে একবার একটি মেয়েকে দেখে খুব সুন্দরী বলে মনে হয়েছিল স্বামীজীর। কোনো মন্দ ভাব থেকে নয়, অমনি। ইচ্ছে হয়েছিল আরেকবার দেখি। দেখা হল আরেকবার। কোথায় সুন্দরী! দেখলেন একটা বাঁদরের মুখ।

স্বপ্নে কখনো স্ত্রীলোক দেখেননি স্বামীজী। একবার কিন্তু দেখে ফেললেন। একটি স্ত্রীলোক মাথায় ঘোমটা দিয়ে বসে আছে। ইচ্ছে হল ঘোমটা খুলে মুখখানি দেখি। যাই ঘোমটা খোলা, অমনি দেখেন ঠাকুর!

'অন্যেরা কলসী বাটি, নরেন্দ্র জালা; অন্যেরা ডোবা পুষ্করিণী, নরেন্দ্র বড় দীঘি, যেমন হালদারপুকুর। মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙা চক্ষু বড় রুই, আর এরা সব পোনা, মৃগেল, কাঠিবাটা।' বলছেন ঠাকুর, 'নরেন্দ্র পুরুষ, গাড়িতে তাই ডানদিকে বসে। আর ভবনাথের মেদি ভাব, ওকে তাই অন্য দিকে বসতে দিই।' ওর বিষয়ে নালিশ করতে আসিসনে। ওকে আমার তামাক সাজতে পর্যন্ত দিই না, দিই না শৌচের জল বইতে। ও সব কাজের জন্যে অন্য লোক আছে। তোরা আছিস।

'আমি নরেন্দ্রকে বলেছিলুম—'

'কে নরেন্দ্র?' জিগগেস করলে প্রতাপ মজুমদার।

'ও আছে একটি ছোকরা।' বলতে লাগলেন ঠাকুর: 'আমি নরেন্দ্রকে বলেছিলুম, ত্থাথ, ঈশ্বর রসের সাগর। তোর ইচ্ছে হয় না কি, এই রসের সাগরে ডুব দিই! আচ্ছা, মনে কর এক খুলি রস আছে, আর তুই মাছি হয়েছিস। তা হলে তুই কোনখানে বসে রস খাবি? নরেন্দ্র বললে, আমি খুলির কিনারায় বসে মুখ বাড়িয়ে খাব। কেন, কিনারায় বসবি কেন? সে বললে, বেশি দূরে গেলে ডুবে যাব আর প্রাণ হারাব। তখন আমি বললুম, বাবা, সচ্চিদানন্দ সাগরে সে ভয় নেই। এ যে অমৃতের সাগর, ঐ সাগরে ডুব দিলে মৃত্যু হয় না, মানুষ অমর হয়। ঈশ্বরেতে পাগল হলে মানুষ বেহেড হয় না।'

দুটোর একটা করো। হয় পাগলামি ছেড়ে দাও, নয় তো ঈশ্বরের নামে পাগল হও।

নববৃন্দাবন প্লে হচ্ছে কেশব সেনের বাড়িতে। নরেন শিব সেজেছে। ঠাকুর দেখতে গিয়েছেন। অভিনয়ের মধ্যেই ঠাকুর বলে উঠলেন, 'নরেনকে নেমে আসতে বলো। হ্যাঁ, ঐ বেশেই নেমে আসুক আমার সামনে। চোখের সমুখে দাঁড়াক একবার স্থির হয়ে, শিব হয়ে।'

নরেন ইতস্তত করছে। কেশব বললে, 'উনি যখন বলছেন তখন এস না নেমে।'

কে নামে, কে ওঠে!

নরেন অবতার মানে না, তাতে কি এসে যায়! এতে যেন আরো উথলে উঠেছে ঠাকুরের ভালোবাসা। নরেনের গায়ে হাত দিয়ে বলছেন, 'মান করলি তো করলি, আমরাও তোর মানে আছি রাই।'

ওরে, কতক্ষণ বিচার? নিমন্ত্রণ বাড়ির শব্দ কতক্ষণ শোনা যায়? যতক্ষণ লোকে খেতে না বসে। যাই লুচি-তরকারি পড়ে, বারো আনা শব্দ কমে যায়। অন্যান্য খাবার পড়লে আরো কমতে থাকে। দই পড়লে তখন কেবল সুপশাপ। খাওয়া হয়ে গেলে নিদ্রা। তেমনি ঈশ্বরকে যত লাভ হবে ততই বিচার কমবে। তাঁকে লাভ হলে, ক্ষুন্নিবৃত্তি হলে আর শব্দ বা বিচার থাকবে না। তখন শুধু নিদ্রা —সমাধি।

নরেনের গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন, মুখে হাত দিয়ে আদর করছেন আর বলছেন, 'হরি ওঁ! হরি ওঁ! হরি ওঁ!'

ক্রমশ বহির্জগতের হুঁশ চলে যাচ্ছে। একেই বুঝি বলে অর্ধবাহ্যদশা, যা শ্রীগৌরাঙ্গের হত। আশ্চর্য, এখনো নরেনের পায়ের উপর হাত, যেন ছল করে নারায়ণের পা টিপছেন। অত গা টেপা পা টেপা কেন? কেন কে বলবে! এ কি নারায়ণের পদসেবা, না শক্তিসঞ্চার!

তারপর হাত জোড় করে বলছেন, 'একটা গান গা। নইলে উঠতে পারব কেমন করে? গোরাপ্রেমে গর্গর মাতোয়ারা।' বলেই নিজে গান ধরছেন: 'দেখিস রাই, যমুনায় যে পড়ে যাবি! সখি, সে বন কতদূর। যে বনে আমার শ্যামসুন্দর। ঐ যে কৃষ্ণগন্ধ পাওয়া যায়। আমি যে চলতে নারি—' উঠতে চেয়েই আবার বসে পড়ছেন। বলছেন, 'ঐ একটা আলো আসছে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু কোন দিক দিয়ে যে আসছে আমাকে কে বলে দেবে! ধর একটা গান ধর—'

নরেন গান ধরল:

'সব দুঃখ দূর করিলে দরশন দিয়ে
সপ্ত লোক ভোলে শোক, তোমারে পাইয়ে—
কোথায় আমি অতি দীনহীন!'

ঠাকুরের নেত্র নিমীলিত। দেহ স্পন্দহীন। সমাধিস্থ।

সমাধিভঙ্গের পর বলছেন বিহ্বল কণ্ঠে, 'আমাকে কে লয়ে যাবে!' দিশাহারা বালক যেমন অন্ধকার দেখে তেমনি।

'কে যায় অমৃতধামযাত্রী, আজি এ গহন তিমির রাত্রি, কাঁপে নভ জয় গানে।'

boiRboi.net

১৪

কেশবের খুব অসুখ। দেখতে এসেছেন ঠাকুর।

আগেরবার যখন অসুখ হয় তখন কালীর কাছে ডাব-চিনি মেনেছিলেন। বলেছিলেন, মা, কেশবের যদি কিছু হয়, তাহলে কলকাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কইব?

এবার অসুখ কিছু বাড়াবাড়ি। এমনিতে কতবার গিয়েছে দক্ষিণেশ্বরে। শেষ দিকে, একেবারে শুধু গায়ে। ফল হাতে করে। এখন একেবারে বিছানা নিয়েছে।

'দেখ কেশব কত পণ্ডিত। ইংরিজিতে লেকচার দেয়, কত লোক তাকে মানে, স্বয়ং কুইন ভিক্টোরিয়া তার সঙ্গে বসে কথা কয়েছে।' বলছেন ঠাকুর ভক্তদের। 'কিন্তু এখানে যখন আসে, শুধু-গায়ে। সাধুদর্শন করতে হলে হাতে কিছু আনতে হয়, তাই ফল হাতে করে আসে। একেবারে অভিমানশূন্য।'

একদিন এসে কথায়-কথায় রাত দশটা বেজে গিয়েছে। প্রতাপ মজুমদার বললে, আজ সব থেকে যাব এখানে। বাড়ি ফিরে আর কাজ নেই।

'না, না, আমার কাজ আছে। আমার যেতে হবে।' কেশব ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'এই যে সেই মেছুনীর মত করলে।' ঠাকুর হেসে উঠলেন: 'আঁস-চুপড়ি গন্ধ না হলে বুঝি আর ঘুম হয় না? এক মেছুনী মালিনীর বাড়িতে অতিথ হয়েছে। মাছ বিক্রি করে আসছে, তাই হাতে চুপড়ি। মালিনী তাকে ফুলের ঘরে শুতে দিয়েছে। কিন্তু অনেক রাত হয়ে গেল, কিছুতেই তার ঘুম আসছে না। কি গো, ছট্‌ফট করছ কেন? জিগগেস করলে মালিনী। কে জানে বাবু, বুঝি এই ফুলের গন্ধে ঘুম আসছে না। মেছুনী মিনতি করল, আমার আঁস-চুপড়িটা আনিয়ে দিতে পারো? তাই আনিয়ে দিল মালিনী। তখন আঁস-চুপড়িতে জল ছিটে দিয়ে নাকের কাছে রেখে মেছুনী ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমুতে লাগল।'

গল্প শুনে কেশব আর তার দলের লোকের হাসি আর থামে না।

'রোগটি হচ্ছে বিকার। যে ঘরে বিকারী রুগী সেই ঘরেই আবার আচার-তেঁতুল —সেই ঘরেই আবার জলের জালা। তা রোগ সারবে কেমন করে? আচার-তেঁতুল—এই দেখ', ঠাকুর তাকালেন সবাইয়ের দিকে, 'বলতে-বলতে আমার মুখে জল এসেছে। সামনে থাকলে কি হয় কে বলবে। মেয়েমানুষ পুরুষের পক্ষে এই আচার-তেঁতুল। ভোগবাসনা জলের জালা। আর সব কিনা এই রুগীর ঘরে।'

দিন কতক ঠাঁই-নাড়া হয়ে থাকো। কদিন এমন জায়গা ঘুরে এস যেখানে আচার-

তেঁতুল নেই, জলের জালা নেই। চলে যাও নির্জনে। নীলের নিলয়ে। হয় নীল সমুদ্রে, নীল অরণ্যে, নয় নীল আকাশের নিঃসীমায়। নীল হচ্ছে অনন্তের রঙ, অবিনশ্বরতার রঙ। তোমার নির্জনতার রঙও হচ্ছে নীল। নির্জনে থাকতে-থাকতেই নীরোগ হবে। নীরোগ হয়ে ঘরে ফিরে এলে আর ভয় নেই।

'অশ্বত্থ গাছ যখন চারা থাকে তখনই চারদিকে বেড়া লাগে। পাছে ছাগল-গরুতে নষ্ট করে। কিন্তু গুঁড়ি মোটা হলে বেড়ার আর দরকার থাকে না। তখন হাতি বেঁধে দিলেও কিছুই হয় না গাছের। যদি নির্জনে সাধন করে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তিলাভ করে বল বাড়িয়ে বাড়ি গিয়ে সংসার করো, কামিনী-কাঞ্চন তোমার কিছু করতে পারবে না।'

দলের মধ্যে ছিলেন একজন সদরওয়ালা। বললেন, 'সংসারত্যাগের যে প্রয়োজন নেই, বাড়িতে থেকেও যে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় এ জেনে মনে বড় শান্তি হল।'

'যা আছে হোথায় তা আছে হেথায়।' রামকৃষ্ণ বললেন দীপ্তস্বরে: 'ত্যাগ তোমাদের কেন করতে হবে? যে কালে যুদ্ধ করতেই হবে, কেল্লা থেকেই যুদ্ধ ভালো। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে, ক্ষুধা-তৃষ্ণার সঙ্গে যুদ্ধ তো করতে হবে। এ যুদ্ধ সংসারে থেকেই সুবিধে। শরীরের যখন যেটি দরকার কাছেই পাবে—রোগ হলে সেবা পর্যন্ত।'

দেখছ না আমাকে! সন্ন্যাসীর শ্রেষ্ঠ হয়ে সংসারীর শিরোমণি।

'আমার তো মাগ আছে। ঘরে-ঘরে ঘটি--বাটি আছে। হরে-প্যালাদের খাইয়ে দিই। আবার হাবির মা এলেও ভাবি।'

পিঁপড়ের মত সংসারে থাকো। বালিতে-চিনিতে, নিত্যে-অনিত্যে, মিশেল হয়ে আছে। বালি ছেড়ে চিনিটুকু নাও। থাকো পাঁকাল মাছের মতো। পাঁকে থাকে কিন্তু গা ঝকঝক করছে। থাকো পানকৌটির মত। পাখা ঝাপটেই গায়ের জল ঝেড়ে ফেল। হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙো।

'একজন তার স্ত্রীকে বলেছিল, আমি সংসার ত্যাগ করে চললুম। স্ত্রীটি একটু জ্ঞানী ছিল। সে বললে, কেন মিছে ঘুরে-ঘুরে বেড়াবে? যদি পেটের ভাতের জন্যে দশ ঘরে যেতে না হয়, তবে যাও। আর তাই যদি হয় এই এক ঘরই ভালো।'

তার মানে জ্ঞানলাভ করে সংসারে থাকো।

'জ্ঞান হয়েছে তা কেমন করে জানব?' জিগগেস করলেন সদরালা।

'জ্ঞান হলে ঈশ্বরকে আর দূরে দেখায় না। তিনি আর তখন তিনি নন। তিনি তখন ইনি। হৃদয়মধ্যে বসে আছেন।'

অন্তরের মধ্যেই সেই স্থিরধাম। কেউ চলেছে দ্বারকানাথ, কেউ মথুরায়, কেউ বা

কাশীতে। কিন্তু প্রভু রয়েছেন অন্তরের নিরালায়। পিপাসিত হয়ে কোথায় যাচ্ছ গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীতে, মানস-সরোবরেই সঞ্চিত আছে জলপুঞ্জ। সেই মন-সংসীতে এবার স্নান করো।

অনেক রুদ্ধ ঘরে কান পেতেছ। এবার নিজের অন্তরে এসে কান পাতো। এবার শুনতে পাবে সে দুয়ার খোলার শব্দ।

সদরালার তবু সংশয় যায় না। বললেন, 'মশায়, আমি পাপী, কেমন করে বলি যে তিনি আমার ভিতরে আছেন?'

একটু যেন বিরক্ত হলেন ঠাকুর। বললেন, 'ঐ তোমাদের পাপ আর পাপ। এ সব বুঝি খৃষ্টানি মত? সে দিন একটু বাইবেল পড়া শুনলাম। তাতে কেবল ঐ এক কথা। পাপ আর পাপ! আমি তাঁর নাম করেছি, রাম কি হরি বলেছি, আমার আবার পাপ! এমন বিশ্বাস থাকা চাই। দৃপ্ত বিশ্বাস। তপ্ত বিশ্বাস।'

'মশায়, কেমন করে অমন বিশ্বাস হবে?'

'তাঁতে অনুরাগ করো। তাঁকে ভালোবাসো। ডাকো। তাঁর জন্যে কাঁদো—'

'কেমন করে ডাকবো?'

ডাক দেখি মন ডাকের মতন কেমন শ্যামা থাকতে পারে। কেমন করে ডাকবো! তাও আমায় শিখিয়ে দিতে হবে?

'আমি মা বলে এইভাবে ডাকতাম—মা আনন্দময়ী, দেখা দিতে যে হবে! আবার কখনো বলতাম, ওহে দীননাথ জগন্নাথ, আমি তো জগৎছাড়া নই নাথ। আমি জ্ঞানহীন, সাধনহীন, ভক্তিহীন—আমি কিছুই যে জানি না—দয়া করে দেখা দিতে যে হবে—'

ঠাকুরের করুণ স্বরে সকলের হৃদয় গলে গেল। মহিমাচরণ তো কেঁদে আকুল। ওরে বিশ্বাস কর, তাঁর নামমাহাত্ম্যে বিশ্বাস কর।

বিশ্বাস? অন্ধ বিশ্বাস?

ওরে, অন্ধ হওয়াই সুবিধে। যার চোখ আছে সে তো নিজের অহঙ্কারে ঘুরে বেড়ায়। যার চোখ নেই তার হাত একজনকে এসে ধরতে হয়। ওরে তুই হাত-ধরা লোক কোথায় পাবি? প্রভুই এসে তোর হাত ধরবেন।

কিন্তু কেশবের এমন অসুখ হল কেন? শুধু খাটতে-খাটতে দেহপাত হল। শুধু লেখা আর লেখা। বক্তৃতা আর বক্তৃতা।

যোগীন যখন প্রথম ঠাকুরের ঘরে এসে প্রণাম করে দাঁড়ায়, তার হাতে একখানা খবরের কাগজ।

'কোত্থেকে আসছ?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'এই দক্ষিণেশ্বর থেকেই আমি নবীন চৌধুরীর ছেলে।'

চিনতে পারলেন। দক্ষিণেশ্বরের সাবর্ণ চৌধুরীদের নাম কে শোনেনি? এঁদের প্রতাপে বাঘে-গরুতে একসঙ্গে জল খেত সেকালে। যেমন অন্যের জাতি নিতে পারতেন তেমনি জাত দিতেও পারতেন অকাতরে। কিন্তু ঠাকুর আশ্চর্য হলেন, দক্ষিণেশ্বরের লোক তাঁকে চিনল কি করে? প্রদীপের নিচেই তো অন্ধকার। মন্দিরের যত কাছে, ঈশ্বরের তত দূরে। সামনের মাঠকে হলদে লাগে, দূরের মাঠই সবুজ।

দক্ষিণেশ্বরের লোক বেশি পাত্তা দেয় না ঠাকুরকে। গেঁয়ো যুগীরই ভিখ মেলে না। তাই তিনি একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এখানকার কথা কি করে জানলে?

'খবরের কাগজ থেকে।'

'কোথাকার কাগজ?'

'কেশব সেনের। কেশব সেন আপনার সম্বন্ধে লিখেছেন কাগজে।'

কি লিখেছে, পড়িয়ে শোনাও তো? এমন কথা জিগগেসও করলেন না ঠাকুর। ডাকিয়ে আনালেন কেশববাবুকে। বাহবা দিলেন না। বরং ধমকিয়ে বললেন, 'আমি কি মান-ভিখারী? আমি কি ইদানিং-সাধু?'

কেশব হাত জোড় করে বসে রইল।

'যা করেছ করেছ, আর লিখো না।'

কিন্তু কেশবের কথা কে লেখে! একটা লোক জগৎ মাতিয়ে দিল—চেয়ে দেখ কত বড় শক্তি! কিন্তু আজ ব্যাধির কবলে পড়ে নিঃসহায়!

শীতকাল। ঠাকুর দেখতে এসেছেন কেশবকে। গায়ে সবুজ রঙের বনাতের গরম জামা। জামার উপর আবার একখানি বনাত। সন্ধ্যা হয়-হয়। কেশবের বাড়ির লোকেরা ঠাকুরকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন উপরে। বৈঠকখানার দক্ষিণে বারান্দা। সেখানে তক্তপোশ পাতা। তার উপরে বসাল ঠাকুরকে। বসে আছেন তো বসেই আছেন। কেউ নিয়ে যাচ্ছে না ভিতরে। তাঁর কেশবের পাশটিতে। বসে-বসে তার কষ্ট-ভরা কাশির আওয়াজ শুনছেন।

কত কীর্তন করেছে কেশব। ঠাকুরকে মাঝখানে রেখে কত নেচেছে। কেশবকে বেশিদিন না দেখতে পেলেই অধীর হয়েছেন। সেবার যেন বড় বেশি ছট্‌ফট করছেন। রাজেন মিত্তির পাশে বসা, তাকে বলছেন বার-বার, ছাখো দিকিন কেশব আসছে কিনা। রাজেন মিত্তির একটু এগিয়ে গিয়ে দেখে আসে। কই, কোথায় কেশব! আবার কোথাও একটু শব্দ হল। ছাখো আবার ছাখো। আবার ফিরে এল

রাজেন। কেশবের কেশাগ্রেরও দেখা নেই। ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, 'পাতের উপর পড়ে পাত। রাই বলে, ওই এল বুঝি প্রাণনাথ।' তার পরে স্বরে অনুযোগ মেশালেন: 'হ্যাঁ, ছাখো, কেশবের চিরকালই কি এই রীত? আসে আসে আসে না!'

কিন্তু সেদিন না এসে আর পারল না কেশব। কিন্তু সঙ্গে সেই দলবল।

'রাজ্যের কলকাতার লোক জুটিয়ে এনেছেন! আমি কিনা বক্তৃতা করব! তা আমি পারবো টারবো-নি। করতে হয় তুমি করো। আমি তোমার থাবো দাবো থাকবো—' তবে তুমি যদি একা-একা আস, বেশ হয়। দুজনে মিলে মনের সুখে কথা কই সঙ্গোপনে। ভক্তের স্বভাব গাঁজাখোরের স্বভাব। তুমি একবার গাঁজার কলকেটা নিয়ে টানলে, আমি একবার টানলাম।

'কেশব, তুমি আমায় চাও, কিন্তু তোমার চেলারা আমায় চায় না। তোমার চেলাদের সেদিন বলছিলুম, এখন আমরা খচমচ করি, তারপর গোবিন্দ আসবেন। তারপর তুমি যখন এলে, বললুম, ঐ গো তোমাদের গোবিন্দ আসছেন। আমি এতক্ষণ খচমচ করছিলুম, জমবে কেন?'

ঐ দল-দল করেই গেল! পাকা আমি কি দল করতে পারে? আমি দলপতি, আমি দল করেছি, আমি লোকশিক্ষা দিচ্ছি, এ আমি কাঁচা আমি।

'কিন্তু, তোমরা এত দেরি করছ কেন? কতক্ষণ বাইরে বসে থাকব? আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো।'

'তিনি এখন এই একটু বিশ্রাম করছেন। একটু পরেই আসছেন এখানে।'

'হ্যাঁ গা, তাঁর এখানে আসবার কি দরকার? আমি যাই না কেন ভিতরে।'

ডাক্তার বলে গেছে বিশ্রামে রাখতে। তাই কেশবের শিষ্যরা খুব হুঁশিয়ার। এই একটু চুপচাপ আছে কেশব। এখুনি যদি আবার তাকে ব্যস্ত করা হয়—

কিন্তু ঠাকুরের ধৈর্য মানছে না। যাই-যাই করছেন।

'আজ্ঞে এই একটু পরেই আসছেন তিনি।'

'যাও, তোমরাই অমন করছ। না, আমিই ভিতরে যাই—'

প্রসন্ন ভুলোতে এস ঠাকুরকে। কেশবের কথা ছাড়া আর কথা কোথায় মনভুলানো। প্রসন্ন বললে, 'তাঁর অবস্থা আরেকরকম হয়ে গেছে। আপনারই মত মা'র সঙ্গে কথা কন। মা কি বলেন, শুনে কাঁদেন-হাসেন।'

এত দূর! সেবার কেশবকে বললেন, বলো ভাগবত-ভক্ত-ভগবান। কেশব তো বললেই, তার শিষ্যরাও বললে। আবার বললেন, বলো, গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব। তখন কেশব বললে, 'মশায়, এখন এত দূর নয়। তা হলে লোকে গোঁড়া বলবে।'

কালী শুধু মানা নয়, কালীর সঙ্গে কথা বলা! শুনেই ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হয়ে গেলেন। বৈঠকখানায় আলো জ্বালা হয়েছে। সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুরকে সবাই নিয়ে এল সে ঘরে। আসবাবে ঠাসা, চেয়ার, কৌচ, আলনা, গ্যাসের আলো। ঠাকুর বসলেন একটা কৌচে। তখনো যেন ভাবাবেশ কাটেনি সম্পূর্ণ। ঘরের জিনিসপত্র লক্ষ্য করে বললেন, 'আগে এ সব দরকার ছিল। এখন আর কী দরকার!' বলতে-বলতেই আবার আবেশ উপস্থিত। বলছেন, 'এই যে মা এসেছ! এসো। আবার বারানসী শাড়ি পরে কী দেখাও! হাঙ্গামা কোরো না। বোসো গো বোসো।' এই কেশবের বাড়িতেই আগে একবার বলেছিলেন ঠাকুর, 'মা গো, এখানে তুই আসিসনি। এরা তোর রূপ-টুপ মানে না। কেবল নিরাকার নিরাকার করে।' আজ একেবারে সটান এসে পড়েছেন। তায় আবার সেজে-গুজে এসেছেন।

হরিশ ঠিকই বলে। ঠাকুরকে দেখিয়ে বলে, 'এখান থেকে সব চেক পাশ করিয়ে নিতে হবে। তবে ব্যাঙ্কে টাকা দেবে। নইলে টাকা নয়, ফাঁকা।'

ঠাকুর বলছেন আপন মনে, 'দেহ হয়েছে আবার যাবে। দেহ আর আত্মা। কিন্তু আত্মা যাবে না। যেমন সুপুরি। কাঁচা বেলায় ফলে আর ছালে লেগে থাকে, আলাদা করা যায় না। কিন্তু পাকলে সুপুরি আলাদা হয়ে যায় ছাল থেকে। কিন্তু পাকবে কখন? যখন তাঁর দর্শন মিলবে। তখন দেহ আলাদা আত্মা আলাদা হয়ে যাবে।'

কেশব আসছেন। পুব দিকের দরজা দিয়ে আসছেন। আসছেন দেয়াল ধরে-ধরে। কী হয়ে গিয়েছে চেহারা! কঙ্কালের উপর শুধু একটা চামড়ার প্রলেপ! চোখ মেলে তাকানো যায় না। বুক ফেটে যায়!

॥ ৯৫ ॥

এই সেই বীর-বিদ্রোহী ভক্তপ্রবর কেশবচন্দ্র।

কেশবের সমস্ত ধর্মসাধনার মূলে হচ্ছে তার মা, সারদাসুন্দরী। কেশব প্রাচীন ধর্ম-কর্ম মানছে না এই তাঁর বিষম চিন্তা। অভিভাবকরা ঠিক করেছেন কুলগুরুর মন্ত্র দিতে হবে তাকে। দিন ঠিক হয়েছে। গুরুদেব উপস্থিত। সব উপকরণ সাজিয়ে মা বসে আছেন। অভ্যাগত-নিমন্ত্রিতের ভীড় বাড়ছে। কিন্তু যাকে উপলক্ষ্য করে এই আয়োজন তার দেখা নেই। কেশব চলে এসেছে দেবেন ঠাকুরের আশ্রয়ে। বলে পাঠিয়েছে পৌত্তলিক গুরুমন্ত্র আমি নেব না।

বাড়ির আর সবাই ঘোরতর বিরক্ত, পারে তো ছিঁড়ে খায় কেশবকে, কিন্তু সারদা-

সুন্দরী নিজের দুঃখকে ছেলের সত্যের চেয়ে বড় করে দেখতে পেলেন না। ছেলে যদি সত্যভ্রষ্ট হয় সে দুঃখ যে দ্বিগুণ হয়ে বাজবে।

ব্রাহ্মসমাজের ক'খানা বই মা'র হাতে দিয়ে গেল কেশব। বললে, পড়ে দেখ। সুন্দর-সুন্দর কথা। কেশব ব্রহ্মজ্ঞানী হবে, গুরুর থেকে মন্ত্র নেবে না—কি এর তাৎপর্য ভালো বুঝতে পারেননি সারদা। কোথায় সে ব্রাহ্মসমাজ কে জানে! কিন্তু এ বইয়ে যা লেখা আছে তা যদি ওদের ধর্ম হয় তো মন্দ কি। গুরুঠাকুরকে দেখালেন বই। বললেন, 'কেশব কি ধর্ম পেয়েছে দেখুন!'

গুরুঠাকুর পড়লেন যত্ন করে। বললেন, 'এ তো খুব ভালো ধর্ম। তুমি ভেবো না, তোমার কেশব যে পথ ধরেছে তাতেই তার মঙ্গল হবে।'

সুন্দর অক্ষরে মাকে কটি প্রার্থনা লিখে দিল কেশব। রোজ তাই পড়েন সারদা-সুন্দরী। নির্মল একটা তৃপ্তির স্পর্শে অন্তর-বাহির জুড়িয়ে যায়। হরিমোহন সেন, কেশবের জ্যাঠামশাই, একদিন দেখে ফেললেন। কি পড়ছ দেখি?

নাটক-নভেল কিছু নয়। ঈশ্বরের কথা, ঈশ্বরকে প্রার্থনা।

'কে লিখে দিয়েছে? কার হাতের লেখা?' গর্জে উঠলেন হরিমোহন।

চোখ নত করলেন সারদাসুন্দরী। কথা কইলেন না।

'বুঝতে পেরেছি কার। কেশবের।' বলেই হরিমোহন কাগজ কখানা ছিঁড়ে ফেললেন টুকরো-টুকরো করে।

ছেলেকে গিয়ে আবার ধরলেন সারদাসুন্দরী। বললেন, 'আমাকে আরেকবার লিখে দে।'

কেশব বললে, 'লিখে লাভ নেই, আবার ছিঁড়ে ফেলবে।'

বিশ বছরের ছেলে, বিজ্ঞ অভিভাবকদের কথা রাখে না, এ অসহ্য। কিন্তু যে হরিমন্ত্র দিয়ে জগজ্জনকে নববিধানে দীক্ষিত করতে এসেছে, তার কাছে কিসের গুরুমন্ত্র! যে নিজে জগদ্‌গুরু তার কাছে আবার কিসের গুরুজন!

হিন্দু পরিবারে থেকে গুরুমন্ত্রে দীক্ষা না নেওয়া গুরুতর পরীক্ষা। কি হল জানবার জন্যে ছেলে সত্যেনকে পাঠিয়ে দিলেন দেবেন ঠাকুর। সত্যেন গিয়ে খবর দিল, জিতেছে কেশব। দেবেন ঠাকুর লাফিয়ে উঠলেন।

বক্তৃতা করে ফিরতে লাগল কেশব। একেকটা বক্তৃতা তিন-চার ঘণ্টা ধরে। যতক্ষণ স্বরভঙ্গ না হয় ততক্ষণ উচ্চগ্রামে বলে যাও হরিনাম। অগ্রসর হও, ডাইনে-বাঁয়ে কোনো দিকে না তাকিয়ে দৃঢ়পায়ে এগিয়ে যাও। যিনি আমাদের আলোক আর শক্তি, পিতা আর বন্ধু, তাঁর দিকে স্থির চোখে ভিখারীর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকো। তিনি তোমার অন্তরে দেবেন জ্ঞান হৃদয়ে প্রেম আত্মায় পবিত্রতা আর দুহাত ভরে

দেবেন শৌর্যে আর সাহসে। এগিয়ে যাও।

'হ্যাঁ গা, ছেলেকে একটু দাবতে পারো না?' বললে কে এক হিতৈষিণী। 'রাত্রে ঘুমোয় না, মারা যাবে যে।'

ছেলে আমার অসাধ্যসাধন করবে। গর্ব না করে প্রার্থনা করেন সারদাসুন্দরী। ছেলেবেলা থেকেই সে অস্থির হয়ে ছুটোছুটি করছে। ছেলেবেলা থেকেই গরদের চেলি পরে নাকে তিলক গায়ে ছাপ এঁকে গলায় মালা দিয়ে ভক্ত সাজতে সে ভালোবাসে। সে যে একটা কাণ্ড-কারখানা করবে এ আর বিচিত্র কি।

দেবেন ঠাকুরের সঙ্গে সিংহল গেলেন কেশব সেন। আর কিছুর জন্যে নয়, জাহাজে চড়া ম্লেচ্ছাচার—এ কুসংস্কার অমান্য করার জন্যে। কলুটোলা সেনপরিবারে এ এক নিদারুণ ঘটনা। কিন্তু কেশব ছাড়া আর কার হবে এ দুঃসাহস!

সারদাসুন্দরী ভয় পেলেন পরিণাম ভেবে। আর কেশবের বালিকা-বধূ কান্নার রোল তুললে। সমুদ্রের ঢেউয়ে সে কান্না আর শোনা গেল না।

দিগ্বিজয় করে ফিরল কেশব। খৃষ্টানির সংস্পর্শে যত কুরীতি-দুর্নীতি এসেছিল সমাজে তার বিরুদ্ধে লড়তে লাগল। লড়তে লাগল যত অন্ধ সংস্কার ও যত বদ্ধ দরজার বিরুদ্ধে। মেয়েদের অবরোধ ঘুচে গেল, নতুন ব্রাহ্মিকার সাজে পরদার বাইরে আসতে লাগল একে-একে। ব্রাহ্মণ যুবকেরা ছিঁড়ে ফেলল পৈতে। দেবেন ঠাকুরও উপবীত ত্যাগ করলেন।

এ দিকে রণে ভঙ্গ দিতে লাগল পাদরিরা। যে খৃষ্টধর্ম তারা প্রচার করছে, সেটা যে মেকি তাই বাইবেল দেখিয়ে প্রমাণ করল কেশব। পাদরির উপর পাদরিগিরি চালালো। কেশবের সভায় লোক ধরে না, আর পাদরির সভায় ঠনঠন।

ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য পদে বরণ করা হবে কেশবকে। সেই উপলক্ষ্যে দেবেন ঠাকুরের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বিরাট উৎসব। পত্র-পুষ্প-পতাকা আর দীপমালার শোভা। সে শোভার সভাপতি কেশব!

কেশব ঠিক করল স্ত্রীকে নিয়ে যাবে সে সভায়। মা'র কাছে অনুমতি চাইল আগের রাত্রে। বীর-বিপ্লবীর মা সারদাসুন্দরী, অনুমতি দিলেন। স্ত্রী তো শয্যা-সঙ্গিনী নয়, স্ত্রী সহধর্মিণী। স্বামীর সঙ্গে-সঙ্গে যাবে ঠিক সীতার মত।

কিন্তু বাড়ির আর সবাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। মেয়ের দল ধমকালো সারদাসুন্দরীকে। 'বউকে সেতখানার মধ্যে বন্ধ করে রাখো। নইলে জাত-কুল সব যাবে।'

সে কথা কানে নিলেন না মা। কিন্তু গৃহস্বামী হরিমোহনের আদেশ আরো দুর্দান্ত। ফটকের দরজায় তালা লাগিয়ে দাও। সর্বক্ষণ মোতায়েন রাখো দারোয়ান।

স্ত্রীর ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল কেশব। বললে, 'হয় আমার সঙ্গে চলো, নয়

পরিবারের গুরুজনদের সঙ্গে থাকো। এই শুভমুহূর্তে—দ্বিধা করবার দেরি করবার সময় নেই।'

পঞ্চদশী কিশোরী বধূ স্বামীর সহগামিনী হল।

পরিচিত প্রাচীন চাকর, সেও পর্যন্ত শাসন করে উঠল: 'আরে, তুমি ভদ্রলোকের মেয়ে তুমি কোথা যাও?'

বন্ধ ফটকের কাছে এসে দাঁড়াল দুজনে। স্ত্রীকে পাশে পেয়ে কেশবের শক্তি দ্বিগুণ দুর্জয় হয়ে উঠল। রূঢ় ধমক দিল দারোয়ানকে: 'খোলো দরজা।' সম্মূঢ়ের মত দরজা খুলে দিলে দারোয়ান। বাড়ির কাছেই পালকির আড্ডা। একটা পালকি ভাড়া করে স্ত্রীকে বসিয়ে দিলে। নিজে চলল পায়ে হেঁটে।

শুধু বন্ধনমোচনেই নয় যোগসাধনের সহধর্মিণী। নৈনিতালের নির্জন পর্বতে সস্ত্রীক শিলাসনে বসে ধ্যান করছে কেশব। কেশবের পরনে ব্যাঘ্রচর্ম, আর স্ত্রীর পরনে গৈরিক। মহাদেবের পাশে অপর্ণা।

উৎসবগৃহে বিচিত্র আমিষ ভোজ্যের আয়োজন হয়েছে। অশাস্ত্রীয় মাংস। কেশব ইংরিজি শিখে ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েছে, আহারব্যাপারে নিশ্চয়ই তার কুসংস্কার নেই। কিন্তু যে আমিষবস্তুই কাছে আনে কেশব বলে, খাই না। ক্ষুব্ধ হলেন দেবেন ঠাকুর। কিন্তু উপায় কি! বাড়ির ভিতর রুগীর জন্যে তৈরি কিছু নিরামিষ রান্না ছিল তাই দেওয়া হল কেশবকে। তাতেই কেশবের অখণ্ড তৃপ্তি। তার তো আহার নয়, তার আহুতি। সে যে কর্মজ্ঞা-মার্গ থেকে চলে আসবে ভক্তিমার্গে। সে তো শুধু ভাঙবার জন্যে নয়, বাঁধবার জন্যে নয়, কাঁদবার জন্যে।

ব্রাহ্মসমাজে খোল করতাল ঢোকাল কেশব। নিন্দা কুৎসা উপহাস করতে লাগল সকলে। কিন্তু স্বদেশের ধর্মপ্রকৃতির নিগূঢ় মর্মটি ঠিক বুঝতে পেরেছে কেশব। হরিপ্রেমে মত্ত হয়ে নৃত্য করতে হবে, ভক্তিকে প্রগাঢ় করতে হবে ভালোবাসায়। ছাড়তে যেমন বিদ্রোহী ধরতেও তেমনি। কীর্তনরসে কঠোর ব্রহ্মধর্মকে রস-সিঞ্চিত করলেন। আগে ছিলেন যীশুখৃষ্ট এখন 'প্রমত্ত মাতঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ'।

হেসেছে কেঁদেছে নেচেছে! জগজ্জনকে মাতিয়ে দিয়েছে। ঈশ্বরনেশায় বিভোর করেছে! হায় হায় সে-কেশবের এই দশা! কোথায় সেই কনককান্তি, সেই বিদ্যুৎ-উন্মেষ-দৃষ্টি! সেই বাগবজ্রে বংশীধ্বনি!

দল—দলই ওকে দ'লে দিয়েছে। লাট করে ফেলেছে। ভগবানে যোগ করতে গিয়ে ও দলের সঙ্গে যোগ দিলে! ওরে যোগ মানে সমষ্টিকরণ নয়, ইষ্টিকরণ। যোগাড় করা বা যোগান দেওয়া নয়, শুধু ভগবানে মনোযোগ।

'ওরে, আমি উলুবনে মুক্তো ছড়াই না।' নব্যবাঙলার মাতব্বর ছোকরাদের বলছেন

ঠাকুর : 'কালে সব বুঝতে পারবি। ওই যে কথায় আছে না—যাঁরে ধ্যানে না পায় মুনি, তাকে ঝাঁটায় ঝেঁটোয় নন্দরানি। তো শালারা আমাকে লাট করে ফেললি। আমাকে সেই এক বুঝেছিল কেশব সেন।'

কেশব সেন বলেছিল বলরামকে, 'তোমরা বুঝতে পারছ না উনি কে। তাই অত ঘাঁটাঘাঁটি করছ। ওঁকে মখমলে মুড়ে ভালো একটি গেলাসকেসের মধ্যে রাখবে, দু-চারটি ফুল দেবে, আর দূর হতে প্রণাম করবে—'

তাতে আবার একজন রাগ করল। ঠাকুরকে উদ্দেশ্য করে বললে, 'আমরা তো আর কেশববাবু নই যে তাঁর মত আপনাকে দেখব। না হয় কাল থেকে আপনাকে আর বিরক্ত করতে আসব না।'

ঠাকুর হেসে বললেন, 'বা গো সখী! ঠোঁটের আগায় রাগটুকুও আছে।'

কেশব দেয়াল ধরে-ধরে টলতে-টলতে আসছে। দাঁড়াতে পারছে না। কখন ইতিমধ্যে কৌচ ছেড়ে নিচে নেমে বসেছেন ঠাকুর। কেশবও তাঁর পায়ের কাছটিতে বসে পড়ল। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল অনেকক্ষণ ধরে।

ঠাকুরের ভাবাবস্থা। মা'র সঙ্গে কি কথা কইছেন আপন মনে।

'আমি এসেছি। আমি এসেছি।' চেঁচিয়ে বলতে লাগল কেশব। ঠাকুরের বাঁ হাতখানি তুলে নিল নিজের হাতে। হাত বুলুতে লাগল।

ঠাকুর তখন মাতোয়ারা। বলছেন ভাবারূঢ় হয়ে : 'যতক্ষণ উপাধি, ততক্ষণই নানা বোধ। যেমন কেশব, প্রসন্ন, অমৃত, এই সব। পূর্ণজ্ঞান হলেই এক চৈতন্য। ভাব-সমুদ্র উথলালেই ডাঙায় এক বাঁশ জল। আগে নদী দিয়ে সমুদ্রে আসতে হলে এঁকেবেঁকে ঘুরে আসতে হত, এক রাজ্যের পথ। বন্যে এলে একাকার। তখন সোজা নৌকো চালিয়ে দিলেই হল।'

চোখ চাইলেন ঠাকুর। বললেন, 'তোমার অসুখ হলেই আমার প্রাণটা বড় ব্যাকুল হয়। আগের বারে তোমার যখন অসুখ হয়, রাত্রির শেষ প্রহরে আমি কাঁদতুম। বলতুম, মা! কেশবের যদি কিছু হয়, তবে কার সঙ্গে কথা কবো। তখন কলকাতায় এলে ডাব-চিনি দিয়েছিলুম সিদ্ধেশ্বরীকে। মা'র কাছে মেনেছিলুম, যাতে অসুখ সেরে যায়।'

কিন্তু এবার, এবার কি মানেননি?

॥ ৯৬ ॥

ঢং করে ঘণ্টা বাজল। ঢং শব্দটা হল সাকার ভাব। তারপর ঢং-এর অং-টি থেকে গেল অনেকক্ষণ। ঐ অং-টি হল নিরাকার।

ঈশ্বরতত্ত্ব বোঝাচ্ছেন ঠাকুর।

'নিরাকারে একেবারে মন স্থির হয় না। বাণ শিখতে হলে আগে কলাগাছ তাক করতে হয়, তারপর শরগাছ, তারপর সলতে। তারপর উড়ে যাচ্ছে যে পাখি।' এক সন্নেসী জগন্নাথ দর্শন করতে গিয়েছে। গিয়ে সন্দেহ হয়েছে ঈশ্বর সাকার না নিরাকার। হাতের দণ্ড ঠেকিয়ে দেখতে গেল তাঁর গায়ে লাগে কিনা। একবার দেখল লাগল, আবার দেখল লাগল না। একবার দেখল মূর্তি, আবার দেখল অমূর্তি। ঘট আর আকাশ। ঢং আর অং। সন্নেসী বুঝল ঈশ্বর সাকার, আবার নিরাকার।

কাঠ মাটি মনে কোরো না সাকার মূর্তিকে। শোলার আতা দেখলে যেমন আসল আতা মনে পড়ে, বাপের ফটোগ্রাফ দেখলে যেমন বাপকে মনে পড়ে, তেমনি। প্রতিমায় সত্যের উদ্দীপনা। রূপের মধ্যেই অরূপরতন।

ভক্তির জন্যে সাকার, মুক্তির জন্যে নিরাকার। মুক্তি দিলেই নিশ্চিন্ত, কোনো ঝঞ্ঝাট নেই, ঈশ্বরকে ফিরতে হয় না সঙ্গে-সঙ্গে। ভক্তি দেওয়াই কঠিন, ছুটি পায় না ভগবান, লেগে থাকতে হয় সব সময়। তাই, আমি মুক্তি দিতে কাতর নই রে, ভক্তি দিতে কাতর হই।

এমনি কত কথা বলে যাচ্ছেন ঠাকুর। প্রিয়তন্ময়ের মত শুনছে কেশব সেন।

অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছে তাই করো। আনন্দময়ীকে সঙ্গে নিয়ে যেথা ইচ্ছে সেথা যাও।

'দেখনি ময়রার দোকানে ছানা চিনি মিশিয়ে একটা ঠাশা তৈরি করে। পরে তা থেকেই তৈরি হয় গোল্লা আর বরফি, তালশাঁস আর আতা সন্দেশ। ছানা চিনির রূপান্তরে যেমন নানান রকম সন্দেশ, তেমনি ভাব ভক্তির রূপান্তরে নানান রকম বিগ্রহ—শিব দুর্গা কৃষ্ণ বিষ্ণু। পলতা থেকে কলকাতাতে যে জল আসে রাস্তায় আর বাড়িতে, তা একই জল, কিন্তু সে কলের জল কোথাও পড়ছে সিংহের মুখ দিয়ে কোথাও বা মানুষের মুখ দিয়ে। নানা রূপে ঈশ্বরই খেলা করছেন।'

যাই বলো, দল চাই নে, চাই উদারবুদ্ধি। গেড়ে ডোবাতেই দাম বাঁধে, যেমন হিঞ্চে কলমির দল। স্রোতের জলে দল বাঁধে না। গোঁড়ামিতেই দল পাকায়, উদারবুদ্ধির দল নেই।

এত কথা বলছেন, একবারও জিগগেস করছেন না, কেশব তুমি কেমন আছ? কেবল ঈশ্বরের কথা।

নরেন্দ্রকে যখন দেখি, কখনো জিগগেস করিনি, তোর বাপের নাম কি? তোর বাপের কথানা বাড়ি?

প্রতিমায় পূজা হয়, আর জীয়ন্ত মানুষে হবে না? তিনিই তো মানুষ হয়ে লীলা

BanglaBook.org

করছেন। 'জীবে জীবে চেয়ে দেখ সবই যে তাঁর অবতার। তুই নতুন লীলা কি দেখাবি তাঁর নিত্য লীলা চমৎকার।'

তাঁকে সবভূতে দেখতে লাগলুম। বেলপাতা তুলতে গেলুম সে দিন। পাতা ছিঁড়তে গিয়ে খানিকটা আঁস উঠে এল। দেখলুম গাছ চৈতন্যময়। মনে কষ্ট হল। ফুল তুলতে গিয়ে দেখি, গাছে ফুল ফুটে আছে, যেন সম্মুখে বিরাট—পূজা হয়ে গেছে—বিরাটের মাথায় ফুলের তোড়া। আর ফুল তোলা হল না।

হাসিমুখে তাকালেন কেশবের দিকে। বললেন, 'তোমার অসুখ হয়েছে কেন তার মানে আছে।'

উৎসুক হয়ে তাকালো কেশব।

'শরীরের ভিতর দিয়ে অনেক ভাব চলে গিয়েছে কিনা তাই এই অবস্থা। যখন ভাব হয় তখন কিছু বোঝা যায় না, অনেক দিন পর শরীরে এসে আঘাত লাগে। দেখনি সেই গঙ্গার উপরে বড় জাহাজ? বড় জাহাজ যখন গঙ্গা দিয়ে চলে যায়,তখন প্রথম কিছু টের পাওয়া যায় না। শেষে, ওমা দেখি, পাড়ের গায়ে জল ধপাস-ধপাস করছে, আর পাড়ের খানিকটা ভেঙে জলে পড়ল। কুঁড়ে ঘরে হাতি ঢুকলেও এমনিই হয়। কুঁড়ে ঘরে হাতি ঢুকলে ঘর তোলপাড় করে ভেঙেচুরে দেয়। তেমনি ভাবহস্তী তোমার দেহঘরে প্রবেশ করেছে। তোলপাড় করে ভেঙে দেবে না তো কি।'

কেশব চক্ষু নত করল।

'হয় কি জানো? আগুন লাগলে কতকগুলো জিনিস পুড়িয়ে টুড়িয়ে ফেলে, আর একটা হৈ হৈ কাণ্ড লাগিয়ে দেয়। জ্ঞানাগ্নি প্রথম কাম ক্রোধ এই সব রিপু নাশ করে, পরে অহং বুদ্ধির উৎখাত হয়। তারপর তোলপাড়!' ঠাকুর থামলেন একটু। বললেন, 'তুমি মনে করছ, সব ফুরিয়ে গেল। কিন্তু যতক্ষণ রোগের কিছু বাকি থাকে ততক্ষণ তিনি ছাড়বেন না। হাসপাতালে যদি একবার নাম লেখাও, আর চলে আসবার যো নেই। যতক্ষণ রোগের একটু কসুর থাকে ছেড়ে দেবে না ডাক্তার সাহেব। তুমি নাম লেখালে কেন?'

কেশব হাসতে লাগল। হাসপাতালের উপমাটি বড় ভাল লেগেছে।

কত রুগী হাসপাতালে ঢোকে এসে জাঁক ক'রে। কিন্তু যখন দেখে ইনচার্জ ডাক্তার কিছুতে ছাড়ে না তখন একদিন ফাঁক বুঝে চম্পট দেয়। কেউ বা আবার চাদর বালিশ নিয়ে সরে পড়ে। কোথায় রোগ সারাবে তা নয় চুরি করে। ধর্মপথে এসে আবার জাহান্নমে যায়।

'তখন আমার দারুণ অসুখ। মাথায় যেন হুলাখ পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বরীয় কথায় বিরাম নেই। নাটাগড়ের রাম কবরেজ দেখতে এল। সে এসে

দেখে আমি বসে বিচার করছি। তখন সে বললে, এ কি পাগল! দুখানা হাড় নিয়ে বিচার করছে!'

যে খানদানি চাষা, সে চাষ করাই চায়, হাজা-শুকো মানে না। আর কিছু জানে না সে চাষ ছাড়া। তেমনি জীবনের দৈন্য-দুর্ভিক্ষেও হরিনাম ছাড়ে না। মা যদি সন্তানকে মারে, সন্তান মা-মা বলেই কাঁদে। গলা ধরে যদি ফেলেও দেয় তবুও তার মা-মা ডাক। সে তো আর যাকে-তাকে মা বলছে না, তার মাকেই মা বলছে। তাই ছন্দে একটি মন্ত্র বাঁধলেন ঠাকুর। 'দুঃখ জানে, শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থাকো।'

দুঃখ তো শরীরের ব্যাপার, আর মন, তুমি তো আনন্দের মৌচাক। দুঃখের হুলেই এই মধুকণা সঞ্চিত হচ্ছে। সারা জীবনই তো দুঃখ—রোগ শোক জ্বালা যন্ত্রণা। যারা বলে আগে দুঃখ-দারিদ্র্য যাক, পরে ঈশ্বরভজন করা যাবে, তারা সেই সমুদ্র-স্নানার্থী তীর্থবাসীর মত। ভাবছে, সমুদ্রের ঢেউ আগে থামুক, পরে স্নান করে নেব। হায়, সমুদ্রের ঢেউ কোনোদিন থামবে না, স্নানও হবে না সেই তীর্থঙ্করের। ঢেউয়ের মধ্যেই স্নান করে নিতে হবে। দুঃখের মধ্যেই নিতে হবে সেই আনন্দ-স্পর্শ। এ তো দুঃখের ঢেউ নয় এ হচ্ছে সুখস্বপ্নরসরাশির ঢেউ।

মেঘাচ্ছন্ন দিন দুর্দিন নয়, যেদিন হরিকথামৃতপান হয় না সেদিনই দুর্দিন।

'তোমার শেকড়সুদ্ধ তুলে দিচ্ছে।' কেশবের দিকে আবার তাকালেন ঠাকুর। 'শিশির পাবে বলে মালী বসরাই গোলাপের গাছ শেকড়সুদ্ধ তুলে দেয়। শিশির পেলে গাছ ভালো করে গজাবে। তাই বুলবুল।'

কেশবের মা দাঁড়ালেন এসে দরজার পাশে।

'মা আপনাকে প্রণাম করছেন।'

আনন্দে হাসলেন ঠাকুর।

'মা বলছেন কেশবের অসুখটি যাতে সারে', কে একজন বললে মায়ের হয়ে।

ঠাকুর বললেন, 'সুবচনী আনন্দময়ীকে ডাকো। তিনিই দুঃখ দূর করবেন।' পরে লক্ষ্য করলেন কেশবকে: 'বাড়ির ভিতরে অত থেকো না। যেখানে যত বেশি ঈশ্বরীয় কথা সেখানেই তত বেশি আরাম। দেখি, তোমার হাত দেখি।' কেশবের একখানি হাত তুলে নিয়ে ওজন করতে লাগলেন ঠাকুর। বললেন, 'না তোমার হাত হালকা আছে। যারা খল তাদের হাত ভারী হয়।'

সবাই হেসে উঠল।

কেশবের মা বললেন, 'কেশবকে আশীর্বাদ করুন।'

'আমার কী সাধ্য! তিনি আশীর্বাদ করবেন। তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে

বলে করি আমি।'

'ঈশ্বর দুবার হাসেন। একবার হাসেন যখন দু ভাই জমি বখরা করে, আর দড়ি মেপে বলে, এ দিকটা আমার, ও দিকটা তোমার। ঈশ্বর এই ভেবে হাসেন, আমার জগৎ, তার খানিকটা মাটি নিয়ে আমার-আমার করছে। আরো একবার হাসেন। ছেলের সঙ্কটাপন্ন অসুখ। মা কাঁদছে। বৈদ্য এসে বলে, ভয় কি মা, আমি ভালো করব। বৈদ্য জানে না, ঈশ্বর যদি মারেন, কার সাধ্য রক্ষা করে।'

কেশবের একটা কাশি উঠল। সে কাশি আর থামে না। কঠিন কষ্টকর কাশি। বুকের মধ্যে ব্যথার ধাক্কা লাগছে সকলের।

বেগটা একটু থামল। থামতেই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল ঠাকুরকে। দেয়াল ধরে-ধরে চলে গেল আপন ঘরে। তার শেষ শয্যায়।

কেশবের বড় ছেলেটিকে ঠাকুরের পাশে এনে বসাল অমৃত। বললে, 'এইটি কেশবের বড় ছেলে। আপনি আশীর্বাদ করুন। ও কি, মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করুন।'

'আমার আশীর্বাদ করতে নেই।' বলে ছেলেটির সর্বাঙ্গে হাত বুলুতে লাগলেন ঠাকুর।

অমৃত বললে, 'আচ্ছা, তবে গায়ে হাত বুলোন।'

সে হাত মানেই তো অপরিমেয় করুণার পারাবার।

'অসুখ ভালো হোক, ও সব কথা আমি বলতে পারি না। ও ক্ষমতা আমি মা'র কাছে চাইও না। মাকে শুধু বলি, মা, আমাকে শুদ্ধা ভক্তি দাও।'

কেশবকে লক্ষ্য করে বলছেন, 'ইনি কি কম লোক গা! যারা টাকা চায় তারাও মানে, আবার সাধুতেও মানে। দয়ানন্দকে দেখেছিলাম। তখন বাগানে ছিল। কেশবের যাবার কথা—কেশব সেন, কেশব সেন, করে ঘর-বার করছে, কখন কেশব আসেন।'

মিষ্টিমুখ করলেন ঠাকুর। এইবার উঠবেন গাড়িতে। ব্রাহ্ম ভক্তেরা সঙ্গে এসে তুলে দিচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় দেখলেন, নিচে আলো নেই। বললেন ঠাকুর, 'এ সব জায়গায় ভালো করে আলো দিতে হয়। আলো না দিলে দারিদ্র্য হয়। দেখো এ রকমটি যেন হয় না আর কোনোদিন।'

এলোপ্যাথিতে আর কিছু হচ্ছে না। ডাকা হল মহেন্দ্রলাল সরকারকে। কিছুতেই কিছু হবার নয়।

তবু তারই মধ্যে বাড়ির এক পাশে দেবালয় তৈরি করাল। প্রতিষ্ঠার দিনে, উত্থানশক্তি নেই, তবু জোর করে নেমে এল নিচে। একটা চেয়ারে বসিয়ে চার পাঁচজনে ধরে নামাল অতিকষ্টে, বেদী এখনো শেষ হয়নি, না হোক, যা হয়েছে

এই বেদীতে বসেই আমি উপাসনা করব।

এসেছি মা, তোমার ঘরে। ওরা আসতে বারণ করেছিল, কোনোমতে শরীরটা এনে ফেলেছি। এই দেবালয় তোমার ঘর, লক্ষ্মীর ঘর। আমার বড় সাধ ছিল কয়েকখানা ইট কুড়িয়ে এনে তোমাকে একখানা ঘর করে দি। তুমি মা নিজেই স্বহস্তে ইট কুড়িয়ে এনে এই প্রশস্ত দেবালয় করিয়ে দিলে। এখন বড় সাধ, ঘরের ঐ রোয়াকে তোমার ভক্তবৃন্দ সঙ্গে নাচি। এই ঘরই আমার বৃন্দাবন, আমার কাশী মক্কা, আমার জেরুশালেম। মা আমার দয়া, মা আমার পুণ্যশান্তি, আমার শ্রীগোবিন্দ, আমার সম্পদস্বাস্থ্য। বিষম রোগযন্ত্রণার মধ্যে মা আমার আনন্দসুধা। রোগের তাড়নায় দিন-রাত আর্তনাদ করছে কেশব। সে নিদারুণ বেদনার নিবারণ নেই। শরীরের রক্ত দিলে যদি উপশম হত, শত-শত লোক দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। মা, আমার মুখ যেন তোমার নিন্দা না করে, তুমি আমাকে ভেঙে-ভেঙে তোমার কোলের মধ্যে টেনে নিচ্ছ মা।

'বাবা, আমার শাপেই তোমার এত যন্ত্রণা—,' সারদাসুন্দরী বললেন কাঁদতে-কাঁদতে।

মায়ের বুকে মাথা রাখল কেশব। বললেন, 'এমন কথা তুমি মুখেও এনো না। তোমার মত মা কে পায়? তুমি আমার বড় ভালো মা, তোমার গর্ভে জন্মেই তো আমি এত ভালো হতে পেরেছি—'

কেশবের তিরোভাবের কথা জানানো হল ঠাকুরকে।

ঠাকুরের মনে হল, একটা অঙ্গ যেন পড়ে গেল। এমন কম্প এল যে লেপ চাপা দিয়ে পড়ে রইলেন। তারপর তিনদিন বেহুঁস।

শিঁড়েপটির মণি মল্লিকের ছেলেটি মারা গেছে। উপযুক্ত ছেলে—এ শোক রাখবার জায়গা নেই। ছেলেকে শ্মশানে পুড়িয়ে রেখে ঠাকুরের কাছে সটান এসে উপস্থিত। সরতরা লোক। সব জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল তার দিকে। ঠাকুরেরও চোখ পড়ল, জগগেশ করলেন, 'কি গো, আজ অমন শুকনো দেখছি কেন?'

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল মণি মল্লিক। বললে, 'আমার ছেলেটি আজ মারা গেল। আসছি সব শেষ করে।'

সহসা সমস্ত ঘর বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হয়ে রইল। ক্রমে-ক্রমে নানা জনে নানা রকম সান্ত্বনার কথা আওড়াতে লাগলো। সব মামুলী, বাজে কথা।

কিন্তু ঠাকুর তো কিছু বলছেন না। এই দারুণদহন শোকে তাঁর কি একটু মৌখিক সহানুভূতিও পাওয়া যাবে না? ঠাকুর এত হৃদয়হীন।

বুড়ো মণি মল্লিক আকুল হয়ে বিলাপ করতে লাগল। ঠাকুর দুটো মিষ্টি কথাও

বলবেন না এ কঠোরতা যেন পুত্রশোকের চেয়েও দুঃসহ।

কেঁদে-কেঁদে শোকের কলসী খালি করল মণি মল্লিক। তখন সহসা তাল ঠুকে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত তেজের সঙ্গে গান ধরলেন ঠাকুর :

জীব সাজো সমরে।
ঐ ছাখ রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।
আরোহণ করি মহা পুণ্যরথে
ভজন সাধন দুটো অশ্ব জুড়ে,—তাতে
দিয়ে জ্ঞানধনুকে টান
ভক্তিব্রহ্মবাণ সংযোগ করো রে ॥

মণিমোহন স্তব্ধশোক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কে পুত্র? কার পুত্র? কার জন্যে এই শোক?

সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুর বললেন, 'পুত্রশোকের মত কি আর জ্বালা আছে? তবে কি জানো? যারা ঈশ্বরকে ধরে থাকে তারা এই বিষম শোকেও একেবারে তলিয়ে যায় না। একটু নাড়াচাড়া খেয়েই ফের সামলে নেয়। চুনোপুঁটির মত আধার-গুলোই একেবারে অস্থির হয়ে ওঠে, তলিয়ে যায়। দেখনি? গঙ্গার স্টীমারগুলো গেলে জেলেডিঙ্গিগুলো কি করে, মনে হয় যেন একেবারে গেল, আর সামলাতে পারলে না। কোনোখানা বা উলটেই গেল। আর বড়-বড় হাজারমুণে কিস্তিগুলো দু-চারবার টালমাটাল হয়েই যেমন তেমনি স্থির হলো। দু-চারবার নাড়াচাড়া কিন্তু খেতেই হবে।'

ঠাকুরের স্বরে বিষাদ-গাম্ভীর্য। 'মানুষ সুখের আশায় সংসার করে। বিয়ে করল ছেলে হল, সেই ছেলে আবার বড় হল, তার বিয়ে দিলে—দিন কতক বেশ চলল। তারপর এটার অসুখ, ওটার বিসুখ, এটা মলো ওটা বয়ে গেল, ভাবনায় চিন্তায় একেবারে ব্যতিব্যস্ত। যত রস মরে তত একেবারে দশ ডাক ছাড়তে থাকে। দেখনি? ভিয়েনের উনুনে কাঁচা সুঁদরির চেলাগুলো প্রথমটা বেশ জ্বলে। তারপর কাঠখানা যত পুড়ে আসে, কাঠের সব রসটা পেছনের দিক দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে গ্যাঁজলার মত হয়ে ফুটতে থাকে আর চুঁ-চাঁ ফুস-ফাস নানা রকম আওয়াজ হতে থাকে—সেই রকম।'

'এই জন্যেই তো আপনার কাছে ছুটে এলাম। বুঝলুম, এ জ্বালা শান্ত করবার আর লোক নেই।'

ধাত্রী ভুবনমোহিনী মাঝে-মাঝে ঠাকুরকে দর্শন করতে আসে।
সকলের জিনিস খেতে পারেন না ঠাকুর। বিশেষত ডাক্তার, কবরেজ বা ধাত্রীর। অনেক যন্ত্রণা দেখেও তারা টাকা নেয় তার জন্যে।
'ভুবন এসেছিল। পঁচিশটা বোম্বাই আম আর সন্দেশ রসগোল্লা এনেছিল।' বলছেন অধর সেনকে। 'আমায় বললে, আপনি একটা আঁব খাবে? আমি বললাম, আমার পেট ভার। আর, সত্যিই দেখ না, একটু কচুরি সন্দেশ খেয়েই পেট কি রকম হয়ে গেছে।' অন্য কথায় গেলেন তখুনি। 'কেশব সেনের মা বোন এরা এসেছিল। তাই আবার খানিকটা নাচলাম। কি করি। ভারি শোক পেয়েছে।' সেদিন আবার বললেন মাস্টারমশাইকে। 'কেশব সেনের মা এসেছিল। তাদের বাড়ির ছোকরারা হরিনাম করলে। কেশবের মা তাদের প্রদক্ষিণ করে হাততালি দিতে লাগলো। দেখলাম শোকে কাতর হয়নি। এখানে এসে একাদশী করলে। মালাটি নিয়ে জপ করে। বেশ ভক্তি।'

॥ ৯৭ ॥

সমরসজ্জায় সেজে শোক তাড়ালেন ঠাকুর। বীরবিক্রমে হুঙ্কার দিয়ে। পরাস্ত, পরাভূত করে। কিন্তু মা, শ্রীশ্রীমা কি করে তাড়ালেন?
'মাঝি-বউ অনেক দিন আসেনা। তার খবর কেউ জানো তোমরা?' মা যখন জয়রামবাটিতে, জিগগেস করলেন একদিন।
কোয়ালপাড়ার মজুরনী। চিনতে পেরেছে সবাই। কিন্তু খবর রাখে না কেউ। সংসারে এত খবর থাকতে কোন এক মজুরনীর খবর!
বলতে-বলতেই মজুরনী এসে হাজির। কোয়ালপাড়ার হাটে মস্ত বাজার করে কে এক ভক্ত তার মাথায় মোট চাপিয়ে দিয়েছে। তাই বয়ে নিয়ে এসেছে ধুঁকতে-ধুঁকতে। এ কেমন চেহারা! রাতারাতি যেন বুড়ো হয়ে গিয়েছে মজুরনী। ধুলো-মাখা রুক্ষ চুল, গভীর গর্তের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে চোখ, কেমন সর্বশূন্য চাউনি। হাঁটু দুটো ঠকঠক করে কাঁপছে, যেন হাতের লাঠি কেউ কেড়ে নিয়েছে জোর করে।
'এ তোমার কী হয়েছে মাঝি-বউ?'
'মা গো, আমার জোয়ান রোজগারী ছেলেটি মারা গেছে।'
'বলো কি মাঝি-বউ?' এক মুহূর্তও স্তব্ধ থাকলেন না শ্রীমা, ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলেন। আকুল, অন্ধ আর্তনাদ। উপরে আকাশ, সামনে দিগন্ত পর্যন্ত রেখা টানা সে আর্তনাদের। কখনো লুটিয়ে পড়ছেন মাটিতে, কখনো বা কাঁদছেন বারান্দার খুঁটিতে মাথা রেখে। জগতের সমস্ত মৃতপুত্রা জননীর শোক নিজের

মধ্যে টেনে নিয়ে ধুয়ে দিচ্ছেন নিরর্গল অশ্রুজলে।

মাঝি-বউ তো অবাক। যেন তার ছেলে মরেনি, মা'র ছেলে মরেছে। কোথায় মা তাকে সান্ত্বনা দেবেন, উলটে এখন তাকেই মাকে সান্ত্বনা দিতে হয়।

যেমন বুদ্ধদেব সান্ত্বনা দিয়েছিলেন উব্বিরীকে।

কোশলের রাণী উব্বিরী। অচিরাবতীর তীরে কাঁদছে অঝোরে।

'এখানে বসে কে কাঁদছ?' জিগগেস করলেন বুদ্ধদেব। বললেন, 'এ যে শ্মশান—'

'এই শ্মশানেই আমার মেয়েটিকে ছাই করে দিয়েছি।'

'কোন মেয়ে?'

জলভরা চোখে তাকালো একবার উব্বিরী। কোন মেয়ে! একটি বই আমার আর মেয়ে কোথায়!

'চুরাশি হাজার মেয়ে এই চিতার ভস্মে ঘুমিয়ে রয়েছে! তুমি চিরন্তনী জননী, তুমি কার জন্যে, তোমার কোন মেয়েটির জন্যে কাঁদছ? কত তো কাঁদলে জন্ম-জন্ম ধরে, কেউ ফিরে এল, চিনতে পারলে কাউকে? যদি চুরাশি হাজার মেয়ে চিতাশয্যা ছেড়ে জেগে ওঠে চোখের সামনে, চিনতে পারবে মেয়ে বলে?'

স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল উব্বিরী।

'পথিক যেমন চলতে-চলতে তরুতলে আশ্রয় নেয় তেমনি তারা তোমার অঙ্কছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিলো। ক্ষণমুগ্ধা, ভেবেছিলে ওদের উপর তোমার বুঝি শাশ্বত অধিকার। কিন্তু চেয়ে দেখ, সবই অচিরস্থায়ী, শ্মশান-নদীর নামটিও অচিরাবতী। সংসারে শুধু এক বস্তু সার জেনো। সে হচ্ছে যাত্রা, অনন্তযাত্রা। তুমিও চলেছ অনন্ত পথে, তোমার মেয়েরাও তেমনি। শুধু এগিয়ে যাওয়া, নিবতে-নিবতে শেষ জ্বলে ওঠা।'

চোখের জল মুছল উব্বিরী। কিন্তু শ্রীমা'র কান্নার বিরাম নেই।

উব্বিরী কেঁদেছিল নিজের কন্যার শোকে। শ্রীমা কাঁদছেন পুত্রহারা মজুরনী মাঝি-বউ হয়ে।

শ্রীমাই চিরন্তনী মা।

শোকের বেগ কমে এলে নবাসনের বউকে নারকেল তেল আনতে বললেন। তেল এনে ঢেলে দিলেন মাঝি-বউয়ের মাথায়। হাত চাপড়ে-চাপড়ে মাখিয়ে দিলেন ভালো করে। আঁচলে বেঁধে দিলেন মুড়ি-গুড়। যাবার সময় বললেন, 'আবার আসিস মাঝি-বউ।'

মাঝি-বউ মৃদু-হাসির ঝিলিক দিল। তার আর শোক নেই।

ঠাকুর শোক তাড়িয়ে দেন। আর মা শোক শুষে নেন।

আরেক ভাবে বলি। ঠাকুর দুঃখকে ঠেলে দেন। মা নেন টেনে।

কিন্তু ও আমার কে?

রামলালের বিয়ে, সারদা চলেছে কামারপুকুর। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখলেন ঠাকুর। যতদূর চোখ যায়। ভাবলেন ও আমার কে!

খেতে বসেছেন ঠাকুর। বলরাম কাছে ব'সে। আরো হয়তো কেউ-কেউ।

'আচ্ছা আবার বিয়ে কেন হল বলো দেখি? স্ত্রী আবার কিসের জন্যে হল? পরনের কাপড়ের ঠিক নেই, তার আবার স্ত্রী কেন?'

বলরাম হাসল একটু মুখ টিপে।

'ও বুঝেছি।' থালা থেকে এক গ্রাস ভাত তুললেন ঠাকুর। বলরামের দিকে ইশারা করলেন। 'এই, এর জন্যে হয়েছে। নইলে কে আর অমন রেঁধে দিত বলো! কে আর অমন করে খাওয়াটা দেখত! ওরা সব আজ চলে গেল—' কে চলে গেল!

'রামলালের খুড়ী গো! রামলালের বিয়ে হবে—তাই সব গেল কামারপুকুর। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখলুম। কিছুই মনে হল না। সত্যি বলছি, যেন কে তো কে গেল! কিন্তু তারপর ভাবনা হল কে এখন রেঁধে দেয়।' আবার বললেন আপন মনে: 'সব রকম খাওয়া' তো আর পেটে সয় না, আর সব সময় খাওয়ার হুঁশও থাকে না। ও বোঝে কি রকমটি ঠিক সয়। এটা ওটা করে দেয়। তাই মনে হল, কে করে দেবে!'

অপূর্ব মমতা। সর্বত্যাগী নির্ভরতা।

শিখিয়ে দিয়েছিলেন সারদাকে: 'গাড়িতে বা নৌকোয় যাবার সময় আগে গিয়ে উঠবে, আর নামবার সময় কোনো জিনিসটা নিতে ভুল হয়েছে কিনা দেখেশুনে সকলের শেষে নামবে।'

ভাবে আছি বলে বাস্তব ভুলব কেন?

বলরাম ঘোষের বাড়ি যাচ্ছেন, সঙ্গে রামলাল আর যোগীন। সকালবেলা। যাচ্ছেন ঘোড়ার গাড়িতে। গাড়ি দক্ষিণেশ্বরের ফটক পর্যন্ত এসেছে, জিগগেস করলেন যোগীনকে, 'কি রে, নাইবার কাপড়-গামছা এনেছিস তো?'

'গামছা এনেছি। কাপড়খানা আনতে ভুল হয়েছে।' কথাটা উড়িয়ে দিতে চাইল যোগীন। 'তা, বলরামবাবুরা আপনার জন্যে একখানা নতুন কাপড় দেখে-শুনে দেবে'খন।'

'সে কি কথা? সবাই বলবে কোত্থেকে একটা হাবাতে এসেছে। কে জানে, তাদের কষ্ট হবে, হয়তো আতান্তরে পড়বে—যা, গাড়ি থামিয়ে নেমে নিয়ে

আয় গে।'

যেমন কথা তেমন কাজ। যোগীন ছুটল ফের কাপড় আনতে।

'ভালো লোক লক্ষ্মীমন্ত লোক বাড়িতে এলে সব বিষয়ে কেমন সুসার হয়ে যায়, কাউকে কিছুতে বেগ পেতে হয় না।' বললেন ঠাকুর, 'আর হাবাতে হতচ্ছাড়া-গুলো এলে সব বিষয়ে বেগ পেতে হয়। যেদিন ঘরে কিছু নেই সেদিনই এসে হাজির হয় হতচ্ছাড়ারা।'

ঠাকুরের সঙ্গে হাজরাও মাঝে-মাঝে আসে কলকাতায়। কিন্তু সেবার সেও ফেলে গিয়েছিল গামছা। দক্ষিণেশ্বরে ফিরে হুঁশ হল।

'কই আমি তো নিজের গামছা বা বটুয়া একবারও ভুলে ফেলে আসি না! ভগবানের নামে কাপড় থাকে না পরনে, কিন্তু ভাবমুখ ছেড়ে বাস্তবমুখে এসে কড়াক্রান্তির ভুলচুক নেই। আর তোর একটু জপ করেই এত ভুল!'

ভক্ত হয়েছিস বলে ভুলো হবি কেন? বোকা হবি কেন?

কে কাকে ভক্তি করে!

'ভক্ত আপনাকেই আপনি ডাকে।' বললে প্রতাপ হাজরা।

'এ তো খুব উঁচু কথা। আপনার ভিতর আপনাকে দেখতে পেলে তো সবই হয়ে গেল। ঐটি দেখতে পাবার জন্যেই সাধনা। আর ঐ সাধনার জন্যেই শরীর।' সার্থক উপমা দিলেন ঠাকুর: 'যতক্ষণ না স্বর্ণপ্রতিমা ঢালাই হয় ততক্ষণ ছাঁচের দরকার। হয়ে গেলে ফেলে দাও মাটির ছাঁচ। ঈশ্বরদর্শন হলে কি হবে আর শরীর দিয়ে?'

তিনি শুধু অন্তরে নন, অন্তরে-বাহিরে! নয়নের সমুখে শুধু নন, নয়নের মাঝখানে! লক্ষ্মী এসেছে এবার। রামেশ্বরের মেয়ে, রামলালের আপন বোন। এগারো বছর বয়েসে বিয়ে হয়েছে। বিয়ে হয়েছে ধনকৃষ্ণ ঘটকের সঙ্গে। সেবার রামেশ্বরের অস্থি নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে এসেছে রামলাল, ঠাকুর জিগগেস করলেন, কেমন আছে লক্ষ্মী?

'তার বিয়ে হয়েছে।' বললে রামলাল।

'বিয়ে হয়েছে? সে বিধবা হবে!' মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল ঠাকুরের।

হৃদয় কাছে বসে ছিল, ফোঁস করে উঠল। 'তাকে আপনি এত ভালোবাসেন, তার বিয়ে হয়েছে শুনে কোথায় তাকে আশীর্বাদ করবেন, তা নয়, কি একটা ছাইভস্ম কথা বলে ফেললেন।'

'কি বললাম বল্ তো!' ঠাকুর তাকালেন শূন্যচোখে।

'কি মাথামুণ্ডু বললেন! শুনে আর কাজ নেই।'

'কি করবো! মা বলালেন যে!' ঠাকুর বললেন গম্ভীর কণ্ঠে: 'লক্ষ্মী মা-শীতলার

অংশ। ভারি রোখা দেবী, আর যার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে সে সামান্য জীব। সে পুড়ে যাবে। সামান্য জীবের ভোগে আসতে পারে না লক্ষ্মী।'

ধনকৃষ্ণ নিরুদ্দেশ হয়েছে। কোথায় কি কাজের সন্ধানে যাচ্ছে বলে বেরুল আর ফিরল না। বারো বছর কেটে গেল। কুশপুত্তলিকা দাহন করে শ্রাদ্ধশান্তি করে খোলসা হল লক্ষ্মী।

শ্বশুরবাড়ির কিছু সম্পত্তি তার ভাগে পড়েছে। তাই শুনে ঠাকুর বললেন, 'কোনো সম্পত্তি জোটাসনি, আঁটকুড়ের আবার সম্পত্তি কি!'

সরিকদের নামে লিখে দিল অংশ।

'ধর্মকর্ম যা সব ঘরে বসে করবি। বাইরে তীর্থে-তীর্থে একলাটি ঘুরে বেড়াবিনে। কার পাল্লায় পড়বি কে জানে। আর ঐ খুড়ির সঙ্গে থাকবি। বাইরে বড় ভয়।' বললেন সারদাকে, 'লজ্জাই নারীর ভূষণ। বল্ না লক্ষ্মী সেই পদটি—অবলার অবলায় বৃদ্ধি, অবলার অবলায় সিদ্ধি।'

নহবৎখানায় প্রতিষ্ঠা হল সারদার। লজ্জারূপেণ সংস্থিতা।

দরমার-বেড়ায় আঙুল-প্রমাণ ছেঁদা হয়েছে একটা। তারই উপর চোখ রেখে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করে সারদা। পাশ থেকে কখনো বা লক্ষ্মী। মন্দিরের প্রাঙ্গণে এত সব নাম-নৃত্য এত সব ভাব-ভক্তি, একটু দেখবে না ওরা? সেই ছেঁদা ক্রমে ক্রমে একটু বড় হয়েছে বুঝি। ঠাকুর পরিহাস করে বললেন রামলালকে, 'ওরে রামনেলো, তোর খুড়ির পরদা যে ফাঁক হয়ে গেল।'

নবতকে বলেন খাঁচা। সারদা আর লক্ষ্মীকে, শুকসারী। নিজের ঘরে ফলমূল মিষ্টি নামলে রামলালকে বলেন, 'ওরে খাঁচায় শুকসারী আছে, ফলমূল ছোলাটোলা কিছু দিয়ে আয়।'

ঠাকুর শুয়ে আছেন খাটের উপর। চোখ বুজে শুয়ে আছেন। সন্ধে হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। খাবার রাখতে সারদা ঘরে ঢুকেছে আলগোছে। বেরিয়ে যাচ্ছে ঠাকুর বলে উঠলেন, 'দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাস।' ভেবেছেন লক্ষ্মী এসেছে বুঝি।

'দিচ্ছি।'

কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলেন ঠাকুর। বললেন, 'আহা, তুমি! আমি ভেবেছিলুম লক্ষ্মী। কিছু মনে কোরোনি।'

দিয়ে যাস? তুই? না, না, তুমি, তুমি। দিয়ে যেও। বন্ধ করে দিয়ে যেও দরজা।

সারা রাত ঠাকুরের আর ঘুম হল না। সকালবেলা নবতে এসে হাজির। বললেন অপরাধীর মত, 'দেখ গো, সারারাত আমার ঘুম হয়নি ভেবে-ভেবে।

কেন অমন রুক্ষ কথা বলে ফেললুম!'

বাপ নেই, মা পাগল, নাম রাধু। শ্রীমা'র ভাইঝি। কি অসুখ করেছে, তাই তার মা শ্রীমাকে গালাগাল দিচ্ছে। 'তুমিই ওষুধ খাইয়ে-খাইয়ে আমার মেয়েকে মেরে ফেললে।' ক্রমেই গলা চড়তে লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে গালাগাল।

শ্রীমা'র অসহ্য মনে হল। বলে উঠলেন পাগলীকে লক্ষ্য করে, 'তোকে আজই মেরে ফেলব। আমি যদি তোকে মারি, দুনিয়ায় এমন কেউ নেই তোকে রক্ষা করতে পারে। আর এতে আমার পাপও নেই পুণ্যও নেই।' পরে বলছেন আপন মনে: 'আমি এমন স্বামীর কাছে পড়েছিলুম কখনো আমাকে তুই পর্যন্ত বলেননি। সরু-চাকলি আর সুজির পায়েস তৈরি করে একদিন সন্ধের পর গেছি ঠাকুরের ঘরে। রেখে চলে আসছি, লক্ষ্মী মনে করে বলছেন, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাস। বললুম, হ্যাঁ, রাখলুম ভেজিয়ে। গলার স্বর টের পেয়ে সঙ্কুচিত হয়ে গেলেন, বললেন, আহা তুমি! আমি ভেবেছিলুম লক্ষ্মী। কিছু মনে কোরো না। পরদিন নবতের সামনে গিয়ে কত অনুনয়। দেখ গো, সারা রাত ঘুম হয়নি ভেবে-ভেবে। আর রাধুর মা কিনা আমাকে দিন-রাত গাল দিচ্ছে। কি পাপে যে আমার এমন হচ্ছে জানি না। হয়তো শিবের মাথায় কাঁটাসুদ্ধ বেলপাতা দিয়েছি। সেই কণ্টকে আমার এই কণ্টক।'

কিন্তু তোর মাথায় যে আমি ফুল দিয়েছি তাতে কি কোনো কণ্টক আছে? কাঁটা না থাকবে তো কাঁদাস কেন এমন করে?

'কেন এত উতলা হন নরেনের জন্যে?' টিপ্পনি কাটে রামলাল।

'ওরে তোর ফেরেনডো যেমন রসিকলাল, নরেনের ফেরেনডো যেমন হাজরা, আমার ফেরেনডো তেমনি নরেন। বলে গেল বুধবার আসবে, ফিরে বুধবার এল তো সে এখনো এল না। তুই একবার গিয়ে খবর নিয়ে আয়, কেমন আছে।'

শেয়ারের গাড়ি না নিয়ে হেঁটেই চলে গেল কলকাতা। পাকড়ালো নরেনকে। বললে, 'কি গো, ঠাকুরকে বলে এলে বুধবারে যাবে, কত বুধবার চলে গেল, তবুও তোমার দেখা নেই।'

'যাব বলে তো ঠিক করি, কিন্তু সংসারের ঝামেলায় হয়ে ওঠে না, দাদা—'

'আজই চলো।'

টেরি কেটে ওরই মধ্যে ফিটফাট হয়ে বাবু সাজল নরেন। দক্ষিণেশ্বরে এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করলে।

তার কপালের ধুলো হাত দিয়ে মুছে দিলেন ঠাকুর। মাথার টেরি উসকো-খুসকো করে দিলেন। বললেন, 'তোর আবার এ সব কেন?' পরে তাকালেন মুখের

দিকে। 'আজ এখানে থাকবি তো?'

না বলতে যেন কান্না পায়। বললে, 'থাকব।'

'ওরে রামলাল, নরেন আজ থাকবে।' উল্লাসে অধীর হলেন ঠাকুর। 'তোর খুড়িকে খবর দে। ভালো করে খাওয়ার বন্দোবস্ত কর। হিন্দুস্থানী রুটি আর ছোলার ডাল।'

শুধু এখানেই খাওয়ান না, নিজের হাতে খাবার বয়ে নিয়ে যান কলকাতায়। একেবারে তার টঙে।

তিন বন্ধুতে মিলে পড়ছে। নরেন, দাশরথি আর হরিদাস। বাইরে হঠাৎ ডাক শোনা গেল: নরেন, ও নরেন!

নরেন ব্যস্ত হয়ে নামতে লাগল। কিন্তু ব্যস্ততর যিনি তিনি উঠে পড়েছেন। বন্ধুরা দেখল, সিঁড়ির মাঝপথে দুজনের সাক্ষাৎকার।

'এত দিন যাসনি কেন? যাসনি কেন এত দিন?' অনুযোগ করছেন ঠাকুর, আর গামছায় বাঁধা সন্দেশ বের করে খাইয়ে দিচ্ছেন নিজ হাতে।

'চল কত দিন গান শুনিনি তোর।'

টঙে উঠে তানপুরা নিয়ে বসল নরেন। কান মলে-মলে সুর বাঁধল। তার পর গাইল গলা ছেড়ে।

জাগো মা কুলকুণ্ডলিনী
তুমি ব্রহ্মানন্দস্বরূপিণী,
তুমি নিত্যানন্দস্বরূপিণী
প্রসুপ্ত ভুজগাকারা আধার-পদ্মবাসিনী।

ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। নরেনের বন্ধুরা ভাবল হঠাৎ কোনো অসুখ হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন বুঝি। জল নিয়ে এল ছুটে। ছিটে দিতে যাবে, বাধা দিল নরেন। বললে, 'দরকার নেই। ওঁর ভাব হয়েছে। আবার গান শুনতে-শুনতেই প্রকৃতিস্থ হবেন।'

যেমন বলা তেমনি। চলল গানের নির্ঝরস্রোত। ঠাকুর চলে এলেন সহজাবস্থায়। বললেন, 'যাবি, আমার সঙ্গে যাবি দক্ষিণেশ্বর? কত দিন যাসনি। চল না আজ। বেশিক্ষণ না হয় নাই থাকলি। আবার না হয় ফিরে আসবি এখুনি। যাবি?'

যাব। ঠাকুরের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল নরেন। পড়ে রইল বই। পড়ে রইল তানপুরা।

BanglaBook.org

শিব গুহ-র বাড়ির ছেলে অন্নদা গুহ। অন্নদার কাছে নরেন আজকাল খুব বেশি আনাগোনা করছে। হাজরা নালিশ করল ঠাকুরকে।

'নরেন অন্নদা এক আপিসওয়ালার বাসায় যায়।' বললেন ঠাকুর। 'সেখানে তারা ব্রাহ্মসমাজ করে।'

'বামুনরা বলে, অন্নদা গুহ লোকটার বড় অহঙ্কার।'

'বামুনদের কথা শুনো না।' ঠাকুর পরিহাস করলেন। 'তাদের তো জানো, না দিলেই খারাপ লোক, দিলেই ভালো। অন্নদাকে আমি জানি, ভালো লোক।'

'শুনলাম বেশ কঠোর করছে আজকাল।' হাজরা বললে। 'সামান্য কিছু খেয়ে থাকে। ভাত খায় চারদিন অন্তর।'

'বলো কি!' যেন একটু আশ্চর্য হলেন ঠাকুর।

শেষে বললেন আত্মস্থের মতো: 'কে জানে কোন ভেক্‌সে নারায়ণ মিল্ যায়।'

'অন্নদার বাড়িতে নরেন আগমনী গাইলে।'

'সত্যি?' ঠাকুর যেন খুশি হলেন। নিরাকার থেকে সাকারে আসছে নরেন? জ্ঞানের প্রাখর্য থেকে ভক্তির স্নিগ্ধতায়?

বলতে-বলতেই নরেন এসে হাজির।

'তুই আগমনী গেয়েছিস? কি রকম গাইলি? গা না একটিবার—'

নরেনকে নিয়ে বাইরে এলেন ঠাকুর। গোল বারান্দা পেরিয়ে গঙ্গার পোস্তার উপরে এলেন। 'গা—না—'

নরেন গান ধরল:

কেমন করে পরের ঘরে ছিলি উমা বল মা তাই।
কত লোকে কত বলে শুনে প্রাণে মরে যাই॥
চিতাভস্ম মেখে অঙ্গে, জামাই বেড়ায় মহারঙ্গে
তুই না কি মা তারি সঙ্গে সোনার অঙ্গে মাখিস ছাই॥
কেমনে মা ধৈর্য ধরে, জামাই নাকি ভিক্ষা করে—
এবার নিতে এলে পরে বলব উমা ঘরে নাই॥

সেই অন্নদা গুহ একদিন এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। 'তুমি তো নরেনের বন্ধু?' উৎসুক হয়ে জিগগেস করলেন ঠাকুর। 'জানো তো ওর বাবা মারা গেছে—'

মাথা হেঁট করে রইল অন্নদা।

'ওদের বড় কষ্ট। দিন চলে না। এখন বন্ধুবান্ধবরা যদি কিছু সাহায্য করে তো বেশ হয়।'

অন্নদা চলে গেলে ঠাকুরকে বকতে লাগল নরেন। সে কি কড়া-কড়া কথা।

'কেন, কেন আপনি ওর কাছে ও সব কথা বলতে গেলেন?'

'তাতে কি হয়েছে?'

'কি হয়েছে মানে? আমার দুঃখ-দৈন্যের কথা যার-তার কাছে বলে-বলে বেড়াবেন? আমার কি একটা মান নেই? আমি কি ভিখিরি?'

বকুনি খেয়ে কেঁদে ফেললেন ঠাকুর। বললেন, 'ওরে তুই ভিখিরি হবি কেন? আমি ভিখিরি হব। আমি দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষে করব তোর জন্যে।'

কিন্তু দুঃখ-কষ্টে দেহই যদি না থাকে তবে সব বৃথা।

'বাঁচবার ইচ্ছে কেন? কেন দেহের যত্ন করি? ঈশ্বর নিয়ে সম্ভোগ করব, তাঁর নাম-গুণ গাইবো, তাঁর জ্ঞানী-ভক্ত দেখে-দেখে বেড়াবো।' ত্রৈলোক্য সান্যালকে বলছেন ঠাকুর: 'তাই মাকে বলেছিলাম, মা, একটু শক্তি দে যাতে হাঁটতে পারি, এখানে-ওখানে যেতে পারি, সঙ্গ করতে পারি জ্ঞানী-ভক্তদের। তা হাঁটবার শক্তি দিলে না কিন্তু—'

তাই কোথায় কোন দোরে গিয়ে তোর জন্যে ভিক্ষে করব?

ঠাকুরের বড় অভিমান হয়েছে মা'র উপর। নরেনের এখনো একটা হিল্লে হল না। দিন-দিন ম্লান হচ্ছে সেই চারুকান্তি! তাই বলছেন ত্রৈলোক্যকে: 'এই দেখ না, নরেন্দ্র—বাপ মারা গেছে, বাড়িতে বড় কষ্ট, কোনো উপায় হচ্ছে না। শুধু দুঃখ ভোগ করছে।' একটু হয়তো থামলেন। বললেন, 'তা কি করা! ঈশ্বর কখনো সুখে রাখেন, কখনো দুঃখে রাখেন—'

'আজ্ঞে, তাঁর দয়া হবে নরেনের উপর।' যেন আশ্বাস দিল ত্রৈলোক্য।

'আর কখন হবে!' অভিমানে কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এল ঠাকুরের: 'তবে কাশীতে অন্নপূর্ণার বাড়ি কেউ অভুক্ত থাকে না! কিন্তু যাই বলো, কারু-কারু সন্ধ্যে পর্যন্ত বসে থাকতে হয়।' নরেন্দ্র কাছেই ছিল, তার দিকে সস্নেহ চোখে তাকালেন ঠাকুর।

'আমি নাস্তিক মত পড়ছি।' নরেন নিস্পৃহের মত বললে।

'দুটোই আছে—অস্তি আর নাস্তি।' বললেন ঠাকুর: 'দুটোই যখন আছে, অস্তিটাই নাও না কেন?'

কী মনে হয় চারদিকে তাকিয়ে? একটা কিছু আছে? না, সমস্তই এলোমেলো, ভাঙাচোরা? ট্রেনে যেতে-যেতে দেখ মাঠের ধারে পোড়ো বাড়ি, ইটের পাঁজা

ভেঙে পড়েছে, ফাটলে-ফাটলে বট-পাকুড়ের জড়িপট। সহজেই বুঝে নিতে পারি, পরিত্যক্ত, জনশূন্য। আবার হঠাৎ কখনো আগ-রাতের দিকে চকিতে একটা আলো-জ্বালা বাড়ি চোখে পড়ে। কাউকে দেখা যায় না বটে, তেরছা আলোয় চোখে পড়ে কোনো আসবাবের টুকরো কিংবা কোনো দেয়ালের পট-পর্দা। কিংবা দিনের বেলায় আরেকটা বাড়িতে গেছে পড়ল, এরিয়েলের তার, কিংবা জামাকাপড় শুকোতে দিয়েছে রেলিঙে। সহজেই বুঝে নিতে পারি লোক আছে। শ্রী আছে, শৃঙ্খলা আছে, স্থিতি-গতি আছে। তেমনি পৃথিবীর চারদিকে তাকিয়ে কি মনে হয় এ একটা দেয়ালে-গাছ-গজানো পোড়ো বাড়ি, না, আলো-জ্বালা গানের-পরশ-লাগা আনন্দ-নিকেতন ?

হয় নীতি, নয় শক্তি, নয় শৃঙ্খলা—একটা তো কিছু আছে। অন্তত একটা ধারা-বাহিকতা। অন্তত একটা পুনরাবৃত্তি। থাকাটাই যদি সত্যি হয় তবে তাই, তাই ভগবান।

'কিন্তু ভগবান তো ভক্তকে দেখবেন।' সুরেশ মিত্তির বললে নরেনের পক্ষ হয়ে। 'নইলে তাঁকে ন্যায়পরায়ণ বলি কি করে ?'

'সেই তো মায়া! ঈশ্বরের কাজ বুঝি এমন আমাদের সাধ্য কি। ভীষ্মদেব শর-শয্যায় শুয়ে। পাণ্ডবেরা দেখতে এসেছেন। সঙ্গে কৃষ্ণ। এসে খানিকক্ষণ পর দেখেন, ভীষ্মদেব কাঁদছেন। কি আশ্চর্য! পাণ্ডবেরা প্রশ্ন করলেন কৃষ্ণকে—পিতা-মহ অষ্টবসুর এক বসু, এঁরমতন জ্ঞানী লোক দেখা যায় না। ইনিও মৃত্যুর মায়াতে কাঁদছেন ? তারই জন্যে কি ? জিগগেস করো ভীষ্মকে। জিগগেস করাতে ভীষ্মদেব বললেন, কৃষ্ণ, ঈশ্বরের কাজ কিছুই বুঝতে পারলাম না। যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ নারায়ন ফিরছেন সেই পাণ্ডবদের বিপদের শেষ নেই। যখনই এই কথা ভাবি তখনই কাঁদি। এই ভেবে কাঁদি ঈশ্বরের কার্য বোঝবার যো নেই।'

'একটু গা না —,' বললেন ফের নরেনকে।

'ঘরে যাই—অনেক কাজ আছে।' ঘুরে দাঁড়াল নরেন।

ঠাকুর অভিমানের সুর মিশিয়ে বললেন, 'তা বাহা, আমাদের কথা শুনবে কেন ? যার আছে কানে সোনা তার কথা আনা-আনা। যার আছে পোঁদে ট্যানা, তার কথা কেউ শোনে না।'

সকলে হেসে উঠল।

'তুমি বাবু গুহদের বাগানে যেতে পারো। প্রায় শুনি, আজ কোথায়, না গুহদের বাগানে। এ কথা বলতুম না—তা তুই কেঁড়েলি করলি কেন ?'

নরেন চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। শেষে বললে, 'যন্ত্র নেই। শুধু গান—'

"আমাদের বাছা যেমন অবস্থা। এইতে পারো তো গাও। তাতে বলরামের বন্দোবস্ত!'

"কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার—', গান ধরল নরেন। ভাবাবেশে তার চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। দেখে ঠাকুরের মহানন্দ!

নরেন কি তবে ধ্যানের পথে? সমাধির পথে? যিনি নাদরহিত, ব্যঞ্জনরহিত, স্বররহিত, উচ্চারণরহিত, রেখারহিত—নরেন কি সেই ব্রহ্মের সন্ধানে?

যেমন তিলের মধ্যে তেল, দুধের মধ্যে ঘি, ফুলের মধ্যে গন্ধ, ফলের মধ্যে রস, কাঠের মধ্যে আগুন, তেমনি শরীরের মধ্যে আত্মা। সর্বব্যাপী, সর্বস্বরূপ। জ্যোতিস্বরূপ, স্বাদস্বরূপ, সৌরভস্বরূপ। বাতাস যেমন আকাশময় ঘুরে বেড়াচ্ছে তেমনি ঈশ্বরও হৃদয়ে ব্যাপ্ত আছেন। হৃদয়ই আকাশ। বাতাস আর ঈশ্বর দুইই নিশ্বাসবস্তু। এই হৃদয়াকাশেই ধরতে হবে সেই সমীরণকে। নরেন কি সেই হৃদয়াকাশের অভিযাত্রী?

'লাল জ্যোতি দেখলুম।' ঠাকুর বলছেন তাঁর আশ্চর্য দর্শনের কথা: 'তার মধ্যে এলে নরেন্দ্র—সমাধিস্থ। একটু চোখ চাইলে। বুঝলাম ওই একরূপে সিমলেতে কায়েতের ছেলে হয়ে আছে। তখন বললাম, মা ওকে মায়ায় বদ্ধ কর। তা না হলে সমাধিস্থ হয়ে দেহত্যাগ করবে।'

॥ ৯৯ ॥

দেহত্যাগের আর দেরি নেই। প্রায়োপবেশনেই সমাধি-শয়ন নেবে এবার।

ঠাকুর এবে কি করতে আছেন? তাঁর ভালোবাসায় তবে আর লাভ কি? তিনি থাকলে যদি মা-ভাই-বোনকে আধপেটা খেয়ে থাকতে হয় তবে তাঁরই বা থাকবার কী অর্থ!

এটর্নির আফিসে কিছু খাটাখাটনি করল ক'দিন। অনুবাদ করল কথামৃত বইয়ের। জল গরম করবার মতও রোজগার নয়।

শত ঠেলা মেরেও সরানো যাচ্ছে না অভাবের হাতিকে। এবার ঠাকুর এসে হাত মেলান। তাঁর মা'র তো অনেক প্রতাপ। মা'র কাছে তাঁর তো অনেক খাতির। এবার তাঁর মাকে বলে-কয়ে একটা ব্যবস্থা করিয়ে দিন।

ছুটল দক্ষিণেশ্বর। একেবারে ঠাকুরের পদপ্রান্তে।

'আপনার মাকে একবারটি বলুন।'

অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'কি বলব?'

'মা-ভাই-বোনের কষ্ট আর দেখতে পারি না।' নরেন বললে প্রায় পরাভূতের

মত : 'ওদের কষ্টের যাতে লাঘব হয়, একটা স্থায়ী চাকরি-বাকরি হয় আমার, আপনার মা'র কাছে সুপারিশ করুন একটু—'

ঠাকুর তাকালেন স্নিগ্ধ চোখে। বললেন, 'আমার মা, তোর কে ?'

পুত্তলিকা। প্রস্তরপ্রতিমা।

নরেন মাথা হেঁট করে রইল। বললে, 'আমার কে না কে, তাতে কী আসে-যায় ? আপনার তো সব। আপনার কথা তো ফেলতে পারবে না। একটু বলুন না আমার হয়ে। যাতে টাকাকড়ির একটু মুখ দেখি। মা-ভাই-বোনের ম্লান মুখে একটু হাসি ফোটাই !'

'ওরে ও সব বিষয়-কথা বলতে পারি না—'

'ও সব বাজে কথা ছাড়ুন।' নরেন মরীয়া হয়ে উঠল : 'আপনাকে বলতেই হবে। নইলে ছাড়ব না কিছুতেই।'

ঠাকুরের চক্ষু দুটি ছলছল করে উঠল। বললেন, 'ওরে, জানিস না, কতবার বলেছি তোর হয়ে। বলেছি, মা, নরেনের দুঃখ-কষ্ট দূর কর্। নরেনকে টাকা দে—'

'বলেছেন ? বেশ, আজ একবার বলুন।'

'তুই গিয়ে বল। কাছে বসে একবার মা বলে ডাক।'

'আমার ডাক আসে না।'

'তারই জন্যে তো হয় না কিছু সুরাহা।' ঠাকুর তাকালেন তার মুখের দিকে। 'তারই জন্যে তো তোর এত কষ্ট। তুই মাকে মানিস না বলে মা আমায় কথাও শোনেন না। শোন—' ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করলেন : 'আজ মঙ্গলবার। রাত্তিরে কালীঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম কর। তার পর যা চাইবি মা'র কাছে, মা দিয়ে দেবেন। লুট করেও মা'র ভাণ্ডার শেষ করতে পারবিনে।'

'সত্যি ?'

'তুই ছাখই না চেয়ে।'

তবে আর ভয় নেই। আকুল হয়ে রাত্রির প্রতীক্ষা করতে লাগল নরেন। প্রার্থনা করা মাত্রই রাত্রির অবসান হয়ে যাবে। সম্পদে-সৌন্দর্যে ভরে উঠবে ঘর-দুয়ার। ক্লেশভার কাঁধে নিয়ে পালিয়ে যাবে দারিদ্র্য। উচ্ছল দক্ষিণ বাতাসের মত আসবে এবার সচ্ছলতা।

কত সহজ সমাধান। শুধু প্রণাম আর প্রার্থনা। শুধু স্বীকৃতি আর সমর্পণ।

উৎকণ্ঠার কণ্টকের উপর দিয়ে হেঁটে-হেঁটে এল সেই মঙ্গলরাত্রি। ক্রমে এক প্রহর কেটে গেল। ঠাকুর এসে বললেন, 'যা এবার শ্রীমন্দিরে। প্রাণ ঢেলে প্রণাম কর। তার পর চা প্রাণ ভ'রে।'

যেন নেশা করেছে নরেন, পা টলতে লাগল। কী না জানি সে দেখবে! কী না জানি শুনবে মা'র মুখের থেকে! প্রস্তরময়ী প্রাণময়ী হয়ে উঠবে। জড়পুত্তলী হয়ে উঠবে সুভাষিণী।

মন্দিরে আর কেউ নেই। শুধু নরেন আর ভবতারিণী।

কী দেখল নরেন চোখ চেয়ে? দেখল অখিল জগতের জননী প্রেম ও প্রসন্নতার নিত্যনিঝরিণী হয়ে বিরাজ করছেন। সৌম্যা সুন্দরী আতিহারিণী। সহস্র-নয়নোজ্জ্বলা হয়ে সংসারে সমারূঢ় হয়ে আছেন। কোথাও শোক নেই দুঃখ নেই অভাব-অভিযোগ নেই।

ত্রিলোকমোহিনী মূর্তির কাছে দাঁড়িয়ে নরেন আর কী প্রার্থনা করবে? প্রণাম করে ভক্তিবিহ্বল হৃদয়ে বলে উঠল, 'মা, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও!'

তন্ময়ের মত ফিরে এল ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর চঞ্চল হয়ে উঠলেন। 'কি রে, গিয়েছিলি মা'র কাছে? চেয়েছিলি টাকাকড়ি?' নরেন বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল। 'কি রে, বলেছিলি আমার সংসারের দুঃখ কষ্ট দূর করে দাও?'

'কি আশ্চর্য, সব ভুল হয়ে গেল। এখন কী হবে?' অসহায়ের মত মুখ করলে।

'যা, যা, ফের যা।' ঠাকুর তাকে ঠেলে দিলেন মন্দিরের দিকে। 'গিয়ে ফের প্রার্থনা কর। মনের কথা মাকে না বলবি তো কাকে বলবি? কেন ভুল হবে? মাকে গিয়ে বল, মা আমাকে চাকরি দে, আরাম দে, স্বাচ্ছন্দ্য দে—'

নরেন আবার এসে দাঁড়াল ভবতারিণীর সমুখে।

সেই কনকোত্তমকান্তিকান্তা দয়ার্দ্রচিত্তা অখিলেশ্বরী। সর্বব্যাপিনী মহতী স্থিতি-শক্তি। শক্তিমতী সত্তা। বিদ্যারূপে উদ্ভাসিনী।

কী আর ভিক্ষা করব মা'র কাছে? মহীরূপে মৃত্তিকারূপে জগৎসংসারকে মায়ের মতনই বুকে করে আছেন। আমিও তো মা'র কোলে অমল শিশু।

'মা, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও—'

আবার ফিরে এল ঠাকুরের কাছে।

'কি রে, এবার চেয়েছিলি ঠিক-ঠিক?'

'পারলুম না। এল না মুখ দিয়ে।'

'সে কি কথা? তুই কি আনাড়ি না আকাট?'

'মাকে দেখামাত্রই কি রকম একটা আবেশ আসে।' নরেন বলতে লাগল মুগ্ধের মত। 'যা চাইবো বলে ভেবেছিলুম তা আর মনে করতে পারলুম না।'

'দূর ছোঁড়া! নিজেকে প্রথমে একটু সামলে নিবি।' ঠাকুর যেন তাকে শিখিয়ে

দিলেন : 'গোড়াতেই তলিয়ে যাবিনে। সামলে নিয়ে চারদিক বুঝে-সমঝে মাথা ঠাণ্ডা করে চাইবি। যা, আরেকবার গিয়ে চেষ্টা কর। এমন সোনার সুযোগ আর আসবে না।' নরেনকে আবার তিনি ঠেলে দিলেন। নরেন আবার এসে পৌঁছুল মন্দিরে।

পরমা মায়া মোক্ষরূপে বসে আছেন সামনে। সুদূরবর্তী আকাশ থেকে সন্নিহিত মৃত্তিকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ তাঁর আনন। দেহবুদ্ধিরূপে তিনি, আবার মনোরূপে তিনি। সুখদুঃখভোক্তা প্রাণরূপে তিনি, আবার বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপে তিনি। তিনি সর্বস্বরূপা সর্বেশ্বরী। হীনবুদ্ধির মত তাঁর কাছে কী লাভ কুমড়ো চাইব! যিনি বরদায়িনী মূর্তিতে অবাধদর্শনা হয়ে আছেন তাঁর কাছে আবার কী ভিক্ষে করব? যিনি সর্ববাধাপ্রশমনী তাঁর সত্তায় বিশ্বাস হোক এবার। তা হলে আর অভাব নেই কাতরতা নেই অন্ধকার নেই।

'আর কিছু চাই না মা, আমাকে জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও।' বারে-বারে প্রণাম করতে লাগল নরেন।

প্রকৃষ্টরূপে অবনত হওয়ার নামই প্রণাম। অহংজ্ঞানকে প্রকৃষ্টরূপে নিপাতিত করার নামই প্রণিপাত। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

মানুষের দরজায়, বিষয়ের দরজায় মাথা ঠুকব না আর। সহস্রশীর্ষে প্রকৃতিরূপিণী জননীকে প্রণাম করব।

'কি রে, চাইলি এবার?' ব্যস্ত হয়ে জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'চাইতে লজ্জা করল!'

'লজ্জা করল!' আনন্দে হাসতে লাগলেন ঠাকুর। নরেন বসল তাঁর পদচ্ছায়ে। তখন ঠাকুর তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বললেন, 'মা বলে দিয়েছেন তোদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না কোনোদিন।'

ও-সবে আর যেন আগ্রহ নেই নরেনের। বললে, 'আমাকে মা'র গান শিখিয়ে দিন।'

'কোন্‌টা শিখ'ব?'

'মা ত্বং হি তারা—সেই গানটা—'

ঠাকুর শিখিয়ে দিলেন।

'মা ত্বং হি তারা
ত্রিগুণধরা পরাৎপরা।
তোরে জানি মা ও দীনদয়াময়ী
তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা॥

BanglaBook.net

তুমি জলে, তুমি স্থলে, তুমিই আদ্য মূলে গো মা,
আছ সর্বঘটে অঙ্গপুটে
সাকার আকার নিরাকারা ॥
তুমি সন্ধ্যা, তুমি গায়ত্রী,
তুমিই জগদ্ধাত্রী গো মা
তুমি অকূলের ত্রাণকর্ত্রী
সদাশিবের মনোহরা ॥'

সারা রাত গাইলে ঐ গান। ঘুমুতে গেল না। নিশীথরাত্রির সঙ্গীতময়ী মহতী সভায় আচ্ছন্ন হয়ে রইল।

পরদিন দুপুরবেলা পর্যন্ত ঘুমুচ্ছে নরেন। তার পাশে বসে আছেন ঠাকুর। যেন পাহারা দিচ্ছেন।

বৈকুণ্ঠ সাঙ্গাল এসেছে।

'ওরে এই ছেলেটিকে চিনিস? এ বড় ভালো ছেলে, নাম নরেন্দ্র।'

'এখনো ঘুমুচ্ছে যে?'

'কাল সমস্ত রাত মা'র গান গেয়েছে—মা ত্বং হি তারা। গাইতে-গাইতে রাত কাবার। কাল কী হয়েছিল জানিস নে বুঝি?'

কৌতূহলী হয়ে তাকাল বৈকুণ্ঠ।

'মাকে আগে মানত না, কাল মেনেছে। কষ্টে পড়েছিল তাই মা'র কাছে গিয়ে টাকাকড়ি চাইতে বলে দিয়েছিলাম। তা গিয়েছিল চাইতে, কিন্তু পারল না! লজ্জা করল!' বলতে-বলতে আনন্দে উছলে পড়ছেন ঠাকুর: 'বললে, ফুল-ফল চেয়ে কী হবে, মা তোকেই চাই। তাই গান শিখে নিয়ে গাইলে সমস্ত রাত—তুমি অকূলের ত্রাণকর্ত্রী, সদাশিবের মনোহরা। কালী মেনেছে নরেন, মা মেনেছে, বেশ হয়েছে—তাই না?'

বৈকুণ্ঠ সায় দিল: 'বেশ হয়েছে।'

হাসতে লাগলেন ঠাকুর: 'নরেন কালী মেনেছে, মা মেনেছে—কী বলো, বেশ হয়েছে। কেমন? তাই না?'

যা দেবী সর্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

boiRboi.net

'আত্মজীবনী লেখা মানে কতগুলো মিছে কথার জাল বোনা।' বলছেন গিরিশ-চন্দ্র। 'শুধু লোকের কাছে দেখাবার চেষ্টা আমি খুব বাহাদুর—আমার খাওয়া, শোওয়া, ঘুম, স্বপ্ন, চিন্তা সব অসাধারণ। দোষগুলি ঢাকা দিয়ে আমি মস্ত একজন ভগবানের স্পেশ্যাল-মার্কার তৈরি—এই তো বলতে হবে। দম্ভের এর চেয়ে আর কিছু প্রকাশ হতে পারে না। শুধু পালিশ করে নিজেকে দেখানো, আমি কত মহৎ, কত উদার, কত প্রতিভাশালী। আত্মজীবনী মানে নিজের ওকালতি করা।'

'কেউ-কেউ তো আত্মজীবনীতে নিজের দুষ্প্রবৃত্তির কথাও বলে থাকেন।' বললেন একজন।

'তাও নিজের মহত্ত্ব প্রকাশ করবার জন্যে।'

আমার অহঙ্কার ভেঙে ফেল, ধুলো করে দাও। একটি ফুৎকারে উড়িয়ে দাও মৃত-পত্রের জঞ্জাল, আবার একটি ফুৎকারে বাজিয়ে তোলো স্তম্ভিত সমুদ্রের শঙ্খ। নিজের পুচ্ছের আলোতে জোনাকির মত আত্মসংসার আলোকিত দেখছি, সে সীমার বাইরে আর সবই অস্বীকৃত—এবার দেখাও তোমার স্পর্শপ্রগাঢ় অন্ধকার। যেখানে বিচ্ছিত্তি নেই, বিবিক্ততা নেই, শুধু অনন্ত অন্তর্ব্যাপ্তি। তুমি যদি পুত্রের থেকে প্রিয়, বিত্তের থেকে প্রিয়, অন্যতর সমস্ত কিছুর থেকে প্রিয়, তবে সুখ-সাধনদ্রব্যে কেন সমাসক্ত রেখেছ? ভেঙে দাও এই মধুপাত্র। ভোগ তো একরকম মনোবিকার। ভেঙে দাও এই মত্ততার স্বপ্ন। কাটিয়ে দাও এই রোগরাত্রি। অহং থেকে আত্মাতে নিয়ে চলো।

'আহা, বসেছেন দেখ না!' বললেন ঠাকুর, 'যেন গোঁফে চাড়া দিয়ে সাইনবোর্ড মেরে বসেছেন!'

কিন্তু গোঁফের তেজ কতদিন! কতদিনই বা সাইনবোর্ডের চাকচিক্য। একজন এলে আরেকজন যায়। আরেকজন এলে সে-একজন থাকে না। তাদের চিরকালের ঝগড়া। কিছুতেই তারা থাকতে পারে না একসঙ্গে। একজনের প্রকাশে আরেকজনের পলায়ন। তারা হচ্ছে 'আমি' আর 'তিনি'। অহং আর আত্মা। হয় আমি থাকি নয় তুমি থাকো। আর, তুমি যদি আসো আমি কোথায়! 'পাছে অহঙ্কার হয় ব'লে গৌরীচরণ "আমি" বলত না—বলত "ইনি"। আমিও তার দেখাদেখি "ইনি" বলতাম। আমি খেয়েছি না বলে বলতাম ইনি খেয়েছেন। সেজবাবু তাই দেখে একদিন বললে, 'সে কি কথা, তুমি কেন ওসব

বলবে? ওসব ওরা বলুক, ওদের অহঙ্কার আছে। তোমার তো আর অহঙ্কার নেই।'

না, আমারও বুঝি অহঙ্কার হত মাঝে-মাঝে!

পূর্বকথা, বেলতলায় তন্ত্রের সাধনার কথা বলতে গিয়ে বললেন ঠাকুর, 'যেদিনই অহঙ্কার করতুম তার পরদিনই অসুখ হত।'

দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ির সেই মেথরানির কথা মনে নেই? তার যে কি অহঙ্কার! গায়ে দু-একখানা গয়না ছিল। যে পথ দিয়ে আসে গয়নার ঝলস দিয়ে বলে, এই, সরে যা! তার মানে, এই দেখে যা! মেথরানিরই এই, তা অন্য লোকের কথা আর কি বলবো!

একমাত্র নিরহঙ্কার যুধিষ্ঠির। পাঁচ ভাই চলেছে মহাপ্রস্থানে। সর্বপ্রথম পড়ল সহদেব। ভীম জিগগেস করল, সহদেবের পতনের কারণ কি? যুধিষ্ঠির বললেন, সহদেব মনে করত তার মত প্রাজ্ঞ আর কেউ নেই—সেই অহঙ্কারে। তার পরে পড়ল নকুল। নকুল পড়ল কেন? নকুল ভাবত তার মত রূপবান আর কেউ নেই—সেই অহঙ্কারে। তার পরে অর্জুন। অর্জুন ভাবত, আমিই সর্বাগ্রগণ্য ধনুর্ধর—সেই অভিমানে। তার পরে ভীম। আমি কেন পড়লুম? তুমি অতিরিক্ত ভোজন করতে, অন্যের শক্তি উপেক্ষা করে নিজের শক্তির শ্লাঘা করতে, সেই দর্পে। সশরীরে স্বর্গে এলেন শুধু যুধিষ্ঠির।

তোমার দম্ভ নয়, তোমার দয়া!

নদীতীরে বসে তপস্বী সন্ধ্যা করছিলেন, এক নিরাশ্রয় বৃশ্চিক ভাসতে-ভাসতে সেখানে এসে উপস্থিত। স্থলে আশ্রয় দেবার জন্যে জল থেকে তাকে তুললেন তপস্বী। তুলতে-না-তুলতেই বৃশ্চিক তাঁকে দংশন করল। বিষজ্বালায় অস্থির হয়ে জলে তখুনি তাকে ছুঁড়ে ফেললেন। জলে পড়ে বিপন্ন বৃশ্চিক আবার হাবুডুবু খেতে লাগল। দেখে আবার দয়া হল তাপসের। আবার তাকে তুললেন হাতে করে। আবার দংশন। আবার নিক্ষেপ। পরে ভাবলেন, বৃশ্চিক তার নিজের ধর্ম বারে-বারে পালন করছে বারে-বারে দংশন করে, কিন্তু আমি কেন ধর্মভ্রষ্ট হচ্ছি? আমার সহজাত দয়া। আমি কেন তাকে জলে ছুঁড়ে ফেলছি? আমার চেয়ে বৃশ্চিক বেশি স্বধর্মাশ্রিত। এই ভেবে আবার তাকে তুললেন জল থেকে। দংশন করলেও এবার আর ফেললেন না। স্থলেই স্থান করে দিলেন।

বার-বার ঘষলেও চন্দন চারুগন্ধ। বার-বার ছিন্ন করলেও ইক্ষুকাণ্ড মধুস্বাদু। বার-বার দগ্ধ করলেও কাঞ্চন কান্তবর্ণ। তেমনি যারা সজ্জন তারা প্রকৃতিবিকৃতিশূন্য। তোমার ক্ষোভ নয়, তোমার ক্ষমা।

তুমি অতৃণ মাঠ। সেখানে আগুন পড়লেও বা কি। আগুন মাটির স্পর্শে আপনিই শান্ত হয়ে যায়। তপ্ত লৌহকে ছেদন করবার জন্যে তোমার হাতে শীতল লৌহ। ধূলির ধরণীতে তুমিই ধরাধর।

তুমি পিঁপড়েটির পর্যন্ত নিন্দা করো না। বরং তার পায়ের নূপুরগুঞ্জনটি শোনো।

'নগণ্য পিঁপড়ের পর্যন্ত নিন্দে কোরো না।'

এ সংসারে সুখ দুর্লভ, সুখই আবার সুলভ। তাই কেউ যদি আমার নিন্দা করে প্রীতিলাভ করে, সমক্ষেই হোক বা অসাক্ষাতেই হোক, করুক, আনন্দ পাক। নিন্দা করার অধিকার দিয়েই তাকে আমি অভিনন্দিত করছি।

ভববল্লী কি? তৃষ্ণা। দারিদ্র্য কি? অসন্তোষ। দান কি? অনাকাঙ্ক্ষা। ভোগ্য কি? সহজ সুখ। ত্যাজ্য কি? অহঙ্কার।

নিজের অন্তরঙ্গদের দেখবার জন্যে ব্যাকুল তখন ঠাকুর। রাতে ঘুম নেই। কালী-মন্দিরে বসে-বসে কাঁদেন। বলেন, 'মা, ওর বড় ভক্তি, ওকে টেনে নাও। মা গো, ওকে এখানে এনে দাও; যদি সে না আসতে পারে তা হলে আমাকে সেখানে নিয়ে যাও। আমি দেখে আসি।'

থেকে-থেকে তাই ছুটে আসেন বলরাম বসুর বাড়িতে। সেখানেই প্রেমের হাট বসিয়েছেন। বলেন, 'জগন্নাথের সেবা আছে বলরামের। খুব শুদ্ধ অন্ন।' এসেই বলরামকে বলেন, 'যাও, নরেন্দ্রকে, ভবনাথকে, রাখালকে নিমন্ত্রণ করে এস। এদের খাওয়ালে নারায়ণকে খাওয়ানো হয়। এরা সামান্য নয়, এরা ঈশ্বরাংশে জন্মেছে। এদের খাওয়ালে তোমার ভালো বই মন্দ হবে না।'

বলরাম আবার একটু হাত-টান।

ঠাকুরকে একদিন গাড়ি করে দিয়েছে দক্ষিণেশ্বর যাবে। ভাড়া ঠিক করেছে বারো আনা। সে কি কথা! বারো আনায় দক্ষিণেশ্বর?

'তা ও অমন হয়।' ঘাড় নেড়ে দিয়ে চলে গেল বলরাম। শেষকালে কেলেঙ্কার। রাস্তার মাঝেই গাড়ি পড়ল ভেঙে। ঘোড়া আর যেতে চায় না। চাবুক চালালো গাড়োয়ান। তখন সেই ভাঙা গাড়ি নিয়েই দে-দৌড়। পড়ি কি মরি ঠিক নেই। যখনই দেখবে বন্দোবস্তটা একটু শিথিল বা কৃপণ, তখনই ঠাকুরের ভাষায় 'বলরামের বন্দোবস্ত'। গাড়ি না করে ঠাকুর যদি নৌকোয় আসেন তবেই যেন বলরাম বেশি খুশি। কড়া-গণ্ডা উশুল করে নেওয়ার পক্ষপাতী। তাই বললেন একদিন ঠাকুর, 'যখন খ্যাট দিয়েছে তখন নিশ্চয়ই আজ বিকেলে নাচিয়ে নেবে।' কীর্তনের সময় ঠাকুর যখন নাচেন তখন বলরাম খোল বাজায়। সে আবার

আরেক যন্ত্রণা। বলরামের তালবোধ নেই, তার ভাবখানা হচ্ছে এই, আপনারা গাও নাচো আনন্দ করো, আর আমি যেমন-তেমন খোলে চাঁটি মারি।

হাজরা ঠাট্টা করে বলে, 'তোমার খালি বড়লোকের ছেলের দিকে টান।'

'তাই যদি হবে তবে হরীশ, নেটো, নরেন্দ্র—এদের ভালোবাসি কেন? ভাত সুন দে খাবার পয়সা জোটে না নরেন্দ্রর।'

বলরাম জিগগেস করল, 'সংসারে পূর্ণজ্ঞান হয় কি করে?'

'শুধু সেবা করে। মায়ের সেবা করে। জগতের মা-ই সংসারের মা হয়ে এসেছেন।' বললেন ঠাকুর। 'যতক্ষণ নিজের শরীরের খবর আছে ততক্ষণ মা'র খবর নিতে হবে। তাই হাজরারে বলি, নিজের কাশি হলে মিছরি মরিচ করতে হয়। যতক্ষণ এ সব করতে হয় মা'র খবরও নিতে হয়। তবে যখন নিজের শরীরের খবর নিতে পাচ্ছি না, তখন অন্য কথা। তখন ঈশ্বরই সব ভার লন।'

ঠাকুর ও ভক্তদের খাওয়াবার নিমন্ত্রণ করে ডেকে এনেছে বলরাম। বারান্দায় বসে গিয়েছে সার বেঁধে। দাসের মতন দাঁড়িয়ে আছে বলরাম, প্রভুর মত নয়। তাকে দেখলে কে বলবে সে এ বাড়ির কর্তা।

একদিন ভাবদৃষ্টিতে বলরামকে দেখলেন ঠাকুর। বটতলা থেকে বকুলতলা পর্যন্ত দেখলেন চৈতন্যদেবের সঙ্কীর্তনের দল চলেছে। তার পুরোভাগে বলরাম। কিরূপ ভক্ত এখানে আসবে আগে থেকে তা দেখিয়ে দেয় মহামায়া। বলরাম না এলে চলবে কেন? নইলে মুড়ি-মিছরি সব দেবে কে?

প্রথম যেদিন দেখলেন দক্ষিণেশ্বরে, বললেন, 'ওগো মা বলেছেন তুমি যে আপনার জন। তুমি যে মা'র একজন রসদদার। তোমার ঘরে এখানকার অনেক জমা আছে—কিছু কিনে পাঠিয়ে দিও।'

তাই দেয় বলরাম। চাল-ডাল চিনি-মিছরি আটা-সুজি সাগু-বার্লি। বলেন ঠাকুর, 'ওর অন্ন আমি খুব খেতে পারি। মুখে দিলেই যেন আপনা হতে নেমে যায়।'

দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির নাম রেখেছেন 'মা কালীর কেল্লা'—প্রথম কেল্লা। দ্বিতীয় কেল্লা হচ্ছে বলরামের বাড়ি। ৫৭ রামকান্ত বসু স্ট্রীট।

সেই বাড়িতেই ঠাকুরের সঙ্গে গিরিশ ঘোষের দ্বিতীয় দেখা।

প্রথম দেখা এটনি দীননাথ বোসের বাড়িতে। বোসপাড়া লেনে। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পড়ে প্রথম জানতে পায় পরমহংসদেবের কথা। এ আবার কেমন পরমহংস! ব্রাহ্মরা বেশ ভোল বদলাচ্ছে যা হোক। হরি ধরেছে, মা ধরেছে, এবার মনের মত এক পরমহংসও খাড়া করেছে দেখছি। ভেলকি ধরেছে মন্দ নয়। এমনি করে লোক বাগাবার মতলব। যাই একবার দেখে আসি গে।

বেজায় ভিড় হয়েছে। ঠাকুরকে ঘিরে বহু ভক্তের সমাগম। ঐ বুঝি কেশব সেন। ঘন-ঘন সমাধিস্থ হচ্ছেন ঠাকুর আবার সমাধিভঙ্গের পর উপদেশ দিচ্ছেন। যারা শুনছে তারা যেন কর্ণ দিয়ে সুধা পান করছে।

সন্ধে হয়েছে। সেজ জেলে রেখে গেল ঠাকুরের সামনে। ঠাকুরের তখনো অর্ধ-বাহ্যদশা। বললেন, 'সন্ধে হয়েছে?'

ঢং! গিরিশের মন তেতে উঠল। দিব্যি সেজ জ্বলছে সামনে, আর বলছে কিনা, সন্ধে হয়েছে? সন্ধে না হলে আলো কেন?

সন্ধে হয়েছে? আবার জিগগেস করলেন ঠাকুর।

হ্যাঁ, হয়েছে। কে একজন বলে উঠল।

কেউ একজন না বলে দিলে যেন সন্ধে হয়েছে কিনা বোঝা যাবে না! চোখের সমুখে আলো জেলে দিলেও না! বুজরুকি আর কাকে বলে! বিরক্তিতে সমস্ত মন বিষিয়ে উঠল গিরিশের। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

বাড়ি ফিরলে জিগগেস করলে পিসেমশাই, সদরালা গোপীনাথ বোস, 'কেমন দেখলে হে?'

একবাক্যে নস্যাৎ করল গিরিশ, 'বুজরুকি।'

॥ ১০১ ॥

দ্বিতীয় দেখা বলরাম-মন্দিরে।

অনেককেই নিমন্ত্রণ করেছে বলরাম। গিরিশকেও। কিন্তু ও কে?

ওকে চেন না? ও বিধু। কীর্তনওয়ালী।

ঠাকুরকে প্রণাম করল বিধু। ঠাকুরও মাটিতে মাথা রেখে দীনভাবে নমস্কার করলেন। কথা বলতে লাগলেন বিধুর সঙ্গে। পরিহাসমধুর সরল আলাপ।

অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ছিলেন সেখানে। তাঁর ভালো লাগল না। গিরিশের সঙ্গে জানাশোনা, তাই তাকেই জানালেন তাঁর বিরক্তি। বললেন, 'চলো হে গিরিশ আর কী দেখবে?'

'না, আরো একটু দেখি।'

'এই তো দেখলে—' প্রায় জোর করে টেনে নিয়ে গেলেন গিরিশকে।

গিরিশ দেখেও দেখল না, বুঝেও বুঝল না।

চৈতন্যলীলা অভিনয় করছে গিরিশ। দৃশ্যপট আঁকছে যে চিত্রকর তার সঙ্গে কথা কইছে। আঁকিয়ে গৌরভক্ত। ভক্তি না হলে রেখায় ফুটবে কি করে পেলবতা! চোখে জাগবে কি করে সংবেদনের স্বপ্ন!

'তোমার গৌরাঙ্গের মহিমা কিছু বলতে পারো ?'

পারি বৈকি। তাঁকে দেওয়া ভোগের রুটিতে তাঁর দাঁতের দাগ দেখি।

'বলো কি হে—'

'সারাদিন খেটে-খুটে বাড়ি ফিরি। বাড়ি ফিরে স্নান করে নিজের হাতে রাঁধি। গৌরহরিকে ভোগ দিই। আকুল হয়ে ডাকি তাঁকে অন্ধকারে। দেখি তিনি খেয়ে গেছেন। ভোগের রুটিতে তাঁর দাঁতের দাগ।'

অন্তরের প্রেমধ্যানটি চোখে-মুখে ফুটে রয়েছে। অগাধ বিশ্বাসের স্বচ্ছ সরোবরে ভক্তির শ্বেতপদ্ম। এ যেন সেই তনু বিনু পরশ নয়ন বিনু দেখা।

ঘরের দরজা বন্ধ করে কাঁদতে বসল গিরিশ।

কবে নিজের রূপ ভুলে অরূপের রূপ দেখতে পাব ? কে দেবে আমাকে সেই তৃতীয় নয়ন ? কে আমাকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাবে ? কে দেবে সেই আলোকময়ের সংবাদ ?

চৈতন্যলীলা মূর্ত হল রঙ্গমঞ্চে। নামল জগাই-মাধাই। গগনমণ্ডপ থেকে নামলেন গৌরচন্দ্র। বাজল খোল-করতাল। হরিনামের বান ডেকে এল। সবাই ডুবল সেই নামপ্রেমসাগরে।

'থিয়েটারে গৌর নেমেছে। তীর্থ হয়েছে নাট্যশালা। বসে গিয়েছে ভক্তির চাঁদনি বাজার। চল দেখে আসি—'

লোক আসছে দলে-দলে। শহর-গ্রাম ভেঙে। দিগ্বিদিক হয়ে। কিন্তু হে অমানীমানদ, দূর্বাদলশ্যামমূর্তি, তুমি কবে আসবে ? হে লাবণ্যমনোরম, কবে দেখব তোমাকে ?

মাধাই বলছে জগাইকে : 'জগা তুই নাচছিস কেন ?'

'বৈরাগী হব। ব্যাটারা কিন্তু বেড়ে গায়, হরি হে দেখা দাও। মেধো, আমায় তেলক কেটে দিতে পারিস ?'

'আচ্ছা হরে কে রে শালা, জগা, জানিস ?' মাধাই টলছে নেশার ঝোঁকে : 'আমি হলে বলতেম, ধরে লে আও শালাকো! আমার মনে হয় এক শালা মালপো-ওয়ালা। খিদে পেলেই ডাকে।'

'চিল্লে খিদে বাগিয়ে নেয়। আমার তো চারখানা খেতেই কুপোকাৎ। আর ওরা এক-এক ব্যাটা রাধা বলে আর বিশখানা ওড়ায়।'

'এক শালাকে একদিনও বাগে পেলুম না।' মাধাই আপসোস করল।

জগাই ঠেলা মেরে বললে, 'তুই শালা যে মাতাল হয়ে ভোঁ হয়ে থাকিস—'

'আথ মাতাল বলিস তো ভালো হবে না। কোনো দিন মাতাল দেখেছিস ? তুই যেমন ছটাকে—আমি দুসের খেয়ে সানসা আছি। এখন চলেছিস কোথায় ?'

'চল না কেত্তন শোনা যাক গে। ব্যাটারা বেড়ে বাজায়—'

'তুই বড় গান শোননেওয়ালা—' ঠেলা মারল মাধাই।

'ওরে বেশ এক রকম রাধে-রাধে বলে, আমার ভাই রাধী নাপতিনীকে মনে পড়ে।'

'তুই দেখছি বৈরাগী হবি—'

'তোর চৌদ্দ পুরুষে বাহান্ন পুরুষ বৈরাগী হোক।'

আহত অভিমানের সুরে মাধাই বললে, 'ভেয়ের চৌদ্দপুরুষ তোলে রে শালা?'

কে এরা জগাই মাধাই? এরা কি দুকড়ি সেন আর স্বয়ং গিরিশচন্দ্র?

ট্যাকে মটর-ভাজা, গিরিশের বাড়িতে এসেছে দুকড়ি। এসেছে মদের পিপাসায়। বাবা, সঙ্গে 'দোশ্ত মটর' আছে, এখন একটু মদিরা পেলেই দাহ মেটে।

মদ নেই। আসবাব-পত্র পালিশ করবার জন্যে এক বোতল মেথিলেটেড স্পিরিট আছে। তাই সই।

নরেন সেই স্পিরিট ঢেলে দিল গেলাসে। জল না মিশিয়ে অম্লানবদনে তাই টেনে নিল দুকড়ি। অম্লানবদনে দগ্ধ মটর চিবুতে লাগল।

'এ করলে কি?' নরেনকে ধমকে উঠল গিরিশ: 'এ যে সাক্ষাৎ বিষ। লোকটা যে এক্ষুনি মারা যাবে।'

'আরে মশাই, ওতে আমার কি হবে?' অম্লানবদনে বললে দুকড়ি সেন। 'ও আমি নিত্য খাই।'

'বোতল-বোতল মদ খেয়েছি। একদিন বাইশ বোতল বিয়র খেয়েছিলুম।' অতীতের কথা বলছেন গিরিশচন্দ্র। 'মদ খেয়ে দেখেছি কি জানো? জোর করে মনকে ধরে রাখা—সে চেষ্টায় আবার অবসাদ আসে—আবার সেই অবসাদ দূর করার জন্যে আবার মদ খাও।'

'তামাক?' জিগগেস করলেন কুমুদবন্ধু।

'তামাক! তামাক ঢের দেখেছি। ওর ঝাড়ে-বংশে খেয়েছি। শুধু কি তামাক? গাঁজা, আফিং, চরস, ভাং—কিছু বাকি রাখিনি।'

'তাই বলে গাঁজা?'

'গাঁজাতে ভীষণ উইল-পাওয়ার বাড়ে। যখন গাঁজা টেনে বুঁদ হয়েছি, তখন সত্যি-সত্যি রোগ সারিয়েছি উইল-পাওয়ারে। কিন্তু যা বলো, আফিঙের মত ছে টলোক নেশা আর নেই। আমার শেষ নেশা দাঁড়িয়েছিল আফিং। একদিন আঙুর কিনেছি কতগুলি। অবিনাশ, বামুনের ছেলে, সর্বদা আসে এখানে। ওকে চারটে আঙুর দিলাম। কিন্তু দেবার পরক্ষণেই মনে হল চারটে না নিয়ে দুটো দিলেই হত। তখন

মনে-মনে বিচার করলাম—মন শালা এত ছোটলোক হল কেন? ভেবে-চিন্তে দেখলাম, আফিঙের এই কাজ। তখন দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে আফিং ত্যাগ করলাম—'

'আর সব?'

'সব ছেড়েছি।'

'ছাড়তে পারলেন?' বিস্ময়ে ও ভক্তিতে আপ্লুত কুমুদের কণ্ঠস্বর।

'সাধে ছেড়েছি? প্যায়দায় ছাড়িয়েছে।'

'কোনো নেশা করতে ইচ্ছে হয় না?'

'ঠাকুরের ইচ্ছেয় হয় না।' অশ্রুতে আচ্ছন্ন হয়ে এল গিরিশের চোখ: 'জীবনে অনেক অকাজ-কুকাজ করেছি। কোনো পাপ করতে আমার বাকি নেই। সব রকম হয়েছে। কিন্তু ওই আমার গৌরবের পসরা। ধুলোকাদা মেখেই দাঁড়িয়েছি ঠাকুরের সামনে। শুধু এই আমার গৌরব—আর আমার কিছু নেই—এই আমার পাপ, এই আমার ধুলোকাদা। এখন তুমি কোলে তুলে ধুলোকাদা মুছে নাও তো নাও—'

আর আমার কিছু নেই। আমার শুধু শরণাগতি। আমার শুধু সমর্পণের তর্পণ। তুমি যদি আমাকে ফেলে দেবে তো দাও। কিন্তু কোথায় তুমি ফেলবে? যেখানে ফেলবে সেখানেও তোমার কোল মেলা। তোমার কোলের বাইরে তো আর জায়গা নেই। তাই যেখানে রাখবে সেখানেই আমি তোমার কোলে ব'সে।

শাস্ত্রে বলে, কাশীতে মরলে মুক্তি মেলে। তাই মৃত্যুকালে কব'র চললেন কাশী ছেড়ে। বললেন, কাশীর বাইরেও যে মুক্তি আছে এটি প্রত্যক্ষ করব।

পরিচ্ছন্ন ও পুণ্যকচিকে স্থান দেবে এর মধ্যে বাহাদুরি কি! যে কাঠে ঘুণ ধরে তাকে যজ্ঞের সমিধ করতে পারো তবেই বুঝি বাহাদুরি। যে লোহায় মরচে ধরে তাকে করতে পারো স্বর্ণপ্রভ তবেই বুঝি তোমার কৃতিত্ব। আর যে দেহে কামের বালা তাকে করতে পারো তোমার মোহন মুরলী তবেই বুঝি তুমি কত বড় কারিগর।

তোমার দরশ-পরশ যে অমৃতসরস তা বুঝি কি করে? তোমার প্রেম যে শুনি স্পর্শ-মণি তার প্রমাণ কি? আমার হৃদয় ছাড়া কোথায় আর তার পরখ হবে? যদি আমিও হিংশায় হতে পারি তবেই তো বলতে পারি তোমার প্রেম পরমধন পরশ-মণি। আমি যদি নিরাময় হতে পারি তবেই তো জানবে জগজ্জনে, তুমি অন্নময় অমৃতময় কল্যাণ-করুণাময়। তুমি রোগার্তের ভিষক, অকিঞ্চনের সর্বস্ব, দরিদ্রের অক্ষয় কোষাগার।

যখন তপ্ত লোহার শলাকা দিয়ে বিদ্ধ করে ছিদ্র করেছ তখন বুঝিনি, যন্ত্রণায়

আর্তনাদ করেছি, কিন্তু এখন যখন হাতে তুলে মুরলী করে বাজাচ্ছ, তখন এই বলে কাঁদছি, শুধু সপ্ত ছিদ্র না করে কেন আমাকে তুমি শতচ্ছিদ্র করোনি? বাঁশকে যদি বাঁশিই না করবে তবে কেমন তুমি বংশীধর?

'চৈতন্যলীলা' অভিনয় দেখে বৈষ্ণব বাবাজীরা ভয়ানক বিগলিত হয়েছে। সব সময়ে ঘিরে আছে গিরিশকে। তার হল্‌ঘরে তাদের ঘনঘন আনাগোনা। কেউ বলছে তার মধ্যে নিত্যানন্দ আবির্ভূত হয়েছেন, কেউ বলছে আপনার উপর মহাপ্রভুর কী কৃপা! গিরিশ দেখল তার কাজকর্মের সমূহ বিপদ। এদের না তাড়ালে রক্ষে নেই।

সে দিন হল্‌-ভর্তি লোক। বাবাজী বৈষ্ণবদেরই ভিড়। কেউ বলছে, কি ভক্তি, কেউ বলছে, কি প্রেম! কেউ বলছে, কি গান! এমন সুধার হরিনাম সাধের পণে কিনবি আয়!

বোতল খুলে গেলাশে মদ ঢালল গিরিশ।

'কি খাচ্ছেন? ওষুধ?' জিগগেস করল এক বাবাজী।

আরেক জন গদগদ হবার চেষ্টায় বললে, 'ও কি মহাপ্রভুর চরণামৃত?'

'না, মদ।' গিরিশ একটা বোমা ফেলল ঘরের মধ্যে।

'রামো! রামো!' নাকে-কানে কাপড় গুঁজে পালালো বাবাজীরা।

হ্যাঁ, মদের নেশা। পদের নেশা। ঈশ্বরপদের নেশা। নেশা ছাড়তে-ছাড়তে চলেছি। একটার পর আরেকটা। নতুনের পর আরো নতুন। নেশা ছাড়া নিশি নেই। সর্বশেষে সর্বনাশের নেশা। শিখর-শিহর।

চৌরাস্তায় রকে বসে আছে গিরিশ। ভক্তপরিবৃত হয়ে সমুখ দিয়ে চলে গেলেন ঠাকুর। চোখের পরে চোখ পড়ল। এক চোখের আকাশ থেকে আলো এসে পড়ল আরেক চোখের উঠোনে।

হৃদয়ের ঘুড়িতে যেন কার সুতো বাঁধা। টান পড়েছে ঘুড়িতে। কান্নিক খাচ্ছে।

'আপনাকে ডাকছেন পরমহংসদেব।' একজন ভক্ত এসে খবর দিল।

লাফিয়ে উঠল গিরিশ। 'কোথায়?'

বলরাম-মন্দিরে।

আর কথা নেই, ডাক এসে গেছে। কিন্তু পাব কি ঠিকানা? ঠিকানা পেলেও কি পারব পৌঁছুতে?

'বাবু আমি ভালো আছি। বাবু আমি ভালো আছি।' আপন মনে বলছেন ঠাকুর। এ কি গিরিশকে উদ্দেশ করে বলা?

বলতে-বলতে ভাবান্তর হল ঠাকুরের। বললেন, 'না, না, এ ঢং নয়। এ ঢং নয়।'

কি করে বুঝলেন আমার মনের কথা? কে এ সত্যবাক, সত্যজ্ঞানী? যে রূপে যা নিশ্চিত তাই সত্য। সর্বরূপে নিত্য যে বিরাজিত সেই সত্য। সমস্ত সংশয়খিন্ন বুদ্ধির উপরে সেই সত্যই কি জ্বলছে সূর্যের মত?

সরাসরি আলাপ হল গিরিশের সঙ্গে।

'গুরু কি?' জিগগেস করল গিরিশ।

'ঐ যে, কুটনি। যে মিলন ঘটিয়ে দেয়। ঘটক।'

সচ্চিদানন্দই গুরুরূপে আসেন। গুরুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভাবতে হয়, তবে তো মন্ত্রে বিশ্বাস হবে? বিশ্বাস হলেই বিশ্বজয়। একলব্য কি করেছিল? মাটির দ্রোণ তৈরি করে বাণশিক্ষা করেছিল। মাটির দ্রোণ নয়, সাক্ষাৎ দ্রোণাচার্য। তবেই বাণসিদ্ধি।

যদি সদগুরু হয় জীবের অহঙ্কার তিন ডাকে ঘোচে। গুরু কাঁচা হলে গুরুরও যন্ত্রণা, শিষ্যেরও যন্ত্রণা। সেই যে ঢোঁড়া ব্যাঙ ধরেছিল, ছাড়াতেও পারে না গিলতেও পারে না। দুয়েরই অশেষ ক্লেশ। জাত সাপে ধরলে তিন ডাকের পর ব্যাঙটা চুপ হয়ে যেত।

'তা তোমার ভয় নেই। তোমার গুরু হয়ে গেছে।'

হয়ে গেছে? কে সে? কোথায়?

বুঝেও বুঝল না গিরিশ। আবার বলল, 'মন্ত্র কি?'

'ঈশ্বরের নাম।'

দুর্গানাম, কৃষ্ণনাম, শিবনাম যে নাম খুশি। যদি একটু রুচি থাকে তবেই বাঁচবার আশা। তাই নামে রুচি।

এ সেই 'খেতে-খেতে বেশ লাগছে'। জানো না বুঝি গল্প? মা'র রান্নাতে অরুচি—আগে, ছি ছি, এ যে মুখে দেওয়া যায় না। তুমি কি বলছ? এ যে আমি রেঁধেছি। বললে এসে স্ত্রী। তুমি রেঁধেছ? খেতে-খেতে বেশ লাগছে।

॥ ১০২ ॥

কেন এত ভয়? ঈশ্বরকে স্মরণ করো। কেন এত পরশ্রীকাতরতা? ঈশ্বরের শ্রী দেখ। কেন মিথ্যা আত্মগ্লানি? সব দুদিনের।

'সব দুদিনের।' বললেন ঠাকুর: 'তালগাছই সত্য, তার ফল-হওয়া আর ফল-খসা দুদিনের।'

রাখালেরও মাঝে-মাঝে হিংসে হয়। সে বালকের হিংসে। ভালোবাসার অভিমান। গাড়িতে ঠাকুরের সঙ্গে যাবে বলে উসখুস করে। যদি আর কাউকে

ডেকে নেন ঠাকুর, হিংসেয় জ্বলে যায়। যদি বলেন, যাই, কলকাতায় গিয়ে ছোকরাদের একটু দেখে আসি, রাগে ঝলসে ওঠে, 'ওরা কি সংসার ছেড়ে আসবে যে আপনি যাবেন?'

কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে এসেই বা রাখালের কী হচ্ছে? কই এখনো তো লাগল না কৃপার মলয় হাওয়া! তবে কি আমি পাঁকাটি? আমি কি অপদার্থ? আমার মধ্যে কি এতটুকুও সার নেই? কোথায় তবে সেই চন্দনগন্ধ?

জপে বসেছিল নাটমন্দিরে, বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল। এত প্রেম এত কৃপা পেয়েও যার কিছু হয় না, তার মুখ দেখিয়ে কাজ নেই। উঠতেই পড়ে গেল ঠাকুরের সামনে।

'কি রে, এরই মধ্যে উঠে পড়লি?'

'আমার দ্বারা কিছু হবে না।'

'কেন, কি হল?'

রাখাল মাথা হেঁট করে রইল।

'কি রে, মুখখানি অত ম্লান কেন? বল আমাকে।'

বলতে হল না। বুঝতে পারলেন ঠাকুর। বললেন, 'হাঁ কর।'

হাঁ করতেই জিভ টেনে ধরলেন রাখালের। আঙুল দিয়ে তিনটে রেখা টেনে দিলেন। কি যেন মন্ত্র পড়লেন নিচু গলায়। বললেন, 'যা, এখন বোস গে।'

রাখালের মন হাল্কা হয়ে গেল। মুখ ভরে উঠল খুশিতে।

শুধু তাই নয়, ঠাকুর একদিন তাকে টেনে আনলেন ভবতারিণীর সামনে। কপালে কারণের ফোঁটা দিয়ে শাক্ত মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। শিখিয়ে দিলেন আসন আর মুদ্রা। শিখিয়ে দিলেন ষটচক্র। সোপান-পরম্পরা।

আর রাখালকে পায় কে!

কৃপা আর কাকে বলে! মেঘ নেই জল ঝরে পড়ল। হলকর্ষণ নেই শস্য এল মাটি ফুঁড়ে। এমন করেই অ'চে দয়ার দক্ষিণ হাওয়া! চাইতে না জানলেও এসে পড়ে। মনের বায়ুমণ্ডলে একটি উত্তপ্ত শূন্যতা সৃষ্টি হলেই বাতাসের আলোড়ন জাগে। কৃপাস্পর্শে সাধনার দীপ্তি ফুটছে চেহারায়। কণ্ঠস্বরে মমতাময় মাধুরী।

'আহা, রাখালের স্বভাবটি আজকাল কেমন হয়েছে! দেখ, দেখ, ঠোঁট নড়ে—' বলছেন ঠাকুর ভক্তদের, 'অন্তরে নামজপ করছে কিনা!'

তারপর বললেন, 'কোথায় আমার সেবা করবে, তা নয়, আমাকেই এখন তাকে জল দিতে হয়।'

'কি করছিস রে বাবুরাম?' ঠাকুর ডাক দিলেন: 'এদিকে একটু আয় না।'

পান সাজছে বাবুরাম। বললে, 'পান সাজছি।'

'রেখে দে তোর পান সাজা।' বিরক্ত হলেন ঠাকুর। 'শুনে যা।'

শোন্। গুরুসেবাই সাধনাঙ্গ। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। 'ভক্তি কি গাছের ফল রে বাবা পেড়ে খাবি?' বলছেন ঠাকুর: 'সেবা ছাড়া প্রেম নেই। সেবা ছাড়া ভক্ত নেই।'

নিজে-নিজেই পান সাজেন কখনো। ঘর ঝাঁট দেন। মালীর কাজ করেন।

'ওরে, ও মালী, ঐ গোলাপ ফুলটা তুলে দে তো—' একজন সত্যি-সত্যি সেদিন বললে ঠাকুরকে।

যা কাপড় পরেন! আর যেমন ভাবে পরেন! একটা মালী বলে ভাববে তা আর আশ্চর্য কি। বলামাত্রই ঠাকুর ফুলটি তুলে দিয়ে দিলেন লোকটাকে। খুশি হয়ে চলে গেল। কিছুদিন পরে জানতে পারলে সেই মালীই শ্রীরামকৃষ্ণ। তখন লজ্জায় অনুতাপে মাটির সঙ্গে তার মিশে যেতে শুধু বাকি। দক্ষিণেশ্বরে এসে দেখা করল ঠাকুরের সঙ্গে। কুণ্ঠিত হয়ে বললে, 'সেদিন আপনাকেই ফুল তুলতে বলেছিলাম—'

'তা কী হয়েছে!' অমলিন কণ্ঠে বললেন ঠাকুর, 'কেউ সাহায্য চাইলে তাকে তা দিতে হয়।'

ঠিক লোককেই তো বলেছিল ফুল তুলতে। মালী ছাড়া আর কি। আগাছার জঙ্গলকে পুষ্পোদ্যানে পরিণত করছেন। প্রার্থীকে ঠিক পৌঁছে দিচ্ছেন রূপার প্রফুল্ল ফুল। পঞ্চনদীর ঘনরে লোহার তারের বেড়া। তারই ওপারে ঝাউতলা। ঝাউতলার দিকে যেতে ঠাকুর পড়ে গেলেন বেড়ার উপর। হাতের একখ না হাড় সরে গেল। তাই দেখে রাখালের মনোবেদনার অন্ত নেই। যাঁর শরীররক্ষা করার কথা তাঁকেই সে ফেলে দিলে! সেই তো ফেলে দিয়েছে! তা ছাড়া আবার কি। যদি সঙ্গে-সঙ্গে থাকত, চোখে-চোখে রাখত, ঘটত না এমন অঘটন। তার দোষেই এই দুর্দশা। ধিক্কারে মন ভরে গিয়েছে রাখালের। ঠাকুর বুঝতে পেরেছেন। বললেন, 'তোর দোষ কি। তুই থাকলেও তোকে তো নিতুম না ঝাউতলা।'

অপূর্ব মমতায় উথলে উঠলেন। বললেন, 'দেখিস তুই যেন পড়িসনে। যেন ঠিকঠিকানা মান করে।'

কত লোক আসছে কতদিক থেকে। পাছে ঠাকুরের হাত ভাঙা দেখে কেউ কিছু ভুল বোঝে তারই জন্যে রাখাল কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয় হাতখানি। ঠাকুরের হাত ভেঙেছে এ যেন তার নিজের কলঙ্ক।

'কেন অমন ঢাক ঢাকি করিস?' বিরক্ত হন ঠাকুর। 'মা যে অবস্থায় রেখেছেন

সেই অবস্থায় থাকতে দে। লোকে নিন্দে করে তো আমাকে করবে! বলবে নিজের একখানা হাত সামলাতে পারেন না সে আবার কেমনতরো কি!'

মধু ডাক্তার এসেছে তাকে পর্যন্ত লুকোনো! আড়ালে নিয়ে গিয়ে কি সব বলছে তাকে রাখাল। ঠাকুর চেঁচিয়ে উঠলেন ঘরের থেকে: 'কোথায় গো মধুসূদন, দেখবে এস, আমার হাত ভেঙে গেছে।'

যন্ত্রণায় অধীর হয়ে একে-ওকে হাত দেখান ঠাকুর। রাখাল শুধু চটে। বলে, 'এ কি বাড়াবাড়ি! তা হলে এখান থেকে চলে যাই আমি।'

ওরে স্বভাবের যন্ত্রণায় কাঁদতে দে আমাকে। যন্ত্রণার মধ্যে কান্নাটাই আনন্দ। আমার কান্না দেখে লোকে যদি একটু কাঁদে সেটুকুও আমার উপশম।

এখান থেকে যাবি তো যা। পরেই আবার মাকে বলেন, 'কোথায় যাবে, কোথায় যাবে জ্বলতে পুড়তে!'

ভাবনয়নে দেখলেন মা যেন সরিয়ে নিচ্ছেন রাখালকে। অমনি ব্যাকুল হয়ে কেঁদে উঠলেন, 'মা, ওকে হৃদের মত সরাসনি। ও ছেলেমানুষ, কিছু বোঝে না, তাই কখনো-কখনো অভিমান করে—ও চলে গেলে কাকে নিয়ে থাকব!'

আরো একটি ছেলের জন্যে কাঁদেন বসে বসে। সতেরো-আঠারো বছর বয়স, গৌর-বর্ণ, নাম নারান। স্কুলে পড়ে। তাকে নিজের হাতে খাওয়াবার জন্যে ব্যাকুল ঠাকুর। তার মাঝেই দেখেন সেই নারায়ণকে।

'মশায়, আপনার গান হবে না?'

প্রশ্নের এই তো ছিরি। তবু যেহেতু নারান বলেছে, নারান গান শুনতে চেয়েছে, ঠাকুর গান ধরলেন। 'অহরহ নিশি, দুর্গানামে ভাসি, তবু দুঃখরাশি গেল না—এবার যদি মরি, ও হরসুন্দরী, তোর দুর্গানাম আর কেউ লবে না—'

বলরামের বাড়িতে নামছেন সিঁড়ি দিয়ে, ভাববিভোর হয়ে, টলতে-টলতে। পাছে পড়ে যান, নারান হাত ধরতে গেল। বিরক্ত হলেন ঠাকুর, নারানের হাত ছুঁড়ে দিলেন। পরে, পাছে ব্যথা পায়, অযতন হয়েছে ভাবে, তাই সস্নেহে বললেন, 'হাত ধরলে লোকে মাতাল মনে করবে। আমি আপনি-আপনি চলে যাব।'

বলরামের বাড়িতে সেদিন এসেছে নারান।

'বোস কাছে এসে বোস। কাল যাস ওখানে। গিয়ে সেখানে খাবি, কেমন?'

কে নারান? তার পুরো নাম বা পদবী ও কেউ জানে না। তবু তার প্রতি কি সর্বঢালা স্নেহ!

কথামত এসেছে নারান। ছোট খাটটির উপর বসিয়েছেন পাশটিতে। গায় হাত

pathagar.net

বুলিয়ে আদর করছেন। মিষ্টি খাওয়াচ্ছেন। বললেন, জল খাবি? জল খাওয়াচ্ছেন নিজের হাতে।

এখানে আসে বলে বাড়ির লোক মারে ছেলেটাকে। তাই কানের কাছে মুখ এনে স্নেহভরা স্বরে বললেন, 'একটা চামড়ার জামা কর, মারলে বেশি লাগবে না।'

কীর্তন শুনছেন ঠাকুর, নারান এসে উপস্থিত। তাকে দেখে চটে উঠলেন ঠাকুর। বললেন, 'তুই আবার কেন এসেছিস এখানে? অত মেরেছে তোকে সেদিন তোর বাড়ির লোক, আবার এসেছিস?'

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল নারান।

কোথায় তবে যাব? প্রহারের পর কোথায় তবে উপশম! প্রখর রৌদ্রের পর কোথায় তবে পাদপচ্ছায়া? সংসার-রাক্ষস আমাকে হরণ করে রেখেছে, আরামময় রাম এসে আমাকে উদ্ধার করবেন বলে। প্রহারেই তো আমি দৃঢ় হব বলিষ্ঠ হব, আমার সমস্ত কলুষ ক্ষয় হয়ে যাবে। প্রহার তো তোমারই উপহার। তুমি হানো তুমিই টানো তুমিই আনো তোমার কোলের কাছে। তুমি ছাড়া আর কে আছে! সকল আত্মীয়ের চেয়েও তুমি আমার আপনার।

ঠাকুরের ঘরের দিকে চলে গেল নারান। বাবুরামকে ঠাকুর বললেন, 'যা, ওকে কিছু খেতে দে।'

কীর্তনে সমাধিস্থ হয়ে যাবার কথা, কিন্তু মন বসল না। হঠাৎ উঠে পড়লেন। ঘরে ঢুকে নিজের হাতে খাওয়াতে লাগলেন নারানকে।

'আজ নারানকে দেখলুম।' রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বলছেন ঠাকুর। ভাবাবেশে কণ্ঠস্বর আচ্ছন্ন হয়ে আসছে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' বললে মাস্টার, 'চোখ দুটি জলে ভেজা। মুখ দেখে কান্না পায়।'

'আহা, ওকে দেখলে যেন বাৎসল্য হয়!' কান্নায় ঠাকুরের গলাও ভিজে উঠল: 'এখানে আসে বলে ওকে বাড়িতে মারে। ওর হয়ে বলে এমন বুঝি কেউ নেই। কুব্জা তোমায় কু বোঝায়। রাই-পক্ষে বোঝায় এমন কেউ নেই।'

'আপনি বোঝাবেন।'

'দেখ ওর খুব সত্তা। নইলে কীর্তন শুনতে-শুনতে উঠে যাই! ওর টানে কীর্তন ছেড়ে উঠে যেতে হল ঘরের মধ্যে। কীর্তন ফেলে উঠে গেছি এমনটি আর হয়নি কখনো।'

কীর্তনের চেয়েও ক্রন্দন যে তোমাকে বেশি টানে। কীর্তন হচ্ছে গুণকথন, যশোবর্ণন আর ক্রন্দন হচ্ছে বেদন-নিবেদন। তুমি আমাকে কাঁদাচ্ছ এইই তো তোমার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তাই ক্রন্দনই শ্রেষ্ঠ কীর্তন।

'কিন্তু ওকে যখন জিগগেস করলাম, কেমন আছিস? ও এক কথায় বললে, আনন্দে আছি।'

তাই তো আর ওর ভয় নেই। প্রহারের প্রত্যক্ষ ভয়কেও উপেক্ষা করতে পেরেছে। জর্জর হয়েও অবসন্ন হয়নি। ধুলোতে শয়ন নিয়েও ভাবছে ঈশ্বরের কোলে মা'র কোলে শুয়ে আছি। আনন্দে থাকা মানে ধুলোকেও ব্রজরেণু মনে করা। নারানের সেই অবস্থা। কিশোর বালক কিন্তু বিশ্বাসের নিষ্কম্প বর্তিকা। বরিষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ। যন্ত্রণাকে নিয়ে এসেছে জয়ধ্বনিতে।

মাস্টারকে বললেন, 'তুমি কিছু কিনে-টিনে মাঝে-মাঝে খাইও ওকে। আচ্ছা,ওকে একবার ওর ইস্কুলে গিয়ে দেখতে পাই?'

'কেন, আমার বাসায় না-হয় ওকে ডেকে আনব। সেখানে চলুন।'

'না, না, একটা ভাব আছে। ওকে ওর স্বভাবে দেখতে চাই। তা ছাড়া, দেখে আসতুম আরো কেউ ছোকরা আছে নাকি—' বলেই আবার নারানে ফিরে এলেন। বললেন গদগদ হয়ে, 'আহা, নাউ-এর ডোলটা ভালো—তানপুরো বেশ বাজবে। আমায় বলে, আপনি সবই।'

এইটিই তো চরম ভালোবাসার কথা। তুমি আমার সব। তারই জন্যে তো তোমাকে ছেড়ে পালাবার পথ পাই না। দূরে-দূরান্তরে এমন জায়গা নেই যেখানে তুমি নেই। এমন শূন্যতা ভাবা যায় না যা তুমি-ছাড়া। সব হারিয়েও দেখি তোমাকে হারাতে পারিনি।

'ওরে বাবুরাম, একবার নারানের বাড়িতে যা না—' নারানের জন্যে ব্যাকুল হয়েছেন ঠাকুর।

কিন্তু বাড়িতে যেতে ভয় পাছে ওর বাবা খেপে ওঠেন, তেড়ে আসেন লাঠি নিয়ে। 'এক কাজ কর। হাতে করে একখানা ইংরাজি বই নিয়ে যা। তা হলে তার বাবা আর কিছু বলবে না।'

কিন্তু তার মা এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। কার টানে ছেলে এমন ঘরছাড়া, মার-ঘেঁচড়া, তাকে একবার দেখে আসি নিজের চোখে। পারি তো শুনিয়ে আসি দুটো কঠিন কথা। নিজের পাগলামি নিয়ে আছো থাকো, পরের ছেলেকে পাগল করা কেন? কিন্তু এসেই তার চোখ ডুবে গেল অমৃত-অঞ্জনে। এ কি অপরূপ! একে দেখে আমিই মুগ্ধ হচ্ছি, আমার নারান তো ছেলেমানুষ! যে সরল সে তো ডুবেই যাবে এ সরলতার সমুদ্রে!

'মা, আমার নারানকে বেশী পীড়ন কোরো না।' বললেন তাকে ঠাকুর, 'ভগবানের দিকে যদি ওর মন যায়, ওর মনটিকে দুমড়ে দিও না।'

ঈশ্বর পুত্রের চেয়েও প্রিয়। সেই মুহূর্তে মনে হল নারাণের মা'র। ঈশ্বরকে সব চেয়ে আমরা বেশি ঠকাই। সংসারে সব চেয়ে যেটা অল্পমূল্য, যা খোয়া গেলে বঞ্চিত মনে হয় না নিজেকে, সেইটিই ঈশ্বরকে নিবেদন করি। কাকে-ঠোকরানো ফলটাই সাজাই এনে পূজার থালায়। কিন্তু সেই মুহূর্তে নারানের মা'র মনে হল এমন প্রিয়তম যে পুত্র তাও সম্ভব দিয়ে দেওয়া যায় ঈশ্বরকে।

॥ ১০৩ ॥

'ওরে কী শুনছি, থিয়েটারে সত্যি গৌর এল নাকি রে?' পদরত্নকে জিগগেস করলে তার বাপ। 'যা তো কলকাতায় গিয়ে একবার দেখে আয়।'

বাপ ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন। নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত।

পদরত্ন গেল কলকাতা। যা দেখল তা আর যায় না দৃষ্টি থেকে। রঙ্গমঞ্চের পর্দা পড়ল কিন্তু চোখের আর পলক পড়ল না। গিরিশকে আশীর্বাদ করল প্রাণ ভরে, 'গৌর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।'

ঠাকুর বললেন, 'আমি থিয়েটার দেখতে যাব।'

সকলে তো অবাক। যেখানে পণ্যস্ত্রীরা অভিনয় করে সেখানে ঠাকুর যাবেন দেখতে? রাম দত্ত বললে, 'অসম্ভব।'

'হ্যাঁ, যাবো। দেখব চৈতন্যলীলা।'

কে ঠেকায়। গৌর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। থিয়েটারের দরজার সমুখে দাঁড়াল পালকি গাড়ি। গৌর নিজে এসেছেন থিয়েটারে।

কেন কে জানে গিরিশ নিজে গেল গাড়ির দিকে। তার আগেই নেমে পড়েছেন ঠাকুর। গিরিশকে দেখতে পেয়েই নত হয়ে নমস্কার করলেন। নমস্কার ফিরিয়ে দিল গিরিশ। তখুনি আবার ঠাকুরের নমস্কার। নমস্কারে পারবে ঠাকুরের সঙ্গে? কোনো কিছুতে পারবে?

ছেড়ে দিল, হেরে গেল গিরিশ। শেষ নমস্কার ঠাকুরের। যার শেষ নমস্কার তারই শেষ জয়।

শুধু গায়ের জোরে নমস্কার নয়। এ একটি বিনয়নম্রিতা। দীনতার নির্ঝরিণী। ধারাবাহিকী দ্রবীভূতা প্রীতিসুধা।

উপরে একটি বক্সে জায়গা হল ঠাকুরের। এক পাখাওয়ালা এসে হাওয়া করতে লাগল।

নিমাই বলছে শচীমাকে:

BanglaBook.org

'কৃষ্ণ বলে কাঁদো মা জননি,
কেঁদো না নিমাই বলে—
কৃষ্ণ বলে কাঁদিলে সকলি পাবে
কাঁদিলে নিমাই বলে নিমাই হারাবে।'

সমাধিতে ডুবে গেলেন ঠাকুর। আবার এলেন জীবভূমিতে। আবার খানিকক্ষণ শোনেন। আবার সমাধিস্থ হন।

আচ্ছা, গিরিশকে আগে কোথায় দেখেছি বলো তো? এখনকার দেখা নয়, যেন বহু আগের দেখা, আগের আলাপ। ঐ সেই দক্ষিণেশ্বরে, প্রথম দিককার সাধনার পরিচ্ছেদে। কালীঘরে বসে আছি, 'দেখলুম একটি উলঙ্গ বালক নাচতে-নাচতে কাছে এল। কোমরে রুপোর পেটি, মাথায় ঝুঁটি বাঁধা। এক হাতে মদের ভাঁড়, অন্য হাতে সুধাপাত্র। কে তুই? হাঁক দিলুম। বললে, আমি ভৈরব। তা এখানে কেন? বললে, আপনারই কাজ করব বলে এসেছি। সেই ভৈরবই যে গিরিশ।

ব্রাহ্মসমাজের নাটকে সাধু সেজেছিল নরেন। ঠাকুর দেখতে গিয়েছেন। সাধুবেশে যেই দেখলেন নরেনকে, দাঁড়িয়ে পড়লেন। বলতে লাগলেন আপন মনে, 'এই ঠিক হয়েছে। ঠিক মিলেছে।' তারপর ডাকতে লাগলেন হাতছানি দিয়ে। এ কি অসম্ভব কথা! সেজে আছে রঙ্গমঞ্চে, সে এখন নেমে আসবে কি! তখন কেশব বললে, 'উনি যখন বলছেন, এসো না নেমে!' উনি যেন সব নিয়মের ব্যতিক্রম! কিন্তু, যাই বলো, নেমে আসতেই হল নরেনকে। ঠাকুর তার হাত ধরলেন, আনন্দ-উজ্জ্বল চোখে বললেন, তোকে এই বেশে একদিন দেখিয়েছিল মা। ঠিক এই বেশে। সত্যি, মিলে যাচ্ছে ঠিক-ঠিক—

অভিনয়ের শেষে চৈতন্য এসে দাঁড়াল ঠাকুরের সামনে। যে এ পার্টে নামে, রোজ গঙ্গাস্নান করে হবিষ্যি করে নামে।

সে মেয়ে, অভিনেত্রী। নাম বিনোদিনী।

বিনোদিনী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল ঠাকুরকে। কল্পতরু ঠাকুর তাকে আশীর্বাদ করলেন, 'মা, তোর চৈতন্য হোক।'

তোমার চিত্তদর্পণের মার্জন হোক, ভবদাবাগ্নির নির্বাণ হোক, মঙ্গলজ্যোৎস্নায় ভরে যাক মনোমন্দির। হৃদয়ে সত্য ও শ্রদ্ধাকে প্রতিষ্ঠিত করো। হৃদয়ই সর্বভূতের আয়তন। হৃদয়ই সর্বভূতের প্রতিষ্ঠা। হৃদয়ই সম্রাট। হৃদয়ই পরমব্রহ্ম। চৈতন্যমন্ত্রে তাকে জাগাও। মলয়স্পর্শে সুগন্ধানন্দ চন্দন হয়ে যাও।

রোগ বড় শক্ত, কিন্তু ভয় নেই, রোজাও বড় পোক্ত। রোজার নামেই রোগ

পালায়।

হলাম গণিকা, তবু তোমার গণনাতে গণ্য হলাম। হে অখিলরসামৃতমূর্তি, আমি তাতেই ধন্য। আর কিছুই চাই না। গণ্য হয়েই ধন্য হলাম।

একটি স্ত্রীলোক এসেছে দক্ষিণেশ্বরে, ঠাকুরের কাছে। ব্রীড়ার সঙ্গে বিষণ্ণতা মিশে মুখখানি ভারি করুণ। কি চাই? স্বামী মাতাল উচ্ছৃঙ্খল, সংসারে পয়সাকড়ি কিছু দেয় না, সব মদ খেয়ে নষ্ট করে। ঠাকুর যদি কিছু একটা ব্যবস্থা দেন। স্বামীর মন যাতে ভালো হয়।

ঠাকুর পরিচয় নিয়ে জানলেন শ্যামপুকুরের কালীপদ ঘোষের স্ত্রী। কালীপদ মানে দানাকালী, গিরিশের বন্ধু। এক গ্লাশের ইয়ার। জন ডিকিন্সনে বড় কাজ করে কিন্তু মাইনে যা পায় তা প্রায় অকাজেই শেষ হয়।

ঠাকুর পাঠিয়ে দিলেন নহবৎখানায়। সতীর দুঃখে সারদা বিচলিত হল। একটি পুজো-করা বেলপাতায় ঠাকুরের নাম লিখলে। বউটিকে দিয়ে বললে, রেখে দিও নিজের কাছে, আর খুব নাম কোরো।

সতী স্ত্রী বারো বছর নাম করেছে।

তারপর এক দিন দানাকালী হাজির দক্ষিণেশ্বরে। তাকে দেখেই ঠাকুর বলে উঠলেন, 'বউটাকে বারো বচ্ছর ভুগিয়ে তবে এখানে এল!'

কথা শুনে চমকে উঠল দানাকালী। তুমি কি করে জানলে? কিন্তু নিমেষে আবার আড়ষ্ট হয়ে গেল। সে তো ভক্তিতে আসেনি, সে এসেছে কৌতূহলে। পাঁচজনে বলাবলি করছে, দেখে আসি কেমনতরো! সেই অলস উদখুদুনি!

'কি চাই তোমার? বলো না গো মুখ ফুটে।' ঠাকুর প্রশ্ন করলেন আত্মজনের মত।

দানাকালী এমন হাঁচড়, বললে, 'একটু মদ দিতে পারেন?'

'তা পারি বৈ কি। তবে এখানকার মদে এমন নেশা, তুমি সইতে পারবে না।'

দানাকালী ভাবল। সে আবার সইতে পারবে না! বললে, 'কি, বিলিতি মদ?'

'না গো, একদম খাঁটি দিশি কারণ-বারি।' ঠাকুর বললেন প্রসন্ন মুখে, 'এখানকার মদ খেলে আর বিলিতি মদ ভালো লাগে না। তুমি ঐ মদ ছেড়ে এখানকার মদ ধরতে রাজী আছ?'

দানাকালী স্তব্ধ হয়ে রইল এক মুহূর্ত। পরে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, 'সেই মদ আমায় দিন যা খেলে আমি সারা জীবন নেশায় বুঁদ হয়ে থাকব।'

এমন কিছু দিন যা খেলে আর আমার কিছু পাবার থাকবে না। এমন প্রাপ্তি দিন যার পরে আর কোনো প্রত্যাশা নেই। এমন আনন্দ দিন যা সুখে-দুঃখে অবিচ্ছিন্ন। ঠাকুর দানাকালীকে ছুঁয়ে দিলেন। ছোঁয়ামাত্র কাঁদতে লাগল দানাকালী। কত

লোকে কত বোঝায়, তবু সে কাঁদে। বাড়ি ফিরে এল বটে, মন পড়ে রইল দক্ষিণেশ্বরে। ক'দিন পরে আবার গিয়ে হাজির। ঠাকুর বললেন, 'তুমি এসেছ? আমার একবার কলকাতা যাবার ইচ্ছে।'

'যাবেন?' দানাকালী উল্লসিত হয়ে উঠল: 'চলুন আমার সঙ্গে। ঘাটে বাঁধা আছে নৌকো।'

সঙ্গে লাটু, ঠাকুর উঠলেন এসে নৌকোয়। মাঝনদীতে এসে বললেন, 'জিব বের করো তো দেখি।'

দানাকালী জিভ বের করল। আঙুলের ডগা দিয়ে কি তাতে লিখে দিলেন ঠাকুর। মৌতাত ধরল বুঝি এতক্ষণে। মনে হল, এমন বোধ হয় কিছু আছে যা পেলে নিজেকে নিঃস্ব জেনেও আনন্দ হয়। চন্দ্রসূর্যহীন অন্ধকার গুহাও আলো হয়ে ওঠে। যার ঘর নেই, পথই তার ঘর হয়ে দাঁড়ায়। যার সবাই পর, পরের মধ্যেই সে আপন জনের মুখ দেখে।

ঘাটে নৌকো লাগল। দানাকালী জিগগেস করল, 'কোথায় যাবেন?'

'কোথায় আবার! তোমার সঙ্গে এসেছি, তুমি যেখানে নিয়ে যাবে।'

আনন্দে বিভোর হল দানাকালী। গাড়ি করে ঠাকুরকে তার নিজের বাড়িতে নিয়ে এল। শবরীর কুটিরে শ্রীরামচন্দ্র।

'স্ত্রী যদি সতী-সাধ্বী হয়,' বললে লাটু, 'তা হলে সে স্বামীর জন্যে কঠোর করতে পেছপা হয় না। স্ত্রীর জন্যে উদ্ধার হয়ে গেল কালীপদ।'

স্ত্রীর সাধনায় কালীপদ ধ্রুবপদ পেয়ে গেল। বুঝতেও পারেনি স্ত্রীর রূপ ধরে কৃপা এসেছিল তার সংসারে। আর যা দীনতা আর প্রতীক্ষা, যা নিষ্ঠা আর আঘাত-সহতা তাই স্ত্রী। সংসারে দীনা দাসীর বেশে রাজেশ্বরী বিরাজ করছে বুঝতেও পারেনি। বুঝতেও পারেনি পরিধানে যে চীরবাস আছে আসলে তা তপস্বিনীর রাজবেশ। বাইরে যা প্রতিবাদ অন্তরে তাই প্রার্থনা।

চিনতে পারল এতদিনে। বারো বছর ধরে যে নিশ্বাসবায়ু রুদ্ধ করে সঞ্চিত করে রেখেছিল তাই এখন কৃপার শীতলবায়ু হয়ে প্রবাহিত হল। এবার নোঙর তোলো, নৌকো ছাড়ো। যে বস্ত্রখণ্ড দিয়ে সঞ্চিত ধন বেঁধে রেখেছিলে, সঞ্চিত ধন জলে ফেলে দিয়ে সেই বস্ত্রখণ্ডকে এখন পাল করো। এত দিন তোমার স্ত্রী একা দাঁড় টেনেছেন, এবার হালে এসে বসেছেন স্বয়ং ভবার্ণবের কাণ্ডারী। আর ভয় নেই! ঠাকুরের অসুখ কাশীপুরের বাড়িতে, নিরঞ্জন দরজা আগলে রয়েছে, অবান্তর লোক কাউকে ঢুকতে দেবে না। যে-সে ঢুকবে আর ঠাকুরকে প্রণাম করবে, প্রণাম করে ঠাকুরের অসুখ বাড়িয়ে দেবে এ অসম্ভব। খুব কড়া মেজাজের ছেলে নিরঞ্জন।

দেখতেও বেশ বলশালী। গয়নার নৌকোয় ফিরছে দক্ষিণেশ্বর, আরোহীরা খুব নিন্দা করছে ঠাকুরের। নিরঞ্জন প্রথম প্রতিবাদ করল, যুক্তিতর্কের রাস্তায় গেল, কিন্তু কেউই নিরস্ত হল না। তখন বললে, গুরুনিন্দা সইতে পারব না, নৌকো ডুবিয়ে দেব। শুধু মুখের কথা নয়, সাঁতারে ওস্তাদ নিরঞ্জন, জলে লাফিয়ে পড়ল, নৌকো ফেলতে গেল উলটিয়ে। তখন সকলে দেখলে মহৎভয় সমুদ্যত। করজোড়ে ক্ষমা চাইতে লাগল সকলে। করতে লাগল অনেক কাকুতি-মিনতি। তখন ছেড়ে দিলে। জল ছেড়ে ফের উঠল গিয়ে নৌকোয়।

কথাটা কানে উঠল ঠাকুরের। নিরঞ্জনকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'কে কি বলে না বলে তোর কী মাথাব্যথা পড়েছিল? ক্রোধ চণ্ডাল, তার কি বশীভূত হতে আছে? সৎ লোকের রাগ জলের দাগের মত, হতে না হতেই মিলিয়ে যায়। তা ছাড়া হীন-বুদ্ধি লোক কত কি অন্যায় কথা বলে, তা কি গায়ে মাখতে আছে? তা ছাড়া—'

নিরঞ্জন মাথা হেঁট করে রইল।

'তা ছাড়া নৌকো যে ডোবাতে গিয়েছিলি, মাঝিমাল্লারা কি দোষ করেছিল? নিরীহ গরিবের উপর অত্যাচার হয়ে যেত, খেয়াল আছে?'

আত্মগঞ্জনায় বিদ্ধ হল নিরঞ্জন।

তার পর নিরঞ্জন আবার মাতৃভক্ত। ঠাকুরের পথে এসেছে অথচ চাকরি করছে এ কিছুতেই চলতে পারে না। কিন্তু চাকরি না করলে মা'র ভরণপোষণ হবে কি করে? আমার মুখের দিকে মা চেয়ে আছেন, আমি ছাড়া তাঁর কেউ নেই। কিন্তু ঠাকুর যদি জানতে পান?

'তোর মুখে যেন একটা কালো ছায়া পড়েছে।' ধরতে পেরেছেন ঠাকুর, 'আপিসের কাজ করিস কিনা।'

মুখের উপর যেন আরো এক পোঁচ কালি পড়ল।

'তার জন্যে মুখ ম্লান করছিস কেন? তুই তো তোর মা'র জন্যে কাজ করছিস, ওতে কোনো দোষ নেই। ওরে মা যে ব্রহ্মময়ীস্বরূপা।'

বীর নিরঞ্জন, ভক্তিতে আর নির্মলতায় বিশ্বজিৎ নিরঞ্জন, সে ঠাকুরের দ্বাররক্ষী হবে না তো কে হবে! অপ্রিয় কর্তব্য সমাধা করবার মত নির্বিকার সামর্থ্য শুধু তারই আছে।

দানাকালী তার এক সাহেব-বন্ধু নিয়ে হাজির। বললে, ঠাকুরের বিশেষ ভক্ত, অসুখ শুনে দেখতে এসেছে। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল নিরঞ্জন, তাকাল একবার সাহেবের হ্যাট-কোটের দিকে। খাস ইংরেজ নয় হয়তো, কিন্তু ফিরিঙ্গি বলতে

আপত্তি হবে না।

সাহেব আর দানাকালী উঠে এল উপরে। ঠাকুরের ঘরে, একেবারে বিছানার কাছটিতে। মাথার থেকে হ্যাট খুলে নিয়ে সাহেব বললে, 'আমি বিনোদিনী। চৈতন্যলীলার বিনোদিনী।'

বলতে-বলতে সে কেঁদে ফেললে। ঠাকুরের রোগক্লিষ্ট মুখ দেখে তার কান্না আরো উথলে উঠল। মেঝেতে বসে পড়ে ঠাকুরের পায়ের উপরে মাথা রাখলে।

কিন্তু ঠাকুরের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বললেন, 'খুব ফাঁকি দিয়ে এসে পড়েছ তো! মেয়েছেলেকে একেবারে সাহেব সাজিয়ে! হাটকোট পরিয়ে! খুব বাহাদুর তুমি কালীপদ!'

'নইলে ওকে যে আসতে দিত না আপনার ভক্তেরা।' বললে দানাকালী : 'কতদিন থেকে কাঁদছে, বলছে ঠাকুরের এমন অসুখ আমি একবার দেখতে পাই না? আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে একবার নিয়ে চলুন। ঠাকুরকে না দেখে আমি থাকতে পারছি না। তাই দয়া হল। নিয়ে এলুম আপনার কাছে।'

এতটুকু ক্ষুব্ধ বা বিরক্ত হলেন না ঠাকুর। বরং পরিহাসটুকু পরমরসিকের মত উপভোগ করলেন। তাঁর বীর ভক্তদল প্রতারিত হয়েছে বলে এতটুকু তাঁর জ্বালা নেই, বরং ভক্তি ও ব্যাকুলতাকে বেউ যে রুখতে পারে না তাতেই ভীষণ প্রসন্ন হয়েছেন। বললেন, 'তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি!'

'নইলে এমনি এলে ঢুকতেই দিত না যে। সাধারণ লোককেই দেয় না, আর এ তো অভিনেত্রী। বলে কিনা পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে ঠাকুরের অসুখ বাড়বে।' দানাকালী জোরের সঙ্গে বললে, 'এ আমি বিশ্বাস করি না। যে পাপের জন্যে এখন অনুতাপ করছে তার স্পর্শে তো এখন শান্তি।'

নিচে খবর পৌঁছে গিয়েছে ভক্তদের মধ্যে, দানাকালী বিনোদিনীকে সাহেব সাজিয়ে নিয়ে এসেছে ঠাকুরের কাছে। সকলের চোখে ধুলো দিয়ে দ্বারীকে কলা দেখিয়েছে। রাগে ফুলতে লাগল ভক্তদল। দানাকালী যতই ঠাকুরের আশ্রিত হোক, গিরিশের অনুগামী হোক, একবার দেখে নেবে তাকে।

কিন্তু কিসের প্রতিশোধ, কার উপর! ঠাকুর যে সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে ভীষণ হাসি-পরিহাস করছেন। যা ঠাকুরকে এত আনন্দিত করছে তা তাঁর ভক্তদের ক্ষুব্ধ করে কি করে? অগত্যা দানাকালী আর বিনোদিনীকে ছেড়ে দিতে হল দরজা। কিন্তু এবার রাম দত্তকে ঠেকিয়েছে নিরঞ্জন। কিছু মিষ্টি আর মালা উপর থেকে প্রসাদ করে এনে দিতে বলেছিল লাটুকে। হামাকে কেন, আপুনি নিজে যান না। বললে লাটু। তখন নিরঞ্জন বাধা দিলে। লাটু বললে, 'একে যেতে দাও না!

আপনা-আপনির মধ্যে এ সব নিয়ম কি জারি করতে আছে?'

নিরঞ্জন তবু অনড়। অনমনীয়।

তখন লাটু ফোঁস করে উঠল: 'সেবার যখন দানাকালী বিনোদিনীকে সাহেব সাজিয়ে নিয়ে এসেছিল তখন তো তাকে ছেড়ে দিতে পেরেছিলে, আর আজ এর মত লোককে ছাড়তে চাইছ না? এর মানে কি?'

অগত্যা ছেড়ে দিল রাম দত্তকে।

লাটুকে ডাকলেন ঠাকুর। কেউ তাঁর কাছে নালিশ করেনি তবু শুনতে পেয়েছেন অন্তর্যামী। বললেন লাটুকে, 'খাখ কারুর কখনো দোষ দেখবিনি, ভুল দেখবিনি, কেবল গুণ দেখবি, ভালো দেখবি। বুঝলি?'

লাটু চুপ করে রইল। মনকে শাসন করলে ব্যথার চাবুক মেরে। তাড়াতাড়ি নিচে নেমে নিরঞ্জনকে জড়িয়ে ধরল। বললে, 'ভাই আমার মত মুখ খুর কথায় দুঃখু করিসনি।'

॥ ১০৪ ॥

'আরেকদিন দেখাবে?' বালকের মতন জিগগেস করলেন ঠাকুর। নয়নে সানন্দ কৌতূহল।

'বেশ তো যাবেন যে দিন খুশি। দেখে আসবেন।'

'কিন্তু কিছু নিতে হবে।'

কি নেব? টিকিটের দাম? ঠাকুর পয়সা পাবেন কোত্থেকে? কৃপা করে যে আসছেন সেই কি অনেক নিচ্ছি না?

না, ঠাকুর পীড়াপীড়ি করছেন, নিতে হবে কিছু। কিছু না দিয়ে তিনিই বা দেখবেন কেন?

গ্যালারির সিট আট আনা। গিরিশ হেসে বললে, 'বেশ, আপনি আট আনা দেবেন।'

'বা, আমি গ্যালারিতে বসতে পারব না। সে বড় র‍্যাজলা—'

'না, না, আপনি গ্যালারিতে বসবেন কেন। সে দিন যেখানে বসেছিলেন সেই বক্সেই বসবেন।'

'কিন্তু মোটে আট আনা?' গূঢ় রহস্যভরা হাসি হাসলেন ঠাকুর।

'তা—' গিরিশ তাকিয়ে রইল মুখের দিকে।

'আট আনা নয়, ষোলো আনা দেব।'

ষোলো আনা দেব। ফাঁক রাখব না, ছিদ্র রাখব না, নিরবকাশ করে দেব। ভরে

দেব সম্পূর্ণ করে। ষোলো কলা একত্র করে দেব তোমাকে পূর্ণচন্দ্র। করুণার পূর্ণচন্দ্র। প্রসাদের পূর্ণঘট।

কিন্তু তুমিই শুধু দেবে, আর আমি নেব হাত পেতে? আমার এ দারিদ্র্য এ কার্পণ্য আর সহ্য হয় না। শুষ্ক পিপাসা দিয়ে গড়েছি যে শূন্য পেয়ালা তা এবার ভেঙে ফেলব। আমি নিজেকে বুঝেছি এবার মহীয়ান রূপে, ঐশ্বর্যবান দাতারূপে। এবার আমি দেব, তুমি নেবে। তুমি আমার দুয়ারে এসে দাঁড়াবে প্রার্থী হয়ে আর আমি তোমাকে ভিক্ষে দেব।

বলো তো, কী দেব? নয়নের অশ্রু, হৃদয়ের চন্দন, কণ্ঠের ফুলমালা।

না, আংশিক নয়, তোমাকেও আমি দেব ষোলো আনা। আমার আমি-কে দিয়ে দেব তোমার হাতে। ঢেলে দেব, বিকিয়ে দেব, বিলিয়ে দেব। কিছু রাখব না আপনার বলে। তখন আমিই তোমার আপনার।

তোমার দান, আমার সমর্পণ। তোমার দয়া, আমার উৎসর্গ।

জানি না দাতা হিসাবে কে বড়? তুমি না আমি?

প্রথমবার যখন যান থিয়েটারে, লোকজন আলো দেখে ঠাকুর বালকের মতন খুশি। বক্সে বসে বলছেন মাস্টারমশাইকে, 'বাঃ, এখান এসে বেশ হলো। অনেক লোক একসঙ্গে হলে উদ্দীপন হয়। দেখতে পাই তিনিই সব হয়েছেন।'

জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে অতিথি এসেছে। অতিথি চোখ বুজে ভগবানকে অন্ন নিবেদন করছে, নিমাই ছুটে এসে তাই খেয়ে নিচ্ছে পলকে। গঙ্গাস্নানের পর ঘাটে বসে পুজো করছে ব্রাহ্মণেরা, নিমাই এসে কেড়ে খাচ্ছে নৈবেদ্য। বিষ্ণুপূজার নৈবিদ্যি কেড়ে নিচ্ছিস, সর্বনাশ হবে তোর—এক ব্রাহ্মণ তেড়ে গেল নিমাইকে। পালিয়ে গেল নিমাই। মেয়েরা ভালোবাসে ছেলেটাকে। নিমাই চলে যাচ্ছে দেখে তারা ব্যাকুল হয়ে উঠল। ডাকতে লাগল, নিমাই, ফিরে আয়, নিমাই, ফিরে আয়। নিমাই ফিরল না।

আমি জানি কি করে ফেরাতে হয় নিমাইকে। আমি জানি সেই মহামন্ত্র। বললে একজন উটকো লোক। বলেই সে বলতে লাগল, হরিবোল, হরিবোল। হরিবোল বলতে-বলতে ফিরে এল নিমাই। ফিরে এল নাচতে-নাচতে।

ঠাকুর আর স্থির থাকতে পারলেন না। মুখে বললেন, আহা, আর নয়নে ঝরতে লাগল প্রেমাশ্রু।

বাবুরামও সঙ্গে ছিল। তাকে আর মাস্টারমশাইকে বললেন, 'দেখ আমার যদি ভাব কি সমাধি হয়, গোলমাল কোরো না। ঐহিকেরা ঢং বলবে।'

বহুবার, নাটকের বহু জায়গায় ঠাকুরের সমাধি হল, কিন্তু নিমাইয়ের সন্ন্যাসের সংবাদ পেয়ে শচী যখন মূর্ছিত হয়ে পড়ল ঘর-ভরা দর্শকের দল হায়-হায় করে উঠলেও ঠাকুর বিচলিত হলেন না। এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন সেই ঝড়ে-ছেঁড়া বৃক্ষশাখার দিকে।

অভিনয়ের পর গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন, একজন এসে জিগগেস করলে, কেমন দেখলেন?

প্রসন্ন-স্বরে ঠাকুর বললেন, 'আসল-নকল এক দেখলাম।'

মহেন্দ্র মুখুজ্জের বাড়ি হয়ে গাড়ি চলেছে দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর গান ধরেছেন:

'গৌর-নিতাই তোমরা দু ভাই,
পরমদয়াল হে প্রভু—
আমি গিয়েছিলাম অনেক ঠাঁই,
কিন্তু এমন দয়াল দেখি নাই,
ব্রজে ছিলে কানাই-বলাই, নদে হলে গৌর-নিতাই।
ব্রজের খেলা ছিল, দৌড়োদৌড়ি,
এখন নদের খেলা ধূলায় গড়াগড়ি।
ছিল ব্রজের খেলা উচ্চ রোল,
আজ নদের খেলা কেবল হরিবোল।
ওহে পরম করুণ, ও কাঙালের ঠাকুর—

মাস্টারমশাইও গাইছেন সঙ্গে-সঙ্গে।

মহেন্দ্র মুখুজ্জে খানিকটা এগিয়ে দিচ্ছেন গাড়িতে। বললেন, একবারটি তীর্থে যাব।

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'কিন্তু প্রেমের অঙ্কুরটি হতে না হতেই তাকে শুকিয়ে মারবে? কিন্তু যাও যদি, শিগগির এস, দেরি কোরো না।'

তীর্থ কোথায়? তীর্থ তোমার এই অন্তরের নির্জনতায়। সেইখানেই গহন গিরি-গুহা, শিহরময় শৈলশিখর, সেইখানেই সঙ্গবিহীন সমুদ্র-তীর। তোমার বাইরের তীর্থ জীর্ণ হয়, পুরোনো হয়, কিন্তু এই অন্তরের দেবালয় রোজ তুমি নিজের হাতে নিত্যনবীন ভাবরসে নির্মিত করো। ধৌত করো অশ্রুজলে। জ্বালো একটি অনাকাঙ্ক্ষার স্বতপ্রদীপ। বাইরের তীর্থে কত বিক্ষোভ কত মালিন্য কিন্তু অন্তর-তীর্থে অনাহত প্রশান্তি। এই অন্তরতীর্থে আশ্রয় নাও। অন্তরতমকে দেখ। তার

সামনে দাঁড়াও করজোড়ে।

গিরিশ ঠাকুরকে একটি ফুল দিল।

নিয়ে তখুনি আবার ফিরিয়ে দিলেন ঠাকুর। বললেন, 'আমায় ফুল দিচ্ছ কেন? ফুল দিয়ে আমি কি করব? ফুলে আমার অধিকার নেই।'

'ফুলে আবার কার অধিকার?'

'দুজনের। একা দেবতার, আর ফুল-বাবুর।'

সকলে হাসতে লাগল।

থিয়েটারে কনসার্টের সময় আরেক কামরায় বসালো ঠাকুরকে। কথায়-কথায় ঠাকুরের ভাবসমাধি হল। মনের আড় যায়নি এখনো গিরিশের। ঠিক ঢং না ভাবলেও ভাবল বোধ হয় বাড়াবাড়ি। যে মুহূর্তে সংশয় ছায়া ফেলল, ঠাকুর চোখ চাইলেন। কুয়াশা কাটিয়ে দেবার জন্যে উদয় হল দিবাকরের।

'মনে তোমার বাঁক আছে।' বললেন ঠাকুর।

শুধু একটা? অসংখ্য। কত কুটিল আবর্ত। অন্ধ ঘূর্ণিবাত। কত অসরল পন্থা, অস্বচ্ছ লক্ষ্য। বক্রতা আর শীর্ণতা। মালিন্য আর আবিল্য। শুধু বিবৃদ্ধ বাসনা।

'এ বাঁক যায় কিসে?' গিরিশের কণ্ঠে লাগল বুঝি কান্নার রঙ।

'শুধু বিশ্বাসে।'

বিশ্বাসে কী না হতে পারে? যার ঠিক, তার সবতাতে বিশ্বাস। সাকার, নিরাকার, রাম, কৃষ্ণ, ভগবতী। বিশ্বাস একবার হয়ে গেলেই হল। বিশ্বাসের বড় আর জিনিস নেই।

বিভীষণ একটি পাতায় রাম নাম লিখে একজনের কাপড়ের খুঁটে বেঁধে দিলে। বললে, সমুদ্রের ওপারে যাবে তো, ভয় নেই, দিব্য জলের উপর দিয়ে চলে যাও। বিশ্বাস করে চলে যাও। কিন্তু অবিশ্বাস করেছ কি, পড়েছ জলের তলে। বিশ্বাস করে সোজা চলে যাচ্ছে সে লোক, ঢেউয়ের উপর দিয়ে, চোখ সামনে রেখে, ঘাড় খাড়া করে। যাচ্ছে-যাচ্ছে, হঠাৎ মনে হল, কাপড়ের খুঁটে কী বাঁধা আছে একবার দেখি। খুলে দেখে, আর কিছু নয়, শুধু একটি রাম নাম লেখা। এই? শুধু একটি রাম নাম? যেই অবিশ্বাস, অমনি ডুবে গেল, ঢেউ এসে গ্রাস করলে!

সেই কৃষ্ণকিশোরের বিশ্বাস। একবার ঈশ্বরের নাম করেছি, আমার আবার পাপ কি! অনাময় নির্মল হয়ে গিয়েছি আমি।

আর আমাকে কে টলায়! বিশ্বাস করে বসেছি। আকাশ নিজে জানে না তার ব্যাপ্তি কতদূর। তেমনি আমি নিজে জানি না আমার এ অনুভূতির সীমা কোথায়!

কিসের ব্যাপ্তি, কিসের অনুভূতি ? আর কিছু নয়, আর কিছু নেই, শুধু তুমি আছ। তোমার প্রকাশেই আর সকলে অনুভাত। তুমিই রথেশ্বর আত্মা। সর্বলোকচক্ষু সূর্য। বিশ্বাস করে ফেলেছি। আর আমাকে কে ফেলে! এবার জলে পড়লেও জলে ডুবব না। আগুনে পুড়লেও পুড়বে না কপাল। ভবমরুপরিখিন্ন হয়ে পথ চলছিলাম, এবার নেমে পড়েছি এক মনোহর সরোবরে। যত ক্লান্তি আর ক্লেদ, যত সন্তাপ আর অতৃপ্তি সব শান্ত হল অবগাহনে। আর কে আমাকে তোলে সেই সরোবর থেকে ? সেই আমার তাপতৃষাহর হরিসরোবর।

দেখ, দেখ, তাঁর অঙ্গকান্তি সেই সরোবরের জল, তাঁর করতল ও পদতল পদ্ম হয়ে ফুটে আছে, তাঁর চক্ষু হচ্ছে মীন আর তাঁর বাহুর আন্দোলন হচ্ছে তরঙ্গলীলা। শুধু শান্তি আর শান্তি। অগাধ ভবজলধি ভেবেছিলাম, এখন দেখি সরল-স্বচ্ছ শীতল সরোবর।

তোমাকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখি। তুমি কত সহজ! আকাশের মত সহজ, প্রাণের মত সহজ, তৃণের মত সহজ। আমার নিশ্বাসের মত সহজ।

তুমি যে আমার নিশ্বাস, এইটিই বিশ্বাস করেছি আজ।

'ও দেশে যাবার সময় রাস্তায় ঝড়-বৃষ্টি এল।' বলছেন ঠাকুর, 'মাঠের মাঝখানে আবার ডাকাতের ভয়। তখন সবাই বললাম, রাম কৃষ্ণ ভগবতী। আবার বললাম, হনুমান। আচ্ছা, সব যে বললাম, এর মানে কি ? কি জানো, ঐ যখন চাকর বা ঝি বাজারের পয়সা নেয় প্রথমটা আলাদা-আলাদা করে নেয়, এটা আলুর পয়সা, এটা বেগুনের, এ কটা মাছের। সব থাক-থাক হিসেব করে নিয়ে তারপর দেয় মিলিয়ে।'

একই অনেক হয়ে মিশেছে। অনেক আবার মিশেছে সেই একে। চাই সেই বিশ্বাস। বালকের বিশ্বাস। গুরুবাক্যে বিশ্বাস। মা বলেছে ওখানে ভূত আছে, তা ঠিক জেনে আছে যে ভূত আছে। মা বলেছে, ওখানে ভূদু, তা ঠিক জেনে আছে ওখানে ভূদু ছাড়া কেউ নেই। মা বলেছে ও তোর দাদা হয়, তা জেনে আছে, পাঁচ সিকে পাঁচ আনা দাদা।

চোখওয়ালা বিশ্বাস নয়, চোখ বন্ধকরা অন্ধ বিশ্বাস। বিচারের পরেও আবার বিচার চলে, কথার পরে আরো কথা। কিন্তু বিশ্বাসের পরে আর কিছু নেই। স্তব্ধতার পরে আবার স্তব্ধতা কি!

ভক্তদের জন্যে মা'র কাছে কাঁদছেন ঠাকুর। 'মা, যারা যারা তোর কাছে আসছে তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিস মা। সব ত্যাগ করালনি! কী নিয়ে থাকবে, খুব কষ্ট হবে যে! সংসারে যদি রাখিস, এক-একবার দেখা দিস! এক-একবার দেখা না

দিলে উৎসাহ পাবে কি করে? শেষে যা হয় করিস, একেবারে বিমুখ করিসনে।'

রাম দত্তের বাড়িতে আরেকবার দেখা পেয়েছে ঠাকুরের। জিগগেস করছে আকুল হয়ে, 'বলুন, আমার মনের বাঁক যাবে তো?'

থিয়েটারে এসে সেদিন একটা চিরকুট পেল গিরিশ। কে দিয়েছে? কেউ বলতে পারলে না। লেখা কি? লেখা, আজ রাম দত্তের বাড়ি পরমহংসদেব আসবেন। তাতে গিরিশের কি? জোয়ারের জলে কাছিতে হঠাৎ টান পড়ল, গিরিশ বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

অনাথবাবুর বাজারের কাছাকাছি এসে থামল গিরিশ। ওই কি নেমন্তন্নের চিঠি? অচেনা লোকের বাড়ি ওই চিরকুটের নেমন্তন্নে যাব? রামবাবুর সঙ্গে আলাপ নেই, তাঁর নেমন্তন্ন কি এমনি উপেক্ষার চেহারা নেবে? দরকার নেই আমার রবাহূতের দল বাড়িয়ে।

কিন্তু ফেরে এমন সাধ্য নেই। তবে ও কার নেমন্তন্ন? চিরকুটটা কি উপেক্ষা? না, কি অন্তিকতম আন্তরিকতার ডাক?

রামবাবু খোল বাজাচ্ছে আর ঠাকুর নাচছেন। ছন্দের দৃঢ়তার উপর দাঁড়িয়ে ভাব-কোমল নৃত্য। সঙ্গে গান হচ্ছে: 'নদে টলমল করে গৌরপ্রেমের হিল্লোলে।'

কাকে বলে প্রেম আর কাকে বলে প্রেমের হিল্লোল সমস্ত প্রাণকে দুই চক্ষুর মধ্যে পরিপূর্ণ করে দেখল গিরিশ। আর কাকে বলে টলমল-করা দেখল একবার অন্তরীক্ষের দিকে তাকিয়ে। আকাশের তারা আর মর্তের মুহূর্ত নাচছে হাত ধরাধরি করে। এখনো চিনতে পারছে না, তার মনে কি এখনো বাঁক আছে? বাঁকাকে দেখে বাঁক কি এখনো সিধে হয়নি?

নাচতে-নাচতে ঠাকুর একবার গিরিশের কাছে এসে পড়েছেন। আর সেইখানেই সমাধিস্থ। মাথাকে নত করে দিল, গিরিশ প্রণাম করল ঠাকুরকে। কীর্তনান্তে ঠাকুর যখন পুরোপুরি নামলেন দেহভূমিতে, গিরিশ জিগগেস করল, 'আমার মনের বাঁক যাবে?'

ঠাকুর বললেন, 'যাবে।'.

যেন স্বকর্ণে শুনেও বিশ্বাস করা যায় না, এমনি দ্বিধান্বিতভাবে আবার জিগগেস করল গিরিশ, 'সত্যি, যাবে?'

'যাবে।'

তবু, বার বার তিনবার।

'ঠিক বলছেন, যাবে আমার মনের বাঁক?'

'সত্যি বলছি, যাবে, যাবে, যাবে।'

boiRboi.net

মনোমোহন মিত্তির বসেছিল পাশে। বিরক্তির ঝাঁজ নিয়ে বললে, 'এক কথা একশো বার জিগগেস করছেন কেন? উনি বলছেন, যাবে, তবু বার-বার ত্যক্ত করা।'

কি আস্পর্ধা লোকটার, মুখের উপর সমালোচনা করে! গর্জে উঠতে যাচ্ছিল, মুহূর্তে শান্ত হয়ে গেল গিরিশ। অনুভব করল তার মনের বাঁক কেটে গেছে। ক্রোধের বদলে দীনতা এসেছে। রূঢ়তার বদলে স্নৈগ্ধ্য। কলহ না করে দেখলে আত্মদোষ। সত্যিই তো, ঠাকুরের এক কথাই একশো সত্যের সমান। তবে কেন অসহিষ্ণু হয়েছিলাম? ঠাকুরকে কেন বসাতে পারিনি এক কথায় একাসনে?

পরদিন থিয়েটার যাবার পথে তেজ মিত্তিরের সঙ্গে দেখা।

'ও মশায়, কাল আপনার জন্যে একটি চিরকুট রেখে এসেছিলাম, পেয়েছিলেন?'

'তুমি কোথায় পেলে?'

'কোথায় আবার পাব! থিয়েটারে গিয়ে দেখলাম আপনি নেই, তাই নিজের হাতে লিখলুম চিরকুট।'

'কিন্তু আপনাকে সংবাদ কে দিলে?'

'কিসের সংবাদ?'

বিরক্ত হয়ে ঝাঁজিয়ে ওঠবার প্রশ্ন এই। কিন্তু অদ্ভুত নম্র থেকে গিরিশ বললে, 'রাম দত্তের বাড়িতে পরমহংসদেবের আসার সংবাদ!'

'আর কে দেবে! স্বয়ং প্রভু। আমাকে বললেন থিয়েটারের গিরিশ ঘোষকে একটা খবর দিও।'

'আমাকে কেন খবর দিতে বললেন বলতে পারেন?'

'তার আমি কি জানি!' তেজ মিত্তির দু'হাতে শূন্যায়িত ভঙ্গি করলে: 'মা কেন তার সন্তানকে ডাকবে, এই কৈফিয়ত আমার জানা নেই।'

তুমি আমাকে ডাক দিয়েছ এ কি আসেনি আমার কর্ণকুহরে? আমার অন্তর-তিমিরে জ্বলেনি কি তোমার ডাকের দীপশিখা? হৃদয়ের শুষ্ক মঞ্জরীর মর্মদেশে লাগেনি কি ডাকের লাবণ্যবর্ণ? বিভাবরী ভোর হল, তোমার ডাকটি এল আজ তপস্বিনী উষসীর মূর্তিতে। তোমার ডাক শুনে জাগি আজ অম্লান-নির্মল নেত্রে, আমামমান প্রাণের সমারোহে। বলবান বিশ্বাসের দুর্বারতায়। নিমেষের কুশাঙ্কুরকে পায়ে দলে চলব নবতর প্রভাতের আবিষ্কারে। মৃত্যুর উদার তীর্থে। সেই পরমা নির্বৃতির শেষ প্রান্তে।

ভবনাথকে বলছেন ঠাকুর, 'আসবে হে আসবে! আমি চেয়েছিলুম ষোলো আনা, গিরিশ আমাকে পাঁচ সিকে পাঁচ আনা দিলে। না দিয়ে যাবে কোথা? আলো যখন উপচে পড়বে, তখন যাবে কোথা, দিতেই হবে। প্রেম যখন উপচে পড়বে

তখন ধরবে কি আর প্রাণপাত্রে? যাবে কোথায়, ঢালতেই হবে সে মধুপ্লাবন!' সে দানের ক্ষয় নেই। সে গানের শেষ নেই। আর সে প্রাণ অপরিচ্ছেন্ন।

॥ ১০৫ ॥

গিরিশ দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত। আর গড়িমসি নয় একেবারে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। জানু, পদ, হস্ত, বক্ষ, শির, দৃষ্টি, বুদ্ধি ও বাক্য সহযোগে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। দক্ষিণের বারান্দায় একখানি কম্বলের উপর বসে আছেন ঠাকুর। সামনে আরেকখানি কম্বলে ভবনাথ বসে।

'এসেছিস? আমি জানি তুই আসবি। জিগগেস কর একে,' ভবনাথের দিকে ইশারা করলেন ঠাকুর, 'তোর কথাই বলছিলাম এতক্ষণ। বোস, পাশে এসে বোস।'

পায়ের কাছে বসে পড়ল গিরিশ। বললে, 'আপনি জানেন না আমি কত বড় পাপী। আমি যেখানে বসি সাত হাত মাটি পর্যন্ত তলিয়ে যায় পাপের ভারে।'

'তাই নাকি?' অভয়মাখা হাসি হাসলেন ভুবনসুন্দর। বললেন, 'তুই এত পাপী যে পতিতপাবনও সে পাপ হরণ করতে অক্ষম—তাই না?'

'কিন্তু আমি যে পাপের পাহাড় করেছি।'

'পাহাড় করেছিস নাকি?' ক্লান্তিহরণ হাসি হাসলেন আবার। বললেন, 'ও তো তুলোর পাহাড়। একবার মা বলে ফুঁ দে, উড়ে যাবে।'

অকূলে যেন কূল পেল গিরিশ। যেন আর সে ভেসে যাবে না, তলিয়ে যাবে না, হারিয়ে যাবে না। বললে, 'এখন থেকে আমি কী করব?'

'যা করছিস তাই কর।'

কী করছি? বই লিখছি। ধারণা নেই, লিখে চলেছি অভ্যাসবশে। লোকে বলে, অন্তরে বিশ্বাস না থাকলে অমন জিনিস বেরোয় না কলমে। বিশ্বাসের জোর তো ভারি, কথানি নাটক লেখাচ্ছে। লোকশিক্ষা হচ্ছে নাকি। মস্ত পণ্ডিত আমি, লোকশিক্ষা দেবার আর লোক নেই দুনিয়ায়! ঠাকুরের পদাশ্রয়ে এসে এখনো বই লেখা! তুচ্ছ পুঁথির পুঁতির মালা তৈরি করা।

'হ্যাঁ, বই লেখাটাও কর্ম। কর্ম না করলে কৃপা পাবে কি করে? জমি পাট করে রুইলেই তো জন্মাবে ফসল।'

সেই দিনানুদৈনিক কাজ, সেই বই লেখা, সেই থিয়েটার করা—এখনো ঠাকুরের এই ব্যবস্থা?

হ্যাঁ, এই। কর্মে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হয়ে যখন তোর ঘর্ম ঝরে পড়বে তখনই তোর আসল ধর্ম। তবে একটু স্মরণ-মনন চাই। ওটিই হচ্ছে যুক্ত হবার সেতু। লেগে

থাকবার আঠা।

'এখন এদিক-ওদিক দুদিক রেখে চল্।' বললেন ঠাকুর, 'তারপর যদি এই দিক ভাঙে তখন যা হয় হবে। তবে,' ঠাকুরের কণ্ঠে মিনতি ঝরে পড়ল: 'সকালে-বিকালে স্মরণ-মননটা একটু রাখিস, পারবিনে?'

মুষড়ে পড়ল গিরিশ। এ আবার কী বাঁধাবাঁধি! সকালে কখন ঘুম থেকে ওঠে তার ঠিক নেই। বিকেলে হয় থিয়েটারে নয় অন্য কোথাও! স্মরণ-মননের সময় কই! শেষকালে কথা দিয়ে কথার খেলাপ করি আর কি! কিন্তু কত সামান্য কথা। এটুকুও গিরিশ রাখতে পারবে না? কোনো কঠিন ব্রত-নিয়ম করতে বলছেন না, নয় কোনো আসন-প্রাণায়াম, নিশান্তে ও দিনান্তে একটু শুধু মনে করে ঈশ্বরকে বাধিত করা! এটুকুতেও গিরিশ অসমর্থ! লোকে বলবে কি! কিন্তু মনকে চোখ ঠেরে তো লাভ নেই। সরলতার ঠাকুর, তাঁর সামনে কেন ধরব ছদ্মবেশ? মুখে যাই বলি মনের কথা তিনি ঠিক নখমুকুরে দেখে নেবেন।

'বহু দিনই সকালের সঙ্গে দেখা হয় না, ঘুম ভাঙতে-ভাঙতেই দুপুর। আর বিকেল?' গিরিশ কুণ্ঠিত মুখে বললে, 'বিকেল যেখানে কাটে সেখানে আরেক রকম মোহনিদ্রা!'

'বেশ, খাবার আগে?' ঠাকুরের কত দায় এমনি ভাবে বলছেন কাতর হয়ে: 'না খেয়ে তো আর থাকিস না? বেশ তো, খেতে বসে একটু নাম করিস মনে-মনে।' সত্যি, রোজ খাই তো? এমন এক-একদিন গেছে কাজে-কর্মে খাওয়াই হয়নি। খেতে বসেছি, কিন্তু এত দুশ্চিন্তা, খাচ্ছি বলে হুঁস নেই। কোনোদিন দশটায়, কোনোদিন বা বিকেল তিনটেয়। কোনোদিন কতগুলি সিঙাড়া-কচুরি খেয়ে দিন কেটেছে থিয়েটারে। আমার আবার খাওয়া! আসন নেই, বাসন নেই, ফরাসে বসে ঠোঙায় করেই খেয়ে নিলাম। আমার আবার স্থির হয়ে বসে নাম করা!

'ও পারব না।' মাথা চুলকোতে লাগল গিরিশ: 'খাওয়ার আমার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। তা ছাড়া খিদের সময় খাবার পেলে আর কিছু তখন মনে থাকে না।'

যেন কত বাহাদুরের মত কথা বলছে। সামান্য একটা অনুরোধ, অত্যন্ত সোজা অত্যন্ত হালকা, তবুও সে অপারগ! সমাজে সে মুখ দেখাবে কি করে!

কিন্তু ঠাকুর দেখুন তার গহন মনের গোপন মুখচ্ছবি। যা সে পারবে না তা সে বলবে করব? অসত্যের চেয়ে অক্ষমতা অনেক নির্দোষ।

তবু নিরস্ত হন না ঠাকুর। বললেন, কণ্ঠস্বরে সেই মমতাময় মিনতি, 'বেশ তো,

শোবার আগে? শুতে না শুতেই তো ঘুম আসে না! অন্তত এক-আধ মিনিট তো অপেক্ষা করতে হয়! তখন, সেই এক-আধ মিনিট সময়টুকুর মধ্যে একটু নাম করিস!'

ভালো সময়ই বের করেছ বটে! আমার কি ওটা ঘুম? আমার ওটা বিস্মরণ। কিংবা বিস্মরণের সমুদ্রে আত্মবিসর্জন। একটি শুচিস্নিগ্ধ শান্তির জন্যে প্রতীক্ষা নয়, জ্বালা-নিবারণের ওষুধ। আর শুই কোথায়? কোন বিছানায়? কার বিছানায়?

মাথা হেঁট করল গিরিশ। বললে, 'আমার ঘুম আসে না। আর ঘুম যদি না আসে নামও আসে না।'

ছি-ছি, এমন করে কেউ প্রত্যাখ্যান করেছে ঠাকুরকে! গন্ধমাদন আনতে বলেননি, গাণ্ডীব তুলতে বলেননি, চাননি দধীচির অস্থি। বলেননি, গুহায় যাও পর্বতে গিয়ে ওঠো বা অরণ্যে প্রবেশ করো। শুধু একটি চিহ্নিত সময়ে মনের নির্জনে একটু ঈশ্বরকে স্মরণ করা। এত সংখ্যা জপ করতে হবে, তাও না। কোনো ধরা-বাঁধা মন্ত্র নয় যে মুখস্থ লাগবে বা উচ্চারণে ভুল হবে। একেবারে বেকড়ার, একেবারে বেকসুর। চোখ পর্যন্ত বুজতে হবে না। একটু শুধু ভাবা। মনে দাগ রাখতে হবে বা স্থান দিতে হবে মনের কোণে এমনও কোনো কথা নেই। শুধু সময়ের উড়ন্ত বাতাসে একটি চপল মুহূর্তের ঘ্রাণ নেওয়া। এটুকুও করতে পারবে না, দিতে পারবে না গিরিশ? ছি-ছি, তবে সে জন্মেছিল কেন মানুষ হয়ে? কিন্তু বৃথা বড়াই করে লাভ নেই। গিরিশ নিজেকে তো জানে। কেমন সে বাউণ্ডুলে কেমন সে ছন্নমতি! শেষে যদি কথা দিয়ে কথা রাখতে না পারে! আসলে ভগবানের যে নাম করব তাঁর কৃপা না হলে হবে কি করে? এই যন্ত্রে যে তিনি ঝঙ্কার তুলবেন যন্ত্র নিজের হাতে তো তাঁকে বেঁধে নিতে হবে! বাঁধবার সময় ব্যথা লাগবে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই ব্যথাই তো কৃপা।

কিন্তু, এ কি, এ কৃপা যে ব্যথাহীন। এ কৃপা যে অহেতুক!

'বেশ, তোকে কিছুই করতে হবে না।' ঠাকুর বললেন প্রসন্নাস্যে: 'আমাকে তুই বকলমা দে।'

তার মানে?

তার মানে, তোকে কিছুই করতে হবে না, তোর ভার আমার উপর ছেড়ে দে! তোর হয়ে আমিই নাম করব। তুই শুধু কলম ছুঁয়ে দে, আমিই সই করব তোর হয়ে।

আর কি চাই! আমার একেবারে ছুটি, আমি নেচে-গেয়ে আনন্দ করে বেড়াব।

যা করবার প্রভু করবেন। আমি নন্দের গোপাল হামা দিয়ে বেড়াব। তিনিই ধুলো মুছে কোলে তুলে নেবেন।

কিন্তু এ কি গিরিশ ছুটি পেল, না, বাঁধা পড়ল দ্বিগুণ শৃঙ্খলে?

বাঁধা পড়ল। গিরিশের আর আমি রইল না। ঠাকুর যখন ভার নিয়েছেন তখন নিজের আর কোনো কর্তৃত্ব নেই, সব তাঁর ইচ্ছাধীন। আমার হয়ে তিনি সত্যিনাম করছেন কিনা এটুকু প্রশ্ন করবারও আর অধিকার নেই। সব তাঁর খুশি, তাঁর এক্তিয়ার। ভার নেওয়া কঠিন হতে পারে, ভার দেওয়াও কম কঠিন নয়। ভার দেওয়া মানে পালিয়ে যাওয়া নয়, ভার দেওয়া মানে কোলের উপর বসা, কাঁধের উপর চড়া। নইলে, ভার যে দিলাম চাপিয়ে, বোঝাব কি করে?

আমার হয়ে সত্যি নাম করছেন কিনা—মাঝে-মাঝে এ চিন্তা আসে। এমনিতে হলে একবার নাম হত, এ চিন্তায় দুবার করে হচ্ছে। প্রথমত, নাম হচ্ছে কিনা—নামই রাম—আর দ্বিতীয়ত, ঠাকুর করছেন কিনা। নামের সঙ্গে-সঙ্গে ঠাকুরের মূর্তি মনে ভাসছে। একের জায়গায় দুই হচ্ছে।

এ যে অছি বসিয়ে দেওয়া। আর 'আছি' নয়, এবার অছি। আর 'আমি' নয়, এবার তুমি। আমার বলে আর কিছু নেই সংসারে। আমার কলম তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। পা-টি ফেলছি এ আমার জোরে নয়, তোমার জোরে। নিশ্বাসটি ফেলছি এ আমার কেরামতি নয়, তোমার করুণা।

'বকলমা দেওয়ার মধ্যে যে এত আছে তা কে জানত! সময় করে নাম করা যেত তার একটা অন্ত থাকত। এ যে একেবারে অনন্তের মধ্যে এসে পড়লুম।' গিরিশ বলছে তদ্‌গত হয়ে: 'কোথাও একটুকু ফাঁক নেই, ফাঁকি নেই। বকলমা দেওয়া মানে গলায় বকলস লাগানো। খাস ছেড়ে দিয়ে দাস বনে যাওয়া।'

স্ত্রী মারা গেল গিরিশের। পুত্র মারা গেল।

উপায় নেই, বকলমা দিয়ে দিয়েছ। মনকে প্রবোধ দেয় গিরিশ: 'তুমি কী জানো কিসে তোমার মঙ্গল, ঠাকুর জানেন। তুমি তাঁর উপর তোমার ভার দিয়েছ তিনিও নিয়েছেন সে-ভার। এখন তো আর বিচার চলবে না, সমালোচনা চলবে না। দলিলে এমন কোনো লেখাপড়া নেই কোন পথ দিয়ে তিনি তোমাকে নিয়ে যাবেন। তুমি তোমার জীবনস্বত্ব দান করে দিয়েছ ঈশ্বরকে। এখন তিনি তাঁর জিনিস নিয়ে যা খুশি করুন, মারুন-কাটুন, ফেলুন-ভাঙুন, তোমার কিছু বলবার নেই। তাঁর কুপালচক্রে তুমি এখন এক তাল নরম কাদা হয়ে যাও।'

তাই হোক। তাই হোক।

আমাকে তুমি নিযুক্ত করো। আমার বাক্যকে নিযুক্ত করো তোমার গুণকথনে,

কর্ণকে নিযুক্ত করো তোমার রসশ্রবণে, হস্তকে নিযুক্ত করো তোমার মঙ্গলকর্মে। মন থাক তোমার পদযুগে, মাথা থাক তোমার জগৎপ্রণামে আর দৃষ্টি থাক দিকে দিকে তোমারই মূর্তিদর্শনে।

'যার যা মনের পাপ আছে, অকপটে জানাও ঈশ্বরকে।' বলছেন ঠাকুর বরদ-মুদ্রিতে: 'যিনি বিন্দুকে সিন্ধু করতে পারেন তিনি পারেন পাপকে মার্জনার পারাবারে ডুবিয়ে দিতে।'

'কি করে জানাব।' গিরিশ কেঁদে পড়ল, 'আমি যে দুর্বল।'

'তা কি ঠাকুর জানেন না? খুব জানেন। তাই, একবার তাঁর শরণাগত হও, সব সমাধান হয়ে যাবে। শরণাগতকে শ্রীহরি পরিত্যাগ করেন না। দীনের ত্রাণকর্তা তিনি, নিশ্চয়ই তোমাকে ত্রাণ করবেন।'

'আমি কি হরি-টরি কাউকে চিনি? আমি চিনি তোমাকে।' গিরিশ জোড় হাত করল: 'তোমাকে বকলমা দিয়েছি। তুমি নিয়েছ আমার ভার। তুমিই আমার ভারহরণ—'

॥ ১০৬ ॥

কেদার চাটুজ্জেরও সেই কথা।

গোড়ায় ব্রাহ্ম ছিল এখন ভক্তিতে সাকারবাদী হয়েছে। এত দৃষ্টিময় স্বাদময় হয়েছে যে বলছে দক্ষিণেশ্বরে এসে, 'অন্য জায়গায় খেতে পাই না, এখানে পেট-ভরা পেলুম।'

'সাধুসঙ্গ সর্বদা দরকার।' কেদারকে বলছেন ঠাকুর, 'সাধুই ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' কেদার বললে, 'যেমন রেলের এঞ্জিন। পেছনে কত গাড়ি বাঁধা থাকে, টেনে নিয়ে যায়। কিংবা যেমন নদী। কত লোকের পিপাসা মেটায়। তেমনি সব মহাপুরুষ। তেমনি আপনি।'

ঈশ্বরের কথায় চোখ জলে ভেসে যায় কেদারের। সংসারে রুচি নেই। মন যেন পাদপদ্মলোভী মধুকর।

কালীঘরে মাকে প্রণাম করে এসেছেন, চাতালে বেরিয়ে এসে ঠাকুর আবার প্রণাম করলেন ভূমিষ্ঠ হয়ে। চেয়ে দেখলেন সামনে কেদার, রাম, মাস্টার আর তারক।

তারক মানে বেলঘরের তারক মুখুজ্জে। প্রথম যখন এসেছিল দক্ষিণেশ্বরে, চার বছর আগের কথা, তখন তার বয়স মোটে কুড়ি। বিয়ে করেছে। বাপ-মা

আসতে দেয় না ঠাকুরের কাছে। কিন্তু ঠাকুর যে বাপ-মা'র চেয়েও বেশি ভালোবাসেন।

সঙ্গে দেবার একটি বন্ধু নিয়ে এসেছে। নাস্তিবাদী বন্ধু। নাকের ডগায় সব সময়ে একটু ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা।

ঘরে প্রদীপ জ্বলছে ছোট খাটটিতে বসে আছেন ঠাকুর। তারককে দেখে শিশুর মত খুশি হয়ে উঠলেন, কিন্তু সঙ্গের ওই ল্যাজটি কোত্থেকে জুটিয়ে আনল? বন্ধুটিকে ঠাকুর বললেন, 'একবার মন্দির সব দেখে এস না।'

বন্ধু উপেক্ষার একটা ভঙ্গি করল। বললে, 'ও সব ঢের দেখা আছে।'

'শোন,' তারককে কাছে ডাকলেন ঠাকুর, 'বিশালাক্ষীর দ, মেয়েমানুষের মায়াতে যেন ডুবিসনি। যে একবার পড়েছে সে আর উঠতে পারে না। তোর অনেক শক্তি, তুই পড়বি কেন? দেখি তোর হাত দেখি।'

ঠাকুর তারকের হাতের ওজন নিচ্ছেন। বললেন, 'একটু আড যে নেই তা নয়। আছে। কিন্তু, আমি বলছি ওটুকু যাবে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবি আর মাঝে-মাঝে আসবি এখানে।'

তারক মাথা নোয়ালো। বললে, 'বাবা-মা আসতে দেয় না।'

'জোর করে আসবি। বাপ-মা শিরোধার্য, কিন্তু ঈশ্বরের চেয়ে কম।'

'এটা কি বললেন মশাই,' সেই বন্ধু ফোড়ন দিল: 'যদি কারু মা দিব্যি দিয়ে বলে ছেলেকে, যাসনি দক্ষিণেশ্বরে, সে যাবে? মা'র অবাধ্য হবে?'

'যে মা এরকথা বলে সে মা নয়, সে অবিদ্যা। সে মা'র অবাধ্য হলে কোনো দোষ হয় না।' বললেন ঠাকুর: 'ঈশ্বরের জন্যে গুরুবাক্য লঙ্ঘন করা চলে, কিন্তু মনে রাখিস, শুধু ঈশ্বরের জন্যে। তা ছাড়া অন্য সব কথা মাথা পেতে শুনতে হবে বাপ-মা'র। নির্বিবাদে, তর্ক-বিচার না করে।'

'আপনি যে কথাটা বলছেন শাস্ত্রে এর দৃষ্টান্ত আছে?' বন্ধু আবার চিপটেন কাটলো।

'যদু। ভরত রামের জন্যে শোনেনি কৈকেয়ীর কথা। প্রহ্লাদ কৃষ্ণের জন্যে শোনেনি হিরণ্যকশিপুর শাসন। বলি শোনেনি গুরু শুক্রাচার্যের কথা, জ্যেষ্ঠ ভাই রাবণের কথা শোনেনি বিভীষণ। আর গোপীরা? কৃষ্ণের জন্যে শোনেনি পতিদের নিষেধ। কি বাপু, মিলছে শাস্ত্রের সঙ্গে?'

ওরা চলে গেলে পর ঠাকুর শুয়েছেন ছোট খাটটিতে, আর বলছেন মাস্টারকে, 'বলতে পারো, ওর জন্যে আমি এত ব্যাকুল কেন? সঙ্গে ওটাকে আবার কেন

নিয়ে এল ?'

'বোধ হয় রাস্তার সঙ্গী।' বললে মাস্টার, 'অনেকটা পথ তাই একজনকে সঙ্গে করে এনেছে।'

যদি সঙ্গী কেউ না জোটে ঈশ্বরই তোর সঙ্গী। ঐ নির্জনতাই তোর নিবিড়তা। কেউ সঙ্গে নেই বলেই তো সে চলেছে তোর পাশে-পাশে।

কালীঘর থেকে বেরিয়ে চাতালে ফের ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন ঠাকুর। তারকের চিবুক ধরে আদর করলেন।

'নরেন রাঙাচক্ষু রুই, কিন্তু তুই হচ্ছিস মুগেল।'

ভাবাবিষ্ট হয়ে ঘরের মেঝেতে বসেছেন ঠাকুর। পা দুখানি সামনের দিকে প্রসারিত। রাম আর কেদার নানা জাতের ফুল দিয়ে সেই পা দুখানি বন্দনা করছে। ঠাকুরের দুপায়ের দুই বুড়ো আঙুল ধরে বসে আছে কেদার। বিশ্বাস, স্পর্শে শক্তি সঞ্চার হবে। কিন্তু তাইতেই কি হয় ? যিনি দেবার তিনি যদি না দেন শুধু তাঁর আঙুল ধরলে কিছু হবে না।

'মা, ও আমার আঙুল ধরে কি করতে পারবে ?' ঠাকুর বলছেন অর্ধবাহ্যদশায়। কেদার তো অপ্রস্তুত। মনের কথা কি করে টের পেয়েছেন অন্তর্যামী ! তাড়াতাড়ি আঙুল ছেড়ে দিয়ে হাত জোড় করলে।

মনের আরো কথা যেন টের পেয়েছেন। গোপনীয় নিগূঢ় কথা। প্রকাশ্যেই তাই বলছেন ঠাকুর, 'মুখে বললে কি হবে যে মন নেই, কামকাঞ্চনে এখনো তোমার মন টানে ! আমি বলি কি এগিয়ে পড়ো। একটু উদ্দীপন হয়েছে বলে মনে কোরো না যে সব হয়ে গেছে। চন্দন গাছের বনের পর আরো আছে, রূপার খনি, সোনার খনি, হীরে-মাণিক। এক্ষুনি থামলে চলবে কেন ?'

কণ্ঠ শুকিয়ে গিয়েছে কেদারের। রামের দিকে চেয়ে বলছে ভয়ে-ভয়ে, 'ঠাকুর এ কি বলছেন !'

ঠিকই বলছেন। এমনি তো মনের মুখোমুখি হবে না, খালি পাশ কাটিয়ে যাবে। ঠাকুর মনের সঙ্গে সম্মুখ-সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দিলেন। এখন দেখ একবার নিজের নির্ভেজাল রূপটুকু, আর আত্মতৃপ্তির আবরণ টেনে রেখো না। দেখ এখনো কত বিকৃতি, কত বৈচিত্র্য। কৃপা পেয়েছ বলেই তো পেলে এই আত্মদর্শনের সুবিধে। দর্পণ আবার মার্জন করো। ক্ষালন করো ক্ষতক্লেদ।

'এই কামকাঞ্চনই আবরণ। এত বড়-বড় গোঁফ, তবু তোমরা ওতেই রয়েছ জুজু হয়ে। বলো, ঠিক বলছি কিনা, মনে-মনে দেখ বিবেচনা করে—'

কেদার চুপ করে আছে। ঠিক বলছেন !

'যাকে ভূতে পায় সে জানতে পায় না তাকে ভূতে পেয়েছে। যারা কামকাঞ্চন নিয়ে থাকে, তারা নেশায় কিছু বুঝতে পারে না। যারা দাবাবোড়ে খেলে, তারা অনেক সময় জানে না, কি ঠিক চাল! কিন্তু যারা অন্তর থেকে দেখে তারা বুঝতে পারে।'

একদিন কেদারের বুকে হাত বুলিয়ে দিতে ইচ্ছে হল ঠাকুরের, পারলেন না। বললেন, 'ভিতরে অষ্টপাশ-বদ্ধ। ঢুকতে পারলাম না। বললাম তো, আসক্তি থাকলে হবে না। তাই তো ছোকরাদের অত ভালোবাসি। ওদের ভিতর এখনো বিষয়বুদ্ধি ঢোকেনি। অনেকেই নিত্যসিদ্ধ। জন্ম থেকেই টান ঈশ্বরের দিকে! যেন বনের মধ্যে ফোয়ারা বেরিয়ে পড়েছে। জল একেবারে বেরুচ্ছে কলকল করে।'

সেদিন আপিস যাবার পথে কেদার এসে হাজির। সরকারী একাউন্টেন্টের কাজ করে, থাকে হালিসহরে। সেখান থেকে কলকাতায় আসে। আসবার পথে কি মনে করে ঢুকেছে আজ দক্ষিণেশ্বরে। আপিসের পোশাক পরনে, চাপকান মায় ঘড়ি আর ঘড়ির চেন। হঠাৎ মন কেমন ব্যাকুল হয়েছে, দেখে যাই একবার ঠাকুরকে। যেই মনে হওয়া, অমনি গাড়ি থেকে নেমে পড়ে সটান দক্ষিণেশ্বর।

তাকে দেখেই ঠাকুরের বৃন্দাবনলীলার উদ্দীপন হল। প্রেমে বিহ্বল হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন ও রাধিকার ভাবে গেয়ে উঠলেন গদগদ হয়ে: 'সখি, সে বন কতদূর! যেথায় আমার শ্যামসুন্দর! আর যে চলিতে নারি।'

ঠাকুর দেখলেন কেদারের অন্তরে গোপীর ভাব। তার সেই ব্যাকুলতাটিই কৃষ্ণাকর্ষিণী গোপবালা।

বৃন্দাবন থেকে কৃষ্ণ যখন অকস্মাৎ অন্তর্হিত হলেন তখন গোপীদের কী দশা? বন হতে বনান্তরে খুঁজতে লাগল পাগলের মত। অশ্বত্থ আর অশোক, কিংশুক আর চম্পক, হে পরার্থজীবিত বৃক্ষ, আমাদের প্রিয়তম কোন পথ দিয়ে চলে গেল তা কি তোমরা দেখেছ? হে তুলসী, যার বুকে থেকেও যার পদযুগল ধ্যান করো, তুমি কি দেখেছ কোথায় পড়েছে তার পদধূলি? মালতী আর যূথিকা, করস্পর্শে তোমাদের শিহরিত করে তিনি কি গেছেন এই পথ দিয়ে? সখীগণ দেখ, দেখ, এই মালতী শরীরে পুলক ধারণ করে বিরাজ করছে, তবে কি তিনি একে নখাঘাত করে চলে গেছেন? হে তৃণাঙ্কিত পৃথিবী, কোন পুরুষভূষণের আলিঙ্গনে তোমার এই মধীন রোমাঞ্চ? কৃষ্ণবিরহে আমরা বিগতপ্রাণা, আমাদের পথ বলে দাও। পতি-পুত্র দ্বারা বারিতা হয়েও আমরা নিবৃত্ত হইনি। লোলায়িতকুণ্ডলকর্ণে ছুটে এসেছি এখানে। কেউ গোদোহন ফেলে এসেছি, কেউ বা দুগ্ধাবর্তন; কেউ শিশুকে স্তন্যপান করাচ্ছিলাম, কেউ বা করছিলাম অন্নপরিবেশন, কেউ বা

অঙ্গরাগলেপন—যার যা হাতের কাজ সব ফেলে-ছড়িয়ে ছুটে এসেছি তাঁর বাঁশি শুনে। সেই অরবিন্দনেত্র এতক্ষণ তো ছিলেন আমাদের সামনে, তিনি কোথায় গেলেন? কেন অদৃশ্য হলেন?

এই ব্যাকুলতাটিই বাস করছে কেদারের বুকের মধ্যে। এই ব্যাকুলতাই ভাসিয়ে নিয়ে যায় সব বিধিবন্ধনের কাঁটাবেড়া।

অধর সেন বললে, 'শিবনাথবাবু সাকার মানেন না।'

'সেটা হয়তো তাঁর বোঝবার ভুল। বললে বিজয় গোস্বামী। ঠাকুরের দিকে ইশারা করলে: 'ইনি যেমন বলেন, বহুরূপী কখনো এ রঙ কখনো সে রঙ। যার গাছতলায় বাসা সে ঠিক খবর রাখে। আমি ধ্যান করতে-করতে দেখতে পেলাম চালচিত্র। কত দেবতা, কত কি। আমি বললাম, আমি অত-শত বুঝি না, আমি তাঁর কাছে যাব, তবে বুঝব।'

ঠাকুর বললেন, 'তোমার ঠিক-ঠিক দেখা হয়েছে।'

কেদারের মধ্যে তন্ময়তা এল। বললে, 'ভক্তের জন্যে সাকার। প্রেমে ভক্ত সাকার দেখে। ধ্রুব যখন শ্রীহরিকে দর্শন করল, বললে, কুণ্ডল কেন দুলছে না? শ্রীহরি বললেন, তুমি দোলালেই দোলে।'

'সব মানতে হয় গো সব মানতে হয়—নিরাকার সাকার সব। কালীঘরে ধ্যান করতে-করতে দেখলুম, রমণী। বললুম, মা, তুই এরূপেও আছিস? কোন রূপে কার সামনে কখন এসে দাঁড়াবেন কেউ জানে না।'

'যাঁর অনন্ত শক্তি,' বললে বিজয়, 'তিনি অনন্তরূপে দেখা দিতে পারেন।'

'সেই যে গো চিনির পাহাড়ে পিঁপড়ে গিয়েছিল।' বললেন ঠাকুর, 'এক দানা চিনি খেয়ে তার পেট ভরে গেল। আরেক দানা মুখে করে বাসায় নিয়ে যাচ্ছে। যাবার সময় ভাবছে, এবার এসে গোটা পাহাড়টা নিয়ে যাব। তেমনি একটু গীতা, একটু ভাগবত, একটু বা বেদান্ত পড়ে লোকে মনে করে আমি সব বুঝে ফেলেছি।'

নবগোপাল ঘোষ একবার তিন বছর আগে এসেছিল। তারপর ভুলে গিয়েছে দক্ষিণেশ্বরের কথা। কিন্তু ঠাকুর ভোলেননি। কি জানি কেন, তিন বছর বাদে ঠাকুর তাকে ডেকে পাঠালেন।

নবগোপাল তো অবাক। আমি তোমাকে ভুলে গিয়েছি অথচ তুমি আমাকে ভোলোনি। কিংবা এতদিন ভুলিয়ে রেখে শুভক্ষণ দেখে ডেকে পাঠিয়েছ। নবগোপাল পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল। বললে, 'কামকাঞ্চনে ডুবে আছি, কি করে আমার ত্রাণ হবে?'

'কোনো চিন্তা নেই।' ঠাকুর বললেন স্নিগ্ধাননে, 'দিনে শুধু একবারটি আমায়

মনে কোরো। শুধু একবার।'

গুরু-শিষ্য বোঝাচ্ছেন ঠাকুর। যিনি ইষ্ট তিনিই গুরুরূপ ধরে আসেন। শব-সাধনের পর যখন ইষ্টদর্শন হয় তখন গুরু এসে শিষ্যকে বলেন তুইই গুরু তুইই ইষ্ট। যখন পূর্ণজ্ঞান হয় তখন কে বা গুরু কে বা শিষ্য। সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু-শিষ্য দেখা নাই।

কে একজন ভক্ত বলে উঠল, 'তাই তো বলে গুরুর মাথা শিষ্যের পা।'

'বোঝো মানে।' বললে নবগোপাল, 'শিষ্যের মাথাটা গুরুর আর গুরুর পা শিষ্যের।'

'না, ও মানে নয়।' বললে গিরিশ, 'বাপের ঘাড়ে ছেলে চড়েছে। শিষ্যের পা এসে ঠেকেছে গুরুর মাথায়।'

'তবে তেমনি কচি ছেলে হতে হয়।' বললে নবগোপাল, 'কচি ছেলে হলেই তবে বাপ তুলবে কাঁধের উপর।'

হতে হবে সরলশুভ্র। হতে হবে লঘুমৃদু। হতে হবে মানহীন ভাবহীন সহায়-সম্বলহীন। মা তখন ছেলেকে ধুলো থেকে কোলে, কোল থেকে কাঁধে তুলে নেবেন। চুমু খাবেন পদাম্বুজে।

বেলঘরের তারক মুখুজ্জে অমনি এক খাঁটি ছেলে, কচি ছেলে। দক্ষিণেশ্বর থেকে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে, ঠাকুর দেখলেন, তাঁর ভিতর থেকে আলো বেরিয়ে চলেছে তারকের পিছু-পিছু। তারক অসহায়, তারক আশ্রিত অপিতসর্বস্ব। তাই তাকে একা ছেড়ে দিতে পারেন না। তাই তার সঙ্গে নেন, হাত ধরেন, পথ দেখান, শ্রান্ত হলে নেন তাকে কাঁধে করে।

কয়েকদিন পর আবার এসেছে, ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে তারকের বুকের উপর পা তুলে দিলেন। তারক আর কি চায়! যম ভয়লয়কারী পরম পদ। কারুণ্যকল্পদ্রুমের ছায়ায়! এ পদের বাইরে আর কী সম্পদ চাইবার আছে!

'খুব উঁচু ঘর তারকের। তবে শরীর ধারণ করলেই যত গোল। স্খলন হল তো সাংজন্ম আসতে হবে। বড় সাবধানে থাকতে হয়। বাসনা থাকলেই দেহধারণ।' বললেন ঠাকুর।

কে একজন ভক্ত বলে উঠল, 'যাঁরা অবতার তাঁদেরও কি বাসনা থাকে?'

সংশ ঠাকুর বললেন সহাস্যে, 'কে জানে! তবে আমার দেখছি সব বাসনা যায়নি। এক সাধুর আলোয়ান দেখে ইচ্ছে হয়েছিল অমনি পরি একখানি। সেই ইচ্ছে এখনো আছে। জানি না আবার আসতে হবে কিনা—'

বলরাম বসেছিল পাশে। হেসে উঠল শিশুর মত। বললে, 'আপনার জন্ম হবে কি

ঐ আলোয়ানের জন্যে ?'

'কে জানে। তবে শেষ পর্যন্ত একটি সৎ কামনা রাখতে হয়। ঐ চিন্তা করতে-করতে দেহত্যাগ হবে বলে। সাধুরা চার ধামের এক ধাম বাকি রাখে। হয়তো গেল না শ্রীক্ষেত্র। তা হলে জগন্নাথ ভাবতে-ভাবতে শরীর যাবে।'

ঘরের মধ্যে একজন গেরুয়াধারী লোক ঢুকল। ঠাকুরকে প্রণাম করলে।

চিরকাল ঠাকুরকে ভণ্ড বলে এসেছে। তবু প্রণাম করবার ঘটা দেখ।

বলরাম হাসছে। ঠাকুর বলছেন, 'বলুক গে ভণ্ড। হাসিসনি। কে জানে ভেক ধরেই হয়তো ওর ভিক্ষে মিলবে। ভেকেরও আদর করতে হয়। ভেক দেখলেও উদ্দীপন হয় সত্যবস্তুর।'

॥ ১০৭ ॥

মনোমোহন মিত্তিরও ঈশ্বর মানে না। মেসো রায় বাহাদুর রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করে। বন্ধু বলতে রাম দত্ত, আরেক মেসোর ছেলে। সমপন্থী নাস্তিবাদী।

ব্রাহ্মসমাজের আওতায় এসেছে দুজনে। অথচ কেশব সেনই দক্ষিণেশ্বরে কোন এক সাধুর কথা লিখেছে কাগজে। কেশব যখন লিখেছে তখন উড়িয়ে দেওয়া যায় না। চল দেখে আসি।

নাস্তিকে-নাস্তিকে মাসতুতো ভাই। এল দুজন দক্ষিণেশ্বরে। রাম দত্ত তখন ডাক্তার, মেডিকেল কলেজে চাকরি করে, আর মনোমোহন বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে চল্লিশ টাকার কেরানী।

এসে দেখে ঠাকুরের দরজা বন্ধ। অবিশ্বাস নিয়ে এসেছে, বন্ধ তো থাকবেই। শরণাগতি নিয়ে আসত, খোলা পেত। শরণাগতি কি সহজে আসে ?

'ওরে হৃদে, মস্ত এক ডাক্তার এসেছে।' ঠাকুর ডাকলেন হৃদয়কে : 'তোর কি ভাগ্যি ! নাড়ী দেখাবি-তো এবেলা দেখিয়ে নে।'

হৃদয় তখুনি বাড়িয়ে দিল হাত। রাম দত্তও দিব্যি পরীক্ষা করল। কিন্তু হৃদয়ের হাত দেখে কি হবে ! ঠাকুর রামকৃষ্ণের পা কই ?

ঘন-ঘন আসা-যাওয়া করছে মনোমোহন, বিশ্বাসের পর্বত ভেদ করে নির্গত হয়েছে ভক্তির নির্ঝরিণী, ইচ্ছে হল পা দুখানি টেনে নেয় বুকের মধ্যে। কিন্তু, কেন কে জানে, সেদিন পা দুখানি গুটিয়ে নিলেন ঠাকুর।

অভিমানে ফুলে উঠল মনোমোহন। বললে, 'বড় যে পা গুটিয়ে নিলেন ! শিগগির বার করুন, নইলে কাটারি এনে পা দুখানি কেটে নিয়ে যাব। আমার একার নয়

সকল ভক্তেষ সাধ মেটাব বলে রাখছি।'

তাড়াতাড়ি পা বার করে দিলেন ঠাকুর।

প্রার্থনায় না পাই, অভিমান করে নেব। নেব ছল করে জোর করে কৌশল করে। একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাবার উদ্যোগ করছে, মাসি এসে বাধা দিল। বললে, যাস নে ওখানে। মাসির বাড়িতে থাকে তাঁর কথার অমান্য করা যায় না, কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে না গিয়েই বা থাকা যায় কি করে! রাম দত্তকে সঙ্গে নিয়ে গেল তাই চুপি-চুপি। গিয়ে দেখে ঠাকুরের মুখ ভার। কি হল?

'ভক্ত আসতে চায় দক্ষিণেশ্বরে কিন্তু তার মাসি তাকে আসতে দিতে নারাজ। ভয় হয় মাসির কথা শুনে সে আসা না বন্ধ করে!'

আরেকদিন দক্ষিণেশ্বর যাচ্ছে, বাধা দিল স্ত্রী। বললে, 'মেয়েটার অসুখ, যেয়ো না বাড়ি ছেড়ে।' কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের ডাক যে ত্রৈলোক্যাকর্ষী বংশীর ডাক। স্ত্রীর কথা তাই কানে তুলল না। এবার আর সঙ্গে নিল না রামকে। কৃতকর্মের ফল সে নিজেই বহন করবে বলে একা গেল। গিয়ে দেখে ঠাকুর বিমর্ষ হয়ে বসে আছেন। ব্যাপার কি?

'ভক্ত আসতে চায় দক্ষিণেশ্বরে কিন্তু তার স্ত্রী তাকে আসতে দিতে নারাজ। ভয় হয় বউয়ের কথা শুনে সে আসা না বন্ধ করে।'

আসা বন্ধ করল না মনোমোহন। আর, থেকে-থেকে সঙ্গে আছে রাম দত্ত। দুই নিরীহ গৃহস্থ কিন্তু আসলে দুই বিরাট আবিষ্কর্তা। মনোমোহন আবিষ্কার করল রাখালকে, রাম দত্ত নরেনকে। শুধু সন্ধান দিল না, ধরে নিয়ে এল ঠাকুরের কাছে। প্রতীক্ষিত বারুদের কাছে দুই উড়ন্ত বহ্নিকণা।

মনোমোহন, মহিমাচরণ আর মাস্টার বসে আছেন। মনোমোহনের দিকে চেয়ে বলছেন ঠাকুর, 'সব রাম দেখছি। তোমরা সব বসে আছ, কিন্তু আমি দেখছি রামই সব এক-একটি হয়েছেন।'

'তবে আপনি যেমন বলেন, আপো নারায়ণ—জলই নারায়ণ, তেমনি।' বললে মনোমোহন, 'জল কোথাও খাওয়া যায়, কোথাও বা মাত্র মুখে দেওয়া চলে, কোথাও বা শুধু বাসন মাজা।'

'ঠিক তাই। কিন্তু তিনি ছাড়া কিছু নেই। জীব-জগৎ সব তিনি।'

চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, সব তুমি। মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার সব তুমি। পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, সব তুমি। তুমিই ভোক্তা-ভোজ্য, আধার-আধেয়। তুমিই অখণ্ডমণ্ডলাকার।

হাটখোলার সুরেশ দত্ত নাগমশায়ের বন্ধু। ঠাকুরের প্রতি ভক্তিতে দৃঢ়ীভূত। ঠাকুরকে একবার ভোগ দেবে, নতুনবাজার থেকে জিনিসপত্র কিনে পাঠিয়েছে

গাড়ি করে। নিজে চলেছে পায়ে হেঁটে, দইয়ের ভাঁড় হাতে নিয়ে। গাড়িতে দিলে ঝাঁকুনিতে দই পাছে চলকে যায়, তাই এই ক্লেশসাধন। ভোগের দই, ভ্রষ্ট হতে পারবে না। তেমনি আমিও অভঙ্গ থাকব।

তেইশ নম্বর সিমলে স্ট্রীট মনোমোহনের বাড়িতে এসেছেন ঠাকুর। বসেছেন বৈঠকখানায়। বলছেন, 'যে অকিঞ্চন যে দীন তারই ভক্তি ঈশ্বরের সব চেয়ে প্রিয়। খোলমাখানো জাব যেমন গরুর প্রিয়। দুর্যোধনের কত ধন কত ঐশ্বর্য, তার বাড়ি ঠাকুর গেলেন না। গেলেন বিদুরের বাড়ি।'

পরামর্শের জন্যে বিদুরকে ডাকলেন ধৃতরাষ্ট্র। কত কিছু ঘটে গেল এর মধ্যে, কিছুই সুফল আনল না। জতুগৃহে দগ্ধ হল না। দ্যূতক্রীড়ায় হেরে গেল, দ্রৌপদীর বেশাভিমর্ষ হল, বনবাস-সত্য পালন করে ফিরে এল পাণ্ডবেরা। রাজ্যভাগ দাবি করল। কৃষ্ণ এসেছিল অনুনয় করতে, ফিরিয়ে দেওয়া হল। এখন বিদুরের কি মত?

বিদুর বললে, 'মহারাজ, কুরুকুলের কুশলের জন্যে যুধিষ্ঠিরকে দিন তার রাজ্যভার। অশিব দুর্যোধনকে ত্যাগ করুন।'

আর যায় কোথা! এ দাসীপুত্রকে কে ডেকে আনল এখানে? যার অন্নে পুষ্ট তারই সে বিরুদ্ধতা করছে? শ্বাস মাত্র অবশিষ্ট রেখে একে এখুনি তাড়িয়ে দাও পুরী থেকে। গর্জে উঠল দুর্যোধন।

এও ভগবানেরই লীলা। দ্বারদেশে ধনুর্বাণ রেখে বেরিয়ে পড়ল বিদুর। পরিধানে কম্বল, ধূলিরুক্ষ কেশপাশ, বেরিয়ে পড়ল তীর্থোদ্দেশে। মুখে শুধু কৃষ্ণনাম। 'রসিকশেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ।' সর্বাবস্থায় যিনি সর্বচিত্তাকর্ষক। এত মধুর নিজের পর্যন্ত মনোহরণ করেন, নিজেকে নিজেই চান আলিঙ্গন করতে।

যে আকাঙ্ক্ষা অভাব থেকে জাগে তা দূষণস্বরূপ। আর যে আকাঙ্ক্ষা স্বভাব থেকে জাগে তা ভূষণস্বরূপ। ঈশ্বরের স্বভাবই হচ্ছে ভক্তের প্রীতিরস-আস্বাদন। যত খান তত চান। কাউকে ছাড়েন না, যার থেকে যতটুকু পান নিংড়ে-নিংড়ে নেন। শ্রেষ্ঠকে পেলেও কনিষ্ঠকে ছাড়েন না, উত্তমকে পেলেও ছাড়েন না অধমকে। তিনি আর কারু বশীভূত নন শুধু ভক্তের বশীভূত। আর কারুতে বৎসল নন শুধু ভক্তে বৎসল।

'বৎসের পিছে যেমন গাভী যায় তেমনি ভক্তের পিছে ভগবান যান।' বললেন ঠাকুর। কথক প্রহ্লাদচরিত বলছে। হিরণ্যকশিপু যেমন নিন্দা করছে হরির, তেমনি নিষ্পীড়ন করছে প্রহ্লাদকে। তবু প্রহ্লাদের বিচ্যুতি নেই। হরিকে প্রার্থনা করছে, হে হরি, বাবাকে সুমতি দাও। আর আমাকে? আমাকে দাও অবিসংবাদিনী ভক্তি।

ঠাকুর কাঁদছেন। পাশে বসে বিজয়, মনোমোহন, সুরেন্দ্র। বলছেন বিহ্বল কণ্ঠে, 'আহা, ভক্তিই সার। সর্বদা তাঁর নাম করো, ভক্তি হবে। দেখ না শিবনাথের কি ভক্তি! যেন রসে-ফেলা ছানাবড়া!'

পরে আবার যখন এলেন মনোমোহনের বাড়ি, ঈশান মুখুজ্জের সঙ্গে কথা বলছেন ঠাকুর।

ঈশান বলছে, 'সবাই যদি সংসার ত্যাগ করে তা হলে কি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কাজ হয় না?'

'সবাই কেন ত্যাগ করবে? যাকে দিয়ে করাবার তাকে দিয়ে করাবেন। জোর করে কি কেউ ত্যাগ করতে পারে? মর্কট বৈরাগ্য কি বৈরাগ্য?' বলে ঠাকুর গল্প গাঁথলেন।

সেই যে বিধবার ছেলে, মা সুতো কেটে খায়, একটু কাজ পেয়েছিল সে কাজ চলে গিয়েছে। বেকার হয়ে বৈরাগ্য হল, গেরুয়া পরল, কাশীবাসী হল। কিছুদিন পরে মাকে চিঠি লিখলে। মা, আমার একটি চাকরি হয়েছে, দশ টাকা মাইনে। ওই মাইনে থেকেই সোনার আংটি কেনবার চেষ্টা করছে। ভোগের বাসনা যাবে কোথায়?

দ্বিতীয়বার, প্রাঙ্গণে বসেছেন। কেশব এসে প্রণাম করল। গৃহস্থ ভক্তেরা চার দিকে ব'সে।

'সংসারে কর্ম বড় কঠিন।' বলছেন ঠাকুর, 'বন্-বন্ করে যদি ঘোরো, মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। কিন্তু যদি খুঁটি ধরে ঘোরো, আর ভয় নেই। ঘুরবে কিন্তু পড়বে না। কর্ম কর চুটিয়ে, কিন্তু ঈশ্বরকে ভুলো না।'

'বড় কঠিন।' কে একজন বললে। 'তবে উপায় কি?'

'উপায় অভ্যাসযোগ। ছুতোরের মেয়ে একদিকে চিঁড়ে কুটছে, ছেলেকে মাই দিচ্ছে, আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথা কইছে, কিন্তু সর্বক্ষণ মন রয়েছে মুষলের দিকে।'

অভ্যাসের থেকেই অনুরাগ। কাঁদতে-কাঁদতে শোক, খেতে-খেতে খিদে। ডাকতে-ডাকতে ভালোবাসা। চলতে-চলতে পথ পাওয়া। প্রদীপ জ্বালতে-জ্বালতে নিজে প্রদীপ হয়ে জ্বলে ওঠা!

হোক কঠিন। কঠিন বলেও যদি নিবৃত্ত না হও তবেই তো কৃপা করবেন। যারা সংসারে থেকেও তাঁকে ডাকতে পারে তারাই তো বীর ভক্ত। মাথায় বিশ মণ বোঝা তবু ঈশ্বরকে পাবার চেষ্টা করছে। যখনই ভগবান দেখবেন এই বীরত্বের কৃতিত্ব তখনই কৃপাস্পর্শে তাকে তিনি মর্যাদা দেবেন। আর তাঁর কৃপাস্পর্শে সমস্ত বোঝা হালকা হয়ে যাবে।

'ভক্তি লাভ করে কর্ম করো।' বলছেন ঠাকুর, 'শুধু কাঁঠাল ভাঙলে হাতে আটা লাগবে। হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙলে আর আটা লাগবে না।'

নিজে একজন খুব বড় ভক্ত, মনে-মনে ঘোরতর স্পর্ধা মনোমোহনের। এ একরকম ভক্তির অহমিকা। কিন্তু ঠাকুর তার গর্ব চূর্ণ করে দিলেন। একদিন বললেন সকলের সামনে, 'সুরেশের ভক্তিই সকলের চেয়ে বেশি।'

মনোমোহনের অভিমানে ঘা লাগল। ভাবল, তবে আর ঠাকুরের কাছে গিয়ে লাভ কি! ছাড়ল দক্ষিণেশ্বর। রবিবার-রবিবার বৈঠক বসত যেখানে, তারও চৌকাঠ মাড়াল না।

কি হল হে তোমার বন্ধুর? আর আসে না কেন? ভালো আছে তো? রাম দত্তকে জিগগেস করলেন ঠাকুর।

রাম দত্ত কিছুই জানে না। খোঁজ নিয়ে জানল ভালোই আছে। তবে যাওনা কেন? আমার খুশি।

ঠাকুরের কাছে খবর গেল। তিনি লোক পাঠালেন। মনোমোহন তা গ্রাহ্য করল না। বললে, 'আমাকে তাঁর কি দরকার! তিনি তাঁর ভক্ত নিয়ে সুখে থাকুন। আমি তাঁর কে!'

অভিমানের কথা। আমার যখন ভক্তি নেই তখন আমাকে আবার ডাকা কেন! বারে-বারে লোক পাঠাতে লাগলেন ঠাকুর, আর বারে-বারেই তাদের ফিরিয়ে দিল। বিরক্ত হয়ে মনোমোহন কোন্নগরে চলে গেল, সেখান থেকেই আফিস করতে লাগল। যাতে ঠাকুরের লোক তাকে ধরতে না পায়। ঠাকুরও ছাড়বার পাত্র নন। কোন্নগর পর্যন্ত ধাওয়া করলেন। একদিন পাঠিয়ে দিলেন খোদ রাখালকে।

রাখালকে ফিরে যেতে দিল না মনোমোহন। সঙ্গের লোকটিকে বলে দিল, 'ঠাকুরকে গিয়ে বলো, ভক্তিহীনকে ডেকে লাভ কি! আগে ভক্তি-টক্তি হোক, তারপর যাব একদিন।'

ক্রোধে পুড়তে লাগল মনোমোহন। বিপরীত আচরণ করছে বটে কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও ঠাকুরকে ভুলতে পারছে না। মন বসছে না আফিসের কাজে, থেকে-থেকেই ছুটে যাচ্ছে দক্ষিণেশ্বরে। যাকে পরিহাস করতে চাইছে সর্বক্ষণ তারই উপর অভিনিবেশ!

যেমন কংসের অবস্থা। পান-ভোজন, ভ্রমণ-শয়ন, নিশ্বাস-প্রশ্বাস সর্ব সময়েই দেখছে চক্রধারীকে। কেশাকর্ষণ করে উচ্চ মঞ্চ থেকে ফেলছেন নিচে তখনো শ্রীকৃষ্ণকে দেখছে অপলক চোখে। দেখতে-দেখতে তাঁরই দুষ্প্রাপ্য রূপ প্রাপ্ত হচ্ছে।

তেমনি মনোমোহনেরও সব সময়ে মনোমোহনদর্শন। বৈমুখ্যের জন্যে সব সময়েই

অভিমুখিতা। বৈরূপ্যের জন্যে সব সময়েই সারূপ্য। যাকে সরিয়ে দিতে চাই বারে-বারে তারই কাছটিতে গিয়ে বসা। যাকে এড়িয়ে যেতে চাই তাকেই জড়িয়ে ধরা। অশান্ত মনে দিন কাটছে মনোমোহনের। একদিন গঙ্গাস্নানে গিয়েছে, দেখল সামনে একখানি নৌকো। তাতে বলরাম বোস বসে। বলরামকে দেখে নমস্কার করল মনোমোহন। বলল, 'কি সৌভাগ্য আমার! সকালেই ভক্তদর্শন।'

কথার সুরে কি সেই পুরোনো অভিমানের ঝাঁজ রয়েছে লুকিয়ে?

হাসিমুখে বলরাম বললে, 'শুধু ভক্ত নয়, গুজরত খোদ এসেছেন।'

কে, ঠাকুর? কোথায় তিনি? নৌকোর দিকে ফের চোখ পড়ল। কোথায়? ও তো নিরঞ্জন!

হ্যাঁ, নিরঞ্জনই তো! নিরঞ্জন বললে, 'আপনি যান না কেন দক্ষিণেশ্বর? আপনি যান না বলে ঠাকুর ব্যাকুল হয়ে এসেছেন আপনার কাছে।'

এসেছেন? কোথায় তিনি? ঐ যে নিরঞ্জনের পাশটিতে বসে আছেন লুকিয়ে। ওরে, না এসে কি পারি? তুই যে সর্বক্ষণ আমাকে ডাকছিস। তুই যে আমাকে দূরে রাখছিস ঐ তো তোর আমাকে কাছে ডাকা। ঠেলে দিচ্ছিস বারে-বারে ঐ তো তোর আমাকে কাছে টানা। আমাকে তুই আর বসে থাকতে দিলি কই?

ঠাকুর সমাধিস্থ হলেন। জলের মধ্যেই মনোমোহন ছুটল তাঁর দিকে। জলের মধ্যেই প্রায় টলে পড়ে—ধরে ফেলল নিরঞ্জন। টেনে তুলল তাকে নৌকোয়। ঠাকুরের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল। কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে।

আমি তোমাকে চাইনি, কিন্তু, আশ্চর্য, তুমি আমাকে চেয়েছ। আমি তোমাকে পিছনে ফেলে পালাতে চেয়েছি, কিন্তু, আশ্চর্য, সামনেই আবার তুমি দাঁড়িয়ে। পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চেয়েছি, তুমি নিজেই কখন ধরা দিয়েছ। তোমাকে চাই না, এ কথা বললেও তুমি ছাড়ো না। তোমার কাছে না গেলেও তুমি আস। না ডাকলেও খুঁজে বার করো। বারে-বারে হেরে গিয়ে জয়ী হও। তোমারসঙ্গে পারি এমন সাধ্য কি!

॥ ১০৮ ॥

রসিকের কথা মনে আছে? সেই রসিক মেথর? দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির ঝাড়ুদার? পঞ্চবটীর কাছটায় ঝাঁট দিচ্ছে, ঠাকুর যাচ্ছেন ঝাউতলার দিকে। পিছনে গামছাতে রামলাল। ঠাকুরকে দেখে সরে গেল রসিক। কে জানে যদি অশুচি ধূলির দূষিত স্পর্শ তাঁর গায়ে লাগে। ফেরবার সময় সরল না। কোমরের গামছা-খানি খুলে গলায় জড়ালে। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে ঠাকুরকে।

ঠাকুর হাসিমুখে শুধোলেন, 'কি রে রসিক, ভালো আছিস তো?'

'বাবা, আমরা হীন জাত, হীন কর্ম করি, আমাদের আবার ভালো কি!' হাত

জোড় করে বললে রসিক।

মথুরবাবু ছাড়া আর কেউ বাবা বলতে পায়নি এতদিন। মথুরবাবুর পরে এই আবার রসিক মেথর। তার বাবা-ডাক মেনে নিলেন সস্নেহে। কিন্তু সতেজে বলে উঠলেন, 'হীন জাত কি! তোর ভেতরে যে নারায়ণ আছেন। নিজেকে জানতে পাচ্ছিস না তাই হীন মনে করছিস—'

'কিন্তু কর্ম তো হীন।'

'কি বলিস! কর্ম কি কখনো হীন হয়?' ঠাকুর আবার বললেন তেজী গলায়: 'এইখানে মায়ের দরবার, দ্বাদশ শিবের দরবার, রাধাকান্তের দরবার, কত সাধু-সজ্জন আসছে-যাচ্ছে, তাঁদের পায়ের ধুলো ছড়িয়ে আছে চারপাশে। ঝাঁট দিয়ে সেই ধুলো তুই তোর গায়ে মাখছিস। কত পবিত্র কর্ম। কত ভাগ্যে এ সব মেলে বল্ দেখি।'

রসিক যেন আশ্বস্ত হল। বললে, 'বাবা, আমি মুখ্খু, তোমার সঙ্গে তো কথায় পারব না। কে বা পারবে তোমার সঙ্গে? শুধু একটা কথা তোমাকে জিগগেস করি। বাবা, আমার গতিমুক্তি হবে তো?'

ঠাকুর চলে যাচ্ছেন, যেতে-যেতে বললেন, 'হবে, হবে। বাড়ির উঠোনে তুলসী-কানন করে সন্ধ্যেবেলায় হরিনাম করবি, কোনো ভয় নেই।'

এ যেন স্থির হয়ে ঠিক বললেন না। কে জানে হয়তো বা স্তোক দিয়ে গেলেন। রসিক পিছু নিল। প্রলুব্ধের মত জিগগেস করলে, 'বাবা, সত্যি আমার গতিমুক্তি হবে?'

এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন ঠাকুর। বললেন, 'হবে হবে হবে। শেষ সময়ে হবে।'

ঠাকুর অপ্রকট হবার পর দু বছর কেটে গেছে। একদিন কাজে রসিক না এসে এসেছে তার স্ত্রী। রামলাল জিগগেস করলে, 'কি রে রসকে এল না কেন?'

'বাবাঠাকুর, তার খুব জ্বর।'

পরদিন আবার রসিকের স্ত্রী এলে রামলাল কুশল প্রশ্ন করল। রসিকের স্ত্রী বললে, 'ভালো নয়। চার টাকা ভিজিট দিয়ে ভালো ডাক্তার আনা হয়েছিল। কিন্তু এমনি জেদ, ওষুধ কিছুতেই খাবে না। আমাকে বললে ঠাকুরবাড়ি থেকে চন্নামৃত নিয়ে আয়। চন্নামৃতই আমার ওষুধ।'

রামলাল চরণামৃত দিল। কালকে আবার কেমন থাকে না জানি।

মেথরপাড়ার মোড়ল এই বুড়ো রসিক। কাঁচড়াপাড়ার কর্তাভজার দল থেকে দীক্ষা নিয়েছে। তুলসী-মালা জপ করে। ঠাকুরের কথা শুনে বাড়ির আঙিনায় কানন করেছে তুলসীর। মেথরদের সব ছেলে-বুড়ো নিয়ে রোজ সন্ধ্যেবেলা কীর্তন করে।

হরিনামের তুফান তোলে।

ভর দুপুরবেলা সেদিন হঠাৎ স্ত্রীকে হুকুমজারি করলে, 'আমাকে তুলসীতলায় নিয়ে চলো।'

সে কি কথা? স্ত্রী তো স্তম্ভিত!

'ছেলেদের ডাকো। আমার এখন শরীর যাবে।'

'তুমি তো এখন দিব্যি ভালো আছ—' স্ত্রী প্রতিবাদ করল।

'যা বলছি তাই শোনো। ছেলেদের ডাকো। তুলসীতলায় মাদুর বিছিয়ে শুইয়ে দাও আমাকে।'

একবার জেদ ধরলে কিছুতেই টলানো যায় না। ছেলেরা জোয়ান, রোজগেরে। বাপের কথায় ছুটে এল। ধরাধরি করে বের করে শুইয় দিল তুলসীতলায়। খাড়া রোদের মধ্যে।

'আমার জপের মালা নিয়ে আয়।' বললে রসিক। স্বাভাবিক সুস্থ কণ্ঠস্বর।

জপ করতে-করতে হঠাৎ যেন কি দেখতে লাগল তীক্ষ্ণ চোখে। সমস্ত রৌদ্রে যিনি ছায়াময় ও সমস্ত ছায়ায় যিনি জ্যোতির্ময় তিনি যেন দাঁড়িয়েছেন সামনে। তৃপ্তির একটি সচেতন লাবণ্য ফুটে উঠল মুখমণ্ডলে। বললে, 'কি বাবা এয়েছ? তাই বলি, এয়েছ? আহা কি সুন্দর, কি সুন্দর!' টান-টান শ্বাস কিছু হল না। বলতে-বলতে গভীর প্রশান্তিতে চোখ বুজল।

নীলকণ্ঠ মুখুজ্জে গান শোনাতে আসে ঠাকুরকে। কী সুখন সে গান! যে শোনে সেই মজে।

'আহা, নীলকণ্ঠের গান কী চমৎকার!' বলছেন শ্রীমা: 'ঠাকুর বড় ভালোবাসতেন। কি আনন্দেই তখন ছিলাম! কত রকমের লোকই তাঁর কাছে আসত। দক্ষিণেশ্বরে যেন আনন্দের হাটবাজার বসে যেত।'

তাঁর ঘরে মেঝেতে মাদুরের উপর বসে আছেন ঠাকুর। দীননাথ খাজাঞ্চিও দর্শন করতে এসেছে। পাঁচ-সাতজন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে ঘরে ঢুকল নীলকণ্ঠ। নীলকণ্ঠ না সুধাকণ্ঠ।

তাকে দেখে ঠাকুর বললেন, 'আমি ভালো আছি।'

সেই ভালোটিই তো চাই। নীলকণ্ঠ যুক্তকরে বললে, 'আমায়ও ভালো করুন। এই সংসারে পড়ে রয়েছি।'

'পাঁচজনের জন্যে তিনি রেখেছেন তোমাকে সংসারে।'

পাঁচজনের সেবাতেই তো ঈশ্বরপূজা। তিনি কাজের মধ্য দিয়ে পূজা নিচ্ছেন। কাজ যেমন হোক, পূজা ঠিকই হচ্ছে। বলো এ তাঁর সংসার। যাদের সেবা করছি

তারা তাঁরই প্রতিনিধি।

'তুমি যাত্রাটি করেছ, তোমার ভক্তি দেখে কত লোকের উপকার হচ্ছে।' বললেন রামকৃষ্ণ : 'তুমি যদি এখন ছেড়ে দাও তোমার সাঙ্গোপাঙ্গরা কোথায় যাবেন?'

ঠিকই তো। আমাকে দিয়ে কতগুলো লোকের ভরণপোষণ হচ্ছে। এ দিয়েই আমি ঈশ্বরের সাধন-ভজন করছি। যাকে দিয়ে তিনি যা করাবেন তাতেই তাঁর তুষ্টি। তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্।

'তোমাকে দিয়ে তিনি কাজ করিয়ে নিচ্ছেন, তাঁর যেমন খুশি। কাজ শেষ হলে তুমি আর ফিরবে না।' আবার বলছেন রামকৃষ্ণ, 'গৃহিণী সমস্ত সংসারের কাজ সেরে সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে নাইতে যায়। তখন শত ডাকাডাকি করলেও ফেরে না।' নীলকণ্ঠ বললে, 'আমাকে আশীর্বাদ করুন।'

'যেকালে তাঁর নাম করতে তোমার চোখ জলে ভেসে যায় সেকালে আর তোমার ভাবনা কি? তাঁর উপরে তোমার যে ভালোবাসা এসেছে।'

শুধু ঐটিই তো মন্ত্র। ভালো হও আর ভালোবাসো। ভালো হতে পারলেই ভালোবাসবে। কিংবা ভালোবাসতে পারলেই ভালো হবে।

'তোমার ও গানটি বেশ। শ্যামাপদে আশনদীর তীরে বাস।' বলছেন ঠাকুর, 'পদে যদি নির্ভর থাকে তা হলেই হল। তাই বলে চুপ করে থাকলে চলবে কি? ডাকতে হবে, কাজ করতে হবে। উকিল সওয়াল শেষ করে শেষে বলে, আমি যা বলবার বললাম, এখন হাকিমের হাত।'

সকালে নবীন নিয়োগীর বাড়িতে কীর্তন করে এসেছে নীলকণ্ঠ। সেখানে গিয়েছিলেন ঠাকুর। তবু আবার এসেছে বিকেলে। শত কথাবার্তার মধ্যেও এই অনুরাগের অঙ্গীকারটুকু রয়েছে প্রচ্ছন্ন হয়ে। শেষকালে বললেন, 'তুমি সকালে এত গাইলে। আবার এখানে এসেছ কষ্ট করে। এখানে কিন্তু "অনারারি"।'

'কি বলেন!' নীলকণ্ঠ অভিভূতের মত বললে, 'আমি এখান থেকে অমূল্য রতন নিয়ে যাব।'

'সে অমূল্য রতন নিজের কাছে। না হলে তোমার গান অত ভালো লাগে কেন? রামপ্রসাদ সিদ্ধ, তাই তাঁর গান অত মধুর। জানো তো, সাধারণ জীবকে বলে মানুষ, যার চৈতন্য হয়েছে সে মানহুঁস। তুমি সেই মানহুঁসের দলে।'

মাস্টারমশায়ের সঙ্গে হরিবাবু এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। সন্ধ্যা সাতটা-আটটা। ছোট খাটটিতে মশারির মধ্যে বসে ধ্যান করছেন। ওরা এসে মেঝের উপর প্রণাম করে বসতেই ঠাকুর মশারির বাইরে এলেন। বললেন, 'কে বা ধ্যান করে, কারই বা

ধ্যান করি! যাই বলো তিনি ধ্যান করালেই তবে হবে। তুমি নিজের ইচ্ছেয় করো তোমার সাধ্য কি।'

'ইনি আপনাকে দর্শন করতে এসেছেন।' হরিবাবুর দিকে ইশারা করল মাস্টার: 'এঁর অনেকদিন পত্নীবিয়োগ হয়েছে, প্রায় এগারো বছর।'

'তুমি কি কর গা?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

হরিবাবুর হয়ে মাস্টারই বললে, 'একরকম কিছুই করেন না। তবে বাপ-মা ভাই-ভগ্নীর সেবা করেন।'

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'সে কি গো, তুমি যে সেই কুমড়োকাটা বড়ঠাকুর হলে। না সংসারী না হরিভক্ত। এ কেমনতরো কথা?'

বাড়িতে একরকম পুরুষ থাকে জানো, নিষ্কর্মা হয়ে বসে কেবল ভুড়ুর-ভুড়ুর করে তামাক খায় আর মেয়েছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দেয়। কাজের মধ্যে মাঝে-মাঝে কুমড়ো কেটে দেওয়া। মেয়েদের কুমড়ো কাটতে নেই, তাই বড়ঠাকুরকে ডেকে আনায়। বলে কুমড়োটাকে দুখান করে দিন। বড়ঠাকুর তাই করে দেয় খুশি হয়ে। তার ঐ পর্যন্ত পৌরুষ। তাই তার নাম হয়েছে কুমড়োকাটা বড়ঠাকুর। 'আমি বলি তুমি এও কর ওও কর। ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রেখে সংসারের কাজ করে যাও।'

শুধু কাজ করলে হবে না, কাজের সামনে একটি লক্ষ্য রাখতে হবে। কেন কাজ করছি, কিসের জন্যে, রাখতে হবে সেই একটি চেতনার উজ্জ্বলতা। ফলের জন্যে লাভের জন্যে যশের জন্যে কাজ করছি না, কাজ করছি তিনি কাজে লাগিয়েছেন বলে। আফিসের বড়বাবু তো চাকরি দেননি, চাকরি দিয়েছেন ঈশ্বর। তাই আফিসের বড়বাবুকে ফাঁকি দিয়ে আমার সুখ কই? সেই সর্বতশ্চক্ষু ঈশ্বরকে তো ফাঁকি দিতে পারব না। তাঁর কাজ তিনি বুঝে নেবেন, আমি শুধু করে যাই। যে পার্টে নামিয়েছেন অভিনয় করে যাই নিখুঁত করে। বাহবা পাই না পাই কিছু এসে-যায় না। তাঁর দেওয়া পার্টটি তো করলাম জীবন ভরে—এই আমার সন্তোষ। আমি না হলে তাঁর এই বৃহৎ নাটক যে সম্পূর্ণ হত না, তাই আমার পার্টে তাঁরও তৃপ্তি। কর্ম করতে-করতেই মনের ময়লা কেটে যাবে। আর মনের ময়লা কাটলেই দেহ পরিশুদ্ধ হবে।

ঐ দেখ না, সেদিন শ্রীরাম মল্লিক এসেছিল, তাকে ছুঁতে পারলাম না।

শ্রীরামের সঙ্গে ঠাকুরের খুব ভাব ছিল ছেলেবেলায়। একে-অন্যের অদর্শনে অস্থির হয়ে পড়ত। এত গলায়-গলায় ভাব, লোকে বলত এদের ভিতর একজন মেয়ে হলে এদের বিয়ে হয়ে যেত। তাকে এখন দেখবার জন্যে ঠাকুরের খুব

আগ্রহ। কতবার লোক পাঠিয়েছেন তার জন্যে তার ঠিক নেই।
একদিন এসে উপস্থিত শ্রীরাম। ছেলেপিলে হয়নি ; একটি ভাইপো মানুষ করছিল সেটি মরে গেছে। কেঁদে আকুল হল ভাইপোর জন্যে। কিন্তু শোকাগ্নিতে পুড়েও পবিত্র হয়নি দেহ।
'ছুঁতে পারলাম না।' বললেন ঠাকুর, 'দেখলাম তাতে আর কিছু নেই।'
সংসারে থাকব না তো যাব কোথায় ? যেখানে থাকি রামের অযোধ্যায় আছি। এই জগৎ-সংসারই রামের অযোধ্যা। গুরুর কাছে জ্ঞানলাভ করবার পর রাম বললে, আমি সংসার ত্যাগ করব। দশরথ তাকে অনেক বোঝালো, রাম নিবৃত্ত হল না। তখন বশিষ্ঠকে পাঠাল দশরথ। বশিষ্ঠ দেখলে রামের তীব্র বৈরাগ্য। তখন বশিষ্ঠ রামকে বললে, আগে আমার সঙ্গে বিচার করো, তোমার জ্ঞানের বহরটা একবার দেখি, তারপর যেথা ইচ্ছা চলে যাও। রাম বললে, বেশ, বলুন, কিসের বিচার ? তখন বশিষ্ঠ বললে, আচ্ছা বলো, সংসার কি ঈশ্বরছাড়া ? যদি ঈশ্বরছাড়া হয়, তুমি এ দণ্ডে তা ত্যাগ করো। রাম দেখল, ঈশ্বরই জীবজগৎ হয়েছেন। তাঁর সত্তাতেই সমস্ত কিছু সত্য হয়ে রয়েছে। তখন সে নিবৃত্ত হল।
'সংসারে রেখেছেন তা কী করবে ? সমস্ত তাঁকে সমর্পণ করো।' বললেন ঠাকুর : 'সংসারেই থাকো আর অরণ্যেই থাকো ঈশ্বর শুধু মনটি দেখেন।'
কলঙ্কসাগরে ভাসো কলঙ্ক না লাগে গায়।

॥ ১০৯ ॥

ওরে যোগীন, যা তো, গিরিশের বাড়ি যা। আমার জন্যে একটা বাতি চেয়ে নিয়ে আয়। আমার বাতি ফুরিয়ে গেছে। আর শোন—ঠাকুর পিছু ডাকলেন। আর দেখে আয় সে কেমন আছে।
কে গিরিশ ঘোষ ? ওই যে থিয়েটার করে ! ওই যে মাতালের সর্দার ! বাতি আনতে তার কাছে ? কোথায় দক্ষিণেশ্বর, কোথায় বাগবাজার ! কাছে-পিঠে কেউ কি রাখে না মোমবাতি ?
কিন্তু উপায় নেই, ঠাকুরের হুকুম।
চলো বাগবাজার। বাড়ি নেই গিরিশ, কোথায় গিয়েছে নেমন্তন্ন খেতে। তবে আর কি, বসে থাকো। এই যে, ফিরেছে, কিন্তু এ কি চেহারা ? টলছে, নেতিয়ে পড়ছে।
'কে হে তুমি ? চাই কি ?'
'আমাকে ঠাকুর পাঠিয়ে দিয়েছেন।'
'ঠাকুর ! আহা, ঠাকুর পাঠিয়ে দিয়েছেন !' ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম করল গিরিশ।
'পাঠাবেন না ? না পাঠিয়ে কি পারেন ? গিরিশের জন্যে যে তাঁর মন পোড়ে।'

'একটা বাতি চেয়েছেন আপনার কাছে—'

'আহা, কি দয়া! একটা বাতির জন্যে এত দূরে পাঠিয়েছেন, আমার কাছে?' দক্ষিণেশ্বরের দিকে চেয়ে গড় করে প্রণাম করল এবার। 'একটা কেন, এক বাণ্ডিল নিয়ে যাও।'

বলে উঠেই গালাগাল! সে আরেক মূর্তি। তুমি বাতি চাইবার আর জায়গা পাওনি? কেন, তোমার বরানগর-আলমবাজারে বাতি মেলে না! একেবারে আমার বাড়ি ধাওয়া করেছ! তুমি কোথাকার জমিদার, পেয়াদা পাঠিয়েছ সমন দিয়ে! আমি কি তোমার বাস্তুবাড়ির প্রজা, না, তুমি আমার মহাজন? বলেই খেউড় শুরু করল। মাতালের পাঁচফোড়ন।

বাতি একটা ছুঁড়ে দিল যোগেনের দিকে। নিয়ে যাও। অন্ধকারে আছে, একটু আলো জ্বালানো মন্দ নয়। আলোর অভাব বলেই তো এই দুর্দশা!

আবার গালাগাল।

বাতি নিয়ে ছুট দিল যোগেন। কি বদ্ধ মাতাল রে বাবা! লাফিয়ে পড়ে কামড়ায়নি যে বড়, এই ভাগ্যি।

'কি এক ত্রেপণ্ড মাতালের কাছেই পাঠিয়েছিলেন—'

'কেন, কি হল?' প্রসন্ন মুখে তাকিয়ে রইলেন ঠাকুর।

'খালি গালাগালি, খালি খিস্তি-খেউড়।'

'কাকে?'

'আর কাকে! আপনাকে।'

এতটুকুও লাগল না ঠাকুরকে। বললেন, 'শুধু গালই দিলে, আর কিছু করলে না?'

'আপনার কথা বলতে প্রথমে প্রণাম করেছিল, উত্তর দিকে মুখ করে কি-সব বলছিল বিড়-বিড় করে, আর মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে গড় করছিল বার-বার—,

'তবে?' উল্লসিত হলেন ঠাকুর। 'তুই শুধু তার মন্দটা দেখলি, ভালোটা দেখলিনে? গালাগাল শুনলি, শুনলিনে তার ভক্তির মন্ত্র? টলে-পড়া দেখলি, দেখলিনে তার নুয়ে-পড়া?'

তাই তো দেখি সর্বক্ষণ। কার কোথায় ত্রুটি, কার কোথায় ন্যূনতা। আমরা ত্বকসর্বস্ব, অন্তঃসারের খবর নিই না। যেমন আমরা লোক তেমনি আমাদের বিচার। আধ-গ্লাশ জল কাছে থাকলে যে দোষদর্শী সে বলে, দেখলে? জল দিলে তো গ্লাশটা ভরতি করে দিলে না! আর যে গুণগ্রাহী সে বলে, আহা কি ভালো, অন্তত আধ-গ্লাশ তো দিয়েছে!

দৈব আর কিছুই নয়, পূর্বকৃত পুরুষকার। এক কথায় প্রারব্ধ।
প্রারব্ধ দিয়ে তৈরি হল আমার ইহজন্মের পরিবেশ। ইহজন্মের পুরুষকার দিয়ে খণ্ডন করব সে পরিমণ্ডল। ব্যর্থ করব সে অদৃষ্টের বিধিলিপি।
যেমন বিশ্বামিত্র করেছিল।
চতুরঙ্গিনী সেনা নিয়ে পৃথিবীভ্রমণে বেরিয়েছিল, উপনীত হল বশিষ্ঠের আশ্রমে। সসৈন্য ক্ষত্রিয়রাজাকে যোগ্য অভ্যর্থনা করতে পারে এমন সামর্থ্য নেই সেই নিঃসম্বল ঋষির—এমনি মনে হল বিশ্বামিত্রের। তবু আতিথ্য নেবার জন্যে বারে-বারে অনুরোধ করতে লাগল বশিষ্ঠ। বিশ্বামিত্র রাজী হল, কিন্তু এই বিপুল বাহিনীকে বশিষ্ঠ খাওয়াবে কি? ভাঁড়ে তো মা-ভবানী।
বিচিত্রবর্ণা কামধেনুকে আহ্বান করল বশিষ্ঠ। বললে, শবলা, অতিথি-সৎকারের খাদ্য দাও।
কামদায়িনী শবলা ভূরি-ভূরি খাদ্য-সৃষ্টি করল। দেখে তো বিশ্বামিত্রের চক্ষু স্থির, যে করে হোক লাভ করতে হবে এই কামদুঘাকে। বললে, 'রত্নে রাজারই অধিকার। অতএব এই রত্ন আমাকে দান করুন। বিনিময়ে যা কিছু চান ধেনু বা ধন দিচ্ছি আপনাকে।'
অসম্ভব! এই শবলা থেকেই আমার হব্য কব্য, আমার প্রাণযাত্রা। শত কোটি ধেনু বা রাশীভূত রজত শবলার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। কিছুতে রাজী হল না বশিষ্ঠ।
তখন বিশ্বামিত্র সবলে টেনে নিয়ে চলল শবলাকে। বশিষ্ঠকে উদ্দেশ করে সরোদনে বললে শবলা, 'আপনি কি আমাকে ত্যাগ করলেন?'
আমি কি করব। এই বলোদ্ধত রাজা তোমাকে স্পর্ধাপূর্বক নিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে এর অক্ষৌহিণী সেনা। এর তুলনায় আমি কিছুই নয়। আমি নির্বল, নিস্তেজ।
কে বলে? আপনিই অধিক বলবান। ক্ষত্রবলের চেয়ে ব্রহ্মবল শ্রেষ্ঠ। 'অনুমতি করুন,' শবলা বললে দৃপ্তস্বরে, 'আমি সৈন্য সৃষ্টি করি। বিধ্বস্ত করি এই দুর্বৃত্তকে।'
তথাস্তু। মুহূর্তে অগণন সৈন্য-সৃষ্টি করল শবলা। বিশ্বামিত্রের সমস্ত সৈন্য নির্জিত ও বিনষ্ট হল। শুধু তাই নয়, শতপুত্র মারা পড়ল একে-একে।
এ কী বিপর্যয়! নির্বেগ সমুদ্র, রাহুগ্রস্ত সূর্য ও ভগ্নদন্ত সাপের মত নিষ্প্রভ হল বিশ্বামিত্র। তখনো একটিমাত্র পুত্র বেঁচে আছে, তাকে রাজ্য দিয়ে চলে গেল হিমালয়ে। বসল শিবারাধনায়। কি বর চাও, তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব দেখা দিলেন। দিব্যাস্ত্র দাও, ত্রিজগতে যত অস্ত্র আছে, সব আনো আমার অধিকারে।

মহাদেব বর দিলেন।

আর যায় কোথা! মহাবলে ধাবিত হল বিশ্বামিত্র। অস্ত্রানলে বশিষ্ঠের আশ্রম দগ্ধ করতে লাগল। আশ্রমবাসীরা পালাতে লাগল ঊর্ধ্বশ্বাসে। ভয় পেয়ো না, রৌদ্র যেমন শিশির ধ্বংস করে, তেমনি আমি বিশ্বামিত্রকে শেষ করছি। বলে বশিষ্ঠ তার দণ্ড উত্তোলন করল। তার ব্রহ্মতেজপূর্ণ উদ্দণ্ড দণ্ড। যত অস্ত্র সংগ্রহ করেছিল বিশ্বামিত্র, ঐন্দ্র আর রৌদ্র, বারুণ আর পাশুপত, সব নিক্ষেপ করল একে-একে। কিছুতেই কিছু হবার নয়। বশিষ্ঠের ব্রহ্মদণ্ড সমস্ত অস্ত্র নিরাকৃত করল, নির্বাপিত করল সমস্ত কালানল।

ক্ষান্ত হোন, মুনি-ঋষিরা স্তব করতে লাগল বশিষ্ঠকে। বিশ্বামিত্র হতমান হয়েছে, বশীকৃত হয়েছে, স্তব্ধ হয়ে বসেছে অধোমুখে। আপনি আপনার দণ্ড সংবরণ করুন। বিশ্বামিত্র দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, ক্ষত্রিয়বলকে ধিক, ব্রহ্মতেজই বল। তাই এক ব্রহ্মদণ্ডেই আমার সমস্ত অস্ত্র পরাজিত হল। এই ক্ষত্রিয়ত্ব পরিহার করে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করব তবে আমার নাম।

দুশ্চর তপস্যায় আরূঢ় হল বিশ্বামিত্র। চিত্তমল বিশোধিত হল। কাম ক্রোধ লোভ অনেক উপকরণ আসতে লাগল সামনে। বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। ধীরে-ধীরে উপনীত হল ব্রহ্মর্ষি পদবীতে।

দেবতারা অভিনন্দন করে বললে, তীব্র তপস্যা দ্বারা তুমি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছ। এস দীর্ঘ আয়ু গ্রহণ করো।

একেই বলে পুরুষকার। প্রারব্ধনির্দিষ্ট গতি বদলে দিল পৌরুষপ্রাবল্যে। দুস্ত্যজ প্রকৃতিকেও অতিক্রম করল তপস্যায়।

'তোমার প্রকৃতিতে তোমায় কর্ম করাবে।' বললেন ঠাকুর, 'ভগবান অর্জুনকে বলছেন তুমি ইচ্ছে করলেই যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হতে পারবে না। তোমায় যুদ্ধ করাবে তোমার প্রকৃতিতে। তা তুমি ইচ্ছে করো আর নাই করো। আমি চিন্তা করছি আমি ধ্যান করছি, এও কর্ম। আমার দান-যজ্ঞ এও কর্ম। নামগুণকীর্তনও কর্ম। কিন্তু যাই করো, ফল আকাঙ্ক্ষা করে কোরো না।'

মৃগ না মিলুক তবু ফিরব না মৃগয়া থেকে। মৃগয়ায় যে বেরুতে পেরেছি সেই আমার পরম লাভ।

॥ ১১০ ॥

দেবেন মজুমদারও নরেনের মত ঠাকুরকে পরীক্ষা করতে চায়। ঘর ফাঁকা দেখে কখন ঠাকুরের বিছানার নিচে ছোট্ট একটি রুপোর দু-আনি রেখে দিয়েছে।

বসতে গিয়ে উঠে পড়লেন ঠাকুর। আবার চেষ্টা করলেন বসতে, আবার উঠে পড়লেন।

'এ কি, এমন হচ্ছে কেন?' জিগগেস করলেন ঠিক দেবেন মজুমদারকেই। 'ছুঁতে পাচ্ছি না কেন বিছানা?'

পরীক্ষকই ধরা পড়ে গেল। পাংশুমুখে স্বীকার করলে অপরাধ।

কিন্তু ঠাকুরের কোনো গ্লানি নেই। হাসিমুখে বললেন, 'আমায় বিড়ে দেখছ নাকি? তা বেশ, বেশ।'

তবু আরো এক পরীক্ষা বুঝি বাকি আছে।

ঠাকুর নিজেই পাড়লেন সেই কথা। বললেন, 'ওগো, মন বড় কেমন করছে। অনেক দিন দেখিনি তাকে।'

কাকে? দেবেন তাকাল কৌতূহলী হয়ে।

ঠাকুর তার নাম করলেন। এ কি, এ যে স্ত্রীলোক! একজন স্ত্রীলোকের প্রতি ঠাকুরের টান! দেবেনের মন কালো হয়ে উঠল।

'ওরে রামনেলো, রসগোল্লা নিয়ে আয়। খিদে পেয়েছে।'

অনেকগুলো নিয়ে এল রামলাল। একটি নিজে খেয়ে বাকিগুলো খাওয়ালেন দেবেনকে। বললেন, 'এ সব সে-ই পাঠিয়েছে। এখানকে বড় ভালোবাসে। বড় ভালো লোক।'

মুখের স্বাদে যেন আর মিষ্টতা নেই এমনি মনে হল দেবেনের। এ কেমনধারা আকর্ষণ।

'ওগো, তাকে বড় দেখতে ইচ্ছে করছে।' ব্যস্ত হয়ে ঠাকুর পাইচারি শুরু করেছেন। সহসা ঝুঁকে পড়ে দেবেনের কানের কাছে মুখ এনে বললেন চুপি-চুপি, 'আমাকে একটি টাকা দেবে?'

টাকা? কেন?

'গাড়ি না হলে যেতেও পারি না, আবার গাড়ি করে গেলে তার ছেলে গাড়িভাড়া দিতে মনে বড় কষ্ট করে। তাই তোমার কাছকে চাইছি। তুমি যদি দাও তবে একবার দেখে আসি।'

তার আর কি! দেব না-হয় যখন চাইছেন।

দেবেনের ভঙ্গি দেখে হাসলেন ঠাকুর। বললেন, 'কিন্তু বলো আবার নিবে। কি, আবার নিবে তো?'

তা বেশ মশাই, শোধ যদি দেন তো নেব। টাকা বের করে রামলালের হাতে দিলে। রামলাল কলকাতা যাবার গাড়ি আনতে গেল।

মাস্টারমশাই ও লাটুর সঙ্গে দেবেনও উঠল গাড়িতে। যাই ব্যাপারটা দেখে আসি স্বচক্ষে।

পথে মন্দির পড়ছে তাকে প্রণাম করছেন ঠাকুর, মসজিদ পড়ছে তাকেও। শুধু তাই নয়, মদের দোকানকেও। কত লোককে এখানেও আনন্দ দিচ্ছেন মহামায়া। মদিরার কথা ভেবে মনে পড়ছে হরিনামের কথা। হরিরসমদিরা পিয়ে মম মানস মাতো রে! যার যাতে নেশা, যার যাতে আনন্দ!

বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে মেয়েরা। তাদের উদ্দেশেও প্রণাম করছেন ঠাকুর। বলছেন, মা আনন্দময়ী!

দেবেনের গা টিপলেন ঠাকুর। বললেন, 'আমি কারু ভাব নষ্ট করি না।'

যার যা ভাব তার সেই ভাব রক্ষা করি। বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবের ভাবটিই রাখতে বলি, শাক্তকে শাক্তের ভাব। তবে যেন এ কথা বোলো না, আমার ভাবই সত্য আর সব ভুয়ো। যে ভাবেই হোক, যদি তা আন্তরিক হয় ঠিক পেয়ে যাবে ঠিকানা।

'বারোয়ারিতে নানা মূর্তি করে, নানান মতের লোকের ভিড়। রাধাকৃষ্ণ, হরপার্বতী, সীতারাম। যারা বৈষ্ণব তারা রাধাকৃষ্ণের কাছে দাঁড়িয়ে দেখছে। যারা শাক্ত তারা হরপার্বতীর কাছে। যারা রামভক্ত তাদের সামনে সীতারাম। কিন্তু যাদের কোনো ঠাকুরের দিকে মন নেই,' ঠাকুর হাসলেন: 'তাদের কথা আলাদা। বেশ্যা তারা উপপতিকে ঝাঁটাপেটা করছে এমন মূর্তিও করে বারোয়ারিতে। ও সব লোক তাই দেখছে হাঁ করে। দেখছে আর চেঁচাচ্ছে। বন্ধুদের ডাকছে, ওসব কি দেখছিস, আয়, এদিকে আয়।'

গাড়ি এসে পৌঁছুল বাড়িতে।

ঠাকুর একা অন্দরমহলে ঢুকে পড়লেন।

সন্দেহ বুঝি আরো উগ্র হল দেবেনের। মাস্টারমশাই তখন গান ধরলেন: আমরা গোরার সঙ্গী হয়েও ভাব বুঝতে নারলুম রে। গোরা বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে, ভাব বুঝতে নারলুম রে—

কিছুক্ষণ পরেই ঠাকুর আবার ফিরে এলেন। অসমাপ্ত গানের অবশিষ্টটুকু গাইতে লাগলেন। তবু সন্দেহ কি যায়। কালিমা কি ঘোচে!

ভিতর থেকে চাকর এসে আবার ডেকে নিয়ে গেল ঠাকুরকে। কতক্ষণ পরে আবার এল চাকর। এবার আপনারা আসুন।

ভেতরে গিয়ে কী দেখল দেবেন! দেখল আসনের উপর আলুথালু হয়ে ঠাকুর বসে আছেন, যেন পাঁচ বছরের ভোলানাথ ছেলে আর তাঁর সামনে বসে তাঁকে খাওয়াচ্ছেন এক বৃদ্ধা মহিলা, চোখে জল, মুখভাবে বাৎসল্যের লাবণ্য।

'বাবা, চৈতন্যচরিতামৃতে পড়েছিলুম,' বলছে সেই বৃদ্ধা গৃহিণী, 'চৈতন্যদেবের মা চৈতন্যদেবকে খাইয়ে দিতেন নিজের হাতে। আমার মনে হত, আমি যদি শ্রীচৈতন্যের মা হতুম, এমনি করে খাওয়াতুম তাকে। কি আশ্চর্য, আমার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল। তুমি এসে উদয় হলে আমার জীবনে!' বলছে আর কাঁদছে অনর্গল।

কৃষ্ণ মথুরায় গেলে যশোদা এসেছিলেন শ্রীমতীর কাছে। ধ্যানস্থা ছিলেন শ্রীমতী। যশোদাকে বললেন, আমি আদ্যাশক্তি, তুমি আমার কাছে বর নাও। যশোদা বললেন, কি আর বর দেবে! শুধু এইটুকু করো, আমার গোপালকে আমি যেন প্রাণ ভরে সেবা করতে পারি, খাওয়াতে পারি হৃদয়মথিত স্নেহনবনী।

এই তো সেই যশোমতীর মাতৃপ্রতিমা।

কৃষ্ণ বললে, আমাকে অহৈতুকী ভক্তি দাও, অব্যবহিতা ভক্তি। ফলাভিসন্ধিরহিত অবিচ্ছিন্ন ভালোবাসা। কার জন্যে তোমার কাছে তোমার প্রাণ-বুদ্ধি দেহ-মন স্ত্রী-পুত্র এত প্রিয়, কার কৃপায়? যার জন্যে যার কৃপায় এই প্রিয়ত্ববোধ, তার চেয়ে প্রিয়তর আর কে আছে?

এই কি সেই প্রিয়-প্রীণন নয়?

আত্মধিক্কারে ভরে গেল দেবেন। একে নয়নভুলানো দেখা দিলেন চোখের সামনে! চোখে যেন আর পলক পড়তে চায় না। খাবার থালা কে দিয়ে গিয়েছে সুমুখে। কিন্তু, না, দাঁড়াও, এই বাৎসল্য-মাধুর্য আস্বাদন করি।

বাগবাজারের এক বড় ঘরের গৃহিণী—কেমন ইচ্ছে হল, যদি একবার যেতে পারতাম দক্ষিণেশ্বর। এত কথা শুনছি যাঁর সম্বন্ধে তাঁকে যদি দেখতে পেতাম চোখ ভরে।

কেন প্রাণ উতলা হয় কে বলবে। ঈশ্বরপিপাসা তো কোনো হেতুবাদের উপর দাঁড়িয়ে নেই, ক্ষুৎপিপাসার মতই এ বৃত্তি স্বাভাবিকী। ভক্তিতে যত আনন্দ বাড়ে তেমন আর কিছুতে নয়। কেন না ভক্তিতেই আর দেহদুঃখ থাকে না, চিত্ত শান্ত ও অমৎসর হয়, ভোগে অনাসক্তি আসে। যত দুঃখ এই আসক্তি থেকে। আসক্তি চলে গেলেই একটা আশ্চর্য স্থিতিশক্তিতে জীবন দৃঢ় হয়ে ওঠে।

কে একজন আছে চেনা মহিলা, কয়েকবার যাতায়াত করেছে দক্ষিণেশ্বরে, তার শরণাপন্ন হল। বেশ তো, কালই চলো না। নৌকো করে যাব দুজনে।

পরদিন বিকেলে দুজন এসে উপস্থিত। কিন্তু এ কি, ঠাকুরের ঘরের দরজা বন্ধ। উত্তরের দেয়ালে দুটি ফোকর আছে, তারই ভিতর দিয়ে উঁকি মারল দুজনে। দেখল ঠাকুর শুয়ে আছেন, বিশ্রাম করছেন। এখন যাই কোথা? সারদামণিও

নেই, গেছেন বাপের বাড়ি। এ-ওর মুখের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। এখন করি কি?

অপেক্ষা করো। সমীপাগত হয়েছ, এখন যদি ধৈর্য না ধরো, তবে যাত্রা ব্যর্থ হয়ে যাবে। বয়ে যাবে লগ্ন। ক্লেশ-নদী অতিক্রম করে এসেছ, এখন কৃপাজলনিধিকে দেখে যাও।

নবতের দোতলার বারান্দায় গিয়ে বসে রইল দুজনে।

কিছু পরেই ঠাকুর উঠলেন। উত্তরের দরজা খুলতেই চোখ পড়ল মহিলাদের উপর। ওগো, তোরা এখানে আয়, ডেকে উঠলেন সানন্দে।

ঘরে এসে বসল পাশাপাশি। যে মহিলাটি পরিচিত, তক্তপোশ থেকে নেমে তার কাছটিতে এসে বসলেন ঠাকুর। বসতেই সে মহিলাটি লজ্জায় কুঁকড়ে গেল। সরে যাবার জন্যে ত্বরিত ভঙ্গি করল। ঠাকুর বললেন, 'লজ্জা কি গো! লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়। শোনো, তোরাও যা আমিও তাই।' নিজের দাড়িতে হাত দিলেন: 'তবে এগুলো আছে বলে বুঝি লজ্জা? তাই না?'

কৃষ্ণান্বেষিণীদের আবার লজ্জা কি! শ্রবণ কীর্তন স্মরণ পদসেবন অর্চন বন্দন দাস্য সখ্য আত্মনিবেদন—এই নবলক্ষণা ভক্তি কৃষ্ণকে নিবেদন করো।

অনেক ভগবৎকথা শোনালেন ঠাকুর। সঙ্কোচের আড়ষ্টতা আর থাকল না। হরিপ্রসঙ্গ শেষে সাংসারিক কথাও পাড়লেন। বললেন, 'সপ্তাহে অন্তত একবার করে এসো। প্রথম-প্রথম এখানে আসা-যাওয়াটা বেশি রাখতে হয়। কিন্তু নিত্য অত নৌকো বা গাড়িভাড়া দিতে যাবে কেন? শোনো, আসবার সময় তিন-চার জনে মিলে নৌকো নেবে আর যাবার সময় হেঁটে বরানগর গিয়ে সেখান থেকে শেয়ারে ঘোড়ার গাড়ি।'

॥ ১১১ ॥

আহিরিটোলার দিগম্বর ময়রার খাবারের খুব নাম-ডাক। ঠাকুরের জন্যে কিছু কিনে নিলে হয়।

মিহিদানা বাঁধা হচ্ছে। কি হে টাটকা না কি?

'হাতে করে দেখুন না। কত গরম!'

এক সের কিনলে দেবেন মজুমদার। ঘাটে এসে দেখে খেয়ার নৌকো ছাড়ে-ছাড়ো। শুধু একজন যাত্রীর অপেক্ষা। উঠে বসলো এক লাফে।

মিষ্টির ঠোঙা কোলে নিয়ে বসলো সন্তর্পণে। এত ভিড়, ছোঁয়া বাঁচানো দুঃসাধ্য। পাশেই এক চাপদাড়িওয়ালা মুসলমান। ভীষণ গোপ্পে, মুখের আর কামাই নেই।

ছুঁয়ে তো দিয়েইছে, কে জানে তার মুখামৃতের ছিটে-ফোঁটাও পড়ছে কি না ঠোঙার উপর।

বিশীর্ণ হয়ে গেল দেবেন। আর ঠাকুরকে দেওয়া চলবে না কিছুতেই। সেবার এক ঝুড়ি জিলিপি নিয়ে এসেছিল রাম দত্ত। পথে একটি ভিখিরি ছেলের সঙ্গে দেখা। তাকে কি ভেবে রাম একখানা জিলিপি দিয়ে দিল। ঠাকুর বললেন, 'সব উচ্ছিষ্ট হয়ে গিয়েছে। দেবতার উদ্দিষ্ট বস্তুর আগ-ভাগ তুলে কাউকে দিলে তা উচ্ছিষ্ট হয়ে যায়।'

একখানা জিলিপি নিয়েছিলেন হাতে করে, গুঁড়িয়ে ফেলে দিয়ে হাত ধুয়ে ফেললেন গঙ্গাজলে।

গরুর গাড়িতে গুড়ের নাগরির মতন গায়ে গা ঠেকিয়ে বসা, তার পর এই মৌলবীর বকর-বকরের আর শেষ নেই। দরকার নেই এ মিষ্টি ঠাকুরের কাছে নিয়ে গিয়ে। রামের জিলিপির অবস্থা হবে। তার চেয়ে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে হাত ধুয়ে হালকা হয়ে যাই। কিন্তু আহা, মিহিদানাগুলো এখনো গরম!

বাঁচোয়া, ঠাকুর ঘরে নেই। দূরের তাকের এক কোণে দেবেন ঠোঙাটা লুকিয়ে রাখল। সহজে কারু নজরে পড়বে না। এ জিনিস ঠাকুরকে দিয়ে কাজ নেই। আরো অনেক আছে এর ভাগীদার।

খাবারের ঠোঙাটা যে ঠাকুরের চোখের আড়াল করতে পেরেছে তাইতেই দেবেন নিশ্চিন্ত।

চটি ফট-ফট করতে-করতে ঠাকুর এসে বসলেন তাঁর ছোট তক্তপোশে। খানিক পরে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'এ কি, খিদে পাচ্ছে কেন?'

কি যেন খুঁজতে লাগলেন ঘরের আনাচে-কানাচে। কি, খাবার? যাই বলি গে, নিয়ে আসুক কিছু যোগাড় করে। উঠে গেল একজন ভক্ত-যুবক। একটু ধৈর্য ধরুন।

অন্তরে বসে কাঁদতে লাগল দেবেন। তোমার নাম করে খাবার আনলাম অথচ তোমাকে দিতে পারলাম না। খাদ্যকে করতে পারলাম না নৈবেদ্য। নিজের রূপকে করতে পারলাম না অরূপের রূপ।

তাক-লাগানো ব্যাপার! ঠিক তাকটি খুঁজে পেয়েছেন ঠাকুর। দেবেনের বুক দুর-দুর করে উঠল। কিন্তু, এ কি, ঠাকুর যে আনন্দে তরলতনু হয়ে উঠলেন। আরে, এই যে, মেঠাই! বাঃ, কে আনলে? এখনো যে হাতে-গরম। বলে, বলা-কওয়া নেই, মুঠো-মুঠো খেতে লাগলেন।

অন্তরের যে কান্না সেই তো তোমার সুধা। আমার অশ্রুক্ষরণই তো তোমার

মধুক্ষরণ। তাই মিষ্টত্ব মিহিদানায় নয়, মিষ্টত্ব ব্যাকুলতায়। দিতে এসেও তোমাকে যে দিতে পারলুম না সেই ব্যর্থতার বিষাদে।

হে প্রণতপ্রিয়, হে দয়াসারসিন্ধু, তোমাকে কি দেব, কিবা চাইব, কিবা বলব তোমার কাছে। শুধু জীবন ভরে এই জেনে থাকব আমার নিদ্রাহীন হৃদয়ের ব্যথা কিছুই আর তোমার অজানা নেই।

ব্যথা হরণ করলেন, নিবারণ করলেন সমস্ত ভয়ভ্রান্তি। শুধু নিজে খেলেন না, সবাইকে প্রসাদ দিতে লাগলেন। খাদ্যকে শুধু নৈবেদ্যে নিয়ে গেলে চলবে না, নৈবেদ্যকে নিয়ে যেতে হবে প্রসাদে।

ভোলা ময়রার দোকানে চমৎকার সর করেছে। ওরে, ঠাকুরের জন্যে একখানা কিনে নিয়ে যাই চল।

মেয়ের দল চলেছে দক্ষিণেশ্বরে। নৌকো করে। একখানা বড় দেখে সর কিনে নিয়েছে। ঠাকুর বড় ভালোবাসেন সর। দেখে কত খুশি হবেন না-জানি!

দক্ষিণেশ্বরে এসে শোনে—কী সর্বনাশ—ঠাকুর কলকাতায় গিয়েছেন। সবাই বসে পড়ল। এত সাধ করে এলুম, দেখা হল না! কোথায় গিয়েছেন কলকাতায়? রামলাল বললে, কম্বুলিটোলায়। মাস্টারমশায়ের বাড়িতে। কখন ফিরবেন কে জানে! চল সেখানেই ফিরে যাই। আমি চিনি সে বাড়ি। আমার বাপের বাড়ির লাগোয়া।

কিন্তু যাবি কি করে? বললে আরেকজন। নৌকো তো ছেড়ে দিয়েছিস।

পায়ে হেঁটে যাব।

সরখানি রামলালের হাতে দিয়ে বললে, ঠাকুর এলে দিও। পেটরোগা মানুষ, সবটা তো আর খেতে পারবেন না, একটু যেন খান।

আলমবাজার পার হতে না হতেই, ঠাকুরের কৃপা, ফিরতি গাড়ি জুটে গেল একখানা। চলো শ্যামপুকুর।

বাপের বাড়িই চেনে সে মেয়েটি, কম্বুলিটোলায় মাস্টারের বাড়ি আর বের করতে পারে না। একবার এ-গলি ঢোকে, ঘুরে-ফিরে আরেক বারও এ-গলি। শেষ পর্যন্ত বাপের বাড়ির সামনেই দাঁড় করালে। একটা চাকর ডেকে নিলে। বাবা, দেখিয়ে দে কম্বুলিটোলা।

জয় শ্রীরামকৃষ্ণ! সামনের ছোট ঘরে তক্তপোশের উপর একলা বসে আছেন। আমরা পর্দার মেয়ে, রাস্তা-ঘাটে বেরোই না কখনও, কিন্তু তোমার জন্যে ছেড়েছি সব লোকলাজ, মানিনি দেয়াল-বেড়া। কার বাড়ি, কে মাস্টার, কিছুই জানি না। শুধু এইটুকু জানি তুমি যেখানে আছ তাই আমাদের ঘর-দোর। আমাদের তীর্থ-মন্দির।

'তোরা এখানে কেমন করে এলি গো ?' ঠাকুর উছলে উঠলেন।

প্রণাম করে বললে যা হয়েছে। বসলে মেঝের উপর। দুজন বুড়ি, তিনজন অল্পবয়সী। আনন্দে কথা কইতে লাগলেন ঠাকুর। এমন সময় আসবি তো আয় ঠাকুর যাকে 'মোটা বামুন' বলতেন সেই প্রাণকৃষ্ণ মুখুজ্জে এসে উপস্থিত। কি সর্বনাশ, পালাবি কোথায়, পালাবি কি করে ? বুড়ি দুজন জবুথবু হয়ে বসে রইল কোনো রকমে, কিন্তু অল্পবয়সীদের উপায় কি ? উপায় ঠাকুরই যুগিয়ে দিলেন। ঠাকুরেরই তক্তপোশের তলায় হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকলে তিনজনে। উবুড় হয়ে শুয়ে পড়ে রইল। মশার কামড়ে ছিন্নভিন্ন হবার যোগাড় তবু নড়ল না এক তিল।

পুরুষ না নারী এই দেহবুদ্ধি নেই ঠাকুরের। কিন্তু প্রাণকৃষ্ণের আছে। তাই ঠাকুরকে তাদের লজ্জা নেই, প্রাণকৃষ্ণকে লজ্জা।

সেই সরোবরতীরে বসন রেখে স্নান করছে সুরাঙ্গনারা। সংসার ত্যাগ করে চলেছে যুবক শুক, সেই সরোবরের তীর দিয়ে। তাকে দেখে সর্ববিনির্মুক্তা অপ্সরীদের এতটুকু সঙ্কোচ নেই, কেন না যুবক হলেও শুক মায়াহীন, ভগবদ্‌ভাব-বিভোর। কিন্তু ছেলের পিছনে ছুটছেন ব্যাসদেব, তাকে সংসারে ফিরিয়ে আনতে। হলেনই বা বৃদ্ধ, তিনি মায়াধীন, তাকে দেখামাত্রই স্বর্গসুন্দরীরা ত্বরান্বিত হয়ে গায়ের উপর টেনে নিল আচ্ছাদন।

মন্দ পরিহাস নয়। ব্যাসদেব দাঁড়ালেন। জিগগেস করলেন, 'এ তোমাদের কেমন ব্যবহার ? আমার যুবক পুত্র শুককে দেখে তোমাদের লজ্জা হল না, আর আমি বুড়ো, আমাকে দেখে তোমাদের লজ্জা ?'

কার সঙ্গে কার তুলনা ! শুক নিবৃত্তাশয়, উপশান্তাত্মা। দেহবুদ্ধির লেশমাত্র নেই। তাই তাকে দেখে আমাদের লজ্জা করবে কেন ? আর বুড়ো হলেও তুমি রূপ-পিপাসু, সর্বশৃঙ্গারবেশাঢ্যা রমণীদের কটাক্ষগর্ভ নেত্রপাতের ভিখারী, তোমার কাব্যে-গ্রন্থে কত তুমি বর্ণনা করেছ লাবণ্যবিলাস ও বিভ্রমমণ্ডনের কথা। তোমাকে দেখে লজ্জা হবে না তো কাকে দেখে হবে ?

প্রাণকৃষ্ণ কি আর শিগগির যায় ! ঠায় এক ঘণ্টা ধরে তার নানা নিবন্ধ। ওরে বাপু, এবার সরে পড়। পারি না আর উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে। মশার কামড়ে যে গেলুম ! ঘণ্টাখানেক লাগল মোটা বামুনের হাওয়া হতে। চলে গেলেই বেরিয়ে এল মেয়েরা। তখন ঠাকুরের কি হাসি !

বাড়ির মেয়েরা অচেনা, কি যায় আসে, ঠাকুর যখন সঙ্গে আছেন তখন চরাচরে আর পরাপর নেই। এরাও তাই ঢুকে পড়ল অনায়াসে। ঠাকুরের সঙ্গে-সঙ্গে এরাও খেল-দেল।

রাত ন'টা, ঠাকুর ফিরলেন ঘোড়ার গাড়িতে আর এরা পায়ে হেঁটে।

ঠাকুরের ফিরতে প্রায় সাড়ে-দশটা। খানিক বাদে রামলালকে ডেকে বললেন, 'ওরে রামনেলো, বড্ড খিদে পেয়েছে।'

'সে কি, খেয়ে আসেননি?'

'খেয়ে এলে কি হয়, আবার খিদে পেতে পারে না? শিগগির কিছু দে। নিদারুণ খিদে।'

সেই সরখানি এনে সামনে ধরল রামলাল? দিব্যি খেয়ে ফেললেন একটু-একটু করে।

পরদিন সকালে আবার এসেছে। সেই মেয়ের দল। তাদের দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন ঠাকুর। 'ওগো রাত্তিরেই তোমার সেই সরখানি সব খেয়ে ফেলেছি। কোনো অসুখ করেনি কিন্তু।'

মেয়েরা সব অবাক। পেটে কিছু সয় না ঠাকুরের, তা ছাড়া রাত্রে দিব্যি খেয়ে এসেছেন মাস্টারের বাড়ি থেকে, তার পরে আবার এই বন্য ক্ষুধা।

বন্য ক্ষুধা নয় অন্য ক্ষুধা। এ ক্ষুধা অন্তরমধুর জন্যে, ভক্তির আস্বাদনের জন্যে। ক্ষুধা কি বস্তুর, ক্ষুধা ভালোবাসার।

কৃষ্ণের সেই গৃহাশ্রমী ব্রাহ্মণ-বন্ধুর কথা মনে করো। একসঙ্গে পড়েছিল পাঠশালায়, সান্দীপনি গুরুর ঘরে। কিন্তু ভাগ্যদোষে আজ সে ভিখারি। মলিন জীবন যাপন করছে ভার্যার সঙ্গে। একদিন স্ত্রী বললে, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ তোমার সখা, তার কাছে গিয়ে কিছু চাও না।

মন্দ কি। কিছু পাই না পাই অন্তত দেখে আসতে তো পারব। মুখে ভাষা না ফোটে চোখে অন্তত থাকবে তো নীরবতা।

ভিক্ষে করে জুটেছিল কিছু চিঁড়ের খুদ, তাই ব্রাহ্মণী বেঁধে দিল বস্ত্রখণ্ডে। দ্বারকার দিকে যাত্রা করল ব্রাহ্মণ। পুরপ্রবেশ করতে পারবে কিনা তারই বা ঠিক কি। তার পরে অন্তঃপুরে কোন সুগোপন কক্ষে তিনি আছেন তাই বা কে বলবে!

আশ্চর্য, কেউ বাধা দিল না। তোরণ পেরিয়ে ক্রমে-ক্রমে তিনটি কক্ষা অতিক্রম করল। এই শ্রীশালী গৃহই শ্রীকৃষ্ণের। দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে রইল দীনভাবে।

প্রিয়ার পর্যঙ্কে শুয়েছিল কৃষ্ণ। ছুটে কাছে এল ব্রাহ্মণের, দুবাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরল নিবিড় করে বসাল পালঙ্কের উপর। নিজের হাতে ধুয়ে দিল পা দুখানি। সেই পাদোদক মাথায় ধরলে। অর্চনা করল নানা উপকরণে। রুক্মিণী ব্যজন করতে বসল। এত সব কাণ্ডের পর কৃষ্ণ বললে, ঘর থেকে আমার জন্যে কি এনেছ দাও। কোথায় আমি চাইব, তা নয়, তুমিই কি না চেয়ে বসলে!

শ্রীকৃষ্ণ বললে, ভাই আমিও ভিখিরি। আমি ভিখিরি ভালোবাসার। ভালোবাসার সঙ্গে যদি অণুমাত্রও কেউ দেয় তাই আমার কাছে অনেক। হোক তা ছোট্ট একটা ফুল নয় তো তুচ্ছ একটা পাতা, কিংবা এক অঞ্জলি জল।

তবু কি এনেছে বলতে সাহস পেল না ব্রাহ্মণ। কি এনেছ দেখি, কৃষ্ণ নিজেই তখন বস্ত্রখণ্ড খুলে ফেললে। এক মুঠো খুদ তুলে নিয়ে মুখে পুরলে। দ্বিতীয় মুষ্টি তুলতে যাচ্ছে, রুক্মিণী হাত চেপে ধরল। বললে, তোমার সন্তোষ দেখাবার জন্যে এক মুষ্টিই যথেষ্ট, আবার দ্বিতীয় মুষ্টি কেন?

সেই রাত হরি-ঘরেই বাস করল ব্রাহ্মণ। কি যে তার অভাব কি যে তার চাইবার কিছুই মনে করতে পারল না। প্রত্যূষে ফিরে চলল।

কোথায় আমি দরিদ্র পাপী আর কোথায় শ্রীনিকেতন শ্রীকৃষ্ণ! আমি তাঁর বন্ধু, শুধু এটুকু জেনেই তিনি আমাকে আলিঙ্গন করলেন। আমি অধন, ধন পেলে মত্ত হয়ে আর তাঁকে স্মরণ করব না, এই ভেবেই করুণাময় ধন দিলেন না আমাকে।

ঘরের কাছাকাছি এসে ব্রাহ্মণ যেন ইন্দ্রজাল দেখল। এ কি, এ উপবন আর সরোবর এল কোত্থেকে, সেই কুঁড়েঘরের পরিবর্তে এ কি বিচিত্রপুরী! কোথা থেকে এল এত দাসদাসী! আর এই যে চন্দ্রচন্দনভূষাঙ্গী পুরাঙ্গনা এই কি তার সেই মনোরথ-প্রিয়তমা ব্রাহ্মণী?

চাইলাম না, অথচ এত সব হল কি করে? মেঘ তো না চাইতেই জল দেয়। তেমনি তাঁর যা ইচ্ছে তা নেন যত ইচ্ছে তত দেন। নইলে আমার পুঁটলি খুলে কেন নিলেন সেই তণ্ডুলকণা, আর কেনই বা দিলেন এত ভোগৈশ্বর্য? পাছে পতন ঘটে তাই তো তিনি ধনবৈভব দেন না ভক্তদের। কিন্তু এ তো আমার প্রাপ্তি নয় এ তোমার প্রীতি। এ তোমার ঐশ্বর্য।

ঠাকুর নবতখানায় খবর পাঠালেন ব্যাঘ্রহুঙ্কারে: ভীষণ খিদে পেয়েছে। শিগগির খাবার পাঠাও।

কি বুঝলেন শ্রীমা, এক থাদা সুজির পায়েস করে পাঠালেন। একজনের চেয়ে অনেক বেশি, একাধিক দিনের আহার। ভক্ত-মেয়ে সেই অন্নপাত্র নিয়ে কাছে এসে এ কি দেখল! ঠাকুর অস্থির পায়ে পাইচারি করছেন। যেন ঠাকুর নয় কে এক অতিকায়-মূর্তি। ঠাকুর ইশারা করলেন খাবার রাখতে। আসনের কাছে খাবার রেখে ভক্ত-মেয়ে দাঁড়িয়ে রইল জোড় করে।

কি পর্বতপ্রমাণ ক্ষুধা! ঠাকুর খেতে লাগলেন ভীমগ্রাসে।

সেই মেয়ের দিকে চেয়ে জিগগেস করলেন, 'এ কে খাচ্ছে? আমি না আর কেউ?'

'আর কেউ।'

শ্রীমা'র কাছে নবতখানায় বসে জপ করছে গোপালের মা। জপ সাঙ্গ করে প্রণাম করে উঠছে, ঠাকুরের সঙ্গে দেখা। ফিরছেন পঞ্চবটীর ধার থেকে, দেখা হতেই জিগগেস করলেন, 'তুমি এখনো এত জপ করো কেন?'

'জপ করব না? বিহ্বলের মত তাকিয়ে রইল গোপালের মা। 'আমার কি সব হয়েছে?'

'সব হয়েছে।'

'বলো কি?' যেন ঠাকুর বললেও বিশ্বাস করা যায় না।

'তোমার নিজের জন্যে সব হয়ে গেছে। তবে,' নিজের শরীরের প্রতি ইশারা করলেন: 'তবে যদি এই শরীরটা ভালো থাকবে বলে করতে চাও তো কোরো।'

তবে তাই হোক। আর নিজের জন্যে নয়। যা করব এবার থেকে সব তোমার, তোমার জন্য।

থলে-মালা গঙ্গায় ফেলে দিল গোপালের মা। হাতেই জপ করতে লাগল। তারপর কি ভেবে আবার একটা মালা নিলে। নিজের জন্যে নয়, গোপালের কল্যাণে মালা ফেরাই।

কিন্তু কই আগের মতন তো গোপাল দর্শন হয় না যখন-তখন। যখন দেখে রামকৃষ্ণ-মূর্তিই দেখে, কোথায় সেই বালকের বেশ! দু জানু আর এক হাত মাটিতে আরেক হাতে নবনীভিক্ষা। কোথায় সেই দুটি আহ্লাদবিহ্বল দৃষ্টি!

একদিন এসে কেঁদে পড়ল ঠাকুরের কাছে। 'গোপাল, তুমি আমার এ কি করলে? আমার কি অপরাধ হল, কেন আমি আর তোমাকে আগের সেই গোপালমূর্তিতে দেখি না?'

'সর্বক্ষণ ও রূপ দর্শন করলে কলিতে শরীর থাকে না।'

'আমার শরীর দিয়ে কি হবে?'

না, তুমি বাৎসল্যমূর্তির উদাহরণ, লোকহিতের জন্যে থাকো তুমি সংসারে। সংসার-বাসিনীরা বুঝুক শিশুসেবার মধ্যেই ঈশ্বরসেবা।

কার মুখখানি মনে পড়ে গা? সংসারে কাকে বেশি ভালোবাসো? একটি ভক্ত-মেয়েকে জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'ছোট একটি ভাইপোকে।'

'আহা, তবে তাকেই গোপাল ভেবে খাওয়াও-পরাও, সেবা করো। তার মধ্যে গোপালরূপী ভগবানকে দেখ। মানুষ ভেবে করবে কেন? ভগবান ভেবে করবে।

যেমন ভাব তেমন লাভ।'

বলরাম বোসের বাড়িতে এসেছেন ঠাকুর। রথের সময়। বার-বাড়ির দোতলায় চক-মিলান বারান্দায় রথ টানবেন ঠাকুর। কীর্তন করবেন। কিন্তু, কত লোক এসেছে, সে কই?

'ওগো সেই যে কামারহাটির বামুনের মেয়ে। যার কাছে গোপাল হাত পেতে খেতে চায়। সেদিন কি দেখে-শুনে প্রেমে উন্মাদ হয়ে আমার কাছে উপস্থিত। খাওয়াতে-দাওয়াতে একটু ঠাণ্ডা হল। কত থাকতে বললুম কিছুতে থাকলো না। যাবার সময়ও তেমনি উন্মাদ। গায়ের কাপড় মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। হুঁশ নেই। ওগো তাকে একবার আনতে পাঠাও না?'

কামারহাটিতে লোক পাঠালো বলরাম।

সন্ধ্যা হয়-হয় ঠাকুরের ভাবাবেশ হল। মরি মরি, বালগোপালের ভাব। হামা দিচ্ছেন দুই জানু আর এক হাতে। অন্য হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে চেয়ে আছেন ঊর্ধ্বমুখে। মা যশোদা, ননী দে।

স্নেহগলিতা যশোদা শিশুকৃষ্ণকে স্তন্য দিচ্ছেন। হঠাৎ শিশু হাই তুলল। পুত্রের মুখবিবরে যশোদা দেখল স্থাবরজঙ্গম-জ্যোতিষ্ক-সমন্বিত সমগ্র বিশ্ব।

আরেক দিন। বলরাম এসে নালিশ করলে মা'র কাছে। মা, কৃষ্ণ মাটি খেয়েছে। না মা, খাইনি মাটি। বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখাচ্ছি তবে হাঁ করে। এ কি স্বপ্ন না দেবমায়া? মুখবিবরে আবার সেই বিশ্বরূপ।

হোক মায়া, তবু সেই আমার একমাত্র আশ্রয়। যশোদা ভাবল মনে-মনে, এই আমি, এই আমার পতি, এই আমার পুত্র, এই গোপ-গোপী-গোধন সকল আমার এ কুমতি যার মায়াবশে হয়েছে সেই আমার পরমগতি, পরমমতি।

ঠাকুরেরও ভাবাবেশ হয়েছে, গাড়ি এসে দাঁড়াল দরজায়। কে এল? যার ভক্তির জোরে ঠাকুর এমন মূর্তি ধরলেন, সে—সেই গোপালের মা।

'আমি কিন্তু বাপু ভাবে অমন কাঠ হয়ে যাওয়া ভালোবাসি না।' গোপালের মা যেন অনুযোগ দিল। 'আমার গোপাল হাসবে খেলবে বেড়াবে দৌড়ুবে—ও মা, এ যেন একেবারে কাঠ! আমার অমন গোপালে কাজ নেই।' ঠাকুরের গা ঠেলতে লাগল গোপালের মা: 'ও বাবা তুমি অমন হলে কেন।'

এই মাতৃভাব বা সন্তানভাব—সাধনের শেষ কথা বা সহজ কথা। তুমি মা, আমি তোমার ছেলে।

আমি তোমার শরণাগত সন্তান। জীবত্ব বুঝি না, ঈশ্বরত্ব বুঝি না, কাকে বা

বলে বন্ধন কাকে বা বলে মুক্তি। জ্ঞান-ভক্তিও বুদ্ধির বাইরে। বুঝি একমাত্র তোমাকে, মাকে। তুমি পূর্ণানন্দস্বরূপ মা আর আমি তোমার কোলে সদ্যোজাত নগ্ন শিশু। তোমার কোলে যদি উঠতে পারি, তবে ঈশ্বরত্বও তৃণীকৃত।

তিনদিন পরে ঠাকুর ফিরছেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুরের নৌকোতে গোলাপ-মা, গোপালের মা আর একটি-দুটি ভক্ত-বালক। আশ্চর্য, গোপালের মা'র হাতে একটি পুঁটলি! কি করবে, বলরামের বাড়ির মেয়েরা বেঁধে দিয়েছে। খান দুই কাপড়, রাঁধবার জন্যে কিছু হাতা খুন্তি।

পুঁটলি দেখে ঠাকুর মহাবিরক্ত। গোপালের মাকে সরাসরি কিছু বললেন না। বললেন গোলাপ মাকে কিন্তু গোপালের মাকে ঠেস দিয়ে। 'যে ত্যাগী সেই ভগবানকে পায়। যে লোকের বাড়িতে খেয়ে-দেয়ে শুধু-হাতে চলে আসে, সেই ভগবানের গায়ে বসতে পারে ঠেস দিয়ে।' বলছেন আর বারে-বারে সেই পুঁটলির দিকে কটাক্ষ করছেন।

গোপালের মা'র মনে হল পুঁটলিটা ফেলে দি গঙ্গাজলে। কিন্তু তাই বা কেন, দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে কাউকে বিলিয়ে দেব না হয়।

দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছেই সোজা চলে গেল নবতে। শ্রীমাকে বললে, 'ও বৌমা, গোপাল এ সব জিনিসের পুঁটলি দেখে রাগ করেছে। এখন উপায়? এ সব ভাবছি আর নিয়ে যাব না, এইখানে বিলিয়ে দি কাউকে।'

সান্ত্বনার প্রলেপ বুলোলেন শ্রীমা। বললেন, 'বলুন গে উনি। তুমি শুনো না। তোমায় দেবার তো কেউ নেই! তা তুমি কি করবে মা, দরকার বলেই তো এনেছ।'

বুক জুড়িয়ে গেল কথা শুনে। তবু মনে যখন উঠেছে, একখানা কাপড় দান করল। আরো কটি এটা-ওটা। ঠাকুরের জন্যে রাঁধল স্বহস্তে। কি জানি, নেবেন কি না।

নেবেন বই কি, হাসিমুখে নেবেন। শ্রীমা ইঙ্গিত করেছেন নবত থেকে। না নিয়ে উপায় কি! গরিব মানুষ, চেয়ে ভিক্ষে করে আনেনি তো! আর যা পেয়েছে তার থেকে দান করে দিয়েছে অপরকে।

নরেনকে ডাকিয়ে এনেছেন ঠাকুর। আর সেই দিনই গোপালের মা'র আবির্ভাব। এবার রগড় হবে মন্দ নয়। একজনের হাতে জ্ঞান-অসি আরেকজনের হাতে বিশ্বাসের পাহাড়—কেমন যুদ্ধ হবে না জানি! দুষ্টুমি করে একটা কোঁদল বাধিয়ে দিই দুজনের মধ্যে।

'কেমন তুমি গোপাল দেখ নরেনকে একটু বলো তো বুঝিয়ে।'

দর্শনের কথা কাউকে বলতে নেই এমনি শিখিয়ে দিয়েছিলেন ঠাকুর। তাই ভয়ে-ভয়ে জিগগেস করল গোপালের মা, 'তাতে কিছু দোষ হবে না তো গোপাল?'

'মা, তুমি বলো।'

তুমি বিশ্বাস করো না করো আমি বলি এবার নির্ভয়ে। আমার ভাবের কথা বলব ভালোবাসার কথা বলব, তাতে আমার লজ্জা কি। চাঁদের আলো যে ছড়িয়ে পড়ছে জলে-স্থলে পাহাড়ে-কাননে সে কি চাঁদের লজ্জা?

গোপাল আমার কোলে উঠে কাঁধে মাথা রেখে এসেছিল সারা পথ। কামারহাটি থেকে দক্ষিণেশ্বর। তার রাঙা টুকটুকে পা ঝুলছিল বুকের কাছটিতে। এসেই ঢুকে গেল ঠাকুরের শরীরে। আবার বেরিয়ে এল যাবার সময়। শুতে বালিশ না পেয়ে খুঁতখুঁত করেছে সারা রাত। কাঠ কুড়িয়ে আনল রাঁধবার সময় আর খেতে বসে কি দস্যিপনা!

ভাবে বিভোর হয়ে বলতে লাগল অঘোরমণি। তুমি যদি না মানো তো আমি কি করব! আমি যে দেখছি চোখের সামনে।

এ কি, নরেন কাঁদছে!

'বাবা, তোমরা পণ্ডিত, বুদ্ধিমান, আমি দুঃখী কাঙালী, কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না।' আকুল স্বরে বললে গোপালের মা, 'তোমরা বলো, আমার এ সব তো মিথ্যে নয়?'

'না মা', নরেন বললে ভক্তবিশ্বাসীর মতো, 'তুমি যা দেখেছ সব সত্যি।'

ঝগড়াটা তাহলে লাগল না। ঠাকুর হাসতে লাগলেন।

॥ ১১৩ ॥

অধর সেনের বাড়িতে ঠাকুরের সঙ্গে বঙ্কিমের দেখা।

'তুমি ডিপুটি।' কথায় কথায় বললেন একদিন অধরকে। তার শোভাবাজার বেনেটোলার বাড়ির উত্তরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে। 'কিন্তু জেনো এ পদও ঈশ্বরের দয়ায় হয়েছে। তাঁকে ভুলো না।' আবার একদিন দক্ষিণেশ্বরে, শিবের সিঁড়িতে বসে। 'দেখ, তুমি এত বিদ্বান আবার ডিপুটি। তবু তুমি খাঁদিকাঁদির বশ। আমার কথা শোনো। এগিয়ে পড়ো। চন্দনকাঠের পরেও আরো ভালো জিনিস আছে। রূপোর খনি, সোনার খনি—তার পর হীরে-মানিক! শুধু এগিয়ে পড়ো—' বয়স আটাশ-উনত্রিশ। বৃত্তি পেয়েছে এনট্রান্সে অষ্টম হয়ে। এফ-এতে চতুর্থ।

কবিতার বই লিখেছে দুখানা, 'মেনকা' আর 'ললিতাসুন্দরী'। চব্বিশ বছর বয়সে প্রথমে ডেপুটি হয়েই চট্টগ্রাম। সেখান থেকে বদলি হয়ে যশোর। যশোর থেকে সম্প্রতি কলকাতা। আর কলকাতায় পৌঁছেই সটান দক্ষিণেশ্বর।

তিনশো টাকা মাইনে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইসচেয়ারম্যান হবার জন্যে দরখাস্ত করেছে। বড়-বড় লোকদের করছে অনেক ধরাধরি। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। এবার তুমি যদি বলো একটু তোমার কালীকে।

অধরকে মনে করেন পরমাত্মীয়। মুখে বলেনও তাই অকপটে। তাই একটু সাধলেন কালীকে। বললেন, 'মা, অনেক তোমার কাছে আনাগোনা করছে। যদি হয় তো হোক না।' বলেই ছি-ছি করে উঠলেন : 'মা, কি হীনবুদ্ধি! জ্ঞান-ভক্তি না চেয়ে চাচ্ছে কিনা টাকা-পয়সা!'

ধিক্কার দিয়ে উঠলেন অধরকে,'কেন হীনবুদ্ধি লোকগুলোর কাছে অত আনাগোনা করলে? কী হল? সাতকাণ্ড রামায়ণ, সীতা কার ভার্যে! আর বোলো না ঐ মল্লিকের কথা। আমার মাহেশ যাবার কথায় চলতি নৌকো বন্দোবস্ত করেছিল, আর বাড়িতে গেলেই হুদুকে বলত, হুদু, গাড়ি রেখেছ?'

অধর হাসল। বললে, 'সংসার করতে গেলে এ সব না করলে চলে কই? আপনি তো বারণ করেননি!'

কি অবস্থাই গেছে! 'এই অবস্থার পর,' ঠাকুর বললেন, 'আমাকে মাইনে সই করাতে ডেকেছিল খাজাঞ্চি। যেমন ডাকে সবাইকে, অন্যান্য কর্মচারীকে। আমি বললাম, তা আমি পারবোনি। তোমার ইচ্ছে হয় আর কারুকে দিয়ে দাও।'

সংসারে থাকো কিন্তু ঈশ্বর-রস-সরসীতে স্নান করো। কিন্তু যদি একবার যাও তলিয়ে আর উঠো না।

'এই অবস্থা যেই হল, রকম-সকম দেখে মাকে বললাম, মা, এইখানেই মোড় ফিরিয়ে দে। সুধামুখীর রান্না, আর না আর না—খেয়ে পায় কান্না!'

সবাই হেসে উঠল। সংসারসুধামুখীকে সবাই চেনে। বচনে অমৃত, ব্যঞ্জনে বিষ। আপাতরম্য কিন্তু পর্যন্তপরিতাপী। যাকে বলে দেখসিঁদুরে। রূপসুন্দর কিন্তু অসার।

'যার কর্ম করছ তারই করো।' বললেন আবার অধর সেনকে : 'লোকে পঞ্চাশ টাকা একশো টাকা মাইনে পায় না, তুমি তিনশো টাকা পাচ্ছ। ডিপুটি কি কম গা? ওদেশে দেখেছিলাম আমি ডিপুটি। নাম ঈশ্বর ঘোষাল। ছেলেবেলায় দেখেছিলাম। মাথায় তাজ—সব হাড়ে কাঁপে। বাঘে-গরুতে জল খায় এক ঘাটে। শোনো। যার কর্ম করছ তারই করো। একজনের চাকরি করলেই মন খারাপ

হয়ে যায়, আবার পাঁচজনের।'

আমিও একজনের চাকরি করছি। একজনের দাসত্ব। সে মুনিব সে উপরওয়ালার নাম ঈশ্বর।

'শোনো! আবার বলছেন ঠাকুর: 'আলো জ্বাললে বাদুলে পোকার অভাব হয় না। তাঁকে লাভ করতে চাইলে তিনিই সব যোগাড় করে দেন, কোনো অভাব রাখেন না। তিনি হৃদয়মধ্যে এলে সেবা করবার অনেক লোক এসে জোটে। তবে আপনি হাকিম, কি বলব! যা ভালো বোঝ তাই কোরো। আমি মূর্খ—' আর সবাইকে লক্ষ্য করে হাসিমুখে বললে অধর, 'উনি আমাকে একজামিন করছেন।'

যেমন দেশে বাড়ি, কলকাতায় গিয়ে কর্ম করে, তেমনি সংসারকর্মভূমিতে কাজ করে যাও। আর ঈশ্বরের নাম করো। ঈশ্বরই কীর্তনীয় কথনীয় গণনীয় মননীয় বর্ণনীয়, বন্দনীয়। ঈশ্বরই সর্বার্থনামচিন্তামণি। শুধু তাঁর নামসাধন করে যাও। পরমামৃতায়মান নামকীর্তন। 'বিদ্যাবধূজীবনং।' চিদ্‌বৃত্তি বিদ্যারূপে যে বধূ তার জীবনই শ্রীকৃষ্ণনামকীর্তন। নামসাধনে নিশ্চলা স্থিতিই নিষ্ঠা।

'তাঁর নামবীজের খুব শক্তি।' বললেন আবার অধরকে। 'নাশ করে অবিদ্যা। বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল, তবু শক্ত মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়।'

কণ্ঠপীঠে মঙ্গলস্বরূপ কৃষ্ণনাম প্রতিষ্ঠিত করো। 'ফুটং রট।' শব্দ করে উচ্চারণ করো। সঙ্কেতে অর্থাৎ পুত্রাদির নামকরণে, পরিহাসে, স্তোভে বা নিরর্থক বাক্যে বা নৃত্যগীতে, বা অবহেলাক্রমে যে ভাবেই হোক নাম করলেই হল। ভুলেও যদি অগ্নিকণা গায়ে এসে পড়ে দগ্ধ করবেই। তেমনি হরিনাম যদি একবার উড়ে এসে মনে পড়ে পুড়ে যাবে সর্বপাপ। আসলে হরিনামও বহ্নিময়। দাহ আছে, আবার এমন মজা, মধুও আছে। যাকে বলে 'তপ্ত ইক্ষু চর্বণ।' রাখাও যায় না ফেলাও যায় না।

'এই প্রেমের আস্বাদন
তপ্ত ইক্ষু চর্বণ—
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন॥'

কিন্তু শুধু নাম করলে কি হবে? অনুরাগ চাই। নামের মধ্যে চাই সেই হৃদয়ের সুর। সেই স্পর্শ-আতুর পথিক হাওয়ার ব্যাকুলতা।

শুধু নাম করে যাচ্ছি অথচ বিলাস-বাসনে মন রয়েছে অলস হয়ে, তাতে কী হবে?

'হাতিকে নাইয়ে দিলে কি হবে, আবার ধুলোকাদা মেখে যে-কে-সেই। তবে হাতিশালায় ঢোকবার আগে যদি কেউ ধুলো ঝেড়ে স্নান করিয়ে দেয়, তাহলে আর ভয় নেই, গা তখন থাকবে ঠিক পরিষ্কার।'

সেই যে এক পাপী গিয়েছিল গঙ্গাস্নানে। গঙ্গাস্নানে পাপ যায় শুনেছে, ব্যস, মনের সুখে ডুব দিচ্ছে জলে নেমে। কিন্তু জানে না পাপগুলো নদীর পাড়ে গাছের উপর গিয়ে বসেছে। যেই স্নান সেরে ফিরছে অমনি পুরোনো পাপগুলো গাছ থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল লোকটার ঘাড়ের উপর। স্নান করে দু পা আসতে-না-আসতেই একটু-আধটু হালকা হতে-না-হতেই আবার সেই গুরুভার। সেই জগদ্দল পাষাণের শ্বাসরোধ।

'তাই বলি নাম করো। আর সঙ্গে-সঙ্গে প্রার্থনা করো, হে ঈশ্বর, তোমার উপর যেন ভালোবাসা আসে। আর কিছু না। টাকা নয় মান নয় দেহের সুখ নয়, শুধু ভালোবাসা। এমন কখনো হতে পারে আমি তোমাকে ভালোবাসি আর তুমি আমাকে বাসো না?'

চণ্ডীর গান হয়ে গেল অধরের বাড়িতে। বলরামকে নেমন্তন্ন করতে ভুল হয়ে গিয়েছে। বলরামের বড় অভিমান, যাকে-তাকে বলে বেড়াচ্ছে। নালিশের মধ্যে রাগ তত নয় যত দুঃখ। চণ্ডীর গান দিল অধর, আমাদের বললে না। তা বলবে কেন, আমরা হলুম আজে-বাজে, হেঁজি-পেঁজি—

কথা কানে উঠল অধরের। ছুটে তক্ষুনি বলরামের বাড়ি গেল। যুক্ত করে অপরাধ স্বীকার করলে। মাপ করুন। ভুল হয়ে গিয়েছিল—

সে কথাই হচ্ছিল ঠাকুরের সঙ্গে।

বলরাম বললে, 'আমি জানতে পেরেছি যে অধরের দোষ নয়। দোষ রাখালের। রাখালের উপর ভার ছিল।'

রাখালের দোষ ধোরো না।' মমতামাখানো মুখে বললেন ঠাকুর, 'গলা টিপলে ওর দুধ বেরোয়—'

'বলেন কি মশাই!' ঝাঁজিয়ে উঠল বলরাম: 'চণ্ডীর গান হল, আর ও নেমন্তন্ন করতে বেরিয়ে—'

'আসলে অধরই জানত না। অধরেরই খেয়াল ছিল না।' ঠাকুর শান্তিজল ঢেলে দিলেন। 'দেখ না সেদিন যদু মল্লিকের বাড়ি গিয়েছিল আমার সঙ্গে। দেখল সিংহবাহিনী। চলে আসবার সময় জিগগেস করলুম, সিংহবাহিনীর কাছে প্রণামী দিলে না? ও, দিতে হয় নাকি—সঙ্কুচিত হয়ে গেল—তা মশাই আমি তো জানি না, আমার তো খেয়াল নেই!' ঠাকুর থামলেন। বলরামকে বিশেষ উদ্দেশ করে

বললেন, 'তা তোমাকে যদি না বলেই থাকে, তাতে দোষ কি? যেখানে হরিনাম সেখানে না বললেও যাওয়া যায়। নিমন্ত্রণের দরকার হয় না।'

নিমন্ত্রণ করি কাকে? অভিমানীকে। স্পর্ধিতবধিতকে। পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করলেও ত্রুটি ধরে। কিন্তু বিশ্বময় এত যে পত্র লিখে রেখেছেন ঈশ্বর, এ কি নিমন্ত্রণ? এ সরোদন আহ্বান। আয় আয়।

তুমি যাবে না ভেবেছ? যেতে পারো না সে আলাদা কথা। তোমার দেহের প্রতিটি রক্তকণা যাই-যাই করে উঠেছে।

গাছ কি নিমন্ত্রণ করে? তবু গাছের ছায়ায় গিয়ে বসি, পত্রমর্মরে হরিনাম শুনি। নদী কি নিমন্ত্রণ করে? তবু তার তীরে গিয়ে বসি, জলগুঞ্জনে হরিনাম শুনি। আকাশ কি নিমন্ত্রণ করে? তবু তার অন্ধকারের নিচে গিয়ে দাঁড়াই। তারায়-তারায় শুনি দীপ্ত হরিনাম।

গৃহস্থের ঘরে হরিনাম হচ্ছে। পথচারী পথিক এসে দাঁড়াল বাড়ির আঙিনায়। কে আপনি? আমি রবাহূত। আমাকে গৃহস্বামী ডাকেনি, আমাকে হরিনাম ডেকে এনেছে।

যেখানেই হরিকথা সেখানেই আত্মীয়তা। যেখানেই হরিনাম সেখানেই সুখধাম। নামসদৃশ জ্ঞান নেই, নামসদৃশ ব্রত নেই, নামসদৃশ ফল নেই, নামসদৃশ শান্তি নেই, নামসদৃশ আশ্রয় নেই। হে রসসারজ্ঞা রসনা, মধুরপ্রিয়া, যদি মধুস্বাদই করতে চাও নিরন্তর, নামপীযূষ পান করো।

'প্রথমে একটু খাটনি!' বললেন আবার অধরকে। 'তার পরেই পেনসান।'

প্রথমে অভ্যাস তারপরেই অনুরাগ। প্রথমে দাগা বুলোনো পরে টেনে লেখা। প্রথমে দাঁড় টানা পরে তামাক খাওয়া। প্রথমে ছুটোছুটি পরে মা'র কোলে ঘুম। অনেক দিন পর এসেছেন অধরের বাড়িতে। কোনো ঠিক ছিল না হঠাৎ এসে পড়েছেন। ঠাকুরের পায়ের কাছে বসল এসে অধর। বললে, 'কত দিন আসেননি। আমি আজ খুব ডেকেছিলাম আপনাকে। চোখ দিয়ে জল পড়েছিল—'

'বলো কি গো—' মুখমণ্ডল প্রসন্ন হয়ে উঠল।

তাই তো এসেছি। ব্যাকুল হয়ে কাঁদলেই তো চলে আসি পথ চিনে। বিনা-রেখার পথ ধরে যেমন বাতাস চলে আসে ফুলগন্ধের সংবাদ পেয়ে।

শুধু তুমি আমার জন্যে নয় আমিও তোমার জন্যে ব্যাকুল হই। কাঁদি। ঘুরে বেড়াই। অনেক দিন পর অধর এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। 'কি গো এত দিন আসোনি কেন?' ঠাকুরের কণ্ঠে যেন বেদনার কুয়াশা।

'অনেক কাজে পড়ে গিয়েছিলাম। নানান মিটিং, ইস্কুল, অফিস—'

'কচ্ছপের মতন থাকো। কচ্ছপ নিজে জলে চরে বেড়ায় কিন্তু মন রয়েছে আড়াতে। যেখানে তার ডিম রয়েছে সেখানে।'

'অনেক দিন আমাদের বাড়িতে আসেননি।' করজোড় করল অধর। বললে, 'সেই যে গিয়েছিলেন বৈঠকখানা ঘর সুগন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন—এখন সব অন্ধকার।'

ভাবসাগর উথলে উঠল ঠাকুরের। ভাবসাগর মানে প্রেমসাগর। দাঁড়িয়ে পড়লেন। হাত দিয়ে অধর আর মাস্টারের মাথা ছুঁলেন, ছুঁলেন বক্ষদেশ। বললেন, 'আমি তোমাদের নারায়ণ দেখছি। তোমরাই আমার আপনার লোক।'

শুধু তাই নয়, সেদিন অধরের জিভ ছুঁলেন ঠাকুর। জিভে কি লিখে দিলেন। সেই কি দীক্ষা হয়ে গেল অজ্ঞানতে? মুখে বললেন, 'তুমি যে নাম করেছিলে তাই ধ্যান করো।'

নামসদৃশ ধ্যান নেই।

সেই অধর সেনের বাড়িতে বঙ্কিম এসেছে। এসেছে ঠাকুরকে দেখতে। ঠাকুরের মতই যার মন্ত্র বন্দে মাতরম্।

'এইকি মা? হ্যাঁ, এই মা। চিনিলাম এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী মৃত্তিকারূপিণী অনন্তরত্নভূষিতা এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশ ভুজ দশ দিক—দশ দিকে প্রসারিত। তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলের শত্রু বিমর্দিত—পদাশ্রিত বীরজন—কেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। এ মূর্তি এখন দেখিব না, আজি দেখিব না, কাল দেখিব না, কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু এক দিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা নানাপ্রহরণ-প্রহারিণী শত্রুমর্দিনী বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞান-ময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ—এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা—"

বঙ্কিম প্রাণায়াম শরীরে।

॥ ১১৪ ॥

'মশাই, চিনিই বঙ্কিমবাবু।' অধর সেন পরিচয় করিয়ে দিল। 'ভারি পণ্ডিত, অনেক বই টই লিখেছেন। দেখতে এসেছেন আপনাকে।'

ঠাকুরের চেয়ে বছর দেড়েকের ছোট বঙ্কিম। তাকালেন একবার চোখ তুলে। সহাস্যে বললেন, 'বঙ্কিম! তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো!'

'আর মশায়, জুতোর চোটে। সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা।'

তা কেন? আমি তোমাকে চিনেছি। ও কথা বোলো না। তুমি কৃষ্ণপ্রেমে বঙ্কিম। তুমি কৃষ্ণের ভক্ত। কৃষ্ণের ব্যাখ্যাতা। কৃষ্ণরসবিবেত্তা।

'না গো, প্রেমে বঙ্কিম হয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীমতীর প্রেমে ত্রিভঙ্গ হয়েছিলেন।' বলে পুরুষ-প্রকৃতির অভেদতত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন মধুর করে: 'শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ শ্রীমতী শক্তি। যুগলমূর্তির মানে কি? মানে হচ্ছে, পুরুষ আর প্রকৃতি অভেদ। একটি বললেই আরেকটি। যেমন অগ্নি আর দাহিকা। অগ্নি ছাড়া দাহিকা নেই দাহিকা ছাড় অগ্নি নেই। তাই যুগলমূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি শ্রীমতীর দিকে, শ্রীমতীর দৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণের দিকে। বিদ্যুতের মত গৌরবর্ণ শ্রীমতীর, তাই নীলাম্বর পরেছেন, আর অঙ্গ সাজিয়েছেন নীলকান্ত-মণি দিয়ে। আর শ্রীমতীর পায়ে নূপুর দেখে নূপুর পরেছেন শ্রীকৃষ্ণ।'

তন্মোহিতের মত শুনছে দুই ডেপুটি। বঙ্কিম আর অধর। নিজেদের মধ্যে ইংরিজিতে কি বলাবলি করছে!

'কি গো, আপনারা ইংরিজিতে কি কথাবার্তা করছ?'

'এই কৃষ্ণরূপের ব্যাখ্যার কথা আলোচনা করছিলাম।' বললে অধর।

'সেই যে নাপিতের গল্প করলে! শোনো তবে। এক নাপিত কামাচ্ছে এক ভদ্রলোককে। কামাতে-কামাতে কোথায় লাগিয়ে দিয়েছে, আর ভদ্রলোকটি অমনি বলে উঠেছে ড্যাম্। ড্যাম্-এর মানে জানে না নাপিত। ক্ষুর-টুর ফেলে রেখে, শীতকাল, তবু জামার আস্তিন গুটোলো নাপিত, বললে, ড্যাম-এর মানে কি বলো। ভদ্রলোক বললে, আরে, তুই কামা না। ওর মানে এমন কিছু নয়, তবে লক্ষ্মী বাবা, একটু সাবধানে কামাস! নাপিত সে ছাড়বার নয়। বললে চোখ পাকিয়ে, ড্যাম মানে যদি ভালো হয় তবে আমি ড্যাম, আমার বাপ ড্যাম, আমার চৌদ্দপুরুষ ড্যাম। আর ড্যাম মানে যদি খারাপ হয় তবে তুমি ড্যাম, তোমার বাপ ড্যাম, তোমার চৌদ্দপুরুষ ড্যাম। শুধু ড্যাম নয়, ড্যাম ড্যাম ড্যাম ড্যা ড্যাম ড্যাম।'

কি মহানন্দ শিশুর মত বললেন সরল গল্পটা। আর বলবার এমন অপূর্ব কৌশল, দুই সহকর্মী হেসে উঠল উচ্চরোলে।

'আচ্ছা মশাই, এমন সুন্দর আপনার কথা, আপনি প্রচার করেন না কেন?' প্রশ্ন করল বঙ্কিম।

প্রচার? মঞ্চে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বক্তৃতা করব? না, খোল ঝুলিয়ে বেরুব শোভাযাত্রায়? না কি ইনিয়ে-বিনিয়ে লিখব আত্মজীবনী?

'প্রচার! ওগুলো অভিমানের কথা। যিনি চন্দ্রসূর্য সৃষ্টি করে এই জগৎ প্রকাশ

করেছেন, তাঁর প্রচার তিনিই করবেন। মানুষ ক্ষুদ্র জীব, তার মধ্যে কি সে প্রচার করে!'

'তবে তিনি যদি সাক্ষাৎকার হয়ে আদেশ দেন তাহলেই প্রচার সম্ভব। সে আদেশ সে চাপরাশ কজন পেয়েছেন? নইলে, আদেশ হয়নি, তুমি বকে যাচ্ছ। যতক্ষণ বলছ লোকে বলবে আহা ইনি বেশ বলছেন। তুমিও থামলে, তারপর ভেঙে যাবে সভা, কোথাও কিছু নেই। আর বলবেই বা কদিন? ঐ দুদিন। দুদিনই লোক শুনবে তারপর ভুলে যাবে। ঐ একটা হুজুক আর কি।'

ঈশ্বরের প্রচার ঈশ্বর করবেন, তুমি নিজে প্রকাশিত হও। দেখ না তিনি নিজে কেমন প্রকাশিত হয়েছেন চতুর্দিকে, সূর্যে চন্দ্রে তৃণাঙ্কিত ধরিত্রীতে, তারাঙ্কিত নিশীথিনীতে। তুমিও তেমনি প্রকাশিত হও। সমস্ত কিশলয়ে যে প্রার্থনা সেই প্রার্থনা তোমারও মধ্যে বিকশিত করো। তুমি যে মহৎ তুমি যে বৃহৎ তার প্রমাণ দাও জীবনে। অপরিমাণ রূপে বাঁচো। নিখিলের প্রতি প্রেমে নিখিলের প্রতি করুণায় প্রসারিত হও।

কার শক্তিতে তুমি প্রচার করবে? তিনি যদি না দুধের নিচে আগুনের জাল দেন তবে তা কি করে ফুলবে?

'যতক্ষণ দুধের নিচে আগুনের জাল রয়েছে ততক্ষণ দুধটা ফোঁস করে ফুলে ওঠে। জাল টেনে নাও, দুধও যেমন তেমনি। আচ্ছা, আপনি তো খুব পণ্ডিত, কত বই লিখেছ,' বঙ্কিমকে সবিশেষ লক্ষ্য করলেন ঠাকুর। 'আপনি কি বলো, কিছু কি সঙ্গে যাবে? পরকাল তো আছে?'

কথাটা উড়িয়ে দিল বঙ্কিম। 'পরকাল? সে আবার কি?'

'যতক্ষণ না জ্ঞান হয় ঈশ্বরলাভ হয় ততক্ষণ ফিরে আসতেই হবে সংসারে, নিস্তার নেই। জ্ঞানলাভ হলে ঈশ্বরদর্শন হলে তবে মুক্তি। সিদ্ধ ধান পুঁতলে আর গাছ হয় না। জ্ঞানাগ্নিতে কেউ যদি সিদ্ধ হয় তাকে নিয়ে আর খেলা হয় না সৃষ্টির।'

বঙ্কিম বললে, 'তা মশাই আগাছাতেও তো গাছের কোনো কাজ হয় না।'

'জ্ঞানী তা বলে আগাছা নয়। যে ঈশ্বরদর্শন করেছে, সে অমৃত-ফল লাভ করেছে, আপনার লাউ-কুমড়ো ফল নয়। তার আর পুনর্জন্ম হয় না। কেশব সেনকেও বলেছিলাম ঐ কথা। কেশব জিগগেস করলে, মশাই, পরকাল কি আছে? আমি না-এদিক না-ওদিক বললাম। বললাম, কুমোররা হাঁড়ি শুকাতে দেয়, তার ভেতর পাকা হাঁড়িও আছে কাঁচা হাঁড়িও আছে। কখনো গরুটরু এলে হাঁড়ি মাড়িয়ে যায়। পাকা হাঁড়ি ভেঙে গেলে কুমোর সেগুলো ফেলে দেয়, কিন্তু কাঁচা হাঁড়ি ভেঙে গেলে সেগুলো ঘরে আনে, ঘরে এনে জল দিয়ে মেখে আবার চাকে দিয়ে

নতুন হাঁড়ি করে, ছাড়ে না। তাই কেশবকে বললুম, যতক্ষণ কাঁচা থাকবে ছাড়বে না কুমোর। যতক্ষণ পাকা না হবে, জ্ঞান লাভ না হবে, ঈশ্বরদর্শন না হবে, আবার চাকে দেবে। পাক দিয়ে ঘুরিয়ে মারবে।'

একগ্রগামিনী নদীর মত চলেছি। বক্রতায়-ঋজুতায়, উচ্চাবচ পথ ভেঙে-ভেঙে, নানা দেশের বিচিত্র ঘটনা ও কাহিনীর মধ্য দিয়ে। কিন্তু আমি শরবৎ তন্ময়। আমার লক্ষ্য হচ্ছে সেই জলনিধি, সেই অপার-অগাধ সেই সুদূর-সুন্দর। আমি তো নিশ্চিন্ত হতে চাই না, উদ্বিগ্ন হতে চাই। আমি তো বিশ্রামের নই আমি প্রাণবেগপ্রাবল্যের। আমি তো সুখী হতে আসিনি বড় হতে এসেছি, বেগবিস্তীর্ণ হতে এসেছি। তাই আমি চলব, আমি থামব না। আমি যে অনন্তের সন্ধানী, সেই তো আবার অন্তহীন আনন্দ।

'আচ্ছা, আপনি কি বলো, মানুষের কর্তব্য কি?'

'আজ্ঞে তা যদি বলেন,' বঙ্কিম বললে পরিহাস করে, 'আহার নিদ্রা আর মৈথুন।'

'এঃ। তুমি বড় ছ্যাঁচড়া,' ঠাকুরের কণ্ঠস্বরে বিরক্তি ঝরে পড়ল। 'যা রাতদিন করো তাই তোমার মুখে বেরুচ্ছে। লোকে যা খায় তার ঢেঁকুর ওঠে। মুলো খেলে মুলোর ঢেঁকুর ওঠে। ডাব খেলে ডাবের ঢেঁকুর ওঠে। কামকাঞ্চনের মধ্যে রয়েছ তাই ঐ কথাই বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে। কেবল বিষয়চিন্তা করলে পাটোয়ারি স্বভাব হয়, কপট হয় মানুষ। আর ঈশ্বরচিন্তা করলে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হলে ও কথা কেউ বলবে না।'

এক সাধুর কাছে এক রাজা এসেছে। সাধুকে প্রণাম করে রাজা বললে, আপনি পরম ত্যাগী। কে বললে? সাধু হাসতে-হাসতে বললে, রাজা আপনিই যথার্থ ত্যাগী। আমি? রাজা তো বাক্যহীন। তা ছাড়া আবার কি! যে সব চেয়ে দামী জিনিস প্রিয় জিনিস ত্যাগ করে সেই তো বড় ত্যাগী। বললে সাধু, আমি তো কতগুলো তুচ্ছ জিনিস ত্যাগ করেছি, কামকাঞ্চন ভোগৈশ্বর্য। কিন্তু সব চেয়ে যা প্রিয় সব চেয়ে যা মূল্যবান সেই পরমাত্মাকে আপনি ত্যাগ করেছেন, আর তা কত অনায়াসে। তাই, সন্দেহ কি, আপনিই বড় ত্যাগী। বলুন, তাই নয়?

'শুধু পাণ্ডিত্য হলে কি হবে? যদি ঈশ্বরচিন্তা না থাকে? যদি বিবেকবৈরাগ্য না থাকে? চিল-শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে কিন্তু নজর ভাগাড়ের দিকে। অনেক শাস্ত্র-পুঁথি পড়েছে পণ্ডিত। শ্লোক ঝাড়তে পারে অফুরন্ত কিন্তু মেয়েমানুষে আসক্ত, টাকা মান সারবস্তু মনে করেছে, সে আবার পণ্ডিত কি? ঈশ্বরে মন না থাকলে আবার পণ্ডিত কি?'

পাণ্ডিত্যে আছে কি? শুধু শুষ্কতা, শুধু দাহ। যেখানে রাজত্ব করার কথা সেখানে এসে দাসত্ব করা। শুধু প্রেমহীন প্রাণহীন মাংসপিণ্ড। ঈশ্বর স্বয়ং যেখানে নত

হয়ে এসেছেন আমার কাছে সেখানে কিসের আমার স্পর্ধা, কিসের ঔদ্ধত্য ? পরম প্রাপ্তিটিই তো প্রণতিতে।

'কেউ-কেউ মনে করে এরা পাগল, এরা বেহেড, কেবল ঈশ্বর-ঈশ্বর করে। আর আমরা কেমন স্যায়না, কেমন সুখভোগ করছি। কাকও মনে করে আমি বড় স্যায়না, কিন্তু আসলে কি খায়, কেবল উড়ুর-পুড়ুর করে। আবার দেখ এই হাঁস, দুধে-জল মিশিয়ে দাও, জল ত্যাগ করে দুধ খাবে।'

সুখভোগ ? যা বিষ হয়, তাই তো সংক্ষেপে বিষয়। তার মধ্যে আছে সুখের প্রতিশ্রুতি ? সুখ যখন সত্যিই চাও বড়ো সুখটাই নাও না কেন, সেই আরো-র সুখ, সুখের চেয়ে অধিকতর যে সুখ। যা পেয়েছি কুড়িয়েছি ও জমিয়েছি তার চেয়েও যা আরো, যা পাইনি হারিয়েছি ও ফেলে দিয়েছি তার চেয়েও। সুখের বাজি জিতিয়ে দেবে বলে কত ঘোড়াই ধরলাম জীবনের ঘোড়দৌড়ের মাঠে। বিদ্যা আর যশ, পুত্র আর বিত্ত। কেউই পারল না বাজি মারতে, প্রত্যেকেই মার খেল! এবার ধরব এক কালো ঘোড়া, ডার্ক-হর্স। মনের গোপনে গভীর গুঞ্জনে এসে গেছে নতুন খবর! এবার নির্ঘাত বাজি মাৎ।

সে তীরবেগ তুরঙ্গমের নামই ঈশ্বর।

'আরো দেখ এই হাঁসের গতি।' বললেন আবার ঠাকুর : 'এক দিকে সোজা চলে যাবে। তেমনি শুদ্ধভক্তের গতিও কেবল ঈশ্বরের দিকে। তার কাছে বিষয়রস তেতো মনে হয়, হরিপাদপদ্মের সুধা বই আর কিছু ভালো লাগে না।' বিশেষ করে তাকালেন আবার বঙ্কিমের দিকে, কোমল স্বরে বললেন, 'আপনি যেন কিছু মনে কোরো না।'

সরল সপ্রতিভের মত বঙ্কিম বললে, 'আজ্ঞে মিষ্টি শুনতে আসিনি।' কিন্তু বঙ্কিম জানে তার অন্তরের মধ্যে এর চেয়ে আর মিষ্টি নেই। শক্তিশালী ওষুধের নাম জানি না, খেতে খুব ঝাঁজালো, কিন্তু মধুরের মত কাজ করে আশুগুণে, আরোগ্য এনে দেয়। তেমনি অর্থ জানি না মন্ত্রের উচ্চারণও হয়তো ঠিক হয় না, কিন্তু আশুগুণে কাজ করে, এনে দেয় নৈরুজ্য। তেমনি তিরস্কারের মধ্য দিয়েই আসুক সেই নামের পুরস্কার।

ভক্ত ঈশ্বরের কাছে বিষয় চাইলেও ঈশ্বর তাকে তাঁর পাদপল্লবই উপহার দেন। হে প্রভু, তোমাকে ত্যাগ করে স্বর্গ চাই না। ধ্রুবলোক চাই না! সার্বভৌম রসাধিপত্যও চাই না। চাই না যোগসিদ্ধি। চাই না অপুনর্ভব। ক্ষুধার্ত শিশু বা অজাতপক্ষ বিহঙ্গ যেমন তার মা'র জন্যে উৎকণ্ঠিত, বিরহিণী স্ত্রী যেমন প্রবাসগত পতির জন্যে উৎকণ্ঠিত, হে মনোহর-অরবিন্দনেত্র, তোমাকে দেখবার জন্যে আমিও তেমনি উৎকণ্ঠিত হয়েছি।

'কামিনী-কাঞ্চনই সংসার।' বঙ্কিমকে লক্ষ্য করে বললেন আবার ঠাকুর : 'এরই নাম মায়া। দেখতে দেয় না ঈশ্বরকে।'

মাথার উপরে ছাদ থাকলে কি সূর্যকে দেখা যায়? একটু-একটু আলো এলে কি হবে? কামিনী-কাঞ্চনই ছাদ। ছাদ তুলে না ফেললে সূর্যকে দেখবে কি করে? সংসারী লোক যেন ঘরের মধ্যে বন্দী। আবছায়ার বাসিন্দে।

কামিনী-কাঞ্চনই মেঘ। সেও দেখতে দেয় না সূর্যকে। যতক্ষণ মায়ার ঘরে আছে, যতক্ষণ মায়া-মেঘ রয়েছে জ্ঞান-সূর্য কাজ করে না। মায়া-ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াও। জ্ঞান-সূর্যে নাশ হবে অবিদ্যা। বদ্ধ ঘরের অন্ধকার। বদ্ধ ঘরের অন্ধকারও যা অহংকারও তাই। হয়ে যাবে শুকনো তৃণের মত।

'ঘরের মধ্যে আনলে আতস কাঁচে কাগজ পোড়েনা।' বললেন ঠাকুর, 'ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালে রোদটি ঠিক কাঁচে পড়ে, তখন পুড়ে যায় কাগজ। আবার মেঘ চলে এলে কাজ হয় না আতস কাঁচে। মেঘটি সরে গেলে তবে হয়।'

সেই একজন এক কুকুর পুষেছে। দিন-রাত থাকে তাকে নিয়ে। কখনো কোলে করে কখনো বা মুখের পরে মুখ দিয়ে বসে থাকে। অত আদর করতে নেই, একজন এসে শাসিয়ে গেল, পশুর জাত, কোনদিন আদর ভুলে ফট করে কামড়ে দেবে তার ঠিক কি! সত্যিই তো। জোর করে নামিয়ে দিলে কোল থেকে, আর কক্‌খনো কোলে নেব না। কুকুর তা শুনবে কেন? দৌড়ে এসে উঠতে চায় ব্যাকুল হয়ে। নামিয়ে দাও তো আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছুটে পালাও তো সেও ছোটে। তখন উপায় কি? প্রহার করো। কুকুরের মার আড়াই প্রহর। মার ভুলে গিয়ে আবার কোলের জন্যে হা-পিত্যেশ করে। অনেক কাল আদর করে কোলে তুলে নিয়েছ এখন তুমি নিরস্ত হলেও সে ছাড়বে কেন? আসতে চায় আসুক, আবার প্রহার করো। জর্জর করো। নির্জিত করো। আর সে আসবে না। পালিয়ে যাবে।

কামকেও অনেক প্রশ্রয় দিয়েছ। এবার তাকে উচ্ছিন্ন করো।

কি জানিস, তোদের এখন যৌবনের বন্যা এসেছে। তাই পাচ্ছিস না বাঁধ দিতে। বান যখন আসে তখন কি আর বাঁধ-টাঁধ মানে? বাঁধ ভেঙে জল ছুটতে থাকে উত্তাল হয়ে। ধান-খেতের উপর এক বাঁশ-সমান জল দাঁড়িয়ে যায়। কামিনী-কাঞ্চন যদি মন থেকে গেল তবে আর বাকি কি রইল? তখন কেবল ব্রহ্মানন্দ।

কিন্তু তুমি কি কামিনী ?

তুমি জননী, তুমি জায়া, তুমি তনয়া, তুমি সহোদরা। তোমাকে ত্যাগ করব কি করে ?

কামিনীকে ত্যাগ করো দামিনীকে নয় ; ভোগিনীকে ত্যাগ করো, যোগিনীকে নয়। অবিদ্যাকে ত্যাগ করো, বিদ্যা-বিনোদিনীকে নয়।

'দু-একটি ছেলে হলে স্ত্রীর সঙ্গে ভাই-ভগ্নীর মত থাকতে হয়, আর তার সঙ্গে কইতে হয় শুধু ঈশ্বরের কথা।' বঙ্কিমকে বললেন আবার ঠাকুর : 'তা হলেই দুজনের মন তাঁর দিকে যাবে আর স্ত্রী ধর্মের সহায় হবে।'

জগতের মা, সেই আদ্যাশক্তিই স্ত্রী হয়ে স্ত্রীরূপ ধরে রয়েছেন। সেই সৃজনী পালনী সংহরণী শক্তিই নেমে এসেছে সংসারে। প্রভাতে গায়ত্রী, অরুণরঞ্জিত আকাশে হংসারূঢ়া কুমারী, সৃষ্টি-উন্মুখী কোরক-আকারা। মধ্যাহ্নে শুক্লবর্ণা স্থিতিরূপিণী যুবতী, পদন্যাসবিলাসলক্ষ্মী। সায়াহ্নে কৃষ্ণবর্ণা প্রলয়শংসিনী বৃদ্ধা, ঘোরকুটিলআননা। এই তো সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়লক্ষণা ব্রহ্মশক্তি! সমস্ত জগতের আধারশক্তি। এই ব্রহ্মময়ী মহাশক্তিকেই তো বসিয়েছি সংসারে।

শক্তিযুক্ত না হতে পারলে শিব করবে কি ? শিব তো সামর্থ্যহীন স্পন্দনহীন। শক্তিযুক্ত হলেই সে পুরুষার্থসম্পন্ন।

ঋক কখনও সাম ছাড়া আর সাম কখনো ঋকবিরহিত হয়ে থাকতে পারে না। ঋক স্ত্রী, সাম পুরুষ। ঋক ভূলোক, সাম স্বর্লোক।

বিবাহের মন্ত্রে বর বলছে বধূকে : 'আমি অম, লক্ষ্মীশূন্য, তুমি লক্ষ্মী। আমি সামবেদ তুমি ঋকবেদ। আমি স্বর্গ তুমি ধরিত্রী।'

আসল কথা সংযম করো। সত্তার কনকপদ্মটিকে উন্মোচিত করো। সংসারের ঊর্ধ্বেও যে সংসার আছে তার খোঁজ নাও। দেহমঞ্চে ফোটাও এবার ঈশ্বর-রোমাঞ্চের ফুল। আনন্দ পেতে এসেছ সংসারে নাও এই নিত্য-নতুনের আনন্দ। বিন্দু-বিন্দু নয়, থেকে-থেকে থেমে-থেমে নয়—চাই অপরিচ্ছন্ন সুখ। একটানা বন্যা। সেই একটানা বন্যার নামই ঈশ্বর।

'আর কাঞ্চন ?' বললেন আবার ঠাকুর : 'পঞ্চবটীর তলায় গঙ্গার ধারে বসে টাকা মাটি, মাটি টাকা, বলে ফেলে দিয়েছিলুম জলে।'

'বলেন কি ! টাকা মাটি ?' বঙ্কিম চমকে উঠল : 'মশায়, চারটে পয়সা থাকলে গরিবকে দেওয়া যায়। টাকা যদি মাটি, তা হলে দয়া-পরোপকার হবে না ?'

'দয়া ! পরোপকার !' স্মিতহাস্যে বললেন ঠাকুর : 'তোমার সাধ্য কি যে তুমি পরোপকার করো। দয়া ঈশ্বরের, মানুষে আবার কী দয়া করবে ! দয়ালুর ভিতর

যে দয়া দেখ সে তাঁরই দয়া। বাবা-মা'র মধ্যে যে স্নেহ দেখ সব তাঁর স্নেহ।'

পরকে দয়া করবার আগে নিজেকে দয়া করো। ভাণ্ডারে বৈভব থেকেও নিজেকে বঞ্চিত করে রেখেছ। উড়িয়ে দিচ্ছ ফুরিয়ে ফেলছ নিজেকে। ক্ষয়ে যেতে বয়ে যেতে দিচ্ছ। সর্বাধিকারী হয়েও আছ সর্বহারার মত। নিজেকে কৃপা করো। আত্মকৃপার মত কৃপা নেই। নিজেই নিজের দিকে চেয়ে রয়েছ করুণনেত্রে। নিজের দিকে তাকাও। নিজেকে বাঁচাও। নিজেকে তুলে ধরো।

'ঈশ্বরকে ডাকবার আমার কী দরকার?' অভিমান করে একদিন বলেছিল বিদ্যাসাগর। 'দেখ না চেঙ্গিস খাঁকে। বিস্তর লুটপাঠ করে রাজ্যের লোককে বন্দী করলে। প্রায় এক লাখ। সেনাপতিরা প্রমাদ গুণল। বললে, মশাই, এদের এখন খাওয়াবে কে? সঙ্গে এদের রাখলেও বিপদ, ছেড়ে দিলেও বিপদ। এই হত্যাকাণ্ডটা তো ঈশ্বর স্বচক্ষে দেখলেন। কই একটু নিবারণ তো করলেন না। তা তিনি থাকেন থাকুন আমার তাতে দরকার কি। আমার তো কোনো উপকার নেই।'

ঠাকুর বললেন, 'ঈশ্বরের কার্য কে বোঝে! কেনই বা সৃষ্টি করছেন, কেনই বা সংহার! আমি বলি আমার ও বোঝবার দরকার নেই। বাগানে আম খেতে এসেছি আম খেয়ে যাই। কত গাছ কত ডাল কত পাতা তার হিসেবে আমার কাজ কি। আমি চাই ভক্তি, আমি চাই ভালোবাসা। আমি চাই সুস্বাদুকে আস্বাদ করতে।'

গঙ্গাধর গাঙুলিকে—পরে যিনি অখণ্ডানন্দ—আসন শেখাচ্ছেন ঠাকুর। একেবারে ঝুঁকে বসতে নেই, আবার খুব টান হয়েও বসতে নেই। শেখাতে-শেখাতে এক সময় বলে উঠলেন, 'শোন, তোকে বলে রাখি কানে-কানে, খিদের মুখে বাড়া ভাত পেলে খেয়ে ফেলবি। খিদের মুখে যেমন করেই খা, পেট ভরবে।'

তাই আসলে হচ্ছে আস্বাদ। আসলে হচ্ছে ভালোবাসা।

বঙ্কিমকে আবার বলছেন ঠাকুর, 'সংসারী লোকের টাকার দরকার। সঞ্চয় দরকার। কেন না তার মাগ-ছেলে আছে, খাওয়াতে হবে। সঞ্চয় করবে না কে? কেবল পক্ষী অউর দরবেশ। পাখী আর সন্ন্যাসী। তেমনি কামিনীও সন্ন্যাসীর ত্যাজ্য। তার কামিনী গ্রহণ করা মানে থুতু ফেলে সেই থুতু খাওয়া।'

আর তুমি সংসারী? কামিনী সম্বন্ধে তোমার সংযম, কাঞ্চন সম্বন্ধে তোমার অনাসক্তি। তোমার ত্যাগ নয়, পরিহার নয়, নিষেধ নয়, আরোপ নয়। তোমার শুধু একটু বেঁকিয়ে দেওয়া। কামের থেকে প্রেমে চলে আসা। আত্ম থেকে আত্মায়। বদ্ধ দেওয়ালের দেশ থেকে উন্মুক্ত সমুদ্রে।

'আচ্ছা, তুমি কি বলো?' প্রশ্ন করলেন বঙ্কিমকে। 'আগে সায়েন্স না আগে ঈশ্বর?'

'বা, আগে পাঁচটা জানতে হবে বৈকি। এদিককার জ্ঞান না হলে ঈশ্বর জানব কেমন করে?'

'তোমাদের ঐ এক কথা। আগে ঈশ্বর তারপর সৃষ্টি। আগে যদু মল্লিক তারপর তার ধন-দৌলত। ১-এর পর যদি পঞ্চাশটা শূন্য থাকে অনেক হয়ে যায়। ১-কে মুছে ফেল সব শূন্য। এককে নিয়েই অনেক। এক আগে তারপর অনেক। আগে ঈশ্বর তারপর জীবজগৎ।' অন্তরঙ্গ দৃষ্টিতে দেখলেন বঙ্কিমকে: 'আম খেতে এসেছ আম খেয়ে যাও।'

বঙ্কিম হাসল। 'আম পাই কই?'

'তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করো। আন্তরিক হলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। হয়তো অন্তত সৎসঙ্গ জুটিয়ে দিলেন—'

'কে, গুরু? তাঁর কথা বলবেন না। ভালো আমটি নিজে খেয়ে খারাপ আমটি আমায় দেবেন।'

'তা কেন? যার যা পেটে সয়। সকলে কি পলুয়া-কালিয়া হজম করতে পারে? যে দুর্বল যার পেটের অসুখ তার পথ্য মাছের ঝোল।'

ত্রৈলোক্য সান্যাল গান ধরল। ঠাকুর দাঁড়িয়ে পড়লেন। দাঁড়িয়ে সমাধিস্থ। সবাই ঘিরে ধরল। ভিড় ঠেলে বঙ্কিমও এল এগিয়ে। একদৃষ্টে দেখতে লাগল ঠাকুরকে। অচ্যুতচিন্তায় কখনো কাঁদছেন, কখনো হাসছেন, কখনো নাচছেন, গান করছেন, অলৌকিক কথা বলছেন, কখনো বা শ্রীহরির লীলাভিনয় করছেন, কখনো বা নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মত তৃষ্ণী হয়ে আছেন। কৃতকৃতার্থ ভক্তের কথা সেই যে পড়েছিল বঙ্কিম, এ যে তারই প্রতিমূর্তি।

কে এই পুরুষ? নাম টাকা মান বৈভব কিছু চায় না, শুধু প্রেমানন্দ চায়, যে প্রেম ঈশ্বর থেকে উৎসারিত। প্রেমানন্দই ভূমানন্দ। কিছু চাই না অথচ ভালোবাসি—এর নামই ভূমা। উদ্দেশ্য যা উপায়ও তাই। উদ্দেশ্য ভালোবাসা উপায়ও ভালোবাসা। ভালোবেসেই বিশ্বকে আপন করা। সেই বিশ্বানন্দই ব্রহ্মানন্দ।

অনিমেষ চোখে তাকিয়ে আছে বঙ্কিম। দেখছে ঠাকুরের নৃত্য। কীর্তনরসস্ফূর্তি। কীর্তনান্তে সকলকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন ঠাকুর। বললেন, 'ভাগবৎ-ভক্ত-ভগবান জ্ঞানী-যোগী সকলের চরণে প্রণাম।'

বিগলিত হল বঙ্কিম। সন্ন্যাসের আসল কি অর্থ তা যেন বুঝল নতুন করে। শুধু স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নয়, এই বিশ্বজগৎ আমার আত্মার বিস্তৃতি, সুতরাং আমারই আপনার লোক। তাই যদি হয় তবে এই অনন্ত আত্মীয়ের রাজ্যে শুধু পরিমিত

পরিজন নিয়ে সুখী আছি কি করে? অঙ্গনকে পরিমুক্ত করো, প্রসারিত করো। এই প্রসারণই সন্ন্যাস। সন্ন্যাস সংসারের সঙ্কোচন নয়, সংসারের বিস্তৃতিই সন্ন্যাস। শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বসংসারী, তাই আসল সন্ন্যাসী। সর্বত্যাগী হয়েও তাই সর্বগ্রাহী। 'ভক্তি কেমন করে হয়?' জিগগেস করল বঙ্কিম।

'ব্যাকুলতায়। ছেলে যেমন মা'র জন্যে দিশেহারা হয়ে কাঁদে সেই ব্যাকুলতায়। উপরে ভাসলে কী হবে? ডুব দাও কান্নাসাগরে, তবেই পাল্লা উঠবে। গভীর জলের নিচে রত্ন, জলের উপর হাত-পা ছুঁড়লেই তো রত্ন ভেসে উঠবে না। রত্ন যে ভারী, জলে ভাসে না, তলিয়ে গিয়ে মাটির সঙ্গে ঠেকেছে। তাই ডোবো। তলিয়ে যাও।'

'কি করি! পেছনে যে শোলা বাঁধা।'

'কাল-পাশ কেটে যাবে, এ তো মাত্র শোলা। তাঁকে মনন করো, তাঁকে ডাকো, তাঁতে নিমজ্জিত হও। ডুব না দিলে কিছু হবে না। একটা গান শোনো।' বলে গান ধরলেন ঃ

ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন,
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেমরত্নধন।

ঘর ছেড়ে মাঠে এসো। ঘরের মধ্যে এক চিল্‌তে আলো ছাদের ফাঁক দিয়ে আসছে। যে ঘরের মধ্যে আছে তার আলো-জ্ঞান ঐটুকু। যার ঘরের বেড়ায় অনেক ছ্যাঁদা, সে বেশি আলো দেখতে পায়। যে দরজা-জানলা খুলে দিয়েছে সে পায় আরো দেখতে। কিন্তু যে চলে আসতে পেরেছে মাঠে তার আলোয় আলো। আত্মবোধ থেকে চলে এসো বিশ্ববোধে।

'কেউ-কেউ ডুব দিতে চায় না। বলে ঈশ্বর-ঈশ্বর করে বাড়াবাড়ি করে শেষকালে কি পাগল হয়ে যাব?' নিবিড় স্নেহে তাকালেন বঙ্কিমের দিকে। ঈশ্বর এমন রস যাতে লোক সুস্থ হয় স্নিগ্ধ হয় সুন্দর হয়। সে অমৃতের সাগরে ডুবলে মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করে—'

ঠাকুরকে প্রণাম করল বঙ্কিম। বিদায় নিল। বললে, 'আমাকে যত আহাম্মক ঠাওরেছেন আমি হয়তো তত নই।'

ঠাকুর হাসলেন। ঠাকুরের কি বুঝতে বাকি আছে কোন উপাদান দিয়ে বঙ্কিম তৈরি! অন্তরগহনে রয়েছে তার ভক্তির উৎস, অন্তঃসলিলা ভক্তির প্রবাহিনী।

আঠারো বছর বেদান্ত রগড়াচ্ছি, তবু, বন্ধু—বলছিল এক সাধু—দূরে মলের শব্দ শুনতে পেলে মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। সংসার থেকে মন উচ্ছিন্ন করা কি সহজকথা?

'একটি প্রার্থনা আছে।' বঙ্কিম বললে স্নিগ্ধমুখে, 'অনুগ্রহ করে যদি কুটিরে একবার পায়ের ধুলো দেন—'

'তা বেশ তো। ঈশ্বরের ইচ্ছা।'

কি ভাবছিল বঙ্কিম, ভাবতে-ভাবতে বেরিয়ে পড়েছে অন্যমনে। যাকে কেউ টানতে পারে না অথচ যে সকলকে টানে তারই আশ্চর্য শক্তির কথাই ভাবছিল হয়তো। গায়ের চাদর ফেলে এসেছে ভুলে। কে একজন কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে তাকে পৌঁছে দিল চাদর। তবু সম্পূর্ণ খেয়াল নেই। দৃষ্টি নেই বেশবাসে।

কদিন পরে গিরিশ আর মাস্টারকে ডাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'সেই যে বঙ্কিম বলে গেল তার বাড়িতে নিয়ে যাবে একদিন, কই, এল না তো! যাও খোঁজ নিয়ে এস দেখি।'

গিরিশ আর মাস্টার তখুনি রওনা হল। বঙ্কিম কত কথা বললে ঠাকুরের সম্বন্ধে, দিব্য আনন্দের কথা। যাকে না পেয়ে ও যেখান থেকে ব্যাহত হয়ে বাক্য ও মন যুগপৎ নিবর্তন করে তাই তো আনন্দ-পারাবার। বহু মেধা বা শাস্ত্র দ্বারা লভ্য নন, যাকে বরণ করেন একমাত্র তার দ্বারাই লভ্য। সেই অনির্বচনীয় কথা।

বললে, 'যাব আরেকদিন। ডেকে নিয়ে আসব।'

আর যাওয়া হয়নি বঙ্কিমের। যেতে হয় না, তিনিই আসেন নিজের থেকে। ডাকলে তো আসেনই, না ডাকলেও আসেন।

যেমন এসেছেন অধরের মৃত্যুশয্যার পাশে।

মাণিকতলায় ডিস্টিলারি পরিদর্শন করতে গিয়েছিল অধর। গিয়েছিল ঘোড়ায় চড়ে। ফিরতি-পথে শোভাবাজার স্ট্রীটে পড়ে গেল ঘোড়া থেকে। ভেঙে গেল বাঁ হাতের কব্জি। শুধু তাই নয়, ধনুষ্টঙ্কার হয়ে গেল। ঠাকুর যখন এলেন, কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে অধরের। তবু চিনতে দেরি হল না। সমস্ত যন্ত্রণা আনন্দাশ্রুতে বিধৌত হতে লাগল। ঠাকুর কাছে বসে গায়ে হাত বুলুতে লাগলেন। মুখখানি ম্লান, চোখ দুটি করুণকোমল।

অধর চলে গেল অধরায়। মাত্র তখন তিরিশ বছর বয়স। একটা যেন তারা খসে পড়ল। ভবতারিণীর দুয়ার ধরে কাঁদতে বসলেন ঠাকুর। 'মাগো, আমার কেন এত যন্ত্রণা? আমাকে ভক্তি দিয়ে রেখেছিস বলেই তো আমাকে এত সইতে হচ্ছে।'

boiRboi.net

প্রভু, কোন মুখে আমি সুখ চাইব তোমার কাছে, কোন লজ্জায়? যতবার দেহধারণ করে এসেছ একবারও সুখ পাওনি। রামরূপে এলে রাজপুত্র হয়ে, চীর-বল্কল ধরে চলে গেলে বনবাসে। চন্দ্রের সঙ্গে চিত্রা-নক্ষত্রের মত সীতাও তোমার অনুগামিনী হল। বনে গিয়ে তোমার কত যন্ত্রণা, কত যুদ্ধ। তারপর সীতাকে যদি-বা উদ্ধার করলে, বসাতে পারলে না সংসারের সিংহাসনে। তাকে পাঠাতে হল নির্বাসনে প্রজানুরঞ্জনের তাগিদে। দগ্ধ হলে দুঃসহ মর্মজ্বালায়। সুখ পেলে না। কৃষ্ণরূপে জন্ম নিলে কারাগৃহে। নিজের মায়ের স্তন্য থেকে বঞ্চিত রইলে। রাজার ছেলে হয়ে মানুষ হলে গোপের ঘরে। সারাজীবন ধরেই যুদ্ধ আর দুষ্টদলন করতে হল, সুখ কাকে বলে শান্তি কাকে বলে জানতে পেলে না। শান্তিস্থাপনের চেষ্টা করলে আপ্রাণ, তবু দায়ী হলে কুরুক্ষেত্রের অশান্তির জন্যে। মাথা পেতে নিলে কত অভিশাপ। চোখের সামনে মরতে দেখলে আত্মীয়বন্ধুকে, শেষে অতর্কিত ব্যাধশরে প্রাণ দিলে। আর এখন রামকৃষ্ণরূপে ভুগছ দুরারোগ্য ব্যাধিতে। কোন লজ্জায় বলব, আমি সুখ চাই, আমাকে সুখ দাও!

ঠাকুরের গা ঘেঁষে বসেছে দুর্গাচরণ। ওগো বসো বসো আমার গা ঘেঁষে। তোমার ঠাণ্ডা শরীর স্পর্শ করে আমার দগ্ধ শরীর শীতল হবে। দুর্গাচরণকে জড়িয়ে ধরলেন, ঠাকুর। বললেন, 'ডাক্তার-কবরেজরা সব হার মেনেছে। তুমি জানো কিছু ঝাড়ফুঁক? কিছু করতে পারো উপকার?'

মুহূর্তে একটা উদ্দাম চিন্তা খেলে গেল মনের মধ্যে। বিদ্যুৎঝলকের মত। মুহূর্তেই সঙ্কল্পে দৃঢ়ীভূত হল। বললে, 'পারি। আপনার কৃপায় সব পারি। আপনার কৃপায় রোগ সারাতে পারি আপনার।'

পারো?

অভিপ্রায় বুঝতে পারলেন ঠাকুর। দুর্গাচরণ নিজের শরীরে ঠাকুরের ব্যাধি টেনে নিতে চাইছে। সহসা তাকে দুই হাতে ঠেলে দিলেন জোর করে। বললেন, 'তা তুমি পারো, জানি, তুমি পারো রোগ সারাতে। কিন্তু সারিয়ে দরকার নেই। সরে যাও, সরে যাও এখান থেকে।'

প্রথম যখন দক্ষিণেশ্বরে আসে, আসে সুরেশ দত্তর সঙ্গে। শুধু নাম শুনেছে আর বেরিয়ে পড়েছে। কোথায় দক্ষিণেশ্বর? তাও জানে না। উত্তরে যাও। উত্তরে গেলেই উত্তর মিলবে। দেখবে সেখানেই বসে আছেন সুদক্ষিণ।

চলেছে পায়ে হেঁটে। চলেছে তো চলেইছে। শেষে একজনকে জিগগেস করলে।

দক্ষিণেশ্বর কোথায় বলতে পারেন ? সে কি মশাই ? দক্ষিণেশ্বর যে ছাড়িয়ে এসেছেন। দুপুর দুটোর সময় মন্দিরে এসে পৌঁছুলেন দুজন। কাউকে চিনি না, কোথায় থাকেন সেই ত্রিদশকুলেশ, কাকে জিগগেস করি ? একজন দাড়িওয়ালা লোকের সঙ্গে দেখা হল হঠাৎ। ইনিই বলতে পারবেন হয়তো।

'হ্যাঁ মশাই, এখানে একজন সাধু থাকেন ?'

দাড়িওলা লোক আর কেউ নয়, প্রতাপ হাজরা। বললে, 'হ্যাঁ, একজন আছেন বটে, কিন্তু আজ তো এখানে নেই।'

নেই ? বসে পড়ল দুজনে। কোথায় গিয়েছেন ?

'চন্দননগরে গিয়েছেন। কবে ফিরবেন কে জানে। তোমরা আরেকদিন এস।'

অবসন্ন পায়ে আবার ফিরে চলো কলকাতা। হৃতসর্বস্বের মতো ফিরে চলো। কিন্তু ওমা, ঐ দেখ ঘরের মধ্য থেকে দরজার ফাঁক দিয়ে হাত বানি দিয়ে কে ডাকছে। আর কে ! ঐ সেই অনন্তাত্মা মহোদধি। অমানীমানদ লোকস্বামী। প্রতাপ হাজরাকে উপেক্ষা করে সটান ঢুকল ঠাকুরের ঘরে। ছোট তক্তপোশটির উপর পা ছড়িয়ে বসে আছেন ঠাকুর।

বারো বছর ধরে ঠাকুরের ছায়ায় বাস করছে হাজরা, তবু চিনতে পারল না ঠাকুরকে। শুধু সাধারণ সত্য কথাটুকুও বলতে শিখল না। কি করে শিখবে, কি করে চিনবে তিনি যদি না কৃপা করেন ! তাঁর হাতেই ফুট-কম্পাস, চেন-দড়ি, তিনি না ছেড়ে দিলে মাপবে কি দিয়ে ?

হৃদয়ের সঙ্গে সেই একবার কালীঘাট গিয়েছিলেন ঠাকুর। দেখলেন পুবের পুকুর-পাড়ে কচুবনের মধ্যে কালী কুমারীবেশে আর কতগুলো কুমারীর সঙ্গে ফড়িং ধরার খেলা করছেন। দেখেই ঠাকুর মা-মা বলে ডেকে উঠলেন আর সমাধিস্থ হলেন। সমাধি-ভঙ্গের পর মন্দিরে এসে দেখলেন যে শাড়ি পরে কুমারীবেশে খেলা করছিলেন কালী ঠিক সেই শাড়ীখানিই মূর্তির গায়ে জড়ানো। ওরে হৃদে, একেই যে তখন দেখলুম ছুটোছুটি করছে—

সব শুনে হৃদয় ক্ষেপে উঠল। বললে, 'তখন বলোনি কেন ? ছুটে গিয়ে ধরে ফেলতুম মাকে।'

'তা কি হয় রে !' ঠাকুর বললেন, 'তিনি যদি কৃপা করে না ধরা দেন কে তাঁকে ধরে ! কে তাঁর দর্শন পায় !'

সুরেশ দত্ত প্রণাম করল করজোড়ে। কিন্তু দুর্গাচরণ আরো বেশি যায়। তার উর্জা ভক্তি। প্রসাদের সঙ্গে সে শালপাতার ঠোঙা পর্যন্ত খেয়ে ফেলে। ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে সে গেল ঠাকুরের পদধূলি নিতে। তুমি হলে জলন্ত আগুন, তোমাকে

কি পা ছুঁতে দিতে পারি ? ঠাকুর পা সরিয়ে নিলেন।

বললেন দুর্গাচরণকে, 'সংসারই তোমার পীঠস্থান। সংসারেই থাকবে। থাকবে পাঁকাল মাছের মতো। পাঁকের মধ্যে ডুবে আছে কিন্তু গায়ে পাঁকের স্পর্শলেশ নেই। তেমনি গৃহে থাকো কিন্তু তার ময়লা যেন না লাগে। থাকো জনকের মত। তোমাকে দেখে লোকে শিখুক কাকে বলে গৃহাশ্রমী।'

যে বিষয়ে যযাতি ভোগী সেই বিষয়েই জনক রাজর্ষি। যে অভিমানে দুর্যোধনের সর্বনাশ সেই অভিমানেই ধ্রুবের সত্যলোকে অধিষ্ঠান।

উপদেশ তো শুনলুম, মানব তা অক্ষরে-অক্ষরে, কিন্তু দুটি হাত ভরে যে পদস্পর্শ নিতে দিলে না এ দুঃখ আমি রাখব কোথায় ? অন্তরের নির্জনে বসে কাঁদতে লাগল দুর্গাচরণ। শুনেছি তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু, তুমি শুনবে না আমার এই বেদনার নিবেদন ? আমি আগুন নই, আমি জল, আমি গলিত-স্খলিত অমল প্রেমাশ্রু। একবারটি স্পর্শ করতে দাও তোমাকে। শীতাংশু সুধা-সমুদ্রের দুটি ঢেউ, তোমার দুটি পাদপদ্ম।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করত দুর্গাচরণ। একদিন দক্ষিণেশ্বরে চলে এসেছে একা-একা। তাকে দেখে ঠাকুর মহা খুশি। উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'তুমি ডাক্তারি করো, দেখ দেখি আমার পায়ে কি হয়েছে ?'

দুর্গাচরণ বসে পড়ল পায়ের কাছে। তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে লাগল পা দুখানি। স্পর্শ করা বারণ, চোখ দিয়েই পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। বললে কুণ্ঠিতের মত, 'কই, কোথাও তো দেখছি না কিছুই।'

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'ভালো করে দেখ না কি হয়েছে।'

এতক্ষণে বুঝল দুর্গাচরণ। পা দুখানি চেপে ধরল দুহাতে। মাথা লুটিয়ে দিল পায়ের উপর। অন্তর্যামী শুনেছেন অন্তরের ঈপ্সা। আগুনকে অশ্রু করেছেন। কিন্তু, প্রভু, আরো প্রার্থনা আছে। ইচ্ছে করে তোমার সেবা করি। বেশ তো, ঠাকুর তাকে নানা ফরমাশ খাটাতে লাগলেন। ওরে তামাক সেজে দে, গামছা আর বটুয়া নিয়ে আয়, গাড়ুতে জল ভর, নিয়ে চল ঝাউতলায়। দুর্গাচরণ এক পায়ে খাড়া। ডাকলেই হল বললেই হল, যেখান থেকে পারি যেমন করে পারি সম্পন্ন করে দেব। তুমি যদি বলো নিয়ে আসব অকালে আমলকী।

একদিন বললেন হাওয়া করতে। পাখাখানি তুলে দিলেন দুর্গাচরণের হাতে। বললেন, আমি একটু ঘুমুই।

জ্যৈষ্ঠ মাস, ফুটি-ফাটা মাঠে কাঠ-ফাটা রোদ। সমানে হাওয়া করছে দুর্গাচরণ। হাত ব্যথা করছে তবু ক্ষান্ত হচ্ছে না। পাখা বন্ধ করলেই যদি জেগে ওঠেন।

আমার অসামর্থ্যের জন্যে প্রভুর বিশ্রামের ব্যাঘাত হবে? কখনো না। হাত ভেরে উঠল, তবু ছাড়ছে না পাখা। হাত ছিঁড়ে পড়ছে যন্ত্রণায়, তবু না। ওকি, ঠাকুর যে নিজেই হাত ধরে পাখা বন্ধ করে দিলেন। তবে কি ঠাকুর ঘুমোননি? দুর্গাচরণ বলে, 'ঠাকুরের ঘুম সাধারণ নিদ্রাবস্থা নয়। তিনি সর্বদাই জেগে রয়েছেন। আর সকলে ঘুমোয় কিন্তু ভগবানের চোখে ঘুম নেই।'

একদিন বললেন তাকে ঠাকুর, 'ডাক্তার উকিল মোক্তার দালাল—এদের ঠিক-ঠিক ধর্মলাভ হওয়া কঠিন। এতটুকু ওষুধে যদি মন পড়ে থাকে তবে আর কি করে বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধারণা হবে?'

এখন তবে উপায়?

উপায় সহজ। দুর্গাচরণ ওষুধের বাক্স আর চিকিৎসার বই ফেলে দিল গঙ্গায়। দ্বিধার কুশাঙ্কুরটিও বিদ্ধ করল না।

দেশে ফিরেছে দুর্গাচরণ। উন্মনা, উদাসীন। বাপ দীনদয়াল অত্যন্ত রুষ্ট হয়েছেন। বললেন, 'ডাক্তারি যে ছেড়ে দিলি এখন করবি কি?'

'আমি কে করবার! যা হয় ভগবান করবেন।'

'তোর মুণ্ডু করবেন। বুঝতে আর আমার বাকি নেই।' দীনদয়াল বিরক্তিতে ঝাঁজিয়ে উঠলেন। 'এখন ন্যাংটা হয়ে চলবি আর ব্যাঙ ধরে খাবি।'

বাবার যখন তাই ইচ্ছে, তবে তাই হোক। পলকে পরনের কাপড় খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল দুর্গাচরণ। উঠোনের কোণে পড়ে ছিল একটা মরা ব্যাঙ, তাই তুলে এনে মুখে পুরলে। চিবোতে-চিবোতে বললে, 'আপনার হু আদেশই পালন করলাম। এখন কৃপা করে আমার একটি অনুরোধ রাখুন। সংসারের কথা আর ভাববেন না। এখন জপ করুন ইষ্টনাম।'

বাড়ির লাউগাছটির কাছে গরু বাঁধা। দড়িটা ছোট, তাই আকণ্ঠ চেষ্টা করেও গাছের নাগাল পাচ্ছে না গরু। ক্ষুধার্ত দুই চোখে লোলুপ কাতরতা। ও মা, খাবি, খেতে সাধ গিয়েছে? নে, খা, তৃপ্তি করে খা। দড়িটা খুলে দিল দুর্গাচরণ। মুহূর্তে গাছটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

'জিহ্বার সুখেচ্ছা হবে।' এই বলে নিজে মিষ্টি বা নুন খায় না দুর্গাচরণ। কিন্তু পরকে খাওয়ায় সাধ্যমত। সে গরুই হোক আর পাখিই হোক। অতিথিই হোক বা ভিখিরিই হোক। তুমি প্রীত হও, তৃপ্ত হও। ইষ্ট ছাড়া আমার আর কিছু মিষ্ট নেই। অশ্রু ছাড়া আমার আর নেই কিছু লবণাক্ত।

কলকাতার বাসার আদ্ধেকটায় কীর্তিবাস থাকে। চালের ব্যবসা করে। কুঁড়ো জমে থাকে তার আড়তে। তাই দুর্গাচরণ কুড়িয়ে নিয়ে এসে গঙ্গাজল মাখিয়ে

খায়। বলে, 'যা হোক কিছু খেয়ে জীবনধারণ করলেই হল, ভালো-মন্দ বিচারের প্রয়োজন কি? শুধু আহার আর তার আস্বাদ নিয়েই থাকব, তবে কখনই বা ডাকব ভগবানকে, আর কখনই বা তাঁর মনন করব? কুঁড়ো খেয়ে দিব্যি হালকা আছি।'

কাউকে হঠাৎ নিন্দা করে ফেলেছে বা কারু উপর রাগ দেখিয়েছে অমনি আত্মপীড়ন শুরু হয়ে গেল। আর নিন্দে করবি? রোষভাষ করবি? রাস্তা থেকে এক টুকরো পাথর কুড়িয়ে এনে ঘা মারতে লাগল কপালে। বল আর অবাধ্য হবি? মানবিনে শৃঙ্খলা? কপাল ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল। সে ঘা শুকোতে এক মাস। হবে না? একশোবার হবে। যে যেমন পাজি তার তেমনি শাস্তি হওয়া দরকার।

'অহং-শালাকে ঠেঙিয়ে-ঠেঙিয়ে তার মাথা ভেঙে দিয়েছেন নাগমশাই।' বলছে গিরিশ ঘোষ। বলছে, 'নরেনকে আর নাগমশাইকে বাঁধতে গিয়ে বড়ই বিপদে পড়েছেন মহামায়া। নরেনকে যত বাঁধেন সে ততই বড় হয়ে যায়, মায়ার দড়ি আর কুলোয় না। শেষে নরেন এত বড় হল যে মায়া হতাশ হয়ে ছেড়ে দিলেন। নাগমশাইকে যত বাঁধেন সে ততই সরু হয়। ক্রমে এত সরু হলেন যে মায়াজালের মধ্য দিয়ে গলে চলে গেলেন পালিয়ে। ধরতে পেলেন না মহামায়া।'

আমি ক্ষুদ্দুর, আমি শুদ্দুর—এই বুলিই নাগমশায়ের মুখে। তোমাদের মুখে ও কিসের কথা? বিষয়প্রসঙ্গ রাখো। রামকৃষ্ণের কথা কও। আর সব কথার ইতি আছে। ঈশ্বরকথার ইতি নেই।

॥ ১১৭ ॥

চ্যামনা সাপে ধরলে মরে না কিন্তু জাত-সাপে কামড়ালে এক ডাক, দু ডাক, তার পরেই মরণ! বললেন গিরিশ ঘোষকে।

তোর যা খুশি তাই কর। আমি যখন তোর ভার নিয়েছি তোর জন্মমরণের মরণ হয়ে গিয়েছে।

আমি দেখেছি মা-কালীর গা থেকে এক কৃষ্ণবর্ণ শিশুর উদ্ভব হল, হাতে সুধাভাণ্ড ও পানপাত্র। দেখেছি পান করতে-করতে দিব্যানন্দে বিভোর সেই শিশু। সেই শিশুই এই গিরিশ। ভৈরবের অংশে জন্ম তাই মদ্যপানে অনুরাগ।

কি দয়া! আমার এই অপরাধকে অপরাধ বলেই ধরলেন না। গিরিশ ভাবছে তদ্‌গত হয়ে। যে অপরাধে বাপ পর্যন্ত ত্যাজ্যপুত্তুর করে তাও তাঁর কাছে অকিঞ্চিৎ।

মঙ্গলমূলমূদ্রা শ্রীসুন্দরীর পূজারী আমি। তাঁর এক হাতে ভোগ আর এক হাতে

মোক্ষ। তেমনি আবার বামে বামা দক্ষিণে মদপাত্র, মুখে জপসাধন মস্তকে শ্রীনাথ। আর হৃদয়ে? আনন্দ হৃদয়াম্বুজে।

ঠাকুরের অসুখ। বসে আছেন বিছানার উপর। মেঝের উপর মাদুর পাতা। ভক্তেরা রাত জাগে পালা করে। ঠাকুরের প্রায় ঘুম নেই। পাহারাদার ভক্তেরাও বিনিদ্র।

লাটু আর মাস্টারের সঙ্গে গিরিশও চলে এল উপরে। মাদুরের উপর বসল।

ঘরের কোণের আলোটি গেল আড়াল হয়ে।

ওগো আলোটি কাছে আনো। আমি গিরিশকে একটু দেখি।

মাস্টার আলোটি কাছে এনে ধরল।

'ভালো আছ?' গিরিশকে জিগগেস করলেন ঠাকুর।

ভালো আছি কিনা জানি না কিন্তু তোমার এই দয়াভরা প্রশ্নটিতে ভালো হয়ে গেলাম সর্বাঙ্গে। তোমার করুণা সর্বসাধিনী।

'ওরে এঁকে তামাক খাওয়া। পান এনে দে। 'লাটুর প্রতি হুকুমজারি করলেন। লাটু পান-তামাক নিয়ে এল।

তাতে কি তৃপ্তি আছে?

কিছুক্ষণ পরে আবার উঠলেন চঞ্চল হয়ে, 'ওরে কিছু জলখাবার এনে দে।'

'পান-টান দিয়েছি।' লাটু বললে, 'দোকান থেকে আনতে গেছে জলখাবার।'

কে এক ভক্ত ক'গাছা ফুলের মালা নিয়ে এসেছে। গলায় পরলেন সেগুলো একে-একে। পরলেন, না, আর কাউকে পরালেন? আর কাউকে পরালুম। হৃদয়মধ্যে যে হরি আছেন তাঁকে পরালুম।

ছগাছি মালা তুলে নিলেন গলা থেকে। গিরিশকে বললেন, 'এগিয়ে এস।' গিরিশ এগিয়ে আসতেই তার গলায় উপহার দিলেন।

'ওরে জলখাবার কি এল?' আবার উঠলেন অস্থির হয়ে।

অসুখ, ঘুম নেই, এত যন্ত্রণার মধ্যেও এত মমতা! এত করুণা! মানুষ ভগবান নয় তো কে ভগবান!

সেইদিন তাই কথা হচ্ছিল বলরাম-মন্দিরে। ঠাকুর বললেন গিরিশকে, 'তুমি একবার নরেনের সঙ্গে বিচার করে দেখ, সে কি বলে।'

'দেখেছি। সে মানতে চায় না। বলে ঈশ্বর অনন্ত। যে অনন্ত তার আবার অংশ কি! তার অংশ হয় না।'

'হয়।' বললেন ঠাকুর, 'ঈশ্বর ইচ্ছে করলে তাঁর সারবস্তু পাঠাতে পারেন মানুষের মধ্য দিয়ে। শুধু পারেন না পাঠান। এ তোমাদের উপমা দিয়ে কি বোঝাব?

গরুর মধ্যে গরুর শিংটা যদি ছোঁও, গরুকেও ছোঁয়া হল। পা বা লেজ ছুঁলেও তাই। কিন্তু আমাদের পক্ষে গরুর সারবস্তু-হচ্ছে দুধ। বাঁট দিয়ে সেই দুধ আসে। অবতার হচ্ছে গাভীর বাঁট।' থামলেন ঠাকুর। আবার বললেন, 'তেমনি প্রেমভক্তি শেখাবার জন্যে মানুষের দেহ ধারণ করে মাঝে-মাঝে আসেন ঈশ্বর।'

পরশরতন শুনেছ এবার শোনো মানুষরতন। অবতারই হচ্ছে সেই মানুষরতন।

'নরেন বলে,' গিরিশ বললে, 'ঈশ্বরের ধারণা কে করতে পারে? তিনি অন্তহীন।'

'হোন। তাঁকে ধারণা করা কি দরকার? তাঁকে একবার দেখতে পারলেই হল। তাঁর অবতারকে দেখা মানেই তাঁকে দেখা। যদি কেউ গঙ্গার কাছে গিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে আসে, সে বলে গঙ্গা দর্শনস্পর্শন করে এলুম। সব গঙ্গাটা হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত হাত দিয়ে ছুঁতে হয় না। তোমার পা-টা যদি ছুঁই তোমাকেই ছোঁয়া হল। তাই নয়? আগুন সব জায়গায় আছে তবে কাঠে বেশি।'

'তাই যেখানে আগুন পাবো সেখানে আগুন পোয়াবো।' গিরিশ বললে তৃপ্ত মুখে।

'তেমনি ঈশ্বর যদি খোঁজো, মানুষে খুঁজবে—'

রূপে-রূপে রূপ মিশায়ে আপনি নিরাকার।

'মানুষেই তেমনি তাঁর বেশি প্রকাশ, বিশেষ প্রকাশ। যে মানুষে দেখবে প্রেমভক্তি উথলে পড়ছে, ঈশ্বরের জন্যে যে পাগল, তাঁর প্রেমে মাতোয়ারা, সেই মানুষে নিশ্চয় জেনো তিনি অবতীর্ণ। যিনি তারণ করেন তিনিই অবতার।'

'কিন্তু নরেন্দ্র বলে তিনি অবাঙ্‌মনসগোচর—'

'মনের গোচর নয় বটে কিন্তু শুদ্ধ মনের গোচর। বুদ্ধির গোচর নয় বটে শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর।' বললেন ঠাকুর, 'ঋষিমুনিরা কি তাঁকে দেখেননি? তাঁরা চৈতন্যের দ্বারা চৈতন্যের সাক্ষাৎকার করেছিলেন।'

'কিন্তু যাই বলুন, নরেন আমার কাছে তর্কে হেরে গেছে।'

হেরে গেছে? ঠাকুর চমকে উঠলেন। অবতার-তত্ত্ব মানে না, নরেনের হেরে যাওয়াই তো উচিত একশো বার তবু তাঁর নরেন হারবে এ যেন সহ্যের বাইরে। বললেন, 'না, হারেনি। আমায় এসে বললে গিরিশ ঘোষের মানুষকে অবতার বলে এত বিশ্বাস, তার আমি কি বলব! অমন বিশ্বাসের উপর কিছু বলতে নেই। তাই ছেড়ে দিল তর্ক।'

নরেন মানে না, তবু নরেনকে ভালোবাসেন। নরেন তর্কে হেরে যাবে এ অসহনীয় লাগে। আর, এ কেমনধারা তর্ক? যে তর্কে স্বয়ং ঠাকুরকে বাতিল করে দিচ্ছে।

আমি নস্যাৎ হই তো হব তবু নরেন জিতুক। আমাকে হারিয়ে ওর যে জিত সে তো আমারও জিত।

একদিন ও ঠিক বুঝবে। এমন অগাধ যার হৃদয় সে বুঝবে না? বুঝবে আমার অবতারতত্ত্বের মানে কি।

মানে হচ্ছে এই, সকলেই তাঁর অবতার, সকলেই তাঁর প্রতিচ্ছায়া। 'জীবে জীবে চেয়ে দেখ সবই যে তাঁর অবতার। তুই নতুন লীলা কি দেখাবি তাঁর নিত্যলীলা চমৎকার।' আমি নিয়ে এসেছি এই মহতী প্রতিশ্রুতি এই বৃহতী সম্ভাবনা। মানুষকে প্রমাণিত হতে হবে প্রকাশিত হয়ে। প্রকাশিত হবে সে কখন? যখন সে তার অন্তরের অমৃতময় অমিততেজ পুরুষকে উদ্‌ঘাটিত করতে পারবে, উন্মোচিত করতে পারবে। সেখানেই সে অবতার, ঈশ্বর সমান।

ঠিক বুঝবে একদিন নরেন। জীবকে শুধু জীবজ্ঞানে সেবা করবে না, জীবকে শিবজ্ঞানে পূজা করবে। সে পূজা ভালোবাসা! সে পূজা দুঃখমোচন, কলঙ্কমোচন। অপমানের অবহেলার উচ্ছেদ। সত্তাসীমার সম্প্রসার।

রাষ্ট্র হবে নতুন জীবনবেদ, নবতর সাম্যবাদ। শুধু পঙ্‌ক্তি সমান নয় পাত্র সমান। শুধু ভোগের বস্তু সমান নয়, ভোগ করার ক্ষমতাও সমান। শুধু—পরিবেশনে সমান নয় আস্বাদনেও সমান।

'ওরে এল জলখাবার?' আবার চঞ্চল হলেন ঠাকুর।

মাস্টার পাখা করছিলেন, বললেন, 'আনতে গেছে। এই এল বলে।'

কে না কে গিরিশ তাকে খাওয়াবার জন্যে ঠাকুরের এত ব্যাকুলতা—গিরিশ যেন এ করুণার পারাপার দেখছে না! বাঁধা-বরাদ্দ অনেক পেয়েছে সে, এ যে উপরি-পাওনা! উপরি-পাওনার শেষ নেই।

এসেছে খাবার। ফাগুর দোকানের গরম কচুরি, লুচি আর মিষ্টি। সেই বরানগরে ফাগুর দোকান।

ঠাকুর আগে প্রসাদ করে দিলেন। তারপর খাবারের থালা ধরে দিলেন গিরিশের হাতে। বললেন, 'বেশ কচুরি। খাও।'

ক্ষুধা কি দুহাতে খায়? তবু গিরিশের ইচ্ছে হল ঠাকুরকে খুশি করার জন্যে খায় সে গোগ্রাসে।

খাবার দিয়েছি, এবার জল দিতে হয়। ঐ তো আমার কুঁজো, ওখান থেকে গড়িয়ে দিলেই হবে। উঠে পড়লেন ঠাকুর। রুগ্ন, দুর্বল, পা টলছে, তবু এগিয়ে চললেন কুঁজোর দিকে। রুদ্ধ নিশ্বাসে চেয়ে রইল ভক্তেরা। গিরিশও স্তম্ভিত। বাধা দেবার কথা ওঠে না, সবাই দিব্যানন্দে বিনিশ্চল।

ঠিক জল গড়ালেন কুঁজো থেকে। বোশেখ মাস, গ্লাশ থেকে খানিকটা জল হাতে নিয়ে অনুভব করলেন যথেষ্ট ঠাণ্ডা কিনা। যতটা ভেবেছিলেন ততটা নয়। কিন্তু কি আর করা যায়! এর চেয়ে ঠাণ্ডা আর পাবেন কোথায়! অগত্যা তাই দিলেন এগিয়ে।

খাদ্য খেয়ে পেট ভরে, রসনার তৃপ্তি হয়। জল খেয়ে গলা ভেজে, বুক জুড়োয়। কিন্তু এ যে খর্চ্ছে গিরিশ এ কি খাদ্যপানীয়? কোন ক্ষুধা কোন তৃষ্ণার নিবারণ হচ্ছে কে জানে?

খেতে খেতে বললে গিরিশ, 'দেবেনবাবু সংসার ত্যাগ করবেন।'

ঠাকুর যেন খুশি হলেন না। কথা বলতে কষ্ট হয়, তাই আঙুল দিয়ে ওষ্ঠাধর স্পর্শ করে ইশারায় জিগেস করলেন, 'তার পরিবার-পরিজনের খাওয়া-দাওয়া হবে কি করে? চলবে কি করে সংসার?'

'তা জানি না।'

এ সেই দেবেন মজুমদার। বলে দিয়েছিলেন ঠাকুর, তোমার বাড়ি যাব একদিন। এই ধরো সামনের রবিবার। দেখো, তোমার আয় কম, বেশি লোকজন ডেকো না। আর, বাড়িও তোমার সেই কোথায়! গাড়িভাড়াও দুর্মূল্য।

দেবেন হাসল। বললে, 'হলই বা আয় কম, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ—'

কথা শুনে ঠাকুরের কি হাসি! যে করেই হোক আমার ঘি খাওয়া চাই। অন্যে ঠকুক আমি ঠকতে পারব না। খবর যখন পেয়েছি চেয়ে-চিন্তে চুরি করে আদায়-আস্বাদ করতেই হবে।

নিমু গোস্বামীর লেনে দেবেনের বাড়িতে এসেছেন ঠাকুর। বাড়ি পৌঁছেই বললেন, 'আমার জন্যে খাবার কিছু কোরো না, অতি সামান্য, শরীর তত ভালো নয়।'

কুল্‌পি-বরফ তৈরি করেছে দেবেন। তাই খেয়ে ঠাকুরের মহানন্দ। গান ধরেছেন ভাবোল্লাসে:

এসেছেন এক ভাবের ফকির—
ও সে হিন্দুর ঠাকুর, মুসলমানের পীর॥

সকলের সকল। একলার একলা। কারুর ভাব আমি নষ্ট করিনে। যে নষ্ট-ভ্রষ্ট তারও না। শুধু একটু বেঁকিয়ে দিই। শুধু যে পাপী তাকে বলি মায়ের সন্তান বলে নিজেকে ভাবতে। যেথা খুশি সেথা যাও যাহা খুশি তাহা করো, শুধু মাকে সঙ্গে নিয়ে যাও, মাকে সঙ্গে নিয়ে করো। যে মুহূর্তে মা তোমার সঙ্গে সে মুহূর্তে তুমি শুদ্ধ তোমার কর্ম শুদ্ধ তোমার চিন্তা শুদ্ধ। মা তোমাকে এমন জায়গায় নিয়ে

যাবে যা মঙ্গলের ক্ষেত্র, এমন কাজে প্রেরিত করবে যা সৌন্দর্যের কর্ম। পৃথিবীতে সর্বত্র মা-তে ওতপ্রোত হও। ভূ-তে থেকে মা-তে প্রসারণ, তারই নাম ভূমা।

'রামবাবু আপনার কথা লিখেছেন বইয়ে।' কে একজন বললে ঠাকুরকে।

'সে আবার কি!'

'পরমহংসের ভক্তি—এই নিয়ে।'

'তবে আর কি।' ঠাকুর বললেন সহাস্যে, 'এবার রামের খুব নাম হবে।'

গিরিশ টিপ্পনি কাটল। 'সে বলে সে আপনার চেলা।'

'আমার চেলাটেলা কেউ নেই।' ঠাকুর বললেন বিগলিত হয়ে, 'আমি রামের দাসানুদাস।'

আমি অণুর অণু, রেণুর রেণু। আমি তৃণের তৃণ, ধূলির ধূলি। 'আমি' খুঁজতে-খুঁজতে 'তুমি' এসে পড়ে। তুমি তুমি তুমি।

'খুব কুলপি খেয়েছি।' গাড়িতে উঠে বলছেন মাস্টারকে: 'তুমি নিয়ে যেও আরো গোটা চার-পাঁচ—' বালকের মত আনন্দ করছেন।

ঠাকুরকে গাড়িতে তুলে দিয়ে ফিরল দেবেন। দেখল উঠোনে তক্তপোশের উপর কে একটা লোক ঘুমিয়ে আছে। কাছে গিয়ে ঠাহর করে দেখল পাড়ারই বাসিন্দে। ওঠো, ওঠো, ডাকল তাকে দেবেন। লোকটি উঠে বসে চোখ মুছতে-মুছতে বললে, 'পরমহংসদেব কি এসেছেন?' সবাই হেসে উঠল। এসেছেন কি মশাই, এসে চলে গেছেন।

সর্বস্বান্তের মত তাকিয়ে রইল লোকটি। সেই কখন থেকে বসে আছে ঠাকুর দর্শনের আশায়। তখনো আসেননি, বসে থেকে-থেকে তাই একটু শুয়ে পড়েছিল, চৈত্র মাস, হাওয়া দিয়েছিল ঝির-ঝির করে। এখন জেগে উঠে দেখে চলে গেছেন সেই রাজকুমার।

মোহনিদ্রায় অস্ত গিয়েছে সে স্বর্ণলগ্ন। এখন কাঁদতে বসল অন্ধকারে। আমি ঘুমিয়ে পড়ি কিন্তু তোমার চোখে তো ঘুম নেই! তুমি আমাকে জাগালে না কেন? এবার তবে জাগাও, স্নিগ্ধ আলোকে না হোক, রুদ্র আলোকে। আনন্দে না হোক, হাহাকারে। আঁধার রাতের রাজা হয়েই তবে দেখা দাও। আমার ছিন্ন শয়ন ধূলায় টেনে তোমার জন্যে আঙিনা সাজাবো।

ঠাকুরের কেবল নরেন-নরেন। তাই নিয়ে অভিমান হয়েছে দেবেনের। সেবার স্টার থিয়েটারে বুষকেতু নাটক দেখবার শেষে জমায়েত হয়েছে সকলে। নরেন, গিরিশ, আরো অনেকে। কিন্তু দেবেন আসেনি।

'দেবেন আসেনি কেন?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'অভিমান করে আসেনি।' বললে গিরিশ। 'বলে, আমাদের ভিতর তো ক্ষীরের পোর নেই, কলায়ের পোর। আমরা এসে কি করব?'

জলখাবার দিয়েছে ঠাকুরকে, তাই থেকে আবার নরেনকে দিচ্ছেন।

যতীন দেব কাছে ছিল, ঠাট্টা করে উঠল। 'আমরা শালারা সব ভেসে এসেছি। শুধু নরেন খাও, নরেন খাও। আর কেউ জানে না খেতে।'

যতীনের থুতনি ধরে আদর করলেন ঠাকুর। বললেন, 'সেখানে, দক্ষিণেশ্বরে যাস। সেখানে গিয়ে খাস।'

অবস্থা প্রায় অচল দেবেনের। জমিদারি সেরেস্তায় দিনে যা কাজ করে তাতে কুলোয় না, তাই মিনার্ভা থিয়েটারে ক্যাশিয়ারির চাকরি নিলে। শুধু ক্যাশিয়ারি নয়, থিয়েটারের এটা-ওটা ফরমাশ খাটো। সময়ে-অসময়ে নটীদের ডেকে আনো তাদের বাড়ি থেকে। ক্রমে-ক্রমে, কাজলের ঘরে কাজ করতে গিয়ে গায়ে দাগ লেগে গেল। অনুতাপে পুড়তে লাগল দেবেন।

নাগমশাই হুঙ্কার দিয়ে উঠল: 'ভয় কি, গুরু আছেন সঙ্গে, ধুয়ে দেবেন।'

সেই কথাই বলছে দেবেন কৃতাঞ্জলি হয়ে। 'জীবনে হীন কাজ করলে ভগবানের পথ থেকে যে জন্মের মত বিচ্যুত হবে এমন কোনো বিধি নেই। কত জঘন্য কাজ যে করেছি তবু করুণাময় ঠাকুর আমাকে ত্যাগ করেননি।'

তাই তো বললেন বিবেকানন্দ, একটানা উন্নতি প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়। প্রত্যুত প্রতি পদস্খলনের পরে যে পুনরভ্যুত্থান তাই প্রকৃত মহত্ত্ব।

পুরোনো কথায় ফিরে এল গিরিশ। ঠাকুরকে লক্ষ্য করে বললে, 'আচ্ছা মশাই, কোনটা ঠিক? কষ্টে সংসার ছাড়া, না, সংসারের কষ্টে তাকে ডাকা?'

'যারা কষ্টের জন্যে সংসার ছাড়ে তারা হীন থাকের লোক। আমি তো সংসার ছাড়বার দলে নই। আমি লোকেদের বলি এ-ও করো ও-ও করো। সংসারও করো, ঈশ্বরকেও ডাক। সব ত্যাগ করতে বলি না। কেমন খাচ্ছ কচুরি?'

'ফাগুর দোকানের কচুরি। চমৎকার!' খেতে-খেতে একমুখ হাসল গিরিশ।

'হ্যাঁ, লুচি থাক, কচুরিই খাও। কচুরি রজোগুণের। কচুরিই খাও।'

খেতে-খেতে গিরিশ বললে, 'আচ্ছা মশাই, মনটা এই বেশ উঁচু আছে, আবার নিচু হয় কেন?'

'সংসারে থাকতে গেলেই ওরকম হয়। কখনো উঁচু, কখনো নিচু। কখনো ঈশ্বরচিন্তা হরিনাম করে, কখনো বা কামিনীকাঞ্চনে মন দিয়ে ফেলে। যেমন সাধারণ মাছি, কখনো সন্দেশে বসছে কখনো বা পচা ঘায়ে। কিন্তু মৌমাছি করে কি! মৌমাছি কেবল ফুলে বসে। ফুল ছাড়া আর কিছু তার খাবার নেই।'

দক্ষিণের ছোট ছাদটিতে হাত ধুতে গেল গিরিশ।

মনে পড়ল কতদিন বারাঙ্গনারা কাছে বসে খাইয়েছে। আজ ঠাকুর খাওয়ালেন।

'ওগো অনেকগুলি কচুরি খেয়েছে গিরিশ।' ব্যস্ত হয়ে মাস্টারকে বললেন, 'বলে দাও বাড়িতে আজ আর কিছু না খায়।'

শুধু সুখ দেখেন না কল্যাণ দেখেন। দয়াসারসিন্ধু। কারুণ্যকল্পদ্রুম। শুধু খাওয়ান না, হজমের খবর নেন।

হাত-মুখ ধুয়ে পান চিবুতে-চিবুতে গিরিশ আবার বসল ঠাকুরের কাছটিতে।

'ঐ যে বলেছি পাঁকাল মাছের মত থাকো—'

'রাখুন মশায়, অতশত বুঝি না। মনে করলে সব্বাইকে আপনি ভাল করে দিতে পারেন—কেন করবেন না?' গিরিশ রোক করে উঠল। 'মলয়ের হাওয়া বইলে সব কাঠ চন্দন হয়।'

'কে বললে হয়? সার না থাকলে হয় না চন্দন।'

'অত-শত বুঝি না মশাই—' আবার তম্বি করে উঠল গিরিশ।

'আইনেই ও রকম আছে।'

'আপনার সব বে-আইনি।'

'তবে হ্যাঁ, তেমন ভক্তি যদি হয় আইন নাকচ হয়ে যায়। ভক্তি-নদী ওথলালে ডাঙায় এক-বাঁশ জল।' বললেন ঠাকুর, 'ভক্তি যদি উন্মাদ হয়, বেদবিধি মানে না। দুর্বা তোলে তো বাছে না। যা হাতে আসে তাই নেয়। তুলসী ছেঁড়ে না পড়-পড় করে ডাল ভাঙে।'

আল-বাঁধ, দরজা-চৌকাঠ উঠে যায়। গণ্ডি-চৌহদ্দির চিহ্ন থাকে না।

সেই মধুরভাবিনী পাগলির কথা উঠল। ঠাকুরকে মধুরভাবে ভজনা করে। একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে কাঁদছে অঝোরে। কি হল, কাঁদছিস কেন? জিগগেস করলেন ঠাকুর। পাগলি বললে, মাথা ব্যথা করছে—

'সে পাগলি ধন্য।' গিরিশ হুঙ্কার দিয়ে উঠল: 'যে ভাবেই হোক আপনাকে অষ্টপ্রহর সে চিন্তা করছে। আর, মশায়, আমি? আপনাকে চিন্তা করে আমি কি ছিলাম কি হয়েছি—'

কী ছিলাম? অহঙ্কারী ছিলাম। দক্ষযজ্ঞে দক্ষের অভিনয় দেখে ঠাকুরই বলেছিলেন, দেখেছ, শালা যেন অংথারে মট-মট করছে। গয়াতে ব্রহ্মযোনি পাহাড়ে উঠতে গিয়েছি, পা পিছলে মরি আর কি। প্রাণভয়ে বলে ফেললাম, ভগবান রক্ষা করো। পরক্ষণেই বলে উঠলাম, থু থু! যদি কখনো প্রেমে ডাকতে পারি ভগবানকে, তবেই ডাকবো, ভয়ে নয়। তাই তো প্রেমের ঠাকুর নেমে এলে।

ডাকবার আগে নিজেই ডেকে নিলে।

অলস ছিলাম। এখন সে আলস্য সমর্পণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপরূপ প্রেমনির্ভর। পাপী ছিলাম। এখন কৃষ্ণ লোহা কাঞ্চনবর্ণ হয়ে উঠেছে। যা ছিল ঘৃণা তাই হয়েছে সুধা।

তুচ্ছকে আদর করিনি কোনোদিন। এখন অমানীমানদ হয়েছি। চারদিকে দেখতে পাচ্ছি এক মহারসের প্রকাশ। যা ছিল দণ্ডপলের, তাই এখন অখণ্ড কালের। দেখিনি এতদিন। আজ দেখতে পাচ্ছি। এই দেখতে পাওয়াটাই মুক্তি। সৃষ্টির মুক্তি নয়, দৃষ্টির মুক্তি। 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।'

॥ ১১৮ ॥

কিন্তু হাজরা একেবারে শুকনো কাঠ। অথচ দালালি জ্ঞান টনটনে!

ঠাকুরের দেশের লোক, বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। হঠাৎ কি খেয়াল হয়েছে, চলে এসেছে সংসার ছেড়ে। আমি ছাড়ব বললেই তো সে ছাড়ে না! তাই ঠাকুরের ঘরের পুবের বারান্দায় বসে মালা ফেরায় বটে কিন্তু মন পড়ে থাকে বাড়ি-ঘরে। হাজার টাকা দেনা, শোধ হবে কি করে? বাড়িতে সামান্য যে জমি তা দিয়ে স্ত্রী-পুত্রের পেট চলতে পারে কিন্তু নগদ টাকা জুটবে কোথায়? তাই মালা জপে আর মিটির-মিটির করে তাকায় যদি মিলে যায় কোনো শিষ্যচেলা। যদি ভক্তিভরে মুক্ত করে ঋণভার।

এক নম্বরের তার্কিক। ঠাকুর যত বলেন তর্জনগর্জনে হবে না, হাজরা তত তেড়ে-ফুঁড়ে ওঠে। বলে, 'আমাকে বলছ কি, তুমিও তো ধনীর ছেলে দেখে সুন্দর ছেলে দেখে ভাব করো, ভালোবাসো।'

নরেনের কথা বলছে বুঝি! নরেন আবার হাজরার 'ফেরেণ্ড'। ওরে নরেনের নুন দিয়ে ভাত খাবার পয়সা জোটে না। ওকে দেখলে জগৎ ভুল হয়ে যায়।

সবাইকে কেবল পাটোয়ারি বুদ্ধির মন্ত্র দেবে। সাধন করো তো সকাম সাধন। সব মেহনতের মজুরি আছে, আর সব চেয়ে যে কষ্টের কাজ—এই সব জপ-তপ আসন-শাসন—এর বেলায় ফক্কিকার! চলবে না এ ফাঁকিবাজি। রোদে পুড়তে-পুড়তে যেতে পারব না ফাঁকায়-ফাঁকায়।

মুখ ধনে নয় মনে। সে কথা কে শোনে!

কেবল অহঙ্কার! এত জপ করলাম। ঠায় বসে এত ডাকলাম রুদ্ধনিশ্বাসে। আমার হবে না তো হবে কার!

হবার মধ্যে, বেরিয়ে যেতে হল দক্ষিণেশ্বর থেকে। কথায়ই আছে, বড় বাড়লে ঝড়ে ভাঙে। কিন্তু বেরিয়ে যাবে কোথায়? আবার এদিকেই উসখুস।

'হাজরা এখন মানছে।' বললে নরেন। তোর অহঙ্কার হয়েছিল—'

'ও কথা বিশ্বাস করো না। দক্ষিণেশ্বরে কের আসবার জন্যে বলছে অমনি।'

'কি করে বুঝলেন?'

'সে আমি বেশ বুঝেছি।' হাসলেন ঠাকুর। ভক্তদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নরেনের মতে হাজরা খুব ভালো লোক।'

'একশোবার।' নরেন জোর দিয়ে বললে।

'কেন? এই যে এত সব শুনলি। দেখলি—'

'তা হোক গে। দোষ কি একেবারেই নেই? আছে, তবে অল্প। গুণই বেশি।'

ঠাকুরকে সায় দিতে হল। 'হ্যাঁ, নিষ্ঠা আছে বটে।'

তবে আর কি। যদি একটা কিছু থাকে, টেনে নাও। যদি অভিমুখী হয়, সাধ্য কি তুমি মুখ ফেরাও! আর কিছু না থাক নিয়তস্থিতি তো আছে। স্থিতি থেকেই প্রীতি আসবে একদিন।

আর কি করা! নরেন যখন বলেছে, হাত বাড়িয়ে টেনে নিতে হল হাজরাকে।

'হাজরা একটি কম নয়।' প্রাণকৃষ্ণকে বলছেন ঠাকুর। 'যদি এখানে বড় দরগা হয় তবে হাজরা ছোট দরগা।'

কিন্তু দোষের মধ্যে, পরনিন্দায় পঞ্চমুখ। আর বড্ড আচারী। তা ছাড়া একটু পেটুক।

নবতের কাছে দেখা। বললেন ঠাকুর, 'শোনো। বেশি নেয়ো না। আর শুচিবাই ছেড়ে দাও। আচার যতটুকু করবার ততটুকু করবে। বেশি বাড়াবাড়ি ভালো নয়।'

'আর?'

'কারু নিন্দা করো না, পোকাটিরও না।' অগাধ স্নেহস্বরে বললেন ঠাকুর, 'যেমন ভক্তি প্রার্থনা করবে তেমনি এও বলবে, যেন কারু নিন্দা না করি।'

নিন্দা করে আনন্দ, নিন্দা না করে আনন্দ। কোন আনন্দ বেশি? কোন আনন্দ অম্লান?

'কিন্তু প্রার্থনা করলে তিনি কি শুনবেন?'

'নির্ঘাত শুনবেন। যদি ডাকটি ঠিক হয়, আন্তরিক হয়। ও দেশে একজনের স্ত্রীর খুব অসুখ হয়েছিল। কে বললে, সারবে না। তাই শুনে লোকটা থরথর করে কাঁপতে লাগল। অজ্ঞান হয় আর কি! এমন কে হচ্ছে ঈশ্বরের জন্যে?'

কি আশ্চর্য, হাজরা হঠাৎ ঠাকুরের পায়ের ধুলো নিল।

'এ আবার কি!' অত্যন্ত কুণ্ঠিত হলেন ঠাকুর।

'যাঁর ছায়ায় আছি তাঁর পায়ের ধুলো নেব না?'

না, না, তুমি নেবে কেন? আমি নেব। তুমি শুধু ঈশ্বরকে তুষ্ট কর। শাখা-প্রশাখায় জল দিতে হয় না, মূলে জল দিলেই বৃক্ষ তুষ্ট হয়। তেমনি মূলে জল দাও।

দ্রৌপদীর হাঁড়ির শাক খেয়ে কৃষ্ণ যেই বললেন তৃপ্ত হয়েছি তখন আর সকলেও তৃপ্ত হল। হেউ-ঢেউ উঠল চারদিকে। তার আগে নয়। সুতরাং তাঁকে খুশি করো। তাঁর আনন্দেই আর-সকলে আনন্দিত। তাঁর সমর্থনেই আর-সকলের সমর্থন।

'তাই সংসারে যেতে জ্ঞানীর ভয় কি?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'মশাই, জ্ঞান হলে তো?' মহিমাচরণ টিপ্পনি কাটল।

ঠাকুর পরিহাস করে বললেন, 'হাজরার সবই হয়েছে, তবে একটু সংসারে মন আছে, এই যা। তা কি আর করা, ছেলেরা রয়েছে, জমি-টমি রয়েছে, ধার রয়েছে—উপায় কি!'

'তাহলে আর জ্ঞান হল কোথায়?' মহিমাচরণ আবার ফোড়ন দিল।

'না গো, তুমি জানো না।' সস্মিতমুখে ঠাকুর বললেন, 'সব্বাই হাজরার নাম করে। বলে রাসমণির ঠাকুরবাড়িতে হাজরা বলে যে আছে, সেই হচ্ছে একটা লোক। লোকের মত লোক।'

হাজরা মুখ খুলল। বললে, 'তা কেন? আপনি হচ্ছেন নিরুপম, আপনার উপমা নেই, তাই কেউ বুঝতে পারে না আপনাকে।'

'তবেই বুঝতে পারছ নিরুপমকে দিয়ে কোনো কাজ হয় না।'

'সে কি মশাই?' মহিমাচরণ গর্জে উঠল: 'হাজরা কি জানে? আপনি যেমনি বলবেন তেমনি শুনবে ও।'

'তা কেন? ওকে জিগগেস করে দেখ না! ও আমায় স্পষ্ট বলে দিয়েছে, তোমার সঙ্গে আমার লেনাদেনা নেই।'

'তাই নাকি? ভারি তার্কিক তো!'

'শুধু তাই নয়, আমায় আবার শিক্ষা দেয় মাঝে-মাঝে।'

সবাই হেসে উঠল। চুপ করে হাজরা বসে আছে এক কোণে।

'কেন দেব না? আমার কি কিছুই বক্তব্য নেই? থাকতে পারে না? বেশ তো, এস, তর্ক করি।'

কিন্তু তর্ক ঠাকুরের পোষায় না। তর্ক করতে গিয়ে, গালাগাল দিয়ে বসলেন হাজরাকে। তারপর শুতে গেলেন মশারির মধ্যে। শুয়ে কি শান্তি আছে? তর্কের ঝোঁকে কি কটু কথা বলেছেন, হয়তো মনে ব্যথা পেয়েছে হাজরা, সেই ভেবে অস্বস্তি।

তারপর আবার চলে এসেছেন মশারির বাইরে। বাইরে এসে হঠাৎ প্রণাম করে বসলেন হাজরাকে।

তোমাকে না মানি কিন্তু তোমার নিষ্ঠাকে প্রণাম। প্রণাম তোমার বাক্‌শক্তিকে। গালাগালিতেও যে তুমি অবিচলিত থাকো, প্রণাম তোমার সেই আঘাতবিজয়ী প্রতিজ্ঞাকে।

'শুয়েছি, আবার কি বলেছি মনে করে বেরিয়ে এসে হাজরাকে প্রণাম করে যাই—তবে হয়।'

কিন্তু এততেও হাজরার হল না। ছাড়তে পারল না দালালি। বৈধীভক্তির দেশাচার। কামনাকণ্টকিত ফলাকাঙ্ক্ষা। মায়ের কাছে বসেও মালা জপ করবে। এ কী হীনবুদ্ধি! যে এখানে আসবে তারই চৈতন্য হবে, একেবারে চৈতন্য হবে। তার আবার কিসের মালাজপ! তার শুধু রাগভক্তি। তার শুধু রঞ্জন-অঞ্জন।

গোলোকধাম খেলা হচ্ছে। মাস্টার, কিশোরী, লাটু আর হাজরা। চারজন খেলোয়াড়। হঠাৎ ঠাকুর এসে দাঁড়ালেন এক পাশে। কী ব্যাপার? কত দূর?

মাস্টার আর কিশোরীর ঘুঁটি উঠে গেল।

'ধন্য তোমরা দু ভাই।' উল্লাস করে উঠলেন ঠাকুর। শুধু তাই? নমস্কার করলেন দু ভাইকে।

কেন করব না? ওরা জয়ী হয়েছে। ওদের জয়ের মধ্যে যে ঈশ্বরের করুণা। কাকে না নমস্কার করেছেন।

পঞ্চবটীতে এক সাধু এসেছে। যেন মূর্তিমান দুর্বাসা। যাকে-তাকে গাল দেয়, শাপ দেয়, মারতে আসে। যখন-তখন, কারণে-অকারণে। ক্রোধে একেবারে নগ্ন-অগ্নি। 'হিঁয়া আগ মিলেগা?' হুঙ্কার দিয়ে উঠল সাধু।

হাত জোড় করে সাধুকে ঠাকুর নমস্কার করলেন। একবার নয় বহুবার। যতক্ষণ সাধু ছিল ততক্ষণই রইলেন করজোড়ে। নীরব বিনতিতে।

আগুন নিয়ে প্রসন্নমনে চলে গেল সাধু। কাউকে শাপমন্যি করলে না। তেড়ে এল না পায়ের খড়ম নিয়ে।

সাধু চলে গেলে ভবনাথ বললে হাসতে-হাসতে: 'আপনার সাধুর উপর কী ভক্তি!'

'ওরে তমোমুখ নারায়ণ। যাদের তমোগুণ তাদের এই রকম করে প্রসন্ন করতে হয়।' বললেন ঠাকুর, 'আর এ তো সাধু।'

খেলা দেখছেন ঠাকুর। ওরে, হাজরার কি হল আবার!

কী হল!

চেয়ে ছাখ, হাজরার ঘুঁটি আবার নরকে পড়েছে।

সকলে হেসে উঠল হো-হো করে।

লাটুর কী অবস্থা! সাত-চিৎ ঢেলেছে লাটু। এক ঢালে মুক্তি। এক লাফে উল্লম্ফন। সংসারঘর থেকে একেবারে ব্রহ্মলোক।

ধেই-ধেই করে নাচতে লাগল লাটু।

'এর একটা মানে আছে।' বললেন ঠাকুর, 'অহঙ্কারের উত্থান নেই, আর ঠিক লোকের সর্বত্র জয়। হাজরার বড় অহঙ্কার হয়েছিল তাই তার পতন আর লেটো হচ্ছে ঠিক লোক, তাই তার ঊর্ধ্বগতি। ঈশ্বরের এমনও আছে যে ঠিক লোকের কখনো কোথাও তিনি অপমান করেন না। সর্বত্র জিতিয়ে দেন।'

তবে কি হাজরা ঠিক লোক নয়?

নইলে তাকে রাখা গেল না কেন?

এমনিতে থাকত নিজের খেয়ালে কিছু এসে যেত না। উল্টে ঠাকুরের বিরুদ্ধতা করতে লাগল।

ঠাকুর তখন ভবতারিণীকে বললেন, 'মা, হাজরা যদি মেকি হয়, ওকে সরিয়ে দে এখান থেকে।'

কদিন পরে সরে গেল হাজরা। কিন্তু নরেন তাকে ছেড়ে দেবে না সহজে। বললে, 'কিন্তু, এক কথা। বলো, মৃত্যুকালে ওর ইষ্ট দর্শন হবে।'

ঠাকুর চোখ তুলে তাকালেন নরেনের দিকে।

বন্ধুর জন্য আবার অনুনয় করল নরেন। 'ও চলে যাচ্ছে যাক, কিন্তু এটুকু অভয় ওকে দিতে হবে। নইলে কি নিয়ে থাকবে ও? ও তাপে-লজ্জায় বিমর্ষ। ও কিছু বলতে পারছে না, আমি ওর হয়ে বলছি। বলো ইষ্টদর্শন হবে ওর মৃত্যুকালে। আর কিছু না থাক, নিষ্ঠা ছিল ওর, ও আর কিছু না পাক তোমারও প্রণাম পেয়েছে। বলো, সত্যি নয়? আর, তোমার প্রণাম যে পেয়েছে—বলো, হবে?'

ঠাকুর বললেন, 'হবে।'

প্রতাপ হাজরাকে আর পায় কে। অনুরক্ত করে না পাক, বিরক্ত করে আদায় করে নিয়েছে। এই তার অসীম প্রতাপ।

হৃদয়ের মত সেও ছেড়ে গেল দক্ষিণেশ্বর। কিন্তু তার তো তবু হবে শেষ সময়।

হৃদয়ের কি হবে না ? তার পক্ষে নরেনের মত মুরুব্বি নেই বলেই কি এই দীন দশা ? এত বলবান সেবা, এত সহিষ্ণু সান্নিধ্য, এত অকাতর শুশ্রূষা—এ কি ব্যর্থ হবে ? কিছুই কি ব্যর্থ হয় ?

॥ ১১৯ ॥

'মশাই, আপনার সঙ্গে কে দেখা করতে এসেছেন।' কে একজন লোক বললে এসে ঠাকুরকে।

'আমার সঙ্গে ?' ঠাকুর তো অবাক।

'হ্যাঁ, আপনারই নাম করলে।'

'কোথায় সে লোক ?'

'যদু মল্লিকের বাগানে এসেছেন। দাঁড়িয়ে আছেন ফটকের সামনে।'

এখানে নিয়ে এস, এ কথা বললেন না ঠাকুর। এতদূর যখন এসেছে তখন ফটক ডিঙিয়ে ভিতরে চলে আসতে দোষ কি, তাও বললেন না। যখন ফটকের সামনে এসেই থেমে পড়েছে তখন নিশ্চয়ই ভিতরে ঢুকতে কোনো বাধা আছে। নইলে এটুকু পথ আর আসবে না কেন ? যাই দেখি গে কে এল। হয়তো হৃদে এসেছে। ও বলেই ঢুকছে না এখানে।

পা চালিয়ে পুবমুখো চলে গেলেন ঠাকুর। যা ভেবেছিলেন। হৃদয়ই দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে করজোড়ে। রামসমীপে মহাবীরের মত।

ঠাকুরকে দেখেই পথের ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল। কাঁদতে লাগল অঝোরে। পরিত্যক্ত শিশুর মত।

ঠাকুর বললেন, 'ওঠ্। কাঁদিসনি। কান্নার কী হয়েছে !' বলছেন আর নিজে কাঁদছেন। যেন কান্নার কিছুই নেই এমনিভাবে নিজের চোখ মুছছেন গোপনে। যে যন্ত্রণা দিয়েছে, তারও জন্যে করুণা। যে বিরক্ত করেছে, তারও জন্যে অনুরাগ ! শুধু ভক্তের ডাকেই সাড়া দেন না, যে পরিত্যক্ত তারও ডাকে সাড়া দেন। ছুটে আসেন নিষেধের গণ্ডি পেরিয়ে। ধুলোর থেকে তুলে নেন হাত বাড়িয়ে।

'কিরে, এখন যে এলি ?'

'তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।'

তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসব তার কি সময়-অসময় আছে ? হৃদয় কাঁদছে তো কাঁদছেই। বললে, 'আমার দুঃখ আর কার কাছে বলব ?'

আমার আর কে আছে ? শত ফটক বন্ধ হয়ে গেলেও তুমি আছ আমার

ফটিকজল। মেয়াদহীন কয়েদখানার বাইরে মুক্ত প্রান্তরের ডাক। তোমাকে কে আটকাবে? আর সবাই ঠেলুক তুমি ঠেলতে পারবে না।

'তোর আবার কিসের দুঃখ?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'তোমার সঙ্গছাড়া হয়ে আছি। সে দুঃখের কি আর শেষ আছে?'

'বা, তখন যে বলে গেলি,' ঠাকুর মনে করিয়ে দিলেন, 'তোমার ভার নিয়ে তুমি থাকো, আমাকে থাকতে দাও আমার নিজের ভাবে।'

কান্নার একটা প্রবল ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিল হৃদয়কে। বললে, 'হ্যাঁ, তখন তো তা বলেছিলাম, কিন্তু আমি তার কি জানি! আমি তার কি বুঝি।'

'তাতে কি হয়েছে! এমনিতর দুঃখকষ্ট আছেই সংসারে।' ঠাকুর সান্ত্বনা দিলেন: 'সংসার করতে গেলেই আছে এমন সুখদুঃখ, এমন ওঠা-নামা। তাতে কি! এমনিতে কেমন আছিস? ধান-টান কেমন হয়েছে এবার?'

'মন্দ নয়।' একটা নিশ্বাস ছাড়ল হৃদয়।

'আজ এখন তবে আয়। আজ রোববার, অনেক লোকজন এসেছে, তারা বসে আছে সকলে।'

আমিও কি সকলের মধ্যে একলা নই? আমিও কি বসে নেই এক পাশে?

'শোন, আরেকদিন আসিস। তখন বসে কথা কইব তোর সঙ্গে।'

সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করল হৃদয়। চোখ মুছতে-মুছতে চলে গেল সমুখ দিয়ে।

দুর্দান্ত সেবাও যেমন করেছে, তেমনি যন্ত্রণাও দিয়েছে অফুরন্ত। ছেলেকে যেমন মানুষ করে তেমনি করে নেড়েছে-চেড়েছে ঘষেছে-মেজেছে ঠাকুরকে। রাত-দিন বেহুঁস হয়ে থাকতেন, নিষ্পলক চোখে পাহারা দিয়েছে। আজ সবাই তোমরা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছ, হৃদয় থাকলে পায়ে হাত দেয় কার সাধ্যি? অসুখে দুখানা হাড় হয়ে গেছি, কিছু খেতে পারি না, আমাকে দেখিয়ে-দেখিয়ে খাচ্ছে হৃদয়, যদি খেতে আমার রুচি আসে। বলছে, এই দেখ না আমি কেমন খাই। তুমি শুধু তোমার মনের গুণে খেতে পাচ্ছ না। কাটিয়ে ফেল মনের গুণ। কত করেছে আমার জন্যে। গঙ্গায় নেমে তুলে এনেছে এই ডুবন্ত দেহকে। ফুলুই শ্যামবাজারে কীর্তনের সময় ভিড়ে আমার সর্দি-গর্মি হয়, সেই ভয়ে খোলা মাঠে টেনে নিয়ে গেছে। বেলঘরে নিয়ে গেছে কেশবের কাছে। কলকাতায় নিয়ে গিয়ে লাটসাহেবের বাড়ি দেখিয়েছে।

তেমনি যন্ত্রণা দিতেও কসুর করেনি। ভেবেছিল ওর 'আণ্ডারে' আছি, যা করাবে তাই করব। বললে, মা'র কাছে ক্ষমতা চাও, ব্যামোর ওষুধ চাও। নইলে আবার

মা কি। ওর পরামর্শ শুনতে গিয়ে ঘা খেলুম। শম্ভু মল্লিকের কাছে টাকা চায়, যদি পারে হাতিয়ে নেয় লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারীর সেই থলেটা। দশ হাজারের থলে। কেবল বিত্তবেসাত জমি-গরুর দিকে লালসা। সিদ্ধাই-সিদ্ধাই করে আস্ফালন। জ্বালিয়ে মেরেছে। এমন জ্বলুনি, পোস্তার উপর থেকে জোয়ারের জলে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলুম।

তাই জন্যে, সেই হৃদয়ের জন্যেই, কাঁদছেন ঠাকুর। যে কাঁদায়, কি আশ্চর্য, তারই জন্যে আবার কাঁদেন। যে বিতাড়িত, তারই জন্যে আবার ছুটে আসেন ব্যগ্র হয়ে। যে অযোগ্য, অকর্মণ্য, তারও জন্যে রেখে দেন আশ্বাসের আতপত্র।

এঁটে ধরে থাক, কিছুতেই ছাড়িসনে, সাধ্য কি তোকে ফেলে রাখে জলের পাশে। পালিয়ে সে কোথায় যাবে, তুই যে তার পা নিয়ে বসে আছিস। ঐ ছাখ সে হেসে উঠেছে অন্ধকারে, নিবিড় বনের অন্তরালে ঐ ছাখ জেগে উঠেছে শুকতারা। সামান্য যাত্রাদলের ছোকরা, তার সঙ্গেও ঈশ্বরকথা।

দক্ষিণেশ্বরের নাটমন্দিরে যাত্রা হচ্ছে। পালা বিদ্যাসুন্দর। শেষরাত্রি থেকে শুরু হয়েছে, সকালেও শেষ হয়নি। মন্দিরে মাকে দেখতে এসে ঠাকুর একটু শুনেছেন কান পেতে। যাত্রাশেষে ঠাকুরের ঘরে এসেছে অভিনেতারা।

যে ছোকরা বিদ্যা সেজেছিল তার অভিনয়ে ঠাকুর খুব খুশি। বললেন, 'বেশ করেছ তুমি। শোনো, যদি কেউ গাইতে বাজাতে নাচতে পটু হয়, যে কোনো একটা বিদ্যাতে যদি তার দক্ষতা থাকে, তাহলে চেষ্টা করলে সহজেই সে ঈশ্বরলাভ করতে পারে।'

আমিও তো ভালো ম্যাকটিং করতে পারি। চমকে উঠল ছোকরা। আমার পক্ষেও সম্ভব ঈশ্বর লাভ?

তা ছাড়া আবার কি। কত অভ্যাস করেই না তবে গাইতে-বাজাতে শিখেছ। কত লাফঝাঁপ করেই না রপ্ত করেছ নাচ। সেই অভ্যাসযোগেই লাভ হবে ঈশ্বর।

'আজ্ঞে, কাম আর কামনায় তফাত কি?' জিগগেস করল ছোকরা।

তুচ্ছ লোকের আবার তত্ত্বজিজ্ঞাসা, এই বলে উড়িয়ে দিলেন না ঠাকুর। বললেন, 'কাম যেন গাছের মূল আর কামনা তার ডালপালা। যদি কামনা করতেই হয়, ঈশ্বরে ভক্তি-কামনা করো। যদি মত্ততা করতেই হয় আমি ঈশ্বরের সন্তান এইভাবে মত্ত হও।'

তাকালেন ছোকরার দিকে। শুধোলেন, 'তোমার বিয়ে হয়েছে?'

ছোকরা ঘাড় কাত করল।

'ছেলেপুলে?'

'আজ্ঞে একটি কন্যা গত। আরেকটি হয়েছে।'

'এর মধ্যে হলো-গেলো? এই তোমার কম বয়স! বলে, সাঁজসকালে ভাতার মলো, কাঁদব কত রাত!'

সবাই হেসে উঠল।

'সংসারে সুখ তো দেখলে।' ঠাকুর আবার তাকালেন ছোকরার দিকে। 'যেমন আমড়া, কেবল আঁটি আর চামড়া।'

'কিন্তু সংসার ছাড়ব কি করে?'

'না, না, ছাড়বে কেন? সংসার করবে কিন্তু মন রাখবে ঈশ্বরের দিকে। সেই যে ছুতোরের মেয়ে চাল এলে দেয় অথচ সর্বক্ষণ হুঁস রাখে ঢেঁকির মুষল যেন হাতে না পড়ে—তেমনি। ছেলেকে মাই দিচ্ছে, খদ্দেরের সঙ্গে কথা কইছে, এক ফাঁকে এক হাতে খোলায় ভেজে নিচ্ছে ভিজে ধান—'

'মনে রাখব আপনার কথাগুলো।'

'মাঝে-মাঝে এখানে এসো। রবিবার কিংবা অন্য ছুটিতে—'

'আজ্ঞে আমাদের তিন মাস রবিবার। শ্রাবণ, ভাদ্র আর পৌষ। বর্ষা আর ধান কাটবার সময়। আপনার কাছে আসব সে আমাদের ভাগ্য।'

'হ্যাঁ, সবাই মিল হয়ে থাকবে। মিল থাকলেই দেখতে-শুনতে ভালো। চারজন গান গাইছে, কিন্তু প্রত্যেকে যদি ভিন্ন সুর ধরে যাত্রা ভেঙে যায়।'

সবাই মিলে এক সুর ধরো। এক তরীতে ভাসো। একাকার হয়ে যাও।

যাত্রা থেকেই যাত্রা করো।

বললেন ঠাকুর, 'তোমাদের মধ্যে যারা কেবল মেয়ে সাজে তাদের মেয়েলি ভাব হয়ে যায়। তাই না? তেমনি যারা রাতদিন ঈশ্বরচিন্তা করে তাদের মধ্যে ঈশ্বর-সত্তার রঙ ধরে। মন ধোপাঘরের কাপড়, তাকে যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যাবে।'

আমি কেন বিদ্যাসুন্দর শুনলাম? এর মানে কি? দেখলাম, তাল মান গান নিখুঁত। তারপর মা দেখিয়ে দিলেন, নারায়ণই যাত্রাওয়ালাদের রূপ ধরে যাত্রা করছেন।

এই ঠাকুরের অবতারবাদ। সকলেই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব। ঈশ্বরের প্রতিধ্বনি। এই ঠাকুরের আত্মদর্শন। সমস্ত মন ঈশ্বরকে না দিলে ঈশ্বরের দর্শন হয় না। তেমনি সমস্ত জনে তাঁকে না দেখলেও হয় না দর্শন। মনে-জনে দেখাই ঠিক দেখা।

যে মা-মন্ত্র দেবে তাকে মায়ের জন্যে কাঁদতে হবে। শুধু বিশ্বের মায়ের জন্যে নয়, ঘরের মায়ের জন্যে। শুধু ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরীর জন্যে নয়, সামান্য গর্ভধারিণীর জন্যে। জগৎ ছাড়লেও যাকে ছাড়া যাবে না। সন্ন্যাসী হয়েও যাকে আঁকড়ে থাকতে হবে জপমালার মত। পঞ্চবায়ু, পঞ্চকোষের মত। শুধু তাই নয় নিজেকেও মা হয়ে দেখাতে হবে মাঝে-মাঝে। আরো কঠিন কথা, মা-মন্ত্রের দিতে হবে একটি পর্যাপ্ত মূর্তি, একটি শরীরী তর্জমা, একটি শাশ্বতী প্রতিলিপি।

সব পুরোপুরি করে গিয়েছেন ঠাকুর। তাই তো তাঁর মন্ত্র এত প্রাণময়। তার শক্তি এত উজ্জীবনী। তার অর্থ এত গভীরগ।

ঈশ্বরের চেয়েও মায়ের, চন্দ্রমণির মুখখানি বেশি সুন্দর দেখেছেন। মায়ের মুখখানি মনে পড়তেই ছুঁড়ে দিলেন গঙ্গামণীর হাত, ছেড়ে এলেন বৃন্দাবন। কিসের শ্রীমতীর সাধন শ্রীমতী মাতার কাছে! 'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান—' একেবারে নাড়ী ধরে টান মারে। মা মরে যাবার পর এমন কান্না কাঁদলেন, নির্বিকল্প সন্ন্যাসেও কুলোল না। এমন মা। এমনই মহীয়সী জীবিতাশা! তারপর নিজে রূপ ধরে দেখালেন মা কেমন। চুল এলিয়ে বুকভরা স্নেহক্ষীর নিয়ে কোল পেতে বসলেন মাটির উপর। রাখাল দেখল মা বসে আছে। সোজাসুজি কোলের উপর গিয়ে বসল, দুধের ছেলের মত পান করতে লাগল মা'র স্তন্যসুধা। এই তো না-হয় হল যারা স্বগণ-স্বজন তাদের জন্যে, কিন্তু আর সকলের কী হবে, তাদের মা কোথায়? শুধু মন্ত্রে, মুখের কথায় কি সাধ মেটে, না, বুক ভরে? আমাদের একটি মূর্তি চাই, প্রতিমা চাই। প্রমিতা, প্রস্ফুটা প্রতিমা। মন্ত্রের উজ্জ্বল উচ্চারণ। ঘনীভূতা নিয়তস্থিতি।

ঠিক কথা। এই দেখ সেই মন্ত্রের মূর্তি, সান্দ্রীভূতা স্মিতজ্যোৎস্না। বলে প্রতিষ্ঠা করলেন সারদামণিকে। চেয়ে দেখ এই মূর্তির দিকে, একে মা বলে ডাকতে ইচ্ছে করে কিনা এবং ডাকবার সঙ্গে-সঙ্গে মনে এই আশ্বাস আসে কিনা যে সাড়া পাব! দুর্গাদুর্গতিহরা জন্মজলধিতারিণী মা। শঙ্খেন্দুকুন্দোজ্জ্বলা সুশুভ্রা। ভবভয়প্রাবিণী দীনবৎসলা।

রাখালের মত তারকও এসে দেখল ঠাকুর নয়, মা বসে আছেন। কোথায় পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করবে তা নয়, লাজুক শিশুর মত ঠাকুরের কোলের মধ্যে মাথা গুঁজে দিল। কি রে, আমি কে? অমন করলি কেন?

তুমি ? তুমি আমার মা। তোমার চাহনিতে সেই নিমন্ত্রণ।

'হ্যাঁ রে, তোকে আগে কোথায় দেখেছি ?'

আমি দেখেছিলাম একদিন রামবাবুর বাড়িতে। সিমলেতে তাঁর বাড়ির কাছেই আমার বাসা। গিয়ে দেখি একঘর লোক, বাইরেও উদ্বেল জনতা। কি যেন দেখতে কি যেন শুনতে সবাই উন্মুখ-উৎসুক। ভিড় ঠেলে গেলাম এগিয়ে। গিয়ে দেখলাম আপনাকে। আহা কি মনোহর দর্শন। অমৃতমহোদধি বসে আছেন শান্ত হয়ে। ভাবারূঢ় অবস্থায়। কন্দর্পকোটিসৌন্দর্য। জগৎগুরুর্জগন্নাথ। আড়ষ্ট ভাবজড়িত স্বরে বলছেন, আমি কোথায় ? কে একজন বললে, রামের বাড়িতে। কোন রাম ? ডাক্তার রাম। তখন ফিরে পেলেন সম্বিৎ।

বলতে লাগলেন সমাধির কথা। কাকে বলে সমাধি ? সমাধি কয় রকম ? কিসে কেমন অনুভূতি।

সে এক অপূর্ব বর্ণনা।

সমাধি পাঁচ রকম। পিপীলিকা, মৎস্য, কপি, পক্ষী আর তির্যক। কখনো বায়ু ওঠে পিঁপড়ের মত শিরশির করে। কখনো ভাবসমুদ্রে আত্মা মাছের মতো খেলা করে। আনন্দে সাঁতার কাটে। কখনো বা পাশ ফিরে রয়েছি, মহাবায়ু পাশ থেকে ঠেলতে থাকে, আমোদ করতে চায়। আমি চুপ করে থাকি, টুঁ শব্দও করি না। কিন্তু নিঃসাড় হয়ে কাঁহাতক থাকা যায় ? বানরের মত লম্বা লাফ দিয়ে মহাবায়ু উঠে যায় সহস্রারে। তাই তো, দেখ না, মাঝে-মাঝে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠি। তারপর আবার পাখি হয় মহাবায়ু। এ ডাল থেকে ও ডাল, ও ডাল থেকে এ ডালে উড়তে থাকে। যেখানটায় বসে সেখানে যেন আগুন জ্বলে। মূলাধার থেকে স্বাধিষ্ঠান, স্বাধিষ্ঠান থেকে হৃদয় এমনি উড়ে-উড়ে বেড়ায়। শেষে এসে মাথায় আশ্রয় নেয়। তির্যকও প্রায় তাই। লাফিয়ে-লাফিয়ে চলে না, এঁকে-বেঁকে চলে। তারও শেষ লক্ষ্য ঐ মাথা। ঐ কুলকুণ্ডলিনী। মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী। ঐ কুলকুণ্ডলিনী জাগলেই শেষ সমাধি।

আমরা কি অত সব পারব ? মহাবায়ুর সঙ্গে কি আমাদের মহাসাক্ষাৎকার হবে ? নিয়ে যাবে সেই প্রস্ফুটিত শতদলের মর্মকোষে ?

কেন হবে না ? শুধু পুঁথি পড়লেই হবে না। শুধু শুকনো চর্বিতচর্বণে হবে না। তাঁকে ডাকলে হবে। তাঁর জন্যে কাঁদলে হবে। তাঁকে ভালোবেসে তাঁর জন্যে ব্যাকুল হলে হবে।

কান্না কখনো পুরোনো হয় না। এক কান্নার সঙ্গে মেলে না ওর কান্না। প্রত্যেকটি কান্না মৌলিক। নিত্যনতুন।

বিষয়চিন্তাই মনকে দেয় না সমাধিস্থ হতে। আবার বলতে লাগলেন ঠাকুর, সূর্য উঠলে পদ্ম ফোটে। কিন্তু মেঘে যদি সূর্য ঢাকা পড়ে তা হলে আর পদ্ম তার দল মেলে না। তেমনি বিষয়মেঘে জ্ঞানসূর্য ঢাকা পড়লে ফোটে না আর ভক্তিকমল।

আরেকরকম সমাধি আছে। যাকে বলে উন্মনা-সমাধি। ছড়ানো মন হঠাৎ কুড়িয়ে আনা।

এ কি যে-সে কথা? মানুষের মন সরষের পুঁটলি। পুঁটলি খুলে সরষে ছড়িয়ে পড়লে ওদের কুড়িয়ে এনে ফের পুঁটলি বাঁধা কি সোজা কথা? একটু মন হয়তো গুটিয়ে এনেছে অমনি কোত্থেকে বিষয়চিন্তা এসে উদয় হল, দিল সব ছত্রখান করে।

সেই নেউলের গল্প জানো না? ন্যাজে ইট-বাঁধা নেউল? দেয়ালের গর্তে, তার নিভৃত সমাধির কোঠরে আছে দিব্যি আরামে, ঐ ইটের টানে বারে-বারে বেরিয়ে পড়ে গর্ত থেকে। যতবারই গর্তের মধ্যে স্বস্থানে বসতে যায় আরামে, ইটের জোরে ততবারই এসে পড়ে বাইরে। বিষয়চিন্তাও অমনি। যতই মন ঈশ্বরের পাশটিতে এসে বসতে চায় ততই বিষয়চিন্তা টেনে বের করে দেয়। ঘটায় যোগভ্রংশ।

উন্মনা-সমাধি কেমন জানো? সেই থিয়েটারের ড্রপ উঠে যাওয়া। দর্শকেরা পরস্পরের সঙ্গে গল্প করছে, হাসি-ঠাট্টা করছে, অমনি থিয়েটারের পর্দা উঠে গেল। তখন সকলের মন সহসা অভিনিবিষ্ট হল অভিনয়ে। আর নেই তখন বাহ্যদৃষ্টি, বাহ্যচেতনা। যেন উঠে পড়ল মায়ার পর্দা। জেগে উঠল যোগচক্ষু। আবার খানিকক্ষণ পর যখন নেমে এল মায়ার পর্দা, মন আবার বহির্মুখ হয়ে গেল। আবার শুরু হল গালগল্প, বিষয়কথা। যে-কে-সে!

তাই বা মন্দ কি। সংসারী লোকের পক্ষে যত বেশি উন্মনা হওয়া যায়! যত বেশি ঘরে থেকে নিজেকে অনুভব করা যায় বনবাসীর মত!

উন্মনা হতে-হতেই স্থির-সমাধি হয়ে যাবে। একেবারে বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ হলেই স্থিত-সমাধি। সর্বক্ষণই বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

রাম-লক্ষ্মণ পম্পাসরোবরে গিয়েছেন। লক্ষ্মণ দেখলেন, জলের ধারে বসে আছে একটা কাক। পিপাসার্ত তবু খাচ্ছে না জল। কেন, কি হল? রামকে জিগগেস করলেন লক্ষ্মণ। রাম বললেন, ভাই, এ কাক পরমভক্ত। অহর্নিশ রামনাম করছে। ভাবছে জল খেতে গেলে পাছে রামনাম জপ বন্ধ হয়ে যায় তাই ঠোঁট দিয়ে জল-স্পর্শ করছে না।

নামসুধাই হরণ করেছে তার দেহপিপাসা।

সংসারীলোকের সেই একমাত্র উপায়—নামজীবিকা। হরিনামকৃতা মালা পবিত্রা পাপনাশিনী।

শুধু তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকো। তাঁর নাম করো। তাতেই জাগবে কুলকুণ্ডলিনী। জাগো মা কুলকুণ্ডলিনী, তুমি নিত্যানন্দস্বরূপিণী, প্রসুপ্ত ভুজগাকারা আধার-পদ্মবাসিনী। ঐ কুণ্ডলায়িত সাপ ফণা না তুললে কিছুই হবে না। ও জাগলেই চৈতন্য, ও জাগলেই ঈশ্বরদর্শন।

ন্যাংটা বলতো গভীর রাত্রে অনাহত শব্দ শোনা যায়। এই শব্দ আবার শোনবার জন্যে তপস্যা। ওই প্রণবের ধ্বনি। ঐ ধ্বনি উঠছে ক্ষীরোদশায়ী পরব্রহ্ম থেকে, প্রতিধ্বনি জাগছে নাভিমূলে। অনাহত শব্দ ধরে এগুলেই পৌঁছানো যায় ব্রহ্মের কাছে, যেমন কল্লোল শুনে পৌঁছানো যায় সমুদ্রে। কিন্তু যতক্ষণ দেহের মধ্যে আমি-আমি রব উঠছে ততক্ষণ শোনা যাবে না সেই শব্দ, দেখা যাবে না সেই শেষশায়ীকে।

মুগ্ধের মত শুনছিল সব তারক আর ভাবছিল এমন ভাগ্য কি হবে যে এই মহাসমাধিস্থ মহাপুরুষের কৃপা আমি পাব?

শুধু কৃপা নয়, কোল দেব তোকে।

রামবাবু বললেন কাঁধে হাত রেখে, 'এখানে খেয়ে যাবেন চারটি।'

'বাড়িতে বলে আসিনি।'

'তাতে কি?' উড়িয়ে দিলেন রামবাবু।

একটা অতি তুচ্ছ কথা কিছু নয়। সত্যের ছোট-বড় নেই, তুচ্ছ-উচ্চ নেই, সত্য সব সময়েই সত্য, সর্বাবস্থায় জগৎপ্রদীপ সূর্যের মতো বৃহত্তেজা।

খুঁজতে-খুঁজতে চলে এসেছে দক্ষিণেশ্বর। দক্ষিণেশ্বরে তারকের এক বন্ধুর বাড়ি, সেই তাকে নিয়ে যাবে পথ দেখিয়ে। বড়বাজার থেকে চলতি নৌকোয় চলে এসেছে শনিবার, আফিসের ছুটির পর। বন্ধুর বাড়ি হয়ে ঠাকুরের কাছে পৌঁছুতে-পৌঁছুতে প্রায় সন্ধ্যে।

প্রথমেই টেনে নিলেন কোলে। দুঃখদারিদ্র্যনাশিনী সর্ববান্ধবরূপিণী মায়ের মতো। আরতির কাঁসরঘণ্টা বেজে উঠল।

ঠাকুর জিগগেস করলেন তারককে, 'তুমি সাকার মানো না নিরাকার?'

'নিরাকারই আমার ভালো লাগে।'

'না রে, শক্তিও মানতে হয়।' বলে ঠাকুর উঠলেন। টলতে-টলতে এগুতে লাগলেন কালীমন্দিরের দিকে। কেন কে বলবে তারকও তাঁর পিছু-পিছু চলতে লাগল।

প্রতিমা প্রস্তর ছাড়া কিছু নয়, ব্রাহ্মসমাজে ঘুরে-ঘুরে এই শিক্ষাই পেয়েছিল তারক। অথচ, কি আশ্চর্য, এই পাষাণাকারা প্রতিমার কাছে ভাববিভোর হয়ে প্রণাম করছেন ঠাকুর। শুধু শুকনো মাথা নোয়ানো নয়, হৃদয়কে জল করে প্রতিমার পায়ের উপর নিঃশেষে ঢেলে দেওয়া।

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল তারক।

সহসা কে যেন বলে উঠল তার মর্মের কানে-কানে: 'অত গোঁড়ামি কেন? এত সঙ্কীর্ণতা কিসের? ব্রহ্ম তো ভূমা, সর্বব্যাপী। তাই যদি হয় এই প্রতিমার মধ্যেও তিনি আছেন। সেই বিভুকে প্রস্তরমূর্তিতে প্রণাম করতে দোষ কি?'

মাথা নত হয়ে এল তারকের।

নীলঘনশ্যামা ভবতারিণীর সামনে সে রাখল তার প্রণিপাত।

ঠাকুর বললেন, 'আজ রাত্রে এখানেই থেকে যাও না।'

কত বড় প্রলোভনের কথা। কিন্তু তারক বললে সহজ সুরে, 'বন্ধুর সঙ্গে এসেছি। উঠেছি তার ওখানে। কথা দিয়ে এসেছি ওখানেই থাকব রাত্রে।'

'কথা দিয়ে এসেছ?' ঠাকুর উল্লসিত হয়ে উঠলেন, 'এর উপরে আর কথা নেই। ঐ সামান্য একটু কথা রাখাই হচ্ছে তপস্যা। সত্য কথার মত বড় তপস্যা আর নেই কলিতে।'

সব মাকে দিয়েছিলুম কিন্তু সত্য দিতে পারলুম না।

মাড়োয়ারী ভক্তরা আসে ঠাকুরের কাছে। থালি হাতে নয়, নানারকম ফল-মিষ্টান্ন নিয়ে। থালা সাজিয়ে। গোলাপজলের গন্ধ ছিটিয়ে। আমি ওসব কিছু নিতে পারি না। বলছেন ঠাকুর। ওদের অনেক মিথ্যা কথা কয়ে টাকা রোজগার করতে হয়। গোলাপজলের গন্ধে কি সেই অপলাপের গন্ধ ঢাকা পড়বে?

সরলভাবেই বলছেন সব মাড়োয়ারীদের, বোঝাচ্ছেন। 'দেখ ব্যবসা করতে গেলে সত্যকথার আঁট থাকে না। ব্যবসায়ে তেজী-মন্দি আছে, তখন মিথ্যে চালাতে হয়। মিথ্যে উপায়ে রোজগার করা জিনিস সাধুদের দিতে নেই। শুদ্ধ জিনিস সত্য জিনিস সাধুদের দেবে। সত্যপথেই ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার।'

তুমি কী করেছ তপস্যা?

কিছু করিনি। শুধু মৌনাবলম্বন করেছি।

তাতেই তোমার সিদ্ধি হয়েছে।

তাতেই?

হ্যাঁ, তার মানে মৌনাবলম্বন করে ছিলে, ফলে তুমি মিথ্যে বলোনি। মিথ্যা না বলাটাও এক হিসেবে সত্য বলা।

boiRboi.net

সকলসুন্দরসন্নিবেশ ঠাকুর তাকালেন তারকের দিকে। বললেন, 'বেশ কাল এসো।' সত্যমেব জয়তে, নানৃতম।

॥ ১২১ ॥

কিন্তু কাল কি আর আসবে ইহকালে?

ঠিক আসবে যদি তিনি কৃপা করেন। যিনি কোল দিয়েছেন তিনি কি করেননি কৃপা? পরদিন সন্ধ্যের আগে ঠিক এসে হাজির।

ওরে এসেছিস? তোর জন্যে মা-কালীর প্রসাদী লুচি-তরকারি রেখে দিয়েছি। কি রে, আজ রাত্রে থাকবি তো এখানে? সামনের ঐ দক্ষিণের বারান্দায় শুবি, কেমন? আজ রাতে কেউ এখানে থাকবে না। শুধু তুই আর আমি।

যেন কতকালের চেনা। কত দেশ ঘুরেছেন ওকে সঙ্গে করে। তোর নাম কি, তোর বাপের নাম কি, কোথায় তোর বাড়ি, কিছুর খোঁজখবরে দরকার নেই। শুধু তুই এলি আর আমি নিলুম। তুই আর আমি এ দুয়ের মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ডলীলা। শুধু শিলা নয় রে, লীলা। শুধু কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ নয়, রাধাকৃষ্ণ।

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের এক সাধু এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। এরা কৃষ্ণ মানে, কিন্তু রাধা-বিহীন কৃষ্ণ। এদের মতে রাধা বলে কিছু নেই। খাজাঞ্চির ঘরের কাছে আছে কিন্তু কোনো দেবমন্দিরেই প্রণাম করতে আসে না। মায়ের মন্দিরে শিবের মন্দিরে তো নয়ই, রাধাগোবিন্দের মন্দিরেও নয়।

সাধুর ইচ্ছে ঠাকুরের ভক্তেরা ওর কাছে এসে সমবেত হয়, শোনে ওর কথাবার্তা। এমনিতে বেশ খাঁটি সাধু, কিন্তু দোষের মধ্যে, শুকনো।

সকলে তাকায় ঠাকুরের দিকে। ঠাকুর বললেন, 'হতে পারে ওর ভালো মত, কিন্তু আমার প্রাণের মতো নয়। ভগবানের লীলা চাই।'

লীলা ভুবনপাবনী। মা আর ছেলে। বর আর বধূ। প্রভু আর দাস। বন্ধু আর সখা।

নারদ দ্বারকায় এসে হাজির। ষোলো হাজার স্ত্রী নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ কি ভাবে বাস করছেন তা একবার দেখে যেতে হবে স্বচক্ষে। বিশ্বকর্মার নির্মাণকৌশলের পরাকাষ্ঠা, কী সুন্দর-সুমহান রাজপুর! নির্ভয়ে প্রবেশ করল নারদ, একেবারে নিভৃত অন্তঃপুরে। গিয়ে দেখল রুক্মিণী রত্নখচিত চামর দিয়ে ব্যজন করছে শ্রীকৃষ্ণকে। নারদকে দেখে উঠে পড়লেন শ্রীকৃষ্ণ, বসবার জন্যে মহার্ঘ আসন দিলেন, নিজের হাতে ধুয়ে দিলেন তাঁর পদযুগল। শুধু তাই নয়, সেই পা-ধোয়া জল রাখলেন নিজের মাথার উপর। বললেন, 'প্রভু, আপনার কোন কাজ সাধন করব বলুন।"

নারদ বললে, 'আর কিছু নয়, যেন আপনার চরণদ্বয়ের ধ্যানে আমার স্মৃতি সতত স্থির থাকে।'

নারদ নিষ্ক্রান্ত হয়ে আরেক মহিষীর ঘরে প্রবেশ করল। গিয়ে দেখল সেখানে শ্রীকৃষ্ণ স্ত্রীর সঙ্গে পাশা খেলছেন। নারদকে দেখে তেমনি পদবন্দনা করে জিগগেস করলেন শ্রীকৃষ্ণ, 'প্রভু, আপনার কী প্রিয়সাধন করব?'

তেমনি এক-এক ঘরে যাচ্ছে নারদ, এক-এক অভিনব দৃশ্য দেখছে। কোথাও শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালন করছেন, কোথাও হোম বা সান্ধ্যবন্দনা করছেন, কোথাও অস্ত্রবিদ্যা শিখছেন, কোথাও অশ্ব হস্তী বা রথপৃষ্ঠে বিচরণ করছেন। কোথাও বা শুয়ে রয়েছেন পর্যাঙ্কে, কোথাও বা মন্ত্রীদের সঙ্গে বসেছেন মন্ত্রণায়, কোথাও বা গোদান করছেন ব্রাহ্মণদের। কোথাও স্নান করতে চলেছেন, হাস্যালাপ করছেন প্রিয়ার সঙ্গে, কোথাও বা পুত্রকন্যার বিয়ের আয়োজন করছেন।

নানা ভাবে অবস্থিত। নানা লীলায় উদ্ভিন্ন।

তখন নারদ বললে করজোড়ে, 'হে যোগেশ্বর, আজ দেখলাম আপনার যোগমায়ার প্রভাব। এবার আমাকে অনুমতি করুন, আমি সকল লোকে আপনার ভুবনপাবনী লীলাগান গেয়ে বেড়াই।'

'পুত্র, তুমি মোহগ্রস্ত হয়ো না।' বললেন শ্রীকৃষ্ণ, 'লোকশিক্ষার জন্যে আমি এরূপ করে থাকি।'

আবার দেখ, ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যা ছেড়ে জলস্পর্শ করে পরমাত্মার ধ্যান করি। অন্ধকারের পরপারে যাঁর বাসা সেই পরমাত্মা।

সেই এক, স্বয়ংজ্যোতি, অনন্য, অব্যয়, নিরন্তকল্মষ ব্রহ্মনামা পুরুষ। উদ্ভব আর বিনাশের মধ্যে যে শক্তি সেই শক্তিতেই যাঁর সত্তা ও আনন্দস্বরূপত্বের উপলব্ধি। আবার যেমন ধরো নিত্যগোপাল। এত বড় ভক্ত, ঠাকুরের মতে যে পরমহংস অবস্থা পেয়েছে তার সঙ্গে মিশতে বারণ করছেন তারককে। বলছেন, 'ছাখ তারক, নিত্যগোপালের সঙ্গে বেশ মিশিসনে। ওর আলাদা ভাব। ও এখানকার লোক নয়।'

তেইশ-চব্বিশ বছরের ছেলে এই নিত্যগোপাল। বিয়ে-থা করেনি। বালকস্বভাব। নিয়ত বাস করে ভাবরাজ্যে। ডিমে তা দেওয়া পাখির দৃষ্টির মতো ফ্যালফেলে। ঠাকুর বলেন, পরমহংস অবস্থা। তাই দেখেন গোপালের মত।

গিরিশের বাড়িতে এসেছেন ঠাকুর। বসতে গিয়ে দেখেন আসনের কাছে একখানা খবরের কাগজ পড়ে আছে। যত বিষয়ব্যাপারের কথা, পরনিন্দা আর পরচর্চা। ইশারায় বললেন কাগজখানা সরিয়ে নিতে। কাগজ সরাবার পর বসলেন আসনে।

সেখানে নিত্যগোপাল এসেছে।

'কি রে, কেমন আছিস?'

'ভালো নেই।' বললে নিত্যগোপাল। 'শরীর খারাপ। ব্যথা।'

'দু-এক গ্রাম নিচে থাকিস।'

'লোক ভালো লাগে না। কত কি বলে, ভয় হয়। আবার জোর করে ভয় কাটিয়ে উঠি।'

'ওই তো হবে। তোর আছে কে?'

'এক তারক আছে। সর্বদা সঙ্গে-সঙ্গে থাকে। কিন্তু সময়ে-সময়ে ওকেও ভালো লাগে না।'

এত উচ্চভূমিতে আছে নিত্যগোপাল তার সঙ্গে সঙ্কেতে কথা হয় ঠাকুরের। 'তুই এসেছিস?' অমনি আবার উত্তর দেন নিগূঢ় স্বরে, 'আমিও এসেছি।'

ভাবাবস্থায় নিত্যগোপালের বুক রক্তবর্ণ। কিন্তু ভাব প্রকৃতিভাব। বলরামের বাড়িতে ভাবাবস্থায় নিত্যগোপালের কোলের উপর পা ছড়িয়ে দিলেন ঠাকুর। ঠাকুর সমাধিস্থ, আর নিত্যগোপাল কাঁদতে লাগল অঝোরে।

একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে জিগগেস করলেন ঠাকুর, 'নিত্য থেকে লীলা, লীলা থেকে নিত্য. তোর কোনটা ভালো?'

'দুইই ভালো।' বললে নিত্যগোপাল।

'তাই তো বলি, চোখ বুজলেই তিনি আছেন আর চোখ চাইলেই তিনি নেই?' সেদিন যেই নরেন গান ধরল—সমাধিমন্দিরে মা কে তুমি গো একা বসি, অমনি ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুরকে বসানো হল আসনে, সামনে ভাতের থালা। সমাধির আবেশ এখনো কাটেনি সম্পূর্ণ, দুই হাতেই ভাত খেতে শুরু করে দিলেন। শেষে খেয়াল হলে বললেন ভবনাথকে, তুই খাইয়ে দে। ভবনাথ খাওয়াতে লাগল। ঠিকমত খাওয়া হল না আজ, বেশির ভাগই পড়ে রইল। বলরাম বললে, 'নিত্যগোপাল কি পাতে খাবে?'

'পাতে? পাতে কেন?' ঠাকুর প্রায় ধমকে উঠলেন।

'সে কি, আপনার পাতে খাবে না?'

নিত্যগোপালও ভাবাবিষ্ট। ঠাকুর এসে বসলেন তার পাশটিতে। যে পাতেই তোকে দিক, তোকে আমি খাইয়ে দি নিজের হাতে। তুই আমার গোপাল।

সেই গোপাল সেন। অনেক দিন হল সেই যে একটি ছোট্ট ছেলে আসত এখানে, এর ভেতর যিনি আছেন সেই মা তার বুকে পা রাখলে, মনে নেই? বললে, তোমার

এখনো দেরি আছে, আমি পারছি না থাকতে ঐহিকদের মধ্যে। এই বলে যাই বলে বাড়ি চলে গেল। আহা, আর ফিরে এল না। তারপর শুনলাম দেহত্যাগ করেছে। সেই গোপালই নিত্যগোপাল।

এমন যে নিত্যগোপাল তার সঙ্গে মিশতে বারণ করলেন তারককে।

'ওরে, সেখানে তুই যাস?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

বালকের মতো সরল মুখে বললে নিত্যগোপাল। 'যাই। নিয়ে যায় মাঝে-মাঝে।' সে একজন ত্রিশ-বত্রিশ বছরের স্ত্রীলোক। অপার ভক্তিমতী, ঠাকুরের দত্তচিত্ত। নিত্যগোপালের অপূর্ব ভাবাবস্থা দেখে বড় আকৃষ্ট হয়েছে, তাকে সন্তানরূপে স্নেহ করে, কখনো-কখনো নিয়ে যায় নিজের বাড়িতে।

'ওরে, সাধু সাবধান।' শাসনবাণী উচ্চারণ করলেন ঠাকুর। 'বেশি যাসনে, পড়ে যাবি। কামিনীকাঞ্চনই মায়া। মেয়েমানুষ থেকে অনেক দূরে থাকতে হয় সাধুকে। ওখানে সকলে ডুবে যায়। ব্রহ্মা-বিষ্ণুও ডুবে গিয়ে খাবি খাচ্ছে সেখানে।' নিত্যগোপালের পরমহংস অবস্থা আর স্ত্রীলোকটিও অশেষ ভক্তিসম্পন্না। তবুও কি অমোঘ শাসন। শাসনবেশে কি করুণা! সাধু সাবধান! কে জানে লৌহগৃহের কোন অসতর্ক ছিদ্রপথে সাপ ঢুকবে! পরমহংস হয়েছ বলেই মনে কোরো না তোমার আর পতন হবার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং, সাধু সাবধান!

সেই নিত্যগোপাল অবধূত হয়েছে। জ্ঞানানন্দ অবধূত। চিতাভস্মভূষোজ্জ্বল দ্বিতীয় মহেশ। পরনে রক্তবাস হাতে ত্রিশূল গলায় নাগসূত্র। করে পানপাত্র মুখে মন্ত্রজাল বনে-গৃহে সমানুরাগ সন্ন্যাসী।

ঠাকুর তাই ঠিকই বলেছিলেন, ওর ভাব আলাদা। ও এখানকার নয়।

ওরা একডেলে গাছ, আমি পাঁচডেলে। আমার পাঁচফুলের সাজ।

মনের আনন্দে সে রাতে আর ঘুম এল না তারকের। একটি মৃদুমিঠে সুগন্ধের মতো উপভোগ করতে লাগল সেই অনিদ্রাটুকুকে।

মাঝরাতে চেয়ে দেখল ঠাকুর দিগ্বসন হয়ে ভাবের ঘোরে ঘুরছেন ঘরের মধ্যে আর কি সব বলছেন নিজের মনে। খানিক পরে বেরিয়ে এসেছেন বারান্দায়। বলছেন জড়িতস্বরে, 'ওগো ঘুমিয়েছ?'

ধড়মড় করে উঠে বসল তারক। বললে, না তো, ঘুমুইনি।

'ঘুমোওনি? তবে আমাকে একটু রামনাম শোনাও তো।'

কি ভাগ্য, তারক উঠে বসে রামনাম শোনাতে লাগল।

রাত তিনটে বাজলেই আর ঘুমোতে পারেন না ঠাকুর। এমনিতে ঘুম দু-এক ঘণ্টার বেশি নয়, বাকি সময় যতক্ষণ জীবভূমিতে থাকেন, নাম করেন। যারা থাকে তাঁর

কাছাকাছি সকলকে ডেকে তোলেন। ওরে ওঠ, আর কত ঘুমুবি? উঠে একবার ভগবানের নাম কর।

এক-এক দিন খোল করতাল নিয়ে এসে বাজনা শুরু করে দেন। কীর্তনের ধুম লাগান। তারপর নাচেন ভাবের আনন্দে ভরপুর হয়ে। ওরে তোরাও নাচ। লজ্জা কিসের? হরিনামে নৃত্য করবি তাতে আর লজ্জা কি! লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়। যে হরিনামে মত্ত হয়ে নৃত্য করতে পারে না তার জন্ম বৃথা! নাচছেন আর দরদরধারে অশ্রু ঝরছে।

বাক্যে যা বলবে মনে যা ভাববে বুদ্ধি দিয়ে যা নিশ্চয় করবে সবই অর্পণ করবে ঈশ্বরকে। সংকল্পবিকল্পকারী মনকে নিরোধ করে ভক্তিভরে ভজনা করলেই মিলবে অভয়। সুতরাং স্বীয় প্রিয়ের নাম করো। লজ্জা ত্যাগ করে অনাসক্ত হয়ে বিচরণ করো সংসারে। অনুরাগ উদিত হলেই চিত্ত বিগলিত হবে, কখনো হাসবে কখনো কাঁদবে কখনো রোদন-চীৎকার করবে কখনো বা উন্মাদের মত নৃত্য করবে। বায়ু অগ্নি সরিৎ সমুদ্র দিক ক্রম আকাশ নক্ষত্র সমস্ত কিছুকে শ্রীহরির শরীর জেনে অনন্যমনে প্রণাম করবে। যে ভোজন করে তার যেমন প্রতি গ্রাসেই একসঙ্গে তুষ্টি পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় তেমনি যে ভজনা করে তারও নাম করার সঙ্গে-সঙ্গেই ভক্তি, ঈশ্বরের অনুভব ও বৈরাগ্য এসে পড়ে। 'ভক্তিরিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ।' এই ভজনাতেই পরা শান্তি, আর কিছুতে নয়।

॥ ১২২ ॥

শিখে রাখ, যখন যেমন তখন তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন। সামনে মাতাল, তাকে ধর্মকথা বলতে গেলে হয়তো কামড়ে দেবে। বরং তার সঙ্গে একটা সম্পর্ক পাতা, খুড়ো বলে ডাক, হয়তো তোকে আদর করে বসবে। দেখবি, শুনবি, বলবি নে। অন্যায় দেখে প্রতিবাদ করার চেয়ে সহ্য করা ভালো। তুই কি কারু দণ্ডমুণ্ডের কর্তা যে তোর শাসনে শোধন হবে? যিনি শাসন করবার ঠিক করবেন। তুই বিচারের ভালো-মন্দ কী বুঝিস? আর শোন, তৈরি অন্ন ছাড়বিনে কখনো। যদি ডাল-ভাত জুটে থাকে তাই খেয়ে নে, পোলাওয়ের আশা করবি নে। কাঠের মালা আর ঘেঁটু ফুল পেয়েছিস তাই দিয়ে সেরে নে শিবপুজো। কবে জরাথুল আর স্ফটিকের মালা পাবি তারই জন্যে বসে থাকবি পথ চেয়ে?

ভক্ত হবি, তাই বলে বোকা হবি? তোর হক ছাড়বি, স্বত্ব খোয়াবি? লোকে তোকে ঠকিয়ে নেবে? ঠিক-ঠিক জিনিস দিলে কিনা দেখে তবে দাম দিবি। ওজনে কম দিল কিনা দেখে নিবি যাচাই করে। আবার যে সব জিনিসের ফাউ পাওয়া যায়

সে সব জিনিস কিনতে গিয়ে ফাউটি পর্যন্ত ছেড়ে আসবিনি।

মোট কথা, সরল হবি, উদার হবি, বিশ্বাসী হবি। তাই বলে বোকা বাঁদর হবি না। কাছাখোলা, আলাভোলা নেলাখেপা হবি না।

'অনেক তপস্যা, অনেক সাধনার ফলে লোকে সরল হয়, উদার হয়। সরল না হলে পাওয়া যায় না ঈশ্বরকে। সরল বিশ্বাসীর কাছেই তিনি আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন।' বললেন ঠাকুর।

আর শোন, কান্না পেলেই কাঁদবি।

বিকেলে দক্ষিণেশ্বরে বালকের মত রামলালের কাছে বসে কাঁদছেন ঠাকুর : 'আমি একটু খাঁটি দুধ খাব। কালীবাড়িতে যে দুধ খাই তাতে স্বাদগন্ধ নেই। বড় সাধ শাদা-শাদা ধোবো-ধোবো মেটো মেটো গন্ধ এমন একটু খাঁটি দুধ খাই। একটু খাওয়াতে পারিস রামনেলো? বাজারে কি গয়লাবাড়িতে গিয়ে দেখ দেখি মেলে কিনা!'

ঘুরে এল রামলাল। হাত খালি। দুধের বিন্দুবিসর্গও কোথাও নেই।

তবে কি হবে? পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসলেন ঠাকুর।

এদিকে বলরামের স্ত্রী তার গৃহে বসে দুধ জ্বাল দিচ্ছে আর কাঁদছে। যোগেন-মা কাছে বসে, তাকে লক্ষ্য করে বলছে, 'দেখ দিদি, এমন দুধ, প্রাণভরে ভগবানকে খাওয়াতে পারলুম না। এ দিয়ে কেবল বাড়ির লোকের পেটপুজো হবে। এক কাজ করবি দিদি? যাবি দক্ষিণেশ্বর?'

যোগেন-মা তো স্তম্ভিত।

'রাত হয়ে এসেছে কেউ টের পাবে না। চল খিড়কি খুলে বেরিয়ে পড়ি। প্রাণ বড় উচাটন হয়েছে, ঠাকুরকে একটু খাইয়ে আসি খাঁটি দুধ। তুই যদি সঙ্গে যাস—যাবি?'

'যাব।'

আধসেরটাক দুধ নিলে একটা ঘটিতে করে। বাটি ঢাকা দিয়ে গামছা জড়ালে। তারপর গা ঢাকা দিয়ে চলল দক্ষিণেশ্বর। সেই একরাজ্যের পথ। তাও কিনা পায়ে হেঁটে!

সমস্ত বন্ধনবেষ্টনী লঙ্ঘন করে এ সেই ডাক। এ ডাক নিরবধি, এ ডাক পৃথিবী ছাড়িয়ে।

ঠাকুরের ঘরে ঢুকল এসে দুজন। হাতে গামছা-বাঁধা ঘটি।

পুলকিত হলেন ঠাকুর। শুধোলেন, 'দুধ এনেছ বুঝি?'

'অ্যাজ্ঞে হ্যাঁ—'

'বিকেল থেকেই মনে হচ্ছে একটু ধোবো-ধোবো মেটো-মেটো খাঁটি দুধ খাই। তাই নিয়ে এসেছ তোমরা—'

যেন নন্দরানীর সামনে গোপাল, তেমনি ভাবে দুধ খেলেন ঠাকুর। পরে পরিহাস করে বললেন, 'তোমরা কুলের কুলবধূ, এত রাতে যে আমার কাছকে এলে তা তোমরা আমার হাতে দড়ি দেবে নাকি?' বলে হাসতে লাগলেন।

রামলালকে বললেন একটা গাড়ি নিয়ে আসতে। গাড়ি এলে বললেন, 'বলরামকে চুপিচুপি বলবি এরা আমার কাছকে এসেছিল যেন রাগ না করে।'

কিন্তু রাগ করছে হরিবল্লভ। বলরামের খুড়তুতো ভাই, কটকের সরকারী উকিল। অধিকন্তু রায় বাহাদুর।

নানা কথা কানে ঢুকেছে। নানা বিরুদ্ধ কথা। তুমি যাচ্ছ তো যাও, তুমি মাতামাতি করছ তো করো, কিন্তু বাড়ির মেয়েদের ওখানে পাঠাও কেন? ওদের কি মাথাব্যথা?

বলরামের এক উত্তর। 'তুমি ভাই একবার তাঁকে দেখে যাও স্বচক্ষে।'

তাই এসেছে হরিবল্লভ। তাকে দেখি আর না দেখি তোমাকে এবার কটকে টেনে নিয়ে যাব। এই মত্ততার প্রভাব থেকে মুক্ত করব তোমাকে।

বলরামের বাড়ি ঠাকুরের 'কলকাতার কেল্লা'। বলরামের অন্নই ঠাকুরের শুদ্ধান্ন। বলরামের সমস্ত পরিবার এক সুরে বাঁধা। এক মন্ত্রে উদ্দীপিত। স্বামী-স্ত্রী থেকে শুরু করে ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে পর্যন্ত ঠাকুরে প্রেরিত, ঠাকুরে ভাবিত, ঠাকুরে নিমজ্জিত।

স্বভাবে কৃপণ কিন্তু সাধুসেবায় বদান্য। বলেন, সাধুসেবা ছাড়া আত্মীয়পোষণ মানে ভূতভোজন। আত্মীয়স্বজনের পাল্লায় পড়ে ছোট মেয়ে কৃষ্ণময়ীর বিয়েতে অনেক খরচ করে ফেলেছেন তাই সারাদিন আছেন ভারি বিমর্ষ হয়ে। একটা সাধুভোজন হল না অথচ এতগুলো টাকা বেরিয়ে গেল জলের মত। অকারণে এত অপচয়!

এমন সময়ে দৈবযোগে ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত যোগীন এসে উপস্থিত।

বলরামের আনন্দ তখন দেখে কে। ব্যাকুল হয়ে তার দুহাত চেপে ধরল বলরাম। বললে, 'গৃহীর বিবাহে সন্ন্যাসীদের নিমন্ত্রণ খাওয়া বারণ। জানি। তবু ভাই তুমি যদি দয়া করে অন্তত একটা মিষ্টিও খাও আমার সব সার্থক হবে। তখন এত ব্যয় আর অপব্যয় বলে মনে হবে না।'

তা কি করে হয়! যোগীন মুখ ফেরাল।

কান্নার কাছে কার নিস্তার আছে! বাপই গলবেন, আর এ তো তাঁর সন্তান।

বলরামের কাতরতায় নরম হল যোগীন। নিল একটা মিষ্টি। মুখে দিল। অমনি সমস্ত মধুর হয়ে গেল বলরামের। যা মনে হয়েছিল ক্ষয় তাই মনে হল আনন্দ। যা মনে হয়েছিল অপব্যয় তাই ঐশ্বর্য-উল্লাস।

কৃষ্ণময়ীর খুব বড় ঘরে বিয়ে হয়েছে। কিন্তু শ্বশুরঘর করতে যাবার সময় গাড়িতে উঠেছে গয়নার বাক্স সঙ্গে নিয়ে নয়, ঠাকুরপুজোর বাক্সটি কাঁখে করে। ঠাকুরের নিত্যপূজার ছবিখানি আর জপের মালাগাছি রয়েছে বাক্সটিতে। সেই তার ইহজীবনের পাথেয়, পরজীবনের ভাণ্ডার।

ঠাকুর বললেন, আহা দেখেছ, কৃষ্ণময়ীর চোখ দুটি ঠিক ভগবতীর চোখের মত!

বলরামের শাশুড়িও কম যায় না। ঠাকুর প্রণাম করে-করে কপালে কড়া পড়িয়ে ছেড়েছে। পুত্র বাবুরামকে অর্পণ করে দিয়েছে ঠাকুরের পদসেবায়। পরিপূর্ণ-চিত্তে।

'যমে নিলে যতটা শোক না হয় তার চেয়ে বেশি হয় ছেলে সংসারবিরাগী হলে।' বললেন ঠাকুর।

কিন্তু বাবুরামের মা মূর্তিমতী প্রশান্তি।

বলরামের অসুখ করেছে, তার গায়ে হাত বুলোচ্ছেন ঠাকুর। বলছেন, 'রুগীকে আমি ছুঁতে পারি না, রোগের যাতনায় ভগবানকে ভুলে থাকে বলে। কিন্তু বলরামের কথা আলাদা। রোগের মধ্যেও ওর মন ইষ্টচিন্তায় নিমগ্ন।'

ভাইয়েদের উপর জমিদারির ভার তুলে দিয়েছে। বাঁধাবরাদ্দ মাসোয়ারা নিয়েই সে খুশি। কিন্তু সে টাকায় যেন ইদানীং সঙ্কুলান হচ্ছে না। তা নিয়ে একদিন আক্ষেপ করল বলরাম। নরেন কাছে ছিল, বলে উঠল, 'নিজের বিষয় নিজে দেখলেই তো হত। বেশ থাকতে পারতেন স্বচ্ছন্দে।'

কথাটা যেন মর্মে লাগল এসে বলরামের। বললে, 'নরেনবাবু গড অলমাইটি। আপনার কথা ফিরিয়ে নিন। প্রভু আর তাঁর সন্তানদের সেবা করছি আমি। আমি কি করে বিষয়ী হব?'

সেই বলরামকে ফেরাতে এসেছে হরিবল্লভ।

শ্যামপুকুরে ঠাকুর তখন অসুস্থ, একদিন এসেছে বলরাম। মুখখানি চিন্তাম্লান। ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'কি হয়েছে? কিসের এত ভাবনা?'

বলরাম বললে যা বলবার।

'কি রকম লোক তোমার এই ভাইটি?'

boiRboi.net

'এমনিতে ভালো। ঈশ্বরবিশ্বাসী। দোষের মধ্যে এই, শুধু ঈশ্বর নয়, যা শোনে তাই বিশ্বাস করে বসে।'

'তা করুক। একদিন এখানে আনতে পারো?'

'জানি না আসবে কিনা। এত সব বাজে কথা শুনেছে আপনার সম্বন্ধে, বোধ হয় চাইবে না আসতে।'

'তা হলে এক কাজ করো। গিরিশকে ডাকো।'

এল গিরিশ। কি ব্যাপার? হরিবল্লভ? হরিবল্লভ বোস? বা, ও আর আমি যে একসঙ্গে পড়েছি। আমি ঠিক ওকে নিয়ে আসতে পারব।

পরদিনই টেনে নিয়ে এল গিরিশ।

'ঐ দেখ আমি বলেছিলাম না, কেমন শিশুর মতো সরল দেখতে!' হরিবল্লভের দিকে তাকিয়ে ভাবাকুলস্বরে বলতে লাগলেন ঠাকুর: 'যার হৃদয় ভক্তিতে ভরপুর নয় তার কি অমন চোখ হতে পারে?' তারপরে হরিবল্লভকে সবিশেষ লক্ষ্য করলেন। 'ভেবেছিলুম কটকের সরকারী উকিল কত না জানি তোমার চোটপাট, কিন্তু এখন দেখছি বিনম্র, অকিঞ্চন—'

ঠাকুরকে অতি ভক্তিভাবে প্রণাম করল হরিবল্লভ। এ কার সম্বন্ধে শুনেছিল সে? এ কি পীযূষপুলদৃষ্টি কোমলগাত্রপবিত্র মধুমঙ্গলপ্রিয়।

'শুধু তাই নয়, আমার আত্মীয় আপনি। বলরাম যেমন আত্মীয়। কি বলেন?'

ঠাকুরের পায়ের ধুলো নিল হরিবল্লভ। বললে, 'আপনার দয়া।'

গলে গেল সমস্ত কাঠিন্য। উড়ে গেল সমস্ত বিমুখতা। এই করুণাঘনের কাছে বসতে ইচ্ছা হল ঘন হয়ে।

'মেয়েরাও পায়ের ধুলো নেয়। তা ভাবি, তিনিই একরূপে আছেন ভিতরে—এ প্রণাম তাঁর, আর কারু নয়!'

'বা, আপনি তো সাধু।' বললে হরিবল্লভ, 'আপনাকে সকলে প্রণাম করবে তাতে দোষ কি।'

হরিবল্লভের দোষদৃষ্টি ঘুচে গেল মুহূর্তে।

ঠাকুর বললেন, 'আমি কি! সে ধ্রুব প্রহ্লাদ নারদ কপিল কেউ এলে হত। আমি রেণুর রেণু।' তাকালেন হরিবল্লভের দিকে। 'আপনি আবার আসবেন।'

'আপনি বলছেন কেন?'

'বেশ, আবার এসো।'

'বলতে হবে কেন, নিজের টানেই আসব।'

'বলরাম অনেক দুঃখ করে। মনে হল একদিন যাই, গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করি।

তা আবার ভয় হয়। পাছে বলো, একে কে আনলে?'

বড় লজ্জিত হল হরিবল্লভ। যেন ধরা পড়ে গেছে। পাশ কাটাবার চেষ্টায় বলল, 'ও সব কথা কে বলেছে? আপনি কিছু ভাববেন না।'

পাশ কাটিয়ে চলে যাবার উপায় নেই, পথও নেই। একেবারে ঢেলে দিতে হবে পায়ের উপর। নৈবেদ্য করে দিতে হবে দেহ-মন!

বড়লোক বলেই তো এটুকু অহঙ্কার। ঈশ্বরকৃপা না থাকলে খুব বড়লোকও অপদার্থ হয়ে যায়। যদু বংশ ধ্বংসের পর অর্জুন আর পারল না গাণ্ডীব তুলতে।

যাবার আগে ঠাকুরের পায়ের ধুলো নিতে গেল হরিবল্লভ। ঠাকুর পা গুটিয়ে নিলেন। কিন্তু হরিবল্লভ ছাড়বার পাত্র নয়। আর সে ছাড়বে না এ প্রাণজীবনকে। জোর করে টেনে নিল দু পা। ধুলো নিল ললাটে।

নীরোগনির্মল হয়ে গেল। জীবনের চক্রাবর্তের মধ্যে খুঁজে পেল ধ্রুব বিন্দু।

এসেছিল বলরামকে নিয়ে যেতে, নিজেই বাঁধা পড়ল। ঐ যে বাপ বলেছিল নেশা-খোর ছেলেকে, কি মধু যে পাস ঐ মদে কে জানে। ছেলে বলেছিল, একটু খেয়েই দেখ না। বাপ খেল, দেখি কি ব্যাপার। খেয়ে উঠে ছেলেকে বললে, ও তুমি ছাড় বাপু, আমি আর ছাড়ছিনে। সেই অবস্থা।

হরিবল্লভ চলে গেলে পর বললেন ঠাকুর, 'কেমন ভক্তি দেখেছ! নইলে জোর করে পায়ের ধুলো নেয়!'

পরে মাস্টারকে বললেন চুপিচুপি, 'সেই যে তোমায় বলেছিলাম না ভাবে দেখলাম দুজন লোক। একজন ডাক্তার, মহেন্দ্র ডাক্তার, আর, আরেকজন এই লোক, এই হরিবল্লভ। তাই দেখ এসেছে।'

আবার এসেছে।

এবার নিচে মাটির উপর বসে ঠাকুরকে পাখা করছে হরিবল্লভ।

কিন্তু হরীশের সর্ববিসর্জন। সব ছেড়েছুড়ে ডেরা নিয়েছে দক্ষিণেশ্বরে। বলে, 'উপায় নেই, এখান থেকে সব চেক পাশ করিয়ে নিতে হবে। নইলে টাকা দেবে না ব্যাঙ্ক।'

মহিমাচরণ বেদান্তচর্চা জ্ঞানচর্চা করে, হরীশ রাগভক্তির আশ্বাধারী।

'জ্ঞান কি জানিস?' ঠাকুর বোঝাচ্ছেন হরীশকে। 'স্বস্বরূপকে জানা। মায়াই দেয় না জানতে। যেন সোনার উপর ঝোড়াকতক মাটি পড়েছে সেই মাটিটা ফেলে দেওয়া। ঐ মাটিটাই মায়া।'

'আর রাগভক্তি?'

'যেমন একটা পোড়োবাড়ির বনজঙ্গল কাটতে-কাটতে নলবসানো ফোয়ারা পেয়ে যাওয়া। মাটি সুরকি ঢাকা ছিল, যাই ঢাকা সরে গেল ফরফর করে জল উঠতে শুরু করল।'

প্রকৃতিভাব হরীশের, মেয়ের কাপড় পরে শোয়। অথচ নিজের স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করে এসেছে। ঠাকুর তাকে বলছেন, 'ওরে যা না একবার বাড়ি। তোর বউ খায় না, ঘুমোয় না, খালি কাঁদে। একবারটি তাকে দেখা দিয়ে এলে কি হয়?'

মুখ গোঁজ করে বসে থাকে হরীশ। কানে আঙুল দেয় মনে-মনে।

'কচি মেয়েটাকে একটু দয়া করতে পারিসনে? দয়া কি সাধুর গুণ নয়? ওরে তাকে যদি একটু বোঝাস সে ঠিক বুঝবে।'

দয়া দেখাতে গিয়ে দায়ে পড়ে যাই আর কি। চোখের জল দেখে ফের ব্যাধের জালে জড়িয়ে পড়ি। ঠাকুর কি আমাকে পরীক্ষা করছেন?

॥ ১২৩ ॥

'ভয় কি রে? আমি আছি।' তারককেও তাই বলছেন ঠাকুর। 'স্ত্রী যতদিন বেঁচে থাকবে তাকে দেখাশোনা করতে হবে বৈকি। একটু ধৈর্য ধর, মা সব ঠিক করে দেবেন। মাঝে-মাঝে যাবি বাড়িতে, যেমন-যেমন বলে দেব তেমন-তেমনটি করবি। দেখবি স্ত্রী সঙ্গে থাকলেও কোনো ক্ষতি হবে না।'

রাখালকেও পাঠিয়েছি অমনি তার স্ত্রীর কাছে।

ভয় কিসের? আমি আছি।

দুস্তর সমুদ্রে আমিই দীপস্তম্ভ। বিপথ-বিপদের অন্ধকারে আমিই অরুণোদয়। নিদারুণ নৈষ্ফল্যের মধ্যে আমিই মঙ্গলস্বরূপ। যদি কিছু থাকে এ বিশ্বলোকে, যদি কোনো শ্রী—সমস্ত বিরোধ ও বৈচিত্র্যের মধ্যে যদি কোনো শৃঙ্খলা—তবে আমি আছি।

অফিসে কাজ করত তারক, ছেড়ে দিল। আর যখন রাখালের বেলায় কথা উঠল তাকে চাকরিতে বসিয়ে আবদ্ধ করবে তখন ঠাকুরকে এসে জানাতেই ঠাকুর বললেন, 'খবরদার, ঈশ্বরের জন্যে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরেছিস এ বরং শুনব তবু কারুর দাসত্ব করছিস চাকরি করছিস এ কথা যেন না শুনি।'

কিন্তু নিরঞ্জনের বেলায় অন্য কথা। কেন হবে না? সেও চাকরি করছে বটে, কিন্তু মা'র ভরণপোষণের জন্যে।

'মা'র জন্যে কর্ম করে, তাতে দোষ নেই।' বলছেন ঠাকুর। 'আহা মা! মা ব্রহ্মময়ীস্বরূপা!'

মা নেমে আয়, নেমে আয়। একদিন হঠাৎ তারকের বুকে পা রাখলেন ঠাকুর। মাথায় হাত বুলুতে-বুলুতে বলতে লাগলেন, নেমে আয় মা, নেমে আয়। যেমন রাখালের জিভ টেনে ধরে সাঙ্কেতিক মন্ত্র এঁকে দিয়েছিলেন, তেমনি তারকের জিভে নখাগ্র দিয়ে লিখে দিলেন বীজমন্ত্র। কুণ্ডলীপাকানো সাপ হেলে-দুলে উঠল। করল ফণাবিস্তার।

কেমন ভাবে শুবি? ভক্ত সন্তানদের শেখাচ্ছেন ঠাকুর: 'প্রথমটা চিত হয়ে শুবি। ভাববি মা-কালী দাঁড়িয়ে আছেন বুকের উপর। এইভাবে মায়ের ধ্যান করতে-করতে ঘুমিয়ে পড়বি। দেখবি সুস্বপ্ন হবে।'

রাতদুপুরে উঠে পড়েছেন কখন। ওরে তারক, আমাকে একটু গোপালনাম শোনা তো। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে।

যদি কাউকে না পান, দারোয়ানকে ডাকিয়ে আনেন। আমাকে একটু রামনাম শোনাও দারোয়ানজী। শুধু নাম। সীতারাম। জীবনের সমস্ত শীতে যে আরাম সেই সীতারাম।

তারকের সময়-সময় ইচ্ছে হয় ঠাকুরের কাছে বসে কাঁদে। কেন কাঁদবে? তা জানে না। দুঃখে না আনন্দে, তাও না। দুঃখের আনন্দে না আনন্দের দুঃখে, তা বা কে বলবে? এমনি অহেতুক কাঁদব। সব চেয়ে বড় কথা, কাঁদতে ভালো লাগবে।

একদিন সত্যি-সত্যি বকুলতলার কাছে পোস্তার উপর বসে খুব খানিকটা কাঁদল তারক।

'ওরে ওরে ছাখ তো, তারক কোথায় গেল?' ঠাকুর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কান্না ঠিক তাঁর কানে গেছে। আর অমনি চঞ্চল হয়েছেন।

ডাকিয়ে আনলেন তারককে। কাছে বসালেন। বললেন, 'কাঁদছিস? খুব ভালো কথা। ভগবানের কাছে কাঁদলে তাঁর ভারি দয়া হয়। জন্মজন্মান্তরের মনের গ্লানি অনুরাগ-অশ্রুতে ধুয়ে যায়।'

কাঁদতে-কাঁদতে ধ্যান, তন্ময়তা। কান্নাতেই কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ।

ধ্যান হত গিয়ে এঁড়েদার বিষ্ণুর। ধ্যানে কাঠ মেরে যেত। সবাই ধাক্কা মারছে, তবু নিঃসাড়। কত ডাকাডাকি, বিষ্টু, ও বিষ্টু, কোথায় কে। নাকের নিচে হাত রাখো, নিশ্বাসের রেখা নেই। তখন সবাই খবর দিতে ছুটল ঠাকুরকে। ঠাকুর এসে ছুঁয়েছেন কি, বিষ্ণু চোখ মেলেছে। সূর্যের স্পর্শে জেগেছে অরবিন্দ।

ছোকরা বয়েস, ইস্কুলে পড়ে। এরই মধ্যে এত!

ঠাকুর বললেন, 'পূর্বজন্মের সংস্কার। গভীর বনে ভগবতীর আরাধনা করছে এক-জন। আরাধনা করছে শবের উপর বসে। কিন্তু মন কিছুতেই স্থির হচ্ছে না। নানারকম বিভীষিকা দেখছে। শেষকালে মূর্তিমান বিভীষিকা বাঘ তাকে ধরে নিয়ে গেল। আরেকজন বাঘের ভয়ে গাছে চড়ে বসেছিল। সে ভাবলে এই ফাঁকে একটু শবসাধন করে নি। পূজার সমস্ত উপকরণ তৈরি, আচমন করে একটু বসে পড়ি শবের উপর। যেই ওকথা মনে এল তরতর করে নেমে এল গাছ থেকে। আচমন করে শবের উপর বসে জপ করতে লাগল। একটু জপ করতে না করতেই ভগবতী আবির্ভূত হলেন। বললেন, প্রসন্ন হয়েছি, বর নাও। তখন সে লোক বললে, মা, এ কী কাণ্ড। ঐ লোকটা অত খেটেপিটে অত আয়োজন করে তোমার সাধন করছিল, তোমার দয়া হল না, আর আমি ওর ছাড়া-আসনে বসে কি একটু জপ করলুম আর অমনি আমাকে দর্শন দিলে! ভগবতী তখন হাসি-মুখে বললেন, বাছা, তুমি কি জন্মান্তরের কথা কিছু জানো? তুমি কত জন্ম আমার জন্যে তপস্যা করেছ তা কি আর তোমার মনে আছে? এই একটু শুধু বাকি ছিল, আজ এই দণ্ডে তা পূরণ হয়ে যেতেই আমার দর্শন পেলে। এখন বলো কি বর পছন্দ?'

সেই বিষ্ণু গলায় ক্ষুর চালিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

শুনে অবধি ঠাকুরের মন খুব বিষণ্ণ। বললেন, 'অনেক দিনই বলত আমাকে—সংসার ভালো লাগে না। পশ্চিমে কোন আত্মীয়ের বাড়িতে ছিল, সারা দিন এখানে সেখানে মাঠে-নির্জনে পাহাড়ে-বনে বসে শুধু ধ্যান করত। আমাকে বলত কত ঈশ্বরীয় রূপ সে দর্শন করে। বোধ হয় এই শেষ জন্ম। পূর্বজন্মে অনেক করা ছিল, বাকিটুকু সেরে নিল এ জন্মে, এই কটি অল্প বছরের মধ্যে।'

'কিন্তু আত্মহত্যা শুনে ভয় হয়।' বললে একজন ভক্ত।

'আত্মহত্যা মহাপাপ। ফিরে-ফিরে আসতে হবে সংসারে আর জ্বলতে হবে দাবাগ্নিতে। তবে যদি কেউ ঈশ্বরদর্শন করে দেহত্যাগ করে স্বেচ্ছায়, তবে তাতে আর দোষ নেই। তাকে বলে না আত্মহত্যা। যখন একবার সোনার প্রতিমা ঢালাই হয়ে যায় মাটির ছাঁচে, তখন মাটির ছাঁচ ভেঙে ফেললে আর দোষ কি।'

আত্মহত্যা কি রকম জানো? জেল থেকে কয়েদী পালানো। জেল থেকে পালিয়ে কয়েদীর রেহাই নেই, এক সময় না এক সময়ে সে ধরা পড়বেই। তখন তার দ্বিগুণ খাটনি। প্রথম, তার প্রথম মেয়াদের বাকি অংশ; দ্বিতীয়, জেল-পালানোর জন্যে অতিরিক্ত দণ্ড। তাই আত্মহত্যা অর্থে দ্বিগুণ কারাবাস।

ওরে এবার তোরা ভিক্ষেয় বেরো। ঠাকুর ডাকছেন তাঁর ভক্ত-সন্তানদের। ওরে কাঁধে ঝুলি নে, নগ্ন পায়ে ফের গৃহস্থের দ্বারে-দ্বারে। নীরবে নম্রমুখে গিয়ে দাঁড়া। যাতে তোকে দেখলেই বুঝতে পারে তুই দীনহীন, তুই ভিক্ষুক—

ভিক্ষেয় বেরুব ?

হ্যাঁ, অভিমান নাশ করতে হবে, নির্মূল করতে হবে। নত হতে হবে প্রত্যেকের সামনে। পায়ের নিচে মাটির ঢেলার মতো অহঙ্কারকে ধুলো করে দিতে হবে। দ্বারে-দ্বারে নিষেধ দ্বারে-দ্বারে প্রত্যাখ্যান তবু অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে চিত্তের প্রসন্নতা। চতুর্দিকে নৈরাশ্য, তবু তার ঊর্ধ্বে জাগ্রত রাখতে হবে নিষ্ঠার জয়নিশান। ওরে ভিক্ষেয় বেরো। অহমিকাকে কুহেলিকার মত উড়িয়ে দে। জীবনের দৈন্যের গহ্বরকে গভীর করে তোল। ভিক্ষার সুধায় ভরে তোল সেই বিরহের পাত্র।

সব চেয়ে সহজ কে ? ঈশ্বর। দুঃখ কি ? অসন্তোষ। সুখ কি ? আত্মবোধের যে শান্তি। শত্রু কে ? গুরুবাক্যে সংশয়। প্রেয়সী কে ? দীনে করুণা ও সজ্জনে মৈত্রী। শোভা কি ? নিস্পৃহতা। তৃপ্তি কি ? সর্বসঙ্গবিরতি। কামধেনু কি ? অনঘা শ্রদ্ধা।

বলরামের সঙ্গে রাখাল বৃন্দাবনে গিয়েছে। শরীর টিকছে না কলকাতায়। যদি বৃন্দাবনে গিয়ে ভালো হয়, আনন্দে থাকে।

ওমা, সেই বৃন্দাবনে গিয়ে ফের রাখালের অসুখ করেছে।

'কি হবে!' ঝরঝর করে বালকের মতো কেঁদে ফেললেন ঠাকুর। 'ওরে ও যে সত্যিই ব্রজের রাখাল। যদি ওর নিজের জায়গা পেয়ে আর ফিরে না আসে! যদি স্বস্থানে শরীর রাখে!'

রেজেস্ট্রি করে চিঠি পাঠানো হল কিন্তু উত্তর নেই।

মা'র কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লেন। পরিত্রাণপরায়ণা ভক্তাভীষ্টকরী বিশ্বেশ্বরীর কাছে। মা, আমার রাখালকে ফিরিয়ে দে। ও আমার গোপাল, ও আমার নিত্যসঙ্গী। আমার হাড়ের হাড়। আমার নয়নের নয়ন।

রাখালের চিঠি এসেছে। লিখেছে মাস্টারকে। লিখেছে এ বড় ভালো জায়গা। এখানে ময়ূর-ময়ূরী আনন্দে নৃত্য করছে—

শুনে ঠাকুরের আনন্দ দেখে কে। তার জন্যে চণ্ডীর কাছে মানসিক করেছিলুম। সে যে বাড়িঘর ছেড়ে আমার উপর সব নির্ভর করেছিল। তাকে আমিই তার পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দিতুম—একটু ভোগের যে তখনো বাকি ছিল! আহা, কি লিখেছে দেখ! ময়ূর-ময়ূরী নৃত্য করছে। লিখবেই তো! ওর যে সাকারের ঘর। বৃন্দাবন থেকে ফিরে পিতৃগৃহে উঠেছে রাখাল। ঠাকুরের অভিমান নেই।

বললেন, 'রাখাল এখন পেনসন খাচ্ছে।'

'আপনার সামনে একটি ব্রহ্মচক্র রচনা করে সাধনা করি এ আমার ইচ্ছে।' একদিন বললে মহিমাচরণ।

বেশ তো! রাজী হলেন ঠাকুর।

কৃষ্ণচতুর্দশীর রাত্রে রচিত হল সেই ব্রহ্মচক্র। মাস্টার, কিশোরী আর রাখাল বসেছে সেই চক্রে। চারদিক নিস্তব্ধ, শুধু গঙ্গার ছলছলানি যা একটু শোনা যাচ্ছে। আর ঝিল্লির অন্ধগুঞ্জন। মহিমাচরণ সবাইকে বললে ধ্যানস্থ হতে। ছোট খাটটিতে বসে একদৃষ্টে দেখছেন ঠাকুর।

ধ্যান শুরু হতে না হতেই রাখালের ভাবাবস্থা উপস্থিত। ঠাকুর নেমে এসে রাখালের বুকে হাত বুলুতে লাগলেন। শোনাতে লাগলেন মা'র নাম।

ব্রহ্মচক্রে বসে রাখালই ব্রহ্মানন্দ।

'রাখালকে দিয়ে মা কত কি দেখালেন। ওরে সব কথা বলতে নেই, বলতে বারণ।' তোমাকে জানি আমার সাধ্য কি! আনন্দে যে তুমি আমার কাছে একটু ধরা দিয়েছ এতেই আমি তোমার আপন হয়ে গেছি। আমার শরীরে এই যে বহমানা প্রাণধারা এ তো তোমারই নামজপমালা।

॥ ১২৪ ॥

'একটা চিল একটা মাছ মুখে করে উড়ে যাচ্ছে, আর-সব চিল তাকে তাড়া করল, ঠোকরাতে লাগল।' বলছেন ঠাকুর। 'মহাযন্ত্রণা। তখন চিল করলে কি! মাছটা ফেলে দিলে মুখ থেকে। ব্যস নিশ্চিন্দি। তখন তার মহানিস্তার।'

অতএব চিল তোমার গুরু। তার থেকে শিখলে অপরিগ্রহ। শিখলে অকিঞ্চনতা।

'গুরুর কাছে সন্ধান নিতে হয়।' বললেন ঠাকুর। 'বাণলিঙ্গ শিব খুঁজে ছিল একজন। কোথায় পাবে কে জানে। তখন একজন বলে দিল, অমুক নদীর ধারে যাও, অমুক গাছ দেখতে পাবে সেখানে। সেই গাছের কাছে দেখতে পাবে ঘুরনি-জল। সেই জলে গিয়ে ডুব দাও, পাবে বাণলিঙ্গ। তাই বলি সন্ধান নিয়ে ডোবো।'

প্রথম গুরু পৃথিবী।

কি শিখলে পৃথিবীর কাছ থেকে? আপন ব্রতে অচল থাকবার বুদ্ধি। কত উৎপাতে আক্রান্ত হচ্ছে তবু অবিচল। আর শিখবে ক্ষমা। সহিষ্ণুতা।

দ্বিতীয় গুরু বৃক্ষ।

কি শিখলে বৃক্ষের কাছ থেকে? পরার্থে জীবনধারণ। কেটে ফেললেও কিছু বলে না, রৌদ্রে শীর্ণশুষ্ক হয়ে গেলেও জল চায় না। 'তরু যেন কাটিলেও কিছু না

বোলয়। শুকাইয়া মৈলে তবু পানি না মাগয়।' অস্নেহে-অসেবায়ও ফলধারণ করে, আর যারা স্নেহ-সেবা করেনি তাদেরই জন্যে করে সেই ফলোৎসর্গ।

তৃতীয় গুরু বায়ু।

গন্ধবহন করে কিন্তু লিপ্ত হয় না। তেমনি বিষয়ে প্রবিষ্ট হয়েও বাক্য ও বুদ্ধিকে অবিকৃত রাখব। শিখব অনাসক্তি।

চতুর্থ আকাশ।

অনন্ত হয়েও সামান্য ঘটের মধ্যে এসে ঢুকেছে। ব্যাপ্ত হয়ে আছে মেঘলোকে অথচ মেঘ তাকে ছুঁতে পাচ্ছে না। তেমনি আত্মা দেহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েও অস্পৃষ্ট। তেমনি আকাশের মত অসঙ্গ হও।

তারপর, জল।

কি শিখবে জলের থেকে? স্বচ্ছতা, স্নিগ্ধতা, মধুরতা। জল যেমন নির্মল করে তুমিও তেমনি দর্শন স্পর্শন ও কীর্তন দ্বারা বিশ্বভুবন পবিত্র করো।

ষষ্ঠ গুরু, অগ্নি।

কাঠের মধ্যে অগ্নি প্রচ্ছন্ন, অব্যক্ত, নিগূঢ়। প্রতি কণা কাঠে প্রতি কণা অগ্নি। তেমনি সমস্ত বিশ্বে ঈশ্বর গুপ্তরূপে অনুস্যূত। প্রদীপ্ত হলেই অগ্নি সমস্ত মালিন্য দগ্ধ করে অথচ সেই মালিন্যস্পর্শে নিজে কলুষিত হয় না। তেমনি তুমিও তেজে ও তপস্যায় প্রদীপ্ত হও, যারই সেবা পাও না কেন, পাপমলে লিপ্ত হয়ো না। আগুনের নিজের কোনো উৎপত্তিবিনাশ নেই। উৎপত্তিবিনাশ শিখার, আগুনের নয়।

পরের গুরু, চন্দ্র।

হ্রাসবৃদ্ধি হয় কার? চন্দ্রকলার, চন্দ্রের নয়। তেমনি জেনে রাখো যা কিছু জন্মমৃত্যু সব দেহের, আত্মার নয়।

চন্দ্র গুরু হলে সূর্যও গুরু।

কী শিখবে সূর্যের থেকে? আত্মা যে স্বরূপতঃ অভিন্ন সেই তত্ত্ব। পাত্রে জল আছে তার উপরে পড়েছে সূর্যকিরণ। জলপাত্রের আকারভেদে সূর্যকিরণকে ভিন্ন-ভিন্ন সূর্যরূপে প্রতীয়মান হচ্ছে। আসলে সূর্য এক, অনন্য। তেমনি উপাধিভেদে আত্মাকে ভিন্ন-ভিন্ন আত্মা মনে হয়। আসলে আত্মা এক, দ্বিতীয়রহিত। আরো কিছু শেখবার আছে সূর্যের কাছে। সূর্য পৃথিবীর জল আকর্ষণ করে আবার পৃথিবীকেই প্রত্যর্পণ করে। তুমিও তেমনি বিষয় গ্রহণ করে যথাকালে অর্থীদের বিতরণ করো।

নবম গুরু, কপোত।

কপোতের কাছ থেকে শিখবে অতিস্নেহ বা আসক্তিবর্জন। কি হয়েছিল শোনো।

এক কপোত কপোতীর প্রণয়ে আবদ্ধ হয়ে বাসা বাঁধল বৃক্ষচূড়ে। স্বাধীন বিচরণের আনন্দ আর রইল না। কালক্রমে সন্তান হল কতগুলি। সংসারবাসের এই বা কম আনন্দ কি! এই সুখস্পর্শ মধুর কূজন, এই অঙ্গচেষ্টা। একদিন আহারের খোঁজে গিয়েছে দুজনে, শাবকগুলি মাটির উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন সময় এক দুরন্ত ব্যাধ এসে উপস্থিত। জাল ফেলে সহজেই ধরে ফেলল বাচ্চাগুলোকে। মা মায়ামুগ্ধা কপোতী এসে দেখে সর্বনাশ। রোদন করতে লাগল। কাঁদতে-কাঁদতে নিজেও সেই জালের মধ্যে আটকা পড়ল। কপোত এসে দেখল, স্ত্রী পুত্র কন্যা সবাই চলে যাচ্ছে তাকে ফেলে। এ সব স্নেহপুত্তলীদের ছেড়ে কি করে থাকব বৃক্ষনীড়ে, আর কেনই বা থাকব? এই বিবেচনা করে সে নিজের থেকেই ঢুকল গিয়ে জালের মধ্যে। ব্যাধ তো সিদ্ধকাম। এক জালে এতগুলো পাখি ধরতে পারবে এ তার কল্পনার অতীত। অত্যাসক্তির জন্যেই কপোত-কপোতীর এই ছিন্নদশা। সুতরাং স্নেহপ্রসঙ্গে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ো না।

তারপর, অজগর।

অজগর কী করে? যথালব্ধ দ্রব্যদ্বারা শরীরমাত্র নির্বাহ করে। যদি কিছু নাও জোটে, নিশ্চেষ্ট হয়ে ধৈর্য ধরে পড়ে থাকে। তেমনি অজগরকে দেখে সর্বারম্ভপরিত্যাগী হও।

তারপর চেয়ে দেখ সমুদ্রের দিকে।

প্রসন্ন, গম্ভীর, দুর্বিগাহ্য ও দুরত্যয়। তেমনি হবে সমুদ্রের মত। আর কী? বর্ষায় জলাগমে স্ফীত হয় না, গ্রীষ্মে জলাভাবে শুষ্ক হয় না। তেমনি নিরভিমান তেমনি নিত্যসরস চিরপরিপূর্ণ থেকো।

দ্বাদশ গুরু, পতঙ্গ।

কামমূঢ় হয়ো না। আগুনে মুগ্ধ হয়ে পুড়ে মরে পতঙ্গ তেমনি বস্ত্রাভরণসজ্জিত নারী দেখে উড়ে পড়ো না। বিরত থাকো। দৃঢ়ব্রত হও।

ত্রয়োদশ, মধুকর।

ছোট-বড় নামী-অনামী সকল ফুল থেকেই ভ্রমর মধু আহরণ করে। তেমনি ছোট-বড় মানী-অমানী সকলের কাছে থেকেই সারসংগ্রহ করবে। আর কী শিখবে? শিখবে সঞ্চয়নিবৃত্তি। মৌমাছি যে মধু সঞ্চয় করে, অন্যে এসে কেড়ে-ধরে নিয়ে যায়। তেমন কৃপণের ধন যায় সেয়ানের পেটে।

আরেক গুরু, হাতি।

করিণীর অঙ্গসঙ্গ লাভের জন্যে গর্তে পড়ে বাঁধা পড়ে। সুতরাং যে সন্ন্যাসী সে দারুময়ী যুবতীমূর্তিকেও ছোঁবে না পা দিয়ে।

পরের গুরু, হরিণ।

হরিণ ধরা পড়ে ব্যাধের গীতে আকৃষ্ট হয়ে। ঋষ্যশৃঙ্গও নারীদের নৃত্যগীতে মুগ্ধ হয়ে আটকা পড়েছিল সংসারে। সুতরাং নৃত্যগীত দেখা করবে না।

তারপরে মৎস্য।

রসে জিতে সর্বং জিতং। রসনা জয় করতে পারলেই সর্বজয়ী হলে। আমিষযুক্ত বড়শি দিয়েই মাছ ধরে। সুতরাং সর্ব অর্থে রসনাকে সংযত করো।

আরেক গুরু পিঙ্গলা।

বিদেহনগরের গণিকা এই পিঙ্গলা। একদিন বেশভূষা করে প্রণয়ীর আশায় অপেক্ষা করছে গৃহদ্বারে। এ এল না, ও নিশ্চয়ই আসবে এমনি ভাবছে পথচারীদের লক্ষ্য করে। একবার ঘরে ঢোকে, আবার দরজার বাইরে এসে দাঁড়ায়। আশা-নিরাশায় দুলছে এমনি সারাক্ষণ। প্রায় মধ্যরাতও বুঝি কেটে যায়। তখন মনে নির্বেদ এল পিঙ্গলার। ছি-ছি, নিজ দেহ বিক্রয় করে অন্য দেহ থেকে রতি আর বিত্ত আশা করছি। যিনি সর্বদা সমীপস্থ, যিনি রতিপ্রদ বিত্তপ্রদ তাঁকে ছেড়ে দিয়ে দুঃখভয়শোকমোহের আকর তুচ্ছ দেহকে ভজনা করছি। না, এ অপমান সহনাতীত। সর্বদেহীর যিনি সুহৃৎ, প্রিয়তম, নাথ আর আত্মা, তাঁর নিকট দেহ বিক্রয় করে লক্ষ্মীর মত তাঁর সঙ্গেই আমি রমণ করব। এখন যেহেতু কামনাভঙ্গ-জনিত নৈরাশ্য আমার মনে এসেছে ভগবান বিষ্ণু নিশ্চয়ই আমার উপর সদয় হয়েছেন। অতএব বিষয়সঙ্গহেতু যে দুরাশা তা ত্যাগ করে ভগবানের শরণ নিলাম। শান্তি পেল পিঙ্গলা। শয্যায় গিয়ে সুখে ঘুমিয়ে পড়ল। আশাই দুঃখের কারণ, আশাত্যাগই পরম সুখ।

অষ্টাদশ গুরু, বালক। অজ্ঞ বালক।

মান নেই অপমান নেই চিন্তা নেই ভাবনা নেই লজ্জা ঘৃণা ভয় কিছু নেই। বালকের থেকে শেখ আত্মক্রীড়তা। আত্মক্রীড় হয়ে সংসারে অবস্থান করো।

অন্য গুরু, কুমারী।

হাতে কয়েক গাছি কঙ্কণ, ঘরে বসে ধান কুটছে কুমারী। মৃদু-মৃদু শব্দ হচ্ছে কঙ্কণের। বাইরে উৎকর্ণ পথিক দাঁড়িয়ে পড়েছে কঙ্কণের শব্দে। নিশ্চয়ই এ কোনো কুমারীর গৃহকাজ, তারই হাত দুটির নড়াচড়া। কঙ্কণনিক্কণে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করে ফেলেছে। তখন কী করে কুমারী! দুগাছি রেখে বাকি কঙ্কণ খুলে নিল হাত থেকে। সে কি, এখনো একটু-একটু শব্দ হচ্ছে যে। দেয়ালের বাইরে এখনো লোকে কান খাড়া করে আছে। তখন আরো একগাছি খুলে ফেলল। মোটে একগাছি রাখল তার মণিবন্ধে। আর শব্দ নেই। সেই এককঙ্কণন্যায় একাকী

থাকো! কুমারীর থেকে শেখ সঙ্গরাহিত্য।

পরের গুরু, শরনির্মাতা।

শরনির্মাতা যখন একমনে শর সরল করে তখন সমুখ দিয়ে ভেরীঘোষসহ রাজাও যদি চলে যায় টের পাবে না। তেমনি মনকে এক বস্তুতে, সার বস্তুতে যুক্ত করো।

তারপর, সর্প।

পরকৃত গর্তে বাস করে সাপ। একা ঘুরে বেড়ায়। সাপের থেকে শেখ অনিকেতনতা।

ঊর্ণনাভ আরেক গুরু।

কী করে মাকড়সা? নিজের হৃদয় থেকে মুখ দিয়ে সূক্ষ্ম তন্তুজাল বিস্তার করে। সেই জালের মধ্যেই বাস করে বিহার করে। আবার শেষকালে নিজেই গ্রাস করে সেই জাল। তবে এই শেখ মাকড়সা থেকে যে ঈশ্বরই সৃষ্টি করছেন স্থিতি করছেন আবার সংহারও করছেন।

আরেক গুরু, কীট।

এমন কীট আছে যে অন্য কীট কর্তৃক ধৃত হয়ে নীত হয় তার বিবরে। তখন ভয়ে-ভয়ে সে আততায়ী কীটের ধ্যান করতে-করতে তারই আকারপ্রাপ্ত হয়। তেমনি তন্ময় হয়ে ভগবানের ধ্যান করো। তাঁর সারূপ্যলাভ হয়ে যাবে।

শেষ গুরু, শ্রেষ্ঠ গুরু তোমার নিজের দেহ।

নিজের দেহ? হ্যাঁ, এর সাহায্যেই সমস্ত তত্ত্ব নিরূপণ করছ। বড় বিচিত্রচরিত্র এই গুরু। একে একটু বেশি সেবা করলেই নিয়ে যায় অধঃপাতে। একে শুধু প্রাণ-মাত্রধারণের উপযোগী ভোগ দাও, তোমাকে জ্ঞানবৈরাগ্য দেবে। আর কী দেখছ? দেখছ পরিবার বিস্তার করছে দেহ, সে পরিবারপালনের জন্যে কত ক্লেশকষ্ট, শেষে বৃক্ষের মতো দেহান্তরের বীজ সৃষ্টি করে নিজেকে নাশ করছে।

বহু সপত্নী যেমন গৃহপতিকে টানছে তেমনি মনকে টানছে নানা শক্তি, নানা ইন্দ্রিয়। সর্বপ্রকার আসক্তি ত্যাগ করে সমচিত্ত হও।

শুধু একজনের কাছ থেকে নয়, বহুজনের কাছ থেকে, যার কাছ থেকে যেটুকু পারো, জ্ঞানকণা কুড়িয়ে নাও।

তদ্‌গতান্তরাত্মা হও।

যাকে ঠাকুর বলেন, 'ডাইলিউট হয়ে যাও।'

নাটমন্দিরে একা-একা পাইচারি করছেন ঠাকুর। যেমন সিংহ অরণ্যে একা থাকতে ভালোবাসে তেমনি। নিঃসঙ্গানন্দ।

শশধর পণ্ডিতকে লক্ষ্য করে বললেন, 'দেখলে, ডাইলিউট হয়ে গেছে। কেমন বিনয়ী। আর সব কথা লয়।'

যে আসল পণ্ডিত সে সব কথাই নেবে। যখন যেটুকু পায়, যেখান থেকেই পাক। কোনো গোঁড়ামি নেই, বাঁধা-ধরা নেই, এই পাত্র ধরে আছি যেখান থেকে পারো দাও আমাকে স্নিগ্ধ হবার শান্ত হবার শরণাগত হবার মন্ত্র।

কিন্তু যাই বলো, শুধু পাণ্ডিত্যে কী হবে? কিছু তপস্যার দরকার। কিছু সাধ্য-সাধনার।

তবে জ্ঞান হলে কী হয়? ঠাকুর বললেন শশধরকে দেখে, 'প্রথম চিহ্ন, শান্ত। দ্বিতীয় অভিমানশূন্য। দেখ না শশধরের দুই চিহ্নই আছে।'

দেরি করে এসেছে বলে ঠাকুর রসিকতা করছেন, 'আমরা সকলে বাসরশয্যা জেগে বসে আছি। বর কখন আসবে।'

ঠাকুরকে প্রণাম করে বসল শশধর।

জিগগেস করল, 'আর কি লক্ষণ জ্ঞানীর?'

'আরো লক্ষণ আছে।' বলছেন ঠাকুর। 'সাধুর কাছে ত্যাগী, কর্মস্থলে, যেমন লেকচার দেবার সময় সিংহতুল্য। আবার স্ত্রীর কাছে রসরাজ, রসিকশেখর।' সবাই হেসে উঠল।

শশধর জিগগেস করলে, 'কিরূপ ভক্তিতে তাঁকে পাওয়া যায়?'

'আমার বাপু জলন্ত ভক্তি, জলন্ত বিশ্বাস। ভক্তি তো তিনরকম। সাত্ত্বিক ভক্তি, সব সময়ে গোপনে রাখে নিজেকে। হয়তো মশারির মধ্যে বসে ধ্যান করে কেউ টেরও পায় না। আর রাজসিক ভক্তি—লোকে দেখুক, আমি ভক্ত। ষোড়শ উপচারে পূজা করে, গরদ পরে বসে গিয়ে ঠাকুর ঘরে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় মুক্তো, মাঝে-মাঝে আবার একটি করে সোনার রুদ্রাক্ষ।'

'আর তামসিক?'

'যাকে বলে ডাকাতে ভক্তি, উৎপেতে ভক্তি।' বলতে-বলতে ঠাকুরের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল: 'ডাকাত ঢে কি নিয়ে ডাকাতি করে, আটটা দারোগায় ভয় নেই, মুখে কেবল মারো, কাটো, লোটো। উন্মত্ত হুঙ্কার, হর হর ব্যোম ব্যোম। মনে খুব জোর। খুব বিশ্বাস। একবার নাম করেছি, আমার আবার পাপ!'

এই তমোগুণেই ঈশ্বরলাভ। ঈশ্বরের কাছে জোর করো। রোক করো। তিনি তো পর নন, আপনার লোক, আমার সব কিছু। তাঁর কাছে আবার ঢাকব কি, লুকোবো কি? তিনিই তো আমাকে ভক্ত করে দীপ্ত করলেন। আমার লজ্জাহরণ করলেন। তাই নির্লজ্জের মত ধরব এবার আঁকড়ে। আর ছাড়ানছোড়ান নেই।

দেখ আবার সেই তমোগুণই পরের ভালোর জন্যে প্রয়োগ করা যায়। যে বৈদ্য শুধু রোগীর নাড়ী টিপে 'ওষুধ খেয়ো হে', বলে চলে যায়, রুগী খেল কিনা খোঁজ নেয় না, সে অধম বৈদ্য। যে বৈদ্য রুগীকে ওষুধ খেতে বোঝায় অনেক করে, মিষ্টি কথায় বলে, 'ওষুধ না খেলে কেমন করে ভালো হবে, লক্ষ্মীটি খাও, এই দেখ আমি ওষুধ মেড়ে দিচ্ছি,' সে মধ্যম বৈদ্য। আর উত্তম বৈদ্য কে? রুগী কোনোমতেই খেল না দেখে সে বুকে হাঁটু দিয়ে বসে জোর করে ওষুধ খাইয়ে দেয়। কি, খাবে না কি, জোর করে জবরদস্তি করে খাইয়ে দেব। এটা হল বৈদ্যের তমোগুণ। এতে রুগীর মঙ্গল, বৈদ্যেরও সাফল্য।

'তেমনি ভক্তির তমঃ। যেন ডাকাতপড়া ভাব। তাঁর নাম করেছি আমার আবার পাপ! আমি যেমনই ছেলে হই তুমি আমার আপন মা, তোমাকে দেখা দিতেই হবে।' বলে প্রেমে উন্মত্ত হয়ে গান ধরলেন ঠাকুর:

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি
আখেরে এ দীনে না তারো কেমনে,
জানা যাবে গো শঙ্করী।
নাশি গোব্রাহ্মণ হত্যা করি ভ্রূণ
সুরাপানাদি বিনাশি নারী
এ সব পাতক না ভাবি তিলেক
ওমা, ব্রহ্মপদ নিতে পারি॥

ঠাকুর গাইছেন আর তাই শুনে কাঁদছে শশধর। পাণ্ডিত্যের তুষারপিণ্ড গলে গিয়েছে। ডাইলিউট হয়ে গিয়েছে।

॥ ১২৫ ॥

তবে এক গল্প শোনো:

এক ব্রাহ্মণ অনেক যত্নে সুন্দর একটি বাগান করেছে। নানারকমের গাছ, ফুলে-ফলে ভরা সেদিন হল কি, একটা কার গরু ঢুকে পড়েছে বাগানে। ঢুকে পড়েই, বলা-কওয়া নেই, খেতে শুরু করে দিয়েছে গাছ-গাছালি। দেখতে পেয়ে বামুন তো রেগে টং। হাতের কাছে ছিল এক আস্ত-মস্ত লাঠি, তাই দিয়ে গরুর মাথায় মারলে এক ঘা। সেই ঘা এত প্রচণ্ড হল যে গরুটা মরে গেল তক্ষুনি। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল বামুন। গোহত্যা করে ফেললুম। হিন্দু হয়ে? এ পাপের কি আর

চারা আছে? তখন তার মনে পড়ল বেদান্তে আছে, চোখের কর্তা সূর্য, কানের কর্তা পবন, হাতের কর্তা ইন্দ্র। ঠিকই তো, বামুন লাফিয়ে উঠল, এ গোহত্যা তা আমি করিনি, ইন্দ্র করেছে। যেহেতু ইন্দ্রের শক্তিতে হাত চালিত হয়েছে এ গোহত্যার জন্যে দায়ী ইন্দ্র। মন খাঁটি করলে বামুন। ফলে গোহত্যার পাপ তার শরীরে ঢুকতে পেল না, মনের দরজায় ধাক্কা খেয়ে থমকে দাঁড়াল। মন বললে, এ পাপ আমার নয়, ইন্দ্রের। আমাকে কেন, তাকে গিয়ে ধরো। পাপ তখুনি ছুটল ইন্দ্রকে ধরতে। ব্যাপার শুনে ইন্দ্র তো অবাক। বললে, রোসো, আগে বামুনের সঙ্গে দুটো কথা কয়ে আসি। মানুষের রূপ ধরে ইন্দ্র তখন এল সেই বাগানে। ফুল-ফল লতাপাতা দেখে মন খুলে খুব প্রশংসা করতে লাগল। বামুনকে শুনিয়ে-শুনিয়ে। মশাই, বলতে পারেন এ বাগানখানি কার? জিগগেস করল বামুনকে। আজ্ঞে, এটি আমার করা। এ সব গাছপালা আমি পুঁতেছি। আসুন না, ভালো করে দেখুন না ঘুরে-টুরে। ইন্দ্র ঢুকল বাগানের মধ্যে। যেন কতই সব দেখছে এমনি ভাব করতে-করতে অন্যমনস্কের মত সে জায়গাটায় এসে উপস্থিত হল যেখানে মৃতমৃত গরুটা পড়ে আছে। রাম, রাম, এ কি, এখানে গোহত্যা করলে কে! বামুন মহা ফাঁপরে পড়ল। এতক্ষণ সব আমি করেছি, সব আমার করা, বলে খুব বরফট্টাই করছিল, এখন মাথা চুলকোতে লাগল। তখন ইন্দ্র নিজরূপ ধরলে। বললে, তবে রে ভণ্ড, বাগানের যা কিছু ভালো সব তুমি করেছ আর গোহত্যাটিই কেবল আমি করেছি! বটে? নে তোর গোহত্যার পাপ। আর যায় কোথায়, পাপ এসে ঢুকে পড়ল ব্রাহ্মণের শরীরে। তাই বলি, যা করেন সব তিনি এই বলে নিজেকে ঠকিও না। নিজের বেলায় ভালোটি আর মন্দটি ভগবানের ঘাড়ে। ওটি চলবে না। ভালোমন্দ সব তাঁকে অর্পণ করে ভালোমন্দের ওপারে চলে যাও।

জ্ঞেয় বস্তু কি?

সুখদুঃখরহিত ঈশ্বরই জ্ঞেয়।

সুখদুঃখরহিত কোনো বস্তু আছে, থাকতে পারে?

পারে। শীত আর গ্রীষ্মের সন্ধিস্থলে কি আছে? এমন একটি অনির্বচনীয় অবস্থা, যা শীতলও নয় উষ্ণ নয়। যদি শৈত্যোষ্ণতাজ্ঞানহীন বস্তু থাকা সম্ভব, তাহলে সুখদুঃখবিহীন বস্তুর অস্তিত্বও মানতে হবে।

অমৃত সরকার ডাক্তার মহেন্দ্র সরকারের ছেলে। সে অবতার মানে না।

'তাতে দোষ কি?' ঠাকুর বললেন স্নেহহাস্যে। 'ঈশ্বরকে নিরাকার বলে বিশ্বাস থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়। আবার সাকার বলেও যদি বিশ্বাস করো, ঠকবে না। দুটি জিনিস শুধু দরকার, সে দুটি থাকলেই হল। সে দুটির একটি হচ্ছে বিশ্বাস,

আর একটি শরণাগতি। ঈশ্বর মানুষ হয়ে এসেছেন এ বিশ্বাস কি করা সোজা? এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরতে পারে? তাই কথা হচ্ছে যে পথে যাও যদি আন্তরিক হও ঠিক-ঠিক মিলে যাবে অমৃত। মিছরির রুটি সিধে করেই খাও আর আড় করেই খাও সমান মিষ্টি।'

আবার, সাকারবাদীদের মতে একটি-দুটি দেবতা নয়, তেত্রিশ কোটি।

হলই বা। কলকাতা শহরে হাজার-হাজার ডাকবাক্স। বড় পোস্টাফিসেই ফেল আর ছোট ঐ ডাকবাক্সেই ফেল, ঠিকানা যদি ঠিক-ঠিক লেখা থাকে, যথাস্থানে গিয়ে পৌছুবে। একটি ডাক পাঠাও তাঁকে, তোমার পায়ে পড়ি। পাঠিয়ে একবারটি দেখ ঠিক পৌছয় কিনা।

'তোমার ছেলে অমৃতটি বেশ।' ডাক্তারকে বললেন ঠাকুর।

'সে তো আপনার চেলা।'

'আমার কোনো শালা চেলা নেই।' ঠাকুর হাসলেন। 'আমিই সকলের চেলা। সকলেই ঈশ্বরের ছেলে, ঈশ্বরের দাস। আমিও ঈশ্বরের ছেলে, ঈশ্বরের দাস। চাঁদা মামা সকলের মামা।'

একটি যুবক ঠাকুরকে এসে জিগগেস করলে, 'মশায়, কাম কি করে যায়? এত চেষ্টা করি তবু মাঝে-মাঝে মনে কুচিন্তা এসে পড়ে।'

'আসুক না।' ঠাকুর নিশ্চিন্তের মত বললেন। 'কেন এল তাই বসে-বসে ভাবতে যাওয়া কেন? শরীরের ধর্মে আসে, আসবে। তাই বলে মাথা ঘামাবিনে। মাথা না ঘামালেই মাথা তুলতে পারবে না কাম। তা ছাড়া তোকে বলে দি, কলিতে মনের পাপ পাপ নয়।'

'কিন্তু মনের ও ভাবটা যাবে কি করে?'

'হরিনামে। হরিনামের বন্যায় ভেসে যাবে সব আবর্জনা।'

যোগীনেরও সেই জিজ্ঞাসা। কাম যায় কিসে? শুধু হরিনামে যাবে এ সে মানতে রাজী নয়। কত লোকই তো হরি-হরি করছে, কারুরই তো যাওয়ার নমুনা দেখছি না। পঞ্চবটীতে এক হঠযোগী এসেছে, তার সঙ্গ করল। যদি কিছু আসন-প্রাণায়ামের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া দিয়ে দমন করা যায় শত্রুকে। ঠাকুর তাকে ধরে ফেললেন। হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে চললেন নিজের ঘরের দিকে। 'তুমি আমার দিকে না গিয়ে এদিকে এসেছ, তাই না? তোকে, শোন্, বলি, ওদিকে যাসনি। ও সব হঠযোগ শিখলে ও করলে মন শরীরের উপরই পড়ে থাকবে সর্বক্ষণ, যাবে না ঈশ্বরের দিকে। আমি তোকে যা বলেছি সেই পথই ঠিক পথ। হরিনামের পথ। হরিনামের শব্দেই উড়ে যাবে পাপ-পাখি।'

নিজেকেই তবু বেশি বুদ্ধিমান বলে যোগীনের ধারণা। ভাবলে এসব ঠাকুরের অভিমানের কথা। পাছে তাঁকে ছেড়ে আর কারু কাছে যাই সেই ভয়েই অমনি একটা ফাঁকা উপদেশ দিয়েছেন। শেষকালে মনে কি ভাব এল, ঠাকুরের কথামতই দেখি না করে। লেগে গেল হরিনামের মহোৎসবে। ঠাকুরের কী অশেষ কৃপা, কয়েকদিনের মধ্যে ফল পেল প্রত্যক্ষ।

কিন্তু কামক্রোধ ঈশ্বর দিয়েছেন কিসের জন্যে?

'মহৎ লোক তৈরি করবেন বলে।' বললেন ঠাকুর। 'মন্দ না থাকলে ভালোর মাহাত্ম্য কি! অন্ধকার না থাকলে আলোর দাম কে দেয়! সীতা বললেন, রাম, অযোধ্যায় সব যদি সুন্দর অট্টালিকা হত তো বেশ হত। অনেক বাড়ি দেখছি ভাঙা আর পুরোনো। রাম বললেন, সব বাড়িই যদি সুন্দর হয়, নিখুঁত হয়, তো মিস্ত্রিরা করবে কি।'

থাক মন্দ, থাক পাপ, থাক কামক্রোধ। শুধু সংযম করো, সাবধান হও। কত রোগের থেকে সাবধান হচ্ছ, সম্ভোগের জন্যেই কত অভ্যাস করছ সংযম। এও তেমনি। আর ঈশ্বরের চেয়ে বড় সম্ভোগ আর কি আছে!

'দেখ না এই হনুমানের দিকে চেয়ে। ক্রোধ করে লঙ্কা পোড়ালো, শেষে মনে পড়ল, এই রে, অশোকবনে যে সীতা আছেন। তখন ছটফট করতে লাগল।' তাই তো বলি রাশ টানো।

মদনকে দগ্ধ করলে শিব। মুগ্ধ করলে কৃষ্ণ। শিব মদনদহন। আর কৃষ্ণ মদনমোহন! দাক্ষিণাত্য বেড়াবার সময় রামচন্দ্র ঠিক করলেন চাতুর্মাস্য করবেন। চাতুর্মাস্য কাটাবার জন্যে একটি পাহাড় মনোনীত করলেন। গিয়ে দেখলেন সেখানে একটি শিবমন্দির। রাম লক্ষ্মণকে বললেন, মন্দিরে যাও। শিবের অনুমতি নিয়ে এস। মন্দিরে গিয়ে শিবকে লক্ষ্মণ জানাল তাদের প্রার্থনা। শিব কিছুই বললেন না, শুধু অনুমূর্তি ধারণ করলেন। অনুমূর্তি মানে অদ্ভুত এক নৃত্যমূর্তি। নিজ লিঙ্গ নিজের মুখে পুরে নৃত্য করছেন। লক্ষ্মণ ফিরে এল রামের কাছে। তাঁকে বললে সব আগাগোড়া। শুনে রাম উৎফুল্ল হলেন। লক্ষ্মণ বললে, বুঝলুম না কিছু। রাম বললেন, শিব অনুমতি দিয়েছেন। তিনি ঐ মূর্তির মাধ্যমে বলছেন, লিঙ্গ আর জিহ্বা সংযম করে যেখানে খুশি সেখানে থাকো। রসনা আর বাসনাকে যদি একসঙ্গে বন্দী করতে পারো তা হলেই অভয়লাভ।

চৈত্রমাসের প্রচণ্ড রোদে ঠাকুর এসেছেন বলরাম-মন্দিরে।

বললেন, 'বলেছি তিনটের সময় যাব, তাই আসছি। কিন্তু বড় ধুপ।'

ভক্তেরা হাওয়া করতে লাগল ঠাকুরকে। সেবা করবে না সুধাস্রব মুখের দিকে

তাকিয়ে থাকবে বুঝতে পারছে না। পাখার ছন্দ ভুল হয়ে যাচ্ছে।

'ছোট-নরেন আর বাবুরামের জন্যে এলাম।' মাস্টারের দিকে তাকালেন ঠাকুর: 'পূর্ণকে কেন আনলে না?'

'সভায় আসতে ভয় পায়।' বললে মাস্টার।

'ভয়?'

'হ্যাঁ, পাছে আপনি পাঁচজনের সামনে সুখ্যাত করে বসেন, সব লোকজানাজানি হয়—'

'বা, এত তো বেশ কথা।' ঠাকুর বললেন অন্যমনস্কের মত: 'কে জানে কখন কি বলে ফেলি। যদি বলে ফেলি তো আর বলব না। আচ্ছা, পূর্ণর অবস্থা কি রকম দেখছ? ভাব-টাব হয়?'

'কই বাইরে তো কিছু দেখতে পাই না।'

'কি করে পাবে? তার আকর আলাদা। বাইরে তো তার ফুটবে না তার।'

'হ্যাঁ, আমিও তাকে সেদিন বলছিলুম আপনার সেই কথাটা।' মাস্টার বললে প্রফুল্লমুখে।

'কোন কথাটা?'

'সেই যে বলেছিলেন, সায়র দীঘিতে হাতি নামলে টের পাওয়া যায় না, কিন্তু ডোবায় নামলে তোলপাড় হয়ে যায়।'

'শুধু তাই নয়, পাড়ের উপর জল উপচে পড়ে।' ঠাকুর জুড়ে দিলেন আরেকটু। 'কিন্তু তা ছাড়া, দেখেছ? ছেলেটার আর সব লক্ষণ ভালো।'

'হ্যাঁ', মাস্টার সায় দিল: 'চোখ দুটো জলজল করছে। যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে সমুখে।'

'চোখ শুধু উজ্জ্বল হলেই হয় না। এ অন্য জাতের চোখ। আচ্ছা', ঠাকুর আরেকটু অন্তরঙ্গ হলেন: 'তোমায় কিছু বলেছে?'

'কি বিষয়?'

'এই এখানকার সঙ্গে দেখা হবার পর কিছু হয়েছে তার?'

'হ্যাঁ, বলেছে, ঈশ্বরচিন্তা করতে গেলে, আপনার নাম করতে গেলে, চোখ দিয়ে জল পড়ে, গায়ে রোমাঞ্চ হয়।'

'বা, তবে আর কি।' যেন মুক্ত হাওয়ার শান্তি পেলেন ঠাকুর।

কতক্ষণ পরে মাস্টার আবার বললে, 'সে হয়তো দাঁড়িয়ে আছে—'

'কে? কে দাঁড়িয়ে আছে?' চমকে উঠলেন ঠাকুর।

'পূর্ণ।'

'কোথায় ?'

দরজার দিকে উৎসুক হয়ে তাকালেন ঠাকুর। উঠি-উঠি করতে লাগলেন।

'এখানে নয়, হয়তো তার বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।' বললে মাস্টার।

'আমাদের কাউকে যদি যেতে দেখে রাস্তা দিয়ে অমনি ছুটে আসবে, প্রণাম করে পালাবে।'

'আহা, আহা—' ভাবে তন্ময় হলেন ঠাকুর। 'ও একটা বিরাট আধার। তা না হলে ওর জন্যে জপ করিয়ে নিলে গা ?'

সবাই কৌতূহলী হয়ে তাকাল। ঠাকুর বললেন, 'হ্যাঁ গো, পূর্ণর জন্যে বীজমন্ত্র জপ করেছি।'

বিরাট আধার, কিন্তু পূর্ণর বয়েস মোটে তেরো। বিদ্যাসাগর-ইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। ঠাকুরের কাছে যে আসে এ বাড়ির লোক পছন্দ করে না একদম। তাই লুকিয়ে-লুকিয়ে আসে এক-আধটু, মাস্টারমশায়ের ছায়ায়-ছায়ায়। সবাই সন্ত্রস্ত, কে কখন টের পায়। সকলের চেয়ে ভয় বেশি মাস্টারমশায়ের, কেননা বাড়ির লোক জানতে পেলে তাকেই দায়ী করবে সর্বাগ্রে। পূর্ণর আসা কোনো ভক্তের আসা নয় এমনি কোনো এক পথভোলা পথের ছেলের ঢুকে পড়া। সব সময়ে আড়াল করে রাখবার চেষ্টা।

এতই যখন ভয় তখন ও-ছেলেকে পথ দেখানোর কি দরকার!

আমি পথ দেখাব ? ও নিজেই পথের ঠিকানা নিয়ে এসেছে। কে ওকে বলেছে ঠিকানা কে বলবে!

কানের কাছে মুখ এনে ঠাকুরও বলছেন চুপি চুপি, 'সে সব করো ? যা সেদিন বলে দিয়েছিলাম—'

পূর্ণ ঘাড় নাড়ল। হ্যাঁ, করি।

'স্বপনে কিছু দেখ ? আগুন, মশালের আলো, সধবা মেয়ে, শ্মশানমশান ? এ সব দেখা বড় ভালো। দেখ ?'

পূর্ণ হাসল এক মুখ। বললে, 'আপনাকে দেখি।'

'তা হলেই হল।'

দেখারও দরকার নেই। শুধু টানটুকু থাকলেই হল। তুমি তো আয়-আয় করছই, আমিই শুধু যাই-যাই করছি না। তুমি যদি কারণরূপে আছ, এবার তারণরূপে এস। তোমার রূপ সর্বপ্রত্যকভূত হোক। তোমার চরণতরী আশ্রয় করতে দাও। তোমার চরণতরী আশ্রয় করে ভবাব্ধিকে যেন গোষ্পদ জ্ঞান করতে পারি।

'তোমার উন্নতি হবে।' পূর্ণকে বললেন শেষ কথা: 'আমার উপর তোমার

টান তো আছে।'

কাছি দিয়ে নৌকো বাঁধা আছে ঘাটে। তুমি জোয়ারের জল হয়ে সেই কাছিতে টান দাও। আমি যেন তোমার দিকে মুখ ফেরাতে পারি। আমার হাল না থাক পাল না থাক, তবু তুমি আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলো। তুমি হও আমার স্রোতের টান। সব-ভাসানো সব-ডুবানোর টান।

ঠাকুরের তখন অসুখ। পূর্ণ চিঠি লিখেছে ঠাকুরকে। কি লিখেছে পড়ো তো! 'আমার খুব আনন্দ হয়।' কে একজন পড়ে শোনাল পূর্ণর চিঠি: 'এত আনন্দ যে মাঝে-মাঝে রাত্রে ঘুম হয় না।'

'আমার গায়ে রোমাঞ্চ হচ্ছে।' অসুখের কষ্টকে নিমেষে উড়িয়ে দিলেন: 'আহা, দেখি দেখি চিঠিখানা।'

চিঠিখানা নিলেন হাতে করে। মুড়ে টিপে দেখতে লাগলেন। বললেন, 'অন্যের চিঠি ছুঁতে পারি না। কিন্তু এর চিঠি বেশ ভালো চিঠি। ধরতে পারি হাতের মধ্যে। ধরতে পারি বুকের উপর।'

তোমার এই আকাশব্যাপিনী জ্যোতির্ময়ী নক্ষত্রলিপিটি কবে ধরতে পারব হাতের মুঠোয়। কবে বা ধরতে পারব বুকের উপর!

॥ ১২৬ ॥

'ভক্ত্যা সর্বং ভবিষ্যতি।' ভক্তি দ্বারাই সব কিছু হবে। ভাগবতী প্রীতিই ভক্তি। ভক্তি শ্রীপাদপদ্মবিষয়িণী।

স্ফটিকমণির ঘরে যে প্রদীপ জ্বলে তার প্রকাশ তীব্র। সেই প্রদীপই যদি জ্বলে আবার পদ্মরাগমণির ঘরে তার প্রকাশ মধুর। তেমনি একই নিখিলপ্রদীপে ভগবানের দুরকম প্রকাশ—তীব্র আর মধুর। তীব্র প্রকাশের নাম ঐশ্বর্য, মধুর প্রকাশের নাম মাধুর্য।

আমার এমন কোনো সাধ্য নেই, নেই আমার আধারে এত আয়তন যে তোমার ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করি। কিন্তু ভালোবাসতে কে না পারে বলো? বনের পশু-পাখিও পারে।

তেমনি যদি একবার ভালোবাসতে পারি তোমাকে, দেখাতে পারি মধুর হওয়া কাকে বলে। তুমি তো মধুলুব্ধ মধুসূদন। তাই আমার মধুর হওয়ার কারণই হচ্ছে তুমি আছ। ভক্তই ভগবদস্তিত্বের প্রমাণ। তেমনি আমিও যেন তোমার পরিচয়টি বহন করি। পাত্র না পেলে তুমি তোমার কৃপা ঢালবে কি করে? আমাকে সে

শূন্যশান্ত পাত্রটি হতে দাও।

অমলা ভক্তি। নিশ্চলা ভক্তি। বিশুদ্ধা ভক্তি। বিমুক্তা ভক্তি।

স্বীয় প্রিয়ের নামকীর্তন করবে, লজ্জা কি। কণ্ঠস্বরটি গাঢ় করো, তীক্ষ্ণ করো। কখনো উচ্চহাস্য, কখনো রোদন কখনো আর্তনাদ কখনো গান, কখনো উন্মাদনৃত্য। জড় জীব জ্যোতিষ্ক—যা কিছু আছে স্থূলে-অস্থূলে, সমস্তই হরির শরীর বলে জেনো। অনন্যমনে প্রণাম কোরো। যে ভোজন করে তার একসঙ্গেই তুষ্টি পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়। তেমনি যে হরিকে ভালোবাসে বা ভজনা করে সে একসঙ্গেই ভক্তি, ঈশ্বরানুভূতি ও বৈরাগ্য লাভ করে।

বৈষ্ণবের মতো ভক্তও তিনরকম। যে সর্বভূতে সমদৃষ্টি, অর্থাৎ যে সর্বভূতে ঈশ্বরকে দেখে সে উত্তম ভক্ত। যার ঈশ্বরে প্রেম, জীবে মৈত্রী, অজ্ঞে কৃপা, বিরোধীর প্রতি উপেক্ষা সে মধ্যম ভক্ত। আর, অধম বা প্রাকৃত ভক্ত কে? যে শুধু বিগ্রহে-প্রতিমায় হরির পূজা করে, হরিভক্ত বা আর কাউকে নয়, সে অধম বা প্রাকৃত ভক্ত।

সন্দেহ কি, উত্তম ভক্তই ভাগবতপ্রধান। বাসনা নয়, বাসুদেবই তার একমাত্র আশ্রয়। অবশে অভিহিত হলেও যে হরিনাম পাপহরণ করে, সেই হরির পাদপদ্ম সে প্রেমরজ্জু দিয়ে বেঁধে রেখেছে হৃদয়ের মধ্যে। সাধ্য নেই হরি ত্যাগ করে সেই সুধা-নিবাস।

'কলিতে নারদীয় ভক্তি।' বললেন ঠাকুর।

নারদ মানে কি? যে নার অর্থাৎ জল দেয়। জল মানে কি? জল মানে পরমার্থবিষয়ক জ্ঞান।

নারদ কী করে?

শ্বাসে-প্রশ্বাসে হরিনাম করে।

বীণাহস্তে সুখাসীন, নারদ একদিন জিগগেস করলে ব্যাসকে, তোমাকে ক্ষুব্ধ দেখছি কেন? এমন মহাভারত রচনা করেছ, ব্রহ্মসূত্র রচনা করেছ, তোমার আর কী চাই?

এত বই লিখেও তৃপ্তি হল না। ব্যাস দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কেন আমার এই অতৃপ্তি আপনিই বলুন বিচার করে।

আমি জানি। বললে নারদ, তুমি ভগবানের অমল চরিতকথা বলোনি বিশদ করে। ব্রহ্মজ্ঞান হরিভক্তিপূর্ণ না হলে প্রীতিপ্রদ হয় না।

ভক্তিতেই তৃপ্তি। ভালোবাসাতেই গৌরব। অশ্রুতেই আনন্দ।

সুতরাং ঈশ্বরের লীলাকথা বর্ণনা করো। রসের আকার হচ্ছে রাস। বর্ণনা

করো সেই রাসলীলা।

ব্যাস রচনা করল ভাগবত। পরমবেদ্যকে শুধু জানা নয়, তাকে ভালোবাসতে জানাই আসল বিদ্যা। 'বিদ্যা ভাগবতাবধি।'

'হাবাতে কাঠ নিজে একরকম করে ভেসে যায়। কিন্তু একটা পাখি এসে বসলেই ডুবে গেল।' বলছেন ঠাকুর। 'কিন্তু নারদাদি বাহাদুরী কাঠ। নিজে তো ভাসেই, আবার কত মানুষ গরু হাতি পর্যন্ত নিয়ে যায় সঙ্গে করে। যেমন স্টীম-বোট। আপনিও পারে যায়, আবার কত লোককে পার করে।'

ঠাকুরের কাশি হয়েছে।

মহেন্দ্র ডাক্তার বললে, 'আবার কাশি হয়েছে? তা কাশিতে যাওয়া তো ভালো।' হাসল ডাক্তার।

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'তাতে তো মুক্তি গো। আমি মুক্তি চাই না ভক্তি চাই।'

মুক্তি হলে তো সব ফুরিয়ে গেল। সব শূন্যাকার। আমার স্পৃহা আস্বাদনে। ভাবগ্রহণে। ভাবের কি শেষ আছে? ভালোবাসার কি অন্ত হয়? তবে আমিই বা কেন অন্ত হব?

আমি অব্যর্থকালত্ব চাই। হে ঈশ্বর, তোমাকে ছেড়ে যেটুকু সময় যায় সেটুকুই ব্যর্থ। এমন করো যেন সব সময়ই তোমাতে লেগে থাকি, ময় থাকি, এতটুকু ক্ষণকণা যেন বিফল না হয়। আর দাও তোমার বসতিপ্রীতি। তোমার যেখানে বসতি সেখানেই আমার অনুরাগ। তোমার বাস তো শুধু তীর্থে নয়, অখিল-সংসারে। অণুতে-রেণুতে। তোমার সর্বব্যাপিত্ববোধে আমার সমস্ত স্থান তীর্থান্বিত করো। বিশ্বময় প্রীতিতে বিস্তৃত হই। স্থানে আর সময়ে এক তিল পরিমাণ তোমার বিরহব্যবধান না থাকে।

'লাখজন্ম হলেই বা ভয় কি।' বললে নরেন, 'বারে-বারে আসব, ছুঁয়ে যাব ঝরা-মরাকে, ধুয়ে যাব কটি ধূলিকণা, তুলে দিয়ে যাব কটি কাঁটার ক্লেশকষ্ট।'

আমি বৃষ্টিবিন্দু হতে চাই। বললে বিবেকানন্দ। আকাশবাসী একটি ছোট্ট বারি-কণা। কিন্তু আকাশেই থাকব না। ঝরে পড়ব।

ঝরে পড়ব কোথায়? জিগগেস করলে স্বামীজী।

শিকাগোতে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে সেই ফরাসিনী গায়িকা। মাদাম কালভে। তাকেই এই প্রশ্ন।

নীরবে গাঢ়নম্র চোখে চেয়ে আছে মাদাম।

ঝরে পড়ব, কিন্তু সমুদ্রে নয়। সমুদ্রে পড়ে মিশে যাব সেই সমুদ্রের সঙ্গে এই

কল্পনা আমার কাছে অসহ্য লাগে। কিছুতেই না, উদ্দীপ্তকণ্ঠে বলতে লাগল বিবেকানন্দ, আমি মোক্ষ চাই না, নির্বাণ চাই না, বিলুপ্তি চাই না। বারে-বারে আমি আমার এই ব্যক্তিত্বের চেতনা নিয়ে বাঁচতে চাই। আমি চাই লক্ষ-লক্ষ পুনর্জন্ম।

ঠাকুরের অভ্রান্ত প্রতিধ্বনি।

জানো না বুঝি? একদিন এক সমুদ্রে ছোট্ট একটি বৃষ্টিবিন্দু ঝরে পড়ল। মাদাম কালভের দিকে চেয়ে বলল আবার স্বামীজী। সমুদ্রে পড়েই কাঁদতে লাগল বৃষ্টিবিন্দু।

কাঁদতে লাগল? কেন? তন্ময়ের মতো জিগগেস করলে মাদাম।

ভয়ে। দুঃখে। মিশে যাবে মিলিয়ে যাবে এই বেদনায়। সমুদ্র বললে, ভয় কি, দুঃখ কি, কত শত বৃষ্টিবিন্দু, কত শত তোমার ভাইবোন এমনি করে পড়েছে আমার মধ্যে। জল হয়ে মিশে গিয়েছে জলাশয়ে। তোমাদের এই বিন্দু-বিন্দু জলবিন্দু দিয়েই তো আমি তৈরি। বিন্দু ছাড়া কি সিন্ধু আছে?

তবু কাঁদতে লাগল বৃষ্টিবিন্দু। আমি লুপ্ত হতে চাই না, আমি লিপ্ত হতে চাই। সমুদ্র বললে, বেশ, তবে সূর্যকে বলো তোমাকে মেঘলোকে নিয়ে যাক। আকাশ থেকে ঝরে পড়ো আরেকবার।

খুশির রঙে টলমল করে উঠল সেই বৃষ্টিবিন্দু। চলে গেল মেঘলোকে। আবার ঝরে পড়ল। এবার জলে পড়ল না, মাটিতে পড়ল। তৃষ্ণার্ত, মলিন মাটিতে। মুছে দিল এক কণা ধূলি। মুছে দিল এক কণা পিপাসা।

মাদাম কালভের দুই চোখে মন্ত্রের সম্মোহন। মন্ত্রের সঞ্জীবনী।

হ্যাঁ, বারে-বারে জন্মাব। শঙ্খনাদ-উদার কণ্ঠে বললে বিবেকানন্দ, যতবার যেটুকু পারি কাঁটা তুলে দিয়ে যাব পৃথিবীর। যেটুকু পারি দেয়াল ভেঙে ফেলব ব্যবধানের যেটুকু পারি পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে যাব সর্বসুখদাতা ঈশ্বরের দিকে। আমি চাই না আমার এই ব্যক্তিত্বের বিনাশ, এই আত্মচেতনার বিলুপ্তি। আমিই সেই মহান অজানা। সেই অখিল অলৌকিক। বারে বারে এই লোকসংসারে ফিরে-ফিরে এসে জানাব নিজেকে, এক অধ্যায় থেকে আরেক অধ্যায়ে, বৃহত্তর অধ্যায়ে—

দুই চোখ জলে উঠল স্বামীজীর।

ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'হ্যাঁ রে নরেন, আর পড়বি না?'

নরেন বললে, 'একটা ওষুধ পেলে বাঁচি, যাতে পড়াটড়া যা হয়েছে সব ভুলে যাই।'

শুধু পাণ্ডিত্যে কী হবে? আর কতই বা পড়বে জিগগেস করি? হাটের বাইরে থেকে দাঁড়িয়ে একটা হো-হো শব্দ শোনা যায়, হাটের মধ্যে ঢুকলে তখন

অন্যরকম। তখন সব দেখছ-শুনছ কোথায় কি বেপারবেসাতি, কোথায় কি দরদাম! সমুদ্রও দূর থেকে হো-হো শব্দ করছে। কী হবে শুধু শব্দ শুনে? কাছে এগোও, দেখবে কত জাহাজ কত পাখি কত ঢেউ। তারপরে স্নান করে তার স্বাদ নাও। সার কথা, হাটের মধ্যে প্রবেশ করা, অবগাহন করা সমুদ্রে।

গুরুর জন্যে শাস্ত্রপাঠ? পথনির্দেশের জন্যে? গুরু না থাকে, না জোটে, শুধু ব্যাকুল হয়ে কাঁদো, কেঁদে-কেঁদে প্রার্থনা করো। তিনিই দেবেন সব বলে-কয়ে, জানিয়ে-বুঝিয়ে।

সমুৎকণ্ঠায় কণ্টকিত হও। আসন জমিয়ে বসলাম তোমার এই দুয়ারে। প্রস্তুত হয়ে এসেছি, মরবার জন্যে প্রস্তুত। যাকে ইচ্ছে সরিয়ে দাও তুলে নাও, আমাকে পারবে না হটাতে। কিছু একটা করে তবে উঠব। হয় ধরে নয় মরে। হয় তোমার ঘরে মিলন নয় তোমার দুয়ারে মৃত্যু। ঘর-দুয়ার এক করে ছাড়ব।

'নরেন বেশি আসেনা।' ঠাকুর আক্ষেপ করছেন। নিজেই আবার প্রবোধ দিচ্ছেন নিজেকে। 'তা ভালোই করে। ও বেশি এলে আমি বিহ্বল হই।'

কাউকে কেয়ার করে না নরেন। এইটেই যেন কত বড় তার গুণের কথা। 'বলব কি, আমাকেই কেয়ার করে না।' স্নেহস্রবস্বরে বলছেন ঠাকুর, 'সেদিন কাপ্তেনের গাড়িতে যাচ্ছিল আমার সঙ্গে। ভালো জায়গায় তাকে কত বসতে বলল কাপ্তেন। তা সে চেয়েও দেখল না। সেদিন হাজরার সঙ্গে কত-কি কথা কইছে। জিগগেস করলুম, কি গো, কি সব কথা হচ্ছে তোমাদের? উড়িয়ে দিল আমাকে, বললে, লম্বা-লম্বা কথা। দেখেছ তো কত বিদ্বান আমার নরেন, তবু আমার কাছে কিছু প্রকাশ করে না, পাছে লোকের কাছে বলে বেড়াই। মায়ামোহ নেই, বন্ধনপীড়ন নেই, একেবারে খাপখোলা তরোয়াল।'

প্রথমে ধূমায়িত পরে জ্বলিত, পরে দীপ্ত, পরে উদ্দীপ্ত এই অগ্নি।

সন্ধ্যের পর ঠাকুরের কলকাতা যাবার কথা। পাইচারি করছেন এদিক-ওদিক আর মাস্টারের সঙ্গে পরামর্শ করছেন, 'তাই তো হে কার গাড়িতে যাই—'

এমন সময় নরেন এসে উপস্থিত। এসেই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল ঠাকুরকে।

'এসেছ? তুমি এসেছ?' যেন গুমোট করে ছিল চারদিক এক ঝলক বসন্তবাতাস ছুটে এল। যেমন কচি ছেলেকে আদর করে তেমনি ভাবে নরেনের মুখে হাত দিয়ে আদর করতে লাগলেন। ভাবখানা এই, আমাকে ছেড়ে কোথায় যাবি? কতদিন থাকবি তোর ও-সব জ্ঞানতর্কের পাথরের দেশে? আমি তোকে গলিয়ে দেব, ছুঁয়ে-ছুঁয়ে, আদর করে-করে, তোর চোখের সঙ্গে চোখ মিলিয়ে। জ্ঞান-তর্কে পারব না

তোর সঙ্গে, কিন্তু তোকে ভালোবাসায় জিতে নেব। আমি যদি তোকে ভালোবাসি তবে সাধ্য কি তুই আমাকে ফেলে যাস, আমাকে ছেড়ে থাকিস ?

মাস্টারের দিকে তাকালেন ঠাকুর। হাসিহাসি মুখে বললেন, 'কি হে, আর যাওয়া যায় ?'

আনন্দভরা চোখে মাস্টারও হাসতে লাগল।

'জানো, লোক দিয়ে নরেন্দ্রকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। ও এসেছে। বলো, আর কি যাওয়া যায় ?'

'যে আজ্ঞে। আজ তবে থাক।'

ঠাকুরও যেন পরম স্বস্তি পেলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, কাল যাব। গাড়ি না হয় নৌকোয় যাব। কি বলো ? আজ নরেন এসেছে। লোক পাঠিয়েছিলুমই বা। ওর কী দায় ছিল আসতে ? তবু ও এসেছে। আজ আর যাওয়া যায় না।' আর-সব ভক্তবৃন্দ যারা সমবেত হয়েছিল তাদের উদ্দেশ করে বললেন, 'তোমরা আজ এস। অনেক রাত হল।'

একে-একে প্রণাম করে বিদায় হল ভক্তেরা। নরেনের বেলায় না-রাত না-দিন।

হরি বিনে কৈসে গোঙায়বি দিনরাতিয়া। শুধু একবেলার ক্ষণিক মিলন নয়, চাই চিরজীবনধনের সঙ্গে চিরজীবনক্ষণের মিলন।

আমি একতাল সোনা আমাকে তুমি আগুনে পুড়িয়ে গলিয়ে নাও। কি, বিশ্বাস হয় না ? আলো তোমার আগুন, আজই হাতে-হাতে নাও পরখ করে। তোমার যেমন খুশি সকল নাচে নাচিয়ে নাও আমাকে, বাজিয়ে নাও সকল রাগিণীতে। সব ছেঁকে নাও, বেছে নাও, পিষে নাও। তোমার যা পছন্দ তাতেই আমি রাজী। তুমি যাতে নিশ্চিত তাতেই আমি নিশ্চিন্ত। তাই যদি হয় তবে আমার সুখও বাহবা দুঃখও বাহবা।

রাম দত্তর সঙ্গে তর্ক করছে নরেন। তুমুল তর্ক।

মাস্টার এক পাশে বসে। ঠাকুরও দেখছেন চুপ করে। শেষকালে বললেন মাস্টারকে লক্ষ্য করে, 'আমার এসব বিচার ভালো লাগে না।' ধমক দিলেন রামকে। 'থামো।' না থামো তো, আস্তে-আস্তে। কে কার কথা শোনে। রাম থামলেও নরেন থামবে না। কিন্তু তাকে কে ধমক দেবে ?

অসহায়ের মত তাকালেন আবার মাস্টারের দিকে। বললেন, 'আমি এসব বাকবিতণ্ডা জানিও না, বুঝিও না। আমি অবোধ ছেলের মত শুধু কাঁদতুম আর বলতুম, মা, এ বলছে এই, ও বলছে ঐ। কোনটা সত্য তুই আমাকে বুঝিয়ে দে।' এই আত্মনিবেদন। এই ভক্তি পরমপ্রেমরূপা। ভালোবাসার করস্পর্শে লৌহদুর্গের

দ্বার খোলা।

কিছু জানি না কিছু বুঝি না। তবু তোমাকে ভালোবাসি।

॥ ১২৭ ॥

যদি আর কিছু না পারো সারা দিনমানে একবার, শুধু একবার আমাকে মনে কোরো।

নবগোপাল ঘোষ প্রথম দিন তো একেবারে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এসেছিল। তারপর সেই যে ডুব মারল, তিন-তিন বছর আর দেখা নেই।

'হ্যাঁ রে, কি হল বল দেখি নবগোপালের? তাকে একটু খবর দে।' তিন-তিন বছর পর একদিন খোঁজ করলেন ঠাকুর।

খবর গেল নবগোপালের কাছে। সে তো প্রায় আকাশ থেকে পড়ল। সেই কবে একবার গিয়েছিলাম তিন বছর আগে, সেই কথা আজও পর্যন্ত মনে করে রেখেছেন! ভুলে যাননি! দিনে-রাত্রে কত লোক আসছে তাঁর কাছে, তার মধ্যে কে-না-কে নবগোপাল ঘোষ, তাকেও হারিয়ে যেতে দেননি। স্মৃতির কৌটোর এক পাশে কুড়িয়ে রেখেছেন।

কিছুই তিনি হারান না। ফেলে দেন না ভোলেন না এতটুকু। আমরাই ভুলি। ফিরে যাই। পথ হারিয়ে পথ খুঁজি।

সময় হলে তিনিই আবার পথ দেখান। ডাক দেন।

নবগোপাল পড়ল আবার পায়ে এসে। তুমি ভোলো না। চিরজ্যোতির্ময়ী নক্ষত্র-লিপিতে প্রতি রাত্রে তুমি লিখে পাঠাও, আমি ভুলিনি। বিনম্রকোমল শ্যামলশীতল তৃণদলেও সেই ভাষাই লিখে রেখেছ, ভুলিনি তোমাকে। বললে, 'আমার সাধনভজন কি করে কী হবে?'

'তোমাকে কিছু করতে হবে না।' বললেন ঠাকুর, 'মাঝে-মাঝে শুধু দক্ষিণেশ্বরে এসো।'

শুধু এইটুকু?

এই বা কি কম কঠিন? দেখ না, কত বাধা এসে পড়বে যাবার মুখে। মন ঠিক করতেই এক যুগ। তারপর মন যদি ঠিক হল তো শরীর বললে ঠিক নেই। মন-শরীর দুই-ই ঠিক, হঠাৎ দেখা দিল সর্বসঙ্কল্পনাশন অক্কাজের তাড়না। হাতের কাছে দক্ষিণেশ্বর, সেই হাত খুঁজতেই রাত ফুরোয়।

একদিন ভাবসমাধি হয়েছে ঠাকুরের, নবগোপাল এসে হাজির। রাম দত্ত ছিল, নবগোপালকে বললে, 'এইবেলা ঠাকুরের কাছ থেকে কিছু বর চেয়ে নিন।'

নবগোপাল সাষ্টাঙ্গ হয়ে পড়ল ঠাকুরের পায়ের কাছে। বললে, 'বিষয়চিন্তায় ডুবে আছি। কি করে যাবে এই বিষজ্বালা আমাকে বলে দিন।'

'কোনো চিন্তা নেই।' আশ্বাস দিলেন ঠাকুর। 'যদি আর কিছু না পারো সারা দিনমানে একবার, শুধু একবার আমাকে স্মরণ কোরো।'

শুধু এইটুকু?

হ্যাঁ, এইটুকু। অঙ্কুরটি ছোট, কিন্তু ওর মধ্যে অব্যক্ত আছে বনস্পতির আয়তন। বেশ তো, দেখ না, সারা দিনে-রাত্রে শুধু একবার আমাকে স্মরণ করে দেখ না কি হয়! একবার স্মরণ করলেই কতবার সাধ যায় স্মরণ করতে। স্মরণ করতে-করতেই অনন্যশরণ।

একদিকে তুমি কত সহজ, আমার দুর্বল দুই বাহুর বন্ধনে বন্দী, আবার আরেক-দিকে তুমি অপরিসীম, সমস্ত আয়ত্তের অতীত, সমস্ত বন্দন-ক্রন্দনের বাইরে। একদিকে তুমি কঠোর কাজের মানুষ, আরেকদিকে তুমি অকাজের রাজা। বৃত্তিরূপে থেকে আবার নিবৃত্তিরূপে বিরাজিত। একবার দেখি অমোঘ নিয়মে বেঁধে রেখেছ আমাকে, আবার দেখি তোমার অশাসনের অঙ্গনে বাজিয়ে দিয়েছ আমার ছুটির ঘণ্টা। একদিকে তুমি সুদুর্গম সুগম্ভীর, আবার, কি আশ্চর্য, তুমি একেবারে হিসাব-কিতাবছাড়া উদ্‌ভ্রান্ত ভোলানাথ।

সেইখানেই তো আমার ভরসা। আমি কি পারব তোমাকে গৌরীশঙ্করের চূড়ায় গিয়ে ধরতে? আমি ধরব তোমাকে বিধি-বাধা-না-মানা ঝড়ের ঘূর্ণবেগে। আর সকলের কাছে তুমি দস্তুরসঙ্গত, আমার কাছে তুমি খাপছাড়া, অগোছালো। আমার যে ভালোবাসার বেসাতি। অনাবশ্যকের ঐশ্বর্য।

নবাই চৈতন্যরও সেই কথা।

পানিহাটির উৎসবে এসেছেন ঠাকুর। নৌকোয় উঠেছেন ফিরে যাবার মুখে, ছুটতে-ছুটতে নবাই এসে হাজির। বাড়ি কোন্নগর, মনোমোহনের খুড়ো। শুনেছে ঠাকুর এসেছেন উৎসবে, তাই দেখতে এসেছে। এতক্ষণ খুঁজেছে ভিড়ের মধ্যে, দলের মধ্যে সেই শতদল কোথায়, ভিড়ের মধ্যে কোথায় সেই অপরূপ! এত দেরি করে এলে কেন? ঐ যে তিনি নৌকোয় উঠছেন। সত্যি? ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল নবাই! ছেড়ো না, ছেড়ো না নৌকো। আর কি ছাড়ে! যে মুহূর্তে দেখতে পেলেন ব্যথিতের ব্যাকুলতা, পারায়ণ-পরায়ণ স্তব্ধ হলেন।

পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল নবাই। আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল।

একেই বলে দেখা আর প্রেমে পড়া। কিম্বা প্রেমে পড়ে দেখা। খুঁজেছে, ছুটেছে, লুটিয়ে পড়েছে। প্রশ্ন করেনি, তর্ক করেনি, বিশ্বাসের দৃঢ় ভূমিতে জাগতে দেয়নি

দ্বিধার কুশাঙ্কুর। শুধু বিশ্বাস নয়, উন্মত্ত ব্যাকুলতা। একেবারে সর্বসমর্পণ। ঠাকুর তাকে স্পর্শ করলেন।

পাগলের মত নাচতে লাগল নবাই। নাচে, নাচে, আবার থেকে-থেকে প্রণাম করে ঠাকুরকে।

আরেক রকম স্পর্শে তাকে ফের প্রকৃতিস্থ করলেন ঠাকুর। সবাই ভাবলে শান্ত হয়ে গেল বুঝি নবাই। দেখল ছেলের উপর সংসারের ভার দিয়ে নবাই গঙ্গাতীরে কুটির বেঁধে বাস করতে লাগল নির্জনে। সঙ্গের সাথী তিনজন। ধ্যান কীর্তন আর উপাসনা।

'ধ্যান চক্ষু বুজেও হয়, চক্ষু চেয়েও হয়।' বললেন ঠাকুর। 'ধ্যান যে ঠিক হচ্ছে তার লক্ষণ আছে। মাথায় পাখি বসবে জড় মনে করে। আমি দীপশিখা নিয়ে আরোপ করতুম। শিখার যেটা লালচে রঙ সেটাকে বলতুম স্থূল, আর শাদা অংশটাকে বলতুম সূক্ষ্ম। মধ্যখানে একটা কালো খড়কের মত রেখা আছে। সেটাকে বলতুম কারণশরীর।'

গভীর ধ্যানে ইন্দ্রিয়ের সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়। মন আর বহির্মুখ থাকে না, যেন বা'র-বাড়িতে কপাট পড়ল। দয়ানন্দ বললে, অন্দরে এসো কপাট বন্ধ করে। অন্দর-বাড়িতে কি যে-সে আসতে পারে?

'ধ্যান হবে তৈলধারার মত।' বললেন আবার ঠাকুর। 'ভিতরে আর ফাঁক নেই। অনর্গল প্রবাহ। তেমনি মনেরও অনর্গল মগ্নতা। একটা ইটকে বা পাথরকেও যদি ঈশ্বর বলে ভক্তিভাবে পুজো করো, তাতেও তাঁর কৃপায় ঈশ্বরদর্শন হবে।'

আর কীর্তন?

কীর্তন হবে হিল্লোল-কল্লোল। ক্রন্দনের সঙ্গে নর্তন মিশলেই কীর্তনের জন্ম। নরোত্তম কীর্তনীয়াকে বললেন ঠাকুর, 'তোমাদের যেন ডোঙ্গা-ঠেলা গান। এমন গান হবে যে নাচবে সকলে।' বলেই গান ধরলেন নিজে: 'নদে টলমল টলমল করে। গৌরপ্রেমের হিল্লোলে রে। তারপর এবার আখর দাও, আর নাচো—'

যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে
তারা, তারা দু ভাই এসেছে রে।
যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে
তারা, তারা দু ভাই এসেছে রে॥
যারা আপনি কেঁদে জগৎ কাঁদায়
তারা, তারা দু ভাই এসেছে রে।

যারা আপনি মেতে জগৎ মাতায়
তারা, তারা দু ভাই এসেছে রে ॥

নবাই এসেছে। এসেই উচ্চতালে কীর্তন শুরু করে দিল। বইয়ে দিল সুরের গঙ্গা। আসন ছেড়ে উঠে ঠাকুর নাচতে লাগলেন। কাছে ছিল মহিমাচরণ, জ্ঞানপথে যার চর্চা-চিন্তা, সেও মেতে উঠল নৃত্যে।

গাইতে-গাইতে বড় টলছেন ঠাকুর। নিরঞ্জন ভাবলে, পড়ে যাবেন বুঝি। হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল। মৃদুস্বরে ধমকে উঠলেন: 'এই শালা, ছুঁসনে।' মাস্টার ছিল সামনে। তার হাত ধরে টান মারলেন। 'এই, শালা, নাচ।'

একেই বলে উর্জিতা ভক্তি। ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়। ভক্তি যেন উথলে পড়ছে। রাম বললেন লক্ষ্মণকে, ভাই যেখানে দেখবে উর্জিতা ভক্তি, সেইখানে জানবে আমি আছি।

'হরিনামে কেমন আনন্দ দেখলে?' সবাইকে উদ্দেশ করে জিগগেস করলেন ঠাকুর। বললেন, 'আমার আরো বেশি আনন্দ। কেন বলো তো? মহিমাচরণ আসছে এদিকে, জ্ঞান পেরিয়ে ভক্তির দিকে। জ্ঞান হচ্ছে একটানা স্রোত আর ভক্তি হচ্ছে জোয়ার-ভাঁটা। আর দেখ না জ্ঞানীর মুখ-চেহারা শুকনো আর ভক্তের মুখ-চেহারা স্নিগ্ধ।'

তারপর তৃতীয় সাথী প্রার্থনা।

কী প্রার্থনা করবে? শুধু বলবে, ঈশ্বর, যেন ভোগাসক্তি যায় আর তোমার পাদপদ্মে মন হয়। কাতর হয়ে প্রার্থনা করলেই চোখে জল আসবে। ঈশ্বর তৃষ্ণার্ত। চোখের জল না পেলে তাঁর পিপাসা নিবারণ হয় না। চাতক যেমন বৃষ্টির জলের জন্যে চেয়ে থাকে ঈশ্বরও তেমনি চোখের জলের জন্যে চেয়ে আছেন। শিশির না ঝরলে ফুলটি ফোটে না, আর ফুলটি না ফুটলে উড়ে আসে না মধুকর। তেমনি অশ্রু না ঝরলে ফোটে না হৃৎকমল, আর হৃৎকমল না ফুটলে ছুটে আসেন না ভগবান। তাই কাঁদবার জন্যেই প্রার্থনা।

না কাঁদলে ধুয়ে যাবে না আসক্তির ধুলোবালি। বাইরে শুকনো জ্ঞানের কথা, অন্তরে প্রচ্ছন্ন ভোগতৃষ্ণা—কিছু হবে না। হাতির যেমন বাইরের দাঁত আছে তেমনি আবার ভিতরের দাঁত। বাইরের দাঁতে শোভা, ভিতরের দাঁতে খায়। তেমনি বাইরে লেকচার উপাসনা ভক্তির আড়ম্বর, ভিতরে কামকাঞ্চনে স্পৃহা। লুকিয়ে-লুকিয়ে লেহনচর্বণ। সমস্তই অনর্থক। মত জলই ঢালো গাছ অফলা। তাই কেঁদে-কেঁদে মা'র কাছে শুধু এই প্রার্থনা:

মা, তোর পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দে। আর যা কিছু চাইছি, কী যে সত্যি চাইবার

তা না জেনেই চাইছি। সন্তান যদি একবার মাকে পায় সে কি আর রঙিন খেলনার জন্যে কাঁদে?

প্রথমে অভ্যাস পরে অনুরাগ। ঠাকুর বললেন, 'প্রথমে বানান করে লেখ তারপর টেনে যাও।'

অন্তরের টানেই তখন টেনে যাবে। এই অভ্যাসটি কেন? যাতে শরীর যাবার সময় ঈশ্বরকেই মনে পড়ে। নাম শুধু মুখে বললেই হবে না, মনে ধরতে হবে। মনে-মনে এক হতে হবে। শুধু কাঁচের উপর ছবি থাকে না। তাই ভোগাসক্ত মনে ফুটবে না নামমূর্তি। কাঁচের পিঠে কালি মাখিয়ে ছবি ধরো। তেমনি মনে মাখাও ভক্তি আর বৈরাগ্যের রঙ, ফুটে উঠবে নামের প্রতিচ্ছায়া।

হেম ঠাকুরকে কীর্তন শোনাবে বলেছিল। তা আর হল না। শেষে বললে, 'আমি খোল-করতাল নিলে লোকে কি বলবে!' ভয় পেয়ে গেল পাছে লোকে পাগল বলে। আর, এই সুখের আশায় ছন্নছাড়ার মত উদ্দাম হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এতে সবাই তাকে সুস্থমস্তিষ্ক বলছে। আর যা অক্ষয় আনন্দের আকর তার জন্যে ক্রন্দন কীর্তনই পাগলামি!

কোথা থেকে কি ছদ্মবেশে যে আসক্তি আসে তার ঠিক নেই।

হরিপদকে চেনো তো?

সে ঘোষপাড়ার এক মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়েছে। বলে, তার নাকি গোপাল ভাব। কোলে বসিয়ে খাওয়ায়। বলে, বাৎসল্য ভাব। ঠাকুর পরিহাস করে বললেন, 'ঐ বাৎসল্য থেকে তাচ্ছল্য।'

সাবধান করে দিলেন হরিপদকে। ছেলেমানুষ, কিছু বোঝে না। ভাবে, বোধ হয় 'রাগকৃষ্ণ' হয়েছে।

জানো না বুঝি? ঐ মেয়েছেলেটি যে পথের পন্থী তাদের মানুষ নিয়ে সাধন। মানুষকে মনে করে শ্রীকৃষ্ণ। ওরা বলে 'রাগকৃষ্ণ'। গুরু জিগগেস করে, রাগকৃষ্ণ পেয়েছিস। উত্তর চাই, হ্যাঁ, পেয়েছি।

তাই ধরেছে হরিপদকে। এমন সুন্দর ছেলেটা না মেছমার হয়ে যায়।

সুন্দর কথকতা জানে। সব না মাটি হয়। গলায় এমন মিঠে সুর, তা না উড়ে পালায়।

সেদিন তার চোখ দুটি লক্ষ্য করলেন ঠাকুর। যেন চড়ে রয়েছে। বললেন, 'হ্যাঁ রে, তুই খুব ধ্যান করিস?'

মাথা হেঁট করে রইল হরিপদ।

'শোন, অত নয়।'

boiRboi.net

পদসেবার ভার দিয়েছেন হরিপদকে। হাত-ভরা কোমল ভক্তি, স্নেহসিক্ত, পবিত্রতা। হায়, আসক্তির ছোঁয়া লেগে হাত দুটি না তার শুষ্ক-শুষ্ক হয়ে যায়।

মনে শান্তি পাচ্ছেন না ঠাকুর। সে মেয়েছেলেটিকে ডেকে পাঠালেন। বললেন মিনতি করে, 'হরিপদকে নিয়ে যেমন করছ করো কিন্তু, দেখো, অন্যায় ভাব যেন এনো না।'

হরিপদর যম-দুয়ারে কাঁটা দিয়ে দিলেন।

'আচ্ছা, এই যে ছেলেরা সব আসছে এখানে, বাধা-বারণ মানছে না, এর মানে কি?' ঠাকুর বলছেন আত্মভোলার মত: 'এই খোলটার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু আছে, নইলে টান হয় কি করে? কেন আকর্ষণ হয়? বলা নেই কওয়া নেই দলে-দলে লোক অমনি এলেই হল? কোনো মানে নেই ওর?'

সকলেই তো আসবে। তোমার ওখানেই যে সকলের সকল পথ সমাপ্ত হয়েছে। তুমি যে সর্বসমন্বয়ের সমুদ্র।

'কেন একঘেয়ে হব? কেন হব একরোখা?' বলছেন ঠাকুর উদার সারল্যে: 'অমুক মতের লোক তা হলে আসবে না, এ ভাবনা আমার নয়। কেউ আসুক আর নাই আসুক, আমার বয়ে গেছে। লোকে কিসে হাতে থাকবে, কিসে দল বাড়বে এ সব আমার মনে নেই। অধর সেন বড় কাজের জন্যে বলতে বলেছিল মাকে, তা ওর সে কাজ হল না। তাতে যদি ও কিছু মনে করে আমার বয়ে গেল।'

॥ ১২৮ ॥

চিৎপুর রোড দিয়ে গড়ের মাঠের দিকে চলেছেন ঠাকুর। চলেছেন গাড়ি করে। উইলসনের সার্কাস দেখতে। সঙ্গে রাখাল, মাস্টারমশাই, আরো দু-একজন। এক-জনের হাতে ঠাকুরের বটুয়া। তাতে মশলা, কাবাবচিনি। ঠাকুরের গায়ে সবুজ বনাত। কার্তিকে নতুন শীত পড়েছে।

একবার এধার একবার ওধার ঘন-ঘন মুখ বাড়াচ্ছেন গাড়ি থেকে। লোক দেখছেন। আপনমনে কথা কইছেন তাদের সঙ্গে। মাস্টারকে বলছেন, 'দেখছ সবার কেমন নিম্নদৃষ্টি। সব পেটের জন্যে চলেছে। কারুর ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি নেই।'

মাঠে তাঁবু পড়েছে সার্কাসের। গ্যালারির টিকিট আট আনা। তাই কেনা হল ঠাকুরের জন্যে। শুধু ঠাকুরের জন্যে কেন, সকলের জন্যে। সব চেয়ে উঁচু ধাপে গিয়ে সবাই বসল। ঠাকুরের মহাস্ফূর্তি। বালকের মত আনন্দ করে বললেন, 'বাঃ এখান থেকে তো বেশ দেখা যায়।'

সার্কাসের মেয়ে ঘোড়ার পিঠে এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছুটছে। বড়-বড় লোহার রিঙ-এর

মধ্যে দিয়ে ছুটছে ঘোড়া, ঘোড়ার পঠ থেকে লাফিয়ে উঠে আবার ঘোড়ার পিঠে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে এক পায়ে, মাঝখানে ডিঙিয়ে গিয়েছে সেই লোহার রিঙ। খুব কায়দার কসরত। বিস্ময়-আয়ত চোখে তাই দেখছেন ঠাকুর।

সার্কাসের শেষে বলছেন মাস্টারকে, 'দেখলে বিবি কেমন এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়ার উপর, আর ঘোড়া কেমন ছুটছে বনবন করে। ভাবো দিকিন, কত অভ্যেস করেছে তবে না হয়েছে। কত মনোযোগ, কত একাগ্রতা! একটু অসাবধান হলেই হাত-পা ভেঙে যাবে, হয়তো বা অবধারিত মৃত্যু। অভ্যাসযোগে সব এখন জল-ভাত। সংসার করাও এমনি কঠিন। অনেক সাধন-ভজন করেই তবে না ঈশ্বরকৃপা! সাধন আর ভজন, অভ্যাস আর অনুরাগ।'

অভ্যাস যদি থাকে, মৃত্যুর সময় তাঁরই নাম মুখে আসবে। সেই অভ্যাস করে যাও। মৃত্যুর সময়ের জন্যে প্রস্তুত রাখো নিজেকে।

'সাধনের সময়', ঠাকুর বললেন, 'এই সংসার ধোঁকার টাটি। কিন্তু জ্ঞানলাভ হবার পর তাঁকে দর্শনের পর এই সংসারই আবার মজার কুটি।'

শুধু অভ্যাস। মন যায় না তবু কষ্টকাঠিন্য করে একটু বোসো। এইটুকুই সাধন। প্রথমে তেতো লাগে, এই তেতোটুকুই খাও। খেতে-খেতেই মধু, খেতে-খেতেই নেশা। ছেলের পড়ায় মন নেই, বাপ-মা জোর করে বসাচ্ছে তাকে বইয়ের সামনে। এই জোরটুকুই কৃচ্ছ্র। পড়তে-পড়তে ছেলের কখন অনুরাগ এসে গিয়েছে, তখন বই আর নামায় না মুখ থেকে। বাপ-মা বারণ করলেও না। অভ্যাস করাই এই অনুরাগের নাগাল পাবার জন্যে। মরা জল ঠেলে-ঠেলে স্রোতের জলে চলে আসার জন্যে।

ঘষো তোমার শুকনো কাঠ। মরা কাঠেই জ্বলবে একদিন আগুনের অনুরাগ। চেঁচিয়ে গলা সাধো, একদিন হঠাৎ এসে যাবে সুররাগের ঢেউ। রুদ্ধ দরজার পাশে বসে ডাক-নামটি ধরে ডাকো একমনে। কখন দরজা খুলে গিয়ে জেগে উঠবে ভালোবাসার প্রতিধ্বনি।

হাতে দাঁড় পড়েছে, দাঁড় টেনে যাও, ঝাঁ করে পাড়ি জমে যাবে টেরও পাবে না। দুপুরবেলা ইস্কুল পালিয়ে চলে এসেছে মাস্টার। শুনেছে বলরামমন্দিরে এসেছেন ঠাকুর, আর কে রোখে! শুধু ছাত্রই ইস্কুল পালায় না, মাস্টারও ইস্কুল পালায়।

'কি গো, তুমি? এখন? ইস্কুল নেই?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

কে একজন ভক্ত ছিল সামনে, বলে উঠল, 'না মশাই, উনি ইস্কুল পালিয়ে এসেছেন।'

সবাই হেসে উঠল। কিন্তু মাস্টার জানে কে যেন তাকে টেনে আনলে! এমন টান

যার ব্যাখ্যা হয় না। পায়ে কুশকণ্টকের বোধ নেই, পথ মনে হয় একটানা বাঁশি। মাস্টারকে সেবা শেখাতে লাগলেন ঠাকুর। আমার গামছাটা নিংড়ে দাও তো। জামাটা শুকোতে দাও। পা-টা কামড়াচ্ছে, একটু হাত বুলিয়ে দিতে পারো? সাহ্লাদে সেবা করছে মাস্টার।

সমুদ্রের দিকে চলেছে নদী। নদীতে উচ্ছ্বাস উঠেছে। নদী ভাবছে এ উচ্ছ্বাস করা, আমার না সমুদ্রের? ওগো সমুদ্র, বলে দাও, এ আবেগ-আবর্ত কার? আমার, না, তোমার? কিন্তু এ জিজ্ঞাসা কতক্ষণ? যতক্ষণ না ঐকান্তিক সমর্পণ হচ্ছে সমুদ্রে। সমুদ্রে একবার মিশে গেলে, পূর্ণ সমর্পণ হয়ে গেলে, তখন কি আর থাকবে এ জিজ্ঞাসা? তখন কি আর থাকবে আমি-তুমি?

গিরিশ ঘোষ বললে, 'আমরা সব হলহল করে কথা কই। কিন্তু মাস্টার ঠোঁট চেপে বসে আ'ছে। কি ভাবে কে জানে।'

ঠাকুর বললেন, 'ইনি গম্ভীরাত্মা।'

তাই বলে একটা গান গাইবে না? সবাই গাইছে, ও কেন মুখ বুজে থাকবে?

ঠাকুরের কাছে নালিশ করল গিরিশ। 'কিছুতেই গাইছে না মাস্টার।'

ঠাকুর বললেন, 'ও স্কুলে দাঁত বার করবে। যত লজ্জা গান গাইতে!' মাস্টারের দিকে তাকালেন। 'ঈশ্বরের নামগুণকীর্তনে লজ্জা করতে নেই। নামগুণকীর্তন অভ্যাস করতে-করতেই ভক্তি আসে।'

ভক্তিতেই সর্বসিদ্ধি। এমন কি ব্রহ্মজ্ঞান।

'তাঁর দয়া থাকলে কি জ্ঞানের অভাব থাকে? ওদেশে ধান মাপে, পেছনে বসে রাশ ঠেলে দেয় আরেকজন। দয়ায় মা জ্ঞানের রাশ ঠেলে দেন। আর দয়া আকর্ষণ করবে কি করে? শুধু ভক্তিতে, ভালোবাসায়। ভালোবাসাতে কান্না আর কান্নাতেই দয়া।'

আমার কী ছিল? কান্না ছাড়া আর ছিল না কিছু পুঁজিপাটা। কেঁদে-কেঁদে বলতুম তাই মাকে, বেদ-বেদান্তে কি আছে জানিয়ে দাও, কি আছে বা পুরাণ-তন্ত্রে। সব জানিয়ে দিলেন দেখিয়ে দিলেন। শিবশক্তি, নৃমুণ্ডস্তূপ, গুরুকর্ণধার, সচ্চিদানন্দসাগর।

'একদিন দেখলুম কি জানো? চতুর্দিকে শিবশক্তি। মানুষ পশুপাখি তরুলতা সকলের মধ্যেই এই পুরুষ আর প্রকৃতি। আরেকদিন দেখলুম নরমুণ্ডের পাহাড়। আমি তার মধ্যে একলা বসে। সেদিন দেখলুম মহাসমুদ্র। নুনের পুতুল হয়ে সমুদ্র মাপতে চলেছি। গুরুর কৃপায় পাথর হয়ে গেলুম। কোত্থেকে একটা জাহাজ চলে এল। তাতে উঠে পড়লুম। দেখলুম গুরুকর্ণধার। তারপরে আবার দেখলুম ছোট্ট

একটি মাছ হয়ে খেলা করছি সাগরে। সচ্চিদানন্দসাগরে প্রফুল্ল মৎস্য। কি হবে বুদ্ধিবিচারে? কি বুঝবে তুমি তিনি না বোঝালে? এইটিই সকল বোঝার সার করো, যে, তিনি যখন দেখিয়ে দেন তখনই সব বোঝা যায়। তার আগে নয়।'

মাস্টারকে দিয়ে গান গাইয়ে ছাড়লেন ঠাকুর। সিদ্ধেশ্বরী বাড়ি পাঠিয়েছেন তাকে পুজো দেবার জন্যে। ঠনঠনের সিদ্ধেশ্বরী। স্নান করে খালি পায়ে গিয়েছে মন্দিরে আবার খালি পায়ে ফিরে এসেছে প্রসাদ নিয়ে। ডাব চিনি আর সন্দেশ। ঠাকুর তখন শ্যামপুকুরে। দক্ষিণের ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন মাস্টারের প্রতীক্ষায়। পরনে শুদ্ধ বস্ত্র কপালে চন্দনের ফোঁটা।

পায়ের চটিজুতো খুলে রেখে প্রসাদ ধরলেন ঠাকুর। খানিকটা মুখে দিয়ে বললেন, 'বেশ প্রসাদ।'

তারপর চমকে উঠে বললেন, 'আমার বই এনেছ?'

'এনেছি।'

রামপ্রসাদ আর কমলাকান্তের গানের বই। ঠাকুর বললেন, 'বেশ, এখন এইসব গান ডাক্তারের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও।'

বলতে-বলতে ডাক্তার এসে হাজির। 'এই যে গো তোমার জন্যে বই এসেছে।' সোল্লাসে বলে উঠলেন ঠাকুর।

বই দুখানি হাতে নিলেন ডাক্তার। বললেন, 'গান পড়ে সুখ কি, গান শুনে সুখ।'

'তবে শোনাও হে মাস্টার—'

এবার আর ঠাকুরের কথা ঠেলতে পারল না। গলা ছেড়ে গান ধরল মাস্টার।

'মন কি তত্ত্ব করো তাঁরে,
যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত
অভাবে কি ধরতে পারে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন
লোহাকে চুম্বকে ধরে।'

তারপর নাচিয়ে পর্যন্ত ছেড়েছেন। আমি হরিনামে যদি নাচি, লোকে আমায় কি বলবে এ ভাব ত্যাগ করো! লজ্জা, অভিমান, গোপন ইচ্ছা—এ সব পাশ। এ ছুঁড়ে ফেলে দিতে না পারলে স্ফূর্তি কই, সারল্য কই? গড় হয়ে দেবতার দুয়ারে প্রণাম করতে গেলে দামী শালে ধুলো লাগবে সুতরাং মনে-মনে প্রণাম করে দায় সারি এ হচ্ছে অহঙ্কারের কথা। কিন্তু শাল গায়ে দিয়ে ঐ ধুলোয় গড়াগড়ি দেওয়াই আনন্দ। সত্যিকার আনন্দ হলে, গায়ের শাল আর পথের ধুলোয় ভেদ থাকে না।

সত্যিকার বন্যা এলে বালির বাঁধে কি করবে? কালীপদসুধাহ্রদে একবার যদি ডুবতে পারো, সব হিসেব পচে যাবে, পূজা হোম জপ বলি কিছুরই আর ধার ধারতে হবে না।

কিন্তু শিবনাথের উলটো কথা। সে বলে, বেশি ঈশ্বরচিন্তা করলে বেহেড হয়ে যায়।

'শোনো কথা!' বললেন ঠাকুর, 'জগৎচৈতন্যকে চিন্তা করে অচৈতন্য! যিনি বোধ-স্বরূপ, যাঁর বোধে জগৎকে জগৎ বলে বোধ হয়, তাঁকে চিন্তা করা মানে অবোধ হওয়া?'

'ভাবতে গেলে সব কিন্তু ছায়া।' বললে প্রতাপ মজুমদার।

'তা কেন?' আপত্তি করল ডাক্তার। 'বস্তুরই তো ছায়া। ঈশ্বর যদি বস্তু হন তা হলে তাঁর ছায়াও বস্তু। এদিকে ঈশ্বর সত্য অথচ তাঁর সৃষ্টি মিথ্যে এ মানতে রাজী নই। তাঁর সৃষ্টিও সত্য।'

সেকথা বৈকুণ্ঠ সেনও বলেছিল। ঠাকুরকে জিগগেস করলে, 'আচ্ছা মশাই, সংসার কি মিথ্যে?'

এক কথায় জল করে দিলেন ঠাকুর। বললেন, 'যতক্ষণ ঈশ্বরকে না জানা যায় ততক্ষণ মিথ্যে। ততক্ষণ মায়া। তখন আমার-আমার। এদিকে চোখ বুজলে কিছু নেই অথচ আমার হাবুর কি হবে! নাতির জন্যে কাশী যাওয়া হয় না! এ সংসার মিথ্যে একশোবার মিথ্যে।'

'কিন্তু সংসারে থেকে তাঁকে জানব কি করে?'

'এক হাত তাঁর পাদপদ্মে রাখো আরেক হাতে সংসারের কাজ করো। ছেলেদের গোপাল বলে খাওয়াও। বাপ-মাকে দেব-দেবী বলে সেবা করো। স্ত্রীর সঙ্গে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ নিয়ে থাকো, ভোগাসনে না বসে বসো যোগাসনে।'

'কেন মশাই, এক হাত ঈশ্বরে আরেক হাত সংসারে রাখব কেন?' কে একজন ফোড়ন দিল: 'সংসার যে কালে অনিত্য তখন এক হাতেই বা সংসারে রাখব কেন?'

সদানন্দ ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'তাঁকে জেনে সংসার করলে সংসার অনিত্য নয়।'

সেদিন সদরালাও জিগগেস করেছিল এই কথা। 'কতদিন খাটনি খাটব সংসারের?'

'যতদিন তিনি খাটান। তিনি যা কাজ করতে দিয়েছেন তাই নির্বাহ করো। যদি মনে করো তাঁর দেওয়া কাজ তবে আর শুকনো কর্তব্য নয়, তবে তা পূজা।'

'এ সব কর্তব্যের জন্যে সংসার করা ?'

'নিশ্চয়। সংসার করা মানেই কর্তব্যসাধন। ছেলেদের মানুষ করা, স্ত্রীর ভরণপোষণ করা, নিজের অবর্তমানে স্ত্রীর ভরণপোষণের যোগাড় রাখা। তা যদি না করো তুমি নির্দয়। যার দয়া নেই সে মানুষই নয়।'

'কিন্তু সন্তানপালন কতদিন ?'

'যদ্দিন না সাবালক হয়। পাখি উড়তে শিখলে তখন কি আর ঠোঁটে করে খাওয়ায় তার মা ? কাছে এলে ঠোকরায়, কাছে আসতে দেয় না।'

'কিন্তু যদি জ্ঞানোন্মাদ হয় ?'

'জ্ঞানোন্মাদ হলে আর কর্তব্য নেই। তখন কালকের কথা আর তুমি ভাববে না, ঈশ্বর ভাববেন। জমিদার তো মরে গেল নাবালক ছেলে রেখে। নাবালকের কি হবে ? তখন তার অছি এসে জোটে। অছি এসে ভার নেয়।' জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন সদরালার দিকে। 'এ সব তো আইনের কথা। তুমি তো সব জানো। আর এ তো তুমি মন্দ লোকের উপর ভার দিচ্ছ না, স্বয়ং ঈশ্বরের উপর দিচ্ছ।'

'আহা কি অপরূপ কথা!' পাশে বসে ছিলেন বিজয় গোস্বামী, বলে উঠলেন মধুভাষে : 'নাবালকের অমনি অছি এসে জোটে! আহা! কবে সেই অবস্থা হবে! যাদের হয় তারা কি ভাগ্যবান!'

আমি হাল ছেড়ে দিলেই তুমি এসে হাল ধরবে। আমি শুধু অভয়মনে ছেড়ে দেব, আমার নৌকো। হোক আমার পাল ছেঁড়া হাল ভাঙা, তবু ঝড়ের রাতে মত্ত সাগরকে আমার ভয় নেই। আমি জানি তুমি বসে আছ হালের কাছে। লক্ষ্য করছ হাল কতক্ষণে ছেড়ে দিই তোমার হাতে।

ছেড়ে দিয়েছি এবার। দেখি তুমি এখন কি করে ছাড়ো!

॥ ১২৯ ॥

অন্ধ বিশ্বাস ? কেন নয় ? প্রতিমুহূর্তে করছ না এই অন্ধ বিশ্বাস ? অন্ধকারে কেউ নেই এ বিশ্বাসও তো অন্ধ বিশ্বাস।

রোগ দেখে ডাক্তার দিয়ে গেল ব্যবস্থাপত্র। পাঠালাম ডিসপেনসারিতে। অন্ধ বিশ্বাস, কম্পাউণ্ডার ঠিক-ঠিক ওষুধ দেবে, বিষ দেবে না। নাপিতের খোলা ক্ষুরের কাছে গলা বাড়িয়ে দিয়েছি কামাবার জন্যে, অন্ধ বিশ্বাস গলার শিরাটি কাটবে না

নাপিত। ট্যাক্সি চেপেছি, অন্ধ বিশ্বাস নিরাপদে নিয়ে যাবে পথ কাটিয়ে। সাহেব এসে বললে, উঠেছিলাম গৌরীশঙ্করে, প্রত্যক্ষও নেই অনুমানও নেই, অনায়াসে সত্য মেনে নিলাম। অন্ধ বিশ্বাস ছাড়া আর কি।

আর-পাঁচজনকে দেখে, পাঁচটা কার্যকারণের ফল থেকেই এই অন্ধ বিশ্বাসের জন্ম। তেমনি দেখি না পাঁচজন কি বলে ঈশ্বর সম্বন্ধে। পাঁচ দেশের পাঁচজন। পাঁচ যুগের পাঁচজন। তারা যদি বলে, হ্যাঁ, আছেন, তাঁকে দেখেছি, তবে মেনে নিতে আপত্তি কি। একটা সাহেবকে সত্যবাদী বলে মানতে পারি, একজন সাধুকে মানতে পারব না? বেশ তো, সাহেবের মধ্যেও তো সাধু আছে। দেখ না তাদের জিগগেস করে।

বাপ ছেলেকে বর্ণপরিচয় শেখাচ্ছে। বলছে, 'পড়ো অ—'

ছেলে বলে, 'কেন, অ বলব কেন? বলব, হ—'

'না, অ-ই বলতে হয়। বলো, অ—'

'বা, বুঝিয়ে দাও, কেন অ বলব? আমি বলব, দ—'

বলো, কী যুক্তি আছে বাপের? কেন ছেলে অ বলবে? কেন সে হ বা দ বলবে না? তখন অনন্যোপায় হয়ে বাপ বললেন, 'সকলে অ বলেছে, তুমিও অমনি অ বলো—' যুক্তির সেরা যুক্তি। সকলে বলেছে। সুতরাং তুমিও বলো। তুমিও মানো। বর্ণপরিচয় যেমন অ থেকে শুরু তেমনি জগৎপরিচয়ের আদিতে ঈশ্বর।

অ বলো। বলো আদ্যবর্ণ। তেমনি ঈশ্বর বলো। বলো আদিভূত।

কেন অবিশ্বাস করি? নিজেকে অহঙ্কারী ভাবি বলে। নিজে না দেখলে মানব কেন এই অভিমান থেকেই অবিশ্বাস। যেন চোখ সবই ঠিক দেখে। সিনেমা দেখে যে চোখের জল ফেলি সেও চোখ ঠিক-ঠিক দেখছিল বলেই। তাই না? হায় রে অহঙ্কার!

কোনো বিষয়ে জানতে হলেই নিজেকে প্রথম জানতে হবে অজ্ঞ বলে। নিজের যদি এই অজ্ঞতাবোধ না থাকে তবে বিজ্ঞজনের সান্নিধ্য পাব কি করে? আমি জানি না। উনি জানেন এই বিনয় এই অভিমানহীনতা না থাকলে কি করে জানতে পারব? ছেলে যদি মনে করে আমি বাপের চেয়ে বড় পণ্ডিত তবে অ-এর বদলে তাকে হ শিখে ফিরতে হয়। পড়তে হয় বিশালাক্ষীর দ-য়ে।

কিন্তু কোনোক্রমে যদি একবার বিশ্বাস হয় তবে কাটান-ছাড়ান নেই। নিশ্চয়-নিষ্পত্তি করে যেতে হবে ষোলো আনা। 'তুই হাসপাতালে এলি কেন?' বললেন ঠাকুর। 'বাড়িতে বসে চিকিৎসা করলেই পারতিস। কে তোকে ঢুকতে বলেছিল হাসপাতালে? যখন একবার ঢুকেছিস সম্পূর্ণ রোগমুক্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। বড় ডাক্তার সার্টিফিকেট না দেওয়া পর্যন্ত রেহাই নেই।'

যখন একবার এসে পড়েছি বিশ্বাসের বন্দরে তখন আর ফিরে যাওয়া নয়। ব্যাকুলতার হাওয়ায় পাল তুলে দিয়ে ভক্তির স্রোতে চলে যাব ভাসতে-ভাসতে।

ভক্তি? ভক্তি কি যে-সে কথা?

না হোক, তবু তোমার মমতা তো আছে, স্নেহপ্রীতি তো আছে। এ তোমার সহজাত। নিজের প্রতি মমতা। সন্তানের প্রতি স্নেহ। পত্নীর প্রতি প্রীতি। এ সব স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নিম্নগামী। বাঁধ দিয়ে এ নিম্নগামী স্রোতকে ভিন্নগামী করে দাও। ঊর্ধ্বগামী করে দাও। প্রীতিও তরলতা ভক্তিও তরলতা। বাঁধের কাছটায় বাঁক ঘুরে প্রবলতর বেগে বয়ে যাবে জলস্রোত। প্রীতি ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হবে।

গাছের মূলটি ঊর্ধ্বমুখে। শাখাগুলি নতমুখ।

তোমার ভালোবাসার অঙ্কুরটি ঊর্ধ্বমুখ করে দাও। পরে বিতত শাখায় নত হয়ে জগজ্জনকে সে ছায়া দেবে, শান্তি দেবে।

'তোমরা তো সংসারে থাকবে, তা একটু গোলাপী নেশা করে থাকো।' ঠাকুর বললেন অশ্বিনী দত্তকে: 'কাজকর্ম করছ অথচ নেশাটি লেগে আছে। তোমরা তো আর শুকদেবের মত হতে পারবে না যে ন্যাংটো-ভ্যাংটো হয়ে পড়ে থাকবে।'

দক্ষিণেশ্বরে এসেছে অশ্বিনী। সাধ পরমহংসকে দেখবে। কিন্তু কে পরমহংস? 'আহা, দেখতে পাচ্ছেন না? ঐ যে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে আছেন।' কে একজন ঘরের মধ্যে দেখিয়ে দিলে আঙুল দিয়ে।

ঐ তাকিয়ায় ঠেস দেবার নমুনা নাকি? তাকিয়ায় কি করে ঠেস দিয়ে বসতে হয় আমিরি চালে তাই জানে না। তবে নিশ্চয় উনিই পরমহংস হবেন।

একখানা কালোপেড়ে ধুতি পরনে, বসে আছেন পা দুখানি উঁচু করে, তাও দুহাত দিয়ে জড়িয়ে, আধা-চিত অবস্থায়। কেশব সেন তখন বেঁচে, এসেছে ঠাকুরের কাছে। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে ঠাকুরও তেমনি প্রণাম করলেন। সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। অশ্বিনী ভাবল এ আবার কোন ঢঙ!

সমাধিভঙ্গের পর কেশবকে বলছেন ঠাকুর, 'হ্যাঁ হে কেশব, তোমাদের কলকাতার বাবুরা নাকি বলে ঈশ্বর নেই? সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন বাবু, এক পা ফেলে আরেক পা ফেলতেই—উঃ, কি হল, বলে অজ্ঞান। ধরো ধরো, ডাক্তার ডাকো। ডাক্তার আসবার আগেই হয়ে গেছে! এই তো বীরত্ব! এঁরা বলেন ঈশ্বর নেই।'

ভক্তি-নদীতে ডুব দিয়ে সচ্চিদানন্দ সাগরে গিয়ে পড়ব—যাকে বলে সন্তরণে সিন্ধু-গমন—এ কি গৃহস্থের পক্ষে সম্ভব নয়? কি করে হবে! একবার ডুববে একবার

উঠবে, একেবারে ডুবে যাবে কি করে! ঐ যা বলেছি গোলাপী নেশার বেশি হবে না।
'কেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর?'
'আহা, দেবেন্দ্র, দেবেন্দ্র—' দেবেন্দ্রের উদ্দেশে প্রণাম করলেন ঠাকুর। বললেন, 'তবে কি জানো, এক গৃহস্থের বাড়ি দুর্গোৎসব হত, পাঁঠাবলি হত উদয়াস্ত। কয়েক বছর ধরে বলির আর সে ধুমধাম নেই। কি ব্যাপার? একজন এসে জিগগেস করলে, আজকাল আর বলি নেই কেন? আর বলি! গৃহস্থ বললে, এখন দাঁত পড়ে গেছে যে। দেবেন্দ্রও এখন তাই ধ্যান-ধারণা করছে, তা করবেই তো! তা কিন্তু খুব মানুষ দেবেন্দ্র!'
কীর্তন আরম্ভ হল। এবং তারপর যা ঘটল, অশ্বিনী তা কোনোদিন কল্পনায়ও আনেনি। ঠাকুর নাচতে শুরু করলেন। সঙ্গে কেশব। আর যারা-যারা ছিল সকলে।
মহাকাশে নক্ষত্রনর্তন। সূর্যও নাচছে সঙ্গে-সঙ্গে গ্রহতারকারাও নাচছে।
নিজে নেচে আর সকলকেও নাচান, অশ্বিনীর সন্দেহ রইল না, এই পরমহংস।
কে এই আত্মদ যাঁর সত্তাতে সকলে সত্তাবান, যাঁর বলে সকলে বলী, যাঁর ছন্দে সকলে প্রাণনৃত্যময়!
বিনয়পূর্ণ প্রার্থনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল মনের মধ্যে। অভিমান বিগলিত করো। প্রাণের মধ্যে পরমনৃত্যের ছন্দে-ছন্দে অহঙ্কারের শৃঙ্খল চূর্ণ-চূর্ণ হয়ে যাক।
আরেক দিন গিয়েছে অশ্বিনী। সঙ্গে কটি যুবক-বন্ধু।
তাদের লক্ষ্য করে ঠাকুর বললেন, 'এঁরা এসেছেন কেন?'
'আপনাকে দেখতে।' বললে অশ্বিনী।
'আমাকে দেখবে কি গো! ঘুরে-ঘুরে বরং বিল্ডিং-টিল্ডিং দেখুন।'
অশ্বিনী হাসল। 'সে কি কথা! আপনাকে দেখতে এসেছে, ইট-বালি-চুন দেখবে কি!'
'তবে বলতে চাও এরা চকমকির পাথর? ঠুকলে আগুন বেরুবে? হাজার বছর জেলে ফেলে রাখলেও আগুন-ছাড়া হবে না? হায়, আমাদের ঠুকলে আগুন বেরোয় কই?'
আবার হাসল অশ্বিনী। আপনি কি আচ্ছাদিত আগুন? আপনি দীপিত আগুন। যে ভাস্করের কাছে আরোগ্য আপনি সেই ভাস্কর। যে হুতাশনের কাছে ধন আপনি সেই হুতাশন। পরম-আয়ু, পরম-ধন-প্রদাতা।
আরো একদিন গিয়েছে। বালকভাবে বললেন ঠাকুর, 'ওগো সেই যে কার্ক খুললে ভস-ভস করে ওঠে, একটু টক এইটু মিষ্টি, তার একটা এনে দিতে পারো?'

অশ্বিনী বললে, 'লেমোনেড ? খাবেন ?'
আবদেরে গলায় বললেন, 'আনো না একটা।'
একটা এনে দিল অশ্বিনী। ঠাকুর খেলেন আনন্দ করে।
অশ্বিনী জিগগেস করল, 'আচ্ছা, আপনার জাতিভেদ আছে ?'
'কই আর আছে ! কেশব সেনের বাড়ি চচ্চড়ি খেয়েছি।'
'আচ্ছা, কেশববাবু কেমন লোক ?'
'ওগো সে যে দৈবী মানুষ।' একটু থেমে আবার বললেন, 'একটা লোক জগৎ মাতিয়ে দিল—কত বড় শক্তি !' তারপর আবার একটু থামলেন। বললেন, 'কিন্তু জাতিভেদ জোর করে টেনে ছিঁড়তে চেয়ো না। ও আপনিই খসে যায়। যেমন নারকোল গাছের বালতো আপনি খসে পড়ে তেমনি। এই দেখ না, সেদিন একটা লম্বা দাড়িওলা লোক বরফ নিয়ে এসেছিল, এত বরফ ভালোবাসি অথচ ওর থেকে কিছুতেই খেতে ইচ্ছে হল না। আবার একটু পরে আরেকজন বরফ নিয়ে এল, ক্যাচড়ম্যাচড় করে খেয়ে ফেললাম চিবিয়ে।'
'আর ত্রৈলোক্যবাবু কেমন লোক ?' আবার জিগগেস করল অশ্বিনী।
'ত্রৈলোক্য ? আহা, বেশ লোক, বেড়ে গায়।'
সেদিন দক্ষিণেশ্বরে ত্রৈলোক্য এসেছে ঠাকুরকে গান শোনাতে। মা'র গান ধরেছে ত্রৈলোক্য। 'মা, তোমার কোলে নিয়ে অঞ্চলে ঢেকে আমায় বুকে করে রাখো।' প্রেমে কাঁদছেন ঠাকুর। বলছেন, 'আহা, কি ভাব !'
ত্রৈলোক্য আবার গাইল :

হরি আপনি নাচো আপনি গাও
আপনি বাজাও তালে-তালে,
মানুষ তো সাক্ষীগোপাল
মিছে আমার-আমার বলে ॥

ঠাকুর বললেন গদ্‌গদ হয়ে : 'আহা, তোমার কি গান ! তোমার গান ঠিক-ঠিক। যে সমুদ্রে গিয়েছে সেই দেখতে পারে সমুদ্রের জল।'
গানশেষে ত্রৈলোক্য বললে, 'আহা, ঈশ্বরের রচনা কি সুন্দর !'
'দপ করে দেখিয়ে দেয়। হিসেব করে সুন্দরের বোধ আসে না।' বললেন ঠাকুর, 'সেই সেদিন শিবের মাথায় ফুল দিচ্ছি, হঠাৎ দেখিয়ে দিলে এই বিশ্বসৃষ্টি, এই বিরাট মূর্তিই শিব। তখন শিব গড়ে পুজো বন্ধ হল। ফুল তুলছি হঠাৎ দেখিয়ে দিলে যেন ফুলের গাছগুলিই একেকটি ফুলের তোড়া। সেই থেকে বন্ধ হল ফুল

তোলা। মানুষকেও ঠিক সেইরকম দেখি। তিনিই যেন মানুষের শরীরটাকে নিয়ে হেলে-দুলে বেড়াচ্ছেন—যেন ঢেউয়ের উপর একটা বালিশ ভাসছে, নড়ছে-চড়ছে, উঠছে-পড়ছে—'

আগের কথার জের টানল অশ্বিনী। প্রশ্ন করল: 'আর শিবনাথবাবু কেমন লোক?'

'বেশ লোক, তবে তর্ক করে যে।' একটু থেমে বললেন: 'শিবনাথকে দেখলে বড় আনন্দ হয়। গাঁজাখোরের স্বভাব, গাঁজাখোরকে দেখে ভারি খুশি। হয়তো তার সঙ্গে কোলাকুলি করে বসে।'

শিবনাথকেও সেদিন তাই বলেছিলেন মুখের উপর: 'তোমাকে দেখতে বড় ইচ্ছে করে। শুদ্ধাত্মাদের না দেখলে কি নিয়ে থাকব? শুদ্ধাত্মাদের বোধ হয় যেন পূর্ব-জন্মের বন্ধু।'

আলিপুরের চিড়িয়াখানায়ও গিয়েছিলেন ঠাকুর। সে কথা বলছেন শিবনাথকে। শিবনাথ জিগগেস করল, 'কি দেখলেন সেখানে?'

'আর কি দেখব! মায়ের বাহন দেখলাম।'

কেন শিবনাথকে চাই? নিজেই ব্যাখ্যা করছেন ঠাকুর, 'যে অনেকদিন ঈশ্বরচিন্তা করে তার মধ্যে সার আছে। তার মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি আছে। আবার যে ভালো গায় ভালো বাজায় তার মধ্যেও ঈশ্বরের শক্তি আছে। যার যতটুকু বিদ্যা তার ততটুকু বিভূতি। এমন কি যে সুন্দর তার মধ্যেও ঈশ্বরের সার।'

ঈশ্বরই সংসারোত্তর মন্ত্র, তাই যার জিহ্বায় কৃষ্ণমন্ত্র তারই জন্মসাফল্য।

অচলানন্দের কথা উঠল। বরিশালে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে অশ্বিনীর।

'কেমন লাগল তাকে?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'চমৎকার।'

'আচ্ছা বলো তো সে ভালো না আমি ভালো?'

কী সরল প্রশ্ন! অশ্বিনী বললে, 'কার সঙ্গে কার তুলনা! সে হল গিয়ে পণ্ডিত, আর আপনি হচ্ছেন মজার লোক। তার কাছে শুধু বচন, আপনার কাছে শুধু মজা। হরেক রকম মজা, অফুরন্ত মজা—'

কথাটি পেয়ে খুশি হলেন ঠাকুর। বললেন, 'বেশ বলেছ, ঠিক বলেছ।'

মজার লোক। তুমি সর্বসুখনিলয়। তুমি আছ হাসে আর রাসে, আনন্দে আর বিনোদে। প্রশান্তবাহিতা তোমার স্থিতি। তুমি প্রাপ্তসমস্তভোগ। আপ্তসমস্তকাম। সুখ কি? আত্মার স্বরূপাবস্থাই সুখ। বিষয়ভোগে যে সুখ সে সুখ কি বিষয়ে? না। সে সুখ সুখময় আত্মায়। তিনি সুখ দিলেন বলে সুখের উপলব্ধি হল। ক্ষণ-

কালের জন্যে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়েছিল, ক্ষণকালের জন্যে চিত্তবৃত্তি আত্মাভিমুখী হয়েছিল, ক্ষণকালের জন্যে মরণযন্ত্রণা বা পরিবর্তন-যন্ত্রণা ছিল না—সেই হেতু। সুখের বিষয় বিষয় নয়, সুখের বিষয় আত্মা।

তাই খণ্ড সুখ ক্ষুদ্র সুখ নিয়ে কি হবে? যে সুখ বারে-বারে মরে যায় সেই সুখের মূল্য কি। চাই অপরিচ্ছিন্ন সুখ। সেই অপরিচ্ছিন্ন সুখই তুমি।

'তাঁকে পাবো কি করে?' সরাসরি প্রশ্ন করল অশ্বিনী।

'কাঁদতে-কাঁদতে কাদাটুকু যখন ধুয়ে যাবে, তখন পাবে।' বললেন ঠাকুর, 'চুম্বক বরাবরই লোহাকে টানে। কিন্তু লোহার গায়ে যে কাদা মাখা। কাদা লেগে থাকতে কি করে লাগে চুম্বকের সঙ্গে! তাই কাদাটুকু ধুয়ে ফেল চোখের জলে।'

ঠাকুর তক্তপোশের উপর উঠে এলেন। শুয়ে পড়লেন। বললেন,'হাওয়া কর দেখি।'

অশ্বিনী পাখা করতে লাগল।

'বড্ড গরম গো। পাখাখানা একটু ভিজিয়ে নাও না—'

পরিহাস করল অশ্বিনী। 'আপনারও শখ আছে দেখছি।'

'কেন থাকবে না, কেন থাকবে না জিগগেস করি?'

'না, না, থাক, একশোবার থাক।'

কতক্ষণ পর ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'আচ্ছা, তুমি গিরিশ ঘোষকে চেনো?'

'কোন্ গিরিশ ঘোষ? থিয়েটার করে যে? দেখিনি কখনো। নাম শুনেছি।'

'আলাপ কোরো তার সঙ্গে। খুব ভালো লোক।'

'শুনি মদ খায় নাকি?'

উদার শান্তিতে বললেন ঠাকুর, 'তা থাক না, থাক না, কতদিন খাবে?'

'এখন ঠাকুরের কথায় যে আনন্দ পাই তার এক কণা যদি মদ-ভাঙ-গাঁজায় থাকত!' নিজের কথা বলছে সবাইকে গিরিশ: 'আমি কত কি ঠাকুরকে বলতাম তিনি কিছুতেই বিরক্ত হতেন না। যখন মদ খেয়ে টং হয়ে যেতাম, বেশ্যাও দরজা খুলে দিতে সাহস পেত না, তখনো ঠাকুরের কাছে আশ্রয় পেতাম। সে অবস্থায়ও আদর করে ধরে নিয়ে যেতেন। লাটুকে বলতেন, ওরে ছাখ গাড়িতে কিছু আছে কিনা। এখানে খোঁয়ারি এলে তখন কোথায় পাব? তারপর আমার চোখের দিকে চেয়ে থাকতেন। চেয়ে থেকে আমার চোখের দৃষ্টি শাদা করে দিতেন। শেষে আপসোস করতাম, আমার আস্ত বোতলের নেশাটা মাটি করে দিলে।'

আবার বলছে গিরিশ, 'সকলকে ঠাকুর গত জীবনের কথা জিগগেস করতেন, আমাকে কখনো করেননি। একবার করলে হয়! সব মহাভারত তাঁকে বলে দিই। বললে সব তিনি নিশ্চয়ই শোনেন বসে-বসে। মানা করেন না কিছুতেই। সাধে কি

আর ওঁকে এত মানি ?'

'আপনি আমার সব বিষয়ের গুরু।' একদিন গিরিশ ঠাকুরকে বললে মুখের উপর।

'এমন কি ফিচকেমিতেও।'

ঠাকুর বললেন, 'না গো তা নয়। এখানে সংস্কার নেই। করে জানা আর পড়ে বা দেখে জানার ভেতর ঢের তফাত। করে জানলে সংস্কার পড়ে যায়। তা থেকে বেঁচে ওঠা ভারি শক্ত। পড়ে বা দেখে-শুনে জানাতে সেটা হয় না।'

এক রাজার এক গল্প আছে। ভারি স্নৈণ সেই রাজা। একদিন রাজার এক বন্ধু তাকে এই নিয়ে খুব শ্লেষ করল। রাজা ভেবে দেখলেন, সত্যি, এবার থেকে চলতে হবে সামলে। অন্তঃপুরে এসে গম্ভীর হয়ে রইলেন, নিতান্ত দু-একটা দরকারি কথা ছাড়া কথাই কন না রানির সঙ্গে। খেতে বসেছেন রাজা, রানির পোষা বেড়াল রাজার পাতের কাছে ঘুরঘুর করছে। রাজা তাকে তাড়াতে চেষ্টা করছেন কিন্তু সে বারে-বারেই ফিরে আসছে। তখন রানি বলছে, 'আগে ওকে অনেক আস্কারা দিয়েছ, এখন আর তাড়ানো সম্ভব ?'

আগে অনেক আস্কারা দিলে পরে আর তাড়ানো যায় না। তাই রাশ রাখো নিজের কাছে।

বারাঙ্গনা ত্যাগ করা সহজ, কিন্তু তোমার বাসনার নটীকে কি করে ত্যাগ করবে ? তবে উপায় ?

আন্তরিক হও। অন্তরের নির্জনে বসে কাঁদো। অন্তরকে প্রক্ষালিত করো। অন্তরের থেকে চাও ঈশ্বরকে।

'ধ্যান করো।' বলছেন ঠাকুর, 'একাগ্র হও। ধ্যানে কত কি হয়তো দেখবে, কুকুর বেড়াল বাঁদর বেশ্যা লোচ্চা জুয়াচোর রাক্ষস পিশাচ দৈত্য দানব। ভয় পেয়ো না। ভেঙে দিও না ধ্যান। বহুরূপী ঈশ্বরের মূর্তি দেখছ মনে করে স্থির থেকো। কিন্তু যদি কোনো বাসনা এসে হাজির হয়, তখুনি বুঝবে মহা বিঘ্ন এসে দাঁড়িয়েছে। তখন ধ্যান ভেঙে কাতরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো, ভগবান, আমার এ বাসনা পূর্ণ কোরো না।'

তুমিই শুধু পূর্ণ হয়ে বিরাজ করো।

তারপর বলি তোদের এক চরম কথা। অশেষ আশ্বাস দিলেন ঠাকুর। 'শোন, কলিতে মনের পাপ পাপ নয়।'

boiRboi.net

ঈশ্বরই মরণাতীত সত্য।

ঈশ্বরকে মাথায় নিলে মানুষ কি ছোট হয়ে যায়, না, বড়ো হয়ে ওঠে। সবই তাঁর ইচ্ছা এই ভেবে কি মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, না, তাঁর ইচ্ছা প্রস্ফুটিত করি আমার জীবনে, আসে এই দুর্দম প্রেরণা? কাকে ধরে শোকে-দুঃখে নির্বিচল থাকি, বাধা-বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করি, বৈমুখ্যে-বৈফল্যে সংগ্রহ করি নবতর সংগ্রামের তেজ! কে হতাশের আশা, নিঃস্বের সম্বল, চিরোৎকণ্ঠিতের শান্তি! কে সমস্ত বিবাদের মীমাংসা! সমস্ত অন্যায়ের সংশোধন!

কোথায় যাবে মানুষ? মায়ামূঢ় দিগ্‌মূঢ় মানুষ! পথ চলতে-চলতে বিশ্রাম চায়। কোথায় সেই বিশ্রামায়তন! নিজের ঘরের চিন্তামণির সন্ধানে ঘর ছেড়ে বনে-বনে ঘোরে।

সন্ন্যাসী হয়েও বিশ্রাম চায়। কুটির বাঁধে, মঠ তোলে। নিজের বৃত্তি ছেড়ে এসে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে। নিজের পুত্র ছেড়ে এসে চেলা বানায়। এক মায়া ছেড়ে আরেক মায়ার বশে আসে। যা চায় কোথাও তাকে পায় না খুঁজে-খুঁজে। সে মোহন মানুষ মনের মানুষ হয়ে মনের মধ্যেই বসবাস করছে। তাকে সেইখানেই খোঁজো, বোঝো, সেইখানেই ধরো।

যে প্রশান্তসাগর খুঁজছ সে তোমার মনের ভূমণ্ডলে।

ঠাকুর বললেন, 'গৃহীর অভিমান কুঁচ গাছের শিকড়, উপড়ে তোলা যায় সহজে। কিন্তু সন্ন্যাস অভিমান অশ্বত্থের মূল, কোনোক্রমে উৎপাটিত হয় না।'

প্রেমানন্দ স্বামী লিখছেন: 'সাধুর এ-দোর ও-দোর ঘোরা কি কম লাঞ্ছনা? সাধুগিরি হ্যাক-থু হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ধোঁকা কাটিয়ে দাও ঠাকুর, ধোঁকা কাটিয়ে দাও। আর না প্রভু, অনেক হয়েছে। সাধু হয়ে আবার ঘর-বাড়ি করে থাকা ঘোর বিড়ম্বনা, মহামায়ার বিষম প্যাঁচ—'

যেখানেই আছ সেখানেই থাকো। দেহকে রথ, মনকে লাগাম, বুদ্ধিকে সারথি, ইন্দ্রিয়দের ঘোড়া ও বিষয়কে রাস্তা করো। আর জেনো আত্মাই হচ্ছে সেই রথের রথী।

জব্বলপুর থেকে এক ভদ্রলোক এসেছে। এম-এ পাশ পণ্ডিত। কাজেকাজেই ঘোরতর নাস্তিক। ঠাকুরের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিয়েছে। জীবনে অনেক অশান্তি, অনেক আঘাত, তবু মানবে না ঈশ্বরকে। ঈশ্বর যে আছে তার প্রমাণ কি!

'তোমার কাছে প্রমাণ বলে যখন কিছু নেই, তখন নেই। কি আর করা! কিন্তু সামান্য তুমি একটু দয়া করতে পারো?' স্নিগ্ধ চোখে তাকালেন ঠাকুর।
'কি, বলুন।'
'এইটুকু অনুমান করতে পারো যে, যদি কেউ থাকে? কত কিছু রয়েছে তোমার চোখের বাইরে, তোমার জ্ঞান-প্রমাণের বাইরে, তেমনি যদি ঈশ্বর বলে কেউ থাকে, এইটুকু মেনে নিতে পারো?'
'যদি কেউ থাকে?' ভদ্রলোক স্তব্ধ হয়ে ভাবলে কিছুক্ষণ। বললে, 'বেশ এইটুকু আনতে পারি অনুমানে। তারপরে কী হবে?'
'তারপরে তার কাছে প্রার্থনা করো।' ঠাকুর শিখিয়ে দিলেন, 'এইভাবে বলো, যদি ঈশ্বর বলে কেউ থাকো তো আমার কথা শোনো। আমার অশান্তি-আঘাত দূর করে দাও। তুমি যখন বলছ নেই তখন নেই। কিন্তু যদি কেউ থাকো, এইটুকু বলতে আপত্তি কি—'
ভদ্রলোক বললে, 'না, এতে আর আপত্তি কি! আমি জানি ঘরে কেউ নেই। তবু ইতিমধ্যে যদি কেউ এসে থাকো, আমার কথা শোনো।'
'হ্যাঁ, এমনি করেই করো প্রার্থনা। কদিন পর আবার এস আমার কাছে।'
কদিন পর এল সেই ভদ্রলোক। ঠাকুরের পা ধরে কাঁদতে লাগল। বলল, 'ঠাকুর, "যদি" আর নেই। "কেউ"-ও আর নেই। একমাত্র "আছেন"। তিনি আছেন, একজনই আছেন।'
'লোকে ঈশ্বর মানবে না!' বলছেন ঠাকুর, 'যে মানুষ গলায় কাঁটা ফুটলে বেড়ালের পা ধরে, খেজুরগাছকে প্রণাম করে, তার আবার বড়াই, ঈশ্বর বিশ্বাস করবে না!' কাপ্তেনকে তাই বললেন ঠাকুর, 'তুমি পড়েই সব খারাপ করেছ। আর পড়ো না।' শব্দজাল না মহারণ্য। অনেক বাক্য নিয়ে মাথা ঘামিও না। জনককে বলেছিলেন যাজ্ঞবল্ক্য। ওতে লাভ আর কিছুই নেই, শুধু বাগিন্দ্রিয়ের ক্লান্তি। আর নারদ কি বলছে? বলছে কত তো পড়লাম, ঋগ্বেদ যজুর্বেদ সামবেদ অথর্ববেদ। ইতিহাস পুরাণ ব্যাকরণ গণিত। দৈব্যবিদ্যা ভূবিদ্যা তর্কশাস্ত্র নীতি-শাস্ত্র। নিরুক্ত কল্প ছন্দ ভূততন্ত্র গারুড়তন্ত্র। ধনুর্বেদ জ্যোতিষ নৃত্যগীতবাদ্য শিল্পবিজ্ঞান। কিন্তু কই, শান্তি কোথায়, সত্য কোথায়? শুধু কতগুলো শব্দের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি।
সনৎকুমার উত্তর দিলেন: 'যা কিছু অধ্যয়ন করেছ সব কতকগুলি বুলি মাত্র।'
'শাস্ত্রের ভেতর কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়?' বললেন ঠাকুর, 'শাস্ত্র পড়ে "অস্তি" মাত্র বোঝা যায়। পাওয়া যায় একটু আভাসলেশ। বই হাজার পড়, মুখে হাজার

শ্লোক আওড়াও, ব্যাকুল হয়ে তাঁতে ডুব না দিলে তাঁকে ধরতে পারবে না। পড়ার চেয়ে শোনা ভালো, শোনার চেয়ে ভালো হচ্ছে দেখা। কাশীর বিষয় পড়া, কাশীর বিষয় শোনা আর কাশী দেখা—অনেক অনেক তফাত। তাই বলি দেখবার জন্যে ডুব দাও। ডুব দেবার পর মনের অতলতলে তাঁকে দেখতে পাবে।'

চিঠির কথা আর চিঠি যে লিখেছে তার মুখের কথা—অনেক তফাত। শাস্ত্র হচ্ছে চিঠির কথা আর ঈশ্বরের বাণী হচ্ছে মুখের কথা। বললেন ঠাকুর, 'আমি মা'র মুখের কথার সঙ্গে না মিললে শাস্ত্রের কথা লই না। বেদ-পুরাণ-তন্ত্রে কি আছে জানবার জন্যে হত্যে দিয়ে মাকে বলেছিলুম, আমি মুখ্খু, তুমি আমায় জানিয়ে দাও ঐ সব শাস্ত্রে কি আছে। মা বললেন বেদান্তের সার ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যে। গীতার সার গীতা দশবার উচ্চারণ করলে যা হয়। অর্থাৎ ত্যাগী, ত্যাগী। যদি একবার ঈশ্বরের মুখের কথাটি শুনতে পাও দেখবে শাস্ত্র কোথায় কত নিচে তলিয়ে গেছে।'

তেমন-তেমন একটি মন্ত্র পেলে কি হবে শাস্ত্র দিয়ে?

'কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঁই, কিবা তার বল
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল।'

শাস্ত্রপাঠ হয়নি কিন্তু সাধুসঙ্গ আছে। শুধু সাধুসঙ্গেই সর্বসিদ্ধি। আতরের দোকানে গেলে তুমি ইচ্ছে করো আর নাই-করো আতরের গন্ধ তোমার নাকে ঢুকবেই। একটা জীবন থেকে আরেকটা জীবনে তেমনি ভাবসংক্রমণ হবে, এক স্ফুলিঙ্গ থেকে আরেক বহ্নিকণা।

দ্বিজ প্রায়ই মাস্টারের সঙ্গে আসে। বয়স পঁনেরো-ষোলো। বাবা দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করেছে, ছেলেকে দক্ষিণেশ্বরে যেতে দিতে নারাজ।

আরো দুটি ভাই আছে দ্বিজর। ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'তোর ভায়েরাও আমাকে অবজ্ঞা করে?'

দ্বিজ চুপ করে রইল।

মাস্টার বললে, 'সংসারে আর দু-চার ঠোক্কর খেলেই যাদের একটু-আধটু যা অবজ্ঞা আছে, চলে যাবে।'

'বিমাতা তো আছে। ঘা তো খাচ্ছে মন্দ নয়।' ঠাকুর একদৃষ্টে দেখছেন দ্বিজকে। বললেন, 'এই ছোকরাই বা আসে কেন? অবশ্য আগেকার কিছু সংস্কার ছিল। তবে কি জানো? তাঁর ইচ্ছে। তাঁর হাঁ-তে জগতের সব হচ্ছে, তাঁর না-তে হওয়া বন্ধ হচ্ছে। মানুষের আশীর্বাদ করতে নেই কেন?'

'মানুষের আশীর্বাদ করতে নেই?'

'না। কেননা মানুষের ইচ্ছায় কিছু হয় না। তাঁর ইচ্ছাতেই হয়-লয়।'
আবার দেখছেন দ্বিজকে। বলছেন, 'যার জ্ঞান হয়েছে তার আবার নিন্দার ভয় কি! কামারের নেহাই, হাতুড়ির ঘা পড়ছে কত, কিছুতেই কিছু হয় না।'
দ্বিজ চলে গেলে আবার বলছেন তার কথা।
'কি অবস্থা ছেলেটার! কেবল গা দোলায় আর আমার পানে তাকিয়ে থাকে। এ কি কম? সব মন কুড়িয়ে যদি আমাতে এল তা হলে তো সবই হল।'
সেদিন দ্বিজর সঙ্গে দ্বিজর বাপ এসেছে। আর ভাইয়েরাও। দ্বিজর বাপ হাই-কোর্টের ওকালতি পাশ করে সদাগরী আফিসের মানেজারি করছে।
'আপনার ছেলে এখানে আসে, তাতে কিছু মনে কোরো না। আমি শুধু এইটুকু বলি চৈতন্যলাভের পর সংসারে গিয়ে থাকো। শুধু জলে দুধ রাখলে দুধ নষ্ট হয়ে যায়। মাখন তুলে জলের উপর রাখো, আর কোনো গোল নেই।'
'আজ্ঞে হ্যাঁ।' দ্বিজর বাপ সায় দিল।
'তুমি যে ছেলেকে বকো, তার মানে আমি বুঝেছি। তুমি ভয় দেখাও। তুমি ফোঁস করো। সেই ব্রহ্মচারী আর সাপের গল্প। জানো না?' ঠাকুর গল্প ফাঁদলেন।
রাখালেরা মাঠে গরু চরাচ্ছে। সেই মাঠে বিষধর এক সাপের বাসা। এক ব্রহ্মচারী একদিন যাচ্ছে ঐ মাঠ দিয়ে। রাখালেরা বললে, ঠাকুরমশাই যাবেন না ওদিকে। ওদিকে এক সর্বনেশে সাপ আছে ফণা তুলে। আমার ভয় নেই, আমি মন্ত্র জানি। বললে ব্রহ্মচারী। বলার সঙ্গে-সঙ্গেই সেই ফণা-মেলা সাপ তেড়ে এল ব্রহ্মচারীর দিকে। ব্রহ্মচারী মন্ত্র পড়ল। মন্ত্র পড়তেই কেঁচো হয়ে গেল সাপ। তুই কেন পরের হিংসে করে বেড়াস? ব্রহ্মচারী শাসালেন সাপকে। বললেন, আয় তোকে মন্ত্র দি। এই মন্ত্র জপ করলে তোর আর হিংসে থাকবে না। বলে চলে গেল ব্রহ্মচারী। সাপ মন্ত্র জপতে লাগল। তখন রাখালরা দেখলে, এ তো ভারি মজা, ঢেলা মারলেও সাপটা রাগে না। তখন একদিন একজন সাপটার ল্যাজ ধরে তাকে অনেক ঘুরপাক খাইয়ে আছড়ে ফেলে দিলে মাটির উপর। অচেতন হয়ে পড়ে রইল সাপ। রাখালেরা ভাবলে মরে গেছে। তাই মনে করে যে যার ঘরে ফিরে গেল। অনেক রাত্রে জ্ঞান ফিরে পেয়ে সাপ ঢুকল গিয়ে তার গর্তে। মার খেয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে, এদিকে হিংসে করা বারণ, গর্তর বাইরে এসে খাবারের সন্ধান করে সাপ। কি আর খাবে! মাটিতে-পড়া-ফল আর পাতা ছাড়া তার খাদ্য নেই। কিন্তু এ দিয়ে কি জীবনধারণ সম্ভব? একদিন এ মাঠ দিয়ে যাচ্ছে ফের ব্রহ্মচারী, ডাকলে সাপকে। ভক্তিভরে প্রণাম করে সাপ কাছে এল। কি রে কেমন আছিস? যেমন

রেখেছেন। সে কি রে, এত রোগা হয়ে গেছিস কেন? লতা-পাতা খেয়ে কি করে আর মোটা হই? শুধু এইজন্যে? নিরামিষ খেলে কি রোগা হয়? ছ্যাখ দেখি ভেবে, আর কোনো কারণ আছে কিনা। আছে। সাপ তখন বললে রাখাল ছেলেদের সেই আছড়ে মারার কথা। আমি যে অহিংসার মন্ত্র নিয়েছি, কাউকে যে কামড়াব না তা তারা কেমন করে জানবে? তুই কী অসম্ভব বোকা? ব্রহ্মচারী ধমকে উঠল। নিজেকে রক্ষা করতে জানিস না? আমি তোকে কামড়াতেই বারণ করেছি, ফোঁস করতে বারণ করিনি। তুই ফোঁস করে ওদের ভয় দেখালিনে কেন?
'তুমিও তেমনি শুধু ফোঁস করো ছেলেকে, কামড়াও না নিশ্চয়ই।'
দ্বিজর বাপ হাসছে।
'শোনো, ভালো ছেলে হওয়া বাপের পুণ্যের চিহ্ন।' বললেন ঠাকুর, 'যদি পুকুরে ভালো জল হয় সেটি পুকুরের মালিকের পুণ্যের চিহ্ন, তাই না?'
হুঁ দিয়ে যাচ্ছে দ্বিজর বাপ।
'শোনো, এখানে এলে-গেলেই ছেলেরা জানতে পারবে বাপ আসলে কত বড় বস্তু। বাপ-মাকে ফাঁকি দিয়ে যে ধর্ম করবে তার ছাই হবে।' পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল ঠাকুরের: 'আমি মা'র কথা ভেবে থাকতে পারলাম না বৃন্দাবনে। যাই মনে পড়ল মা দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে আছেন, অমনি মন হু-হু করে উঠল। বৃন্দাবন অন্ধকার দেখলাম। আমি বলি সংসারও করো আবার ভগবানে মন রাখো। সংসার ছাড়তে বলি না। এও করো ওও করো।'
দ্বিজর বাপ এতক্ষণে মুখ খুলল। বললে, 'আমি বলি পড়াশোনা তো চাই। ছেলেদের সঙ্গে ইয়ারকি দিয়ে সময় না কাটায়। এখানে আসতে কি আর আমি বারণ করি?'
'আর জোর করেই কি তুমি বারণ করতে পারবে? যার যা আছে তাই হবে।'
আবার হুঁ দিল দ্বিজর বাপ।
মাদুরের উপর বসেছেন সবাই। কথা বলছেন আর মাঝে-মাঝে দ্বিজর বাপের গায়ে হাত দিচ্ছেন ঠাকুর। দ্বিজর বাপের গরম লাগছে। নিজে হাতে করে তাকে পাখা করছেন ঠাকুর।
দ্বিজর দিদিমা ঠাকুরকে দেখতে এসেছেন অসুখ শুনে।
'ইনি কে?' জিগগেস করলেন ঠাকুর, 'যিনি মানুষ করেছেন দ্বিজকে? আচ্ছা, দ্বিজ নাকি একতারা কিনেছে? সে আবার কেন?'
মাস্টার বললে, 'ঠিক একতারা নয়, ওতে দুই তার আছে।'
'কেন, কি দরকার? একে তো তার বাপ বিরুদ্ধ, তায় ফের জানাজানি করে লাভ

কি ? ওর পক্ষে গোপনে ডাকাই ভালো।'

গোপনে-গোপনে শয়নে-স্বপনে যে তোমাকে ডাকছি জানতে দেব না কাউকে। হৃদয়ে তুমি যে তোমার রাঙা রাখীর ডোরটি বেঁধে দিয়েছ বাইরে থেকে কেউ তা জানতে পারবে না। তোমার সঙ্গে আমার প্রেম সংসার নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। সংসারকে ফাঁকি দেব, সিদ্ধ হব এই নিষিদ্ধ প্রেমে। তখন এই সংসারই হবে আমাদের মিলনমালঞ্চ। জলেস্থলে এত যে শোভা-সৌন্দর্য ছড়িয়ে রেখেছ এ আমাদেরই প্রেমের মুগ্ধ দৃষ্টি। ভুবনচরাচর আমাদেরই মহোৎসব-সভা।

অগাধজলসঞ্চারী রোহিত হও, গণ্ডূষজলে সফরী হয়ো না।

সেই রাজকুমারীর গল্পটি শোনো :

ভক্তিমতী রাজবালা, রামময়জীবিতা, কিন্তু তার রাজকুমার স্বামী ভুলেও রাম-নাম উচ্চারণ করবে না। তাতে রাজকুমারীর বড় দুঃখ। কত অনুরোধ স্বামীকে, একবার রাম-নাম বলো, স্বামী নিরুত্তর। স্বয়ং রামচন্দ্রের কাছে কাতর প্রার্থনা জানায় রাজকুমারী। স্বামীকে সুমতি দাও, তাঁর জিভে একবার তোমার নামময় প্রদীপটি জ্বেলে দাও। এমনিতে মলিন মুখ রাজকুমারীর, হঠাৎ সেদিন, বলা-কওয়া নেই, সকাল হতেই রাজকুমারী উৎফুল্ল। দেওয়ানকে খবর দিল, আজ নগরময় আনন্দোৎসব হবে, অগণন ব্রাহ্মণভোজন, অগণন ভিখারী-বিদায়। সত্বর সব ব্যবস্থা করুন। কারণ কি জানতে পাই ? মিনতি করল দেওয়ান। আমার হুকুম। গম্ভীর হল রাজকুমারী। রাজকুমার বললে, এ কি সমারোহ! এত ঘটা-ছটা কিসের জন্যে ? প্রথমে রাজকুমারী বলতে চায় না, শেষে অনেক সাধ্যসাধনার পর বললে, জানো আজ আমার কত বড় শুভদিন! কাল রাত্রে স্বপ্নে তুমি একবার রাম-রাম করে ফেলেছ। এতদিন যে নাম শত অনুরোধেও উচ্চারণ করোনি, ঘুমঘোরে সে নাম তোমার মুখ থেকে স্খলিত হয়েছে। তাই এই উৎসবের আয়োজন। বিমূঢ়ের মত, হৃতসর্বস্বের মত তাকিয়ে রইল রাজকুমার। বেদনার্ত কণ্ঠে বললে, কি নাম ? রাম-নাম। বলে ফেলেছি ? মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছে ? রাজকুমার আর্তনাদ করে উঠল, যে ধন হৃদয়ের মধ্যে এতদিন লুকিয়ে রেখেছিলাম তা বেরিয়ে গিয়েছে ? বলতে-বলতেই মূর্ছিত হয়ে পড়ল। রাজকুমারী দেখল, নাম-পাখি উড়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই স্বামীর দেহপিঞ্জর শূন্য! তাই যত্ন করে লুকিয়ে রাখো। শুধু সে দেখে আর তুমি দেখো। আমার সকল জল্পনা তোমার নামজপ, আমার সকল শিল্পকর্ম তোমারই মুদ্রারচনা। আমার ভ্রমণ তোমাকে প্রদক্ষিণ, আমার ভোজন তোমাকে আহুতিদান। আমার শয়ন তোমাকে প্রণাম, তোমাকে আত্মসমর্পণই আমার অখিলসুখ। আমার সকল চেষ্টা তোমারই পূজাবিধি।

আমি স্বভাবতই কামাসক্ত,আমাকে আর প্রলুব্ধ কোরো না বর দিয়ে। কামাসক্তির ভয়েই তো তোমার কাছে আশ্রয় নিয়েছি। আমার মধ্যে সত্যিকার ভৃত্যের লক্ষণ আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যেই তুমি আমাকে কামপ্রবৃত্ত করছ। নতুবা হে অখিলগুরু, তুমি করুণাময়, তোমার কেন এই কঠোরতা ? যে তোমার কাছে বর চায় সে ভৃত্য নয়, সে বণিক। এই বাণিজ্যবুদ্ধি থেকে মুক্তি দাও আমাকে। আমি তোমার অকামসেবক, তুমি আমার নিরভিপ্রায় প্রভু। হে সর্বকামদ, যদি নিতান্তই আমাকে বর দেবে তবে এই বর দাও যাতে কাম না অঙ্কুরিত হয় হৃদয়ে। তোমার কথা অমৃতস্বরূপ। সন্তপ্তজনের প্রাণদাতা। সর্বপাপনাশী। শ্রবণমঙ্গল। সর্বশ্রীবর্ধক। যাঁরা তোমার নাম কীর্তন করেন তাঁরা বহুদাতা। তুমি বিশ্বমঙ্গল মহৌষধি।

॥ ১৩১ ॥

ঠাকুর অসুখে পড়লেন। গলায় ব্যথা।

'বড় গরম পড়েছে।' বললেন মাস্টারকে : 'একটু-একটু বরফ খেয়ো।'

মৃদু-মৃদু হাসল মাস্টার।

'গরমে আমারো বাপু বড় কষ্ট হচ্ছে। তা বরফ খেয়েই বা বিশেষ লাভ কি। এই দেখ না, কুলপি বরফ বেশি একটু খাওয়া হয়েছিল, গলায় এখন বিচি হয়েছে।'

এই প্রথম সূত্রপাত অসুখের।

'মাকে বলেছি, মা, ব্যথা ভালো করে দাও, আর কুলপি খাব না।'

'শুধু কুলপি ?'

'না। আবার বলেছি, মা বরফেও খাব না আর। যেকালে বলেছি একবার মাকে, আর খাব না কোনোদিন। কিন্তু জানো,' সরলস্বভাব বালকের মত বললেন, 'মাঝে-মাঝে এমন হঠাৎ ভুল হয়ে যায়। সেদিন বলেছিলাম মাছ খাব না রোববার, কিন্তু, জানো, ভুলে খেয়ে ফেলেছি।'

মৃদু-মৃদু হাসল মাস্টার।

'কিন্তু জানো' গম্ভীর হলেন ঠাকুর : 'জেনে-শুনে হবার যো নেই।'

কলকাতা থেকে হঠাৎ একজন ভক্ত এসে উপস্থিত। সঙ্গে বরফ নিয়ে এসেছে ঠাকুরের জন্যে।

কৌতূহলী হয়ে তাকালেন মাস্টারের দিকে। ছেলেমানুষ যেমন করে তাকায় লোভালু চোখে। জিগগেস করলেন, 'হ্যাঁগা, খাব কি ?'

মাস্টার চুপ করে রইল।

'হ্যাঁগা, বল না, খাব কি?' আবার জিগগেস করলেন বালকের মত।

'আজ্ঞে,' মাস্টার বললে কুণ্ঠিত হয়ে, 'মাকে জিগগেস করে নিন। যদি তিনি না করেন খাবেন না।'

খেলেন না ঠাকুর।

এমনি বালকস্বভাব। এমনি সর্ববন্ধনহীন সর্বানন্দ।

স্টারে দক্ষযজ্ঞ দেখতে গিয়েছেন। সঙ্গে রামলাল। কিছু খেয়াল নেই, যে পথে মেয়েরা ঢোকে সেই পথে এসে পড়েছেন। এতটুকু পিছিয়ে যাবার চেষ্টা নেই। যে মেয়েটিকে কাছে পেলেন তাকেই ডেকে জিগগেস করলেন, 'ওগো গিরিশকে একবার ডেকে দাও না।'

গিরিশের নিমন্ত্রণেই এসেছেন। চৈতন্যলীলার পর এবার দক্ষযজ্ঞ। কৃষ্ণ-কীর্তনের পর শিববন্দনা। নবীননীরদশ্যামল কৃষ্ণ আর শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশ শিব।

কে এসে পড়েছেন নিভৃত প্রকোষ্ঠে জানে না হয়তো মেয়েটি। একচক্ষে তাকিয়ে রইল। পর্বতের মধ্যে মহামেরু নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্রমা, কে তুমি।

'বলো গে দক্ষিণেশ্বর হতে সব এসেছে।'

পড়ি-মরি করে ছুটে এসেছে গিরিশ। ছুটে এসেই লুটিয়ে পড়ল পায়ের উপর।

'ওঠো গো ওঠো। জামায় যে ময়লা লাগল।'

'ময়লা লাগল, না ময়লা গেল?' মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললে উদ্দীপ্ত হয়ে, 'সবাইকে ডাক্। পায়ে লুটিয়ে পড়্, লুটিয়ে পড়্। মহা ভাগ্য তোদের, তিনি পথ ভুলে এসে পড়েছেন, ওরে, এমন সুযোগ আর পাবিনে—'

কে কোথায় সাজগোজ করছিল, সব ফেলে রেখে ছুটে এল। প্রণাম করতে লাগল একে-একে।

এ কি সেই ভুবনভয়ভঙ্গ চতুর্বর্গবদান্য শিব নয়?

'ওঠো ওঠো মায়েরা, আনন্দময়ীরা।' মুক্তহস্তে ঠাকুর কৃপাবর্ষণ করতে লাগলেন, 'নেচে গেয়ে অভিনয় করে সর্বজীবকে আনন্দ দিচ্ছ, নিত্য বসতি করো এই আনন্দে। যাও, এইবার সাজগোজ সেরে নামো গে—'

দক্ষ সেজেছে গিরিশ। হুঙ্কার দিয়ে লাফিয়ে পড়ল স্টেজে। বীরদর্পে ঘোষণা করল: 'শিবনাম ঘুচাইব ধরাতল হতে।'

বালকের মত বিস্ময়বিহ্বল চোখে দেখছেন সব ঠাকুর। গিরিশের কথা শুনে লাফিয়ে উঠলেন ঠাকুর: 'ওরে রামলাল, এ শালা আবার বলে কি রে—'

বলে কিনা শিবনাম ঘোচাবে! এত দিন ধরে তবে ওকে শেখালাম কি!

'ও কথা গিরিশ বলছে না, দক্ষ বলছে॥'

'গিরিশ বলছে না?' যেন অবাক হলেন ঠাকুর।

'না, ওটা দক্ষের কথা।'

গিরিশ আর দক্ষ যে আলাদা এ ভেদ ভুলে গিয়েছেন। যে পোশাকেই এসে দাঁড়াক, যে অবস্থাতেই, গিরিশ সব সময়েই গিরিশ।

এই বালকস্বভাব। রাজার পার্টে বাপ অভিনয় করছে, মা'র কোলে বসে দেখছে তার ছোট ছেলে। মা, বাবা আবার কখন আসবে, কোন দৃশ্যে, এই শুধু তার জিজ্ঞাসা। রাজার আবির্ভাবের কথা নিয়ে সে মাথা ঘামায় না। নাটকে আছে বিদ্রোহী সেনাপতি রাজাকে হঠাৎ অস্ত্রাঘাত করে বসবে। সেই দৃশ্যে যেমনি সেনাপতি রাজাকে তলোয়ারের ঘা দিল ছোট ছেলে মা'র কোলে বসে কেঁদে উঠল, মা, বাবাকে মারলে! ওটা যে রাজার উপর আঘাত তা কে বোঝায় সেই ছেলেকে! তার চোখে রাজা নেই, শুধু তার বাবা। তেমনি ঠাকুরের চোখে দক্ষ নেই, শুধু গিরিশ। যে গিরিশ ভক্তভৈরব, সে শিবনাম উচ্চারণ করবে না?

'ভয় নেই, দক্ষ মানে গিরিশ আবার বলবে শিবনাম।'

বলবে তো? দেখিস। যেন আশ্বস্ত হলেন। দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন, বসলেন আবার চেয়ারে।

সেবার গিয়েছিলেন 'প্রহ্লাদচরিত্র' দেখতে। গিরিশকে বললেন, 'বা, তুমি বেশ লিখেছ।'

'লিখেছি মাত্র।' গিরিশ বললে বিনীত ভাবে, 'কিন্তু ধারণা কই?'

'ধারণা না হলে কি এত সব লেখা যায়? ভিতরে ভক্তি না থাকলে আঁকা যায় কি চালচিত্র?'

প্রহ্লাদ পড়তে এসেছে পাঠশালায়। তাকে দেখে ঠাকুরের আহ্লাদ আর ধরে না। সস্নেহে তাকে ডেকে উঠলেন প্রহ্লাদ বলে। বলতে-বলতে সমাধিস্থ।

হাতির পায়ের নিচে ফেলেছে প্রহ্লাদকে। ঠাকুর কাঁদতে শুরু করলেন। ফেলেছে অগ্নিকুণ্ডে। আবার কান্না। গোলোকে লক্ষ্মীনারায়ণ বসে আছেন প্রহ্লাদের প্রতীক্ষায়। ঠাকুর আবার সমাধিস্থ।

অসুরদের পুরোহিত শুক্রাচার্য। তার দুই ছেলে, ষণ্ড আর অমর্ক। প্রহ্লাদের দুই মাস্টার। অসুররাজ বিষ্ণুশত্রু হিরণ্যকশিপু ছেলের পড়াশোনা নিয়ে আর ভাবে না, যোগ্য হাতেই তাকে সমর্পণ করা হয়েছে। একদিন গৃহাগত ছেলেকে কোলে

নিয়ে হিরণ্যকশিপু জিগগেস করলে, যা যা এত দিন শিখলে তার মধ্যে তোমার সবচেয়ে কী ভালো মনে হয় ? প্রহ্লাদ বললে, বাবা, এই অন্ধকূপ সংসার ত্যাগ করে বনে গিয়ে শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণ করার কথাটিই সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে সুখময় মনে হয়েছে।

কোল থেকে নামিয়ে দিল ছেলেকে। গুরুরা টেনে নিয়ে গেল। জিগগেস করলে, প্রহ্লাদ, এ তুমি নিজের থেকে বললে, না, আর কেউ তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছে ? আর কেউ শিখিয়ে দিয়েছে। স্মিতহাস্যে বললে প্রহ্লাদ। যিনি শিখিয়ে দিয়েছেন, যাঁর আকর্ষণে আমার এই মতি হয়েছে, তিনিই শ্রীহরি শ্রীবিষ্ণু। তর্জন-গর্জন দণ্ড-বেত্র বহু শাসন-পীড়ন শুরু করল মাস্টাররা। নতুন করে শেখাল সব জাগতিক কর্মকাণ্ডের কথা। আবার নিয়ে এল বাপের কাছে। এইবার বলো সর্বোত্তম কী তুমি শিখে এলে ? পিতাকে বন্দনা করে প্রহ্লাদ বললে, নবলক্ষণা শিখে এসেছি। নব-লক্ষণা ? হ্যাঁ, শ্রবণ কীর্তন স্মরণ পাদ-সেবন অর্চন বন্দন দাস্য সখ্য আত্মনিবেদন। এই নবলক্ষণা ভক্তি বিষ্ণুকে অর্পণ করাই সর্বোত্তম শিক্ষা।

এবার দৈত্যরাজ ক্ষেপে গেল মাস্টারদের উপর। এই মারে তো সেই মারে। ষণ্ড-অমর্ক বলে, প্রভু এই শিক্ষা আমরা দিইনি। আর কেউও দেয়নি। এ বুদ্ধি ওর স্বভাবজ। প্রহ্লাদও সায় দিল, বললে, বাবা, সাধ্য নেই বিষয়াসক্ত স্বয়ংবদ্ধ জীব শ্রীকৃষ্ণে মতি জন্মায়। এ মতির দাতা তিনিই।

মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল ছেলেকে। সবলে লাথি মারল হিরণ্যকশিপু। অসুরদের বললে, শিগগির একে বধ করো। মাত্র পাঁচ বছরের শিশু, এ কিনা আমার পরম-শত্রু বিষ্ণুর সেবক। দুষ্ট অঙ্গের মতন এ পরিত্যাজ্য। তীক্ষ্ণ শূলে প্রহ্লাদকে বিদ্ধ করল অসুরেরা। উপবাস করিয়ে রাখো। সাপ দিয়ে দংশন করাও। হাতির পায়ের নিচে ফেল। ফেল তপ্ত কটাহে। পর্বতশৃঙ্গ থেকে নিক্ষেপ করো। পরব্রহ্মে-সমাহিত প্রহ্লাদকে কে স্পর্শ করে ! সব চেষ্টা নিষ্ফল হল। মহা ভাবনায় পড়ল হিরণ্যকশিপু।

প্রভু, আপনি ত্রিজগৎবিজয়ী, বললে ষণ্ড-অমর্ক, ছোট একটা ছেলের জন্যে কেন ভাবছেন ? পিতা শুক্রাচার্য শিগগিরই ফিরে আসছেন, যতদিন না আসেন ততদিন আমাদের কাছে ওকে পাশবদ্ধ করে রেখে যান, দেখি আরেকবার চেষ্টা করে।

দেখ। যারা খেলা করে বেড়ায় সে ছেলেদের দলে ভিড়িয়ে দাও।

আবার শুরু হল নতুন প্রয়াসের পরিচ্ছেদ। পড়াশোনা যখন বন্ধ থাকে তখন দল

পাকিয়ে আসে সব সমবয়সীরা। হেলাফেলার খেলায় ডাক দেয়।
প্রহ্লাদ বললে, মনুষ্যজন্ম দুর্লভ। মনুষ্যজন্মেই পুরুষার্থসাধন। কিন্তু মনুষ্যজন্মও নশ্বর, অধ্রুব। সুতরাং বাল্যেই ভাগবত ধর্মের আচরণ করবে।
এ আবার কেমনতরো কথা!
হ্যাঁ, বিষ্ণুই সর্বভূতের আশ্রয়, সকলের প্রিয়, সকলের বান্ধবস্বরূপ। আয়ু বড়জোর একশো বছর। তার আদ্ধেক যাচ্ছে ঘুমে। কুড়ি বচ্ছর অনর্থক ক্রীড়ায়। কুড়ি বচ্ছর জরাজনিত অক্ষমতায়। বাকি সময় যাচ্ছে স্ত্রী-পুত্র-বিষয়ভোগের আসক্তিতে। ত্রিতাপে জর্জরিত হয়ে। কেশকার কীট যেমন নিজের জালে বদ্ধ তেমনি। কামিনীর ক্রীড়ামৃগ, সন্তানের শৃঙ্খলরজ্জু। হে দৈত্যবালকগণ, মুকুন্দশরণাগতি ও তাঁর পদসেবাই এই ক্লেশক্লেদ থেকে মুক্তি আর মঙ্গলের উপায়।
প্রহ্লাদ এত কথা জানলে কি করে? বলাবলি করতে লাগল ছেলেরা।
যতদিন মাতৃগর্ভে ছিলাম নারদ আমাকে ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ দিয়েছেন। সেই স্মৃতি ত্যাগ করেনি আমাকে। হে বয়স্যগণ, আমার বাক্যে শ্রদ্ধা করো, বালকেরও ভাগবতী মতি জন্মাতে পারে। বয়স বা বিকার দেহের, আত্মার নয়। খনি খুঁড়ে যেমন সোনা, তেমনি এই দেহক্ষেত্রেই আত্মযোগের দ্বারা ব্রহ্মত্বলাভ।
'প্রহ্লাদচরিত্র' প্লে হবার পর 'বিবাহবিভ্রাট' হবে। গিরিশ ঠাকুরকে বলছে শুনে যেতে।
'না, প্রহ্লাদের পর আবার ওসব কি! গোপাল উড়ের দলকে তাই বলেছিলাম, শেষে কিছু ঈশ্বরীয় কথা বোলো। বেশ ভগবানের কথা হচ্ছিল, শেষে কিনা বিবাহবিভ্রাট, সংসারের কথা! কি লাভ হল যা ছিলুম তাই হলুম।'
'থাক তবে। কিন্তু কেমন দেখলেন প্রহ্লাদচরিত্র?'
'দেখলাম তিনিই সব হয়েছেন। মেয়েরা আনন্দময়ী মা, এমন কি গোলোকে যারা রাখাল সেজেছে তারাও সাক্ষাৎ নারায়ণ। ঈশ্বরদর্শনের লক্ষণ কি? একটি লক্ষণ আনন্দ। নিঃসঙ্কোচ আনন্দ। যেমন সমুদ্র। উপরে হিল্লোলকল্লোল, নিচে স্থির জল গভীর জল। কখনো বালকের ভাব। আঁট নেই, যেমন কাপড় বগলে করে বেড়ায়। কখনো পৌগণ্ড ভাব, ফষ্টিনষ্টি করে। কখনো যুবার ভাব. যখন কর্ম করে, লোকশিক্ষা দেয় তখন সিংহতুল্য।'
ঈশ্বর নিজেই যে বালক। তাই তো বালক ভাবটি এত মধুর! এত আত্মীয়।
ছোট তক্তপোশের উপর মুখখানি চুন করে বসে আছেন। ব্যথা বেড়েছে। গলায়

কে ডাক্তারি প্রলেপের পোঁচ দিয়েছে। চারদিকে ভক্তদের কড়া নিষেধ। যেন মুক্ত হরিণকে বেঁধেছে দড়ি দিয়ে। রুগ্ন ছেলেটির মুখের মতই মুখখানি করুণ। সব চেয়ে কঠিন কথা, কথা বলা যাবে না।

'কথা একেবারে বন্ধ করলে চলে কি করে?' প্রতিবাদ করছেন ঠাকুর: 'কত লোক কত দূর থেকে আসছে, একটা কথাও শুনে যাবে না?'

'কি দরকার! আপনাকে দেখলেই আনন্দ।' কে একজন ভক্ত বললে।

'তুই বললেই হল? দেখেই সব, কথায় কিছু নেই? তোর তো দেখে আনন্দ, কিন্তু আমার আনন্দ যে বলে।'

মাগো, যত সব এঁদো, রোগো লোক আনবি, এক সের দুধে পাঁচ সের জল, আমি কত আর ফুঁ দিয়ে জ্বাল ঠেলব? আমার চোখ গেল, হাড়-মাস মাটি হল, আমাকে রেহাই দে। অত আমি করতে পারব না। আমার কী দায় পড়েছে! তোর শখ থাকে তুই করগে যা। বেছে-বেছে সব ভালো লোক আনতে পারিস না, যাদের দু-এক কথা বললেই হবে। এ যে একেবারে বাজে লোকের ভিড় লাগিয়ে দিয়েছিস। লোকের ভিড়ে আমার নাইবার-খাবার সময় নেই। এই তো একটা মাত্র ফুটো ঢাক, রাতদিন বাজালে কদিন আর টিকবে বল?

গলা দিয়ে রক্ত বেরুল ঠাকুরের।

একটি ভক্ত মেয়ে চলেছে ঠাকুরের কাছে। ওগো, তোর হাত দিয়ে যদি একটু দুধ পাঠাই নিয়ে যাবি ঠাকুরের জন্যে? শুধোলে তাকে তার প্রতিবেশিনী।

দক্ষিণেশ্বরে আবার দুধের অভাব! ঠাকুরের জন্যে কত বরাদ্দ দুধ, কত-বা নৈবেদ্য-নিবেদন। নিতে রাজী হয় না ভক্ত মেয়ে।

শুধু এক ঘটি দুধ! নিয়ে যা। ঠাকুরকে খাইয়ে আয়।

হাতে করে ঘটি বয়ে নেতে পারব না বাপু। অনেকটা রাস্তা।

অনুনয় শুনল না। খালি হাতেই গেল দক্ষিণেশ্বর। দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে শুনল দুধ-ভাত ছাড়া আর কিছু মুখে উঠছে না ঠাকুরের। আর, এমন দুর্দৈব, আজ এক ফোঁটাও দুধ যোগাড় নেই কালীঘরে। শ্রীমা চোখে আঁধার দেখছেন, খাওয়াবেন কী ঠাকুরকে! ছি, ছি, কেন আমি সেই সাদা দুধ ফেলে এলাম? আমার মত আছে কি কেউ অভাগিনী? মনের মধ্যে ভক্ত-মেয়ে হাহাকার করতে লাগল। এখন আমি কোথায় যাই, কে আমাকে দুধ দেয়!

পাঁড়ে গিন্নির নাম করলে কেউ-কেউ। কাছেই থাকে এক হিন্দুস্থানী মেয়ে, গরু আছে বাড়িতে, দুধ বেচে। কিন্তু বেচবার মত নেই কিছু আজ উদ্বৃত্ত। দেড়

পোয়াটাক ছিল, তা এই দেখ, জাল দিয়ে রেখেছি। ঐ জাল-দেওয়া দুধই আমাকে দাও। আমার দারুণ দায়। আমার ঠাকুর না খেয়ে রয়েছেন। বলো কত দাম দেব? যা চাও তাই নাও।

অনেক সাধ্যসাধনা করে কিনে আনল দুধ। ভাত চটকে সেই দুধটুকুই খেলেন ঠাকুর। কত বড় তৃপ্তির সাগর উথলাচ্ছে সেই ভক্ত-মেয়ের বুকের মধ্যে। আঁচাবার সময় জল ঢেলে দিল ঠাকুরের হাতে।

কানের কাছে মুখ এনে সহসা ঠাকুর বললেন, 'ওগো তোমার সেই মন্ত্রটি আমাকে দেবে?'

কোন মন্ত্র? চমকে উঠল সেই ভক্ত মেয়ে।

'সেই যে সিদ্ধিমন্ত্র পেয়েছিলে কর্তাভজাদের এক মেয়ের কাছ থেকে সেইটি।' কণ্ঠস্বরে ব্যথা ঝরে পড়ল: 'ওগো গলায় বড় বেদনা। তোমার ঐ মন্ত্রটি উচ্চারণ করে গলায় একবার হাত বুলিয়ে দেবে?'

আশ্চর্য, ঠাকুর কি করে জানলেন! গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল মেয়ের। কোন কালে কী সকাম সাধনায় ঐ মন্ত্র সে শিখেছিল গোপনে তা তো তাঁর জানবার কথা নয়! ঠাকুরের পায়ে শরণ নিয়ে জীবনের সকল কথাই তাঁকে সে খুলে বলেছে, শুধু এই মন্ত্র নেওয়ার কথাটিই বলেনি। কামনাসিদ্ধির জন্যে মন্ত্র নেওয়া, এ শুনলে ঠাকুর যদি অসন্তুষ্ট হন তারই জন্যে চেপে গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য, কিছুই কি তাঁকে লুকোবার নেই?

লজ্জায় অবনতমুখে গেল সে শ্রীমা'র দুয়ারে। বললে তার ধরাপড়ার কথা।

মা বললেন, 'কোনো ভয় নেই। এখন তো সে মন্ত্র ফেলে দিয়েছ, নিষ্কাম হয়ে ঈশ্বরকে ডাকাই যে কর্তব্য, বুঝেছ এই সার কথা। জানো এঁর কাছে আসার আগে আমিও ঐ মন্ত্র শিখে নিয়েছিলাম। কত লোকে কত কথা বলেছে, ঐ মন্ত্রও ওদের পরামর্শেই নেওয়া। একদিন ঠাকুরকে বললুম সব খোলাখুলি। একটুও রাগ করলেন না। শুধু বললেন, মন্ত্র নিয়েছ তাতে কি? এখন তা ইষ্ট পাদপদ্মে সমর্পণ করে দাও।'

ভালো-মন্দ শুচি-অশুচি সকাম-নিষ্কাম সব বিসর্জন দাও তাঁর পদপ্রান্তে। তিনি আর কিছু চান না, শুধু চান মন-মুখের সমতা।

নিজলাভতুষ্ট স্বশান্তরূপ আশুতোষকে দেখ। সামান্য মৃত্তিকায় তার মূর্তি। একটু গঙ্গাজল আর দুটো বেলপাতাই তার উপকরণ। তুচ্ছ গালবাদ্যেই তার পরিতোষ।

আর কিছু না থাকে দাও তাঁকে অন্তরের সারল্য। সরল হওয়া মানেই নির্মল হওয়া। তিনি যে নির্মলচক্ষু। কী তাঁর থেকে গোপন করবে? কোন গুহায় গিয়ে মুখ ঢাকবে? তিনি যে আরো গভীরে। কী আচ্ছাদন আছে তোমার আবৃত করবার? তিনি যে অনিরুদ্ধ।

ঠাকুরকে কলকাতায় নিয়ে আসা হল চিকিৎসার জন্যে। প্রথমে উঠলেন দুর্গাচরণ মুখুজ্জে স্ট্রীটের ছোট বাড়িতে। ছাদ থেকে গঙ্গা দেখা যাবে এইটুকু সেখানে প্রশান্তিস্পর্শ।

ছাই। ওটুকু গঙ্গায় আমার কী হবে? রাত্রিদিন নিত্য আমি ছিলাম ঐ প্রশস্ত-বাহিনী গঙ্গার কাছটিতে, আমার বিস্তীর্ণ দক্ষিণেশ্বরের বাগানে, মুক্ত বাতাসের উদারতায়। এ আমাকে কোথায় এনে বন্দী করলি? একদিন হেঁটে চলে গেলেন বলরামের বাড়ি। তবু এখানে কিছুটা খোলা-মেলা আছে। আছে অনন্ত শুভাবহা ভক্তির বিশুদ্ধতা।

আসতে লাগল কবিরাজের দল। গঙ্গাপ্রসাদ গোপীমোহন নবগোপাল দ্বারিকানাথ। ডাক্তাররা যাকে বলে ক্যান্সার, কবিরাজের ভাষায় রোহিনী। গঙ্গাপ্রসাদ বললেন ভক্তদের, 'শাস্ত্রে আছে বটে চিকিৎসার বিধান কিন্তু অসাধ্যআরোগ্য।'

কবিরাজদের কোনো ওষুধই লাগল না। শেষে ঠিক হল হোমিওপ্যাথি করানো যাক। শ্যামপুকুর স্ট্রীটে নেওয়া হল বাড়িভাড়া। ডাকো মহেন্দ্র সরকারকে। অসহ্য ক্লেশভোগ করছেন। অথচ অবিচাল্য। পর্বতচূড়ারও বোধ করি ধৈর্যের সীমা আছে। বজ্র পড়লে তাও ভেঙে পড়ে। কিন্তু এঁর ধৈর্যের বুঝি সীমা নেই। বজ্রের বহ্নিজ্বালাও বুঝি ঐ শান্তশীতল বক্ষের স্পর্শে নিভে গেছে।

তাই অপার বিশ্বাসই তোমার দুর্গ হোক। তপস্যা আর আত্মসংযম হোক অর্গল। ধৈর্য হোক দুর্ভেদ্য প্রাচীর। তারপর তোমার ধনু উত্তোলন করো। ধর্মই তোমার ধনু, নিষ্ঠা তার জ্যা, শান্তি তার অটনি। সত্যসহায়ে তোলো তোমার ধনু। প্রেমরূপ শর যোজনা করো। ভেদ করো তোমার কর্মরূপ বর্ম। সর্বসংগ্রামে জয়ী হও।

শাঁখারিটোলায় ডাক্তারের বাড়ি এসেছে মাস্টারমশায়। নিয়ে যাবে তাকে শ্যামপুকুর। ডাক্তার তার গাড়িতে তুলে নিল মাস্টারকে। বহু জায়গায় ডাক, ঘুরে-ঘুরে ফিরতে লাগল ঘরে-ঘরে। প্রথমে চোরবাগান, পরে মাথাঘষার গলি, শেষে পাথুরিয়াঘাটা। বড়বাজার হয়ে সর্বশেষে শ্যামপুকুর। সমস্ত জ্ঞান-তর্ক পেরিয়ে সর্বশেষে শরণাগতি।

ঠাকুরের সেবার কথা উঠেছে। 'তোমাদের কি ইচ্ছে ওঁকে আবার দক্ষিণেশ্বরে পাঠানো?' ডাক্তার জিগগেস করল মাস্টারকে।

'না, তাতে ভক্তদের বড় অসুবিধে। কলকাতায় থাকলে সব সময় যাওয়া-আসা যায়, দেখতে পাওয়া যায় সর্বদা।'

'কিন্তু এতে তো অনেক খরচ।'

'তা হোক। ভক্তদের তার জন্যে বিন্দুমাত্র কষ্ট নেই। যাতে তাঁর পরিপূর্ণ সেবা করতে পারে তাই তাদের একমাত্র চেষ্টা।' মাস্টার বললে গাঢ়স্বরে, 'একমাত্র আরাধনা। খরচ এখানেও, সেখানেও। খরচের কথা কেউ ভাবে না। তবু যে সর্বক্ষণ দেখতে পাচ্ছি চোখের উপর এই একমাত্র সান্ত্বনা।'

সব ভক্তকে মেলাবার জন্যেই তো ঠাকুরের অসুখ। এক সুতোয় গাঁথবার জন্যে। এক মন্ত্রে উজ্জীবিত করার জন্যে।

সে মন্ত্রটি কি?

সে মন্ত্র সেবা।

ওরে শুধু আমার সেবা নয়, সমস্ত মানুষের সেবা। শিবজ্ঞানে জীবসেবা। ওরে মানুষের মৈত্রী, মানুষের কল্যাণ। মানুষের চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই। মহাভারতে ভীষ্মের কথা মনে কর, ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ।

হরি, আমাকে বিনামূল্যে পার করে দাও। এই বিনামূল্যটিই প্রেম। আর, পার হতে চাওয়া সমস্ত অহঙ্কারের বিচ্ছেদ উত্তীর্ণ হয়ে মানুষের মৈত্রীতে প্রসারিত হওয়া।

ওরে মানুষের মধ্যেই এই ঠাকুর। পরমপুরুষ ব্রহ্মবিদ। প্রেমই ব্রহ্মবিহার। তুই ধর্ম দিতে যাস নেবে না, আদর্শের সঙ্গে আদর্শের সঙ্ঘাত হবে। কিন্তু মৈত্রী দিতে যাস নেবে পাত্র পরিপূর্ণ করে। মিত্রের অনুরাগপূর্ণ দৃষ্টিতে সকলকে দেখ, সকলেও সেই সাহ্লাদদৃষ্টিটি প্রত্যর্পণ করবে।

আমরা ভদ্র শুনব, ভদ্র দেখব, ভদ্রে প্রেরিত হব। আমাদের চিন্তা কল্যাণ, দর্শন কল্যাণ, কর্মও কল্যাণ।

মানবসেবাই মাধবসেবা।

॥ তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥

BoiRboi.net

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

চতুর্থ খণ্ড

boiRboi.net

"তুমি এ রকম ঢিমে তেতালা বাজালে চলবে না। তীব্র বৈরাগ্য দরকার। পনেরো মাসে এক বৎসর করলে কি হয়? তোমার ভিতরে যেন জোর নেই। শক্তি নেই। চিঁড়ের ফলার, আঁট নেই, ভ্যাদ-ভ্যাদ করছে। উঠে পড়ে লাগো। কোমর বাঁধো। এ জন্মে না হোক পর জন্মে পাব—ও কি কথা? অমন ম্যাদাটে ভক্তি করতে নেই। তাঁর কৃপায় তাঁকে এ জন্মেই পাব, এখনই পাব—মনে এই রকম জোর রাখতে হয় বিশ্বাস রাখতে হয়। ও দেশে চাষীরা সব গরু কিনতে গিয়ে গরুর ল্যাজে আগে হাত দেয়। কতকগুলো গরু আছে, ল্যাজে হাত দিলে কিছু বলে না, গা এলিয়ে শুয়ে পড়ে—অমনি তারা বোঝে সেগুলো ভালো নয়। আর যেগুলোর ল্যাজে হাত নেওয়া মাত্র তিড়ি-মিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে, অমনি বোঝে এইগুলো খুব কাজ দেবে। সেইগুলোর ভিতর থেকে পছন্দ করে নেয়। ম্যাদাটে ভাব ভালো নয়। জোর নিয়ে এসে বিশ্বাস করে বলো, তাঁকে পাবই পাব, এখনই পাব—তবে তো হবে।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

boiRboi.net

'যে অসুখ হয়েছে, কারু সঙ্গে কথা কওয়া চলবে না।' মুখ গম্ভীর করে বললে ডাক্তার সরকার। তার পর মুখে একটু হাসি টানলে: 'তবে আমি যখন আসব কেবল আমার সঙ্গে কথা কইবেন।'

শুনতে মধুময় লাগে। কথা তো নতুন নয়, বলাটি নতুন। সেই একের কথাই অনেক ভাবে বলা। একটুও লাগে না একঘেয়ে।

আপনিও এ-সব কথা শোনেন? আপনি তো ঘোরতর বৈজ্ঞানিক। যুক্তিবাদী। বাস্তবপন্থী।

কলকাতা মেডিকেল কলেজের এম-ডি, নাম ডাক-ওয়ালা ডাক্তার, হঠাৎ হোমিয়োপ্যাথির দিকে ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু যার মধ্যে সত্য আছে একবার বুঝেছে তাকে শত অসুবিধা সত্ত্বেও ছাড়তে কখনো রাজী নয়। শুধু অসুবিধে? দস্তরমত উৎপীড়ন। তার সহযোগী য়্যালোপ্যাথ ডাক্তারেরা খড়্গহস্ত হয়ে উঠল। নানা উপায়ে লাগল তার বিরুদ্ধতা করতে। দুর্নাম রটাতে। কিন্তু দমবার পাত্র নয় সরকার।

মেডিকেল এসোসিয়েশনের সভা হচ্ছে। বক্তা মহেন্দ্র সরকার। মুক্তকণ্ঠে হ্যানিম্যানের গুণকীর্তন করছে। সহগামী ডাক্তাররা তো সব হতভম্ব। বিজ্ঞানের মান-ইজ্জৎ সব যে ধূলিসাৎ করে দিল। অসম্ভব! বক্তৃতা বন্ধ করো। বিজ্ঞানের অপমান সইতে পারব না আমরা। ও নিজে না বন্ধ করে, মুখ চেপে ধরো কেউ।

'চুপ করো।' গর্জে উঠল য়্যালোপ্যাথের দল। 'নইলে ঘাড় ধরে বার করে দেব হল্ থেকে।'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে সভার দিকে তাকিয়ে দেখল একবার সরকার। দৃঢ় অথচ শান্ত কণ্ঠে বললে, 'যদি কেউ বার করে দিতে চায় তো দিক কিন্তু আমি আমার সত্যকে প্রকাশ করে যাব।'

সত্যকে প্রকাশ করে যাব। যা বুঝেছি যা জেনেছি তা বলতে পেছপা হব না। শুধু বলে যাব না, করে যাব। দেখিয়ে যাব। নিজেও প্রকাশিত হব।

কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছে এত মজা কিসের?

গিরিশ ঘোষ বললে, 'আপনি যে ওখানে তিন-চার ঘণ্টা ধরে রয়েছেন। এ কেমন কথা! আর রুগী নেই আপনার? তাদের চিকিৎসা করতে হবে না?'

'আর ডাক্তারি আর রুগী!' গভীর নিশ্বাস ফেলল সরকার। 'যে পরমহংস হয়েছে আমার সব গেল!'

সকলে হেসে উঠল।

আমার সব গেল। দড়ি গেল, দড়া গেল, হাল গেল, পাল গেল, এবার ভেসে পড়লাম নদীতে।

ঠাকুর বললেন, 'এ নদীর নাম কর্মনাশা। এ নদীতে ডুব দিলে মহা বিপদ। কর্মনাশ হয়ে যায়। সে ব্যক্তি আর কোনো কর্ম করতে পারে না।'

তবে ডাক্তার কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করে? শুধু কারণ-পরম্পরাই দেখে না, জগৎকারণকেও খোঁজ করে? প্রতিপাদিত সিদ্ধান্তের বাইরে আছে কি কোনো অপ্রমেয়? ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে প্রচ্ছন্ন কোনো মূল শক্তি?

শিবনাথের বন্ধু বিয়ে করেছে এক বিধবাকে। বউটির ভারি অসুখ। সংস্থান নেই যে ভালো চিকিৎসা করে। ওহে শিবনাথ, একটা কিছু সুরাহা হয়?

দীনতারণ বিদ্যাসাগর। শিবনাথের হাতে চিঠি দিল সরকারকে, যদি দয়া করে দেখ একবার বিনা পয়সায়। আদর্শ পালনের জন্যে লাঞ্ছিত হচ্ছে। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝে-যুঝে নিয়েছে শেষ রোগশয্যা।

একবার নয় বার-বার যেতে লাগল সরকার। কিন্তু কই, ভালো হচ্ছে কই মেয়েটি?

রোজ সকাল-বিকাল শিবনাথ আসছে ডাক্তারের কাছে। রুগীর অবস্থা বলছে, ব্যবস্থা নিচ্ছে। চলো আরেক বার দেখি। আরেক বার ওষুধ পালটাই। কিন্তু কই, এত চেষ্টা, এত আয়াস, সুফল ফলছে কই? হায়, সে সুফলবৃক্ষের নাম কি?

বউটির মৃত্যুর একদিন আগে শিবনাথ গিয়েছে ডাক্তারের কাছে। রাত প্রায় দশটা। অবস্থা খারাপ, তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে পড়েছে। নতুন একটা কিছু অষুধ দিন। বড্ড ছট্‌ফট করছে।

দেব। কিন্তু অষুধের জন্যে শিশি এনেছ?

শিশি আনতে ভুলে গিয়েছে শিবনাথ। কোনো দিন ভুল হয় না, কি সর্বনাশ, আজই এই সঙ্গিন মুহূর্তে এমন একটা ভুল হয়ে গেল?

ডাক্তার নিজের বাড়িতে খোঁজ করলে। কিন্তু যেমনটি দরকার পাওয়া গেল না একটাও। শিবনাথ ছুটে বেরিয়ে গেল। কোনো ডাক্তারখানা থেকে যদি কিনতে পায়! রাত অনেক হল। তা হোক। শিশি একটা যোগাড় হবে না? শিশি নিয়ে ফিরল যখন শিবনাথ, অনেক-অনেক মূল্যবান সময় অপব্যয় হয়ে

গেছে। ডাক্তার ক্লান্ত স্বরে বললে, 'এরই জন্যে মনে হচ্ছে বউটি বাঁচবার নয়। যদি বাঁচবার হত, তোমার শিশি আনতে ভুল হয় কেন? আর আমার ঘরেই বা পাওয়া যায় না কেন একটা?'

'কিন্তু এই তো এনেছি যোগাড় করে।'

'যেখানে প্রতিটি মুহূর্ত দামী সেখানে এতটা সময় অনর্থক নষ্টই বা হয় কেন? কোন ওজরে? শিবনাথ, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, পারলুম না বাঁচাতে!'

ম্লান হয়ে গেল শিবনাথ। বললে, 'আপনিও যদি এই কথা বলেন আমরা যাই কোথায়?'

ডাক্তার চমকে উঠল। 'কেন, কি বললুম আমি?'

'আপনি ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক। আপনিও যদি ভাগ্য বা নিয়তির উপর নির্ভর করে থাকেন তাহলে আমাদের উপায় কি?'

'অনেক দিন ধরে ডাক্তারি করছি, হাড়ে ঘুণ ধরে গেল। কিন্তু প্রতিনিয়তই এই সত্যটাকেই উপলব্ধি করছি, আরেকটা কোনো শক্তি সমস্ত প্রাণিজীবনকে চালনা করছে। যতই ওষুধ-বিষুধ দিই ছুরি-কাঁচি চালাই আমরা কিছু নয়, শুধু ঢিল ছুঁড়ছি অন্ধকারে। যার মৃত্যু নিশ্চিত কোন ডাক্তার তাকে রক্ষা করে?'

'তাহলে ডাক্তারি ছেড়ে দিন।' ঝাঁজিয়ে উঠল শিবনাথ। 'সবাইকে বলুন ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ করে বসে থাক শান্ত হয়ে।'

'তা কেন? অন্ধকারে আছি বলেই তো বেশি করে হাতড়াতে হবে, বেশি করে আঁকড়াতে হবে। ফলাফল থাক আরেকজনের হাতে, তবু আমরা বীর, আমরা লড়াই করে যাব। সত্য খুঁজতে-খুঁজতে ধরে ফেলব সেই সত্যস্বরূপকে।'

ঠাকুর বললেন অনুনয় করে, 'এই অসুখটা ভালো করে দাও। তাঁর নাম-গুণ গান করতে পাই না।'

নারদ বললেন, আহা, তোমরা কী সুনির্মল, যেহেতু হরিনাম কীর্তনে তোমাদের অনুরাগ। আগে তিমিরহনন করেই সূর্যের উদয় তেমনি তোমাদের মনের অন্ধকার নাশ করে নামতপন তোমাদের রসনার আকাশে উদিত হয়েছেন।

যদি অন্তর্বহিকে সমুজ্জল করতে চাও তবে তোমার জিহ্বারূপদ্বারে রামনাম-মণিরূপ দীপ স্থাপন করো। বায়ুর সাধ্য নেই সে দীপকে বাধা দেয়, সে দীপকে নেবায়। বায়ু মানে সংসারঝটিকা।

প্রহ্লাদ বললে, হে নৃসিংহ, যে সকল সাধু আনন্দান্বিত হয়ে উচ্চকণ্ঠে তোমার নাম গান করছে তারাই সর্বজীবের অকৈতব বন্ধু। নিরুপাধিক বান্ধব।

মন্ত্রে-তন্ত্রে কত স্খলন-পতন ঘটছে। মন্ত্রে স্বরভ্রংশ হচ্ছে, উচ্চারণে ভুল হচ্ছে। তন্ত্রে হচ্ছে-আচারভ্রংশ, নিয়মের ব্যতিক্রম। সমস্ত ছিদ্র ও ন্যূনতা নামকীর্তনই পূরণমোচন করে। ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব কিছুই পড়ে দরকার নেই তোমার, তুমি শুধু হরিনাম করো। সর্বার্থসাধক সর্বতীর্থাধিক হরিনাম। আর বিষ্ণুদূতেরা বললে যমদূতদের, 'হে কৃতান্তকিঙ্করগণ! এই অজামিল কোটি-কোটি পাপ করেছিল বটে কিন্তু যে মুহূর্তে হরিনাম উচ্চারণ করেছে তখন আর সে পাপী নয়। হরিনামই পরম স্বস্ত্যয়ন। পরম মোক্ষপ্রদ।'

কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ এই অজামিল। দাসীসংসর্গে কুলভ্রষ্ট হয়েছে। হেন পাপ নেই যে করেনি। ধর্মপত্নীকে পর্যন্ত ত্যাগ করেছে। দাসীগর্ভে অনেকগুলি পুত্র হয়েছে; কোন খেয়ালে কে জানে, সর্বকনিষ্ঠের নাম রেখেছে নারায়ণ। বড় ভালোবাসে ছেলেটাকে। নাওয়ায়-খাওয়ায়, কোলে-পিঠে করে খেলা দেয়। ছেলের অস্ফুট মধুর কণ্ঠ নকল করে নারায়ণ-নারায়ণ বলে ডাকে।

বুড়ো বয়সে অজামিলকে কাল গ্রাস করতে এসেছে। বাচিক মানসিক ও কায়িক—তিন রকম পাপেই পাপী ছিল বলে তিন-তিনটে যমদূত এসে হাজির। ঊর্ধ্বরোম বক্রানন বিকটমূর্তি পুরুষ তিনজন। পাশ দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাবে, ভীতত্রস্ত হয়ে অজামিল তাকাতে লাগল চারদিকে। অদূরে খেলছিল নারায়ণ, তারই নাম ধরে ডেকে উঠল অজামিল। নারায়ণ, নারায়ণ!

আর যায় কোথা! চোখের পলকে চারজন বিষ্ণুদূত এসে উপস্থিত। চতুরক্ষক নারায়ণ, তাই বিষ্ণুদূত চারজন। এসেই হাঁক দিল, 'কোথায় নিয়ে যাও একে? যদি বাঁচবার ইচ্ছে থাকে, ছেড়ে দাও অজামিলকে। পথ দেখ।'

'কে তোমরা?' হুমকে উঠল যমদূতেরা। 'ধর্মরাজের শাসনে বাধা দাও, কী স্পর্ধা তোমাদের? তোমরা দেখতে তো মনোহর, অভিনববয়স, চতুর্ভুজ। পদ্মপলাশনেত্র, কিরীটকুণ্ডলধারী। তোমাদের আকৃতি দেখে তো সুশীল-শিষ্ট বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু এ তোমাদের কি দৌরাত্ম্য? দুরাচার পাপীকে যমালয়ে নিয়ে যেতে দেবে না? তোমরা কে? কার লোক? তোমাদের তো কই দেখিনি।'

দণ্ডাদণ্ড জ্ঞান নেই কারা এই হীনমতি? বিষ্ণুদূতরা বললে, 'যদি তোমরা ধর্মরাজের আজ্ঞাবহ, ধর্মের স্বরূপ ও প্রমাণ কি তা আমাদের বলো।'

'যা বেদবিহিত তাই ধর্ম। যা বেদনিষিদ্ধ তাই অধর্ম। জানো এই পাপাত্মাকে?' যমদূতরা নির্দেশ করল অজামিলকে। 'পরিণীতা পবিত্রা

ভার্যাকে এ ত্যাগ করেছে। পিতামাতাকে ত্যাগ করেছে। দাসীর প্রতি কামাসক্ত হয়েছে। চিরজীবন উল্লঘন করেছে শাস্ত্রবিধি। অধর্মার্জিত অর্থে পোষণ করেছে পরিবার। আত্মকৃত পাপের নিষ্কৃতির জন্যে কোনো প্রায়শ্চিত্ত করেনি। তাই একে দণ্ডপাণির কাছে নিয়ে যেতে এসেছি। সেই ধর্মাধিকরণে জীব দণ্ড দ্বারাই বিশুদ্ধ হয়।'

'অহো কি দুঃখ! ধর্মদর্শীদের সমাজে প্রবেশ করেছে অধর্ম।' বিষ্ণুদূতরা বললে, 'অজামিল শত-শত পাপ করেছে সত্য কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করেনি এ সত্য নয়।'

'নয়?'

'না। অন্তিম কালে, হোক তা বিবশ অবস্থা, পরমস্বস্তিপ্রদ শ্রীহরির নাম করেছে। ব্রতযজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত পাপের ক্ষয় করে মাত্র, কিন্তু শ্রীহরির নাম পাপ প্রবৃত্তির মূল উৎপাটন করে। তার চেয়েও আরো বেশি করে। অন্তরে শ্রীহরির গুণরাশি উপলব্ধি করিয়ে দেয়। যেমনি অজামিল মৃত্যুকালে প্লুতস্বরে শ্রীহরির নাম নিয়েছে, বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে সমস্ত পাপ। সুতরাং একে ছাড়ো, ওকে আর নিয়ে যেতে পারবে না যমালয়ে।'

"নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকঃ পাতকী জনঃ॥"

পাপহরণ বিষয়ে হরিনামের যত শক্তি আছে, পাতকীজনের সাধ্য নেই সে পরিমাণ পাপ করে।

"একবার হরিনাম যত পাপ হরে,
পাপীদের সাধ্য নাই তত পাপ করে।"

যমদূতরা ছেড়ে দিল অজামিলকে। মৃত্যুবন্ধন থেকে মুক্ত করে দিল। পূর্ব-দুষ্কৃত স্মরণ করে ঘোর অনুতাপ হল অজামিলের। আমাকে শত ধিক, কি দুষ্পরাজয় পাপই না আমি করেছি! কিন্তু কি আশ্চর্য, পাপবদ্ধ অবস্থায় যেই নারায়ণকে ডাকলাম, শোভনদর্শন দেবদূতরা এসে আমাকে মুক্ত করে দিল। কোথায় গেল তারা, আর কি তাদের দেখতে পাব না? এবার থেকে যত-চিত্তেন্দ্রিয় হয়ে থাকব। অবিদ্যাবন্ধন ছিন্ন করে আত্মবান ও সর্বপ্রাণীর সুহৃদ হব। অহং মম বোধ আর রাখব না মিথ্যাপদার্থে। ভগবানের কীর্তন দ্বারা দেহ-মন বিশুদ্ধ করে অর্পিতচিত্ত হব, সমাহিত হব। ইন্দ্রিয়দের বিষয় থেকে প্রত্যাহৃত করে মন মুক্ত করব আত্মায়, শ্রীহরির পাদপদ্মে।

বিষ্ণুদূতরা দেখা দিল আবার। এবার স্বর্ণবিমান নিয়ে এসেছে। অজামিলকে

তুলে নিয়ে গেল শ্রীপতির সুখধামে।

'জপ করা মানে নির্জনে নিঃশব্দে তাঁর নাম করা।' সেদিন ঠাকুর বলছিলেন দেবেনকে। 'একমনে নাম করতে-করতে, জপ করতে-করতে তাঁর দেখা মেলে। শেকলে-বাঁধা কড়িকাঠ গঙ্গার গর্ভে ডোবানো আছে, আরেক দিক তীরে বাঁধা। শিকলের একেকটি পাব ধরে-ধরে এগিয়ে গিয়ে শেষে ডুব মেরে শিকল ধরে-ধরে যেতে-যেতে পৌঁছুনো যায় কড়িকাঠে। তেমনি জপ করতে-করতে মগ্ন হয়ে গেলে ক্রমে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়।'

আসল কথা হচ্ছে, ডোবো।

'ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন!
তলাতল খুঁজলে পাতাল পাবি রে প্রেমরত্ন ধন।'

তাই সরবে নাম করতে পারছেন না বলে ঠাকুরের দুঃখ। ওগো অসুখটি ভালো করে দাও।

'নাম করতে না পারলে কি হয়?' বললে ডাক্তার, 'ধ্যান করলেই হল।'

'সে কি কথা!' ঠাকুর আপত্তি করলেন। 'আমি একঘেয়ে কেন হব? আমি পাঁচ রকম করে মাছ খাই। কখনো ঝোলে কখনো ঝালে কখনো অম্বলে কখনো ভাজায়। আমার কখনো পূজা, কখনো জপ, কখনো ধ্যান, কখনো নামগুণগান। কখনো বা নৃত্য।'

'আমিও একঘেয়ে নই।' বললে ডাক্তার।

আমার অনন্ত পথের অদ্বিতীয় যে বন্ধু তিনিও তো বহুবিচিত্র।

কিন্তু এ আমার কি হল? রাত তিনটে থেকে ঘুম নেই, শুধু পরমহংসের ভাবনা। সকালে উঠেও সেই পরমহংস। বলছে মাস্টারকে, 'তোমরা জানো না, আমার য়্যাকচুয়েল লস্ হচ্ছে। রোজ দু-তিনটে কল-এ যাওয়াই হচ্ছে না। তারপর নিজেই রুগীদের বাড়ি যাই। আপনি গেলে আর ফি নেই। বলো, আপনি গিয়ে কি ফি নেওয়া যায়?'

॥ ১৩৩ ॥

ডাক্তার তো জুটেছে কিন্তু সেবা করবার লোক কোথায়?

কেন, আমরা আছি। ভক্তের দল এগিয়ে এল। দিনের পর দিন রাত জাগল। যখন যা করবার তাই করব প্রাণ ঢেলে। বুকের রক্ত দিতে হয় তাতেও পেছপা নই।

কিন্তু রুগীর পথ্য তৈরি করবে কে? কে তাতে মেশাবে তার মমতার কোমলতা? অনুরাগের স্বাদগন্ধ? আরোগ্য প্রার্থনার মাধুর্য?

'ও গোপাল, ভালো করে খাও। ছোলা দিয়ে শাক ভাজা হয়েছে, ওটি আগে মুখে দাও।' দক্ষিণেশ্বরে অঘোরমণি কত দিন এসে খাইয়েছে ঠাকুরকে।

'বড়ি দিয়ে ঝোল আরেকটু দেবে?'

'কে রেঁধেছে বলো তো?' ঠাকুর জিগগেস করেন খেতে-খেতে।

'স্বয়ং লক্ষ্মী রেঁধেছেন।'

কে লক্ষ্মী যেন চেনেন না ঠাকুর।

'বৌমা গো বৌমা।'

'সবই যদি বৌমার রান্না, তুমি তবে খাওয়াবে কবে?'

'কার সঙ্গে কার তুলনা।' অঘোরমণি বিহ্বল গলায় বললে, আমার বৌমার হাতধোয়ানি জলেই অমৃততুল্য রান্না হয়।'

কে এই অঘোরমণি? বলরাম বোসের বাড়িতে একদিন বলছেন ঠাকুর: 'কামারহাটির বামনি কত কি দেখে! গঙ্গার ধারে একলাটি এক বাগানে নির্জন ঘরে থাকে আর জপ করে। গোপালের কাছে শোয়।' বলতে-বলতে চমকে উঠছেন: 'কল্পনা নয়, সাক্ষাৎ। দেখলে গোপালের হাত রাঙা। সঙ্গে-সঙ্গে বেড়ায়, মাই খায়, কথা কয়। নরেন্দ্র শুনে কাঁদলে।'

আমার গোপাল ধন-দৌলত চায় না, ভোগ-বিলাস চায় না, সামান্য একটু ক্ষীর-সর পেলেই সে খুশি। বড়জোর মাথার একটা বালিশ। কটা নেহাত জংলি ফুল। অসুখ শুনে একটি ভক্ত-মেয়েকে পাঠিয়ে দিয়েছেন শরৎ মহারাজ। কামারহাটির বাগানে একা-একা থাকেন, একটু গিয়ে তাঁর দেখাশোনা করো। তার পর শুনতে পাচ্ছি সে বাড়িতে নাকি নানারকম শব্দ, ছাদের উপর, দরজা-জানলায়। রুগ্ন একা মানুষ, ভয় না পান শেষকালে!

সাহসিকা মেয়ে পিছু হটল না। কিন্তু তাকে দেখে আপত্তি করল অঘোরমণি। 'এখানে কেন এলি? ভীষণ কষ্ট পাবি যে। আমার ভয়ই বা কি, ভাবনাই বা কি। আমার তো গোপালই আছে। শোন বাপু, এখানে যখন এসেছিস, এখানে কিন্তু নানান রকম আছে। শব্দ-টব্দ শুনলেই কিন্তু জপে বসে যাবি, আসন ছাড়বিনে—'

জপ আর আসন। একটু নিষ্ঠা আর অভিনিবেশ। একটু সঙ্কল্প আর উন্মুখতা। বাগবাজার বৃন্দাবন পালের গলি থেকে দুটি মেয়ে এসেছে অঘোরমণির কাছ থেকে দীক্ষা নিতে।

ওরে আর লোক পেলিনে ? আমার কাছ থেকে দীক্ষা ?

স্বামীজী এলেন এগিয়ে। বললেন, 'তা জানি না। ওদেরকে তোমার কাছে উৎসর্গ করে দিচ্ছি। তুমি গোপালের মা।'

'বাবা, আমি কাঙাল ফকির—কিছুই জানি না। আমি কি দেব ? বউমা—বউমাও তো নেই এখন এখানে। তবে কী হবে ?'

'তুমি কি যে-সে ?' বললেন স্বামীজী, 'তুমি জপে সিদ্ধ। তুমি পারবে না তো কে পারবে ? বলি, কিছু না পারো তোমার ইষ্টমন্ত্রটি দিয়ে দাও। তোমার তো সব হয়ে গেছে। তোমার আর ও মন্ত্রে কি দরকার।'

তথাস্তু। মেয়ে দুটির কানে নাম দিয়ে দিল অঘোরমণি।

এবার তবে গুরুদক্ষিণা দাও।

ষোলো আনা পূর্ণ করে দুটি টাকা দিতে গেল মেয়ে দুটি। গোপালের মা বলে উঠল, 'ওগো মনপ্রাণ যে দেবার কথা।' শেষে বলল গম্ভীর হয়ে, 'শোনো, নাম নেওয়া হেলাফেলার জিনিস নয়। অন্তত দশ হাজার জপের পর আসন ছাড়বে। হলেও বেরুবে না, মলেও বেরুবে না।' মানে সংসারে কেউ জন্মালো বা মরলো খেয়াল করবে না। নাম করে যাবে।

এই দেখ না গোলাপ-মাকে। ওর পুজো-আচ্চা নেই। সটান বসে গেল জপের আসনে। আর কে ওকে টলায়। কে আর ওকে সরায় ওর আনন্দকেন্দ্র থেকে।

পবিত্রতাই আসন। আর ব্যাকুলতাই নাম।

ঠাকুর বললেন, 'নামের মাহাত্ম্য খুব আছে বটে, তবে অনুরাগ না থাকলে কিছু হবার নয়। ঈশ্বরের জন্যে ব্যাকুল হওয়া চাই। শুধু নাম করে যাচ্ছি, কিন্তু মন রয়েছে কামকাঞ্চনে তাতে কিছু হবে না। তাই নাম করো, সঙ্গে-সঙ্গে প্রার্থনা করো, হে ঈশ্বর, তোমাতে যেন অনুরাগ হয়, যেন দেহসুখ মানযশের প্রতি টান কমে যায়।'

ছোট্ট ঘরটি গঙ্গার জলে ধুয়ে-মুছে খটখটে করে রাখে অঘোরমণি। নিজের হাতে-পায়ে খাটা-খাটনি করে। একটি সিকেতে মুড়ি বাতাসা নারকেল নাড়ু রাখে, কখন গোপালের খিদে পাবে কে জানে! ডালাকুলো, শিল-নোড়া কোন জিনিসটা না লাগে শুনি। দাঁত মাজবার গুল, খাবার পর দুটি মশলা, জোয়ান বা ধনের চাল, ছেঁচা একটু পান পেলে খাই গোপালকে ভোগ দিয়ে। শরৎ মহারাজকে লক্ষ্য করে বলে উঠল একদিন : 'বলি হ্যাঁ শরৎ, লোকে বলে সংসার ত্যাগ করব। তারা কি পাগল ? এই শরীরটাই তো একটা প্রকাণ্ড সংসার।

বঁটি কাটারি হাতা-খুন্তি, মেথি পাতা কালো জিরে, কি না হলে চলে বলো দেখি ? সব গোপালের সংসার।'

অসুখে ভুগছে, নিজের শরীরের দিকে ইঙ্গিত করে বলছে, 'গোপাল বড় কষ্ট পাচ্ছে।'

সারাদিনই এই গোপালের সঙ্গে স্নেহালাপ, কখনো বা শাসন গর্জন। ছেলে অন্ধকার থাকতেই গঙ্গায় নেমে হুলুস্থুল শুরু করেছে। উঠে আয় উঠে আয় বলছি—শাসনের সুরে চেঁচাচ্ছে অঘোরমণি। রাত পোহায়নি এখনো, কেউ এখন জলে নামে ? অবাধ্য ছেলে কথা না শুনলে মা তখন আর করে কি। কাঁদতে বসে। ওরে লক্ষ্মীধন আমার, উঠে আয়। কাক কোকিল ডাকুক, চারদিক ফরসা হোক, তখন নাইয়ে দেব। ঠাণ্ডা জলে ঝাঁপাই ঝুড়লে যে তোর অসুখ করবে।

এক-একদিন ভাত ঢাকা পড়ে থাকে, খেতে বসে না অঘোরমণি। বিকেল হয়ে আসে, তবুও না। সে কি, গোপালের আজ কি হল ? বেলা পড়ে গেল, খাবে না, খিদে পায়নি ? কোথায় দুষ্টুমি করছে কে জানে, অঘোরমণি বলে উদাসীনের মত। এ কি খেয়াল, একি দুরন্তপনা। আপনি আসনে বসে তাকে একবার ডাকুন। বলে সেই সেবিকা মেয়ে। খেলা ভুলে ছুটে আসবে দুষ্টু গোপাল। আসনে বসল অঘোরমণি। চোখ বুজল। বললে, গোপাল বলছে আজ আর সে নিজের হাতে খাবে না, তাকে খাইয়ে দিতে হবে।

গরাস পাকিয়ে-পাকিয়ে অঘোরমণিকে খাইয়ে দিল সেবিকা।

তেমনি কে আমাকে খাইয়ে দেবে ?

ভক্তরা ঠাকুরের কাছে গিয়ে প্রস্তাব করল, শ্রীশ্রীমাকে নিয়ে আসি এখানে।

'কিন্তু সে কি এখানে এসে থাকতে পারবে ?' প্রশ্ন করলেন ঠাকুর।

পুরুষদের বাসা, চারদিকে পুরুষের ভিড়, সেখানে সেই লজ্জাপটাবৃতা বাস করতে পারবে সর্বক্ষণ ?

সেই নহবতখানার রাত তিনটের সময় ওঠেন। স্নান সেরে নেন। তারপর ঘরে ফিরে গিয়ে জপে বসেন। সেদিন হয়েছে কি, যথারীতি উঠেছেন শেষ রাত্রে। সঙ্গে গৌরীমাকে নিয়েছেন। কখনো মেয়ে, কখনো সঙ্গী, কখনো পরিহাসসরসা সখী। জলের কাছে সিঁড়িতে কালো মতন টিপি কি-একটা পড়ে আছে তার উপরে মা পা রেখেছেন অলক্ষ্যে। পা রেখেই চমকে উঠেছেন, ভয় পেয়ে উঠে পড়েছেন দু সিঁড়ি। তাঁকে জড়িয়ে ধরল গৌরীমা। কি, কি হল ?

'কুমীর গো !'

'কে বললে কুমীর ?' গৌরীমা বললে রঙ্গ করে, 'ও শিব। তোমার চরণ পরশ পাবার জন্যে শিব হয়ে পড়ে আছে।'

'রাখ তোর রঙ্গ। আমি বলে ভয়ে মরি। কি সর্বনাশ, একেবারে কুমীরের উপর গিয়ে পড়েছিলুম !'

'তোমার আবার ভয় কি। তুমি অভয়া—তুমি শুভাবহা, অমিয়ময়ী লাবণ্য প্রতিমা।'

'তাঁকে গিয়ে সব বলো।' ভক্তদের বললেন ঠাকুর। 'সব কথা জেনে-শুনে সব দিক বুঝে-সুঝে সে যদি আসতে চায় তো আসুক।'

আসতে চায় তো আসুক। অন্তরের অনুচ্চারিত সুরটুকু ঠিক শুনলেন শ্রীমা। মনে আছে, পানিহাটির উৎসবে শ্রীমা যাবেন কিনা ঠাকুরের সঙ্গে একটি ভক্ত-মেয়ে জিগগেস করতে এসেছিল ঠাকুরকে, আর ঠাকুর বলেছিলেন, ওর ইচ্ছে হয় তো চলুক। যাননি শ্রীমা। বুঝেছিলেন, যদিও যাওয়া না যাওয়ার ব্যাপারে তাঁকেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, ঠাকুরের সমর্থনের স্পর্শটুকু যেন এসে লাগছে না ঠিক-ঠিক। যেন অশ্রুত একটি সুর বলছে তাঁর কানে-কানে, কি হবে গিয়ে ঐ ভিড়ের মধ্যে, চাই না যে তুমি যাও, তুমি যেয়ো না। কিন্তু এবার ? এবারও ভিড়, ভক্ত পুরুষদের অবিরাম আনাগোনা। এবারও আসবেন কি না-আসবেন শ্রীমা'র উপরেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। কিন্তু সেই না-শোনা সুরটি কী বলছে তাঁর কানে-কানে ? বলছে, তুমি এস, তুমি এস। হে কষ্টহারিণী, হে আরোগ্যদাত্রী, তুমি এস আমার রোগশয্যার শিয়রে। চলে এলেন মা।

ঠাকুর বললেন, 'ও খুব বুদ্ধিমতী।'

যখন যাননি পানিহাটিতে তখনো। যখন চলে এলেন শ্যামপুকুরে তখনো। তুমি বুদ্ধি ও বিদ্যা। তুমি উজ্জ্বলতা ও নির্মলতা। তুমি অম্লানলক্ষ্মী। পীযূষবাদিনী।

সেই একটি মেয়ে এসেছে দক্ষিণেশ্বরে, ঠাকুরের কাছে। তুমি অসাধ্যসাধক আমার একটি উপকার করো। ঠাকুর তাকালেন চোখ তুলে। আমার স্বামীকে অলক্ষ্মীতে ধরেছে, তাকে যাতে বশে আনতে পারি তাই করে দাও।

'মা গো, এ বিদ্যে আমার জানা নেই। ঐখানে যে সাধুমায়ী থাকেন তাঁর কাছে যাও।' ঠাকুর নহবতখানার দিকে ইঙ্গিত করলেন। 'তিনি ইচ্ছে করলেই দুঃখ দূর করতে পারেন তোমার।'

ঠাকুর বলেছেন, আর কি। মেয়েটি গিয়ে মায়ের পায়ে লুটিয়ে পড়ল। বললে, 'ঠাকুর পাঠিয়ে দিলেন আপনার কাছে।'

কী হয়েছে?

মেয়েটি বললে যা বলবার। আপনিই বুঝবেন নারীর প্রাণের কঠিন যন্ত্রণা। শুধু বিচ্ছেদের কষ্ট নয়, অপমানের কষ্ট। আপনিই এর বিহিত করুন। ত্রাণ করুন আমাকে। আমার স্বামীকে।

'আমি সামান্য নারী, আমি কি জানি।' বললেন শ্রীমা।

ছলনা কোরো না মা, ঠাকুর বলে দিলেন তুমিই সর্বব্যথাপ্রশমনী। সংসার-দাবদাহে তুমি অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টিধারা। নইলে কি ঠাকুর পাঠিয়ে দিলেন তোমার দুয়ারে। তুমি পদ্মদলায়তলোচনা দয়াঘনা, মা হয়ে তুমি যদি মেয়ের মুখের দিকে না চাইবে তো কোথায় যাব? কোন দুয়ারে মাথা ঠুকব?

'তোমায় যিনি পাঠিয়েছেন তুমি তাঁর কাছেই ফিরে যাও।' বললেন শ্রীমা, 'দৈবশক্তি তাঁরই করায়ত্ত। তাঁর ইচ্ছামাত্রই সব মঙ্গল হয়। তুমি তাঁর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করো।'

মেয়েটি আবার এসে দাঁড়াল ঠাকুরের কাছে। বললে, 'সাধুমায়ী ফিরিয়ে দিলেন আমাকে, বললেন, যা ওষুধবিষুধ সব তোমার হাতে। তিনি কিছুই জানেন না, কিছুই পারেন না। তুমি ইচ্ছে করলেই সব করে দিতে পারো। যে হারিয়ে গেছে তাকে আনতে পারো ফিরিয়ে।'

মৃদু-মৃদু হাসলেন ঠাকুর। চাপাগলায় বললেন, 'শোনো, সাধুমায়ী ভারি চাপা। কাউকে সহজে ধরা দিতে চান না। তুমি তাঁর কাছে গিয়েই শরণাগত হও। তাঁকে সামান্য ভেবো না, তিনি সকলের চাইতে বড়।'

মূঢ় চোখে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে রইল মেয়েটি।

'আমি যা বলছি ঠিকই বলছি। তুমি তাঁকে গিয়েই ধরো। তাঁর কৃপা হলেই আশা পূর্ণ হবে তোমার। দুঃখের রাত ভোর হবে।'

একবার এখানে আরেকবার ওখানে। এ কেমনতরো কথা। তার মানে আমি হতভাগিনী, কোথাও আমার ঠাঁই নেই। যার ঠাঁই নেই সে যাবে কোন দুয়ারে।

আর কোন দুয়ারে! যার কেউ নেই তারও যে একজন আছে, তার কাছে। তার কাছেই গেল শেষ পর্যন্ত। বললে, 'মা আমায় ফিরিয়ে দিও না। ঠাকুর কি কখনো ভুল বলতে পারেন? তিনি বললেন, তুমি তাঁর চেয়েও বড়। ফাঁকি দিও না মা। তুমি দয়া করলেই মনের সাধটি মিটে যায়।'

মেয়ের কান্নার কাছে হেরে গেলেন মা। প্রসাদী ফুল-বেলপাতা দিলেন তাকে। বললেন, 'এ নির্মাল্যে সমস্ত কিছু নির্মল হোক। তুমি শান্তি পাও।'

॥ ১৩৪ ॥

'মশায়, কি হলে ঈশ্বরকে দেখতে পাওয়া যায়?' একজন ভক্ত জিগগেস করল ঠাকুরকে।

'মন সব কুড়িয়ে এনে জড়ো করো এক জায়গায়, এক লক্ষ্যে।' বললেন ঠাকুর, 'শুকদেবের কথা আছে, পথে যাচ্ছে যেন সড়িন চড়ানো। আর কোনো দিকে দৃষ্টি নেই, শুধু ভগবানের দিকে দৃষ্টি। এরই নাম যোগ।'

মনের প্রত্যক্ষের বিষয় ঈশ্বর।

'কিন্তু সে এ মনের নয়। সে শুদ্ধ মনের।' বললেন ঠাকুর।

শুদ্ধ মন কাকে বলে?

যে মনে বিষয়াসক্তির লেশমাত্র নেই। নেই কামকাঞ্চনের কুয়াশা।

'প্রত্যক্ষ করতে হলে দুরবীন চাই।' বললে মাস্টার। 'ঐ দুরবীনের নামই যোগ।'

'কর্মযোগ আর মনোযোগ। যোগ মোটামুটি এই দুই রকম।' বললেন ঠাকুর, 'তুমি চাষ করবার জন্যে নালা কেটে খেতে জল আনছ কিন্তু আলের গর্ত দিয়ে সব বেরিয়ে যাচ্ছে। নালা কেটে জল আনা তবে বৃথা। সব শ্রম পণ্ডশ্রম।' নালা কেটে জল আনাটি কর্মযোগ আর আলের গর্ত দিয়ে জল যাতে না বেরিয়ে যায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখাটি মনোযোগ।

'চিত্তশুদ্ধি হলে বিষয়াসক্তি গেলেই ব্যাকুলতা আসবে। তোমার অন্তরের প্রার্থনা পৌছুবে ঈশ্বরের কাছে। টেলিগ্রাফের তারে অন্য জিনিস মিশেল থাকলে বা ফুটো থাকলে তারের খবর পৌছুবে না।'

যোগ কি? চিত্তবৃত্তির নিরোধই যোগ। নদীর এক দিকে চর পড়লে অন্য দিকে ভাঙন ধরে। বিষয়-বাসনার স্রোত রুদ্ধ হলেই অমৃতবাসনার স্রোত বাড়তে থাকে। সংসারাভিমুখিতা রুদ্ধ হলেই দেখা দেবে ঈশ্বরাভিমুখিতা। বাহ্যগতি রুদ্ধ হলেই শুরু হবে অন্তর্গতি। তেমনি নিরোধ হলেই যোগ।

আরশুলাকে নিজ বিবরে নিয়ে গিয়ে তাকে মৃদু-মৃদু দংশন করে ভ্রমর, মৃদু-মৃদু গুঞ্জরব শোনায়। ভ্রমরের ভয়ে আরশুলা সারাক্ষণ ভ্রমরের ধ্যান করে। ধ্যান করতে-করতে তার চিত্তবৃত্তি ভ্রমরাকারে নিরুদ্ধ হয়ে যায়। তৎস্বরূপত্ব পেয়ে বসে। তেমনি যোগীরাও নিরুদ্ধাবস্থায় এসে ব্রহ্মে লীন হয়। ঐ লয়ই যোগ।

'তুমি কে? কি চাও?' একটি পনেরো-ষোলো বছরের ছেলেকে জিগগেস

করলেন ঠাকুর।

উজ্জ্বল ও আকুলতাভরা দুটি চোখ তুলে ছেলেটি বললে, 'আমার যোগসাধন করবার ইচ্ছে হয়েছে। আপনি আমাকে শেখাবেন?'

সানন্দ বিস্ময়ে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'তুমি এখানকার খবর পেলে কোথায়? তোমার নাম কি? কোত্থেকে আসছ?'

আমার নাম কালীপ্রসাদ। ওরিয়েন্টাল সেমিনারির মাস্টার রসিকলাল চন্দ্রের আমি দ্বিতীয় ছেলে। আহিরীটোলার নিমু গোস্বামীর লেনে আমাদের বাড়ি। স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। এলবার্ট হলে হিন্দুধর্মের সভা হচ্ছে। সভাপতি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বক্তৃতা দিচ্ছেন শশধর তর্কচূড়ামণি। বক্তৃতার বিষয় হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। কদিন ধরেই হচ্ছে। রোজ শুনছি। সাংখ্য-দর্শনের পর শুরু হল পতঞ্জলির যোগসূত্র। শুনছি আর মন মেতে উঠছে। সাধ হয়েছে যোগাভ্যাস করব। জলখাবারের পয়সা জমিয়ে একখানা যোগসূত্র কিনলাম। কিবা সংস্কৃত জানি, কতটুকু বা বুঝি ওর অর্থ-মর্ম। তাই একদিন সাহস করে গেলাম চূড়ামণি মশায়ের বাড়ি। আমাকে পাতঞ্জলিদর্শন পড়াবেন? চূড়ামণি মশায় তো অবাক। বললেন, বাবা, আমার সময় কোথায়? তুমি কালীবর বেদান্তবাগীশের কাছে যাও। বোলো আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। গেলাম বেদান্তবাগীশের বাড়ি। বেদান্তবাগীশ বললেন, স্নানের আগে চাকর যখন আমার গায়ে তেল মাখাবে তখন যদি উপস্থিত থাকতে পারো একটু-আধটু শেখাতে পারি মুখে-মুখে। তাই সই। সকালে রোজ তাঁর তেল মাখার সময় গিয়ে হাজির হই। মুখে-মুখে মোটামুটি জেনে নিই। যোগসূত্রের পর শিবসংহিতা। যত পড়ি ততই মন ব্যাকুল হয়। কিন্তু সব শাস্ত্রেই ঐ এক কথা, যোগসিদ্ধ গুরু না পেলে একা-একা সাধন করতে গেলেই সর্বনাশ! তখন মন বড় দমে যায়, পড়াশোনা বিস্বাদ লাগে। কোথায় পাব সেই যোগগুরু? বাগবাজারের যজ্ঞেশ্বর আমার বন্ধু। তাকে বললাম আমার মনের যন্ত্রণা। সে বললে, দক্ষিণেশ্বরে যাও। সেইখানেই মিলবে এক মহাযোগী।

তন্ময়ের মত শুনছেন ঠাকুর।

দক্ষিণেশ্বর কোথায়, তাই কি আমি জানি? বাড়ির সবাইকে জিগগেস করলুম, কেউ হদিস দিতে পারলেন না। যজ্ঞেশ্বরেরও ঠিকানা জানা নেই যে সেখানে গিয়ে খোঁজ করব। যা থাকে অদৃষ্টে, বেরিয়ে পড়লুম, যেমন গিরিগৃহ থেকে নির্ঝরিণী বেরোয়। উত্তরে কোথাও হবে আচমকা একটা আন্দাজ করে চিৎপুরের খাল পেরোলুম কিসের টানে এগিয়েই চলেছি, সকাল প্রায় দুপুরে

গড়িয়ে পড়ল। পথচারী একজনকে হঠাৎ জিগগেস করলুম, দক্ষিণেশ্বর কোথায় বলতে পারো? সে কি কথা! রাজ্যের পথ এগিয়ে এসেছেন যে, ফিরে যান। আবার ফিরে চললুম। ঘুরতে-ঘুরতে পেলুম ঠিক দক্ষিণেশ্বর। কিন্তু খবর নিয়ে জানলুম আপনি কলকাতায় গিয়েছেন এ বেলা আর ফিরবেন না।

তখন কি আর করি, আপনারই ঘরের উত্তরের বারান্দায় বসে পড়লুম হতাশ হয়ে। হাঁটতে-হাঁটতে পায়ের দড়ি ছিঁড়ে গেছে, পকেটে একটি আধলাও নেই, বাড়ির লোকদের না বলে-কয়ে এসেছি, তারা না জানি কত উতলা হয়েছে এই সব ভেবে দেহ মন নেতিয়ে পড়ল। এমন সময় দেখি, কে একটি ছেলে ছাতা-হাতে আসছে এদিকে। আপনজনের মত একেবারে আমার পাশে এসে বসল, নাম শুনলুম শশিভূষণ। এস দুজনে মিলে গঙ্গাস্নান করি, কালীবাড়ির কর্মচারীদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, তাদের বলে কিছু প্রসাদ সংগ্রহ করি দুজনে, তার পর স্থির হয়ে বসে একমনে শুধু ঠাকুরের কথা কই।

ক্রমে-ক্রমে সন্ধ্যে হল, বেজে উঠল আরতির বাজনা। আরতির পর রামলাল-দাদা শীতলভোগের প্রসাদ এনে দিলেন। প্রসাদ পেয়ে দু বন্ধু শুয়ে পড়লুম বারান্দায়। রাত প্রায় নটা, ঘোড়ার গাড়ির চাকার আওয়াজ হল। ঐ আসছেন ঐ আসছেন ঠাকুর।

কালী, কালী, কালী—গাঢ়গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করতে-করতে ঠাকুর ঢুকলেন তাঁর ঘরটিতে উত্তরের বারান্দা পেরিয়ে। পিছনে গামছা আর বটুয়া হাতে লাটু। শশী গিয়ে বললে কালীপ্রসাদের কথা। ডাকো ডাকো, তাকে দেখিনি কখনো। রামলালকে দিয়ে ডাকিয়ে আনলেন। গড় হয়ে প্রণাম করে দাঁড়াতেই জিগগেস করলেন, 'তুমি কে?'

নবাগত তরুণ সুদীপ্ত চোখে বললে, 'আমি কালীপ্রসাদ।'

উত্তরকালে স্বামী অভেদানন্দ।

'কি চাই তোমার?'

নির্ভীক অথচ আকুলকণ্ঠে বললে কালীপ্রসাদ, 'আপনার কাছে যোগ শিখতে চাই।'

আশ্চর্য, একবাক্যে রাজী হয়ে গেলেন ঠাকুর। সকলেই তো ভোগ চায়, যোগ চায় কজন! কে চায় প্রশান্তবাহিতা স্থিতি, কে চায় সুধা-পণ্য!

বললেন, 'তোমার এই কচি বয়েস, তোমার যোগশিক্ষার ইচ্ছে হয়েছে এ তো খুব ভালো লক্ষণ। তুমি পূর্বজন্মে প্রকাণ্ড যোগী ছিলে, একটুখানি এখনো

বাকি আছে, এই তোমায় শেষ জন্ম। দেব আমি তোমাকে যোগশিক্ষা। আজ রাত যাক, কাল ভোরবেলা এস।'

রাত কি আর কাটে। বারে-বারে উঠে বসে কালীপ্রসাদ, কতক্ষণে না জানি নব প্রভাতের অরুণরঞ্জন দেখা দেবে। ঠিক সময়ে রামলালকে দিয়ে ডেকে পাঠালেন ঠাকুর। নিয়ে গেলেন উত্তরের বারান্দায়। একখানি তক্তপোশ পাতা ছিল, বললেন, 'বসো, যোগাসন করে বসো।' বসল কালীপ্রসাদ।

জিভ দেখি। কালীপ্রসাদ জিভ বের করল। ডান হাতের মধ্যমা দিয়ে ঠাকুর তার জিভে মূলমন্ত্র লিখে দিলেন। নিচে থেকে উপরে হাত বুলিয়ে দিলেন বুকে, ঊর্ধ্ব দিকে তুলে দিলেন শক্তি। বললেন, তুমি যাঁর প্রসাদ সেই মা-কালীর ধ্যান করো।

মুহূর্তে কাষ্ঠবৎ সমাহিত হয়ে গেল কালীপ্রসাদ।

নিষ্কল নির্মল নিরাময় শান্ত ও সর্বাতীত। বর্ণমালা অভ্যাস করেই সমস্ত শাস্ত্র আয়ত্তে আনা যায়, তেমনি যোগাভ্যাস করেই পাওয়া যায় তত্ত্বজ্ঞান। বিচ্ছিন্ন বর্ণ কোনো পদবিন্যাস করতে পারে না, কিন্তু একত্র গ্রথিত করলেই কেমন বাক্য-পদ-ছন্দের আকৃতি ধরে। তেমনি সমস্ত শক্তিকে একসূত্রে গেঁথে নিয়ে একটি কেন্দ্রে সংলগ্ন করা একটি অর্থে আরূঢ় করার নামই যোগ।

নীরদনীল সমুদ্র সামনে পড়ে আছে, তার জল খেয়ে কি পিপাসা মিটবে? মিটবে না। বরং সেই লোনা জল যত খাবে ততই আরো বাড়বে পিপাসা! তবে উপায়? উপায় সূর্য। সূর্য সেই লোনা জল টেনে নেবে স্বতেজে, তার পর ধারাধর রূপ ধরে ধারাবর্ষণ করবে। সেই মেঘপতিত বৃষ্টির জলেই তোমার তৃষ্ণার তৃপ্তি, তোমার দাহের নিবারণ।

এই সমুদ্র হচ্ছে শাস্ত্র। তুমি নিজে থেকে এর জলপান করো তৃষ্ণানিবৃত্তি হবে না। সহস্রবর্ষ পরমায়ু পেলেও পার হতে পারবে না এই মহাসাগর। সুতরাং গুরুরূপী সূর্যকে ডাকো। সূর্যের শরণ নাও। লবণাক্ত জল টেনে নিয়ে সূর্য তোমাকে পরিচ্ছন্ন জল দেবে, তোমার তৃষ্ণাবারক মন্ত্র তোমার সিন্ধুপারক সাধন প্রণালী। সুতরাং গুরুর পাদপদ্মরূপ দীর্ঘ নৌকাই তোমার আশ্রয়।

উপর থেকে নীচে কালীপ্রসাদের বুকে আবার হাত বুলিয়ে দিলেন ঠাকুর। কেটে গেল সমাধি। ফিরে এল বাহ্যজ্ঞান।

'জলে জল, অধঃ ঊর্ধ্ব পরিপূর্ণ।' বললেন ঠাকুর, 'জীব যেন মীন, জলে আনন্দে সে সাঁতার দিচ্ছে। ঠিক ধ্যান হলে দেখবে এই সত্যকে।' আবার বললেন, 'অনন্ত আকাশ তাতে পাখি উড়ছে পাখা মেলে। চৈতন্য আকাশ, আত্মা

পাখি। পাখি খাঁচায় নেই, চিদাকাশে উড়ছে। আনন্দ আর ধরে না।'
যখন নিজ দেহের অন্তঃপুরে একাকী বসে তোমাকে ডাকি, তুমি আমার সামনে এসে দাঁড়াও। আমার সামনে এসে দাঁড়ালে তোমাকে আর ডাকতে হয় না, তোমার সেই ডাক-নাম—নাম-জপও আমি ভুলে যাই। তুমিই বা তখন কোথায়! শুধু দেখি তোমার রূপ, রূপের তরঙ্গ, মাধুর্যসমুদ্রের প্রশান্তি। ডুবে যাই লীন হয়ে যাই। আমার আমি তোমার আমিতে বিভোর হয়ে যায়। শিবমূর্তির মূল ধ্যান আর থাকে না, কল্যাণস্পদ শিবতত্ত্বে নিমগ্ন হই।
'মহীনবাবু কি টাকা-টাকা করছ!' ঠাকুর বললেন ডাক্তার সরকারকে। 'মাগ, মাগ—মান, মান। ও সব এখন ছেড়ে দিয়ে ঈশ্বরেতে মন দাও। একচিত্ত হও। ঈশ্বর-আনন্দ ভোগ করো।' বলতে-বলতেই ভাবাবিষ্ট হলেন ঠাকুর।
ডাক্তার বললে, 'কথা আর ভাব এখন ভালো নয়।'
কে শোনে সে কথা। ঠাকুর তাকালেন ডাক্তারের দিকে। বললেন, 'জানো, কাল ভাবাবস্থায় তোমাকে দেখলাম। দেখলাম জ্ঞানের আকর কিন্তু মগজ একেবারে শুকনো। আনন্দরসের ছিটেও লাগেনি। কিন্তু যদি একবার পাও সেই রসের সন্ধান, অধঃ-ঊর্ধ্ব পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, হ্যাঁক-ম্যাঁক লাঠিমারা কথাগুলো আর বেরুবে না মুখ দিয়ে।'
ডাক্তার হাসতে লাগল মৃদু-মৃদু। বললে, 'একেবারে শুকনো।'
'তুমি এ সব বিশ্বাস করো না', ঠাকুর বললেন, 'ডাক্তার ভাদুড়ী বলছিল মন্বন্তরের পর তোমার একেবারে ইট-পাটকেল থেকে শুরু করতে হবে!'
হেসে উঠল ডাক্তার। বললে, 'তাতে ক্ষতি কি। যদি ইট-পাটকেল থেকে শুরু করে অনেক জন্মের পর মানুষ হই আর এখানে আসি তাহলে আবার সেই ইট-পাটকেল থেকে শুরু।'
হেসে উঠল সকলে।

॥ ১৩৫ ॥

মেডিকেল কলেজের ইংরেজ ডাক্তার কোটস এসেছে ঠাকুরকে দেখতে। যদিও হোমিওপ্যাথি চলছে, একবার দেখে যেতে ক্ষতি কি।
যে প্রণালীতে সাহেবি পরীক্ষার বিধি তা এক কথায় বলা যায় আসুরিক। সরাসরি ঠাকুরের গলা টিপে ধরলেন।
যন্ত্রণায় শিউরে উঠলেন ঠাকুর। বুঝলেন ব্যাধির চেয়ে চিকিৎসাই মর্মান্তিক। তখন কি আর করা! স্বভাবজ সমাধিতে ডুবে গেলেন। এখন দেখ তোমার যত খুশি। যত খুশি কসরত করো।

সাহেবের চক্ষু স্থির! এ কি অদ্ভুত রোগী! ভূতলে অতুল শোভা এ কি নির্মল-কান্তি! রোগ দেখবে না রোগী দেখবে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছে সাহেব।

কেমন দেখলে?

রোগ তো ক্যানসার, বলতে পারি সহজে। কিন্তু এ রোগী কে? সর্বলোক-সুখাবহ সর্বচক্ষুস্নেহপ্রদ। এমনটি তো আর দেখিনি কোথাও। বাইবেলে পড়েছি খীশুর এমন ভাবসমাধি হত। আজ দেখলাম স্বচক্ষে। দেহবুদ্ধির লেশ-মাত্র নেই। শরীরে যে এত কষ্ট আননমণ্ডলে যেন তার চিহ্নমাত্র নেই। কণ্টক-কষ্ট উত্তীর্ণ হয়েও যেন ফুটে আছে আনন্দপদ্ম।

যিনি মহাচিন্ময় হয়েও বৃহৎ পাষাণবৎ স্থিত, যিনি জড়ের অন্তঃস্বরূপ চৈতন্য—সাহেব যেন সেই পরমাত্মার রূপ দেখলে। ছদ্মবেশধারী রাজাকে।

ওষুধ? যেমন চলছে তেমনি চলুক। তাইতেই ভালো হবে।

চিকিৎসার ভার নিল না সাহেব। তা না নাও, তোমার প্রাপ্য ফি-টা নিয়ে যাও। হাত গুটোল সাহেব। বললে, টাকা ছুঁয়ে হাত ও মন অশুচি করতে পারব না। এ টাকাটা ওঁরই সেবায় ব্যয় হোক।

তারপর এল ডাক্তার নবীন পাল। মহেন্দ্র সরকার রোজ আসতে পারে না এত দূর, তাই হাতের কাছে একজনকে মজুত রাখো। নবীন পাল ডাক্তার হয়েও কবরেজি করে। মন্দ কি, তার চিকিৎসাই কদিন করা যাক না।

কিন্তু সুবিধে হল না। তার বিধিব্যবস্থাও ক্লেশদায়ক।

হোমিওপ্যাথিই ভালো। তবে এবার একবার ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল দত্তকে নিয়ে এস।

কিন্তু রাজেন্দ্র শুধু ডাক্তার হয়েই আসে না, ভক্তমূর্তিতে আসে। কখনো হাতে একটি সুগন্ধি ফুল নয়তো সুমধুর একটি ফল। কি পথ্য খেতে ইচ্ছে করে তোমার—কখনো বা সেই পথ্য। বিদ্যুন্মালামণ্ডিত এ কে মহামেঘ! গ্রীষ্মক্লিষ্ট ধরিত্রীকে কৃপাবারিসিঞ্চনে তুষ্ট-পুষ্ট করছেন! আমার তো চিকিৎসা নয়, আমার এ ব্রত, হরিতোষণ ব্রত। আহা, দুর্বল শরীরে ঐ চটিজুতোর ভার তুমি বইতে পারছ না—মখমলের নরম চটি হলে ভালো হয়। রাজেন তক্ষুণি মখমলের চটি নিয়ে এল। নিজ হাতে পরিয়ে দিল শ্রীপদে।

নিত্যসিদ্ধ আগুন যেমন কাঠে আবির্ভূত হয় তেমনি নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বর মহা-ভূতরূপে জন্ম নেয়। কিন্তু কে তাকে চেনে? সমুদ্রস্থ চন্দ্রকে মাছ কমনীয় জলচর মনে করে, চিনতে পারে না অমৃতপিণ্ড বলে। কৃষ্ণের সঙ্গে একত্র বাস করেও যদুবংশীয়েরা চিনতে পারেনি হরিকে। শীতোষ্ণবাতবর্ষে অভিভূত

আমরা, সংশয়খিন্ন বুদ্ধি আমাদের, চিনতে পারব কি তোমাকে ? হে তমঃসংহর্তা বিজ্ঞানাত্মা, তোমার সর্বপ্রকাশক প্রভাতের আলোটি কি আমাদের চোখে এসে পড়বে ?

ডাক্তার সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে নতুন ওষুধ দিল রাজেন্দ্র। একটু যেন ফল হল। ব্যথার যেন উপশম হল খানিকটা। কিন্তু সেই ফল কি চিকিৎসার না, ভক্তির ? ভক্তিই একমাত্র বলবিধায়িনী ওষধি।

কদিন পরেই আবার যে-কে-সে। ডাকো মহেন্দ্র সরকারকে।

কিন্তু অসুখের কথা কই ? কেবল ঈশ্বরের কথা। সমস্ত কিছুর মধ্যে ভগবান জেগে রয়েছেন, ফুটে রয়েছেন, ফলে রয়েছেন, সেই কথা।

'কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন,' বললেন ঠাকুর, 'তুমি আমাকে ঈশ্বর বলছ—কিন্তু তোমাকে একটা জিনিস দেখাই, দেখবে এস। অর্জুন গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। খানিক দূরে গিয়ে বললেন শ্রীকৃষ্ণ, কি দেখছ ? অর্জুন বললেন, মস্ত একটা গাছ। কি গাছ ? জাম গাছ। কি ফলে আছে ? অর্জুন বললেন, কালো জাম থোলো-থোলো হয়ে ঝুলে আছে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, কালো জাম নয়। দেখ ভালো করে। আর একটু এগিয়ে এসে দেখ। তখন অর্জুন দেখলেন, বললেন, থোলো-থোলো কৃষ্ণ ফলে আছে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, দেখলে তো ? আমার মত কত কৃষ্ণ ফলে রয়েছে।'

ডাক্তার সরকার বললে, 'এ সব বেশ কথা।'

ঠাকুর খুশি হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, কেমন কথা ?'

'বেশ।'

'তবে একটা থ্যাঙ্ক-ইউ দাও।' লোকাতিহর হাসি হাসলেন ঠাকুর।

পরিহাসে স্বচ্ছ জলের উপর ফোটাচ্ছেন বর্ণাঢ্য ভাবপদ্ম। ঈশ্বরকথার চন্দনে স্নিগ্ধ করছেন রোগযন্ত্রণা।

কিন্তু, জানো ডাক্তার, ব্যথাটা আবার বেড়েছে।

'নিশ্চয়ই কুপথ্য করেছ।' ডাক্তার সরকার শাসিয়ে উঠল।

সকালে একটু ভাতের মণ্ড, ঝোল আর দুধ, সন্ধ্যায় আবার একটু দুধ আর খইয়ের মণ্ড—এই তো পথ্য সারা দিনের। তার মধ্যে আবার অনিয়ম কি ?

'কি কুপথ্য করেছ, তাই—'

ঠাকুর মাথা চুলকে বললেন, 'কই না তো।'

'আচ্ছা, আজ কোন-কোন আনাজ দিয়ে ঝোল রান্না হয়েছিল ?' কড়া গলায় প্রশ্ন করল ডাক্তার।

'আলু কাঁচকলা বেগুন—' ঠাকুর আবার মাথা চুলকোলেন : 'দু-এক টুকরো ফুলকপিও ছিল—'

'এ্যাঁ! ফুলকপি? ফুলকপি দিয়েছ? এই তো খাবার অত্যাচার হয়েছে।' তড়পাতে লাগল ডাক্তার : 'ক-টুকরো খেয়েছ?'

'না গো এক টুকরোও খাইনি।' ঠাকুর বললেন অপরাধীর মত : 'তবে ঝোলে ছিল দেখেছি।'

'দেখেছ? তবেই হয়েছে। না খেলে কী হয়?'

'না খেলে কী হয়!' ঠাকুর অবাক হবার ভাব করলেন।

'কপি না খাও ঝোল তো খেয়েছ। ঝোলে তো কপির গুণ ছিল। তারই জন্যে তোমার হজমের ব্যাঘাত হয়ে ব্যারামের বৃদ্ধি হয়েছে।'

'সে কি গো!' ঠাকুর প্রায় আকাশ থেকে পড়লেন : 'কপি খেলাম না, পেটের অসুখও হয়নি, ঝোলে একটু-কি কপির রস ছিল তাইতেই অসুখ বাড়ল? এ কিছুতেই মানতে পারব না।'

'মানতে পারবে না কেন?' ডাক্তার বসল গ্যাঁট হয়ে : 'আমার বেলায় কি হয়েছিল তবে শোনো! হোমিওপ্যাথি করি, ছোট একটুকুর শক্তিকে উপেক্ষা করতে পারি না। তুমিই তো বলো, ছোট-একটুকু বীজে বিরাট বনস্পতি। সেবার আমার দারুণ সর্দি হল। সর্দি থেকে ব্রঙ্কাইটিস। কিছুতেই সারে না। কেন যে অসুখটা লেগে থাকছে বুঝে উঠতে পারছি না কিছুতেই। শেষে একদিন দেখি কি—'

ঠাকুর তাকালেন কৌতূহলী হয়ে।

দেখি চাকর গরুকে মাসকড়াই খাওয়াচ্ছে। যে গরুটার আমি দুধ খাই সেই গরুটাকে। কি ব্যাপার? চাকর বললে, কোত্থেকে কতগুলো মাসকড়াই জুটেছে সর্দির ভয়ে কেউ খেতে চাচ্ছে না, তাই ঠেসে-ঠেসে খাওয়াচ্ছে গরুকে। হিসেব করে দেখলাম যেদিন থেকে মাসকড়াই খাচ্ছে গরু, সেদিন থেকেই আমার সর্দি।'

'তারপর কি করলে?'

'গরুর মাসকড়াই খাওয়া বন্ধ করে দিলাম, আর আমার সর্দিও সেরে গেল।'

সবাই হেসে উঠল হো-হো করে।

'কিসে কি হয় কিছু বলা যায় না।' আবার গল্প জুড়ল ডাক্তার। 'পাকপাড়ার বাবুদের বাড়িতে সাত মাসের মেয়ের অসুখ করেছিল—ঘুঙরি কাশি, হুপিং কাফ। আমি দেখতে গিয়েছিলাম। কিছুতেই অসুখের কারণ ঠিক করতে পারি না। শেষে জানতে পারলুম গাধা ভিজেছিল।'

'গাধা ভিজেছিল কি গো!'

'যে গাধার দুধ খেত মেয়েটি সেই গাধা ভিজেছিল বৃষ্টিতে।'

'কী বলে গো!' ঠাকুরও রঙ্গ করলেন: 'সেই যে বলে তেঁতুলতলা দিয়ে আমার গাড়ি গিয়েছিল তাই আমার অম্বল হয়েছে।'

পড়ল আবার হাসির রোল।

'জাহাজের কাপ্তেনের বড় মাথা ধরেছিল।' ফোড়ন দিল ডাক্তার: 'তা ডাক্তারেরা পরামর্শ করে জাহাজের সারা গায়ে বেলেস্তারা লাগিয়ে দিলে।'

কিন্তু ঠাকুরের অসুখ নরম পড়ে না কিছুতেই।

শশধর তর্কচূড়ামণির অন্য কথা। নিজের চিকিৎসা নিজে করো। কি ছাই পরের কাছে ব্যবস্থা চাও, নিজেই নিজের ব্যবস্থা করো। তুমি নিজে ভবরোগ-বৈদ্য হয়ে কি করতে অন্য ডাক্তারের শরণ নিচ্ছ! হাতে যার লণ্ঠন সে টিকে ধরাবার জন্যে প্রতিবেশীর ঘরে আগুন চাইতে যায় কেন?

কি করতে হবে?

'শাস্ত্রে পড়েছি আপনার মত যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা ইচ্ছা করলেই শারীরিক রোগ আরাম করতে পারেন। যেখানটায় কষ্ট সেখানটায় মন একাগ্র করে আরামের তীব্র প্রার্থনা করলেই তা সেরে যায়। তা একবার দেখুন না চেষ্টা করে।'

'তুমি এত বড় একটা পণ্ডিত হয়ে এমন কথা বললে?' ঠাকুর আপত্তির সুরে বললেন, 'যে মন সচ্চিদানন্দে দিয়েছি তা সেখান থেকে তুলে এনে এ ভাঙা হাড়-মাসের খাঁচার উপর দেব? এটা তুমি কেমন কথা বললে গো?'

সেবার এক কুষ্ঠরোগী এসেছিল ঠাকুরের কাছে। বললে, 'দয়া করে যদি একবার হাত বুলিয়ে দেন তবেই আমি সেরে যাই।'

'কই আমি তো জানি না কিছু!'

'আপনাকে কিছু জানতে হবে না।' লোকটি কান্নায় লুটিয়ে পড়ল ঠাকুরের পায়ে। 'শুধু দয়া করে একটু হাত বুলিয়ে দিন।'

'যখন বলছ দিচ্ছি হাত বুলিয়ে। মা'র ইচ্ছা হয় তো সেরে যাবে।' হাত বুলিয়ে দিলেন ঠাকুর।

হাত বুলিয়ে দেবার পর তখন নিজের হাতে কি অসহ্য যন্ত্রণা! অস্থির হয়ে উঠলেন। মাকে বললেন আকুল হয়ে, 'মা এমন কাজ আর করব না।'

রোগীর রোগ সেরে গেল আর যত ভোগ নিজে টেনে নিলেন।

দেখতে পেলেন একদিন স্থূল শরীর থেকে সূক্ষ্ম শরীর বেরিয়ে এসে বেড়িয়ে

বেড়াচ্ছে। দেখলেন তার পিঠময় ঘা। এমন কেন হল?

তখন মা দেখিয়ে দিলে, যা-তা করে এসে যত লোক ছোঁয়, তাদের দুর্দশা দেখে মনে দয়া হয়, তখন তাদের সেই দুষ্কর্মের বোঝা নিতে হয় ঘাড় পেতে। সেই জন্যেই তো এই রোগ, এত কষ্ট।

সকলের শাপ আর তাপ জ্বালা আর যন্ত্রণা বহন করে নিয়ে যাব। আমার রোগে সকলের আরোগ্য।

নগরের প্রান্তে এসে সিদ্ধার্থ তাঁর অশ্বকে বিদায় দিলেন। দেখলেন পথের উপর কটিধৃতকাষায়পরিহিত এক কিরাত। বললেন, তোমার ঐ ছিন্ন কাষায়খানা আমাকে দাও।

সিদ্ধার্থের পরিধানে কৌষেয়। বনিময়ে তা পাবার লোভে কিরাত তার কাষায় ত্যাগ করল। আর তথাগত কৌষেয়বাস ছেড়ে জীবরক্তকলঙ্কিত অশুচি বসন গায়ে ধরলেন।

জীবজগতের পুঞ্জিত বেদনা বহন করে চললেন বনপথে।

কৌষেয়পরা ব্যাধ চলল তাঁর পিছু-পিছু। এ কি, তুমি কোথায় চলেছ এই গহন রাতে?

ব্যাধ বললে, 'এ কী বসন তুমি পরালে আমাকে? তীরধনুক খসে পড়ছে আমার হাত থেকে। জগৎপ্রাণীকে মনে হচ্ছে আত্মজন। তুমি তোমার বসন ফিরিয়ে নাও। আমাকে দাও আমার জীর্ণ চীর।'

সিদ্ধার্থ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'ভাই তুমিই আমার সাধনার পথের প্রথম বন্ধু। জীবনবসন জীবহিংসাচিহ্নিত হয়ে আছে, অহিংসার সাধনায় এস তাকে নবীনধবল করি। কৌষেয় জীর্ণ হোক, দূর হোক হিংসাদ্বেষকলহ আর কাষায় পবিত্র হয়ে বিশ্বমানবের নির্বাণবেশ রচনা করুক।'

॥ ১৩৬ ॥

নলিনীদলসনাথ সরোবরের পারে এসে দাঁড়ালেন যুধিষ্ঠির। দেখলেন, হিমালয়, পারিপাত্র, বিন্ধ্য ও মলয়—চার পর্বতের মত তাঁর চার ভাই, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, মরে পড়ে আছে। হা কুরুকুলকীর্তিবর্ধন, তোমাদের এ দশা কে করল? কাঁদতে লাগলেন আকুল হয়ে।

আমি করেছি। আমি যক্ষ। এই সরোবর আমার অধিকারে। আমার নিষেধ অমান্য করে তোমার চার ভাই জল পান করতে চেয়েছিল, তাই তাদের মেরেছি। তুমি আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তার পর চাও তো

জল খাও।

নিশ্চয়ই। তোমার অধিকৃত বস্তুতে আমার অভিলাষ নেই। বললেন যুধিষ্ঠির। কিন্তু তোমার প্রশ্নের উত্তর কি দিতে পারব ঠিক-ঠিক? আত্মশ্লাঘা করছিনে, সাধুপুরুষেরা আত্মশ্লাঘার নিন্দে করে থাকেন, তবে এইটুকু শুধু বলতে পারি, নিজের বুদ্ধি-অনুসারে তোমার উত্তর দেব।

বেশ, তবে শোনো: সূর্যকে কে ঊর্ধ্বে রেখেছে? কে সূর্যের চার দিকে বিচরণ করে? কে তাঁকে অস্তে পাঠায়? কোথায় বা তিনি প্রতিষ্ঠিত আছেন?

যুধিষ্ঠির উত্তর করলেন: ব্রহ্ম সূর্যকে ঊর্ধ্বে রেখেছেন, দেবগণ তাঁর চারদিকে ঘুরে বেড়ান, ধর্ম তাঁকে অস্তে পাঠান, আর তিনি প্রতিষ্ঠিত আছেন সত্যে।

ব্রাহ্মণগণের দেবত্ব কি কারণে? তাদের কোন ধর্ম সাধুধর্ম? কিসে তাদের মানুষ ভাব? অসাধু ভাবই বা কেন?

বেদপাঠের হেতু তাদের দেবত্ব। তপস্যাই সাধুধর্ম। মৃত্যু মনুষ্যভাব। আর পরনিন্দায় তারা অসাধু।

ক্ষত্রিয়গণের দেবভাব সাধুভাব মনুষ্যভাব অসাধুভাবই বা কি?

অস্ত্রনিপুণতা দেবভাব, যজ্ঞ সাধুভাব, ভয় মনুষ্যভাব এবং শরণাগতকে পরিত্যাগই অসাধুভাব।

পৃথিবীর চেয়ে গুরুতর কে? আকাশের চেয়ে উচ্চতর কে? বায়ুর চেয়ে শীঘ্রতর কে? তৃণের চেয়ে বহুতর কে?

মাতা পৃথিবীর চেয়ে গুরুতর। পিতা আকাশের চেয়ে উঁচু। মন বায়ুর চেয়ে শীঘ্রগামী। আর তৃণের চেয়ে বহুতর হচ্ছে চিন্তা।

কে নিদ্রিত হয়েও নয়ন মুদ্রিত করে না? জন্মগ্রহণ করেও কে স্পন্দিত হয় না? কার হৃদয় নেই? কে বেগে বর্ধিত হয়?

মাছ নিদ্রাকালেও চোখ বোজে না। অণ্ড প্রসূত হয়েও নিস্পন্দ। পাষাণই হৃদয়হীন। নদীই বেগ দ্বারা বৃদ্ধি পায়।

প্রবাসী, গৃহবাসী, আতুর ও মুমূর্ষু—এদের মিত্র কে?

প্রবাসীর সঙ্গী, গৃহবাসীর ভার্যা, আতুরের চিকিৎসক, মুমূর্ষুর দান।

কে সর্বভূতের অতিথি? সনাতন ধর্ম কি? অমৃত কি? সমুদয় জগৎই বা কি পদার্থ?

অগ্নি সর্বভূতের অতিথি। জ্ঞানযোগ সনাতন ধর্ম। সলিল ও যজ্ঞশেষ অমৃত। বায়ুই সমুদয় জগৎ।

কে একাকী বিচরণ করে? কে বারে-বারে জন্মায়? কে প্রধান বপনক্ষেত্র?

সূর্য। চন্দ্র। পৃথিবী।

ধর্মের, যশের, স্বর্গের ও সুখের একমাত্র আশ্রয় কি ?

দাম্ভ ধর্মের, দান যশের, সত্য স্বর্গের, শীল সুখের একমাত্র আশ্রয়।

কি ত্যাগ করলে প্রিয় হয় ? কি ত্যাগ করলে শোক যায় ? কি ত্যাগ করলে ধনী হয় ? কি ত্যাগ করলে সুখী হয় ?

অভিমান ত্যাগ করলে প্রিয় হয়, ক্রোধ ত্যাগ করলে শোক যায়, কামনা ত্যাগ করলে ধনী হয়, আর লোভ ত্যাগ করলে সুখী।

তপঃ, দম, ক্ষমা ও লজ্জার লক্ষণ কি ?

স্বধর্মানুবর্তিত্বই ধর্ম, মনের নিগ্রহই দম, দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতাই ক্ষমা আর অকার্য থেকে নিবৃত্তিই লজ্জা।

জ্ঞান শম দয়া ও আর্জব কাকে বলে ?

তত্ত্বার্থোপলব্ধিই জ্ঞান, চিত্তের প্রশান্ততাই শম, সকলের সুখাভিলাষই দয়া আর সমচিত্ততাই আর্জব।

স্থৈর্য ধৈর্য স্নান ও দানের কি লক্ষণ ?

স্বধর্মে নিয়তাবস্থা স্থৈর্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ধৈর্য, মনোমালিন্য পরিত্যাগই স্নান আর প্রাণিরক্ষাই দান।

অহঙ্কার, দম্ভ, দৈব্য এবং পৈশুন্য কি ?

অজ্ঞানই অহঙ্কার, ধর্মধ্বজের উন্নমনই দম্ভ, দানের ফলই দৈব্য আর পরের প্রতি দোষারোপই পৈশুন্য।

সুখী কে ? আশ্চর্য কি ? পথ কি ? বার্তাই বা কাকে বলে ?

যিনি অঋণী ও অপ্রবাসী হয়ে দিবসের অষ্টম ভাগে বা সন্ধ্যাকালে গৃহে শাক পাক করেন তিনিই সুখী। প্রাণিগণ শমনসদনে যাচ্ছে প্রত্যহ তবু অবশিষ্ট সকলে চিরজীবী হতে চায়, এইটেই আশ্চর্য। নানা মুনির নানা মত, ধর্মের তত্ত্ব গুহানিহিত, অতএব মহাজন যে পথে গেছেন তাই পথ। আর বার্তা ? মহামোহরূপ কটাহে কাল জগৎপ্রাণীকে পাক করছে, সূর্য তার আগুন, দিন-রাত্রি তার ইন্ধন, মাস-ঋতু তার দর্বা।

যক্ষ বললে, তুমি ঠিক-ঠিক সব উত্তর দিয়েছ। এখন শেষ প্রশ্নের জবাব দাও। পুরুষ কে ? আর সর্বধনীই বা কোনজন ?

পুণ্যকর্মের ফলে মানুষের নাম স্বর্গ স্পর্শ করে ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত হয়, সেই নাম যত দিন থাকে তত দিনই সে পুণ্যকর্মা পুরুষ বলে গণ্য। যে অতীত বা অনাগত সুখ-দুঃখ প্রিয়-অপ্রিয় তুল্য বলে মনে করে সেই সর্বধনী

বেশ, খুশি হলাম। এখন ভ্রাতাদের মধ্যে শুধু একজনকে বেছে নাও, সে বেঁচে উঠবে।

যুধিষ্ঠির বললেন, তবে একমাত্র নকুল জীবিত হোক।

সে কি? ভীম অর্জুন কারু প্রাণ না চেয়ে বিমাতৃপুত্র নকুলের প্রাণ চাইলে? ধর্মকে নষ্ট করলে ধর্মই আমাদের নষ্ট করবেন, বললেন যুধিষ্ঠির, আর রক্ষা করলে রক্ষা করবেন। কুন্তী আর মাদ্রী উভয়েই আমার জননী। উভয়ে পুত্রবতী থাকুন এই আমার অভিলাষ।

তুমি কামনায় ও কার্যে অন্তরে-বাহিরে, অনৃশংস। অতএব তোমার সকল ভাইই পুনর্জীবিত হোন।

এবার শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রশ্নোত্তরমালিকা দেখ।

পথ কি? যত মত তত পথ।

দেবতা থেকেও বড় কে? মানুষ। মানুষ কে? যে মান-হুঁস সে। আর আমি কে? তুমি।

দয়া কি? সবাইকে ভালোবাসার নাম দয়া। চাতুরী কি? যে চাতুরীতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।

সিদ্ধ কে? পরের দুঃখে যে কাঁদে। তত্ত্বজ্ঞান কি? আত্মজ্ঞান। লাভ কেমন? ভাব যেমন।

দেহের যত্ন করবে কেন? ঈশ্বরকে নিয়ে সম্ভোগ করবে বলে। ঈশ্বর কে? মানুষ। কোথায় তার বৈঠকখানা? ভক্তের হৃদয়ে।

জ্ঞান অজ্ঞান কি? এক জানার নাম জ্ঞান, অনেক জানার নাম অজ্ঞান। যখন হোথা তখন অজ্ঞান, যখন হেথা তখন জ্ঞান।

বীরভক্ত কে? সংসারে থেকে যে ঈশ্বরকে ডাকে। উপায় কি? দুটি—অভ্যাস আর অনুরাগ। কার হয় না? যে বলে আমার হবে না।

তপস্যা কি? সত্য কথা। মন্ত্র কি? মন তোর মন্তোর। মায়া কি? কামকাঞ্চন। অবিদ্যা কি? যে ঈশ্বরের পথে বাধা দেয়।

গীতার অর্থ কি? দশ বার গীতা-গীতা বললে যা হয়। কার কাছে ঈশ্বর ছোট? ভক্তের কাছে। ভগবানের চেয়ে ভক্ত বড়, কেন না ভক্ত ভগবানকে হৃদয়ে বয়ে নিয়ে বেড়ায়। ভক্তের কেমন স্বভাব? আমি বলি তুমি শোনো, তুমি বলো আমি শুনি।

কোথায় নিমন্ত্রণের দরকার হয় না? যেখানে হরিনাম।

ঈশ্বর আমাদের কি? আমাদের বিলেত।

আর, ইচ্ছা কি? স্বাধীন ইচ্ছা না ঈশ্বরের ইচ্ছা? ঈশ্বরের ইচ্ছা।

কলকাতার বড় আদালতের উকিল জিগগেস করল ঠাকুরকে, 'মশায়, একটি সন্দেহ আমার যায় না। এই যে বলি ফ্রি উইল, স্বাধীন ইচ্ছে, মনে করলে ভালোও করতে পারি মন্দও করতে পারি, এটা কি সত্যি? সত্যিই কি আমরা স্বাধীন?'

'সব ঈশ্বরাধীন, সব তাঁর ইচ্ছা, তাঁর লীলা।' বললেন ঠাকুর: 'তাঁর ইচ্ছেতেই ছোট বড় সবল দুর্বল ভালো লোক মন্দ লোক। এই দেখ না বাগানের সব গাছ কিছু সমান হয় না।' আবার বললেন, 'যতক্ষণ ঈশ্বর লাভ না হয় ততক্ষণ মনে হয় আমরা স্বাধীন। এ ভ্রমে তিনিই রেখে দেন, তা না হলে পাপের বুদ্ধি হত। পাপে ভয় হত না, পাপে শাস্তি হচ্ছে এ বোধ হত না।'

সুরেন মিত্তিরের বাড়িতে অন্নপূর্ণা পূজা হচ্ছে। উঠানে ভক্ত সঙ্গে বসে আছেন ঠাকুর। ঠেসান দেওয়ার জন্যে ঠাকুরকে তাকিয়া দেওয়া হল। তাকিয়া সরিয়ে রাখলেন।

'তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসা! কি জানো অভিমান ত্যাগ করা বড় শক্ত। এই বিচার করছ অভিমান কিছু নয়, আবার কোথা থেকে এসে পড়ে। স্বপ্নে ভয় দেখেছ, জেগে উঠেও ভয়ে বুক দুর-দুর করে। অভিমানও সেই রকম। তাড়িয়ে দিলেও আবার এসে পড়ে কোত্থেকে। কেবল মুখভার, কেবল নালিশ, আমায় খাতির করলে না, আমাকে তাকিয়া দিল না ঠেসান দিতে।'

নদীর জল নদীতে আছে, সে জল কি আমার? বনের ফুল ফুটে আছে কাননে, সে ফুল কি আমার? জল যখন তুলে আনি কলসীতে তখন বলি আমার। ফুল যখন তুলে এনে ডালিতে সাজাই তখন বলি আমার। জল দিয়ে দাও তৃষ্ণাতুরকে, ফুল দিয়ে দাও দেবতার পূজায়। তখনই অহং সার্থক, তখনই অহং আত্মা।

আমি শরীর তুমি আত্মা! আমি রথ তুমি রথী। আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী। আমি গাড়ি তুমি ইঞ্জিনিয়র।

বৈদ্যনাথের দিকে ফের তাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'আপনি কি বলো? তর্ক করা ভালো?'

'আজ্ঞে না। তবে তর্ক করার ভাব জ্ঞান হলে যায়।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। যদি কোনো মহাপুরুষ বলে আমি ঈশ্বরকে দেখেছি তবুও লোকে তার কথা নেয় না। বলে ও যখন দেখেছে তখন আমাকেও দেখিয়ে দিক। কিন্তু একদিনে কি নাড়ী দেখতে শেখা যায়? যাদের নাড়ী দেখা ব্যবসা, সেই বৈদ্যের সঙ্গে ঘোরো। তখন কোনটা কফের কোনটা পিত্তের

কোনটা বায়ুর বুঝতে পারবে। আগে সুতোর ব্যবসা করো তবেই তো বুঝতে পারবে কোনটা চল্লিশ নম্বর কোনটা বা একচল্লিশ নম্বরের সুতো।'

খোল বাজছে। এবার কীর্তন শুরু হবে। গায়ক জিগগেস করছে, কি পদ গাইব? ঠাকুর বললেন, 'ওগো একটু গৌরাঙ্গের কথা কও।'

রাত সাড়ে নটা পর্যন্ত কীর্তন চলল। ঠাকুর কত নাচলেন, আখর দিলেন। সুরেন বললে, 'আজ কিন্তু মায়ের নাম একটুও হল না।'

প্রতিমার দিকে তাকিয়ে ঠাকুর বললেন, 'আহা, মা কেমন আলো করে বসে আছেন! দর্শনে ভোগের ইচ্ছা দুঃখশোক সব পালিয়ে যায়। নিরাকার কি দর্শন হয় না—হয়, কিন্তু বিষয়বুদ্ধি এতটুকু থাকলে আর হবে না। দেখ দেখি, বাইরে কেমন দর্শন করছ আর আনন্দ পাচ্ছ।'

সুরেন কারণ পান করে। একবার গিরিশ ঘোষ বসেছিল সামনে। তাকে ইঙ্গিত করে ঠাকুর বললেন সুরেনকে: 'তুমি আর কি! ইনি তোমার চেয়ে—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' সুরেন বললে হাসতে-হাসতে, 'ইনি আমার বড় দাদা!'

কারণ খেয়ে কি হবে? কারণানন্দদায়িনীর করুণাসুধা পান করো। সহজানন্দ হয়ে যাও।

'তুমি কারণ খেয়েছ?' বলতে-বলতেই ঠাকুর ভাবাবিষ্ট।

প্রতিমার সামনে প্রণাম করলেন ঠাকুর। এবার যাবেন দক্ষিণেশ্বর। হাঁক দিলেন: 'ও—রা, জু—আ?'

অর্থাৎ, ও রাখাল, জুতো আছে, না হারিয়ে গেছে?

॥ ১৩৭ ॥

গোপালের মা ভাত রাঁধছে ঠাকুরের জন্যে। সব তৈরি, খেতে বসেছেন ঠাকুর। কিন্তু এ কি, ভাতগুলি যে শক্ত, সেদ্ধ হয়নি ভালো করে। ঠাকুর বিরক্ত মুখে বললেন, 'এ ভাত কি আমি খেতে পারি? ওর হাতে ভাত আর আমি কখনো খাব না।'

এ কখনো হতে পারে? গোপালের মা যার তিনি অঞ্চলের নিধি, যার তিনি অন্ধের নড়ি, কাঙালের কড়ি, তাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন? এ নিশ্চয়ই অভিমানের কথা, হয়তো বা ভয় দেখানো। ভবিষ্যতে সাবধান হোয়ো, মনোযোগী হোয়ো, তারই শাসন-উচ্চারণ। দেখবে, এখুনিই মেঘ কেটে যাবে, ধুয়ে যাবে অভিমান, গোপালের মাকে ডেকে এনে করবেন কত স্নেহ-সমাদর, আবার রাঁধতে বলবেন আরেকদিন।

কিন্তু, না, অক্ষরে-অক্ষরে ফলল। কদিন পরেই অসুখ হল ঠাকুরের। দেখতে-দেখতে বেড়ে গেল অসুখ। বন্ধ হল ভাত খাওয়া। গোপালের মা'র হাতে ভাত খাওয়া ঘুচে গেল এবারের মত।

'আজ বিকেলে একবার যদু মল্লিকের বাগানে যাব।' এক ভক্তকে একদিন বললেন ঠাকুর।

কিন্তু সেদিনই দক্ষিণেশ্বরে বহু লোকের সমাগম। সারা দিন কেবল কথা আর কথা। আর সব প্রসঙ্গের শেষ আছে ঈশ্বর প্রসঙ্গের শেষ নেই। আর সব কথা বলতে ক্লান্তি শুনতে ক্লান্তি কিন্তু ঈশ্বরকথা যে বলে যে শোনে দুই-ই অক্লুরন্ত।

অনেক রাত্রে, যখন সবাই বিদায় হয়ে গিয়েছে, যদু মল্লিকের বাগানে যাওয়ার কথা মনে পড়ে গেল। আর কি স্থির থাকা যায়! তখুনি উঠে পড়লেন, চললেন হন-হন করে। ও কি, কোথায় যাচ্ছেন? যদু মল্লিকের বাগানে। সে কি, এত রাতে, এই অন্ধকারে! তা হোক, বারণ শুনলেন না কারু, সটান এগিয়ে চললেন। কিন্তু যাবেন কোথায়, বাগানের গেট বন্ধ। তাতে কি, দমবার পাত্র নন ঠাকুর। বাক্য যখন একবার উচ্চারণ করেছেন তখন সত্য পালন করতেই হবে। দারোয়ানকে ডাকলেন। বললেন, গেট খুলে দাও। দারোয়ান গেট খুলে দিল। তখন বাগানের মধ্যে খানিক পাইচারি করে সুস্থির হলেন।

সুরেন মিত্তিরের বাগান থেকে ফিরছেন ঠাকুর, হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আমি তখন লুচি খাইনি, আমাকে একটু লুচি এনে দাও।'

লুচির থালা নিয়ে এল ঠাকুরের কাছে। একটু কণিকামাত্র ভেঙে মুখে দিলেন। বললেন, 'এর অনেক মানে আছে। লুচি খাইনি মনে হলে আবার ইচ্ছে হবে। হয়তো আবার আসতে হবে এখানে।'

মণি মল্লিক হেসে বললে, 'বেশ তো সঙ্গে-সঙ্গে আমরাও আসতাম।'

'দেখ রাখাল বলছিল ওদের দেশে বড় জলকষ্ট।' একদিন বললেন মণি মল্লিককে: 'তুমি সেখানে একটা পুকুর কাটিয়ে দাও না কেন! কত লোকের উপকার হয়। তোমার তো অনেক টাকা আছে, অত টাকা নিয়ে কি করবে? তা শুনি তুমি নাকি বড় হিসেবী।'

বরানগরে বাগান আছে মণিলালের। সি দুরেপটি থেকে প্রায়ই সেখানে আসে আর খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ঠাকুরকে দেখে যায়। সারা পথই কি আর গাড়িভাড়া করে আসে? ট্রামে করে প্রথমে শোভাবাজার, সেখান থেকে শেয়ারের গাড়িতে বরানগর। আর বাকি পথটা কখনো পায়ে হেঁটে।

অথচ অঢেল পয়সা।

পয়সার প্রতি যে টান সে টান দিতে পারো ঈশ্বরকে? কৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর টান। ঠাকুর বললেন, 'তোরা আর কিছু নিস বা না নিস কৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর টানটুকু নে।'

হেসে বললেন, 'টাকা থাকলেই বাঁধতে ইচ্ছে করে।'

'টাকা বার করতেই অনেক হিসেব।' বললে মাস্টার: 'তবে ঐ যে বলছিলেন ত্রিগুণাতীত হয়ে সংসারে থাকা—'

'হ্যাঁ, বালকের মত।' ঠাকুর আরো সহজ করে দিলেন।

'কিন্তু বড় কঠিন। সহজ হওয়াই শক্তিমানের তপস্যা।'

স্বভাবকে লাভ মানেই সহজকে লাভ। নেব—এটা স্বভাব নয়, দেব—এটাই স্বভাব। মেঘ জল দেয়, বৃক্ষ ফল দেয়, আগুন আলো দেয়। চারদিকেই এই দেওয়ার দেওয়ালী। বিনা কারণে উৎসর্গের উৎসব। আমার চারদিকে এই উৎসব, আর আমি ম্লান শুষ্ক ব্যয়কুণ্ঠ হয়ে থাকব? আমিও মাতব এই উৎসবে। দায় নেই দান বাধ্যতা নেই বিতরণ—সেই আনন্দযজ্ঞে। আর কাউকে কিছু দিইনি, তোমাকে সর্বস্ব দিয়ে যাব। মৃত্যু দিয়ে তৈরি তুচ্ছ উপকরণ নয়, অমৃত দিয়ে ভরা আত্মার উপঢৌকন।

শুধু ধূমায়িত হব, একবারও প্রজ্বলিত হতে পারব না, এই কলঙ্ক থেকে আমাকে ত্রাণ করো। জ্বালাহীন তুষানলের মত আমাকে অবসাদধূমে আচ্ছন্ন রেখো না। আমাকে একবার তোমার জন্যে দীপ্ত হয়ে ওঠবার তেজ দাও। ত্যাগই আমার তেজ, বিসর্জনই আমার জীবনালোক।

প্রভু, আমার দোষ আর ধোরো না। তোমার তো সমদর্শন, যদি আর-কাউকে পার করে দিয়ে থাকো, দয়া করে আমাকেও পার করে নাও। তোমার খুশি তা জানি। কিন্তু আমার খুশির জন্যে তুমি একটু খুশি হতে পারো না? পূজার ঘরের ফল-কাটার যে বঁটি আর কসাইয়ের হাতে যে হিংসার খড়্গ দুই-ই এক লোহার তৈরি। কিন্তু স্পর্শমণির অন্তরে তো দ্বিধা নেই, সে ভালো মন্দ দুটো অস্ত্রকেই সোনা করে। একই জল, নদীতে তা স্বচ্ছ নালায় তা মলিন, অপবিত্র, কিন্তু দুই-ই গঙ্গায় এসে পড়ে স্বচ্ছন্দে এবং গঙ্গায় পড়ে একই রঙে রঙিন হয়। যেমন গঙ্গার বর্ণ তেমনি ঐ নদী-নালার। তেমনি আমাকে যদি টেনে নাও তোমার মধ্যে, হই না কেন অস্বচ্ছ-অপরিচ্ছন্ন, ঠিক তোমার বর্ণে বর্ণায়িত হব। তবে কেন দয়া করবে না? কেন হাত বাড়িয়ে টেনে নেবে না বলহীনকে?

আমি শুকনো মাঠ, আমার পাশেই তুমি রয়েছ জলাশয়। আগের থেকেই রয়েছ। আমার সেচের জল, আর্দ্রীকরণ উর্বরীকরণের জল। শুধু আমি অহঙ্কারের আল-বেঁধে রেখেছি বলেই তুমি ঢুকতে পারছ না। নইলে কবে ভেসে যেতাম স্নেহসিঞ্চনে, অকৃপণ ফসল ফলাতাম। তুমি এত কিছু ভেঙে-চুরে ফেলছ, আমার এই সামান্য মৃত্তিকার আল ভূমিসাৎ করতে পারো না? এই মণি মল্লিকের বাড়িতেই, ৮১ সিঁদুরেপটি, একবার নাচলেন ঠাকুর। শুধু নিজে নাচলেন না, সকলকে নাচিয়ে ছাড়লেন। শুধু ভক্তদের নয়, যারা দেখছিল তাদেরও। আপনি মেতে জগৎ মাতায়। আপনি হেসে জগৎ হাসায়। আর সঙ্গে চিরঞ্জীব শর্মার গান, 'নাচ রে আনন্দময়ীর ছেলে'—বাম বাহু তুলে ও দক্ষিণ ভুজ কুঞ্চিত করে, বাম পা আগে ও ডান পা পিছনে রেখে ঠাকুরের সেই ভুবনস্পন্দন নাচ। এ যেন সেই 'পদযুগ ঘিরে জ্যোতির্মঞ্জীরে বাজিল চন্দ্রভানু।' বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে যে নৃত্য চলেছে তারই স্বতোৎসার।

এই মণি মল্লিকের বিধবা মেয়ে নন্দিনী। আমাকে ইষ্টদর্শন করিয়ে দিন এই আকুল প্রার্থনা নিয়ে একদিন প্রভুর পায়ে এসে পড়ল।

'ইষ্ট? ইষ্টকে দেখতে চাও?' যেন কত সহজ এমনি নিশ্চয়ভরা চোখে তাকালেন ঠাকুর।

'হ্যাঁ, দিন দেখিয়ে।'

'বাড়িতে কোন ছেলেটিকে সব চেয়ে বেশি ভালোবাসো?'

'আমার ছোট্ট একটি ভাইপো আছে—তাকে।'

'তবে আর কি। পেয়ে গেছ তোমার ইষ্ট। ঐ ছোট্ট ভাইপোকেই শ্রীগৌরাঙ্গ ভেবে সেবা করো।'

ভেবেছিল ঐ আঁচলধরা অনুরক্ত ছেলেটাই জীবনের বন্ধন। ঠাকুর দেখিয়ে দিলেন আসলে ঐটেই মুক্তি। যেখানে বন্ধন সেখানেই মুক্তি। তোমার স্বভাবই তোমার আসন; তোমার প্রবণতাই তোমার ধ্যান। প্রাণ যা চায় তাই ঈশ্বর। সব পেলেও আবার যা চায় তাই ঈশ্বর।

ঈশ্বর আমাদের ফাউ। বাঁধাবরাদ্দের উপর উপরি-পাওনা। সমস্ত প্রাপ্তির পরিধির বাইরে মহত্তম উদ্‌বৃত্ত।

ওগো আমার একটু পালো-দেওয়া ক্ষীর খেতে ইচ্ছে করছে। কলকাতার নেমন্তন্ন বাড়িতে যেমন পাওয়া যায় তেমনি। ডাক্তারদের একটু জিগগেস করো না খাওয়া চলবে কি না।

ডাক্তারদের আপত্তি নেই।

যোগীন গেল সেই ক্ষীর কিনতে। পথে যেতে-যেতে ভাবনা ধরল, বাজারের ক্ষীর খাওয়া কি ঠাকুরের পক্ষে ভালো হবে? বাজারের ক্ষীরে তো শুধু পালো নয় রয়েছে আরো কত কি ভেজাল কে জানে! তার চেয়ে কোনো ভক্তের বাড়িতে বলে সেখান থেকে ক্ষীর তৈরি করে নিই গে। কে জানে সেইটেই বা ঠাকুরের মনঃপুত হবে কিনা। তেমন কথা তো কিছু বলে দেননি ঠাকুর।

সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে চলে এল সে বলরাম বাবুর বাড়ি। এখন বলুন দেখি কি করি।

বাজারের কেনা জিনিস ঠাকুরকে খাওয়াবে, তুমি পাগল হয়েছ? বাড়িতে তৈরি করে দিচ্ছি। কিন্তু সকালবেলাতেই তো হবে না। তুমি এ বেলা এখানে থাকো, খাওয়া-দাওয়া করো, পরে বিকেলে নিয়ে যেও তৈরি ক্ষীর। ঠাকুর খুশি হবেন ক্ষীর দেখলে।

তথাস্তু। ক্ষীর নিয়ে কাশীপুর পৌঁছুতে বিকেল চারটে।

দুপুরে খাওয়ার সময় ঠাকুর অনেকক্ষণ বসে ছিলেন ক্ষীরের জন্যে। এই আসে এই আসে করে মুহূর্ত গুণেছেন। বরাদ্দ সময় পার হয়ে গেল তবু দেখা নেই। তখন আর কি করা, রোজ যা দিয়ে খান তাই দিয়ে খেলেন শুকনো মুখে।

'কি রে এত দেরি হল কেন?'

'জ্বাল দিয়ে আনলুম বলরাম বাবুর বাড়ি থেকে।'

'তোর কি বুদ্ধি! তোকে কি তাই আমি আনতে বলেছিলুম!'

যোগীন তাকিয়ে রইল অপরাধীর মত।

'আমি তোকে বলেছিলুম, বাজারের ক্ষীর খাবার ইচ্ছে হয়েছে, বাজার থেকে কিনে আন। ভক্তদের বাড়িতে গিয়ে তাদের কষ্ট দিয়ে তৈরি করে আনবার কি হয়েছিল?'

'বাজারের ক্ষীর খেলে আপনার অসুখ বাড়বে মনে করে—'

'আর এ খেলে বাড়বে না? দেখেছিস কেমন ঘন গুরুপাক ক্ষীর।'

অধোমুখে দাঁড়িয়ে রইল যোগীন।

যেমনটি বলে দিয়েছি তেমনটি করবি। যা করবি বলে বেরিয়েছিলি তার থেকে বিচ্যুত হবি না। সম্পূর্ণ করাই সম্পন্ন করা। ঠিক-ঠিক কথা ঠিক-ঠিক কাজ।

'এ ক্ষীর আমি খাব না।' বলে পাঠালেন শ্রীমাকে।

কিন্তু কত কষ্ট করে ভক্ত তৈরি করেছে, কত কষ্ট করে বহন করে এনেছে

আরেকজন। সব তো তাঁরই নিবেদনে। তিনি যদি একটুও মুখে না দেন তা হলে কি করে চলে!

'সমস্তটা ক্ষীর যেন গোপালের মাকে খাওয়ানো হয়। হ্যাঁ, গোপালের মাকে। ভক্তের দেওয়া জিনিস ফেলা চলবে না। ওর মধ্যেই গোপাল আছে। ওর খাওয়াতেই আমার খাওয়া।'

সাধন আর কি? সহজ সাধন। সেই যা পড়েছিলে ছেলেবেলায়: 'সদা সত্য কথা কহিবে।' এ তো তোমার নিজের আয়ত্তের মধ্যে, এর জন্যে তো কোনো দৌড়-ঝাঁপের দরকার নেই, কোনো কাঠ-খড়ও পোড়াতে হবে না। সহজ সংসারে চলো-ফেরো আর সত্য কথাকে আঁট করে ধরে থাকো। কি হয়েছে, কি দেখেছ, কি করেছ, সব ঠিক-ঠিক বলো। এর জন্যে তো শাস্ত্র পড়তে হবে না, করতে হবে না যাগ-যজ্ঞ, যেতে হবে না তীর্থে স্নানে। শুধু সত্যবাদী হও। হও রৌদ্রে নিষ্কাশিত জলন্ত তরবারি।

'যারা বিষয় কর্ম করে, আফিসের কাজ কি ব্যবসা—তাদেরও সত্যেতে থাকা উচিত।'

সত্যই সাহস। সত্যই ঔজ্জ্বল্য। সত্যই পবিত্রতা।

সামান্য-সাধারণ কথায় সামান্য-সাধারণ আচরণে সত্যকে ধীরে-ধীরে আরোপ করো জীবনে। দেখবে কত বড় প্রচণ্ড শক্তির আধার হয়ে উঠেছ। রক্তের মধ্যে বিদ্যুদগ্নি বয়ে চলেছে। দেখছ পথ রোধ করে সামনে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়। তোমার সত্যময় জীবন সে পাহাড়কে প্রশস্ত রাজপথে পরিণত করবে।

'মাকে সব দিলুম কিন্তু সত্য দিতে পারলুম না।' বললেন ঠাকুর। 'সত্যতে থাকবে তা হলেই ঈশ্বরলাভ।'

কথা একটু কম কও। দয়া করো, একটু চুপ করে থাকো। চুপ করে থেকে অন্যের কথা শোনো। অন্য আর কোথায়। তোমার অন্তরতম। তুমি চুপ করলেই তার কথা শুনতে পাবে। শুনতে পাবে সেই গভীর গুঞ্জন।

চুপ করে থাকলে অন্তত মিথ্যে বলার হাত থেকে রেহাই পাবে। চুপ করলেই বন্ধ হবে সব ইন্দ্রিয়ের হট্টগোল। হবে পাহাড়ে বেড়ানো, হবে সমুদ্রস্নান। অনুভব করবে সব প্রবাহই জাহ্নবী, সব স্বরূপই সমুদ্র। অন্তরক্ষেত্রে কোথায় সুপ্ত শক্তির বীজটি পড়ে আছে, কুড়িয়ে পাবে। মৌনের আকাশে বহুবিস্তৃত-শাখায় প্রসারিত হবে সে বনস্পতি। নিজেকে নিজে আবিষ্কার করবে, হবে নিজের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। অনীয়ান ও মহীয়ানকে দেখবে একসঙ্গে।

আর কিছু না পারো নির্জন পথে একা-একা হাঁটো। চুপ করে থাকো।

আর যদি কথাই কইবে, সকালে-বিকেলে হরিবোল বলো। হাততালি দাও আর হরিনাম করো।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ছেলে, কথকতা করে, এসেছে ঠাকুরের কাছে। সাতাশ-আটাশ বয়স, কি নাম কে জানে, সবাই ঠাকুরদাদা বলে ডাকে। সংসার ঘাড়ে পড়েছে তাই বৈরাগ্য নিয়ে উধাও। কিন্তু মন টিকল না, আবার ফিরে এসেছে স্বস্থানে। তার মাটির কেল্লায়।

'কোত্থেকে আসছ?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'আজ্ঞে বরানগর থেকে।'

'পায়ে হেঁটে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এখানে কি দরকার?'

'আপনাকে দর্শন করতে এসেছি। একটা কথা আপনাকে জিগগেস করব।'

'করো।'

'তাঁকে ডাকি অথচ মনে অশান্তি কেন? দু-চার দিন বেশ আনন্দে থাকি, তার পর আবার অশান্তি।'

'বুঝেছি।' বললেন ঠাকুর, 'ঠিক পড়ছে না। কারিকর দাঁতে-দাঁত বসিয়ে দেয়। ঠিক পড়ছে না। কোথায় একটু আটকে আছে।'

কি সুন্দর করে বললেন। দাঁতে-দাঁত বসছে না। কারিকরের হাতেই সে কারসাজি। একটুখানি সরিয়ে দাও একটুখানি বেঁকিয়ে দাও, ঠিক খাঁজে-খাঁজে লেগে যাবে। তখন জলের মত চলে যাবে ক্ষুর। তখনই সর্বশান্তি।

গঙ্গাই শুধু সমুদ্রকে চায় না, সমুদ্রেরও গঙ্গা ছাড়া গতি নেই। 'সাগরাদনপগা হি জাহ্নবী, সোঽপি তন্মুখরসৈকনির্বৃতিঃ।' গঙ্গা সমুদ্র ছেড়ে অন্যত্র যায় না, তেমনি সমুদ্রও গঙ্গার মুখরসেই আনন্দ লাভ করে।

'মন্ত্র নিয়েছ?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'মন্ত্রে বিশ্বাস আছে?'

এইবার মুখে আর কথা নেই ঠাকুরদাদার। তবেই বুঝতে পারছ, কেন বসছে না দাঁতে-দাঁত। মন্ত্রের কাছেই ত্রাণ খোঁজো। নামের কাছেই প্রেম চাও। অভ্যাসের থেকেই নিংড়ে নাও অনুরাগ। অনুরাগকে দৃঢ় করো, প্রগাঢ় করো। তখনই দেখা দেবে বৈরাগ্য। বৈরাগ্য তো নঙর্থক নয়, নেতিবাচক নয়। বৈরাগ্য সদর্থক, অস্তিবাচক। বৈরাগ্য মানে ঈশ্বরে নিবিড়ানুরাগ।

মর্কট-বৈরাগ্য নয়, তীব্র বৈরাগ্য আনো। আসক্তির চেয়েও তা বড় শক্তি। আস্পৃহার চেয়েও তা তীক্ষ্ণতর আকর্ষণ।

'জানো না বুঝি, সংসারের জ্বালায় জ্বলে গেরুয়া পরে কাশী গেল।' বললেন ঠাকুর। 'অনেক দিন খবর নেই। তারপর বাড়িতে একখানা চিঠি এল। লিখেছে তোমরা ভেবো না, আমার এখানে একটি কাজ হয়েছে।'

সবাই হেসে উঠল

ঠাকুর বললেন, 'তুমি একটা গান ধরো।'

ঠাকুরদাদা গান ধরলেন। তন্ময় হয়ে শুনলেন ঠাকুর। বললেন, 'তোমার মধ্যে গান আছে, তবে আর কি। ঐ গান ধরেই এগোও ঈশ্বরের দিকে। সংসারে থাকতে গেলেই জ্বালা, হয়তো মাগ অবাধ্য, কুড়ি টাকা মাইনে, ছেলেকে পড়াতে পারছে না, বাড়ি ভাঙা, ছাদ দিয়ে জল পড়ে, মেরামতের টাকা নেই। তবু থাকো, থাকো সংসারে। কেল্লার ভিতর থেকে যুদ্ধ করো। মাঠে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করলেই বেশি বিপদ, সোজা গায়ের উপরেই গোলাগুলি এসে পড়ে।'

'সংসার ত্যাগের দরকার নেই?'

'কি দরকার! সাধুদের কত কষ্ট! সংসার ত্যাগ করতে যাচ্ছে একজন, তাঁর স্ত্রী বললেন, কোন সুখে চলেছ গৃহ ছেড়ে? এই এক ঘরে খাওয়া পাচ্ছ এই তো আরাম, মিছিমিছি কেন আট ঘর ঘুরে-ঘুরে বেড়াবে?'

'তা হলে এখন আমি কি করব?' কাতর হয়ে প্রশ্ন করলেন ঠাকুরদাদা।

'হাততালি দিয়ে সকালে-বিকালে হরিনাম করবে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল বলবে।'

আর, বলি আরো একটি সহজ কথা, সত্য কথা বলবে। থাকবে সত্যকে আশ্রয় করে।

সেই শুষনি শাক তোলার ঘটনাটা মনে করো। চার-চার মেয়ের মধ্যে বিষয়-আশয় সব ভাগ করে দিয়েছেন রাসমণি। যে পুকুরটা দ্বিতীয় মেয়ের ভাগে পড়েছে তাতে সেজগিন্নি স্নান করতে নেমেছে। সুন্দর শুষনি শাক হয়েছে পুকুরে। আঁচলে করে কিছু শুষনি শাক তুলে নিয়ে গেল সেজগিন্নি। সমস্ত ব্যাপারটা ঠাকুরের চোখে পড়ল। স্নান করতে এসেছিস স্নান করে যা, তা নয়, পরের পুকুরের শাক তুলে নিচ্ছিস। পরের জিনিস না বলে নিলে চুরি করা হল না? কি দরকার ছিল পরের জিনিসে লোভ করে?

বড় অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন ঠাকুর। দ্বিতীয় মেয়েকে ডাকিয়ে

আনলেন। সব কথা খুলে বললেন তাকে। এমন গম্ভীর মুখ করে বললেন, সত্যি যেন সেজগিন্নির অন্যায়ের অবধি নেই। হাসতে লাগল দ্বিতীয়া। রঙ্গ করে বললে, 'তাই তো, বড় অন্যায় করেছে সেজ। এ চুরি ছাড়া আর কি।' সেজগিন্নিও তখন সেখানে এসে উপস্থিত। সেও হাসতে লাগল। বললে, 'কত কষ্ট করে শাকগুলি তুলে নিয়ে এলুম লুকিয়ে, আর তুমি কি না তাই বলে দিলে!' 'কি জানি বাপু,' ঠাকুর গম্ভীর মুখে বললেন, 'বিষয় সম্পত্তি সব ভাগ-যোগ হয়ে গিয়েছে তখন পরেরটা না বলে নেওয়া কেন? তাই ভাবলুম যার জিনিস গেছে তাকে বলে দি, সে একটা বোঝাপড়া করে নিক।'

দু বোনে আরো হাসতে লাগল।

সব মাকে দিয়েছি, সত্য দিতে পারিনি।

একদিন হঠাৎ দক্ষিণেশ্বরে বলে ফেললেন ভাবাবস্থায়, 'এর পরে আর কিছু খাব না, কেবল পায়সান্ন, কেবল পায়সান্ন।'

তখন ঠাকুরের অসুখ নেই, যথাবিধি খাচ্ছেন ঝোল-ভাত। হঠাৎ এমন কথা কেন বলে বসলেন, শ্রীশ্রীমা'র বুকের মধ্যিখানটা শিউরে উঠল। তিনি বললেন, 'তা কেন? আমি তোমাকে মাছের ঝোল ভাত রেঁধে দেব।'

'না, না, পায়সান্ন খাব আমি।'

কিছুদিন পরেই ঠাকুর অসুখে পড়লেন। তখন ক্রমে-ক্রমে বন্ধ হয়ে গেল ঝোল-ভাত। তখন শুধু মণ্ড আর দুধ, নয়তো স্রেফ দুধ-বার্লি।

॥ ১৩৮ ॥

গিরিশ নিমন্ত্রণ করেছে ঠাকুরকে, যেতেই হবে তার বাড়ি।

বলরামের বাড়িতে আছেন, রাত প্রায় নটা হল, উঠে পড়লেন ঠাকুর। ওরে গিরিশের বাড়ি যাব। নেমন্তন্ন করে গিয়েছে। হ্যাঁ, এই রাত্রেই যেতে হবে। আহা, কি সব গান বেঁধেছে বলো দেখি। কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জ-কাননচারী। যার ভেতরে এই সব গান এত সজীব অনুরাগ তার ডাকে কি সাড়া না দিয়ে পারি?

সেদিন ঠাকুরকে বললে গিরিশ, 'মশাই ছেলেবেলায় আমি কিছু লেখাপড়া করিনি তবু লোকে বলে বিদ্বান—'

বই-শাস্ত্র একটা উপায় মাত্র। ঠাকুর বুঝিয়ে দিলেন, 'আসল হচ্ছে খবর সব জেনে নিয়ে নিজেই কাজ আরম্ভ করে দাও।'

নিজেই নিজের উদ্ধার সাধন করো। সেই তো স্বাধীনতার অর্থ। নিজের

ঘরে নিজের দেহের মধ্যে নিজের জীবনের মধ্যে কাজ করো। দেখাও তোমার বীরত্ব, তোমার পুরুষকার। তুমি স্বাধীন হয়েছ বুঝব কিসে যদি তুমি এখনও ইন্দ্রিয়পরবশ হয়ে বাস করো। শুধু পড়ে কি হবে কাজ করে দেখাও, তুমি কত বড় কারু, কত বড় শিল্পী।

'শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে?' বললেন ঠাকুর, 'অনেক শ্লোক অনেক শাস্ত্র মুখস্থ কিন্তু মন রয়েছে টাকা আর দেহসুখের দিকে। শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে কিন্তু নজর ভাগাড়ে। শুধু খুঁজে বেড়াচ্ছে কোথায় মরা জানোয়ার।'

বই-শাস্ত্র দেখ। পথ-পদ্ধতি জেনে নাও। তারপর বই বন্ধ করে দিয়ে বাজার করতে বেরোও। যে বাজারে আসল বস্তুলাভ।

কাজ করো। সাধন করো।

'বেলতলায় কত রকম সাধন করেছি, কত কঠোর সাধন।' বলছেন ঠাকুর, 'গাছতলায় পড়ে থাকতুম, মা দেখা দাও বলে। চক্ষের জলে গা ভেসে যেত।'

'আর সকলের ধারণা, এক মুহূর্তে সব হয়ে যাবে!' মাস্টার টিপ্পনি কাটল: 'বাড়ির চারদিকে আঙুল ঘুরিয়ে দিলেই যেন দেয়াল হল।'

কি অবস্থাই গিয়েছে! কুমার সিং সাধু-ভোজন করাবে, নেমন্তন্ন করলে রামকৃষ্ণকে। অনেক সাধুর ভিড়, পঙতি করে বসেছে সবাই। রামকৃষ্ণও বসল এক পাশে। কেউ-কেউ পরিচয় জিগগেস করল, এ কে, কোন মতের, কই আগে তো কখনো দেখিনি। অত খবরে কাজ কি। রামকৃষ্ণ আলাদা হয়ে সরে বসল। যেই পাতায় খাবার দিল, কারু দিকে না চেয়ে কারু জন্যে অপেক্ষা না করে সরাসরি খেতে শুরু করে দিলে। যেন অভব্য কিছু একটা করছে এমনি অবাক হবার ভাব করে কেউ-কেউ বলে উঠল: এ কেয়া রে!

এ অনন্যসাধারণ! নিজের ঢাক পিটতে রাজী নয়, একেবারে নিরহঙ্কার। পাতে খাবার পড়লে এক মুহূর্ত দেরি করতে রাজী নয়, এমনি তার সত্যপথাশ্রিত সরলতা।

রাত নটা, উঠে পড়লেন ঠাকুর।

সে কি, আপনার জন্যে খাবার তৈরি করেছি যে। বলরাম আপত্তি করল। তাও তো ঠিক। খেয়ে না গেলে বলরাম যে কষ্ট পাবে—আবার ওদিকে গিরিশের ডাক, দেরি করবার উপায় নেই। তখন উপায়কুশল বললেন, এক কাজ করো, খাবারটা দিয়ে দাও সঙ্গে।

বোস পাড়ার তেমাথা পার হচ্ছেন, কাছেই গিরিশের বাড়ি, প্রায় ছুটে চলেছেন। পথটুকু পার হতেও যেন তর সইছে না।

কিন্তু এ কে, সহসা এ কে চোখের সামনে এসে দাঁড়াল !

আর কে ! আপনার সেই লোচনলোভনীয় ! যার নাম বলতে আপনি পাগল ! সেই ইন্দ্রপ্রতিম নরেন্দ্র।

পলক ফেলতে পারছেন না ঠাকুর। যেন 'পলকের মাঝখানে অনন্ত বিরাজে।' কথা সরছে না মুখ দিয়ে। এরই নাম বোধ হয় ভাব। পরম প্রাপণীয়কে পেয়েও অপ্রবৃত্তি। অণুমাত্র প্রাণপবনস্পন্দেই যেন মহীয়ান স্বরূপানন্দ !

চলে গেলেন পাশ কাটিয়ে। গিরিশের ঠিক বাড়ির সমুখে আবার দেখা হল। তখন দিব্যি সহজ স্নিগ্ধ স্বরে বললেন, 'ভালো আছ তো বাবা ? আমি তখন কথা কইতে পারিনি।'

একজন একটা কুয়ো খুঁড়তে আরম্ভ করল। কিছুটা খোঁড়ার পর একজন এসে বললে, এখানে খুঁড়ে কোনো লাভ নেই। নিচে কেবল শুকনো বালির স্তূপ। লোকটা জায়গা বদলালো। খানিক দূর খুঁড়েছে, আরেকজন এসে বললে, কেন পণ্ডশ্রম করছ, এখানটায় বোদা জল। আবার পিছু সরল। তোমার সময় আর পয়সার কি দাম নেই ? নইলে এমন কাঁকুরে জায়গায় কি কেউ মাটি খোঁড়ে ? দক্ষিণে যাও, সেখানেই মিলবে তোমার মিষ্টি জলের ঝরনা। বললে আরেকজন। হায়, দক্ষিণে এসেও আবার প্রতিবন্ধ। কি করেছেন মশাই, উত্তর ছেড়ে কি কেউ দক্ষিণে আসে ?

কুয়ো খোঁড়া ভুয়ো হয়ে গেল।

কিন্তু নরেনের স্থানবদল নেই। দৃঢ় প্রত্যয়ই তার খননাস্ত্র। যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই খুঁড়ছে। হোক তা রুক্ষরুষ্ট, হোক তা প্রস্তরকঙ্করাকীর্ণ, সেখান থেকেই উদ্ধার করবে সে তৃষ্ণার পানীয়। জলও আমার মধ্যে, অস্ত্রও আমার হাতে—আমাকে আর পায় কে ! আমিই আত্মদীপ, আমিই জগদ্ভাতি সূর্য। গজেন্দ্র-বিক্রম আয়তবাহু মহাবীর। আকাশ পতিত, হিমাচল বিশীর্ণ, সমুদ্র শুষ্ক ও ভূমণ্ডল খণ্ড-খণ্ড হলেও উঠব না আমার ব্রতাসন থেকে। আত্মোদ্ধার করব, করব আত্মোদ্‌ঘাটন।

কিন্তু অবতার মানতে সে রাজী নয়। এদিকে গিরিশ অবতারবাদে নিদারুণ বিশ্বাসী। 'তোমরা দুজনে একটু এ নিয়ে বিচার করো না।' গিরিশের বাড়ি এসে বললেন ঠাকুর : 'একটু ইংরিজিতে তর্ক করো। আমি শুনি।'

বাঙলাতেই কথা হল, মাঝে-মাঝে ইংরেজির ছিটেগুলি।

'ঈশ্বর সকলের মধ্যেই আছেন।' বললে নরেন, 'শুধু একজনের মধ্যেই এসেছেন এ কখনো হতে পারে না।'

'আমারো সেই মত।' নরেনের কথায় সায় দিলেন ঠাকুর। 'তবে একটা কথা আছে। কোনো আধারে শক্তি বেশি কোনো আধারে শক্তি কম। কেউ গেড়ে পুষ্করিণী কেউ বা সায়র দীঘি। কেউ কুঁজো-কলসী কেউ বা জালা। যেখানে যত বেশি শক্তি সেখানে তত বেশি ভগবত্তা।'

গিরিশ নরেনকে লক্ষ্য করে বললে, 'তুমি কি করে জানলে তিনি দেহ ধারণ করে আসেন না?'

তিনি মনোবাক্যবুদ্ধির অগোচর। তিনি আবার একটা সীমাবদ্ধ জীব হবেন কি করে?'

হলে ভগবানের খুব ক্ষতি হয়ে যায়, তাই না? তাঁর পূর্ণতা; তাঁর অনন্ত শক্তিমত্তা, তাঁর সর্বজ্ঞতা, সর্বব্যাপিতা বাধিত হয়? কখনোই না। জীবের প্রতি অনুগ্রহই তাঁর শরীর গ্রহণের মুখ্য কারণ।

'অবতার না হলে কে বুঝিয়ে দেবে?' বললে গিরিশ: 'মানুষকে জ্ঞানভক্তি দেবার জন্যেই তাঁর দেহধারণ না হলে শিক্ষা দেবে কে?'

'কেন, অন্তরে থেকে বুঝিয়ে দেবেন।' নরেন হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

নরেনকে আবার সায় করলেন ঠাকুর। 'হ্যাঁ, নইলে তিনি অন্তর্যামী কেন?'

'তুমি তাঁর অচিন্ত্যশক্তির কি জানো?' এবার গিরিশ উঠল লাফিয়ে।

দুই সাধু বসে আছে গাছতলায়, সেখান দিয়ে নারদ চলেছেন বীণা বাজিয়ে। প্রভু, কোত্থেকে আসছেন, একজন জিগগেস করলে। বৈকুণ্ঠ থেকে আসছি। বৈকুণ্ঠ থেকে? ভগবান সেখানে এখন কি করছেন দেখে এলেন? নারদ বললে, ছুঁচের ছ্যাঁদার মধ্য দিয়ে হাতি-উট এধার-ওধার করছেন। তা আর তাঁর পক্ষে আশ্চর্য কি! তিনি সব করতে পারেন। বললে এক সাধু। অন্যজন বললে, গাঁজাখুরি! ছুঁচের ছ্যাঁদায় হাতি-উট গলানো স্রেফ আষাঢ়ে গল্প। নারদকে বললে, আপনি কোনো কালে বৈকুণ্ঠে যান নি মশাই।

তিনি সূর্য-চন্দ্র করতে পারবেন, সৃষ্টি-প্রলয় করতে পারবেন, শুধু একটা মানুষের ছদ্মবেশে ভূতলে অবতীর্ণ হতে পারবেন না! যেন ওটিই তাঁর হতে বারণ, আর যা তিনি হোন না করুন না। কিছু বাদ দিয়ে কিছু কেটে-ছেঁটে ছোট করে ঈশ্বরকে নেব কেন? তিনি যদি সব হতে পারেন অবতারও হতে পারবেন।

লেগে গেল তুমুল তর্ক।

শেষকালে ঠাকুর শান্তিবারি সেচন করলেন। বললেন, 'তিনি যদি দেখিয়ে দেন এর নাম অবতার, তিনি যদি তাঁর মানুষলীলা দেখিয়ে দেন তা হলে আর

কাউকে বুঝিয়ে দিতে হয় না। যেমন অন্ধকারের মধ্যে দেশলাই ঘষতে-ঘষতে দপ করে আলো হয়। সেই রকম দপ করে আলো যদি তিনি জেলে দেন তা হলে সব সন্দেহ মিটে যায়, তা নইলে নয়।'

'ও ভাই হরিপদ, একটা গাড়ি ডেকে আন।' বলে উঠল গিরিশ, 'আমাকে এক্ষুনি থিয়েটারে যেতে হবে।'

'সে কি, এত রাতে?'

'উপায় নেই। কর্মবন্ধন।' গিরিশের মুখে কাতরতা ফুটে উঠল। 'এদিকে আপনি এখানে বসে, আপনাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে থিয়েটার।'

ধিক্কার দেবার মতন ব্যাপার। কিন্তু ঠাকুর উদার প্রসন্নতায় বললেন, 'তা ঠিক আছে। এদিক-ওদিক দুদিক রাখতে হবে। জনক রাজার মত। এ-দিক ও-দিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি।'

'একেকবার মনে হয় থিয়েটারটা ছোঁড়াদেরই ছেড়ে দিই। ছুটি নিই ছোটোছুটি থেকে।'

'না, না, ও বেশ আছে।' ঠাকুর আবার অভয় দিলেন: 'লোকশিক্ষা হচ্ছে। অনেকের উপকার হচ্ছে!'

কিন্তু নরেনের সইল না। বিদ্রূপ করে উঠল। 'এদিকে বলছে ঈশ্বর, অবতার, আবার ওদিকে থিয়েটারে টানছে।'

'আমি কি করব, আমি পাপী, ঘোরতর পাপী—'

পাপী? এবার ঠাকুর উঠলেন হুঙ্কার দিয়ে। খবরদার, ও কথা মুখে আনবিনে। বারে-বারে পাপী-পাপী বললে পাপীই হয়ে যেতে হয়। বল আমি মায়ের ছেলে। মায়ের ছেলের আবার পাপ কি! সব ধুলো-কাদা মুছে যদি কোলে তুলে না নেবেন তবে আবার তিনি কেমন মা!

আমি পুরুষ। বীর্যস্বরূপের অনন্ত বীর্য আমার মধ্যে বর্তমান। আমি স্বস্বরূপবিশ্বাসী। আমি শৃগালের শিশু নই, আমি সিংহের কুমার। আমি অনন্ত শক্তির আধার, আমি দ্বিবাহু হয়েও বহুবাহু। বলো আমি দুর্বল নই, অধম নই, পাপী নই, দীন-হীন নই, আমি অকলুষ, আমি অপাপবিদ্ধ, আমি বিশ্বপ্রণেতা প্রজাপতির পুত্র। বারে-বারে এই মন্ত্র জপ করলেই ভগবৎশক্তি শত সর্পগর্জনে জেগে উঠবে। যে নিজেকে বলে ভীরু, কাপুরুষ, দাসত্বসেবী তার মুক্তি কোথায়? দৃঢ়ধন্বা অর্জুন হও, পারে তবে সেই যোগেশ্বর কৃষ্ণের বন্ধুতা। 'আঁজ ওই শুভ্র কোলের তরে, ব্যাকুল হৃদয় কেঁদে মরে, দিয়ো না গো দিয়ো না আর ধূলায় শুতে।' তোমার কোল যতই শুভ্র হোক, আর আমার সর্ব অঙ্গে

যতই মালিন্য থাক, তুমি আমার মা, আমি জানি, তুমি আমাকে কোলে তুলে নেবেই নেবে। তোমার কোলের জন্যে যখন আমার আকুলতা জেগেছে তখন নেই আর আমার মালিন্যদৈন্য নেই আর আমার ধূলিশয্যা।

হে অর্জুন, তুমি মন্মনা হও, তা যদি না পারো মদ্ভক্ত হও। তাও যদি না পারো নিষ্কাম কর্মে পূজাপরায়ণ হও। তাও যদি না পারো নমস্কার করো আমার সর্বপ্রকাশিত বিশ্বরূপ। তাও যদি না পারো সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে আমাতে শরণ নাও। হে সাগরপারলিপ্সু, আমি তোমাকে পার করিয়ে দেব। কিন্তু কি করে চিনব তোমাকে?

আপনজন বলে অনুভব করো, চিনতে দেরি হবে না। প্রভু যে বেশেই আসুক কুকুর তাকে ঠিক চিনতে পারে। মেষশিশুকে যে খোঁয়াড়েই আটকে রাখুক, প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনলেই সে উত্তর দেবে। ঠাকুর বললেন, 'যে হয় আপনজনা নয়নে তারে যায় গো চেনা।'

ঠাকুরের কাছে করজোড়ে বসেছে গিরিশ। বলছে, 'ভগবান, আমায় পবিত্রতা দাও। যাতে কখনো একটুও পাপচিন্তা না হয়।'

'তুমি পবিত্র তো আছ।' বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ। 'তোমার যে বিশ্বাস-ভক্তি। তোমার যে আনন্দ।'

'আনন্দ? আজ্ঞে না।' গিরিশ বললে কাতর স্বরে, 'মন বড় খারাপ। বড় অশান্তি। তাই তো ঠেসে মদ খেলুম।'

॥ ১৩৯ ॥

'এখানকার কথা মানতে হবে।' লাটুকে বললেন একদিন ঠাকুর।

'তবে এখানকার কথা বুঝিয়ে দিন।' লাটু বললে সরল মুখে।

তক্ষুনি গোপাল ঘোষের উদ্দেশে হাঁক পাড়লেন ঠাকুর: 'ওরে গোপাল, শোন লেটো কি বলে। বলে এখানকার কথা বুঝিয়ে দিন। এখানকার কথা কি বোঝানো যায়?' গোপালকে সাক্ষী মানলেন ঠাকুর: 'তুই বল না, বুঝিয়ে বলবার মত এখানকার কথা?'

কোথায় ঠাকুরের কথায় সায় দেবে, তা নয়, লাটুর দিকে ঘুরে দাঁড়াল গোপাল। বললে, 'সত্যিই তো। এখানকার কথা আপনি ছাড়া আর কে জানে। তাই দিন না বলে, হাটে দিন না হাঁড়ি ভেঙে।'

'এ তোমার কেমনতরো কথা। আমার দিকে না থেকে তুমি লেটোর দিকে গেলে। তুমিই বলো বিবেচনা করে এখানকার কথা কি জানিয়ে দিতে আছে?'

'এখানকার কথা জানবার জন্যেই তো আমরা সব এসেছি।' গোপাল বললে বিনত হয়ে, 'আমাদের না বললে আমরা জানব কি করে?'

হার মানলেন ঠাকুর। যিনি মধুদাতা তিনি আবার মধুপাতা। বললেন, 'এখন নয়, এখন নয়। এখানকার কথা এখন নয়। সময় হলে বুঝবে সবাই একদিন।'

জগদ্দলের গোপাল ঘোষ। সিঁথির বেণীমাধব পালের দোকান আছে চিনে-বাজারে, বুরুশ-ম্যাটিং-এর দোকান, সেখানে কাজ করে। বেণী পাল ব্রাহ্ম হলে কি হয়, ঠাকুরকে মাঝে-মাঝে নিয়ে আসে তার বাড়িতে। সেখানেই প্রথম দেখে ঠাকুরকে। প্রথম দর্শন যেন মর্ম পর্যন্ত পৌঁছল না। কিন্তু আরেকবার দেখ। সমগ্রলক্ষ্যবদ্ধ হয়ে দেখ। দেখ একবার প্রাণের চক্ষু উন্মীলন করে। গভীর হতে বিচ্ছুরিত যে আনন্দময় জ্যোতি সেই আলোতে চোখ মেলে দেখ এই প্রাণের মানুষকে। পুণ্যপরিপূর্ণ পাবনপুরুষকে। হৃদয়ের মধ্যে নাও সেই গভীরের সঞ্জীবন।

একদিন ঠাকুরের কাছে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে পড়ল গোপাল। বললে, 'অনেক দিন ধরে যাওয়া-আসা করছি আপনার কাছে, কই, একদিনও ভাবসমাধি হল না। আমার একদিন ভাবসমাধি করিয়ে দিন।'

'তুই ছোঁড়া তো ভারি বোকা।' ঠাকুর বললেন আশ্বাসের সুরে: 'ভাবছিস বুঝি ঐটেই হলেই সব হল! ঐটেই বুঝি সার বস্তু। শোন ঠিক ঠিক ত্যাগ ঠিক-ঠিক বিশ্বাস তার চেয়ে বড় জিনিস। তাকিয়ে ছাখদিকি নরেন্দরের দিকে। ও সব বড় একটা তার হয় না। কিন্তু ছাখ দেখি কি ত্যাগ, কি বিশ্বাস!'

আর ঠাকুরের যে ভাবসমাধি হয় তাকে শিবনাথ শাস্ত্রী হিষ্টিরিয়া বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে। একদিন সরাসরি ধরলেন তিনি শিবনাথকে। পেটেমুখে এক হতে হবে তাই লুকোছাপা করলেন না। বললেন, 'হ্যাঁ হে শিবনাথ, তুমি নাকি এগুলোকে রোগ বলো? আর বলো নাকি, আমি ও সময়টায় অচৈতন্য হয়ে যাই?' করুণামাখা হাসি হাসলেন ঠাকুর: 'তোমরা ইট-কাঠ-মাটি-টাকা এ সব জড় পদার্থে দিন-রাত মন রেখে ঠিক থাকলে, আর যাঁর চৈতন্যে জগৎ সংসার চৈতন্যময়, তাঁকে দিন-রাত ভেবে আমি অজ্ঞান অচৈতন্য হলুম! এ কোন দিশি বুদ্ধি তোমার?'

শিবনাথের মুখে কথা সরল না।

যে জিনিস ধুলো হয়ে যাবে তারই ধুলো ঝাড়ছি। যে কলসে ছিদ্রের অন্ত নেই তারই মধ্যে জল ভরবার দুশ্চেষ্টা করছি প্রাণপণে। ঘরকে কোথায় বড় করব,

তা নয়, জিনিস জমিয়ে-জমিয়ে ঘরের জায়গা মারছি। কণ্ঠাগত প্রাণে সঙ্কুচিত হয়ে নিশ্বাস ফেলবার কায়িক অভ্যাস পালন করছি মাত্র।

জিনিসে-জায়গায় ভরপুর কোথায় আমাদের সেই পরিপূর্ণতা? প্রারম্ভ থেকে পরিণাম পর্যন্ত কোথায় সেই নিত্যনিয়ত? অমৃত যাঁর ছায়া মৃত্যুও যাঁর ছায়া তিনি ছাড়া আর কোন দেবতাকে পূজো করব?

'তুমি অত নরেন্দর-নরেন্দর করো কেন?' নরেনই কিনা অভিযোগ করে। 'অত নরেন্দর-নরেন্দর করলে তোমায় যে নরেন্দরের মত হতে হবে। ভরত রাজা হরিণ ভাবতে-ভাবতে হরিণ হয়ে গিয়েছিল মনে নেই?'

বহু কাল রাজ্য ভোগ করে ছেলেদের মধ্যে তা ভাগ করে দিয়ে মহারাজ ভরত প্রব্রজ্যা নিলেন। এলেন পুলহাশ্রমে। আশ্রমের উত্তরে সরিদুত্তমা গণ্ডকী, সুরম্যসলিলা। নদীতীরে বসে একদিন প্রণব জপছেন ভরত, অদূরে সিংহগর্জন শুনতে পেলেন। একটি গর্ভিণী হরিণী জলপান করছিল, দেখলেন, আতঙ্কে নদী পার হয়ে গেল লাফ দিয়ে। গর্ভের শাবক জলে পড়ে ভেসে চলল। কারুণ্য-রসবশংবদ হয়ে রাজা হরিণশিশুকে তুলে আনলেন জল থেকে। মা'র খোঁজ করলেন, দেখলেন, নদীর পরপ্রান্তে এক গুহার মধ্যে মরে পড়ে আছে। তখন কি আর করা! হরিণ-শিশুর পালন পোষণ করতে লাগলেন, বৃক ও বাঘের থেকে রক্ষা করতে লাগলেন নিয়ত। শুধু তাই নয়, কখনো কোলে কখনো কাঁধে করে ফিরতে লাগলেন তাকে নিয়ে। শ্যামলঘন কোমল তৃণ আহরণ করে খাওয়ান তাকে হাতে করে, তার গা চুলকে দিয়ে তাকে যত না আরাম দেন নিজে তার চেয়ে শতগুণে বেশি তৃপ্তিলাভ করেন। ভোজনে-শয়নে ভ্রমণে-উপবেশনে ঐ মৃগশিশুই তাঁর সতত সঙ্গী। ভগবৎসেবায় আর আগ্রহ নেই, সমস্ত নিয়ম-নিষ্ঠা শিথিল হয়ে খসে পড়ল মাটিতে। মোহাচ্ছন্ন হয়ে মৃগতৃষ্ণায় কাল কাটাতে লাগলেন।

কিন্তু দুরন্ত কালকে এড়াবেন কি করে? তখনো সেই মৃগচিন্তা। মৃগচিন্তা করতে-করতেই শরীর ত্যাগ করলেন। পরজন্মে হরিণ হয়ে জন্ম নিলেন কাননে। কথা যখন শুরু হয়েছে, শেষটুকুও শোনো।

হরিণজন্ম নিলে কি হবে, স্মৃতিভ্রংশ হল না ভরতের। পূর্বার্জিত আসক্তির জন্যে অনুতাপ করতে লাগলেন। কি কষ্ট, সেই ঈশ্বরপথ, সেই বীরবর্ত্ম থেকে আমি বিচ্যুত হয়েছি। কাউকে কিছু না বলে চরতে-চরতে চলে এলেন সেই পুলহাশ্রমে। একা-একা ফিরতে লাগলেন, কারু সঙ্গ আশ্রয় করলেন না। কবে মৃগত্বের অবসান হবে তৃষ্ণাপরিপূর্ণ চোখে তারই প্রতীক্ষা করতে

লাগলেন।

সব আগুনই নেবে। জন্মজ্বালার আগুন ও নিবল একদিন। পবিত্র তীর্থসলিলে মৃগশরীর ত্যাগ করলেন ভরত।

তারপর ?

এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নিলেন। জাতিস্মর হয়ে জন্মেছেন, জানেন প্রাক্তন জন্মের বিষয়াসক্তির কথা, তাই জড় মূক ও বধিরের মত ব্যবহার করতে লাগলেন। বাপ অনেক চেষ্টা করল লেখাপড়া শেখাতে, ভস্মে ঘি ঢালা হল। বাপ মরলে মা-ও সহমৃতা হলেন। ভাইয়েরা দূর-ছাই করতে লাগল। খাটাতে লাগল চাকরের কাজে। বৃষের মত পুষ্ট কঠিন শরীর, মাঠে গিয়ে কাদা চটকে জমি পাট করুক। কিন্তু ক্ষেত্র সম কি বিষম এই জ্ঞানটুকু পর্যন্ত ওর নেই। কুৎসিত দগ্ধ অন্ন খেতে দাও ওকে। তাই ভরত খাচ্ছে অমৃততুল্য করে।

চৌররাজ ভদ্রকালীকে খুশি করবার জন্যে নরবলির আয়োজন করেছে। যূপ-কাষ্ঠে বেঁধে রেখেছে এক শিশুকে। কি কৌশলে কে জানে, বাঁধন খসিয়ে পালিয়ে গেল শিশু। খোঁজ খোঁজ, অনুচররা ছুটোছুটি করতে লাগল, বলি যোগাড় না হলে কারু ঘাড়ে আর মাথা থাকবে না। অন্ধকারে খুঁজতে-খুঁজতে মিলে গেল জড়ভরতকে। ঊর্ধ্বমুখ হয়ে খেত পাহারা দিচ্ছে। এই যে এই সুলক্ষণ বলি, এটাকেই দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে চলো চণ্ডিকার কাছে। তথাস্তু। স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরিয়ে মাল্যতিলকে অলঙ্কৃত করে কালীর সামনে বসালো তাকে অধোমুখে। জড়ভরতের মুখে একটা কথা নেই, কাকুতি নেই। কেই বা খড়্গ, কেই বা ঘাতক, কেই বা বলি, কেই বা যূপকাঠ।

তস্কর-পুরোহিত যেই খড়্গ তুলেছে, ভদ্রকালী প্রতিমা থেকে বেরিয়ে এলেন স্ব-মূর্তিতে। সেই উত্তোলিত খড়্গ কেড়ে নিয়ে একে-একে সকল ডাকাতের শিরশ্ছেদ করলেন। রক্ত পান করে অন্তর্হিত হলেন প্রতিমার মধ্যে।

যে ব্রহ্মর্ষি পরমহংস, তার সংহার নেই।

তারপর ?

আরো আছে। সেইটুকুই সার কথা।

সিন্ধু ও সৌবীর দেশের রাজার নাম রহূগণ। শিবিকা করে যাচ্ছেন, পথিমধ্যে একজন বাহকের দরকার হল। ইক্ষুমতী নদীতীরে মিলে গেল ভরতকে। বলীবর্দের মত ভারবহনে সমর্থ মনে হচ্ছে, এস, পালকিতে কাঁধ দাও। ধরে নিয়ে গিয়ে কাজে লাগিয়ে দিল। পাছে কোনো প্রাণিহিংসা হয় সে আশঙ্কায়

সতর্ক হয়ে সামনে কিছুটা দেখে-দেখে পথ চলে ভরত। তাই শিবিকার সমতা রক্ষা করে চলা কঠিন হয়ে পড়ল।

রহূগণ গর্জন করে উঠল। সমান হয়ে চলছ না কেন?

প্রধান বাহক বললে, আমরা ঠিক চলেছি। এই নবনিযুক্ত লোকটাই দ্রুত চলছে না। তাই শিবিকা বিষম হয়েছে।

রহূগণ শ্লেষ করে উঠল ভরতকে। তুমি কি শ্রান্ত? তুমি স্থূলও নও দৃঢ়াঙ্গও নও, তবে তুমি কি জরাগ্রস্ত?

ভরত কথা কইল না।

কিন্তু শিবিকা যেমন অসমান তেমনি।

তুমি কি জীবন্মৃত? রাজা আবার হুঙ্কার ছাড়ল। উপযুক্ত দণ্ড না পেলে তুমি প্রকৃতিস্থ হবে না দেখছি।

এতক্ষণে কথা কইল ভরত। বললে, রাজন, তুমি কাকে ভার বলো? কেই বা ভারবহনে শ্রান্ত হয়? কেই বা স্থূল বা দৃঢ়? জরাই বা কি? জীবন্মৃততাই বা কার? কেই বা দণ্ড দেয়, কেই বা পায়?

ভারবাহীর মুখে এ কি কথা! তাড়াতাড়ি শিবিকা থেকে নেমে এল রহূগণ। শিবিকাবাহক ভরতের পায়ের কাছে মাথা রেখে বললে, মহাত্মন, আপনি কে! কর্ম থেকে শ্রম হয়, বস্তুর ভার আছে, দেহের স্থূলতা-কৃশতা আছে ব্যবহারিক জগতে এই তো দেখছি চিরদিন। একে মিথ্যে বলি কি করে? কৃপা করে আমার সন্দেহের নিরসন করুন।

লৌকিক ব্যবহার নিত্যসত্য নয়। বললে জড়ভরত। এই প্রপঞ্চ ভগবানের মায়া, ভগবান ভিন্ন সমস্তই অবাস্তব।

ভগবানকে লাভ করব কি করে?

বেদাভ্যাস বা বৈদিক ক্রিয়া সূর্য-অগ্নির উপাসনা তপস্যা বা যাগযজ্ঞ—এ সব দ্বারা ভগবানকে লাভ করা দুরূহ। সে প্রাপ্তির একমাত্র মূল্য মহতের পদধূলি। মহতের পদধূলি কুড়োও আর সে মূল্যে কিনে নাও বাসুদেবকে।

সেই মহতের পদধূলি দিতে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

নরেনের কথায় খুব বিশ্বাস, তাই ভড়কে গেলেন ঠাকুর। তাঁর কথা চিন্তা করতে গেলে তার মত হয়ে যেতে হবে অথচ সে চিন্তা উচ্ছিন্ন করাও যাচ্ছে না। মা'র কাছে গিয়ে পড়লেন। মা বললেন, ওর কথা শুনিস কেন? ওর মধ্যে নারায়ণকে দেখতে পাস তাই ওর জন্যে এত আকুলি-ব্যাকুলি।

নরেনকে গিয়ে ধরলেন ঠাকুর। বললেন, 'তোর কথা আমি মানি না। মা

বলেছে তোর ভেতর নারায়ণ দেখি বলেই তোর উপরে টান। যেদিন তা দেখতে না পাব সেদিন তোর মুখও দেখব না রে শালা।'

সেই নরেন এসে আবার শক্ত হাতে ধরেছে ঠাকুরকে। বললে, 'কেমন আপনার মা এইবার দেখব। তাকে বলুন আপনার গলার ব্যথা সারিয়ে দিতে।'

'তোকে বলছি না যে মন সচ্চিদানন্দে অর্পণ করেছি, তা এই হাড়মাসের খাঁচার মধ্যে আনতে পারব না।'

'ও সব কথা শুনব না কিছুতেই। বলতেই হবে আপনাকে। সন্তানের ব্যথা হরণ করে না সে কেমন জননী!'

ঠাকুর কথা ক'ন না, আবিষ্টের মত তাকিয়ে থাকেন।

'আপনি বললে নিশ্চয় শুনবেন।' নরেন আবার তাড়া দিল: 'আপনি কিছু খেতে পাচ্ছেন না এই কষ্ট আর আমরা দেখতে পাচ্ছি না।'

'ওরে ও-সব কথা যে মুখ দিয়ে বেরোয় না।'

'আমাদের জন্যে বার করতেই হবে। শুনব না কিছুতেই।' নরেন দৃঢ়স্বরে বললে, 'যেখানে একটা মুখের কথা বললেই কষ্টের উপশম হয়, কেন আপনি বলবেন না? আপনার জন্যে বলতে বলছি না, আমাদের জন্যে বলুন, আমাদের কষ্টের লাঘবের জন্যে। যাতে অন্তত একটু খেতে পারেন তাই চেয়ে নিন। আপনি খেতে পাচ্ছেন না আর আমরা দাঁড়িয়ে-চাঁড়িয়ে তাই দেখছি, এ কষ্ট সহনাতীত।'

ঠাকুর উঠলেন। বললেন, 'দেখি। যখন বলছিস এত করে। দেখি, বলতে পারি কিনা।'

নরেনকে একদিন ঠাকুর পাঠিয়েছিলেন মা'র কাছে টাকাকড়ি চাকরিবাকরি চেয়ে নিতে। ফেরাফিরতি ঠাকুরকে আজ পাঠাচ্ছে নরেন, যাতে স্বচ্ছন্দে দুটি খেতে পারেন তার ক্ষমতার জন্যে।

মহাপ্রাণময়ী রাজরাজেশ্বরী বসে আছেন মন্দিরে। তয়া সর্বমিদং ততম্। সমস্ত পরিব্যাপ্ত করে বিরাজ করছেন। তোমার কাছে কী চাইব মা!

তুমি সৌম্যা, সৌম্যতরা, সৌম্যতমা। তুমি অতিবিস্তীর্ণকান্তি। পর ও অপর উভয়েরই আশ্রয়। তুমিই পরমেশ্বরী। তুমিই ধারণ করছ, পালন করছ, গ্রাস করছ। তুমিই সর্বগ্রাসিনী। আমি যে মুহূর্তে অমৃতায়মান হব আমাকে তুমি তোমার সুস্বাদু আহার্যরূপে গ্রহণ করবে, গ্রাস করবে। আমি মরে অমর হব। মৃত্যুর পক্ষ থেকে চলেছি সেই অমৃত-অঙ্কে, আর কী চাইবার আছে? সুখেও তুমি, অসুখেও তুমি, অশনেও তুমি, অনশনেও তুমি। তুমি 'সদসৎ' হয়েও

আবার 'তৎ পরং যৎ'।

আঙুল দিয়ে গলার ঘা ইঙ্গিত করলেন। বললেন, সরল শিশুর মত : 'মা, এইটের দরুন কিছু খেতে পারছি না। যাতে দুটো খেতে পারি তাই করে দে।'

মা বুঝি প্রার্থনা শুনলেন। উজ্জ্বলনয়নে হেসে কি যেন বললেন ঠাকুরের কানে-কানে।

মন্দির থেকে ফিরে চললেন ঠাকুর। নরেন ব্যস্তসমস্ত হয়ে এগিয়ে এল। 'কি, বললেন মাকে?' দীপ্তদ্রুত তীরের মতন তার প্রশ্ন।

'বললুম।'

'বললেন?' উৎসাহে প্রফুল্ল হয়ে উঠল নরেন। যখন বলেছেন, বলতে পেরেছেন, মুখ দিয়ে যখন বেরিয়েছে কথাটা তখন আর ভাবনা নেই। সুফল অনিবার্য।

'কি বললেন?'

'বললুম, কিছু খেতে পারছি না। যাতে দুটো খেতে পারি তাই করে দে।'

'শুনে মা কি বললেন?'

'তোদের সবাইকে দেখিয়ে দিলেন। বললেন, কেন, তোর একমুখ বন্ধ হয়েছে তো কি হয়েছে! তুই তো এদের শতমুখে খাচ্চিস। লজ্জায় আর কথাটি কইতে পারলুম না।'

নরেনের মাথাও হেঁট হল।

সে আর তার বন্ধুরা যে খাচ্ছে সেও ঠাকুরেরই খাওয়া। এক দরজা বন্ধ তো হাজার দরজা খোলা। এক তারা নিথর তো লক্ষ তারায় তাকিয়ে আছে মহারাত্রি। তুই যে খাচ্ছিস তাইতে আমিও খাচ্ছি। তোর যে সুখ সেইটেই আমার উপভোগ। তোর যে তুষ্টি, তোর যে তৃপ্তি তাইতেই আমার চরিতার্থতা।

'রাজন, এই সংসার এক গহন অটবী।' ভরত ফের বলল রহুগণকে। 'দেহী বণিক, বুদ্ধি নায়ক। নায়ক অসতর্ক হলে ছয় ইন্দ্রিয় ছয় দস্যুরূপে পুণ্যধন লুণ্ঠন করে নেয়। কখনো গহ্বরে এনে ফেলছে কখনো বা তুলছে শৈলশৃঙ্গে। তুমিও বিচরণ করছ এই মায়াকাননে। অসজ্জিত-আত্মা অর্থাৎ অনাসক্ত হও। কৃতভূতমৈত্র হও, অর্থাৎ সর্বজীবে বন্ধুতা করো। সকল জঞ্জালশৃঙ্খল জ্ঞান-খড়্গ দিয়ে ছিন্ন করো। ভবাটবী উত্তীর্ণ হয়ে যাও।'

দেহে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করল রহুগণ। বললে, 'মহৎকে নমস্কার, শিশুকে নমস্কার, বালককে নমস্কার, যুবককে নমস্কার। যে ব্রাহ্মণ অবধূতবেশে পৃথিবীতে বিচরণ করছে তাকে নমস্কার। তাদের সকলের অনুগ্রহে সকল রাজার কল্যাণ হোক।'

নিম-জল দিয়ে ঠাকুরের গলার ঘা পরিষ্কার করে দিচ্ছে গোপাল।

ভীষণ লাগছে। যন্ত্রণায় ঠাকুর আর্তধ্বনি করে উঠলেন।

ততোধিক যন্ত্রণা গোপালের। হাত গুটিয়ে নিল। বললে, 'তবে থাক, আর ধোয়াব না।'

সে আবার আরেক কষ্ট ঠাকুরের। তাঁর কষ্টে আর সকলে ব্যথা পাচ্ছে এ আবার দুঃসহ। বললেন, 'না-না তুমি ধুইয়ে দাও। এই দেখ আমার আর কোনো কষ্ট হচ্ছে না।'

দেহ থেকে মন উঠিয়ে নিলেন নিমেষে। গোপাল ধুয়ে দিতে লাগল। আর আর্তনাদ নেই, বিকৃতিচিহ্ন নেই, মুখমণ্ডলে অমোঘ-অনঘ প্রসন্নতা। অপ্রগল্‌ভ শান্তি।

'দুঃখ জানে শরীর জানে মন তুমি আনন্দে থাকো।' এই ঠাকুরের মূলমন্ত্র। এই যে কষ্টের ব্যাপারটা হচ্ছে এটা দুঃখ আর শরীরের মধ্যে বোঝাপড়া, 'হে মন, তুমি অসম্পৃক্ত, তুমি স্পর্শদোষশূন্য, তুমি থাকো অখণ্ডিত আনন্দে। ধূমের সঙ্গে কাঠের সঙ্গে সম্বন্ধ, হে অগ্নিশিখা, তুমি অব্যাহত, তুমি সংশ্লেষলেশহীন, তোমাকে কে ছোঁয়, কে তোমাকে মলিন করে!

তাঁতেই লেগে থাকো। দুঃখের পার আছে, সুখই অপার। শরীরের শেষ আছে মনই অফুরন্ত। মরুময়ী তামসী নিশাই মায়া, দিকদিগন্তের অধীশ্বর প্রদীপ্তশক্তি সূর্যই একমাত্র সত্য।

'একই সাধে সব সাধে, সব সাধে সব যায়!' এক সাধ করলেই সব সাধ পূর্ণ হয়, অনেক সাধ করলে একটি সাধও মেটে না। যদি বৃক্ষের মূলে জলসেচন করো বৃক্ষ পুষ্পফলব্যাপ্ত হবে; গোড়া ছেড়ে আর সর্বত্র জল ঢালো কোথায় তোমার বৃক্ষশোভা, কোথায় বা পুষ্পকান্তি। সব ছেড়ে সেই এককে ধরো, মূলকে ধরো, শাখা ছেড়ে শিকড়কে আশ্রয় করো। সেই তোমার সবেধন নীলমণি। তোমার একশ্চন্দ্রঃ।

গোপালের সেবাই ঠাকুর বেশি পছন্দ করেন। ওষুধও সে-ই খাইয়ে দেয়। 'সেই বুড়ো লোকটা কোথায়?' ওষুধ খাবার সময় হয়ে গেলেও গোপালের দেখা নেই দেখে ঠাকুর জিগগেস করলেন বিরক্ত হয়ে।

সকলের চেয়ে বয়সে বড়, এমন কি ঠাকুরের চেয়েও, তাই ঠাকুর তাকে বুড়ো গোপাল বলে ডাকেন। কখনো বা ডাকেন 'মুরুব্বি'।

খোঁজ, খোঁজ, কোথায় গেল, কোন কানাচে! একজন এসে বললে, 'ঘুমুচ্ছে।'

'আহা', স্নেহে ও সমবেদনায় ভরে উঠলেন ঠাকুর। 'কত রাত জেগেছে। এখন

ঘুমুচ্ছে, আহা, একটু ঘুমুক। তাকে আর জাগিও না।'

ভক্তের দাহেই তাঁর দাহ। তার উপশমেই তাঁর উপশম।

বুড়ো গোপাল একবার তীর্থে যেতে চেয়েছিল। ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'তোমার মন বুঝি এখন তীর্থ-তীর্থ করছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। বারে-বারেই ইচ্ছেটা আসে ঘুরে-ঘুরে।'

বহুদক আর কুটীচক। যে সাধু অনেক তীর্থভ্রমণ করে তার নাম বহুদক। আর যার ভ্রমণের সাধ মিটে গেছে, এক জায়গায় স্থির হয়ে আসন করে যে বসেছে, তাকে বলে কুটীচক।

'যখন হেথা-হেথা তখনই জ্ঞান।' বুড়ো গোপালের দিকে তাকালেন ঠাকুর। যা আছে নিকটেই আছে, এই মুহূর্তেই আছে, আছে আমার দক্ষিণ হাতের দৃঢ় মুষ্টিতে। কেন আর গ্রন্থি জটিল করছ, গ্রন্থির পাশেই রয়েছে উন্মোচনের উপায়। তাকিয়ে দেখ একবার চোখ মেলে, সূর্য-চন্দ্রের দিকে নয়, দূরে মেঘ-ছোঁয়া মন্দিরচূড়ার দিকে নয়, তোমার পাশে বসা এই সহজ সুন্দর মানুষটির দিকে, বহুপুষ্প-ফলোপেত কল্যাণবৃক্ষের দিকে।

'যা চাও তাই কাছে।' বললেন ঠাকুর স্মিতমুখে। 'অথচ লোকে নানা স্থানে ঘুরে মরে।'

যেখানে স্বয়ং ঠাকুর বর্তমান সেখানে আবার তীর্থ কি! যেখানে হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় সেখানে পথ বাড়াবার কি দরকার!

বলরাম বললে, 'তাই গুরু শিষ্যকে বলে চার ধাম করে এস। যখন একবার ঘুরে দেখে যে এখানেও যেমন সেখানেও তেমন, তখন আবার গুরুর কাছে ফিরে আসে।'

যাবে কোথায়! যে বিন্দুর থেকে যাত্রা সমাপ্তিসিন্ধুও যে সেইখানে।

শুধু চিনতে পারে না। কাচমূল্যে কাঞ্চন বিকোয়। কায়া ছেড়ে ছায়ার পিছনে ছোটে। নিজ পুত্র ও বালক মনে করে বসুদেবও চিনতে পারেনি শ্রীকৃষ্ণকে। নিকর্ষই অনাদরের হেতু। যেমন গঙ্গাতীরবাসী গঙ্গা ছেড়ে শুদ্ধির জন্যে অন্য তীর্থজলের সন্ধান করে। হাতের শাঁখা দেখতে দর্পণ খুঁজতে বেরোয়।

কিন্তু সাধুই আসল তীর্থ।

'জলময় সকল স্থানই তীর্থ নয়,' বললেন শ্রীকৃষ্ণ, 'মৃত্তিকা বা প্রস্তরময় সকল বস্তুই দেবতা নয়। তীর্থ আর দেবতা পবিত্র করে বহু কাল পরে কিন্তু সাধু পবিত্র করে দর্শনমাত্র।'

সমুদ্র অসীম, গভীর-গম্ভীর, কিন্তু গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর যে মাধুর্য তা সমুদ্রে

কোথায় ? ব্রহ্মের চেয়েও সাধু সরস।

দধিমন্থন করছে যশোদা, কৃষ্ণ এসে দণ্ড ধরে বাধা দিল। কোলে তুলে স্তন্যপান করাচ্ছেন, দেখলেন উনুনে দুধ উথলে পড়ছে। অতৃপ্ত শিশুকে জোর করে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে যশোদা ছুটে গেল দুধ নামাতে। এসে দেখল ক্রুদ্ধ শিশু শিলাখণ্ড দিয়ে দধিমন্থনের ভাণ্ডটি চূর্ণ করেছে। শুধু তাই নয়, ঘরে ঢুকে ননী চুরি করে এনে নিজে খাচ্ছে, বানরদের খাওয়াচ্ছে।

লাঠি নিয়ে ছেলেকে তাড়া করল যশোদা। মাকে মারমুখো দেখে কৃষ্ণ ছুট দিলে। যশোদাও পিছু নিল। যোগীদের তপঃপ্রেরিত মন যার মধ্যে প্রবেশ করতে অসমর্থ, চেয়ে দেখ তারই পিছনে কিনা ছুটছে। কিন্তু শিশু তো, কত আর ছুটবে, ধরা পড়ল। মারবার জন্যে লাঠি তুলল যশোদা, কিন্তু দেখল ছেলের মুখ ভয়ে পাংশু হয়ে গিয়েছে। তখন মায়া হল। লাঠি ফেলে দিয়ে দড়ি কুড়িয়ে নিলে। দড়ি দিয়ে উদূখলের সঙ্গে বাঁধল কৃষ্ণকে। যার অন্তর-বাহির পূর্ব-পর কিছু নেই, যে নিজেই অন্তর-বাহির পূর্ব-পর তারই কি না রজ্জুবন্ধন!

কিন্তু কি আশ্চর্য, দড়িতে কুলোচ্ছে না, বারে-বারেই দু আঙুল ছোট হয়ে যাচ্ছে। বাড়তি দড়ি জুটলো গিঁট দিয়ে, তবু দু আঙুল কম। সবাই অবাক মানল। এ কি অঘটন, এ কি অতিমানুষী বিভূতি! কিন্তু যশোদা ছাড়বার পাত্র নয়। আরো দড়ি জুড়লে। পরিশ্রমে ক্লান্ত ঘর্মাক্ত হয়েছে, কবরী ও মাল্য বিস্রস্ত হয়ে পড়েছে, তবু নিবৃত্তি নেই। যে করে হোক তোকে বাঁধবই বাঁধব।

তখন কৃষ্ণ মাকে কৃপা করলেন। খিন্নগাত্রা বিস্রস্তকেশা দেখে নিজেই ইচ্ছে করে বাঁধা পড়লেন। বিশ্ব যাঁর বশ তিনি ভক্তের ও বশ। ভক্তিমানদের পক্ষেই তিনি সুখলভ্য।

॥ ১৪০ ॥

বাগবাজারের চুনীলাল বোস সাধু দেখবার জন্যে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়। অন্তত একবার গঙ্গার ধারটা ঘুরে আসে। জটাভস্ম দেখলেই সঙ্গ নেয়। কোন জটায় জলধারা আছে, কোন ভস্মে বা স্বর্ণখণ্ড তা কে জানে! কিন্তু যত জটা দেখে সব কেশভার যত ভস্ম দেখে সব দগ্ধাবশেষ।

কে একজন বললে, যদি সত্যিকার সাধু দেখতে চাও রাসমণির কালীবাড়িতে যাও।

সে আবার কোথায় ?

শুধু ঠিকানা জানলেই চলবে না, পথও জানা চাই। তারার অক্ষরে ঠিকানা তো লেখা আছে কিন্তু পথ কই অন্ধকারে ?

আহিরীটোলা থেকে নৌকো পাবে জোয়ারের সময়। দক্ষিণেশ্বরের উত্তরের ঘাটে নামবে। ভাড়া পাঁচ পয়সা।

তবু কি তক্ষুনি-তক্ষুনি যাওয়া যায় ? ঘাট থেকে কত নৌকো ছাড়ে, কত জোয়ারের নিমন্ত্রণ আসে তবু সময় হয় না। কি করে হবে ? তুমি যখন ডাকবে তখনই তো সময়। তার আগে আর লগ্ন নেই।

কত দিন পরে এল সেই শুভযোগ। আপিসের ছুটি, দুপুরের জোয়ার, মনিব্যাগে পাঁচটি পয়সা এবং সর্বোপরি মন। মন যদি দূরে থাকে কান শোনে না হাজার ডাকে।

ঘাটে নেমেই এক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা। যেমন সাধারণ লোকের প্রার্থনা তাই আন্দাজ করে ব্রহ্মচারী জিগগেস করলে, 'কি, ওষুধ চাই ?'

'না। পরমহংসদেবের দর্শন চাই।'

'ঐ আছেন কোণের ঘরে। কিন্তু তাঁর কাছে কি ?'

'কিছু নয়। শুধু দর্শন।'

ঠাকুরের ঘরে উত্তরের দিকে একখানি বেঞ্চি, তাতে গুটিসুটি বসল এসে চুনীলাল। ঠাকুর তাকে আপনজনের মত প্রশ্ন করতে লাগলেন। কোথায় থাকে, কি কাজ করে, কত মাইনে, কে-কে আছে তার সংসারে, এই সব ঘরোয়া কথা। প্রেমভক্তি বিবেক-বৈরাগ্যের কথা নয়, সর্বদুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি যে ঈশ্বরে সে ঈশ্বরকথা নয়। অথচ একটুও ফাঁকা-ফাঁকা লাগল না, মনে হল না আসার কথা। সব যেন এক নিমেষে সরল করে দিলেন, লঘু করে দিলেন। আপনজন কি আর মুখের কথায় হওয়া যায় ? আমার আপনজন হবেন অথচ আমার খুঁটিনাটি সব জানবেন না, তা কি হতে পারে ? মুখের কথায় যখন মনের মধু এসে মেশে তখনই তো আপনজন।

চুনীলালের মনে হল, এই তো ভূভারভঞ্জন সর্বলোকসুখাবহ বন্ধু। অজ্ঞান-সঙ্কটে পরজ্যোতি।

যাবার সময় মিছরি প্রসাদ দিয়ে দিলেন। বললেন, আবার এসো।

বৈরাগ্য এল চুনীলালের মনে। এক মাসের ছুটি চেয়ে দরখাস্ত পাঠাল আপিসে। বাড়ি থেকে সটকান দিলে। কাশী-বৃন্দাবন করলে কদিন, পরে হরিদ্বার-হৃষীকেশ। কিন্তু হৃষীকেশ হৃদিস্থিত না হওয়া পর্যন্ত শান্তি কই ? মর্কট-বৈরাগ্যের অবসান হল, ফিরে এল কলকাতা।

এসে দেখল চাকরিটি গেছে। মিউনিসিপ্যাল আফিসে কাজ করে, যত সামান্যই হোক তাইতেই তো সংসারের পালন-পোষণ। বৈরাগ্য গেছে যাক, চাকরিটি যায় কেন?

ধরাধরি করে চাকরিতে ফের বহাল হল চুনীলাল। এবার তোমার পদপ্রান্তে বহাল করো।

বলরামের বাড়ির লাগোয়া পশ্চিমেই চুনীলালের বাসা। ঠাকুর বলে দিলেন বলরামকে, যেন চুনীলালকে নিয়ে আসে মাঝে-মাঝে। শুধু চুনীলাল কেন, যত ভক্ত যোগাড় করতে পারে, সবাইকে নৌকো করে নিয়ে আসে বলরাম। অন্ত দিন না হোক অন্তত রবিবার। কত গরিব লোক আছে, দশটি পয়সা যোগাড় করাও যাদের কষ্ট, বলরাম তাদের এপারের কাণ্ডারী। ওপারের কর্ণধারের কাছেই নিয়ে যাচ্ছি তোমাদের।

চুনীলালকে পাড়ার লোকে বলে বড়লোকের পেটোয়া, যেহেতু ঠাকুরের ইঙ্গিতে সে বলরামের নৌকার সোয়ারী। লোক না পোক! লোকের কথায় আমি কি এই সরলপথপরায়ণ ধর্ম থেকে বিচ্যুত হব?

তবু, কে জানে কেন, যোগাভ্যাসের দিকে মন গেল চুনীলালের। পুঁটে সিদ্ধেশ্বরীর ঘরে বসে আসন-প্রাণায়াম করতে লাগল। লাভের মধ্যে হল এই, হাঁপানি শুরু হয়ে গেল। কাজ কামাই, ঠাকুরের কাছে যাওয়া বন্ধ। টানটা কম পড়তে একদিন এসেছে দক্ষিণেশ্বর, ঠাকুর তাকে বকে উঠলেন, 'তোমাদের ও-সব কেন? তোমরা গৃহী, ও-সব যোগ-টোগ তোমাদের জন্যে নয়। তোমাদের শুধু বিশ্বাসভক্তি। ফেরবার সময় গোপাল ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে তিন মাত্রা ওষুধ নিয়ে যেও। দেখো, ও-সব কাজ আর কোরো না।'

কি করে জানলেন তার যোগের কথা, তার রোগের কথা?

আর, কি আশ্চর্য, তিন মাত্রা ওষুধ খেয়েই তার অসুখ সেরে গেল!

"জরে আর দশমূল পাচন চলবে না এ যুগে', বললেন ঠাকুর, 'এখন ফিভার মিকশ্চার।'

যোগ-প্রাণায়াম নয়, এ যুগে শুধু নারদীয় ভক্তি। অকারণের অবারণের ভালোবাসা।

বড় সাধ চুনীলালের—ঠাকুরের কিছু সেবা করে। কিন্তু বড় গরিব, কিছু ভোগরাগ করার সামর্থ্য নেই। মনের ফুল তুমি নিচ্ছ তা জানি কিন্তু তোমাকে যে বনের ফুলও দিতে ইচ্ছা করে। শুধু ভাব নয় কিছু একটা দ্রব্য দিতে ইচ্ছা করে। দেখতে ইচ্ছা করে তোমার মুখে আত্মভোলা শিশুর আহ্লাদ।

মাস্টারমশায়ের কাছে ঠাকুর একটা টুল চেয়েছিলেন, সেদিন চুনীলাল সেখানে ছিল। ঠাকুর বললেন, 'একটা টুল কিনে আনবে এখানকার জন্যে। কত নেবে?'

'দু-তিন টাকার মধ্যে।' বললে মাস্টার।

'এত? একটা জলচৌকির দাম যদি বারো আনা, তবে অত হবে কেন?'

'না, না, বেশি হবে না।' মাস্টার চাপা দিতে চাইল কথাটা।

মাস্টারের কাছে চেয়েছেন, চুনীলাল কি করে কেনে? তা ছাড়া দু-তিন টাকা খরচ করবার মত তো তার সঙ্গতি নেই।

ঠাকুর বুঝলেন ভক্তের মনের ব্যথা। বললেন, 'ধাতু-পাত্রে তো জল খেতে পারি না। তুমি এখানকার জন্যে একটা কাচের গ্লাস এনে দিও।'

কৃতার্থ হল চুনীলাল। কৃতকৃতার্থ। মনের ব্যথাটুকুই শুধু জানবে, হরণ-পূরণের কোনো ব্যবস্থা করবে না? তুমি তবে কেমনতরো আত্মজন?

প্রণবোচ্চারণে অধিকার নেই চুনীলালের, এ আরেক দুঃখ। তাও ঠাকুর জল করে দিলেন। বললেন, 'প্রণবে কি দরকার? ভগবানের যে কোনো একটা নাম ধরো, তাই জপ করো, উচ্চারণ করো।'

এই তো সরলপথপরায়ণ ধর্ম। এই তো ক্রান্তদর্শন। এই তো বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি। ঈশ্বরের হাত নেই, কিন্তু সমস্ত কিছু রচনা করেন, গ্রহণ করেন। পা নেই কিন্তু সর্বব্যাপক বলে সমধিক বেগবান। চোখ নেই তাই দেখেন অনিমেষে, কান নেই তাই শোনেন অনিরুদ্ধ। অন্তঃকরণ নেই তবু সমস্ত জগৎকে হৃদয়ঙ্গম করেন। অথচ তাঁকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে এমন কারও সাধ্য নেই। সনাতন সর্বোত্তম ও সর্বত্রপূর্ণ বলে তিনি পুরুষ। এবং পরমপুরুষ।

'যখন যেরূপ লোক আসবে আগে দেখিয়ে দিত।' মাস্টারকে বলছেন ঠাকুর, 'এই চোখে, ভাবে নয়, দেখলাম চৈতন্যদেবের সঙ্কীর্তন বটতলা থেকে বকুলতলার দিকে যাচ্ছে। তাতে বলরামকে দেখলাম, যেন তোমাকেও দেখলাম। আর চুনীলাল এখানে আনাগোনা করছে, তুমি করছ, তাতে উদ্দীপন হয়েছে।'

উদ্দীপিত করতে পারছে ঠাকুরকে এমন লোক চুনীলাল।

'আচ্ছা এ অসুখটা কত দিনে সারবে বলতে পারো?' কাশীপুরের বাড়িতে এসে জিগগেস করলেন একদিন।

'তা একটু সময় নেবে।' যেন প্রবোধ দিল মাস্টার।

'কত?' নিরীহ শিশুর মত তাকালেন ঠাকুর।

'এই পাঁচ-ছ মাস।'

'বলো কি?' অধীর হয়ে আকুলকণ্ঠে কেঁদে উঠলেন। 'এত ঈশ্বরীয় রূপদর্শন এত ভাবসমাধি, তবে আবার এই অসুখ কেন?'

'উদ্দেশ্য আছে নিশ্চয়ই।'

'কি বলো তো?' ঠাকুরের চোখে প্রশান্তির প্রসন্নদীপ্তি ফুটে উঠল।

'একটা শুধু বলতে পারি, আপনি সাকার থেকে নিরাকারে যাচ্ছেন। বিদ্যার "আমি" পর্যন্ত থাকছে না। লোকশিক্ষা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।'

'ঠিক বলেছ। কাকে আর কি বলব। সব রামময় দেখছি। কিন্তু দেখ না এই বড় বাড়িটা ভাড়া হয়েছে বলে কত লোক আসছে। শুধু কথা শুনতে চায়।' হাসলেন ঠাকুর। 'আমি কি কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বা শশধরের মত সাইনবোর্ড দিয়ে বসেছি যে অমুক সময় লেকচার হবে?'

সেই বাগবিন্যাসবিশারদ পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন। যে বলি-হস্তীর পদমর্দনে ধর্ম নিঃশেষপ্রায় হতে চলেছে সেই প্রমত্ত মাতঙ্গমথনের অঙ্কুশস্বরূপ হয়ে সে আবির্ভূত হয়েছে। মোহনিদ্রাতুর দেশের জাগ্রত চৈতন্য।

'আচ্ছা মশাই আপনি গেরুয়া পরেন কেন?' কৃষ্ণানন্দ স্বামীকে জিগগেস করলেন একজন।

'শ্রীমদ্ভবধূত গুরুপ্রসাদাৎ।'

'বাইরের রঙের চেয়ে ভিতরের রঙ কি ভালো নয়?'

'না। বাইরে রঙ করুন আর না করুন, ভিতর একেবারে শাদা রাখতে হবে। যদি ভিতরে রঙ লেগে যায় তাকে বৈরাগ্যের জলে ধুয়ে ফেলাই ভালো।'

'এ মলিন পোশাক পরে বাইরে ঘুরে বেড়াতে আপনার লজ্জা করে না?'

হাসল কৃষ্ণানন্দ। 'এ যে অযাচকের পরিচ্ছদ। যাচঞাহীন ব্যক্তি নির্ভীক, ভুজবীর্যসম্পন্ন, আনন্দময়।'

'কিন্তু আপনি তো দান সংগ্রহ করেন শুনছি।'

'সে আমার নিজের জন্যে নয়, ভারতের হিতের জন্যে। এখানে স্বয়ং ভারতই যাচক, ভারতই দাতা।'

'কিছু সুবিধে আছে গৈরিক পরে?'

'যখন শাদা কাপড় পরতাম তখন আমার জামা লাগত, জুতো লাগত, না হলে পরিপূর্ণ হত না। এখন গৈরিক বস্ত্রখণ্ড একাই স্বসম্পূর্ণ। জুতো জামার দরকার হয় না। মাত্র কৌপীন পরলেই মনে হয় পূর্ণ পরিচ্ছদ পরে আছি।'

'শুধু এইটুকু লাভ?'

'না আরো আছে। আগের দিনে ঋষি ও ব্রহ্মচারীরা যাঁরা গহন বনে বা গিরিগুহায় থাকতেন তাঁরা গিরিমাটিতে বসন রাঙিয়ে নিতেন। গায়ে মাটি মাখলে কি হয় জানো বোধ হয়? শরীর থেকে যে তৈজসপদার্থ নিত্য বেরিয়ে যাচ্ছে তা নিরুদ্ধ হয়ে যায়। তাতে শরীরের ওজোগুণ বাড়ে, আত্মাতে সমাধি করবার শক্তি বাড়ে। গৈরিক বসন পরলে সেই গিরিমৃত্তিকার স্পর্শে সাধনার্থীর দেহ বলশালী হয়ে ওঠে। সুতরাং গেরুয়া সাজের জন্যে নয় কাজের জন্যে।'

সেই কৃষ্ণপ্রসন্ন বা কৃষ্ণানন্দ স্বামী ঠাকুরকে দেখতে এসেছে। তার পর লিখছে তার কাগজে 'ধর্মপ্রচারকে' :

'ইনি গৈরিক কৌপীনধারী নহেন, ইহার মস্তক মুণ্ডিত নহে, তথাচ ইহাকে কেন লোকে পরমহংস বলিয়া বুঝিয়াছেন? ইনি পরিচ্ছদে পরমহংস নহেন, কিন্তু কার্য্যে পরমহংস। আশ্চর্য্য ইহার ভাব, আশ্চর্য্য ইহার প্রকৃতি, যদি কেহ তাঁহার নিকটে ভগবানের গুণগান করেন তাহা হইলে দেখিতে দেখিতে তাঁহার সংজ্ঞার বিলোপ হইয়া যায়। শরীর নিস্পন্দ, শ্বাস বন্ধ, ধমনীতে রক্তচলাচলশক্তি রুদ্ধ হইয়া যায়। আবার তাঁহার কর্ণে ঘন ঘন প্রণবধ্বনি শুনাইলে পুনশ্চেতনা লাভ হইয়া থাকে। তাঁহার কথাগুলি এত সরল এত মধুর ও এত হৃদয়গ্রাহী যে তৎ-শ্রবণে পাষাণ হৃদয়েও ভক্তির বেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে। তিনি সাধনা দ্বারা কামিনীকাঞ্চনকে বস্তুতঃই কায়েন-মনসা-বাচা পরিত্যাগ করিয়াছেন এতদ্বয় তাঁহার শরীরের সহিত সংসৃষ্ট হইলে তাঁহার হস্তপদাদি বাঁকিয়া যায়, শরীর সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ে। এমন কি যদি কোনো পাপগামী অপরিচিত পুরুষ তাঁহাকে দৈবাৎ স্পর্শ করে তবে তাঁহার শরীরের মধ্যে একটি আশ্চর্য্য সংবেগ উদয় হয়, এবং ইহা দ্বারা তাহার দূষিত প্রকৃতি অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারেন। তাঁহার প্রকৃতি এত উদার ও সরল যে তাঁহাকে কেহই কখনও শত্রু বলিয়া ভাবিতে অবকাশ পায় না। বস্তুতঃ তিনি অজাতশত্রু, তাঁহার নিকট কিয়ৎক্ষণ বসিলে কথায় কথায় এত উচ্চ ও হৃদয়ভেদী উপদেশ পাওয়া যায় যে, বহুদিন শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াও তত্তাবৎ সহজে লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার জীবন একখানি জীবন্তগ্রন্থ বিশেষ, কল্যাণপ্রার্থী মাত্রেরই অধ্যয়নের উপযোগী। তাঁহার সংস্রবে ও তাঁহার উপদেশশুণে অনেক অবিশ্বাসী নাস্তিকের চিত্তও বিগলিত হইয়াছে।...'

সেই সব কথাই হৃৎকর্ণরসায়ন কথা। সেই সব কথা শ্রবণই অবিদ্যা নিবৃত্তির পথ, শুদ্ধা রতিভক্তি সংক্রমণের পথ। একমনসোবৃত্তি স্বাভাবিকী যে ভক্তি,

যে ভক্তি অনিমিত্তা তা সিদ্ধির থেকে মুক্তির থেকেও গরীয়সী।

যারা আমার পদসেবাপরায়ণ, বললেন শ্রীহরি, তারা আমার সঙ্গে একাত্মতাও ইচ্ছা করে না।

দেখ দেখ আমার রুচির প্রসন্ন মুখ, আমার অরুণলোচন, আমার দিব্যতরঙ্গ-শোভা আর ইচ্ছামত বাক্যালাপ করো আমার সঙ্গে।

'দেখলাম সাকার থেকে সব নিরাকারে যাচ্ছে।' মাস্টারকে বললেন ঠাকুর, 'আর আর কত কথা বলতে ইচ্ছে যাচ্ছে, কিন্তু পারছি না।'

তুমি যদি না কও আমরা কইব।

আমরা কইব আর তুমি শুনবে।

তোমার নাম যার জিহ্বাগ্রে, সেই কপিলজননী দেবহূতি স্তব করেছিল ভগবানের, সে চণ্ডাল হলেও শ্রেষ্ঠ।

আর যারা তোমার নাম উচ্চারণ করে তারাই প্রকৃত তাপস। তারাই ঠিক-ঠিক হোম ও তীর্থস্নান করেছে। তারাই যথার্থ সদাচারী, তাদেরই সার্থক বেদাধ্যয়ন।

॥ ১৪১ ॥

দক্ষিণেশ্বরের ঝাউতলায় হনুমানের পাল চুপ করে বসে আছে। যেন কত ভালোমানুষ। যেন সর্ববিষয়ে বীতরাগ। কিন্তু আসল মতলবখানা হচ্ছে, কোন গৃহস্থের চালে-বাগানে হুপ করে লাফিয়ে পড়বে। চালে হয়তো ফলে আছে লাউ-কুমড়ো, বাগানে হয়তো কলা-বেগুন। এই মর্কট-ধ্যান, মর্কট-বৈরাগ্য দিয়ে কি হবে? কেশব সেনকে একদিন বলেওছিলেন ঠাকুর: 'তোমাদের ওখানে অনেকের ধ্যান দেখলাম সেই হনুমানের ধ্যানের মত।'

তন্ময় হয়ে যাও, তদেকান্তচিত্ত হও। আবেশেই তো আছ সারাক্ষণ। হয় ধনের আবেশ, নয় মানের আবেশ, নয়তো গূঢ়চর কামনার আবেশ। এবার নতুন আবেশে চলে এস, ঈশ্বর-আবেশে। কালকূটকুম্ভ আলোড়ন করে বারে-বারে পান করেছ, মেটেনি তৃষ্ণা, এবার ঈশ্বর-সরোবরে অবগাহন কর। তোমার চিত্ততল আবৃত করেই সেই অমৃতের পয়োধি।

'আচ্ছা' ধ্যানের কি নিয়ম? কোথায় ধ্যান করব?' জিগগেস করল মণি মল্লিক।

'কেন, হৃদয়ে।' মুখের উপর জবাব দিলেন ঠাকুর। 'হৃদয়ই ডঙ্কাপেটা জায়গা। নয়তো সহস্রারে। এ-সব বৈধী ধ্যান। নিরাকার ধ্যান বড় কঠিন। তাকে

বলে শিবযোগ। ধ্যানের সময় দৃষ্টি রাখতে হয় কপালে। জগৎ ছেড়ে স্ব-স্বরূপ চিন্তা।'

'আর সাকার ধ্যান?'

'তাকে বলে বিষ্ণুযোগ। দৃষ্টি নাসাগ্রে। অর্ধেক জগতে অর্ধেক অন্তরে।' একটু কি দুরূহ লাগছে?

ঠাকুর হাসলেন। জল করে দিলেন। বললেন, 'ও সব শাস্ত্রবিধি। যাদের রাগভক্তি হয়েছে, যেখানে খুশি সেখানেই তারা ধ্যান করতে পারে। সব স্থানই তো তাঁর, কোথায় তিনি নেই? গঙ্গা যেমন পবিত্র তেমনি অগঙ্গাও পবিত্র। বলির কাছে এসে যখন তিন পায়ে নারায়ণ স্বর্গ মর্ত পাতাল ঢাকলেন, তখন কি আর কোনো জায়গা বাকি ছিল?'

'পাগল হও, ঈশ্বরের প্রেমে পাগল হও।' ঈশান মুখুজ্জেকে বলছেন ঠাকুর, 'লোকে না হয় জাহুক ঈশান এখন পাগল হয়েছে। কোশাকুশি ছুঁড়ে ফেলে দাও, ঈশান নাম সার্থক করো।'

পাগল নয় কে! কেউ কামের জন্যে পাগল, কেউ নামের জন্যে। কেউ পদের জন্যে কেউ সম্পদের জন্যে। কয়েকজন না হয় ঈশ্বরের জন্যে পাগল হল! আর সব পাগলদের মধ্যে হানাহানি মারামারি, কিন্তু আমিও ভক্ত তুমিও ভক্ত, জলে জলাকার।

ঈশানের দুর্জয় বিশ্বাস। বলে, 'একবার যখন দুর্গানাম করে বেরিয়েছি, আর আমার ভয় কি! শূলহস্তে শূলপাণি আমার সঙ্গে আছে।'

'তোমার খুব বিশ্বাস।' বললেন ঠাকুর। 'আমাদের কিন্তু অত নেই।' সকলে হেসে উঠল।

'কি বলো, শুধু বিশ্বাস থাকলেই হয়?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

আগুনের সঙ্গে বায়ুর যেমন প্রীতি, তেমনি বিশ্বাসের সঙ্গে ব্যাকুলতার। শিশুর বিশ্বাস আর মায়ের ব্যাকুলতা।

'অহঙ্কারের দরুনই আমাদের বিশ্বাস কম।' বললে ঈশান। 'কাক ভুষণ্ডীও প্রথমে মানেনি রামচন্দ্রকে। সপ্তলোক বেড়িয়ে এসে দেখলে কিছুতেই নিস্তার নেই রামের থেকে। তখন নিজে ধরা দিল। রামের শরণাগত হল।'

শরণাগতি তো বীর্যহীনের নিষ্ক্রিয়তা নয়, শরণাগতি হচ্ছে এগিয়ে গিয়ে ধরা। রোক করে জোর করে ধরা। যে এগিয়ে গিয়ে ধরে সেই তো পুরুষপ্রবীর।

'তুমি খোশামুদের কথায় ভুলো না।' ঠাকুর সাবধান করে দিলেন ঈশানকে।

'বিষয়ী লোক দেখলেই পিছু নেয়। যেমন মরা গরু দেখলেই শকুনি এসে ভিড় করে। আর, বিষয়ী লোকদের কথা বোলো না। কোনো পদার্থ নেই। যেন গোবরের ঝোড়া।'

খুব সালিশি-মোড়লি করে ঈশান, তাকে সবাই মানে-গোণে। পাঁচটা লোকের যদি উপকার হয় তারই সে সুযোগ খুঁজে বেড়ায়।

'তোমার ও ভাবনায় কাজ কি? ও সবের জন্যে অন্য থাকের লোক আছে। তোমার এখন সময় হয়েছে, তুমি ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন দাও। লঙ্কায় রাবণ মরে তো মরুক, বেহুলা কেন কেঁদে আকুল হবে?'

ঘোড়ার গাড়ি করে ঠাকুর যাচ্ছেন ঈশানের বাড়ি। বাবুরাম আর মাস্টারমশাইও চলেছে। শীতকাল। ঠাকুরের গায়ের বনাত, বনাতের কান-ঢাকা টুপি আর মশলার থলে নিয়েছে সঙ্গে করে।

বৈঠকখানায় ঈশানের ছেলে শ্রীশের সঙ্গে দেখা। এণ্ট্রান্স ও এফ-এ-তে প্রথম হয়েছে। এখন এম-এ আর ল পাশ করে ওকালতি করছে আলিপুরে। বিদ্বান অথচ বিনয়ের প্রতিমূর্তি। দেখলে মনে হবে সংসারে আর সব জ্ঞানী-গুণীর কাছে সে-ই একমাত্র অজ্ঞ।

'তুমি কি করো গা?'

'আজ্ঞে, আমি আলিপুরে বেরুচ্ছি। ওকালতি করি।'

'বলে কি গো?' মাস্টারের দিকে তাকালেন ঠাকুর। 'এমন লোকের ওকালতি?' শেষে বললেন, 'হাজার লেখাপড়া শেখ, ঈশ্বরে ভক্তি না থাকলে, তাঁকে পাবার ইচ্ছা না থাকলে সব মিছে।'

শ্রীশের কটা প্রশ্ন আছে।

কর্মভার কমবে কিসে?

ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হতে-হতে। যতই এগোবে ততই লঘু হবে, মুক্ত হবে। যে বস্ত্রখণ্ড দিয়ে পুঁটলি বেঁধেছিলে তারই গ্রন্থি মোচন করে পাল করে উড়িয়ে দেবে নৌকোয়।

সংসারে থেকে তাঁর দিকে এগোই কি করে?

শুধু অভ্যাসযোগে। প্রথমটা কাঠ-আড়ষ্ট মনে হবে বটে কিন্তু ক্রমশই রপ্ত-মুখস্থ হয়ে যাবে। অভ্যাসের থেকেই অনুরাগ। ভূমিকর্ষণেই মেঘবর্ষণ।

কিন্তু ঈশ্বরকে ডাকবার সময় কই?

এটা একটা খাঁটি কথা বলেছ। তিনি সময় করে না দিলে কিছুই হবার নয়। ছেলে ঘুমিয়ে পড়বার আগে মাকে বলেছিল, মা, আমার যখন খিদে পাবে তখন

আমাকে জাগিয়ে দিস। মা বললেন, খিদেই তোমাকে জাগাবে। আমাকে জাগাতে হবে না।

তাই একবার খিদে যদি জাগে তাহলেই সফলমনোরথ।

'কি করবে? কিছুই করবার নেই। শুধু তাঁর পায়ে সব ঢেলে দাও, বিলিয়ে দাও। যা ভালো হয় করুন। আমি নাবালক, আমি ভালো-মন্দের কি বুঝি!' কিন্তু ঈশ্বরের নাম নিলেই বা ভালো ফল হয় কোথায়?

'বলো কি? বীজ পড়ামাত্রই কি গাছ দেখা দেয়? আগে গাছ, তবে তো ফুল-ফল।'

তবু বপন করো এই নাম-বীজ। বীজের মধ্যেই নিগূঢ় হয়ে আছে নিরুদ্ধ হয়ে আছে বনস্পতি। তুমি জানো না তোমার আয়তন। তোমার পরিমাণ-পরিসর। হৃদয়ের উর্বর ক্ষেত্রে ফেল একবার এই বীজবিন্দু। দেখ কাকে বলে অসাধ্য-সাধন। অফল-ফলন।

'আহা, সেই ছেলেটির গল্পটা বলো না!' ঈশ্বরকে অনুরোধ করলেন ঠাকুর। একটি ছোট ছেলে কোত্থেকে খবর পেয়েছে ঈশ্বরই সব সৃষ্টি করেছেন, ঈশ্বরই একমাত্র আপনার লোক। তখন সে ঈশ্বরকে একখানা চিঠি লিখলে। ঠিকানা দিলে স্বর্গ। চিঠি লিখে ফেলে দিল ডাকবাক্সে।

'দেখলে তো! একেই বলে বিশ্বাস। একেই বলে সরলতা। বালকের বিশ্বাস আর বালকের সরলতা।'

ডাকবাক্স তো একটা নয়, তেত্রিশ কোটি ডাকবাক্স। তেত্রিশ কোটি দেবতা। চিঠি পৌঁছুনো নিয়ে কথা। গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা গাঁয়ের ডাকবাক্সেই ফেল বা হেড পোস্ট অফিস বা জি-পি-ও-তেই ফেল ঠিকানা ঠিক লেখা থাকলে ঠিক গিয়ে পৌঁছুবে। শুধু ভক্তির টিকিটটি এঁটে দিও। দু-একবার বেয়ারিং হয়ে পৌঁছুতে পারে, শেষকালে, বেশি বেয়ারিং দেখলে রিফিউজ করে দেবে। টিকিটটি এঁটে দেওয়াই শাস্তি। যখন ব্যাকুলতার ভাষায় লিখেছ তোমার চিঠি, বিশ্বাস করে ফেলে দিয়েছ তোমার নিকটতম ডাকবাক্সে আর তাতে ভক্তির টিকিটটি এঁটে দিয়েছ, তখন আর ভাবনা নেই, তোমার চিঠি পৌঁছেছে ঠিক জায়গায়। এবার অপেক্ষা করো, এই এল বলে তাঁর প্রত্যুত্তর।

জানো না বুঝি, তিনিও গুণাতীত বালক। বালকে-বালকে বন্ধুত্ব। তুমিও বালক হয়ে যাও।

কালীপ্রসাদ সেদিন এসে খুব আনন্দের কথা বললে। আনন্দই যদি মুখ্য তবে তার মধ্যে আবার শ্রেণীভাগ কি? যার যাতে আনন্দ!

ঠাকুর বললেন, 'তাই বলে ব্রহ্মানন্দ আর বিষয়ানন্দ এক ?'

দেখ কে বেশি টেঁকসই। স্থানে-কালে কে বেশি পরিব্যাপ্ত। কে নিরবচ্ছিন্ন। কে শ্রান্তিক্লান্তিহীন।

কালী বললে, 'তাঁর শক্তিই তো সব। সেই শক্তিতেই ব্রহ্মানন্দ, সেই শক্তিতেই বিষয়ানন্দ।'

ঠাকুর বললেন, 'সে কি ? সন্তান লাভের শক্তি আর ঈশ্বর লাভের শক্তি কি এক ?'

কালী বুদ্ধগয়া থেকে ফিরেছে। তাই সব সময় আনন্দের কথা কইছে আনন্দের ধ্যান করছে। সুখই যখন আমার উদ্দেশ্য তখন অল্প সুখে তুচ্ছ সুখে আমার সুখ কি ! আমি যে সুখের চেয়েও আরো সুখ চাই। সুখ মানেই তো আরো-সুখ। আরো-সুখ মানেই তো অধিকতম সুখ। সেই অধিকতমই তো ঈশ্বর।

শ্রাবস্তীতে এক নবদম্পতি বুদ্ধ ও তাঁর ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াচ্ছে। নবীনা বধূ পরিবেশন করছে স্বহস্তে। স্বামী বুদ্ধের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। তার আতুর দৃষ্টি স্ত্রীর দিকে। বুদ্ধ তার মনের কথা টের পেয়েছেন। বলছেন তাকে, কামনার সমান আগুন নেই, দ্বেষের সমান পাপ নেই, পঞ্চস্কন্ধের সমান দুঃখ নেই, শান্তি বা নির্বাণের সমান সুখ নেই।

পঞ্চস্কন্ধ কি ? রূপ, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান আর বেদনা। জীব এই পঞ্চ-স্কন্ধের সমষ্টি।

কোশলরাজ প্রসেনজিৎ মগধরাজ অজাতশত্রুর কাছে হেরে গিয়েছে যুদ্ধে। বার বার তিন-বার। সামান্য কাশীগ্রাম নিয়ে যুদ্ধ। তা হলে কি হয়, পরাজয়ের লজ্জায় অনশন শুরু করেছে প্রসেনজিৎ। বুদ্ধ শুনতে পেলেন অনশনের কথা। বললেন, 'জয় বৈরিতা প্রসব করে, পরাজিত বাস করে দুঃখে, মর্মদাহে। যে জয়-পরাজয়ের অতীত তারই অক্ষুণ্ণ শান্তি।'

কাশীপুরের বাগানবাড়ির ভাড়া পঁয়ষট্টি টাকা। তারপর রাঁধুনে বামুন রাখতে হয়েছে, আবার একটি ঝি। অনেক খরচ হচ্ছে।

ঠাকুর বললেন মহেন্দ্র সরকারকে, 'বড় খরচা হচ্ছে।'

'তা হলেই দেখ।' সরকার হাসল, 'কাঞ্চন চাই।'

ঠাকুর নরেনের দিকে তাকালেন। ইচ্ছে সে একটা সমুচিত উত্তর দেয়।

'শুধু কাঞ্চন ? কামিনীরও দরকার।'

রাজেন ডাক্তার বললে, 'রান্নার জন্যে অন্তত।'

'দেখলে ?'

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'কিন্তু বড় জঞ্জাল।'

'জঞ্জাল না থাকলে তো সবাই পরমহংস।'

'টাকাতে যদি কেউ বিদ্যার সংসার করে দোষ নেই।' বললেন ঠাকুর, 'সব স্ত্রীলোককে ঠিক মা বোধ হলেই তবে বিদ্যার সংসার।'

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ঠাকুর যেন একটু ভালো আছেন। রাজেন ডাক্তার ভারি খুশি। বললে, 'সেরে উঠে আপনার কিন্তু হোমিওপ্যাথি করতে হবে। নইলে বেঁচে থেকে লাভ কি ?'

॥ ১৪২ ॥

জ্ঞানীর লক্ষণ কি ?

লক্ষণ দুটি। বললেন ঠাকুর, 'প্রথম, অভিমান থাকবে না, দ্বিতীয়, স্বভাবটি শান্ত হবে।' থেমে আবার বললেন, 'যার মধ্যে এ দুটো লক্ষণ দেখবে, জানবে তার উপর ঈশ্বরের অনুগ্রহ।'

পালকিতে করে নন্দ বোসের বাড়িতে এসেছেন ঠাকুর। পরনে লাল ফিতে-পাড় ধুতি, পায়ে বার্নিশ-করা কালো চটিজুতো। উঠে এসেছেন উপরের হল্-ঘরে। ঘর তো নয়, পটের হাট। প্রথমেই চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি। দাঁড়িয়ে ছিলেন ঠাকুর, ভাবাবিষ্ট হয়ে বসে পড়লেন। তারপর এই দেখ নৃসিংহমূর্তি। জলে বিষ্ণু, স্থলে বিষ্ণু, বিষ্ণু সর্বগুহাশয়। সেই উদার আধার বিশ্ববিধায়ক বিষ্ণু। আর দম্ভের স্তম্ভ-বিদারক নৃসিংহ।

আহা, হনুমানের মাথায় হাত দিয়ে রাম আশীর্বাদ করছেন বুঝি। হনুমানের দৃষ্টি রামের পায়ের দিকে। হে নির্মলজ্ঞানচক্ষু, আর কি আশীর্বাদ করবে ! তোমার পাদপদ্মেই যেন মতি শাশ্বতী হয়।

আর এইটি বুঝি বামন ? ছাতা মাথায় দিয়ে চলেছে বলির যজ্ঞে। এক দৃষ্টে তাকে দেখছেন ঠাকুর। লোকব্যাপারকারণ সর্বব্যাপী প্রকাশিত হয়েও যে ছদ্মবেশী।

তমালশ্যামল কৃষ্ণ বাঁশি বাজাচ্ছেন। রাখাল ছেলেদের সঙ্গে চলেছেন গোষ্ঠে, যমুনাপুলিনে। আর, দেখ, দেখ, রাই রাজা সেজে বসেছে সিংহাসনে। চারদিকে সখীদের শতদল। সব চেয়ে মজা, কুঞ্জদ্বারে ঐ কোটালটিকে দেখ। চিনতে পেরেছ ? ওটি আমাদের কৃষ্ণ ছাড়া আর কেউ নয়।

এ সব উগ্রমূর্তি রেখেছ কেন ? ধূমাবতী ছিন্নমস্তা বগলা মাতঙ্গী ? ও সব

মূর্তি রাখলে পুজো দিতে হয়। আর, আহা, এইটি অন্নপূর্ণা। সর্বজনেশ্বরী সর্বদানেশ্বরী কল্যাণী। হে সর্ববরকামদে, ভিক্ষে দাও। অন্ন দাও। যে অন্নে তুষ্টি-পুষ্টি-অনাময় সেই অন্ন দাও। জ্ঞানভক্তিবৈরাগ্যই সেই অন্ন।

সুরেশ মিত্তির ঠাকুরের ভাব নিয়ে বিচিত্র একটা ছবি করিয়েছিল, দিয়েছিল কেশব সেনকে। সেটি দেখছি এখন নন্দ বোসের বাড়িতে।

ঠাকুর চিনতে পারলেন। বললেন, 'এ সেই সুরেন্দরের পট।'

কে একজন বললে, 'আপনি আছেন এই ছবির মধ্যে।'

'এ হচ্ছে ইদানীং ভাব।' আত্মগত হলেন ঠাকুর, 'এর মধ্যে সবাই আছে।'

ছবির বিষয়বস্তুটি অভিনব। শ্রীরামকৃষ্ণ কেশব সেনকে দেখিয়ে দিচ্ছেন ভিন্ন-ভিন্ন পথ দিয়ে চলেছে যাত্রীদল। কিন্তু সবাই গিয়ে পৌছুচ্ছে সেই চির-স্থিরের সকাশে। অর্থাৎ যত মত তত পথ। কর্ম নানা, বিষয় এক। পথ নানা, লক্ষ্য অভ্রান্ত।

দেখতে তো পাচ্ছ তিনি অনন্ত, তাই তাঁর পথও অন্তহীন। তিনি বিচিত্র তাই তাঁর পথও বহুদিমুখ। তাঁকে মানলেও তিনি, তাঁকে উড়িয়ে দিলেও তিনি। তাঁর কথা বললেও তিনি, তাঁর কথা চেপে গেলেও তিনি। এক ছাড়া দুই নেই। দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত—যত খুশি বাড়িয়ে যাও, সব সেই এককে নিয়ে। বাড়ির মধ্যে রয়েছে একজন, কেউ ডাকছে খুড়ামশাই, কেউ ডাকছে মাধাবাবু, কেউ ডাকছে মেসোমশাই, কিন্তু লোকটি ঠিক বুঝতে পারছে আমাকেই ডাকছে। ঠিক-ঠিক সাড়া দিচ্ছে। যার যেমন তাড়া তার তেমনি সাড়া। কথায় বলে, যেমন গাওনা তেমনি পাওনা। ঐ বারোয়ারি তলায় মেলায় দেখনি? বললেন ঠাকুর, 'কত রকম মূর্তি তৈরি করেছে। রাধাকৃষ্ণ, হরপার্বতী, সীতারাম। আবার বেশ্যা তার উপপতিকে ঝাঁটা মারছে, তাও আছে। নানা মতের লোক নানা মূর্তির কাছে ভিড় করে যারা বৈষ্ণব তারা যায় রাধাকৃষ্ণের কাছে, যারা শাক্ত তারা যায় হরপার্বতীর কাছে, যারা রামভক্ত তাদের লক্ষ্য সীতারাম। আর যাদের ঠাকুরের উপর মন নেই তারা দেখছে ঐ ঝাঁটা-মারা। শুধু তাই নয়, বন্ধুদের ডাকছে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে—ওরে, ও সব কি দেখছিস, এদিকে এসে ছাখ, কেমন তৈরি করেছে মাইরি!'

তেমনি বিষয়ী লোক ডেকে বলছে ভক্তদের, ওদিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে কি দেখছ, এদিকে এসে ভিড় করো, দেখ এই ভূতের নৃত্য।

কিন্তু সারাংশ পরীক্ষা না করে কদলীকাণ্ডে আসক্ত হব না এই বীরত্বই তো ভক্তি।

কাম-কাঞ্চনের সুখ, এই আছে, এই নাই। যে সুখ সারাক্ষণ থাকে না সে সুখ আমি সওদা করতে যাব কেন? আমি কেন ঠকে ঠুনকো জিনিস নেব? এত যাচাই-বাছাই করা আমার অভ্যেস, মানিক ফেলে কাচ কিনব আমি কোন হিসেবে?

'ভোগান্ত না হলে কি চৈতন্য হয়?' জিগগেস করলে নন্দ বোস।

'ও রকম মত আছে বটে। এ কাদের মত জানো? যাদের ভোগ করবার ইচ্ছে তাদের। আহা, ভোগ করবে কি? ঐ তো আমড়া, আঁটি আর চামড়া। খেলেই অম্লশূল।'

'তাহলে চৈতন্য হয় কিসে?'

'একমাত্র তাঁর কৃপায়।'

'তবে সবাইকে কৃপা করছেন না কেন?'

'তাঁর খুশি।'

'এ কেমনতরো খুশি?'

'খুশির আবার এমন-তেমন কি? খুশি—খুশি।'

'তা হলে কি বলব ঈশ্বর পক্ষপাতী?' জিগগেস করল নন্দ বোস।

'কার উপর পক্ষপাত করবেন?' ঠাকুরের প্রশান্তমুখ প্রসন্নতায় ভরে গেল। 'সবই তো তিনি। পঞ্চকোটি ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন, তার মধ্যে দুটো একটা বা কাটিয়ে দিচ্ছেন খুশিমত। সেই মুক্তিতে নিজেই আবার হাততালি দিচ্ছেন। তাঁর ইচ্ছেতেই সব হচ্ছে।'

'আর তাঁর ইচ্ছেতে আমরা মরছি।'

'তোমরা কোথায়? সব তিনি। তিনিই মরছেন। তিনিই হয়েছেন।'

'এ স্বরূপ বুঝি কি করে?'

'মানুষের এক ছটাক বুদ্ধিতে কি ঈশ্বরের স্বরূপ বোঝা যায়? বুঝে কি বা হবে? নানা খবরে নানা বিচারে কাজ কি। কথাটা আর কিছুই নয়, ঈশ্বরের উপর একবার ভালোবাসা আসে কিনা তাই দেখ। তুমি তাঁর ভালবাসার জন, এ যদি একবার তাঁকে বোঝাতে পারো, তিনি তোমাকে সব বুঝিয়ে দেবেন। কথাটা আর কিছুই নয়, আম খেতে এসেছ আম খেয়ে যাও। কত ডাল, কত পাতা এ হিসেবে দরকার কি?'

নন্দ বোস গদগদ হয়ে তন্ময়ের মত বললেন, 'আমগাছ কোথায়?'

আহা, নিত্যবৃক্ষ। শুধু বৃক্ষ? তিনি কল্পতরু। প্রার্থনা করো, কাঁদো। তরুর মূলে ফল আপনা থেকে খসে পড়বে।'

আমরা কি কাঁদি না? আমরাও কাঁদি। কিন্তু যে অশ্রু ফেলি সে অশ্রু অমল অশ্রু নয়, আবিল অশ্রু। আকাঙ্ক্ষায় আবিল, ভালোবাসায় অমল নয়।

'নাকের দিক দিয়ে যে চোখের কোণ সে কোণ দিয়ে যে জল আসে সে হচ্ছে অনুতাপের অশ্রু আর অন্য প্রান্ত দিয়ে যে জল আসে সে হচ্ছে ভালোবাসার।' গঙ্গাধরকে বললেন একদিন ঠাকুর।

'হ্যাঁ রে, ধ্যান করতে-করতে চোখে জল এসেছিল?' জিগগেস করলেন গঙ্গাধরকে: 'প্রার্থনা করতে-করতে?'

'এসেছিল।'

'তবে আর কি। তবে আর ভাবনা নেই। কিন্তু কি করে প্রার্থনা করতে হয় জানিস?'

চুপ করে রইল গঙ্গাধর।

'ছোট ছেলের মত হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদতে হয়। কাঁদতে হয় অঝোরে। নাছোড়বান্দার মত। বলতে হয়, মা, আমাকে জ্ঞান দে, ভক্তি দে। আমি আর কিছুই চাইনে মা! তুই ছাড়া আমার আর কে আছে? তোকে ছেড়ে আমি কি করে থাকব?'

কি আশ্চর্য, নিমেষে ঠাকুর ছোট ছেলেটির মতন হয়ে গেলেন। কাঁদতে লাগলেন হাত-পা ছুঁড়ে, কাঁদতে লাগলেন নিরর্গল।

ছোট ছেলেরই ঐশ্বর্য নেই। দারিদ্র্যে সে দীন নয়, নগ্নতায় সে রিক্ত নয়, ধূলিতেও সে শুচিস্নাত। ঐশ্বর্য জুটতে শুরু করলেই সে সরতে আরম্ভ করে।

'ঐশ্বর্যের স্বভাবই ঐ। ঐ দেখ না যদু মল্লিককে।' বললেন ঠাকুর, 'বেশি ঐশ্বর্য হয়েছে, তাই আজকাল আর ঈশ্বরীয় কথা কয় না। আগে-আগে বেশ কইত।'

'আচ্ছা মশাই, পরলোক কি আছে?' নন্দ বোস আবার প্রশ্ন করল।

'থাকলে আছে, না থাকলে নেই। কি দরকার ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে? আধ বোতল মদেই যখন মাতাল হও, শুঁড়ির দোকানের বোতলের হিসেবে দরকার কি? একটা জন্মেই যখন ঈশ্বরকে পাওয়া যায়—'

'তবু যদি বলেন—'

'সোজা কথা, যতক্ষণ ঈশ্বরলাভ না হচ্ছে ততক্ষণ বারে-বারে যাতায়াত করতে হবে সংসারে। যতক্ষণ কাঁচা মাটি থাকবে কুমোরের চাকে উঠতে হবে পাক খেতে।'

BanglaBook.net

যতক্ষণ ঘট তৈরি না হচ্ছে ততক্ষণ কুম্ভকার রেখে দেবেন দণ্ড-চক্র। যতক্ষণ নদী অনুত্তীর্ণ ততক্ষণ নৌকো ভাসাবেন কর্ণধার।

যখন আমরা চলি তখন এক পা মাটিতে রেখে আরেক পায়ে মাটি ত্যাগ করি। এক পায়ে ত্যাগ আরেক পায়ে গ্রহণ। এমনি করে ধরে আর ছেড়ে, ছেড়ে আর ধরে আমরা এগোই। যতক্ষণ না মেলে আমাদের গন্তব্যস্থল। জোঁক কি করে? পূর্বাশ্রিত তৃণ ত্যাগ করে গ্রহণ করে তৃণান্তর। তেমনি প্রাক্তন দেহ ত্যাগ করে ধরছি নবীন দেহ। এক দীপের আলো বহন করছি আরেক দীপে। যতক্ষণ না তার মুখখানি দেখি। তন্তু ছাড়া পটোৎপত্তি অসম্ভব। তেমনি মৃত্যু ছাড়া জন্ম অমূলক।

জীবনটা যখন পেয়েছ তখন সম্ভোগ করে যাবে তো? আর সে সম্ভোগে সুখ কোথায় যে সম্ভোগে নিশ্চিন্ততা নেই? সংসারে নিশ্চিন্ত কে? একমাত্র ভক্তই নিশ্চিন্ত। তারই একমাত্র বিশুদ্ধ বুদ্ধি। সারাবলোকিনী প্রজ্ঞা। সমস্ত জীবন-ভোর তার প্রসন্ন বায়ুর দাক্ষিণ্য। অনুকূল হাওয়া দিলে মাঝি কি করে? কেবল হাল ধরে বসে থেকে তামাক খায়। অনুকূল বায়ুই হচ্ছে ভক্তি। হাল হচ্ছে ঈশ্বর। আর তামাক খাওয়া হচ্ছে জীবনসম্ভোগ।

বারে-বারে আসব। আমার পুলক-পূজাঞ্জলি দিয়ে যাব তোমাকে। শেষে নিজেকে দিয়ে যাব উৎসর্গ করে। তার আগে আমার ছুটি নেই, চাইও না। আমার সমস্ত দৈন্যকে যতক্ষণ না বৈভবরূপে দিতে পারছি তোমার হাতে ততক্ষণ আমারও বিশ্রাম কোথায়? আমার সমস্ত অপচয়ের পরিপূর্তি তো তুমিই।

তুমি আত্মা, আমার পঞ্চপ্রাণ তার সহচর, শরীর গৃহ, বিবিধ উপভোগরচনাই পূজা, নিদ্রা সমাধিস্থিতি, পদসঞ্চার প্রদক্ষিণবিধি আর আমার সমস্ত বাক্য তোমার স্তোত্র। আর যত কর্ম আমি করছি সমস্ত তোমারই আরাধনা।

কি প্রার্থনা ঠাকুরের অন্তরের? যদি একটি মানুষেরও দুঃখ মোচন করতে পারি, ঊর্ধ্বগমন পথে যদি একটি আত্মাকেও সাহায্য করতে পারি, আমি জন্ম-জন্ম আসব, হোক না তা অতি নীচ জন্ম। সেবাই আমার পরাপূজা। মা, আমাকে বেহুঁস করিস না। সমাধি সুখের হাত থেকে রেহাই দে মা। আমাকে ডুবিয়ে দিস না মা, আমাকে সন্তরণ করতে দে। সন্তরণেই সিন্ধুতরণ।

অসুখ বেড়েছে, কাউকে কাছে আসতে বারণ, ঠাকুর কাতরস্বরে বলছেন, 'আজ আর কেউ তো এল না? আজ তো আমি কারুর কাজে লাগলাম না? আমার

এ কষ্ট কি কম গা ?'

সৌরালোকে যে অখিল জগৎ প্রতীত, তাকে কে সন্দেহ করে? তেমনি আমাকেই বা কার সন্দেহ? আমিই সেই নিত্যস্ফূর্তিময় নির্মল সদাকাশ। মহামোহান্ধকার থেকে আমিই একমাত্র বিনির্গত। আমার দিকে চেয়ে দেখ। আমাকেই বা কার সন্দেহ? আমিই অখণ্ড বোধস্বরূপ আনন্দ, আমিই পরাৎপর ঘনচিৎপ্রকাশ। মেঘ যেমন আকাশকে স্পর্শ করে না তেমনি সাধ্য কি সংসার-দুঃখ আমাকে স্পর্শ করে?

একটা বেরাল তার বাচ্চা নিয়ে কাশীপুরের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। তাই নিয়ে ঠাকুরের মহাভাবনা। একদিন নবগোপাল ঘোষের স্ত্রী এসেছে, তাকে একটু একান্তে টেনে নিলেন ঠাকুর। কুণ্ঠিত মুখে জিগগেস করলেন, 'হ্যাঁ গা, তোমাকে একটা কথা বলব?'

বলুন। আপনি বলবেন তাতে আবার কথা কি! নবগোপালের বউ যেন নিজেই সঙ্কুচিত হল।

'দেখ আমার এখানে একটা বেরাল আছে, তার আবার কতগুলি বাচ্চা—' মমতাময় কণ্ঠস্বর। তন্ময়ের মত তাকিয়ে রইল নবগোপালের স্ত্রী।

'কিন্তু জানো, এখানে মাছ নেই, দুধ নেই। বড় কষ্ট হচ্ছে তাদের। তোমাকে যদি দিই নিয়ে যাবে?'

আপনার দান নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। ঘোষপত্নী হাত পাতল।

এততেও হল না। ঠাকুরের মুখে তখনও কুণ্ঠার কুয়াশা লেগে। বললেন, 'নেবে যে, তোমাদের কোনো অসুবিধে হবে না তো?'

না, না, অসুবিধে কি। আমি তো বেরাল ভালোবাসি।

'কিন্তু তোমার বাড়ির কর্তারা যদি অমত করে? যদি কেউ বিরক্ত হয়? যদি কেউ মারে বেরাল-ছানাকে?'

নবগোপালকে ডাকানো হল। সেও যখন সায় দিলে তখন ঠাকুর নিশ্চিন্ত, তখন তাঁর মুখ ভরে উঠল খুশিতে।

এই নবগোপালেরই শেষকালে নাম হয়েছিল 'জয় রামকৃষ্ণ'।

ওরে চল্ ঐ 'জয় রামকৃষ্ণ' আসছে রে, চল বাতাসা নিয়ে আসি।

যেদিন ঠাকুর কল্পতরু হন সেদিন সেখানে নবগোপালও মোতায়েন। রাম দত্ত ছুটে এসে বললে, 'বসে আছেন কি! ঠাকুর কল্পতরু হয়েছেন। যান, যান, শিগগির যান, যা চাইবার চেয়ে নিন এইবেলা।'

নবগোপাল ছুটল। ঠাকুরের পায়ের কাছে নুয়ে পড়ে বলল, 'আমার কি হবে?'

,একটু ধ্যান জপ করতে পারবে ?'

বলো পারব, একশোবার পারব, কেন পারব না ? কিন্তু নির্ভয়ে নবগোপাল বললে, 'আমার সময় কোথায় ? ছাপোষা গেরস্থ লোক সংসারের ধান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছি—'

'ধ্যান না হোক, একটু একটু জপ করতে পারবে না ?'

'তারই বা সময় কই ?'

যখন কাছে এসে পড়েছে, কিছু ফল নেবেই সে কুড়িয়ে। তখন ঠাকুর বললেন, 'জপ করতে না পারো, আমার নাম একটু-একটু করতে পারবে ? সময়ে-অসময়ে, যখন খুশি, যখন তোমার মনে পড়বে—কোনো বাঁধাধরা নেই—আইন-কানুন নেই—পারবে ?'

'তা পারব।'

'তা হলেই হবে। আর কিছু করতে হবে না তোমাকে।'

সেই থেকে নবগোপালের মুখে শুধু 'জয় রামকৃষ্ণ'। পাড়ার ছেলেরা তার পিছু নেয় আর হাত-তালি দিয়ে বলে 'জয় রামকৃষ্ণ'। আফিস থেকে যখন ফেরে দরজায় বাতাসার ঠোঙা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চাকর। চল, চল, ঐ 'জয় রামকৃষ্ণ' আসছে, বাতাসা বিলোবে এবার। চল বাতাসা নিয়ে আসি। ছেলেরা জড়ো হয়ে ঘিরে দাঁড়ায় নবগোপালকে। 'জয় রামকৃষ্ণ' বলে নাচে। মুঠো ভরে বাতাসা নেয়।

কালীঘর থেকে প্রসাদ পেয়ে কাছে এসে দাঁড়াল গঙ্গাধর। ঠাকুর তার হাতে একটা পানের খিলি দিলেন। বললেন, 'খা, খাবার পর দুটো একটা খেতে হয়—'

কুণ্ঠিত মুষ্টি খুলে দিল গঙ্গাধর। ঠাকুর বললেন, 'নরেন একশোটা পান খায়। যা পায় তাই খায়। এত বড়-বড় চোখ, ভিতর দিকে টান। সব নারায়ণময় দেখে। কলকাতায় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, বাড়ি-ঘর গাড়িঘোড়া সব নারায়ণময়। তুই তার কাছে যাবি, খুব যাবি আর তার সঙ্গ করবি।'

সেই নরেনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কাশীপুরের বাড়িতে। ঠাকুরকে সারাক্ষণ দেখবার জন্যে যে বাড়িঘর লেখাপড়া ছেড়ে চলে এসেছে কাশীপুর, সে হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে কয়ে চলে গেল উধাও হয়ে। একদিন যায় দুদিন যায়, কোনো খোঁজখবর নেই। শুধু একা যায়নি মনে হচ্ছে, তারক আর কালীপ্রসাদও অনুপস্থিত। কোথায় গেল, কোথায় গেল নরেন ?

'নরেন কি নিষ্ঠুর!' আক্ষেপ করছেন ঠাকুর। 'আমার এই অসুখ আর এই সময়ে আমাকে ও ছেড়ে গেল! কানাই ঘোষালের ছেলে, যাকে এখানে সে আশ্রয় দিল, সেই তারক ওকে নিয়ে গেল ভুলিয়ে। আর কালীকেও সঙ্গে নিলে!'

বালককে যেমন সান্ত্বনা দেয় তেমনি করে বললে একজন: 'কোথায় আর যাবে! এই এসে পড়বে একদিন হুট করে।'

'সত্যিই তো যাবে কোথায়!' ঠাকুরের কণ্ঠস্বর উদ্দীপ্ত হল: 'তার আর আছে কোন আস্তানা? ওলতলা বেলতলা, সেই আসতে হবে ফের বুড়ির কাছে। আমার কাজের জন্যে মহামায়া যখন তাকে এনেছে তখন আমার পেছনেই তাকে ঘুরতে হবে। যাবে কোথায়!'

কিন্তু সত্যি কি আর নরেন ফিরবে? সে চলে এসেছে বুদ্ধগয়া।

নির্বেদ এসেছে নরেনের মনে। সমস্ত মায়া কাটিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে নির্বাণ-নগরীর দিকে! কঠোর তপস্যায় যদি ঈশ্বর দর্শন হল তো হল নইলে আসনে বসেই দেহপাত করে যাব। ঠাকুরের স্নেহ ও বন্ধন, সেই বন্ধনও ছিন্ন করতে হবে।

'হে ভবতৃষ্ণা, বহু জন্ম ধরে আমার এই দেহগৃহ নির্মাণ করে আসছ, এইবার সেই দেহ ভেঙে দিলাম। আর পারবে না বাসা বাঁধতে।' উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন বুদ্ধদেব।

নির্বাণ-নগরের দ্বাররোধ করে দাঁড়িয়ে আছে 'তন্‌হা', তৃষ্ণা—তোমার কামনা-বাসনা। তারাই কর্মের সৃষ্টি করছে আর সেই কর্মের সংস্কার সঞ্চিত হয়ে তৈরি করছে মাকড়সার জাল। তারই নাম 'মার'। এই 'মার'কে পরাভূত করতে হবে, ছিন্ন করতে হবে ঊর্ণাতন্তু। সেই বাসনার বোঝা ফেলে দিতে পারলেই হালকা হবে তোমার দেহ-নৌকা। তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে এই নির্বাণ-বন্দরে।

ও তো হল নিজের মুক্তির কথা। নিজে সরে পড়া। তা হলে চলবে না, পরের কথাও ভাবতে হবে, অন্যকেও পৌঁছে দিতে হবে সেই আনন্দলোকে। প্রেমে ও প্রসাদে করুণায় ও মৈত্রীতে তোমার শূন্যতাকে ভরে তোলো। প্রেম-প্রবাহে প্রসারিত হয়ে পরিপ্লুত করো সবাইকে।

মৈত্রী করুণা মুদিতা আর উপেক্ষা।

'সুখং বসতি মিত্রাণি বিবর্ধতু সুখঞ্চ নঃ।' হে মিত্রগণ, তোমরা সুখে থাকো ও

তোমাদের সুখ বর্ধিত হোক। এই হচ্ছে মৈত্রী। আর শত্রুর দুঃখে হৃষ্ট না হয়ে বলো, তোমার সর্বদুঃখের বিমোচন হোক। এই হচ্ছে করুণা। আর মুদিতা কি? আমাদের মতের বা পথের যারা বিরোধী তাদের অভ্যুদয়ে আমাদের আর ক্লেশ নেই, তাদের পুণ্যাংশ চিন্তা করে মনে আনো এবার প্রসন্নতা। আর উপেক্ষা কাকে বলে? কে পাপকারী? কার প্রতি তোমার এত অবজ্ঞা, এত ক্রূরতা? কার তুমি বিচার করবে? বলো, আমি নিজেই পাপকারী, নিজেই বিচারপ্রার্থী, তোমাকে আর আমি কি বলতে পারি? এই মনোভাবের নামই উপেক্ষা। এই সব ভাবনা করে চিত্তের শোধন-সাধন করো।

বৈশাখী পূর্ণিমার দিন কুশীনারায় দেহ রাখছেন তথাগত, ম্লান মুখে শিষ্যেরা চেয়ে আছে তাঁর দিকে। আনন্দকে ডেকে নিলেন কাছটিতে, বললেন, 'আনন্দ, আত্মদীপ হও। জ্ঞানালোকের জন্যে বাইরে কোথাও অনুসন্ধান কোরো না। তোমরা নিজেরাই তোমাদের একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র উৎস, একমাত্র প্রদীপ। সত্য যদি কোথাও থাকে তা তোমাদের নিজেদের মধ্যে।' অহংকে আত্মাতে দান করো। তা হলেই দুঃখের অপসরণ হবে। কার দুঃখ, কার সুখ? তোমার নিজের সুখ ঘটিয়েই বা তোমার শান্তি কোথায়? অন্যের সুখেই যে তোমার সুখের নিশ্চিন্ততা। সুতরাং এক সুখ এক দুঃখ। তোমার আমার সুখ নয়, নয় তোমার আমার দুঃখ। দুঃখ দুঃখ বলেই নিবারণীয়, আমার তোমার বলে নয়। তেমনি সুখ সুখ বলেই প্রাপণীয়, আমার তোমার বলে নয়। এক অখণ্ড দুঃখ, এক অভিন্ন সুখ। নিজ-নিজ খণ্ড-খণ্ড সুখ আহরণ করতে গিয়েই একে অন্যকে দুঃখ দিয়ে নিজ-নিজ দুঃখের বোঝা বাড়াচ্ছি। যেমন এক দেহ তেমনি এক পৃথিবী। অঙ্গের এক অংশের ব্যাধিতে সর্বদেহ নিপীড়িত, তেমনি এক অংশের আরোগ্যে সর্বদেহের নৈরুজ্য নেই। চাই সর্বাঙ্গের স্বাস্থ্য। সর্বাঙ্গের সৌন্দর্য। আমি স্ফীত আর তুমি বিশীর্ণ, তার অর্থ সমস্ত দেহই কদাকার, রোগক্লিন্ন। কোথাও গণ্ডী নেই, পৃথক সত্তা নেই। তাই সকলের দুঃখমোচন সকলের সুখসাধন চাই। তা কিসে হবে? তার উপায় কি? একমাত্র উপায় মৈত্রী। আকাশজোড়া প্রকাণ্ড প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তর, ভালোবাসা।

'সুখের আকাঙ্ক্ষা বর্জন না করলে দুঃখ দূর হয় না।' বললেন বুদ্ধদেব। 'সংসারে যারা দুঃখ পায় সুখের ইচ্ছাতেই সে দুঃখ পায়। আর যারা সুখী হয় পরের সুখেচ্ছাতেই সুখী হয়। সুতরাং "আমি"কে দান করো। নিজের আর পরের উভয়ের দুঃখ দূর করবার জন্যে উৎসর্গ করো "আমি"কে।'

নদীতীর দিয়ে যাচ্ছে আনন্দ, দেখল একটি মেয়ে কলসীতে জল ভরছে। কলসী কাঁখে নিয়ে চলে যাচ্ছে মেয়েটি, আনন্দ তার কাছে এসে বললে, 'আমি তৃষ্ণার্ত, আমাকে একটু জল দেবে?'

মেয়েটি তাকাল চোখ তুলে। আনন্দের অঞ্জলিতে জল ঢেলে দিল।

জল খেয়ে চলে যাচ্ছে আনন্দ, মেয়েটি তার পিছু নিল। তোমার তৃষ্ণা দূর করলাম, এবার আমার তৃষ্ণা দূর করো।

ঘরে ফিরে এসে ধূলায় শুয়ে কাঁদতে লাগল মেয়ে। মা মাতঙ্গীকে বললে, 'আমি দেখে এসেছি কোথায় তিনি থাকেন। তাঁর নাম আনন্দ। আমার যদি বিয়ে দিতে চাও তবে তাঁর সঙ্গেই বিয়ে দাও। তাঁকে ছাড়া আর কাউকে আমি বিয়ে করব না।'

কে আনন্দ, সন্ধানে বেরুল মাতঙ্গী। আনন্দ? তাকে চেনো না? সে যে শ্রমণ। বুদ্ধশিষ্য।

'এ তোর কী অসম্ভব কথা?' মা ফিরে এসে শাসন করল মেয়েকে। 'সে বুদ্ধের ভক্ত, সে কি করে বিয়ে করবে?'

'মা, তুমি তো মন্ত্রতন্ত্র জানো। এবার সেই শক্তি প্রয়োগ করো।' মেয়ে মায়ের পা চেপে ধরল।

আহার-নিদ্রা ত্যাগ করল মেয়ে। মায়ের মন গলল। গৃহে ভিক্ষা নেবার জন্যে নিমন্ত্রণ করল আনন্দকে।

আসছে? আসবে বলেছে? মেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠল সর্বাঙ্গে।

আনন্দ এসে দাঁড়াল ভিক্ষাপাত্র হাতে। মাতঙ্গী বললে, 'আমার মেয়েকে তুমি বিয়ে করো।'

শান্ত স্বরে বললে আনন্দ, 'আমি শীল গ্রহণ করেছি, স্ত্রী গ্রহণ করতে পারি না।'

'তোমাকে পতিরূপে না পেলে আমার মেয়ে আত্মহত্যা করবে।'

কোনো অনুনয় কানে তুলল না আনন্দ। ফিরে যাবার জন্যে যাত্রা করল।

'তোমার তন্ত্রমন্ত্র কোথায় গেল?' মায়ের উদ্দেশে গর্জে উঠল মেয়ে। 'কোথায় তোমার ইন্দ্রজাল?'

'এমন মন্ত্র-তন্ত্র কিছু নেই যা বুদ্ধ বা বুদ্ধের শিষ্যদের অভিভূত করতে পারে।' অসহায়ের মত বললে মাতঙ্গী।

'তা হলে দ্বার বন্ধ করে দাও।' আকুলা কন্যা আবার রোদন করে উঠল। 'আমার কাছেই রয়েছে সে ইন্দ্রজাল। রাত্রি সমাগত হলে স্বভাবতই উনি

আমার পতি হবেন।'

মাতঙ্গী দ্বার বন্ধ করে দিল। মন্ত্র দিয়ে বন্ধ করলে আনন্দকে। মেয়ের জন্যে শয্যারচনা করলে।

আনন্দ অক্ষুণ্ণ উদাসীন। সর্বজয়বিবর্জিত।

মন্ত্রবলে আগুন আকর্ষণ করল মাতঙ্গী। আনন্দকে টানতে-টানতে নিয়ে এল অগ্নিকুণ্ডের কাছে। বললে, 'যদি আমার মেয়েকে এ দণ্ডে বিয়ে না করো তবে তোমাকে আগুনে নিক্ষেপ করব।'

কি আশ্চর্য, মন্ত্রের মায়া কাটাতে পাচ্ছি না এখনো? একমনে বুদ্ধদেবকে ডাকতে লাগল আনন্দ। আগুন নিবে গেল। খুলে গেল রুদ্ধ দ্বার।

গৃহগণ্ডী থেকে বেরিয়ে এলো আনন্দ।

'মা, ও যে চলে যায়!' মেয়ে আবার কেঁদে উঠল অনাথার মত।

মা বললে, 'আমি আগেই বলেছি আমার মন্ত্রের এমন ক্ষমতা নেই বুদ্ধের শিষ্যকে বশীভূত করতে পারে।'

তবু আনন্দচিন্তা ত্যাগ করতে পারল না মেয়ে। পরদিন সকালে উঠে আবার চলল আনন্দের সন্ধানে। আনন্দ ভিক্ষায় বেরিয়েছে, পিছু-পিছু চলল তার ছায়া হয়ে। বিহারে এসে ঢুকল, মেয়ে তবু কাঁদতে লাগল দ্বারের বাইরে।

বুদ্ধদেব তাকে ডাকিয়ে আনলেন। বললেন, 'তুমি কি চাও? কেন আনন্দের পিছু নিয়েছ?'

স্পষ্ট দুঃসাহসে বললে তরুণী: 'আনন্দকে পতিরূপে বরণ করতে চাই।'

বুদ্ধদেব বললেন, 'তাকিয়ে দেখেছ আনন্দের দিকে?'

'দেখেছি।'

'তার মাথায় চুল নেই দেখেছ?'

'দেখেছি।'

'কিন্তু তোমার মাথাভরা চুল। তুমি আনন্দের মত মাথা মুণ্ডন করতে পারবে? নির্মূল করতে পারবে কেশভার? যদি পারো তোমার হাতে দিয়ে দেব আনন্দকে।'

'পারব।'

'তবে যাও, মাথা মুণ্ডন করে এস।'

মেয়ে ফিরে গেল মায়ের কাছে। বললে, 'তোমার মন্ত্রতন্ত্র যা পারেনি তা অনায়াসেই সফল হতে চলেছে। বুদ্ধ বলেছেন ক্ষুর দিয়ে মাথা মুড়িয়ে নিলেই পাব সেই পরমরম্যকে।'

BanglaBook.org

মাতঙ্গী ক্রুদ্ধ হল। বললে, 'আহা, কি রূপের ছিরি হবে তখন! বলি, দেশে কত ধনী-গুণী লোক আছে, তাদের কাউকে মনোনীত কর। শ্রমণ ছাড়া কি আর মোহনমনোরম নেই?'

'মরি আর বাঁচি, আমি আনন্দর।'

অভিশাপ দিল মাতঙ্গী। তবু মেয়ে নিরস্ত হয় না। তখন কি আর করে, কাঁদতে-কাঁদতে মেয়ের মাথা কামিয়ে দিল ক্ষুর দিয়ে।

মুণ্ডিত মাথায় বুদ্ধ সমীপে দাঁড়াল এসে মেয়ে। বললে, 'আমি এসেছি। এবার দিন আমার আনন্দকে।'

'তুমি আনন্দকে ভালোবাসো?' জিগগেস করলেন বুদ্ধদেব।

'বাসি।'

'দেহের কোন অংশ ভালোবাসো?'

'চোখ কান নাক মুখ, চলন বলন, সমস্ত—'

'চোখে কানে মুখে নাকে দেহের প্রতি অংশেই ঘৃণিত মল। ক্লেদে-কলুষে মানুষের জন্ম, ক্লেদে-কলুষেই মানুষের মৃত্যু। কাকে তুমি ভালোবাসছ? এই নশ্বর দেহকে? যার অস্তিত্বেও দুঃখ অবসানেও দুঃখ। সত্যি যদি আনন্দ চাও, এমন আনন্দের সন্ধান করো যার লয়-ক্ষয়-ব্যয় নেই।'

দেহের অভ্যন্তরের কঙ্কালদর্শন হল তখন সেই তরুণীর। সেই তো সত্যদর্শন। স্বরূপদর্শন। সেই দর্শনে দিব্যজ্ঞান হল। অর্হত্ব লাভ করল।

বুদ্ধদেব বললেন, 'এবার চলে যাও আনন্দের ঘরে।'

শ্রমণা তখন পড়ল প্রভুর পাদমূলে। বললে, 'ভগ্নতরী ফেলে এবার তীরে এসে উঠেছি। অন্ধের যষ্টিলাভ হয়েছে। আর আমার কোনো বাসনা নেই। আমি শান্ত হয়েছি, অভাবনামুক্ত হয়েছি, অপ্রমাদচিত্ত হয়েছি। আর আমি কিছু চাই না।'

আমি দীপাকাঙ্ক্ষীর দীপ, শয্যাকাঙ্ক্ষীর শয্যা, আরোগ্যাকাঙ্ক্ষীর মহৌষধ। যতক্ষণ না ব্যাধির বিচ্ছেদ হচ্ছে ততক্ষণ তার শয্যাপার্শ্বে চলবে আমার পরিচর্যা। যতদিন আকাশ থাকবে যতদিন জগৎ থাকবে ততদিন জগতের সর্বদুঃখ অপনয়ন করতে আমিও থাকব।

বৈশালী থেকে রাজগৃহে ফিরছেন বুদ্ধদেব। দেখলেন নগরের উপকণ্ঠে এক ব্রাহ্মণ চাষী তার গৃহে খুব উৎসবে মেতেছে। চলছে নৃত্য, চলছে পান-ভোজন। কি ব্যাপার? নতুন ফসল উঠেছে ঘরে, ভবনাঙ্গন ভর-ভর, তাই এই উৎসব। ভিক্ষাপাত্র হাতে বুদ্ধদেব দাঁড়ালেন এসে দুয়ারে। বললেন,

'ভিক্ষা দাও।'

'এখানে কিছু হবে না।' ব্রাহ্মণ, নাম ভরদ্বাজ, তিরস্কার করে উঠল। 'কত কষ্টে জমি চষে ঠিকমত সময়ে বীজ বুনে দেহপাত পরিশ্রম করে শস্য ফলাই, আর তুমি বিনাশ্রমের ভিখিরি, দিব্যি হাত পেতে আমাদের উপভোগে ভাগ বসাতে চাও। লজ্জা করে না! আমার কথা শোনো। ঘরে ফিরে যাও। চাষ করো জমি। বীজ বোনো। পরিশ্রমের ফসল ফলাও।'

বুদ্ধদেব বললেন, 'বন্ধু, আমিও জমি চাষ করি বৈকি। আমিও বীজ বুনি। মানব-জীবনই আমার ভূমি। বীর্য বৃষ, বিনয় হল, প্রজ্ঞা ফাল। সৎকর্মের বৃষ্টিতে ভূমি উর্বর হয়, তারপর সম্যক দৃষ্টির বীজ বুনি। কর্ষণে কর্ষণে যে জঞ্জাল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তার নাম তৃষ্ণা। তারপরে ভূমি ফল দেয়। আর সেই ফলের নাম নির্বাণ।'

'অমন কথা সব ভিক্ষুই বলে থাকে।' প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ করল ভরদ্বাজ। 'দেখাতে পারো?'

'পারি। এস আমার সঙ্গে।'

নগরের প্রমোদ-উদ্যানে পৌরনাগরদের ভিড় হয়েছে। কি ব্যাপার? নগরের প্রধানা নর্তকী কুবলয় নাচছে রঙ্গমঞ্চে। সেইখানে ভরদ্বাজকে নিয়ে হাজির হলেন বুদ্ধদেব।

স্পর্ধিনী রূপসী নাচছে লাস্যের তরঙ্গ তুলে। কামার্ত চোখে নগরবিলাসীর দল পান করছে রূপসুধা। অনন্ত রূপের আধার প্রভু তথাগত যে পাশে দাঁড়িয়ে সে দিকে কারু চোখ নেই।

নাচতে-নাচতে হঠাৎ জনতাকে লক্ষ্য করে কুবলয় বলে উঠল, 'আমার মত সুন্দরী আর দেখেছ কাউকে সংসারে?'

লালসাবিলোল চোখে হতবাক জনতা নিস্পন্দ হয়ে রইল।

'আমি দেখেছি।' জনতার মধ্য থেকে বলে উঠলেন বুদ্ধদেব। 'আর সে তোমার থেকে শত সহস্রগুণ বেশি সুন্দরী।'

'কোথায়? কোথায়?' মিলিত স্বরে জনতা হুঙ্কার করে উঠল। 'দেখাও সেই সুন্দরীকে।'

'দেখাচ্ছি।'

কোত্থেকে দেখাবে? কুটিলকটাক্ষ হেনে আবার নাচতে লাগল কুবলয়। লাবণ্যের সরোবরে ফুটতে লাগল আবার লাস্যের শতদল।

বুদ্ধদেব তার দিকে অনিমেষে তাকিয়ে রইলেন।

এ কি! এ কি অঘটন!

ক্রমে ক্রমে মাথার চুলে পাক ধরল নটিনীর। কুন্দদন্ত খসে পড়ল একে-একে। দুই গালে গহ্বর হয়ে গেল। দুই চোখ প্রবেশ করল কোটরে। ধীরে-ধীরে মৃত পাত্রর মত খসে পড়ল রূপ-লাবণ্য। বরাঙ্গ কঙ্কালে পরিণত হল। বিবসনা হয়ে দাঁড়াল রঙ্গমঞ্চে। ভয় পেয়ে কেউ চোখ বুজল, কেউ বা ঘৃণায় পালিয়ে গেল সভা ছেড়ে।

প্রভু বললেন, 'কুবলয়, এবার দর্পণে নিজেকে দেখ। দেখ কত সহস্র গুণ সুন্দরী হয়ে উঠেছ। মায়াবসন ছেড়ে ধরেছ এবার তোমার নিত্য সৌন্দর্যের আকৃতি।'

বসন কুড়িয়ে নিয়ে কুবলয় প্রভুর পাদমূলে লুটিয়ে পড়ল। বলল, 'চিনতে পেরেছি তোমাকে। তোমার করুণা অন্তহীন। তুমি নির্বাচিত করেছ আমাকে। তোমার চরণতলে ডেকে নিয়েছ নিজের থেকে। প্রভু, আর আমাকে বিচ্যুত কোরো না।'

'আমিও চিনেছি তোমাকে।' ভরদ্বাজও ধূলায় লুটিয়ে পড়ল। 'তুমি কোন কৃষির কৃষক? কি তোমার হল-বৃষ? কি তোমার বৃষ্টিধারা? আমাকেও ডেকে নাও তোমার চাষের কাজে। আমাকেও কৃষাণ করো।'

ঠাকুর বললেন, 'আমি মেয়ে বড় ভয় করি। দেখি যেন বাঘিনী খেতে আসছে। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিদ্র সব খুব বড়-বড় দেখি। সব যেন রাক্ষসীর মত। আগে ভারি ভয় ছিল। কারুকে কাছে আসতে দিতাম না। এখন তবু অনেক করে মনকে বুঝিয়ে মা আনন্দময়ীর এক-একটি রূপ বলে দেখি।' আবার বলছেন, 'দেখ, ছাদে একবার উঠতে পারলে হয়। ওঠবার পর ছাদে নাচাও যায়। কি বলো, যায় না? কিন্তু সিঁড়িতে নাচো, তোমার সাধ্য কি। সাধকের অবস্থাঃই খুব সাবধান। তখন মেয়েমানুষ থেকে অন্তরে থাকো। একবার সিদ্ধ হয়ে যেতে পারলে আর ভয় নেই। তখন মেয়েমানুষ মাত্রই সাক্ষাৎ ভগবতী।'

বলরাম বোসের বাড়ির একতলায় তখন একটা বালিকা বিদ্যালয় বসে। শৌচান্তে ঠাকুরের হাতে জল ঢেলে দিচ্ছে বাবুরাম, ইস্কুলের একটা মেয়ে আঁচলে-বাঁধা চাবির গুচ্ছ ঘোরাতে-ঘোরাতে চলে গেল সমুখ দিয়ে। বাবুরামকে বললেন ঠাকুর, 'দেখে রাখ্। পুরুষদের ঐ রকম করে বেঁধে বন-বন করে ঘোরায় মেয়েরা। তুইও কি ওদের হাতে পড়ে ঐ রকম করে ঘুরতে চাস?'

স্বগতোক্তি করছেন ঠাকুর। 'আমি একজায়গায় যেতে চেয়েছিলাম। রামলালের খুড়িকে জিগগেস করাতে বারণ করলে, আর যাওয়া হল না। খানিক পরে

ভাবলুম, আমি সংসার করিনি, কামিনীকাঞ্চনত্যাগী, তাতেই এই! সংসারীরা না জানি পরিবারদের কাছে কি রকম বশ!'

'সেই পাঁড়ে জমাদার খোট্টা জমাদারকে চেনো? তার চৌদ্দ বছরের বউ! গোলপাতার ঘর। গোলপাতা খুলে-খুলে লোকে দেখে। তাকে আগলাতে-আগলাতেই প্রাণ বেরিয়ে যায় জমাদারের।'

তিন বন্ধু, নরেন কালী আর তারক, গয়ায় নেমে সাত মাইল পথ হেঁটে সোজা চলে এল বোধগয়ায়। এই সেই বোধিদ্রুম, এই সেই শিলাসন। এখানে বসেই জগৎ সংসারের দুঃখ নিবারণের তপস্যা করেছিলেন বুদ্ধদেব। মানুষের মুক্তি কিসে, এই প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিলেন। দুঃখ নিবারণের উপায় তৃষ্ণার উন্মূলনে। আর মানুষের উপায় আত্মার উন্মীলনে।

একদিন সন্ধ্যায় নির্জনে সেই শিলাসনে বসে ধ্যানস্থ হল নরেন। কতক্ষণ পর পাশে বসা তারকের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।

'সে কি, কাঁদছ কেন?'

'ভাই, বুদ্ধদেবকে দেখলাম। সেই করুণাঘন ক্ষমাসুন্দর প্রশান্ত মূর্তি।'

মন্দিরের মোহান্তের আশ্রয়ে তিনদিন ছিল কোনো রকমে। তিনদিনের পরেই পিছটান। আবার ঠাকুরের কথা মনে পড়ল। সেই সরল সুন্দর প্রেমস্থিত স্নিগ্ধ হিরণ্ময় পুরুষ। তাঁকে ছাড়া সব যেন নিরুদক মরুভূমি। চল, চল ফিরে চল নিজের ঘরে। কিন্তু বাহির ঘুরে এলেই তো নিজের ঘরের মর্যাদা।

ঠাকুরের সেই কথা! 'কোথায় আর যাবে? আকাশ একটু দেখুক উড়ে-উড়ে। শেষকালে বসবে ঠিক এই বৃক্ষশাখে তার নিজের জায়গায়।'

নরেন ফিরে এসেছে। ঠাকুর শুনে মহা খুশি। কোথায় আর যাবে। এখানে ও যেমনটি দেখেছে তেমনটি আর দেখবে না কোথাও। এখানে এমন একটা কিছু ওর চোখে পড়েছে যা আর কোথাও স্পষ্ট নয়।

আমার প্রভুর পায়ের তলে কি শুধু মানিক জলতেই দেখেছ? শত শত মাটির ঢেলাও সেখানে স্থান পেয়ে কাঁদছে লুটিয়ে লুটিয়ে। আমার গুরুর আসনের কাছটিতে যে কটি চেলা জমেছে সবাই কি সুবোধ? অবোধও কটি আছে আশে-পাশে। সেই অবোধজনকেও কোল দিয়েছেন বলেই তো আমি তাঁর চেলা হতে পেরেছি।

গতির লক্ষ্য এক, কিন্তু তার পথ অনেক। সাগরের দিকে সব নদীই যায় কিন্তু সবাই এক পথে এক নদী হয়ে যায় না। ঠাকুর সব পথে গিয়েছেন। যত মত তত পথ।

ঠাকুরের যন্ত্রণার কিছুতে নিবারণ নেই।

সেটা ততোধিক যন্ত্রণা নরেনের। ডাক্তার-টাক্তার সব ফেল মেরে গেল। কোনো প্রতিকার নেই, প্রতিষেধ নেই। কি দুঃসহ অবস্থা!

অখণ্ড ধরামণ্ডলে এমন কি কেউ নেই যে প্রতিবিধান করতে পারে! নয়কে হয় করতে পারে! সর্বাস্ত্রকুশল সর্বকামসম্পন্ন ধন্বন্তরি কি কেউ নেই?

উন্মত্তবৎ হয়ে উঠল নরেন। মুখে রাম-নাম গর্জন করতে-করতে বাগানের চারদিকে ছুটতে লাগল। সেই সন্ধ্যে থেকে ছুটছে, মধ্যরাত্রি হয়ে এল, তবু বিরাম নেই। মধ্যরাত্রি কি, শেষরাত্রি! তবু কেউ থামাতে পারছে না নরেনকে। তবু সমানে ছুটছে। রাম রাম রাম রাম! হুঙ্কার ক্রমে আর্তনাদের রূপ নিল। রাম রাম রাম রাম! রাত্রির শেষ প্রহরও বুঝি যায়-যায়!

'যা নরেনকে শিগগির ডেকে নিয়ে আয়।' ঠাকুর আদেশ করলেন ভক্তদের। কিন্তু কোনো কথাই কানে তুলবে না নরেন। নামধ্বনিতে উন্মূল করবে রোগজ্বালা।

ঠাকুর যখন আদেশ করেছেন, ভয় কি, জোর করে ধরে নিয়ে চলো। সবাই তখন নরেনকে গায়ের জোরে বাধা দিল। প্রায় ধরে-বেঁধে নিয়ে এল ঠাকুরের কাছে।

'হ্যাঁ রে, অমন করছিস কেন? ওতে কি হবে?'

নরেন চুপ করে রইল।

ঠাকুর আবার বললেন, 'তুই যেমন করছিস অমনি বারোটা বছর আমার গিয়েছে। দু-এক রাত্তির নয়, অখণ্ড বারোটা বছর গিয়েছে একটানা একটা ঝড়ের মত। এক রাত্তিরে তুই আর কি করবি বাবা? ছেড়ে দে, ঘরে যা, ঠাণ্ডা হ।'

যেন থাকবেন না এমনিই ইঙ্গিত করছেন। নইলে নামশক্তিকে তো অস্বীকার করতে পারেন না ঠাকুর।

কি ছিল কি হয়েছে!

সেই একদিন হাজরার সঙ্গে বসে নরেন শুকনো জ্ঞানবিচার করছিল, ইংরেজিতে বড়-বড় দর্শনের বুলি, ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'তোমাদের কি সব কথা হচ্ছে?'

নরেন বললে, 'লম্বা-লম্বা কথা। সে আপনি বুঝবেন না।'

'তবু শুনি না।' ঠাকুর হাসলেন।

'সে ইংরিজি কথা। দার্শনিক হ্যামিলটন কি লিখেছেন তাই।'

'কি লিখেছেন?' ঠাকুর নাছোড়বান্দা।

ইংরেজি কথাটা আওড়ালো নরেন।

'এর মানে কি গো? মানে বলে দাও।'

'মানে হচ্ছে, দর্শনশাস্ত্র পড়া শেষ হয়ে গেলে মানুষ তখন বুঝতে পারে সে কিছুই জানে না। তখন সে ধর্ম-ধর্ম করে। যেখানে বিজ্ঞানের শেষ সেখানেই ধর্মের আরম্ভ।'

আনন্দিত হলেন ঠাকুর। মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ। থ্যাঙ্ক ইউ।' সমস্ত জানার পরেও থেকে যায় অজানা। সমস্ত বিশ্লেষণের পরেও থেকে যায় অনুভূতি। সমস্ত বিশেষণের পরেও থেকে যায় বিশেষ্য। সমস্ত প্রথার পরেও থেকে যায় প্রাণ।

'এরা সব নিত্যসিদ্ধের থাক।' বললেন ঠাকুর, 'নরেন রাখাল বাবুরাম।' বলে সেই হোমাপাখির কথা বললেন।

বেদে আছে সেই হোমাপাখির কথা। সে পাখি আকাশবাসী, কখনো আশ্রয় নেয় না মাটিতে। আকাশেই ওড়ে ঘোরে, আকাশেই ডিম পাড়ে। ডিমও মাটিতে এসে পড়ে না, মাটিতে পড়বার আগেই ফুটে যায় ডিম। ডিম ফুটতেই বেরিয়ে পড়ে ছানা। ছানার তখন মাটিতে পড়বার কথা। কিন্তু ছানা বেরিয়ে এসেই উড়তে শুরু করে। উড়তে শুরু করে মাটির দিকে নয়, তার মায়ের দিকে। তার এক লক্ষ্য শুধু উপরে ওঠা, তার মায়ের কাছে পৌঁছনো।

'ও সব ছোকরারাও সেই রকম।' বললেন ঠাকুর, 'কিসে মা'র কাছে যাব।' আর, মা কে? ঠাকুর নিজেই তো মা।

কাল কালীপুজো, আগের দিন ভক্তদের হঠাৎ বললেন, 'পুজো হবে, সব উপকরণ ঠিক রাখিস।'

ঘটনাটা শ্যামপুকুরে থাকতে।

পুজো হবে, শুধু এইটুকু নির্দেশ। ভক্তরা ভাবনায় পড়ল। কি উপচার লাগবে, কি দিয়ে বা ভোগ, কিছুই বললেন না ঠাকুর। এখন কি করে কি যোগাড়যন্ত্র করে ভেবে পেল না কেউ। এ বলে ও, ও বলে ও। এ দিকে ঠাকুরের মুখে আর কথা নেই।

যাক গে, ফুল আর ধূপদীপ হলেই যথেষ্ট। ভোগের জন্যে না হয় কিছু মিষ্টি, নয়তো বা একটু পায়েস। তারপর এর অতিরিক্ত কিছু ফরমায়েস করেন তখন দেখা যাবে। কিন্তু, কি আশ্চর্য, পরদিন বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যে প্রায় হয়-হয় তবু

ঠাকুরের কোনো কৌতূহল নেই। পুজোর কথা তুলছেনও না কারু কাছে। ঘড়িতে সাতটা ছেড়ে আটটা বাজল। তবু যেমন বসে থাকেন তেমনি বসে আছেন শয্যায়। স্থির, স্তব্ধ, উদাসীন। কি আর করা যাবে, ঠাকুরের বিছানার পাশে মেঝের উপর জিনিসগুলো সাজিয়ে দিল ভক্তরা। নিজেরা বসল চার দিকে। দীপ জ্বলল, উঠল ধূপগন্ধ।

কে জানত এই কালী, এই কালীপুজো।

'জয় মা!' বিহ্বলকণ্ঠে বলে উঠল গিরিশ ঘোষ। ফুলচন্দন ফেলল ঠাকুরের পাদপদ্মে।

ঠাকুর গভীর সমাধিতে ডুবে গেলেন। দুই হাতে ধারণ করলেন বরাভয় মুদ্রা। উদ্ভাসিত হলেন দিব্যজ্যোতিতে।

এ স্বপ্ন নয়, ইন্দ্রজাল নয়, মরুনীর নয়, আকাশে গন্ধর্বনগর নয়, সত্যিই মা আছেন বসে। কালী মানেই রামকৃষ্ণ। কালীপুজা মানে রামকৃষ্ণপূজা।

'জয় মা, জয় মা—' সবাই ঠাকুরের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগল।

রাখাল দেখল ঠাকুর শুধু তার নিজের মা নন, অখিলজননী। অনেকাকারা সৃষ্টির আদিকর্ত্রী। মহাকালের মনোমোহিনী। জীবজগতের জগদ্ধাত্রী। রাখালও ফুল দিল শ্রীচরণে।

মনে হল ঠাকুরের এ অসুখ, এ বুঝি তাঁর নিজের ইচ্ছে। তবে আর কিসের চিন্তা, কিসের চিত্তক্লেশ! তাঁর রোগের চিন্তা না করে এস তাঁর নিজের চিন্তা করি!

ডাক্তার সরকার এসেছে।

'তুমি নাকি বলেছ ইনি পাগল?' নিজের দিকে ইঙ্গিত করলেন ঠাকুর।

'তা ঠিক বলিনি। বলেছি তোমাতে এখনো অহঙ্কার আছে।'

'অহঙ্কার!' মাস্টার চমকে উঠল।

'তা ছাড়া আবার কি! নইলে অন্যকে কেউ পায়ের ধুলো নিতে দেয়?'

'বা, লোকে যে পায়ের ধুলোর জন্যে কাঁদে।' বললে মাস্টার।

'কাঁদলেই হল? কাঁদলেই দিতে হবে? লোকে পাগল বলে আমিও পাগল হব?'

ডাক্তার বললে উত্তেজিত হয়ে: 'সবাইকে বুঝিয়ে বলব ছাড়ো এই পাগলামি।'

'যদি প্রণাম করতে না দেন তা হলে আবার কেউ অহঙ্কারী বলবে।' আরেক-জন কে বললে পাশ থেকে। 'বলবে, দেখলে লোকটার অহঙ্কার। এত লোক একটু পায়ের ধুলোর ভিখিরি, আর, দেখ না কেমন পায়ে কম্বল বেঁধে বসে

আছে!'

'তা নয়, বুঝিয়ে বলো।'

'কাকে বোঝাবো? কে বুঝবে? বুঝিয়ে বলতে গেলেই তো বক্তৃতা। আবার সেই অহঙ্কার।' বললে সেই পার্শ্ববর্তী।

মাস্টার আগের কথার জের টানল। বললে, 'কেন দোষ কি প্রণামে? সর্বভূতে কি নারায়ণ নেই?'

'বেশ, তাই যদি হয়, তবে সব্বাইকে করো। বিশেষ একজনকে কেন?'

'সেই বিশেষের মধ্যেই যে বেশি।' মাস্টার এবার অনেকটা বাগে পেয়েছে ডাক্তারকে। 'জল কোথাও ডোবায় প্রকাশ, কোথাও সাগরে। কোথায় এসে বিহ্বল হন, ডোবায় না সমুদ্রে? আপনি কাকে বেশি মানবেন, ফ্যারাডেকে, না, নতুন বি-এস-সি পাস কলেজী-ছোকরাকে?'

ঠাকুর মুখ খুললেন। সূর্যকিরণ মাটিতে এক রকম পড়ে, গাছে আরেক রকম। আবার যখন আরশিতে পড়ে তখন একেবারে আলাদা। সেই একই কিরণের বিভিন্ন প্রকাশ। কিছু বেশি প্রকাশ আরশিতে। তাই নয়? তেমনি এমন মানুষও আছে, যেখানে ঈশ্বর বিভূতির বেশি প্রকাশ। যেমন ধরো প্রহ্লাদ। কাকে বেশি মানবে? প্রহ্লাদকে? না, এই যারা ভক্তবৃন্দ সমবেত হয়েছে এদেরকে?

'সব বুঝলাম।' বললে ডাক্তার। 'কিন্তু লোকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছে এ দেখলে আমার কষ্ট হয়। ভয় হয় এমন একটা ভালো লোককে খারাপ করে দিচ্ছে। কেশব সেনকেও তার চেলারা অমনি করেছিল। তোমায় বলি শোনো—'

'তোমার কথা কি শুনব!' ঠাকুর কি বিরক্ত হলেন? বললেন, 'তুমি লোভী, কামী, অহঙ্কারী।'

'তা হলে বেশ, উঠলাম।' ডাক্তারের গলার স্বরে কি অভিমান বেজে উঠল? বললে, 'তবে এখন থেকে তোমার কেবল গলার অসুখটি দেখে যাব। অন্য কথায় কাজ নেই। তবে যদি অন্য কথা উঠে পড়ে, আমি ছাড়ব না। ছাড়ব না যুক্তির পথ। তর্ক করতে হলে বলব ঠিক ঠিক।'

করো না তর্ক। কটা সিঁড়ি শুধু তো ভাঙবে ধাপের পর ধাপ—তারপর? কটা সিঁড়িই বা পারো তৈরি করতে? রাবণের সিঁড়িও ভেঙে পড়েছিল, স্বর্গকে ছুঁতে পারেনি। সিঁড়ির শেষ আছে, কিন্তু যাকে সে স্পর্ধা করে উঠতে চেয়েছে সেই আকাশের শেষ কই, অবধি-পরিধি কই? সিঁড়ি ভাঙতে-ভাঙতে

উঠবে না হয় উচ্চচূড়ে, তুঙ্গচূড়ে, প্রাসাদ-শিখরে। তারপর? আর কোথায় তর্ক, কোথায় বাক্যজাল? অবলম্বনের সূক্ষ্ম সূত্রটিও আর যেই। তখন অবতরণ। তখন শরণাগতি।

তাকেই বলি তত্ত্বজ্ঞান।

তত্ত্বজ্ঞানের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হাজরা বললে, 'তত্ত্বজ্ঞান মানে চব্বিশ তত্ত্বের জ্ঞান—'

'চব্বিশ তত্ত্ব কি-কি?' কে একজন জিগগেস করল।

'পঞ্চভূত ছয় রিপু'—হাজরা ফিরিস্তি দিতে বসল।

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'ঐ বুঝি তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ? তত্ত্বজ্ঞান মানে আত্মজ্ঞান।'

সবাই চমকে উঠল কথা শুনে। তাকাল ঠাকুরের মুখের দিকে।

'তৎ মানে পরমাত্মা আর ত্বং মানে জীবাত্মা।' ঠাকুর বললেন, 'পরমাত্মা আর জীবাত্মা এক, এই জ্ঞানের নামই তত্ত্বজ্ঞান। আর তাঁকে জানা যা নিজেকে জানাও তা। তাই তত্ত্বজ্ঞানই আত্মজ্ঞান।'

কিন্তু তর্কে-তত্ত্বে কি দরকার? সোজা পথ ভক্তির পথ। ভক্তিতেই মুক্তি। তাতেও টিপ্পনি কাটলে হাজরা। বললেন 'যাই বলো ব্রাহ্মণশরীর না হলে মুক্তি হবে না।'

'সে কি?' ঠাকুর ঝলসে উঠলেন: 'শবরী ব্যাধের মেয়ে, শূদ্র। তার ভক্তিতেই মুক্তি হয়েছিল। কি, হয়নি?'

শবরী বনের মেয়ে। ফুল তোলে, পাখির গান শোনে, বুনো ফল খায়, তৃণগন্ধের ঘ্রাণ নেয়। গিরিনদীতে স্নান করে, তরুছায়ায় আলুল চুলে বসে থাকে। কখনো বা শুয়ে থাকে। সকাল-সন্ধ্যা সূর্যের উদয়-বিলয় দেখে। রাতে চাঁদ উঠলে আর ঘরে ফেরে না।

দণ্ডকারণ্যে তার অনেক সঙ্গিনী। তাদেরকে জিগগেস করে, তোরা বলতে পারিস এ সূর্য-চন্দ্র কে করেছে? নীলাম্বর ভরে কে এত ঢেলে দিয়েছে জ্যোৎস্না? পাখিদের কণ্ঠে কে দিয়েছে এত অমিয়? মৃগশাবকের চোখে কে দিয়েছে এত বিস্ময়সারল্য? তোরা বলতে পারিস কে সে?

সঙ্গিনীরা কি বলবে! যা জানি না তা জানি না। অত খোঁজাখুঁজিতে কাজ কি! কি দিয়েছে তাই দেখ, কে দিয়েছে তা নিয়ে তোর কি দরকার!

আমার প্রশ্ন 'কি' নয়, আমার প্রশ্ন 'কে'?

বাপ শবরীর জন্যে পাত্র ঠিক করেছে। শুধু পাত্র নয়, দিনও স্থির। নিমন্ত্রিতদের

জন্তে এক পাল গরু-মোষও কেনা হয়েছে। ব্যবস্থা হয়েছে ভূরিভোজের।

অন্তরের গভীরে শিউরে উঠল শবরী। তার জন্তে নিরীহ পশুহনন হবে! রক্তনদীর পারে বসে প্রিয়মিলন! তার প্রিয় কে? গিরিধর গোপাল বিনা কে আর আমার প্রিয়তম!

বিয়ের রাত্রে শবরী গৃহ ছাড়ল। বন হতে বনান্তর ঘুরে পৌছুল পম্পা সরোবরের পারে মতঙ্গ মুনির আশ্রমে। পিছনে চর ছুটেছে শবরীকে ধরে নিয়ে যাবার জন্তে। এবার মতঙ্গের আশ্রমে এসে শবরী নির্বিঘ্ন হল। কারু সাধ্য নেই মুনির আশ্রয় থেকে তাকে বিচ্যুত করে।

ছোট একটি পর্ণকুটির তৈরি করল শবরী। ঋষিসেবায় মন দিলে। ভূমিতলে শোয়, গাছের বাকল পরে, ফলমূলের অতিরিক্ত কোনো ভোজন নেই। রাত্রির তৃতীয় প্রহরে ঘুম থেকে উঠে শৌচ-পূজা সেরে পথে এসে বসে। যে পথ দিয়ে ঋষিরা স্নানে যাবেন সেই পথে। সেই পথের কণ্টক-কঙ্কর তুলে দেয়, বালি কুড়িয়ে এনে পুরু করে ঢেলে দেয় পাথরের উপর। যাতে ঋষিদের পায়ে এতটুকু কাঁটাখোঁচা না লাগে। ঋষিরা স্নানে গেলে কুশসমিধ আহরণ করতে বেরোয়। তার এই অলক্ষিত সেবা মতঙ্গ মুনি টের পেলেন। দিলেন তাকে যোগদীক্ষা। নাম রাখলেন শ্রমণী। বললেন, নিজ কুটিরে অপেক্ষা করো, তোমার প্রাণনাথ দেখা দেবেন, তোমাকে।

অপেক্ষা করবার অধিকার পেয়েছি আর আমার কি চাই! আমার অপেক্ষাই টেনে আনবে অপরূপকে।

রাজা দশরথের বড় ছেলে রাম চৌদ্দ বছরের জন্তে বনবাস করছে, এ খবর বনচরদের মুখে-মুখে। আর বনবাসী ঋষিদের জানতে বাকি নেই সেই রামই বিষ্ণুর অবতার।

সেই কমলায়তাক্ষ নবদূর্বাদল শ্যাম রামই আমার প্রিয়তম। সন্দেহ কি, তিনি আসবেন আমার কুটিরে!

গুরুবাক্য মিথ্যে হবার নয়। আমি প্রতিমুহূর্তে প্রস্তুত আমার প্রতীক্ষায়। এমন যেন না হয় তিনি এসেছেন অথচ আমি প্রস্তুত নই।

মতঙ্গ মুনি মারা গেলেন। একে-একে আর-আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা। আশ্রম জনমানবহীন হয়ে গেল। বনচরেরা এ আরণ্যপ্রান্ত পরিত্যাগ করলে। শবরী একাকিনী বসে আছে তার কুঁড়ে ঘরে। বিরহোৎকণ্ঠা বিহ্বলা শবরী। প্রভাততপস্যায় তমস্বিনী শর্বরীর মত। এই বুঝি এলেন, পাতার মর্মরে বাতাসের নিশ্বাসে এই বুঝি তাঁর পদশব্দ!

দণ্ডে শতবার বাইরে বেরিয়ে আসে। এগিয়ে গিয়ে দেখে কোথায় তিনি? কোথায় তিনি? আবার ফিরে এসে স্থির হয়ে বসে ঘরের শূন্যতায়। কোথায় তুমি? কবে আসবেন ঠিক নেই, তাই নিত্য প্রত্যূষে স্নান করে গন্ধপুষ্প চয়ন করে শবরী। শুধু ফুল নয় রসাল ফলমূল। পর্ণপুট ভরে শীতল জল ধরে রাখে। অজিন আসনটি পেতে রাখে মেঝের উপর। আর পথের দিকে সতৃষ্ণ বিমর্ষ চোখ দুটি মেলে তাকিয়ে থাকে। দু-এক বছর নয়, দীর্ঘ বারো বছর। ঘরে দরজা নেই শবরীর, চোখে নেই স্বপ্নহরণ নিদ্রা। তবু কোথায়, কোথায় আমার হৃদয়রঞ্জন, আমার লোচনাভিরাম!

সীতাহরণের পর রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে বনে-বনে ঘুরছেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে। খুঁজতে খুঁজতে পথিমধ্যে মৃতকল্প জটায়ুর সঙ্গে দেখা! জটায়ু বললে, পম্পা সরোবরের পূবে ঋষ্যমূক পর্বত। সেখানে গেলেই সন্ধান পাবে জানকীর।

পম্পার দিকে যাত্রা করল রাম-লক্ষ্মণ। ঋষ্যমূক পরে যাব, দেখে আসি ঐ পর্ণ-কুটীর, কে রয়েছে একাকিনী। অন্ত্যজার ঘরে দাঁড়ালেন এসে ভগবান।

॥ ১৪৫ ॥

ঠাকুরের ঘরের রেকাবি হারিয়েছে। বুন্দে ঝি আর রামলাল কথা-কাটাকাটি করছে। তারপর দুজনে মোকাবিলা হল ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর বললেন, 'কই এখন আর দেখতে পাই না। আগে ছিল বটে দেখেছিলাম।'

'আমার সব আছে। স্ত্রী আছে। ঘরে-ঘরে ঘটিবাটিও আছে।' বললেন ঠাকুর, 'হরে প্যালাদেরও খাওয়াই, হাবির মা এলেও ভাবি।'

মধ্যবিত্ত সংসারীর কথা। কিন্তু মন রয়েছে ঈশ্বরের পাদপদ্মে।

বিষয়ী লোকদের টানবার জন্যে গৌরনিতাই তাই পাঁতি দিলেন: মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, বোল হরিবোল। লোকে ভাবলে খাসা ব্যবস্থা। এস না যদি প্রথম দুটি বস্তু পাওয়া যায়, করি না একটু হরিনাম। মাগুর মাছের ঝোল আর কিছুই নয়, প্রেমের অশ্রুনির্ঝর। যুবতী মেয়ে আর কিছুই নয় পৃথিবী। যুবতী মেয়ের কোল মানে হরিপ্রেমে ধুলোয় গড়াগড়ি। একবার জিভে একটু নাও না হরিনামামৃতচ্ছটা, দেখ না চোখে জল আসে কিনা, ইচ্ছে করে কিনা ধুলোয় বিলুণ্ঠিত হই।

কাঁটালের মাছি কি গোলাপের গন্ধে আকৃষ্ট হবে? হবে না। সুতরাং গোলাপের নির্যাস আগে একটা শিশির মধ্যে বন্ধ করো। শক্ত করে ছিপি আঁটো। তারপর শিশির গায়ে ঘন করে কাঁটালের রস মাখাও। সেই রসের গন্ধে ছুটে আসবে

কাঁটালে মাছি। মাছি এসে জড়ো হলেই খুলে দাও ছিপি, ঢেলে দাও গোলাপের নির্যাস। তখন কাঁটালের মাছি বসে যাবে ডুবে যাবে, আর উড়ে পালাবে না। ঘটিবাটি আছে বটে কিন্তু ছুতে পারেন না ঠাকুর। গাড়ু পর্যন্ত না। ধাতুদ্রব্য ছুঁলেই হাত বেঁকে যায়, ঝনঝন কনকন করে। কলাপাতায় ভাত খান। জল খান ভাঁড়ে করে।

তামাক খান ঠাকুর।

আগরপাড়ার বিশ্বনাথ কবিরাজ দেখতে এসেছে ঠাকুরকে। ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'হ্যাগা, তামাক খেলে কি হয় ?'

কবিরাজ বললে, 'বায়ু কম হয়। তবে আপনি যখন খাবেন, ছিলিমের উপর কিছু ধনের চাল আর মৌরি দিয়ে খাবেন। তাতে উপকার হবে।'

তথাস্তু। ওরে রামলাল, ধনের চাল আর মৌরি যোগাড় কর।

সঙ্গে একটি বটুয়া রাখেন। বটুয়ার মধ্যে মশলা। মশলা খান মাঝে-মাঝে। বটুয়াটি রঙিন।

সেইবার একটা লেমনেড খেয়েছিলেন অশ্বিনী দত্তের হাতে।

ঈশানের বাড়িতে সেবার জল খেতে চেয়েছিলেন। কে একজন এক গ্লাশ জল ঠাকুরের সামনে এনে রাখল। কিন্তু সেই জল স্পর্শ করলেন না ঠাকুর।

কেন কি হল ?

যে জল রেখে গেছে সে লোকটা উচ্ছৃঙ্খল। জলের মধ্যে দেখতে পেলেন তার স্বভাবের আবিলতা।

মশারি গুঁজে নিতে পারেন না। না বা জামায় বোতাম লাগাতে। শুতে যাবেন দরজায় খিল লাগাবেন না।

কে একজন হঠাৎ তাঁর সামনে নতুন কাপড় ছিঁড়ে ফেলল। ঠাকুর যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলেন এ যেন তাঁকে লেগেছে।

গরমের দিনে মছলন্দের মাদুর পেতে বসেন বারান্দায়। কখনো বা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে। মাস্টারকে বললেন, 'পা-টা একটু কামড়াচ্ছে, একটু হাত বুলিয়ে দাও তো গা।'

মাস্টারকেই বললেন মাকিনের জামা দিতে। সেদিন বললেন, 'একটা শাদা পাথরের বাটি এনো। এক পো আন্দাজ দুধ যাতে ধরে।' হাতের ইশারায় বাটির গড়ন বুঝিয়ে দিলেন, 'আর সব বাটিতে আঁষটে লাগে।'

খবরের কাগজ দেখতে পারেন না। গিরিশের বাড়িতে বৈঠকখানায় গিয়ে দেখলেন একখানা খবরের কাগজ পড়ে আছে। ইশারায় বললেন সেটাকে

সরিয়ে নিতে। না সরানো পর্যন্ত বসলেন না।
কালো বার্নিশকরা চটি পরেন। ধুতির পাড় লাল। এমনিতে গায়ে একটা পিরান, আস্তিনটা কনুই ও কবজির মাঝামাঝি। শীতের দিনে ফুলকাটা মোজা, বনাতের জামা, কান-ঢাকা টুপি।
গেরো বাঁধতে পারেন না। গেরো বাঁধলেই দম বন্ধ হয়ে আসে।
শম্ভু মল্লিকের ওষুধখানা থেকে একটু আফিং নিয়ে বেঁধেছিলেন কাপড়ের খুঁটে, ব্যস, পথ ভুল হয়ে গেল। শ্রীমা'র হাত থেকে পাওয়া একটু মশলা একদিন গুঁজেছিলেন ট্যাঁকে, ব্যস, গঙ্গায় গিয়ে ডুবলেন। 'দেশেও অমনি একদিন হয়েছিল। আম পেড়ে নিয়ে আসছি, পথে আর পা ফেলতে পারি না। দাঁড়িয়ে পড়লাম কাঠ হয়ে। তখন কি করি, আমগুলো ফেলে দিলুম ডোবার মধ্যে। তখন পায়ে চলার শক্তি এল।'
গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে যেমন এলোমেলো হয়ে বসে তেমনি বসেন চাপাটি খেয়ে। কোঁচা নেই, কাপড়টা লম্বা চাদরের মত করে বাঁ কাঁধে ফেলা। যখন কীর্তনে যোগ দেন কোঁচার কাপড়টা কোমরে ফেটি করে বাঁধেন। যখন বালক সাজেন তখন আবার অন্যরকম করে পরেন।
সেদিন বালক সেজে বালিশ কোলে নিয়ে বসেছেন। বালিশকে ছেলে করে দুধ খাওয়াচ্ছেন আর হাসছেন বালকের মত।
সমাধি অবস্থাতেও মুখে হাসি।
হিসেব করতে পারেন না। মাইনে নিয়ে একবার কি গোল বাধল। শ্রীমা বললেন, খাজাঞ্চিকে একবার বলা যাক। ঠাকুর ছি-ছি করে উঠলেন : 'হিসেব করব?'
সেবার মণি মল্লিক তীর্থ করে ফিরেছে। ঠাকুরকে এসে বললে, 'অনেক সব সাধু দেখে এলাম।'
'কেমন দেখলে সব?'
'দেখলুম, তবে কিনা—'
'তবে কিনা কি?'
'তবে কিনা সব্বাই পয়সা চায়।'
মণি মল্লিক ভেবেছিল ঠাকুর বোধ হয় সেই সব অর্থী সাধুদের উপর বিমুখ হয়ে উঠবেন। কিন্তু ঠাকুরের সায় ঐ সব সাধুদের দিকে। বললেন, 'ক'টা বা আর চায় শুনি? হয়তো একটু তামাক বা গাঁজা খাবে তার জন্যে। তোমাদের দুধের বাটি ঘিয়ের বাটি চাই, ওদের একটু তামাক-গাঁজাও খেতে দেবে না? সব ভোগই তোমরা করবে?'

সহজ সদানন্দ পুরুষ, সকলের জন্যে দরদ। সর্বভূতে ক্ষান্তি। গগনাঙ্গনে সার্বকালিকী জ্যোৎস্না। কারু প্রতি কার্পণ্য নেই, কুণ্ঠালেশ নেই। ভূতানুকম্পী জনই আসল সাধু। ঠাকুর হচ্ছেন ভূতানুকম্পী।

নারকেলের নাড়ু ভালবাসেন। জিলিপিকে বলেন লাটসাহেবের গাড়ির চাকা। আর কিছু না, দাও একটু ভাতের মণ্ড, একটু সুজির পায়েস। অল্প নিয়েই আমার তুষ্টি। উপকরণ সামান্য উপভোগ অন্তহীন।

যার যা পেটে সয়। যার যেমন ধাত।

একবার যোগীন ঠাকুরের কোথায় নিন্দা শুনল। নিন্দা করছে তো করুক, ঠাকুরকে তা স্পর্শও করতে পারবে না। ধোঁয়া কি ম্লান করতে পারে আকাশকে? চুপ করে রইল যোগীন। ফিরে এসে ঠাকুরকে বললে।

ঠাকুর রাগ করে উঠলেন। বললেন, 'আমার নিন্দা করল আর চুপটি করে তাই তুই শুনে এলি? প্রতিকার দূরের কথা, প্রতিবাদও করলিনে একটা? তুই কি মানুষ?'

মাথা হেঁট করে রইল যোগীন।

এর কিছুদিন পরে নিরঞ্জন নৌকো করে দক্ষিণেশ্বর আসছে। সেই নৌকোয় আরো অনেক যাত্রী। কথায়-কথায় ঠাকুরের প্রসঙ্গ উঠেছে। কতগুলি যাত্রী ঠাকুরের নিন্দা শুরু করল। যত কলুষকটূক্তি।

আর যায় কোথা! ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল নিরঞ্জন। নৌকোর দু দিকে পা রেখে দোলাতে লাগল নৌকো। বললে, ডুবিয়ে মারব তোদের। ঠাকুরের নিন্দে সইব না প্রাণ থাকতে।

সকলে তো ভয়ে থরহরি। নৌকো প্রায় ডুবু-ডুবু। সবাই তখন নিরঞ্জনের হাতে-পায়ে ধরল। অনেক কাকুতিমিনতি করতে লাগল। নাক কান মলে প্রতিজ্ঞা করলে আর নিন্দা করবে না ঠাকুরের। তখন নিবৃত্ত হল নিরঞ্জন। সেই কথাই সেদিন বলছিল দক্ষিণেশ্বরে। শুনে ঠাকুর তো জ্বলে উঠলেন। 'শালা, তোর কি! আমার নিন্দে করছিল তো বেশ করছিল। তাতে তোর কি মাথাব্যথা?'

যার যেমন ধাত। যার যা পেটে সয়। যার যেটি সহজ হয়ে আছে।

আবার আরেকদিন।

কালীমন্দিরের ঘাটে স্নান করতে আসে এক পতিতা। স্নান সেরে ফিরে যাবার পথে ঠাকুরকে প্রণাম করে দূর থেকে। দু-একটি কথাও বা কয় মাঝে-মাঝে। এই নিয়ে আবার পাড়ায়-বেপাড়ায় ফিসফাস।

কথাটা কানে এল যোগেনের। সে এবার তেরিয়া হয়ে উঠল। এবার আর সে ছেড়ে দেবে না। প্রমাণ যদি দিতে না পারো তবে তোদেরই একদিন কি আমারই একদিন।

তখন নিন্দুকের দল মেয়েটাকে ধরল।

ছি ছি ছি, পাপপ্রশমন মধুসূদন, আর বাড়িও না পাপের বোঝা। লজ্জানিবারণ, লজ্জা কেড়ে নিও না। নিজের দেহ বিকিয়েছি বলে দেবচরিত্রে কালি দেবো! আমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন, কলুষিত তবু দেখেছি সেই সরসিজাসন নারায়ণকে।

নিন্দুকের দল লেজ গুটোল। উদ্যতমুষ্টি যোগেন বুঝি পিছু নিয়েছে।

ঠাকুর যোগেনকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'ছাগলে কি না খায় পাগলে কি না বলে! তার জন্যে তোর কেন আস্ফালন? ওসব কথায় তোর কান দেবার কি হয়েছে!'

যখন যেমন তখন তেমন। যার বেলায় যা তার বেলায় তা।

কাপড়চোপড় রাখবার জন্যে ঠাকুরের একটা বাক্স ছিল। সেই বাক্সে আরশুলা বাসা বেঁধেছে। বাক্সে একদিন নাড়াচাড়া পড়তেই বেরিয়ে পড়ল আরশুলার দল।

'ধর্, ধর্—' ঠাকুর তেড়ে গেলেন।

একটাকে মুঠোয় চেপে ধরেছে যোগেন। ঠাকুর বললেন, 'ওটাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফ্যাল।' বাইরে নিয়ে গেল বটে কিন্তু মারল না। ছেড়ে দিল। এ নিয়ে আবার ঠাকুর মাথা ঘামাবেন ভাবতে পারেনি যোগেন। ঘুরে ফের ফিরে আসতেই জিগগেস করলেন, 'কি রে আরশুলাটা মেরে ফেলেছিস তো?'

যোগেন ভ্যাবাচাকা খেল। ঢোঁক গিলে বলল, 'না মশায়, ছেড়ে দিয়েছি।'

'আমি তোকে কি বলেছিলাম?'

'মেরে ফেলতে বলেছিলেন।'

'তবে ছেড়ে দিলি কেন?'

যোগেনের মুখে কথা নেই।

ঠাকুর বললেন, 'শোন, যেমনটি করতে বলব তেমনটি করবি। নিজের মতে চলবিনে।'

গুরুবাক্যই বেদবাক্য, বহ্নিবাক্য। পিতা আর গুরু সমান। পুত্র আর শিষ্যও তেমনি। গুরুকে মানলেই গুরু তোকে টানবেন, ডাকবেন, রাখবেন।

শিব-দুর্গা ঘুমুচ্ছেন, দরজায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে গণেশ। হঠাৎ পরশুরাম এসে তার গুরু শিবের দর্শন চাইল। গণেশ বললে, হবে না, আরেক সময় এস।

আমার এখুনি দর্শন চাই। পরশুরাম জোর দিয়ে বললে। তাঁরা এখন ঘুমুচ্ছেন, তাঁদের ঘুমের ব্যাঘাত হতে দেব না। গণেশ রুখে দাঁড়াল। ও সব কথা শুনছি না, দ্বার ছাড়ো। পরশুরাম নাছোড়বান্দা। দর্শন করতে যখন মন হয়েছে কেউ পারবে না ঠেকাতে। লেগে গেল মারামারি। গণেশ পরশুরামকে ধরে ত্রিভুবন ঘুরিয়ে ছুঁড়ে মারল মাটিতে। তখন পরশুরাম কি করে, শিবের থেকে পাওয়া পরশু ছুঁড়ে মারল গণেশের উপর। গণেশের একটা দাঁত ভেঙে পড়ল। রক্তারক্তি কাণ্ড। গোলমাল শুনে ঘুম ভেঙে গেল শিব-দুর্গার। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখেন গণেশের এই অবস্থা। তখন ভগবতী শূল তুললেন। তেড়ে মারতে গেলেন পরশুরামকে। মহাদেব নিরস্ত করলেন ভগবতীকে। বললেন, আত্মজ যেমন পুত্র শিষ্যও তেমনি পুত্র। তাই গণেশ আর পরশুরাম সমান। সুতরাং পুত্রবুদ্ধিতে পরশুরামকে ক্ষমা করো। ভগবতীর ক্রোধ শান্ত হল। পরশুরামকে ক্ষমা করলেন, রক্ষা করলেন।

গণেশও হতাশ হবার ছেলে নয়। ভগ্ন দন্ত তুলে নিলে মাটি থেকে। সেটিকে নিজের যোগদণ্ড করলে। সেই থেকে তার নামও হয়ে গেল একদন্ত।

হাজরার বেলায় 'পাটোয়ারী বুদ্ধি', অথচ যোগেনের বেলায়, 'ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন?'

একটা কড়া কিনতে বাজারে পাঠিয়েছেন যোগেনকে। অত শত কে দেখে, দোকানীকে শুধিয়েছে, ভালো জিনিস তো, দোকানী বলেছে, ভালো। সরল বিশ্বাসে তা-ই নিয়ে এসেছে বাড়ি। দেখি কেমন কড়া আনলি? কড়াটা হাতে নিতেই ঠাকুর দেখতে পেলেন কড়াটা ফাটা। জল দিতেই দেখা গেল জল পড়ছে। তখন খুব চটে উঠলেন ঠাকুর। বললেন, 'ভক্ত বলে তুই বোকা হবি? দোকানীর কথায় বিশ্বাস করে একটিবার না দেখেই তুই নিয়ে এলি? দোকানী কি দোকান ফেঁদেছে ধর্ম করতে?'

লজ্জায় ম্লান হয়ে গেল যোগেন।

ভবের হাটে সুখ কিনতে বেরিয়েছিস। যাচাই-বাছাই করে ছাখ কোন সুখটা টেকসই অথচ সুলভ। বাজার করতে এসে আমি ঠকে যাব কেন? আমি ঠকতে তো আসিনি! চোখ কান খোলা রেখে সওদা করে যাব। সুখের বস্তুটাকে দেখব ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। টুটা-ফুটা দেখলে কিছুতেই কিনব না। কিছুতেই না।

প্রভু বললেন, 'সহজ না হলে সহজকে চেনা যায় না।'

আর কিছু না পারো সহজ হয়ে যাও। তাকেই বলে সহজানন্দ হওয়া। চলতে-

এলতে যা কিছু পথে এসে পড়ে তাতেই আনন্দ। তাতেই পরমপূর্ণতা।
তোমার মুখখানি দেখব বলে কত সন্ধান করেছি দিকে-দিকে। গিয়েছি পর্বতে অরণ্যে সজনে বিজনে, হয়েছি একান্তচারী, কখনো বা ঐহিকদর্শী। পরিক্রমা করেছি সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা। কোথায় তোমার মুখ? সব সময়ে মনে হয়েছে অস্পষ্ট, নীরব, অবগুণ্ঠিত। কোথায় কোন স্বর্গার্গল উদ্‌ঘাটন করলে দেখব সেই মনোনয়ননন্দন মনোহর মুখখানি?
সর্বতীর্থে স্নান করে এলাম, দীক্ষা নিয়ে এলাম সর্বমন্ত্রে, তবু তোমার সেই উন্মুদ্র কমলকোষ কোমল মুখখানি চোখে পড়ল না।
তারপর শরণ নিলাম মানসনিলয়ে। আশ্চর্য, সেইখানেই তোমার সুচির-রুচির মুখখানি ফুটে আছে।
বুঝেছি চিত্তের সহজ সুখই তোমার মুখ।

॥ ১৪৬ ॥

কায় বাক্য মন এই তিন নিয়ে ধন।
কায়মনোবাক্যে সেবা করছেন শ্রীমা। সেবার, কতদিন আগের কথা, ঠাকুরের যখন আমাশা হয়েছিল দক্ষিণেশ্বরে, সেবার ভার ছিল হৃদয়রামের হাতে। শ্রীমাকে ঘেঁষতে দেয়নি কাছে। কাশী থেকে না কোথেকে একটি মেয়ে এসে হাজির, অবাক্যব্যয়ে লেগে গেল ঠাকুরের পরিচর্যায়। মাকে ধরে নিয়ে এল তাঁর চালাঘর থেকে। বললে, 'তাঁর এমন অসুখ আর তুমি এমনি দূরে পড়ে থাকবে?'
'কি করি, ভাগ্নের বউ রয়েছে যে ঐচালাঘরে। আমি নইলে ওকে আগলাবে কে?' সে ওরা লোক-টোক রেখে দেবে'খন।' বললে সেই অপরিচিতা। 'তাই বলে তুমি তোমার স্বামীসেবার হাত লাগাবে না?'
আরোগ্যের দেশে ঠাকুরকে নিয়ে আসবার জন্যে আরামের দেশে চলে এলেন শ্রীমা।
কিন্তু কাশীর মেয়েটি গেল কোথায়? যেন হাওয়া হয়ে মিলিয়ে গেল। ঠাকুরের প্রয়োজনে এসেছিল, প্রয়োজন সাধন করে ছুটি নিলে।
এবারের সেবায় প্রথম শ্যামপুকুরে, শেষে কাশীপুরে।
শুধু ওষুধটি হলেই তো চলে না, পথ্যটিও দরকার। পথ্য কে রান্না করে? শুধু রান্না করলেই তো চলে না, খাওয়ায় কে? পথ্যের সঙ্গে কে মেশায় প্রচ্ছন্নপবিত্র প্রেম? অন্তর-সুষমার শুশ্রূষা?

boiRboi.net

লজ্জাপটাবৃতা হয়ে বাস করছেন শ্রীমা। চারদিকে ভক্ত ছেলেদের ভিড়, তারই মধ্যে সবাইকার মা রয়েছেন অন্তরালবর্তিনী হয়ে। মহাবলসম্পন্না কল্যাণেচ্ছার মত।

ভাতের মণ্ড তৈরি করছেন। কখনো বা মাংসের সুরুয়া।

দুপুরবেলা পথ্য তৈরি হলে, বুড়ো গোপাল বা লাটুকে দিয়ে খবর পাঠান। এবার তবে লোক সরিয়ে দাও। মা নিজে এসে খাওয়াবেন ঠাকুরকে।

'সেবা বস্তুতে নয়, সেবা অন্তরের ইচ্ছাটিতে।' একদিন লাটুকে বললেন ঠাকুর, 'ভিক্ষে করে এনেও যদি প্রিয় জিনিস কেউ ভগবানকে উপহার দেয়, সে সেবাও উত্তম জানবি।'

কি ছিল সেটি বিচার্য নয়, কেমন করে ছিল, কোন ভাবের থেকে ছিল সেইটিই জিজ্ঞাস্য।

কে এক বড়লোক ভক্ত শ্রীশ্রীমাকে একখানি ছোট সিংহাসন উপহার দিয়ে গেছে। সেখানে ঠাকুরকে বসিয়ে পুজো করবেন বলে।

তুই এত বড় একটি ডাকসাইটে বড়লোক অন্তত একটা রূপোর সিংহাসন দে। কি একটা জার্মান সিলভারের সিংহাসন নিয়ে এসেছিস! ভক্ত-মেয়েরা লোকটিকে বিদ্রূপ করতে লাগল। কী হাড়কৃপণ, পয়সা তো নয় যেন বুকের পাঁজর। 'তুমি এ সিংহাসন ফেরত দাও মা।' কেউ-কেউ বললে। 'ও সব জাঁকের বড়লোকের চাইতে গরিবের ভক্তি অনেক বেশি।'

'এ সব কথা বোলো না।' মা বললেন সুধাসিঞ্চিত কণ্ঠে: 'মানুষের প্রাণে যাতে ব্যথা লাগে, এমন কথা বলতে নেই। ভক্ত যদি বাঁশের তৈরি সিংহাসনও আমায় দেয়, আমি তাও খুশি মনে তুলে নেব। জিনিসের বিচার হবে কি জিনিসের দাম দিয়ে? কখনো না। তার দাম হবে যে দিচ্ছে তার আন্তরিকতা দিয়ে।'

ঈশ্বরকে কি দিচ্ছ? হয় পাতা নয় ফুল নয় একটুখানি জল। দেওয়ার মধ্যে আন্তরিকতার এক ছিটে রস ঢালো, ঈশ্বর হাত বাড়িয়ে লুফে নেবেন। সমস্ত উৎসর্গ স্বর্গসুধান্বিত হয়ে উঠবে।

কি এক কাজে লাটুকে ঠাকুর পাঠিয়েছেন কলকাতায়। ফিরতে-ফিরতে প্রায় বিকেল। ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'কিরে খাওয়া জুটেছে তো কোথাও? না কি উপোস?'

'আপনার কাজে গিয়েছি, অভুক্ত থাকতে পারি?'

'কোথায় খেয়েছিস?'

'শরতের বাড়িতে।' তৃপ্তির পরিপূর্ণ প্রসন্নতা ভেসে উঠল লাটুর মুখে:

'শরতের মা যা খাওয়ালে তার তুলনা হয় না।'

'বলিস কিরে!'

'খেতে-খেতে তাইতো এত দেরি হল। কি সুন্দর যে রাঁধেন শরতের মা!'

'কোন রান্নাটা সব চেয়ে ভালো হয়েছিল?'

'চচ্চড়ি—চচ্চড়ি। এমন চচ্চড়ি জীবনে আমি আর কখনো খাইনি মশাই।'

'বলিস কিরে? সেই চচ্চড়ি তুই একা-একা খেয়ে এলি?' নিজের দিকে ইঙ্গিত করলেন ঠাকুর: 'ইখানকার জন্যে একটু আনলিনে?'

লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে গেল লাটু। সত্যিই তো, মস্ত ভুল হয়ে গেছে। নিজের যা ভালো লাগে তাই তো দেবতাকে উৎসর্গ করতে হয়। তাকেই তো বলে আত্মবৎ সেবা। অর্থাৎ নিজের সেবার পক্ষে যেটি রুচিকর তাই দিয়ে তোমার প্রিয়তমের সন্তোষ করো। যেটিতে তোমার রতি সেইটিতেই আরতি ভগবানের।

'শোন, কাল আবার যাবি কলকাতায়।' ঠাকুর হুকুমজারি করলেন। 'আর সেই শরতের বাড়িতে। শরতের মাকে বলবি ফের তেমনি করে চচ্চড়ি রাঁধতে। আর সেই চচ্চড়ি নিয়ে আসবি ইখানকার জন্যে। বুঝলি?'

পরদিন পায়ে হেঁটে লাটু ঠিক গেল কলকাতায়। শরতের মায়ের থেকে নিয়ে এল চচ্চড়ি। একটু মুখে দিয়ে ঠাকুর তো আনন্দের উদধি হয়ে উঠলেন। বললেন, 'ওরে, সত্যিই তো, এ যে অমৃত। এমন চচ্চড়ি তো কোনোদিন খাইনি। শরতের মা'র মন ভালো নইলে কি রান্নায় এমন তার হয় রে?'

যার মন পরিচ্ছন্ন, তার কাজই শুভাবহ। কাজ মনেরই প্রতিফলন। গোল জিনিসের ছায়া গোল, চৌকোর ছায়া চৌকো। তেমনি তোমার যেমন মর্ম তেমনি কর্ম।

লালাবাবু বেড়াতে বেরিয়েছেন, শরপুঞ্জের মত বৃষ্টি নেমে এল, এক দরিদ্র গ্রাম্য নারীর ঘরের দাওয়ায় তিনি আশ্রয় নিলেন। এমন বর্ষণ যে ছেদ টানতে চায় না। দীর্ঘকাল ধরে অপেক্ষা করছেন লালাবাবু, বৃষ্টির সমাপ্তি নেই। দাঁড়িয়ে থেকে থেকে খিদে পেয়ে গেল যে।

গ্রাম্য নারী দরজা খুলে শীলসম্পন্ন অতিথিকে অন্তঃপুরে ডেকে নিল। ঘন দুধে চিনি ফেলে চারটি চিঁড়ে দিল খেতে। পরম তৃপ্তিতে লালাবাবু খেলেন সে দুধ-চিঁড়ে।

সেই তৃপ্তি সেই প্রীতি নিবেদন করলেন তাঁর রাধাবল্লভকে। শুরু হয়ে গেল রাধাবল্লভের চিঁড়ে-ভোগ।

BanglaBook.org

আমার ভালো লাগা যে তোমারই ভালো লাগা।
আর তোমার যত দুঃখ সব আমার দুঃখের জন্যে।
তাই ঠাকুর একদিন বললেন মাকে, 'জীবের জন্যে আমি শত দুঃখ সয়েছি, তুমিও তাদের একটু দেখো।'
মায়ের খুব জ্বর, থার্মোমিটার লাগাতে এসেছে একটি মেয়ে। থার্মোমিটারটিকে মা বলেন কাঠি।
বললেন, 'ঠাকুরের কথা রেখেছি আমি মা। যেখান থেকে যে এসেছে, কারুকে বারণ করিনি। সবাইকে নাম বিলিয়েছি। মানুষের পাপে তাপে দেহটা জলে গেল। কাঠিতে কি জ্বর পাবে মা! এ আমার অন্তঃজ্বরা।
মাঝে-মাঝে ঠাকুরের একটু পা টিপে দেন মা। মাঝে-মাঝে সেটি বুঝি মনের মতন হয় না। তখন ঠাকুর মায়ের গা টিপে দেখিয়ে দেন, বলেন, 'এমনি করে টেপো।' ঠাকুর কিছু খেতে পাচ্ছেন না।
ঠাকুরের দাদা রামকুমার বিকারের সময় জল খাচ্ছেন, তাড়াতাড়ি হাত থেকে জলের গ্লাশ কেড়ে নিলেন ঠাকুর।
খুব চটে গেলেন রামকুমার, শাপ দিয়ে বসলেন। বললেন, 'তুই যেমন আমায় জল খেতে দিলিনে, তুইও তেমনি শেষ সময়ে খেতে পারবি নি কিছু।'
ঠাকুর বললেন, 'আমি তো তোমার ভালোর জন্যে জল খেতে দিচ্ছি না। তাই বলে তুমি আমাকে শাপ দিলে?'
তখন যেন চেতনা হল রামকুমারের। কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'ভাই, কেন কে জানে অমন একটা অসম্ভব কথা বেরিয়ে এল মুখ থেকে।'
মুখ দিয়ে যখন বেরিয়ে এসেছে তখন আর ফিরিয়ে নেওয়া চলবে না। হোক না সে ছোট ভাই। আপনার জন।
'তার মানে,' মা বললেন, 'কর্মের ফল ঠাকুরকেও ভোগ করতে হয়েছে। অনেক জন্মের সংস্কারের ফল। যে কটা ঢেউ আছে সব কাটিয়ে যেতে হবে।'
কিন্তু সবদিন এমন ছিল না।
সেই এক বুড়ি লাঠি ধরে কাঁপতে-কাঁপতে এসেছে দক্ষিণেশ্বর। ডান হাতে লাঠি, বাঁ হাতে ছোট্ট একটি পাতার ঠোঙা।
ইচ্ছে ঠাকুরকে একটু মিষ্টিমুখ করানো। কিন্তু তাঁর ঘরে প্রচণ্ড ভিড়। সাধ্য কি অনামা-অজানা বুড়ি সে ঘরে ঠাঁই পায়। নিরিবিলিতে বলে একটু তার প্রাণের কথা।
অগত্যা নবতে এসে দাঁড়াল। বললে, 'মা, একটু সন্দেশ এনেছিলুম ওঁকে খাওয়াব

বলে। কি বিরাট ভিড় হয়েছে সেখানে। উপায় নেই মনের ইচ্ছাটি পূর্ণ করি। তাই তোমার কাছে রেখে গেলুম মা; আমার হয়ে তুমি খাইয়ে এস।'

'ঐ ভিড়ের মধ্যে আমিই বা যাব কি করে?' বললেন শ্রীমা। 'আপনার সন্দেশ আপনিই দিয়ে আসুন।'

বুকে বল বেঁধে ভিড়ের দিকে আবার এগুলো বৃদ্ধা। আশ্চর্য, ঢুকতে কেউ তাকে বাধা দিল না। দেখল তক্তপোশের পায়ার কাছে অনেকে অনেক রকম নৈবেদ্য রেখে গেছে, তারই মধ্যে নিজের ছোট্ট ঠোঙাটি লুকিয়ে রাখল। প্রণাম করে চলে গেল নীরবে। প্রাণের কথাটি বলা হল না। হে হৃদয়বিহারী বুঝে নাও আমার মর্মের গুঞ্জন।

ভাবাবেশ হয়েছে ঠাকুরের। দেহভূমিতে নেমে বলে উঠলেন, 'খাব। খিদে পেয়েছে।'

স্তূপীকৃত নৈবেদ্য থেকে বড় ঠোঙাটি বেছে নিলেন গৌরীমা।

ঠাকুর বললেন, 'উঁহু।'

শাঁসালো দেখে আরো একটি বের করলেন গৌরীমা। এটিও ঠাকুর বাতিল করে দিলেন। আঙুল দেখিয়ে বললেন: 'ঐ যে, ছোট্ট ঠোঙাটি—'

সেই বুড়ির ঠোঙা। সেই বুড়ির নিবেদন।

সবটুকু সন্দেশ খেয়ে নিলেন ঠাকুর। সন্দেশের মিঠায় শুনলেন তার প্রাণের কান্নার মধুরিমা।

সেদিন ছোট একটি ছেলেকে নিজেই ডাকলেন সন্দেশ খেতে। তিন-চার বছরের শিশু, কখন দরজা খোলা পেয়ে ঢুকে পড়েছে কে জানে। দাড়ি-গোঁফওলা অচেনা লোক দেখে খানিকটা ভয় পেয়েছে বোধ হয়, কিন্তু মুখে দুষ্টুমিমাখা মিষ্টি হাসি—যেন আর দু পা এগিয়ে এলেই কিছু একটা লোভের বস্তু পাওয়া যাবে। 'আয়, আয়।' ঠাকুর হাত বাড়ালেন: 'সন্দেশ খেতে দেব।'

এক গাল হেসে শিশু ঠাকুরের কোলে চড়ে বসল।

ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'তুই কাদের বাড়ির ছেলে?'

আর কাদের বাড়ি! যিনি কোলে তুলে নিয়েছেন, তিনিই আমার বাড়ি-ঘর। ছেলেটা কথা কয় না, নির্ভয়ে হাসে।

'তোর নাম কি?'

উজ্জ্বল চোখে ছেলেটা বললে, 'শিবকালী।'

দরজায় কার ছায়া পড়ল। ঠাকুর তাকিয়ে দেখলেন স্ত্রীলোক। ছেলে কোথায় লুটিয়ে পড়ে ঠাকুরকে প্রণাম করবে, তা নয়, এক লাফে কোলে উঠে বসেছে,

boiRboi.net

তাই অস্থির পায়ে ছুটে এসেছে মা। চোখে নীরব শাসন, নোংরা ছেলে, ছু ছেলে, নেমে পড় শিগগির।

'এ তোমার খোকা বুঝি?' ঠাকুর বললেন স্ত্রীলোকটিকে, 'বেশ নাম রেখেছ। শিবকালী।' বলে তিনবার উচ্চারণ করলেন, শিবকালী, শিবকালী, শিবকালী। আদি-মধ্যান্ত-শূন্য শিব, ভবভয়শমনী কালী। বারাণসীপুরপতি বিশ্বনাথ, কাশীপুরাধিশ্বরী অন্নপূর্ণা।

জ্যেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠ পূর্ব-প্রথম ইজ্য-পূজ্য মান্য-শ্লাঘ্য সকলকে প্রণাম, আবার সদ্যোজাতকেও প্রণাম। প্রণাম শিশু ভোলানাথকে।

কালীঘাট অঞ্চল থেকে এসেছে স্ত্রীলোক। নাম ব্রজবালা। ঠাকুরের কাছে আসবার আগে ছেলে কোলে নিয়ে গিয়েছিল নবতে, শ্রীমা'র কাছে। ছেলের মঙ্গল চেয়েছিল। শ্রীমা বললেন, ছেলেকে ছেড়ে দাও, ঠাকুরের কাছে চলে যাক গুটি-গুটি। আর শিবকালীকে শিখিয়ে দিলেন, গিয়েই ঠাকুরকে প্রণাম করবি, পায়ের নিচে পড়ে ধুলোয় গড়াগড়ি খাবি। বুঝলি?

খুব বুঝেছে যা হোক। পায়ে না পড়ে কোলে চড়ে বসেছে। শিশুর হাতে ঠাকুর একটি সন্দেশ দিলেন। বললেন, 'খা।' লোভার্ত ছেলে, অথচ মুঠোর মধ্যে সন্দেশ চেপে ধরে নিস্পন্দ হয়ে রইল। শুধু বলতে লাগল, শিবকালী, শিবকালী, শিবকালী।

ব্রজবালা ছুটে এল মা'র কাছে।

মা বললেন, আর ভাবনা কি, তোমার ছেলের কাজ হয়ে গেল!

শুধু ঈশ্বরকে আশ্রয় করে থাকো আর নাম করো। কালাতীতকল্যাণ শিব আর কারুণ্যপূর্ণেক্ষণা কালী।

একবার একটি ভক্ত এসে বললেন শ্রীমাকে, 'মা, আমি জপের সংখ্যা ঠিক রাখতে পারি না। হাত চলে তো মুখ চলে না আর মুখ চলে তো হাতের গণনা ভুল হয়ে যায়।'

শ্রীমা বললেন, 'এর পর দেখবে হাত-মুখ কিছুই চলবে না, শুধু মনে, নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে।'

নিশ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করো। নামসাধনই পরম সাধন। নিশ্বাস-প্রশ্বাসেই রক্ত-চলাচল, দেহরক্ষা। দেহের প্রতিটি অণুতে-পরমাণুতে তার কাজ। অনেক রকম গন্ধ নিয়েছ তোমার ঘ্রাণে, এবার নামসৌরভ নাও। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে নাম-গন্ধ মিশে গেলে ধীরে-ধীরে সমস্ত দেহ নামময়, নামাঙ্কিত হয়ে উঠবে। এই ভাবেই সাত্ত্বিক হয়ে উঠবে দেহ। সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত কর্মও

শুভসত্ত্বান্বিত হবে। নাম সাধনই কামশোধন। সর্বশোধন।

এমন কি নাম করতে-করতে দেহে, দেহের অস্থিচর্মে পর্যন্ত, নাম ফুটে ওঠে। বিজয়কৃষ্ণ বললেন, 'অর্ধকুম্ভে বৃন্দাবন গিয়েছিলাম। যমুনার চড়াতে দেখলাম সাধুদের ভিড়। ভাবলাম দর্শন করে আসি। বালির উপর দেখলাম একখানা হাড় পড়ে আছে। সন্দেহ নেই মানুষের হাড়। কি মনে হল, তুলে নিলাম হাড়খানা। দেখি সমস্ত হাড়খানাতে দেব নাগরী অক্ষরে 'হরেকৃষ্ণ' লেখা। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে হাড়খানা দেখালাম সাধুদের। সবাই অবাক হয়ে গেল। নিশ্চয়ই কোনো বৈষ্ণব মহাপুরুষের অস্থি, সকলে সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করতে লাগল। সঙ্কীর্তন লাগিয়ে দিলে। পরে কেশীঘাটের কাছে যমুনার চড়ায়-ই সমাধিস্থ করল অস্থি।'

এক ভক্ত শ্রীমাকে বললে, 'জপ করতে আর ইচ্ছে নেই। করে কিছুই হচ্ছে না। কাম ক্রোধ মোহ আগে যেমন ছিল, এখনো তেমনি আছে। মনের ময়লা একটুও কাটেনি।'

'নাম করতে-করতেই কাটবে।' বললেন শ্রীমা, 'নাম না করলে চলবে কেন? পাগলামি কোরো না। যখনই সময় পাবে নাম করবে। ডাকবে ঠাকুরকে।'

'কই কিছুই হচ্ছে না।' স্বরে অপার নৈরাশ্য নিয়ে বললে সেই ভক্ত। 'আবার সেই পুরোনো অসৎ সঙ্গীদের সঙ্গে মিশি, অন্যায় কাজ করি। যতই চেষ্টা করি না কেন কুচিন্তা ছাড়তে পারি না।'

বরাভয়ময়ী মা বললেন, 'ও কি আর জোর করে ছাড়া যায়? ও তোমার পূর্ব-জন্মের সংস্কারে হচ্ছে। নামেই প্রারব্ধ নষ্ট হবে। নৈরাশ্য ও শুষ্কতার ওষুধই হচ্ছে নাম।'

কাশীপুরের বাড়িতে কাঠের সিঁড়ি। ধাপগুলোও উঁচু-উঁচু। আড়াই সের দুধের বাটি নিয়ে শ্রীমা উঠছেন উপরে, হঠাৎ কি হল, মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। দুধ তো গেলই, মায়ের গোড়ালির হাড় সরে গেল। বাবুরাম ছুটে এসে মাকে তুলে নিয়ে শুইয়ে দিল বিছানায়।

ঠাকুরের কানে গেল সেই কথা। বাবুরামকে ডেকে এনে বললেন, 'তাই তো বাবুরাম, এখন কি হবে? আমাকে খাওয়াবে কে?'

খান তো ভাতের একটু মণ্ড, তা গোলাপ-মা খাইয়ে দেবে। কিন্তু খাদ্যই তো সব নয়, আসল হচ্ছে সান্নিধ্য, সেই আত্মস্থ হয়ে পরমাত্মাতে চিত্ত সংলগ্ন করে থাকা। হাতের কাছে আঙুল ঘুরিয়ে নখ বোঝালেন ঠাকুর। আর নখ দেখিয়ে বোঝালেন শ্রীমাকে। বললেন, 'ও বাবুরাম, এই ওকে তুই একটু আমার কাছে

নিয়ে আসতে পারবি ?'

'কি করে আনব ! মায়ের পায়ে যে ব্যথা। মাটিতে ফেলতে পারেন না পা।'

'কেন একটা ঝুড়িতে বসিয়ে মাথায় করে তুলে নিয়ে আসবি এখানে। তুই আর নরেন। পারবি নে ?'

নরেন আর বাবুরাম তো হেসে খুন।

তিনদিনেই ব্যথার কিছু উপশম হল। নরেন আর বাবুরাম মাকে ধরে নিয়ে গেল উপরে, ঠাকুরের কাছে।

এবার আমাকে তোমার সেবার কাজে লাগাও। আমাকে একলা ফেলে রেখো না। তুমি আমাকে তোমার কাছে-কাছে থাকতে দাও। তোমার এই কাছে-কাছে থাকাটিই আমার একমাত্র পূজা। আমার থেকে চোখ ফিরিয়ে নিও না। আমাকে তুমি ডেকে নাও তোমার পাশটিতে। আমার হৃদয়ে তোমারই যে সঞ্চিত সুধা তারই আস্বাদ গ্রহণ করো আমার হাত থেকে। শুধু আমিই তো তোমাকে চাই না, তুমিও আমাকে চাও। শুধু তুমিই তো আমাকে কাঁদাও না, আমিও তোমাকে কাঁদাই। তাই এবার সব ব্যবধান ভেঙে দাও। তোমার কৃপাচোখে আমাকে দেখ। তোমার স্নেহকরতলে নির্ভয়-নির্ভর করো। আর নাও আমার এই দেবনিন্দিত হৃদয়ের সহজশোভন সম্ভাষণ।

'মাগো, সংখ্যা রেখে কি জপ করব ?' শ্রীমাকে জিগগেস করলে এক ভক্ত।

'সংখ্যা গুণে যোগ করতে গেলে কেবল সংখ্যার দিকে লক্ষ্য থাকবে।' বললেন শ্রীমা, 'তাই এমনি জপ করবে।'

'কিন্তু জপ করতে-করতে মন কেন তাঁতে মগ্ন হয় না ?'

'করতে-করতেই হবে। মন না বসলেও জপ করতে ছাড়বে না। তোমার কাজ তুমি করে যাবে। বসলেই দেহ স্থির, নাম করতে করতে মন স্থির। তাঁকে ষোলো আনা না দিলে চলবে কেন ? একটি স্ত্রীলোকের মন্ত্র ছিল 'রুক্মিণীনাথায়'। সে ঠিক-ঠিক উচ্চারণ করতে পারত না। সে বলত 'রুকু' 'রুকু'। তাতে তাকে ঠেকতে হয়েছিল। পরে গুরুকৃপায় ফের মন্ত্র পেয়ে ভেলা ধরল।'

ঠাকুর বললেন, 'তুমি যদি ষোলো আনার কাপড় চাও তাহলে কাপড়ওয়ালাকে ষোলো আনা তো দিতে হবে। একটু কম পড়লে একটু বিন্ন থাকলে আর যোগ হবার যো নেই। টেলিগ্রাফের তারে কোথাও যদি একটু ফুটো থাকে তা হলে আর খবর যাবে না।'

কিন্তু যাদের গুরুদত্ত মন্ত্র লাভ হয়নি তাদের কি হবে ?

তাদের শুধু আকুল প্রার্থনা, প্রভু, তুমি তো সর্বত্রই আছ তবু আমার কাছে

এসে দাঁড়াও ; তুমি তো সব কিছুই দেখছ তবু আমার চোখের উপর চোখ রেখে আমাকে দেখ ; সব কিছুই তুমি শুনছ তবু আমার বুকের উপর তোমার কান রেখে শোনো আমার নিঃশব্দ কান্না।

সেই নিঃশব্দ কান্নাই আমার মহামন্ত্র। হে জগদ্‌গুরু, এ মন্ত্র তো তোমার দেওয়া। মানুষগুরু মন্ত্র দেন কানে, জগদ্‌গুরু মন্ত্র দেন প্রাণে। হে প্রাণপাল, নিজের দেওয়া মন্ত্রের থেকে নিজের কান ফিরিয়ে নিও না। শোনো আমার কান্না, আমার চিরন্তনী প্রাণবাণী।

॥ ১৪৭ ॥

ঠাকুরের কাছে বিজয়কৃষ্ণ এসেছেন।

কথায়-কথায় বললেন বিজয়কৃষ্ণ, 'কে একজন সদাসর্বদা আমার সঙ্গে থাকেন। আমি দূরে থাকলেও তিনি জানিয়ে দেন কোথায় কি হচ্ছে।'

'ঠিক গার্ডিয়ান এঞ্জেলের মত। তাই না?' বললে নরেন।

ঠাকুরকে লক্ষ্য করে বললেন বিজয়কৃষ্ণ, 'জানো, আমি ঢাকায় ওঁকে দেখেছি।'

'ঢাকায়?' নরেন যেন আকাশ থেকে পড়ল।

'হ্যাঁ, শুধু ছায়া দেখিনি, গা ছুঁয়ে দেখেছি। টিপে-টিপে দেখেছি।'

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'সে তবে আরেক জন।'

নরেন ঢোঁক গিলল। বললে, 'আপনার কথা বিশ্বাস করি না এ কথা বলতে বাধো-বাধো ঠেকছে, কেননা আমিই নিজে যে ওঁকে দূরে বসে দেখেছি। অনেকবার।'

ঠাকুর গোপনে বললেন শ্রীমাকে, 'আত্মাটা যে বেরিয়ে যায় দেহ থেকে, এ ভালো নয়। দেহ বুঝি আর এবার বেশিদিন থাকবে না।'

ঠাকুর তখন অপ্রকট, একটি গৃহস্থ শিষ্য এসেছে মা'র কাছে। বললে, 'মা, কেন ঠাকুরের দর্শন হচ্ছে না?'

'দর্শন কি এতই সোজা?' বললেন মা, 'ডাকতে থাকো, ক্রমে ক্রমে হবে। এ জন্মে না হয় পরজন্মে হবে। পরজন্মে না হয় তার পরজন্মে।'

নরেনের হয়েছিল। হয়েছিল বিজয়কৃষ্ণের।

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গের পঞ্চমখণ্ডে লিখছেন কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী: "গয়াতে দীক্ষা-গ্রহণের পর ঠাকুর (শ্রীবিজয়কৃষ্ণ) কলিকাতায় আসিয়া বরাহনগর মণি মল্লিকদের বাগানে পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। পরমহংসদেব ঠাকুরকে দেখিয়াই বলিলেন, এ কি, তোমার যে গর্ভলক্ষণ হয়েছে। ঠাকুর তখন

তাঁহাকে দীক্ষালাভের সমস্ত পরিচয় দেন। পরমহংসদেব শুনিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আর একবার ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের দর্শনমানসে যান। পরমহংসদেব একটু অসুস্থ ছিলেন। শিষ্যেরা ঠাকুরকে নিকটে যাইতে বাধা দিতে লাগিল। পরমহংসদেব তখন হাতে তালি দিয়া ঠাকুরকে ডাকিতে লাগিলেন। ঠাকুর সম্মুখে যাওয়া মাত্রই পরমহংসদেব বলিলেন, আহা, তোকে দেখে যে আমার হৃদয়পদ্মটি ফুটে উঠল। এই বলিয়াই সমাধিস্থ হইলেন। একবার ঠাকুর পশ্চিমাঞ্চলে বহু স্থান ঘুরিয়া কলিকাতা আসিলেন। একদিন পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরে গেলেন। পরমহংসদেব ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এত তো ঘুরে এলি, কোথায় কি রকম দেখলি বল দেখি? ঠাকুর কহিলেন, কোথাও চার আনা, কোথাও আট আনা, কোথাও বারো আনা চৌদ্দ আনাও দেখেছি, কিন্তু ষোলো আনা এখানে। পরমহংসদেব শুনিয়া ভাবাবেশে জ্ঞানশূন্য হইলেন।"

ঠাকুরের যেমন কালী, বিজয়কৃষ্ণের তেমনি শ্যামসুন্দর।

একদিন শ্যামসুন্দর বিজয়কৃষ্ণকে বললে, 'আমি সোনার চুড়ো পরব। আমাকে একটা গড়িয়ে দে না।'

বিজয়কৃষ্ণ তখন ব্রাহ্মসমাজে। সে বললে, 'আমি তোমাকে মানি না। যারা মানে, তাদের বলো গে। আমার টাকা-পয়সা নেই।'

'তোর নেই, তোর খুড়ির আছে।' বললে শ্যামসুন্দর। 'আখ গে, তোর খুড়ির ঝাঁপির মধ্যে অনেক টাকা। খুড়িকে বলে চেয়ে নে না।'

খুড়িমাকে বললে বিজয়কৃষ্ণ।

'কি আশ্চর্য,' খুড়িমা অভিভূতের মত বললে, 'কাল যে আমাকেও স্বপন দিয়েছেন শ্যামসুন্দর। বললেন, ওগো আমি সোনার চুড়ো পরব। আমি বললুম, টাকা কোথায় পাব? শ্যামসুন্দর বললেন, আখ না ঝাঁপি খুলে, চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা কোন না পাবি? লুকিয়ে-লুকিয়ে সাতষট্টি টাকা জমিয়েছিলাম ঝাঁপিতে, কেউ জানে না, কিন্তু শ্যামসুন্দর ঠিক দেখে রেখেছেন। সাধ্য নেই তাঁর চোখে ধুলো দি।'

অগত্যা বিজয়কৃষ্ণের হাতে টাকা দিল খুড়িমা। সেই টাকায় ঢাকা থেকে গড়ানো হল সোনার চুড়ো।

সেই সোনার চুড়ো পরানো হল শ্যামসুন্দরকে।

সন্ধের আগে ছাদে গিয়েছে বিজয়, শ্যামসুন্দর ঘর থেকে উঁকি মারল উপরে। বললে, 'ওরে একবার দেখে যা না চুড়ো পরে আমাকে কেমন দেখতে হয়েছে।'

'আমি আর কি দেখব,' স্নেহকটাক্ষ ফিরিয়ে দিল বিজয়। 'আমি তো আর তোমাকে মানি না। যারা তোমাকে মানে তাদের ডেকে আনো গে।'

শ্যামসুন্দর হাসল মৃদু-মৃদু। বললে, 'নাই বা মানলি, তাতে একবার দেখতে কি দোষ!'

সত্য তো, দেখতে বাধা কি! একটা পাথরের মূর্তির মাথায় মুকুট পরানো হয়েছে, এইটুকুই তো দেখা। দেখি না কেমন গড়িয়ে আনলাম সোনার চুড়ো! শ্যামসুন্দরের কাছে এসে দাঁড়াল বিজয়কৃষ্ণ। এ কি, চোখ যে আর ফিরিয়ে নিতে পারছি না! পদ্মপত্রবিশালাক্ষ কি অপার স্নেহে তাকিয়ে আছেন! তমালশ্যামল-দ্যুতি সর্বাঙ্গে, সমস্ত ঘর নয়, সমস্ত ভুবন যেন আলো করে দাঁড়িয়ে আছেন।

'কি রে, মানিস না, তবে অমন করে তাকিয়ে আছিস কেন?' বললে শ্যামসুন্দর। 'চোখের দেখা তো কখন হয়ে গিয়েছে। এবার যা না ফিরে।'

পা ওঠে না বিজয়ের, চোখে পলক নেই। বললে, 'ঠাকুর, আমার উপর তোমার এতই যদি দয়া, তবে এতদিন এত ঘোরালে কেন? কালাপাহাড় বানিয়ে সব ভাঙালে কেন একধার থেকে?'

শ্যামসুন্দর বললে, 'তুই কে? সব আমি। ভেঙেওছিলাম আমি, এখন আবার গড়েও নিচ্ছি আমি। ভেঙে গড়লে কত সুন্দর হয় তার খেয়াল আছে?'

বিভ্রদ্বপুঃ সকলসুন্দরসন্নিবেশ শ্যামসুন্দরের দিকে মুগ্ধের মত তাকিয়ে রইল বিজয়। আমি মানি আর না মানি কি এসে যায়, তুমি তারুণ্যমৃতপারাবার, তুমি মধুর মধ্যমণি। আমি জানি আর না জানি কি এসে যায়, তুমিই লীলাকল্লোলবারিধি, তুমিই সর্বসৌন্দর্যের সিন্ধু।

এক দিন দুপুরে বসে আছে বিজয়, শ্যামসুন্দর এসে নালিশ করলে।

'ছাখ, আজ আমাকে খেতে দিয়েছে বটে, কিন্তু জল দেয়নি।'

'এ কখনো হয়?'

'জিগগেস কর না তোর খুড়িকে।'

খুড়িমাকে ডেকে জিগগেস করলে বিজয়, 'শ্যামসুন্দরকে আজ জল দাওনি?'

'কে বললে তোকে?'

'শ্যামসুন্দর বললেন।'

'শ্যামসুন্দর তো আর লোক পেল না, তুই ব্রহ্মজ্ঞানী, তোকে বলেছে জল দেবার কথা।'

'বেশ তো, তুমি একটু খোঁজ করেই দেখ না।'

খোঁজ নিয়ে খুড়িমা মাথায় হাত দিলেন। সত্যিই শ্যামসুন্দর আজ অপীত।

আমি তোমাকে না চাইলেও তুমি আমাকে চাও। আমি না মানলেও তুমি আমাকে ধরে থাকো। আমি তোমাকে ছাড়িয়ে চলে যেতে চাই, কিন্তু কিছুতেই তুমি ছাড়ো না।

ঠাকুর তীব্র বৈরাগ্যের গল্প বলছেন বিজয়কে। তীব্র বৈরাগ্য মানে দুঃসাহসিক অনুরাগ। শরণাগতি মানে চুপ করে করজোড়ে বসে থাকা নয়, শরণাগতি মানে হচ্ছে শরণে আগতি, এগিয়ে গিয়ে ধরা, রোক করে ধরা, জোর করে আঁকড়ানো।

একজনের স্ত্রী তার স্বামীকে একদিন বললে, শুনেছ? দাদা আজ কদিন থেকে সংসার ত্যাগ করে সন্নিসি হবার চেষ্টা করছে! বলো কি? কি করছে তোমার দাদা? খাওয়া কমিয়েছে, মাটিতে শোয়, বউয়ের সঙ্গে ভালো করে কথা কয় না। তাই বড় ভাবনা হয়েছে, পাছে সন্নিসি হয়ে বেরিয়ে যায়। স্বামী শুধু একটু হাসল। বললে, দূর ক্ষেপি, সে যাবে না, মিছে কথা, সন্নিসি কি অমনি করে হয়? স্ত্রী বললে, ওগো না সে যে কাপড় ছুবিয়েছে, সব ঠিকঠাক, সে নিশ্চয়ই যাবে। স্বামী আবার হাসল। বললে, আমি বলছি যাবে না। সন্নিসি কি অমনি করে হয়? স্ত্রী ক্ষেপে গেল। ঝাঁজিয়ে উঠে বললে, অমন করে হয় না তো কেমন করে হয়? কেমন করে হয় দেখবে? বলে স্বামী হঠাৎ নিজের পরা কাপড়খানি ছিঁড়ে ফেলে কোপনি করে পরলে। বললে, এমনি করে হয়। বলে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। আর এল না।

'একবার আমার ভাগ্নি ব্যামোর সময় গঙ্গাপ্রসাদ সেনের কাছে নিয়ে গেল।' বলছেন ঠাকুর। 'গঙ্গাপ্রসাদ বললেন, স্বর্ণপর্পটি খেতে হবে। কিন্তু জল খেতে পাবে না। বেদানার রস খেতে পারো। সকলে ভাবলে, এ কি সম্ভব, জল না খেয়ে কি করে থাকবে! এই কথা? আমি তখন জল খাব না বলে রোক করলুম। পরমহংস, আমি তো প্যাতিহাঁস নই, রাজহাঁস। দুধ খাব।'

যা একবার মিথ্যে বলে জেনেছি তাকে যদি রোক করে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করতে না পারি তাহলে কিসের মনুষ্যত্ব?

'তুমি মাঝে-মাঝে আসবে।' বিজয়কে বললেন ঠাকুর, 'তোমাকে দেখতে বড় ইচ্ছে করে।'

মামুলি নিয়মকানুন মেনে বিগ্রহ গড়লে বা চিত্রপট আঁকলেই চলবে না, তাতে মেশাতে হবে কারুকারের ভাবলাবণ্য, ভক্তির পবিত্রতা। সেই নিয়েই সেদিন কথা হচ্ছিল বিজয়ের সঙ্গে।

বিজয়কৃষ্ণ বললে, 'চিত্রপট ভাবশুদ্ধরূপে আঁকা উচিত। আজকাল বিশেষ আর

সেই ভাবশুদ্ধি দেখা যায় না।'

'এঁড়েদায় মন্দিরের বারান্দায় যে চিত্রপট আছে দেখেছ?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'না, দেখিনি।'

'ঐ চিত্রপট ঠিক-ঠিক আঁকা। একবার গিয়ে দেখে এস।'

'আপনি যদি সঙ্গে করে নিয়ে যান তবেই যাওয়া হয়।'

'বেশ তো যাব।'

দুজনে একদিন গিয়ে হাজির হলেন এঁড়েদায়। মন্দিরে গিয়ে দেখলেন দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কখন খুলবে? কেউ ঠিক বলতে পারে না। পূজারী সামনের দিকের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে পিছনের দরজায় তালা দিয়ে চলে গিয়েছে। কখন ফিরবে কে জানে।

দুজনে মন্দিরের বাইরে থেকে প্রণাম করলেন। কাছেই কোন এক বৈষ্ণবের সমাধি আছে তাই গেলেন দর্শন করতে।

ফিরে এসে দেখেন তখনও মন্দির বন্ধ। মন্দিরের আঙিনার পাশে ছোট এক-খানি ঘর, তাতে বসলেন দুজনে। ঠাকুর গান ধরলেন আর বিজয়কৃষ্ণ ভাবাবেশে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন আঙিনায়।

মুহূর্তে কি হল কে জানে, মন্দিরের দরজা খুলে গেল।

সে কি, পূজারী ফিরে এল নাকি?

না, পূজারী কোথায়! মন্দিরের পিছনের দিকের দরজায় তেমনি তালাবন্ধই আছে। কতক্ষণ পরে পূজারী ফিরে এসে তো হতভম্ব। মন্দিরের সামনের দরজা খুলে গেল কি করে?

ব্যাকুলতায় খুলে গেল। এ তো শুধু বাইরের থেকে টান নয়, এ যে ভিতর থেকেও ঠেলা। এ বেগ দুদিকের। ওরা শুধু দেখতে আসেনি, আমিও যে দেখতে চাই। কতক্ষণ ওরা বসে থাকবে, তাই আমিই খুলে দিই দরজা। দেবতাই দরজা খুলে দিলেন।

প্রসাদী মালা ঠাকুর আর বিজয়কৃষ্ণের গলায় পরিয়ে দিল পূজারী।

এই দেখ সেই চিত্রপট। বারান্দায় সেই মনোনীত ছবিটি বিজয়কৃষ্ণকে দেখালেন ঠাকুর।

'প্রেম কাকে বলে?' ঠাকুর বলছেন ভক্তদের, 'ঈশ্বরে যার প্রেম হয় তার জগৎ ভুল হয়ে যাবে। এত প্রিয় যে দেহ তা পর্যন্ত হুঁশ থাকবে না। বিজয় এখন বেশ হয়েছে, হরি-হরি বলতেই মাটিতে পড়ে যায়। ঠাকুরবিগ্রহ দেখলেই একেবারে

লাষ্টাঙ্গ। আর অতি উদার সরল। সরল না হলে কি ঈশ্বরের কৃপা হয়?'

প্রেম রজ্জুস্বরূপ। প্রেম হলেই ভক্তের কাছে ঈশ্বর বাঁধা পড়েন। প্রেম হলেই সর্বভূতে সাক্ষাৎকার।

প্রেমই মধু। সেই মধুব্রহ্মের ভজনা করো। মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। এ মনোনেত্রোৎসবকে উপভোগ করো চতুর্দিকে।

মৈত্রেয়ীকে বলছেন যাজ্ঞবল্ক্য, 'পতির কামনায় পতি প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় পতি প্রিয় হয়। জায়ার কামনায় জায়া প্রিয় হয় না, আত্মার কামনায় জায়া প্রিয় হয়। পুত্রের কামনায় পুত্র প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় পুত্র প্রিয় হয়। কারু কামনায়ই কেউ প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় সকলে প্রিয় হয়।'

এ আত্মা কে? এ আত্মাই মধুব্রহ্ম।

মধুরাধিপতির সমস্ত অখিলই সুমধুর।

'খুব ভালোবাসা হলে তবেই তো চারিদিক ঈশ্বরময় দেখবি।' বললেন ঠাকুর, 'খুব ন্যাবা হলে তবেই তো চারদিক হলদে দেখা যাবে।'

'সব ঋণ থেকে মুক্ত কে?' আবার বললেন ঠাকুর। 'শুধু একজন। যে প্রেমোন্মাদ। তার আর তখন কে বা বাপ কে বা মা কে বা স্ত্রী! ঈশ্বরকে এত ভালোবাসা যে পাগলের মত হয়ে গিয়েছে। খসে গিয়েছে সমস্ত ঋণশৃঙ্খল।' যখন প্রিয়মিলনের লগ্ন এসে পড়েছে তখন আর কিসের বিদ্যুৎ কিসের ঘনঘটা কিসের বা উল্কাবৃষ্টি।

॥ ১৪৮ ॥

সূর্যের উদয়াস্তের সঙ্গে-সঙ্গে বৃথা চলে যাচ্ছে আয়ু। চরম ভোগের উপাদান আজো পেলাম না খুঁজে-খুঁজে।

শুধু টিঁকে থাকাই কি জীবন? শুধু নিশ্বাস নেওয়া? গাছও তো টিঁকে আছে, বেঁচে আছে পত্রে-পুষ্পে। কামারের দোকানের হাপর নিশ্বাস ফেলছে সমানে। গ্রাম্য পশুরাও মেতে আছে আহারে-বিহারে। কান পচে গেল নানা শব্দের কোলাহল শুনে-শুনে, কবে শুনতে পাব সেই হরিনাম, শ্রবণমঙ্গল রসায়ন? কত কথাই তো বলছে জিহ্বা, একবার বলবে কবে হরিকথা? পট্টকিরাটই কি মাথার ভূষণ হবে, ভগবদ্ভক্তের পদরেণু কি মাথায় ধরতে পাব না? যে হাত হরির পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিল না, কাঞ্চনকঙ্কণ থাকলেও তা মড়ার হাত। পা থাকতে যে হরিক্ষেত্রে গেল না তাতে আর তৃণগুল্মে প্রভেদ কি? কি প্রভেদ তাতে আর পাথরে যার হরিনামেও চোখে নেই অশ্রু, অঙ্গে নেই রোমহর্ষ! আর

কত ঘ্রাণই তো নিলাম নাসিকায়, শ্রীবিষ্ণুপদার্পিত তুলসীর গন্ধটুকু নেব কবে ? দিন থাকতে-থাকতে বেরিয়ে পড়ো। হৃদয়নলিনদিনেশ এখনো অস্ত যায়নি। এখনো কিঞ্চিৎ আয়ু অবশিষ্ট আছে।

দেহ ধরেছিস কেন ? সমস্ত রোমাঞ্চের শ্রেষ্ঠ—ঈশ্বর-রোমাঞ্চ আস্বাদ করবার জন্যে।

'তাই তো দেহের যত্ন করি।' বললেন ঠাকুর, 'ঈশ্বরকে নিয়ে যে সম্ভোগ করব।' আবার বললেন, 'এক-এক সময় মনে হয় দেহটা খোলমাত্র, সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বই আর কিছু নেই।'

দেহবুদ্ধি থাকলেই বিষয়বুদ্ধি। দেহে আত্মবুদ্ধি করার নামই অজ্ঞান। যতক্ষণ এ দেহ আমার বলে বোধ আছে ততক্ষণ সোঽহং নেই। যখনই এ দেহ তোমার বলে বোধ হবে তখনই দাসোঽহং।

আমার দেহ তোমার হাতের বীণা। তোমার হাতের লেখনী। যতদিন খুশি যেমনতরো খুশি, বাজাও, লেখ। যখন ইচ্ছা হবে ছুঁড়ে ফেলে দিও অন্ধকারে। সেই অন্ধকারেই আবার তোমার হাতের নতুন বীণা নতুন লেখনী হয়ে উঠব। দীপেরই বদল হয় দ্যুতিটি অক্ষুণ্ণ। দেহেরই নাশ হয়, আত্মা চিরশিখা। দীপ আর তেলের তারতম্যে জ্যোতির তারতম্য। মাটিতে স্নিগ্ধ স্ফটিকে তীব্রপ্রভ। ঘৃতে স্বচ্ছ রেড়ির তেলে বিমলিন। শুধু এই তো সাধনা যেন ভালো দীপ পাই, ভাল আধার পাই, আহরণ করতে পারি ভালো তেল, আরো শক্তি। যেন আরো জ্বলতে পাই উজ্জ্বল হয়ে। জ্বলতে-জ্বলতে মিশে যেতে পারি সেই নিখিলজ্যোতিতে।

'সুখ দুঃখ রোগ শোক জন্ম মৃত্যু এ সব দেহের, আত্মার নয়।' বললেন ঠাকুর, 'দেহের মৃত্যুর পর ঈশ্বর হয়তো ভালো জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন, ভালো আধারে—যেমন প্রসব বেদনার পরে সন্তানলাভ।'

কিন্তু যতদিন দেহ ততদিনই তো কষ্ট। এ খোলস যত শিগগির ছেড়ে দেওয়া যায় ততই ভালো।

কোন দুঃখে ?

'দেহ থাকলেই বা।' বললেন ঠাকুর। 'এই সংসার যেমন ধোঁকার টাটি তেমনি আবার মজার কুটিও হতে পারে। শুধু একবার গুরুদত্ত কৃপা হলেই হয়। সমস্ত গেরো খুলে যায়, দিব্যচক্ষু ফুটে ওঠে। ভেলকি বাজি দেখনি ? অনেক গেরো দেওয়া দড়ি, তার একধার একটা জায়গায় বাঁধে বাজিকর। তারপর আরেকধার নিজের হাতে ধরে দড়িটাকে নাড়া দেয়। যেই নাড়া দেওয়া অমনি সব গেরো

খুলে যায় একে-একে। অন্য লোকের সাধ্যও নেই টানাহেঁচড়া করেও সে সব গেরো খুলতে পারে। দেহে যেই একটু নাড়া খাওয়া অমনি দিব্যচক্ষু খুলে যাওয়া। মনের শুদ্ধিতেই দিব্যদৃষ্টি। নইলে ভাবো, সাধারণ একটা কুমারী মেয়ে, তার মধ্যে দেখলাম কিনা সাক্ষাৎ ভগবতী!'

গঙ্গা দিয়ে একখানি নৌকা যাচ্ছে। সন্ধ্যা হয়-হয়। মাঝি গান ধরেছে আপন মনে। গঙ্গার জল ছুঁয়ে সমস্ত আকাশ কাঁপিয়ে সেই গীতধ্বনি ঠাকুরকে এসে স্পর্শ করল। অমনি ভাবাবিষ্ট হয়ে গেলেন। সমস্ত শরীরে পুলককণ্টক। মাস্টার কাছে ছিল, তার হাত ধরলেন। বললেন, 'দেখ-দেখ আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে। আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখ।'

মাস্টার ঠাকুরের গায়ে হাত রাখল। আনন্দে-আবেগে সে দেহ শিহরিত হচ্ছে, কাঁপছে থরথর করে। শব্দরূপে ব্রহ্ম ঠাকুরকে আচ্ছন্ন করেছে।

মণি মল্লিকের নাতজামাই এসেছে। সে খুব জাঁক করে বলছে, ইংরেজের বইয়ে লিখেছে ঈশ্বর তেমন সর্বজ্ঞ নয়। সর্বজ্ঞ যদি হবেন তবে লোকের এত দুঃখ কেন? কোনো কার্যকারণ নেই তবু দুঃখ, ব্যাখ্যাহীন দুঃখ। একদিন যখন মরবেই তখন তাকে তিলে-তিলে কষ্ট দিয়ে মারা কেন? লেখক বলেছে, সে হলে এর চেয়ে ঢের-ঢের ভালো সৃষ্টি করতে পারত।

পণ্ডিতের কথা, শুনতে হয় সমীহ করে।

শেষে ঠাকুর বললেন বিনয়নম্র হয়ে, 'তাঁকে কি বোঝা যায় না? আমিও কখনো তাঁকে ভাবি ভালো, কখনো মন্দ। এক সের ঘটিতে কি দশ সের দুধ ধরে? কখনো অজ্ঞান চলে যায়, কখনো আবার তা ঘিরে ধরে। যেন পানাঢাকা পুকুর। একটা ঢিল ছোঁড়ো, দেখতে পাবে খানিকটা জল। কিন্তু কতক্ষণ! খানিক পরেই দেখতে পাবে পানা নাচতে-নাচতে এসে সে জলটুকুও ঢেকে ফেলেছে।'

বউবাজারের রাখাল-ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এসেছে মাস্টার। সকলেই দেখেছে তুমিও একবার দেখ। দেখ কিছু করতে পারো কি না।

ডাক্তারের আঙুলের দিকে তাকালেন ঠাকুর। দেখলেন আঙুলগুলো মোটা-মোটা।

'যারা কুস্তিগীর তাদের মত তোমার আঙুল।' সহাস্যে বললেন ঠাকুর। 'দেখলে ভয় করে। মহেন্দ্র সরকার জিভ এমন জোরে টিপেছিল যে ভীষণ লেগেছিল, যেন গরুর জিভ টিপছে।'

'না, না, আমি হাত দেব না।' ডাক্তার বললে অপ্রস্তুতের মত। 'আপনার

লাগবে না কিছু।'

তবে দেখ।

শুধু ঐটুকু। আর কথাবার্তা নেই ডাক্তারের সঙ্গে। ডাক্তারের কি অভিমত, কি ব্যবস্থাপত্র, কৌতূহল নেই কণামাত্র। ভক্তদের সঙ্গে আলাপ।

আমাদের কিসে কি হবে! এই তো একমাত্র জিজ্ঞাসা!

'দীঘিতে বড় মাছ আছে, চার ফেল।' বললেন ঠাকুর।

চার কি? চার কোথায়?

অত কথায় কাজ নেই। ঠাকুর বললেন, 'দিন কতক না হয় সব ত্যাগ করে তাঁকে ডাকো। একটু নির্জনে চলে যাও। নির্জনে গোপনে কেঁদে-কেঁদে তাঁকে ডাকো তিনি সব করে দেবেন।'

এবার নির্জনে এসেছি, সংসার-কোলাহলের প্রান্ত উত্তীর্ণ হয়ে। আমার এবার ভয় ভেঙে দাও। আমি যে একাকী নই এটি বুঝতে দাও প্রাণ ভরে। একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাও আমার দিকে। হৃদয়ের থেকে উদ্ধৃত হয়ে দাঁড়াও আমার চোখের সামনে। তোমার জন্যে কত ধুলোপথ হেঁটে এসেছি, এড়িয়ে এসেছি কত অপবাদ ও প্রতিবাদের কণ্টক। তুমি যদি এখন দেখা না দাও, ফিরে গিয়ে মুখ দেখাব কি করে? আঁধার ঘনিয়ে এসেছে, ঝড়ের নিশান উড়ছে ঈশান কোণে। আমাকে আশ্রয় দাও। ডান হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে তুলে ধরো আমাকে। আমাকে স্পর্শ করো। কোলে করে রাখো। আমি তোমার জন্যে এক পা এলে তুমি কি আমার জন্যে দশ পা আসবে না?

রাধিকার সর্প-অভিসারের গল্প বলছেন ঠাকুর। বলছেন লক্ষ্মীকে ও সারদামণিকে। 'নিকুঞ্জে এসেছে শ্রীকৃষ্ণ। বাঁশির সঙ্কেতধ্বনি করেছে। আর যায় কোথা! ললিতা বিশাখাকে নিয়ে শ্রীমতী সাজতে বসল। যাব-যাব আজ অভিসারে। ত্বরা কর ত্বরা কর সখি, তৃষ্ণাতরঙ্গিণী দুলে উঠেছে। কিন্তু তখুনি প্রবল ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। এখন যাবি কি করে? পাথর ডাগল, আতুর বাহ্নি, কাহে অভিসারিবি তুঁহু সুকুমারী! আমোদিনী রাধা উন্মাদিনী হয়েছে। বললে, কাকে সখি নিবারণ করছ? সমস্ত মর্যাদা সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করেছি, এখন কি এই সামান্য বৃষ্টির জলকে ভয় করব? তীর যদি একবার ছোঁড়া যায় সে কি আর ফিরে আসে? তোরা থাক। তুই যদি না শুনিস আমরাও শুনব না। বললে সব সখিরা। তুই বৃক্ষ আমরা তার পত্রপুষ্প। তুই আকাশ আমরা তার চন্দ্রতারা। তখন সবাই বেরুল রাস্তায় ঝড়-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে। এমন নয় যে রাস্তায় বেরুবার পর ঝড়-বৃষ্টি এসে পড়েছে আচম্বিতে। এ ঝড়-বৃষ্টি দেখে

শুনে রাস্তায় বেরুনো। ঝড় বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে, উড়িয়ে দিয়ে। রাস্তায় জলের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা সাপ শুয়ে আছে। রাধা ও সখিদের লক্ষ্য নেই, সাপের উপরেই পা দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সাপ আর কেউ নয়, স্বয়ং অনন্তদেব। যেমনি উঠে দাঁড়িয়েছে অনন্তদেব সোঁ করে ফণা বিস্তার করে একেবারে তাদের নিকুঞ্জের ধারে পৌঁছে দিলেন। কেউ টেরও পেল না। এক পলকপতনের পরে আরেক পলক তুলে দেখল, এ কি, নিকুঞ্জে চলে এসেছি যে! ওমা গো, এ যে দেখি মস্ত বড় সাপ! সবাই হুড়মুড় করে নেমে পড়ল সাপের থেকে। এ যে সাপের উপর পা দিয়ে আছি গো। চল-চল পালাই কৃষ্ণের কাছে। বুঝলি একেই বলে সর্পাভিসার।'

যদি দুস্ত্যজ অনুরাগ হয়, যদি আসে সর্বভঞ্জন ব্যাকুলতা, ঠিক এসে উপনীত হবে। যাঁর মুরলী ত্রিজগন্মানসাকর্ষী তিনিই টেনে নিয়ে যাবেন। তুমি শুধু একবার ঝড়-বৃষ্টি সত্ত্বেও বাইরে এসে দাঁড়াও।

জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্ম, ভক্তের কাছে ভগবান। ব্রহ্ম ক্ষুরধারের মত দুর্লক্ষ্য আর ভগবান সর্বরস-কন্দম্বমূর্তি। সমস্ত রসের আধার-আশ্রয়।

মল্লের কাছে অশনি, নরের কাছে নৃপতি, রমণীর কাছে মূর্তিমান মীনকেতু, গোপীর কাছে স্বজন, দুষ্টের কাছে শাস্তা, বাপ-মায়ের কাছে শিশু, ভোজরাজ কংসের কাছে মৃত্যু, অজ্ঞের কাছে বিরাটস্বরূপ, যোগীর কাছে পরমতত্ত্ব আর বৃষ্ণির কাছে দেবতা।

যে ঈশ্বরকে যেমন ভাবে দেখে ঈশ্বর তার কাছে তেমনি। কৃষ্ণ যখন কংসের মল্লমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন তখন সকলে তাকে এক রূপে এক চোখে দেখল না। কৃষ্ণে যে সকল রসেরই যুগপৎ আবির্ভাব তা কয়জনে দেখে! মল্ল দেখল রুদ্ররূপে, রমণী দেখল কন্দর্পরূপে, বাপ-মা সন্তানরূপে, দুষ্ট রাজারা বীররূপে আর কংস ভয়ঙ্কররূপে। রৌদ্র শৃঙ্গার বাৎসল্য বীর আর ভয়ানক সর্বরসের সমুচ্ছ্বাস।

সর্বরসের আস্বাদ্য ও আস্বাদক দুই-ই শ্রীকৃষ্ণ। তিনি যেমন সকলের প্রিয় সকলেও তাঁর তেমনি প্রিয়। তাঁর বাঁশি ডাকছে সবাইকে আর সকলেও সেই বংশীরবের জন্যে উৎকর্ণ হয়ে আছে। শুধু মানুষ নয়, বনের পশু-পাখি, বৃক্ষলতা, তৃণগুল্ম।

কৃষ্ণসারগেহিনী হরিণীরাও ছুটে এসেছে কৃষ্ণের কাছে। বিমুক্তগৃহাশা গোপিনীর মত। এই সারকৃষ্ণ ছেড়ে যাবে না আর কৃষ্ণসারের কাছে। সারসহংসের দল চারুগীতহৃতচিত্ত হয়ে শ্রীহরির কাছে এসে মিলিতনেত্রে

বসেছে স্তব্ধ হয়ে। পুষ্পফল্যাঢ্যা বনলতা আর প্রণতভারপুলকিত তরু প্রেমহৃষ্ট হয়ে মধুধারা বর্ষণ করছে।

আর গোপীরা।

তারা গোবিন্দে গতবাককায়মানসা। কৃষ্ণ বললেন, তারা মন্মনস্কা, মৎপ্রাণা, মদর্থে ত্যক্তদৈহিকা। 'ত্যক্তলোকধর্মাশ্চ'। তারা আমাকেই মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছে, আমার জন্যে ছেড়েছে দেহস্বার্থ, পতিপুত্র। আমিই তাদের প্রিয়তম আত্মা, আমি মন দিয়ে পাবার, আমাকে তারা পেয়েছে মন দিয়ে। যারা আমার জন্যে লোকধর্ম বিসর্জন দিয়েছে আমি তাদেরই পালক-পোষক।

উদ্ধবকে বললেন, উদ্ধব, তারা আমার জন্যে বিরহোৎকণ্ঠ বিহ্বল হয়ে আছে। আমি দূরস্থ বলেই তারা আমাতে এমনি নিবিড় সংলগ্ন। আবার ফিরে যাব বলে তাদের আশ্বাস দিয়ে এসেছিলাম, আহা, সে কথা বিশ্বাস করেই তারা বহুক্লেশে দেহ ধারণ করে আছে। তুমি যাবে, একবার দেখে আসবে তাদের?

বাবুরাম বলে উঠল, 'আমি গোপী-টোপী জানি না।'

ঠাকুর ঝলসে উঠলেন, 'শালা, কলিকালে গোপীদের ভাব কি আর নিতে পারবি? শুধু তাদের টানটুকু নে। যে কৃষ্ণকে শিব ব্রহ্মা ইন্দ্র ধর্ম ধ্রুব প্রহ্লাদ নারদ ব্যাস শুক দূর থেকে স্তব করে, রাসের সময় সেই কৃষ্ণের গলা ধরে নৃত্য করেছে গোপীরা। অনিমেষ লোচনে পান করেছে তার মুখমাধুর্য।'

উদ্ধব ব্রজে এসেই প্রথমে নন্দ-যশোদার সঙ্গে দেখা করল। উদ্ধব, গোবিন্দ কি আমাদের কথা আর মনে রেখেছে? সে কি আর আসবে না ফিরে? তার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি কি আর দেখতে পাব না? নন্দ প্রেমগদগদ কণ্ঠে কৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণনা করতে লাগল। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল বলতে-বলতে। প্রেমপ্রসরবিহ্বল হয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। কাঁদতে লাগল যশোদা। স্নেহের গাঢ়প্রাচুর্যে তার পয়োধর থেকে দুগ্ধক্ষরণ হতে লাগল।

উদ্ধব বলে, দেহীদের মধ্যে আপনারা দুজনেই শ্লাঘ্যতম। অখিলগুরু নারায়ণে আপনাদের এই বিগাঢ়মতি। সন্তান—আলম্বন-বিভাব। আপনারা আশ্বস্ত হোন। শীঘ্রই কৃষ্ণ ফিরে আসবে আপনাদের কাছে।

আরো বললে, 'কৃষ্ণের কাছে প্রিয়-অপ্রিয় কিছু নেই, না বা উত্তম-অধম না বা সমান-অসমান। বাপ মা স্ত্রী পুত্র আত্মীয়-পর দেহ জন্ম-কর্ম কিছু নেই। কাঠের মধ্যে যেমন প্রচ্ছন্ন অনল তেমনি সকল দেহীর অন্তরেই নিহিত তাঁর নির্মল সত্তা। শুধু ক্রীড়ার জন্যে শুধু সাধুদের পরিত্রাণের জন্যে সকল যোনিতেই তাঁর আবির্ভাব। কুম্ভকারের ঘূর্ণ্যমান চক্রে চোখ রাখলে মনে হয় সমস্ত

ভূমিই বুঝি ঘুরছে, তেমনি অহংদৃষ্টি নিবদ্ধ মানুষ ভুল করে ভাবছে আমিই একমাত্র কর্তা, আমিই একমাত্র স্বয়ং-তন্ত্র। তিনি যেমন তোমাদের তেমনি আর সকলেরও। যে, যে ভাবে চায় তাকে তিনি সেই ভাবে দেখা দেন।'

ব্রজদ্বারে হেমময় রথ দেখে গোপীরা বিচলিত হল। এ কি কৃষ্ণচোর অক্রূর আবার এল নাকি? এবার বুঝি আমাদের দেহ কুড়িয়ে নিয়ে তার মৃত প্রভু কংসের পিণ্ড দেবে?

না, এ অক্রূর নয় তো! আজানুলম্বিত বাহু, কমললোচন, পীতাম্বর, পুষ্কর-মালী সুন্দর পুরুষ। দেখতে প্রায় কৃষ্ণের মত। এ কোত্থেকে এল বল দেখি? আমি কৃষ্ণের বার্তাবহ। কৃষ্ণানুচর। বললে উদ্ধব। বসল সুখাসনে।

তখন সকলে তাকে বেষ্টন করে দাঁড়াল। সমুচিত সংবর্ধনা করলে। বললে, তুমি কৃষ্ণের সখা, আমরাও একদিন তার সখী ছিলাম। পিতামাতার প্রতি প্রিয়কাম হয়ে সে তোমাকে পাঠিয়েছে ব্রজপুরে, আমাদের জন্য নয়। বন্ধুদের স্নেহবন্ধন, শুনেছি, মুনিরাও সহজে ছিঁড়তে পারে না। কিন্তু তোমার কৃষ্ণের ব্রজধামে কিছুই আর স্মরণীয় নেই। স্ত্রীলোকের প্রতি পুরুষের মৈত্রী নিমিত্তমাত্র, যেমন ফুলের প্রতি ভ্রমরের। পাখি যেমন বীতফল বৃক্ষকে ত্যাগ করে, মৃগগণ যেমন দগ্ধ বনকে, তেমনি তোমার কৃষ্ণ আমাদের ত্যাগ করেছে।

একটা অলি উড়ে এসে গুঞ্জন করতে-করতে এক গোপীর পায়ের উপর বসতে চাইল। গোপী বললে, ধূর্তের বন্ধু, চিনেছি তোমাকে। আর কেন পুরোনো বন্ধুর গান শোনাতে এসেছ আমাদের? তুমি যেমন মধুশেষ ফুল ত্যাগ করো, মধুপতি তেমনি আমাদের ছেড়ে গেছে। তার আপাতমধুর কথায় আমরা ভুলেছিলাম, লক্ষ্মীকে আবার ভুলিয়েছে। লক্ষ্মীর কাছে আমরা কি! লক্ষ্মী কেন, ত্রিভুবনে এমন কে কন্যা আছে যে সেই কপটসুন্দর সহাস্য মুখের দুষ্প্রাপ্য? তবু জানতাম দীনজনের জন্যেই তার উত্তমশ্লোক নাম। কিন্তু এ তার কেমন ব্যবহার, কেমন রীতিনীতি? কেন বারে-বারে পায়ের উপর বসছ জিগগেস করি। জানি অনেক চাটুবাক্য শিখেছ সেই কপটাচারীর কাছে। যার জন্যে আমরা স্বামী পুত্র গৃহ-কুল, এমন কি পরকাল পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছি, যে কৃতঘ্ন এ কথাও ভুলতে পারে তার সঙ্গে আবার সন্ধি কি? যে অসিত তার সঙ্গে আবার সখ্য কি? কিন্তু হায়-হায়, তার প্রসঙ্গও যে ছাড়তে পারি না, ভুলতে পারি না। অশ্রুতে চোখ আচ্ছন্ন তবু সেই কৃষ্ণসঙ্গমই ধ্যান করি। ব্যাধশরে হরিণীর মত বুক বিদ্ধ হয়ে গেছে তবু সেই ক্ষত দেখেও কঠিন হতে পারি না। বরং সেই কঠিনের প্রতিই কামমোহিত হচ্ছি। হে প্রিয়প্রেরিত

বন্ধু, বৃথা রাগ করছি তোমার উপর, বলো সেই প্রিয়তমের কথা। এই দাসীদের কথা কি ভুলেও একবার সে উচ্চারণ করে? সে কি তার অগুরু-বাসিত হাতখানি আমাদের মাথার উপর রাখবে না আর কোনো দিন?

উদ্ধব বিহ্বল হয়ে পড়ল। বললে, তোমরাই ধন্য, তোমরাই সিদ্ধকাম, তোমরাই লোকপূজ্য। তোমাদের এই বিরহসন্তাপ আমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ। তোমাদের এই বিরহসন্তাপ দেখেই বুঝতে পারছি, ভগবৎ-প্রেমসুখ কি অনির্বচনীয়। তিনি তোমাদের জানাবার জন্যে কী বলে পাঠিয়েছেন জানো? বলেছেন, তোমাদের সঙ্গে তাঁর আর বিয়োগ নেই। ধ্যানকাম হয়ে সর্বদা তোমাদের মন তাঁতে লগ্ন হয়ে থাকবে, তারই জন্যে তাঁর এই দূরস্থিতি। প্রিয়তম সর্বক্ষণ কাছে থাকলে রমণীদের আকর্ষণে আলস্য আসে, দূরে থাকলেই জাগে তাতে বিহ্বলপ্রাবল্য। তাই সম্পূর্ণ মন আমাতেই আবিষ্ট কর।

থাক, ঢের হয়েছে। শত্রু নাশ করে এখন সে রাজ্যলাভ করেছে, রাজকন্যাও বিয়ে করেছে শুনলাম, এখন আর এ বনচারিণীতে তার রুচি থাকবার কথা নয়। কিন্তু জিগগেস করি, আমাদের সে একদিন যেমন করে ভালোবেসেছিল তেমন করে কি বাসে, বাসতে পারে মধুপুরের কামিনীদের? কজ্জল নয়নের স্নিগ্ধ সলজ্জ হাসি দিয়ে অবলোকন দিয়ে তারা কি আমাদের মত পারে তার অর্চনা করতে? বলো আর কি সে আসবে না? তার গাত্রস্পর্শে সুশীতল করবে না, সঞ্জীবিত করবে না আমাদের? জানি, নৈরাশ্যই সুখ, তবু আশা ছাড়তে পারছি কই? গোপীরা আবার শোক করতে লাগল।

'তোমাদের হরিকথাগীতে লোকত্রয় পবিত্র হয়, তোমাদের চরণরেণু বন্দনা করি।' উদ্ধব বলতে লাগল, 'শ্রীহরির নিজ অঙ্গে একান্ত সংলগ্ন লক্ষ্মীর প্রতিও এমন অনুগ্রহ হয়নি। ভদ্রাচারের ধার ধারে না যে বনচরী তারা শুধু ভালোবাসার জোরেই ঈশ্বরকে লাভ করল। আমি আর কিছু চাই না, বৃন্দাবনে যে সকল গুল্মলতা ও ওষধি এদের পদরেণু স্পর্শে পবিত্র হয়েছে আমি তাদের মধ্যে যে কোনো একটি হতে চাই।'

গোপীদের তাই বললেন শ্রীকৃষ্ণ, তোমাদের ঋণ আমি কোনো কালে শোধ করতে পারব না। দেবতার আয়ু পেলেও নয়। দুর্জরগৃহশৃঙ্খল নিঃশেষে ছিন্ন করে আমাতে আত্মার্পণ করেছ, প্রত্যুপকার দ্বারা নয়, তোমাদের প্রীতি দ্বারা আমিই অঋণী হব।

ঠাকুর আবার বলতে শুরু করলেন কৃষ্ণকথা:

'শ্রীকৃষ্ণ যেদিন রাসলীলা করেন সেদিন বৈকুণ্ঠ থেকে লক্ষ্মীও এলেন লীলা

দেখতে। যোগমায়া দ্বার রক্ষা করছে, তাকে বললেন, দোর ছাড়, রাসস্থলীতে যাব। যোগমায়া বললে, আগে গোপীদের পদরজে গড়াগড়ি দিয়ে গোপীদের প্রাপ্ত হও, তার পরে যেতে পাবে রাসস্থলীতে। কি, এত বড় কথা? আমি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী, আমি গোয়ালা মেয়েদের পদরজে গড়াগড়ি দেব? যাব না রাসস্থলী। আমি তপস্যা করে ভগবানকে নিয়ে করব রাসলীলা। আজও পর্যন্ত বৃন্দাবনে বিল্ববনে লক্ষ্মী তপস্যা করছে। কিন্তু কৃষ্ণ কি তপস্যার জিনিস? কৃষ্ণ ভালোবাসার জিনিস। গোপীরা সাধন ভজন তপজপ কিছুই জানে না, তাদের একমাত্র সম্বল ভালোবাসা।

'তারপর শিব এল কৈলাস থেকে। যোগমায়া পথ আটকাল। বললে, গোপীদের পদরজে গড়াগড়ি দিয়ে গোপীদের প্রাপ্ত হও, তার পরে যেতে পাবে রাসস্থলীতে। আশুতোষ ভোলানাথ, অভিমানের লেশমাত্র নেই। তখুনি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গোপীদের পদরজে গড়াগড়ি দিতে লাগল। গড়াগড়ির ফলে গোপীদেহ লাভ করল ভোলানাথ। নাচতে লাগল গোপীদের সঙ্গে। ললিতা-বিশাখাকে বললে শ্রীমতী, আমাদের শ্বেতাঙ্গ সখী শুধু একজন—অনঙ্গমঞ্জরী। এ নতুন শ্বেতাঙ্গ সখী কোত্থেকে এল? ও মা, তার কপালে যে দপদপ করে আগুন জ্বলছে! কৃষ্ণকে জিগগেস করলে, চেন ওকে? কৃষ্ণ বললে, কৈলাস হতে শিব এসেছে। সকলে পুষ্পাঞ্জলি দাও তাকে। কৃষ্ণ গিয়ে আলিঙ্গন করল। বললে, আপনি এখানে গোপীশ্বর হয়ে বিরাজ করুন। আজও পর্যন্ত তাই রাসস্থলীতে গোপীশ্বর মহাদেবের অধিষ্ঠান।'

তার পর লক্ষ্মীকে বললেন ঠাকুর, 'আমার কাছে যা সব শুনলি তোরা দুজনে, খুড়ি ভাসুরঝিতে মিলে বলাবলি করবি। গরুগুলো দিনের বেলা যা খায় রাত্রে তা জাবর কাটে। বলাবলি করলেই আর ভুলে যাবিনে। মনে গেঁথে থাকবে।' আবার বললেন, 'আমার দোকানে সব রকম জিনিস পাওয়া যায়। যে যেমন খদ্দের তাকে সেই জিনিসের জোগান দি। শোন আরো কৃষ্ণকথা:

'আয়ান ঘোষ আগের জন্মে ব্রাহ্মণ ছিল। ঘোরতর তপস্যা করলে। ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলেন। ব্রাহ্মণ বললে, তোমার লক্ষ্মীকে পেতে চাই, তাকে আমার গৃহিণী করে দাও। ভগবান ভ্যাবাচাকা খেলেন, বললেন, ও ছাড়া অন্য বর নাও। অন্য বর নেব না, লক্ষ্মীই আমার একমাত্র লক্ষ্য। ভগবান চলে গেলেন। কিন্তু তপস্যা ছাড়ল না ব্রাহ্মণ। দেখি কেমন তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু। ভগবানকে আবার আসতে হল। বললেন, লক্ষ্মী ছাড়া আর যে কোনো বর নাও। ব্রাহ্মণ বললে, আর সব ছাড়তে পারি লক্ষ্মীছাড়া হতে

পারব না। আবার চলে গেলেন ভগবান। ব্রাহ্মণের তপস্যা আবার তাঁকে ফিরিয়ে আনল। বার-বার তিনবার। তখন অনুপায় হয়ে বর দিলেন। বললেন, বেশ তুমি গয়লার ঘরে গিয়ে জন্ম নেবে আর লক্ষ্মী তোমার ঘরণী হবে। কিন্তু তুমি ক্লীব হবে, ঘরণীকে স্পর্শও করতে পারবে না। ব্রাহ্মণ হাসল। বললে, তোমার লক্ষ্মী আমার ঘরণী হবে তাতেই আমি খুশি। তাকে আমার স্পর্শ করবার দরকার নেই, আমি তপস্বী, দিবানিশি তপস্যা করব। তথাস্তু। আয়ান ঘোষ খাবার সময় বাড়িতে একবার আসে আর বাকি সময় কেশীঘাটে বসে তপস্যা করে।'

সৎ চিৎ আর আনন্দ। সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সংবিৎ আর আনন্দাংশে হ্লাদিনী। সরস্বতী যমুনা আর গঙ্গা। সন্ধিনী মানে কর্ম, সংবিৎ মানে জ্ঞান আর হ্লাদিনী মানে ভক্তি। সরস্বতীর কর্মধারা যমুনার জ্ঞানধারা আর গঙ্গার ভক্তিধারা। ঈশ্বরের তাই তিন রূপ। প্রতাপঘন, প্রভাবঘন আর প্রেমঘন। অখণ্ড প্রতাপ, অতর্ক্য প্রভাব আর অনন্ত প্রেম।

তাই কর্ম জ্ঞান আর প্রেমের সাধন করো। কর্মে সর্বভূতে হিতকারী জ্ঞানে সর্বভূতে সমদর্শী আর প্রেমে সর্বভূতে প্রীতিমান।

॥ ১৪৯ ॥

আমার অসুখ কেন হল বলতে পারো? জিগগেস করলেন ঠাকুর।

তার তিন কারণ।

প্রথম কারণ, পাপ গ্রহণ করে তাঁর শরীরে ব্যাধি। বললেন, 'গিরিশের পাপ। আহা, ও যে কষ্টভোগ করতে পারবে না।'

যদি জানতুম তবে যাবো তবে আরো পাপ করে নিতুম। বললে গিরিশ ঘোষ। 'ঠাকুরের কাছে সব শুদ্ধসত্ত্ব ছেলেরা এসেছিল, আমিই এক মাত্র পাপী, একমাত্র দুরাচার। হেন পাপ নেই যা করিনি। তবু তিনি আমায় নিয়েছিলেন, পথের এক পাশে ফেলে দেননি। কোনোদিন কিছু নিষেধ করেননি আমায়। অহেতুক কৃপার কাছে আমার শুধু অবারিত প্রশ্রয়।'

কত লোক গিরিশের সম্পর্কে নালিশ করতে এসেছে ঠাকুরের কাছে। বলেছে কত বিরুদ্ধ কথা। ঠাকুর বললেন, 'না গো না, ওকে কিছু বলতে হবে না, ও নিজেই সব কাটিয়ে উঠবে।'

তোমার কৃপার কাছে আবার পাপ কি। তোমার কৃপার অনলে অঙ্গার হয়ে যাবে সর্বপাপ।

'গিরিশের থাক আলাদা।' বললেন ঠাকুর, 'যোগও আছে, ভোগও আছে। যেমন রাবণের ভাব। নাগকন্যা দেবকন্যাও নেবে আবার রামকেও লাভ করবে।'

আগেকার দল ছেড়েছে গিরিশ।' বললে নরেন।

'তা ছাড়লে কি হয়? বাটিতে যদি এক বার রসুন গোলা হয় সে গন্ধ কি আর যায়? বাবুই গাছে কি আর আম ফলে?'

'কেন ফলবে না?' হুমকে উঠল নরেন।

'তা তেমন সিদ্ধাই থাকলে ফলতে পারে।' বললেন ঠাকুর। 'কিন্তু তেমন সিদ্ধাই কি সকলের হয়?'

আর কারু না হোক গিরিশের হবে। প্রজ্বলন্ত বিশ্বাসই গিরিশের একমাত্র সিদ্ধাই।

'কিন্তু মাই বলো গিরিশের খুব বিশ্বাস।' উজ্জ্বল চোখে ঠাকুর বললেন। 'সত্যি এমনটি আর কোথাও দেখেছিস?'

ঠাকুর একদিন কি উপদেশ দিতে চেয়েছিলেন গিরিশকে। গিরিশ লাফিয়ে উঠল, 'আপনার কাছে এসেও আমাকে উপদেশ শুনতে হবে? উপদেশ তো আমিও অনেক দিতে পারি। অনেক লিখেওছি বইতে। কেন আপনার কাছে এসেছি, আপনি যদি আমায় কিছু করে দিতে পারেন তো তাই করুন। উপদেশ তুলে রাখুন কুলুঙ্গিতে।'

রামলালকে একটা শ্লোক আবৃত্তি কয়তে বললেন ঠাকুর। রামলাল আবৃত্তি করলে।

তার মানে? তার মানে বিশ্বাসই হচ্ছে পদার্থ।

পার্বতী মহাদেবকে জিগগেস করলেন, 'ঈশ্বরলাভের খেই কোথায়?'

মহাদেব বললেন, 'বিশ্বাসই এর খেই।'

'তাই বলুন।' গিরিশ বললে উল্লসিত হয়ে, 'আপনার দেখা পেয়েছি এর পর আবার কি চাই? এখন বলুন এত দিন যা করছি তাই এখনো করে যাব?'

'তাই করে যাও। তোমায় কিছুই ছাড়তে হবে না।'

যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকে, স্তব্ধীভূত অপ্রগল্‌ভ বিশ্বাস, তা হলে পাপই করুক আর মহাপাতকই করুক কিছুতে ভয় নেই।

'বিশ্বাস যত বাড়বে জ্ঞানও তত বাড়বে।' বললেন ঠাকুর। 'তাঁর নামে বিশ্বাস করলে তীর্থের প্রয়োজন হয় না। কৃষ্ণকিশোর বলত ওঁ রাম ওঁ কৃষ্ণ নাম করলে কোটি সন্ধ্যার ফল হয়। বলত, বোলো না কাউকে, আমার সন্ধ্যাটন্ধ্যা ভালো

লাগে না। ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী পূজা-সন্ধ্যা সে কি চায়? সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়। ভক্তির যেমন তমঃ তেমনি বিশ্বাসের তমঃ আনো। রাম বলেছি কালী বলেছি আমার আবার বন্ধন আমার আবার কর্মফল। একশোবার যদি পাপী-পাপী বলো, পাপীই হয়ে যেতে হয়। আমি মা বলে ডেকেছি আমার আবার পাপ কি? ঈশ্বরের নামস্পর্শেই জিহ্বা পবিত্র হয়েছে, দেহ-মন পবিত্র হয়েছে।'

গিরিশের সেই বিশ্বাসের তমঃ।

'কিন্তু এত হৈ-চে গালাগাল মুখখারাপ করে কেন?' কৌতুকস্বরে জিগগেস করলেন ঠাকুর।

শুধু তোমার কৃপা আস্বাদন করার জন্যে। কর্দমের বদলেও কুঙ্কুম লাভ করা যায়, তা প্রমাণ করার জন্যে।

'মদ খেয়ে কত গালাগাল দিয়েছি, কত অপমান করেছি।' বলছে গিরিশ, 'কখনো যদি স্নেহভরে বলেছেন পা টিপে দিতে ভেবেছি এ কি আপদ! মানিনি ধরিনি গ্রাহ্য করিনি। তবু টেনে তুলে নিলেন, শুধু তাই নয়, নমস্কার করলেন।'

ঠাকুর বললেন, 'তবে কি এদের ঘৃণা করি? কখনো না, ব্রহ্মজ্ঞান আনি। তিনিই সব হয়েছেন, সকলেই নারায়ণ। সব যোনিই তখন মাতৃযোনি। তখন বেশ্যা আর সতী-লক্ষ্মীতে তফাত দেখি না।'

রাত্রে এসেছে গিরিশ। ঠাকুরের ঘুম নেই, বসে আছেন বিছানায়।

ওরে আলোটা আন। গিরিশকে একটিবার দেখি।

মাস্টার আলো এনে ধরল।

'ভালো আছ?' কণ্ঠে অপার স্নেহ ঢেলে জিগগেস করলেন গিরিশকে।

গিরিশ বুঝি খুব ক্লান্ত হয়ে এসেছে। কোন ধাপধাড়া গোবিন্দপুর থেকে আসছে তার ঠিক কি! ব্যস্ত হয়ে বললেন লাটুকে, 'ওরে লেটো, এঁকে তামাক খাওয়া। পান এনে দে।'

লাটু ছুটল তামাকের যোগাড়ে। ওরে পান কই? সাজা পান নিয়ে আয়।

পান-তামাক দিল এনে গিরিশকে। শুধু এতে কি হবে? ঠাকুর আবার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, ওরে জলখাবার এনে দে।

লাটু বললে, আনতে গেছে জলখাবার।

খার তার দোকান থেকে আনিসনি যেন। বরানগরে যেতে বল। ফাগুর দোকান থেকে যেন কচুরি নিয়ে আসে। কচুরি হচ্ছে রজোগুণের। তাই খাবে আজ গিরিশ।

শুধু কচুরি নয় লুচি-মিষ্টিও এসেছে ফাগুর দোকান থেকে। প্রকাণ্ড একটা থালায় সাজিয়ে সমস্ত খাবার প্রথম ধরল ঠাকুরের সামনে। ঠাকুর তা প্রসাদ করে দিলেন। সমস্ত খাবার নিজের হাতে তুলে ধরলেন গিরিশের হাতে। গিরিশ খাচ্ছে আর ভাবছে, এ কী খাচ্ছি! ফাগুর দোকানের কচুরি না কি অপ্লব অমৃত-উদধি!

জল? জল দিতে হবে না গিরিশকে? বৈশাখের রাত, কী গরম পড়েছে কদিন থেকে।

ঘরের কোণে জলের কুঁজো। দাঁড়াবার শক্তি নেই তবু উঠে দাঁড়ালেন ঠাকুর। নিজের হাতে জল গড়িয়ে দেবেন গিরিশকে। ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছেন, এবার পিপাসামোচন করবেন।

উঠে দাঁড়ালেন। দিগম্বর। একটি সকললোকসুন্দর বালক মূর্তি।

সকলে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে।

নিজ হাতে জল গড়ালেন ঠাকুর। হাতে একটু ঢেলে দেখলেন যথেষ্ট ঠাণ্ডা কিনা। বোধ হয় যথেষ্ট ঠাণ্ডা নয়। না হোক, এখন আর এর চেয়ে ভালো জল কোথায় মিলবে! নাও এই জলই নাও। নাও আমার হাত থেকে।

তোমার হাত থেকে যখন নিয়েছি তখন এ জল সর্বতাপশোষণ শীতলতা! হোক বা তা অশ্রুজল, যখন তোমার হাত থেকে নিয়েছি তখন এতেই অত্যন্তনিবৃত্তি শান্তি।

কী দেব তোমাকে এই জলের পরিবর্তে? শুধু অশ্রুজল—অশ্রুজল ছাড়া আমার কী আছে?

আকাশ বিগতাভ্র হল। পথ সমতল হল, কুশকণ্টকরহিত হল। উৎপথগামী হল বুঝি সৎপথগামী। তুমি একাধারে প্রণম্য ও প্রিয়। আমার প্রাণের প্রণাম নাও। নাও আমার গভীর প্রিয়সম্ভাষণ।

গিরিশ বললে, 'শুধু প্রণতিপরায়ণ হও। নিয়ত নমো-নমো করাই প্রকৃত যোগসাধন।'

কে একজন ভক্ত ক-গাছা ফুলের মালা এনে দিল ঠাকুরকে। একে-একে সবগুলি ঠাকুর গলায় পরলেন। এ কি আমি পরলাম? আমার হৃদয়মধ্যে যে হরি আছেন তাঁকে পরিয়ে দিলাম।

দু-গাছি মালা আবার তুলে নিলেন গলা থেকে। নিজের হাতে পরিয়ে দিলেন গিরিশকে।

এ কি শুধু কৃপা? এ পূজাও। আমি যে তোমার মাঝে দেখলাম নেই

ভৈরবকে। এক হাতে সুধা আরেক হাতে সুরা। এক হাতে বিষসর্প আরেক হাতে অভয় কবচ।

তুমিই সেই বিরূপাক্ষ, বিষমলোচন! নিরাভাস নিরাময়, নিঃসংশয় নিরঞ্জন। তোমার গঙ্গা তোমার গন্ধপদ্মময়ী বাণী, তোমার চৈতন্যলীলা বিল্বমঙ্গল।

খুব মদ খেয়ে এসেছে গিরিশ। কাঁদছে অঝোরধারে। ঠাকুরের পায়ের উপর মাথা ঢেলে দিয়ে কাঁদছে।

ঠাকুর তার পিঠের উপর হাত রাখলেন। গিরিশও মাথা তোলে না, ঠাকুরও হাত সরান না। এক দিকে সমস্ত ঢেলে দেওয়া, আরেক দিকে সমস্ত তুলে নেওয়া।

'ওরে একে তামাক খাওয়া।' ঠাকুর হাঁক দিয়ে বললেন এক ভক্তকে।

প্রত্যাখ্যান তো নয়ই, আপ্যায়ন। গিরিশ মাথা তুলল। হাত জোড় করে দাঁড়াল স্থির হয়ে। বললে, 'প্রভু, তুমিই পরব্রহ্ম। তুমিই চরাচর ও চিরন্তন। তুমিই ভুবনাকার বৃক্ষ, তুমিই এর মূল, তুমিই এর শাখা-পল্লব।'

ঠাকুর শুনেও শুনছেন না।

'তুমিই পরশুপাণি মহাদেব। রাজীবলোচন রাম। লোকপিতামহ ব্রহ্মা। পুণ্য-পরিপূর্ণ পাবনপুরুষ নারায়ণ।'

কথা কানেও তুলছেন না ঠাকুর। বলছেন হাঁক দিয়ে, 'ওরে, এর জন্যে তামাক আন।'

আবেশে গলার স্বর বিহ্বল হয়ে এল গিরিশের। 'বড় দুঃখ রইল মনে প্রাণ ভরে তোমার সেবা করতে পেলুম না। বর দাও ভগবান, এক বছর, শুধু একটি বছর তোমার সেবা করব। মুক্তিফুক্তি কিছু চাই না, শুধু সেবা, শুধু গুরুশুশ্রূষা—'

ঠাকুর তাকালেন চোখ তুলে। যেন জনান্তিকে বললেন, 'ওরে এখানকার লোক ভালো নয়। কেউ আবার কিছু বলবে। বর-টর চলে না এখানে।'

'ও সব কথা আমি শুনব না। বলো রাখবে কি না প্রার্থনা।' গিরিশ এগিয়ে এল দৃঢ় পায়ে। 'বলো। অন্তত আর এক বছর। সেবা করব, দেহ ঢেলে প্রাণ ঢেলে—'

'আচ্ছা হবে'খন।' ঠাকুর পাশ কাটাতে চাইলেন। 'যখন তোর বাড়িতে যাব তখন করিস।'

'না, আমার বাড়িতে নয়। এইখানে। তুমি যেখানে বসছ-শুচ্ছ সেইখানে। আমার বাড়ি কী আবার একটা জায়গা?'

অনমনীয় জেদ গিরিশের। কারুণ্যবশংবদ ঠাকুর হার মানলেন। বললেন,

'আচ্ছা, তাই। কিন্তু সব ঈশ্বরের ইচ্ছা।'

আরো এক পা এগিয়ে এল মাতাল। বললে, 'তোমার অসুখ আমি ভালো করে দেব।'

'সে কি রে, তুই ভালো করে দিবি?'

'হ্যাঁ, আমার কাছে ওষুধ আছে।'

'ওষুধ?'

'হ্যাঁ, মন্ত্র। তোমাকে শুধু মুখে একবার উচ্চারণ করতে হবে। তা হলেই ব্যাধিমুক্তি।'

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'সে আবার কি মন্ত্র?'

'শুধু মুখে একবার বলবে, আমার এই অসুখ আরাম হয়ে যাক। ব্যস, তাহলেই হল।' গিরিশ লাফিয়ে উঠল, 'তাহলেই উড়ে যাবে এক ফুঁয়ে।'

'ও আমি পারব না।'

'পারতেই হবে। বেশ, না পারো তো, আমিই ঝেড়ে দেব। আমি জানি কি করে ঝাড়তে হয় রোগের ভূত। কালী, কালী, মহাকালী।' বলে ঠাকুরের গা-সই করে শূন্যের উপর দিয়ে হাত চালাল গিরিশ। তার পর কটা ফুঁ দিল। 'ফুঁ! ফুঁ।' 'ওরে এতে আমার লাগবে।' ঠাকুর সঙ্কুচিত হলেন।

লাগুক গে। তুমি ভালো হয়ে গেলে আর লাগবে না। আপনমনে হাত চালাতে-চালাতে বলতে লাগল গিরিশ, 'যা যা, ভালো হয়ে যা। ভালো হয়ে যা। যদি ও-পায়ে আমার কিছু ভক্তি থাকে, তবে ভালো হয়ে যা। বলো, গেছে, ভালো হয়ে গেছে।'

এ এক আচ্ছা মাতালের পাল্লায় পড়া গেছে! ঠাকুর বিরক্ত হলেন। বললেন, 'যা বাপু, ওসব আমি বলতে পারি না।'

'কাকে বলতে পারো না?'

'মাকে!'

'মা আবার কে! তুমিই মা। তুমিই সব। আমার যদি ও-পায়ে কিছু ভক্তি থাকে, বলো, আছে কিনা ভক্তি, তাহলে বলতেই হবে তোমাকে—'

'আচ্ছা, যা, ঈশ্বরের ইচ্ছায় হবে।

'বলো, তোমার ইচ্ছায়।'

'ছিঃ, ও কথা বলতে নেই।' কুণ্ঠিত হলেন ঠাকুর। 'আমি ঈশ্বরের আজ্ঞায় চলেছি। আমি সেই মহান প্রভুর দাস, সেই মহান গুরুর সেবক।'

'কেন অত কথা বাড়াও?' গিরিশ অস্থির হয়ে উঠল। 'ছোট্ট সোজা কথা,

সেটুকু বলে ফেললেই তো চুকে যায়। তুমি কি বা কে, সে কথা পরে হবে'খন। এখন শুধু বলো, ভালো হয়ে যাবে। ভালো হয়ে যাব।'

কি একগুঁয়ে নাছোড়বান্দার হাতেই পড়েছি! শেষ পর্যন্ত হার মানলেন ঠাকুর। বললেন, 'আচ্ছা, যা। যা হয়েছে তা যাবে।'

যা বললেই কি যাওয়া যায়?

কিন্তু না গিয়ে উপায় নেই। গাড়োয়ান ডাকাডাকি করছে।

বড় বেআক্কেল তো এই গাড়োয়ান! গিরিশ উঠে দাঁড়াল। রোক করে চলল বাইরে, গাড়োয়ানকে শায়েস্তা করতে।

কয়েক পা গিয়েই আবার ফিরে এল। করজোড়ে বললে, 'আমায় ভুলো না।'

ওদিকে গাড়োয়ানও ভুলছে না। আবার শুরু করেছে হাঁকডাক।

বেগে বেরিয়ে গেল গিরিশ।

ঠাকুর ব্যস্ত হয়ে মাস্টারকে বললেন, 'দেখ দেখ, কোথায় যায়! গাড়োয়ানকে মারধোর করে না যেন।' মাস্টার গেল সঙ্গে-সঙ্গে।

এই গিরিশকেই গেরুয়া-রুদ্রাক্ষ দিলেন ঠাকুর।

বুড়ো গোপালের শখ হয়েছে সাধুদের গেরুয়া কাপড় আর রুদ্রাক্ষের মালা দেয়। সাধু কোথায়? গঙ্গাসাগরে যাবার জন্য দেশ-বিদেশের বহু সাধু জমায়েত হয়েছে কলকাতায়, তাদের থেকেই বাছাই করব। বিশ্রুত-বিখ্যাত সাধু।

ঠাকুর শুনে খুব খুশি হলেন। কিন্তু বলিহারি তোকে গোপাল, তুই সাধু খুঁজতে গঙ্গাসাগর গেলি?

গোপাল ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

'ভুলজি জটা দেখে, দাড়ি দেখে, ত্রিশূল-চিমটে দেখে? চোখের সামনে জ্বলছে যে দ্বাদশ আদিত্য তা তোর চোখে পড়ল না? সেই যে কথায় বলে না, ঘরের কাঠ উইয়ে খায়, কাঠ কুড়োতে বনে যায়—তোর দেখি সেই দশা।'

দ্বাদশ আদিত্য!

'হ্যাঁ, আমার ভক্ত ছোকরার দল। তোর ও-সব বাজারে সাধুর চাইতে ঢের-ঢের খাঁটি। যা বারোখানা গেরুয়া কাপড় আর বারোটা রুদ্রাক্ষের মালা নিয়ে আয়। আমিই বিতরণ করে যাই। অভিষেক করে যাই আমার রাজকুমারদের।'

তথাস্তু। বুড়ো গোপাল কিনে নিয়ে এল বস্ত্র মাল্য।

হিসেবে তো মোটে এগারোজন হয়। নরেন রাখাল তারক বাবুরাম শরৎ যোগীন নিরঞ্জন কালী হরি লাটু আর বুড়ো গোপাল নিজে। বারো নম্বরের কোন জন?

এক-এক করে এগারোজনকে বিতরণ করা হল। আরেকজন ?

সেই আরেকজনই গিরিশ।

গিরিশ ? সে গেরুয়া আর রুদ্রাক্ষের অধিকারী ?

'হ্যাঁ' এই কাপড় আর মালা তুলে রাখো তার জন্যে। সে এলে তাকে দিয়ো।' বললেন ঠাকুর, 'কিংবা কেউ গিয়ে দিয়ে এস তার বাড়িতে।'

সবাই অবাক। সে তো মশাই পাপী, অপবিত্র।

তার জলন্তপাবক বিশ্বাস। প্রচণ্ডতরঙ্গ ভক্তি। সেই বিশ্বাস-ভক্তিই তার পবিত্রতা। তার দেহে-মনে জাগ্রত আনন্দ। এই আনন্দেই তার পাপক্ষয়।

গিরিশ বললে, 'ভগবান, আমাকে পবিত্রতা দাও।'

'তুমি পবিত্র তো আছ।' ঠাকুর বললেন দৃঢ়স্বরে, 'তোমার যে বিশ্বাস-ভক্তি। তোমার যে আনন্দ-নিবাস।'

অভেদদর্শনই জ্ঞান, মনের বিষয়শূন্যতাই ধ্যান, মনের অশুদ্ধিত্যাগই স্নান আর ইন্দ্রিয়সংযমই শৌচ।

কিন্তু গিরিশ যে ঘোরতর গৃহী। ও তো গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী হবে না, মান রাখবে না রুদ্রাক্ষের।

গৃহই তো ঈশ্বরসাধনার নবতম পীঠস্থান। আর বৈরাগ্য তো মনে। আর মনোমালাই তো জপমালা।

॥ ১৫০ ॥

ঠাকুরের ব্যাধির দ্বিতীয় কারণ, ভক্তসেবকদের তাঁর চার পাশে একত্র করা একসূত্রে গেঁথে নেওয়া, এক সঙ্ঘে সংহত করা।

সূত্রটি কি ? সূত্রটি সেবা।

সঙ্ঘটি কিসের ? ভগবানের কাজে আত্মোৎসর্গের।

'ওরে আমাদের সেবা নেবেন, তাই তিনি এমন অসুখ করেছেন।' বললে নরেন। 'আর কিছু নয়, শুধু সেবা লাগিয়ে দে। সেবাই আমাদের পুজো, সেবাই আমাদের উপাসনা।'

এই কষ্টের মধ্য থেকে আনন্দের মধ্য থেকে চরমতম দীক্ষা নে। এখন ভগবানের সেবা করছিস, পরে জগজ্জনের সেবা করবি। জগজ্জনের সেবাই ভগবানের সেবা!

'আপনাদের সব সময়েই তো তাঁর সেবা করতেই দেখি, উপাসনা করেন কখন ?' কৌতূহলী কে একজন জিগগেস করলে।

উত্তর দিলে লাটু। নে বলে, 'হামনে ঠাকুরের মেথর আছে।' বললে, 'তাই আমাদের আবার উপাসনা কি? তাঁর যে সেবা করতে পারছি এই আমাদের উপাসনা।'

উপাসনা কাকে বলে? অমুক দিকে মুখ করে অমনি ভাবে বসো, চোখ বোজো, অমনি করে নিশ্বাস ফেল, অতগুলো মন্তর বলো—এই কি উপাসনা? ঠাকুর বলেছেন, উপাসনার সময় ভাববে তিনি কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন, তুমি তাঁকে নাওয়াচ্ছ খাওয়াচ্ছ, সাজাচ্ছ-গোছাচ্ছ, হৃদয়ে এনে বসাচ্ছ, করছ কত সুখ-দুঃখের আলাপন। আমরা যে এই প্রত্যক্ষভূতকে সেবা করছি এই আমাদের উপাসনা।

যোগীনের অসুখ করেছে।

'আমি আগেই জানি। আমার সেবার ত্রুটি হবে বলে নিজের শরীরের যত্ন নিত না এতটুকু। ওরে তা কি হয়?' ঠাকুরের স্বরে করুণার সঙ্গে কাতরতা ফুটে উঠল 'তোদের শরীর যদি ভেঙে পড়ে, আমার তবে যত্ন করবে কে? কথা শোন বাপু, ঠিক সময়ে সব খাওয়াদাওয়া কর, ঘুমুতে যা।'

শশী বসে-বসে পাখার হাওয়া করছে। বেলা প্রায় গড়িয়ে যায়, তবু ওঠবার নাম নেই।

তার হাত থেকে পাখা কেড়ে নিলেন ঠাকুর। বললেন, 'ওগো যাও, নেয়ে-খেয়ে নাও। আমি এখন দিব্যি ভালো আছি। খেয়ে-দেয়ে না হয় আবার বোসো।'

ওরে গোপাল কোথায়, বুড়ো গোপাল? আমার যে এখন ওষুধ খাবার সময়। আর সেই যে আমাকে ওষুধ খাওয়ায়।

বুড়ো গোপাল ঘুমুচ্ছে। কে এসে বললে ঠাকুরকে।

'আহা, ঘুমোক।' চিদ্ঘনলীলাবিগ্রহ ঠাকুর আনন্দ করে উঠলেন: 'কত রাত জেগেছে, কত কষ্ট করছে আমার জন্যে। ওকে তোমরা জাগিও না, ঘুমুতে দাও চোখ ভরে!'

ঠাকুরের সেই আমলকী খাবার সাধ হল, বেরিয়ে পড়ল দুর্গাচরণ। স্বর্গ-মর্ত মন্থন করে তিনদিন পরে সে আমলকী নিয়ে এল। এই তিনদিন তার নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই। কোথায় আমলকী! কিন্তু ঠাকুর যখন খেতে চেয়েছেন তখন নিশ্চয়ই অকাল-ফলোদয় হবে।

হলও তাই। কোত্থেকে কে জানে টাটকা আমলকী নিয়ে এল দুর্গাচরণ।

তার রুক্ষ-শ্রান্ত চেহারা দেখে মমতায় উথলে উঠলেন ঠাকুর। বললেন, 'আগে স্নান করো, কিছু খেয়ে নাও।'

ভাতের থালা সামনে, বসে আছে চুপ করে। 'কি, খাচ্ছেন না কেন?'

'আজ একাদশী।'

তিনদিন অভুক্ত, তারপর আজ আবার উপবাস। কিন্তু দুর্গাচরণকে টলায় এমন কারো সাধ্য নেই।

ঠাকুর বললেন, 'ওরে কেউ গিয়ে ভাতের পাতাটা এখানে নিয়ে আয়।'

শশী নিয়ে এল ভাতের থালা। ঠাকুর তার থেকে এক কণা তুলে মুখে দিলেন। আর যায় কোথা! হোকগে একাদশী, কিন্তু যখন অন্ন প্রসাদ হয়ে গেছে তখন আর ভাবনা কি। নিয়ে এস।

শুধু ভাত-ডাল নয়, পাতাসুদ্ধ খেয়ে ফেলল দুর্গাচরণ।

ঠাকুর তাকে বলে দিলেন, 'তুমি গৃহস্থাশ্রমে থাকবে। তোমায় পেলে গৃহীরা ঠিক-ঠিক বুঝবে গৃহস্থের ধর্ম কি?'

আহা, কি সুন্দর গৃহই দিয়েছে প্রভু! চারখানা ঘর, তার মধ্যে তিনখানারই ছাদ ফুটো। সেবার অঢেল বর্ষা নেমেছে, যে ঘরখানা নিটুট সে ঘরেই সস্ত্রীক থাকে দুর্গাচরণ। হঠাৎ দুজন অতিথি এসে উপস্থিত। খাওয়ানো না হয় হল কিন্তু রাত্রে শুতে দিই কোথায়? এদিকে যে অবিচ্ছেদ বৃষ্টি।

স্ত্রী একবার তাকাল স্বামীর দিকে।

দুর্গাচরণ বললে, 'যে ঘরখানা আমাদের তাই ওদেরকে ছেড়ে দেব। আজ তো আমাদের মহা ভাগ্য। অতিথি-নারায়ণের সেবায় আমাদের ঘুম ও আরাম উৎসর্গ করতে পারছি।'

অতিথিদের ভালো ঘরখানা ছেড়ে দিয়ে দুর্গাচরণ আর তার স্ত্রী ভাঙাঘরে গিয়ে বসল। চতুর্দিক দিয়ে জল পড়ছে। কোথাও এতটুক শুকনো নেই, কোণটুকুও নয়। সেই জলকে মাথা পেতে নিয়ে দুজনে বসল পাশাপাশি। ভয় কি। মুক্ত কণ্ঠে শুরু করে দিল শ্রীরামকৃষ্ণ-নাম।

সেই নামই তো আনন্দাম্বুধিবর্ধন। সেই নামের কাছে দান ব্রত তপ তীর্থ কিছু নয়। সেই নামই সংসার-ব্যাধিভেষজ, সেই প্রাণপ্রয়াণ-পাথেয়।

হে ভগবান, নামব্যাপারে আমাকে কৃপণ করো। কৃপণ যেমন নানা জায়গা থেকে ধন সংগ্রহ করে, ধনের মনোহারিতা ও বহুমূল্যতা বিচার করে আর সর্বক্ষণ ধনের রক্ষণ বিষয়ে চিন্তা করে, তেমনি তোমার নাম আমার সঞ্চয়ের, বিচারের ও চিন্তনের বিষয়ীভূত করো। হে ভুবনমঙ্গল, দিব্যনামধেয়, তোমার নামামৃতসিন্ধুর লহরীকল্লোলে নিত্য আমাকে নিমজ্জিত করো, আমি যেন গলদশ্রুনেত্র ও অবশ হয়ে থাকি। হে বৈদগ্ধিসারসর্বস্ব মূর্ত লালেশ্বর, আমার

রসনায় তোমার বাসা হোক।

দুর্গাচরণের স্ত্রী ঘর ছাওয়াবার জন্যে ঘরামি লাগিয়েছে।

দুর্গাচরণ বাড়ি এসে দেখল চালের উপর ঘর্যামি। অমনি হায়-হায় করে উঠল। ওরে, নেমে আয় শিগগির, নেমে আয়। আমি যে এ দৃশ্য আর দেখতে পারি না।

কি দৃশ্য?

'আমার সুখের জন্যে অন্য লোকে খাটবে, এ যে আমার কাছে অসহ্য! এ আমাকে ঠাকুর কী গৃহস্থাশ্রমে থাকতে বললেন!' দুর্গাচরণ রোল তুলে কাঁদতে লাগল। 'ওরে নেমে আয়, যদি পারি নিজে ঘর ছাইব, নইলে ভিজব বসে বৃষ্টিতে। আমার জন্যে তুই খাটতে যাবি কেন?'

ঘরামি তো হতভম্ব।

কপালে করাঘাত করতে লাগল দুর্গাচরণ। ওরে নেমে আয় নেমে আয় বলছি।

কি আর করে, নেমে এল ঘরামি! পাখা নিয়ে দুর্গাচরণ তাকে হাওয়া করতে লাগল। নিজে বসে তাকে তামাক সেজে দিল। চুকিয়ে দিল সমস্ত দিনের মজুরি।

পেটে শূলব্যথা, ঘরে পড়ে আছে দুর্গাচরণ, অতিথি এসে হাজির। দু একজন নয়, আট-দশজন। বাজারে বেরোতে হয়, নইলে অতিথিসৎকার হয় কি করে? ব্যথা নিয়েই বেরিয়ে পড়ল। আট-দশজনের বাজার, তা ছাড়া ঘরে চাল নেই, চাল কিনতে হল, সব মিলে প্রকাণ্ড একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াল। একটা মুটে ডাকলেই তো হয়। সর্বনাশ! নিজের বোঝা অন্যকে দিয়ে বওয়ার? কখনো না। মুটে না ডেকে নিজেই সে মোট মাথায় তুলল দুর্গাচরণ। কিন্তু কত দূর যাবে? পেটে নিদারুণ যন্ত্রণা। পড়ে গেল চলতে-চলতে। পড়ে-পড়ে ঠাকুরকে উদ্দেশ করে বলতে লাগল, 'খুব তো সংসারাশ্রম করতে বলে গেছ। কিন্তু অতিথি-নারায়ণের সেবা করতে দিচ্ছ কই?'

ব্যথার উপশম হলে মোট মাথায় নিয়ে ফের চলতে লাগল দুর্গাচরণ। বাড়ি পৌঁছে আবার কান্না: 'আপনাদের কাছে অপরাধী হয়ে রইলাম। কত দেরি হয়ে গেল আপনাদের সেবা করতে।'

'যে সংসারে থেকে ঈশ্বরকে ডাকে সেই বীরভক্ত। যে সংসার ত্যাগ করেছে, সে ঈশ্বরকে ডাকবে তার মধ্যে বাহাদুরি কি।' বললেন ঠাকুর, 'যে সংসারে থেকে ঈশ্বরকে ডাকে সেই বিশ মণ পাথর ঠেলে দেখে গহ্বরে কি আছে।

সেই-ই বাহাদুর, সেই-ই বীরপুরুষ।'

সংসারী লোকের এই বেলা বিশ্বাস তো ঐ বেলা সংশয়। এই বেলা আশা তো ঐ বেলা নৈষ্ফল্য। এই বেলা স্বীকার তো ঐ বেলা প্রত্যাখ্যান। অস্তি-নাস্তির মধ্যে দুলছে অহরহ। কত দুঃখে ক্লান্ত, কত অপমানে বিশীর্ণ, কত অবিশ্বাসে কলুষিত। কত তার বাধার কণ্টক-ক্লেশ কত তার বুদ্ধির বৈগুণ্য। পিছনে সর্বসময়ে তার অপ্রতিবিধেয় নিয়তি। তন্তুবদ্ধ শকুনির ন্যায় সে পরাধীন। তবু তারি মধ্যে বিনির্মল মুহূর্ত খুঁজে বসছে প্রশান্ত হয়ে, নিজের হৃদয়ের গভীরে ডুবে গিয়ে খুঁজছে সেই হৃদয়নিহিতকে। এত বাধাতেও যে হটে না, এত জ্বরেও যে জ্বলে না, সে বীর নয় তো আর বীর কে?

'সংসারচারিণী সেই পতিব্রতার গল্প জানো না?'

এক তপস্বী গিয়েছিল এক পতিব্রতার বাড়িতে ভিক্ষে করতে। গিয়েছিল অসময়ে। পতিব্রতার স্বামী তখন ঘরে ফিরেছে, পতিব্রতা তার সেবায় ব্যস্ত। আগে জল দিয়ে নিজের হাতে পা ধুয়ে দেবে, মাথার চুল দিয়ে পুঁছে দেবে, তারপর খেতে দেবে, খাওয়ার সময় পাশে বসে হাওয়া করবে। একটু দাঁড়াতে হবে তপস্বীমশাই। তপস্বী তো রেগে টং। এতদূর স্পর্ধা, এক ডাকে ভিক্ষে দিচ্ছে না? আমি একবার রোষদৃষ্টিতে তাকালে কাক-বক ভস্ম হয়ে যায়, একি জানে না ঐ গৃহস্থ-স্ত্রী? চেঁচিয়ে হাঁক দিল তপস্বী, দেরি কোরো না বলছি, শিগগির ভিক্ষে দাও, নইলে এমন চোখে তাকাব ভস্ম হয়ে যাবে। পতিব্রতা হাসল, বললে, আমাকে তোমার কাকী-বকী পাওনি, আমি পতিব্রতা। আমার আগে পতি, পরে অতিথি। আমি সংসারব্রতিনী।

তপস্বী রোষপরুষ চোখে তাকাল। কিচ্ছু হল না।

বলরাম বোস দুর্গাচরণকে বললে, পুরী চলো। তোমার যা খরচ লাগে আমি দেব।

দুর্গাচরণ বললে, 'ঠাকুর বলে গেছেন ঘরে থাকতে। তাঁর কথা এক চুল লঙ্ঘন করি আমার সে সাধ্য নেই। ঘরে থাকা মানেই তাঁকে ধরে থাকা।'

স্বয়ং বিবেকানন্দ বলে পাঠালেন: 'আপনি মঠে এসে থাকুন।'

সেখানেও দুর্গাচরণের সেই এক উত্তর: 'ঠাকুর যে আমাকে ঘরে থাকতেই বলে গেছেন। তাঁর আজ্ঞার লঙ্ঘন করি কি করে?'

শীতবস্ত্র নেই, গিরিশ ঘোষ একখানা কম্বল পাঠিয়ে দিয়েছে দুর্গাচরণকে। দেবেন মজুমদার স্বয়ং বয়ে এনে দিয়ে গিয়েছে। নিয়েছে দুর্গাচরণ। গিরিশ

ঘোষ জানত পরের থেকে কোনো জিনিসই সে গ্রহণ করে না, তাই এই জিজ্ঞাসা। নিয়েছে, মাথায় করে নিয়েছে। শুনে আশ্বস্ত হল গিরিশ।

কিন্তু ঐ মাথায় করে নেওয়াই। কদিন পর গিরিশের কানে এল, কম্বল দুর্গাচরণ গায়ে দেয়নি, সেই মাথায় করেই রেখেছে। খোঁজ নিতে পাঠাল দেবেনকে। তুমি একবার গিয়ে দেখে এস তো।

দেবেন মজুমদার দেখে এল। কি দেখে এলে? দেখে এলুম কম্বল মাথায় করে বসে আছেন নাগমশাই।

জেলে মাছ বেচতে এসেছে। কই, মাগুর, সিঙ্গি। কাছেই এই পুকুরের মাছ মশাই, জ্যান্ত, দেখুন লাফাচ্ছে চুপড়িতে। লাফাচ্ছে না ছট্‌ফট করছে? সমস্ত মাছগুলি কিনল দুর্গাচরণ। আর মুহূর্তমাত্র দেরি না করে মাছগুলি পুকুরে ছেড়ে দিয়ে এল। জেলে তো থ। দাম আর চুপড়ি যেই ফিরে পেল অমনি ছুট দিল ঊর্ধ্বশ্বাসে।

ভাত-ডালের পিণ্ড হাতে নিয়ে পুকুরপাড়ে এসে দাঁড়াল দুর্গাচরণ। পোষা কটি মাছ আছে তাদের নাম ধরে ডাকে। জলের কোন গভীর স্তর থেকে উঠে আসে মাছগুলি। জলের মধ্যে খাবার ছুঁড়ে-ছুঁড়ে মারে না, দুর্গাচরণ জলের ধারেই বসে পড়ে, জলে হাত ডুবিয়ে রাখে, হাতের থেকেই মাছগুলি খাবার তুলে নেয়।

উঠোনে বসে তামাক খাচ্ছে দুর্গাচরণ, দুটো বুনো শালিক উড়ে এসে বসেছে তার পাশটিতে। প্রথমটা খেয়াল করেনি, পাখি দুটো শেষে তার পা ঠোকরাতে লাগল। এসেছিস মা? তাদের গায়ে দুর্গাচরণ হাত বুলতে লাগল। দাঁড়া, তোদের খাবার দি, জল দি। চাল নিয়ে এসে হাতে করে খাওয়াতে লাগল তাদের, বাটি করে জল দিল। খেয়েছিস, পেট ভরেছে? এবার যা, বনে গিয়ে খেলা কর। কাল আবার আসিস। পা ঠুকরে তন্দ্রা ভাঙাস।

এই যে তোদের খেলা আমার সঙ্গে এই তো আমার ঠাকুরের খেলা।

একটা গোখরো সাপ বেরিয়েছে উঠোনে। মারো, মারো, সবাই ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে উঠল। শুধু দুর্গাচরণ নির্বিচল। বললে, 'বনের সাপে খায় না মনের সাপে খায়। যদি ওর অনিষ্ট ইচ্ছা না করো ও-ও করবে না কিছু অনিষ্ট। যেমন ব্যবহার তেমন ব্যবহার। যেমন দেবে তেমনি পাবে।'

নাগরাজ! নাগরাজ! সাপকে ডাকতে লাগল দুর্গাচরণ।

'আসুন আমার সঙ্গে। জঙ্গলে থাকেন, কেন এই ক্ষুদ্র মানুষের ঘরে পদার্পণ করেছেন? এখানে কে বোঝে আপনার মর্যাদা?'

তুড়ি দিতে-দিতে দুর্গাচরণ চলতে লাগল আগে-আগে আর বিষধর সাপ তার অনুগমন করতে লাগল নতশিরে। গৃহাঙ্গন ছেড়ে চলে গেল জঙ্গলে।

নিজেও মাঝে-মাঝে ফণাধারী ভুজঙ্গ সেজেছে।

দুর্গাচরণের কাছে কে একজন ঠাকুরকে নিন্দে করছে। দুর্গাচরণ প্রথমে তাকে বিনয় করে বললে, থামুন, ও সব মিথ্যে কথা।

নিন্দুকের রসনা আরো লেলিহান হয়ে উঠল। মিথ্যে কথা? আরো সে কুৎসা-বর্ষণ করতে লাগল।

'এ বাড়িতে বসে এ সব নিন্দাবাদ করতে পারবেন না বলছি। এই কানে শুনতে পাব না গুরুনিন্দা।' দুর্গাচরণ হুমকে উঠল।

গালাগালেরও একটা নেশা আছে। তাই তখন পেয়ে বসেছে লোকটাকে। সে নিরস্ত হল না!

'বেরোও, বেরোও, তুমি এখান থেকে। নইলে মহা বিভ্রাট হবে বলে দিচ্ছি।' কে কার কথা শোনে! লোকটার মাথায় তখন ভূত চেপে বসেছে। গলার স্বর সে শেষ পর্দায় তুললে। 'তবে রে—' সেই লোকটার পায়ের জুতো কেড়ে নিয়ে লোকটাকে পিটতে লাগল দুর্গাচরণ। 'বেরোও, বেরোও এখান থেকে।'

চলে যেতে-যেতে লোকটা বললে, 'আচ্ছা দেখে নেব তুমি কেমনতরো সাধু। পাবে এর প্রতিফল।'

দুর্গাচরণ ঘন-ঘন ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম করতে লাগল। ঠাকুর, কেন, কেন তুমি আমাকে গৃহস্থ হতে বললে? তারই জন্যে তো এই দুর্বিষহ যন্ত্রণা। শুনতে হয় তোমার নিন্দা, করতে হয় তার প্রতিকার। তারপর আবার প্রতীক্ষা করতে হয় দোর্দণ্ড প্রতিফল।

মুহূর্তে কি ভোজবাজি হয়ে গেল নাকি? সেই লোকটা দেখি ফিরে আসছে। লাঠিসোটা নিয়ে নয় দুটি হাত জোড় করে। দুর্গাচরণের কাছে বসে দীন বচনে বললে, আমাকে ক্ষমা করুন।

জয় শ্রীরামকৃষ্ণ! আনন্দে লাফিয়ে উঠল দুর্গাচরণ। আরে বসুন-বসুন উঠছেন কেন? গ্রামের এত বড় একজন আপনি গণ্যমান্য লোক, অমনি-অমনি কি ফিরে যেতে আছে? তামাক খেয়ে যান। দুর্গাচরণ তামাক সাজতে বসল।

পাটের কলের দুটো সাহেব পাখি মারতে এসেছে দেওভোগে দুর্গাচরণের গ্রামে। দুর্গাচরণ ছুটে গিয়ে তাদের অনুরোধ করলে, মারবেন না পাখি।

একটা রুক্ষশুষ্ক পাগলের মত দেখতে। এর কথা কে কবে গ্রাহ্য করে! সাহেব

পাখির দিকে তাক করল বন্দুক।

খপ করে বন্দুক ধরে ফেলল দুর্গাচরণ। কি স্পর্ধা, সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, বন্দুকের গুলি পাখির নয় তোমারই হৃদয় ভেদ করবে দেখ। কিন্তু সাধ্য কি দুর্গাচরণের মুঠোর থেকে ছিনিয়ে নেয় বন্দুক। রোগা লিকলিকে শরীরে এখন শত সিংহের শক্তি। ধস্তাধস্তিতে সাহেব তাকে কিছুতেই টলাতে পারছে না। আরেকজন সাহেব এল তার সাহায্যে। তবুও নয়। দুর্গাচরণ বন্দুক কেড়ে নিয়ে চলল বাড়ির দিকে। বাড়ি এসে জলে হাত ধুয়ে ফেলল দুর্গাচরণ। কি ভীষণ প্রাণঘাতী অস্ত্র স্পর্শ করেছি।

ঠাকুরের মাথায় হাত বুলুচ্ছে লাটু। কি আশ্চর্য, হাত বুলুতে-বুলুতে ঘুমিয়ে পড়েছে! শশী কাছাকাছি ছিল, এসে দেখল, ঠাকুর চোখ চেয়ে আছেন, আর তাঁর মাথায় নিশ্চল হাত রেখে দিব্যি ঘুম মারছে লাটু।

লাটু, লাটু, ডাকতে লাগল শশী। এত সজাগ ঘুম লাটুর, তবু সাড়া দেবার নাম নেই। গায়ে হাত দিয়ে নাড়া দিল তবু ওঠে না।

'ওকে বিরক্ত করিসনি।' স্নেহমধুর স্বরে ঠাকুর বললেন, 'ও কি এখন আর এ জগতে আছে! চলে গিয়েছে সমাধির দেশ দেখতে।'

শশী তখন এক পাশে বসে ঠাকুরের মাথায় হাত বুলুতে লাগল।

মাদ্রাজ মঠের ছাদ ফেটে বৃষ্টির জল পড়ছে মেঝেতে। ঠাকুরঘরেও পড়ছে নাকি?

শশী বারে-বারে উঠে-উঠে গিয়ে দেখে আসছে। হ্যাঁ, এখন দেখছি ঠাকুরঘরেও পড়ছে। ঠিক যেখানটাতে ঠাকুরের ছবি, সেইখানে। কি হবে?

একটা ছাতা খুলে ঠাকুরের মাথার উপর ধরল শশী। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। ধরে দাঁড়িয়ে রইল এক ঠায়ে। সমস্ত রাত ধরে বৃষ্টি। সমস্ত রাত ধরে দাঁড়িয়ে।

সবাই বললে, শুকনো জায়গায় ফোটোটি সরিয়ে দিলেই তো হয়।

কি সর্বনাশ, নাড়াচাড়া করতে গেলে ঠাকুরের ঘুম ভেঙে যাবে যে।

সেদিন গ্রীষ্মের দুপুরে কি অসহ্য গরম। খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করতে বসেছে শশী, সাধ্য কি একটু তন্দ্রার স্পর্শ পায়! আহা ঠাকুরের না জানি কী অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে। মনে হওয়া মাত্রই উঠে পড়ল শশী, ছুট দিল ঠাকুরঘরে। হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করতে লাগল। প্রভু আমার প্রিয় আমার পরমধন হে। চিরপথের সঙ্গী আমার চিরজীবন হে।

নিজের ফোটো নিজে সেদিন দেখছেন ঠাকুর। বললেন, 'এ যে দেখছি এক মহাযোগীর মূর্তি। ওরে ফুল নিয়ে আয়, একে আমি পূজা করব।'

ভবনাথ ফুল নিয়ে এল। নিজের ফোটো নিজেই ঠাকুর পুজো করলেন। শ্রীশ্রীমাকে বললেন, 'দেখো, ঘরে-ঘরে এর একদিন নিত্যপুজো হবে।'

শুধু ঘরে-ঘরে? হৃদয়ে-হৃদয়ে।

॥ ১৫১ ॥

যিনি মহাকাশে মহাতপস্বী মহাকাল তাঁকে মনের ইয়ত্তার মধ্যে মনন করা যায় কই?

'আমার অবস্থা তবে তুমি কি মনে করো?' ডাক্তার সরকারকে জিগগেস করলেন ঠাকুর: 'ঢং?'

মৃদু হাসল ডাক্তার। বললে, 'ঢং মনে করলে কি এত আসি? ছ-সাত ঘণ্টা ধরে বসে থাকি? কিন্তু তাই বলে মনে করো না অমুকে তোমাকে মেনেছে বলে আমিও তোমাকে মানব।'

'আমি কি তোমাকে মানতে বলছি?'

'তবে কি বলছ?'

'সব ঈশ্বরের ইচ্ছা।'

'সব?'

'সমস্ত। ঘাসের ডগাটিও নড়ে না ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া। অর্জুন তো কত বললে, কিছুতেই যুদ্ধ করব না, জ্ঞাতিহত্যা করা আমার কর্ম নয়। শ্রীকৃষ্ণ হাসলেন, বললেন, 'তুমি কি আর করবে, তোমার স্বভাবে করাবে। এই দেখ আমি আগের থেকেই সবাইকে মেরে রেখেছি। তুমি নিমিত্ত মাত্র।'

'সব যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা তবে তুমি বকো কেন? কি দরকার কথা কয়ে?' ডাক্তার তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করল।

'বলাচ্ছেন তাই বলি,' প্রশান্ত মুখে বললেন ঠাকুর 'তিনি যন্ত্রী আর আমি তাঁর যন্ত্র।'

তিনি লেখক আর আমি তাঁর লেখনী। তিনি শিল্পী আর আমি তাঁর তুলিকা।

'চুপ করে থাকলেই পারো।' ডাক্তার আবার ফোড়ন দিল। 'কেন আর তবে পরমহংসগিরি করছ? আর এরাই বা তোমার সেবা করে মরছে কেন? আর কেনই বা বলছ অসুখটি সারিয়ে দাও ডাক্তার।'

কি আর করি বলো। সব তাঁর ইচ্ছাতেই করা। যতক্ষণ এই দেহ রয়েছে এই আমি-ঘট রয়েছে, ততক্ষণ হবেই এই আর্তনাদ।

'মনে করো মহাসমুদ্র।' বললেন ঠাকুর, 'তার মধ্যে রয়েছে একটি ঘট।

আত্মার সমুদ্রের মধ্যে অহংএর ঘট। সে ঘটের ভিতরেও জল বাইরেও জল। কিন্তু বাইরের জলের সঙ্গে ভিতরের জলের একাকার হতে হলে ঘটটি ভেঙে ফেলা চাই। যাঁর মহাসমুদ্র তাঁরই আবার এই ঘট। তিনিই এই আমি-ঘটটি রেখে দিয়েছেন সমুদ্রের মধ্যে। তিনি এই পোড়া-মাটির দেয়ালটুকু ভেঙে না দিলে কিছুতেই জলে জলময় হওয়া যাবে না।'

ডাক্তার অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, 'তবে কি বলতে চাও এই যে লক্ষ-কোটি "আমি" এ সব শুধু ঈশ্বরের চালাকি? তিনি কি চালাকি করছেন আমাদের সঙ্গে?'

গিরিশ কাছেই ছিল, সেও খাপ্পা হয়ে উঠল। বললে, 'আপনি কি করে জানলেন যে করছেন না চালাকি?'

ঠাকুর বললেন, 'যেমন করেই বলো না কেন সব তাঁর লীলা। এই খেলার মেলা বসবার জন্যেই এতগুলো আমির খেলোয়াড়। বলতে চাও তো বলো একটা ভোজবাজি। সেই রাজার সামনে একজন ভেলকি দেখাতে এসেছিল। একটু দূরে সরে গিয়ে জিগগেস করলে, কি দেখছ বলো তো? একটা ঘোড়ার উপর সওয়ার দেখছি। সওয়ার কেমন দেখতে? খুব সাজগোজ, খুব জেল্লাজমক, হাতে রাজ্যের অস্ত্রশস্ত্র। সভাসুদ্ধ লোক স্তম্ভিত। রাজা সবাইকে বললেন, এবার তবে বিচার করে দেখ। সবাই বিচারে বসল। বিচারে সাব্যস্ত হল, ঘোড়া সত্য নয়, সাজগোজ জেল্লাজমক অস্ত্রশস্ত্রও সত্য নয়, সত্য হচ্ছে সওয়ার। সে সওয়ারই একলা দাঁড়িয়ে। বাজিকর যে সওয়ারও সে।'

কিংবা আরেক রকম করে বলি।

'মনে করো, একটা হাঁড়িতে ভাত চড়িয়েছ, আলু বেগুন ছেড়ে দিয়েছ তাতে। কতক্ষণ পরে আলু-বেগুন নড়তে-চড়তে লাফাতে শুরু করল। ছোট ছেলে যার জ্ঞান হয়নি সে ভাবছে আলু-বেগুন বুঝি নিজের থেকেই লাফাচ্ছে। কিন্তু লাফাবার আসল কারণ হচ্ছে ঐ হাঁড়ির নিচেকার আগুন। যতক্ষণ আগুন ততক্ষণই লাফঝাঁপ। জলন্ত কাঠ টেনে নিয়ে যাও উনুন থেকে, সব ঠাণ্ডা। সব আমরা ঈশ্বরের শক্তিতেই শক্তিমান। আমরা সব তাঁর খেলার পুতুল।'

সব তাঁর খেলা বা খেয়াল। 'খেলার ছলে হরিঠাকুর গড়েছেন এই জগৎখানা।' শুধু জগৎ নয় আমার হৃদয়টুকুও। আমার হৃদয়টুকুই যে তাঁর খেলবার আঙিনা। আমি না হলে তাঁর খেলা জমবে কেন? দুজন না হলে কি খেলা জমে?

ঈশ্বরের আস্বাদন ও উপভোগের জন্যেই আমরা। এর বাইরে আর কি প্রয়োজন আছে জীবনের? এই বোধই তো মানুষের চরমবোধ। যার জীবনে ঈশ্বরের উপভোগ ও আস্বাদন অব্যাহত সেই ভক্ত। ভক্তের হৃদয়েই কৃষ্ণের সভতই

বিশ্রাম। ভক্তের হৃদয়ই ভগবানের বৈঠকখানা।

ভক্ত মুক্তি চায় না। সে চায় ঈশ্বরের রূপ দেখতে, আলাপ করতে। জগৎকে সে বলে না স্বপ্নবৎ। বলে তিনিই এ সব হয়েছেন। মোমের বাগানে সবই মোম, তবে নানা রূপ, নানা ছাঁদ। সবই ঈশ্বরের ঝিলিক, ঈশ্বরের চাকচিক্য। বলে, বা, এ সব বেশ হয়েছে, দিবি হয়েছে।

ব্রহ্ম আর মায়া। জ্ঞানী মায়া ফেলে দেয়। ভক্তি মায়া ছাড়ে না। মহামায়ার ভজনা করে। জ্ঞানী জোর করে খুলে দেয় ঘোমটা। ভক্ত স্তব করে ঘোমটা খোলায়।

একটু অহং থাকে ভক্তের। সে অহং আস্বাদনের অহং, সে অহং তুমি প্রভু আমি দাস, তুমি মা, আমি সন্তান।

'এই বিদ্যার আমি, ভক্তের আমি, এতে দোষ নেই।' বললেন ঠাকুর, 'বজ্জাত আমিতেই দোষ। ভক্তের আমি মানে বালকের আমি। কেমন জানো? যেন আশির মুখ। আর যাই করুক গালাগাল দেয় না। যেন পোড়া দড়ি। পোড়া দড়ি দেখতেই দড়ির আকার। কিন্তু ফুঁ দাও উড়ে যাবে। জ্ঞানাগ্নিতে অহঙ্কার পুড়ে গেছে। এখন আর কারু অনিষ্ট করে না। এখন নামমাত্র আমি।'

'সেদিন মহিম চক্কোত্তির বাড়ি গিয়েছিলাম।' বললে নরেন।

'তাই নাকি?' ঠাকুর উৎসুক হয়ে উঠলেন।

'ওরকম শুষ্কজ্ঞানী দেখিনি।'

'বটে? কি হল ওখানে?'

'আমাদের গান গাইতে বললে। গঙ্গাধর গাইলে—"শ্যামনামে প্রাণ পেয়ে ইতি-উতি চায়, সম্মুখে তমালবৃক্ষ দেখিবারে পায়।" গান শুনে কি বললে জানেন?'

'কি বললে?'

'বললে, ও সব গান কেন? প্রেম-ট্রেম ভালো লাগে না। তা ছাড়া মাগ-ছেলে নিয়ে থাকি, ও সব গান এখানে কেন?'

'দেখলে, কি ভয়!' ঠাকুর হেসে উঠলেন।

জ্ঞানীরই ভয়, ভক্তের ভয় কি! যে মায়ের সন্তান সে তো অকুতোভয়। তার মুখে মা-মন্ত্র, সে তো অভী-মন্ত্র। আমার মা আছেন আর আমি আছি, আমার আবার কিসের ভাবনা!

বোশেখ মাস, রোদের দিকে তাকানো যায় না। ঘরেও দুঃসহ গরম। নিঃসন্দেহ কষ্ট হচ্ছে ঠাকুরের। সুরেন মিত্তির খসখস এনে দিয়েছে। পরদা বানিয়ে টাঙিয়ে দাও জানলায়। জলের ছিটে দাও। ঘর ঠাণ্ডা হবে।

কিন্তু কে দেয়। কার আর এ সব দিকে নজর আছে!

সুরেন হৈ-চৈ করে উঠল। 'এ কি, কেউ পরদা করে টাঙিয়ে দিলে না খসখস? কি আশ্চর্য, এ দিকে কারু মনোযোগ নেই।'

'কি করে হবে!' কে একজন পাশের থেকে টিপ্পনি কাটল: 'শিষ্য সেবকদের যে এখন ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা। এখন কেবল সোঽহং চলছে। আবার যখন তুমি প্রভু আমি দাস চলবে তখন এসব দিকে নজর আসবে। তার আগে নয়।'

কিন্তু নরেন কি ভক্ত না জ্ঞানী?

নরেনের হাত মুখ স্পর্শ করছেন ঠাকুর। বলছেন গাঢ়স্বরে, 'মায়াবাদ? মায়াবাদ বড় শুকনো।' তাকালেন নরেনের দিকে। 'কি বললাম বল তো।'

'শুকনো।'

'কিন্তু তুই? তুই তো শুকনো নোস। তোর মুখ-চোখ তো শুকনো নয়। তোর সর্বাঙ্গে যে ভক্তির লক্ষণ। জ্ঞানের পর যে ভক্তি সেই ভক্তির ব্যঞ্জনা।

ভক্তি নইলে জ্ঞান দাঁড়াবে কোথায়? জ্ঞানী জ্ঞানলাভ করার পর কি করবে? থাকবে বিদ্যামায়া নিয়ে। ভক্তি দয়া বৈরাগ্য নিয়ে। তার দুই উদ্দেশ্য। এক উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা, দ্বিতীয় রসাস্বাদন। জ্ঞানী যদি সমাধিস্থ হয়ে বসে থাকে তবে লোকশিক্ষা হয় না। তেমনি ঈশ্বরের আনন্দকে কি করে সম্ভোগ করবে যদি ভক্তি না থাকে?

তাই নরেন ভক্তশ্রেষ্ঠ। তার এক দিকে ঈশ্বরসম্ভোগ অন্য দিকে লোকশিক্ষা। লোকশিক্ষা?

সমাধিতে বসেছে নরেন। উঠব না বসব না নড়ব না। ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করব। সমস্ত দেহ নিঃসাড় নিস্পন্দ। মৃত্যুশীতল। মধ্যরাত্রির পাথরে নেই এতটুকু একটা নিশ্বাসের রেখা।

পাশে বুড়ো গোপাল বসে ছিল। তার ধ্যানে ছেদ পড়ছে বারে-বারে। আড়-চোখে দেখছে নরেনকে। কিন্তু এ কি, ঘুমন্ত লোকেরও একটা অস্তিত্ব থাকে। নরেনের গায়ে সে ঠেলা মারল। ডাকল, নরেন, নরেন! কে সাড়া দেবে! গা একেবারে নিস্প্রাণ ঠাণ্ডা।

ছুটে দোতলায় একেবারে ঠাকুরের কাছে এসে হাঁপাতে লাগল গোপাল। বললে, 'নরেন নেই।'

'নেই, গেল কোথায়?'

'মরে গেছে।'

'বেশ হয়েছে। থাক অমনি কতক্ষণ শূন্য হয়ে। সমাধি-সমাধি করে আমাকে

BanglaBook.org

কম জালিয়েছে। এখন থুক একটু সমাধির দেশ।'
দেহজ্ঞান ফিরে এলে পর টলতে-টলতে ঠাকুরের কাছে উঠে এল নরেন। ঠাকুর বললেন, 'কি রে, বেড়ানো হল একটু সমাধিভূমি? কেমন দেখলি? কিন্তু যাই বল, ঘর তোকে দেখিয়ে দিলাম বটে, কিন্তু তার দরজার চাবি এঁটে বন্ধ করে দিলাম।'
'বন্ধ করে দিলেন?' যেন চমকে উঠল নরেন। 'কিন্তু তার চাবি?'
'তার চাবি আমার কাছে থাকল। সে ঘরে যে তোর হামেশা যাওয়া চলবে না। ভোর যে অনেক কাজ।'
'কাজ? কিসের কাজ? কার কাজ?' নরেন ঝঙ্কার দিয়ে উঠল।
'আমার কাজ।' ঠাকুর তাকালেন নরেনের চোখের দিকে। 'সে কাজ যখন ফুরুবে তখন আমিই চাবি ঘুরিয়ে বন্ধ ঘর আবার খুলে দেব, দেখিস।'
'কিন্তু কাজটা কি শুনি?'
কাগজ-পেন্সিল তুলে নিলেন ঠাকুর। যেন কী গূঢ় কথা জানাচ্ছেন গোপনে এমনি করে লিখলেন। লিখলেন, 'লোকশিক্ষা।'
'বয়ে গেছে।' প্রবল ভাবে ঘাড় নাড়া দিল নরেন। বললে, 'পারব না, কিছুতে পারব না।'
ঠাকুর দৃঢ় স্বরে বললেন, 'তোর ঘাড় পারবে।'
তুই যে ভক্তশ্রেষ্ঠ। তোর এক দিকে ঈশ্বরসম্ভোগ অন্য দিকে লোকশিক্ষা।
কিন্তু ভক্তিই সব? বিজ্ঞান বা সায়ান্স কিছু নয়? ডাক্তার সরকার উদখুস করে উঠল।
কে বললে কিছু নয়? প্রতীয়মান সত্যকে কে অমান্য করবে, কে মূল্য দিতে কুণ্ঠিত হবে? ঈশ্বরেরই যে ইচ্ছা, বুদ্ধির জগতে বিজ্ঞানই সিংহাসন নিক। স্বচ্ছ দৃষ্টি ও দৃঢ় প্রমাণেরই জয়জয়কার হোক। জড়বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান—এরাই তো প্রকৃতীশ্বরের জীবন্ত ধর্মগ্রন্থ। এদেরকে বাদ দিলে চলবে না, কিন্তু ওদের বাইরে আর জায়গা নেই তাও নয়। বুদ্ধির জগতের বাইরে রয়েছে আরেকটা বোধির জগৎ। স্বল্প কল্পনার স্বপ্নরহস্যের জগৎ নয়, প্রতীয়মানের ঊর্ধ্বে অনন্যভূয়ের জগৎ। আপেক্ষিকের ঊর্ধ্বে অব্যাহতের। তাকেই বা বাদ দেব কেন? ইন্দ্রিয়তান্ত্রিক বুদ্ধির বিজলির আলোর ঊর্ধ্বে স্বয়ম্প্রভ বোধির জ্যোৎস্নাকেও উপভোগ করব না কেন?
সেই উপভোগের কৌশলটিই ভক্তি।
কাচের বোয়মের মধ্যে জল, তাতে লাল মাছ খেলা করছে। ডাক্তার সরকার

তাতে একটা এলাচের খোসা ফেলে দিল। মাছের খাবার সেই এলাচের খোসা।
'দেখলে, দেখলে,' কাছে বসেছিল মাস্টার, তাকে লক্ষ্য করে ডাক্তার বললে, 'মাছগুলো আমার দিকে চেয়ে আছে। এদিকে যে এলাচের খোসা ফেলে দিয়েছি তা দেখছে না। তাই তো বলি শুধু ভক্তিতে কিছু হবে না, জ্ঞান চাই।' কটা ময়দার গুলি পাকিয়ে খোলা ছাদের উপর ছুঁড়ে দিল ডাক্তার। কটা চড়ুইপাখি উড়ে বেড়াচ্ছে, থাক এই ময়দার গুলি।
'দেখলে, চড়ুইপাখি উড়ে পালাল! ময়দার গুলি দেখে ভয় পেল। ওটা যে খাবার জিনিস তা জানে না। ওর খাওয়া হল না জানে না বলে। ওর ভক্তি হল না জ্ঞান নেই বলে।'
নিশ্চয়। জ্ঞানের পরেই তো ভক্তি। এত জেনেও তোমাকে জানা হল না, তাই তো তোমাকে ভালোবাসা।
পাশাপাশি দুটো পাতকুয়ো আছে। একটার জল আসছে নিচে ঝরনার থেকে, আরেকটার আসছে বর্ষার থেকে। দুটোই সমান পরিপূর্ণ। কিন্তু বর্ষার পাতকুয়োর জল কতক্ষণ টিকবে? যেই বর্ষা শেষ হবে অমনি জলও শেষ হবে। কিন্তু যে-পাতকুয়োর নিচে ঝরনা তার অনন্ত পরমায়ু। তার জলের আর শেষ নেই। সে সব সময়েই কানায়-কানায় ভরা। তেমনি তোমার সায়ান্সের জ্ঞান ঐহিকের জ্ঞান দুদিন পরেই শুকিয়ে যাবে। কিন্তু যে ভক্ত তার মধ্যে অনন্ত জ্ঞানের উৎস, সে সব সময়েই ভাবে-রসে-সুখে-প্রেমে পরিপূর্ণ।
'কিন্তু ভক্তিপথে মানুষ যে আটকে যায়।' বললে ডাক্তার।
'তা যায় বটে কিন্তু তাতে হানি হয় না।' বললেন ঠাকুর। 'সেই সচ্চিদানন্দের জলই জমাট বেঁধে বরফ হয়েছে। তুমি বিচারের পথে জ্ঞানের পথে যেখানে এসে পৌছুবে, আমি যে শুধু ভক্তির জোরেই সেখানে পৌছুতে পারি।'
'কিন্তু ইন্দ্রিয়সংযম কি অমনিতে হয়?' বললে ডাক্তার। 'ঘোড়ার চোখের দু'দিকে ঠুলি দাও। তেমন বেয়াড়া হয় ঘোড়া একেবারে বন্ধ করে দাও চোখ। ঐটেই বিচার।'
'ভক্তিপথেও তাই হতে পারে।' ঠাকুরের কণ্ঠস্বর আবেগমধুর হয়ে উঠল: 'যদি ঈশ্বরের পাদপদ্মে একবার ভক্তি হয়, যদি তাঁর গুণগান করতে ভালো লাগে, তাহলে আর চেষ্টা করে ইন্দ্রিয়সংযম করতে হয় না। রিপুবশ আপনা-আপনি হয়ে যায়।'
সেদিন নরেন গান গাইল। আর গান শুনে নাচতে শুরু করলেন ঠাকুর।
ডাক্তার তো স্তম্ভিত! এত-বড় একটা কঠিন রুগী, দুর্বল যন্ত্রণাজর্জর সে

কিনা মহানন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য শুরু করেছে! শরীরের দুঃখদৈন্য চলে গিয়েছে নির্বাসনে, মন শুধু সুধাস্নানে মাতোয়ারা।

এ কি, ডাক্তারের চোখেও ঘোর লাগল নাকি! সে কি চোখের সামনে একজন ব্যাধিক্লিষ্ট রুগী দেখছে, না, আর কেউ?

যা এমন অসাধ্য ব্যাধির অসহ্য কষ্ট ভুলিয়ে দিতে পারে, সে না জানি কি দ্রব্য!

শুধু ঠাকুর নন, যারা-যারা ভক্ত সেখানে জমায়েত হয়েছে, ছোট-নরেন, লাটু, সবাই সমাধিস্থ। নাড়ী চলছে না, নড়ছে না হৃৎপিণ্ড। সবাই জড় জিনিসের মত নিশ্চলস্তূপ হয়ে আছে।

ঠাকুরের চোখের পাতা মেলে আঙুল ঢুকিয়ে দিল ডাক্তার, চোখের পাতা কাঁপল না এতটুকু।

বিজ্ঞান কি পঙ্গু হয়ে গেল নাকি? পর্বতের গা বেয়ে কত দূর উঠে, বসে পড়ল নাকি? থেমে পড়ল নাকি? পাথেয় ফুরিয়ে গেল নাকি তার?

ভাবের উপশম হবার পর আরেক বিচিত্র কাণ্ড। ভক্তেরা কেউ হাসছে, কেউ কাঁদছে। এতে হাসবারই বা কি আছে, কাঁদবারই বা কি আছে! সুস্থসমর্থ ছেলেগুলো সহসা পাগল হয়ে গেল নাকি? পাগল না হবে তো এ কেমন ব্যবহার!

'কিন্তু, যাই ভাবো আর বোঝো, তুমি রসবে।' ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে হাসলেন ঠাকুর।

তোমাকে শুকনো থাকতে দেব না। এমনি যা জানবে শুকনো। যখন ঈশ্বরকে জানবে তখনই তুমি সরস-তরল। আর ঈশ্বরকে জানাই সমস্ত জানার চরম। সমস্ত বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান।

ঈশ্বরই অপ্রমেয়। তিনি সর্বভূতের বাসস্থান, তাই তিনি বাসুদেব। বৃহৎ বলে তিনি বিষ্ণু। মা শব্দের অর্থ বুদ্ধি। মৌন ধ্যান ও যোগশক্তিতে আত্মার উপাধিভূত সেই বুদ্ধিবৃত্তিকে দূরীকৃত করেন বলে তিনি মাধব। কৃষি-শব্দের অর্থ সত্তা আর ন-শব্দের অর্থ আনন্দ। সৎ ও আনন্দস্বরূপ বলে তিনি কৃষ্ণ। পুণ্ডরীক শব্দের অর্থ পরমস্থান ও অক্ষ শব্দের অর্থ অব্যয়। পরম স্থানে বাস করেন আর তাঁর লয় নেই বলে তিনি পুণ্ডরীকাক্ষ। দুষ্টদের বিত্রাসিত করেন বলে জনার্দন। কারু গর্ভে জন্মান না বলে অজ। সাতিশয় দান্ত ও ইন্দ্রিয়দের মধ্যে স্বপ্রকাশ বলে দামোদর। হৃষ্ট ও ঐশ্বর্যবান বলে হৃষীকেশ। নরগণের আশ্রয় বলে নারায়ণ। সর্বভূতের পূরণকর্তা বলে পুরুষোত্তম।

সেদিন আবার গান শোনাবার জন্যে নরেনকে পীড়াপীড়ি করছেন ঠাকুর। আর গান মানেই তো ঈশ্বরগুণগান।

মাস্টারকে ইশারা করল ডাক্তার। বললে, গান-টান আর নয়। উত্তেজিত হবেন আর তাতে মহা অনর্থ হবে। বারণ করে দাও।

কে কাকে বারণ করে!

ঠাকুর নিজে থেকেই জিগগেস করলেন, 'কি হে, গান শুনবে?'

'আমি তো শুনতে পারি কিন্তু তুমি শুনো না।'

'আমি শুনব না?'

'না, গান শোনা তোমার অপকার।'

'অপকার?'

'হ্যাঁ, গান শুনলেই যে তুমি তিড়িং-মিড়িং করে ওঠো।'

মুখখানি ম্লান করলেন ঠাকুর। বললেন, 'কি করতে হবে?'

'ভাব চেপে রাখতে হবে।'

'তাই রাখব। চুপ করে থাকব। তবু গান হোক।'

নরেন গান ধরল। 'এ কি সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ!'

দেখতে-দেখতে ঠাকুরের ভাবসমাধি হয়ে গেল। ডাক্তার কোথায় বিরক্ত হবে, তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল সেই আশ্চর্য মুখের দিকে। এমন মুখ পলকপতন-কালেও না দেখে হৃদয় অস্থির হয়ে ওঠে। এ কি মানুষের মুখ? এ কি জরা-জরাপীড়িত মর্ত দেহ, না কি সূর্যাগ্নিসঙ্কাশ দিব্যপুরুষ?

এ কি, গান শুনতে-শুনতে যে ডাক্তারের চোখেও জল ভরে এল!

'তুমি রসবে।' ঠাকুরের কথা না ফলে যায় না।

শুধু তাই নয়, ভাবাবেশে ডাক্তারের কোলের মধ্যে পা তুলে দিলেন ঠাকুর। বললেন, 'আহা, তুমি তখন কি কথাই বলেছ! তাঁরই কোলের মধ্যে বসে আছি, দুঃখ-কষ্টের কথা আধি-ব্যাধির কথা তাঁকে বলব না তো কাকে বলব!'

ঠাকুরেরও দু-চোখ ভেসে গেল জলে। ডাক্তারকে বললেন, 'ডাক্তার, তুমি খুব শুদ্ধ, খুব খাঁটি। তা না হলে কি তোমার গায়ে পা রাখতে পারি?'

তিন যুদ্ধে জয়ী হলেন ঠাকুর। প্রথম যুদ্ধ সংশয়ের সঙ্গে, অবিশ্বাসের সঙ্গে, যার প্রতিনিধি নরেন। দ্বিতীয় যুদ্ধ পাপের সঙ্গে, উচ্ছৃঙ্খলতার সঙ্গে, যার প্রতিনিধি গিরিশ। তৃতীয় যুদ্ধ বিজ্ঞানের সঙ্গে, প্রত্যক্ষবাদের সঙ্গে, যার প্রতিনিধি ডাক্তার, মহেন্দ্র সরকার।

প্রতীক্ষা করে থাকো। বিশ্বাস হারিও না। নিরাময় হতে পারে না এমন রোগ নেই। অপসৃত হতে পারে না এমন বাধা নেই। বিগলিত হতে পারে না এমন কাঠিন্য নেই। আর ঈশ্বরের শক্তি? কোথাও তার সীমারেখা টানতে চেয়ো না। আরোপ করো না কোনো শর্তের ঘেরাটোপ। সমস্ত নিয়ম-নির্দেশের বাইরে তাঁর ইচ্ছা।

আনন্দ পাও বা না পাও তাঁকে ধরে থাকো। চালিয়ে যাও ধ্যান-ধারণা। অভ্যাসযোগের পৃষ্ঠা উলটিয়ে যাও। পড়ে থাকো, লেগে থাকো, বাকি রাতটুকু কোনো রকমে কাটিয়ে দাও জেগে থেকে।

দেখনি, পিত্তদোষ হলে মুখে চিনি ভালো লাগে না। কিন্তু রোজ যদি অভ্যেস করে একটু চিনি খাও, পিত্তদোষ তো সেরে যাবেই, চিনিকেও মিষ্টি বলে অনুভব করবে। পিত্তদোষ মানে অবিদ্যাদোষ আর চিনি মানে ঈশ্বরপ্রীতি। একটু-একটু রোজ সাধন-ভজন নাম-জপ করো, দেখবে অবিদ্যাদোষ কেটে যাচ্ছে আর সুস্বাদু লাগছে ভগবানকে। হবে না হচ্ছে না বোলো না, শুধু লেগে থাকো। জেগে থাকো। বীজ বুনতে-বুনতেই কি ফল হয়? ধৈর্য ধরো, বীজ বাঁচিয়ে রাখতে তৎপর হও। জল সেচ, নিড়েন দাও, পোকার কামড় বা পাখির ঠোকর যেন না লাগে। তার পর বেড়া দাও, ছাগল-গরু যেন না মুখ বাড়ায়। এত হাঙ্গাম-হুজ্জুতের পরেই না ফসলের হাতছানি।

সমস্ত খাটুনির মজুরি মেলে, ঈশ্বর খাটুনির মজুরি মিলবে না?

আর যাই করো, তালে ভঙ্গ দিয়ো না।

সেই কৃপণ রাজার গল্প শোনো। বুড়ো হয়েছে, রাজকাজ দেখবার ক্ষমতা নেই, অথচ শাসনভার যে ছেড়ে দেবে ছেলের উপর তারও প্রবৃত্তি হয় না। ছেলে বড়ো হয়েছে, উপযুক্ত হয়েছে তাতে কি। রাজ্য পেলে পাছে বেশি খরচ করে সেই ভয়েই অভিভূত। মেয়ে বড় হয়েছে কিন্তু তার বিয়ে দিতে গেলেই বেরিয়ে যাবে অনেক টাকা। তাই মেয়ের বিয়ের ব্যাপারেও রাজা উদাসীন।

সেই রাজ্যে নামজাদা নট-নটী এসেছে। ইচ্ছে রাজাকে তাদের নাচ দেখায়। এত বড় নাচিয়ে-বাজিয়ে, না দেখলেও রাজার মান থাকে না। অথচ দেখতে গেলেই তো একগাদা খরচ। নট-নটীকে সরাসরি 'না'ও বলছে না। অথচ আসরও বসাচ্ছে না। হবে—হচ্ছে—বলে ঠেকিয়ে রাখছে। নট-নটী মন্ত্রীর দ্বারস্থ হল।

মন্ত্রী রাজাকে গিয়ে বললে, আপনার কিছু খরচ হবে না, আপনি আসর ডাকুন।

কিছু খরচ হবে না জেনে রাজা আশ্বস্ত হল। তবে আসর জমাও। ঢ্যাঁটরা পিটিয়ে দাও।

সভায় তিলধারণের স্থান নেই। রাত্রির প্রথম প্রহরেই শুরু হল তামাশা। নটী নাচছে আর নট তাল বাজাচ্ছে। একেকটা নাচ শেষ হয়, নটী তাকায় এদিক-ওদিক, যদি কোথাও থেকে আসে কোনো উপঢৌকন। একটা কানাকড়িও কেউ ছুঁড়ে মারে না। বিষাদভাব কাটিয়ে নটী আবার নাচ শুরু করে, নট আবার ঢোল তুলে নেয়। নৃত্যশেষে আবার সেই রিক্ততা। সেই শূন্যাঞ্জলি। ক্লান্ত হয়ে পড়ল নটী। রাত্রির দ্বিপ্রহর কখন কেটে গিয়েছে, তবু একটা পয়সা উপার্জন হল না। আশার শেষ নেই, আবার তাল বাজাল নট। তৃতীয় প্রহর গিয়ে এখন শেষ প্রহরও প্রায় যায়-যায়। নটী বোধ হয় এবার ভেঙে পড়বে। ম্লান কণ্ঠে বললে এবার নটকে, 'রাত তো প্রায় কাবার হতে চলল। শরীর ও অবসন্ন। একটা ফুটো পয়সাও মিলল না এ পর্যন্ত। হে নট, বিরথা তাল বাজাও। তোমার তাল বাজানো অনর্থক।'

বিমর্ষ চোখে ক্ষীণ হাসির আভা এনে শান্ত স্বরে নট বললে, 'বহুৎ গেয়ি, থোরি রহি, থোরি ভি আভি যায়; নট কহে দায়িতাকো, তালমে ভঙ্গ না পায়।' রাতের অনেকটাই চলে গেছে, তবু অল্প কিছু এখনো আছে। নট তার প্রিয়াকে বলছে, এখনি তালে ভঙ্গ দিও না।

এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

এখনো আশার জলসেক নিঃশেষ হয়নি। এখনো প্রদীপে খানিকটা তেল আছে; সম্পূর্ণ পুড়ে যায়নি মোমবাতি। যতক্ষণ বর্ষে ততক্ষণ অর্শে। হেরে যেও না, ছেড়ে দিও না। নেচে যাও, আমিও যাই বাজিয়ে।

নটের কথা শুনে অঘটন ঘটে গেল। এক সাধু ফকির ছিল দর্শকদের মধ্যে, সে তার কম্বলখানা, তার একমাত্র সম্পত্তি, দিয়ে দিল নটকে। যুবরাজ তার হাত থেকে খুলে দিল সোনার তাগা। আর রাজকুমারী? রাজকুমারী তার গলার থেকে তুলে নিল রত্নমাল্য।

রাজা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। সাধুকে বললে, 'এ কি ব্যাপার?'

সাধু বললে, 'নটের ঐ মন্ত্র শুনে দিব্যচক্ষু খুলে গেল।'

'মন্ত্র?'

'হ্যাঁ। ঐ যে বললে তালমে ভঙ্গ্ না পায়, সেই মন্ত্র। অনেক দিন থেকে সাধুগিরি

করে ঘুরেছি দেশে-দেশে, সেই ছেলেবেলা থেকে, বুড়ো হয়ে পড়েছি এখন। কি কষ্টের যে এই সাধুগিরি, আর পোষাচ্ছে না এই বার্ধক্যে। ঠিক করেছিলুম গৃহস্থজীবনে আবার ফিরে যাব। বাকি দিন কটা কাটাব একটু আলস্যে আরামে। এমন সময় এই নটের মন্ত্র কানে এল। অনেক গেছে, অল্প আছে—কে জানে এই অল্পই হয়তো অনেক। অল্প যেতে-যেতেও হয়তো অনেক। নেচে যাও বাজিয়ে যাও। তাল কাটিয়ে দিও না। স্বস্থানে নিয়তস্থিত থাকো। তাই ঠিক করলাম জীবনের বাকি কটা দিন যেমন সাধুগিরি করছিলাম তেমনি সাধুগিরিই করে যাব।'

'আর তুমি?' রাজা জিগগেস করলে যুবরাজকে।

'ঠিক করেছিলাম গোপনে আপনাকে হত্যা করে রাজা হব। এমন সময় অন্তালভঙ্গের মন্ত্র এল। ভাবলাম বৃদ্ধ রাজা কদিনই বা আর বাঁচবে। বাকি অল্পকালের জন্যে কেন পিতৃহত্যার পাতকে লিপ্ত হই? যাক না যেমন যাচ্ছে। আর কটাই বা দিন! কেন সন্তানধর্ম থেকে বিচ্যুত হই? তাই মন্ত্রদাতাকে গুরুপ্রণামীস্বরূপ দিলাম ঐ হাতের তাগা।'

'আর তুমি?' রাজকন্যাকে লক্ষ্য করল রাজা।

'ঠিক করেছিলাম বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে বিয়ে করব। এমন সময় বিদ্যুতের মত মন্ত্রের চমক এল। অনেক গেছে, অল্প আছে—সে অল্পও বুঝি যেতে বসেছে, তবু অল্পের জন্যে স্খলিত হয়ো না। বুড়ো বাপের আয়ুই বা আর কত দিন! কার্পণ্যের জন্যে বিয়ে দিচ্ছেন না, তাঁর তিরোভাবেই আসবে সেই দাক্ষিণ্যের শুভ লগ্ন। কেন দুদিনের জন্যে রাজকুলে কালি দিই, আপনাকে ক্লিষ্ট করি। তার চেয়ে প্রতীক্ষা করে থাকি, বাধা অপসারিত হবে, পাব সেই মনোনীতকে।' মহাজ্ঞানস্বরূপ ফল লাভ করল রাজা। ছেলেকে রাজপদে অভিষিক্ত করল। মেয়েকে সমর্পণ করল বাঞ্ছিত পাত্রে।

তাই, শুধু লেগে থাকো, পড়ে থাকো, ধরে থাকো। শুধু নাম করে যাও। শুধু সহ্য করে যাও।

ঠাকুর হৃদয়কে বলতেন, 'তুই আমার কথা সহ্য করবি, আমি তোর কথা সহ্য করব, তবে হবে। তা না হলে ডাকতে হবে খাজাঞ্চীকে।'

আর কিছু করতে না পারি সইতে পারি। একমাত্র সহ্য করে যাওয়াই সাধন করে যাওয়া।

ঢিমে তেতালা বাজালে চলবে না। পনেরো মাসে এক বছর করলে কি হয়? চিঁড়ের ফলার হয়ো না। জোর করো। রোক করো। উঠে পড়ে লাগো।

কোমর বাঁধো। এগিয়ে গিয়ে ধরো। এগিয়ে গিয়ে ধরার নামই শরণাগতি। ভক্তিমান কে? যে শক্তিমান সেই আসলে ভক্তিমান।

আর শক্তি হচ্ছে সহ্য করার শক্তি। আঁকড়ে থাকবার শক্তি।

মাস্টারকে বললেন, 'সকলেরই যে বেশি তপস্যা করতে হয় তা নয়। কারু-কারু চট করে হয়ে যায়। আমার কিন্তু বড় বেশি কষ্ট করতে হয়েছিল। মাটির ঢিপি মাথায় দিয়ে পড়ে থাকতাম। কোথা দিয়ে দিন চলে যেত। কেবল মা-মা বলে ডাকতাম। মা-মা বলে কাঁদতাম।'

সেই তো একমাত্র ডাক, যে ডাকে শ্রান্তি নেই, যে ডাক সাড়া না আনলেও সান্ত্বনা আনে। আর যখনই সান্ত্বনা পেলে তখনই বুঝলে সাড়া এসেছে।

আর কেউ আমার থাক না থাক, আমার মা আছে, এই তো ধরে থাকবার কৌশলকলা। মা ভুলিয়ে রাখতে চান খেলা দিয়ে। কিন্তু মা যখন বুঝবেন ছেলে খেলনা চায় না মাকেই চায়, তখন আর মা কি করবেন!

তাই শুধু মাকেই ধরে থাকো। যখন তাঁর স্বত্বে আছি তখন তাঁর ঘরে আমারও হিসসা আছে আমি ভয়-ভাবনাশূন্য।

উঠোনের দোষ দিয়ো না, শুধু নেচে যাও। যারা খেলতে জানে তারা কানাকড়িতেও খেলে। আর সব পুরোনো হয়ে যায়, তেতো হয়ে যায়, শুধু ঈশ্বরপ্রীতিতেই বিস্বাদ নেই, একঘেয়েমি নেই। তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং। নবীনের থেকেও নবীনতর ঈশ্বর। শুধু মা নামেই অরুচি নেই। মা নামেই বিশ্বাস, মা নামেই ব্যাকুলতা। ডাকলেই মনে হয় যেন পাশের ঘরে রান্নাঘরে আছেন, এখুনি ছুটে আসবেন। আছেন—এইটি বুঝিয়ে বিশ্বাস আনান। আর আসবেন—এইটি বুঝিয়ে আনান ব্যাকুলতা। আর যদি একবার বিশ্বাস আর ব্যাকুলতা আসে তবে ঈশ্বরই চলে আসবেন। আর ঠাকুর বললেন, ঈশ্বরদর্শনের জন্যেই নবজন্ম। চক্ষের এত তৃষ্ণা শুধু শেষ সেই ঈশ্বরকে দেখব বলে।

তাই সমস্ত বন্ধ কুঠুরির চাবিকাঠি হচ্ছে মা-ডাক। মাতৃস্তোত্র করো।

হে শরণাগতের আর্তিহারিণী, অখিলজগতের জনয়িত্রী, সর্বচরাচরের অধীশ্বরী, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তুমি যদি প্রসন্ন হও তাহলে আর আমার ভয় কি! তাহলে আর আমার কিসের দৈন্য-কাতর্য, কিসের-বা অজ্ঞান-অবোধ!

তুমি জগদ্ধাত্রী, মহতী মহীমূর্তি। মৃত্তিকা হয়ে সবাইকে আঁকড়ে আছ, আবার জল হয়ে আপ্যায়িত করছ সবাইকে। আমাকে তাই তুমি কোলে ধরো, স্তন্যদানে স্নিগ্ধ করো। ধারণ-পোষণের উৎস তুমি, তোমার শক্তির সঙ্গে কে

এঁটে উঠবে! তুমি অলঙ্ঘবীর্যা।

তোমার বীর্যবিভবের অন্ত কোথায়? তুমিই সর্বব্যাপিনী স্থিতিশক্তি। তুমিই বিশ্বের বীজ, তুমিই আবার প্রকাশপল্লব। তুমিই পরমা মায়া। তুমিই সম্মোহিনী, তুমিই আবার মোক্ষদাত্রী। তুমি শুধু প্রসন্ন হও। প্রসন্ন হলেই কামকাঞ্চনের লাজলজ্জা খসে পড়বে, উদ্ভাসিত হবে তোমার অভয়-অক্ষয় মাতৃমূর্তি।

তাই তুমি সমস্তরূপিণী বিদ্যামূর্তি। যা-কিছু দেখি সব তোমারই ভেদ, তোমারই ভাগ। জগৎজোড়া সমস্ত স্ত্রীই তুমি, তোমারই বিকিরণ। মাতৃস্বরূপে সমস্ত বিশ্বকে তুমি পরিপূর্ণ করেছ, সমাচ্ছন্ন করেছ, তোমার আমি কী স্তুতি করব! তবু তোমার নাম করি, তোমার স্তোত্র পড়ি, সে শুধু আমার বাকশুদ্ধির জন্যে। তুমি নিত্যস্তুতা, যেহেতু তুমি সর্বভূতা, স্বর্গমুক্তিবিধাত্রী। এমন কি উক্তি আছে যে অবাক-গোচরাকে ব্যাখ্যা করে। তুমিই তোমার বেত্তা, তুমিই তোমার ব্যাখ্যাতা।

তুমি সর্বলোকের হৃদয়ের বুদ্ধিরূপে বিরাজমান। তুমিই নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি। স্বর্গও দাও, অপবর্গও দাও। ভোগ দাও, আবার দাও ভোগাতীত সম্ভোগ। তোমাকে প্রণাম।

তুমিই মুহূর্ত, তুমিই পরিণাম। তুম কালের পরিচ্ছেদ, তুমিই আবার অপরিচ্ছিন্ন সত্তা। সকলের হয়েও প্রত্যেকের। ব্যষ্টির নয় সমষ্টিরও সংহারকর্ত্রী।

তুমি সর্বমঙ্গলের মঙ্গলকারিণী। শুভময়ী। সমস্তবাঞ্ছিতকরী। সর্বাভীষ্ট-সাধিকা। তুমিই আশ্রয়নীয়া। ত্রিনয়না গৌরী। তোমার ত্রিনেত্র—সূর্য, চন্দ্র আর বহ্নি, স্থূল সূক্ষ্ম আর কারণ, স্মৃতি কল্পনা আর আশা, শব্দ স্পর্শ আর রস, অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যৎ। তুমি সৌম্যা, মনোহরা।

তুমি মহতী চিতিশক্তি। তোমার তিন স্পন্দন, সৃষ্টি স্থিতি আর বিনাশ। গুণ-ত্রয় যখন তোমার আধারে প্রকাশিত হয়, যখন তুমিই স্বয়ং গুণময়ী। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তিন আবর্তনের অতীত, তুমি আবার নিত্যা সনাতনী।

শরণাগত, দীন ও আর্তের তুমি পরিত্রাণপরায়ণা। তোমাকে বুঝিনি বলেই তো আমি দীন, তোমাকে পাইনি বলেই তো আমি আর্ত। তারপর যখন বুঝি কোথায় আমার আশ্রয়, কোথায় আমার প্রতিষ্ঠা, তখনই দেখি, হে নিবৃত্তি-কারিণী, তুমি আমার সর্ব অভাব মোচন করেছ।

তুমি ব্রহ্মাণী। তুমি সর্বব্যাপিনী বিশ্বকল্পনা। জীবমনের হংস-বিমানে চড়ে উড়ে চলেছ সেই ব্যোমবাহিনী বিশ্বকল্পনায়। তোমার কমণ্ডলুর কুশপুত বারি ক্ষরণ করো। তোমার এই বারিসিঞ্চন ছাড়া কর্মপিপাসা নিবৃত্ত হবার নয়।

ত্রিশূল, চন্দ্র আর অহি তুমি ধারণ করে আছ জ্ঞানে আর মনে কুলকুণ্ডলিনী জাগাবে বলে। অধিষ্ঠিত আছ ধর্মরূপী বৃষভে। তুমি স্বপ্রকাশরূপা মাহেশ্বরী। ময়ূর ভুজঙ্গদলকে বিনাশ করে। তুমি সেই পাপনাশিনী পবিত্রতা। তুমি কুমারী, তুমি অনঘা, তুমি মহাশক্তি।

তুমি শ্রেষ্ঠ আয়ুধধারিণী বৈষ্ণবী। শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গশোভিতা। তুমি প্রসন্ন হও। তুমি বারাহীমূর্তিতে উগ্র মহাচক্র ধারণ করে দংষ্ট্রাদ্বারা উদ্ধার করেছ বসুন্ধরাকে। তুমি না তুললে কে ভাঙত তার এই তিমিরমগ্নতা? তার কামকর্ম থেকে কে তাকে নিয়ে যেত চিরন্তন মঙ্গলের দিকে? মা তুমি মঙ্গলরূপিণী।

তুমি নারসিংহী। দম্ভের স্তম্ভ বিদীর্ণ করে হিরণ্যকশিপুকে নিধন করলে। তুমি ত্রৈলোক্যত্রাণকারিণী নারায়ণী।

তুমি কিরীটিনী, তুমি মহাবজ্রা। তুমি সহস্রনয়নোজ্জ্বলা। অনাত্মাবোধরূপী বৃত্র তোমারই শস্ত্রপ্রহারে পরাভূত। তুমি অসুরঘাতিনী ব্রাহ্মীশক্তি।

তুমি শিবদূতী। ঘোররূপা, মহারাবা, সর্বসন্ত্রাসকারিণী। তুমি দংষ্ট্রাকরালবদনা, শিরোমালাবিভূষণা। তুমি চামুণ্ডা, দানবমথনা।

তুমি লক্ষ্মী। তুমি লজ্জা। তুমি পুষ্টি। তুমি শ্রদ্ধা। তুমি স্বধা। তুমি ধ্রুবা বিনিশ্চলা। তুমি অজ্ঞানরূপা মহারাত্রি। অনাত্মপ্রত্যয়রূপা অবিদ্যা। তুমি আবার পরমা সুমহতী ব্রহ্মবিদ্যা।

তুমি মেধা, ধারণাবতী বুদ্ধি। তুমি সরস্বতী, শুদ্ধজ্ঞানবাসিনী অখিলবিদ্যা। তুমি বরা, অভয়পদপ্রদা। তুমি সাত্ত্বিকী, তুমি রাজসী, তুমি তমোভূতা। তুমি নিয়তা, নিশ্চয়াত্মিকা।

তুমি সর্বস্বরূপা সর্বেশা। সর্বশক্তিসমন্বিতা। তুমি আমাদের ভয় থেকে ত্রাণ করো। ত্রাণ করো জন্মমৃত্যুপীড়িত অল্পজ্ঞতা থেকে। হরণ করো আমাদের জীবত্বের দুর্গতি।

তোমার লোচনত্রয়ভূষিত সৌম্য মুখমণ্ডল আমাদের সর্বভূত থেকে রক্ষা করুক। রক্ষা করুক জড়ত্বের শাসন থেকে। তুমিই তো জড়ত্ববাসিনী চৈতন্যশিক্ষা।

তোমার জ্বালাকরাল ত্রিশূল আমাদের রক্ষা করুক। রক্ষা করুক তোমার জগৎ-পরিপূরণী আনন্দিনী ঘণ্টাধ্বনি। রক্ষা করুক অসুররক্তপঙ্কলিপ্ত তোমার করোজ্জ্বল খড়্গ। রক্ষা করুক ভয় থেকে পাপ থেকে বদ্ধতা থেকে।

তুষ্ট হয়ে তোমার রোগনাশন, রুষ্ট হয়ে তোমার রোগশাসন। তোমার তুষ্টি-রুষ্টি দুই-ই তোমার মঙ্গলস্পর্শ। তোমার তুষ্টিতে অভীষ্টপূর্তি রুষ্টিতে অভীষ্টবিলয়। কখনো সঞ্চিত করো কখনো বঞ্চিত করো। কিন্তু যে তোমাকে আশ্রয় করেছে

তার আর কিসের ভয়, কিসের অভাব।

মা, তুমিই মমত্বগর্তে বিবেকদীপ। তুমিই বিভ্রান্ত হয়ে অনুসন্ধান করছ নিজেকে। আবার ভ্রান্তিও যে তুমি। আবার উদ্ভাসিনী উন্মুক্তিও তুমি। অনেকরূপে আত্মমূর্তিকে বহুধা করে পরিব্যাপিনী হয়ে আছ। রূপে-রূপে প্রতিরূপা হয়ে আছ।

কান্তা? তুমি ছাড়া আর কে আছে? বহু হয়েও তোমার একত্ব অক্ষুণ্ণ। অনন্ত আধারে তুমিই একাধেয়া যেমন অজ্ঞানে তেমনি অধ্যবসায়ে। যেমন অন্ধকারে তেমনি বিধূম পাবকে। কা ত্বদন্যা? আর কে আছে তুমি ছাড়া? তুমি সর্বজীবসম্মোহিনী শর্বরী। তুমিই আবার সর্বভূতহিতৈষিণী জ্যোতির্গঙ্গা। 'দ্বিতীয়াকা মমাপরা' আমার দ্বিতীয় কোথায়!

আমিই স্পন্দনাত্মিকা নিত্যপ্রবৃত্তিমতী শক্তি। আমিই প্রবুদ্ধসলিলা বেগবতী স্রোতস্বতী। আমিই লোকবরদা বিশ্বেশবন্দ্যা।

ঠাকুর বলছেন মাস্টারকে। 'আর বিচার করো না। আমি রাত্রে একলা রাস্তায় কেঁদে-কেঁদে বেড়াতাম আর বলতাম, মা, বিচারবুদ্ধিতে বজ্রাঘাত দাও।' বলছেন আবার মাস্টারকে। 'ভোগের লুচি বেড়ালকে খাইয়েছিলাম। দেখলাম মা-ই সব হয়েছেন, বেড়াল পর্যন্ত।'

'কিছু হল না তাতে?'

'খাজাঞ্চি সেজবাবুর কাছে চিঠি পাঠালে, অনাচারের শাসন করতে। সেজবাবু লিখল, উনি যা করেন তাতে কিছু বলতে যেও না।'

আহা কত রূপে মাকে দেখলাম। কত বেশে কত বয়সে।

'কাল মাকে দেখলাম।' ঠাকুর বলছেন প্রাণকৃষ্ণকে, 'গেরুয়া জামা পরা, মুড়ি সেলাই নেই জামাতে। আমার সঙ্গে কথা কচ্ছেন।'

শুধু ভাব-ভক্তিতে দর্শন। ভাবতে-ভাবতে প্রেমের চক্ষু হয়ে যায়। সেই চক্ষুতেই মায়ের আবির্ভাব।

হলধারী কি তা মানত? বলত, তিনি তোমার ভাবের জন্য বসে আছেন আর কি। তিনি ভাব-অভাবের অতীত।

'আমি তখন মাকে গিয়ে বললাম, মা, হলধারীর কথাই কি ঠিক? তাহলে তোমার এই রূপ-টুপ সব মিথ্যে? মা তখনি রতির মা'র বেশে দেখা দিলেন।

'কে রতির মা?'

'লালাবাবুর রানী কাত্যায়নীর মোসায়েব। গোঁড়া বৈষ্ণবী। কিন্তু বড় একঘেয়ে।'

'রতির মা'র বেশে দেখা দিয়ে মা কি বললেন ?'

'বললেন তুই ভাব নিয়েই থাক।'

কিন্তু আমরা সংসারীরা, আছি অভাব নিয়ে।

ঠাকুর বললেন, 'অভাবও পথ। ভাব অভাব সবই পথ। অনন্ত মত অনন্ত পথ।' মা, আমার হাত ধরে নিয়ে যাও। ঠাকুর হাত বাড়িয়ে দিয়ে কাঁদছেন মায়ের জন্যে। আমি ছোট ছেলে, হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে চলতে পারছি না। তুমি এগিয়ে এসে আমাকে ধরো। আমাকে কোলে করে নিয়ে যাও। যে পথ দিয়েই হাঁটি না কেন তোমার কোলটুকুই আমার শেষ পৈঠা।

'কারণানন্দরূপিণি, মা, বলো, আমি খাব না তুমি খাবে ?'

এ সংসারে ডরি কারে
রাজা যার মা মহেশ্বরী।
আনন্দে আনন্দময়ীর
খাস তালুকে বসত করি।

॥ ১৫৩ ॥

ঠাকুরের ব্যাধির তৃতীয় কারণ কি ?

নিজের দিকে ইঙ্গিত করে বলছেন, 'এর ভিতর মা স্বয়ং ভক্ত হয়ে লীলা করছেন। যখন প্রথম এই অবস্থা হল দেখলাম জ্যোতিতে দেহ জ্বলজ্বল করছে। বুক লাল হয়ে গেছে। মাকে বললাম, মা, বাইরে প্রকাশ হয়ো না, ঢুকে যাও, ঢুকে যাও। তাইতে এখন এই হীন-দেহ।

নইলে কি হত ?

'নইলে সেই জ্যোতির্ময় দেহ থাকলে লোক জ্বালাতন করত। সর্বক্ষণ ভিড় লেগে থাকত। সামলানো যেত না। তিষ্ঠোতে দিত না এক মুহূর্ত।'

এখন কি হচ্ছে ?

রূপের প্রকাশ নেই দেখে আগাছারা পালিয়ে যাচ্ছে। বলাবলি করছে, এই অবতার ? এ তো আমাদের মতই সামান্য সাধারণ। আমাদের মতই ভুগছে অসুখে, অপ্রতিকার্য যন্ত্রণায়। তবে এ আর আমাদের কী মনস্কামনা পূরণ করবে। নিজের ব্যাধি সারাতে পারে না, আমাদের কোন ব্যাধির নিরসন করবে। চলো ফিরে যাই। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি করব ! দেখেছ ? শরীর কেমন হয়ে গিয়েছে ভুগে-ভুগে ! এতই যখন ভুগছে, শরীরের যখন এই হাল, তখন একজন সাধারণ সাধুর সঙ্গে তফাত কি !

এই ব্যারাম হয়েছে কেন? এর মানেই ঐ।' বললেন ঠাকুর, 'যাদের সকাম ভক্তি তারা ব্যারাম অবস্থা দেখলে চলে যাবে। যারা শুদ্ধ ভক্ত, যারা আমাকে অহেতুক ভালবাসে তারাই লেগে থাকবে, তারাই টিঁকে থাকবে। আগাছার দল শুকিয়ে গেল। মিলিয়ে গেল ব্যাঙের ছাতা।'

সেইখানেই তো তুমি অবতার। এই সাধারণত্বেই তো তুমি অসাধারণ। তুমি আর-আরদের মত ঐশ্বর্য নিয়ে আসোনি এবার। না রাজসম্পদ না বা শাস্ত্র-ব্যাকরণ। না বা রূপবল স্বাস্থ্যশক্তি। একটা সিদ্ধাই পর্যন্ত দেখালে না। ছদ্মবেশ ধরে এলে। পাঁচজনের একজন হয়ে রইলে। আমাদের ছেড়ে চলে গেলে না বনে-পর্বতে, মঠে-মন্দিরে, বিদেশে-বিভুঁয়ে। আমাদের মাঝখানেই বাসা বাঁধলে। নিরীহের মত, নিরাভরণের মত। আমাদেরই মত দীর্ঘদিন রোগাক্রান্ত রইলে। দুঃখ-কষ্টের পাশ কাটিয়ে চলে গেলে না। ইচ্ছামৃত্যু ঘটালে না। সমাধি অবস্থায় দেহ ছাড়লে না। শূন্যে মিলিয়ে গেলে না হাওয়া হয়ে। তিল-তিল করে ভুগলে, তিল-তিল করে জীর্ণ করলে দেহ। কেন? শুধু এই আশ্বাস দিতে যে তুমি আমাদেরই একজন। আমাদের রোগে শোকে দুঃখে কষ্টে যদি কেউ পাশে দাঁড়াবার থাকে সে তুমি। তুমিই সাহস তুমিই উৎসাহ। এই বোঝাতে যে দুঃখকষ্টও ঈশ্বরের অভিপ্রায়, আর এই দুঃখকষ্টের মধ্যেও আমি অপাপ, অকলঙ্ক। 'দুঃখ জানে শরীর জানে, মন, তুমি আনন্দে থাকো।'

'শরীরের রোগ হলে বোধ হয় আমার রোগ হয়েছে।' হীরানন্দকে বললেন ঠাকুর। 'কিন্তু আমাকে কে ছোঁয়? ধোঁয়া দেয়াল ময়লা করে কিন্তু আকাশের কিছু করতে পারে না।'

হীরানন্দ সিন্ধী, কলকাতার কলেজে পড়ে বি-এ পাশ করেছে। কিন্তু ভক্ত। সবচেয়ে বড় কথা—শান্ত। আর কথা যেন মধুমাখা।

হীরানন্দ জিগগেস করলে, 'ভক্তের এত দুঃখ কেন?'

নরেনের কি হল, হঠাৎ জ্বলে উঠল। বললে, 'দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা মনে হয় এক শয়তান। আমি যদি হতুম তা হলে এর চেয়ে ঢের-ঢের ভালো জিনিস তৈরি করতুম।'

'কেন? দুঃখ আছে বলে?' হীরানন্দ বললে, 'দুঃখ না থাকলে সুখবোধ কোথায়? অন্ধকার না থাকলে কে আর আলোকে অভ্যর্থনা করত? বিরহ ছিল বলেই তো মিলন এত স্পৃহণীয়। অন্যায় যদি না থাকত তা হলে কে দিত সুবিচারের মর্যাদা?'

সবাই ভালো সর্বত্রই স্থায় এই নিষ্প্রাণ সমতলতা জীবনের বৃদ্ধির পথে অভিশাপ।

নিচুটি ছিল বলেই তো উঁচুর মাথা-উঁচু। মন্দটি ছিল বলেই তো ভালোর জন্যে এত প্রসার প্রচেষ্টা। যদি জন্ম থেকেই ভালো থাকতাম তাহলে আর বড় হতাম কি করে? যদি না পড়তাম কি করে আসত তবে ওঠবার সঙ্কল্প? মৃত্যু ছিল বলেই তো অমৃতের প্রতি অভিসার। সে জন্যেই তো অমৃতলোক থেকে মৃত্তিকালোক এত মধুর। দেবতার চেয়েও মানুষ বড়।

সীতা অযোধ্যায় ফিরে আসার পথে রামকে নালিশ করলে, 'কেন এত সব ভাঙা বাড়ি? কেন সব সমান সুন্দর নয়?'

রাম বললে, 'সব বাড়িই যদি সুন্দর হয় তাহলে মিস্ত্রিরা কি করবে?'

ঠাকুর সেই মিস্ত্রি। সবাই যদি সৎ ও ধার্মিক হয়, লেশমাত্র গ্লানি ও ম্লানতা কোথাও না থাকে, তাহলে তো আসেন না অবতার। তাহলে তো পেতাম না ঠাকুরকে। নয়ন-মনোহরকে। সংশয়-ক্লেশনাশনকে। কি করে হত তবে পরমতম সুহৃদসাক্ষাৎ। কোথায় তবে পেতাম জীবনের সংক্ষিপ্ত ও সারতম উত্তর? মহাবিরাট থেকে ক্ষুদ্র কীটাণু সবই যে এক অভিব্যক্তি কোথায় তবে পেতাম সেই বিশ্বাসের অকার্পণ্য? সব পথেই যে সেই গতিসত্তম, সেই অখণ্ড-মণ্ডন, কে দিত এই শুভদৃষ্টি? কার এত মধুমুক্ষিত কথা, বেদানুসারিণী শোক-বিনাশিনী বাণী? কে তেজের আকর, সত্যের আশ্রয়, বলের আধার, ধর্মের আয়তন? কে আমার সতৃষ্ণ নয়নের তৃপ্তি, আমার প্রাণবহ্নের সমীরণ!

আমাকে অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে চলো, মৃত্যু থেকে অমৃতত্বে। তমসার তীর থেকে জ্যোতির নির্মল তীর্থে।

অমৃতত্বের ধারয়িতাই এই শরীর।

'দেহ ধরেছি কেন? ঈশ্বরকে নিয়ে সম্ভোগ করব বলে।' বললেন ঠাকুর। 'আর এই বুঝব বলে, শরীরটা দুদিনের জন্যে, এই আছে এই নেই, সত্য শুধু ঈশ্বর।'

সব রকম রাগিণী বাজিয়ে যাব। সব রকম স্পর্শের আস্বাদ নিয়ে যাব তাঁর হাত থেকে। কখনো তাঁর রুদ্রতেজ কখনো বা বরাভয়। ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আবার কোলে নিচ্ছেন হাত বাড়িয়ে। বিচ্ছেদ-পারাবারের পারে নিমন্ত্রিত করে রেখেছেন আবার মিলন-নিকেতন। কামকণ্টকের বৃন্তে ফোটাচ্ছেন প্রেমপ্রসূন।

'শরীর এই আছে এই নেই, তাই তাঁকে তাড়াতাড়ি ডেকে নাও।' বললেন ঠাকুর, 'আলোটি নিবতে না নিবতে দেখে নাও তাঁর মুখখানি।'

চোখের পাতাটি খোলো। আলোক-অন্ধকারে দেখ সেই আনন্দমুখ।

'শরীরটা যেন বাথারি-সাজানো কাপড়মোড়া, সেইটে নড়ছে।' বললেন ঠাকুর, 'কিন্তু ভিতরে একজন আছে বলে তাই নড়ছে।'

ভিতরে একজন আছে বলেই এত আশ্চর্য ব্যাপার! নেপথ্যে একজন রয়েছে বলেই এত রঙ্গলীলা। আমাকে ধরে রেখেছে কে? পৃথিবী। পৃথিবীকে ধরে রেখেছে কে? আকাশ। আকাশকে ধরে রেখেছে কে? কেউ জানে না। আর আকাশে কি একটা সূর্য, একটা চন্দ্র, একটা ধ্রুবতারা? আকাশে নক্ষত্র-পরমাণুপুঞ্জ। কত সেই অমেয় স্থান যাতে অগণন আশ্রয় পেয়েছে। আর সবই কিনা ঘুরছে একটি সুশৃঙ্খল সুষমায়। একটি সুকেন্দ্রিত ছন্দে। সেই সর্বাকর্ষণের কেন্দ্র কে?

সেই কেন্দ্রই আবার বিরাজ করছে আমার হৃদয়ের মধ্যে। আমার শরীরকে বেঁধে রাখতে চাইছে একটি ছন্দের বিধানে।

'শরীরটা যেন হাঁড়ি, মন-বুদ্ধি জল।' বলছেন ঠাকুর, 'ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি আলু-পটল। আর সচ্চিদানন্দ অগ্নি।'

'কিন্তু অবতারের বেলায়?'

'অবতারেরও দেহ-বুদ্ধি আছে।' বললেন ঠাকুর, 'শরীর ধরলেই মায়া। সীতার জন্যে রামও কেঁদেছিলেন, ধনুর্বাণ তুলতে পারেননি। তবে অবতারে জীবে প্রভেদ আছে। প্রকাশের প্রভেদ।'

বেলঘরের গোবিন্দ মুখুজ্জে এসেছে। বললে, 'কি রকম।'

'অবতার ইচ্ছে করে নিজের চোখ কাপড়ে বাঁধে। ঐ যে ছেলেরা কানামাছি খেলে—দেখবি?' তেমনি। কিন্তু মা ডাকলেই খেলা থামায়।'

'আর জীব?'

'তার অন্য কথা। তার যে কাপড়ে চোখ বাঁধা সেই কাপড়ের পিঠে আটটা ইসক্রুপ আঁটা। সেই আট ইস্ক্রুপের নাম অষ্টপাশ। গুরু না খুলে দিলে উপায় নেই।'

আবার বললেন, 'ভগবান অবতার হয়ে আসেন কেন? প্রেম-ভক্তি শেখাবার জন্যে। ঈশ্বরের অনন্ত লীলা। অত আমার দরকার কি? আমার দরকার প্রেম-ভক্তি। আমার দরকার ক্ষীর। গাভীর বাঁট দিয়েই ক্ষীর। অবতার গাভীর বাঁট।'

কিন্তু অবতারেও দেহবোধ আছে।

কে একজন যুবক এসে জিগগেস করলে, 'মশায়, কাম কি করে যায়?'

ঠাকুর বললেন, 'একটু কাম-ক্রোধাদি না থাকলে শরীর থাকে না। তাই

তোমরা কেবল তা কমাবার চেষ্টা করবে।'

'কি করে কমাব?'

'শুধু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। বহিঃ শিব, হৃদে কালী, মুখে হরিবোল। শ্রীশ্রীমাকে একজন জিগগেস করলে, 'মা, মন বড় চঞ্চল। কিছুতেই ঠিক হয় না।

মা বললেন, 'ভয় কি, শুধু তাঁর নাম করো। যেমন ঝড়ে মেঘ উড়িয়ে নেয়, তেমনি তাঁর নামে বিষয়-মেঘ কেটে যাবে।'

'কিন্তু মা, কাম যে যায় না।'

'কাম কি একেবারে যায় গা? শরীর থাকলেই কিছু না কিছু থাকে।' মা বললেন অভয়শান্ত মুখে, 'তবে কি জানো, তাঁর নাম করো, দেখবে সাপের মাথায় ধুলোপড়া পড়লে যেমনটি হয় তেমনটি হয়ে যাবে।'

সেই লোকটি আবার জিগগেস করল ঠাকুরকে, 'এত চেষ্টা করি, তবু মাঝে-মাঝে মনে কুচিন্তা আসে।'

'আসুক না।' বললেন ঠাকুর। 'ও নিয়ে মাথা ঘামাস কেন? আসবে আবার চলে যাবে।' লোকটি অবাক হয়ে ঠাকুরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'ওরে, ভগবানের দর্শন একবার না হলে কাম একেবারে যায় না। তা হলেও বা কি! শরীর যত দিন থাকে তত দিন একটু-আধটু থাকে। তবে কি জানিস? মাথা তুলতে পারে না। তুই কি মনে করিস আমারই একেবারে গেছে?'

যুবক মূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল।

'একবার মনে হয়েছিল কামটা সম্পূর্ণ জয় করেছি।' প্রসাদবদান্ত মুখে ঠাকুর বলতে লাগলেন। 'বসে আছি পঞ্চবটীতে, হঠাৎ এমনি কামের তোড় এল যে সামলাতে পারি না। তখন ধুলোয় গড়িয়ে পড়ে মাটিতে মুখ ঘষড়ে কাঁদি আর মাকে বলি, মা, ভীষণ অন্যায় করেছি, অহঙ্কার করে ফেলেছি। আর নিজেকে কখনো ভাবব না কামজয়ী বলে। এত কাঁদবার পর তবে যায়।'

যুবকটির সন্নিহিত হলেন ঠাকুর। অন্তরঙ্গের মত বললেন, 'তোদের এখন যৌবনের বন্যা, তাই পাচ্ছিস না বাঁধ দিতে। বন্যা যখন আসে তখন কি আর বাঁধ-টাঁধ মানে? তবে তোকে বলি শোন, কলিতে মনের পাপ পাপ নয়।'

'নয়?'

'না। ওগুলো শরীরের ধর্মে আসে যায়। মনে যদি কুভাব এসে পড়ে তাতে ঘাবড়াবি কেন? কি ভাবে এল গেল নজরও দিবিনে। শুধু হরিনাম করবি আর

প্রার্থনা করবি। দেখবি আস্তে-আস্তে সব বাঁধ মেনেছে। হজম ভালো আছে, আর উঠবে না মনের চোঁয়া ঢেঁকুর।'

একটি ভক্ত-মেয়ে মাকে বললে জাঁক করে, 'মা, আমার মনে খারাপ ভাব আসে না।'

মা তখুনি চমকে উঠলেন। বাধা দিয়ে বললেন, 'বোলো না, বোলো না, অমন কথা বলতে নেই।'

কখন দর্পনাশনের বজ্র উদ্যত হয়ে উঠবে বলা যায় না। সুতরাং শান্ত হও, দীনতা আনো, প্রার্থনা করো।

'মা গো, কি করে লাভ হবে ভগবান?' আর্ত হয়ে মেয়েটি জিগগেস করল মাকে। 'জপধ্যান সাধন আরাধনা—এ সবে?'

'কিছুতে না।' মায়ের স্বরটি গাঢ়।

'কিছুতে না?'

'কিছুতে না।' মায়ের স্বরটি দৃঢ়।

'কিছুতেই না?'

'কিছুতেই না।' মায়ের স্বরটি কঠিন-তীক্ষ্ণ।

'তবে কি হবে! কিসে হবে?' চারদিকে যেন আঁধার দেখল মেয়েটি।

'একমাত্র তাঁর কৃপাতে হবে।' সমস্ত গ্রন্থি মোচন করে দিলেন মা। বললেন, 'তাই বলে কি ধ্যানজপ করবে না? করবে। ধ্যানজপে মনের ময়লা কাটবে। মনের ময়লা না কাটলে কৃপার প্রসাদ ধরবে কি করে? যেমন ফুল নাড়তে-নাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে-ঘষতে গন্ধ বের হয় তেমনি ভগবানের আলোচনা করতে-করতে ভগবানের উদয় হয় চোখের সামনে।'

কৃপা - শুনতে অযৌক্তিক, কিন্তু আসলে একমাত্র যুক্তি—ঐ কৃপাই।

'তাঁর কৃপা ছাড়া কিছু হবার জো নেই।' বলছেন ঠাকুর, 'কামকাঞ্চনকে ঠিক-ঠিক মিথ্যে বলে বোধ হওয়া, এই জগৎ তিন কালেই অসৎ এর সম্যক ধারণা যদি করিয়ে দেন তো হয়, নইলে যত সাধন-ভজন করুই না, সব ফক্কিকার। মানুষের কতটুকু শক্তি? সে শক্তি দিয়ে কতটুকু সে চেষ্টা করবে, কতটুকুই বা আয়ত্ত করবে?'

'জ্ঞানভক্তি দুই-ই একসঙ্গে হতে পারে না?' জিগগেস করল মাস্টার।

'আঁধারের উপর নির্ভর করছে।' বললেন ঠাকুর, 'কোনো বাঁশের ফুটো বড়, কোনো বাঁশের ফুটো সরু। ঈশ্বরবস্তুর ধারণা কি সকল আধারে সম্ভব? এক সের ঘটিতে কি দু সের দুধ ধরবে?'

'কিন্তু যদি তাঁর কৃপা হয় ?' মাস্টার উছলে উঠল। 'তিনি যদি কৃপা করেন তবে তো ছুঁচের মধ্য দিয়ে উটও চালাতে পারেন।'

ঠাকুর হাসলেন। 'কিন্তু কৃপা কি অমনি হয় ?'

'অমনি হয় না ?'

ঠাকুর আবার হাসলেন। 'ভিখিরি যদি পয়সা চায় দেওয়া যায়, কিন্তু যদি একেবারে রেল-ভাড়া চেয়ে বসে ?'

মাস্টার চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ঠাকুরও স্তব্ধ। হঠাৎ আত্মগতের মত বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, হতে পারে। তাঁর কৃপা হলে কারু-কারু আধারে দুই-ই হতে পারে। কেন পারবে না ? তাঁর কৃপার কি দড়ি-বেড়া আছে ?'

তাঁর দৃষ্টান্ত আর কে নরেন ছাড়া ?

কুঠির উপর থেকে আরতির সময় চেঁচাতাম, ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়, দেখা দে. ওরে আমার যে বড় সাধ, ভক্তের রাজা হব।

একে-একে সে সব লোকই জুটছে। যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডাকবে তার আসতেই হবে এখানে। শুদ্ধসত্ত্ব ত্যাগী ভক্তের দল। নরেনের ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হচ্ছে আজকাল। ছোট-নরেনের কুম্ভক সমাধি।

এমন কি ডাক্তার সরকারও বুঝি দলে ভিড়ল।

'কাল রাত তিনটের সময় তোমার জন্যে বড্ড ভেবেছিলুম।' ডাক্তারের গলা স্নেহসিক্ত।

'কেন বলো তো ?'

'বৃষ্টি হচ্ছিল তখন। ভয় হল তোমার ঘরের দোর-টোর সব খুলে রেখেছে না কি করেছে কে জানে!'

ঠাকুর বিহ্বল হয়ে উঠলেন। 'বলো কি গো !'

'আর না বলে করি কি ! তোমাকে যে ভালোবেসে ফেলেছি। তোমাকে ছুঁয়ে-ধরে আমারও প্রায় সাধু হবার দশা।'

'উপায় নেই।' বললে মাস্টার। 'ঠাকুর একবার জাদুঘর দেখতে গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখেন, জানোয়ার ফসিল—পাথর হয়ে গেছে। সঙ্গে-সঙ্গে বলে বসলেন, পাথরের সঙ্গে থেকে-থেকে পাথর হয়ে গেছে। তেমনি সাধুর কাছে থাকতে-থাকতে সাধু হয়ে যায়।'

'কিন্তু তোমার দেহটি টিঁকিয়ে রাখতে না পারলে কি করে দু'দিন সঙ্গ করি ?'

'কিন্তু সর্বক্ষণ দেখছি যে দেহ আলাদা, আত্মা আলাদা। যেমন নারকেলের জল শুকিয়ে গেলে মালা আলাদা, শাঁস আলাদা তেমনি। যেমন খাপ আলাদা

তলোয়ার আলাদা। তাই তো দেহের অসুখের জন্যে বলতে পারি না মাকে।'
'দেহটি থাকলেই তো মায়ের নামগুঞ্জন হবে।' ডাক্তার তদ্‌গতের মত বললে।
'তাই তো, সেবার আমার খুব অসুখ, কালীঘরে বসে আছি, কেন কে জানে, মা'র কাছে খুব প্রার্থনা করতে ইচ্ছা হল। নিজের হয়ে বলতে বাধল। হৃদের হয়ে বললাম। বললাম, মা, হৃদে বলে তোমার কাছে ব্যামোর কথা বলতে। বলা আর শেষ হল না, চোখের কাছে দপ করে সেই জাদুঘরের ছবি ভেসে উঠল। মা-ই দেখিয়ে দিলেন। দেখিয়ে দিলেন তারে বাঁধা মানুষের হাড়ের দেহ। আমি বললুম, মা, তোমার নামগান করে বেড়াব, দেহটা একটু তার দিয়ে এঁটে দাও।'
দেহের আর কাজ কি! ঈশ্বরের হাতের বীণা হও।
আমাকে তোমার হাতে তুলে নাও, ধুলো থেকে তুলে নাও, তোমার নন্দননিকুঞ্জ থেকে সুর এনে একে প্রাণময় করো, গীতময় করো, রসবর্ষণময় করো। তোমার নখস্পর্শে বধির অন্ধকারে আলোর পুলকিত তারকার কণিকাগুলি জ্বলে-জ্বলে উঠুক। হৃদয়হারা রুক্ষ পাথর গলে-গলে যাক অশ্রুর উদ্বেলতায়। আমাকে বেদনায় চেতনায় জর্জরিত করো। নবীন আঘাতের স্নানে নবজন্মের নির্মল আয়ু আনো জীবনে।
আর মনের কাজ কি? সপ্ততীর্থে উপনীত হও।
সত্যতীর্থ, ক্ষমাতীর্থ, দমতীর্থ, দয়াতীর্থ, জ্ঞানতীর্থ, তপতীর্থ আর তীর্থ প্রিয়বাদিতা। এই সপ্ততীর্থ মানসতীর্থ। অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী, পুরী আর দ্বারাবতী এই সপ্ত স্থানতীর্থে কি হবে, যদি মানসতীর্থে না অবগাহন করতে পারো! তীর্থফল হচ্ছে মনের নির্মলতা। মানসতীর্থে সেবা না করলে সেই ফলপ্রাপ্তি হবে কি করে? তোয়পূত দেহ দিয়ে কি হবে, তোয়পূত মন চাই। যার চিত্ত সুবিশুদ্ধ সেই যথার্থ স্নাত।
'তীর্থে গেলে কী হয়? আর কিছু হয় না, উদ্দীপন হয়।' বললেন ঠাকুর, 'মথুরবাবুর সঙ্গে সেই বৃন্দাবন গিয়েছিলাম না? কালীয়দমন ঘাট দেখামাত্রই উদ্দীপন হত, বিহ্বল হয়ে যেতাম। ছোট একটি ছেলের মতন করে হৃদে নাওয়াতো আমাকে। বৃন্দাবনের বেশ ভাব তাই না? নতুন যাত্রী এলে বৃন্দাবনের ব্রজবালকেরা কলরব করতে থাকে, হরি বোলো গাঁঠরি খোলো হরি বোলো গাঁঠরি খোলো।'
ভাবের নদীতে উজান এসেছে। নৌকো ছাড়ো। পাল তুলে দাও। যে বস্ত্রখণ্ড দিয়ে এতদিন গাঁঠরি-বোঁচকা বেঁধেছ সেই বস্ত্রখণ্ড খুলে নিয়ে পাল

টানাও। আর ভাবনা নেই, হাততালি দাও আর গান গাও।

'অবতার যখন আসে সাধারণ লোকে জানতে পারে না।' বললেন ঠাকুর, 'অবতারকে চিনতেও সাধন লাগে। সেই হীরের দর যাচাই করতে পাঠিয়েছিল বেগুনওয়ালার কাছে। বেগুনওয়ালা বললে, বড়জোর ন সের বেগুন দিতে পারি, তা এও বাজারদরের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছি। পরে গেল কাপড়ওয়ালার কাছে। কাপড়ওয়ালার পুঁজি বেশি, সে বললে, নশো টাকা। হাজার টাকা দাও তো ছেড়ে দিয়ে যাই। ওরে বাবা, বাজারদরের চেয়ে অনেক বেশি বলে ফেলেছি। এবার চলো খাঁটি জহুরির কাছে। জহুরি এক পলক দেখেই লাফিয়ে উঠল। বললে, এক লাখ টাকা দেব। যার যেমন পুঁজি তার তেমন দর।'

জহুরির চোখ চাই। চাই জ্ঞানপ্রেমের চক্ষু।

'অবতার না হলে জীবের আকাঙ্ক্ষা মেটে কই? অবতার ফাঁকা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়, কোথাও বদ্ধ হয় না বন্দী হয় না।' বলছেন ঠাকুর, 'অবতারের আমি পাতলা আমি। বলতে পারো ফোকরওয়ালা পাঁচিল। পাঁচিলের দুই দিকেই অনন্ত মাঠ। পাঁচিলের যে দিকে দাঁড়াও সেই দিকেই দেখা যায় অনন্ত মাঠ। ফোকর দিয়ে এদিক ওদিক আনাগোনা করা যায়। এদিকে দেহধারণেও যোগ ওদিকে আবার দেহাতীত সমাধি।'

যশোদাকে শ্রীকৃষ্ণ অনেক সব দেখালেন। গোলোক দেখালেন, দেখালেন অখণ্ড জ্যোতি। যশোদা বললেন, 'কৃষ্ণ রে, ও-সব কিছু দেখতে চাই না। তোর মানুষরূপ দেখা। আমার কোলে ওঠ, আমার বুকে আয়। আমি তোকে কোলে করব নাওয়াব-খাওয়াব।'

'তাই অবতারের শরীর থাকতে-থাকতেই তাঁর সেবা-পূজা করতে হয়।' বললেন ঠাকুর, 'আর অবতারের উপর একবার ভালোবাসা এসে গেলেই হয়ে গেল।'

ভালোবাসা এলে কি হলে? নিশ্চিন্ত হলে।

সুজির পায়েস খেতে দিয়েছে ঠাকুরকে। কিন্তু খেতে-খেতে কাশি উঠল বুঝি। পুঁজরক্তমেশানো গয়ার ফেললেন সেই পায়েসের বাটিতে।

ভক্তদের দিকে তাকালেন ডাক্তার। 'অবতার তো বলো, খেতে পারো এই উচ্ছিষ্ট পায়েস?'

খুব পারি। পায়েসের বাটি মুখে তুলল নরেন। এক চুমুকে খেয়ে ফেলল যা-কিছু ছিল সেই বাটিতে।

একমাত্র নরেনই পারে। নরেনই পারে সমস্ত হজম করতে।

সে একাধারে জাগ্রত বহ্নি আর তুহিন-তুষার। সেই পারে জ্বালিয়ে দিতে পুড়িয়ে দিতে, গলিয়ে দিতে তলিয়ে দিতে। সূর্যের দীপ্তি আর চন্দ্রের শৈত্য একসঙ্গে। একসঙ্গে অপ্রমেয় অপরাজিত জ্ঞান আর মাধুর্যধৈর্যসুভগা ভক্তি। এক দিকে মুরজ-ডিণ্ডিম-বাদ্য-বিলক্ষণ, অন্য দিকে মধুর-পঞ্চমনাদ-বিশারদ। নরেনই তো সেই ভস্মভূষণ ভাস্বর কন্দর্প-দর্পনাশন শিব। ওই তো পারে সেই বিষ ধারণ করতে।

'যখন ও বুঝবে ও কে', বললেন ঠাকুর, 'তখন দেহ ছেড়ে চলে যাবে।'

সেই আত্মনিরীক্ষণ করবার জন্যেই তো নরেন যেতে চায় সমাধিভূমিতে। ঠাকুর তাকে ঠেকিয়ে রাখেন। বলেন, চাবি রেখে দিলাম আমার হাতে, আমি না খুলে দিলে সেই বন্ধ ঘরে তুই ঢুকতে পাবিনে।

মনের সপ্তম ভূমিই সমাধি।

ঠাকুর সমাধির বিশ্লেষণ করছেন। প্রথম তিন ভূমি লিঙ্গ গুহ্য আর নাভি। যতক্ষণ মনের কামকাঞ্চনে আসক্তি ততক্ষণ এই তিন ভূমিতেই ঘোরাফেরা করে, কিছুতেই পারে না ঊর্ধ্বে উঠতে। কিন্তু যদি একবার ছাড়া পায় মন উঠে আসে চতুর্থভূমিতে, হৃদয়ে। তখন একটা আলো দেখে, নূতন দেশের আলো। অবাক হয়ে যায় এ আভা কোথায় ছিল, কোথায় ছিল এত অব্যক্ত ব্যঞ্জনা! তখন মন আর নিচে নামতে চায় না। বলে, দেখেছি ঢের দেখেছি তোমাদের জারিজুরি, তোমাদের চটুকে রঙ্গ। আর ও-সবে ভুলছিনে। আস্তে-আস্তে শেষে পঞ্চভূমি, কণ্ঠে উঠে আসে। মন যার কণ্ঠে উঠেছে ঈশ্বরের কথা ছাড়া অন্য কথা বলতে বা শুনতে তার ভালো লাগে না। যদি কেউ অন্য কথা বলে, সেখান থেকে উঠে যায়।

তার পর, ষষ্ঠভূমি?

ষষ্ঠভূমি কপাল। সেখানে গেলে মন নিরন্তর ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করে। কিন্তু সর্বক্ষণ ধরি-ধরি করেও ধরতে পারে না সেই নিরুপমকে, নিরবদ্যকে। তখনও একটু থেকে যায় আমিত্বের পরদা। যেন লণ্ঠনের ভিতরে আলো বাইরে তার কাচের আবরণ। এই বুঝি ছুঁয়ে ফেললাম, আলিঙ্গন করলাম সেই দিব্য-জ্যোতিকে, কিন্তু না, এখনো একটু বাধা আছে।

বাধা-ব্যবধান সব দূরে গিয়েছে, উড়ে গিয়েছে, সপ্তমভূমিতে। সেই ভূমিই সমাধিভূমি। তার স্থান শিরোদেশে। সেখানে উঠলেই ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ। নিত্য আলিঙ্গন। সেই অবস্থায় একুশ দিনে মৃত্যু।

'কিন্তু এ সব জ্ঞানের পথ, কঠিন পথ।' বললেন ঠাকুর সংসারী ভক্তদের। 'তোমাদের ভক্তির পথ। ভালোবাসার পথ। ভালোবাসায় কি হয়? মন প্রাণ লীন হয়ে যায়। স্ত্রীর যেমন স্বামীতে নিষ্ঠা তেমনি নিষ্ঠা আনো ঈশ্বরে। সেই ভালোবাসার থেকেই ভাব হবে—ক্রমে মহাভাব।'

ভাব হলে কি হয়? মানুষ অবাক হয়ে যায়। বায়ু স্থির হয়, সেই বায়ু স্থির হওয়ার নামই কুম্ভক। বন্দুকের গুলি ছোঁড়বার সময় যে গুলি ছোঁড়ে সে বাক্‌শূন্য হয়, তার বায়ু স্থির হয়ে যায়। তেমনি প্রেমের জিনিসের প্রতি স্থিরলক্ষ্য হও, অমনিতেই যোগ হয়ে যাবে।

মা ঠাকরুণ বললেন, 'আমি একবার তারকেশ্বর যাব।'

'কেন?' ঠাকুর তাকালেন আকুল চোখে।

'সেখানে গিয়ে হত্যে দেব। বলো, যাব?'

'যেতে চাও তো যাও। কিন্তু কিছু কি হবে?'

'কেন হবে না? একবার সিংহবাহিনীকে জাগিয়েছিলাম, এবার পারব না পশুপতির ঘুম ভাঙাতে? সেবার নিজের অসুখে এবার তোমার অসুখে। আর, তুমি তো জানো, তোমার অসুখেই আমার অসুখ।'

হে তারকেশ্বর, জাগো, ত্রাণ করো।

তুমি কাশীতে বিশ্বনাথ, কৈলাসে কৈলাসেশ্বর। কামরূপে বৃষধ্বজ, মণিপুরে মহারুদ্র। হরিদ্বারে গঙ্গাধর, নেপালে পশুপতিনাথ। চিত্রকূটে চন্দ্রচূড়, নর্মদায় বাণলিঙ্গ। উৎকলে জগন্নাথ, নীলাচলে ভুবনেশ্বর। সেতুবন্ধে রামেশ্বর, পুষ্করে পুরুষোত্তম ঝাড়খণ্ডে বৈদ্যনাথ আর রাঢ়ে তারকেশ্বর।

যাচ্ছ যে, পারবে জাগাতে?

কেন পারব না? সাবিত্রী পারেনি?

সত্যবান বললে, সাবিত্রী, আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না, ইচ্ছে করছে ঘুমুই।

সাবিত্রী মাটিতে বসে পড়ল। স্বামীর মাথা কোলে টেনে নিল। খানিক পরেই দেখতে পেল কে একজন রক্তবসন রক্তনয়ন পুরুষ তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। শ্যামবর্ণ, বদ্ধমৌলি, সাক্ষাৎ সূর্যের মত তেজস্বী।

আস্তে-আস্তে স্বামীর মাথা মাটিতে শুইয়ে দিয়ে সাবিত্রী সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। কম্প্রবক্ষে হাত জোড় করে বললে, 'আপনাকে দেবতা বলে মনে হচ্ছে। সত্যি

আপনি কে, কেন এসেছেন ?'

'সাবিত্রী, তুমি পতিব্রতা ও তপোনুষ্ঠানসম্পন্না', বললে সেই অভ্যাগত, 'তাই তোমাকে আত্মপরিচয় দিচ্ছি। শোনো, আমি যম। তোমার স্বামীর আয়ু শেষ হয়েছে। এই দেখ, আমার হাতে পাশ। আমি তাকে এই পাশে বেঁধে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'আপনার অনুচরদের না পাঠিয়ে আপনি নিজে এসেছেন কেন ?' সাবিত্রী এতটুকু ভয় পেল না।

'তোমার স্বামী পরমধার্মিক, রূপবান, গুণসাগর। তাই দূত না পাঠিয়ে আমি নিজে এসেছি।' এই বলে যম সত্যবানের দেহের মধ্য থেকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে পাশবদ্ধ করে সবলে আকর্ষণ করে নিষ্কাশিত করল। মুহূর্তে সত্যবানের দেহ শ্বাসহীন, প্রভাহীন, চেষ্টাহীন হয়ে গেল।

যম চলল দক্ষিণ দিকে।

ব্রতসিদ্ধা সাবিত্রী দুঃখার্তচিত্তে চলল তার পিছু-পিছু।

কৃতান্ত বললে, 'এ কি, তুমি চলেছ কোথায় ? তুমি ফিরে যাও, তোমার স্বামীর পারলৌকিক কাজ সমাধা কর। তুমি তোমার ভর্তার ঋণ শোধ করেছ, তোমার আর ভয় কি ?'

'স্বামী যে স্থানে নীত হন বা স্বয়ং যেখানে যান সেখানে স্ত্রীরও গতি, এই নিত্যধর্ম। তপস্যা, গুরুভক্তি, ভর্তৃস্নেহ ও ব্রতবলে ও সবার উপরে আপনার প্রসাদে আমার গতি অপ্রতিহত। আপনার সঙ্গে সপ্তপদ ভ্রমণ করা হয়ে গিয়েছে, তাই আপনি আমার মিত্র। সেই মিত্রভাব থেকে আপনাকে যা বলছি শুনুন। গার্হস্থ্য ধর্মই সর্বধর্মের প্রধান। পতিহীনা হয়ে বনে বাস করে আমি কি করে সেই ধর্মাচরণ করব ?'

'অনিন্দিতে, তোমার সুব্যক্ত ও যুক্তিযুক্ত বাক্যে আমি তুষ্ট হয়েছি। তুমি বর চাও।' যম ফিরে দাঁড়াল। 'সত্যবানের জীবন ছাড়া যা চাইবে তাই পাবে। বর নিয়ে ফিরে যাও।'

'আমার শ্বশুর অন্ধ ও রাজ্যচ্যুত হয়ে অরণ্যবাসী হয়েছেন। আপনি তাঁকে চোখ দিন। চোখ পেয়ে অগ্নি আর দিবাকরের মত তিনি বলবান হোন।'

'তথাস্তু। এবার তবে নিবৃত্ত হও।' যম বললে, 'তুমি পথশ্রান্ত হয়েছ। আরো যাবে তো আরো তোমার ক্লান্তি বাড়বে।'

'আমি যখন আমার স্বামীর কাছে-কাছে আছি তখন আর আমার ক্লান্তি কি ? যেখানে তিনি যাবেন আমিও সেইখানে যাব। তিনিই আমার যাত্রা,

তিনিই আমার গতি। সুতরাং আমার জন্যে চিন্তা করবেন না, দিগন্তরেখা উত্তীর্ণ হয়ে আমি হেঁটে যাব। তা ছাড়া আপনার মত সজ্জনসঙ্গ পাব কোথায়? সাধু ব্যক্তির সঙ্গে কিঞ্চিৎ সমাগমেই মিত্রতা, তাই সাধুসমাগমও কখনো নিষ্ফল হয় না। তারই জন্যে সাধুসংসর্গেই বাস করা বিধেয়।'

যম উৎসাহিত হল। বললে, 'ভামিনি, তোমার বাক্যবিন্যাস হৃদয়রঞ্জন, হিতকর ও বুধগণেরও বোধবর্ধন। তুমি আরেক বর, দ্বিতীয় বর চাও। সত্যবানের জীবন ছাড়া যে কোনো প্রার্থনা।'

'আমার শ্বশুর তাঁর হৃতরাজ্য ফিরে পান ও তাঁর ধর্মে অবিচ্যুত থাকুন।' সাবিত্রী দ্বিতীয় বর চাইল।

'তথাস্তু।' যম দ্রুতক্ষেপে পা চালাল। 'কিন্তু এ কি, এখনো আসছ কেন? আর যে পারবে না চলতে, তোমার পা টলে-টলে পড়ছে।'

'পড়ুক।' যমকে থামতে দেখে সাবিত্রীও থামল। বললে, 'আপনারই নিয়মে জীবজগৎ নিগৃহীত, কর্মের নিয়মে আবার যার যা যাতায়াত। সর্বত্রই এই নিয়মের বিধানশাসন। তাই আপনার যম-নাম সুবিখ্যাত! কিন্তু আমার আরো কথা শুনুন। কায়মনোবাক্যে সকলের প্রতি অদ্রোহ, অনুগ্রহ আর দান এই সাধুদের সনাতনধর্ম। শত্রু হলেও সে যখন মর্তের লোক তখন নিশ্চয়ই সে দুর্বল ও অল্পজীবী, তাই সাধুরা শত্রুদের দয়া করেন।'

'কি সুন্দর তোমার কথা সাবিত্রী!' যম গদ্‌গদ ভাষে বললে, 'যেন পিপাসিতের কাছে শীতল জল। তুমি সত্যবানের জীবন ছাড়া তৃতীয় বর যাচ্ঞা কর।'

'আমার পিতার পুত্র নেই, তাঁর যেন বংশকর শত পুত্র জন্মে, এই আমার তৃতীয় প্রার্থনা।'

'তথাস্তু।' যম আবার চলতে শুরু করল। 'এবার তো তুমি কৃতকামা হলে, এখন প্রতিনিবৃত্ত হও। দেখ কত দূর পথে চলে এসেছ।'

'আমি যখন স্বামীর সন্নিধানে আছি তখন, কোন পথই আমার দূর পথ নয়।' সাবিত্রী স্নিগ্ধমুখে বললে, 'আমার মন দূরতর পথে ধাবমান। বেশ তো, আপনি চলতে-চলতেই আমার কথা শুনুন। আপনি বিবস্বানের পুত্র, তাই আপনি বৈবস্বত। প্রজাদের পক্ষপাতরহিত ধর্মশাসন করেন বলে আপনি ধর্মরাজ। সুতরাং আপনি সজ্জন। সজ্জনের উপর যেমন বিশ্বাস হয় তেমন নিজের উপরেও হয় না।'

'ভদ্রে, এমন চারুবাণী আর কোথাও শুনিনি।' যম হাত তুলল। 'সত্যবানের জীবন ছাড়া চতুর্থ বর প্রার্থনা করো।'

'সত্যবানের ঔরসে আমার গর্ভে বলবীর্যশালী কুলবর্ধন এক শত পুত্র হোক— এই আমার চতুর্থ প্রার্থনা।' সাবিত্রী দৃঢ় হয়ে দাঁড়াল।

'তথাস্তু। তোমার বলবীর্যবান আনন্দবর্ধন শত নন্দন হোক। এবার তবে প্রত্যাবর্তন করো।'

সাবিত্রী আবার যমকে অনুগমন করতে লাগল। বলতে লাগল, 'সাধুদের ধর্মবৃত্তি চিরকালই সমান। সাধুরা কখনো অবসন্ন হন না, ব্যথিত হন না, সাধুর সঙ্গে সাধুর সমাগম চিরকাল ফলান্বিত। সাধুরাই সত্য দ্বারা সূর্যকে চালিত করছেন, তপস্যা দ্বারা ধারণ করেছেন পৃথিবীকে। পরস্পর অপেক্ষা না করে আর্যগণের পূজনীয় জ্ঞানেই চিরকাল পরোপকার করে থাকেন। তাঁদের প্রসাদ কখনো ব্যর্থ হয় না, তাঁদের কাছে কারু প্রার্থনা বা সম্মানের হানি হয় না। তাই সাধুরাই সকলের রক্ষাকর্তা।'

যম বললে, 'তোমার সুবিন্যস্ত ধর্মসংহত বাক্য যত শুনছি ততই তোমার প্রতি আমার ভক্তি উচ্ছলিত হচ্ছে। অতএব আবার তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা করো।'

'হে মানদ! আপনি আমাকে শতপুত্রের বর দিলেন কিন্তু আমার স্বামী কোথায়? আমি স্বামিবিনাকৃত সুখ, স্বামীবিনাকৃত স্বর্গ স্বামিবিনাকৃত শ্রীর অভিলাষিণী নই। স্বামী ছাড়া জীবন আমার মৃত্যুতুল্য। সুতরাং আমাকে শতপুত্র বর দিয়ে কি করে নিয়ে যাচ্ছেন আমার স্বামীকে? অতএব আমার স্বামী জীবিত হোন, এই আমার পঞ্চম, আমার পরম প্রার্থনা।'

সানন্দচিত্তে যম বললে, 'তথাস্তু। কুলনন্দিনি, এই তোমার স্বামীকে পাশমুক্ত করে দিচ্ছি। ইনি নীরোগ, কৃতার্থ ও তোমাতে বশীভূত হয়ে চারশো বছর জীবিত থাকবেন আর যজ্ঞ ও ধর্ম দ্বারা খ্যাতিলাভ করে তোমাকে শত পুত্রের জননী করবেন। এবার যাও, স্বামীর কাছে ফিরে যাও।'

দ্রুত পায়ে সাবিত্রী ফিরে গেল, যেখানে তার স্বামীর মৃত কলেবর পড়ে আছে। ভূমি-নিপতিত ভর্তাকে আলিঙ্গন করে তার মাথা নিজের কোলের উপর নিয়ে বসল। সত্যবান চোখ খুলে সপ্রেমে তাকাল সাবিত্রীর দিকে, প্রবাসাগত লোক যেমন তাকায় তার প্রণয়িনীর দিকে। বললে, 'কি কষ্ট। অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম, আমাকে জাগাওনি কেন এতক্ষণ? যিনি আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন সেই শ্যামবর্ণ পুরুষ কোথায়?'

'জীবিতনাথ,' সাবিত্রী আনন্দরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'যাঁর কথা জিগগেস করছ তিনি লোকসংহর্তা যম। তিনি এখন ফিরে গিয়েছেন স্বস্থানে। যদি শরীরে

শক্তি ফিরে পেয়ে থাকো তো ওঠবার চেষ্টা করো। রাত ঘোর অন্ধকার হয়ে এসেছে।'

সত্যবান উঠে বসল। সমুদায় দিক আর অরণ্যানী নিরীক্ষণ করতে লাগল। বললে, 'সুমধ্যমে, এখন বেশ মনে করতে পারছি। কাষ্ঠপাটন করতে এসেছিলাম তোমার সঙ্গে। শিরঃপীড়ায় কাতর হয়ে তোমার কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলাম, তোমার বাহুবন্ধনে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তারপর। তারপর স্বপ্ন কি সত্য কিছুই জানি না, ঘোরতিমিরবর্ণ মহাতেজা পুরুষকে দেখলাম। সে কে? যদি তুমি কিছু জানো তো বলো।'

'কাল বলব। এখন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে চল। তোমার মা বাবা উৎকণ্ঠিত হয়ে রয়েছেন।'

'কিন্তু ভয়ঙ্কর বন অন্ধতমসে আচ্ছন্ন। কি করে পথ দেখবে?'

'তবে থাক, আজকের রাত এখানে বসেই কাটিয়ে দিই। তুমি পীড়িত, দুর্বল, পথ চলতে অসমর্থ। ঐ দেখ, এখানে-ওখানে শুষ্ক তরু জ্বলছে, ওখান থেকে আগুন এনে কাঠ জ্বালাই, সে আগুনে তুমি তোমার শরীরগ্লানি অপনোদন করো।' সাবিত্রী উঠে পড়ল।

'না, না, এখানে রাত কাটাব না। মা-বাবার কাছে ফিরে যাব।' সত্যবান অস্থির হয়ে উঠল, 'এখনো বাড়ি ফিরিনি, না জানি কতই ব্যাকুল হয়েছেন আমার জন্যে। দুজনেই বৃদ্ধ হয়েছেন, তা ছাড়া আমার বাবা নয়নহীন। আমিই তাঁদের যষ্টিস্বরূপ। তাঁদের জীবনেই আমার জীবন। তাঁদের ভরণপোষণ ও প্রিয়ানুষ্ঠানই আমার একমাত্র ধর্ম।'

গুরুপ্রিয় ধর্মাত্মা সত্যবান পিতামাতার উদ্দেশে কাঁদতে লাগল। সাবিত্রী তার অশ্রুমার্জন করে রাত্রির উদ্দেশে বললে, 'যদি আমি কোনো তপশ্চর্যা করে থাকি তা হলে হে শর্বরি, আমার শ্বশ্রূ, শ্বশুর ও স্বামীর পক্ষে কল্যাণকারিণী হও। আমি যে স্বৈর ব্যবহারেও কখনো মিথ্যা বলিনি, আজ সেই সত্য তাঁদের অবলম্বন হোক।'

'আমাকে শিগগির তাঁদের কাছে নিয়ে চল। যদি দেখি তাঁদের কিছু অমঙ্গল হয়েছে তা হলে এ জীবন আর রাখব না। আমি এখন সমর্থ ও প্রকৃতিস্থ হয়েছি, বরারোহে, তুমি এখন ত্বরান্বিত হও।'

কেশপাশ দৃঢ়বদ্ধ করে দু-বাহু দিয়ে সবলে স্বামীকে টেনে তুলল সাবিত্রী। ফলের থলে আর কাঠ কাটবার কুঠার তরুশাখায় ঝোলানো ছিল, তুলে নিল। নিজের কাঁধে সত্যবানের বাহু নিবেশিত করে দক্ষিণ হাতে তাকে আলিঙ্গন

করে ধীরে-ধীরে এগুতে লাগল।

এগুতে লাগল মৃত্যুত্তীর্ণ হয়ে। নবাবির্ভাবের প্রাণলোকে।

ঠাকুর বললেন, 'এই তোর দুই দেবতা, মা আর বাবা। এদের ছেড়ে তুই কোথায় যাবি? কোন বনে, কিসের সন্ধানে?'

'বাবা-মা কত বড় গুরু।' আবার বললেন ঠাকুর। 'রাখাল আবার জিগগেস করে যে, বাবার পাতে কি খাব? আমি বলি সে কি রে? তোর কি হয়েছে যে বাবার পাতে খাবি না? তবে কি জানো? যারা সৎ তারা উচ্ছিষ্ট কাউকে দেয় না। এমন কি কুকুরকেও না।'

রাম এসে নালিশ করল ঠাকুরের কাছে। 'বাবা গোল্লায় গেছেন।'

বাবার অপরাধ দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করেছেন।

'শুনলে?' ঠাকুর ভক্তদের দিকে তাকালেন। 'বাবা গোল্লায় গেছেন আর উনি ভালো আছেন!'

বিমাতার এখন বয়স হয়েছে তবু রামের রাগ পড়েনি। বলে, 'একটা না একটা অশান্তি লেগেই আছে। বলি, বাপের বাড়িতে গিয়ে থাকুন, তা নয়!'

'তোমার স্ত্রীকেও অমনিধারা বাপের বাড়িতে থাকতে বলো না।' কে একজন টিটকিরি দিয়ে উঠল।

'এ কি হাঁড়ি-কলসী গা?' ঠাকুর সহাস্য প্রতিবাদ করলেন: হাঁড়ি এক জায়গায় সরা আরেক জায়গায়? এ যে শিবশক্তি। এদের তো একত্র স্থিতি। বেশ তো, বাপের বাড়ি কেন, আলাদা বাড়ি করে দাও না। মাস-মাস খরচ দেবে।'

'কিন্তু বাপ-মা যদি কোনো গুরুতর অপরাধ করেন, তাহলেও কি তাঁদের ত্যাগ করা যাবে না?' কে আরেকজন জিগগেস করল।

'কখনো না। মা দ্বিচারিণী হলেও ত্যাগ করবে না মাকে।' ঠাকুর বললেন, 'গুরু-পত্নীর চরিত্র নষ্ট হওয়াতে শিষ্যরা বললে, ওঁর ছেলেকে গুরু করা যাক। আমি বললুম, সে কি গো? ওলকে ছেড়ে ওলের মুখী নেবে! নষ্ট হল তো কি হল! তুমি তাঁকেই ইষ্ট বলে জেনো।'

যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি-বাড়ি যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।

'মা-বাপ কি কম জিনিস গা?' বললেন আবার ঠাকুর। 'তাঁরা প্রসন্ন না হলে ধর্ম-টর্ম কিছুই হয় না। যেই বাবা-মা মানুষ করল, তাঁদের ফাঁকি দিয়ে ছেলে-মাগ নিয়ে যে বেরিয়ে আসে, হলই বা না বাউল-বৈষ্ণবী, আমি বলি ধিক।'

প্রাণ ফিরে পেয়েই সত্যবান চলল তাই তার গৃহে, তার বাপ-মা'র কাছে।

তার যুগ্ম-দেবতা দর্শনে। কিন্তু প্রাণ ফিরে পেল কার তপস্যায়? কে সে মহীয়সী, কৃতান্ত-নিবৃত্তিনী?

দুদিন নিরম্বু উপবাসে কাটালেন শ্রীমা। তারকেশ্বর মুখ তুলে চাইল না। তবু ছাড়ব না তোমার চৌকাঠ। ঠায় পড়ে রইলেন। তাঁর ব্যাধি সারিয়ে দাও। তাঁকে অক্লেশ-অব্রণ করো।

তৃতীয় দিনের মধ্যরাত্রে, হত্যা দিয়ে পড়ে আছেন শ্রীমা, হঠাৎ একটা শব্দ শুনতে পেলেন। যেন পর-পর বসানো আছে মাটির হাঁড়ি, তা যেন একটার পর একটা কে লাঠির বাড়ি মেরে ভেঙে দিচ্ছে। ঐ শব্দে জেগে উঠলেন শ্রীমা। কই, কিছু নেই তো! এর তবে মানে কি?

হৃদয়ের গভীরে উত্তর পেলেন শ্রীমা। এ জগতে কে কার স্বামী, কে কার স্ত্রী। যিনি গড়বার গড়েছেন, যিনি ভাঙবার ভাঙবেন। সব সেই কামারের দোকানের হাঁড়িকুঁড়ি!

মায়ার মেঘ সরে গেল এক মুহূর্তে। যা হবার হবে যা করবার করবেন, আমি কেন আত্মহত্যা করি! আমার আত্মনিধন নয়, আত্মনিবেদন।

অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে মন্দিরের পিছনে এসে পৌছুলেন। হাতড়ে-হাতড়ে পেলেন স্নানকুণ্ড। অঞ্জলি করে জল তুললেন। পিপাসায় কণ্ঠ কাঠ হয়ে আছে। তাই দিয়ে শুষ্ক কণ্ঠ সিক্ত করলেন। দেহে যেন একটু বল এল। হ্যাঁ, এবার ফিরতে পারবেন কাশীপুর।

'দু-ভাই রামলক্ষ্মণ সশরীরে লঙ্কায় যাবে ঠিক করেছে।' ঠাকুর গল্প বলছেন। 'কিন্তু সামনে সমুদ্র, দুস্তার বাধা। লক্ষ্মণের ভীষণ রাগ হয়ে গেল। কি, এত বড় কথা? সমুদ্র আমাদের বাধা দেবে? ধনুর্বাণ উত্তোলন করল। বললে, বরুণকে এক্ষুনি বধ করব। রাম তাকে বুঝিয়ে বললে, ভাই লক্ষ্মণ, চোখের সামনে যা দেখছ সব মায়া, স্বপ্নবৎ। সমুদ্রও মায়া, তোমার রাগও মায়া। একটা মায়া দিয়ে আরেকটা মায়ার বিনাশ করবে, সেটাও মায়া।' সেই নহবৎখানার সাধুর কথা মনে নেই? কারু সঙ্গে কথা কইত না, শুধু এক মনে ঈশ্বরের ধ্যান করত। একদিন হঠাৎ আকাশ কালো করে মেঘ এল আর দেখতে-দেখতে সর্বনাশা ঝড় এল হুড়মুড় করে। ঝড়ে উড়িয়ে নিল মেঘ। দেখা গেল আবার সেই আকাশ-ভরা রোদের ঝিকিমিকি। সাধু ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় নাচতে শুরু করল। হাততালি দিতে লাগল আনন্দে।

ঠাকুর বললেন,'আমি তাকে জিগগেস করলুম, তুমি ঘরের মধ্যে চুপচাপ থাক,

হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে এসে আনন্দে নৃত্য করছ কেন? তোমার হল কি?'
হল কি! সাধু বললে, মায়ার খেলা হল। চোখের সামনে মায়ার খেলা দেখলুম। এই দিব্যি পরিষ্কার আকাশ ছিল, হঠাৎ কালো মেঘে ছেয়ে গেল দিকদিগন্ত। কোত্থেকে ঝড় এসে উড়িয়ে নিল মেঘ। আবার সেই পরিষ্কার আকাশ। মায়া শব্দের আসল অর্থ কি? আসল অর্থ হচ্ছে ভগবদিচ্ছা।

শ্রীমা ম্লান মুখে ঠাকুরের পাশটিতে এসে দাঁড়ালেন। ঠাকুর উৎসুক হয়ে জিগগেস করলেন, 'কি গো, কিছু হল?' পরে বুড়ো আঙুল নেড়ে বললেন, 'কিছুই হবার লয়।'

জানো? আমিও সেদিন স্বপ্ন দেখলাম ওষুধ আনতে হাতি গেল। মাটির নিচে ওষুধ পোঁতা, মাটি খুঁড়তে শুরু করেছে হাতি। দিব্যি খুঁড়ছে, ওষুধ এই বেরুলো বলে, এমনি সময় গোপাল এসে ঘুম ভেঙে দিল।

'আচ্ছা, তুমি স্বপ্নটপ্ন দেখ?' ঠাকুর জিগগেস করলেন শ্রীমাকে।

'সেদিন দেখেছিলাম।'

'কি দেখলে।'

'দেখলাম কালী-মা দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু তাঁর ঘাড় কাত।'

'মাকে কিছু জিগগেস করলে?'

'বললাম, মা তোমার ঘাড় কাত কেন?'

'মা কি বললেন?'

'বললেন, আমার গলায় ঘা।'

'কিছু বুঝলে?'

স্থির নয়নে প্রশান্ত আস্যে তাকিয়ে রইলেন শ্রীমা।

অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী দর্শন করে ফিরেছে বিবেকানন্দ। বাগবাজারের বাড়িতে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। সমস্ত দেহ চাদর ঢেকে মা এককোণে দাঁড়িয়েছেন। বিবেকানন্দ প্রণাম করল সাষ্টাঙ্গে। বলল, 'মা, তোমার ঠাকুর কিছু নয়।'

'কেন বাবা, কি হল?'

'একেবারে কিছু নয়! কোনো কিছু শক্তি ধরে না। নিজের অসুখ তো সারাতে পারলেই না, আমাদেরও না। একেবারে বাজে ঠাকুর।'

মা ক্ষীণ একটু হাসলেন। কি হয়েছে তাই বল না?

'কাশ্মীরে এক ফকিরের চেলা আমার কাছে আনাগোনা করত।' বললে স্বামীজী। 'তাতে সেই ফকিরের খুব আক্রোশ হল আমার উপর। নিজের

চেলাকে ঠেকাতে পারে না, যত রাগ আমার উপর। শেষে ফকির আমাকে শাপ দিল। বললে তিন দিনের মধ্যে তোমার পেটের অসুখ হয়ে এখান থেকে সরে পড়তে হবে। আমি ঠাকুর ভরসা করে নিশ্চিন্ত মনে আছি, ঠাকুরের কাছে কিসের ঐ পাহাড়ী ফকির! কিন্তু কি আশ্চর্য, ঠিক তিন দিনের মধ্যে আমার ঘোরতর পেটের অসুখ শুরু হল আর আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে এলুম। তোমার ঠাকুর কিছুই করতে পারলেন না। সামান্য একটা ফকিরের কাছে হেরে গেলেন।'

'বিদ্যা! বিদ্যা মানতে হয় বই কি বাবা!' মা বললেন স্নিগ্ধ স্বরে। 'আমাদের ঠাকুর তো কিছুই ভাঙতে আসেননি, সব মেনে গিয়েছেন। শঙ্করাচার্যও শুনেছি নিজের দেহে ব্যাধি আসতে দিয়েছিলেন। তুমি তো জানো সেই ঠাকুরের খুড়তুতো দাদাকে—'

'কে, হলধারীকে?'

'তিনি একবার ঠাকুরকে শাপ দিয়েছিলেন তোর মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে। তা উঠেছিল সেই রক্ত। তোমার শরীরে অসুখ আসা আর ঠাকুরের শরীরে অসুখ আসা একই কথা।'

'ও সব কিছুই মানি না। তুমি তোমার ঠাকুরের দিকে টেনে কথা কইছ। আসলে তোমার ঠাকুর কিছুই নয়। যাই কেন না বলো আমি আর মানতে রাজী নই।'

মা বললেন, 'না মেনে থাকবার জো আছে কি বাবা! তোমার টিকি যে তাঁর কাছে বাঁধা।'

নরেন হাসতে লাগল।

॥ ১৫৫ ॥

সিদ্ধাই দেখিয়ে কি হবে? হরিপদ তাপহরণের ধাম, সেই দিকে এগুতে পারবে এক পা? জাগাতে পারবে কুলকুণ্ডলিনী? মূলাধারে সেই সর্পীতুল্য শক্তি। পদ্মমৃণালের মধ্যবর্তী তন্তুর মত অতি সূক্ষ্মা, শঙ্খবর্তসমা নবীনচপলার মত দেদীপ্যমানা। ভ্রমরমালার গুঞ্জনের মত আবার অস্ফুট মধুর শব্দ করছে। সেই কূজনকারিণী জীবনদায়িনী শক্তিকে জাগাতে পারবে?

ঠাকুর বললেন, সেই সমুদ্রপারের সাধু ঝড় থামাতে গিয়ে জাহাজডুবি করেছিল। জানো না সেই কাহিনী?

সাধু সিদ্ধ হয়েছে। একদিন বসে আছে সমুদ্রের ধারে, ঝড় উঠল। ঝড়ে তার

খুব অসুবিধে হচ্ছে দেখে সে বলে উঠল, ঝড়, থেমে যা। তার কথা মিথ্যে হবার নয়। বলা মাত্রই ঝড় থেমে গেল। তাতে ফল হল এই, পাল তুলে একটা জাহাজ যাচ্ছিল, হাওয়া বন্ধ হওয়ামাত্রই জাহাজ টুক করে ডুবে গেল। অনেক লোক ছিল জাহাজে, মারা পড়ল। তার জন্যে যে পাপ হল তা বর্তাল এসে সেই সিদ্ধপুরুষে। সিদ্ধাই তো গেলই, নরকবাসের থেকেও রেহাই পেল না। চিনু শাঁখারির কথা মনে আছে? কামার-পুকুরের সেই বুড়ো সাধক, পরম বৈষ্ণব। ছেলেবেলায় যার পায়ে পড়ে বলেছিল রামকৃষ্ণ, ওরে তোদের পায়ে পড়ি, একবার তোরা হরিবোল বল। দেখা হলেই রামকৃষ্ণকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করত আর বলত, ওরে গদাই, তোকে দেখে আমার গৌরকে মনে হয়।

একবার হল কি শোনো। কতকগুলি সাধু ঘুরতে-ঘুরতে কামারপুকুরে একদিন চিনুর বাড়িতে গিয়ে অতিথি হল। তখন আমের সময় নয়, তবু সাধুদের কি বেয়াড়া সাধ, তারা মৌরলা মাছ দিয়ে আমের টক খাবে। চিনু তো মাছ যোগাড় করল, কিন্তু আম কোথায়? অতিথি নারায়ণ, তাদের ইচ্ছা তো আর অপূর্ণ রাখা যায় না। চিনু বিমূঢ়-বিহ্বল হয়ে পড়ল। কেমন করে মুখ রাখি, কেমন করে ধর্মহানি থেকে রক্ষা পাই?

কাতর হয়ে কাঁদতে-কাঁদতে চিনু শেষকালে একটা আমগাছের তলায় এসে দাঁড়াল। গলায় কাপড় দিয়ে মাথা কুটতে-কুটতে বললে, আমার ভিটেয় আজ ছলনা করতে অতিথিরূপে নারায়ণ এসেছেন। এসে বলছেন আম দিয়ে মাছের টক খাবেন। আমি দীনহীন পথের কাঙাল, অসময়ে আম কোথা পাব? কেমন করে তুষ্ট করব তাঁদের? দেবতার যদি দয়া না হয় আমি কি করতে পারি? আশ্চর্য, সত্যি-সত্যি গুটিকতক কাঁচা আম ঝরে পড়ল গাছ থেকে।

ঠাকুর শুনতে পেলেন সেই কাহিনী। চিনুকে বললেন, 'ছি দাদা, বিভূতি, সিদ্ধাই, হ্যাক থুঃ। অমন আর করোনি। তা হলে বেটা-বেটিরা তোমার মাথা খাবে। খবরদার ও-সব আর করতে যেওনি, ও সবে মন দিলে মন নেমে যাবে।' হীনবুদ্ধি লোকেই সিদ্ধাই চায়। ব্যারাম ভালো করা, মোকদ্দমা জেতানো, নদীর উপর দিয়ে চলে যাওয়া, আগুনের উপরে দাঁড়িয়ে থাকা, আরেক দেশে কে কি বলল তাই ঠিক বলতে পারা—এই সব ইন্দ্রজাল। এই সবে আছে কি! প্রতিষ্ঠা আর লোকমান্য হতে পারে, কিন্তু সে বন্ধনে পড়ে মন সচ্চিদানন্দ থেকে দূরে সরে পড়ে। যারা শুদ্ধ ভক্ত তারা ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া আর কিছু চায়না।

সত্যিকারের সাধুর লক্ষণ কি ?

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, তিতিক্ষু। সত্যই যার বল, যার ভিত্তি, সর্বজীবে অসূয়া-হীন। সর্বোপকারক। বিষয়ে অক্ষুব্ধ, সংযত, মৃদু, শুচি আর অকিঞ্চন। অনিচ্ছুক, বিত্তত্যাগী, শান্ত, স্থির আর শরণাগত। অপ্রমত্ত, গভীরাত্মা আর যে ষড়্‌গুণ জয় করেছে। নিজে মানাকাঙ্ক্ষী নয়, বরং অমানীমানদ, দক্ষ, অবঞ্চক, কারুণিক আর কবি অর্থাৎ সম্যকবোদ্ধা।

আর ভক্তের লক্ষণ কি ?

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, আমার বিগ্রহ ও আমার ভক্তকে দর্শন স্পর্শন অর্চন আর পরিচর্যা। স্তুতি আর গুণকর্মের অনুকীর্তন। আমার কথা শুনতে শ্রদ্ধা, আমাকে অনুধ্যান। আমাতে লব্ধ বস্তুর সমর্পণ, দাস্যভাবে আত্মনিবেদন। আমার জন্মকর্মকথন, আমার পর্বানুমোদন। অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব আর নিজে সে কি করেছে তার পরিকীর্তনে অস্পৃহা।

এই ভক্তি লাভ হবে কি করে ?

একমাত্র সাধুসঙ্গে।

সর্বামঙ্গলনাশক সাধুসঙ্গ।

যোগ, সাংখ্যধর্ম, স্বাধ্যায়, তপস্ত্যাগ, পূর্ত, দান, ব্রত, যজ্ঞ, ছন্দ, মন্ত্র, তীর্থ, নিয়ম কিছুই আমাকে বশীভূত করতে পারে না, যেমন পারে সাধুসঙ্গ। তুমি শুধু সাধু হও, আমি তোমার সঙ্গী হব। তুমি শুধু মধুর হও, আমার সঙ্গে তোমার অপরিচ্ছিন্ন মৈত্রী।

বৃত্র, প্রহ্লাদ, বৃষপর্বা, বলি, বাণ, ময়, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান, জটায়ু আর কুব্জা—এদের কি ছিল ? এরা বেদ পাঠ করেনি, উপাসনা করেনি, এদের ব্রত ছিল না। তপস্যা ছিল না, শুধু নিজ সঙ্গ দ্বারা, শুধু সাধুসঙ্গহেতু পেয়েছিল আমাকে।

আর ব্রজাঙ্গনারা ?

তাদের কিছু নেই, আছে একমাত্র ভগবদ্‌বিরহ। একমাত্র ভগবদ্‌বিরহ থেকেই একান্ত ভক্তিলাভ হয়। মহাভাগ্যবতী বলে ব্রজাঙ্গনাদের তাই সম্বোধন করল উদ্ধব। বলল, বিরহে তোমরা শ্রীকৃষ্ণে সর্বাত্মভাবে অধিকৃত হয়েছ। অস্পর্শ-সমুদ্রে মগ্ন আছ সর্বক্ষণ। তোমরা ছাড়া আর কার এমন মহাভাগ্য ! মুনিদুর্লভা ভক্তির তোমরাই জন্মভূমি।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন উদ্ধবকে, আমার সঙ্গকালে গোপবালারা এক রাত্রিকে ক্ষণার্ধ বলে মনে করেছে। আর অক্রূর এসে যখন আমাকে মথুরায় নিয়ে গেল, তখন

আমার বিরহে তাদের এক রাত্রিকে মনে হয়েছিল এক কল্প। নদী যেমন সমুদ্রে মিশে পৃথক অস্তিত্ব হারায় তেমনি তারাও আমাতে মিশে নিজেদের হারিয়েছিল। পুত্র পতি দেহ স্বজন ভবন—কোনো দিকে তাকায়নি। কিন্তু কী তাদের সম্বল? তারা না বুঝেছে আমার তত্ত্ব, না বা আমার স্বরূপ। তাদের একমাত্র ধন ভক্তি। উদ্ধব, তুমি শ্রুতি স্মৃতি প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সব ছেড়ে একনিষ্ঠ ভক্তি নিয়ে আমার শরণ নাও, তাহলে আর তোমার ভয় নেই।

'মহাত্মা শ্রীপতি আপ্তকাম পুরুষ,' বলছে গোপীরা: 'বনবাসিনী আমাদের দিয়ে তাঁর কী প্রয়োজন? স্বৈরিণী পিঙ্গলার মত যদিও আমরা জানি, নৈরাশ্যই পরম সুখ, তবু শ্রীকৃষ্ণেই আমাদের দুরত্যয়া আশা। তাঁর বার্তার জন্যে কে নিরুৎসুক থাকতে পারে? তাঁর সেবাধন্য সেই সরিৎ, শৈল, বনোদ্দেশ-গাভী, বেণুরব, তাঁর শ্রীনিকেতনস্বরূপ পদাঙ্ক বারে-বারে তাঁকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। তাঁর সেই ললিত গতি, উদার হাস্য, লীলাবলোকন আর মধুর বচনে আমরা হৃতধী। তাঁকে ভুলি কি করে? হে নাথ, হে রমানাথ, হে ব্রজগত, হে আর্তিনাশন, দুঃখনিমগ্ন গোকুলকে উদ্ধার করো।'

কোথায় বনচরী গোপী, কোথায় বা শ্রীকৃষ্ণে নিশ্চল স্নেহ! কিন্তু বস্তুশক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা করে না। ওষধিশ্রেষ্ঠ অমৃতকে যে জানে না সেও যদি তা আস্বাদ করে, পায় তার শ্রেয়োফল। তেমনি গোপীরা জানে না কার সঙ্গ করেছে, কিন্তু ফল পেয়েছে হাতে-হাতে।

আমাদের কিছু জেনে দরকার নেই। বলছে ব্রজবালারা, আমাদের মনোবৃত্তি কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয় হোক। আমাদের কথা তাঁরই নামাভিধায়িনী হোক। আমাদের কায় ভূলুণ্ঠিত হয়ে তাঁকে প্রণাম করুক। মঙ্গলাচরিতে হোক, কর্মচক্রে ভ্রাম্যমাণ হতে-হতেই হোক, যেখানেই থাকি তাঁর ইচ্ছায় তাঁর প্রতি আমাদের অনুরাগ যেন অচঞ্চল থাকে।

গোপীদের প্রণাম করল উদ্ধব। প্রার্থনা করল, গোপীদের চরণরেণুসেবী বৃন্দাবনের গুল্ম-লতা ওষধির মধ্যে আমি যেন একটা কিছু হই। যাদের হরিকথাচরিত ত্রিলোক পবিত্র করেছে সেই নন্দব্রজস্ত্রীদের পদরেণু আমি বারে-বারে বন্দনা করি।

ভক্তিই মুখ্য।

কর্মমীমাংসক বলে, ধর্মই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। কাব্যালঙ্কারিক বলে, যশই উদ্দেশ্য। বাৎসায়ন বলে, কামই উদ্দেশ্য। যোগশাস্ত্রকার বলে, সত্য আর শম-দমই উদ্দেশ্য। দণ্ডনীতিকৃৎ বলে, ঐশ্বর্যই উদ্দেশ্য। চার্বাক বলে, আহার ও

মৈথুনই উদ্দেশ্য। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভক্তি, যাকে আশ্রয় করলেই ঈশ্বরদর্শন।

'ভক্ত পারমেষ্ঠ্য চায় না, মহেন্দ্রলোক চায় না, কিছু চায় না, শুধু আমাকে চায়।' বললেন শ্রীকৃষ্ণ। 'যোগ, সাংখ্য, ধর্ম, স্বাধ্যায়, তপস্যা, ত্যাগ, কিছুতেই আমাকে তত বশীভূত করতে পারে না, যেমন পারে ভক্তি, উর্জিতা ভক্তি।' ভক্তের জাত নেই। তাদের শ্রেষ্ঠ বর্ণ।

'প্যারে আ যাও, প্যারে আ যাও!' গেঁড়াতলার মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে এক মুসলমান ফকির আর্তনাদ করছে।

এই আর্তনাদের সুরটি ভালবাসার। মনস্তুষ্ময় ব্যাকুলতার।

কাকে ডাকছে অমন গলা বাড়িয়ে? কাকে বুকে ধরবার জন্যে মেলে ধরেছে দুই বাহু?

একটা ছ্যাকরা গাড়ি এসে দাঁড়াল না? কে একজন যেন নামল গাড়ি থেকে! এ কি, শ্রীরামকৃষ্ণ না?

'প্যারে আ যাও, প্যারে আ যাও।' মুসলমান ফকির প্রেমগদগদস্বরে অথচ তীক্ষ্ণ আর্তি নিয়ে ডাকতে লাগল।

ঠাকুর কালীঘাট থেকে ফিরছেন দক্ষিণেশ্বরে। পথে এসেছেন মৌলালি। ফকিরকে দেখে যেতে। বুক ভরে নিতে তার ভক্তগাত্রস্পর্শ।

'প্যারে আ যাও, প্যারে আ যাও।'

মুসলমান ফকির আর শ্রীরামকৃষ্ণ পরস্পরের প্রেমালিঙ্গনে বাঁধা পড়লেন।

তপস্যার কি দরকার? হরি যদি অন্তরে বাহিরে থাকেন তাহলে তপস্যা নিরর্থক, যদি না থাকেন তাহলে আরো নিরর্থক। তাই তপস্যা থেকে বিরত হও। শুধু ভক্তিলাভ করো, সুপক্কা ভক্তি। এই ভক্তি-কাটারি দিয়েই ভবনিগড় ছেদন হবে।

জীবকোটি আর ঈশ্বরকোটি।

জীবকোটি ভক্তি ধরে সমাধিতে আসে। আর ঈশ্বরকোটি নিত্যসিদ্ধ, নির্বিকল্প, সুসমাহিত। যেমন শুকদেব।

'বিষ্ণু পাঠালেন নারদকে, শুকদেবকে নিয়ে এস, পরীক্ষিতকে ভাগবত শোনাতে হবে।' বলছেন ঠাকুর। 'নারদ এসে দেখে শুকদেব সমাধিস্থ, জড়ের মত বসে আছে বাহ্যশূন্য হয়ে। তখন বীণা বাজাতে শুরু করল নারদ। চারশ্লোকে বর্ণনা করতে লাগল হরির রূপ। প্রথম শ্লোকে শুকদেবের রোমাঞ্চ, দ্বিতীয় শ্লোকে অশ্রু, তৃতীয় আর চতুর্থ শ্লোকে একেবারে চিন্ময় রূপদর্শন।' জন্মগ্রহণমাত্র ব্রহ্মচারী ও সমাহিতচিত্ত এই শুকদেব। সরহস্য বেদ ও বেদাঙ্গ

সমুদায় তার হৃদয়ে দেদীপ্যমান, তবু সুরগুরু বৃহস্পতির কাছে গেল ইতিহাস ও রাজশাস্ত্র পড়তে। সর্বলোকের মাননীয় হয়ে উঠল। কিন্তু কিছুতেই শান্তি নেই। নিখিল যোগশাস্ত্রে পারঙ্গম হয়েও নয়। মোক্ষ ছাড়া শান্তি নেই কিছুতেই। ব্যাসকে গিয়ে বললে, 'বাবা, আপনি মোক্ষধর্মকুশল, কিসে আমার চিত্ত প্রশান্ত হবে তার উপদেশ করুন।'

ব্যাস বললে, 'তুমি মিথিলাধিপতি জনকের কাছে যাও, তিনিই উপদেশ করবেন।'

শুকদেব তক্ষুনি বেরিয়ে পড়বার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। ব্যাস তাকে বাধা দিয়ে বললে, 'স্বীয় প্রভাববলে অন্তরীক্ষ পথ দিয়ে যেও না, সাধারণ মানুষের মত পায়ে হেঁটে উপনীত হবে। পথে কিছুমাত্র সুখ বা স্বসম্পর্কীয় লোকের খোঁজ করবে না, করলেই বদ্ধ হবে সঙ্গপাশে। জনক আমাদের যজমান জেনে কিছুমাত্র অহঙ্কার দেখাবে না, সব সময়ে তাঁর বশবর্তী হয়ে থাকবে। দেখবে তিনিই তোমার সমস্ত সংশয় ছেদন করবেন।'

পায়ে হেঁটে যাত্রা করল শুকদেব। পাহাড় নদী তীর্থ সরোবর শ্বাপদাকীর্ণ অটবী পার হল একে-একে। সুমেরুশৃঙ্গ থেকে শুরু করে চীন-হূন দেশ দেখে ইলাবৃত বর্ষ, হরিবর্ষ ও হৈমবতবর্ষ পেরিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করল। কত রমণীয় পত্তন, কত সমৃদ্ধিশালী নগরী, কত মনোহর উদ্যান-উপবন চোখে পড়ল, কিন্তু চিত্ত কিছুতেই সমাকৃষ্ট হল না। কত অন্নপানীয় আর ভোজন, ধান্য ও গোধূম, কত সুশোভিত ঘোষপল্লী, কত খেচর-জলচর পাখি, কত রূপবতী পদ্মিনী কামিনী, কিন্তু কিছুতেই চিত্তবিকার ঘটল না। মনে শুধু এক চিন্তা, মোক্ষচিন্তা। মিথিলার রাজভবনের প্রথম কক্ষায় প্রবেশ করা মাত্র দ্বারপালেরা কঠোর বাক্যে নিবারণ করল শুকদেবকে। অপমানেও কিছুমাত্র ব্যথা পেল না শুকদেব, মধ্যাহ্নকালীন সূর্যের মত দাঁড়িয়ে রইল একাকী। দারোয়ানদের মধ্যে একজন তাকে বন্দনা করে ঢুকিয়ে দিল দ্বিতীয় কক্ষায়। আগের মহলে ছিল রোদ এ মহলে ছায়া। কি রোদ কি ছায়া, শুকদেবের কাছে সমতুল্য। মন্ত্রী এসে শুকদেবকে নিয়ে গেল তৃতীয় কক্ষায়। এখানে পুষ্পিত পাদপ আর কেলিসরোবর শোভা পাচ্ছে। এর নাম প্রমদাবন, মিথিলার অমরাবতী। মুহূর্তমধ্যে মন্ত্রী অদৃশ্য হয়ে গেল আর উপস্থিত হল পঞ্চাশজন বারাঙ্গনা। সকলেই তরুণবয়স্কা ও প্রিয়দর্শনা, আলাপকুশলা ও নৃত্যগীতনিপুণা। পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়ে পূজা করে সুস্বাদু অন্ন নিবেদন করল শুকদেবকে। মনে মোক্ষচিন্তা নিয়ে আহার করল শুকদেব। হৃদয়জ্ঞা কামদক্ষা বারবিলাসিনীরা

শুকদেবকে নিয়ে প্রমদাবন দেখিয়ে বেড়াতে লাগল আর সর্বক্ষণ মেতে রইল হাস্যগীতে নৃত্যক্রীড়ায়, কিন্তু জিতেন্দ্রিয় বিশুদ্ধাত্মা শুকদেব কিছুতেই হৃষ্ট বা বিরক্ত হল না।

সন্ধ্যা হলে বারবনিতারা শুকদেবকে আসন ও শয়ন দিলে। মহামূল্য আস্তরণ-সমাস্তীর্ণ রত্নজালভূষিত আসনশয়ন। আসনে বসে ধ্যাননিরত হয়ে পূর্বরাত্র কাটিয়ে দিল শুকদেব। মধ্যরাত্রি সুশান্ত নিদ্রায় যাপন করলে। শেষ রাত্রে উঠে শৌচক্রিয়া সেরে আবার ধ্যাননিমগ্ন হল।

ধ্যানে ও সুষুপ্তিতে সর্বসময়েই তাকে ঘিরে বসেছিল বারবনিতারা, কিন্তু শুক-দেবের মন বিচলিত হল না।

পরদিন জনক নিজে এসে গুরুপুত্রের সংকার করলে। মাটিতে বসে করজোড়ে জিগগেস করলে, 'কি হেতু আগমন?'

'আমি পিতার আদেশে সংশয়নাশের জন্যে আপনার কাছে এসেছি। মোক্ষতত্ত্ব কিরূপ আমাকে তা বলুন।'

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান ছাড়া মোক্ষলাভ অসম্ভব। আবার গুরু ছাড়া জ্ঞান লাভের আশা নেই।' বললে জনক। 'আচার্যই সংসার-সাগরের কর্ণধার আর জ্ঞান প্লবস্বরূপ। সুতরাং গুরুর থেকে জ্ঞান লাভ করে সংসারসাগর উত্তীর্ণ হয়ে জ্ঞান আর গুরু উভয়কেই পরিত্যাগ করবে। কর্মকাণ্ডের উচ্ছেদ যাতে না হয় তারই জন্যে ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। একে-একে চার আশ্রমের ধর্ম পালন করে কর্মের শুভাশুভ ফল ত্যাগ করতে পারলেই মোক্ষপ্রাপ্তি।'

'কিন্তু ব্রহ্মচর্যাশ্রমেই কি মোক্ষলাভ হতে পারে না?' অস্থির হয়ে জিগগেস করল শুকদেব।

'কেন পারবে না?' জনক তাকে আশ্বস্ত করল: 'বহু জন্মের সাধনায় ইন্দ্রিয় যার বশীভূত হয়েছে, যার চিত্ত-বিশুদ্ধি হয়েছে, তার ব্রহ্মচর্যাশ্রমেই মোক্ষলাভ হয়ে থাকে। আর একবার ব্রহ্মচর্যাশ্রমে মোক্ষলাভ হলে আর গার্হস্থ্যাদি আশ্রম গ্রহণের প্রয়োজন থাকে না।'

নির্ভয় হল শুকদেব।

জনক তারপর বলতে লাগল: জলচর যেমন জলে থেকেও জলে লিপ্ত হয় না, তেমনি সকল প্রাণীতে নিজেকে ও নিজের মধ্যে সকল প্রাণীকে অবস্থিত দেখেও নির্লিপ্তভাবে কালযাপন করবে। সর্বত্র একমাত্র পরমাত্মাকে দর্শন করবে। যে অন্যকে ভয় দেখায় না, নিজেও ভীত হয় না, যে এককালে কাম ও ক্রোধ ত্যাগ

করেছে, যে করেছে সম্পূর্ণ বৈরভাব বর্জন, যার মনে নেই আর মোহকারিণী ঈর্ষা, প্রিয়-অপ্রিয় কথা শুনে বা প্রিয়-অপ্রিয় বস্তু দেখেও যার আহ্লাদ বা শোক নেই, স্তুতি-নিন্দা, লৌহ-কাঞ্চন, সুখ-দুঃখ শীত-গ্রীষ্ম অর্থ-অনর্থ জীবন-মরণ যার কাছে সমান, সেই পরমার্থ ব্রহ্মপদার্থ লাভ করে। যেমন দীপ দ্বারা অন্ধকার ঘর প্রকাশিত হয় তেমনি জ্ঞান দ্বারা লক্ষিত হয় পরমাত্মা। তোমার ভয় কি? তুমি ছিন্ন সংশয়, দেহাভিমানশূন্য। বিজ্ঞানসম্পন্ন স্থিরবুদ্ধি ও নির্মলনির্লোভ। সুখ দুঃখ লাভ ক্ষতি নৃত্যগীতে-অনুরাগ বন্ধুস্নেহ শত্রুভয় ও ভেদবুদ্ধি তোমার অন্তর থেকে তিরোহিত হয়েছে। তুমি যে অনাময় পরম পথ আশ্রয় করেছ সে পথই একমাত্র পথ।'

আত্মসাক্ষাৎকার হল শুকদেবের। হিমালয়ের পুব দিকে পিতার কাছে সে ফিরে গেল। সেখানে নারদের সঙ্গে দেখা। শুকদেব জিগগেস করল, 'দেবর্ষি, ইহলোকে কি হিতকর, আপনি আমাকে উপদেশ করুন।'

নারদ বললে, 'বৎস, বিদ্যার তুল্য চক্ষু নেই, সত্যের তুল্য তপস্যা নেই, আসক্তির তুল্য দুঃখ নেই, ত্যাগের তুল্য সুখ নেই। ক্রোধ থেকে তপস্যাকে, মাৎসর্য থেকে শ্রীকে মানাপমান থেকে বিদ্যাকে এবং প্রমাদ থেকে আত্মাকে সতত রক্ষা করবে। আনৃশংস্যই পরম ধর্ম। ক্ষমাই পরম বল। আত্মজ্ঞানই পরম জ্ঞান। আর সত্যের সমান পরম আর কিছু নেই। কিন্তু সত্যের চেয়েও হিতবাক্যই বেশি বলবে। আমার মতে, যে বাক্য দ্বারা জীবের মঙ্গল হয়, তাই সত্যবাক্য। কোনো প্রাণীর হিংসা করবে না, সকলের প্রতি মিত্রতুল্য ব্যবহার করবে, এই দুর্লভ মানবজন্ম পেয়েছ, তবে আবার কার সঙ্গে শত্রুতা? অনৈশ্বর্য, নিত্যসন্তোষ, নিস্পৃহত্ব ও অচাপল্যই পরম শ্রেয়। যে মরেছে বা যা নষ্ট হয়েছে তার জন্যে শোক করা মানে দুঃখ থেকেই দ্বিগুণতর দুঃখ টেনে নেওয়া। সুতরাং চিন্তা না করাই দুঃখ নিবারণের মহৌষধ।

'জ্ঞানতৃপ্ত হও। চারদিকে সুখাসক্ত জনতার মধ্যে একাকী অবস্থান করো। সংসার নদী অতি ভীষণ। রূপ এই নদীর কূল, মন এর স্রোত, স্পর্শ এর দ্বীপ, রস এর প্রবাহ, গন্ধ এর পঙ্ক আর শব্দ এর জলস্বরূপ। আর নৌকো তোমার এই শরীর, ক্ষমা তার ক্ষেপণী, দয়া তার বায়ু, ধর্ম স্থৈর্য, আকর্ষণ রজ্জু। এই শরীর-নৌকায় নদী পার হয়ে যাও। তপোবলে সংসারবন্ধ থেকে বিমুক্ত হয়ে অনন্তসুখসংবর্ধনী সিদ্ধি লাভ করো।

'আর দেখ, যখন দৈবপ্রভাবে লোকের দুঃখ আসে তখন কি পৌরুষ কি প্রজ্ঞা কি নীতিবল কিছুতেই তার নিবারণ করা যায় না। তবু স্বভাবত সর্বদা

সাবধান থাকবে। জীবিততৃষ্ণাপরায়ণ দেহ, সর্বদাই তার ক্ষয় হচ্ছে। সূর্য নিজে অজর কিন্তু পর্যায়ক্রমে সমুদিত ও অস্তমিত হয়ে জীবের সুখদুঃখ জীর্ণ করছে, ইষ্টানিষ্টকে সহচর করে রাত্রিও পালিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। চেয়ে দেখ ক্রিয়াফল কিছুই তোমার হাতে নেই। তা যদি হত তোমার সব বাসনাই সব উদ্যোগেই তুমি সিদ্ধ করতে পারতে। কত নিয়মধারী কার্যদক্ষ মতিমান লোক সৎকর্ম থেকে পরিভ্রষ্ট হয়ে ফল লাভে বঞ্চিত হয়, আবার কত নির্গুণ নরাধম মূর্খও উৎকৃষ্ট ফল পায়। কত লোক সর্বদা হিংসা ও বঞ্চনা করেও পরম সুখে কালাতিপাত করে, আর কত সাধু বিবিধ বিচিত্র সৎকর্মের অনুষ্ঠান করেও অসমর্থ ও অকৃতকাম।

'লোকে রোগাক্রান্ত হয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়, আবার সে চিকিৎসকও কালক্রমে ব্যাঘ্রপীড়িত মৃগের মত রোগের কবলে গিয়ে পড়ে। ধন, রাজ্য বা তপস্যা দিয়েও কেউই স্বভাবকে অতিক্রম করতে পারে না। শুধু কামনানিবন্ধনই যত ক্লেশ ভোগ। তুমি মোহবিহীন হয়ে প্রথমত জ্ঞানবলে ধর্ম ও অধর্ম, সত্য ও মিথ্যা পরিত্যাগ করে পশ্চাৎ জ্ঞানকেও পরিত্যাগ করো।' তথাস্তু।

শুকদেব স্থির করলেন যোগবলে কলেবর ত্যাগ করে বায়ুভূত হয়ে তেজোরাশিপরিপূর্ণ অর্কমণ্ডলে প্রবেশ করব। তার আগে একবার পিতার সঙ্গে দেখা করে যাই।

ব্যাসকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে দাঁড়াল শুকদেব।

নিত্য-স্নানের উদ্দেশে যোগানুষ্ঠান করতে যাবে শুনে ব্যাস চঞ্চল হয়ে উঠল। বললে, 'তুমি কিছুক্ষণ আমার কাছে থাকো, তোমাকে দেখে আমার চক্ষু চরিতার্থ হোক।'

স্নেহশূন্য সংশয়মুক্ত শুকদেব পিতার বচনমাধুর্যে বিচলিত বা বিগলিত হল না। পিতাকে ত্যাগ করে সিদ্ধনিষেবিত কৈলাস পর্বতে চলে গেল।

ব্যাকুল হয়ে পুত্রকে অনুসরণ করতে লাগল ব্যাস আর সরোদনে 'শুক' বলে আহ্বান করতে লাগল। সর্বগামী সর্বতোমুখ শুকদেব স্থাবরজঙ্গম অনুনাদিত করে প্রত্যুত্তর করল, 'ভোঃ'। সেই অবধি সমুদয় বিশ্বমধ্যে এই একাক্ষর 'ভোঃ' প্রচলিত হল। আজও গিরিগহ্বর প্রভৃতি স্থানে শব্দ করলে ঐ একাক্ষর প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

শব্দাদিগুণকেও অতিক্রম করল শুকদেব। বৃক্ষপদে প্রবেশ করে অন্তর্হিত হয়ে গেল। হিমালয়প্রস্থ দেশে ব্যাস পুত্রের অনুধ্যান করতে বসল। কাছেই

মন্দাকিনীতীরে স্নানরতা বিবস্ত্রা অপ্সরারা বিরাজ করছিল, ব্যাসকে দেখে ত্রস্ত ও লজ্জিত হয়ে কেউ জলে ডুবল, কেউ লতাগুল্মের অন্তরালে পালাল, কেউ-কেউ বা ত্বরান্বিত হয়ে টেনে নিল ত্যক্ত বাস। ব্যাস বুঝল, তার পুত্রই মুক্ত আর তার নিজেরই বিষয়কলুষ। যুগপৎ হর্ষ ও লজ্জায় অভিভূত হল ব্যাস।

পুত্রশোকার্ত পিতার কাছে পিনাকপাণি শঙ্কর আবির্ভূত হল। বললে, মহর্ষি, তুমি আমার কাছে অগ্নি, বায়ু, জল, ভূমি ও আকাশের মত বীর্য-সম্পন্ন পুত্র প্রার্থনা করেছিলে, আমি তোমার সে প্রার্থনা পূর্ণ করেছিলাম। তোমার সেই পুত্র দেবদুর্লভ পরমগতি লাভ করেছে, তবে তোমার কিসের দুঃখ? তোমার ও তোমার পুত্রের অক্ষয়কীর্তি চিরকাল ঘোষিত হবে। আর মহামুনি, তোমাকে এই বর দিচ্ছি, এই ভূমণ্ডল মধ্যে সর্বদা সর্বস্থানে তুমি তোমার পুত্রের ছায়া দেখতে পাবে। এই দেখ।

শুকদেবের ছায়া এসে দাঁড়াল।

'একমতে আছে, শুকদেব সেই ব্রহ্ম-সমুদ্রের একটি বিন্দুমাত্র আস্বাদ করেছিলেন।' বললেন ঠাকুর, 'সমুদ্রের হিল্লোল-কল্লোল দর্শনশ্রবণ করেছিলেন, কিন্তু ডুব দেন নাই সমুদ্রে।'

হিমালয়ের ঘরে পার্বতীর জন্ম। পিতাকে তার নানা রূপ দেখাতে লাগল পার্বতী। হিমালয় বললে, 'মা, এসব রূপ তো দেখলাম, কিন্তু তোমার যে একটি ব্রহ্মস্বরূপ আছে, সেইটি একবার দেখাও।'

পার্বতী পাশ কাটাতে চাইল। বললে, 'বাবা, যদি ব্রহ্মজ্ঞান চাও, তাহলে সংসার ত্যাগ করে সাধুসঙ্গ করতে হবে।'

ঠাকুর বললেন, 'হিমালয় জানে না সে দর্শনের মানে কি।'

কিছুতেই ছাড়বে না হিমালয়। তখন পার্বতী একবার দেখাল।

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'দেখামাত্রই গিরিরাজ মূর্চ্ছিত।'

ব্রহ্মজ্ঞানের পরেও শরীর রাখতে পারে কে? একমাত্র অবতার। তাও শুধু লোকশিক্ষার জন্যে।

॥ ১৫৬ ॥

অত-শতয় দরকার কি? শুধু সরল হয়ে যাও।

'সরলের কাছে তিনি খুব সহজ।' বলছেন ঠাকুর।

কিন্তু সরল হওয়া কি সহজ কথা?

pathagar.net

বঙ্কিম চাটুজ্জেকে বলছেন, 'কপট হয়েছ কি, তিনি দূরে সরে গিয়েছেন। সেয়ানাবুদ্ধি পাটোয়ারিবুদ্ধি বিচারবুদ্ধি করতে গিয়েছ—অমনি তিনি বেপাত্তা।'

সরলভাবে ডাকলে তিনি শুনবেন। একবার দেখ না ডেকে। ছেলে যেমন মাকে না দেখে দিশেহারা হয়, মেঠাই-সন্দেশে ভোলে না, কেবল মা-মা করে, তেমনি করে একটু ডাকো না। একবার আন্তরিক কাতর হও না মায়ের জন্যে। দেখ না মা আসে কিনা ছুটে। একটি নির্ভুল সরলরেখার মত।

'তাই তো ছোকরাদের এত ভালবাসি।' ডাক্তারকে বলছেন ঠাকুর। 'যেন নতুন হাঁড়ি, দুধ নিশ্চিন্ত হয়ে রাখা যায়। আর বিষয়ী লোকেরা হচ্ছে দই-পাতা হাঁড়ি, দুধ রাখলেই নষ্ট। তা, তোমার ছেলেটি বেশ। এখনো বিষয়বুদ্ধি কামিনীকাঞ্চন ঢোকেনি।'

'বাপের খাচ্ছেন কিনা তাই।' ডাক্তার পরিহাস করল। 'নিজের করতে হলে দেখতুম বিষয়বুদ্ধি ঢোকে কিনা।'

'তা বটে।' বললেন ঠাকুর, তবে কি জানো, ঈশ্বর বিষয়বুদ্ধির থেকে দূর, নইলে একেবারে হাতের মধ্যে।'

সরলভাবে ডাকলে তিনি দেখা দেবেনই দেবেন।

এক যাত্রাওয়ালা দেখা করতে এসেছে, তাকে বলছেন, 'শোনো, আরেকটি কথা। যাত্রাশেষে কিছু হরিনাম করে উঠো। তাহলে যারা গায় আর যারা শোনে সকলেই একটু ঈশ্বর ভাবনা করতে-করতে যে যার বাড়ির দিকে রওনা হবে।'

যাত্রারম্ভে তো করোনি যাত্রাশেষে করো হরিনাম। পরিণামে হরিনাম। কিন্তু সমস্ত পথ ধরে করে না এলে কি শেষ কালে মনে পড়বে?

তাই সরল হয় শেষ জন্মে। 'শেষ জন্মে খ্যাপাটে ভাব।' বললেন ঠাকুর, 'বহু জন্মের তপস্যার পরেই সরল-উদার হওয়া চলে।'

তবে এ জন্মের উপায় কি?

খুব করে বালকের সঙ্গে মেশ। বালক ভাব আরোপ করো নিজের মধ্যে। যতক্ষণ বালকদের সঙ্গে মিশবে ততক্ষণ তুমি নিজেও বালক, নিজেও আত্মভোলা। বালকের মতই তুমি সরল, বালকের মতই তুমি বিশ্বাসী। শিখবে কি করে আখখুটে হতে হয়, কান্না জুড়ে ছুঁড়তে হয় হাত-পা, মায়ের কোল পেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যেতে হয়।

দুটি সন্তানবতী গৃহস্থবধূ দর্শন করতে এসেছে ঠাকুরকে। দুটি জা, একই

পরিবারের। এসেছে মাথায় ঘোমটা দিয়ে। নম্রশ্রীতে বসেছে ঠাকুরের কাছে।
'শোনো, শিবপুজো করবে।' বললেন ঠাকুর।
সর্বভূতাত্মা সর্বলোককৃৎ সর্ববিগ্রহ শিব। সর্ববাসী সর্বচারী সর্বকালপ্রসাদ। দেখবে স্ফটিকশুভ্র শিব বসে আছেন পদ্মাসনে। কাঁধে-গলায় সাপ গর্জন করছে, মাথার জটায় কুল-কুল করছে গঙ্গা। চূড়ায় শশধরের মুকুট।
'ঠাকুর পুজোর কাজ অনেকক্ষণ ধরে করবে। অনেকক্ষণ ধরে।' তাদের বলতে লাগলেন ঠাকুর। 'এই প্রথম ফুল তুললে, পাতা বাছলে, মালা গাঁথলে, অনেকক্ষণ—অনেকক্ষণ ধরে। তারপর ঠাকুরের বাসন মাজলে, চন্দন ঘষলে, ঠাকুরের জলখাবার সাজালে। এ সব যে কাজ করছ এও ঠাকুর পুজো। দু জায়ে যে কথা কইবে তাও ঠাকুরের কথা। তখন কোথায় সংসারের হীন-বুদ্ধি, রাগদ্বেষ, ক্ষুদ্রতা-হীনতা! তখন শুধু তেলের ধারার মত আনন্দের ধারা।' যখন বাসন মাজবে, মনে করবে চিত্তমার্জনা করছ। যখন চন্দন ঘষবে, মনে করবে নিজেকে নির্মল করে কোমল করে নিঃশেষ করে মিলিয়ে দিচ্ছ ঈশ্বরে। পুজোর আয়োজনও পুজো। প্রেমের আয়োজনই প্রেম।
'আমাদের কি একটু কিছু বলে দেবেন?' বড় বউটি জিগগেস করল।
'কি, মন্ত্র?'
দু-চোখে সস্মিত ভরে তাকাল বউটি।
'কিন্তু আমি তো মন্ত্র দিই না। মন্ত্র নিলে শিষ্যের সব পাপ-তাপ নিতে হয়। মা আমাকে বালকের অবস্থায় রেখেছেন।'
বউদুটি কি একটু বিমর্ষ হল?
ঠাকুর আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'তোমাদের যে ভাবে পুজো করতে বলে দিলাম তাই কোরো, ভাবনা কি। তা ছাড়া হরিনাম যে করতে বলেছিলাম তা হচ্ছে?'
ঘাড় হেলিয়ে সায় দিল বউদুটি।
'তবে আর কথা নেই।'
সর্বদা নাম করবে। নামে ভাসবে নামে ডুবে থাকবে। দেখবে নিশ্বাস-প্রশ্বাসে নাম হবে। দেখবে ঘুমেও নাম ছাড়া নও। নামে যদি একবার আনন্দ হয় তাহলে আর কিছু করতে হয় না। করবার দরকারও হয় না। শুধু নাম নিয়ে পড়ে থাকলেই যথেষ্ট। শুধু যথেষ্ট নয়, যথাতিরিক্ত।
'তোমরা উপোস করে এসেছ বুঝি?' ঠাকুর চঞ্চল হয়ে উঠলেন।
বউ দুটি চুপ করে রইল।

'উপোস করে এসেছ কেন? মেয়েরা আমার মা'র এক-একটি রূপ। তাই তাদের একটু কষ্টও আমি দেখতে পারি না। খেয়ে আসবে, আনন্দে থাকবে। ওরে রামলাল!'

রামলাল এসে হাজির।

'ওরে বউছুটিকে বসা। একটু জল খাওয়া।'

ফলহারিণী পূজার প্রসাদ, লুচি আর নানারকম ফল মিষ্টি এনে দিল রামলাল। গ্লাস ভরে এনে দিল চিনির পানা।

'আহা-হা, তোমরা কিছু খেলে, আমার প্রাণটা শীতল হল।' ঠাকুর বললেন সতৃপ্তনেত্রে। 'ওগো, মেয়েদের উপবাসী আমি দেখতে পারি না।'

আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী, জ্ঞানী—আমি তো কিছুই নই। শুনেছি ঐচারটেরকমই নাকি বৈধী ভক্তির চার উপায়। তা হলে আমার কী উপায় হবে? কিন্তু কী তুমি জিগগেস করি! আমি কাঙাল, দীনহীন। বটে? তাহলে তো আর ভাবনা নেই, তাহলেই তো তুমি প্রভূতবিত্ত। নিজেকে দীনহীন কাঙাল মনে করে ঈশ্বরের পা ধরে পড়ে থাকো, দেখবে কখন ভক্তি এসে গিয়েছে। শুধু ধরে থাকো, শুধু পড়ে থাকো। শুধু ভরে থাকো। শুকনো লাগছে কাঠ-কাঠ লাগছে, বিরস-বিস্বাদ লাগছে, তবু নাম করে যাও। যত বিরক্তির সঙ্গেই খাও না ওষুধ তার কাজ করবেই। তেমনি নামের বস্তুগুণ সর্বাবস্থায় কার্যকর। বস্তুগুণ কি অবস্থার অপেক্ষা করে?

সংসারে জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে। সবাই মনমরা, হৃতসর্বস্বের মত চেহারা। মুখে হাসি নেই, প্রাণে স্ফূর্তি নেই। কেন, কিসের দুঃখ? নামের নেশা ধরো! দেখ আনন্দ আসে কিনা উজান ঠেলে। ধুয়ে-পাখলে যায় কিনা তোমার ঐ রোদজ্বলা মুখের চেহারা।

গঙ্গুর মা'র বাড়িতে এসেছে ঠাকুর। রাস্তার উপরে একতলা বাড়ি। বৈঠকখানায় ছোকরাদের কনসার্ট পার্টির আখড়া, সেখানেই বসেছেন। ঠাকুরকে পেয়ে ছোকরারা বাজনা শুরু করে দিয়েছে। পাড়ার ছেলে বুড়ো সবাই ভেঙে পড়েছে দলে-দলে।

জানলার উপর দাঁড়িয়েছে কেউ-কেউ। কতগুলি অপোগণ্ড শিশু।

'তোরা এখানে কেন? যা-যা বাড়ি যা।' কেউ বুঝি ওদের তেড়ে গেল।

'না, থাক না, থাক না।' ঠাকুর বাধা দিলেন।

যা শুনছেন সব চমৎকার। আশে পাশে যত লোক সব বেশ লোক। আনন্দে যখন আছে তখন নিশ্চয়ই আছে ঈশ্বরসংস্রবে।

তিন রকম আনন্দ। বিষয়ানন্দ, বিদ্যানন্দ, ব্রহ্মানন্দ। এক সিঁড়ির পরেই আরেক সিঁড়ি। উঠে যাও, শক্তির প্রমাণ দাও। যে শক্তিমান সেই ভক্তিমান।

'আপনি ভেতরে আসুন।'

'কেন গো?'

'ভেতরে জলখাবার দেওয়া হয়েছে।'

'এখানেই এনে দাও না।'

'ঘরটায় পায়ের ধুলো দিন, তাহলে ঘর কাশী হয়ে থাকবে।' বললে গন্ধুর মা।

'কখন ঘরে মরে পড়ে থাকব, আর তাহলে কোনো গোল থাকবে না।'

যেখানে তোমার পা দুখানি রেখেছ, ঘরেই হোক আর অন্তরেই হোক, সেখানেই কাশী।

গন্ধুর মা'র কি আছে? শুধু সরলতা। যারা ফ্লুট হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে তাদের বা কি আছে? ঐ সরলতা। জানলার উপরে ঐ শিশুর দল ঠাঁই পেয়েছে কেন? শুধু ঐ সরল বলে।

আর দেখ এই সরলের প্রতিমূর্তি বিজয়কৃষ্ণকে।

ঠাকুর বললেন, 'আহা বিজয়কে দেখ। কেমন উদার-সরল। অধর সেনের বাড়ি গিয়েছিল, তা যেন আপনার বাড়ি, সব্বাই যেন আপনার লোক।'

ব্রাহ্ম সমাজে একদিন উপাসনা করছে বিজয়, বড় শুকনো-শুকনো লাগছে। মনে ভাবভক্তি কিছু আসছে না। কি করে যাবে এ প্রাণের শুষ্কতা? কি করবে কিছু ঠিক করতে পারছে না। তবে এই কাষ্ঠ উপাসনা যে ছাড়তে হবে, এ ঠিক। কিছু ঠিক করতে না পেরে রাস্তায় বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসেই দেখতে পেল একটা কুলি। অমনি তার পায়ে পড়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল বিজয়। সঙ্গে-সঙ্গেই তার প্রাণ সরস হয়ে উঠল। চলে এল ভক্তির প্রবাহিণী। আবার উপাসনায় গিয়ে বসল। ভীষণ জমল উপাসনা।

'আরেকদিন', বলছে বিজয়, 'আরেকদিন শুষ্কতায় কিছুই ভালো লাগছে না, মন বসছে না উপাসনায়, উঠে গিয়ে দারোয়ানকে এক ছিলিম তামাক সেজে দিয়ে এলাম। তখন মনটি সরস হল। উপাসনাও খুব ভালো হল।'

'তোমরা অত পাপ-পাপ বলো কেন? একশোবার আমি পাপী আমি পাপী বললে তাই হয়ে যায়।' বিজয়কে বলছেন ঠাকুর: 'এমন বিশ্বাস করা চাই যে তাঁর নাম করেছি, আমার আবার পাপ কি। তিনি আমাদের বাবা-মা, তাঁকে বলো যে পাপ করেছি আর কখনো করব না। আর তাঁর নাম করো, জিহ্বা পবিত্র হয়ে যাবে, দেহ-মন পবিত্র হয়ে যাবে, পাপ-পাখি উড়ে পালাবে

দেহবৃক্ষ থেকে।'

মায়ের কাছে সন্তান কি পাপী? সন্তান পীড়িত। সন্তান দুঃখী। সন্তানের দুঃখ হরণ করতে রোগহরণ করতে মা কী না করবে? ব্যথার স্থানে হাত বুলিয়ে দেবে। সমস্ত উপশমের উৎসই তো হচ্ছে মা'র করকমল। আর, পাপ রোগ ছাড়া কি, ব্যাধি ছাড়া কি। মা-ই তো সমস্ত ব্যথার সমস্ত ব্যাধির বিশল্যকরণী।

ঈশ্বরই তো বন্ধু। তাঁকে বন্ধু করো। বন্ধু কি আসবে না বন্ধুর সাহায্যে? আর এতো তোমার প্রবল বন্ধু, পরাক্রান্ত বন্ধু। ক্ষমায় সুন্দর, ঔদার্যে বিশাল স্নেহে বিপুল দক্ষিণ। সর্বসময় অব্যবহিত। তোমার সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী তৃপ্তিতে পরিতৃপ্ত। তোমাকে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যে সর্বদা হাত বাড়িয়ে আছে। তোমাকে পাহারা দেবার জন্যে রয়েছে চোখ মেলে। এমন বন্ধুকে যদি না চেনো, তবে এ সংসারে তুমিই একমাত্র নির্বান্ধব।

মনের কথা বলে প্রাণ খোলসা করতে পারো এমন বন্ধু কে আছে ঈশ্বর ছাড়া? আর যাকেই বিশ্বাস করে বলো তোমার গোপন কথা, কদিন পরে দেখবে সে কথা বাজারে বিকোচ্ছে। তখন তুমি দেখবে মতে-মতে মিলনই বন্ধুতা নয়, এক উদ্দেশ্য এক দল এক বাণিজ্য এ-ও বন্ধুতা নয়। আজকের বন্ধু কালকের কালসাপ। তাই কাকে তুমি বলবে তোমার প্রাণের কথা, তোমার সুখ-দুঃখের কাহিনী? যদি কথা কয়ে প্রাণ উজাড় করে দিতে না পারো তাহলে হালকা হবে কি করে? তাই একমাত্র যিনি বিশ্বাস্য, একমাত্র যিনি ক্ষুদ্র-অন্তঃকরণ নন তার সঙ্গে কথা কও। ঈশ্বরের সঙ্গে কথা মানেই সরল হয়ে যাওয়া। আর যে সরল সেই সত্যবাদী।

আগড়পাড়া থেকে একটি বিশ-বাইশ বছরের ছোকরা আসে ঠাকুরের কাছে। এসে, কি সাহস, দূরে দাঁড়িয়ে ঠাকুরকে ইশারা করে ডাকে। ঠাকুরও তেমনি। উঠে যান সেই অচেনা ছোকরার ইশারায়। ছেলেটি ঠাকুরকে নিয়ে যায় নির্জনে।

'এখানে কেন?'

'তোমার সঙ্গে দুটো মনের কথা কইব। ওখানে বড্ড ভিড়। চুপি-চুপি না হলে কি মনের কথা কওয়া যায়?'

'বেশ তো, কও না মনের কথা। চুপি-চুপিই কও।'

ছেলেটি নির্ভয় হয়ে গেল, নির্দ্বন্দ্ব হয়ে গেল। বললে, 'বলতে পারো আমার কামভাব কি করে যাবে?'

ঠাকুর বললেন, 'নিজেকে মেয়ে বলে ভাবো। এ-ও একটা উপায় কামজয়ের। প্রকৃতি ভাব আরোপ করলে কামভাব নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক মেয়েদের মতন ব্যবহার হয়। যাত্রাতে যারা মেয়ে সাজে, তাদের নাইবার সময় দেখেছি, মেয়েদের মতই কথা কয়, দাঁত মাজে।'

নির্জন না হলে নিরঙ্কুশ হবে কি করে? নির্মুক্ত না হলে কইবে কি করে মনের কথা?

তাই তাঁর সঙ্গে খেল, যে এই সৃষ্টির আসল খেলুড়ে। মাটির বীজ পুঁতলে অঙ্কুর হয়, এ কৃষকের গুণ নয়, সৃষ্টিকর্তার নিয়মের গুণ। অঙ্কুরের মধ্যে তাঁকে দেখ। তাঁর নিয়ম দেখাই তাঁকে দেখা।

সাধুরা ধুনি জ্বালায় কেন? শীতের থেকে ত্রাণ পাবার জন্যে, না, গাঁজা খাবার জন্যে?

মোটেই না। কাম-ক্রোধকে ইন্ধন করে আহুতি দেবার জন্যে। কাঠের একটা করে কুঁদো নেয়, কোনোটাকে কাম ভাবে কোনোটাকে বা ক্রোধ। আর আগুনকে মনে ভাবে ইষ্ট, মনোবাঞ্ছার পরিপূর্তি। আগুনের কাছে বসে খুব তেজের সঙ্গে নাম করলে আগুনেরও দাহ-দীপ্তি বাড়তে থাকে। কাঠের কুঁদো ভস্ম না হওয়া পর্যন্ত কেউ আসন ছাড়ে না, অবিশ্রান্ত নাম করে। নিরিন্ধন হয়ে যায়।

চিমটে কেন? ধুনি খোঁচাবার জন্যে?

মোটেই না। চিমটে হচ্ছে বাকসংযমের প্রতীক। যার জিহ্বা সংযত হয়নি, সে ধরতে পারবে না চিমটে।

আর কমণ্ডলু? জল খাবার জন্যে নিশ্চয়ই?

মোটেই না। টইটম্বুর করে জল রাখো কমণ্ডলুতে। নির্মল ঠাণ্ডা জল। জলের ঐ সাম্য শৈত্য ও স্থৈর্য তাদের সঙ্গে মনের যোগ রেখে সাধু ভগবানের নাম করে। সব সময়েই দেহ-মন ঠাণ্ডা থাকে, তৃপ্ত হয় না। চিত্ত অবিকৃত অচঞ্চল থাকে। মনে বিরাজ করে পক্ষপাত-নিরপেক্ষ সমতা।

আর ত্রিশূল? হিংস্র জন্তুর আক্রমণের থেকে বাঁচবার জন্যে?

মোটেই না। সত্ত্ব রজ আর তম এই তিন গুণ যার করায়ত্ত, সেই-ই ত্রিশূল ধারণের অধিকারী।

'তুমি সাকারবাদীদের সঙ্গে মেশো, তাই তোমার নাকি খুব নিন্দে হয়েছে?' ঠাকুর জিগগেস করলেন বিজয়কে।

বিজয় চুপ করে রইল।

boiRboi.net

'যে ভগবানের ভক্ত তার কূটস্থ বুদ্ধি। জাগ্রতে স্বপ্নে সে চিরস্থির, একাবস্থ। যেমন কামারশালের নাই। হাতুড়ির ঘা অনবরত পড়ছে, তবু নির্বিকার। তোমাকে কত কি বলবে, কত নিন্দে কত কটূক্তি। যেহেতু তুমি আন্তরিক ভগবানকে চাও তুমি সব সহ্য করবে। টলবে না গলবে না।'

বিজয় হাসল।

'দুষ্ট লোকের মধ্যে থেকেও কি ঈশ্বরচিন্তা হয় না?' সরল শিশুর মত ঠাকুর বললেন, 'দেখ না বনের মধ্যে ঈশ্বরকে ডাকত কেমন ঋষিরা। চারদিকে বাঘ ভালুক, তবু সাধনার থেকে নিবৃত্তি নেই। যেমন নিন্দুক আছে তেমনি আবার সৎসঙ্গও আছে। মাঝে-মাঝে সৎসঙ্গ করা বড় দরকার।'

বিজয় বললে, 'সময় কই? কাজে আবদ্ধ হয়ে আছি।'

'তোমার আচার্যের কাজ। অন্যের ছুটি হয় কিন্তু আচার্যের ছুটি নেই।'

'ছুটি নেই?'

'আচার্যের নেই। দেখনি নায়েব যদি এক ধার শাসিত করতে পারে, জমিদার তাকে আরেক ধার শাসন করতে পাঠায়।'

বিজয় বললে, 'আপনি একটু আশীর্বাদ করুন।'

'ও সব অজ্ঞানের কথা। আমি কে! আশীর্বাদ ঈশ্বর করবেন।'

লোকলজ্জা ত্যাগ করে সেই অনন্তের নাম কীর্তন করো। তুমিই তো চলমান তীর্থ।

রাতের অন্ধকারে গোদোহন করছে, কালপ্রেরিত সাপ এসে নারদজননীকে দংশন করল। মায়ের মৃত্যুকে নারদ ভগবানের অযাচিত কৃপা বলে মনে করল। চলে গেল গৃহ ছেড়ে। গভীর অরণ্যে গিয়ে বসল এক অশ্বত্থ গাছের নিচে। বুদ্ধিকে সংযত করে অন্তরাত্মায় স্থাপন করল। কি হল তারপর? প্রেমভরে দেহ পুলকিত হতে লাগল, দু-চোখ ভরে উঠল প্রেমাশ্রুতে। দ্বিতীয় কোনো সত্তার আর জ্ঞান থাকল না। তখন হৃদয় মধ্যে ভগবানের সর্বশোকাবহ দিব্যভাস্বরকলেবর অপরূপ রূপ আবির্ভূত হল। কিন্তু আবির্ভূত হয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল। এ কি, কোথায় পালালে? বিহ্বল ব্যাকুল হয়ে উঠে পড়ল নারদ। খোঁজাখুঁজি করতে লাগল এখানে-ওখানে। কোথায় সেই ভুবনমনোমোহন মূর্তি! তাকে বাইরে খুঁজছি কোথায়? তাকে তো দেখেছিলাম অন্তরের অন্তঃপুরে। সুতরাং আবার মন স্থির করে বসি। নারদ শান্তসংকল্প হয়ে বসল সেই বৃক্ষতলে। বসল প্রেমধ্যানে। কিন্তু কোথায়, কোথায় সেই মণ্ডল-মণ্ডন সুমোহন! আর্ত, আতুর ও অস্থির

হয়ে উঠল নারদ। তখন আকাশপথে স্নিগ্ধ গম্ভীর বাণী ধ্বনিত হল—হায়, তুমি আর আমার দেখা পাবে না এ জন্মে। তোমাকে যে একটিবার মাত্র দেখা দিয়ে অদৃশ্য হয়েছি তা শুধু তোমার অনুরাগ বৃদ্ধির জন্যে। যারা কুযোগী, যাদের আন্তর মালিন্য বিদূরিত হয়নি, তারা তো আমার একবারমাত্রও দর্শন পায় না। তুমি যে পেয়েছ তা শুধু তুমি নিষ্পাপ বলে। কিন্তু সর্বক্ষণই যদি দেখ কোথায় পাব তোমার এই আর্তি, এই অনুরাগ, এই খরতরা ব্যাকুলতা!

সেই থেকে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য ধারণ করে দেবদত্ত বীণার ঝঙ্কারে হরিগুণ গান করতে-করতে পৃথিবী পর্যটন করছে নারদ।

'আমিও চোখ বুজে ধ্যান করতুম।' বিজয়কে বললেন ঠাকুর। 'শেষে ভাবলুম, চোখ বুজলেই ঈশ্বর আছেন আর চোখ খুললে তিনি নেই, এ কখনো হতে পারে? চোখ খুলেও দেখছি ঈশ্বর সর্বভূতে রয়েছেন। মানুষ জীবজন্তু গাছপালা চন্দ্রসূর্য তারা-তৃণ সব তিনি।'

কিন্তু আমরা তোমাকে দেখি কোথায়? অন্তর অস্বচ্ছ, চর্মচক্ষুও অপরিচ্ছন্ন, আমাদের কি করে দর্শন হবে?

আমাদের শ্রবণই দর্শন। আমরা যে তোমার কথা শুনেছি সেই আমাদের তোমাকে দেখা। আমাদের না দেখেই ভালোবাসা। আমাদের শুধু বাঁশি শুনেই অভিসার। আমাদের অনুপলব্ধিই প্রমাণ।

তোমাকে দেখে তুমি সুন্দর এ বলা কত সহজ। কিন্তু আমরা না দেখেও বলতে পারি তুমি সুন্দরতম, তুমি মধুরতম, তুমি মঙ্গলতম।

কাটোয়ার বৈষ্ণব ঠাকুরকে জিগগেস করলে, 'মশায়, পরজন্মের কথা কিছু বলতে পারেন?'

'এ জন্মের কথা বলতে পারি।'

বৈষ্ণব বাবাজী তাকিয়ে রইল ফ্যাল-ফ্যাল করে।

'এ জন্মের সার কথা ঈশ্বরে ভক্তিলাভ। ঈশ্বরে ভক্তিলাভের জন্যেই মানুষ হয়ে জন্মেছ। সেই জন্মস্বত্ব অর্জন করো।'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু মরবার পর আবার কি জন্ম হবে?'

'গীতায় বলেছে, যে যা ভেবে দেহত্যাগ করবে তার সেই ভাব নিয়ে জন্ম হবে। হরিণকে চিন্তা করে ভরতরাজার হরিণজন্ম হয়েছিল।'

'এটা যে হয় তা কেউ চোখে দেখে বলে, তবে তো বিশ্বাস করতে পারি।'

'তা জানি না বাপু। নিজের ব্যামো সারাতে পারছি না—আবার মলে কি হয়!'

ঈশ্বর নাবালকের অছি।

ঈশ্বর কল্পতরু। যে যা চায় সে তাই পায়।

জগৎ দেখলেই বোঝা যায় ঈশ্বর আছেন।

ঈশ্বর আমাদের আপনার লোক। যদি কারু উপর জোর চলে সে একমাত্র ঈশ্বরের উপর।

ঈশ্বরকে মা বলে ডাকতেই শান্তি। ঈশ্বরকে মা বলে ডাকলেই শীঘ্র ভক্তি হয়, ভালোবাসা হয়।

সব ঠাকুরের কথা।

তাই মা-মা করো। নাম করো। নামে যদি অরুচি হয় তার ওষুধও ঐ নামই। যখন পিত্তরোগে মুখ তেতো হয় তখন মিছরিও তেতো লাগে। সেই তিক্ততার ওষুধই ঐ মিছরিই। খেতে-খেতে দেখবে ঐ তেতো মুখেই আবার মিষ্টি লাগতে শুরু করেছে। আনন্দ না পেলে নাম করব না যখন ভালো লাগবে তখন নাম করব, এ ভাব পাটোয়ারি। ভালো লাগুক আর না লাগুক নাম করতেই হবে। তৃণের মত নত হয়ে বৃক্ষের মত সহিষ্ণু হয়ে অমানীকেও মান দিয়ে নিরভিমান হয়ে নাম করো। তা হলে নামের ফল পাবে। নামের ফল আর কি? নামের ফল মহানন্দ।

মা বলে ডাকো। শুষ্কতা লাগবে না, অরুচি ধরবে না। আরো সব চেয়ে সুবিধে, কিছু প্রার্থনাও করতে হয় না মা'র কাছে। মা বলে ডাকলেই মানুষ পবিত্র হয় নিমেষে। মা বলে ডাকলেই মনে হয় পাশের ঘরে আছেন, এখুনি আসবেন ব্যাকুল হয়ে।

যদু মল্লিকের মাকে বললেন, 'যখন মৃত্যু আসবে সেই সংসার চিন্তাই আসবে। ছেলেমেয়ের চিন্তা, উইল করবার চিন্তা, বাড়িঘরের চিন্তা। ঈশ্বরচিন্তা আসবে না।'

'উপায়?'

'উপায় তাঁর নামজপ নামকীর্তন অভ্যাস করা। এই অভ্যাস যদি থাকে তবেই মৃত্যুকালে তাঁর নাম মুখে আসবার আশা।'

কিন্তু যতক্ষণ ভোগ আছে ততক্ষণ যোগ হবে কি করে? ভোগাসক্তি ত্যাগ হলেই শরীর যাবার সময় মনে পড়বে ঈশ্বরকে।

তাই তাড়াতাড়ি ভোগের পালা শেষ করে নাও। নটবর পাঁজা যখন

ছেলেমানুষ তখন রাসমণির বাগানে গরু চরাত। তার অনেক ভোগ ছিল। তাই রেড়ির তেলের কল করে অনেক টাকা করেছে। দেখনি আলামবাজারে তার রেড়ির তেলের ব্যবসা?

বিধিপূর্বক যে ভোগ তাতে শাম্য হয়। শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে যে ভোগ তার নাম উপভোগ উপভোগে শাম্য নেই। ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। এর অর্থ এ নয়, কামীদের কাম ভোগের দ্বারা উপশম হয় না। এর অর্থ হচ্ছে কামীদের কাম উপভোগের দ্বারা উপশম হয় না। ভোগ হচ্ছে শাস্ত্রসম্মত ভোগ আর উপভোগ হচ্ছে স্বেচ্ছাচারপ্রসূত ভোগ।

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীকে বিয়ে করল যযাতি। দৈত্যরাজ বৃষপর্বার মেয়ে শর্মিষ্ঠা যযাতির রাজপুরীতে বন্দিনী, দেবযানীর দাসীত্ব তার আমরণ অভিশাপ। সেই শর্মিষ্ঠারই ছেলে পুরু। দাসীগর্ভে পুত্রোৎপাদনের জন্যে যযাতিকে শাপ দিল শুক্রাচার্য। এই শাপ যে, যৌবনেই যযাতি জরাপ্রাপ্ত হবে। একটু দয়াও করল দৈত্যগুরু। সঙ্গে এই বর দিল, যদি কেউ রাজী থাকে তা হলে এই জরা তাকে দান করে তার যৌবন সে চেয়ে নিতে পারবে। কিন্তু কে রাজী হবে এই দুর্ব্যাপারে? ক্রমান্বয়ে জ্যেষ্ঠ চার-চার ছেলের কাছে গিয়ে যযাতি মিনতি করল, প্রত্যেকের কাছেই মিলল প্রত্যাখ্যান। তখন কনিষ্ঠ ছেলে পুরুর কাছে গিয়ে যযাতি দাঁড়াল কাতরচক্ষে। পুরু রাজী হয়ে গেল। পিতার জরা চেয়ে নিয়ে নিজের নবযৌবন বাপকে দান করল। দেবযানীকে নিয়ে পুনরায় বিষয়ভোগে মত্ত হল যযাতি। দু-চার বছর নয়, পূর্ণ সহস্র বৎসর। তখন যযাতি দেবযানীকে বললে, 'পৃথিবীতে যত শস্য, যত স্বর্ণ, যত স্ত্রী, যত পশু আছে সমস্ত পেলেও কামপূত পুরুষের মন তৃপ্ত হয় না। উপভোগে কামনার নিবৃত্তি নেই, বরং ঘৃতাহুত বহ্নির মত কেবলই বাড়তে থাকে। পুরুষ যখন সর্বভূতে মঙ্গলভাব পোষণ করে, সমদৃষ্টি হয় তখনই তার কাছে দিঙ্মণ্ডল সুখময় হয়ে ওঠে। যে তৃষ্ণা দুস্ত্যজ্যা, শরীর জীর্ণ হলেও যা জীর্ণ হয় না, সতত দুঃখপ্রদ, এই তৃষ্ণাকে ত্যাগ করতে পারলেই কল্যাণ। এক হাজার বছর অবিরাম বিষয়সেবা করলাম, তবুও তৃষ্ণার পার পেলাম না। তাই ঠিক করেছি এবার সকল বিষয় ত্যাগ করে পরব্রহ্মে মন নিবিষ্ট করব, নির্দ্বন্দ্ব ও নিরহঙ্কার হয়ে অরণ্যের হরিণের সঙ্গে যথেচ্ছ বিচরণ করব।'

পুরুকে ডেকে পাঠালেন যযাতি। তার যৌবন তাকে ফিরিয়ে দিলেন, তুলে নিলেন নিজের জরাভার। তাকে রাজ্য ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন গহনারণ্যে। অক্লেশে, নিস্পৃহ নির্বিঘ্ন চিত্তে। নীড়ত্যাগী জাতপক্ষ পাখির মত

দিব্যানুভবে দেবযানীও উদ্দীপ্ত হল। বুঝল সমস্তই ভগবন্মায়া, বিষয়সঙ্গ স্বপ্নতুল্য, কারু কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই, সকলেই ঈশ্বরপরতন্ত্র, আর এই যে সুহৃৎসন্নিবাস এ হচ্ছে পানশালায় আসা কতকগুলো তৃষ্ণার্ত লোকের সঙ্গে ক্ষণমিলন। হে বাসুদেব, তুমিই সর্বভূতাধিবাস, তুমিই বৃহৎশান্তি, তোমাকে প্রণাম। এই বলে দেবযানী দেহ রাখল।

খুব সংগ্রাম করো, লোভের সঙ্গে পাপের সঙ্গে প্রবৃত্তির সঙ্গে। সংগ্রাম আরম্ভ হলেই বুঝবে ধর্মজীবন আরম্ভ হল। অগণন তোমার শত্রু কিন্তু তোমার একমাত্র অস্ত্র নামমন্ত্র। জানি তুমি বারে-বারে পড়বে, আবার বারে-বারে ওঠো গা-ঝাড়া দিয়ে। প্রতিপদে পরাস্ত হতে-হতে যখন একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়বে, চারদিক অন্ধকার দেখবে, তখনই বুঝবে তোমার একলার ক্ষমতায় কিছু হবার নয়। তখনই তুমি উপলব্ধি করবে, তুমি অধম-অক্ষম অকর্মণ্য-অসমর্থ, তখনই তুমি প্রবল কোনো বন্ধুর সাহায্যের জন্যে হাত বাড়াবে, বুঝবে সে ছাড়া তোমার গতি নেই। সে শুধু প্রবল নয়, সে অপরাভূয়। তীব্র তপস্যায় হবে না, না কঠিন বৈরাগ্যে, না বা নিদারুণ সাধন ভজনে। যখন বুঝবে তুমি দীন-হীন পতিত-কাঙাল, তখনই তুমি প্রাণের থেকে ডাকবে ঈশ্বরকে, সে ডাক আর তোমার শেখানো বুলি হবে না। সে ডাকই ডেকে নিয়ে আসবে তাঁর কৃপা। শরণাগতিই নিয়ে আসবে শতশৃঙ্গ পর্বতের আশ্রয়। তখনই বুঝবে তাঁর কৃপাই সার। সাধন-ভজন কেন? সংগ্রাম কেন? তাঁর কৃপা ছাড়া কিছুই হবার নয়, এটুকু পরিষ্কার বোঝবার জন্যেই সাধন-ভজন। যত যুদ্ধ-বিগ্রহ।

কর্নেল অলকট কলকাতায় এসেছে।

'কে অলকট?'

'প্রকাণ্ড একজন থিয়োসফিস্ট। মানে ঈশ্বরজ্ঞানী।'

'সে কি করছে?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছে।'

'সে কি, তার নিজের ধর্ম কি দোষ করল?' ঠাকুর যেন আহত হলেন। 'তার নিজের ধর্ম সে ছাড়ল কেন? তার ধর্মে কি ঈশ্বরজ্ঞানের ঘাটতি পড়েছে?'

সুরেন মিত্তির আফিন-ফেরতা ঠাকুরকে দেখতে এসেছে। হাতে চারটি কমলা লেবু আর দুই গাছা ফুলের মালা।

রাত প্রায় আটটা। ঠাকুর বসে আছেন বিছানার উপর। দু-একজন ভক্ত এদিকে-ওদিকে।

আফিসের কাজ সেরে এই সবে এলাম। আরো আগে কি আসতে পারতাম,

না? আগে আসতে হলে আফিসের কাজ শেষ না করে আসতে হয়। সেটা কি ভালো?'

ঠাকুর ইঙ্গিত করলেন, ভালো নয়।

'দুই নৌকোয় পা দিয়ে লাভ কি? তাই কাজ সেরেই চলে এলাম।'

হ্যাঁ, কাজ সেরেই চলে এস। কিন্তু যতক্ষণ কাজ না সারা হয় ততক্ষণ উন্মনা হয়ে থাকো, কতক্ষণে গিয়ে পৌঁছুবে? এই উন্মনা হয়ে থাকাটিও ঈশ্বরকৃপা।

'তাছাড়া আজ নববর্ষ। তার উপর আবার মঙ্গলবার। কালীঘাটে যাওয়া হল না।' সুরেনের দুই চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'ভাবলাম যিনি কালী, যিনি কালী ঠিক চিনেছেন, তাঁকে দর্শন করলেই হবে।'

ঠাকুর তা মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলেন।

'গুরুদর্শনে সাধুদর্শনে কিছু ফুল-ফল আনতে হয় শুনেছি। তাই এগুলি আনলাম।'

ঠাকুর নিলেন তা হাত বাড়িয়ে।

মনে পড়ল একদিন তার দেওয়া মালা ঠাকুর নেননি, ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। সে মালায় অহঙ্কারের স্পর্শ ছিল, অনেক টাকা খরচ করে এই মালা এনেছি, ছিল সেই আভিজাত্যের ঝাঁজ। মালা ছুঁড়ে ফেলে দেবার পর প্রথমটা সুরেনের রাগ হয়েছিল, ভেবেছিল রাঢ় দেশের বামুন এ সব জিনিসের মর্যাদা কি বুঝবে! পরে খানিক পরে তার চেতনা হল। বুঝল ভগবান পয়সার কেউ নন, অহঙ্কারের কেউ নন, লোকমান্যের কেউ নন, তিনি শুধু দীনহীন অকিঞ্চনের। আমি অহঙ্কারী, আমি কামকামী, আমি হঠবাদী, আমার পূজা কেন তিনি নেবেন! কেন তিনি বরদাস্ত করবেন এই ঔদ্ধত্য এই ক্ষুদ্রতা? আমার ইচ্ছে নেই বাঁচতে।

দু-চোখ বেয়ে চোখের জল পড়তে লাগল সুরেনের। তখন সেই বিক্ষিপ্ত মালা কুড়িয়ে নিয়ে গলায় পরলেন ঠাকুর। নৃত্য করতে লাগলেন।

সেদিনের কথা।

'আজ যে এ দুগাছা মালা এনেছি তার মোটে চার আনা দাম।'

ঠাকুর আবার নীরবে হাসলেন।

সুরেন বললে, 'ভগবান তো পয়সা দেখেন না, মন দেখেন। কাক হয়তো একটি পয়সা দিতে কষ্ট আর কেউ হয়তো একমুঠো ধুলোর মত এক হাজার টাকা ফেলে দিতে পারে অক্লেশে। ভগবান জিনিসে নয় ভাবে। উপকরণে নয় ভক্তিতে।'

ঠাকুর কথা বলতে পারছেন না, স্নিগ্ধ হেসে সায় দিলেন।

'কাল সংক্রান্তি, তাই আসতে পারিনি। কাল শুধু আপনার ছবিটিকে ফুল

দিয়ে সাজালুম।'

এই সেই সুরেন, ঠাকুর যাকে সুরেশ বলে ডাকতেন, একঘরের মাতাল, গিরিশেরই যমজ ভাই। কিন্তু সেই মদ কোথায়? একটুখানি বেঁকিয়ে দিলেন ঠাকুর। মদ-মাতালকে মন-মাতাল করে দিলেন।

'তুমি আফিসে মিথ্যা কথা কও, তবু তো মারটা খাই কেন!' ঠাকুর তাকে বলেছিলেন একদিন। 'খাই তোমার যে দানধ্যান আছে। তোমার যা আয় তার চেয়েও তোমার বেশি দান। বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি। কৃপণের ধন উড়ে যায়, দাতার ধন রক্ষা হয়, যেহেতু তা সৎকাজে যায়। যার দানধ্যান তারই ফললাভ।'

'কিন্তু আমার ধ্যান জমে না কেন?' দুঃখ করেছিল সুরেন।

'না জমুক। স্মরণ-মনন আছে তো!'

'আজ্ঞে, মা-মা বলে ঘুমিয়ে পড়ি।'

'আহা হা, তাহলেই হল। মা-মা বলে ঘুমিয়ে পড়তে পারলেই ভালো।'

আর কিছু নয়। শুধু মাকে ডাকো। মাকে প্রণাম করো।

রৌদ্রাকে প্রণাম, গৌরীকে প্রণাম। নিত্যা যে ধাত্রী তাকে প্রণাম। চির-জ্যোৎস্নাকে প্রণাম। প্রণাম সুখস্বরূপাকে। বুদ্ধিসিদ্ধিরূপিণীকে প্রণাম, সর্বাণী ভূভৃৎলক্ষ্মীকে প্রণাম, প্রণাম আবার মা'র রাক্ষ সীমূর্তিকে। তুমি দুর্গা দুর্জ্ঞেয়া ধাবার দুর্গপরা। তুমিই সর্বকারিণী স্থিরাংশরূপিণী। তুমিই অতিসৌম্যা অতিরৌদ্রা করুণাময়ী ব্যথাহারিণী। আবার অপগতবাসনা প্রকটিতবদনা ভয়ঙ্করা। দৃষ্টিসম্পাতমাত্র যদি তোমাকে না চিনি সহস্র চক্ষু পেলেও তোমাকে চিনব না। তুমি এত সরল এত সহজ এত সন্নিহিত। তোমার হাতের মার খেয়ে যখন কাঁদি তখনও তা আনন্দেরই উচ্চারণ। দুঃখ-দারিদ্র্য যে ভোগ করি সেই ভোগের মধ্যেও আনন্দ। যোগ-দৃষ্টি কোথায় পাব? তোমার কৃপাই আমার যোগ-চক্ষু।

ছোট চৌকিতে শুয়ে আছেন ঠাকুর, পায়ের কাছে বসে ঠাকুরের পা টিপে দিচ্ছে গঙ্গাধর। হঠাৎ ঠাকুরের দু-পায়ের দুটো বুড়ো আঙুল নিয়ে নিজের কপালে ঊর্ধ্ব পুণ্ড্র তিলক আঁকতে লাগল।

'ও কি, কি হচ্ছে!'

'আপনি যে বলেন যারা সাত্ত্বিক তারা গঙ্গাস্নান করতে-করতে গঙ্গাজলে তিলক দেয়। আমি আজ তেমনি সাত্ত্বিক তিলক দিচ্ছি।'

হরিপ্রসন্ন চাটুজ্জে মানে স্বামী বিজ্ঞানানন্দের বেলায় কি করলেন! জিগগেস

করলেন, 'হ্যাঁরে তুই কুস্তি লড়তে পারিস ?'

দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, সুগঠিত সুন্দর। ঠিক পালোয়ানের মত দেখতে। দেখতে কি, সত্যি-সত্যি কুস্তিগির পালোয়ান। দুশো-আড়াইশো করে ডন-বৈঠক দেয় রোজ। প্রায় লোহা চিবিয়ে খায়।

'দেখি না, আমার সঙ্গে লড় না এক হাত!' সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন ঠাকুর।

এ কেমনতরো সাধু! হরিপ্রসন্ন তো অবাক। সাধু কিনা কুস্তি লড়তে চায়! এমনতরো তো কোথাও শুনিনি!

'আয়না, দাঁড়িয়ে আছিস কেন?' তাল ঠুকতে-ঠুকতে হরিপ্রসন্নর দিকে এগুতে লাগলেন ঠাকুর। তার দু-হাত নিজের দু-হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে তাকে ঠেলতে লাগলেন পিছনের দিকে।

আর পেছপা হয়ে থাকা যায় না। হরিপ্রসন্নও ঠেলতে লাগল। হারিয়ে দিল ঠাকুরকে। তাঁকে ঠেলতে-ঠেলতে একেবারে ও-দিকের দেয়ালে তাঁকে চেপে ধরল।

ঠাকুর তবু হাসছেন। 'কি রে, হারিয়েছিস তো?'

হারিয়েছি! হরিপ্রসন্নর সমস্ত শরীর শির-শির করে উঠল। বিদ্যুৎ-প্রবাহের মত কি একটা আশ্চর্য শক্তি যেন তার দেহের মধ্যে প্রবেশ করছে। মুহূর্তে অবসাদে শিথিল হয়ে এল হরিপ্রসন্ন। ঠাকুর তাকে ছেড়ে দিলেন। বললেন, 'কি রে, হারিয়েছিস তো?'

ভক্ত ও ভগবানের লড়াইয়ে কে হারে কে জেতে কে বলবে! যতক্ষণ লড়াই করেছিলে তন্ময় হয়ে ছিলে। প্রীতিতে বরং বিচ্যুতি ঘটে শত্রুতায় বিচ্যুতি নেই। সুতরাং ঈশ্বরের বন্ধু হতে না পারো শত্রু হও। বৈরানুবন্ধে যেমন তন্ময়তা তেমন তন্ময়তা ভক্তিযোগেও হয় না। অখিলাত্মা ঈশ্বরের তো কোনো ভেদজ্ঞান নেই। তিনি যদি কাউকে দণ্ড দেন নিজের সুখের জন্যে নয়, জীবের হিতের জন্যে। তাই বৈরিতা ভয় স্নেহ কাম যে উপায়ে হোক তাঁর সঙ্গে যুক্ত হও। এক উপায় আরেক উপায়ের বিরোধী, তা মনে কোরো না।

তাই ঈশ্বরের সঙ্গে করমর্দন করতে না পারো কুস্তি করো। প্রেমে আলিঙ্গন না হয় মল্লযুদ্ধে আলিঙ্গন।

প্রসন্নোজ্জ্বলচিত্ততা না এলে ঈশ্বরতাৎপর্য বুঝবে না। কান দিয়ে আলোকের জ্ঞান হয় না, চোখ দিয়ে হয় না শব্দের। তেমনি মেধার দ্বারা নয়, বহু শাস্ত্রের জ্ঞান দ্বারা নয়, একমাত্র প্রসন্নোজ্জ্বলচিত্ততা দিয়েই প্রেমের অনুভব।

প্রসন্নোজ্জ্বল হবে কিসে? একমাত্র ঈশ্বরের কৃপাস্পর্শে।

কর্মও চাই, কৃপাও চাই। পুরুষকারও চাই, দৈবও চাই। উভয়ের সমাবেশেই সিদ্ধি। পর্জন্য সলিল বর্ষণ করলে কি হবে, ক্ষেত্রে যদি না কর্ষণ থাকে। পুরুষকার যোগে কর্ম, দৈবযোগে সিদ্ধি। দৈবশূন্য পুরুষকার নিষ্ফল আর পৌরুষশূন্য দৈবও অসম্ভব। তাই কর্ম দিয়ে কৃপা আকর্ষণ করো। ক্লান্ত হলেই পাবে কৃপার সমীর স্পর্শ।

কুরুক্ষেত্র জয়ের পর রাজশ্রী ত্যাগ করবার সংকল্প করলেন যুধিষ্ঠির। ভায়েদের বললেন, আমি গ্রাম্যসুখ পরিত্যাগ করে বনে প্রবেশ করব। মিতাহারী ও চর্ম-চীর জটাধারী হয়ে দুই-সন্ধ্যা স্নান করে হুতাশনে আহুতি দেব। ফলমূল খেয়ে মৃগযূথের সঙ্গে সঞ্চরণ করব। ক্ষুৎ-পিপাসা শ্রান্তি শীত আতপ ও বায়ু সব ক্লেশ সহ্য করে শরীর শুষ্ক করব। একাকী প্রত্যেক বৃক্ষতলে এক-একদিন অতিবাহিত করতে-করতে প্রাণান্তকাল প্রতীক্ষা করব। গ্রামবাসী কি বনবাসী কারুর অপকার করব না, কারুর প্রতি কখনো ভ্রূভঙ্গী বা উপহাস করব না। কাউকে পথ জিজ্ঞাসা করব না, শূন্য চিত্তে যে কোনো একটি পথ ধরে চলে যাব। স্বভাব সকলের আগে-আগে যায়, সেই কারণে আমাকে হয়তো বা গৃহস্থের দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা করতে হবে, কিন্তু আমি তখনই তার দ্বারস্থ হব যখন তার গৃহ ধূমহীন, অগ্নিহীন, অতিথিসঞ্চারবিরহিত। তাকে ব্যস্ত করব না, যদি না জোটে থাকব নিরাহারে। আশেপাশে বাঁধা পড়ব না, বাতাসের মত সর্বলোকের অনায়ত্ত থাকব। লাভ-ক্ষতি নিন্দা-স্তুতি শোক-হর্ষ শুভ-অশুভ সব আমার পক্ষে সমান হবে। দেহমাত্র ধারণ করব কিন্তু কোনো কাজে লিপ্ত হব না। বিষয়া-বাসনাপরতন্ত্র হয়ে ঘোরতর পাপানুষ্ঠান করেছি। এখন বৈরাগ্যেই আমার শাশ্বত সন্তোষ। এই নির্ভয় পথে চলতে চলতে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি বেদনায় অভিভূত এই পাঞ্চভৌতিক দেহ আমি ত্যাগ করব।

অর্থবিষয়িণী বুদ্ধি তিরোহিত হয়েছে। যুধিষ্ঠিরকে ভীম আর অর্জুন, নকুল আর সহদেব, এমন কি দ্রৌপদী কঠোর ভাবে তিরস্কার করতে লাগল। অর্জুন বললে, উদ্যমহীন ভিক্ষুক, ভীম বললে, ক্লীব অকৃতী। দ্রৌপদীও বিদ্যুল্লসিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'ধিক! পূর্বে দ্বৈতবনে তোমার ভায়েরা শীতে আতপে পরিক্লিষ্ট হলে তুমি বলেছিলে দুর্যোধনকে বিনাশ করে সসাগরা বসুন্ধরাকে উপভোগ করবে। কিন্তু এখন কেন এই গিরিকাননসমন্বিতা সদ্বীপা পৃথিবীকে পরিত্যাগ করতে চাইছ? তুমি বিদ্যা দান সন্ধি যজ্ঞ বা যাচ্ঞা দ্বারা এ পৃথিবী লাভ করোনি। গজাশ্বরথসম্পন্ন শত্রুপক্ষীয় বীরদের সংহার করে অধিকার

করেছ। পুরুষশার্দূলের মত ব্যবহার, এখন কেন এই হীনতা? তোমার প্রমত্ত গজেন্দ্র সদৃশ ভায়েদের দিকে দেখ, অরাতিতাপন তোমার সদৃশ তোমার ভায়েরা চিরদুঃখভোগী, এদের আহ্লাদবর্ধন করা কি তোমার কর্তব্য নয়? শ্রেয়োলাভে বঞ্চিত মূঢ় ব্যক্তিরাই বৈরাগ্য ও বানপ্রস্থের কথা চিন্তা করে।'

দ্রৌপদীর কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে ভীমার্জুন আবার কটূক্তি করতে লাগল। যুধিষ্ঠির বললেন, তোমরা কেবল অসন্তোষ প্রমাদ মদ মোহ রাগ দ্বেষ বল অভিমান ও উদ্বেগে অভিভূত হয়ে রাজ্যভোগে বাসনা করছ। ওসব ত্যাগ করে প্রশান্ত হও। যে রাজা এই অখিল ভূমণ্ডলে একাধিপত্য বিস্তার করেন, তাঁরও এক ভিন্ন দ্বিতীয় উদর নেই। একদিন বা এক বছর ছেড়ে দি, যাবজ্জীবন চেষ্টা করলেও কেউ আশা পূর্ণ করতে পারে না। অগ্নি কাষ্ঠসংযুক্ত হলেই জলে আর কাষ্ঠশূন্য হলেই শান্ত হয়, অতএব তুমি অল্পাহার দ্বারা সমুদ্দীপ্ত জঠরানলের সান্ত্বনা কর। মূঢ় ব্যক্তিই কেবল নিজের উদরপূরণের জন্যে অধিকতর দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করে। সুতরাং আগে উদরকে পরাজয় কর, তাহলেই সমস্ত পৃথিবী পরাজিত হবে। রাজ্যলাভ ও রাজ্যরক্ষা উভয়েই ধর্ম ও অধর্ম আছে, তোমরা তা পরিত্যাগ করে মহৎভাব থেকে বিমুক্ত হও। যে নরপতির ভূমণ্ডলে অখণ্ড প্রভুত্ব তাকে কৃতকার্য বলা যায় না, যার মৃত্তিকা ও কাঞ্চনে সমজ্ঞান তিনিই কৃতকার্য। অতএব সংকল্পিত বিষয়ে নিরাশ, নিশ্চেষ্ট ও মমতাশূন্য হয়ে অক্ষয় পদলাভের চেষ্টা করো। ভোগাভিলাষপরিশূন্য ব্যক্তিই নির্ভরনির্মুক্ত। ভোগ্যবস্তুই বন্ধন, ভোগ্যবস্তুই কর্মবলে কীর্তিত। এই কর্মবন্ধন থেকে মুক্তিই পরম পদে আরোহণ।

জনকরাজা কি বলেছিলেন? বলেছিলেন, আমি অতুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর, বিত্ত আমার কিছুই নেই। এই মিথিলা নগরীমধ্যে অগ্নিদাহ উপস্থিত হলেও আমার কিছুই দগ্ধ হয় না।

প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে এসে অশোচ্য বিষয় সম্পর্কে নিস্পৃহ হও। বুদ্ধিপূর্বক চতুর্দিক অবলোকন কর। তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন হও। যে যথার্থ বুদ্ধিমান ঈশ্বর তারই আয়ত্ত।

'যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।'

ঠাকুর বললেন, 'ব্রহ্ম অচল অটল নিষ্ক্রিয় বোধস্বরূপ। বুদ্ধি যখন এই বোধস্বরূপে লয় হয় তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়। তখন মানুষ বুদ্ধ হয়ে যায়। ন্যাংটা বলত, মনের লয় বুদ্ধিতে, বুদ্ধির লয় বোধস্বরূপে।'

অল্পবয়সী ছাত্র, কিন্তু ঈশ্বরে দুরন্ত ব্যাকুলতা। ব্রাহ্ম, তবু এসেছে কালীমন্দিরে। কালীঘরের দরজার সামনে বসে প্রাণ ঢেলে গান গাইছে।

কে গায় রে?

ভূপতি। ভাই ভূপতি।

ঠাকুর কান পেতে শুনলেন গান। কি সুন্দর গাইছে! অপূর্বের দ্বার যেন খুলে গেছে নিমেষে:

'হরি কাণ্ডারী যেমন
এমন কি আর আছে নেয়ে!
পার করে দীনজনে
অভয় চরণ-তরী দিয়ে।'

ভাবাবেশে কাছে এসে দাঁড়ালেন ঠাকুর। 'এই নে' বলে ভূপতির বুকের উপর পা তুলে দিলেন।

ভূপতি চোখ চাইল।

এ কে? এ যে তার সেই ইষ্টদেবতা, সচ্চিৎসুখ, পূর্ণসনাতন।

আর যায় কোথা! লেখাপড়ার মন উবে গেল আস্তে-আস্তে। সর্বক্ষণই সে পদচ্ছায়ার আশ্রয়ের কাছে ঘোরাফেরা করে। যদি সংসারে টানটুকু কাটিয়ে দেন। যদি টেনে রাখেন তাঁর কোলের কাছটিতে।

সেদিন বাহ্যশূন্য চিত্রার্পিতের মত বসে আছেন ঠাকুর। সর্ব অঙ্গে ঈশ্বর-আবেশ।

'দেখ, দেখ, কি নির্মল নিরাময় প্রেমমূর্তি!' গদ্‌গদ ভাবে বলে উঠল মহিমাচরণ। ভূপতি স্তব শুরু করল। 'তুমিই স্বরাট বিরাট। নরোত্তম নারায়ণ। শান্তে-বাদে বনে-দুর্গে জরে-ঘোরে সংগ্রামে-সংকটে বিজনে-শ্মশানে তুমিই একমাত্র রক্ষা-কর্তা। পদ্মদলায়তলোচন, দয়াঘন, আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকো। সংসারদাবদহনাতুর আমি, সর্বত্রই আমার ভয়, তুমি আমাকে নিঃসংশয় করো। শরণাগতির শরদম্বরকান্তি আনো আমার মধ্যে।' পরে গান ধরল:

'চিদানন্দসিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী।
মহাভাব রাসলীলা কি মাধুরী মরি মরি।'

সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুর একটি সলজ্জ শিশুর মত হয়ে গেলেন। বললেন, কি, যেন একটা হয় এই আবেশে। যেন ভূতে পায়, আমি আর আমি থাকি না। এখন ভারি লজ্জা হচ্ছে। এখন শুনতে বলো, শুনতে পর্যন্ত পারি না। এক, সাত, আট এই রকম হয়ে যায়।'

'সবই তো সেই এক।' বললে নরেন, 'একের সঙ্গে এক যোগ করেই সমস্ত।'

'না। এক আর এক, দুই। সমাধি হচ্ছে সেই এক-দুয়ের পার।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, দ্বৈতাদ্বৈতবর্জিত।' বললে মহিমাচরণ।

'যাই বলো, হিসেব থাকে না, হিসেব পচে যায়।' বললেন ঠাকুর, 'হিসেব করে সে হিসেবের নিকেশ করে কার সাধ্যি? হাতে একখানা বই দেখি, বড়জোর রাজর্ষি বলতে পারি। কিন্তু ব্রহ্মর্ষি বলি কাকে? ব্রহ্মর্ষির কোনো চিহ্ন নেই। চিহ্ন থাকবে কি করে? ব্রহ্ম বেদ পুরাণ তন্ত্র মন্ত্র সমস্ত কিছুর পার।'

আরেকদিন ঠাকুরের দিকে চেয়ে শুব্ধ হয়ে করজোড়ে বসে আছে ভূপতি। চোখের পলক ফেলতে দিচ্ছে না। যতই কেন না চক্ষুকে নিষ্পলক করি তুমি যদি না দেখাও, তুমি যদি না চক্ষুকে দ্যুতিমান করো, সাধ্য কি আমার দর্শন হয়! আর যতক্ষণ না দর্শন হয় ততক্ষণ আর কিছুই দেখব না চারদিকে। হে দীপপ্রদ, এই অন্ধতার অন্ধকার দীর্ণ-বিদীর্ণ করে দাও।

'এতই যখন সাধ দেখবার স্থাখ চোখ মেলে।' ভাববিহ্বল মূর্তিতে ঠাকুর দাঁড়ালেন প্রকটিত হয়ে।

এ কাকে দেখছে ভূপতি? তার হৃদয়সংকল্পিত প্রাণবল্লভকে? এ কি, এ তো একজন নয়, এ যে তিনজন একাধারে। চতুর্মুখ, চতুর্ভুজ আর পঞ্চবক্ত্র। হংস, গরুড় আর বৃষ।

তন্ময়ের মত প্রণাম করল ভূপতি। যা বলে-বুদ্ধিতে হবার নয়, না বা শাস্ত্র-পাণ্ডিত্যে, সাধন-ভজনে, কর্ম-কাণ্ডে, যোগ-জপ-তপস্যায় তা সাধ্য হবে শুধু একটিমাত্র নমস্কারে।

নিজের দেহ-মন-প্রাণ একটি নমস্কারের পদ্মকোরকে সুসম্বদ্ধ করে তাঁর পায়ে নিবেদন করে দাও।

বিষ্ণুর বাহন গরুড়। গরুড়ই বেদ। বেদই বহন করে যজ্ঞ পুরুষ বিষ্ণুকে। বিষ্ণুই জগদ্ব্যাপক চৈতন্য। পাখি যেমন দুই পাখা মেলে উন্মুক্ত আকাশের সন্ধান করে তেমনি গরুড়ের দুই পাখার এক হচ্ছে কর্ম, অন্য হচ্ছে জ্ঞান। আর উন্মুক্ত আকাশের নামই মোক্ষ।

গণেশের বাহন কি? গণেশের বাহন মূষিক। মূষিক কি করে? কেটে ছারখার

করে' তেমনি তোমার কর্মফলগুলি কর্তন করো, ছেদন করো। কর্মফলমোচনের উপরেই সিদ্ধি প্রতিষ্ঠিত। আর গণেশই সিদ্ধির দেবতা, সিদ্ধিদাতা। কর্মফলগুলি না কাটা পর্যন্ত পৌঁছুবে না সিদ্ধিদ্বারে।

শিবের বাহন কি? শিবের বাহন বৃষ। বৃষ মানে ধর্ম। আর শিব মানে? শিব মানে মঙ্গল। ধর্মই কল্যাণকে বহন করে নিয়ে আসে। বৃষটি শুভ্র কেন? সত্ত্ব গুণের রঙটি শুভ্র। আর সত্ত্ব গুণের উদয়েই ধর্মের আবির্ভাব। বৃষের তো চার পা। ধর্মও চতুষ্পাদ। শৌচ দান দয়া ও তপস্যা এই তার চার ভিত্তি। যখন এই চতুষ্পাদ ধর্মের আচরণ করবে তখনই তোমার শিবদর্শন।

দুর্গার বাহন সিংহ। সিংহের ধর্ম কি? সিংহের ধর্ম হিংসা। অর্থাৎ তোমার জীবভাবকে হিংসা করো, হনন করো, জীবভাববিলয়ের মধ্যেই ব্রহ্মত্বের অভ্যুদয়।

এদিকে লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা। পেচক দিবান্ধ! আর মানুষ দিব্যান্ধ। অর্থাৎ যতক্ষণ মানুষ আত্মজ্ঞানে অন্ধ ততক্ষণ লক্ষ্মী ধনেশ্বরী মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত। পার্থিব সুখের অধিষ্ঠাত্রী হলেও আসলে লক্ষ্মী ব্রহ্মশক্তি। কিন্তু যতক্ষণ আত্মজ্ঞানে দৃষ্টিহীন ততক্ষণ এই ব্রহ্মশক্তির উপলব্ধি কোথায়?

কিন্তু সরস্বতী? সরস্বতী ব্রহ্মবিদ্যা। তাঁর বাহন হংস। হংস মানে প্রাণবায়ু। হং মানে নিশ্বাস, স মানে প্রশ্বাস। নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে যে মন্ত্রোচ্চারণ তাকেই বলে অজপা। আর যে অজপা মন্ত্রে সিদ্ধ তাকেই বলে হংসধর্মী। প্রতি নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে জপ হচ্ছে এই উপলব্ধি হলেই ব্রহ্মবিদ্যা। আর হাঁসের গুণ কি? দুধে জলে মিশেল হয়ে থাকলে জল ত্যাগ করে দুধটুকু গ্রহণ করে। তুমিও তেমনি নশ্বর থেকে ঈশ্বরকে সংগ্রহ করে নাও। তারি জন্যে হংসপৃষ্ঠে সরস্বতী।

আরো কটি ছোকরা এসেছে। একটির নাম মণীন্দ্র গুপ্ত। বয়েস পনেরো-ষোলো। কবি ঈশ্বর গুপ্তের দৌহিত্র। একদিন কি মনে করে এক বন্ধুর সঙ্গে শ্যামপুকুরে এসে হাজির। আর এদিক-ওদিক উঁকি-ঝুঁকি মারতে-মারতে একেবারে ঠাকুরের ঘরে।

বিছানায় শুয়ে ছিলেন ঠাকুর, হঠাৎ উঠে বসলেন। কে যেন এক আপনজন চলে এসেছে বিনা নিমন্ত্রণে। ইঙ্গিত করলেন কাছে আসতে। কাছে আসতেই গা-হাত-পা টিপে দেখতে লাগলেন অঙ্গগুলো। কানে-কানে বললেন, 'কাল আবার এসো। কেমন? কিন্তু কাউকে সঙ্গে এনো না। একা-একা এসো।' রাত কি আর কাটে! দিন এলেও কাজ কি সহজে ফুরোয়?

সন্ধ্যের আগেই এসে হাজির হল মণীন্দ্র। ঠাকুর একেবারে তাকে কোলের মধ্যে তুলে নিলেন। বললেন, 'এত দিন ছিলি কোথায় ?' বলেই সমাধিতে লীন হয়ে গেলেন।

সমাধিভঙ্গের পর কোল থেকে নামিয়ে দিলেন মণীন্দ্রকে। জিগগেস করলেন, 'কিছু একটা চাইবি ?'

'চাইব।'

'চা।' সরল শিশুর মত বললেন ঠাকুর।

কি যেন খানিকক্ষণ চিন্তা করল মণীন্দ্র। তার কিশোর কল্পনা কতদূর তাকে সাহায্য করল কে জানে, সে বলে বসল, 'আমাকে প্রকাশক্ষমতা দিন।'

'সে আবার কী জিনিস ?'

মণীন্দ্র বললে, 'চারদিকে কত লোক দেখি, জগতের কত সৌন্দর্য, কত বিচিত্র ব্যাপার, কিন্তু কিছুই প্রকাশ করে বলতে পারি না, লিখতে পারি না। আমার সেই দৈন্য মোচন করুন।'

ঠাকুর স্নিগ্ধমুখে হাসলেন। বললেন, 'তুই তাঁকেই নে না, যিনি সমস্ত কিছুর প্রকাশক। তাঁকে ধরলেই তো তিনি সব কিছু ধরিয়ে দেবেন।'

মণীন্দ্রর মনে হল কি একটা শক্তি তাকে আচ্ছন্ন অভিভূত করে ফেলছে। যেন মহাশূন্যে সে একাকী, কাকে যেন খুঁজে-খুঁজে ফিরছে, যেন একা থাকবার উপায় নেই, অথচ খুঁজে পাচ্ছে না সেই মহা একাকীকে। তাই আকুল হয়ে কাঁদছে মণীন্দ্র। সে কান্না আর থামে না।

ঠাকুর বললেন, 'একে অন্য ঘরে নিয়ে যাও।'

অন্য ঘরে নিয়ে গেল। সেখানেও কান্না।

ঠাকুরের সেবা করছে মণীন্দ্র। মণীন্দ্রর ডাক-নাম খোকা। সেবা করছে খোকা ও আরেকটি ছেলে। তার নাম পতু। দুজনে মিলে হাওয়া করছে ঠাকুরকে। একজনের হাত ব্যথা হলে আরেকজন।

দোল-পূর্ণিমার দিন। সবাই রঙের খেলায় মেতেছে, উড়ছে লাল আবিরের ধুলো। মণীন্দ্র আর হরিপদ, ডাক-নাম পতু—ঠাকুরের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে হাওয়া করছে।

'কি রে, রঙ খেলতে যাবিনে ?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'না।' চোখ নামিয়ে নিল মণীন্দ্র।

'সে কি রে, সবাই খেলছে, হুল্লোড় করছে। তোদের বয়সী ছেলেরা কেউ আজ চুপ করে বসে নেই। যা না, খেল না গিয়ে।' ঠাকুর আবার তাদের তাড়া

দিলেন।

'না, আমাদের রঙ খেলে দরকার নেই।' মণীন্দ্র জোরে পাখা করতে লাগল। ঠাকুরের সেবা ফেলে কিছুতেই গেল না। তোমাকে সেবা করাই আমাদের রঙ-খেলা। তুমি যদি আমাদের চোখের দিকে তাকাও সানন্দ চোখে, তাতেই আমাদের রঙিন হয়ে ওঠা।

ঠাকুর বলেন, মণীন্দ্রর প্রকৃতি-ভাব। ভগবানের নামগুণগান শুনেছে, কি, অমনি ভাবে বিভোর হয়ে নৃত্য করতে থাকে।

'কাল রাতে স্বপ্ন দেখেছি'—মহিমা চক্রবর্তী বললে এসে ঠাকুরকে।

'কি স্বপ্ন?'

'যেন আপনি আমাকে আদেশ করছেন মণীন্দ্র গুপ্তকে মন্ত্র দিতে।'

'কি মন্ত্র বলো তো?'

মহিমা সেই স্বপ্নে-পাওয়া মন্ত্রটি উচ্চারণ করল। উচ্চারণ করা মাত্রই ঠাকুর সমাধিতে ডুবে গেলেন। সমাধিভঙ্গের পর বললেন, 'হ্যাঁ, এই মন্ত্র, ওই মন্ত্রই তুমি দিও মণীন্দ্রকে।'

আমার কাজ আমি কাকে দিয়ে কার জন্যে কখন করিয়ে নেব, তা আমিই জানি।

আরো একটি ছোট ছেলে এসেছে, বারো বছর বয়স, নাম ক্ষীরোদ।

মাস্টার বললে, 'দেখুন, দেখুন, এই ছেলেটি বেশ। ঈশ্বরের কথায় খুব আনন্দ।'

'আহা, চোখ দুটি যেন হরিণের মত।' ঠাকুর তার দিকে নেত্রপাত করলেন। পা এগিয়ে দিলেন তার দিকে। ক্ষীরোদ পা-খানি তুলে নিল কোলের মধ্যে।

সেই ক্ষীরোদ গঙ্গাসাগর যাবে।

ঠাকুর বলছেন মাস্টারকে, 'আহা ক্ষীরোদ যদি গঙ্গাসাগরে যায়, তাকে তুমি একখানা কম্বল কিনে দিও।'

'দেব।'

একটু সুজির পায়েস খেতে বসেছেন ঠাকুর। আহা, যেন খেতে পারেন। খেতে যেন না কষ্ট হয়।

সত্যি খেতে পারলেন ঠাকুর। শিশুর মতন আনন্দ করে বললেন, 'খেতে পারলাম। মনটায় তাই বেশ আনন্দ হচ্ছে। তুমি ক্ষীরোদকে একটু দেখো। আমার অসুখ, আমি বলেছি তোমার কাছে গিয়ে উপদেশ নিতে। বেশ ভালো ছেলে। তুমি তার একটু যত্ন কোরো।'

'করব। আমার পাড়াতেই তো ওর বাড়ি।'

আর পূর্ণ? পূর্ণরও মোটে তের বছর বয়স কিন্তু বহ্নিময় অনুরাগ। ছাদ থেকে দেখেছে মাস্টারমশাই যাচ্ছে ট্রামে করে, দেখেই পাগলের মত ছুটে এসেছে রাস্তার উপরে। রাস্তার উপরে দাঁড়িয়েই প্রণাম করছে মাস্টারমশায়ের উদ্দেশে।

ঠাকুর শুনে বলছেন, 'আহা, কি অনুরাগ! কেন এই অনুরাগ? না, ইনি পরমার্থের সংযোগ করে দিয়েছেন। ঈশ্বরের জন্যে যে ব্যাকুল সেই পারে এমনি করে ছুটে আসতে।'

যদি একবার অন্তরে আসে সেই ব্যাকুলতা আর ফিরে যাওয়া নেই। যদি পাহাড় পড়ে, ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। যদি মরুভূমি পড়ে শ্যামছায়াচ্ছন্ন হয়ে উঠবে। যদি সমুদ্র পড়ে, বুকে করে তুলে নিয়ে যাবে তরঙ্গের উপর দিয়ে।

রায় বাহাদুর দীননাথ ঘোষের ছেলে, বাড়ি থেকে আসতে দিতে চায় না। বড়-লোকের ছেলে কিন্তু বাবা না দিলে পয়সা কই?

ঠাকুর পূর্ণর চিবুক ধরে আদর করে বললেন, 'যখনই সুবিধে হবে চলে আসবি এখানে। আমি তোর গাড়িভাড়া দেব।'

শুধু আমিই কি ওর জন্যে ব্যাকুল? ও ভীষণ চতুর। বলে, আমারও বুক কেমন করে আপনাকে দেখবার জন্যে।

তা হলেই আর কথা নেই। তা হলেই সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

নহবতখানায় নিয়ে এলেন একদিন। বললেন, 'এই পূর্ণ, একে পেট ভরে খাওয়াও।'

চোখ মেলে তাকাল পূর্ণ। ইনি কে? আনন্দময়ী ভুবনেশ্বরী। নম্রনেত্রা সমুৎসুকা।

'আগে মালা-চন্দনে সাজাও ছেলেটাকে, তার পরে ভোজনের আহুতি দাও।'

ঠাকুর আবার বললেন সেই গৃহলক্ষ্মীকে। সর্বসম্পৎস্বরূপা রাজলক্ষ্মীকে।

মায়ের মত স্নেহভরে পূর্ণকে কাছে টেনে নিলেন সেই মহিলা। মালাচন্দনে সাজিয়ে খাওয়াতে লাগলেন কাছে বসে। ঠাকুর বারে-বারে এসে উঁকি মারছেন, বলছেন, 'ওগো এই তরকারিটা একটু বেশি করে দাও।' আবার বাইরে যাচ্ছেন, আবার ঘুরে আসছেন। 'ওরে, কেমন খেলি? পেট ভরল?'

খাওয়া হয়ে গেলে বললেন, 'ওগো, একে হাত-মুখ ধোবার জল ঢেলে দাও।'

আঁচানো হয়ে গেলে পর ফের বললেন, 'ওগো, একে ষোলো আনা দিও।'

গৃহলক্ষ্মী একটি টাকা এনে পূর্ণর হাতে দিলেন। স্নেহার্দ্র স্বরে জিগগেস করলেন, 'বলো তো আমি কে?'

চিনত না, তবু চিনতে কি আর বাকি আছে? প্রাণ ঢেলে পূর্ণ বললে, 'তুমি আমার মা, সকলকার মা।'

ঘরে বসে পড়ছে পূর্ণ, দেখল জানলায় কার ছায়া। এ কি, মাস্টারমশাই। পড়া ফেলে ঘরের বাইরে ছুটে এল পূর্ণ। চোখে মুখে জলন্ত ঔৎসুক্য।

'ঠাকুরকে দেখবে?'

'কোথায়?'

'তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তার মোড়ে।'

'কোথায়? কোন মোড়ে?'

'শ্যামপুকুরের মোড়ে।'

ছুট দিল পূর্ণ। ঠাকুর ঠোঙায় করে সন্দেশ নিয়ে এসেছেন। দুই চোখে উজ্জ্বল সুখ নিয়ে বলছেন, 'ওরে তোর জন্যে সন্দেশ নিয়ে এসেছি। নে, খা।' বলে রাস্তার মাঝেই তার মুখে সন্দেশ তুলে দিলেন ঠাকুর।

ঠাকুর তখন অপ্রকট হয়েছেন, পূর্ণরও যাবার দিন এগিয়ে এসেছে। বিয়াল্লিশ বছর বয়সে যখন পূর্ণ চোখ বোজে, রোগশয্যা ছেড়ে একা-একা বাইরে গেছে, পা টলে পড়ে গেছে মূর্ছিত হয়ে। কেউ বুঝি নেই ধারে-পারে। না, একজন আছেন। সবল বাহুতে শিশুর মত পূর্ণকে কোলে তুলে নিলেন। তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে শুইয়ে দিলেন শয্যায়। চোখ মেলে তাকাল পূর্ণ। এ যে সেই ঠাকুর, সেই শ্যামপুকুরের রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে সন্দেশ খাইয়েছিলেন যিনি, সেই অহেতুক কৃপাসিন্ধু।

আরেকটি ছোট ছেলে আসে, সারদাপ্রসন্ন।

ঠাকুর বলেন, 'সারদার বেশ অবস্থা। আগে সঙ্কোচ ভাব ছিল, যেন ছিপের ফাতা টেনে নিত। এখন মুখে আনন্দ এসেছে।'

আর কি চাই। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। যে আনন্দ আকাশে-আলোকে উদ্ভাসিত, আমাতেও সেই আনন্দেরই প্রকাশ। তাকিয়ে দেখ আমার মুখের দিকে। আমার মুখে সেই অমৃতনেত্রস্পর্শ পড়েছে কিনা। পড়েছে বলেই তো আমি অকুণ্ঠিত, আমি উচ্চারিত, আমি উচ্ছ্বসিত।

প্রসন্ন বলছে দুঃখ করে, 'না হল জ্ঞান, না হল প্রেম। কি নিয়ে থাকি?'

'জ্ঞান হল না বুঝি, কিন্তু প্রেম হল না কেমন করে?' তারক জিগগেস করল।

'কই কাঁদতে পারলাম কই। কাঁদতেই যদি না পারলাম তাহলে আর প্রেম হল কি করে?'

আহা, দেখ না একবার ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে। জ্ঞান আর প্রেমের সমাহার।

একদিকে শঙ্কর আরেকদিকে গৌরাঙ্গ।

ঠাকুর বললেন, 'জ্ঞানীর ভিতর টানা গঙ্গা। আর ভক্তের ভিতর জোয়ার-ভাঁটা।'

জ্ঞানপথ বড় কঠিন পথ। এ পথ কলিকালের পক্ষে নয়। কলিকালের পক্ষে ভক্তি। জ্ঞান যায় সদরমহল পর্যন্ত, ভক্তি একেবারে অন্তঃপুরে। জ্ঞানী আইন মানে, ভক্তি অকুতোভয়। জ্ঞানীর কাম্য ভক্তি, ভক্তের কাম্য ভালোবাসা। জ্ঞান সূর্য, ভক্তি সুধাংশু।

আরেকটি ছেলে আসে, পলটু। কিন্তু তার বাবার সায় নেই।

'তুই তোর বাবাকে কি বললি?'

'বললাম, ওঁর ওখানে যাওয়া কি অন্যায়?'

'না, না, ওরকম করে জবাব করিসনি। দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।'

পলটু চলে যাচ্ছে, ঠাকুর সস্নেহকণ্ঠে বলছেন, 'ওরে এখানে আসিস এক-আধবার।'

'সময় পেলে আসব।'

'ওরে কলকাতায় যেখানে যাব, যাস একটু।'

'দেখব, চেষ্টা করব।'

'ওরে, কি রকম কথা তোর!'

'তাছাড়া আবার কি। চেষ্টা করব না বললে যে মিছে কথা বলা হবে।'

'তোদের মিছে কথা আমি ধরি না।'

সে এক জ্ঞানী ছিল অথচ অজস্র মিথ্যে কথা বলে। লোকে প্রতিবাদ করে, তিরস্কার করে। বলে, এদিকে ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে বলছ অথচ মিথ্যে কথা তো ঝুড়ি-ঝুড়ি। জ্ঞানী বললে, কেন জগৎ তো স্বপ্নবৎ। সবই মিথ্যে এ জ্ঞানই তো ব্রহ্মজ্ঞান। সবই যখন মিথ্যে তখন যাকে সত্য কথা বলছ সেটাও মিথ্যে। বুঝলে না, সত্যটাও মিথ্যা মিথ্যাটাও মিথ্যা।

হরীশ মুস্তফি এসেছে ঠাকুরের কাছে। যদি কটা আসন শিখিয়ে দেন।

ঘোরতর অসুস্থ রোগীকে কেউ এমন অনুরোধ করতে পারে? যখন করে ফেলেছে, প্রার্থনা পূরণ করতে হয়। বিছানার উপর উঠে বসলেন ঠাকুর। সাকার উপাসনার আসন শিখিয়ে দিলেন। নিরাকার উপাসনার আসন শেখাচ্ছেন, নিজেই সমাধিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন। ডাক্তার এত করে বলে গেছে, আর সমাধি ভূমিতে যাওয়া চলবে না যদি বাঁচতে চাই। তুমি চাও কিনা জানি না আমি তো চাই বাঁচতে। সুতরাং ডাক্তারের অনুরোধই বা

তুমি রাখবে না কেন? শুধু তো আরোগ্যের বাধা নয়, দুর্বিষহ ব্যাধিযন্ত্রণা।

ঠাকুর তাড়াতাড়ি নেমে এলেন সমাধি থেকে, প্রায় জোর করে। নেমে এসে যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন।

লজ্জায় বিবর্ণ মুখে হরীশ বললে, 'আপনার এত কষ্ট হবে অথচ আপনি ও সব করতে গেলেন কেন?'

'করতে গেলুম কেন? না করলে শিখবে কি করে? কষ্ট?' ঠাকুর হাসলেন, 'সবই তো তোমাদের জন্যে।'

'আমার কষ্ট তোমাদের জন্যে। আমার ধৈর্য তোমাদের জন্যে। আমার ত্যাগ তোমাদের জন্যে।'

রন্তিদেবের কথা মনে করো। সর্বপ্রকার দানে বিশেষত অন্নদানে যে সদাব্রত। বহুদিন উপবাসে কেটেছে রন্তিদেবের, সেদিন কিছু যোগাড় হয়েছে ভোজ্য দ্রব্য। সেই মুহূর্তে এক ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ এসে দ্বারস্থ হল। সেই অন্নের পর্যাপ্ত পরিমাণ দিয়ে তার পরিতুষ্টি করল রন্তিদেব। বাকি অন্ন পরিজনদের বিভাগ করে দিয়ে নিজাংশ নিয়ে বসল।

ভোজনে উদ্যত হয়েছে, এমন সময় শূদ্র জাতীয় আরেক অতিথি এসে উপস্থিত। নিজাংশ থেকে রন্তিদেব তাকেও দিয়ে দিল যথেষ্ট অন্ন।

সামান্য পরিমিত অবশিষ্টাংশ নিয়ে বসেছে, চেয়ে দেখল চোখের সামনে আরেক-জন দাঁড়িয়ে। তার সঙ্গে আবার কতকগুলি কুকুর। সে বললে, শুধু আমি নই, আমার কুকুরগুলিও বুভুক্ষু। আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করুন। হৃষ্টচিত্তে নত মস্তকে বাকি অন্ন তাদের দিয়ে দিল রন্তিদেব। তখন আর কিছুই খাদ্য নেই, শুধু খানিকটা জল রয়েছে পাত্রে। সেই জল খেয়েই ভোজন সমাধা করবে আজ। জলপাত্র মুখে তুলেছে, এক চণ্ডাল এসে সেই জলটুকু চাইলে। বললে আমার কাছে কোথাও নদী বা সরোবর নেই, পথশ্রমে দারুণ পিপাসার্ত হয়েছি, ঐ জলটুকু আমাদের দান করুন।

তথাস্তু। নিজে ক্ষুৎপিপাসায় ম্রিয়মাণ, তবু রন্তিদেব সেই জলটুকু দিয়ে দিল চণ্ডালকে।

বললে, 'আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে অষ্টৈশ্বর্যান্বিতা পরাগতি চাই না, চাই না মোক্ষ বা অপুনর্ভব। আমি যেন অখিল জীবের অন্তরে বাস করে তাদের সমস্ত দুঃখ নিজের মধ্যে টেনে নিই, যাতে তারা দুঃখ-মুক্ত হয়। জীবিতকামী জীবের জীবনরক্ষার জন্যে আমার জীবন বলি প্রদান করলেই আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা শ্রান্তি-ক্লান্তি-আর্তি-কাতরতা খেদ-বিষাদ শোক-মোহ সব অপগত হবে।'

তখন দেবতারা নিজ-নিজ মূর্তি ধরে দেখা দিল রন্তিদেবকে। বললে, তোমার ধৈর্য পরীক্ষা করতে আমরাই এসেছিলাম ছদ্মবেশে।

আমার প্রণাম নিন। আমাকে নিঃসঙ্গ ও বিগতস্পৃহ করুন। শুধু ভগবান বাসুদেবেই যেন আমার চিত্ত সমর্পিত থাকে। ঈশ্বর ছাড়া আমার আর কোনো ফলাকাঙ্ক্ষা নেই। যদি একমাত্র তাঁকেই আশ্রয় করতে পারি তাঁর গুণময়ী মায়া স্বপ্নের মতই বিলীন হয়ে যাবে।

'মায়াতে সৎকে অসৎ, অসৎকে সৎ বলে বোধ হয়।' বললেন ঠাকুর। 'এই মায়াকে সরিয়ে যে তাঁকে দর্শন করে সেই তাঁকে দেখতে পায়। কামারপুকুরের একটা পুকুর দেখেছিলাম পানায় বোঝাই। একটা লোক তৃষ্ণার্ত হয়ে সে পুকুরের কাছে এসে দাঁড়াল। পানা সরিয়ে জল খেল, সেই জল স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। লোকটা কি বোঝাল? বোঝাল, সচ্চিদানন্দ জল মায়ারূপ পানাতে ঢাকা। বোঝাল, যে সরিয়ে জল খায় সেই পায়।'

আমাকে সরিয়ে দেখব তোমাকে। অহংএর বৃন্তে ফোটাব আত্মার শতদল।

॥ ১৫৯ ॥

'তোমরা কাঁদলে বলে এত ভোগ করছি।' ঠাকুর বলছেন ভক্তদের দিকে চেয়ে। 'নইলে সবাই যদি বলো, এত কষ্ট, তবে দেহ যাক, তাহলে দেহ যায়।'

পাষাণেরও বুক ফেটে যায় কথা শুনে। ঠাকুরের কষ্ট চোখে দেখা যায় না অথচ এ কষ্টের অবসানের জন্যে দেহেরও অবসান হোক, এ ভাবলেও তো প্রাণ শতধা হাহাকার করে ওঠে।

প্রকাশ মজুমদার এক ডোজ নাক্সভমিকা দিয়েছে ঠাকুরকে। শুনে ডাক্তার সরকার খুব চটেছে। বললে, 'সে কি কথা! আমাকে না বলে নাক্সভমিকা দেওয়া! আমি তো মরিনি।'

'তোমার অবিদ্যা মরুক।' ঠাকুর বললেন পরিহাস করে।

পরিহাস ঠিক বুঝতে পারল না ডাক্তার। সে ভাবল অবিদ্যা মানে বোধ হয় গর্বিকা। গম্ভীর হয়ে বললে, 'আমার কোনো কালে অবিদ্যা নেই।'

ঠাকুর বুঝতে পেরেছেন ডাক্তার কি বুঝেছে। বললেন, 'না গো, তা বলিনি। সন্ন্যাসীর জানো তো, অবিদ্যা মা মারা যায় আর বিবেক সন্তান হয়। মা মারা গেলে অশৌচ হয়, তেমনি অবিদ্যার মৃত্যুতে সন্ন্যাসীর অশৌচ। তারই জন্যে সন্ন্যাসীকে ছুঁতে নেই।'

'আচ্ছা মশাই, পাপের শাস্তি আছে শুনেছি, অথচ ঈশ্বরই সব করেছেন, এ

কেমনতরো কথা?' বলেছিল শ্যাম বসু। 'বুঝিয়ে দিন!'
'কি তোমার সোনারবেনে বুদ্ধি!' ঠাকুর রঙ্গ করে উঠলেন।
'সোনারবেনে বুদ্ধি মানে ক্যালকুলেটিং বুদ্ধি।' বুঝিয়ে দিল নরেন।
'তোমার অত মাথাব্যথায় কাজ কি! ফিলজফি লয়ে বিচার করে তোমার কি হবে? আধপো মদেই তুমি মাতাল', বলছেন ঠাকুর, 'শুঁড়ির দোকানের মদের হিসেবে তোমার কি দরকার?'
ডাক্তার সরকার বললে, 'আর ঈশ্বরের মদ অনন্ত। সে-মদের শেষ নেই।'
'তুমি তাঁকে সব ভার দিয়ে চুপ করে বসে থাকো না।' বললেন ঠাকুর, 'সৎলোককে যদি কেউ ভার দেয়, সে কি অন্যায় করে? পাপের শাস্তি তিনি দেন কি না দেন তিনি বুঝবেন। তোমার কিসে ঈশ্বরে ভক্তি হয়, তাই দেখ।'
'মানুষ হিসেব করে কি বলবে?' ডাক্তারও চলে এসেছে ভক্তি-বিশ্বাসের পথে। বললে, 'তিনি সমস্ত হিসেবের পার।'
'মানুষের নিজের মধ্যে যেমন, ঈশ্বরের মধ্যেও তেমনি দেখে।' বললেন ঠাকুর। 'বলে কিনা ঈশ্বরের বৈষম্যদোষ। একজনকে সুখে রেখে আরেকজনকে দুঃখে রেখেছেন। নিজের গজ-ফিতে দিয়ে ঈশ্বরকে মাপতে যায়।'
ঠাকুরের বাহ্যিক দেহে দুর্দান্ত যন্ত্রণা, তবু তিনিই নিজে আবার ভক্তদের ভুলিয়ে রাখছেন। আমার কষ্ট দেখে ওদের মুখে ক্লেশচ্ছায়া দেখা দেবে, সে যে আমার ততোধিক কষ্ট।
সেই বড়বাজারে মাড়োয়ারী-ভক্তের বাড়ি গিয়েছিলেন, তার গল্প করছেন। হিন্দুস্থানী এক পণ্ডিতের সঙ্গে সেখানে আলাপ। তাকে ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'আচ্ছা জী, কারু ভক্তি হয় কারু হয় না, এর মানে কি?'
পণ্ডিতজী কি সুন্দর করে বললে। বললে, ঠিক ঠাকুরের প্রতিধ্বনি: 'ঈশ্বরে বৈষম্য নেই। তিনি কল্পতরু, যে যা চায় সে তা পায়। তবে কল্পতরুর কাছে চাইতে হয়।'
আঠারো শো ছিয়াশী সালের পয়লা জানুয়ারী ঠাকুর কল্পতরু হলেন।
বেলা প্রায় তিনটে, ছুটির দিন। গৃহস্থ ভক্তরা সমবেত হয়েছে কাশীপুরের বাগানে। ছুটির দিন, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করা যাবে। যদি এক ফাঁকে দেখা যায় একটু ঠাকুরকে।
অপেক্ষা করেই তো আছি। যেদিন সংসারে এসেছি তাঁর পাদপদ্ম-বিচ্যুত হয়ে সেই দিন থেকেই তো অনিকেত আমরা। এই সব মাটির ঘর কি আমাদের আশ্রয় হতে পারে? যে মুহূর্তে ডাক পড়বে সে মুহূর্তেই তো বিদায় হতে হবে।

বাড়ি-ঘরের মেরামত বাকি, দরজায় তালা লাগিয়ে আসি, কোনো ওজুহাতই শুনবে না। যে বাড়িতে শেষ পর্যন্ত কর্তৃত্ব নেই সে কি আমার বাড়ি? এই একটু বৃষ্টিটা ধরবার জন্যে ছাতার তলায় দাঁড়ানো। ডাকটি শোনবার আশায় একটু বসে যাওয়া। পথ চেয়ে অপেক্ষা করা। কখন আসবে সেই ডাকহরকরা কেউ জানে না। স্টেশনের মুসাফিরখানায় বসে আছি ট্রেন ধরবার জন্যে।

মুসাফিরখানায় কি ঘর-বাড়ি?

'ওরে ওরা আমার জন্যে সব বসে আছে।' ঠাকুর হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন: 'আমাকে কাপড়-জামা দাও, আমি পরব, সাজব, যাব আমি বাগানে বেড়াতে।'

এ কি অসম্ভব কথা! শয্যাশীন কঠিন রুগী, এ যাবে কি করে নিচে নেমে?

যাব, সহজেই চলে যাব, ওরা আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। এখানে ওদের আসতে বারণ, অনেক বিধি-নিষেধের কণ্টক। আমিই যাব আগ বাড়িয়ে। রোদে ওদের ছায়া দেব।

মনোহর বেশ পরব। তেলধুতি নয়, ধোয়া ধুতি। নিয়ে এস আমার বনাতের জামা। আমার কাঁচাকা টুপি। আমার ফুলকাটা মোজা।

একবার দুখানা তেলধুতি কিনতে বলে ছিলেন মাস্টারকে। মাস্টার তেলধুতি তো কিনলই, দুখানা ধোয়াও কিনল।

ঠাকুর বললেন, 'তেলধুতি দুখানি সঙ্গে দাও, আর ধোয়া দুখানা তুমি নিয়ে যাও।'

'যে আজ্ঞে।'

'আবার যখন দরকার হবে তখন এনে দেবে। আমার সঞ্চয় করবার জো নেই। সেবার সিঁথির ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবে বেণী পালের বাগানে গিয়েছিলাম। রাত দশটার পর কালীঘরে ফেরবার জন্যে গাড়িতে উঠেছি, দেখি বেণী পালের হাতে লুচি-মিষ্টির চ্যাঙারি। কি ব্যাপার? রামলাল আসতে পারেনি তার জন্যে কিছু খাবার দিতে চাচ্ছে। ও বাপু বেণী পাল, আমি বললুম তাকে মিনতি করে, আমার সঙ্গে ও সব দিও না। আমার সঙ্গে কোনো জিনিস সঞ্চয় করে নিয়ে যেতে নেই।'

সিন্ধুবাসী হীরানন্দ ঠাকুরকে পাজামা উপহার দিতে চায়। বলে, আমার দেশের পাজামায় বেশি আরাম পাবেন। তার আগ্রহ দেখে ঠাকুর বলছেন, দিও পাঠিয়ে।

আমার আবার আরাম-বিরাম! আমার আবার বসনভূষণ!

কোমরে কাপড় রাখতে পারছেন না ঠাকুর। প্রায় বালকের মত দিগম্বর। দুটি

ব্রাহ্মভক্ত এসেছে হীরানন্দের সঙ্গে। তাই এক-আধবার কাপড়খানি টানছেন কোমরের কাছে। হীরানন্দকে বলছেন, 'কাপড় খুলে গেলে তোমরা কি অসভ্য বল?' আপনার তাতে কি।' বললে হীরানন্দ, 'আপনি তো বালক।'

প্রিয়নাথ ব্রাহ্ম। তাকে ইঙ্গিত করে ঠাকুর বললেন, 'উনি বলেন।'

'মাইরি কোন শালা ভাঁড়ায়।' মাঝে-মাঝে এই বলে বালকের মত শপথ করেন ঠাকুর। 'মাইরি আমি সভ্য হয়েছি।' বলতে-বলতে কখন আবার বলে ওঠেন, 'কত মনে করি সভ্য হব কিন্তু মহামায়া যে বসন রাখতে দেন না শরীরে। আমাকে বালকের মত করে রাখেন। সেবার একটা ছোট ছেলে ফুল নেব বলে বায়না ধরলে। বাপ বোঝালে, নিতে নেই, ও ফুলে ঠাকুরপুজো হবে। কে শোনে কার কথা। ছেলে কান্না জুড়ে দিল। আমি তখন তাকে দিলাম সেই ফুল। ফুল পেয়ে কি আনন্দ সেই শিশুর। তারপর? তার পর দূর যাঃ, বলে সে ফুল সে ফেলে দিল ছুঁড়ে।'

প্রিয়নাথ বললে, 'আজ্ঞে পায়ে বন্ধন, এগুতে দেয় না।'

'থাক না পায়ে বন্ধন, মন নিয়ে কথা। মনে কেন বাঁধন পরাও?'

'হায়, মন যে আমার বশ নয়।'

'মন অভ্যাসের বশ। অভ্যাস কর, মনকে যে দিকে খুশি নিয়ে যেতে পারবে।' ঠাকুর লালপেড়ে ধুতি পরলেন, গায়ে দিলেন সবুজ বনাতের জামা। মোজা পায়ে চটিজুতো পরলেন। মাথায় আঁটলেন কানঢাকা কাপড়ের টুপি।

যার নাকি শয্যাশয়ন অসুখ, সে উঠে বসে সাজগোজ সমাধা করল। হেঁটে চলল। নেমে চলল সিঁড়ি দিয়ে। একেবারে এসে উপস্থিত হল সামনের মাঠে। যেখানে গৃহীভক্তরা জমায়েত হয়েছে। জমায়েত হয়ে তাকিয়ে আছে ঊর্ধ্ব মুখে। চলে এলেন সেই গৃহীদের আহ্বানে যিনি স্বয়ং সন্ন্যাসী হয়েও গৃহস্থের শিরোমণি। পর্বতচূড়ায় তুষার হয়ে বসে রইলেন না, নেমে এলেন সাধারণের সমতলে। পাপী তাপী দুঃখী দুর্গতদের মাঝখানে। যারা নানা বাধা বেদনায় জর্জর, সংশয়ে অবিশ্বাসে পীড়িত, আকাঙ্ক্ষায় অহঙ্কারে অভিভূত তাদের একেশ্বর। প্রবৃত্তিতে শত তাড়িত হয়েও যারা অম্লান ভক্তিমান। যারা সংসার-কারাগারে বন্দী থেকেও সর্বদা সেই নীল আকাশের ভিখারী।

এসেছে গিরিশ ঘোষ, অতুল ঘোষ, রাম দত্ত, অক্ষয় সেন, হারান দাস, কিশোরী রায়, বৈকুণ্ঠ সান্যাল। নবগোপাল ঘোষ, হরমোহন মজুমদার আর মাস্টারমশাই মহেন্দ্র গুপ্ত। আরো অনেক, হরীশ মুস্তফি, চুনীলাল বসু, উপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ওরে চেয়ে ছাখ কে এসেছে!

শরীরে বেঁচে থেকে যে বিশ্বাস করা যায় না। এ কি সত্যি, না, দিবাস্বপ্ন? একসঙ্গে এতগুলি লোকের দৃষ্টিভ্রম হয় কি করে? ওরে এ যে তিনিই। মর্তের ঘরে আকাশের দিনমণি!

কই তাঁর রোগ কই? কষ্ট কই? এ যে সর্বদীপ্ত প্রসন্নতা। সর্বশুভা পরিতৃপ্তি। দু-চোখে এত রূপ ধরে না। হৃদয়মৃৎপাত্রে ধরে না যে করুণার শ্রাবণ-উৎসার।

হে ঈশ্বর, বলতে পারো তুমি আমার কে? সকলের চেয়ে ভালো, সকলের চেয়ে মহৎ, সকলের চেয়ে মধুর, বলতে পারো তুমি আমার কে? সকলের চেয়ে কঠিন আবার সকলের চেয়ে করুণাময়। সকলের চেয়ে ন্যায়ী, সমস্ত বিচারের শেষ বিচার। সমস্ত অর্থের শেষ অর্থ। নতনম্র হয়েও প্রচণ্ড। এত কাছে অথচ কোন দুষ্প্রবেশ্য প্রচ্ছন্নে যেন গা ঢেকে আছ। অচঞ্চল, অথচ তোমাকে ধরতে পারছি না। নিজে বদলাচ্ছ না অথচ বাকি সমস্ত জিনিস বদলে বদলে দিচ্ছ। এত পুরোনো হয়েও নিত্য-নতুন। এত ব্যস্ত অথচ কি সুন্দর বিশ্রাম করছ! এত কষ্ট করছ অথচ মুখে কি অম্লান হাসি! এত সঞ্চয় করছ অথচ কিছু তোমার প্রয়োজন নেই। বলো তোমাকে ছাড়া কী আর আমার চাইবার আছে! আর সমস্ত পেলেও আমার তৃপ্তি নেই। তোমাকে চাইতে পারলেই আমার তৃপ্তি।

কিন্তু কি করে তোমাকে চাই, তুমি যদি না চাওয়াও। কি করে তোমাকে দেখি যদি তুমি না দেখা দাও দয়া করে?

তাই তুমি নিজের থেকেই চলে এলে নেমে এলে আমাদের মধ্যে। তোমার দুয়ারে কত রক্ষী, কত পাহারাওয়ালা, কত নিয়মকানুনের অস্ত্রশস্ত্র। সমস্ত বিধিনিষেধ তুমি নস্যাৎ করে চলে এলে। তুমি বুঝলে আমাদের দুঃখ, আমাদের অসামর্থ্যের অসাফল্যের বেদনা, তাই তুমি নিজের থেকে এসে ধরা দিলে। সৈন্য-সান্ত্রীরা লজ্জায় মুখ লুকোলো।

তুমি যে আমাদেরই একজন। তুমি যে আমাদের কাছে সংসারীর চেনা পোশাকে দেখা দিলে, গেরুয়া পরে এলে না। তোমার সন্ন্যাস তো সংসারের সঙ্কোচন নয় সংসারের সম্প্রসার। আমার ঘরের আঙিনাকে বিশ্বের প্রাঙ্গণে বড় করে দেওয়া। পরিবারকে পল্লীতে, পল্লীকে নগরে, নগরকে দেশে, দেশকে পৃথিবীতে, পৃথিবীকে তিন ভুবনে নিয়ে আসা। স্বদেশং ভবনত্রয়ং। একটি-একটি করে পাপড়ি উন্মোচিত করা। অহং-এর বৃন্তে বিশ্বাত্মার শতদল ফোটানো।

আর সকলে আমাদের পরিত্যাগ করেছে। কেউ গিয়েছে অরণ্যে, কেউ সমুদ্রে, কেউ শৈলশৃঙ্গে, কেউ বা কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনে। সাধ্যি নেই তাদের আমরা অনুসরণ করি। কি করে ছাড়ব রাজ্য, ছাড়ব স্ত্রী-পুত্র, কি করে বা সংসারনিবাস? তুমিই একমাত্র বললে, তোকে কিছু ছাড়তে হবে না, তুই বসে থাক তোর নিজের জায়গায়, নিজের কোটে, নিজের আয়ত্ত-অধিকারের মধ্যে। আমিই সমস্ত তীর্থ ঘুরে তীর্থোদকে কুম্ভ পূর্ণ করে তোর ঘরে এসে উঠছি। তোর ঘরেই তাঁর কোল পাতা। তোর সংসারই তাঁর পীঠস্থান। তুই ঠিক থাক, তুই ঠাঁই-নাড়া হসনি, যা আছে ভুবনে তাই তোর ভবনে, যা ব্রহ্মণ্ডে তাই তোর ভাণ্ডে, যা হোথায় তাই হেথায়।

যত মত তত পথ। এ কথা কে বলতে পারে? যে সমস্ত মত আচরণ করেছে সমস্ত পথ বিচরণ করেছে। আর সমস্ত মত সাধন করে সমস্ত পথ ভ্রমণ করে তুমি কোথায় এসে উঠলে? কোনো মঠে নয়, আখড়ায় নয়, গুহায় নয়, তরুতলে নয়, উঠলে এসে সংসারে, মা-মন্ত্রের প্রতিচ্ছবি নিয়ে। তুমি মাতৃভক্ত, তুমি বিবাহিত—এ তো সংসারীর লক্ষণ। আর সকলে হয় স্ত্রীকে ত্যাগ করেছে নয় পরিহার করেছে। তুমি তাকে অচলপ্রতিষ্ঠ মহিমা দিয়েছ। বিবাহের কি মহত্তম আদর্শ তাই দেখালে জগৎকে। বললে, আমি ষোলো আনা করে যাচ্ছি যাতে তোরা অন্তত এক পয়সা করিস। সাড়ে পনেরো আনা চাওনি—মোটে এক পয়সা। বললে, একটি-দুটি সন্তান হবার পর স্বামী স্ত্রী ভাই-বোন হয়ে যাস। স্ত্রী কত বড় শক্তি কত বড় শ্রী তাই বোঝালে তাকে পূজা করে। এত প্রকাণ্ড মহাভারত, কোথাও এর দৃষ্টান্ত নেই। তুমি মহাভারতকে অতিক্রম করলে। নারীকে কত বড় সম্মান, কত বড় স্বীকৃতি দিলে। এ সবই তো সংসারকে স্বর্গ করার জন্যে যে ঘরে নারীর মান নেই সে ঘর তো শ্মশান। যে জায়া সেই জননী। তোমার মা-মন্ত্র তো সংসারীর কান্না দিয়ে লেখা। যে মাকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছে সংসার ছেড়ে, তার মুখে মা-ডাক আর ফুটবে কি করে? তাতে থাকবে কি করে সত্যের সুর সারল্যের সুর? ও মা ডাক তো তোমার-আমার। যেহেতু তুমি-আমি দুজনেই সংসারী।

এক হিসেবে সংসারীই তো মুক্ত। ঈশ্বরের জন্যে সে সর্বস্বান্ত যাবে, যেমন তুমি গিয়েছিলে। তোমার কাছ থেকেই তার সব শেখা। তার মধ্যে কোনো গণ্ডি নেই, গোষ্ঠী নেই, সম্প্রদায় নেই। সব কিছুই সে মানে, যেমন তুমি মানতে, হাঁচি টিকটিকিও মানতে। সে পাদরির কাছেও যাবে, পীরের দরগায়ও যাবে। কোঁটা-তিলকের কাছে যাবে, যাবে ত্রিপুণ্ড্রকের কাছে। বেলতলায়, ষষ্ঠীতলায়।

অশ্বত্থ-পাকুড়ের নিচে, হয়তো বা কোনো জলাশয়ে। যে যা বলবে তাই শুনবে। একগুঁয়ে হবে না, একঘেয়ে হবে না। সর্বত্র তার রিক্ত পাত্রটি বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। যেখানে যেটুকু মধু পায়, যেটুকু রস পায়, তাই নিচ্ছে সংগ্রহ করে। সর্বত্র মধু। সর্বভূতে মধু। তুমিই বলেছ, সব যে বিশ্বাস করবে তার শিগগির হবে।

ঠাকুর গিরিশের কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'তুমি আমার সম্বন্ধে কী বলছ এখানে-সেখানে? আমার মধ্যে তুমি কি দেখলে?'

গিরিশ নতজানু হল। ঊর্ধ্বমুখে তাকাল ঠাকুরের দিকে। করজোড়ে বলল, 'ব্যাস-বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেনি, আমি তাঁর বিষয়ে আর কি বলব?'

চারদিকে জয়-জয় পড়ে গেল।

ঠাকুর হাত তুললেন। বললেন, 'তোমাদের চৈতন্য হোক।'

চারদিকে চৈতন্যের ঢেউ পড়ে গেল। দেশকাল দিকবিদিক মুছে গেল নিমেষে। প্রণামের প্রেমপুঞ্জাঞ্জলি পড়তে লাগল পায়ের উপর। কত সবাই প্রতিজ্ঞা করেছিল ঠাকুর সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত কেউ তাঁকে ছোঁবে না, তাদের কলুষস্পর্শে ক্লিন্ন করবে না সে দিব্য দেহ, সব ভুলে গেল। মনে হল এ নিত্যদীপ্রদ্ধ চৈতন্য, কিছুতেই এতে মালিন্যস্পর্শ নেই, সর্বাবস্থায়ই এ জ্যোতি বিশুদ্ধতম, এ জ্যোতি নির্মলতম। স্পর্শ করে অস্তিত্বের মধ্যে নিয়ে নাও সেই চৈতন্য প্রবাহ, বিদ্যুৎপ্রবাহ। রুদ্ধদ্বার বিদীর্ণ করে দাও। নিঃশস্যা বন্ধ্যাভূমিতে নিয়ে এস প্রবল জলস্রোত। জাগিয়ে দাও কুলকুণ্ডলিনী।

এ কাকে দেখছি! শিউরে উঠল রামলাল। ইষ্টমূর্তির ধ্যান করতে বসে কখনো তাকে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ করে দেখতে পাইনি। যখন পা দেখছি মুখ দেখতে পাইনি। যখন মুখ দেখছি তখন কোথায় পা দুখানি! এখন মনে হল সে মূর্তি যেন আশিরপদনখ স্পষ্ট ও স্থির হয়ে উঠেছে, হয়ে উঠেছে সর্বগঠনসুন্দর। হৃদয়পদ্মে আবির্ভূত হয়ে গোটা মূর্তি আলোকে পুলকে ঝলমল করে উঠেছে।

রমা দত্ত অঞ্জলিভরে ফুল দিতে লাগল পায়ে। ঠাকুর তাকে স্পর্শ করলেন।

ছুটি জহুরি চাঁপা নিয়ে এল অক্ষয় সেন। ফুল দুটি পায়ে দিতেই ঠাকুর তার বুক ছুঁয়ে দিলেন।

বেলেঘাটার হারান দাস পায়ের কাছে প্রণাম এনে রাখতেই ঠাকুর ভাবাবেশে তাঁর পাদপদ্ম রাখলেন তার মাথার উপর।

কৃপার কল্পতরু হয়েছেন ঠাকুর। আত্মপ্রকাশ করেছেন। করেছেন অভয়প্রকাশ। এই সেই মহাভাগ ভাগবতবৃক্ষ। গোচরণ করতে-করতে শীতলছায়ান্বিত গাছ

দেখে শ্রীকৃষ্ণ বললেন বয়স্যদের, 'এই সব মহৎ বৃক্ষকে দেখ। পরার্থেই এরা একান্ত-জীবিত। পরের উপকার করবার জন্যেই এরা জীবনধারণ করে। বাত বর্ষা হিম তাপ কত সহ্য করেছে অক্লেশে। সহ্য করে রক্ষা করছে আমাদের। এরাই সর্বপ্রাণীর জীবনধারণের হেতু, এদেরই বরজন্ম, কোনো যাচ্ঞাই এদের কাছে বিমুখ হয় না। পত্র-পুষ্প ফল ছায়া মূল বল্কল কাঠ গন্ধ নির্যাস ভস্ম অস্থি পল্লব—সব দিয়ে সকলের কামনা পূরণ করে। তেমনি প্রাণ মন বুদ্ধি বাক্য দিয়ে সর্বদা জীবের কল্যাণসাধন করাই মানুষজন্মের সার্থকতা।'

'ওরে কে কোথা আছিস এই বেলা চলে আয়, মুঠো-মুঠো অভয় কুড়িয়ে নে, আশ্বাস কুড়িয়ে নে।' সানন্দে চীৎকার করে উঠল অক্ষয়। 'চৈতন্যের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। কুড়িয়ে নে ভারে-ভারে। জ্ঞান ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য, যার যা খুশি, ঠাকুর কল্পতরু হয়েছেন। এমন দিন আর পাবি না রে। কৃপার পাত্র উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন প্রভু। আয়, নিয়ে যা দেখে যা।'

দেখে যা এই অমৃত ও অভয়ের অধিপতিকে। যাঁর চরণযুগলই সকল কর্মের ও সকল মঙ্গলের নিদান। স্পর্শ করে ধন্য হ সকলে।

ছুঁলেন নবগোপালকে, অতুলকে, হরমোহনকে। গিরিশকে, কিশোরীকে, রামলালকে।

বৈকুণ্ঠ বললে, 'আমাকে কৃপা করুন। আমাকে স্পর্শ করুন।'

ঠাকুর বললেন, 'তোমার তো সব হয়ে গিয়েছে।'

'আপনি যখন বলছেন হয়ে গিয়েছে, তখন আর তাতে ভুল কি।' তবু মুখের উপর যেন একটু কোথাও বিষাদছায়া লেগে আছে। 'কিন্তু অল্পবিস্তর একটু বুঝতে পারি তার ব্যবস্থা করে দিন।'

'বেশ, কাছে এস।'

কাছে এসে দাঁড়াল বৈকুণ্ঠ। ঠাকুর তার বুকের উপর হাত রাখলেন।

একটা বিরাট ভাবান্তর হল বৈকুণ্ঠের। দেখতে পেল চতুর্দিকে যেন ঠাকুর হাসছেন। গাছপালা বাড়িঘর লোকজন—এরা যেন গাছপালা বাড়িঘর লোকজন নয়, সবই ঠাকুর, ঠাকুরের সুহাস মূর্তি।

বিশ্বরূপ দেখে ভয় পেয়েছিল অর্জুন। শ্রীকৃষ্ণকে বললে, প্রতিসংহার করো এই মূর্তি, এ আমি সইতে পারছি না। আবার তুমি তোমার মানুষরূপটি ধরো। তোমার সেই সকলসুন্দরসন্নিবেশ সৌম্যমূর্তি।

বৈকুণ্ঠও তেমনি ভয় পেয়ে গিয়েছে। বললে, 'প্রভু, এ ভাব ধরতে পারছি না। দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছি, এ ভাবের উপশম ঘটিয়ে দাও।'

ঠাকুর হাসলেন। বৈকুণ্ঠ শান্ত হল

সন্তোষ অভ্যাস করবে। সন্তুষ্ট নিরীহ ও আত্মারাম ব্যক্তির যে সুখ কামধাবমান লোকের সে সুখ কোথায়? কামক্রোধের বরং অন্ত হয়, লোভের অন্ত হয় না। সঙ্কল্পত্যাগ দ্বারা কামকে, কামত্যাগ দ্বারা ক্রোধকে, অর্থে অনর্থ দর্শন দ্বারা লোভকে জয় করবে। আত্মানাত্মবিবেক দ্বারা শোক ও মোহকে, মহৎ লোকের সেবা দ্বারা দম্ভকে, মৌন দ্বারা যোগপ্রতিবন্ধককে, কামনা বিষয়ে অচেষ্টা দ্বারা হিংসাকে জয় করবে। যার থেকে ভয় তার হিতাচরণ করে সেই ভয় নিবারণ করবে। মনঃপীড়া ও দুঃখকে সমাধি দ্বারা, আত্মজনিত কষ্টকে যোগের দ্বারা, চাঞ্চল্যকে নির্জনবাস দ্বারা জয় করবে। অভ্যাসেই চিত্ত কাষ্ঠশূন্যবহ্নির মত শান্ত হয়ে যাবে। সর্ববৃত্তিতিরোহিত চিত্তই ব্রহ্মসুখ স্পর্শ করতে পারে। সেই পরাস্ত করতে পারে দুর্জয়া মায়াকে।

ওরে তোরা কে কোথা আছিস ছুটে আয়।

ঠাকুরের সন্ন্যাসী ভক্তরা ছিল ঘরের মধ্যে, তারা সে ডাকে সাড়া দিল না। ঠাকুর নিচে নেমে যেতেই তারা ঠাকুরের বিছানাপত্র রোদে দিতে লাগল, মেতে উঠল ঘর গুছোতে। কত দিন ঝাড়া-পোঁছা হয়নি, এবার এই সুযোগে সংস্কার করে নি। মার্জনা করে নি। তাই উপরের বারান্দা থেকে ঘটনাটা দেখলেও তাদের মধ্যে কোনো আগ্রহ-আবেগের ঢেউ জাগল না।

ওরে আর লোক কই, বেলা যে বয়ে গেল। কোথায় কে আছিস আর্তরক্ষিত অন্ধ-বিভ্রান্ত ছুটে আয়, কল্পতরুকে দেখে যা, বোধ এসে তাঁর ছায়ার আশ্রয়ে, তাঁর করুণায় নিকেতনে। চতুর্বর্গ ফল নিয়ে যা। জীবনে যা তোর অভীষ্টতম সে পরমধন স্পর্শমণিকে একবার স্পর্শ কর। লোহার কালো তনু কাঞ্চন করিয়ে নিয়ে যা।

রান্নাঘর থেকে হিড়হিড় করে রাঁধুনি বামুনকে টেনে আনল শিষ্য

'এ কি, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?'

'ওরে চেয়ে ভাখ, প্রভু আজ অকাতর হয়েছেন, নিয়ে যা কৃপার কণিকা।'

রাঁধুনি বামুনও এসে কুড়িয়ে নিল মহাস্পর্শ।

প্রাণ ঢেলে প্রাণ ভরে চা। আনন্দৈকমাত্র ভগবান সন্নিহিত খুলেছেন, তুইও তোর প্রার্থনায় অবারিত হ। চা না কি তোর চাইবার!

আমি কিছু চাই না। তোমার ফুল চাই না, ফল চাই না, ছায়া চাই না, কাঠ চাই না। হে মহাভাগ বৃক্ষ, আমি শুধু তোমাকে চাই।

॥ ১৬০ ॥

ঠাকুর আবার তাঁর বিছানায় এসে শুলেন।

কলিমলহন্তা অখিলপাপনাশন হরি সকলের পাপ টেনে নিলেন নিজের মধ্যে। আমরা, আমাদের কী হল? আমরা তো পাইনি সে পরমস্পর্শ। আমরা যে ঘোর কলিপীড়িত, কালপীড়িত। আমাদের উপায় কি?

কলিতে সর্বপ্রকার ধর্মাচারের নাশ, ধন আর বলেরই মাহাত্ম্য প্রাবল্য। অভিরুচি-মত স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ, প্রবঞ্চনা দ্বারা ক্রয়-বিক্রয়, সূত্রধারণ দ্বারা ব্রাহ্মণের পরিচয়, দণ্ড অজিন দ্বারা আশ্রম, চটুলবাক্য প্রয়োগ দ্বারা পাণ্ডিত্য আর দম্ভ দ্বারা সাধুতা প্রমাণিত হবে। উদরপূর্তিই একমাত্র প্রয়োজন, কুটুম্বভরণই দক্ষতা, যশোলাভের জন্যেই ধর্ম। বলবত্তমই রাজা হবে আর করভারক্লিষ্ট অপদস্তধন প্রজারা পাহাড়ে-কাননে আশ্রয় নেবে। দুর্ভিক্ষে প্রাণত্যাগ করবে। হিমে-রৌদ্রে বিনাদে-ব্যাধিতে ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় বেশি দিন বাঁচবে না। তমোগুণের প্রাধান্য হেতু মায়া, মিথ্যা, তন্দ্রা, নিদ্রা, শোক ও মোহ সকলকে আচ্ছন্ন করবে। তবে আমাদের উপায় কি? কলিকৃত অশুভের খণ্ডন হবে কি করে?

একমাত্র হরিকীর্তনে। সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে বিষ্ণুসেবা, কলিতে হরিকীর্তন।

একমাত্র কেশবকে হৃদয়স্থ করো। তাতেই মিলবে তোমার পরমা গতি, পরমা প্রতিষ্ঠা।

চুনীলাল বসুর আসতে দেরি হয়েছে। এখন এসে শোনে, ঠাকুর শুয়ে পড়েছেন আর তাঁর কাছে বর চাওয়া চলবে না। পা স্পর্শ করা দূরস্থান। কিন্তু এক-বারটিও কি দেখতে পাব না গোখের দেখা!

না। দ্বাররক্ষী নিরঞ্জন! সে আর কাউকে ঢুকতে দেবে না। অনেক ঘাঁটাঘাঁটি হয়েছে, অনেক হুলুস্থুল। এবার প্রভুকে একটু বিশ্রাম করতে দাও নির্জনে। এই চুনীলালের কত দুঃখ ঠাকুর বুঝেছেন। ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হবার আগে থেকেই তার কুলগুরুর থেকে তার দীক্ষা হয়েছিল। দুর্বল ফুসফুসে প্রাণায়াম করতে গিয়ে হাঁপানি হয়ে গেল তার। অনেক দিন যেতে পারেনি ঠাকুরের কাছে। একটু সুস্থ হয়ে সেদিন এসেছে, ঠাকুর তাকে দেখে তিরস্কার করে উঠলেন: 'তোমরা গৃহী মানুষ, তোমাদের ও সব কেন! ওসব যোগ-টোগ তোমাদের জন্যে নয়। অমন কাজ আর কোরো না, যাও গোপাল ব্রহ্মচারীর

কাছ থেকে তিন মাত্রা ওষুধ চেয়ে নাও গে। সেরে যাবে হাঁপানি।'

ঠাকুর কি করে জানলেন যে যোগ করে চুনীলাল? আর ঐ যোগের জন্যেই তার ব্যাধি?

আরো আশ্চর্য, গোপালের তিন মাত্রা ওষুধেই সেরে গেল হাঁপানি।

কত বুঝেছেন দুঃখদৈন্য। একটি গ্লাশ চেয়ে ফেলেছেন চুনীলালের কাছে, কিন্তু রূপো বা কাঁসার গ্লাশ কিনে দেয় চুনীলালের সাধ্যি কি? তখুনি বলে ফেললেন, 'তুমি শুধু একটা কাচের গ্লাশ দিও।'

প্রণব উচ্চারণের অধিকার নেই চুনীলালের। তাই মুখখানি ম্লান করে বসে আছে। ঠাকুর বললেন, 'সে কি রে, নাই বা হল প্রণবমন্ত্র। ভগবানের যে কোনো একটি নাম ধরে ডাক, অজস্র তাঁর ডাক নাম, দেখবি ঠিক সাড়া পাবি। মন্ত্রের জন্যে নামের জন্যে ভাবনা?

কত বুঝেছেন!

কি তার নাম কিছু জানি না। একমাত্র তোমাকে জানি। তোমার নাম রামকৃষ্ণ। সুতরাং রামকৃষ্ণই আমার জপমন্ত্র, আমার ধ্যানবস্তু।

নরেন এসে বললে, 'আজ যা বুঝলাম ঠাকুরের শরীর বেশিদিন থাকবে না। এই বেলা যা চাইবার চেয়ে নিন।'

'কিন্তু নিরঞ্জন ঢুকতে দেয় না যে।'

ঢের হয়েছে, অনেক তোলপাড় করেছ। কেশব সেন বলেছিলেন গ্লাশ-কেশে তুলে রাখতে, গ্লাশ-কেসের বাইরে তাঁকে ফুল দিতে, সে গ্লাশ কেস তোমরা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছ। আর কোনো প্রশ্রয়-প্রার্থনা শুনব না তোমাদের। আমরা কি করব! ঠাকুর তো করুণায় নিজের থেকে নেমে এসেছেন। তিনিই তো বইয়ে দিয়েছেন অমৃতস্পর্শের বন্যা, চৈতন্যের মহাপ্লাবন।

ও সব কথায় কান পাততে নিরঞ্জন রাজী নয়। ঢের শুনেছি। যাও ফিরে যাও। যেতে পাবে না উপরে। দেখা হবে না কিছুতেই।

কি একটা কাজে নিরঞ্জন একটু সরে গেল দরজা থেকে। ঠাকুরই সরিয়ে দিয়েছেন সন্দেহ কি। অন্তরের ব্যাকুলতার কাছে কিসের কি বাধার প্রহরা!

নিরঞ্জন সরে যেতেই নরেন ইশারা করল চুনীলালকে। আর অমনি চুনীলাল টুক করে ঢুকে পড়ল। একেবারে সটান দোতলায়। পা ছুঁয়ে প্রণাম করল ঠাকুরকে।

'আসতে দেরি হল বুঝি?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'আমার সব তাতেই দেরি।'

ধর্মের রাজ্যে ঈশ্বরের রাজ্যে কোনো দেরি নেই। দেরিতে এসেছ বলে তুমি

পাত পাবে না, এ হতে পারে না। তোমার খাবার ঠিক তোলা আছে।
'তাতে কি।' ঠাকুর ইশারা করে চুনীলালকে কাছে ডাকলেন : 'তুমি কিছু চাও?'
'চাইব না, এ কখনো হতে পারে? চাই।'
'বেশ তো বলো না কি চাইবে?'
সত্যিই, কি চাইল কিছুই মনে এল না চুনীলালের। কোন চাওয়াটা সেরা চাওয়া, কোন বস্তুর তার তীব্রতম অভাব, কি চাইলে আকাঙ্ক্ষাকে মর্যাদাবান করা যায়, কিছুই বুঝে উঠল না। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।
শোন, কিছুই চাইতে হবে না, শুধু এইটেতে ভক্তি-বিশ্বাস রাখিস, তা হলেই হবে। ঠাকুর নিজের দেহের দিকে সঙ্কেত করলেন, 'শুধু তোর হবে না, সকলের হবে।'
জয় রামকৃষ্ণ! আর কি চাই। সাধ্যি কি কলি আমাদের বলি দেয়!
শুধু বিশ্বাস! শুধু নাম। অভ্যাসে অনুরাগ। অনুরাগই ভক্তি। অনুরাগই স্পর্শ-মণি। পতিত, স্খলিত, আর্ত, ক্ষুধিতও যদি 'হরিকে নমস্কার' একবার বলে তা হলেই তার সর্ব পাতকের মোচন ঘটে। সূর্য যেমন তমসাকে ও ঝড় যেমন মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে যায় তেমনি হরিনামও সকল দুঃখ-কুজ্ঝটিকা বিদীর্ণ করে ফেলে। যে কথায় হরির প্রসঙ্গ নেই সে কথা মিথ্যা, সে কথা অসৎ। সেই কথাই সত্য সেই কথাই মঙ্গল সেই কথাই পুণ্য যে কথায় ভগবানের গুণের কথার বর্ণনা আছে। উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের জয়গানই রমণীয় ও রুচির ও নিত্য নবীন আর তাই মানস মহোৎসব। 'তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং।' হরিনামই মানুষের শোকার্ণবশোষণ।
আবার আরেকদিন রোগশয্যা থেকে উঠে পড়লেন ঠাকুর।
লাটু রাখাল নরেন নিরঞ্জন ঠিক করেছে বাগানের মধ্যে ঐ যে খেজুর গাছ আছে, শেষ রাত্রে তারা রস চুরি করে খাবে। ঠাকুর তা টের পেয়েছেন। কিন্তু ঐ খেজুর গাছের তলায় যে একটা কালসাপ। কি করলেন। উঠে পড়লেন বিছানা ছেড়ে। যে পথ দিয়ে ছেলেরা যাবে সে পথ দিয়ে নয়, অন্য পথ দিয়ে তিনি রওনা হলেন গাছের দিকে। সাপটা তাড়িয়ে দিয়ে আবার এসে বিছানা নিলেন। যেমন বেগে গিয়েছিলেন তেমনি বেগে চলে এলেন।
অতন্দ্রা প্রার্থনার মত শ্রীশ্রীমা ছিলেন জেগে। তিনি দেখলেন ব্যাপারটা।
আর ছেলেরা? ছেলেরা সেই খেজুর গাছই খুঁজে পায় না। বাগানের প্রতিটি গাছ যাদের চেনা, চেনা সমস্ত আনাচ-কানাচ, তাদেরই চোখের কাছ থেকে

গাছ আজ উধাও হয়ে গেল। ঘুরে-ঘুরে সবাই ক্লান্ত কিন্তু গাছের পাত্তা নেই। সবাই বুঝল এ প্রভুর কৌতুক।

পরদিন পথ্য খাওয়াবার সময় শ্রীমা জিগগেস করলেন, 'কাল রাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠে ছুটেছিলে কোথায়?'

'তুমি দেখেছ বুঝি?' ঠাকুর তখন বললেন কি হয়েছিল। তার পর বললেন অন্তরঙ্গের মত, 'তুমি যেন এই কথা কাউকে বোলো না।'

রাখালকে ডেকে পাঠালেন ঠাকুর। বললেন, 'এই অসুখ, খাজাঞ্চী-টাজাঞ্চী বলবে, প্রায়শ্চিত্ত করলে না। তুই দশটা টাকা নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে যা, মা-কালীকে নিবেদন করে বামুন-টামুনদের বিলিয়ে দে।'

সারদামণিকে কাছে ডাকলেন। বললেন, 'আমার ইষ্ট-কবচ তুমি নাও, তোমার কাছে রেখে দাও।'

'না, না', অন্তরে হাহাকার করে উঠলেন শ্রীমা, 'তোমার জিনিস তোমার কাছেই থাক।'

বলা বৃথা। ঠাকুর বাহু থেকে খুলে ফেলেছেন ইষ্ট-কবচ। শ্রীমা'র হাতে সঁপে দিয়েছেন। তবে কি মহাপ্রস্থানের আর দেরি নেই! চলে যাবেন বলেই কি দেহে আর ইষ্টকবচ রাখতে চাচ্ছেন না?

আমি আর তবে কি করতে পারি? কাঁদতে পারি মনের নিরালায়। প্রভু, তুমি শোনো। তুমি বিধান করো। তুমি আমাকে অবসন্ন হতে দিও না।

দ্রৌপদী খেয়ে-দেয়ে সুখাসীন হয়েছে, অযুত শিষ্য নিয়ে দুর্বাসা কাম্যক-বনে এসে উপস্থিত। আতিথ্য-গ্রহণে নিমন্ত্রণ করল যুধিষ্ঠির। আহ্নিক সমাধান করে আসুন।

সশিষ্য স্নান করতে গেল দুর্বাসা। দ্রৌপদীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। এত লোককে খাওয়াব কি করে?

অনন্যোপায় হয়ে দ্রৌপদী কৃষ্ণকে ডাকতে লাগল: হে বাসুদেব, হে জগন্নাথ, প্রণতার্তিবিনাশন, হে বিশ্বম্ভর, হে পরাৎপর, হে সর্বসাক্ষী পরাধ্যক্ষ, আমাকে রক্ষা করো। হে শরণাগতবৎসল নীলোৎপলদলশ্যাম, পদ্মারুণেক্ষণ, দুঃশাসনের থেকে যেমন একদিন মুক্ত করেছিলে, আজ আবার এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ করো।

ভক্তবৎসল কৃষ্ণ পার্শ্বশায়িনী রুক্মিণীকে ত্যাগ করে চলে এলেন ত্বরিত গমনে। প্রণাম করে দ্রৌপদী বললে তাকে দুর্বাসার কথা।

কৃষ্ণ বললে, 'দ্রৌপদী, আমি অত্যন্ত ক্ষুধিত, আগে আমাকে ভোজন করাও।'

লজ্জায় অধোমুখ হল দৌপদী। কাতরকণ্ঠে বললে, 'আমার ভোজন পর্যন্ত থালা অন্নে পরিপূর্ণ থাকে, কিন্তু আজ আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছে, কিছু নেই আর থালাতে।'

বাসুদেব বললেন, 'আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত, এখন কি পরিহাস করা উচিত? শিগগির সেই থালা এনে আমাকে দেখাও।'

নির্বন্ধাতিশয় লঙ্ঘন করতে পারল না দ্রৌপদী। থালা এনে দেখাল। থালার কণ্ঠে কিঞ্চিৎ শাকান্ন সংলগ্ন ছিল, বাসুদেব তা খেয়ে কৃষ্ণাকে বললেন, 'এতে বিশ্বাত্মা প্রীত ও পরিতুষ্ট হোক।' ভীমকে বললেন, 'যাও, ব্রাহ্মণদের ডেকে আনো।'

দেবনদীতে স্নান করছে দুর্বাসা ও তার শিষ্যরা, ভীমসেন ডাকতে এল। দুর্বাসা বললে, 'আমাদের আর খেয়ে দরকার নেই, পেট ভরে গিয়েছে। পেট ভরে গিয়েছে।' উদ্গার তুলতে লাগল সকলে। বললে, 'আমাদের জন্যে আর রাঁধতে হবে না। পাকক্রিয়া বন্ধ করুন।'

বৃথা পাকের জন্যে হয়তো অপরাধী হলাম। পাণ্ডবের কোপদৃষ্টিতে আমরা না ভস্মসাৎ হই। ব্রতধারী তপস্বী সদাচাররত নারায়ণ-পরায়ণ পাণ্ডবেরা ক্রোধোদ্দীপ্ত হলে আমরা তুলোর মত পুড়ে মরব। অতএব শীঘ্র পালাই চলো।

পাঞ্চালকুমারী, ভয় নেই। বললে কৃষ্ণ, যারা ধর্মের অনুগত তারা কখনোই অবসন্ন হয় না।

ঠাকুর বললেন, সেখানে সন্তোষ করলেই সকলেই সন্তোষ।

মূলে জলসেচন করো। শাখায়-পল্লবে কে জল দেয়, গোড়ায় জল পেলেই বৃক্ষ পল্লবিত, কুসুমিত ও ফলান্বিত হয়ে উঠবে।

ডাক্তার সরকার বলছে ঠাকুরকে দেখিয়ে, 'ইনি যা বলেন তা অত অন্তরে লাগে কেন? ওঁর সব ধর্ম দেখা আছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, শাক্ত, বৈষ্ণব—সব উনি নিজে করে দেখেছেন। মধুকর নানা ফুলে বসে মধু সঞ্চয় করলে তবে চাকটি বেশ হয়।'

যত মত তত পথ কে বলতে পারে? যে সব মত আচরণ করেছে, সব পথ বিচরণ করেছে। সব পথই পৌঁছেচে গিয়ে ঈশ্বরে। সব পথ হেঁটে সেই চূড়ান্তকে স্পর্শ করে ফিরে-ফিরে এসেছে।

ফিরে এসেছেন আমাদের জন্যে। ছেড়ে যাওয়াতেও ঈশ্বর, ফিরে আসাতেও ঈশ্বর। সন্ন্যাসেও ঈশ্বর, সংসারেও ঈশ্বর। যেখানে থাকো সেখানেই রামের

অযোধ্যা।

মহিমাচরণ বললে, 'আপনার যখন অসুখ তখন ডাক্তারেরা তার কি করবে? এ হচ্ছে ডাক্তারদের অহঙ্কার বাড়ানো।'

ঠাকুর মহেন্দ্র সরকারকে দেখিয়ে বললেন, 'ইনি খুব ভালো ডাক্তার, আর এঁর খুব বিদ্যা।'

'তা কে সন্দেহ করে!' বললে মহিমাচরণ, 'উনি জাহাজ আর আমরা ডিঙি। কিন্তু ওখানে, ঠাকুরের পায়ের দিকে ইঙ্গিত করলে, 'ওখানে সবই সমান।'

আমি তো চিকিৎসা করতে আসিনি, আমি নিজেই চিকিৎসিত হতে এসেছি। আমার তিনি অহঙ্কার বাড়াবেন কি, আমার অহঙ্কার তিনি ধুলো করে দিলেন। জড়বাদী ছিলুম, জড় যে চৈতন্যের ছদ্মবেশ ছাড়া কিছু নয় তাই শিখলুম দেখতে। অণুতায় মানতুম না কিন্তু দেখলুম গোষ্পদীকৃত যে জল তাই আবার সমুদ্রায়িত। বিজ্ঞানী ছিলুম কিন্তু দেখলুম জানার বাইরে অজানা কি বিশাল। সেই মহৎ অজানাকে স্বীকার করলুম, প্রণাম করলুম। শুষ্ক ছিলুম, ঠাকুর আমাকে 'রসিয়ে' দিলেন। বললেন, শুকনো আছ কিন্তু তুমি রসবে। আমি রসাস্বাদপরিপূর্ণ হয়ে উঠলুম।

চিরপুরাতনের মধ্যে দেখলুম সেই নিত্যনতুনকে। যিনি সর্বদা অনুভূয়মান হয়েও আপন মাধুর্যের দ্বারা অননুভূতের মত বিস্ময় জন্মিয়ে থাকেন, তিনিই তো নিত্য-নতুন।

হে অপরিমেয় অমৃত, তোমাকে বুঝতে না দাও, দাও আস্বাদ করতে। অন্তত এটুকু যেন বুঝি তোমার সর্বব্যাপী ভূমামূর্তির কাছে সকলে পরাভূত। তোমার বিশ্বরূপ দেখলে পৃথিবীকে মনে হবে পরমাণু, সমুদ্রকে জলবিন্দু, জ্যোতির্মণ্ডলকে অগ্নিকণা, বায়ুমণ্ডল ক্ষণিক শ্বাসক্রিয়া, বিশ্বব্যাপী আকাশ সূচীছিদ্র, জগৎ-উৎপত্তি-প্রলয়কারী ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রভৃতি দেবতা সামান্য জীব আর অন্যান্য দেবদেবী ক্ষুদ্র কীটাণু।

হে পূষণ হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা তুমি সত্যের মুখ আবৃত করেছ। সত্যধর্মের জন্য যে উন্মুখ তার দৃষ্টি ত তুমি একে উন্মুক্ত করো।

তিনজনকে পরাভূত করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

প্রথম, নীরন্ধ্র সংশয়—নরেন্দ্রনাথ; দ্বিতীয়, দুরপনেয় পাপ—গিরিশচন্দ্র; তৃতীয় স্পর্ধোদ্ধত বিজ্ঞান—মহেন্দ্র সরকার।

নিশাচর একটা পাখি ডেকে উঠল রাতের অন্ধকারে। অমঙ্গলের ভয়ে শ্রীমা'র মন শিউরে উঠল। না, অমঙ্গল কোথায়! সর্বত্র শিব, সর্বত্র শুভ। সর্বত্র

শান্তি। সমস্ত বিশ্বের স্বস্তি হোক। খল প্রসন্ন হোক, অনুকূল হোক। সমস্ত প্রাণী পরস্পরের হিতচিন্তা করুক। শুধু ভজনা করুক মৃত্যুঞ্জয় মঙ্গলকে। আর কিছু নয়, ঈশ্বরে মতি হোক অহৈতুকী।

॥ ১৬১ ॥

অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করে বহু দেবসৈন্য মারা গেল। দুর্বাসার শাপেও স্বর্গ শ্রীহীন, যাগযজ্ঞ লুপ্তপ্রায়। নিরুপায় হয়ে দেবতারা সুমেরু পর্বতে ব্রহ্মার শরণ নিলে। ব্রহ্মা তাদের নিয়ে এল ক্ষীরোদসাগরের পারে, বিষ্ণুর কাছে। বিষ্ণু বললে, অসুরদের সঙ্গে সন্ধি কর, তারপর সমুদ্রমন্থন করে উদ্ধার করো অমৃত। সেই অমৃতেই স্বর্গের পুনরুজ্জীবন হবে।

মন্দরপর্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকিকে রজ্জু করে নাও। প্রথমে বিষ উঠবে তাতে ভয় কোরো না। অনেক হয়তো কাম্যনীয় বস্তু উঠবে তাতে লোভ কোরো না। লোভের জিনিস না পেলে ক্রোধ কোরো না। যদি কোথাও শান্তি থাকে তা অন্বেষণ।

অসুররাজ বলির কাছে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে হাজির হল দেবতারা। সন্ধিতে সম্মত হল বলি। কিন্তু এ কি কাণ্ড, জলে নেমেই মন্দর ডুবে গেল অতলে। ভগবান তখন কচ্ছপশরীর ধারণ করে মন্দরকে পিঠে তুললেন। তাকে দাঁড়াবার আধার দিলেন।

শুরু হল মন্থন। প্রথমেই হলাহল উঠল। দেবতারা ভয় পেয়ে গেল, সর্বপ্রাণীর সুহৃদ শঙ্করের শরণ নিল। অন্যের বিপদে এগিয়ে যাওয়া, অন্যের দুঃখে সন্তপ্ত হওয়াই অখিলাত্মা পরমপুরুষের আরাধনা। যারা আত্মমায়ায় মুগ্ধ, পরস্পর বৈরভাবে আবদ্ধ তাদের প্রতি কৃপা করলেও ভগবান প্রীত হবেন। সুতরাং আমি এই বিষ পান করব প্রজাগণের স্বস্তি হোক।

মহাদেব অঞ্জলি করে পান করল হলাহল। তীব্র বিষের প্রভাবে কণ্ঠ নীল হয়ে গেল।

আবার মন্থন চলল। ক্রমশ উঠল সুরভি নামে গাভী, উচ্চৈঃশ্রবা নামে অশ্ব, ঐরাবত নামে হস্তী, পুষ্পদন্ত প্রভৃতি অষ্ট দিগ্‌গজ, কৌস্তুভ নামে পদ্মরাগমণি আর পারিজাত নামে সর্বকামবরদ বৃক্ষ। সর্বশেষে উঠলেন শ্রীদেবী।

দেবী নিজের জন্যে আশ্রয় খুঁজতে লাগলেন। তাকালেন ব্রহ্মার দিকে। উচ্চপদ আছে কিন্তু কামজয় নেই। তাকালেন শুক্রাচার্যের দিকে। জ্ঞান আছে কিন্তু অনাসক্তি নেই। তাকালেন সনকের দিকে। সর্বসঙ্গবর্জিত বটে কিন্তু সমাধিলীন। তাকালেন পরশুরামের দিকে। ধর্ম আছে কিন্তু দয়া নেই।

তাকালেন মার্কণ্ডেয়ের দিকে। দীর্ঘ আয়ু আছে কিন্তু শীল নেই, মঙ্গল নেই। তাকালেন দুর্বাসার দিকে। তপস্যা আছে কিন্তু ক্রোধজয় নেই। কোথায়, কোথায় আমার আশ্রয়?

তাকালেন মুকুন্দের দিকে। আত্মারাম, জ্ঞানকর্মপ্রেমের মূর্তির দিকে। তাকেই বরণ করলেন। তার পর উঠল সুরা নামে আরেক কন্যা। অসুরেরা তাকে আয়ত্ত করল। তোমরা শ্রীকে নাও আমরা সুরাকে নেব। এবার অমৃতকুম্ভ হাতে উঠে এল ধন্বন্তরি। তার হাত থেকে অসুরেরা ছিনিয়ে নিল সুধাভাণ্ড। দেবতারা হতভম্ব হয়ে গেল। ম্লান মুখে দাঁড়াল এসে শ্রীহরির সামনে। শ্রীহরি মোহিনী মূর্তি ধরলেন। মোহিনীকে দেখে অসুরেরা কামোন্মত্ত হয়ে উঠল। বললে, ভামিনি, অমৃতের অভিলাষে আমরা পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হয়েছি, তুমি আমাদের এই গৃহকলহ ভঞ্জন করো। এই অমৃতকুম্ভ তুমি নাও, তুমিই বণ্টন-বিতরণ করে দাও।

মোহিনীর হাতে অমৃতকুম্ভ তুলে দিল অসুরেরা। এক পঙক্তিতে দেবতা ও আরেক পঙক্তিতে অসুরদের আলাদা করে বসিয়ে দিল মোহিনী। এবার যাকে যোগ্য মনে করি তাকেই দেব এই অমৃত, জরামরণহারিণী সুধা।

শুধু চারুবাক্যে অসুরদের তৃপ্ত রাখল মোহিনী। অমৃত পান করাল দেবতাদের। অসুর-রাহু দেবচিহ্ন ধারণ করে বসেছিল দেবতাদের পঙক্তিতে। সে-ও অমৃত পান করলে। চন্দ্র-সূর্য চিনতে পারল রাহুকে। ছদ্মবেশী, তুমি এখানে? চক্র দ্বারা তার মাথা কেটে ফেলল তক্ষুনি। মাথা কাটলে কি হবে, অমৃত পান করেছে রাহু, তাই মরল না। চন্দ্র-সূর্যের চিরশত্রু হয়ে রইল।

শ্রীহরি তখন স্ত্রীরূপ ত্যাগ করলেন।

এই কাণ্ড?

অসুরেরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। দেবতাদের আক্রমণ করলে। শুরু হল তুমুল যুদ্ধ। দেবতারা অমৃত পান করেছে, তাদের সঙ্গে কে পারবে? বলি দ্বৈরথসংগ্রামে ইন্দ্রকে আহ্বান করলে। এত বড় কথা? ইন্দ্র তার শতপর্ব বজ্র উত্তোলন করে বলির দিকে ধাবমান হল। স্পর্ধা করে বললে, এখুনি আমি তোর শিরশ্ছেদ করছি।

বলি হাসল। বলল, বৃথা হর্ষ রাখো। আমরা সকলে কালপ্রেরিত হয়ে কর্ম করছি, তুমি যদি জয়ীও হও, মনে কোরো না তুমি তোমার জয়ের বা আমার পরাজয়ের কর্তা। কর্তা স্বয়ং বিভু। তুমি নিতান্ত অজ্ঞ, তাই স্পর্ধান্বিত রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করছ।

তর্ক রাখো। বজ্রাঘাতে বলিকে ভূতলে নিক্ষেপ করল দেবরাজ।
অসুরেরা বলিকে অস্তপর্বতে নিয়ে গেল। শুক্রাচার্য তাঁর সঞ্জীবনী দিয়ে বলিকে বাঁচিয়ে দিলেন। লোকতত্ত্বে বিচক্ষণ বলি, পরাজয়েও খিন্ন হল না, পরাভূত হল না।
পিতামহ প্রহ্লাদকে প্রণাম করে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ আরম্ভ করল। যজ্ঞের হুতাশন থেকে রথ অশ্ব ধ্বজ ধনু তূণীর কবচ উত্থিত হল। শুক্রাচার্য দিব্য শঙ্খ দিলেন। ইন্দ্রপুরী অবরোধ করল। ধ্বনিত করল সেই মহাস্বন শঙ্খ। দেবগুরু বৃহস্পতি ভয়চকিত হয়ে ইন্দ্রকে গিয়ে বললেন, স্বয়ং শ্রীহরি ছাড়া কেউ বলিকে নিরস্ত করতে পারবে না। তোমরা দ্রুত অদৃশ্য হও, অর্থাৎ পলায়ন করো।
পালিয়ে গেল দেবতারা। বলি স্বর্গপুরী অধিকার করে বসল।
দেবমাতা অদিতি স্বামীত্যক্ত আশ্রমে অনাথার মত বাস করতে লাগল। অদিতিপতি কশ্যপ একদিন ফিরে এলেন আশ্রমে। দেখলেন আশ্রম আনন্দশূন্য, অদিতি দীনা-হীনার মত বসে আছে এক কোণে। কি, সমস্ত কুশল তো? কোনো অতিথি ফিরে যায়নি তো অনাদৃত হয়ে?
কুশল? এর চেয়ে ঘোরতর দুর্দিন আর কি হতে পারে? শত্রুরা আমার পুত্রদের লাঞ্ছিত করেছে, তাদের শ্রী হরণ করেছে, রাজ্য অধিকার করে নিয়েছে, আপনি যদি এর প্রতিবিধান না করেন তো কে করবে?
কিসের রাজ্য, কিসের শ্রী? কে-বা কার পতিপুত্র? কশ্যপ হাসলেন। সমস্তই বিষ্ণুমায়া। সেই মায়াতেই এই জগৎ স্নেহবদ্ধ, মোহাক্রান্ত। যদি কিছু সত্যবস্তু থেকে থাকে তা হচ্ছে ঈশ্বরভক্তি। ঈশ্বরভক্তিই অমোঘা, নিশ্চিতফলপ্রদা।
সুতরাং বাসুদেবপরায়ণ হও। পয়োব্রত নামে ব্রত উদ্‌যাপন করো। সে ব্রতের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে অসদালাপ বর্জন, উচ্চ-নীচ সমস্ত রকম ভোগ-ত্যাগ, সর্বভূতে অহিংসা আর ঈশ্বরে নিশ্চল একাগ্রতা।
ব্রত উদ্‌যাপন করল অদিতি। আদিপুরুষ ভগবান তার কাছে আবির্ভূত হলেন। প্রীতি-বিহ্বল হয়ে অদিতি ভূমিতে দেহ রেখে দণ্ডবৎ তাঁকে প্রণাম করল। রোমাঞ্চিতকায়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে উঠে দাঁড়াল। চোখ ছাপিয়ে নেমে এল আনন্দাশ্রু। প্রভু, দাঁড়াও, তোমাকে আরো একটুকু দেখি।
শোনো। বলপ্রয়োগে অসুরেরা এখন পরাজিত হবে না। আমি নিজে তোমার পুত্রত্ব গ্রহণ করে তোমার পুত্রদের রক্ষা করব। বলে অন্তর্হিত হলেন শ্রীহরি। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে অভিজিৎ মুহূর্তে অদিতির গর্ভে বামনদেবের জন্ম হল। বটুরূপ ধারণ করলেন। কত জনে কত উপহার নিয়ে

এল। সূর্য দিল সাবিত্রীমন্ত্র, বৃহস্পতি যজ্ঞোপবীত, পিতা কশ্যপ মেখলা, মাতা অদিতি কৌপীন। স্বর্গ দিল ছত্র, সোম দণ্ড, সরস্বতী অক্ষমালা, ব্রহ্মা কমণ্ডলু, কুবের ভিক্ষাপাত্র আর ভগবতী ভিক্ষা।

উপনয়নের পর ব্রাহ্মণবটু চলল বলির যজ্ঞক্ষেত্রে। প্রতি পদক্ষেপে ভূমিকে অবনমিত করতে-করতে।

এ কে তুমি অভিনব? তেজোদৃপ্ত রূপচ্ছটায় বলি অভিভূত হয়ে গেল। এস তোমার পা দুখানি নিজ হাতে ধুয়ে দিই।

নিজ হাতে পা ধুয়ে দিয়ে সেই পাদশৌচ জল মাথায় তুলে নিল বলি। বললে, আজ আমার যজ্ঞ ফলান্বিত, আমার পিতৃপুরুষ তৃপ্ত আর আমার কুল পাবিত হল। আপনার পদজলে আমার পাপ প্রক্ষালিত হল, আপনার পদন্যাসে ভূমিতল তীর্থীকৃত হল। আপনি যা ইচ্ছা করেন, তাই গ্রহণ করুন। আপনাকে প্রার্থী বলেই অনুমান করছি। গাভী কাঞ্চন গজ তুরঙ্গ রথ গৃহ অন্ন পেয় সমৃদ্ধ গ্রাম বিপ্রকন্যা যা আপনি অভিলাষ করেন, তাই আপনাকে দেব অকাতরে। দেব ভূরি-ভূরি।

তোমার এই বাক্য সুনৃত, ধর্মান্বিত, তোমারই কুলোচিত। বললে বামনদেব। তোমাদের বংশে এমন কেউ নিঃস্বত্ব কৃপণ জন্মেনি যে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে কোনো ব্রাহ্মণকে প্রত্যাখ্যান করেছে। মনে করো তোমার পিতা বিরোচনের কথা। শক্র দেবতা ছদ্মবেশ ধরে এসেছে জেনেও তাকে তার পরমায়ু দিয়ে ফেললে। তুমি যোগ্য কুলভূষণ। শোনো আমার যাচনীয় বিশেষ কিছু নেই, আমি তোমার কাছে শুধু তিন পদ ভূমি প্রার্থনা করছি।

বলি পরিহাস করে উঠল। বললে, আপনার আকারের মতই আপনার বুদ্ধি! বালকের মত কথা বলছেন কেন? যে ত্রিলোকের একেশ্বর তার কাছে আপনি শুধু তিন-পা মাটি চাইছেন? ভূমিই যদি নিতে হয় অন্তত জীবিকা ধারণের উপযুক্ত পরিমাণ গ্রহণ করুন।

আমার যাবন্মাত্র প্রয়োজন, ততটুকুই আমি নেব। বিত্তং যাবৎ প্রয়োজনং। তার বেশি নিলে আমার পাপ হবে। বললে বামনদেব। যা যদৃচ্ছাক্রমে আসে তাতে যে সন্তুষ্ট, সেই যথার্থ সুখী। যে অসন্তুষ্ট অজিতাত্ম তার ত্রিভুবনেও সুখ নেই। তিন-পা ভূমিই আমার যথেষ্ট, তাতেই আমার অভীষ্ট সিদ্ধি। সুতরাং তার অতিরিক্ত আমার কামনীয় নয়।

বেশ, তবে তিন-পা ভূমিই আপনাকে দেব।

ভূমিদানের জন্যে বলি জলপাত্র হাতে নিয়েছে, শুক্রাচার্য ছুটে এল। বললে,

মহারাজ, ক্ষান্ত হোন।

সে কি ?

আপনি জানেন না এই বামনবেশী ব্রাহ্মণ স্বয়ং বিষ্ণু। মায়াবলে আপনার সমস্ত কেড়ে নিতে এসেছে। আপনার স্থান শ্রীযশ বিদ্যা—সমস্ত। সমস্ত কেড়ে নিয়ে দিয়ে দেবে ইন্দ্রকে, আপনার প্রতিপক্ষকে। এ আপনি কিছুতে সহ্য করবেন না। ইনি বিশ্বকায়, ত্রিপদ দিয়ে ত্রিলোক আক্রমণ করবেন। অবহিত হোন, এঁকে কিছু দান করবেন না। দৈত্যকুলের মহা অনর্থ ডেকে আনবেন না। তিন লোক দিয়ে এঁর তিন-পদ পূরণ করতে পারবেন না, প্রতিজ্ঞাভঙ্গের অপরাধে নিরয়গামী হবেন। যে দানে দাতার জীবন বিপন্ন হয় সে দান অদেয়।

কিন্তু মিথ্যাকথনের পাপে লিপ্ত হব ? বলি প্রতিবাদ করে উঠল।

শুক্রাচার্য বললে, স্ত্রীর কাছে, কৌতুকে, বিবাহ ব্যাপারে, জীবিকার জন্যে, প্রাণ-সঙ্কটে, সর্বস্বাপহরণ কালে, গোব্রাহ্মণের হিতার্থে, কারু প্রাণহিংসা নিবারণকল্পে মিথ্যাকথন দূষণীয় নয়। যে সত্য ও অসত্যের বিশেষ মর্ম অবগত না হয়ে সত্যানুষ্ঠানে উদ্যত হয় সে নিতান্ত বালক। আর যে সত্য ও অসত্যের যথার্থ নির্ণয় করতে পারে সে-ই প্রকৃত ধর্মজ্ঞ। অকৃতপ্রজ্ঞ লোক ধর্মাভিলাষী হয়ে কৌশিকের মত মহাপাপে নিমগ্ন হয়।

কে কৌশিক ?

এক বহুশ্রুত তপস্বিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। গ্রামের অনতিদূরে অরণ্যপ্রান্তে বাস করতেন। একমাত্র ব্রত ছিল, সে হচ্ছে সত্যকথন। সর্বদা সত্যবাক্য প্রয়োগ। একদা কতকগুলি লোক দস্যুতাড়িত হয়ে বনের মধ্যে ঢুকে আত্মগোপন করল। পশ্চাদ্ধাবিত দস্যুরাও খুঁজতে-খুঁজতে এল সেই বনপ্রান্তে। কৌশিককে জিগগেস করলে, কতকগুলি লোক ভীত-ত্রস্ত হয়ে এই দিকে এসেছিল আপনি দেখেছেন ? দেখেছি। কোন পথে গিয়েছে যদি জানেন সত্য করে বলুন। সত্যব্রতরত কৌশিক বললেন, ঐ বৃক্ষলতাগুল্ম বেষ্টিত অটবীর মধ্যে প্রবেশ করেছে। ক্রূরকর্মা দস্যুরা অরণ্যে ঢুকে লোকগুলির সন্ধান পেল ও তাদের আক্রমণ ও বিনাশ করল। সূক্ষ্মধর্মে অনভিজ্ঞ কৌশিক সত্যবাক্যজনিত পাপে লিপ্ত হয়ে ঘোর নরকে নিপতিত হল।

বলি বললে, প্রভু, যা বললেন তা গৃহস্থদের ধর্ম। কিন্তু আমি প্রহ্লাদের বংশধর, দেব বলে কথা দিলে সে কথা ফিরিয়ে নিতে পারব না। বিত্তের বিবেচনা আমার কাছে বিবেচনাই নয়। তার নাশে-লাভে আমার সমান অস্পৃহা। পৃথিবী বলেছে, অসত্যের চেয়ে বড় অধর্ম আর কিছু নেই। অসত্যপর

নয় ছাড়া আর সকলের ভারই সহ্য করতে পারি, মিথ্যাবাদীর সংস্পর্শই অসহ্য। নরককে ভয় করি না, সর্ব-দুঃখের আকর দারিদ্র্যকে ভয় করি না, মৃত্যুকে না, স্থানচ্যুতিকে না; একমাত্র ভয় করি মিথ্যাকে, বঞ্চনাকে, প্রতিশ্রুতি-পালনের পরাঙ্মুখতাকে। সুতরাং ইনি বিষ্ণুই হোন আর শত্রুই হোন, এই বটুর প্রার্থিত ভূমি আমি দান করব।

শুক্রাচার্য বিফলমনোরথ হয়ে শাপ দিল বলিকে।

গুরু কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েও সত্য থেকে বিচ্যুত হল না বলি। বামনকে অর্চনা করে ভূমিস্পর্শ করে প্রথমে জলদান করল।

বলীপত্নী বিন্ধ্যাবলী স্বর্ণকুম্ভ ভরে আরো জল নিয়ে এল। সে জলে বলি স্বয়ং বামনের পদযুগল ধুয়ে দিল। আর সেই বিশ্বপাবন জল মাথায় ধরল।

এবার নিন আপনার ত্রিপাদ ভূমি।

এক পদে সমস্ত মর্তমহী আকাশ ও দিগ-দিগন্ত আক্রমণ ও আচ্ছন্ন করল বামন। যখন দ্বিতীয় পদ ক্ষেপণ করল স্বর্গ পরিপূর্ণ হয়ে গেল। মহর্লোক ও তপো-লোক ছাড়িয়ে পৌঁছুল গিয়ে শেষলোকে, সত্যলোকে। তৃতীয় পদের জন্যে আর অণুমাত্র স্থান রইল না।

বামন বললে, দুই পদে সমুদয় স্বর্গমর্ত ঢাকা পড়েছে, এবার তৃতীয় পদের জন্যে স্থান দাও। নিজেকে আঢ্য মনে করে দানের অঙ্গীকার করেছ, এবার পূরণ করো অঙ্গীকার। অর্থীকে প্রতিশ্রুত বস্তু না দিয়ে যে বঞ্চনা করে তার মনোরথ বৃথা, তার স্বর্গ দূরস্থ এবং তার পতন অনিবার্য।

আমার বাক্য কখনো মিথ্যে হবার নয়। বললে বলি। হে উত্তমশ্লোক, আপনার তৃতীয় পদের জন্যেও আমি স্থান দেব। আমি কখনোই ভঙ্গ করব না প্রতিজ্ঞা। আমার এই মাথাই আপনার তৃতীয় পদের স্থান। 'পদং তৃতীয়ং কুরু শীঘ্রি মে নিজং।' পদচ্যুতি পাশবন্ধন বা নরককেও আমি ভয় করি না, আমার ভয় অপযশে। আমার মাথায় রাখুন আপনার তৃতীয় পদ। অন্তে যে দেহের অবসান হবে তাতে কি প্রয়োজন? বিত্তাপহারী দস্যু স্বজনবর্গে ই বা কি প্রয়োজন? সংসারহেতুভূতা স্ত্রীতেই বা কি দরকার? এ আমার কি সৌভাগ্য, যে সম্পদ কৃতান্তকে ভুলিয়ে রাখে সে সম্পদ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে আপনার সামীপ্য পেলুম। পেলুম আপনার পদস্পর্শের অধিকার।

সেখানে তখন প্রহ্লাদ এসে উপস্থিত হল। পিতামহকে পূজোপহার দিতে পারছে না, বলি ব্রীড়ামণ্ডিত অধোমুখে অশ্রুবিলোল নয়নে হেঁট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

শ্রীহরিকে প্রণাম করে প্রহ্লাদ বললে, ভগবান, আপনিই বলিকে ইন্দ্রপদ দিয়েছিলেন, আপনিই আবার সেই মোহকর সম্পদ প্রত্যাহার করলেন। এর চেয়ে বলির আর কি ভাগ্য হতে পারে?

কৃতাঞ্জলি হয়ে বললে বিন্ধ্যাবলী, হে ঈশ্বর! আপনি নিজ খেলার জন্যে এই ত্রিজগৎ রচনা করেছেন। যারা কুবুদ্ধি তারাই কর্তৃত্বের অভিমান করে। যতই অহঙ্কার করুক তাদের সাধ্য কি দান করে আপনাকে?

ব্রহ্মা বললে, হে ভূতেশ, হৃতসর্বস্ব বলিকে মোচন করুন। এ নিগ্রহযোগ্য নয়, সত্যরক্ষার জন্যে সর্বস্ব দান করেছে আপনাকে। দান করেছে নিজেকে, নিজের মাথা আপনার পায়ে বিকিয়ে দিয়েছে। আর কি চাই?

তাই তো হয়। বললেন শ্রীহরি। যাকে আমি কৃপা করি তার সকল সম্পদ আমি কেড়ে নিই। যে লোক সম্পদে মত্ত ও স্তব্ধ, সে যে আমাকেও অবজ্ঞা করে। দৈত্যকুলের কীর্তিবর্ধন এই বলি দুর্জয়া মায়াকে পরাভূত করেছে। জ্ঞাতিরা একে ত্যাগ করেছে, গুরু অভিসম্পাত দিয়েছে, তবুও আমার ছলনা বুঝতে পেরেও সত্য থেকে বিচলিত হয়নি। একে আমি দেবদুর্লভ স্থান দিচ্ছি। বলি, তুমি সুতলে গিয়ে বাস করো। সেখানে দেবদানব কেউ তোমাকে অতিক্রম করতে পারবে না। আমি সানুচর তোমাকে রক্ষা করব। তুমি সর্বক্ষণ আমাকে তোমার কাছে সন্নিহিত দেখতে পাবে। তোমার মঙ্গল হোক।

ঠাকুর বললেন, 'ঠিক-ঠিক ত্যাগী ভক্ত আর সংসারী ভক্ত অনেক তফাত। ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী, ঠিক-ঠিক ত্যাগী ভক্ত—মৌমাছির মত। মৌমাছি ফুল বই আর কিছুতে বসবে না। মধু বই আর কিছু পান করবে না। সংসারী ভক্ত অন্য মাছির মত, সন্দেশেও বসছে আবার পচা ঘায়েও বসছে। বেশ ঈশ্বরভাবেতে রয়েছে আবার কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে মেতেছে। ঠিক-ঠিক ত্যাগী ভক্ত চাতক পাখির মত। চাতক স্বাতী নক্ষত্রের মেঘের জল বই আর কিছু খাবে না। সাত সমুদ্র তেরো নদী ভরপুর, সে অন্য জল ছোঁবে না। ছোঁবে না কামিনী-কাঞ্চন। পাছে আসক্তি হয় কাছেও রাখবে না।'

ডাক্তার সরকারকে এবার লক্ষ্য করলেন ঠাকুর, 'কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ তোমাদের পক্ষে নয়। তবে এ জানবে টাকাতে ডাল-ভাত হয়, পরবার কাপড় হয়, থাকবার একটি স্থান হয় আর ঠাকুরের ও সাধু ভক্তদের সেবা হয়। ব্যস এই পর্যন্ত। আর স্ত্রী। স্বদারায় গমন দোষের নয়। তবে একটি দুটি ছেলেপুলে হয়ে গেলে ভাই-ভগিনীর মত থাকবে।'

কিন্তু সন্ন্যাসী ?

'সন্ন্যাসীর পক্ষে ত্যাগ। তারা স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যন্ত দেখবে না। "সন্ন্যাসী নারী হেরবে না" এই সন্ন্যাসীর ধর্ম। ছোট হরিদাস ভক্ত মেয়ের সঙ্গে আলাপ করেছিল, চৈতন্যদেব হরিদাসকে ত্যাগ করলেন। কালো পাঁঠা মা'র সেবায় জন্যে বলি দিতে হয়, কিন্তু একটু ঘা থাকলে হয় না। সন্ন্যাসী রমণীসঙ্গ তো করবেই না, মেয়েদের সঙ্গে আলাপ পর্যন্ত করবে না। জিতেন্দ্রিয় হলেও না, লোকশিক্ষার জন্যেও না। তার এমন স্থানে থাকা উচিত যেখানে স্ত্রীলোকের মুখ দেখা যায় না বা অনেক কাল পরে দেখা যায়।'

আর টাকাকড়ি ?

'টাকাও সন্ন্যাসীর পক্ষে বিষ। টাকা কাছে থাকলেই ভাবনা। হিসাব, দুশ্চিন্তা, অহঙ্কার, লোকের উপর ক্রোধ, দেহের সুখের চেষ্টা, এই সব এসে পড়ে। সূর্য দেখা যাচ্ছিল, মেঘ এসে সব ঢেকে দিলে। সন্ন্যাসীর পক্ষে গেরো দেওয়া সেলাই-করা পরদা গুটানো দোরবাক্সে চাবি দেওয়া এই সব চলবে না। সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী-কাঞ্চন থুতু ফেলে থুতু খাওয়া। সন্ন্যাসীর পক্ষে টাকা নেওয়া মানে ব্রাহ্মণের বিধবা হবিষ্য খেয়ে বাগদি উপপতি করা। সন্ন্যাসীর এ কঠিন নিয়ম কেন? সন্ন্যাসীর ষোলো আনা ত্যাগ দেখলেই তো লোকের সাহস হবে।' বলে ঠাকুর গল্প গাঁথলেন :

একজন সস্ত্রীক বিবাগী হয়ে বেরুল তীর্থ করতে। পথে যেতে স্বামী দেখতে পেল এক জায়গায় কয়েকটা হীরে পড়ে আছে। ভাবলে এগুলোকে মাটি চাপা দিয়ে রাখি, নইলে যদি স্ত্রী দেখতে পায় তবে তার লোভ হতে পারে। মাটি চাপা দিয়ে রাখছে, স্ত্রী পিছন থেকে এগিয়ে এসে বললে, ও কি করছ? স্বামী থতমত খেয়ে গেল। স্ত্রী ছাড়বে কেন, নিজেই পা দিয়ে মাটিগুলি সরাতে লাগল। যেই সরিয়েছে দেখতে পেল, হীরে! তখন বললে, আশ্চর্য, এখনো হীরে-মাটি তফাত দেখছ, তবে তুমি মরতে বনে এলে কেন?

তেজচন্দ্র মিত্রকে ডেকে পাঠান ঠাকুর। কিন্তু তার কি আসবার সময় আছে? তার কেবল কাজ, কেবল আপিস! 'তোকে এত ডেকে পাঠাই আসিস না কেন?' সেদিন আসতেই জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'আপনিই ডাকেন, আপনিই আবার আটকান। মন্দিরও আপনি আপিসও আপনি।'

'আমি তোকে আপনার জন বলে জানি, তাই ডাকি।'

'কিন্তু সাড়া দেবার মত প্রাণ দিচ্ছেন না কেন? অবসর নেই, অবসর নেই,

এই তো প্রাণের কান্না।'

'অবসর নেই, অবসর নেই!' প্রতিধ্বনি করলেন ঠাকুর।

এই অনবসরের মধ্যেও ঈশ্বর। ঈশ্বর যখন তিন পায়ে স্বর্গ-মর্ত-পাতাল আচ্ছন্ন করেছেন, তখন স্থানে-কালে অবসরে-অনবসরে কোথায় আর ব্যবধান? আমার ধ্যানে যেমন ঈশ্বর আমার বিক্ষিপ্ততায়ও তেমনি ঈশ্বর। আমার নামে যেমন ঈশ্বর, বিস্মৃতিতেও তেমনি ঈশ্বর। যেমন ঈশ্বরচিন্তনে তেমনি ঈশ্বর-বিভ্রান্তিতে। তোমাকে যদি আমি ভুলে থাকি সে তুমিই আমাকে ভুলিয়ে রেখেছ বলে। আমার মধ্যে উচ্ছ্বসিত যে এই নিশ্বাস এ তোমারই তপ্ত প্রাণ-স্পর্শ। আমি এই যে লিখছি এ-ও তোমাকেই লেখা। এই যে পড়ছি এ-ও তোমাকেই দেখা। 'দিবীব চক্ষুরাততং।' একসঙ্গে অতি সহজেই সমস্ত আকাশকে চোখ দেখে। তেমনি তোমাকে দেখতে দাও। ভেঙে-ভেঙে নয়, টুকরো-টুকরো করে নয়, জীবনের ছোট-ছোট প্রকোষ্ঠের মধ্যে নয়, সম্মিলিত করে একসঙ্গে দেখা, সমগ্র করে একসঙ্গে আস্বাদ করা। ঈশ্বরের পদতলে বলি হওয়া।

॥ ১৬২ ॥

দুপুরবেলা। মেঘ নেই বৃষ্টি নেই, রোদেভরা আকাশ, হঠাৎ একটা বাজ পড়ল। আচমকা আওয়াজ শুনে চমকে উঠল লক্ষ্মী। চমকে উঠলেন শ্রীমা।

বিনামেঘে বজ্রাঘাত! এ কি অলক্ষণ!

দুজনেই ছুটে গেল ঠাকুরের ঘরে।

ঠাকুর বললেন, 'কি গো, ভয় পেয়ে ছুটে এসেছ বুঝি?'

তা ছাড়া আবার কি! দুজনে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে! ঠাকুরের গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে।

'রাম-অবতারে লীলা-অবসানের আগে কালপুরুষ স্বয়ং এসেছিলেন।' বললেন ঠাকুর, 'এবার বজ্রধ্বনিতে সঙ্কেত করে গেলেন দিন আর নেই। খেলাঘর ভেঙে দাও এবার।'

লক্ষ্মী বুঝি আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল।

'কিসের দুঃখ কিসের শোক!' লক্ষ্মীকে সান্ত্বনা দিলেন ঠাকুর: 'এখানকার কত কথাই তো শুনলি, সেই সব কথা বলবি সবাইকে। সে তো শুধু আনন্দের কথা, অমৃতের কথা। দেশে রঘুবীর আছে, তাকে নিয়ে থাকবি। আর কতদিনের জন্যেই বা এই তিরোধান। শোন, একশো বছর—মোটে একশো বছর—'

দুজনে তাকাল উৎসুক হয়ে।

'একশো বছর পরে আবার আসব।'

'এই একশো বছর থাকবে কোথা?' জিগগেস করলেন শ্রীমা।

'থাকব ভক্তহৃদয়ে।'

'আপনি আসুন গে। আমি আর আসছি না।' অভিমানভরে বললে লক্ষ্মী, 'তামাককাটা করলেও না।'

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'আমি যদি আসি তো থাকবি কোথায়? প্রাণ টিকবে না যে আমাকে ছাড়া। কলমির দল এক জায়গায় বসে টানলেই সব আসবে।'

লক্ষ্মীকে ঠাকুর শীতলা-জ্ঞান করতেন। কামারপুকুরের ঘরে যে মা-শীতলা আছেন লক্ষ্মী তাঁরই প্রতিরূপ।

হৃদয় যখন চলে যায় ঠাকুরকে বলেছিল, 'মামা, এখানে কি করতে পড়ে আছ? গঙ্গার ধারে তোমার জন্যে যে একখানা বাগান দেখে এসেছি সেখানে চল তোমাকে নিয়ে গিয়ে বসাই। তারপর দেখাই একবার ভানুমতীর খেল্।'

ঠাকুর বললেন, 'শালা তুই আমাকে শীতলা পেয়েছিস? শীতলার বামুনের মত তুই আমাকে ফিরি করে বেড়াবি? আমি তোর পয়সা রোজগারের ফিকির? এই হীনবুদ্ধি নিয়ে তুই জীবন কাটালি? তোর দুঃখ তবে কে ঘোচাবে?'

যে শীতলা বামুনের থালায় চড়ে ঘুরে বেড়ায় না, যে শীতলা ভক্তের হৃদয়পদ্মে স্থির হয়ে থাকে সে-ই লক্ষ্মী।

ভবতারিণী ও রাধাকান্তের জন্যে কত ভোগসামগ্রী আসে, কত ভালো-ভালো ফল আর মিষ্টি, আহা, আমার কামারপুকুরের শীতলা কিছুই খেতে পায় না এই ভেবে কষ্ট হয় ঠাকুরের। একদিন মা-শীতলা স্বপ্ন দিলেন ঠাকুরকে, 'গদাই, আমি এক রূপে ঘটে আর এক রূপে তোমাদের লক্ষ্মীতে। লক্ষ্মীকে খাওয়ালেই আমার খাওয়া হবে।'

কাশীপুরে দুবার ঠাকুর পুজো করলেন লক্ষ্মীকে। তার উচ্ছিষ্ট খেলেন।

গিরিশকে বললেন, 'লক্ষ্মীকে মিষ্টি-টিষ্টি একদিন খাইও। তাহলেই মা-শীতলাকে ভোগ দেওয়া হবে। লক্ষ্মী মা-শীতলারই অংশ।'

শ্রীমাকে বললেন, 'আমার বড় সাধ লক্ষ্মীকে একজোড়া রালা ও একছড়া হার দি।'

রাম দত্ত কাছে ছিল, বলে উঠল, 'বেশ তো, আগামী রোববারই আমি নিয়ে আসব।'

আগামী রোববার আর আসে না। ঠাকুর বললেন, 'শালা ভেগেছে।'

শ্রীমা বললেন, 'বেশ তো, তোমার যখন অত সাধ, আমার পুরোনো বালা ও হার লক্ষ্মীকে দিয়ে দি।'

'না, না, তোমারটা দিতে যাবে কেন? আমার নতুন গড়িয়ে দেবার সাধ। মা-শীতলা বলে দেব।'

লক্ষ্মীর কানে গেল কথাটা। বললে, 'আমি হার-বালা চাই না। আমি ঐ টাকায় বৃন্দাবনে যাব।'

'সে তো যাবিই। কিন্তু তোর নতুন গয়নাও চাই যে।'

ঠাকুর বেঁচে থাকতে সে গয়না হয়নি। পরে যখন ভক্তরা জানতে পেল ঠাকুরের সাধের কথা, হার-বালা গড়িয়ে দিল লক্ষ্মীকে। ঠাকুরের সাধ, লক্ষ্মী তাই হাতে-গলায় পরল সে গয়না। কিন্তু পরামাত্রই খুলে ফেলল। দিয়ে দিল অন্যকে।

শ্রীমা বললেন, 'কাল উনি বীজমন্ত্র আমার জিভে লিখে দিয়েছেন। তুই যা না। তোকেও লিখে দেবেন দেখিস।'

লক্ষ্মী কেমন কুণ্ঠিত হল। বললে, 'আমার বড় লজ্জা করে।'

'সে কি রে? তাঁর কাছে যাবি, লজ্জা কিসের?'

'কী বলে চাইব?'

'মুখ খুলে চাইতে হবে কেন? অন্তরে অভিলাষটি নিয়ে দাঁড়াবি, তিনি ঠিক শুনতে পাবেন। একবার শোনাতে পারলে তিনি অস্থির হয়ে উঠবেন, নিজের থেকেই ব্যবস্থা করবেন—'

'কায়া সব আছে।'

সেদিন গেল না লক্ষ্মী। তারপর এমনি একদিন গিয়েছে প্রণাম করতে, ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'হ্যাঁ রে, তোর কোন ঠাকুর ভালো লাগে?'

লক্ষ্মীর বুকের ভিতরে আনন্দ উথলে উঠল। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, রাধাকৃষ্ণ।

'জিভ বার কর।' জিভের উপর বীজ ও নাম লিখে দিলেন ঠাকুর। বললেন, 'তোর গলায় দেখছি তুলসীর মালা। কে দিয়েছে?'

'লাহাবাবুদের পেসন্নদিদি।'

'হ্যাঁ, ঐ মালা রাখবি। তোকে বেশ দেখায়।'

শ্রীমা এসে বললেন, 'সে কি গো? লক্ষ্মীর যে আগে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা হয়ে গিয়েছে।'

'সে আবার কবে?'

'ঐ যে হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী এসেছিল কামারপুকুরে, নাম পূর্ণানন্দস্বামী, তার কাছ থেকে।'

pathagar.net

'তা হোক গে। লক্ষ্মীকে আমি যে মন্ত্র দিয়েছি ঠিকই দিয়েছি।'

পুরী এসেছে লক্ষ্মী। স্বর্গদ্বারে নেমেছে স্নান করতে। ঢেউয়ের দোলায় কি করে কে জানে ভাসতে-ভাসতে চলে এসেছে চক্রতীর্থ পর্যন্ত। গোপবেশী কে একজন হিন্দুস্থানী যুবক জলে নেমে তাকে উদ্ধার করল, টেনে তুলল ডাঙার উপর। সুস্থ হয়ে চোখ মেলে তাকে আর দেখতে পেল না লক্ষ্মী।

ক্লান্তদেহে মুহ্যমানের মতো বাড়ি ফিরে এল লক্ষ্মী। তারপর দেহে আরো একটু বল এলে গেল জগন্নাথদর্শনে। এ কি। মন্দিরের বলরামের জায়গায় যে সেই গোপবালক।

মাঝে-মাঝে বলরামের আবেশ হয় লক্ষ্মীর। তখন গলায় নবমল্লিকার মালা দুলিয়ে উত্তাল কেশ এলিয়ে উদ্দাম নৃত্য শুরু করে। সঙ্গে-সঙ্গে গান ধরে বিভোর হয়ে। পায়ের নিচে মাটি টলমল করতে থাকে। বলে, 'মেয়েছেলে হয়ে এসেছি, নইলে দেখাতাম, কাকে বলে নৃত্য কাকে বা কীর্তন।'

জগন্নাথ-মন্দিরে গিয়ে দেখে যে জগন্নাথ সেই রামকৃষ্ণ।

ঠাকুর বললেন, 'ঠাকুর দেবতা যদি স্মরণে না আসে তো আমাকে ভাববি। তাহলেই হবে। কি রে, আমাকে মনে হয় তো? কেমন, মনে হয়?'

লক্ষ্মী ঘাড় হেলিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, তা হয়?'

'কি রকম হয়?'

'এই যেমন দেখছি তেমনি।'

লক্ষ্মীকে ভিক্ষেয় পাঠালেন ঠাকুর। বললেন, যা বাড়ি-বাড়ি নাম বিলিয়ে আয়।'

'লোকে যদি গালাগাল দেয়?'

'দিক না গালাগাল। তোর পায়ের ধুলো তো তাদের বাড়িতে পড়বে। তাতেই ওদের মঙ্গল।'

কুঠিবাটা রতনবাবুর বাড়ি ভিক্ষে করতে গেল লক্ষ্মী। তারা একটা সিকি দিল। লক্ষ্মী তো মহাখুশি।

ঠাকুরকে এসে বললে উচ্ছ্বসিত হয়ে।

ঠাকুর বললেন, 'বড়লোকের বাড়ি গেলি কেন? গরিবের বাড়ি যাবি।'

ঠাকুরকে কি ভাবে স্মরণ করবে জানো? লক্ষ্মী প্রণালী বাতলে দিল। প্রথমে ভাববে, ভোরবেলা, ঠাকুর উঠলেন ঘুম থেকে। মুখ-হাত ধুলেন, গেলেন ঝাউ-তলায়। তারপর তাঁর পা ধুয়ে দিলে। কাপড় ছাড়িয়ে দিলে। তারপর তাঁর গলায় দিলে বেলফুলের মালা। তারপর তাঁকে খেতে দিলে জগন্নাথের

মহাপ্রসাদ, বৃন্দাবনের রজ আর গঙ্গাজল। সঙ্গে মাখন-মিছরি। তারপর খেতে দিলে পান-তামাক। তারপর জপের জিনিস এগিয়ে দিলে হাতের কাছে।
দুপুরবেলা খাইয়ে দিলে, ডাল-ভাত ডুমুর কাঁচকলার ঝোল। তারপর তাঁকে শুতে দিলে। পাখা করতে থাকলে। কখনো বা পা টিপতে।
রাত্রে সামান্য লুচি আর পায়েস দিলে খেতে। তারপর আবার শয়ন দিলে। হাওয়া করলে। বসলে পাদপদ্মের সেবায়।
শ্রীমা আর লক্ষ্মীর দিকে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'বলরামকেও বলেছি আর বেশিদিন কষ্টভোগ করতে হবে না।'
'আহা, বলরামের কি স্বভাব!' বলছেন ঠাকুর, 'রাতদিন ঠাকুর নিয়ে আছে। যেন মালী ফুলের মালাই গাঁথছে অবিরাম। আমার জন্যে উড়িষ্যায় কোঠারে যায় না। ভাই মাসোয়ারা বন্ধ করেছিল আর বলে পাঠিয়েছিল, তুমি এখানে এসে থাক, মিছিমিছি কেন এত টাকা খরচ! ও সব কথা কানে তুলল না বলরাম। শুধু আমার কাছে থাকবে বলে। আমাকে দেখবে বলে।'
বলরামের বাড়িতে রথ টানলেন ঠাকুর। সঙ্গে গিরিশ, নরেন, কালী, রাম দত্ত, প্রতাপ মজুমদার, মাস্টারমশাই, শশধর তর্কচূড়ামণি। সকলেই দড়ি ধরল। গান ধরলেন ঠাকুর, সঙ্গে ভাবস্বচ্ছন্দ নৃত্য। নদে টলমল করে, গৌরপ্রেমের হিল্লোল রে।
শশধরকে বললেন, 'শশধর, একেই বলে ভজনানন্দ। সংসারীরা বিষয়ানন্দ ভোগ করে, ভক্তরা ভজনানন্দ। ভজনানন্দ ভোগ করতে-করতেই ব্রহ্মানন্দ।'
গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, বর্ণ উজ্জ্বল গৌর, শশধরের বাড়ি এলেন ঠাকুর। জিগগেস করলেন, 'আচ্ছা, তুমি কি রকম লেকচার দাও?'
বিনীতস্বরে শশধর বললে, 'আজ্ঞে, শাস্ত্রের কথা বোঝাতে চেষ্টা করি।'
ঠাকুর বললেন, 'জানো তো, আজকালকার জ্বরে দশমূল পাঁচন চলে না। দশমূল পাঁচন দিতে গেলে রুগীর এদিকে হয়ে যায়। আজকাল ফিবার মিকশ্চার।'
এত বড় পণ্ডিত, কথাটার মানে যেন ধরতে পেল না শশধর।
'বুঝলে না, শাস্ত্রবিহিত কর্ম করবার মতো মানুষের সময় কই? আজকাল শুধু নারদীয় ভক্তি। ভক্তিযোগেই যুগধর্ম।' শশধরের দিকে স্নেহচোখে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'বাবা, আরেকটু বল বাড়াও। আর কিছুদিন সাধনভজন করো। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি কোরো না। তবে, সন্দেহ কি, যেটুকু করছ লোকের ভালোর জন্যেই সব করছ।' বলে ঠাকুর মাথা

নত করে শশধরকে নমস্কার করলেন। ভবতারিণীকে উদ্দেশ করে বললেন, 'মা সেদিন ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দেখালি। তারপর আজ আবার এখানে এনেছিস। দেখলুম শশধরকে।'

আমি কাঁদতাম আর বলতাম, মা বিচারবুদ্ধিতে বজ্রাঘাত হোক।

শশধর বললে, 'তবে আপনারও বিচারবুদ্ধি ছিল?'

'তা এক সময় ছিল।'

'তাহলে বলে দিন আমাদেরও একদিন যাবে। আপনার কেমন করে গেল?'

'অমনি একরকম করে গেল'। বললেন ঠাকুর, 'এখন এই সার কথা. ভক্তিই সার, ঈশ্বরকে ভালোবাসাই সার। শুধু শুষ্ক জ্ঞান নিয়ে থেকো না। প্রেম ধরো। প্রেমই সচ্চিদানন্দকে ধরবার দড়ি।'

প্রেমই সর্বসাধ্যসার। এ হচ্ছে সেই অনুরাগ যা 'অনুদিন বাড়ল অবধি না গেল' তদর্পিতাখিলাচারিতা তদ্‌বিস্মরণে পরমব্যাকুলতা।

শ্রীমাকে বললেন, 'তোমাকে থাকতে হবে, অনেক কাজ করতে হবে। লক্ষ্মী তোমার দোসর হবে। কখনো তাকে কাছছাড়া করবে না। আমার তো হয়ে এল। সে তোমার কাছে থাকলে কত ভালো কথা কয়ে তোমার প্রাণ ঠাণ্ডা করবে।'

কেন শোক করছি, কিসের জন্যে কার জন্যে শোক? শরীর মন ইন্দ্রিয় দিনে-দিনে ক্ষণে-ক্ষণে পরিবর্তিত হচ্ছে, তবে মৃত্যুরূপ পরিবর্তনকে ভয় কেন? মৃত্যু-রূপ পরিবর্তনের পরেও তো আছে আরেক অস্তিত্ব। লোকবিচ্ছেদজরামরণ-বর্জিত অস্তিত্ব। সেই অস্তিত্বই তো অবিনাশী। আত্মস্তরহিত আনন্দরসাশ্রয় অস্তিত্ব। মায়ার জন্যেই দুঃখ। কিসের ভ্রান্তি কিসের মায়া।

মায়া ঈশ্বরেরই শক্তি, ঈশ্বরেই বর্তমান, কিন্তু নিজে তিনি মায়ায় আবদ্ধ নন। সাপের মুখে বিষ, কিন্তু সে বিষে সাপ নিজে মরে না; সে মুখ দিয়ে সে খাচ্ছে ঢোঁক গিলছে, তবুও না; কিন্তু যাকে কামড়ায় সেই মরে।

সমস্ত জগৎ মায়ারই বিজৃম্ভণ মাত্র। মায়া পরমেশ্বরাশ্রয়া।

মনই মায়া। যতক্ষণ মন আছে ততক্ষণই দ্বৈত আছে। মন থাকলেই বিকার আর বিকার থাকলেই বিনাশ। বিকার মিথ্যা, আধারই সত্য। বিশ্ব তাই স্বপ্ন-মায়ার মত, গন্ধর্বনগরের মত। আসলে জীব সর্বাবস্থায়ই মুক্ত, শুধু অবিদ্যার বশে আত্মস্বরূপবিস্মৃত। কাঁধে গামছা আছে, কপালে-তোলা চশমা আছে, শুধু মনে নেই। হাত যায় না কাঁধে, চশমা ঠিক বসে না চোখের সামনে।

যা তিনকাল ও তিন অবস্থায় সৎ তাই সত্য, যা অবাধিত, অনিরুদ্ধ তাই

সত্য। যার বাধ হয় রোধ হয় তা মিথ্যে। সত্য চিরকাল সমস্ত অবস্থাতেই সত্য। শুধু দৃশ্য বা বিষয়ের পরিবর্তন। এই সত্য-মিথ্যে নিয়েই চলেছে লোক-ব্যবহার। এক বস্তুকে অন্যবস্তু বলে বোধই অজ্ঞান। যথার্থস্বরূপের বোধই জ্ঞান।

যথার্থস্বরূপকে দেখ।

যা বৃহৎ যা মহান যা বাধারহিত যা নিরতিশয় তাই যথার্থস্বরূপ। যার চেয়ে ব্যাপক বা উৎকৃষ্ট কিছু নেই তাই যথার্থস্বরূপ। যা নশ্বর তাই দোষযুক্ত। যা দোষলেশশূন্য, নিত্যশুদ্ধ নিত্যবুদ্ধ নিত্যমুক্ত তাই যথার্থস্বরূপ। তাই ব্রহ্ম। তাই আত্মা, সকলের আত্মা। অয়মাত্মা ব্রহ্ম।

পুরী থেকে মা ফিরেছেন কলকাতায়, সে তেরোশো এগারো সালের মাঘ মাস। এসেই বললেন, চল একবার আমার শাশুড়ী-ঠাকরুনকে দেখে আসি।

পালকি এসে থামল বোসপাড়া লেনের এক ভাড়াটে বাড়িতে। এখানে মা'র শাশুড়ী কে! এখানে তো নিবেদিতা থাকে।

নিবেদিতা তার নিজের বাড়িতেই নিয়ে এসেছে অঘোরমণিকে, গোপালের মাকে। হাঁটবার-চলবার শক্তি নেই গোপালের মা'র, কেউ দেখবার-শোনবার নেই, তাই নিবেদিতা নিয়ে এসেছে নিজের কাছে। আর কে না জানে গোপালের মা-ই সারদামণির শাশুড়ী।

শয্যায় মিশে আছে গোপালের মা। বাইরে কি একটা কথা বলেছে সারদামণি, কণ্ঠস্বর ঠিক চিনতে পেরেছে। কে ও? আমার মা কি এলে? আমার বৌমা? আমার বৌমা এসেছ?

'হ্যাঁ, মা, আমি এসেছি।' কয়েকটা ফল হাতে নিয়ে সারদামণি ঘরে ঢুকল। ফল কটি গোপালের মা'র হাতে দিয়ে প্রণাম করল সারদামণি। চিবুকে আঙুল ঠেকিয়ে একটু আদর করল গোপালের মা। বললে, 'ও বৌমা, আমার গোপাল কেমন আছে?'

'তিনি তো ভালোই আছেন।'

'তুমি সময়মত আমার কথা তাকে মনে করিয়ে দিও, মা।'

'তিনি তো আপনার কাছেই রয়েছেন।'

এই গোপালই তো মীরাবাঈ-এর রণছোড়, তার গিরিধারী নাগর। 'মেরে তো গিরিধর গোপাল, দুসরা ন কোঈ।' আমার কাছে শুধু গিরিধারী গোপাল, আর কেউ আমার দোসর নেই। যার মাথায় ময়ূরপুচ্ছের মুকুট সেই আমার স্বামী, আমার সর্বস্ব। বাপ মা ভাই বন্ধু কেউ আমার স্বজন নয়। গিরিধারীই

আমার স্বজন। আমি কুলের মর্যাদা ছেড়েছি, আর কে কী আমার করবে? সাধুদের সঙ্গ করে লোকলজ্জা খুইয়েছি। চোখের জল ঢেলে-ঢেলে প্রেমলতা পুঁতেছি, সে লতায় ফুল ধরেছে, ধরেছে আনন্দফল। আমাকে দেখে সংসার কাঁদছে কিন্তু ভক্তের দল খুশি। হে ভক্তের ভগবান, তুমিও খুশি হও। হে লাল-গিরিধর, মীরা তোমার দাসী, তাকে তুমি ত্রাণ কর।

মেবারে মেড়তা-তালুকের জমিদার রতনসিং-এর মেয়ে মীরাবাঈ। ছেলেবেলায় কোন এক প্রতিবেশিনীর বাড়িতে গিয়েছে বিয়ের নেমন্তন্নে। মাকে জিগগেস করছে, মা, আমার বিয়ে কার সঙ্গে? আমার বর কই?

বাড়িতে কুলদেবতা গিরিধারীলাল, সেই বিগ্রহ দেখিয়ে মা বললেন, 'ঐ তোমার বর, ওরই সঙ্গে তোমার বিয়ে।'

মীরার যখন সত্যি বিয়ে হয়, দেখল সংসারবিলাসে সুখ নেই, 'হরি বিন রহ্যা ন যায়।' সখি আর যে থাকতে পারি না হরিহারা হয়ে। শাশুড়ী কটব্য করে, ননদ গঞ্জনা দেয়, রানা তো বিরস-বিরক্ত হয়েই আছেন। ঘরে বন্দী করেছেন, দরজায় তালা লাগিয়েছেন, রেখেছেন পাহারাওয়ালা। কিন্তু এ তো আমার পূর্ব-পূর্ব জন্মের পুরোনো প্রেম, এ আমি ভুলি কি করে? হে মীরার গিরিধারী নাগর, তুমি ছাড়া আর কাউকে যে আমার মনে ধরে না।

হে মীঠাবোলা, সাজন-ঘরে একবার এস। পথের পাশে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কতদিন আর চেয়ে থাকব? আসতে তোমার ভয় কি, তুমি এলেই তো সুখোৎসব। হে শ্যামলমোহন, তোমাকেই তো দেব আমার দেহমন, তুমি এলেই তো রঙ্গ পূর্ণ হবে। আর দেরি কোরো না। 'কাজল-তিলক-তমোলা' সব রঙ ত্যাগ করেছি তোমার জন্যে, তোমারই রঙে রঙিন হব বলে। তোমার জন্যে বুকের আঁচল আজ খুলে দিয়েছি, তুমি এস।

হে প্রভু, মীরাকে তোমার 'সাঁচী দাসী' করে নাও। মিথ্যা সংসারমায়ার ফাঁদ ছাড়িয়ে দাও। আমার বিবেকের ঘর এরা লুঠ করে নিল, শত বল-বুদ্ধি খাটিয়েও এঁটে উঠতে পারছি না। হে রাম, কিছুই যে আমার বশে নেই, মৃত্যুর পথে চলেছি বিফল হয়ে। তুমি এস, আমাকে বাঁচাও। প্রত্যহ ধর্মের উপদেশ শুনছি, মনকে ভয় পাইয়ে রেখেছি কুপথ থেকে, সর্বদা সাধুসেবা করছি, স্মরণে-ধ্যানে চিত্তকে ধরে আছি দৃঢ় করে। তুমি এবার মুক্তির পথ দেখাও। মীরাকে 'সাঁচী দাসী বনাও'।

ননদ এসে বললে, 'ভাবি, সাধুসঙ্গ ছাড়, তোমার কলঙ্কে যে কান আর পাতা যায় না, তোমার নিন্দায় শহর-গাঁ তোলপাড়। তুমি যে রাজকুলের বধূ তা কি

ভুলে থাকবে ?'

'আমি গিরিধারীর দাসী। গিরিধারীই আমার যশ, গিরিধারীই আমার নিন্দা।'

'তোমার এই শুষ্ক বেশ আর দেখতে পারি না। পর তোমার মুক্তাহার, 'তোমার কেয়ূর কঙ্কণ। রাজকুলশোভা হয়ে বিরাজ করো।'

মীরা বললে, 'অসার রত্নভূষণ ছেড়ে শীলসন্তোষকেই আমি বরণ করেছি।'

মা গো, আমি রামরতনধন পেয়েছি। আমি তো রামরতনধনই পেয়েছি। এ ধন খরচ হয় না, চুরি যায় না, দিন-দিনই বেড়ে চলে। এ ধন জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না, এত প্রকাণ্ড যে ধরণীও ধরে উঠতে পারে না। নামের তরীতে ভজনের প্রদীপ জেলে বসেছি, হে কাণ্ডারী, হে নাগর গিরিধর, আমাকে ভবসাগর পার করে দাও।

রানা হরিচরণামৃত বলে বিষ পাঠাল মীরাকে। মীরা সে বিষ খেয়ে ফেলল। মীরার স্পর্শে সে বিষ অমৃত হয়ে গেছে।

হে প্রিয়, তুমি এ বন্ধন ছিঁড়তে পারো, আমি ছিঁড়ব না। তোমার প্রীতির ডোর ছেড়ে আর কার সঙ্গে বাঁধব ? আমার আর কে আছে ? তুমি তরু আমি বিহঙ্গ। তুমি সরোবর আমি মীন। আমি চকোর তুমি সুধাংশু। তুমি মুক্তো আমি সুতো। তুমি আমার সোনা আমি সোহাগা। হে ব্রজবাসী, মীরার প্রভু, তুমি ঠাকুর আমি তোমার দাসী।

বিয়ের দশ বছরের মধ্যেই বিধবা হল মীরা। সবাই বললে কুলবধুর মতো অন্তঃপুরচারিণী হয়ে থাক। লজ্জাহীনার মতো পথে-বিপথে সাধুসঙ্গ করে বেড়িও না। কে কার উপদেশ শোনে! সংসারবিষ পান করে হরিপ্রেমস্পর্শে অমৃতত্ব আস্বাদ করেছি, বল, কোথায় গেলে সে হরির দর্শন পাব ? সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসিনী সেজে মীরা চলল বৃন্দাবনে।

'তুমি বিন সব জগ খারা।' তোমাকে ছাড়া সমস্ত জগৎ বিস্বাদ। আমার দুঃখ কে বোঝে বল ? তোমার বিরহে শূলশয্যায় শুয়ে আছি, কি করে ঘুম আসে ? তোমার শয্যা গগনমণ্ডলে, সেখানে তোমার সঙ্গে কি করে মিলব ? ব্যথিত যে সেই ব্যথা বোঝে আর বোঝে সে, যার জন্যে ব্যথা। রত্নের মূল্য বোঝে জহুরি আর বোঝে যে কেনে সেই রত্ন। যন্ত্রণায় পাগল হয়ে বনে-বনে ঘুরে বেড়াচ্ছি কোথায় সেই জরহর ? আমার শ্যামলসুন্দর যখন বৈদ্য হয়ে দেখা দেবে তখনই আমি শীতল হব।

ফাগুন যে শেষ হতে চলল, দিন চারেক আর বাকি। ওরে মন, হোলি খেলে নে। করতাল নেই পাখোয়াজ নেই, শুধু অনাহতের ঝঙ্কার উঠেছে, রোমে-

রোমে অনুভব করছি সেই পুলকপ্রবেশ। প্রেমগীতির পিচকিরি করেছি, শীলসন্তোষের কেশর গুলেছি, গুলালের বাদলে অপার আনন্দ ঝরে পড়ছে। 'ঘটকে সব পট খোল দিয়ে হৈ, লোকলাজ সব ডার রে।' সমস্ত আবরণ খুলে দিয়েছি, জলাঞ্জলি দিয়েছি সব লোকলজ্জা। ওরে মন, হোলি খেল, ঐ দেখ মনোহরের চরণকমল, প্রিয়তম ঘরে এসেছেন।

সখি, আমি তো প্রিয়তমের রঙে রঙিন। পাঁচ রঙে আমার চেলি রাঙিয়ে দে, এবার আমি ঝুরমুট খেলতে যাই। ঝুরমুট খেলায় পাব আমার প্রিয়তমকে, দেহের আবরণ ফেলে আমি মিলব তাঁর সঙ্গে। তখন আর কিছুই থাকবে না, চাঁদ যাবে সূর্য যাবে পৃথিবী আকাশ সব যাবে, থাকবে শুধু সেই অটল অবিনাশী। মনের প্রদীপে নিত্যস্মরণে শিখা জ্বালাও, প্রেমের হাট থেকে তেল আনো তাঁর জন্যে, সে দীপের নির্বাণ নেই। আমার বাস বাপের বাড়িতেও না, শ্বশুরবাড়িতেও না, সদ্‌গুরুর উপদেশই আমার আশ্রয়। অন্তরসখি, আমারও ঘর নেই তোরও ঘর নেই। শুধু হরির রঙেই রঙে আছি আমরা। হরিই আমাদের ঘরদোর।

বৃন্দাবনে এসে শ্রীরূপ গোস্বামীর দর্শন যাচ্‌ঞা করল। গোস্বামী বলে পাঠালেন, 'আমি সন্ন্যাসী বৈরাগী, আমি প্রকৃতি সম্ভাষণ করি না।'

মীরা বলে পাঠাল, 'আমি জানতুম বৃন্দাবনে একমাত্র বৃন্দাবনচন্দ্রই পুরুষ আছেন। তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ পুরুষ আছেন তা আমার জানা নেই।'

লজ্জা পেলেন গোস্বামী। বুঝলেন মীরার দিব্যদৃষ্টি কতদূর এসে পৌঁচেছে। দর্শন দিলেন মীরাকে।

নিন্দা কুৎসা নির্যাতন অত্যাচার কিছুই গ্রাহ্য করেনি মীরা। তোমার জন্যে সব ছাড়লাম তুমি আমাকে কি করে ছেড়ে থাকবে? দিনরাত্রি এই কান্নাই শুধু তার সম্বল। মেবার ছেড়ে বৃন্দাবনের দিকে যেদিন যাত্রা করে মীরা, সেইদিন থেকেই মেবারের দুর্দিনের সূচনা। মেবারবাসীরা বুঝল মীরাই মেবারের রাজলক্ষ্মী, যে করে হোক তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। মীরা তখন দ্বারকায়। সেখানে মেবারদূত এসে তাকে মিনতি-বিনতি করতে লাগল। তুমি ফিরে চল। মেবারের দুরবস্থা দেখবে একবার স্বচক্ষে। তার রাজলক্ষ্মী আজ ধূলায় নির্বাসিতা।

রণছোড়জীর মন্দিরে গিয়ে ঢুকল মীরা। গান ধরল। 'সাজন, সুধ জোঁ জানে তোঁ লীজে হো।' হে প্রিয়তম, তুমি যদি আমাকে শুদ্ধ বলে জানো তবে তুমি আমাকে তুলে নাও। কৃপা করো, তুমি ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই।

অন্নে রুচি নেই চোখে নিদ্রা নেই, দিন নেই রাত নেই, পলে-পলে দেহ শুধু ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। হে মীরার প্রভু গিরিধর নাগর, এই যে মিলন তোমার সঙ্গে, এতে আর বিচ্ছেদ ঘটিও না।

গাইতে-গাইতে ঢলে পড়ল মীরা। রণছোড়জীর বিগ্রহে বিলীন হয়ে গেল।

ঠাকুর বললেন, 'সংসারীদের অনুরাগ ক্ষণিক, তপ্ত খোলায় জল যতক্ষণ থাকে। একটা ফুল দেখে হয়তো বললে, আহা, কি চমৎকার ঈশ্বরের সৃষ্টি। ব্যস, হয়ে গেল।'

এতটুকুতে হবার নয়। দুর্দাম ব্যাকুল হও। বন্যার উলঙ্গ উন্মাদনা, আগুনের লেলিহান আনন্দ।

'ব্যাকুলতা চাই।' বললেন আবার ঠাকুর, 'ব্যাকুল হলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। তিনি যেকালে জন্ম দিয়েছেন সেকালে তাঁর ঘরে আমাদের হিস্যা আছে। তিনি আপনার বাবা, আপনার মা, তাঁর উপর জোর খাটে। দাও পরিচয়। নয় গলায় এই ছুরি দিলাম।'

সারদামণির দিকে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'তুমিও যা আমিও তা। আমরা অভেদ। আমি যাব তুমি থাকবে।'

দুধে যেমন ধাবল্য অগ্নিতে যেমন দাহিকা পৃথিবীতে যেমন গন্ধ তেমনি আমিই তোমাতে ওতপ্রোত আছি। আমি অচ্যুতবীজরূপ আর তুমি সৃষ্টির আধারভূতা। সমতুল্য প্রকৃতি-পুরুষ। আমাদের অনশ্বর ঐক্য, শাশ্বত সাযুজ্য।

॥ ১৬৩ ॥

দুই শালতরুর মাঝখানে অমিতাভ বুদ্ধ শুয়েছেন বিশ্রামের জন্যে। আশ্চর্য। অকালবসন্তের উদয় হল বৃক্ষশাখে। অমিত পুষ্পভারে বৃক্ষশাখা নুয়ে পড়ল। নুয়ে পড়ল অমিতাভের শয়নমঞ্চের উপর। আকাশ হতেই ফুল ঝরে পড়তে লাগল। আকাশ থেকে গীতধ্বনি নেমে এল মাটিতে।

আনন্দকে উদ্দেশ করে বললেন তথাগত: 'আনন্দ দেখ, দেখ এখন ফুল ফোটবার সময় নয়, তবু গাছ ভরে অজস্র ফুল ফুটেছে। শুধু তাই নয় সে ফুল ঝরে পড়ছে আমার উপর। আকাশে সুর বাজছে মধুক্ষরা। দেবতারা বুদ্ধপূজা করছেন। তাই না?'

'তাই।' আনন্দ চোখ নত করল।

'কিন্তু আনন্দ, এই ভাবে বুদ্ধের সম্যক পূজা হয় না।' বললেন বুদ্ধদেব। 'সত্যে শ্রদ্ধাবান সকল নরনারী নিজের জীবনে ধর্মের যথাযথ শীলন ও পালন করলেই

বুদ্ধের যথার্থ পূজা হয়। তাই তোমাকে বলি ধর্মানুসারে জীবন যাপন করবে। অতি ক্ষুদ্র তুচ্ছ ব্যাপারেও ধর্মের পবিত্র বিধি পালন করতে কুণ্ঠিত হবে না।'

আনন্দ কাঁদছে। পাছে তার কান্না দেখে ফেলেন, আনন্দ সরে পড়ল।

আমি এখনো লক্ষ্যে উপনীত হইনি। এর জন্যে আনন্দের কান্না। আমার কাম্যবস্তু পাইয়ে দেবার আগেই চলে যাচ্ছে কাম্যতম। জগজ্জ্যোতি যাত্রা করেছে নির্বাণে।

আনন্দকে ডেকে পাঠালেন বুদ্ধদেব। বললেন, 'আনন্দ, শোক কোরো না, হতাশ হয়ো না। ভেবে দেখ, শোকের বা বৈরাগ্যের কিই বা আছে! যা আমাদের প্রীতিকর যা আমাদের ভালোবাসার বস্তু তার থেকে একদিন বিচ্ছিন্ন হবই। যা অচিরস্থায়ী তাকে হারিয়ে শোক কি? যা জাত, গঠিত, তা কি করে অবিনাশী হবে? তা ধ্বংসান্ত হতে বাধ্য।'

আনন্দ চোখ ফিরিয়ে নিল।

'আনন্দ, তুমি দীর্ঘকাল আমার সেবা করেছ, বিশ্বস্ত বন্ধুর মত থেকেছ আমার পাশে-পাশে, চিন্তায় বাক্যে ও কর্মে তোমার আদর্শ থেকে এক তন্তু ভ্রষ্ট হওনি। এই তো যথার্থ পথ। এই পথ ধরে চলে যাওয়াতেই তো সিদ্ধি।'

যুগ্ম শালতরুর নিচে ভগবান বিশ্রাম করছেন এ খবর ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। দলে-দলে বুদ্ধকে পূজা করবার জন্যে আসতে লাগল নরনারী।

নিশীথ রাত্রি। বুদ্ধদেবের কাছে এসে বসল আনন্দ। বুদ্ধদেব বললেন, 'তোমার হয়তো মনে হবে, আমাদের শিক্ষা দিতে আর কেউ রইলেন না। কিন্তু তা মোটেই নয়। ধর্ম রইল, যে ধর্ম আমি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছি, এই ধর্মই তোমাকে পথ দেখাবে। এই ধর্মই তোমার একমাত্র শাস্তা।'

আবার বললেন, 'যা নির্মিত হয়েছে তা বিনষ্ট হবেই। তার জন্যে শোক করা বৃথা। আনন্দ, তুমি নিজেই নিজের আলোকবর্তিকা হও, নিজেতেই আশ্রয় গ্রহণ কর। অবিশ্রান্ত যত্ন করে নিজের মুক্তির পথ নিজে পরিষ্কৃত কর।'

নিজের খোঁজ নাও। চলো কৃত্রিমকে লঙ্ঘন করে সহজের মধ্যে। যারা বলে তিনি দূরে আছেন তারাই দূরে আছে। অনুভবের রসে মাতাল হও। অনুভবই অগম্যের বাণী।

আমি নিজেই নৌকা নিজেই মাঝি নিজেই নদী নিজেই কূল।

আত্মপূজা করছেন ঠাকুর।

ঠাকুরের সামনে পুষ্পপাত্রে ফুলচন্দন এনে রেখেছে। ঠাকুর উঠে বসেছেন

শয্যায়। ফুলচন্দন নিয়ে নিজেকেই পূজো করছেন। সচন্দন ফুল কখনো রাখছেন মাথায় কখনো কণ্ঠে কখনো হৃদয়ে কখনো নাভিদেশে। ফুলের মালা নিজেই নিজের গলায় দোলালেন।

পূজা-অন্তে মনোমোহনকে নির্মাল্য দিলেন। মাস্টারমশাইকে একটি চাঁপা ফুল। আর সুরেন মিত্তির এলে তাঁর গলায় পরিয়ে দিলেন ফুলের মালা।

আমি কাকে পূজা করি? আমার মাঝে মা আছেন সেই শুদ্ধবোধানন্দময়ী মাকে পূজা করি। সর্বকেন্দ্রস্বরূপিণী সুধাসিন্ধুনিবাসিনী মাকে।

তুলসী দত্ত, নির্মলানন্দ স্বামী, যখন প্রথম আসে দক্ষিণেশ্বরে, দেখল ঠাকুর নিজ সাধনস্থানে পঞ্চবটীতে প্রণাম করে বসলেন নিচের সিঁড়িতে আর ভাবাবিষ্ট হয়ে জগন্মাতার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। কি যে কথা বোঝবার সাধ্য নেই তুলসীর, শুধু মাঝে মাঝে কানে আসতে লাগল হৃদয়পরিপূর্ণ ধ্বনি, মা, মা!

বাগবাজারে তুলসীর বাড়ি। সে বাড়িরই এক অংশে গঙ্গাধর, অখণ্ডানন্দ স্বামী থাকে, সামনেই হরিনাথ বা তুরীয়ানন্দের বাসা। তিনজনের গলায়-গলায় ভাব। হরিনাথ আর গঙ্গাধর ঠাকুরকে প্রথম দেখে দীননাথ বসুর বাড়িতে, তুলসী দেখে বলরাম বসুর বাড়িতে। হরিনাথরা শোনে কে একটা পাগল গান গাইছে, যশোদা নাচাত তোরে বলে নীলমণি, আর তুলসী দেখল কে একটা মাতাল টলতে-টলতে বৈঠকখানায় এসে ঢুকছে। চোখে চোখ পড়ল তুলসীর আর মুহূর্তে মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে একটা বিদ্যুৎকম্পন উঠে গেল।

যেন বার্তা পাঠালেন। যাস দক্ষিণেশ্বর। যাস একা-একা। যখন শুধু তোতে-আমাতে।

কাশীর ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ঠাকুরের ভাষায়, জীবন্ত শিব। তুলসী যখন নিতান্ত বালক মা-বাবার সঙ্গে কাশী এসেছে। খেলবার জায়গা করেছে যেখানটায় মৌনী হয়ে অবস্থান করছেন ত্রৈলঙ্গ। এক দঙ্গল ছেলের সঙ্গে তুলসীও ত্রৈলঙ্গর শান্তিভঙ্গ করছে। একদিন খাপ্পা হয়ে সব শিশুগুলোকে তাড়িয়ে দিল, কিন্তু কি মনে করে তারই মধ্যে থেকে তুলসীকে ডাকল ইশারায়। কি জানি কেন তাকে একটু প্রসাদ খেতে দিল।

তুলসী বলে, দীক্ষা নানারকমের হয়, কখনো বা উদরের মাধ্যমে। ত্রৈলঙ্গ স্বামীর কাছ থেকে আমি উদর-মাধ্যমে প্রথম দীক্ষা পেলুম।

কিন্তু এই দীক্ষা দৃষ্টির মাধ্যমে। যে হয় আপনজনা, সহজেই যায় যে চেনা।

একদিন দুপুরবেলা একা-একা গিয়েছে তুলসী। বলা-কওয়া নেই সটান ঢুকে পড়েছে ঠাকুরের ঘরের মধ্যে। কোনটা যে ঠাকুরের ঘর এও তার জানার

কথা নয়। গিয়ে দেখল ঠাকুর খাচ্ছেন। বলা-কওয়া নেই, মেঝের উপর মিচ্ হয়ে টিপ করে প্রণাম করল। এই কি প্রণাম করবার ছিরি? খাবার সময় কেউ প্রণাম করে? কে জানে! নিয়মকানুন শিখলুম কোথায়!

খাওয়াশেষে ঠাকুর ঘাটে ডেকে নিয়ে গেলেন। মুখ-হাত ধুয়ে ঘাটে বসেই পান-তামাক খেতে লাগলেন। বললেন, 'জানিস, তোর মতন একটা ছেলে সেদিন এসেছিল আমার কাছে—'

'আমার মতন?'

'অবিকল তোর মতন। এমনি মুখ-চোখ, এমনি ছিরি-ছাঁদ। ধর্ না, তুইই এসেছিলি।'

'বা, আমি আসলুম কখন?'

'তা তুই কি করে জানবি। ধর্ ঘুমের মধ্যে চলে এসেছিলি!'

'এসে কি বললাম?'

'বললি, আমার মধ্যস্থ হতে পারবেন?'

'বা, আমি কার সঙ্গে ঝগড়া করলাম যে আপনাকে মধ্যস্থ হতে বলব!'

'ওরে ঝগড়ার মধ্যস্থ নয়, মিলনের মধ্যস্থ। বুঝতে পারছিস না?'

'না।'

'তুই এসে আমাকে বললি, আপনি আমাকে ভগবানের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারবেন? তুই যদি ভাগ্যক্রমে এসে না মিলিস তবে তোকে মেলাব কি করে?'

ঠাকুর তাঁর বাঁ হাতখানা রাখলেন তুলসীর কাঁধের উপর।

তুলসী চকিতে বুঝল ইনিই হচ্ছেন গুরু, মধ্যস্থ। পরে বুঝল, অনাদিমধ্যান্ত। নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপং।

বরানগরের নারায়ণ শিরোমণি প্রকাণ্ড কথক। ঠাকুরকে দেখতে একবার এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। বলছে, 'আমি দেশবিদেশ ঘুরে কত হরিনাম করে বেড়াই, কত গীতা-ভাগবতের কথা শোনাই, কত লোককে মাতিয়ে দি। শুনতে পাই আপনিও নাকি অনেক উপদেশ দেন, হরিগুণগান করে লোক মাতান। আমাতে-আপনাতে তফাত কতটুকু? শুনতে পাই আপনার নাকি খুব উচ্চ অবস্থা। বলতে পারেন সে অবস্থায় পৌঁছুতে আমার কত দেরি?'

ঠাকুর একটু হাসলেন। বললেন, 'ওগো, বেশি দেরি নেই, বেশি তফাতও নেই—এই একটুকুন বাকি।' বলে আঙুলের একটি কড় দেখালেন। 'তুমি কি কম লোক গা? তোমার গুণের অবধি নেই। তুমি হরিকথা শুনিয়ে কত প্যালা পাও, আর আমার এখানে কারু প্যালা লাগে না। তোমার মত পণ্ডিতের সঙ্গে

কি আমার তুলনা হতে পারে? আমি মুখ্খু-সুখ্খু মানুষ, লেখাপড়ার ধার ধারি না, মা যা বলান তাই বলি। আর তোমার কত বিদ্যা কত মুখস্থ কত জ্ঞানগরিমা—'

আবার বললেন, 'মাকে বলি, মা, মুখ্খুর মত গাল নেই। তুই আমার এই গালটা ঘুচিয়ে দে। কিন্তু মা আমার কথায় কানও দেয় না।'

যোগীনকে ডাকলেন ঠাকুর। 'যোগীন, পাঁজিখানা নিয়ে আয় তো।'

যোগীন পাঁজি নিয়ে এল।

'পঁচিশে শ্রাবণ থেকে প্রতিদিনের তিথি-নক্ষত্র সব পড়ে শোনা তো।'

যোগীন পড়তে লাগল। পঁচিশে, ছাব্বিশে, পড়তে লাগল পন্ন-পন্ন। পড়তে-পড়তে এল শ্রাবণ-সংক্রান্তিতে। একত্রিশে শ্রাবণ।

'রাখ্, আর পড়তে হবে না।' ইঙ্গিতে পঞ্জিকা রেখে দিতে বললেন।

'কেন?' যোগীনের কণ্ঠ উদ্বেগভারাতুর।

'বেশ রাত্রি, বেশ তিথি। ঝুলনপূর্ণিমা।'

নরেনকে ডাকলেন। শশী ছিল দাঁড়িয়ে তাকে বললেন, নিচে যা। কেউ যেন না থাকে ধারে-কাছে। শুধু আমি আর নরেন।

ঘর ফাঁকা হয়ে গেল। নরেনকে বললেন, 'চারদিকে ভালো করে দেখে আয় উঁকি দিয়ে, কেউ যেন না উপরে আসে।'

নরেন দেখে এল। বললে, কেউ নেই।

'বোস আমার কাছটিতে।'

শান্ত হয়ে তন্ময় হয়ে পিপাসু হয়ে বসল নরেন।

আরেকদিনের কথা মনে পড়ল নরেনের। বলছে মাস্টারমশাইকে, 'আমাকে একদিন একলা একটি কথা বললেন। কাউকে বলবেন না যেন সে কথা।'

'না। কি বললেন?'

'বললেন আমার তো সিদ্ধাই করবার জো নেই। তোর ভিতর দিয়ে করব।'

'তুমি কি বললে?'

'আমি তাঁকে এক-কথায় হটিয়ে দিলুম। বললুম, না, তা হবে না। তিনি চুপ করে গেলেন।' স্বগতোক্তির মত বলছে নরেন, 'তাঁকে মানতুম না, ধরতুম না, ওঁর সব কথা উড়িয়ে দিতুম। তিনি বলতেন, ওরে, আমি কুটির উপর থেকে চেঁচিয়ে বলতাম, ওরে কে কোথায় আছিস তোরা আয়, তোদের না দেখে যে আর থাকতে পারি না। মা বলে দিলেন ভক্তেরা সব আসবে। ঠিক-ঠিক মিলল। তোরা সব এলি একে-একে।'

কত আপনার জন, চক্ষুর চক্ষু শ্রোত্রের শ্রোত্র প্রাণের প্রাণ, এমনি ঘনতম অন্তরঙ্গতায় বসেছে নরেন। দয়াঘন স্নেহপরিপূর্ণ চোখে তাকিয়ে আছেন ঠাকুর। সেই মধুরভাবের পাগলিনী, যাকে দেখে ঠাকুরের ভয়, তারও প্রতি ঠাকুরের কি করুণা!

থেকে-থেকে চলে আসে ফটক খুলে। কারুর নিষেধ-বাধা মানে না একেবারে সোজা দোতলায় উঠে আসে। এসেই মায়ের গান ধরে। কি মিষ্টি গলা! গান শুনেই ঠাকুরের সমাধি হয়ে যায়।

আমার সন্তানভাব। মধুরভাবের পসারিণীকে আমার এখন বড় ভয়।

'ওরে পাগলীকে বাগান থেকে বের করে দে। ওকে এখানে আসতে দিস না।' নিরঞ্জন লাঠি নিয়ে তাড়া করে তবু সরে না পাগলী। কালীপ্রসাদ তো একদিন হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে থানায়ই রেখে এল। আবার কখন থানা থেকে সরে পড়ে চলে এসেছে বাগানে। আবার গান ধরেছে। গান শুনে ঠাকুরের আবার ভাবাবেশ।

এবার আর তাড়া নয়, এবার রীতিমত প্রহার।

তবুও নিবৃত্তি নেই। দিগম্বর বালক হয়ে ভক্তসঙ্গে বসে আছেন ঠাকুর, পাগলীর সাড়া পাওয়া গেল বাইরে। শশী বলল, 'উপরে উঠলে ধাক্কা মেরে ফেলে দেব।'

ঠাকুর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'না, না, আসবে আবার চলে যাবে।'

'না, আসবে না।' নিরঞ্জন হুমকে উঠল।

রাখাল দুঃখ করতে লাগল, পাগলের উপর আবার আস্ফালন!

'তোর মাগ আছে কিনা তাই তোর মন কেমন করে।' নিরঞ্জন গর্জে উঠল, 'আমরা তাকে বলিদান দিতে পারি।'

'কি বাহাদুরি! রাখালও পাল্টা বললে, 'কিন্তু জিগগেস করি ঠাকুর কি শুধু তোর-আমার? শুধু এই ঘরের লোকদের? বাইরের লোকদের নন? তিনি কি শুধু আমাদের এই কয়জনের জন্যেই এসেছেন? আপামর সকলের জন্যে আসেননি। উনি কি শুধু সদগুরু? উনি জগৎগুরু। সদগুরুই জগদ্গুরু। উনি সকলের। পাগলেরও।'

'তাই বলে অসুখের সময় কেন?' শশী প্রতিবাদ করল: 'উপদ্রব করে কেন?'

'উপদ্রব সবাই করে। আমরা করিনি? গিরিশ ঘোষ করেনি? নরেন-টরেন আগে কি রকম ছিল, কত যন্ত্রণা দিত, কত তর্ক করত। কষ্ট কি আমরাই কিছু কম দিয়েছি? ডাক্তার সরকার কত কি ওঁকে বলেছে। বলেনি? ধরতে

গেলে কেউই নির্দোষ নয় নিরুপদ্রব নয়।'

ঠাকুর বললেন, 'রাখাল, কিছু খাবি?' রাখালের প্রতি তাঁর স্নেহ উচ্চারিত হয়ে উঠল।

রাখাল বললে, 'খাবোখন।'

পাগলী সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। আজ আর কোনো উপদ্রব করল না। শুধু প্রণাম করে চলে গেল।

কিন্তু ঠাণ্ডা থাকবার পাত্র নয় পাগলী। আবার হৈ-চৈ শুরু করে দিয়েছে। আবার গান জুড়েছে। আবার ভাবাবেশে ঠাকুরকে ক্লিষ্ট করা।

এখন শুধু মন নিচে নামিয়ে রাখবার প্রয়োজন।

নরেনকে একদিন বলেছিলেন, 'আচ্ছা, তোর কি মনে হয়? এখানে সব আছে না? নাগাদ মুশুর ডাল, ছোলার ডাল তেঁতুল পর্যন্ত।'

নরেন বললে, 'সব আছে, আপনি সব অবস্থা ভোগ করে নিচে এসে রয়েছেন।'

'সব অবস্থা ভোগ করে ভক্তের অবস্থায়।' মাস্টারমশাই বললে।

'কে যেন নিচে টেনে রেখেছে।' বললেন ঠাকুর।

পাগলীকে নিরঞ্জন একদিন একটা খালি ঘরে বন্ধ করে রাখল। যদি এমনিতরো শাস্তিতে শিক্ষা হয়। কতক্ষণ পরে দরজা খুলে দিতেই আবার সিঁড়ি বেয়ে উপরে। আবার সেই গান।

তখন নিরঞ্জন কাঁচি দিয়ে পাগলীর মাথার চুলগুলি কেটে দিল। তারপর পাগলী আর এল না।

নিরঞ্জনের যা কিছু করা তার মূলে গুরুসেবা।

'দেখ না নিরঞ্জনকে।' বলছেন ঠাকুর, 'কিছুতেই লিপ্ত নয়, নিজের টাকা দিয়ে গরিবদের ডাক্তারখানায় নিয়ে যায়। বিয়ের কথায় বলে, বাপরে, ও বিশালাক্ষীর দ। নিরঞ্জনকে দেখি, একটা জ্যোতির উপর বসে আছে।'

আহা এই তো চাই। কোনো লেনা-দেনা নেই। যখন ডাক পড়বে তখনই যেতে পারবে।

'লোক বাছা যা বলছ তা ঠিক।' মাস্টারকে বলছেন ঠাকুর, 'এই অসুখ হওয়াতে কে অন্তরঙ্গ কে বহিরঙ্গ বোঝা যাচ্ছে। যারা সংসার ছেড়ে এখানে আছে তারা অন্তরঙ্গ। আর যারা একবার এসে কেমন আছেন মশাই জিগগেস করে তারা বহিরঙ্গ।'

নীলকণ্ঠের গানেই বা কত মধু কত ভক্তি। কৃষ্ণলীলায় বৃন্দাবনদূতী সেজে কেঁদে ভাসিয়ে দেয় সকলকে। হাটখোলায় বারওয়ারিতলায় শ্রীকৃষ্ণ যাত্রাগান

করবে, ঠাকুর বালকের মত মেতে উঠলেন তিনি যাবেন। একটা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে আয়। লাটু আর কালী, চল আমার সঙ্গে।

লোকে লোকারণ্য ভিড়। ভিতরে ঢোকেন এমন সাধ্য নেই। সুতরাং স্বয়ং নীলকণ্ঠকে ধরো। খবর পৌঁছল তার কাছে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেব এসেছেন। শোনামাত্র গান থামাল নীলকণ্ঠ। নিজে গিয়ে ভিড় সরিয়ে ঠাকুরকে নিয়ে এল আসরে।

শ্রীরাধার প্রেমে মত্ত হয়ে গান ধরল নীলকণ্ঠ : 'পীরিতি বলিয়া এ তিন আখর ভুবনে আনিল কে।' ঠাকুর নিজের থেকে আখর দিতে শুরু করলেন। গান ভীষণ জমে উঠল। কতক্ষণ পরে ঠাকুর বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে সমাধিস্থ দেখে নীলকণ্ঠ বারে-বারে তাঁর পায়ের ধুলো নিতে লাগল। সমাধি ভাঙবার পর আবার চুপ করে বসে গান শুনতে লাগলেন। গানে আর শোভায় সারা বারওয়ারিতলা গমগম করতে লাগল।

সেই নীলকণ্ঠ আবার এসেছে দক্ষিণেশ্বরে।

ঠাকুরকে বলছে, 'আপনিই সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ।'

'ওগুলো কি বলছ? আমি সকলের দাসের দাস। গঙ্গারই ঢেউ। ঢেউয়ের কখনো গঙ্গা হয়?'

'যাই আপনি বলুন, আমরা আপনাকে তাই দেখছি।'

'বাপু হে, আমার আমিই তো খুঁজে ফিরছি, কিন্তু পাই কই?'

'আমরা কি অতশত বুঝি?' নীলকণ্ঠ হাত জোড় করল : 'আমাদের শুধু কৃপা করবেন।'

'কি বল! তুমি কত লোককে পার করছ, তোমার গান শুনে কত লোকের উদ্দীপন হচ্ছে!'

'পার করছি বলছেন?' নীলকণ্ঠ হাসল। 'কিন্তু আশীর্বাদ করুন যেন নিজে না ডুবি।'

'যদি ডোবো তো, ঐ সুধা-হ্রদে।' বললেন ঠাকুর। 'তোমার এখানে আসা, যাকে অনেক কিনা সাধ্যসাধনা করে তবে পাওয়া যায়। বেশ, তবে একটা তুমি গান শোনো।' বলে গান ধরলেন ঠাকুর। গান শেষ করে বললেন, 'আমার ভারি হাসি পাচ্ছে। ভাবছি তোমাদের আবার গান শোনাচ্ছি।'

'আমরা যে গান গেয়ে বেড়াই তার আজ পুরস্কার হল।' ঠাকুরকে আবার প্রণাম করল নীলকণ্ঠ।

নরেন একবার বলেছিল ঠাকুরকে, 'আমি শান্তি চাই, ঈশ্বর পর্যন্ত চাই না।'

আহা. ঈশ্বরই তো শান্তি।

ঠাকুরের পাশটিতে বসে সেই শান্তিই যেন আস্বাদ করছে নরেন।

নরেন তাকিয়ে আছে ঠাকুরের দিকে। ঠাকুরের নিষ্পলক দৃষ্টি। সর্বসংশয়চ্ছেদী অভয় আশ্বাসে পরিপূর্ণ। চেয়ে থাকতে-থাকতে নরেনের মনে হল কি একটা আশ্চর্য স্পন্দন তার সমস্ত দেহে আলোড়িত হচ্ছে। মনে হল ঐ দুটি পুণ্যচক্ষুর আভা ছাড়া সংসারে আর তার কোনো অনুভূতি নেই।

হঠাৎ চমক ভাঙল নরেনের। দেখল ঠাকুর কাঁদছেন।

'এ কি, কাঁদছেন কেন?'

'নরেন, আমার যা কিছু ছিল, আমার যথাসর্বস্ব, তোকে আজ দিয়ে দিলুম।'

নরেনের একটা হাত ঠাকুরের একখানা হাতের মধ্যে ধরা: 'দিয়ে আমি আজ ফকির হয়ে গেলুম, ফতুর হয়ে গেলুম। তুই রাজরাজেশ্বর হয়ে গেলি।'

নরেন অনুভব করল এ কান্না আনন্দের নির্ঝর। এ কান্না তার রাজাভিষেকের পুণ্যবারি।

নরেনও কাঁদতে লাগল।

ঠাকুর বললেন, 'তুই সবাইকে আঁকড়ে থাকবি, সকলের আশ্রয় হবি। সকলের ভার তোর হাতে দিয়ে গেলুম। তারপর তোর যখন কাজ ফুরুবে, যখন একদিন বুঝতে পারবি তুই সত্যি কে, ফিরে যাবি স্বধামে।'

নরেন গুরুবলে বলীয়ান হয়ে উঠল। অয়মহং ভোঃ। ওঠো জাগো, যতক্ষণ পর্যন্ত না ঈপ্সিততমকে অর্জন করতে পারছ ততক্ষণ নিবৃত্ত হয়ো না।

ঠাকুর বললেন, তিনিই সব হয়েছেন। কেন? সবই আবার তিনি হবে বলে। তুই এই হওয়ার বার্তাটি পৌঁছে দে ঘরে-ঘরে। পৌঁছে দে জনে-জনে।

॥ ১৬৪ ॥

'আমরা গোরার সঙ্গে থেকেও তার ভাব বুঝতে নারলাম রে।' চৈতন্যলীলায়ও এ আক্ষেপ করেছিল পার্ষদরা, এবারও বুঝি সেই মনস্তাপ। ঠাকুর তাই ঠিক করলেন, হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে যাবেন।

'এখানকার যা কিছু সব নজির স্বরূপ।' বললেন ঠাকুর।

কিসের নজির?

জীবমাত্রেই ব্রহ্মের প্রতিভাস। তুমিও তাই 'তদগতান্তরাত্মা' হয়ে ওঠো। ঈশ্বর-লাভের জন্যেই মানবজীবন। তাই এখানে দেখ সেই মানবজীবনের চরম সার্থকতা। 'আমি ষোলো টাং করে গেলাম যদি তোরা এক টাং করিস।' যদি ষোলো

দেখে অন্তত এক হতে চাস। যদি মহৎকে দেখে অণু হবারও প্রেরণা জাগে।'
'কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ।' নরবপু যে তাঁর স্বরূপ এটুকু অন্তত বুঝে যাও। একই অগ্নি বিশ্বভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে রূপে-রূপে রূপায়িত প্রাণে-প্রাণে প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে। ঠাকুর বললেন, 'নরলীলায় মন কুড়িয়ে আনলেই হয়ে গেল। আরগুলা কুমরে পোকা হয়ে গেলেই হয়ে গেল।
সেই মহত্তম পরমতম হয়ে-ওঠাকে দেখ। 'নরলীলা কেমন জানো?' আবার বললেন ঠাকুর: 'যেমন বড় ছাদের জল নল দিয়ে হুড়-হুড় করে পড়ছে। সেই সচ্চিদানন্দ—তাঁরই শক্তি একটি প্রণালী দিয়ে, নলের ভিতর দিয়ে আসছে।'
তুমি আমি হয়ে ওঠ। অর্জুনকে তাই তো বললেন শ্রীকৃষ্ণ। 'মদ্‌ভাবমাগত' হও। 'সকলের চেয়ে গুহ্যতম পরমকথা এবার শোনো।' শ্রীকৃষ্ণ বললেন অর্জুনকে, 'তুমি আমার প্রিয় হতে প্রিয়তর তাই তোমাকে বলছি এ গোপন কথা। সব ভুলে আমাকে ভাবো, আমার দিকে চোখ ফেরাও, আমাগতপ্রাণ হয়ে ওঠ। তুমি আমার প্রিয় তাই প্রতিজ্ঞা করে তোমাকে বলছি, তোমাকে আমি হয়ে উঠতেই হবে। বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্‌ভাবমাগতাঃ। অনেকে শুধু আমার হাত ধরে আমা-সম হয়ে উঠেছে।'
অরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে বললেন, এই সুবিশাল বটবৃক্ষ দেখছ, এর থেকে একটি ফল আহরণ কর।
বটফল আহরণ করল শ্বেতকেতু।
'ভাঙো।'
ভাঙল বটফল।
'কি দেখছ?'
'ছোট-ছোট বীজকণা।'
'একটি কণাকে ভাঙো। আরো ভাঙো। কি দেখছ?'
'এখন আর কিছুই দেখছি না।'
'যা এখন আর দেখছ না সেই সূক্ষ্মাংশ থেকেই উৎপন্ন হয়ে এই মহাবল বটবৃক্ষ বিদ্যমান আছে।' অরুণি বললেন, 'বৎস, শ্রদ্ধান্বিত হও। শ্রদ্ধা না থাকলে এই তত্ত্ব বুদ্ধির অগম্য।'
'কিন্তু সত্যিই যদি জগতের মূল হয় তবে তা প্রত্যক্ষ হয় না কেন?' জিগগেস করলে শ্বেতকেতু।
অরুণি বললেন, 'এই নুন নাও, জলে ফেলে দিয়ে এস। কাল প্রাতঃকালে দেখা

কোরো।'

প্রভাতে দেখা করতে এল শ্বেতকেতু। অরুণি বললেন, 'বৎস, রাত্রে যে নুন জলে ঢেলে দিয়েছিলে সেই নুন নিয়ে এস।'

অনেক অনুসন্ধান করেও সে নুন পাওয়া গেল না। যদিও সে নুন বিলীনরূপে বিদ্যমান। জলপাত্র নিয়ে উপস্থিত হল শ্বেতকেতু।

অরুণি বললেন, 'বৎস, এই জলের উপরিভাগ থেকে আচমন করো। কেমন বোধ হচ্ছে?'

'লবণাক্ত।'

'মধ্যভাগ থেকে আচমন করো। কেমন বোধ হচ্ছে?'

'লবণাক্ত।'

'অধোভাগ থেকে আচমন করো। কেমন বোধ হচ্ছে?'

'লবণাক্ত।'

'এবার জল ফেলে দিয়ে আমার কাছে বোস।'

বসল শ্বেতকেতু। অরুণি বললেন, 'শোনো, ঐ লবণ জলের মধ্যেই সর্বদা বিদ্যমান ছিল। এই জলের মধ্যে বিদ্যমান থেকেও যেমন তুমি লবণকে দেখতে পাওনি তেমনি এই দেহমধ্যেই সেই সত্য সেই ব্রহ্ম অপ্রত্যক্ষরূপে বিদ্যমান আছেন।'

আগে নুন যখন হাতে করে নিয়ে এসেছিলে তখন তাকে স্পর্শ করে জেনেছিলে চোখ দিয়ে দেখেছিলে। কিন্তু যেই জলে মিশে গেল অমনি চক্ষু আর স্পর্শের বাইরে চলে গেল। তখন সেই নুনকে জানবে কি করে? সেই জানার উপায়ান্তর আছে। সেই উপায়ান্তর হচ্ছে জিহ্বা। তখন তুমি জিহ্বা দিয়ে জানবে এই সেই নুন।

তেমনি জগতের মূল সৎব্রহ্ম এই দেহে বিদ্যমান থাকলেও ইন্দ্রিয়াদির অগ্রাহ্য। কিন্তু তাকেও জানবার উপায়ান্তর আছে।

আছে? কি সেই উপায়ান্তর?

অরুণি বললেন, 'যদি কাউকে চোখ বেঁধে গান্ধারদেশ থেকে নিয়ে এসে তারও চেয়ে নির্জন জায়গায় এনে ছেড়ে দেয় তার কি দশা হয় সে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে কখনো পুবে কখনো উত্তরে কখনো দক্ষিণে কখনো বা পশ্চিমে ছুটোছুটি করতে থাকে। আর এই বলে আর্তনাদ করে, আমাকে চোখ বেঁধে নিয়ে এসেছে আর, দেখ, বদ্ধচক্ষু অবস্থাতেই ফেলে গেছে এখানে। তখন কেউ যদি তার বন্ধন মোচন করে দিয়ে বলে, এই দিকে গান্ধারদেশ এই দিকে যাও, তখন সেই আলোকপ্রাপ্ত উপদেশপ্রাপ্ত লোক গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে কথা

জিগগেস করতে-করতে সেই গান্ধারদেশে এসেই উপস্থিত হয়। তেমনি সংসার-প্রবিষ্ট ব্যক্তি, আচার্যবান পুরুষ গুরুকর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে।'

অবতারই সেই মানুষরতন। যিনি তরণ করে তারণ করেন।

'অবতারের ভিতরই ঈশ্বরের শক্তির বেশি প্রকাশ।' বললেন ঠাকুর, 'অবতারের আমির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে সর্বদা দেখা যায়।'

কে একজন ভক্ত বললে, 'আজ্ঞে, আপনাকে দেখাও যা, ঈশ্বরকে দেখাও তা।'

'ও কথা আর বোলো না।' বলে উঠলেন ঠাকুর, 'গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউয়ের গঙ্গা নয়। আমি এত বড় লোক, আমি অমুক, আমি শম্ভু মল্লিক বা আমি মহিম চক্রবর্তী, আমি ধনী আমি বিদ্বান এই আমি ত্যাগ করতে হবে। আমি-টিপিকে ভক্তির জলে ভিজিয়ে সমভূমি করে ফেল।'

সেইবার ঠাকুরের যখন হাত ভাঙা, হাতে বাড়-বাঁধা, উত্তরগীতা পড়ে শোনাচ্ছে মহিমাচরণ। 'ব্রাহ্মণদের দেবতা অগ্নি, মুনিদের দেবতা হৃৎস্থ অর্থাৎ হৃদয়মধ্যে, স্বল্পবুদ্ধি মানুষের দেবতা প্রতিমায় আর সমদর্শী মহাযোগীদের দেবতা সর্বত্র।'

'প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং সর্বত্র সমদর্শিনাম্। সর্বত্র সমদর্শিনাং'—কথা কয়টি শোনামাত্র ঠাকুর আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। উঠে দাঁড়িয়েই সমাধিস্থ। হাতে সেই বাড় ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ভক্তেরা নির্নিমেষে দেখছে সমদর্শী মহাযোগীকে।

আকীটপতঙ্গপিপীলক ব্রহ্ম। সকলেই তাঁর অবতার। 'তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে।' পর ও অবর, উৎকৃষ্টে ও অপকৃষ্টে সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করো। সেই দর্শনেই হৃদয়বন্ধন ভিন্ন, সংশয়জাল ছিন্ন ও কর্মরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত। 'মোমের বাগানে সবই মোম।'

চিড়িয়াখানা দেখতে গিয়েছেন ঠাকুর। সিংহদর্শন করেই ঠাকুর সমাধিস্থ।

'ঈশ্বরীর বাহনকে দেখেই ঈশ্বরের উদ্দীপন হল।' বললেন ঠাকুর।

আবার বললেন, 'আমি একবার মিউজিয়মেও গিয়েছিলুম। দেখলুম ইট পাথর হয়ে গেছে, জানোয়ার পাথর হয়ে গেছে। দেখ, সঙ্গের গুণ কি। তাই সর্বদা যদি সাধুসঙ্গ কর সাধু হয়ে যাবে।'

উপনিষদের ভাষায় ঐটিই উপায়ান্তর।

'নানা শাস্ত্র জানলে কি হবে, ভবনদী পার হতে জানা দরকার।' বললেন ঠাকুর।

নৌকো করে কজন গঙ্গা পার হচ্ছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিল পণ্ডিত,

সর্বদা বিদ্যা জাহির করতে ব্যস্ত। পাশের লোককে জিগগেস করল, বেদান্ত জানো? সে বললে, আজ্ঞে না। সাংখ্য-পাতঞ্জল জানো? আজ্ঞে না। ষড়দর্শন? তাও না। এমন সময় ঝড় উঠল নদীতে। নৌকো প্রায় ডোবে। তখন পাশের লোকটি ভীতত্রস্ত পণ্ডিতকে জিগগেস করলে, পণ্ডিতজী, আপনি সাঁতার জানেন?' পণ্ডিত মুখ কাঁচু-মাচু করে বললে, না। পাশের লোকটি বললে, 'পণ্ডিতজী, আমি সাংখ্যপাতঞ্জল জানি না, কিন্তু সাঁতার জানি।'

স্টার-থিয়েটারে 'বৃষকেতু' অভিনয় দেখছেন ঠাকুর। গিরিশকে শুধোলেন, 'এ কার থিয়েটার? তোমার, না, তোমাদের?'

গিরিশ বললে, 'আজ্ঞে আমাদের।'

'আমাদের কথাটিই ভালো, আমার বলা ভালো নয়। কেউ-কেউ বলে আমি নিজেই এসেছি, নিজেই করেছি।' বলছেন ঠাকুর, 'এ সব হীনবুদ্ধি অহঙ্কারে লোকের কথা।'

নরেন বললে, 'সবই থিয়েটার।'

'হ্যাঁ, ঠিক, ঠিক কথা।' বললেন ঠাকুর, 'তবে কোথাও বিদ্যার খেলা কোথাও অবিদ্যার।'

নরেন জোর গলায় বললে, 'সবই বিদ্যার।'

'হ্যাঁ, তবে ওটি ব্রহ্মজ্ঞানে হয়। ভক্তের কাছে দুই আছে, বিদ্যামায়া আর অবিদ্যামায়া। খোসাটি আছে বলেই আমটি আছে। মায়া হচ্ছে খোসা, আম হচ্ছে ব্রহ্ম। মায়ারূপ ছালটা আছে বলেই ব্রহ্মজ্ঞান লভ্য।'

নরেনের হঠাৎ মনে হল, এখন যদি প্রকাশ করে বলেন, বলতে পারেন, তাহলে বুঝি। তবেই বিশ্বাস করি।

কি বলবেন? কি শুনতে চাস?

অনেক সময় বলেন তিনিই সেই, ছদ্মবেশে রাজ্যভ্রমণে এসেছেন। তিনিই ভগবানের অবতার, তিনিই পুরুষোত্তম। এখন সে কথা কি তিনি ঘোষণা করতে পারেন? এই অসহন রোগক্লেশের মধ্যে, এই মৃত্যুশয্যায় শুয়ে? বলতে পারেন, তিনিই আদিদেব, পুরাণ পুরুষ, সমস্ত বিশ্বের নিলয়-নিধান? বলতে পারেন তিনিই বেত্তা তিনিই বেদ্য তিনিই সেই অব্যয় অক্ষর? বলতে পারেন, তিনিই ভগবান?

'এখনো তোর জ্ঞান হল না?' নিদারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যে কমলবিশদ প্রসন্ন চোখ মেলে ঠাকুর তাকালেন নরেনের দিকে। বললেন: 'এখনো তোর সংশয়? সত্যি-সত্যি বলছি, যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং এ শরীরে রামকৃষ্ণ।

তবে তোর বেদান্তের দিক থেকে নয়।'

থমকে দাঁড়াল নরেন। অপরাধের গ্লানিতে দুই চোখ জলে ভরে উঠল। ভুবনমঙ্গল স্বরূপানন্দ ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে রইল অপলকে। তোমার চরণে শাশ্বতী স্থিতি দাও। বৈরাগ্যবলসম্পন্ন জ্ঞান দাও। ভবপ্রদা গৃহাসক্তি ছেদন কর।

এই অসুখ হবার প্রায় চার-পাঁচ বছর আগে শ্রীমাকে একদিন বলেছিলেন ঠাকুর, 'যখন দেখবে যার-তার হাতে খাচ্ছি, কলকাতায় রাত কাটাচ্ছি আর খাবারের অগ্রভাগ কাউকে দিয়ে বাকিটা নিজে খাচ্ছি, তখনই বুঝবে দেহরক্ষার আর বাকি নেই।'

কত দিন থেকেই তো কলকাতায় নানা ভক্তের বাড়িতে অন্ন ছাড়া অন্য ভোজ্য খাচ্ছেন, বলরামের বাড়িতে তো অন্নই খেয়েছেন রীতিমতো, আর রাতও কাটিয়েছেন মাঝে-মাঝে। তবে দিন কি ঘনিয়ে এল? তবু খাবারের অগ্রভাগ তো এখন কাউকে দেননি।

কিন্তু সেবার কি হল? নরেনের পেট খারাপ হয়েছে, কদিন আসছে না দক্ষিণেশ্বর। কেন আসছে না রে? দক্ষিণেশ্বরে তার উপযুক্ত পথ্য হবে না। কিন্তু বল গে, আমি তাকে ডেকেছি। সকালবেলা তার কাছে লোক পাঠালেন ঠাকুর। নরেনকে আসতে হল। ঠাকুরের নিজের জন্যে ঝোলভাত তৈরি হয়েছে, তারই অগ্রভাগ নরেনকে খেতে দিলেন। বললেন, 'যা বাকি আছে তাই আমার জন্যে নিয়ে এস।'

সারদামণি বুকের মধ্যে ধাক্কা খেলেন। বললেন, 'না, না, আমি তোমাকে ফের নতুন করে রেঁধে দিচ্ছি।'

কিন্তু ঠাকুর শোনবার পাত্র নন। বললেন, 'নরেনকে দিয়ে খাব তাতে দোষ কি! নিয়ে এস যা আছে।'

ঠাকুর কি বলেছিলেন তা যেন মন থেকে মুছে দিতে চাইলেন শ্রীমা। ভাবলেন নরেনের সঙ্গে কার কথা! নরেন যেন সব কিছুর ব্যতিক্রম।

কিন্তু আজ, ১২৯৩ সালের শ্রাবণ-সংক্রান্তির দিন মা এত চঞ্চল হয়ে উঠলেন কেন? ঠাকুরের মহা-সমাধির দিন কি তবে সমুপস্থিত?

একখানি দিশি শাড়ি শুকোতে দিয়েছিলেন ছাদে, খুঁজে পেলেন না। জলের কুঁজোটা তোলবার সময় হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল। সেবক-সন্তানদের জন্যে খিচুড়ি রাঁধছেন, তলাটা ধরে গেল।

সারাদিনই ভাববিভোর হয়ে আছেন। ঘন-ঘন সমাধি হচ্ছে। কিছুই

খাওয়ানো যাচ্ছে না।

অতুলের নাড়ীজ্ঞানের প্রশংসা করতেন ঠাকুর। সে এসে নাড়ী দেখল। মুখ অন্ধকার করে বললে, 'আলো নিভতে আর দেরি নেই।'

বিকেলের দিকে অবস্থা আরো খারাপ হল। শ্বাসক্লেশ দেখা দিল। ডাক্তার আর কি করবে, তবু শশী ছুটল ডাক্তারের সন্ধানে। যে ডাক্তার দেখছিল শেষদিকে তার বাড়ি এখান থেকে সাত মাইল। সাত মাইল পথ প্রায় এক নিশ্বাসে পার করে দিল শশী। ডাক্তারের বাড়ি গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসল, ডাক্তার বাড়ি নেই।

কোথায়, কত দূর যেতে পারে? কি করে বলব, দেখুন এদিক-সেদিক। এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করতে লাগল। আরো এক মাইল ছুটে ধরল ডাক্তারকে। চলুন শিগগির কাশীপুর। ডাক্তার বললে, জরুরি কল আছে অন্যত্র। এর চেয়েও জরুরি? ডাক্তারের হাত ধরে হিড়হির করে টেনে নিয়ে চলল। দেখে-শুনে ডাক্তার বললে, যেমন বলে, ভয় নেই।

সন্ধ্যের দিকে চোখ খুললেন ঠাকুর। নিশ্বাস-প্রশ্বাস সহজ হয়ে এল। ভক্তদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সারাদিন দেবতাদের নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম তাই তোদের সঙ্গে কথা কইতে পারিনি। আমি এখন খাব। ভারি খিদে পেয়েছে।'

সারাদিন কিছু মুখে তোলেননি, সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিছু তরল পথ্য নিয়ে এল। কিন্তু গিলতে পারলেন না। অগত্যা জল দিয়ে মুখ মুছে দিল আস্তে-আস্তে, পায়ের নিচে দিল কটা বালিশ গুঁজে। হে আত্মারাম, কি আরাম তোমাকে আমরা দিতে পারি?

হরি ওঁ তৎসৎ—মুখে উচ্চারণ করে ঠাকুর ঘুমিয়ে পড়লেন।

মধ্যরাত্রের দিকে আবার সমাধি হল ঠাকুরের। সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে উঠল। পাখা করছিল শশী, তার মনে হল এ সমাধি যেন অন্যরকম। শিশুর মত কাঁদতে লাগল ফুলে-ফুলে।

গিরিশ আর রামকে খবর পাঠাও।

কোনো ভয় নেই, এস, হরি ওঁ তৎসৎ কীর্তন করি। নরেন ডাকল সবাইকে। ঠাকুরকে ঘিরে বসল। শোকগদগদ কণ্ঠে কীর্তন শুরু হল, হরি ওঁ তৎসৎ।

রাত প্রায় একটার সময় ঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল। স্পষ্ট, সুস্থস্বরে বললেন, 'আমি খাব। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

সবাই আনন্দচকিত হয়ে উঠল। কি খাবেন?

'ভাতের পায়েস খাব।'

ভাতের পায়েস আনা হল। ঠাকুর বললেন, 'বসে খাব।'

যে শয্যাবিলীন দুর্বল সে কিনা উঠে বসতে চায়। ছেলেরা ধরাধরি করে সন্তর্পণে ঠাকুরকে বসিয়ে দিল বিছানায়।

শশী খাওয়াতে লাগল ভাতের পায়েস।

আশ্চর্য, স্বাভাবিক অনায়াসে খেতে লাগলেন। গলায় যেন ঘা নেই যন্ত্রণা নেই। বললেন, এত খিদে যে ইচ্ছে হচ্ছে হাঁড়ি-হাঁড়ি খিচুড়ি খাই।

সবাই অবাক হয়ে গেল। কেন এই খিচুড়ি খাবার ইচ্ছে?

শ্রীমা সকালে যে খিচুড়ি রেঁধেছিলেন তিনি কি তার গন্ধ পেয়েছেন? আরো কি টের পেয়েছেন তলাটা ধরে গিয়েছিল তার? উপরের ভালো অংশ সন্তানদের দিয়ে নিচেকার সেই পোড়াঝোরা নিজে খেয়েছেন শ্রীমা?

না কি আর সব অবতারের যেমন বিশেষ প্রিয় ভোজ্য থাকে, ঠাকুরের তেমনি খিচুড়ি! রঘুনাথের প্রিয় ভোজ্য রাজভোগ, বৃন্দাবনচন্দ্রের প্রিয় ভোজ্য ক্ষীর-সর, বুদ্ধদেবের প্রিয় ভোজ্য ফানিত বা ফেণী বাতাসা। তেমনি নবদ্বীপচন্দ্রের মালসাভোগ, শঙ্করপন্থীদের পুরি-নাড়ু আর রামকৃষ্ণের খেচরান্ন।

খেয়ে খানিক সুস্থ বোধ করলেন। নরেন বললে, এবার তবে একটু ঘুমুন। কালী, কালী, কালী—স্বচ্ছ স্পষ্টকণ্ঠে তিনবার উচ্চারণ করলেন ঠাকুর। জগজ্জনকে বরাভয় দেবার ইচ্ছায় দু-হাত সামনের দিকে প্রসারিত করে দিলেন। ধীরে-ধীরে শুয়ে পড়লেন বিছানায়।

রাত তখন একটা বেজে গেছে, ঠাকুরের সর্বদেহ কাঁপল দু-একবার, গায়ের সব লোম খাড়া হয়ে উঠল। চোখের দৃষ্টি নাসাগ্রভাগে এসে স্থির হল। মুখের উপর ভেসে উঠল অম্লান আনন্দজ্যোতি।

এই সমাধি বুঝি আর ভাঙে না।

হরি ওঁ, হরি ওঁ, আবার সবাই কীর্তন শুরু করল। বিগতমেঘ আকাশের মত এই বুঝি আবার চক্ষু উন্মীলন করবেন। কতবার গভীর সমাধি থেকে উঠে এসেছেন, এবারেও উঠবেন বোধ হয়।

দক্ষিণেশ্বরে বিষ্ণুঘরে রকে বসিয়ে ঠাকুরের একবার ফোটো তোলা হয়েছিল। তাঁর যে পদ্মাসনস্থ ধ্যানমূর্তি, যে মূর্তি ঘরে-ঘরে পটে-পটে বিরাজমান সেই ফোটো। ফোটো তোলাতে বসে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে যান। ফোটো তোলা শেষ হয়ে যাবার পরেও সমাধি ভাঙে না। ফোটোওয়ালা ভয় পেয়ে যন্ত্রপাতি ফেলে চম্পট দেয়। তারপর সমাধি ভাঙলে পরে ঠাকুর বললেন, 'দেখবি কালে ঘরে-ঘরে এই ছবিরই পুজো হবে।' সে ছবি পরে তাঁকে দেখানো হলে তিনি

তাকে প্রণাম করলেন, পুজো করলেন।
এই বুঝি জাগেন, এই বুঝি ওঠেন, সর্বক্ষণ সকলের মনে এই ঔৎসুক্য।
বুড়ো গোপালকে ডাকাল নরেন। বললে, 'একবার রামলালকে ডেকে আনতে পারো?'
লাটুকে নিয়ে বুড়ো গোপাল চলল দক্ষিণেশ্বর।
আকাশের পূর্ণ চাঁদ লাল হয়ে উঠল। ক্রমে হলদে হল। শেষে নীল হয়ে অস্ত গেল।
রাতেই চলে এসেছে রামলাল। বললে, 'ব্রহ্মতালু এখনো গরম আছে। তোমরা একবার কাপ্তেনকে খবর দাও।'
ভোর হয়ে গেল তবু ঠাকুর তখনো ঘুমে।
বাগান থেকে ফুল তুলল ছেলেরা। দিব্যতনুর শেষ পূজার আয়োজন করল। শ্রীপদে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিল। গলায় পরিয়ে দিল ফুলের মালা। এ কি, শ্রীঅঙ্গে যে এখনো তাপ। এখনো দিব্যদ্যুতি।
কে খবর দিয়েছে কে জানে, ভোর হতে না হতেই ডাক্তার সরকার এসে হাজির। তিনি দেখে-শুনে বললেন, এ মহাসমাধি ভাঙবার নয়। লীলা সম্বরণ করেছেন ঠাকুর।
কাপ্তেন, বিশ্বনাথ উপাধ্যায় এসে ঘি মালিশ করতে বললে। বললে, দেহে যখন এখনো তাপ আছে, তখন বলা যায় না, এ মহাসমাধি ভাঙতেও পারে। যোগ-শাস্ত্রে বিধি আছে সমাধিস্থ যোগীর গ্রীবা বক্ষ ও গুল্‌ফে যদি কোনো ব্রাহ্মণ গব্যঘৃত মালিশ করে তাহলে সমাধিভঙ্গের সম্ভাবনা। ঘি আনা হল। শশী গ্রীবায় শরৎ বক্ষে ও বৈকুণ্ঠ সান্যাল পায়ে মালিশ করতে লাগল। তিন ঘণ্টারও উপর মালিশ করা হল একনাগাড়ে। কিন্তু হায়, কিছুতেই কিছু হল না।
সমস্ত অবরোধ ভেঙে নদীর উচ্ছ্বাসের মত শ্রীমা ছুটে এলেন। পড়লেন মাটিতে লুটিয়ে। কণ্ঠে শুধু এক বুকভাঙা আর্তনাদ: আমার কালী মা কোথায় গেলে গো? যোগীন আর বাবুরাম ছুটে গেল মা'র কাছে। গোপাল-মা এসে মাকে তুলে নিল। মা একবার কেঁদে সেই যে চুপ করলেন তাঁর গলার আওয়াজ আর শোনা গেল না।
বাতাসের মুখে খবর ছুটল। নানা ধারায় আসতে লাগল জনস্রোত। ডাক্তার সরকার বললেন, 'এই দিব্যাবস্থার ছবি নেওয়া দরকার। আমি যাই, কলকাতায় গিয়ে এর একটা ব্যবস্থা করি।'
উদ্ধব বললে, হে অচ্যুত, যোগচর্চা অতি দুশ্চর। মানুষ যাতে সহজে সিদ্ধিলাভ

করতে পারে তাই বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'আর কিছু নয়, আমাকে এবং আমার জন্যই তোমার কর্ম এ ভাবটিকে সবদা মনে রেখে কর্ম করা অভ্যাস করবে। সকল ভূতের অন্তরে ও বাইরে আমাকে ছাড়া আর কাউকে দেখবে না। ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সাধু-তস্কর সুর-খলিজ ক্রূর-অক্রূর সকলকে যে সমান দেখে সেই পণ্ডিত। মন বাক্য ও শরীর দ্বারা সর্ববস্তুতে মদ্‌ভাব অনুভব করাই আমাকে লাভ করার শ্রেষ্ঠ উপায়।' শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম মাথায় নিল উদ্ধব। বললে, হে অজ, হে আদ্য, আপনার সান্নিধ্যগুণেই আমার মোহজাল ছিন্ন হয়েছে। আর কিছু চাই না, আপনার শ্রীচরণে আমার অনপায়িনী রতি হোক।

'উদ্ধব, তুমি আমার প্রিয়ধাম বদরিকায় চলে যাও। সেখানে আমার পাদতীর্থোদকে স্নান ও আচমন করে শুচি হও। বল্কল পরিধান করে বন্য ফল ভোজন করে অলকানন্দা দর্শন করে বিধৌতকলুষ হয়ে বিরাজ করো। সর্বপ্রকার দ্বন্দ্বভাব ত্যাগ করে মন আমাকে সমর্পণ করে আমারই প্রদত্তজ্ঞান স্মরণ করো।'

বদরিকায় চলে গেল উদ্ধব।

বাসুদেব চলে এলেন প্রভাসে। সেখানে যদুকুল একে অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিহত হতে লাগল। কৃষ্ণ ও বলরামকেও তারা আক্রমণ করলে। বলরাম আর কৃষ্ণের হাতে কেউ আর অবশিষ্ট রইল না।

তখন সমুদ্রবেলাতে বসলেন বলরাম। যোগ অবলম্বন করে পরমাত্মাতে আত্মা সংযুক্ত করে মনুষ্যলোক ত্যাগ করলেন। বলরামের নির্যাণ দেখে বাসুদেব একটি অশ্বত্থবৃক্ষতলে এসে বসলেন। চতুর্ভুজ মূর্তি ধরে দিঙমণ্ডল আলোকিত করে বিধূম পাবকের মত বিরাজ করতে লাগলেন। দক্ষিণ উরুর উপর কমলকোরকসন্নিভ বাম পদতল স্থাপিত। তূষ্ণীভূত সমাহিত মূর্তি।

সেই পদতলকে মৃগ মনে করে জরা-ব্যাধ শর ছুঁড়ল। শর বিদ্ধ করল পদতল। ব্যাধ এগিয়ে গিয়ে দেখল চতুর্ভুজ বিভ্রাজ-মূর্তি। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। হে অনঘ উত্তমশ্লোক, বুঝতে পারিনি, আমার এই অনপনেয় পাপ ক্ষমা করুন।

'তুমি আমার অভিলষিত কাজই করেছ।' বললেন শ্রীকৃষ্ণ। 'সুকৃতীদের পদ স্বর্গলোক লাভ করো।'

কৃষ্ণসারথি দারুক এল রথ নিয়ে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'রথে চড়ে নয়, আমি লোকাভিরাম ধ্যানমঙ্গল নিজ দেহ নিয়েই স্বধামে প্রবেশ করব। ভুবনে এই প্রতিষ্ঠিত করে যাবো যে মর্ত তনু দ্বারাই দিব্যগতি লাভ করা যায়। আমি কি

ব্যাধের খরশর থেকে আত্মরক্ষায় অক্ষম ছিলাম। না, দারুক, এইটুকু শুধু জেনো যে আমিই সত্য আর সমস্তই আমার মায়ারচনা।'

॥ ১৬৫ ॥

আমাকে দেখ।

চিদমৃতমুখরাশিতে চিত্তফেন বিলীন হয়ে গিয়েছে। চঞ্চল চিত্তবৃত্তিতরঙ্গ আর নেই। নিশ্চলসুখসমুদ্র নিশ্চেষ্ট ও সুপূর্ণ। আমি সর্বদা একাবস্থ। আমাতে দুঃখ কি করে সম্ভব? আমি আনন্দরূপ, আমি অখণ্ডবোধ। আমি পরাৎপর, ঘনচিৎপ্রকাশ। মেঘ যেমন আকাশকে ছোঁয় না, আমিও তেমনি সংসারদুঃখের বাইরে।

যে সূর্যালোকে অখিলজগৎ প্রতীত, তাকে কে সন্দেহ করে? তেমনি আমি যে স্বয়ংপ্রকাশ পরমপ্রকাশ কেবল-শিব তাতে কার সংশয়? দেখ আমাকে। আমি নিত্যস্ফূর্তি, নির্মলসদাকাশ, আমি নিত্যসুখশান্ত, আমার থেকেই সমস্ত মহামোহ দূরীকৃত, আমিই বেদ-প্রত্যয়-বিহীন অখিলতত্ত্ব।

চীনেবাজারের বেঙ্গল ফোটোগ্রাফার কোম্পানির লোক এল ফোটো তুলতে। আদতে আসতে বিকেল করে ফেলল। সকালের দিকে ঠাকুরের দিব্যদেহে, হরিপাদপঙ্কজপরাগপবিত্র দেহে, যে জ্যোতির্ময় দীপ্তি ছিল তা তখন ম্লান হয়ে গিয়েছে। পীতবস্ত্রে সাজানো হল সেই দেহ। নিচে নামানো হল খাটে করে। ভক্ত ও সন্তানেরা দাঁড়াল সন্নিহিত হয়ে, নরেনের কাঁধে হাত দিয়ে রাম দত্ত। ফোটো নেওয়া হল দুখানা।

সেদিনের কথা মনে পড়ছে ডাক্তার সরকারের, যেদিন প্রথম এসেছিল শ্যামপুকুরের বাড়িতে। ঠাকুর বলেছিলেন, 'যে সংসারী ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি রেখে সংসার করে সেই ধন্য সেই বীরপুরুষ। যেমন কারুর মাথায় দু-মণ বোঝা আছে, আর এদিকে বর যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। মাথায় বোঝা তবু বর দেখছে। খুব শক্তি না থাকলে কি এ সম্ভব?'

'দেখ আমি বই-টই কিছু পড়িনি, কিন্তু মা'র নাম করি বলে আমায় সবাই মানে। যখন পঞ্চবটীতে মাটিতে পড়ে-পড়ে মাকে ডাকতুম, বলতুম, মা আমি কিছু শুনিনি কিছু জানি না, তুই শুধু আমায় দেখিয়ে দে। কর্মীরা কর্ম করে যা পেয়েছে, জ্ঞানীরা বিচার করে যা জেনেছে, যোগীরা যোগ করে যা দেখেছে। আমার কিছু নেই, আমার আছে শুধু ভক্তি। তোকে ভালোবাসি এই অখণ্ড অধিকার। এই অধিকারেই নেব তোর অভয়পদ—আমার পরম পদ।'

ডাক্তার বলেছিল আর-আরদের, 'বই পড়লে এঁর এত জ্ঞান হত না।'

ঠাকুরেরও সেই কথা: 'অনেকে মনে করে বই না পড়ে বুঝি জ্ঞান হয় না। কিন্তু পড়ার চেয়ে শোনা ভালো, শোনার চেয়ে দেখা। কাশীর বিষয় পড়া, কাশীর বিষয় শোনা আর কাশী দেখা অনেক তফাত।' আবার বললেন, 'যারা নিজে দাবা খেলে তারা চাল তত বোঝে না, কিন্তু যারা না খেলে উপর-চাল বলে দেয়, তাদের চাল ওদের চেয়ে অনেকটা ঠিক-ঠিক হয়। সংসারী লোক মনে করে আমরা বড় বুদ্ধিমান। তারা নিজে খেলছে তাই তারা নিজেদের চাল ঠিক বুঝতে পারে না। কিন্তু সংসারত্যাগী সাধু নিজে খেলে না, তাই উপর-চাল ঠিক-ঠিক বলে দিতে পারে।'

চারদিকে শোকের পাথার দুলে উঠেছে। সব চেয়ে কাঁদছে বেশি শশী।

ডাক্তারের মনে পড়ল একবার ঠাকুর বলেছিলেন, শোকেরই মতই এই ঈশ্বর। যদি কারু পুত্রশোক হয় সেদিন কি আর সে লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারে, না, নিমন্ত্রণে গিয়ে খেতে পারে? সে কি লোকের সামনে জাঁক করে বেড়াতে পারে, না সুখ সম্ভোগ করতে পারে? তেমনি যদি ঈশ্বরে সত্যি ভক্তি হয়, যদি তাঁর নামগুণগান ভালো লাগে তাহলে কি আর ইন্দ্রিয়ভোগে মন যায়?

মহেন্দ্র মুখুজ্জে বললে, 'সংসারে কি শুধু দারিদ্র্যই দুঃখ? এ দিকে ছয় রিপু, তারপরে রোগ-শোক।'

'আবার মানসম্ভ্রম।' বললেন ঠাকুর, 'টাকা থাকলেই বা কি হবে! জয়গোপাল সেন কত টাকা করেছে, কিন্তু বিষম দুঃখ, ছেলেরা মানে না। যা হোক, তুমি তো একটা ধরেছ—নিরাকার। যা বিশ্বাস তাই রাখবে, কিন্তু এটা জানবে যে তাঁর সবই সম্ভব।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সবই সম্ভব। সাকারও সম্ভব।'

'আর জেনো তিনি চৈতন্যরূপে বিশ্ব ব্যাপ্ত করে আছেন।'

'তিনি চেতনেরও চেতয়িতা।'

'এখন ঐ ভাবেই থাকো, টেনেটুনে ভাব বদলাবার দরকার নেই। ক্রমে জানতে পারবে ঐ চৈতন্য তাঁরই চৈতন্য। যাকে জড় বলছ তাও চৈতন্যেরই আবরণ।'

তাই ঠাকুর যখন সায়েন্স-এ্যাসোসিয়েশান বা বিজ্ঞানসভায় যাবার জন্যে ডাক্তারকে পীড়াপীড়ি করেছিলেন তখন ডাক্তার বলেছিল, 'কি সর্বনাশ! তুমি সেখানে গেলে অজ্ঞান হয়ে যাবে।'

'কেন, কেন?'

'ঈশ্বরের নানা আশ্চর্য কাণ্ড দেখে।'

'তা বটে।' গম্ভীরমুখে বললেন ঠাকুর।

ঠাকুরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল ডাক্তার। ভাবছে, আমার কি এখনো গ্রেপ্তার হবার সময় আসেনি?

রবীন্দ্র নামে একটি কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলে আসত ঠাকুরের কাছে। একবার একনাগাড়ে তিন রাত তাঁর কাছে বাসও করেছিল। তাকে ঠাকুর বলেছিলেন, 'তোর কিন্তু দেরি হবে, এখনো তোর একটু ভোগ আছে কপালে। এখন কিছু হবে না। যখন ডাকাত পড়ে তখন ঠিক সেই সময়ে পুলিশ কিছু করতে পারে না। একটু থেমে গেলে তবে পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করে।'

ডাক্তার ভাবছে তার ডাকাতি কি শেষ হয়নি এখনো? এখনো কি সই হয়নি পরোয়ানা?

ঠাকুরের তিরোধানের ক-মাস পরে রবীন্দ্র একদিন পাগলের মত ছুটতে ছুটতে বরানগর মঠে এসে উপস্থিত। পরনে আধখানা মোটে কাপড়। আর আধখানা কোথায় গেল কে জানে?

'তোমার আর আধখানা কাপড় কোথায় গেল?'

'আসবার সময় কাপড় ধরে টানাটানি করলে, তাই আধখানা ছিঁড়ে গেল। নাও আধখানা। তবু তোমার খপ্পর থেকে যে করে পারি আসব বেরিয়ে—'

'কে সে?'

'আর কে? মদ আর তার সঙ্গিনী অবিদ্যা।'

'কি করে এলে?'

'স্রেফ পায়ে হেঁটে। ছুটতে-ছুটতে। যাই গঙ্গাস্নান করে আসি। আর সংসারে ফিরব না।'

রামলালও কাঁদছে অঝোরে। কি কথা ভাবছে কে জানে।

ঠাকুর যখন চিকিৎসার জন্যে চলে যান কলকাতা তখন রামলাল বলেছিল, আপনার জন্যে বড় মনকেমন করবে। ঠাকুর বললেন, মনে করবি যে ঝাউতলায় গেছি আবার আসব। যাব কোথায়? সর্বদাই আছি আমি দক্ষিণেশ্বরে।

মনে পড়ছে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরের দক্ষিণ বারান্দার দেয়ালে ঠাকুরের কাঠকয়লা দিয়ে আঁকা ছবিটি। একটি টবের উপর পদ্মফুলের গাছ, আর সেই ফুলের উপরে একটি পাখি। কাশীপুরের বাড়িতেও ছোট একটা কাঠির সাহায্যে দেয়ালে বালির উপর একটি গাছ এঁকেছেন আর গাছের ডালে বসা একটি পাখি। পাখিটা এমন জীবন্ত যেন এখনি উড়ে যাবে।

'ছেলেবেলায় কত ছবি আঁকতাম।' বলতেন সবাইকে: 'পোটোদেরও তাক

লেগে যেত।'

শম্ভু মল্লিকের বাগানে কে একজন এসেছে, হিপনটিজম জানে। ঠাকুর শুনে শুধোলেন সেটা কি জিনিস? সেটা হচ্ছে মন্ত্রের গুণে লোককে অজ্ঞান করে তাকে দিয়ে ইচ্ছা মত কাজ করানো। ঠাকুর তাকে বললেন, হ্যাঁ গা, তুমি তো অনেককে করো, কই আমায় একবার ঐ রকম করো না। পারলে না, লোকটা ঠাকুরকে পারলে না অজ্ঞান করতে। ঠাকুর বললেন, কে জানে বাপু মা'র ইচ্ছে নয় যে আমি অজ্ঞান হই।

সেই সেবার আলমবাজারে শিবু আচার্যির পাঁচালি শুনতে গিয়েছিল রামলাল। আসরে ভারি মজার ব্যাপার, একতাড়া কলার ঝাড় ও পঞ্চাশ টাকার নোট ঝোলানো। তার মানে যে ভালো করতে পারবে সে পঞ্চাশ-টাকা পাবে আর যারটা সবচেয়ে খারাপ হবে সে পাবে ঐ কলার ঝাড়। গান শুনে এসে ঠাকুরকে বললে রামলাল, কি সুন্দর গান! 'এমন অমূল্য শ্রীরামনাম কে শুনালে আমার কর্ণে।' ঠাকুর দুঃখ করে বললেন, 'আহা, আমি শুনতে পেলুম না।

কদিন পরেই শিবু আচার্যি হাজির দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর বললেন, আহা, সেই গানটা গাও না। রামলাল শুনে কত প্রশংসা করলে। শিবু গান ধরল। দু-চক্ষের জলে ভেসে গেলেন ঠাকুর, রামলালকে বললেন, গানটা লিখে নে। শিবুকে বললেন, 'আহা, কত লোককে গান শোনাচ্ছ, চার-পাঁচ ঘণ্টা গাইছ একভাবে, তোমার গলা খারাপ হয় না, এ কি কম কথা! যার দ্বারা দশজন আনন্দ পায় আর যার আকর্ষণশক্তি বেশি, তার হৃদয়ে যেন শক্তি বিরাজ করছে।'

একদিন শিবু আচার্যি চারখানি নৌকো নিয়ে হাজির। ওপারে ভদ্রকালিতে তার শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাবে। সে কি ধুমধাম করে যাওয়া হল সেবার। এক নৌকোয় ঠাকুর, নরেন, রাখাল আর রামলাল, আরেক নৌকোয় অক্ষয় মহিম আর মাস্টারমশাই। নিশান টাঙানো হল নৌকোয়। শিঙে খোল করতাল বাজিয়ে হরিনাম করতে-করতে যাত্রা। পারে কত লোক এসে দাঁড়িয়েছে। কারু হাতে ফুলের মালা, কারু হাতে বা ধামিভরা বাতাসা। ঠাকুরের গলায় মালা দিলে, হরিবোল-হরিবোল বলে বাতাসাগুলি ছড়িয়ে দিল চারদিকে। টলমল-টলমল করতে-করতে ঠাকুর নামলেন নৌকো থেকে।

কি হচ্ছে এখানে? একদিকে কীর্তন অন্যদিকে পণ্ডিতদের আলোচনা। ঠাকুরকে নিয়ে গিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বসিয়ে দিল। সে কি তর্ক পণ্ডিতদের

মধ্যে। সবচেয়ে দুর্ধর্ষ ব্রহ্মরত সামাধ্যায়। তার জিভের আগে কেউ টিকতে পাচ্ছে না। যে যা বলছে সব সে কেটে দিচ্ছে। কিছু মানছে না কিছু রাখছে না। অনেকক্ষণ চুপচাপ ছিলেন ঠাকুর, পরে রামলালকে বললেন, চল্ তো রে একটু বাইরে যাব। বাইরে গিয়ে তিনি হঠাৎ মাকে বললেন, মা, শালা ভারি তর্ক করছে। কারু কথাই নিচ্ছে না ধরছে না। ভারি শুকনো পণ্ডিত। তুই ওকে একটু ঠাণ্ডা করে দে দিকিনি। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে ঠাকুর সামাধ্যায়ের ডান হাঁটুটা খপ করে ধরে ফেলে বললেন, হ্যাঁ গা, কি বলছিলে বলো না। সামাধ্যায় হেসে বললে, ও আমি ঠাট্টা-তামাশা করছিলাম।

যখন খেয়ে-দেয়ে দুপুরে শুতেন কত তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিয়েছি। কতক্ষণ পরেই বলতেন, যা এইবার একটু গড়িয়ে নে গে যা। মাদুর-বালিশ নিয়ে একটু শুতুম, তারপর দপ্তরখানায় চিলে-ছাতে যেতুম রসিকের সঙ্গে গল্প করতে। কামারপুকুরের রসিকলাল সরকার মা-কালীর ঘরের সমস্ত কাজের যোগানদার, তখন থাকত সেই চিলে-কোঠায়। ঘুম থেকে উঠে ঠাকুর ডাকতেন, ওরে রাম-নেলো, শালা, শিগগির আয়, আমি বাইরে যাব। গল্পে এত মত্ত থাকতুম কখনো ঠিক-ঠিক শুনতে পেতুম না। যখন শুনতুম, পড়ি-মরি ছুট মারতুম। বলতেন, 'শালার রসকের ওপর এমন ভালোবাসা, গল্প করবে তো মাদুর-বালিশ তুলতেও সময় পায়নি।'

কত তামাক সেজে দিয়েছি। ঠাকুরের বায়ুবৃদ্ধি হয়েছে, আগড়পাড়ার বিশ্বনাথ কবরেজ চিকিৎসা করছে। হ্যাঁ গা, তামুক খেলে কি হয়? বায়ু কমে। বললে বিশ্বনাথ। তবে যখন তামাক খাবেন তখন চিলিমের উপর কিছু ধনের চাল আর মৌরী দিয়ে খাবেন। ও রকম করে কতবার সেজে দিয়েছি।

কত ডাকা-আনা করেছি নরেনকে। ওরে রামলাল, একবারটি লরেনের খবর নিয়ে আয়। এই ছাখ এক মাড়োয়ারি ভক্ত এসে বাদাম-কিসমিস খেতে দিয়ে গেছে। যা এগুলো পৌঁছে দিয়ে আয় লরেনকে।

আবার কবে আসবি? নরেনকে জিগগেস করলেন ঠাকুর। বুধবার আসব। ক'টায়? তিনটেয়। সেই বুধবার এসেছে, আর ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে কথা কইবেন কি, বারে-বারে বাইরের দিকে তাকাচ্ছেন। হঠাৎ, বলা-কওয়া নেই, চটিজুতো পায়ে দিয়ে হনহন করে ফটকের দিকে এগিয়ে গেলেন ঠাকুর। এ কি, নরেন দাঁড়িয়ে। কি রে, কখন এলি, বাইরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? নরেন বললে, এখন সবে দুটো, অনেক আগে এসে পড়েছি। সত্যরক্ষার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি, তিনটে বাজলে যাব। ঠাকুর দাঁড়িয়ে রইলেন। ফটকের সামনে দুজনের

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথা। যখন ঠিক তিনটে বাজল তখন নিয়ে এলেন ঘরে। কত দিনের কত কথা ভিড় করছে মনে।

মনে পড়ছে কাপ্তেনকে। কুকুর-কাপ্তেন। কোন একটা কুকুর মন্দিরের সামনে চাতালে বসে থাকত। ঠাকুর তাকে কাপ্তেন-কাপ্তেন করে ডাকতেন। ডাকলেই সে ঠাকুরের পায়ে এসে গড়াগড়ি দেয়, ঠাকুরের হাতের লুচি-সন্দেশ পেলে দারুণ খুশি। ঠাকুর বললেন, ছাখ এত যে কুকুর রয়েছে, কই কেউ তো মায়ের সামনে বসে না। গঙ্গার ধাপে বসতে, গঙ্গাজল খেতে এর আর জুড়ি নেই। এ কাপ্তেনটা শাপভ্রষ্ট হয়ে জন্মেছে। ওর পূর্বজন্মের সংস্কার যা ছিল তাই এখানে এসে করছে। ধন্য হয়ে গেল।

সিস্টার নিবেদিতা শ্রীমা'র সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। দেখল বাড়িতে ঢোকার সিঁড়ির উপর একটা কুকুর শুয়ে আছে। নিবেদিতা হাত জোড় করে কুকুরটিকে বললে, "ভক্তবর, দয়া করে পথ ছেড়ে দাও। আমি জগন্মাতার পাদপদ্মে প্রণাম করতে এসেছি, আমার পথরোধ করে থেকো না। আমি জানি, তুমি ছদ্মবেশী মহাভক্ত, পূর্ব-পূর্ব জন্মে অনেক সুকৃতি ছিল, কিন্তু কি কারণে কে জানে এবার কুকুরদেহ ধারণ করেছ। মায়ের পদধূলি পড়েছে সিঁড়িতে, পড়েছে কত সন্তান ভক্তের, তাই তুমি এ মহাতীর্থ ছাড়ছ না। আমিও তোমার সতীর্থ, আমাকে একটু পথ করে দাও।' কুকুর দোর ছাড়ল না, শুধু একটু পাশ দিল নিবেদিতাকে।

ঠাকুর যখন কল্পতরু হলেন তখন সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে রামলাল ভাবতে লাগল, সকলের তো একরকম হল, আমার কি গাড়ু-গামছা বওয়াই সার হবে? এই কথা যেমনি মনে হওয়া ঠাকুর অমনি পিছন ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'কি রে রামলাল, অত ভাবছিস কেন? আয়-আয়।' এই বলে রামলালকে টেনে এনে তাঁর সামনে দাঁড় করালেন, তার গায়ের চাদর খুলে দিলেন। তার বুকে হাত বুলুতে-বুলুতে বললেন, 'ছাখ দিকিনি এইবার।' রামলাল দেখল চারদিক অপার্থিব আলোতে ভরে গিয়েছে।

আর নরেন? নরেন কি ভাবছে?

ভাবছে তার গুরুদায়িত্বের কথা। বলে গেলেন যাবার আগে, তুই সব চেয়ে বুদ্ধিমান, তোর হাতে আর সব ছেলেদের ভার দিয়ে গেলাম। দেখিস ওদের, ছাড়িদনে।

রাত্রে, আহারান্তে, ঠাকুর যখন খানিক স্বস্তি বোধ করলেন, বললেন, 'জানিস, আজ সারাদিন ভগবানের খেলা দেখে বিভোর ছিলাম তাই তোদের সঙ্গে কথা

কইতে পারিনি।' তখন নরেন বলে উঠল, 'ভগবান তো সর্বভূতেই আছেন, ভুবনজোড়া তাঁর খেলার মাঠ—'

তখন ঠাকুর বললেন, 'ওরে তোর বেদান্তের ঈশ্বর নয়। তিনি চিন্ময়ও বটেন আবার চিদ্ঘনও বটেন। লালায় সেই চিন্ময়ের জমাট রূপ। দেখছি তিনি অপরূপ বালকৃষ্ণ হয়ে আপনমনে ধুলোখেলা করছেন। নবীন মেঘের মত রঙ, জ্যোতিতে সব দিক আলো, রূপ যেন ঠিকরে পড়ছে। পথ দিয়ে যত লোক যাচ্ছে তাদের গায়ে ধুলো দিয়ে আনন্দ। কেউ গাল দিয়ে গেল ভ্রূক্ষেপ নেই। কেউ আদর করে কোলে করতে এল, অমনি দে-দৌড়। আবার কেউ আনমনে চলে যাচ্ছে, ঝাঁপ দিয়ে তার কোলে উঠলেন। বালকের খেলা কিনা, কোনো হেতু নেই। যে আদর করলে তাকে উপেক্ষা, আর যে ভুলেও ডাকেনি তাকে কৃপা।'

বিকেল পাঁচটায় শুরু হল শোভাযাত্রা। গলায় ফুলের মালা, শ্রীপাদপদ্মে সচন্দন ফুল, চললেন ঠাকুর নারায়ণী দেহে আনন্দৈকমাত্র বৈকুণ্ঠলোকে। প্রেমাশ্রুব্যাকুল হয়ে সবাই ছুটোছুটি করতে লাগল, কেউ একটু খাট ছুঁতে পারে কিনা। কেউ একটু পারে কিনা কাঁধ দিতে। হে চরমশরণ, তোমাতে দৃঢ়া দুরাপা রতি দাও, দাও পাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্তি। শতবর্ষ তুমি ভক্তহৃদয়ে বাস করবে, আমার হৃদয় তোমার বাসের যোগ্য করে তোলো। খোল-করতালে সংকীর্তন চলল আগে-আগে। সঙ্গে নিশান, ওঁকার, ত্রিশূল। সমস্ত ধর্মের প্রতীক। বৈষ্ণবের খুন্তি, খৃষ্টানের ক্রুশ, মুসলমানের অর্ধচন্দ্র। চলেছেন সর্বধর্মসমন্বয়—সর্বধর্মএকীকরণমন্ত্রের উদ্গাতা। যত মত তত পথ তো বটেই, যত মত এক পথ।

জ্ঞানে শঙ্কর, ভক্তিতে গৌরাঙ্গ, বৈরাগ্যে বুদ্ধ, আত্মবলিদানে যীশুখৃষ্ট, ঔদার্যে মহম্মদ। সর্বত্র অবিরোধ, সর্বত্র অবিদ্বেষ। তুমি সেই সর্বত্রগামী। সেই সর্বাত্মা। এক ঈশ্বর। এক পৃথিবী। এক মানুষের সত্তা। হে এক, তোমাকে অনন্ত চক্ষুতে দেখতে দাও।

রাম দত্ত লাটুকে বললে, 'তুই বাগানে এখন কিছুক্ষণ থেকে যা। পরে যাস শ্মশানে।'

লাটু তাই থেকে গেল। শোভাযাত্রার সঙ্গে গেল না। ছন্নছাড়া শিশুর মত এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

'ঠাকুরের মিরাকল্ বা বিভূতি যদি কিছু দেখতে চাও তো লাটু মহারাজকে দেখ।' বলেছিল অতুল। 'ঠাকুর যে বলতেন ওরে লেটো, তোর মুখ দিয়ে

বেদবেদান্ত ফুটে বেরুবে, ঠিক তাই ফলেছে।'

'দেখো, একটুকু বুঝেছি যে এক ভাঁড় জল আলাদা করে রাখলে শুকিয়ে যায়', বলছে লাটু, 'বাকি সেই ভাঁড়কে যদি গঙ্গার জলে ডুবিয়ে রাখতে পারি তাহলে জল আর শুকোয় না। তেমনি এই জগতে হামাদের মনকে যদি ভগবানের পায়ে সঁপে দিতে পারি তাহলে বিষয়বাতাসে হামাদের মন আর শুকিয়ে উঠতে পারে না, জগৎ আর নিরানন্দ লাগবে না।' আবার বলছে, 'দেখো, গঙ্গার জলে ডুব দিলে মাথার উপর হাজার মণ জল থাকলেও ভারটা বোঝা যায় না, তেমনি ভগবানের সংসারে ভগবানকে ধরে ডুব দিলে সংসারের বোঝা আর বোঝা বলে মনে হয় না। সংসারকে মনে হয় আনন্দের নিকেতন। যো যাকে শরণ লিয়ে সে রাখে তাকো লাজ, উলঠ জলে মছলি চলে বহি যায় গজরাজ।'

সব তাঁর ইচ্ছা এই ভাবে নিষ্পন্ন থাকো। ঠাকুরের সেই গল্প মনে পড়ল। একজন লোক অনেক মেহনত করে পাহাড়ের উপর একখানি কুঁড়েঘর করেছিল। একদিন ভারি ঝড় উঠল। টলমল করতে লাগল ঘর। লোকটি তখন কাতরে প্রার্থনা করতে লাগল, হে পবনদেব, দেখো, ঘরটি যেন না পড়ে। পবনদেব শুনছেন না, ঘর মড়মড় করতে লাগল। তখন লোকটি একটা ফন্দি ঠাওরাল। হনুমান তো পবনদেবের ছেলে, তার নাম করে দোহাই দিলে। বাবা, এ হনুমানের ঘর, দেখো যেন ভেঙো না। কিন্তু তখনো ঘর পড়ো-পড়ো। তখন অনুপায় হয়ে লোকটি বললে, বাবা, এ লক্ষ্মণের ঘর। তবুও বারণ মানছে না ঝড়। বাবা, এ রামের ঘর, রামের ঘর। তবুও না। ঘর যখন সত্যি ভাঙতে শুরু করেছে, যখন আর উপায় নেই, তখন লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, যা শালার ঘর।

কিছুই করবার নেই। তাঁর ইচ্ছায় হচ্ছে তাঁর ইচ্ছায় যাচ্ছে।

আবার সবই তাঁর কৃপা।

দরোয়ান হনুমন্ত সিং-এর সঙ্গে এক ভারি পাঞ্জাবী কুস্তি লড়তে এসেছে। পাঞ্জাবী লোকটা ভীষণ জোয়ান, দিন পনেরো ধরে খুব কসরত চালাল আর ঘি দুধ মাংস খুব খেতে লাগল। তার চেহারা দেখে সবাই সাব্যস্ত করলে তাঃই জিত হবে। হনুমন্ত সিং-এর কোনো আয়োজন নেই, শুধু নীরবে দাঁড়িয়ে ঠাকুরের আশীর্বাদ চাইলে। ঠাকুর বললেন, খাওয়া কমাতে হবে, কসরত কমাতে হবে আর দিনভোর মহাবীরজীর শরণ নিতে হবে। মহাবীরজীর কৃপা হলে সব বিপক্ষ নিরস্ত হবে। লোকে ভাবলে একি সর্বনেশে বিধান, খাওয়া-দাওয়া কমালে লড়বে কি করে? কিন্তু ঠাকুরের উপর হনুমন্তের অটুট-বিশ্বাস,

তাঁর কথা পুরোপুরি মেনে নিলে। জয় মহাবীরের জয়। কুস্তিতে হনুমন্তের জয় হল।

আর সে কৃপার কোনো কার্যকারণ নেই।

একদিন দুপুরবেলায় লাটুকে নিয়ে ঠাকুর চললেন তালতলায়, ডাক্তার দুর্গাচরণ বাঁড়ুয্যের বাড়ি। চল, একবার তাকে গলাটা দেখিয়ে আসি, এমন ডাকসাইটে ডাক্তার।

অনেকক্ষণ ধরে দুর্গাচরণ ঠাকুরকে পরীক্ষা করলে, কিন্তু কি যে অসুখ, বলতে পারলে না। ঠাকুর তাকে বতবার বলেন, হ্যাঁ গা, রোগ সারবে তো, দুর্গাচরণ তত বলে, ওষুধটা আগে খেয়ে দেখুন। বাড়ি ফিরে এসে ঠাকুর লাটুকে বলছেন, রোগ সারবে কিনা তার খোঁজ নেই, বলে ওষুধটা খেয়ে দেখুন। খাব না ওর ওষুধ। তবে সেখানে গেলেন কেন? ওরে তুই জানিস না, ও লুকিয়ে-লুকিয়ে যেত দক্ষিণেশ্বর। কতবার গিয়েছে, একবার আমার না গেলে কি ভালো দেখায়? ও তো নিজে থেকে ডাকল না ওর বাড়ি, না ডাকুক, আমি নিজেই উদ্যোগী হয়ে গেলাম। কতদিন রাত্তির দশটা-এগারোটার সময় গিয়ে 'হৃদে, হৃদে' করে ডাকত। ওর গলা শুনে বুঝতে পারতুম, হৃদেকে বলতুম, ওরে দোর খুলে দে, কলকাতা থেকে দুর্গাচরণ এসেছে। হৃদয় দোর খুলে দিত। ডাক্তার একটাও কথা বলত না। চুপচাপ বসে থাকত অনেকক্ষণ। ঠাকুর বললেন, 'কি চোখে আমাকে দেখেছিল তা ও-ই জানে।'

রোজ সকালে ঘুম ভাঙতেই দু-চোখের উপর হাত চাপা দিয়ে ঠাকুরকে ডাকত লাটু। ঠাকুর এসে দাঁড়াতে তবে চোখ খুলত। দিনের প্রথম দর্শন দিনমণি নয়, দিনের প্রথম দর্শন শ্রীরামকৃষ্ণ।

এখন কোথায় দেখব তোমাকে?

লাটু ছুটল কাশীপুর শ্মশানে। চন্দনকাঠের চিতা জ্বলছে। চিরঞ্জীব শর্মা গান গাইছে শোকাশ্রু-গম্ভীর কণ্ঠে: 'জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে, হোক তব ইচ্ছা পূর্ণ সুখ-দুঃখের ভিতরে।' 'মা তোর রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ি অবাক হয়েছি। হাসিব না কাঁদিব তাই বসে ভাবিতেছি।'

কিন্তু প্রজ্বলিত চিতার পাশে পাখা হাতে কে বসে? আগুনকে হাওয়া করছে এ কে উন্মাদ?

উন্মাদ নয়, গুরুগতপ্রাণ শশিভূষণ। প্রভুর সেবাকালে অহরহ পাখা করেছে, এখনো দেহরক্ষা করার অন্তেও চলেছে সেই সেবাকাজ। দেহে নেই বলে যারা ভাবছে ঠাকুর তিরোহিত তারাই শশীকে উন্মাদ বলবে কি শশী সর্বকালে

সর্বঘটে তার ইষ্টকে দেখছে, তার দৃষ্টিতে অগ্নিতে আর রামকৃষ্ণে কোনো ভেদ নেই, তাই সে-ই সত্যদ্রষ্টা সে-ই সত্যধ্যানী।

চিতা নিবে গেল তবুও শশীর পাখার বিরাম নেই।

লাটু তুলল তার হাত ধরে। নরেন আর শরৎ নিজেদের কি প্রবোধ দেবে তা জানে না, শশীকে প্রবোধ দিতে লাগল।

ঠাকুরের সব ভস্মাস্থি একত্র করে একটি তামার কলসীতে রাখল শশী। মাথায় করে নিয়ে চলল। কাশীপুরের বাড়িতে ফিরে ঠাকুরের শয্যাস্থানে রাখল।

আবার বসল পাখা করতে।

কে বলে তিনি নেই?

আমি আছি। আগুনে দগ্ধ হলেও আমি উড়ে যাই না, জলে মগ্ন হলেও আমি ধুয়ে যাই না। আমি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য। আমি নিত্য সর্বব্যাপী স্থির অচল ও সনাতন। আমিই প্রাণীর গতি ও প্রতিপালক। আমিই প্রভু, সকল প্রাণীর নিবাসস্থল ও কৃতাকৃতের সাক্ষী। আমিই প্রত্যুপকার-নিরপেক্ষ হিতকারী। স্রষ্টা ও সংহর্তা। আধার ও প্রলয়ভাণ্ড। আমিই অক্ষয়কারণ।

আমাকে দেখো।

'নান্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে।' আমার বিভূতির অন্ত নেই। যা কিছু শ্রেষ্ঠ যা কিছু পরম-প্রধান তাই আমি। প্রকাশকদের মধ্যে আমি মরীচিমালী সূর্য, পুরোহিতদের মধ্যে আমি বৃহস্পতি, সেনাপতিদের মধ্যে কার্তিক আর জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্র। পর্বতের মধ্যে মেরু, দেবতার মধ্যে ইন্দ্র, নক্ষত্রের মধ্যে সুধাংশু। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন, অষ্ট বসুর মধ্যে অচল, সর্বভূতে অভিব্যক্ত চেতনা। বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ, স্থাবরের মধ্যে হিমালয়, শব্দের মধ্যে ওঁকার। দেবর্ষির মধ্যে নারদ, গন্ধর্বের মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধের মধ্যে কপিল। অশ্বের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, হস্তীর মধ্যে ঐরাবত, মানুষের মধ্যে নরপতি। আয়ুধের মধ্যে বজ্র, ধেনুর মধ্যে কামধেনু, সর্পের মধ্যে বাসুকী। সৃজনশক্তির মধ্যে কাম, নিয়ামকদের মধ্যে যম, সংখ্যাকারিকের মধ্যে কাল। পশুর মধ্যে সিংহ, পাখির মধ্যে গরুড়, মৎস্যের মধ্যে মকর। নাগের মধ্যে অনন্ত, জলদেবের মধ্যে বরুণ, দৈত্যের মধ্যে প্রহ্লাদ। বেগবানের মধ্যে বায়ু, নদীর মধ্যে গঙ্গা, শস্ত্রপাণিদের মধ্যে রামচন্দ্র। অক্ষরের মধ্যে অ-কার, সমাসের মধ্যে দ্বন্দ্বসমাস, বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা। সমস্ত সৃষ্টির আমিই আদি আমিই মধ্য আমিই শেষ, ক্ষণ-রূপে আমিই অক্ষীণ কাল, আমিই সর্বকর্মের ফলদাতা। অপহারীদের মধ্যে মৃত্যু, ভাবীকালের উৎকর্ষ, বিতণ্ডার মধ্যে বিচার। নারীর মধ্যে কীর্তি, শ্রী, বাণী,

স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা। ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী, মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ, ঋতুর মধ্যে বসন্ত। ছলের মধ্যে অক্ষ, তেজস্বীর মধ্যে তেজ, বিজয়ীর মধ্যে বিজয়, উদ্যোগীর মধ্যে অধ্যবসায়। যাদবের মধ্যে কৃষ্ণ, পাণ্ডবের মধ্যে অর্জুন, মুনির মধ্যে ব্যাস, কবির মধ্যে শুক্রাচার্য। আমিই শাসকের দণ্ড, জিগীষুদের নীতি, গুহ্য বিষয়ে মৌন, জ্ঞানীর জ্ঞান। যা কিছু বীজস্বরূপ তাই আমি। সমস্তই আমার সত্তায় সত্তান্বিত। সবই মদাত্মক। আমার বিভূতির এত কথা জেনেই বা তোমাদের কি দরকার? এইমাত্র জেনে রাখো আমিই এক পাদমাত্র দ্বারা সমস্ত জগৎ আবৃত করে আছি।

'জয় জয় পরমা নিষ্কৃতি হে নমি নমি
জয় জয় পরমা নির্বৃতি হে নমি নমি।
অশ্রুশ্রাবণপ্লাবন হে নমি নমি
পাপক্ষালনপাবন হে নমি নমি।
সর্ব ভয় ভ্রম ভাবনার
চরমা আবৃতি হে নমি নমি॥'

॥ ১৬৬ ॥

মা-ঠাকরুন হাতের বালা খুলতে যাচ্ছেন, ঠাকুর সশরীরে দেখা দিলেন। বললেন, 'কেন গো, আমি কি কোথাও গেছি? এ তো এঘর আর ওঘর।' কারু সাধ্য নেই মাকে থানকাপড় এগিয়ে দেয়। নিজ হাতেই মা কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে সরু করে নিয়েছেন।

লোকনিন্দা যায় না। স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণকন্যা সোনার বালা পরে পেড়ে কাপড় পরে এ কি কথা! তাহলে মানতে হয় দেশাচার। আবার খুলতে যাচ্ছেন বালা আবার ঠাকুরের আবির্ভাব। এবার একেবারে মা-ঠাকরুণের হাত চেপে ধরলেন, বললেন, 'আমি কি মরেছি যে বিধবার বেশ ধরবে? গৌরীকে জিগগেস কোরো, ও সব শাস্ত্র জানে।'

গৌরীকে কোথায় পাব? সে তো এখন বৃন্দাবনে।

ঠাকুরের তিরোধানের খবর পেয়ে গৌরীমা তো কেঁদে আকুল। ভৃগুপাতে দেহত্যাগ করতে উদ্যত হলেন। অমনি চোখ চেয়ে দেখল সামনে ঠাকুর দাঁড়িয়ে। তুই মরবি নাকি? ঠাকুর ধমক দিয়ে উঠলেন। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে গৌরীমা উঠে দাঁড়াল। ঠাকুর অদৃশ্য হয়ে গেছেন। গৌরীমা বুঝতে পারল তার দেহত্যাগ ঠাকুরের ইচ্ছা নয়। এখনো অনেক বুঝি তার কাজ বাকি।

'কি বলবে বলোই না।' কাশীপুরে একদিন মা দেখলেন ঠাকুর তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন অপলকে। দুই চোখ কি যেন বলি-বলি করছে।

'হ্যাঁ গা, তুমি কি কিছু করবে না? সব এ-ই করবে?' নিজের দেহের দিকে ইঙ্গিত করলেন ঠাকুর।

'আমি মেয়েমানুষ, আমি কি করতে পারি?'

'না, না, তোমাকে অনেক কিছু করতে হবে। লোকগুলো অন্ধকারে পোকার মত কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো।' নিজের দেহের দিকে আবার ইঙ্গিত করলেন ঠাকুর: 'এ আর কি করেছে? তোমার অনেক-অনেক কাজ বাকি। দায় কি শুধু আমারই? দায় তোমারও।'

এখন ঠাকুর অপ্রকট হবার পর, মা'র ইচ্ছা হল আমিও চলে যাই। ঠাকুর দেখা দিলেন। বললেন, 'জগতে মাতৃভাব প্রকাশের জন্যে তোমাকে রেখে গিয়েছি। তুমি থাকো।'

এদিকে মায়ের সন্তানদের মধ্যে ঝগড়া বেধেছে। ঝগড়া বেধেছে ঠাকুরের ভস্মাস্থি নিয়ে। কাশীপুরের বাড়ির ভাড়া টানবার আর সঙ্গতি নেই সন্তানদের, তবে ঠাকুরের পূতাস্থিপূর্ণ কলসীটি কোথায় রাখা হবে? যতদিন এ-বাড়ির মেয়াদ আছে ততদিন না হয় এখানেই সে কলসীর পূজার্চনা হবে—তারপর?

রাম দত্ত আর তার দলের লোকদের ইচ্ছা কলসী কাঁকুড়গাছিতে তার যোগোদ্যানে নিয়ে সমাহিত করা হয়। কিছুতেই তা হতে দেবে না। শশী আর নিরঞ্জন রুখে দাঁড়াল। গঙ্গাতীরে জমি কিনব নিজেরা আর সেখানে সমাহিত করব পূতাস্থি।

কিন্তু জমি কেনবার মত টাকা কই? নিজস্ব একটা বাড়ি পর্যন্ত নেই যেখানে এ সম্পদ আগলাতে পারি। সন্ন্যাসী ভক্তরা যুক্তি করতে বসল। তাম্রকলসী রামবাবুকেই দেওয়া হোক কিন্তু তার আগে পূতাস্থিভস্মের অধিকাংশ সরিয়ে নেওয়া হোক। কিন্তু দেখো, রামবাবু যেন জানতে না পারে।

তাই হল। বেশির ভাগ পূতাস্থিভস্ম সরিয়ে নেওয়া হল কলসী থেকে। রাখা হল একটি আলাদা কৌটোয়। সে কৌটোটি লুকিয়ে রাখা হল বলরাম বসুর বাড়িতে। সেখানেই হবে নিত্যপূজা।

মায়ের কানে গেল এই ঝগড়ার কথা। গোলাপ-মাকে বললেন দুঃখ করে, এমন সোনার মানুষই চলে গেলেন, দেখেছ গোলাপ, ছাই নিয়ে ঝগড়া করছে।' এত কথায় দরকার কি। বললে নরেন, 'আমাদের দেহেই ঠাকুরের জীবন্ত সমাধি হোক।'

পূতাস্থির খানিকটা হামানদিস্তাতে চূর্ণ করা হল। সেই চূর্ণ ভাগ করে নিল সন্ন্যাসী-সন্তানরা। জিহ্বায় স্পর্শ করল সকলে।

ঠাকুর মহাপ্রয়াণ করেছেন ৩১শে শ্রাবণ, তার কিছুদিন পরে, জন্মাষ্টমীর দিনে, অস্থির কলসী নিয়ে যাওয়া হল যোগোদ্যানে। কে আর নেবে, শশীই মাথা পাতল। যথোচিত পূজা হল কলসীর। তারপর তাকে যখন মাটির নিচে পোঁতা হল, উপরে মাটি ফেলে দুরমুশ করতে লাগল, তখন শশী তীব্র যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল : 'ওগো, ঠাকুরের গায়ে যে বড্ড লাগছে।'

নবীন শ্যামল ঘাসের উপর দিয়ে হেঁটে গেলে ঠাকুরের যেমন হত। ওগো, মাড়িয়ো না, মাড়িয়ো না, বুকে ভীষণ বাজছে।

ঘটে পটে কাঠে শিলায় সর্বত্র চৈতন্য।

একটি ভক্ত মেয়ে এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। উত্তরদিকের দরজা একটু ফাঁক করে দেখে একলা ঘরে ঠাকুর তক্তাপোশের উপর বসে পশ্চিমদিকের দেয়ালে টাঙানো দেবদেবীর ছবিদের সঙ্গে হাত নেড়ে-নেড়ে হাসছেন, কথা কইছেন। ভিতরে ঢুকে তাঁর আনন্দের ব্যাঘাত ঘটাতে ইচ্ছা হল না। কিন্তু অন্তর্যামী ঠাকুর জানতে পেরেছেন, হাতছানি দিয়ে ডাকলেন মেয়েকে, বললেন, 'দেয়ালের এই সব ছবি চৈতন্যময়, তাই এদের সঙ্গে কথা কইছি। তোমার ঘরে যে গোবিন্দের পট আছে তাকে ছবি মনে কোরোনি, তার সঙ্গে কথা কোয়ো—তাকে চিন্ময় ভাবতে-ভাবতে একদিন ঠিক তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাবে। সেইদিন সার্থক হবে তোমার পূজা, তোমার ভোগরাগ।'

গোবিন্দ মানে জানো তো? যিনি ইন্দ্রিয়সকলকে রক্ষা ও পরিচালনা করেন, যিনি ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ তিনিই গোবিন্দ। বৃন্দাবনে গরু চরিয়ে বেড়াতেন যে গোবিন্দ সেই তিনিই জীবের ইন্দ্রিয়ের রাখাল। সকল ইন্দ্রিয়ের কর্তা মন, সেই মন গোবিন্দপাচনবাড়িতে জব্দ থাকে। গোবিন্দই মনোরথের সারথি।

মনকে নিগৃহীত করো। মন নিগৃহীত না হলে অভয়লাভ অসম্ভব। মন নিগৃহীত হলেই দুঃখ ক্ষয়, প্রবোধ ও পরাশান্তি। ধীরে-ধীরে মননিগ্রহ করো। কুশাগ্রের মুখে বিন্দু-বিন্দু করে জল তুলে সমুদ্র সেঁচে ফেল। কামেই চিত্তের বিক্ষেপ। কামভোগে কেবল দুঃখ এই বোধে বৈরাগ্যবলে উদ্দীপ্ত হও। আত্মানাত্মবিবেকই উপসেব্য।

মনের সংযমই শম। কর্মেন্দ্রিয়ের সংযমই দম। সকল ব্রহ্ম এ জেনে ইন্দ্রিয়গ্রাম যদি সংযত হয় তখন যে অবস্থা তাই ধৃতি। প্রতিকারের চেষ্টা না করে চিন্তা আর বিলাপ না করে দুঃখ সহ্য করাই তিতিক্ষা। নিগৃহীত মন আবার

যদি বিষয়াভিমুখী হয় তাকে প্রত্যাহৃত করাই উপরতি। গুরু ও বেদান্তবাক্যে আস্তিক্যবুদ্ধিই শ্রদ্ধা। পরমগুরু পরমেশ্বরে একান্ত অনুরক্তিই সমাধান।

বলরামকে ঠাকুর বললেন, 'আমার ইচ্ছে দুখানি ছবি যদি পাই। একটি ছবি, যোগী ধুনি জেলে বসে আছে; আরেকটি ছবি, যোগী গাঁজার কলকে মুখে দিয়ে টানছে আর সেটা দপ করে জ্বলে উঠেছে। এ সব ছবিতে বেশ উদ্দীপন হয়। যেমন শোলার আতা দেখলে সত্যিকার আতার উদ্দীপন হয়।'

একটা থেকে আরেকটা।

অরুন্ধতী পাতিব্রত্যের প্রতীকস্বরূপ। তাই নববোঢ়াকে অরুন্ধতীনক্ষত্র দেখানো হয়। সে নক্ষত্র অত্যন্ত ছোট, সহজে চোখে পড়ে না। সুতরাং স্বামী নিকটের একটি স্থূল উজ্জ্বল তারার দিকে সঙ্কেত করে বলে, ঐ দেখো অরুন্ধতী। যখন বধূর দৃষ্টি তাতে সুস্থির হল একাগ্র হল তখন স্বামী বললে, না, না, ওটা নয়, ওর কাছে ঐ যে ছোট্ট তারাটি আছে ঐটিই অরুন্ধতী।

প্রতিমা দেখছ, তারপর দেখ সেই নিষ্প্রতীককে। মনোবুদ্ধিঅহঙ্কার চিত্ত দেখছ, তারপর দেখ এই আপনাকে। আত্মসাক্ষাৎকার করো।

কি চাই জানবার আগে কে চায় নির্ণয় করো। অন্বিষ্ট বস্তু ও অন্বেষক শক্তি কি আলাদা? তাই নিজেকে ফোটাও, নিজে হও। নিজেকে জানো। নিজেকে জানাই সত্য, নিজেকে জানাই সাধুতা। নিজের তাগিদে নিজের অনুপাতে হয়ে ওঠো। অন্যকে নকল করে নয় নিজে অবিকল থেকে।

শিবের কোলে কালী বসে, এই ক্ষেমঙ্করী ছবিটি ঠাকুরকে দিয়েছিল সুরেশ মিত্তির। ঠাকুর বললেন, 'বা, বেশ হয়েছে। মা, এই ঘরে থাকো, আর মন্দিরে গিয়ে খেও। ওরে রামলাল, কালীপুজোর দিন মা'র ছবিটি মা'র ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখবি। মা সেদিন অনেক কিছু খাবে।'

ভবনাথ এনে দিয়েছিল নবদ্বীপের গৌরাঙ্গকীর্তনের ছবি! যমুনাপুলিনের ছবিটি দিয়েছিল রাখাল। 'বা' রাখালের কি পছন্দ! রাধিকা কোমরে হাত দিয়ে যেন বাঁশরী কাড়তে যাচ্ছে।' শ্বেতপাথরের বুদ্ধমূর্তিটি দিয়েছিল পাইকপাড়ার রানী কাত্যায়নী। নেপালের বিশ্বনাথ উপাধ্যায় দিয়েছিল গণপতি মূর্তি। কেশবচন্দ্র দিয়েছিল যীশুখৃষ্টের ছবি, মহেন্দ্রলাল দিয়েছিল ষোড়শী আর যশোদাগোপাল। শিকদারপাড়ার পোটো দিয়েছিল পাষাণী অহল্যা, রাম লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্র।

সব কি সজীব। সর্বত্র উদ্দীপন।

নন্দনবাগানে ব্রাহ্মসমাজে গিয়েছেন ঠাকুর। ব্রহ্মমন্দিরের বেদীর সামনে ঠাকুর প্রণাম করলেন। বললেন, 'নরেন বলে সমাজ-মন্দিরে প্রণাম করে কি হয়?

উদ্দীপন হয়। মন্দির দেখলেই তাঁকে মনে পড়ে। যেখানে তাঁর কথা সেখানেই তাঁর আবির্ভাব। সেখানেই সকল তীর্থের উপস্থিতি। একজন, জানো তো, বাবলাগাছ দেখে ভাবাবিষ্ট হয়েছিল, কেননা ঐ কাঠে রাধাকান্তের বাগানের জন্যে কুড়ুলের কাঠ হয়। একজনের এমন গুরুভক্তি, গুরুর পাড়ার লোককে দেখেই ভাবে বিভোর। মেঘ দেখে নীল বসন দেখে রাধিকার ব্যাকুলতা।'

নন্দনবাগানে সদরালা কাশীশ্বর মিত্রের বাড়িতেই এই ব্রহ্মমন্দির। সেদিন সে উৎসবে উপস্থিত আছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বেদমন্ত্রপাঠের পর উপাসনা হচ্ছে। তারপরে প্রার্থনা। মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা। অসত্য থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও। অন্ধকার থেকে জ্যোতিতে। মৃত্যু থেকে অমৃতত্বে। হে চিরপ্রকাশ, একবার আমার হয়ে প্রকাশ পাও, আমাতেই তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ করো। হে রুদ্র হে ভয়ঙ্কর, তোমার প্রসন্নসুন্দর মুখ আমাকে দেখাও, সে মুখের অভয়লাবণ্যে আমাকে বাঁচাও, আমাকে উজ্জীবিত করো।

ঠাকুর খুব খুশি। বলছেন 'অশ্বত্থই সত্য, ফল দুদিনের জন্যে। গাছ কে দেখে সব ফুল কুড়োতেই ব্যস্ত। অন্তর শুদ্ধ না হলে বিশ্বাস হয় না। যার ঠিক বিশ্বাস তারই ঠিক দর্শন। তবে কিনা সংসারী লোকদের ঈশ্বরানুরাগ ক্ষণিক—যেন তপ্ত লোহায় জলের ছিটে, জল যতক্ষণ থাকে।'

এক শিখ-সেপাই এসেছিল ঠাকুরের কাছে। বললে, 'আমরা হরদম মারপিট করছি, সরকারী হুকুমে গুলি করে লোক মারছি, আমরা কি রকম থাকব?'

ঠাকুর ভাবে দেখলেন একটা ঢেঁকি ধান ভানছে। বললেন, 'দেখ ঢেঁকি যেমন অনেক মাথা নাড়ে, অনেক উঁচু-নিচু ওঠে, গড়ের ভিতর অনেক ধান ভানে, অনেক কাজ করে কিন্তু দু-পাশের দুটো কাঠি দুটো খোঁটাতে আটকানো থাকে, কোনো নড়চড় নেই, তেমনি মন রেখে কাজ কোরো।'

কাশীপুর বাগানের পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরছে ছেলেরা। নরেন, নিরঞ্জন আর কালী। কালীই বেশি ওস্তাদ। নরেন-নিরঞ্জন একটি মাছ গাঁথতে যত সময় নেয়, তার মধ্যে কালী প্রায় চার-পাঁচটি ধরে ফেলে। ঠাকুরের কানে গেল এ সংবাদ। ছেলেদের তিনি ডেকে পাঠালেন।

কালীকে বললেন, 'তুই নাকি পুকুরে ছিপ ফেলে খুব মাছ ধরিস?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ছিপ দিয়ে মাছ ধরা বড় পাপ।'

'কেন, জীবহত্যা?' নরেন বললে।

'হ্যাঁ, জীবহত্যা।'

boiRboi.net

'সে কি ? নায়ং হন্তি ন হন্যতে। আত্মা কাউকে মারতেও পারে না, নিজেও মরে না, তাহলে পাপ কোথায় ?'

'পাপ বিশ্বাসঘাতকতায়।' বললেন ঠাকুর, 'আহারের লোভ দেখিয়ে বঁড়শি লুকিয়ে রাখা আর অতিথিবন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে তার খাদ্যে গোপনে বিষ দেওয়া একই পাপ। আত্মা মরে না, অন্যকেও মারে না—এ সত্য, কিন্তু এই জ্ঞান যার হয়েছে সে তো আত্মা-স্বরূপ হয়েছে। তার আর অপরকে হত্যা করার প্রবৃত্তি হবে কেন ? যতক্ষণ ঐ হত্যাবৃত্তি আছে ততক্ষণ সে আত্মা-স্বরূপ হয়নি, সুতরাং তার আত্মজ্ঞানও হয়নি। তাই জেনে রাখ, ঠিক-ঠিক জ্ঞান হলে পা আর পড়ে না বেতালে।'

প্রয়াগে এসেছেন মা-ঠাকরুন। ঠিক করলেন ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নানকালে কেশদাম বিসর্জন দেবেন। কাউকে সে কথা প্রকাশ করলেন না, লক্ষ্মীকেও না। স্নানের দিন খুব প্রত্যূষে মা শুনতে পেলেন কে যেন লক্ষ্মীকে ডাকছে। 'লক্ষ্মী, লক্ষ্মী, লক্ষ্মী।' বেদনাবিদ্ধ গম্ভীর কণ্ঠস্বর। মা চঞ্চল হয়ে ছুটে গেলেন দরজার দিকে। দেখলেন ঠাকুর দুই হাত দিয়ে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু মুহূর্তমাত্র। পলক স্থির হতে না হতেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মায়ের প্রাণ অধীর হয়ে উঠল। কেন, কেন ঠাকুরের এই কাতরতা ? সহসা মনে হল তাঁর কেশদাম জলাঞ্জলি দেওয়া ঠাকুরের ইচ্ছে নয়।

কাশীধামে এসেছেন শ্রীমা। মৃত্তিকার কাশী নয়, স্বর্ণের কাশী।

কাশীতে এক গুরু তার শিষ্যকে এক ডেলা মাটি আনতে বললে। শিষ্য সারা কাশী ঘুরে-ঘুরে গুরুর কাছে ফিরে এল দিনান্তে। বললে, গুরুদেব, আমি হতভাগ্য, আপনার আদেশ পালন করতে পারলুম না। কোথাও একটু মাটি নেই।

এ কি অসম্ভব কথা ! গুরু ক্রুদ্ধ হল। সারা কাশী খুঁজে এক ডেলা মাটি পেলে না তুমি ?

বিনয়বচনে শিষ্য বললে, না গুরুদেব। অন্নপূর্ণার সোনার কাশী, এখানে মাটির ছিটেফোঁটাও নেই—সমস্তই সোনা।

গুরু স্তম্ভিত হয়ে গেল। শিষ্য তাকে ছাড়িয়ে সাধনভূমির কত উঁচুতে উঠে গেছে। বিশ্বনাথের মাথায় জল ঢালছেন শ্রীমা, আর দেখছেন, অনাদি লিঙ্গ কোথায়, ঠাকুর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। যত জল ঢালছেন সব ঠাকুরের পায়ে পড়ছে। হাত-পা কাঁপতে লাগল শ্রীমা'র, তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরলেন। এত তাড়াতাড়ি ফিরলে কেন মা ? কে একজন জিগগেস করলে। মা বললেন, ঠাকুর আমাকে হাত ধরে মন্দির থেকে নিয়ে এলেন।

আরেকদিন মা নারায়ণ দেখলেন। বৃন্দাবনে শেঠদের মন্দিরে যেমন দেখেছেন

তেমনি। শুধু নারায়ণ নয়, নারায়ণের পাশে ঠাকুর। ঠাকুর হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। ঠাকুর হাতজোড় করে কেন? 'তাঁর কথা ছেড়ে দাও।' বললেন মা। 'সকলের কাছেই তাঁর দীনভাব—ঐ ওঁর বিশেষত্ব। এবার যে বালকবৎ অবস্থা অবলম্বন করে লীলা করলেন।'

একবার এক ভক্ত ঠাকুরকে একজোড়া মোজা দিল। নতুন মোজা পরে ঠাকুর ছোট ছেলের মত আহ্লাদে আটখানা। হুটকো গোপাল এসেছে দর্শন করতে, আনন্দময় ঠাকুর বলে উঠলেন, 'ওরে, আমাকে আজ মোজা পরে কেমন বাবু সাজিয়েছে ছাখ।'

গোপাল হাসছে।

'তুই বড় হাসছিস যে?'

'মোজা পরে তো বেশ সেজেছেন।' বললে হুটকো গোপাল, 'এদিকে পরনের কাপড়খানার যে ঠিক নেই।'

ঠাকুরের কাপড়খানা এলোমেলো হয়ে ছিল। তিনি নির্লিপ্তের মতো বললেন, 'তাই তো রে, ঠিক বলেছিস তো।'

কাপড়খানা ঠিকঠাক পরিয়ে দিলে গোপাল। একেবারে শিশু। সদানন্দ সর্বানন্দ শিশুর মতই হাসতে লাগলেন ঠাকুর।

কামারপুকুরে একদিন রঘুবীরের ভোগ হয়ে গেলে ঠাকুরকে ডাকতে গেলেন মা। দেখলেন ঠাকুর ঘুমোচ্ছেন। মা একবার ভাবলেন ভাঙাবেন না ঘুম; আবার ভাবলেন ঘুম না ভাঙলে খেতে যে দেরি হয়ে যাবে। ভাবতে না ভাবতেই ঠাকুরের ঘুম ভেঙে গেল। বললেন, 'জানো গা, এক দূর দেশে গিয়েছিলাম। সেখানকার লোক সব শাদা-শাদা। তারা পরে আসবে। কিন্তু আমার দেখা তারা পাবে না।' তাদের অগ্রদূতী নিবেদিতা। মাকে একটি জার্মান সিলভারের কৌটো দিয়েছে, তাতে মা ঠাকুরের কেশ রেখেছেন। বললেন, 'নিত্যপূজার সময় যখন এই কৌটোটির দিকে তাকাই নিবেদিতাকে মনে পড়ে। নিবেদিতা আমায় বলেছিল, মা, আমরা আর জন্মে হিন্দু ছিলুম। ঠাকুরের কথা ওদেশে প্রচার হবে বলেই ওদেশে জন্মেছি।'

কোয়ালপাড়াতে খুব জ্বরে ভুগছেন শ্রীমা। বেহুঁশ হয়ে বিছানাতেই অসামাল হয়ে পড়ছেন। হুঁশ হয়ে যখনই ঠাকুরকে স্মরণ করছেন তখনই দর্শন পাচ্ছেন। সেই হৃষীকেশ থেকে এক সাধু লিখেছে মাকে, মা তুমি বলেছিলে, সময়ে ঠাকুররে দর্শন পাবে, কই তা হল?

চিঠি পেয়ে মা বললেন, 'ওকে লিখে দাও হৃষীকেশে গিয়েছ বলে ঠাকুর তোমার জন্যে সেখানে এগিয়ে থাকেন নি। সাধু হয়েছে ভগবানকে ডাকবে না তো কি

করবে? তিনি যখন ইচ্ছা দেখা দেবেন।'

'আপনাকে দর্শন করেছে অথচ আপনার উপর বিশ্বাস-ভক্তি নেই তাদের কি কিছুই হবে না?' একজন জিগগেস করল ঠাকুরকে।

ঠাকুর বললেন, 'ওরে নাই বা মানলেক, দর্শনের ফল যাবে কোথায়? পরের জন্মে তাদের সাধন-ভজনে মতিগতি হবে।'

কেউ-কেউ বা অশরীরী অবস্থাতেও উদ্ধার পায়।

গোপালের মা'র বাড়িতে ঠাকুর আর রাখাল গেছেন মধ্যাহ্নভোজের নিমন্ত্রণে। গঙ্গার ধারের বাগানবাড়ির নিচের ঘরটিতে থাকে গোপালের মা। কি রাশীকৃত রান্নার আয়োজন করেছে কে জানে, তার রান্না তখনো শেষ হয়নি। উপরের ঘরটি খুলে দিয়ে অতিথিদের বিশ্রাম করতে বললে।

ঠাকুরের পাশে তাকিয়া ঠেস দিয়ে রাখাল চোখ বুজে শুয়ে রইল। খানিক পরে শুনতে পেল কে যেন ঠাকুরের সঙ্গে কথা কইছে। বলছে, 'আপনি এখানে আসাতে আমাদের ঘর ছেড়ে দিতে হয়েছে। বাইরে এই দুপুরের রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে বড় কষ্ট হচ্ছে আমাদের।'

ঠাকুর বললেন, 'তোমরা কারা?'

'আমরা প্রেতাত্মা। পাশের চটকলে কাজ করতুম, অপঘাতে প্রাণ গিয়েছে। সদ্‌গতি হয়নি এখনো। এই বাগানে ঘুরে বেড়াই আর এই খালিঘরে থাকি।'

'আহা, তোমাদের এত কষ্ট; এখুনি চলে যাচ্ছি আমি।'

ঠাকুর উঠে পড়লেন।

রাখাল চোখ চেয়ে দেখল পাশে ঠাকুর নেই। ছুটে সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে ধরল। এ কি, নেমে যাচ্ছেন কেন? কার সঙ্গে কথা কইছিলেন এতক্ষণ?

'ওরে, এই ঘরটাতে ভূত থাকে। তারা বলছিল তাদের কষ্ট হচ্ছে বাইরে থাকতে। তাই নেমে যাচ্ছি। খবরদার এ কথা যেন বলিসনি বামনিকে।'

'আপনাকে দেখেও কি ওদের উদ্ধার হবে না?'

হবে। এখানকার টান চলে গেলেই উঠে যাবে উপরে।'

এখানকার টান কি যে-সে টান। ঠাকুর ছড়া কাটলেন:

রানী টানেন কোল পানে
রাখাল টানে বন পানে
রাই টানেন চোখের টানে
বল শ্যাম দাঁড়াই কোথা—

'সংসারে থাকো কিন্তু আসক্তির গোড়া কেটে।' বললেন ঠাকুর, 'আসক্তি পুষে

রাখলে এগুবি কি করে? নোঙর না তুলে দাঁড় টেনে গেলে নৌকো এক হাতও এগোয় না।'

'তবে কি সংসারে থেকে দয়া-মায়া স্নেহ-ভালবাসা তুলে নেব?'

'তোমাকে নিষ্ঠুর হতে হবে এ কে বলছে? সংসারের সবাইকে আপনার জন মনে না করে ভগবদ্‌জন বলে ভাবতে শেখ। তারই জন্যে মনের জঞ্জাল আগে সাফ করো। মনের জঞ্জাল ঘুচলেই চোখের দৃষ্টি ফুটবে। তখন দেখতে পাবে এ সংসারও তাঁরই রচনা। যার যা পেটে সয় তার জন্যে তেমন খাবারের ব্যবস্থা।'

যেখানে থাকো না কেন স্বর্গরাজ্য তোমার ভিতরেই। তুমি ছাড়া কেউ তা তোমার হয়ে আবিষ্কার করতে পারবে না।

ঈশ্বরে যুক্ত হয়ে থাকো। সব সময়ে তাঁর কথা ভাবো। তাঁর নাম করো। পুণ্যতীর্থ, নদীতীর, গুহা, পর্বতশৃঙ্গ, তীর্থস্থান, নদীসঙ্গম, পবিত্র বন, নির্জন উদ্যান, বিল্বমূল, গিরিতট, দেবমন্দির, সমুদ্রতীর, নিজ গৃহ অথবা যে স্থানে মন প্রশস্ত হয় প্রসন্ন হয় সেখানেই নাম করো। অত বাছবিচারের বা দরকার কি। যখনই মনে পড়বে তখনই নাম করবে। উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে খেতে-শুতে—যখন-তখন। নাম করতে-করতে মনের জঞ্জাল সাফ হবে। দেখা দেবে পবিত্রতা। পবিত্রতাই চিরতুষারমণ্ডিত কৈলাসধাম। নাম করতে-করতে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হবে। চিত্তবৃত্তি নিরোধের নামই যোগ। চিত্তকে একতান বা একাগ্র করার নামই যোগ। বুদ্ধির সমস্ত মুখ বেঁধে দিয়ে একটিমাত্র মুখ খুলে রাখার নাম যোগ। আর সব মুখ বেঁধে দিয়ে ঈশ্বরের মুখটি খুলে রাখো। দেখো কি রকম বেগ কি রকম শক্তি!

চিত্তে বাসনা থাকতে যোগ হবার সম্ভাবনা নেই। তোমার চিত্ত তোমারই অধীন হবে, তুমি চিত্তের অধীন হবে না এইটিই যোগের লক্ষণ। সবদিকে নিরুদ্ধ, শুধু একদিকে একাগ্র। ঈশ্বরের তীব্রভাবনার নামই যোগ। সে অভিজ্ঞতার জন্যে প্রস্তুত হও। প্রস্তুত হওয়া মানেই অধিকারী হওয়া।

নিশ্চিন্তপুরুষ হয়ে যাও।

বর্ষার রাত, অবিশ্রাম বৃষ্টি হচ্ছে, ঝড়ও চলছে দুনিবার, এক গোয়ালার ঘরের দেয়ালের ধারে ছেঁচতলায় আশ্রয় নিয়েছেন বুদ্ধদেব। জানলা দিয়ে গোয়ালা দেখলে, গেরুয়া কাপড়। হেসে বললে, 'সন্ন্যাসী, ওখানেই থাকো, ঐ তোমার ঠিক জায়গা।' তারপরে গান ধরল গোয়ালা, 'আমার গরু-বাছুর ঘরে আনা হয়েছে, সুন্দর আগুন জ্বলছে, আমার স্ত্রী নিরাপদে আছে, শিশুরা শান্তিতে ঘুমুচ্ছে, হে মেঘ, তুমি আজ যত খুশি বর্ষাও সারা রাত।' বাইরে থেকে

বুদ্ধদেব বললেন, 'আমার চিত্ত সংযত হয়েছে, আমার ইন্দ্রিয়সকল কুড়িয়ে এনেছি, হৃদয় আমার দৃঢ়, হে সংসারমেঘ, যত পারো বর্ষণ করো সারা জীবন।' এই হচ্ছে নিশ্চিন্তপুরুষ।

একটি আসনে বসো ও ধ্যান করো।

যে অবস্থায় সুখে অজস্র ব্রহ্মচিন্তা হয় তাই আসন। এ ছাড়া অন্য আসন সুখাসন নয়, সুখনাশন। শুধু স্তব্ধতাই মৌন নয়। বাক্য ও মন যাকে না পেয়ে নিবর্তিত হয় তাই মৌন। সমরস ব্রহ্মে লীন হওয়াই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমতা। নইলে শুধু শারীরিক ঋজুতাই সমতা নয়। নাসাগ্রনিবদ্ধ দৃষ্টিই যোগদৃষ্টি নয়। জ্ঞানময় দৃষ্টিতে সকলই ব্রহ্মময় দেখাই যোগদৃষ্টি। ব্রহ্মই আমি, এই জ্ঞানে যে নিরালম্বন স্থিতিলাভ হয় তাই ধ্যান। নির্বিকার ব্রহ্মরূপে অবস্থানে চিত্তবৃত্তির নিবৃত্তিই সমাধি।

বিষয় আর কিছুই নয়, দুটি মাত্র অক্ষর : হ আর রি।

কি খুঁজছ? সুখ? হায়, হায়, সুখ কি খোঁজবার বস্তু?

এমন একটা জিনিস চাই যাকে ধরে বাঁচতে পারি। যে আমাকে অন্তহীন আশা দেবে অতলগভীর আশ্বাস দেবে, অবিচ্ছিন্ন উৎসাহ দেবে। নিজের মধ্যে এত আমি অনিশ্চিত, সে আমাকে অকম্পিত নিশ্চয়তা দেবে। কে সে? ঐ দুটি মাত্র অক্ষর।

রাখাল ঠাকুরকে বললে, 'মাকে বলুন, যাতে শরীরটা আর কিছুদিন থাকে।'

নরেনেরও সেই কথা : 'আপনি ইচ্ছে করলেই মা'র ইচ্ছে হবে।'

'না রে না, এখন আর মাকে বলে কিছু হবে না।' বললেন ঠাকুর, 'এখন আর মা'র আর আমার ইচ্ছার মধ্যে ভেদ খুঁজে পাচ্ছি না।' পরে নিজের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'এর মধ্যে দুটো। একটা মা—পূর্ণ ও আর একটা ছেলে —অবতীর্ণ। ছেলেরই হাত ভেঙেছিল, ছেলেরই এখন অসুখ। পূর্ণই অবতীর্ণ হয়, মানুষ হয়ে ভক্তসঙ্গে আসে, তার সঙ্গে-সঙ্গে ভক্তরাও চলে যায়। রাউলের দল এল, নাচল, চলে গেল, কেউ চিনলে কেউ চিনলে না। জীবের জন্যেই এই শরীরধারণ, আর শরীর থাকলেই কষ্ট।'

ঠাকুর তাকালেন নরেনের দিকে। জিগগেস করলেন, 'আমাকে কি বলে বোধ হয়?'

নরেন বললে, 'আপনি সত্যদর্শী সিদ্ধ মহাপুরুষ, আপনিই স্বয়ং শ্রীমতী রাধারানী।'

ঠাকুর নিজের বুকে হাত দিয়ে বললেন, 'দেখছি যা কিছু আছে, সব এখান থেকেই।

তুমিই সব। তুমিই সমস্ত ঘর-ঘোরা পরিপক্ক ঘুঁটি। তুমি সব ঘরে সব ঘাটে সব পথে সব স্তরে। সব দৃষ্টিকোণে। তুমি আস্তিকের অস্তি, নাস্তিকের নাস্তি, শূন্যবাদীর শূন্য, অদ্বৈতবাদীর অদ্বৈত। তুমি অভেদবাদীর এক, প্রভেদবাদীর বহু, দ্বৈতবাদীর দুই।

তুমি কি নও? তুমি সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থী, সংসারী, ব্রহ্মচারী। তুমি কর্মী, জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত।

তুমিই আমার একমাত্র।

সার তুমি বস্তু তুমি প্রয়োজন তুমি। তুমিই আমার ঘর-বাড়ি মাঠ-আকাশ সাগর-পর্বত। আমার সমস্ত ভালোবাসা স্তবস্তুতি কথনকীর্তন—সব তোমার। তুমি দুর্বলের বল, দুঃখীর দরদী, দরিদ্রের ধনরত্ন। তুমি নিরাকুল শান্তি, নিরাময় ক্ষমা, নিরঞ্জনা সান্ত্বনা।

তুমি মধুর, সর্বতোমধুর।

অধরং মধুরং বদনং মধুরং
নয়নং মধুরং হসিতং মধুরং।
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং॥
বচনং মধুরং চরিতং মধুরং
বসনং মধুরং বলিতং মধুরং।
চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং॥
বেণুর্মধুরো রেণুর্মধুরো
পাণির্মধুরঃ পাদৌ মধুরৌ।
নৃত্যং মধুরং সখ্যং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং॥
গীতং মধুরং পীতং মধুরং
ভুক্তং মধুরং সুপ্তং মধুরং।
রূপং মধুরং তিলকং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং॥

॥ সমাপ্ত ॥

boiRboi.net